শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই বলেন :

"আমি ও আচার্য্য কৃপালনী অন্ত শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা পরিদর্শন করিয়া দেখিলাম যে ইহা একটি বৃহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় কারখানা। এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সুপরিচালনার জন্ম অধ্যক্ষ মহাশয় বাস্তবিকই প্রশংসার পাত্র। এখানকার সুবিশুদ্ধ ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীতে আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি।"

তাঃ ১৭।৫।২৫ স্বাঃ মহাদেব দেশাই

বিষয়-সূচী—বৈশাখ, ১৩৫৭

বিবিধ প্রসঙ্গ— ১—১৬

কন্যাদের বিবাহ হবে না ?—
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি ... ১৭

অপ্রতিগ্রাহী (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ২৩

বাঁধ (উপন্যাস)—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত ... ২৪

নারী শিক্ষা সমিতি (সচিত্র)—
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র ... ৩২

বিষয়-সূচী—বৈশাখ, ১৩৫৭

রোল্যাঁর শিল্পদৃষ্টি—
অধ্যাপক শ্রীসুধীর নন্দী ... ৩৯

স্পর্শ (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ... ৪২

ভেলকি (সচিত্র—গল্প)—শ্রীপরিমল গোস্বামী ... ৪৩

"বন্দে মাতরম্"—"জনগণমন অধিনায়ক"—
শ্রীসুধীরচন্দ্র কর ... ৪৮

সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী (সচিত্র)—
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ... ৫১

বিষয়-সূচী—বৈশাখ, ১৩৫৭

হাজারিবাগ সংশোধনী কারাগারের কথা—

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত ... ৫৫

অন্নপূর্ণার পুত্রবধূ (গল্প)—শ্রীজগদীশ গুপ্ত ... ৫৮

প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব (সচিত্র)—

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ... ৬৪

বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে মহাত্মাজী—শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল ... ৭১

জাগো নারায়ণ (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ... ৭৫

লিপিভারতী—সাক্ষরতার মূল ভিত্তি (সচিত্র)—

শ্রীসতীশচন্দ্র গুহঠাকুর ... ৭৬

পাকিস্থানের মতিগতি—রেজাউল করিম ... ৮২

সর্ব্বোত্তম উপন্যাস হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শরৎ-স্মৃতি পুরস্কার' পেয়েছিল আমাদের বই
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
হাঁসুলীবাঁকের উপকথা (২য় সং) ৭
বিপ্লব নেতা পুণ্যবান উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'খানা কালজয়ী সাহিত্যকীর্ত্তি
নির্ব্বাসিতের আত্মকথা (৪র্থ সং) ২৷৷০
ঊনপঞ্চাশী (৩য় সং) ২
সর্ব্বোত্তম উপন্যাস হিসাবে বাংলা গবর্ণমেণ্টের 'রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার' পেল আমাদের বই
সতীনাথ ভাদুড়ীর
জাগরী (৪র্থ সং) ৪
বনফুলের
শ্রেষ্ঠ গল্প (২য় সং) ৫
মানদণ্ড (২য় সং) ৪৷৷০
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের আধুনিকতম উপন্যাস
তোমরাই ভরসা ৫
হাতে খড়ি ৩
মনোজ বসুর
ভুলি নাই (১৮শ সং) ২
কাচের আকাশ ২
বাঁশের কেল্লা ২।০
আগষ্ট ১৯৪২ (২য় সং) ৪
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫
অমরেন্দ্র ঘোষের
পদ্মদীঘির বেদেনী ২৸০
১৩৫৪-র সেরা গল্প ৪
শ্রেষ্ঠ লেখকগণের বৎসরের সেরা গল্পের সঙ্কলন
'রঞ্জনের'
শীতে উপেক্ষিতা ৩য় সং ৩৷৷০
মহাস্থবিরের নূতন বই
প্রভাত-সঙ্গীত ২
যোগেশচন্দ্র বাগলের
বিদ্রোহ ও বৈরিতা ২
রামনাথ বিশ্বাসের
যুযুৎসু জাপান ৩
ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
অগ্নিরথের সারথি ৪
প্রবোধকুমার সান্যালের
কল্লোল (২য় সং) ২।০
উপহারের বই
মনোজ বসুর
ওগো বধূ সুন্দরী (৩য় সং) ২৸০
একদা নিশীথ কালে (৩য় সং) ২৷৷০
শৈল চক্রবর্ত্তীর
যাদের বিয়ে হ'ল (৪র্থ সং) ৩৷৷০
যাদের বিয়ে হবে ৩
আর্য্যকুমার সেনের
লীলাসঙ্গিনী ৪
নবেন্দু ঘোষের
ডাক দিয়ে যাই (৪র্থ সং) ৩
কালো রক্ত ২৸০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
শিলালিপি ৬
স্বর্ণসীতা (২য় সং) ২৸০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ভাবীকাল (২য় সং) ৩
অভিযোগ ৩
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
রাজপথ (৪র্থ সং) ৪
দিকশূল (২য় সং) ৪৷৷০
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
যৌবনের পিছল পথে ৩৷৷০
অলকা মুখোপাধ্যায়ের
তোমারই (২য় সং) ২
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আচার্য্য কৃপালনী কলোনি ২।০
হেমেন গুপ্তের
'৪২ আড়াই টাকা
ঋষি দাসের
মা (২য় সং) ২৸০
(প্রাংসিয়া দেলেদ্দা)
বেঙ্গল পাবলিশার্স :: ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বিষয়-সূচী—বৈশাখ, ১৩৫৭

মহিলা-সংবাদ— ... ৮৪

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেন কি বিজয়সেন?—
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত ... ৮৫

আলোচনা (সচিত্র)— ... ৮৭

পুস্তক-পরিচয়— ... ৮৮

প্রণাম জানাই (কবিতা)—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য ... ৯৪

দেশ-বিদেশের কথা (সচিত্র)— ... ৯৫

রঙীন ছবি

তীর্থযাত্রীদের শিবির—শ্রীহীরাচাঁদ দুগার

তীর্থযাত্রীদের শিবির
শ্রীহীরাচাঁদ দুগার

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা

পাতকুয়া তলায়

স্নানান্তে

'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"।

৫০শ ভাগ ১ম খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৫৭ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নববর্ষ

আজ নূতন বৎসরের দুয়ারে আসিয়া আমরা তমসাচ্ছন্ন পুরাতনের দিকে ফিরিয়া দেখিতেছি। ঘোর দুর্বিপাকের মধ্য দিয়া আমরা অতিক্রম করিয়াছি ১৩৫৬ সালের দীর্ঘপথ। পথের শেষে দেখিয়াছি কেবল বিভীষিকা; শুনিয়াছি কেবল উৎপীড়িতের আর্ত্তনাদ ও ধর্ষিতার কাতর ক্রন্দন এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়াছি উন্মত্ত জনতার গর্জ্জন। কোথাও দেখি নাই আশার আলোকের ইঙ্গিত, দেখিয়াছি কেবল নৈরাশ্যের গভীর ছায়াপাত।

সে পথের তো শেষ দেখা দিল। প্রশ্ন এই যে নববর্ষে বাংলার ও বাঙালীর যাত্রা তবে কোন পথে, কি উদ্দেশ্যে, এবং কাহার বিধিব্যবস্থায়? এবং সে পথে সাথী সহযাত্রী বান্ধবই বা মিলিবে কোথায় ও কবে? নূতন বৎসরেও কি বাঙালী চলিবে নিরুদ্দেশ যাত্রায়, উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছ্বাসে সম্বিৎহারার মত?

প্রথমেই বলি, আজ বাঙালীর সাথী-সহকারী বান্ধব বলিতে কেহ নাই। যে জাতি চিরকাল আবেগ-উচ্ছ্বাসের উন্মাদনায় ধ্রুব বাস্তবকে ছাড়িয়া অধ্রুব ও অবাস্তবের পিছনেই ছুটিয়া চলে, তাহার সঙ্গী হইয়া সর্ব্বনাশের পথে যাইবে কে? যে সহজ ও পিচ্ছিল পথে বাঙালী গড়াইয়া চলিয়াছে তাহার শেষ কোথায় তাহা জানে সকলেই, জানে না কেবল বাঙালী।

বাংলার ও বাঙালীর উদ্ধারের পথ অতি দুরূহ, কণ্টকাকীর্ণ। সে পথে চলিবার ইচ্ছা ও শক্তি যদি থাকে বাঙালীর মধ্যে তবেই এই "ছায়াভয়চকিত মূঢ়" পরিত্রাণ পাইবে, নতুবা নহে। দ্বাদশ শতকের বাঙালীর কথায় শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার অমূল্য "বাঙালীর ইতিহাস" গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

যে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা এবং তাহার চেয়েও বড় কথা, বাঙালী বাংলা দেশ যে সর্ব্বব্যাপী মহতী বিনষ্টির সম্মুখীন হইয়াল সেই পরাধীনতা ও বিনষ্টির হাত হইতে বাঁচিতে হইলে চরিত্রবল, যে সমাজশক্তি এবং যে সুদৃঢ় প্রতিরোধকামনা কা প্রয়োজন, সমসাময়িক বাঙালীর তাহা ছিল না। রণ ··সমাজ জাতবর্ণ এবং অর্থনৈতিক শ্রেণী উভয় দিক হইতেই স্তরে স্তরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত;···এক স্তর অন্য স্তরের প্রতি অবিশ্বাসপরায়ণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একের স্বার্থ অন্যের পরিপন্থী।"

ইহা কি আজও সত্য নয়?

একদিকে পিশাচের তাণ্ডব, অন্যদিকে ভীতচকিতের আর্ত্তনাদ, একদিকে শরণার্থীর চরম দুর্দ্দশা, অন্যদিকে স্বার্থান্বেষী মেকী বাস্তুহারার ষড়যন্ত্র—ইহার মধ্যে বাংলার উদ্ধারের বাস্তব পথের সন্ধান আমাদের করিতেই হইবে।

নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি

এই চুক্তির মূল্য কতটুকু, উহা বাস্তব অথবা অবাস্তব, তাহা উহার সত্যপালনের উপর নির্ভর করিবে। এখন হইতেই নিম্নলিখিত কয়েকটি লক্ষণ অবিলম্বে দেখা দিলে বিশ্বাস করা যাইবে যে চুক্তি সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছে।

(১) পাকিস্থান হইতে অবাধ সংবাদ সরবরাহ। শুধু সংবাদপত্র নয়, চিঠিপত্রেও যাহাতে আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিশদ বিবরণ বিনা সেন্সার ও বিনা বাধায় আসিতে পারে তাহার স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। সংবাদপত্রের কোন প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্থান কর্ত্তৃপক্ষের আপত্তি থাকিলে তাহা তাঁহারা জানাইতে পারেন কিন্তু সেই সংবাদপত্র বা সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানকে সেখানে প্রতিনিধিশূন্য অবস্থায় রাখিবার কোন অধিকার তাঁহাদের থাকিতে পারে না। সত্য সংবাদ অপ্রিয় হইলেই সংবাদদাতার পিছনে লাগিতে হইবে এই মনোবৃত্তি একেবারে বন্ধ হওয়া দরকার। উভয় পক্ষে সংবাদ সরবরাহের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইলে অবস্থার অনিশ্চয়তা দূর হইবে এবং ইহাই স্থায়ী বোঝাপড়ার মূল ভিত্তি।

(২) সীমান্তের ঘটনা একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১০ই এপ্রিলের মধ্যে কেবলমাত্র ত্রিপুরা, আসাম ও নদীয়া সীমান্তেই ২৬টি ঘটনা ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে মিঃ লিয়াকৎ আলির দিল্লী আলোচনাকালেই ঘটিয়াছে সাতটি।

(৩) বাস্তুহারাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন ও তাহাদের পথিমধ্যে নানাভাবে হয়রাণী বন্ধ করিতে হইবে। যাহারা গ্রামের অবস্থা অস্বস্তিকর বলিয়া বাস্তুত্যাগ করিয়াছে তাহারাও যদি পথি-

মধ্যে সদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার পায় তবে বিদেশে অনিশ্চিত জীবনযাপনের পরিবর্ত্তে স্বগৃহে ফিরিবার সাহস তাহাদের মনে জাগিবে। পাকিস্থান 'অবজার্ভার' পত্রে প্রকাশ পূর্ব্ববঙ্গের রিলিফ কমিশনার নারায়ণগঞ্জে এরূপ একদল বাস্তুহারার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করিয়া তাহাদের সাহস দেওয়াতেই তাহারা গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছে।

(৪) যে সমস্ত বাস্তুহারা ভারতে আসিয়াছে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বা অন্য আত্মীয়-স্বজনের খোঁজে তাহারা দেশে যাইতে চাহিলে তার অবাধ সুযোগ তাহাদিগকে দিতে হইবে।

(৫) পাকিস্থান সত্য সত্যই চুক্তির সর্ত্তানুসারে উপরোক্ত ভাবে কাজ করিতেছে কি-না তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হইবে বাস্তুহারাদের আগমন হ্রাস।

(৬) চুক্তিতে মাইনরিটি বোর্ড গঠনের কথা আছে। এরূপ বোর্ড গত বৎসর গঠিত হইয়াছিল। তাহার বহু হিন্দু সদস্য এখন বিনা কারণে নানা ছুতায় জেলে পচিতেছেন। তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হইবে।

(৭) মাইনরিটিদের মনে মেজরিটির উপর আস্থা আনয়নের একটি প্রধান উপায় সরকারী চাকুরীতে তাহাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের বেলায় এই নীতি পদদলিত করা হইয়াছে। পাকিস্থানে মাইনরিটিদের অধিকার স্বীকারের আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হইলে অনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। লিয়াকৎ আলি যে বলিয়াছেন, পাকিস্থান আধুনিক গণতন্ত্র, শরিয়ৎ শাসিত ইসলাম রাজ্য নয়—এই কথা ভাঁওতা কিনা তারও প্রমাণ ইহাতেই মিলিবে।

নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির মূল

নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি সাফল্যের অথবা ব্যর্থতার পথে অগ্রসর হইতেছে তাহা বুঝিবার জন্য যে কয়টি লক্ষণ আবশ্যক আমরা আলোচনা করিয়াছি। অবাধ সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতার উপর আমরা খুব বেশী জোর দিতে চাহিতেছি এইজন্য যে, একমাত্র ইহারই দ্বারা প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব হইবে। চুক্তিতে উত্তেজনামূলক সংবাদ প্রচার বন্ধ করিবার কথা আছে, সত্য সংবাদ চাপা দেওয়ার জন্য এই সর্ত্তের সুযোগ লইলে তাহা অত্যন্ত অন্যায় হইবে এবং তাহাতে ইহাই বুঝা যাইবে যে, যে পক্ষ সংবাদ চাপা দিতে চাহিতেছেন তাঁহারা চুক্তি রক্ষার পথে যাইতেছেন না। খাঁটি এবং নির্ভরযোগ্য সংবাদ প্রাপ্তির একটা মস্ত বড় উপায় পার্লামেন্টের এবং ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্যবিবরণী। ভারতের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহ এই কার্য্য-বিবরণী যথেষ্ট দ্রুততার সহিত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু পাকিস্থানে তাহা হয় না। পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের কোন কার্য্য-বিবরণী গত তিন বৎসরের মধ্যে আমরা দেখি নাই, যত দূর শুনিয়াছি তাহাতে মনে হয় উহা ছাপাই হয় নাই। করাচী ব্যবস্থা-পরিষদের কার্য্য-বিবরণীও খুব বেশী পিছাইয়া আছে।

পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে বিরোধীদলের নেতা শ্রীবসন্তকুমার দাস পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীকে প্রদত্ত একটি মেমোরাণ্ডামে ফেব্রুয়ারী মাসের চাঞ্চল্যের মূল কারণ ও বিবরণ নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। উহা আমরা দেখিয়াছি।

মেমোরাণ্ডামে তাঁহারা বলিতেছেন যে, পাকিস্থানের মাইনরিটিরা মনে করিতেছে যেন তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘ কাল যাবৎ হিন্দুদের তাড়াইবার জন্য বেপরোয়া ভাবে বাড়ী রিকুইজিশন, ক্ষতিপূরণ না দেওয়া, বেআইনী ভাবে টাকা আদায়, গ্রেপ্তার ও বিনাবিচারে আটক রাখা ইত্যাদি চলিতেছিল। ইতিপূর্ব্বে আরও দুই বার তাঁহারা এই সকল অত্যাচারের পরিণামের কথা মি: লিয়াকৎ আলিকে জানাইয়াছিলেন। দুই বারই তাঁহারা অত্যাচারের অনেক ঘটনার তালিকা দিয়া বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন যে, সাধারণ শাসনব্যবস্থা এ বিষয়ে শিথিল হইয়া পড়িতেছে এবং দুর্বৃত্তের কার্য্যকলাপ নিবারণে পুলিস যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে না। ডিসেম্বর মাসে পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন বসিলে তাঁহারা প্রধান মন্ত্রীকে সমস্ত ঘটনা লিখিয়া দাখিল করেন। কিন্তু কোন ফল হয় না। স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে ক্রমাগত তীব্র হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার চলিতে থাকে, মুসলিম লীগের কতিপয় নেতাসহ মেজরিটি সম্প্রদায়ের বহু লোকেও সাম্প্রদায়িক তিক্ততা প্রচার করিতে থাকে, পরিষদ-সদস্যেরা এ বিষয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করা সত্ত্বেও গবর্মেণ্ট ইহাদের বাধা দেন নাই। পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ ইহারই পরিণতি।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস স্পষ্ট ভাষায় এই কথা লিয়াকৎ আলিকে লিখিয়া দিয়াছেন, "আপনি গতবার আসার পর এই প্রদেশে পর পর কয়েকটি বড় ঘটনা ঘটিয়াছে।"

ইহার পর তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন: শ্রীহট্ট জেলার বিয়ানীবাজার এবং বড়লেখা থানার অন্তর্গত কতকগুলি গ্রামে মুসলিম জনতা হিন্দুদের আক্রমণ করে। ইহাদের সঙ্গে পুলিস এবং আনসাররাও ছিল। লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড, হত্যা ইত্যাদি তো হইয়াছেই, পুলিস কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত নারীধর্ষণ করিয়াছে। সমস্ত অত্যাচারটা দস্তুরমত সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে হয়। পরিষদের হিন্দু সদস্যেরা পরিষদগৃহে ঘটনা বিবৃত করেন এবং প্রতিকার প্রার্থনা করেন। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। বরিশাল জেলার ভাণ্ডারিয়া গ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের সমস্ত মাইনরিটির উপর অনুরূপ অত্যাচার হয় এবং মনে হয় জেলা কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে ইহা হইয়াছিল। আবার গবর্মেণ্টের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করা হয়, কিন্তু ইহাও ব্যর্থ হয়। বিশৃঙ্খলা দমনে গবর্মেণ্টের এই ইচ্ছাকৃত উদাসীনতা

দুর্বৃত্তদের উৎসাহ যোগাইতে বাধ্য; হইলও তাহাই। ইহার পর খুলনায় প্রায় ২০টি গ্রামে খুন, লুণ্ঠন, বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরকরণ, মন্দির অপবিত্রকরণ, নারীধর্ষণ প্রভৃতি ঘটিল। বাগেরহাট শহরেও গোলযোগ হইল। রাজসাহী জেলার নাচোলে এবং গোমস্তিপুরে সাঁওতাল গ্রামে অমানুষিক অত্যাচার হইল। স্থানীয় রোমান ক্যাথলিক মিশনারী ফাদার টমাস ক্যাণ্টেন্স তাঁহার রিপোর্টে পুলিস এবং মিলিটারী কর্তৃক সাঁওতালদের গৃহলুণ্ঠন, অগ্নিপ্রদান, নারীধর্ষণ প্রভৃতির বিবরণ দিয়াছেন। শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জে আদালত গৃহে ২২শে জানুয়ারী আকস্মিকভাবে আগুন লাগে কিন্তু তার জন্য বহু সংখ্যক হিন্দুকে গ্রেপ্তার ও মারপিট করা হয়। উত্তেজনাপূর্ণ সভা ও শোভাযাত্রা হয় এবং পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাসকে মারিতে মারিতে অজ্ঞান করিয়া ফেলা হয়। তাঁহাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করিতে হয়। কয়েকদিন বাদে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজও তিনি মুক্তি পান নাই। ২রা ফেব্রুয়ারী ফেণীতে কয়েকটি দোকানে খুন ও লুঠ হয়।

৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত বসন্ত দাস পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে মুলতুবী প্রস্তাব আনিয়া এই সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহেন। তাঁহাকে সে অনুমতি দেওয়া হইল না। আইনসঙ্গত ও নিয়মতন্ত্রসম্মত উপায়ে অভিযোগ জ্ঞাপনের এবং প্রতিকার প্রার্থনার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। "প্রধান মন্ত্রী এমন একটি বক্তৃতা করিলেন যাহাতে আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদিগকে hostage-এ পরিণত করা হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের মাইনরিটিদের উপর যাহা ঘটিবে তার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে।" প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তৃতার পর পরিষদের অন্য সদস্যেরা তীব্র ভাষায় বিষোদ্গার করেন। শ্রীযুক্ত দাস অতঃপর বলিতেছেন, "প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে hostage-এর পর্য্যায়ে পড়িতে আমরা রাজী নহি। মূল অধিকাররূপে আমরা আগেও দাবি করিয়াছি, এখনও করিতেছি যে অন্যত্র যাহাই ঘটুক না কেন এই রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ এবং আইনানুগ অধিকারীরূপে কতকগুলি অধিকার ও সংরক্ষণ আমাদিগকে দিতে হইবে। ৭ই ফেব্রুয়ারী এই কথাই আমি পরিষদ গৃহে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি। আমাদের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া আমাদের বক্তব্যের বিকৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে উত্তেজিত করা হয়।" ইহার পর সংবাদপত্রে তীব্র বিষোদ্গার চলিতে থাকে। এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের ঘটনার অতিরঞ্জিত বিবরণ রেডিও মারফত উত্তেজনাসহকারে প্রচারিত হইতে থাকে। এই ভাবে আসে ১০ই ফেব্রুয়ারী—সেক্রেটারিয়েট হইতে শোভাযাত্রা বাহির হইয়া তার পর হিন্দু নিধন আরম্ভ হয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ঘটনা ঘটে বহরমপুরে, জানুয়ারী মাসের শেষভাগে। ৮ই ফেব্রুয়ারী মাণিকতলার অগ্নিকাণ্ডকেই প্রথম বড় ঘটনা বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীনও ডিসেম্বরের শেষ ভাগে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার অধিবেশন এবং ১৫ই জানুয়ারীর সর্দ্দার প্যাটেলের বক্তৃতার আগে এই তরফে উত্তেজনার কোন নিদর্শন দিতে পারেন নাই।

কোন্ ঘটনা আগে কোন্টা পরে সে তর্ক তোলা নিরর্থক, কারণ পাকিস্থানকে দলিল দেখাইলেও সে সত্য কথা স্বীকার করিবে না। ঘটনার চেয়ে এখানে বড় কথা ঘটনার পরিবেশ। পাকিস্থান কোন রাষ্ট্রবিধি পাশ করে নাই, জনসাধারণের মূল অধিকার সম্পর্কিত ধারাও পাস হয় নাই। কেবলমাত্র রাষ্ট্রবিধির মুখবন্ধটি পাস করা হইয়াছে। উহাতে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে যে পাকিস্থানের গণতন্ত্র ইসলামের আদর্শে গঠিত হইবে। উহাতে একাংশে বলা হইয়াছে,

"Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed."

অপরাংশ এইরূপ :

"Wherein Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and the Sunna."

এই অনুচ্ছেদটির ব্যাখ্যার সময় পাকিস্থানী প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি করাচী গণপরিষদে বলিয়াছিলেন,

"You would also notice that *the State is not to play the part of a neutral observer* wherein the Muslims may be merely free to profess and practise their religion, *because such an attitude on the part of the State would be the very negation of the ideals which prompted the demand of Pakistan, and it is these ideals which should be the corner stone of the State which we want to build.* The State will create such conditions as are conducive to the building up of a truly Islamic Society, which means that *the State will have to play a positive part in this effort.*"

ভারতীয় রাষ্ট্রবিধিতে মাইনরিটি সহ সমস্ত নাগরিকের মৌলিক অধিকার সুস্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং উহা ভঙ্গ হইলে সুপ্রীম কোর্টে মামলা করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় রাষ্ট্রবিধির মুখবন্ধে ভারতীয় ঐতিহ্যের উল্লেখ নাই, যদিও সর্ব্বজীবে ও মানবে সমতা দর্শন ও সমব্যবহার ভারতীয় ঐতিহ্যের মূলমন্ত্র। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তিতে বলা হইয়াছে যে, পাকিস্থান গণপরিষদে গৃহীত রাষ্ট্রবিধিতে ঐরূপ বিধি আছে। অথচ পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃতিতে আমরা দেখিতেছি এই উক্তির কোন যাথার্থ্য নাই।

সার যদুনাথ সরকার তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ ঔরঙ্গজীবের ইতিহাসে পরিষ্কার ভাবে মুসলমান শাসিত রাজ্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। সার যদুনাথকে পক্ষপাতিত্বের কোনরূপ

দোষ কেহ দিতে পারিবে না। তিনি দেখাইয়াছেন যে, হিন্দু প্রজাদের necessary evil রূপে মানিয়া লওয়াই নিয়ম, যতদিন তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করে তত দিন তাহাদিগকে নানারূপ অসুবিধার মধ্যে নাগরিক অধিকার বর্জ্জিত হইয়া বাস করিতে হয়। ভীতি এবং প্রলোভন প্রয়োগের দ্বারা তাহাদের আলোকপ্রাপ্তি ত্বরান্বিত করা ইসলামের বিধান। হিন্দু হত্যায় মুসলমান দণ্ডনীয় হয় না—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম আইনজ্ঞের মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি ইহা দেখাইয়াছেন। কোরাণে মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, বিশ্বাসী অর্থাৎ মুসলমান এবং অবিশ্বাসী। অবিশ্বাসীদের মধ্যে যাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, অর্থাৎ ইহুদীরা, জিজিয়া কর দিয়া জিম্মিরূপে বাস করিতে পারে কিন্তু পৌত্তলিকদের বেলায় দুইটি মাত্র বিধান—হত্যা অথবা ইসলাম গ্রহণ। এই কথা সমস্ত মুসলমান জানে ও বিশ্বাস করে, ভারতে সাত শতাব্দীর মুসলিম অধিকারেরও ইহাই ইতিহাস। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর সর্ব্বপ্রথমে হিন্দুদের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা হইয়াছে, তারপর ধীরে ধীরে তাহাদের বাস, ট্যাক্সি, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি হইতে চ্যুত করিয়া অর্থনৈতিক অবরোধে ফেলা হইয়াছে, বইগুলি বদলাইয়া ইসলামী শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করা হইতেছে, আধুনিক জগতের মাইনরিটিরূপে সরকারী চাকুরীতে যে অনুপাত তাহাদের প্রাপ্য তাহা হইতে তাহাদের বঞ্চিত রাখা হইয়াছে, হিন্দুর সম্পত্তি লুণ্ঠন ও অপহরণ দণ্ডনীয় নহে এই ধারণা মুসলমানদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। এই ভাবে হিন্দু বিতাড়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার পর এখন হঠাৎ এমন কি ঘটিল যাহাতে পণ্ডিত নেহরু মনে করিলেন যে, এই চুক্তির ফলে হিন্দুরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিবে? লুণ্ঠিত সম্পত্তি এবং অপহৃতা নারী উদ্ধারের চুক্তি ত পঞ্জাবের সঙ্গেও হইয়াছিল, সে চুক্তি কে রক্ষা করিয়াছে আর কে ভাঙ্গিয়াছে সে কথা পণ্ডিতজী কি জানেন না?

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিকারে জন্য ২৩টি প্রস্তাব তাঁহার মেমোরাণ্ডামে দিয়াছেন। তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কথা এই যে, পাকিস্থানকে সেকুলার ও ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে এবং মাইনরিটিদের সঙ্গে সমান অধিকারসম্পন্ন নাগরিক বলিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। লিয়াকৎ আলি খাঁ পণ্ডিত নেহরুকে বলিয়াছেন যে, পাকিস্থানকে ধর্ম্মরাষ্ট্ররূপে গঠন করা তাঁহাদের অভিপ্রায় নয়, ভারতে যেমন রামরাজ্যের উল্লেখ করা হয় তেমনি তাঁহারাও মাঝে মাঝে ইসলামের কথা বলেন। উপরে প্রদত্ত পাকিস্থানী রাষ্ট্রবিধির মুখবন্ধের কথাগুলির বিষময় পরিণাম সম্বন্ধে যদি তাঁহাদের এতদিনে চৈতন্য হইয়া থাকে, নিজেদের ভুল স্বীকারে যদি তাঁহারা লজ্জা পান এবং পণ্ডিত নেহরুর নিকট ঐ মুখবন্ধের য ব্যাখ্যা লিয়াকৎ আলি খাঁ করিয়াছেন, তাহাই যদি তাঁহাদের এখনকার আন্তরিক কথা হয় তবে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের প্রস্তাব মত পাকিস্থানকে সেকুলার ও ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করিতে পাকিস্থানের দেরী হওয়া উচিত নয়। ভারতবর্ষ তার সাধ্যের অতিরিক্ত করিতেছে, এবার পাকিস্থানকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, পাকিস্থান হিন্দুবাসের যোগ্যস্থান।

ভারত-পাকিস্থান চুক্তির সর্ত্তাবলী

অনুচ্ছেদ (ক)—ভারত ও পাকিস্থান সরকার চুক্তিবদ্ধ হইয়া ঘোষণা করিতেছেন যে, প্রত্যেক সরকার তাঁহাদের এলাকায় সংখ্যালঘুদের ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমান নাগরিক অধিকার—ধন, প্রাণ, মান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পূর্ণ নিরাপত্তা, অবাধ-ভ্রমণের সুবিধা, আইন ও নৈতিক শৃঙ্খলা সাপেক্ষে তাহাদের বৃত্তি, বাক্ ও পূজা-অর্চ্চনার অধিকার দিবেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ন্যায় দেশের সাধারণ জীবনযাত্রা, কূটনৈতিক ও অন্যান্য চাকুরী, সৈন্য ও অসামরিক বিভাগে অংশ গ্রহণের সমান অধিকার পাইবেন। উভয় গবর্ন্মেণ্টই এইগুলিকে মৌলিক অধিকার বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন এবং যথার্থভাবে তাহাদের কার্য্যকরী করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন। ভারতের শাসনতন্ত্রে ভারতের সকল সংখ্যালঘুকে এই অধিকার প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু পাক-প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পাক-প্রধান মন্ত্রী জানান যে, পাকিস্থান গণপরিষদ তাঁহাদের প্রস্তাবে অনুরূপ ধারা গ্রহণ করিয়াছেন। কোন প্রকার বৈষম্য না করিয়া উভয় দেশের সকল অধিবাসীকে এই গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেওয়াই উভয় সরকারের নীতি।

উভয় সরকারই এই কথা জানাইতে চাহেন যে, নিজ রাষ্ট্রের প্রতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আনুগত্য থাকিবে এবং তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য তাহারা নিজেদের সরকারের উপর নির্ভরশীল হইবেন।

অনুচ্ছেদ (খ)—পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা প্রভৃতি যেস্থানে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ হইয়াছে তৎসম্পর্কে দুই দেশের নিম্নোক্ত চুক্তি হইয়াছে।

(১) চলাফেরার স্বাধীনতা ও দেশান্তর গমনের সময় নিরাপত্তা প্রয়োজন।

(২) উদ্বাস্তদের যতদূর সম্ভব অস্থাবর ও গৃহস্থালী সম্পত্তি আনয়ন করিতে দিতে হইবে। অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে ব্যক্তিগত অলঙ্কার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। প্রত্যেক বয়স্ক উদ্বাস্তকে নগদ দেড় শত এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ককে নগদ ৭৫৲ টাকা আনিতে দিতে হইবে।

(৩) উদ্বাস্ত যদি ব্যক্তিগত অলঙ্কার ও নগদ টাকা আনিবার ইচ্ছা না করেন তাহা হইলে তিনি তাহা ব্যাঙ্কে জমা

দিয়া আসিতে পারিবেন। ব্যাঙ্ক হইতে তাঁহাকে যথাযথ রসিদ দিতে হইবে এবং যখন তিনি প্রয়োজনবোধ করিবেন তখন এই সম্পত্তি প্রেরণের সুবিধা দিতে হইবে। অবশ্য নগদ টাকাকড়ি প্রেরণের সময় সংশ্লিষ্ট গবর্মেণ্টের বিনিময় হার অনুসরণ করা হইবে।

(৪) শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারী উদ্বাস্তুদের হয়রানি করিবেন না। এই প্রথা চালু করার জন্য শুল্ক বিভাগের সীমান্তবর্ত্তী ঘাঁটিতে অপর সরকারের সংযোগকারী অফিসার থাকিবেন।

(৫) স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা বা অধিকার সত্ত্বেও উদ্বাস্তুর অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে না। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে যদি অন্য কেহ সম্পত্তি অধিকার করেন তাহা হইলে তিনি যদি ১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তাহা হইলে তাঁহার সম্পত্তির অধিকার প্রত্যর্পণ করা হইবে। যেখানে উদ্বাস্তু চাষী প্রজা হইবেন সেখানেও তাঁহার জমির অধিকার ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। অবশ্য তাঁহাকে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইবে। যদি কোন সম্পত্তি উদ্বাস্তুকে প্রত্যর্পণ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে উপযুক্ত সংখ্যালঘু কমিশনের উপর তাহার বিবেচনার ভার অর্পণ করা হইবে। কোন রাষ্ট্রের বাস্তুত্যাগীরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনরায় সেই রাষ্ট্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহাদের স্থাবর সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া অসম্ভব হইলে তাহাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট সরকারই করিবেন।

(৬) যে সকল বাস্তুত্যাগী স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহিবেন না তাঁহাদের অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা তাঁহাদেরই থাকিবে এবং তাঁহারা অন্যদেশের বাস্তুত্যাগীর সম্পত্তির সহিত উহা বিনিময় করিতে পারিবেন। তিন জন সংখ্যালঘু প্রতিনিধি লইয়া গঠিত কমিটি ও উহার সরকার-নিযুক্ত সভাপতি মালিকের অছির কাজ করিবেন। কমিটি অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আইনের বিধান অনুযায়ী খাজনা ও ভাড়াদি আদায় করিবে। পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা কমিটি গঠন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিবেন। প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকার জেলার কর্তৃপক্ষ বা অনুরূপ কোন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য করিবেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পরে কিন্তু সাম্প্রতিক দাঙ্গার পূর্ব্বে যে সকল উদ্বাস্তু পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভারতে গিয়াছেন এবং যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ত্যাগ করিয়া পাকিস্থান অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন তাঁহাদের সম্পর্কেও উক্ত অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে। এই অনুচ্ছেদের ব্যবস্থা, পূর্ব্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য যাহারা বিহার ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের সম্পর্কেও প্রযুক্ত হইবে।

অনুচ্ছেদ (গ)—পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্থান সরকার নিম্নোক্তরূপে আরও চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন।

(১) তাঁহারা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার চেষ্টা অব্যাহত রাখিবেন এবং যাহাতে পুনরায় গোলযোগ না হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

(২) যাহারা কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তির ক্ষতি সাধনের বা অন্য প্রকার অপরাধে অপরাধী প্রতিপন্ন হইবে উভয় সরকার তাহাদের শাস্তি দিবেন। প্রয়োজন হইলে অপরাধ নিবারণের জন্য উভয় সরকার পাইকারী জরিমানা আরোপ করিবেন। দুর্বৃত্তদের সত্বর শাস্তি বিধানের জন্য প্রয়োজন হইলে বিশেষ আদালত নিয়োগ করা হইবে।

(৩) উভয় সরকার লুণ্ঠিত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

(৪) অপহৃতা নারীদের উদ্ধারকল্পে অবিলম্বে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইবে এবং এই প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইবে।

(৫) বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিতকরণ কোন সরকার স্বীকার করিবেন না। সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সময় অনুষ্ঠিত ধর্ম্মান্তরিতকরণ বলপূর্ব্বক করা হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে। বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত করণের অভিযোগে যাহারা দোষী সাব্যস্ত হইবে তাহাদের শাস্তি দেওয়া হইবে।

(৬) সাম্প্রতিক গোলযোগের কারণ তদন্ত ও রিপোর্টের জন্য অবিলম্বে এক কমিশন স্থাপন করা হইবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে অনুরূপ গোলযোগ না ঘটিতে পারে তজ্জন্য কমিশন সুপারিশ পেশ করিবেন। কমিশনে একজন হাইকোর্টের বিচারপতি থাকিবেন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন প্রতিনিধি থাকিবেন।

(৭) সংবাদপত্র, বেতার, ব্যক্তিবিশেষ বা কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি হইতে পারে এইরূপ কোন সংবাদ এবং ক্ষতিজনক মতামত প্রচারিত হইলে তাহা বন্ধ করিবার জন্য সত্বর ও কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। অপরাধী ব্যক্তিদের কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হইবে।

(৮) দেশের আঞ্চলিক সংহতি ক্ষুণ্ণ করিবার অথবা দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধে উস্কানি দিবার কোন প্রচারণাই কোন সরকার চলিতে দিবেন না। এই অপরাধে অপরাধী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

অনুচ্ছেদ (ঘ)—চুক্তির (গ) অনুচ্ছেদের (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৭), এবং (৮) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত সর্ত্তাদি সাধারণ ব্যবস্থার অন্তর্গত এবং প্রয়োজন অনুসারে ভারত অথবা পাকিস্থানের যে কোন অংশে প্রযোজ্য হইতে পারে।

অনুচ্ছেদ (ঙ)—উদ্বাস্তুরা যাহাতে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন

করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে সকলের মনে আস্থা আনয়নের জন্য উভয় সরকার নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন :

(১) যত দিন প্রয়োজন হইবে তত দিন পর্য্যন্ত উপদ্রুত অঞ্চলে অবস্থানের জন্য উভয় সরকার (একজন করিয়া) দুইজন মন্ত্রীর উপর ভার অর্পণ করিবেন :

(২) পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের মন্ত্রিসভায় সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইবে। আসামের মন্ত্রিসভায় ইতিপূর্ব্বেই সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি আছে। পূর্ব্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় অবিলম্বে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়োগ করা হইবে।

অনুচ্ছেদ (চ) —এই চুক্তি কার্য্যে পরিণত করার বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য উভয় সরকার (ঙ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত মন্ত্রিদ্বয়ের নিয়োগ ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের জন্য একটি, পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি এবং আসামের জন্য একটি সংখ্যাল্প কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সকল কমিশনের গঠন এবং অধিকার নিম্নলিখিত রূপ হইবে :

(১) প্রত্যেক কমিশনে, সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক অথবা রাজ্য সরকারের একজন মন্ত্রী থাকিবেন ও তিনি কমিশনের সভাপতি হইবেন এবং পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবেন। এই সকল প্রতিনিধি প্রাদেশিক অথবা রাজ্য সরকারের (যেরূপ প্রযোজ্য) আইন-পরিষদে নিজ নিজ (সম্প্রদায়ের) প্রতিনিধিদের দ্বারা এবং তন্মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করা হইবে।

(২) ভারত-সরকারের এবং পাকিস্থান-সরকারের মন্ত্রিদ্বয় যে কোন কমিশনের যে কোন সভায় যোগদান করিতে এবং অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই চুক্তি সন্তোষজনক-ভাবে কার্য্যে পরিণত করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদ্বয়ের যে কোন একজনের নির্দ্দেশে যে কোন একটি সংখ্যাল্প কমিশন অথবা যে কোন দুইটি সংখ্যাল্প কমিশনের বৈঠক হইবে।

(৩) প্রত্যেক কমিশন নিজ নিজ দায়িত্ব ও অধিকার যথাযথ পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং নিজ নিজ কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারণ করিবেন।

(৪) প্রত্যেক কমিশন ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসের আন্তঃডোমিনিয়ন চুক্তি অনুযায়ী গঠিত সংখ্যাল্প বোর্ডসমূহের মারফত প্রতি জেলার, সংখ্যাল্প সম্প্রদায় এবং ছোট ছোট পরিচালক সদর কার্য্যালয়ের সহিত সংযোগ রক্ষা করিবেন।

(৫) পূর্ব্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাল্প কমিশন ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসের আন্তঃডোমিনিয়ন চুক্তি অনুসারে গঠিত সংখ্যাল্প বোর্ডের স্থানাধিকার করিবে।

(৬) কেন্দ্রীয় সরকারের দুই জন মন্ত্রী মধ্যে মধ্যে নিজেদের বিবেচনা অনুসারে কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শ করিতে পারিবেন।

(৭) সংখ্যাল্প কমিশনের অধিকার নিম্নলিখিত রূপ হইবে :

(ক) এই চুক্তি কি ভাবে পালিত হইতেছে তাহা পরিদর্শন এবং তৎসম্পর্কে রিপোর্ট দান। এতদুদ্দেশ্যে (কমিশন) চুক্তি ভঙ্গ অথবা চুক্তি পালনে অবহেলার ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত থাকিবেন।

(খ) (কমিশনের) সুপারিশসমূহ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ দান।

(৮) প্রত্যেক কমিশন যথাপ্রয়োজন সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক এবং রাজ্য সরকারসমূহের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন। (ঙ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত কার্য্যকালের মধ্যে উক্ত রিপোর্টসমূহের নকল একই সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদ্বয়ের নিকট দাখিল করা হইবে।

(৯) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদ্বয়ের উভয়ের সমর্থন থাকিলে, ভারত ও পাকিস্থান সরকার এবং রাজ্য ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় নিজেদের সংক্রান্ত সুপারিশগুলি কার্য্যে পরিণত করিবেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদ্বয়ের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে, বিষয়টি ভারত এবং পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রিদ্বয়ের বিবেচনার্থ প্রেরণ করা হইবে। প্রধান মন্ত্রিদ্বয় নিজেরাই বিষয়টির মীমাংসা করিবেন অথবা মীমাংসার পদ্ধতি এবং যিনি মীমাংসা করিবেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন।

(১০) ত্রিপুরা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদ্বয়কে লইয়া কমিশন গঠিত হইবে এবং তাঁহারা এই চুক্তি অনুসারে পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের জন্য গঠিত সংখ্যাল্প কমিশনসমূহের অনুরূপ অধিকার ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(ঙ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদ্বয় পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম সম্পর্কে সংখ্যাল্প কমিশনের অনুরূপ দায়িত্ব এবং অধিকার পালনের জন্য ত্রিপুরায় যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশ করিবেন।

এই চুক্তিতে যে সকল ক্ষেত্রে প্রকারান্তর করা হইয়াছে, সেগুলি ব্যতীত অপর সকল ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সম্পাদিত আন্তঃডোমিনিয়ন চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

পণ্ডিত নেহরুর বেতার ভাষণ

নিম্নে পণ্ডিতজীর বেতার বক্তৃতার সারাংশ প্রদত্ত হইল :

যে ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়া মানুষের অন্তর-সত্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, আমরা সেই ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। বাংলাদেশের অগণিত নরনারী তাঁহাদের পৈতৃক ভূমি হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া চলিয়াছে। লক্ষ লক্ষ নরনারী মৃত্যুভয়ের মধ্যে দিন কাটাইতেছে। কিন্তু বাংলা ও আসামের লাঞ্ছিত ও অত্যা-

চরিত নরনারী ছাড়া আর যাঁহারা আছেন অর্থাৎ যাঁহারা ব্যক্তিগত জীবনে এই ভয়াবহ নির্যাতন ও লাঞ্ছনার সহজ শিকার হন নাই, তাঁহারাও এই লাঞ্ছনা ও দুর্দ্দশার বেদনার অংশ সমান ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্তরও হায় হায় করিয়া উঠিয়াছে। এই অন্তরের হাহাকার রক্তে উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিয়াছে এবং সেই উন্মাদনা উন্মত্ত পাশবিকতার পথ প্রশস্ত করিয়াছে। কিন্তু চরম বিপর্য্যয়ের মুখে পতিত হইয়া সমূলে ধ্বংস হইবার পূর্ব্বেই আমরা কোন রকমে যে টাল সামলাইয়া লইতে পারিয়াছি, ইহা আমাদের সৌভাগ্যই বলিতে হইবে।

কিন্তু এই চুক্তির মূল্য কি? ইহার কতটুকু কার্য্যকরী হইবে? এই চুক্তি বাংলা, আসাম ও অন্যত্রের সংখ্যালঘুদের মনে আশা ও নিরাপত্তা বোধ সঞ্চারে কতটুকু সফল হইবে? যে গুরুতর সমস্যার সম্মুখে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি, এই চুক্তি তাহা সমাধান করিতে পারিবে কি?

কিন্তু এই সব প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য হইতেছে এই যে, এইরূপ চুক্তিমাত্রই আনন্দের বিষয় ও অভিনন্দিত হইবার যোগ্য, কারণ এইরূপ চুক্তির ফলে জনসাধারণের মন ধ্বংসাত্মক কার্য্যের পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গঠনমূলক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

আমরা একটা বড় বাধা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছি কিন্তু এখনও আমাদের সম্মুখে আরও অনেক বাধা রহিয়াছে। সেগুলিকে আমি খাটো করিতে চাই না। কিন্তু যত দুরূহই হউক না কেন এই সব বাধা আমরা সকলে যদি অতিক্রম করিতে বদ্ধপরিকর হই তাহা হইলে জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

জনসাধারণের সহিত আমাদের যোগাযোগ দীর্ঘ ত্রিশ বছরের। এই দীর্ঘ দিনের যোগাযোগের অভিজ্ঞতা হইতে আমি তাঁহাদের চিনি, তাঁহারা আমাকে জানেন। কাজেই আমি আজ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতকটা বিশ্বাসের সহিতই বলিতে পারি বটে যে বর্ত্তমান সময় সহজ আশাবাদের সময় না হইলেও একেবারে নিরাশ হইবার মতও নয়। আপনারা এই চুক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া ইহার এখানে-সেখানে দোষত্রুটি ধরিতে পারেন, কিন্তু আসল বিবেচ্য বিষয় হইতেছে ইহার অন্তরস্থিত আন্তরিক মনোভাব। সেই আন্তরিকতা যদি ইহাতে না থাকিয়া থাকে তাহা হইলে এই চুক্তি এক টুকরা কাগজ ছাড়া আর কিছুই নহে—তাহার চেয়ে বেশী দাম ইহার কখনই হইবে না। দুঃখ ও বিপদ জয়ের শক্তি বাংলার অপরিসীম, বিপদের দিনে মাথা তুলিয়া চলিবার ক্ষমতা বাংলার অভূতপূর্ব্ব বলিয়া পণ্ডিত নেহরু বাংলার নরনারীর নিকট আবেদন জানাইয়া বলেন যে, তাঁহারা যেন আত্মশক্তি এবং ধৈর্য্যের সহিত বর্ত্তমান অবস্থায় নিজেদের কল্যাণ ও বৃহত্তর মানবের কল্যাণের পথে চলেন।

পার্লামেণ্টে পণ্ডিত জবাহরলাল

"পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী এবং আমি উভয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছি, তাহা আমি পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিতে চাহি। পূর্ণ এক সপ্তাহ আলোচনার পর গত শনিবার এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

"গত কয়েক সপ্তাহ এবং কয়েক মাস হইতে সমগ্র দেশ, বিশেষতঃ বাংলা যে দুর্ঘটনা ও বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাতে জনসাধারণের উত্তেজিত হইয়া উঠা বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে এবং যে দুর্ঘটনায় বিপুল সংখ্যক লোককে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে, তাহা অধিকতর বিপর্য্যয়ের সূচনা করে। আমি যখন পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি, তখন আমি গৃহহারা, ভীত, সন্ত্রস্ত দুর্ভাগ্য-প্রপীড়িত অগণিত লোককে অন্ধকারময় অজ্ঞাত ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইতে দেখিয়াছি। তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা আমি জানি। তাহার সমাধানের জন্য আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি। ভাগ্য এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য সরকারী কার্য্য গ্রহণ করার পর হইতে আমি যে আদর্শ অনুসরণ করিয়াছি তাহা যেন লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমরা কি উহার জন্যই দীর্ঘদিন চেষ্টা করিয়াছি? ইহার জন্যই কি আমরা জাতির জনকের শিষ্যত্ব লাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম?

"আমি পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীকে দিল্লীতে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলাম। তিনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাত দিন ধরিয়া আমরা বাংলার অবস্থা এবং অন্যান্য যে বিষয় ভারত ও পাকিস্থানের সম্পর্ক বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমরা আলোচনা করি। আমাদের উভয়ের উপরে যে বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে, আমরা তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। এই ব্যাপার কেবলমাত্র রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ব্যাপার নহে, পরন্তু ইহা মূলতঃ মানবিক; এই সমস্যার সহিত মানুষের জীবন ও মানুষের দুঃখকষ্ট জড়িত রহিয়াছে। এই সমস্যা কেবল বাংলার নহে, পরন্তু ইহা সমগ্র ভারতের। ইহার প্রতিক্রিয়া ভারত ও পাকিস্থানের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণেই সমগ্র বিশ্ব এই আলোচনা এবং উহার ফলাফল সম্বন্ধে উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল।

মৌলিক অধিকার

"চুক্তির প্রথম অংশে নাগরিক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নরনারীর গণতন্ত্রসম্মত কতক মৌলিক অধিকারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের সমানাধিকার থাকিবে এবং ধনসম্পত্তি, সংস্কৃতি, ব্যক্তিগত মর্য্যাদা রক্ষা ও প্রত্যেক রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে চলাফেরা, জীবিকাবলম্বন, বক্তৃতা দান, ধর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকার থাকিবে।

"আমাদের শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত প্রত্যেক বিষয়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে; কিন্তু কতক লোকের মনে এইরূপ একটা সন্দেহের ভাব সৃষ্টি হইয়াছে যে, সাম্প্রদায়িক আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্থান গঠিত ও পরিচালিত, সুতরাং তথায় সংখ্যালঘুদলের সমানাধিকার লাভের আশা নাই। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী বিশেষ জোরের সহিত উল্লিখিত অভিযোগ ক্ষালন করিয়াছেন এবং ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্রসম্মত ঐ সকল অধিকার স্বীকৃত হইবে। আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে পাক-গণপরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি আমার নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন যে, পাক-গবর্ন্মেণ্ট আধুনিক গণতান্ত্রিক আদর্শেই পরিচালিত হইবে এবং বর্ত্তমান জগতে ঐরূপ ভিত্তি ব্যতীত রাষ্ট্রগঠন সম্ভব নহে।"

প্রধান মন্ত্রী বলেন, ভারত ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ইহাতে অনেকেই এইরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে, ইহা ধর্ম্ম ও নীতি-বিরুদ্ধ। বহু লোক এইরূপ দাবিও উত্থাপন করেন যে, ভারতেও ধর্ম্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত এবং পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য। ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠিত হইলেই যে ব্যক্তিজীবন হইতে ধর্ম্মকে বাদ দেওয়া হইল ইহা মোটেই সত্য নহে। রাষ্ট্রের সহিত ধর্ম্মকে সমসূত্রে গ্রথিত না করাই ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের তাৎপর্য্য।

তদন্ত কমিশন নিয়োগ

সাম্প্রতিক হাঙ্গামার কারণ ও ইহার ব্যাপকতা নির্দ্ধারণ এবং ভবিষ্যতে ইহার পুনরাবৃত্তি রোধ সম্পর্কে কতক সুপারিশ পেশ করার জন্য তদন্ত কমিশন নিয়োগের প্রস্তাবও করা হইয়াছে। সংবাদ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টিমূলক মন্তব্য-প্রচার বন্ধের জন্য দ্রুত ও কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। পূর্ব্ব-অথবা পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক অখণ্ডত্ব অথবা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ সৃষ্টির প্ররোচনামূলক প্রচারকার্য্য কিছুতেই বরদাস্ত করা হইবে না।

ঐ সকল বিধান পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য হইবে। তবে সাধারণভাবে ভারত ও পাকিস্থানের যে কোন অংশে উল্লিখিত কতক বিধান প্রয়োগ করা চলিবে।

পণ্ডিত নেহরু বলেন, চুক্তি কার্য্যকর করার ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে এবং আসামে সংখ্যালঘু কমিশন নিয়োগ করা হইবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য উক্ত কমিশনের যে কোন বৈঠকে যোগ দিতে পারিবেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য কোন সুপারিশ সমর্থন করিলে সাধারণত: উহা কার্য্যকর করা হইবে। কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যদ্বয়ের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হইলে উহা ভারত ও পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রিদ্বয়ের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রধান মন্ত্রী বলেন, ইহাই চুক্তির সংক্ষিপ্তসার। গত কয়েকদিন যাবৎ যে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়াছিল ইহার ফলে অগৌণে তাহা বহুলাংশে প্রশমিত হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। ইহাও সত্য যে, এই চুক্তির দ্বারা বাংলা ও আসামের সমস্যার সমাধান হইবে না। লক্ষ লক্ষ নরনারী আশু প্রশস্তি লাভ করিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খানিকটা আশান্বিত হইবেন ইহাই একমাত্র আশা।

তিনি বলেন, আমাদের সমস্যার বহু দিক রহিয়াছে; তন্মধ্যে মানসিক দিকটাই মুখ্য। সংখ্যায় বহু হইলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে এমন একটা মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যে, ভীতি ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পূর্ব্বপুরুষের বাস্তুভিটায় বসবাস অপেক্ষা তাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দূরদেশে অনিশ্চিত অবস্থায় বসবাস করিতে আগ্রহশীল। এইরূপ মনোভাব দূর করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, চুক্তির দ্বারা ইহা কোনক্রমেই সম্ভব নহে। চুক্তি একটা নির্দ্দিষ্ট পথে পদক্ষেপ মাত্র। আরও বহু ব্যবস্থা অবলম্বন অত্যাবশ্যক। ভারত ও পাকিস্থান সরকার ঐ সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমি আশা করি, পার্লামেণ্ট ইহা কার্য্যকর করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করিবেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামবাসী নরনারী সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় সর্ব্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। তাঁহাদের নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে, তাঁহারা চুক্তি কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করিবেন। সমগ্র ভারত তাঁহাদের এই চরম দুর্দ্দশায় শুধু সহানুভূতি প্রদর্শন করেন না, সক্রিয়ভাবে দুঃখ-দুর্দ্দশা লাঘবের চেষ্টাও করিয়াছেন। উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে বলা চলে যে, ভারত-সরকার একটা বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। মন্দভাগ্য উদ্বাস্তু নরনারীর পুনর্ব্বসতির জন্য আমরা সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিব। কিন্তু এই বিরাট সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট পন্থা ইহা নহে। প্রত্যেকে যাহাতে স্ব স্ব বাস্তুভিটায় অবিলম্বে বসবাস করিতে সমর্থ হন সেইরূপ আবহাওয়াই আমাদের সৃষ্টি করিতে হইবে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া যে বর্ব্বর ও অমানবিক কার্য্যাবলী অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে। ব্যক্তিগতভাবে হিংসাত্মক কার্য্য ও অমানুষিক আচরণ প্রদর্শন দ্বারা দেশ ও জাতির কল্যাণ সম্ভব নহে—ইহাতে জাতি দুর্ব্বল ও অধঃপতিত হইতে বাধ্য।

সুতরাং ভারত ও পাকিস্থান সরকার এবং উভয় রাষ্ট্রের জনসাধারণকে সদিচ্ছার গভীর সঙ্কল্প লইয়া যাবতীয় সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। গত আড়াই বৎসরের মধ্যে যে জঘন্য আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়া জীবনকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছে তাহা অবশ্যই দূর করিতে হইবে।

পাক-পার্লামেণ্টে লিয়াকৎ আলির ঘোষণা

"মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, ভারত-পাকিস্থান বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য গত ২রা এপ্রিল আমি ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। আন্তরিক পরিবেশের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়, এবং ৮ই এপ্রিল আলোচনা শেষ হয়। আমি সানন্দে জানাইতেছি যে, আমাদের মধ্যে একটি চুক্তি হইয়াছে, এবং সে চুক্তি আমি আপনাদের নিকট পেশ করিতেছি।"

মিঃ লিয়াকৎ আলি বলেন, "চুক্তিটি দ্বিমুখী, ইহার সাধারণ দিক ও বিশেষ দিক আছে। সাধারণভাবে ইহাতে সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভারত অথবা পাকিস্থানের কোন অংশে সাম্প্রদায়িক অশান্তি হইলে কঠোর হস্তে তাহা দমনের ব্যবস্থা আছে। বিশেষভাবে ইহাতে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থা, অর্থাৎ যদি এই সকল স্থানে এখনও হাঙ্গামা চলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহা দমন ও বাস্তুত্যাগের হিড়িক বন্ধের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। বাস্তুহারাদের মনে আস্থার ভাব ফিরাইয়া আনিয়া তাহাদের স্বগৃহে প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

মৌলিক অধিকার

মিঃ লিয়াকৎ আলি বলেন, "চুক্তিতে যে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হইয়াছে, ১৯৪৯ সালের মার্চ্চে পাক গণপরিষদে গৃহীত রাষ্ট্রের নীতি নির্দ্ধারক প্রস্তাবে তাহার উল্লেখ আছে। ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমান নাগরিক অধিকার, ধন, প্রাণ, ব্যক্তিগত মান-মর্য্যাদা, চাকুরী, ব্যবসা, বক্তৃতা ও পূজা-পার্ব্বণ এই মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। উভয় রাষ্ট্রই পুনরায় ঘোষণা করিয়াছে যে, সমস্ত সংখ্যালঘুই এই সকল অধিকার ভোগ করিতে পারিবে এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ন্যায় তাহাদেরও সরকারী চাকুরী, রাজনৈতিক ও অন্যান্য চাকুরীতে সমানাধিকার আছে।"

পাক-প্রধান মন্ত্রী বলেন, "এই সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি আবার জোর দিতেছি। ইহা নীতিগত প্রশ্ন। উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুরা তাহাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের অনুগত থাকিবে। তাহারা তাহাদের রাষ্ট্রের নাগরিক এবং অভিযোগের প্রতীকারের জন্য তাহারা নিজেদের গবর্মেণ্টের উপরই নির্ভর করিবে। পুনরায় এই নীতি ঘোষণা করার কারণ এই যে, ইতিমধ্যে এই মূলনীতি যাহাতে স্বীকার করা না হয়, সেইজন্য উভয় রাষ্ট্রে যথেষ্ট রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটিয়াছে।"

সাম্প্রদায়িক অশান্তি দমন

মিঃ লিয়াকৎ আলি বলেন, "সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দমনের জন্য উভয় রাষ্ট্র যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হইয়াছে, অপরাধীদের শাস্তিবিধান ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পাইকারী জরিমানা ধার্য্য তাহার অন্যতম।"

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

মিঃ লিয়াকৎ আলি খান বলেন যে, সংবাদপত্র, বেতার, ব্যক্তিবিশেষ ও প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক সংবাদ প্রচার এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা জাগাইবার জন্য দুরভিসন্ধিপূর্ণ মতামত প্রকাশ বন্ধের জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং এই সকল ক্ষেত্রেও অপরাধীদের শাস্তিবিধান মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

মিঃ লিয়াকৎ আলি খান বলেন যে, বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তর অস্বীকার করা হইবে এবং অপহৃতা নারী উদ্ধারে সাহায্যের জন্য একটি এজেন্সী খোলা হইবে।

সংখ্যালঘু মন্ত্রী নিয়োগ

মিঃ লিয়াকৎ আলি খান বলেন, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন্ত্রী নিয়োগ সম্পর্কেও উভয় সরকার একমত হইয়াছে।

মিঃ লিয়াকৎ আলি খান বলেন, "মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, গত ২৮শে মার্চ্চ আমি পার্লামেণ্টে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিলাম যে, পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করা সত্ত্বেও হিন্দুদের গৃহত্যাগের দুইটি প্রধান কারণ আছে। ভারতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, ভারতীয় সংবাদপত্রে পাকিস্থান আক্রমণের ইঙ্গিত এবং কয়েকজন ভারতীয় নেতার উস্কানিই হিন্দুদের গৃহত্যাগের কারণ। বর্ত্তমান চুক্তিতে এই সকল বিষয়ের গুরুত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে আমি বলিতে চাই যে, আমি ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী সতর্কতার সহিত সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়াছি। আমি ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী স্বীকার করি যে, এই চুক্তি যথাযথ কার্য্যকরী হইলে এই উপমহাদেশ হইতে ভয় ও সংশয়ের ভাব দূর হইবে।"

বিলাতী সাপ্তাহিকে পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা বর্ণনা

লণ্ডনের অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক "ইকনমিষ্ট" ভারতের বন্ধু নয়; কাশ্মীর সম্পর্কে তাহার সম্পাদক আর একটা ভাগাভাগি চান। কিন্তু বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গের ঘটনায় তাঁহারও টনক নড়িয়াছে। নিম্নলিখিত প্রবন্ধ তাহার নিদর্শন:

গত তিন মাসে হতাহতের সংখ্যা খুব বেশী হয় নাই। ভারতে তিন সংখ্যার উপর উঠে নাই এবং পাকিস্থানেও চারি সংখ্যার মধ্যে রহিয়াছে। ১৯৪৬ সালে আগষ্ট মাসে যখন ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব ছিল, তখন কলিকাতায় পাঁচ হাজারের মত লোক নিহত হইয়াছে, কিন্তু সেই সময় কোন শরণার্থী সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু ১ লক্ষ ৩০ হাজার শরণার্থী এবার ভারতে আসিয়াছে এবং প্রতিদিন পাঁচ হাজার করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্ববাংলার প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে,

পাকিস্থানে ভারত হইতে ১ লক্ষ ১৬ হাজার শরণার্থী আসিয়াছে।

এখন উভয় দেশেই অতি সহজেই বনিয়াদী ব্যক্তিদিগকেও বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহাদের দুঃখের কাহিনী সকলে বিশ্বাস করে ও অতিরঞ্জিত করিয়া তোলা চলে। গুরুতর বিপদ উভয় দিকেই, কিন্তু পাকিস্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠদের বিপদ খুবই বেশী।

ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। শাসনতন্ত্রের মুখবন্ধে ন্যায় ও স্বাধীনতার কথা বলা হইয়াছে এবং তাহাতে ধর্ম সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই। হিন্দু ও মুসলমান এক, ইহাই কংগ্রেসের অভিমত। এক-চতুর্থাংশ মুসলিম কংগ্রেসকে সমর্থন করিত এবং ভারতে মুসলীম লীগের বিলোপ সত্ত্বেও তাহাদের নেতৃত্ব ও আদর্শ রহিয়াছে। ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টে দুই জন মুসলমান মন্ত্রী আছেন, প্রদেশেও বহু মুসলিম মন্ত্রী আছেন, বিহারে পুলিশের ইনস্পেক্টার জেনারেল একজন মুসলমান এবং এই প্রকার আরও বহু শ্রেষ্ঠপদে মুসলমান রহিয়াছেন। ভারতের উপর যে মুসলমানদের যথেষ্ট আস্থা আছে, তাহার প্রমাণ পশ্চিম পাকিস্থান হইতে ৩০০,০০০ মুসলমান ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছে ও ১৯৪৭ সাল হইতে বহু মুসলমান আসামে চলিয়া গিয়াছে।

পক্ষান্তরে পাকিস্থানকে ইসলামের ভিত্তিতে একটা রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া তোলা হইতেছে। মুসলিম লীগ নিছক মুসলিম প্রতিষ্ঠান। ঐসলামিক আদর্শের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার জন্য মুসলমানেরা ব্যাপকভাবে দাবি করিতেছে। এইজন্য পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে পাকিস্থানের সমাজদেহে স্থান করিয়া দেওয়ার অসুবিধা যথেষ্ট হইয়াছে। মুসলিম জনগণ জানে যে, হিন্দুরা প্রত্যেকেই তীব্রভাবে এই পাকিস্থান সৃষ্টির বিরোধিতা করিয়াছিল। সেইজন্যই প্রত্যেক ধুতি পরিহিত ব্যক্তিকেই তাহারা পঞ্চমবাহিনী বলিয়া মনে করে।

ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে খুলনা ও রাজসাহীতে গোলযোগ আরম্ভ হয়, পনর হাজার শরণার্থী ভারতে আসে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ গবর্মেণ্ট মাত্র ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত গোলযোগ সম্পর্কে তাঁহাদের বক্তব্য এক ইস্তাহারে প্রকাশ করেন। পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের হিন্দু সদস্যগণ যখন এই গোলযোগ সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাহেন তখন স্পীকার উহা আলোচনা করিতে অনুমতি ত দেন নাই, তাঁহাদিগকে বিশ্বাসঘাতকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। গত সোমবার পাকিস্থান পার্লামেণ্টে মিঃ লিয়াকৎ আলী খান যে বক্তৃতা করিয়াছেন, সেই বক্তৃতার সহিত উক্ত মনোভাবের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। পূর্ব্ববঙ্গ গবর্মেণ্ট 'হাঙ্গামা' চলিবার পর দৃঢ় হন। তখন সৈন্য ও পুলিস তলব করা হয়, সান্ধ্য-আইন জারী করেন এবং শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা ও কঠোরতার সহিত অবস্থার সম্মুখীন হন। পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট হোলি উৎসব পালনও করিতে দেন নাই। মিঃ লিয়াকৎ আলী খান পণ্ডিত নেহরুর সহিত একসঙ্গে সফরের প্রস্তাবে অসম্মত হওয়াতেই পূর্ব্ববঙ্গ গবর্মেণ্ট শৈথিল্য দেখাইয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের আস্থা ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ব্যাপক বাস্তত্যাগ হইবে। বর্ত্তমানে যে সকল লোক পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিতেছে, তাহারা হইতেছে সেই সকল লোক, যাহারা পাকিস্থানে বাস করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিল।

পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের পুলিস অপ্রচুর, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ, সেখানে চার কোটির উপর লোক আছে। অথচ রাজস্ব মাত্র এক কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড। মুসলমান সমাজ অত্যন্ত অনুন্নত, মধ্যবিত্ত ও ধনী লইয়াই হিন্দু সমাজ, সুতরাং গবর্মেণ্টের বাড়ী রিকুইজিশন, কি জমিদারী প্রথা বিলোপ ব্যবস্থাকে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা বলিয়া মনে করা হয়।

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীরা অত্যন্ত সম্প্রীতির সহিত বসবাস করিতেছিল। পঞ্জাবী সরকারী কর্ম্মচারী এবং বিহারী মুসলিম শরণার্থীরা এই বাঙালীদের কাছে বিদেশী। বিহারীদিগকে লইয়া আন্সার বাহিনী গঠন করা হইয়াছে। এই পঞ্জাবী ও বিহারীদের উপস্থিতিতে অবস্থা বিস্ফোরকপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্ব সীমান্ত

পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম—ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্ব সীমান্ত দুইটি প্রদেশ—পাকিস্থানী উগ্রতায় বিপন্ন হইয়া উঠিতেছে। সেই জন্য এই দুই প্রদেশের নাগরিকবৃন্দের উপর একটা বিশেষ দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। "প্রবাসী"র সম্পাদকীয় মন্তব্যে গত আড়াই বৎসরের প্রায় প্রতি সংখ্যায় এই গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে দেশের লোককে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হইতেছে। এই বিষয়ে "সংগঠনী" পত্রিকা গত ১৬ই চৈত্রের সংখ্যায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিলাম :

"...আমরা স্বীকার করি এই বিরাট দেশে সুদীর্ঘ সীমান্ত সতর্কতার সহিত রক্ষা করা একটা সহজ ব্যাপার নহে ; কিন্তু তাই বলিয়া শিথিল হইলেও চলিবে না। অবিলম্বে যত দূর সম্ভব বৈজ্ঞানিক প্রথায় সামরিক ব্যবস্থা দ্বারা দূরত্বকে অতি নিকট, সুদৃঢ় ও সদা সতর্ক করিতে হইবে। এই সীমান্ত রক্ষার শক্তি বৃদ্ধির জন্য আজ একান্ত ভাবে প্রয়োজন—একটা বিশাল, সুশিক্ষিত ও সুসংবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবক প্রান্তীয় বাহিনী সৃষ্টি করা। এই প্রান্তীয় বাহিনী সীমান্ত রক্ষা পুলিস ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যকারী শক্তিরূপে কাজ করিবে। এ পর্য্যন্ত যে কয়েক সহস্র স্বেচ্ছাসেবক প্রান্তীয় বাহিনী প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাদের অধিকতর সক্রিয় ও সংগঠিত করিতে হইবে। ইহাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমরা মন্তব্য করিতে

বাধ্য হইলাম যে, ইহা আশানুরূপ ফল প্রদান করিতে পারিতেছে না। ইহার কারণ সরকারী নিশ্চেষ্টতা এবং ইহাদের প্রতি সরকারের তত্ত্বাবধানের ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অভাব।

আমাদের সহযোগী সরকারের উপর সকল দোষ চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা জানি এই অভিযোগ অংশতঃ মাত্র বিচারসহ। বেশীর ভাগ দোষ পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকবৃন্দের প্রাপ্য। ইংরেজের আমলে দেশের রক্ষা ব্যবস্থার দায় আমাদের—বাঙালীর—উপর পড়ে নাই। আমরা মনে করিতাম বেশ আছি ; এই ভাব একটা অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

আসামের অভিজ্ঞতা আমাদের অপেক্ষা আশাপ্রদ নয়। একটা হিসাবে দেখিলাম যে ন্যাশনাল কেডেট বাহিনীতে আসামের কলেজ ও স্কুলের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্য হইতে মাত্র ১৯০ জন যোগদান করিয়াছেন। সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিবার উপযোগী পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৩০।৭০ হাজার। সেই সংখ্যার অনুপাতে এই কেডেট বাহিনীতে যোগদান যাহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়।

রাষ্ট্ররক্ষার জন্য এই শ্রেণী হইতে আপৎকালে সৈন্যাধ্যক্ষ পাওয়া যাইতে পারে কি ? কিন্তু সৈন্য বাহিনীতে বাঙালী ও অসমিয়া কৈ ? সেই সৈন্যবাহিনী পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের জনমণ্ডলী হইতে আসিতে পারে। আসিতেছে কি ? এই প্রশ্নের সদুত্তরের অপেক্ষায় থাকিব এবং সেই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত সীমান্তের এই অংশের জটিলতা সম্বন্ধে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। এই জটিলতা সহজে বুঝিবার জন্য ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর নিকটে যে স্মারকলিপি প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পূর্ব্ববঙ্গের মুসলিম সমাজের দোটানা মনোভাব

গত মাঘ মাসে কেন্দ্রীয় পাকিস্থান ব্যবস্থাপক সভায় এক বিতর্ক ঘটে। তৎসম্বন্ধে নারায়ণগঞ্জে (ঢাকার) 'সংগ্রাম' পত্রিকা নিম্নলিখিত আলোচনার অবতারণা করেন :

সম্প্রতি পাকিস্থান পার্লামেন্টে যে বিতর্ক হইয়া গিয়াছে তাহাতে পূর্ব্ব বাংলার অধিবাসীদের জানিবার মত, চিন্তা করিবার মত অনেক সমস্যা দেখা দিয়াছে। পাকিস্থানের লোকসংখ্যার প্রায় ৬৫ ভাগ পূর্ব্ব বাংলায় বাস করে। পাকিস্থানের রাজস্বের অধিক সংখ্যক টাকাও এই পূর্ব্ব বাংলা হইতেই উঠান হয়। অথচ পূর্ব্ব বাংলাকে সমৃদ্ধশালী করার দিকে নেতাদের নজর কম কেন ? ইহা প্রাদেশিকতার কথা নহে। সমস্ত দেশটিকে সমৃদ্ধশালী করার জন্যই এই প্রশ্ন এত জোরদার হইয়া দেখা দিয়াছে। এ পর্য্যন্ত একটা সুতার কল বা একটা চটকল পূর্ব্ব বাংলায় স্থাপিত হইতে পারিল না। শিক্ষার দিক দিয়াও পূর্ব্ব বাংলার মাতৃভাষা বাংলাকে বার বার আঘাত করা হইতেছে।

এবারকার পার্লামেন্টের বিতর্কে আরও কতকগুলি সংবাদ পাওয়া গেল।

বিদেশী গবর্ণমেণ্টগুলি পাকিস্থানের পরীক্ষার্থীদের জন্য মোট ২১টি বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছে ; ইউ-এন-ও মঞ্জুর করিয়াছিল ২৩টি বৃত্তি। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছে মোট ৪৯টি বৃত্তি।

সর্ব্বশুদ্ধ এই ৯৩টি বৃত্তির মধ্যে পূর্ব্ব বাংলার ছাত্রদের জন্য রক্ষিত হইয়াছে মাত্র ২১টি।

বিদেশী শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য পাকিস্থানের মোট ৬৫ জন প্রার্থীকে বিদেশে পাঠান হইয়াছে। তাহার মধ্যে পূর্ব্ব বাংলার ভাগে পড়িয়াছে মাত্র ১০ জন।

কোন্ প্রদেশের কত জন প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইবে তাহা স্থির হয় শিক্ষামন্ত্রী বিভাগের দ্বারা, যে বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হইতেছেন জনাব ফজলুর রহমান। তিনি পূর্ব্ব বাংলারই অধিবাসী। পার্লামেন্টের বিভিন্ন সদস্যরা পূর্ব্ব বাংলার প্রতি এই অবিচারের কথা উল্লেখ করিলে জনাব ফজলুর রহমান সাহেব বলেন যে, উপযুক্ততার উপরই এই নির্ব্বাচন নির্ভর করে। কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, পূর্ব্ব বাংলা হইতে অধিকসংখ্যক প্রার্থী পাওয়া গিয়াছিল কিনা তখন জনাব শিক্ষামন্ত্রী জানান যে সে খবর তাঁহার ঠিক জানা নাই।

পূর্ব্ববঙ্গের শাসনযন্ত্র চালাইতেছে পঞ্জাবী, উত্তর প্রদেশীয় বিহারী মুসলীম কর্ম্মচারীগোষ্ঠী। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাঙালী মুসলীম সমাজের একটা আক্রোশ জমাট বাঁধিতেছে। ব্যবস্থাপক সভার আলোচনায় তাহা মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়। অ-বাঙালী কর্ম্মচারীগোষ্ঠী তাহা জানে এবং সেই আক্রোশের স্রোতকে 'কাফের' নিধনে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আত্মরক্ষা করে। পূর্ব্ববঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনা তার একটা প্রমাণ। এবং যত দিন অ-বাঙালী মুসলীম কর্ম্মচারীগোষ্ঠীর প্রাধান্য পূর্ব্ববঙ্গে বজায় থাকিবে ততদিন পূর্ব্ববঙ্গে শান্তির আশা যাঁরা করিবেন, তাঁদের বিফলমনোরথ হইতে হইবে। নেহরু-লিয়াকৎ চেষ্টা গোঁজামিল হইতে বাধ্য।"

কাশ্মীর সমস্যা

গত ৩০শে ফাল্গুন (১৪ই মার্চ্চ) সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘের বর্ত্তমান কেন্দ্র লেকসাকসেস হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রেরিত হয় :

অদ্য স্বস্তি পরিষদে কাশ্মীর লইয়া ভারত ও পাকিস্থানের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একজন মধ্যস্থ নিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ডাঃ লা ফ্রন্টে বলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনার দিন স্থির হইয়াছিল যে, তিনি প্রথমে ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ বি এন. রাওকে তাঁহার গবর্ণমেণ্টের অভিমত পরিষদে উত্থাপন করিতে আহ্বান

করিবেন। চতুঃশক্তি প্রস্তাবের মুখপাত্ররূপে ব্রিটিশ প্রতিনিধি যে মন্তব্য করিয়াছেন বিশেষভাবে তাহা বিবেচনা করিয়াও তিনি মিঃ বি. এন. রাওকে তাঁহার গবর্মেণ্টের অভিমত জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

মিঃ রাও অতঃপর ভারত গবর্মেণ্টের বিবৃতি পাঠ করেন। তিনি বলেন যে, প্রস্তাবের রচয়িতাদের পক্ষ হইতে স্যর টেরেন্স শোন যে সকল ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার গবর্মেণ্ট তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন।

চারি জন প্রস্তাব-রচয়িতার পক্ষ হইতে ব্রিটিশ প্রতিনিধি স্যর টেরেন্স শোন নিরাপত্তা পরিষদের গত অধিবেশনে প্রস্তাবের কয়েকটি অস্পষ্ট বিষয়ের 'ব্যাখ্যা' করেন।

অদ্য ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রী বি. এন. রাও ভারত গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়াছেন—"গত ৮ই মার্চ্চ এক বিবৃতিতে আমি ম্যাকনটন প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত গবর্মেণ্টের মনোভাবের কথা জানাইয়াছি। আমার গবর্মেণ্ট এই মনোভাবে অবিচল আছেন; সুতরাং মনোভাব পরিবর্ত্তনের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

"এই সর্ত্ত সাপেক্ষে আমার গবর্মেণ্ট প্রস্তাবটি গ্রহণ করিতেছেন।

"যুক্ত প্রস্তাবের পঞ্চম অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী দুই পক্ষের সম্মতিক্রমে রাষ্ট্রসঙ্ঘের একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন এবং ভারত তাঁহার কাজে যথাশক্তি সহযোগিতা করিবে বলিয়া আমার গবর্মেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিতেছেন।"

শ্রীযুত রাও বিবৃতির ভূমিকায় বলেন, "আমরা আলোচনার এমন এক পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছি যে, সমস্যার সমাধানের জন্য এখন সর্ব্বাধিক আত্মসংযম ও বাক্‌সংযমের প্রয়োজন। সুতরাং আমার গবর্মেণ্ট আমাকে যে বিবৃতি পাঠ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, আমি তাহা নিরাপত্তা পরিষদে পড়িয়া সকলকে শুনাইতেছি; এই বিবৃতিতে অন্য কথা যোগ করিবার লোভ সংবরণ করিলাম।"

তিনি অন্য কোন মন্তব্য করেন নাই।

গত ৮ই মার্চ্চ শ্রীযুক্ত রাও তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন, "গত ৭ই ফেব্রুয়ারী নিরাপত্তা পরিষদে আমি যে বিবৃতি পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতে কাশ্মীর সমস্যার আইন ও নীতিগত প্রশ্ন এবং জেনারেল ম্যাকনটনের প্রস্তাব সম্পর্কে আমার গবর্মেণ্টের অভিমত সম্পূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। এই অভিমতের পশ্চাতে বাধা দিবার কোন মনোভাব নাই, আমার গবর্মেণ্টের অভিমত ন্যায়সঙ্গত।"

যুক্ত প্রস্তাবের প্রথম অনুচ্ছেদে ম্যাকনটন প্রস্তাবের যে উল্লেখ আছে তাহা এইরূপ, "এই প্রস্তাব গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ মাসের মধ্যে জেনারেল ম্যাকনটনের প্রস্তাবের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত নীতি অথবা ভারত ও পাকিস্থানের সম্মতিক্রমে পরিবর্ত্তিত নীতির ভিত্তিতে সৈন্যাপসারণের কার্য্য-সূচী প্রণয়ন ও তদনুযায়ী কাজ করিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ ভারত ও পাকিস্থান গবর্মেণ্টকে অবিলম্বে ব্যবস্থা করিতে আহ্বান জানাইতেছেন; নিজেদের অধিকার ও দাবির ক্ষতি না করিয়া, আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

ভারত নিরাপত্তা পরিষদকে জানাইয়াছে যে, ভারত কাশ্মীর সম্পর্কে চতুঃশক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। তবে ম্যাকনটনের প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত উহার অভিমতে অবিচল থাকিবে।

এই প্রস্তাবের রচয়িতা হইতেছে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে ও কিউবা।

স্যর জাফরুল্লা খাঁ বলেন, পাকিস্থান এই যুক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে এবং এই প্রস্তাবানুযায়ী কর্ত্তব্যপালনে তাঁহারা সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সহিত যথাশক্তি সহযোগিতা করিবেন।

তিনি বলেন, নিরাপত্তা পরিষদকে একথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া বাহুল্য বলিয়া মনে করি যে, এই প্রস্তাবটি ম্যাকনটনের প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছে—আলোচ্য প্রস্তাব সম্পর্কে মোটের উপর পাকিস্থানের ইহাই মনোভাব; পাকিস্থান ম্যাকনটনের প্রস্তাবও গ্রহণ করিয়াছে।

নিরাপত্তা পরিষদের গত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাও এই প্রস্তাবের একটা অংশ সম্পর্কে বিবৃতি দিয়াছিলেন। সেই সময় ইহার তাৎপর্য্য বুঝা যায় নাই। এই বিবৃতিতে শ্রীযুক্ত রাও বলিয়াছিলেন যে, নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত চুক্তি "দুই পক্ষের সম্মতির উপর ভিত্তি করিয়াই গৃহীত হইবে।"

স্যর মহম্মদ বলেন, কাশ্মীর কমিশনের ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্ট ও ১৯৪৯ সালের ৫ই জানুয়ারী কাশ্মীর কমিশন যে প্রস্তাব করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রস্তাবে সেই সকল প্রস্তাবের কথাই বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকায় মিঃ রাও যে ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন, সমগ্র প্রস্তাবের ভাষা ও অর্থের দিক দিয়া তাহা একেবারে গ্রহণের অযোগ্য। পাকিস্থান আবার বলিতেছে যে, ম্যাকনটনের প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমান যুক্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে এবং এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চল রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষই শাসন করিবেন।

পাকিস্থান পুনরায় জানাইতেছে যে, বর্ত্তমান যুক্ত প্রস্তাবের ভিত্তি এই ম্যাকনটন প্রস্তাবেই "সুস্পষ্টভাবে" বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা উত্তরাঞ্চল শাসিত হইবে।

স্যর মহম্মদ পরিষদকে আরও স্মরণ করাইয়া দেন যে, কাশ্মীর ভারত কিংবা পাকিস্থানে যোগদান করিবে কিনা তাহা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণভোটের দ্বারাই স্থির হইবে—ভারত ও পাকিস্থান উভয়েই এই নীতিতে সম্মত হইয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রসঙ্ঘকে এই নীতির প্রতি অবিচল ও স্থির থাকিতে হইবে।

প্রেসিডেন্ট সাধারণ বিতর্কের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অত:পর চতু:শক্তি প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হইলে প্রস্তাবের পক্ষে আটটি ভোট হয়, বিপক্ষে কেহই ভোট দেন নাই; যুগোশ্লাভিয়া ও ভারত ভোটদানে বিরত থাকে।

ভোটের অব্যবহিত পরেই যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিনিধি মি: জুয়ো নিনসিক তাঁহার ভোটদানে বিরত থাকার কারণ সম্বন্ধে বলেন, কাশ্মীর সমস্যাটি সম্পূর্ণভাবে দুই পক্ষের মতামতের দিক হইতে বিচার করিলে চলিবে না—সেখানকার অধিবাসীদের স্বার্থের দিক দিয়া উহার বিচার করিতে হইবে। উপমহাদেশের দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

নিরাপত্তা পরিষদের ব্যবস্থায় ভারত ও পাকিস্থানের অধিবাসীদের মনে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, তাহা ভাল করিয়া অনুধাবন করা উচিত। এই প্রস্তাবের পরিণতি সম্পর্কে আমি সন্দেহ পোষণ করি।

ডা: লা ক্রন্টে অত:পর ঘোষণা করেন, কাশ্মীর সংক্রান্ত বিরোধে একজন মধ্যস্থ নিয়োগের জন্য আগামী সপ্তাহের কোন সময়ে পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হইবে।

একদিকে কাশ্মীরের সেনাবাহিনীর সহযোগে ভারতের নিয়মিত বাহিনী এবং অন্যদিকে পাকিস্থানের নিয়মিত বাহিনী ও "আজাদ" বাহিনী অধিকৃত অঞ্চলে সৈন্যাপসারণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা হইবে মধ্যস্থের কার্য্য।

বিহারে বাঙালীর অবস্থা

মানভূম সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নায়ক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ সম্প্রতি একটি বিবৃতির মাধ্যমে দেশবাসীকে জানাইয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের বিপর্য্যয়ের জন্য তাঁহারা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলী এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারিতেছেন না। এদিকে মানভূমে বাঙালীর অবস্থা খুব সুখদায়ক নয়। তার পরিচয় পাই মানভূম জেলা বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতার মধ্যে। বিহারে বাঙালীর অবস্থা বুঝিবার জন্য তাহা জানিয়া রাখা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি:

জেলার কিশোর ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানরূপে গত ১৯৩৭ ইং, বাংলা ১৩৪৩ সালে মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথি গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসরই সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু সহসা স্বাধীনতা লাভের প্রতিক্রিয়ায় দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া অপ্রত্যাশিতরূপে দূষিত হইয়া পড়ে এবং ইহার বিষাক্ত প্রভাব জীবনের প্রতিক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। নবলব্ধ শাসনক্ষমতাকে কায়েমী স্বত্বে পরিণত করিবার অত্যুগ্র আগ্রহে শাসকগোষ্ঠী জেলার মাতৃভাষা বাংলাকে উচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তাহার ফলে ১৯৪৮ সালে মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথির একাদশ বার্ষিক অধিবেশনের জন্য অনুমতি চাহিলে, মাসাবধিকাল বিষয়টি চাপা রাখিয়া কর্তৃপক্ষ শেষ মুহূর্ত্তে শান্তিভঙ্গের অজুহাতে কয়েকটি হীন সর্ত্ত সাপক্ষে অনুমতি প্রদান করেন।

পর বৎসর, অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে, আমাদের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের সময় হোলি উপলক্ষ্যে শহরের বুকে যে দাঙ্গা ও অশান্তি ঘটে তাহাতে এরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় যে গত বৎসরও আমাদের সম্মেলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়।

পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও সম্মেলন অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রার্থনা করিলে কর্তৃপক্ষ অনুমতি দানে অযথা বিলম্ব করেন এবং এই বৎসরে অনুমতির সহিত কোনরূপ সর্ত্ত প্রয়োগ না করিয়া সম্মেলন পণ্ড করিবার অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করেন। সরকারী কর্ম্মচারী প্রেরণ করিয়া উদ্যোক্তাদের সম্মেলন বন্ধ করিবার হুমকি দেওয়া হয়, অন্যথায় বিহার জন-নিরাপত্তা আইনের নাগপাশে সায়েস্তা করিবার শাসানীও দেওয়া হয়।

ভারত যখন স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইয়াছে, তখন একটি রাষ্ট্রভাষার দরকার—আর হিন্দী দিয়া যদি সে অভাব পূরণ করা সম্ভবপর হয়, তবে তাহাই হউক। কিন্তু হিন্দী প্রসারের নামে 'পাকিস্থানী' নীতির দ্বারা মাতৃভাষার উচ্ছেদ করিয়া হিন্দীর ধ্বজা ধরিতে হইবে এই উন্মাদ প্রচেষ্টার আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি।

হিন্দী প্রচারের নামে এই জেলায় যে সকল চেষ্টা এবং অপচেষ্টা চলিতেছে তাহার মূলে যদি হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার গৌরবে অধিষ্ঠিত রাখার আন্তরিকতা থাকিত তাহা হইলে বিষয়টি তত আপত্তিজনক হইত না। কিন্তু যে জঘন্য মনোবৃত্তি ইহার পিছনে কাজ করিতেছে তাহা রাষ্ট্রভাষার প্রসার নহে—আগামী ১৯৫১ সালের আদমসুমারীতে এই জেলাকে যাহাতে হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চলরূপে প্রতিপন্ন করা যায়, তাহারই প্রয়াস এবং সেইজন্য এত লক্ষ লক্ষ টাকার অপব্যয়।

কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধন

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধন বিল বিনা বাধায় গৃহীত হইয়াছে। প্রাপ্তবয়স্কের

ভোটাধিকার মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনে স্বীকার করা হয় নাই, তবে ভোটাধিকার ব্যাপকতর ও ভোটের যোগ্যতা হ্রাস করা হইয়াছে। ইহাতে লাভ হইয়াছে এই যে, শহরের স্থায়ী অধিবাসীদের অনেকে ভোটাধিকার লাভ করিয়াছে এবং অস্থায়ী ভ্রাম্যমাণ ফুটপাথশায়ী জনতার ভোটে কর্পোরেশন পরিচালনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা দূর হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করিলে তাহা শহরের পক্ষে ক্ষতিকর হইত। নূতন সংশোধনে নিম্নলিখিত শ্রেণীর লোকেরা ভোটাধিকার পাইবে—

(১) যাহারা যে কোন প্রকার কর বা লাইসেন্স ফী দেয়, (২) যাহারা কুঁড়ে ঘরের জন্য চার টাকা এবং অন্যবিধ ঘরের জন্য আট টাকা মাসিক ভাড়া পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অন্ততঃ ছয় মাস ধরিয়া দিয়াছে এবং (৩) বস্তির অথবা কুঁড়ে ঘরের যে সব মালিক পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে যে কোন কর দিয়াছে। এই সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতাও প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। যে সমস্ত ম্যাট্রিক পাস লোক পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অধিকাংশ সময় কলিকাতায় ছিলেন তাঁহারাও ভোটাধিকার পাইবেন। আগে সহরে প্রায় এক লক্ষ ভোটার ছিল, এখন উহা হইবে প্রায় ছয় লক্ষ।

বিলে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে :

(১) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তপশীলী সম্প্রদায় এবং বিশেষ কেন্দ্রগুলির জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে না।

(২) কাউন্সিলর মনোনয়ন প্রথা বাতিল হইয়া যাইবে।

(৩) নির্ব্বাচন প্রার্থীদের বয়স ২৯-এর পরিবর্ত্তে ৩০ বৎসর হইতে হইবে।

নূতন ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার কাজ আগামী অক্টোবর মাসের শেষের দিকে অথবা নভেম্বর মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে এবং ডিসেম্বর মাসে নির্ব্বাচন হইবে বলিয়া ডাঃ রায় আশ্বাস দিয়াছেন।

নূতন যুগে দানের নূতন রূপ

এই উপাধি অবলম্বন করিয়া সত্যাগ্রহ পত্রিকার গত ১লা ফাল্গুন সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখক স্থানীয় কয়েকজন দাতার নাম করিয়া বলিতেছেন যে, বর্ত্তমান খাদ্যাভাবের যুগে অনুরূপ দান নূতন খাতে প্রবাহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা তাহার সারাংশ তুলিয়া দিলাম :

হাওড়া জেলার কামারগোল খালটি সংস্কারের জন্য সরকার ১০ লক্ষের উপর টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ৩ মাইলের উপর সংস্কার হইয়াছে। ইহাতে স্থানীয় বহু জমির উপকার হইয়াছে। জমির দামও বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সংপ্রতি ৩০ টাকা হাজারের কমে কোন্ কন্‌ট্রাক্টর পাওয়া যাইতেছে না। সরকার কোনরূপে ২৫ টাকা হিসাবে দিতে সমর্থ। বেশী বাড়ানো সম্ভব নয় এইজন্য যে, তাহা হইলে অন্যত্র কাজ বন্ধ করিতে বা কমাইতে হইবে। অথচ স্থানীয় লোকেরা বলিতেছেন যে, এই খালটি সম্পূর্ণ খোঁড়া হইলে লক্ষ বিঘা জমির উপকার হইবে : তাহা যদি হয় তবে ঐ খাল খনন করিবার জন্য নিম্নলিখিত পন্থাগুলির যে কোন একটি বা সবগুলি লইতে পারা যায়—

স্থানীয় উদ্যমী ব্যক্তিরা এমন কণ্ট্রাক্টর বাহির করিতে পারেন যিনি নিজে লাভ না রাখিয়া—এমন কি ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কাজটি সম্পন্ন করিবেন। এই লাভ না রাখা ও ক্ষতি স্বীকার করা তাঁহার দানেই হইবে। তাঁহার এই দান শ্রমিকদেরও মনের ভিতরে দানের প্রবৃত্তি জাগ্রত করিতে পারে। তাহারাও কম রেটে কাজ করিতে পারে। স্থানীয় শ্রমিক হইলে তাহা তো তাহাদের কর্ত্তব্যই হইবে। কারণ ইহাতে তাহারা সকলেই পরোক্ষভাবে এবং অনেকেই প্রত্যক্ষ ভাবে উপকৃত হইবে, যেহেতু তাহাদের নিজেদের জমিরও উৎপাদন বেশী হইবে। ভাগচাষী হইলেও ভাগের মাত্রা বাড়িবে। স্থানীয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা ইহাতে দান করিতে পারেন। তাহা হইলে কার্য্যটির উদ্ধার হইবে।

আয়কর ফাঁকির স্বরূপ

ভারতীয় পার্লামেণ্টে অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই ১৯৪৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আয়কর তদন্ত কমিশনের কার্য্যকলাপের যে বৎসরান্তিক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে 'আয়কর ফাঁকি দিবার কয়েকটি অভিনব ফন্দির' দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে কমিশনের তদন্তাধীন ১৩৬৫টি মামলার মধ্যে ১০১টি মামলার রিপোর্ট সরকারের নিকট দাখিল করা হইয়াছে। এই কয়টি মামলায় মোট দুই কোটি অষ্টাশী লক্ষ ছয় হাজার পাঁচ শত সাত টাকা পরিমাণ আয় গোপন করার চেষ্টা করা হইয়াছিল।

তদন্তরত কমিশনের অসুবিধা সম্পর্কে রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, মাত্র একটি মামলা ব্যতীত অপর সকল ক্ষেত্রেই 'কালোবাজারে মুনাফার' কোন হিসাব দাখিল করা হয় নাই এবং আয়কর ফাঁকি দিবার সমগ্র ইতিহাস হিসাব বহির্ভূত লগ্নী (অর্থাৎ যে সকল লগ্নীকৃত টাকা সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ত পাওয়া যায় নাই) হইতে উদ্ধার করিতে হইয়াছে। এই কার্য্যে তদন্তাধীন প্রত্যেক মামলার জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রত্যেক অফিসারকে ১৯৪০ সাল হইতে ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় সাত-আট বৎসরের হিসাবের খাতাপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিতে হয় এবং উক্ত সাত-আট বৎসর কালের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করিতে হয়। এই কারণে প্রত্যেক অফিসারকে যে কয়টি মামলা সম্পর্কে তদন্তের ভার দেওয়া হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহার সাত-আট গুণ পরিমাণ বেশী কাজ তাঁহাকে করিতে হইয়াছে।

কমিশনের রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, কমিশন

এখন পর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির তদন্ত সুরু না করিলেও, প্রকাশিত বিবরণে আয়কর ফাঁকি দিবার ফন্দি এবং ফাঁকি দেওয়া টাকার অঙ্ক (আয়) সম্পর্কে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে।

তদন্তের ফলে এ পর্য্যন্ত কত টাকা আদায় করা হইয়াছে, রিপোর্টে তাহার উল্লেখ করা হয় নাই।

প্রকৃত আয় গোপন করিবার এবং আয়কর ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে যে সকল ফন্দি ফিকিরের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, এইগুলি প্রায় একই ধরণের। যৌথ কোম্পানীগুলির, বিশেষত: বস্ত্রশিল্পের ম্যানেজিং এজেন্টগণ বিবিধ উপায়ে ব্যক্তিগত মুনাফা করিয়াছে। এইরূপ মুনাফার চেষ্টা কোম্পানীর আয় এবং অংশীদারদের উভয়ের স্বার্থের প্রতিকূল। হিসাবের খাতায় ভুয়া হিসাব লেখা একটি সাধারণ ফিকির। মাল আদৌ ক্রয় হয় নাই এরূপ কাঁচা মালের কিংবা আসলে ম্যানেজিং এজেন্টদের 'বেনামীদার' প্রতিষ্ঠানসমূহের মারফত ক্রীত কাঁচা মালের দাম খাতায় লিখিয়া উৎপাদন ব্যয় অত্যধিক 'স্ফীত' করা হইয়াছে।

গত মাসে আমরা প্রায় এক কোটি টাকা সেল-ট্যাক্স ফাঁকির একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই এক মাসের মধ্যেও ইহার কোন প্রতিকারের চেষ্টা, অর্থাৎ কর আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানিতে পারি নাই। অথচ পশ্চিমবঙ্গের এই দারুণ দুর্দ্দিনে এই টাকাটার প্রয়োজন অসামান্য। ট্যাক্সের টাকার হিসাব ঠিক করা এবং আদায় করার উপযুক্ত অফিসারেরা সরকারী-বিভাগসমূহেই রহিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদিগকে উহা করিতে দেওয়া হইতেছে না—ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক।

ভারতরাষ্ট্রে বিদেশীর মূলধন

গত ১৬ই চৈত্রের সংবাদপত্রাদিতে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল :

আজ ১৫ই চৈত্র ভারতীয় সংসদে একটি প্রশ্নের উত্তরে অর্থসচিব ডা: মাথাই বলেন যে, ভারতে ১৯৪৮-৪৯ সালে ৫ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৯-৫০ সালে (১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) ১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ করা হইয়াছে।

১৯৪৮-৪৯ সালে ব্রিটেন ৫,০৫,৭৪,৩২১৲ টাকা, কানাডা ১৬,৬০,০০০৲ টাকা, সিংহল ১,২৫,০০০৲ টাকা, ব্রিটিশ পূর্ব্ব-আফ্রিকা ২৫,০০০৲ টাকা, ডেনমার্ক ১৬,৫৮০৲ টাকা এবং ১৯৪৯-৫০ সালে (১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) ব্রিটেন ১৫,৭৪০,১৭৬৲ টাকা, হংকং ১২০,৬২৫৲ টাকা, মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্র ১৬,৫০০৲ টাকা ভারতে মূলধন বাবদ নিয়োগ করিয়াছে। ঔষধ, লৌহেতর ধাতু, রং ও বার্ণিশ, কাগজ, কার্ডবোর্ড ও রেডিও নির্ম্মাণ শিল্পে বিনিয়োগ হইয়াছে।

এই হিসাবের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে এই কথাটা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, বিলাতী ও মার্কিণী পুঁজিপতিগণ চাহেন আমাদের অর্থনৈতিক আয়োজন-উদ্যোগের দৈন্যের অবসরে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সস্তা শ্রমশক্তি শোষণ করিয়া লাভবান হইতে; আমরা চাই এই দুই সম্পদের সংগঠন করিয়া দরিদ্র জনগণের অবস্থার উন্নতি করিতে। এই দুই উদ্দেশ্যের বিরোধ প্রায় মীমাংসার অতীত।

ডাঃ সুধীর চট্টোপাধ্যায়

বগুড়ার পরহিতব্রতী চিকিৎসক ডা: সুধীর চট্টোপাধ্যায় গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী সান্তাহারে আসাম মেল আক্রান্ত হইলে তিনটি মাড়োয়ারী স্ত্রীলোককে দুর্ব্বৃত্তদের কবল হইতে রক্ষা করিতে গিয়া নিহত হইয়াছেন। তাঁহার দুই জন সহযাত্রীর নিকট হইতে এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং উহা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ দিন আসাম মেল আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া পূর্ব্বেই জানিতে পারায় নানা অজুহাতে তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টাও করা হইয়াছিল। একজন কাষ্টমস অফিসার তাঁহার মালপত্র তল্লাসীর ছুতা করিয়া ঐসমস্ত আটক করে, কিন্তু ডা: চট্টোপাধ্যায় প্রাণের ভয়ে ঐ যাত্রা স্থগিত রাখিতে অস্বীকার করিয়া মালপত্র ফেলিয়াই ট্রেনে ওঠেন। দীর্ঘ ৫০ বৎসর যাবৎ তিনি দরিদ্র মুসলমানদের নি:স্বার্থ ও অক্লান্তভাবে সেবা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ প্রচরিত হইবামাত্র স্থানীয় মুসলমান জনসাধারণ দলে দলে লীগ আপিসে তাঁহার সংবাদ লইতে আসে ; তিনি নিরাপদে কলিকাতা পৌছিয়াছেন এই কথা বলিয়া উহাদের ফিরাইয়া দেওয়া হয়। পরে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ সঠিকভাবে জানিবার পর বগুড়ার স্কুল প্রভৃতি সমস্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া যায় এবং শোকসভার অনুষ্ঠান হয়।

আর্ত্ত ও বিপন্না নারীকে রক্ষা করিতে গিয়া ডা: সুধীর চট্টো-পাধ্যায় বীরের মৃত্যু বরণ করিয়া ভারতীয় ঐতিহ্যের সম্মান রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এই মৃত্যু পরম গৌরবের, শোকের নহে।

মি: ক্যামেরণ নামক একজন খ্যাতনামা ইংরেজ বণিক তাঁহার মুসলমান ভৃত্যকে রক্ষা করিতে গিয়া এমনিভাবে বীরের মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মন্ত্রী হইতে সুরু করিয়া অনেকেই অনেক কিছু বলিয়াছেন, কিন্তু ডা: চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে কেহ কোন কথা বলেন নাই।

সুন্দরীমোহন দাস

এই ভিষকশ্রেষ্ঠ ৯৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘজীবনের সমাজসেবা স্মরণ করিয়া তাঁহার স্মৃতির

"সিপাহী বিদ্রোহে"র বৎসরে শ্রীহট্টের এক সম্পন্ন পরিবারে সুন্দরীমোহন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এক সময় কলিকাতা আলীপুরের জজ সাহেবের খাস মুন্সী ছিলেন।

প্রায় ১৫ বৎসর বয়সে শ্রীহট্টে পাঠ সমাপ্ত করিয়া সুন্দরীমোহন ফার্ষ্ট আর্টস পাঠের জন্য কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন এবং দুই বৎসর পর মেডিক্যাল কলেজে যোগদান করেন।

পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা আমাদের রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শক্তি দান করে নাই। সেইজন্য সেই সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শিক্ষিত মন বিরূপ ছিল। রামমোহন রায়ের জীবনে, প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে, সেই ভাবের স্ফুর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন তাহার উত্তরসাধক, মধুসূদন দত্ত সেই বিদ্রোহের কবি, বঙ্কিমচন্দ্র এই ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করেন।

ডাক্তারী পাস করিয়া তিনি শ্রীহট্টের মহকুমা হবিগঞ্জে ব্যবসায় আরম্ভ করেন; কয়েক বৎসর কলিকাতা মিউনিসিপালিটির অধীনে স্বাস্থ্যবিভাগে চাকুরী, তারপর চিকিৎসা বিদ্যা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। রাধাগোবিন্দ কর, নীলরতন সরকার ও সুন্দরীমোহন দাস এই তিন জনের চেষ্টায় একটি স্কুল স্থাপিত হয় যাহা আজ বিরাট রূপ ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে কলিকাতার উত্তর-পূর্ব্ব উপকণ্ঠে আর. জি. কর কলেজরূপে। কলিকাতায় এমন কোন বেসরকারী চিকিৎসা বিদ্যালয় নাই যাহার সংগঠনে সুন্দরীমোহন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই।

তাঁহার জীবনের শেষ কীর্ত্তি পার্কসার্কাস অঞ্চলে গোরাচাঁদ রোডে অবস্থিত জাতীয় চিকিৎসা-বিদ্যায়তন; প্রায় ৩০ বৎসর ইহার অধ্যক্ষরূপে তনু-মন সমর্পণ করিয়া তিনি বাৎসল্যাধিক স্নেহে ইহা গড়িয়াছেন এবং বিদ্যালয়ের পরিচালকবর্গও পিতৃঋণ শোধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সুন্দরীমোহনের জীবনের শেষ তিন মাস এই বিদ্যালয়ের শুশ্রূষাগারে কাটিয়াছে; মানুষের সাধ্য যাহা তাহা করা হইয়াছে তাঁহাকে নিরাময় করিবার জন্য। কিন্তু তাঁহার আরাধ্য দেবতা ডাকিয়া লইয়াছেন এই কর্ম্মকান্ত, অদম্য সেবককে।

ইহাই সুন্দরীমোহনের সম্যক্ পরিচয় নয়। কর্ম্মের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সংযোগ ও সমন্বয় দেখিয়াছি তাঁহার জীবনে। দিবারম্ভে যাহাদের সৌভাগ্য হইয়াছে আকস্মিকভাবে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে, তাঁহারা একজন আত্মবিস্মৃত সাধকের সাক্ষাৎলাভ করিতেন; দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁহার আত্মনিয়োগও এই রহস্য গাঢ় করিয়া তুলে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলার যুবশক্তি যে রক্তাক্ত পথে পদার্পণ করে তাহার সহপথিক ছিলেন সুন্দরীমোহন। তারপর যখন সন্ত্রাসবাদের বিফলতার মধ্যে গান্ধী যুগের আরম্ভ হয় এবং মোহনের বয়স ষাট বৎসরের ঊর্দ্ধে। সেই বয়সে যুবকের উৎসাহ লইয়া তিনি খাটিয়াছেন। তাহার অন্ত হইল গত ২১শে চৈত্র তারিখে।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালী সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের প্রবর্ত্তক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের মন্ত্রশিষ্য এই বিপ্লবী নেতার তিরোধানে আমরা আত্মীয়জন-বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। গত ২৩শে চৈত্র তারিখে ৭১ বৎসর বয়সে উপেন্দ্রনাথ দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্রের শোকে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষ দশকে ভারতের রাজনীতিক চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারা আবেদন-নিবেদনের ব্যর্থ পথ ত্যাগ করিয়া আত্মশক্তি ও আত্ম-সংগঠনের পথে পদার্পণ করিতে প্রস্তুত হইল। সেই পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখিতে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্যে, কমলাকান্তের বুক-ফাটা ক্রন্দনে, বঙ্গবাসী পত্রিকায় কঙ্গ-রসের প্রতি বিদ্রূপে, রবীন্দ্রনাথের গানে ও প্রবন্ধে। বিবেকানন্দের বিজয়ের কাহিনী সেই জাগরণে বল সঞ্চয় করে; ভারতীয় লোক-সংস্থিতির ক্ষুরধার পথে চলিবার প্রবৃত্তি দান করে।

বাঙালী ছেলে অরবিন্দ আয়ারলণ্ডের পার্নেল আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হইয়া আবেদন-নিবেদনের বিরুদ্ধে ১৮৯৪ সাল হইতে লেখনী ধারণ করেন। উপেন্দ্রনাথ এই পরিবেশের মধ্যে শৈশব ও যৌবন কাটাইয়াছিলেন। ফরাসী চন্দননগরে তাঁহার জন্ম; শৈশব হইতে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী তাঁহার কানে গিয়াছে। সুতরাং অরবিন্দ ঘোষের ডাক যখন তাঁহার নিকট পৌঁছাইল, যুবক উপেন্দ্রনাথ তখন পাগলপারা হইয়া তাহাতে উত্তর দিলেন। সদ্যবিবাহিত যুবক, পরিবার প্রতিপালকের পক্ষে এই বিপৎসঙ্কুল পথ বাছিয়া লওয়া কোন সময়েই সহজ নয়। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ কোটির মধ্যে একজন যাঁহারা অসাধ্যের ডাকে ঘর-বাড়ী ছাড়িতে দ্বিধা অনুভব করেন না।

মানিকতলা বোমার মামলায় তাঁহার শাস্তি হয়। দ্বীপান্তরের পর ১৯১৯-২০ সালে দেশের রাজনীতিক জীবনে তাঁহার যোগ দান স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু প্রকাশ্যত: গান্ধী আন্দোলনের সমর্থক হইলেও তাঁহার লেখায় দেখা গেল অহিংস নীতির বিরুদ্ধে জাতক্রোধ। 'অনন্তানন্দ' ছদ্মনামে "বঙ্গবাণী" মাসিক পত্রিকায় তাঁহার লেখাই তার প্রমাণ। সেই সময় হইতে উপেন্দ্রনাথ সমালোচকই রহিয়া গেলেন। সেই সময় হইতেই তাঁহার সাংবাদিক ও সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হইল। তাঁহার লেখনীমুখে যে রস পরিবেশিত হইত তাহা পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তিকে শাণিত করিত।

উপেন্দ্রনাথ যাহা জাতিকে দিয়া গিয়াছেন তাহা "মৃত্যুহীন প্রাণে"র আদর্শ; তাহার স্মৃতি তাঁহাকে আমাদের ইতি-

কন্যাদের বিবাহ হবে না?

(১)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

৯ই মাঘ (বঙ্গাব্দ ১৩৫৬) সরস্বতী পূজা হয়ে গেল। পরদিন সকাল বেলা একটি কন্যা আমাকে প্রণাম করতে এসেছিল। সে কলিকাতায় থাকে, এক দাদার সঙ্গে এসেছিল, ফিরে যাবে। কলিকাতায় কোথায় বাসা, নরহত্যার সময় কি দেখেছিল, এই রকম দু-এক কথার পর সে বললে,—

"জ্যেঠামশায়, এবার যাই?" কণ্ঠস্বরে অবসাদ।

তখন ঘড়ীতে সাড়ে ন'টা; ট্রেন সাড়ে দশটায়।

"তোমাকে দেখলে আমার ভারি দুঃখ হয়।"

"জ্যেঠামশায়, আমি ভাল আছি।"

"আর ভাল আছ!"

"না জ্যেঠামশায়, আমি ভাল আছি। এবার যাই?"

কণ্ঠস্বর মৃদু ও দীর্ঘ। সে চলে' গেল।

কন্যাটি আমার এক প্রতিবেশী বধূর ছোট বোন। বধূটি পুত্র-কন্যাবতী, বোন অনূঢ়া। পূর্বদিন তিনটার সময় তার দিদির সঙ্গে আমার কাছে এসেছিল। অনেক ক্ষণ বধূটির সহিত কথা হ'তে লাগল, বর্তমান কন্যাদের কথা। তার বোনটি অনেক বৎসর হ'তে বেরিবেরিতে ভুগছে। কখনও একটু ভাল থাকে, কখনও থাকে না। সে বালিকা-বয়সে স্থূলাঙ্গী ছিল। এখন অতিশয় কৃশ, হৃদ্‌যন্ত্র দুর্বল। আমরা একটু থামলে সে বললে,—

"জ্যেঠামশায়, 'প্রবাসী'তে আপনার যত প্রবন্ধ বেরয়, আমি সব পড়ি। পূজার পর হ'তে আপনি কিছু লেখেন নাই।"

"পূজার সময় আমি ত কিছু লিখি নাই।"

"না, 'প্রবাসী'তে নয়, 'আনন্দবাজার' শারদীয়া সংখ্যায় পড়েছিলাম।"

"বুঝতে পেরেছিলে?"

"অর্ধেক পেরেছিলাম, অর্ধেক পারি নাই। জ্যেঠামশায় আপনি সোজা করে' লেখেন না কেন, আমরা যে বুঝতে পারি না।"

"আচ্ছা, লিখব। কি বিষয়ে, বল।"

"আমাদের কথা।"

"ঐটি ছাড়া আর কিছু বল। আমি কূল দেখতে পাচ্ছি না।"

চকিতে তার পাণ্ডুর মুখের উপর দিয়ে একখণ্ড পাতলা মেঘ ভেসে গেল।

পাঁচ বৎসর পূর্বে সে একবার এসেছিল। সেবার শরীর সারাবার জন্য অনেক দিন ছিল। আমার কাছে মাঝে মাঝে আসত; আর, বরিশালের বিবরণ শোনাত। তাদের নিবাস বরিশালে। পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব হ'তে বেরিবেরিতে ভুগছিল। তার কথায়, গলার স্বরে, হাসিতে, বুঝতে পারি নাই। একদিন শুনলাম, তার এক মামাত দাদা পচাত্তর টাকা দামের এক ঢাকাই শাড়ী কিনে দিয়েছে। তার দাদারা তাকে খুব ভালবাসে। মেয়েটি সুশীল শান্ত ধীর, কখনও কিছু চায় না। কিন্তু তার দাদাদের স্নেহ তার উপর গাঢ় হয়েছিল। তাকে কিছু চাইতে হ'ত না। আমি শাড়ীর কথা শুনে বললাম, "পঁচাত্তর টাকা দামের শাড়ী পরলে তোমার গর্ব বাড়তে পারে, কিন্তু রূপ বাড়বে না।" পরদিন দেখি, সেই ঢাকাই শাড়ী পরে' এসেছে। কিছু বলে না।

"দেখ, আমি যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে। তুমি চম্পকা, ঢাকাই শাড়ীতে তোমার বরণ ম্লান দেখাচ্ছে। তোমায় সাজবে নীলাম্বরী, ঢাকাই-টাকাই নয়। রাধিকা কেন নীল শাড়ী পরতেন, জান? আমাদের কবিরা মেঘ-ডম্বর শাড়ীর প্রশংসা করে' গেছেন। ডম্বর সংস্কৃত শব্দ, অর্থ সদৃশ। মেঘ-ডম্বর, অর্থাৎ মেঘের তুল্য নীল। যে নারী মেঘ-ডম্বর শাড়ী খুঁজত, সে নিশ্চয় গৌরবর্ণা ছিল। কৃষ্ণা হ'লে পীতাম্বরী খুঁজত। কৃষ্ণ পীতাম্বর ছিলেন।"

তার সঙ্গে এই ভাবে কথাবার্তা চ'লত। তদবধি পাঁচটি বছর গড়িয়ে গেছে। সংসারের জ্ঞান বেড়েছে, সে গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তার দাদারা অনেকবার তার বিয়ের প্রস্তাব করেছিল, সে সম্মত হয় নাই। সে দাদার সংসারে লক্ষ্মী-স্বরূপা হয়ে আছে। নিত্যকর্মই তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। ঔদাস্য আসবে না, এমন নয়। কিন্তু সে জানে, দুঃখের পর সুখ আসবেই। এই জন্যই শেষ নয়।

* * *

গত ৩রা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) পশ্চিমবঙ্গ পালক শ্রীযুত কাটজু মহাশয় বাঁকুড়ায় এসেছিলেন। এখানকার বড় কলেজ দেখতে গেছলেন। এই কলেজে সহশিক্ষা প্রচলিত আছে। চতুর্থবর্ষের তিনটি ছাত্রী স্বাক্ষরের নিমিত্ত তাঁর সমীপস্থ হয়েছিল। শুনলাম, তিনি তাদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমরা পাস হয়ে কে কি করবে? শিক্ষিকা হবে, না রোগার্ত-সেবিকা হবে, না অন্য চাকরি

করবে?" কেউ স্পষ্ট উত্তর করতে পারে নাই। কেমন করে'ই বা পারবে? তারা হিন্দু মেয়ে। পিতামাতা যা বলবেন, তাই করবে। প্রথমতঃ তাদের বিবাহ হবে। তারপর তারা কি করবে, এখন কে বলতে পারে?

আমি তিনটি কন্যাকেই চিনি। তাদের কেহই চাকরির অভিপ্রায়ে বি-এ পড়ছিল না। আর, চাকরি দাসবৃত্তি, অতিতুচ্ছ কর্ম, যে-সে করতে পারে। কিন্তু বিশ্বকর্মা এক অতিশয় গুরুকর্মের নিমিত্ত নারী সৃষ্টি করেছেন। নারীই মনুষ্য-জাতি-প্রবাহ অব্যাহত রেখেছে। নারীই গৃহ, নারীই গৃহলক্ষ্মী, গৃহের শ্রী, সংসারস্থিতিকারিণী। এই কারণেই মনু নারীকে পূজ্যা করেছেন। অসুরদলনের নিমিত্ত বিষ্ণু মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হলেন। দেবগণ লক্ষ্মীকে বললেন,—

"আল রাধা, পৃথিবীত কর অবতার।
থির হউ জগত সংসার॥"

রাধাই হ্লাদিনী শক্তি। এর অভাবে গৃহ ও অরণ্য সমান হয়ে যায়, নরজাতি উদাস ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়ায়।

বিশ্বকর্মা নারীকে জননী হবার নিমিত্ত কি অদ্ভুত মায়া সৃষ্টি করেছেন! প্রথম যৌবনে নারী বুঝতে পারে না, কেন সে বিবাহ করতে চায়। কিছু পরে, ২৫।২৬ বৎসর বয়স হ'লে বিবাহের নিমিত্ত ব্যগ্র হয়ে উঠে, সন্তান-কামনা তার হৃদয়ে প্রখর হয়ে উঠে। সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ কেহ পরিমাণ করতে পারবে না। অনিমেষ দৃষ্টিতে শিশুর প্রতি চেয়ে চেয়ে তার তৃপ্তি হয় না। তাকে কোলে-কাঁখে করে' তার যে কি অসীম সুখ হয়, কেবল জননীই তা বুঝতে পারেন। ছেলে কাঁদছে, মা ছুটে গিয়ে কোলে নিয়ে বসেন। এই সে বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় এক অভাগিনী তার ছেলেটিকে বুকে নিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকছে, "মা গো, একটু ফেন দাও; বাছা কিছুই খায় নি। আমি চাই না, বাছাটিকে দাও।" তিন মাস পূর্বে এই নারী যুবতী ছিল। এখন তার অস্থি শীর্ণ, চর্ম সূক্ষ্ম, দেহের অস্থি গণতে পারা যায়। কিন্তু ছেলেটি যাতে বাঁচে, তাই চায়। তার স্বামী কোথায় চলে' গেছে।

কিন্তু একা নারী অপূর্ণ, একা পুরুষও অপূর্ণ; বিবাহের দ্বারা উভয়ে পূর্ণ হয়। একা নারী অর্ধাঙ্গ, একা পুরুষও অর্ধাঙ্গ, উভয়ে মিলে পূর্ণাঙ্গ হয়। অর্ধ-নারীশ্বর প্রতিমা আমাদের দেশেই কল্পিত হয়েছিল। সেখানে নারী বড় কি পুরুষ বড়, কে সে বিচার করতে পারে?

কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গরাজ নারী পুলিস নিযুক্ত করেছিলেন। সে সংবাদ পড়ে' কলেজের পড়ুয়া শ্রীমতী মায়া বলছিল, "দাদু, দেখছেন কি? যুগান্তর! আমরা নগর রক্ষা করব, আপনারা নিশ্চিন্তমনে ঘুমাবেন। আর, আমাদের নামে আপনাদের পরিচয় হবে।"

"তা ত দেখছি। এখন বলতে হবে, "সুবল বাবু শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীর স্বামী। স্বামী শব্দের অর্থ জান ত?"

"পুরুষরা এ সব নাম রেখেছিল। আমরা কি গরু-ছাগল? আমাদের স্বামী কি?"

স্ত্রীরাজ্য নূতন নয়, কিন্তু পুরুষ ছাড়া চলে না। পূর্বকালে আসামে কদলীরাজ্য নামে এক নারীরাজ্য ছিল। সেখানে নারীই রাজ্যের কর্ত্রী, পুরুষেরা তাদের দাস হয়ে থাকত। যোগীশ্রেষ্ঠ স্বয়ং মৎস্যেন্দ্রনাথ সেদেশে দাস্য-স্বীকার করে' নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্য গোরক্ষনাথ বহুকষ্টে তাঁর গুরুকে উদ্ধার করেন। সেখানকার নারীরা পুরুষ দেখলে 'গুণ' করত। তারা ভেঁড়া হয়ে থাকত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও লোকে বিশ্বাস করত, কামরূপে গেলে সেখানে নারী কুহক করে, পুরুষ আর ফিরে আসে না। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে মালাবারে বহু বহু পূর্বকাল হ'তে এখনও স্ত্রী-রাজ্য আছে। সেদেশে নারীই সম্পত্তির অধিকারিণী, কিন্তু পুরুষ নইলে রাজ্যশাসন হয় না। রাজ্যের সকল বিভাগই চলতে পারে, দাম্পত্য-বিভাগ চলে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নরনারীকে সমান মনে করেছেন। উভয়ের নিমিত্ত একই বিষয় শিক্ষণীয় করেছেন। কিন্তু বিশ্বকর্মা নর ও নারী পৃথক নির্মাণ করেছেন, পৃথক কাজের জন্যই করেছেন। তিনি কাঁচা কারিকর নন। পৃথক করে' সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা করেছেন। শুধু নরনারীর নয়, নিম্নতম জীবেও পুং-স্ত্রী-ভেদ করেছেন; পৃথক কাজের জন্যই করেছেন। নরনারীর কর্মভেদ স্বীকার না করলে সভ্য-সমাজ দাঁড়াতে পারে না। আদিম মানব বর্বর অবস্থা হ'তে ক্রমশঃ অল্পে অল্পে বর্তমান সভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছে। কর্মবিভাগই এর মূলমন্ত্র। অসভ্যজাতির নারী চাষবাস করে, গৃহরক্ষা করে; পুরুষ যুদ্ধ করে, আর নেশা করে' দিন কাটায়। সে জাতির নর যখন কঠিন কর্ম নিজে করে এবং নারীকে লঘু কর্ম দেয়, তখনই তার উন্নতি হ'তে থাকে। কর্মভেদ দ্বারাই মানুষ সভ্য হয়েছে, বৃহৎ সমাজ গড়ে' উঠেছে। কতদিকে কত কর্ম আছে, যা নারীই পারে। অন্য কত কাজ আছে, যা নরই পারে। উভয়ে একবিধ কর্ম করলে কে গৃহ হবে? কে গৃহরক্ষায় পুরুষের সহায় হবে?

নারী নরের সহধর্মিণী। সহধর্মিণী, এর অর্থ এমন নয়, একজন কবি হ'লে অপরকেও কবি হ'তে হবে; একজন খরচো হ'লে অপরকেও তাই হ'তে হবে। এরূপ ঘটলে সে সংসার টেকে না; বরং দু-জনের বিপরীত

ধর্ম হ'লে সংসার ভাল চলে। স্বামী গদ্য, স্ত্রী পদ্য হবে, স্বামী পরুষ হ'লে স্ত্রী কোমল হবে। স্বামী খরচে হ'লে স্ত্রী নি-খরচে হবে। সহধর্মিণী গৃহস্থ ধর্ম প্রতিপালনে স্বামীর সহায় হবে। কন্যাদিকে এইরূপ শিক্ষা দিতে হবে। বাঙ্গালীর ঘরে এরূপ কন্যার অভাব নাই। কিন্তু যেখানে অভাব ঘটে, সেখানে দম্পতীর কেহই সুখী হয় না। তখন স্বামী সত্ত্বেও নারী অনাথা। যার দোষেই হউক, তাকে অভাগী বলতে হবে। কিন্তু ইংরেজী পড়ে' এইরূপ অভাগী মনে করে, "স্বাধীন হয়েছি।" আর, তারাই অধিকার নিয়ে স্বামীর সহিত বিবাদ করে। এটা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। আর, আইনের দ্বারা ব্যতিক্রমের সমর্থন ও সাহায্য করা উচিত নয়। এমন বিধি হ'তে পারে না, যাতে ব্যতিক্রম থাকবে না।

বিবাহ-বাজারে গুণের তেমন মূল্য নাই। যে পিতা-মাতা মনে করছেন, কন্যাকে লেখাপড়া শিখিয়ে বি-এ, এম-এ পাস করালেই বর না কিনে বিয়ে দিতে পারবেন, তাঁরা ভ্রান্ত। বরপণ অর্থে বরের ক্রয়মূল্য। কথাটার আর কোনও মানে নাই। আর, অনেক বরের পিতা আছেন, যাঁরা ঘরে বি-এ, এম্-এ পাস বউ আনতে চান না। আমার এক বন্ধু বহুকাল কলেজে শিক্ষক ছিলেন। তিনি বালীগঞ্জে এক নূতন বাড়ী করেছিলেন। তিন-চারটি ছেলেকে ভাল রকম লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তিন জন উপার্জনক্ষম হয়েছিল। আমি বললাম—"এবার পুত্রদের বিয়ে দিন। আর, কলিকাতায় অনেক বি-এ, এম-এ পাস কন্যা পাবেন।"

তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, "ছাই, ছাই, আমি তা'দিকে পুষতে পারব?"

"আপনি যদি না পারেন, তারা কোথায় যাবে?"

"সে ভাবনা তাদের বাপেরা করুন। পূর্ববঙ্গে চলতে পারে, এদিকে চলবে না। পূর্ববঙ্গ যখন দড়ি ছেঁড়ে তখন দিগ্‌বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে দৌড়ে। আমরা চাই, মেয়েটি অল্প স্বল্প ইংরেজী জানবে, গৃহকর্ম জানবে আর সুশীল ও শান্ত হবে।"

শহরের দিকে কালো মেয়ের বিয়ে হওয়া দুর্ঘট; গুণ থাকলেও হয় না। আমার এক বন্ধুর ভাইএর দুই কন্যা ছিল। প্রথমটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখও মন্দ নয়। তার বাবা ঘটক-আপিসে আনাগনা করে' আর তিন হাজার টাকা ঢেলে তার বিয়ে দিয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় কন্যাটি কালো, কিন্তু মুখশ্রী মন্দ নয়। তার বাবা ভালো ওস্তাদ রেখে তাকে গান শিখিয়ে ছিলেন। অনেক দিন শিখেছিল। আমি তখন কলিকাতায় থাকি। একদিন ইচ্ছা হ'ল মেয়েটির গান শুনি। সকাল বেলা ৮টার সময় তাদের বাসায় ঢুকলাম। তার বাবা ছিলেন না। নীচের তলার বসবার ঘর হ'তে গায়ত্রীকে ডাকলাম। সে নেমে এল।

"শুনছি, তুই নাকি ভারি গান শিখেছিস্। একটা গা, আমি শুনব।"

ঘরে একটা তক্তপোষ ছিল, আমি বসলাম।

"যন্ত্র আনব?"

"কোথায়?"

"তে-তলায়।"

"যন্ত্র থাক, তুই অমনই গা।"

সে একটা খেয়াল ধরলে, আর ঘরখানা কাঁপতে লাগল। এক গ্রাম দু' গ্রাম অবহেলায় উঠতে, নামতে লাগল। যখন উঠে, তখন আমি বলে' উঠি—"থাম, থাম, তোর গলা চিরে যাবে, আমি চাই না।" সে হাসে। আর, কি মূর্ছনা! খানিকক্ষণ শুনে বললাম, "ধন্য তোর ওস্তাদ, আর ধন্য তোর শিক্ষা। আমি এই গানই খুঁজি। একটা শুনলে পাঁচ-সাত দিন তার ঝঙ্কার চলতে থাকে।"

একদিন গায়ত্রী আমার বাসায় এসেছিল।

"জ্যেঠামশায়, আমায় একটা গান লিখে দিন।"

"গান লিখবার কি আছে? ভাল ভাল গান ছাপা হয়ে গেছে।"

"সে সব গানে হবে না। নূতন আধুনিক গান চাই।"

"আধুনিক গান? যার না আছে ভাব, না আছে ছন্দ, যার না আছে তাল, না আছে মান, যার আছে কেবল লয়,—আ-আ-আ? এই তিড়িং রাগিণী গাইবে কে, তুই?"

"আমাকে রেডিওর লোক ডাকতে আসে। বাবা মাঝে মাঝে যেতে দেন, দাদা মানা করে। তারা নূতন আধুনিক গান চায়।"

"বটে? এবার যখন ডাকতে আসবে, একগাছি মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে যাবি, বুঝলি? দেশী সাহেবরা আমাদের রুচি বিগড়ে দিলে। বিলেতের হুবহু নকল করে' দেশটাকে ঝুটো করে' ফেললে।"

"আপনি না-ই বা শুনলেন, অনেক লোক শুনতে চায়।"

"ঐ কথা মাতালও বলে, আপনি না-ই বা খেলেন, আমরা পাঁচ জন খাব, স্ফূর্তি করব, তাতে আপনার ক্ষতি কি?"

এক দিন তার বাবাকে শুধালাম, "গায়ত্রীর বিয়ের কিছু করতে পারছ?"

"কি করব? ছোকরারা তার গান শুনতে চায়, তাকে

বিয়ে করতে চায় না। চার-পাঁচ জন বিকেল বেলা আসে, তখন চা খাওয়াতে হয়, আর অকারণ আমার দু' টাকা আড়াই টাকা খরচ হয়। এবার মনে করেছি, গায়ত্রীকে একখানা ছোরা কিনে দেবো। আর বলব, এই ছোরাখানা তোর বুকের কাপড়ের ভিতরে রেখে দে। তোর বাবা তোকে আর কিছু দিতে পারে নাই, এই ছোরাখানা দিয়ে গেছে।"

তার বাবা কম দুঃখে এ কথা বলেন নাই। ঘটকদের আপিসে কত ঘোরাঘুরি করেছেন; মেয়েটি কুরূপাও নয়, গৃহকর্মেও অতি নিপুণা, কিন্তু টাকা চাই। তিন হাজারের জায়গায় গানের গুণে আধ হাজার কম হ'তে পারে।

যদিও দশ-বার বৎসর পূর্বের কথা লিখছি, এই ভাব এখনও সত্য। বিশেষতঃ সহজে কেহ সহ-শিক্ষিতাকে বউ করতে চায় না। অধিকাংশ বরও বি-এ, এম-এ পাস কন্যাকে বিবাহ করতে চায় না। তারা ভাবে, এমন কন্যা কখনও পোষ মানবে না, কেবল 'অধিকার' খুজবে। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে, বধূ সত্য সত্যই পতিগতপ্রাণা হয়ে সংসার-ধর্ম পালন করছে। কিন্তু সংখ্যায় অল্প। পিত্রালয়ের গুণে ও শিক্ষার গুণে তারা সুখে ও শান্তিতে আছে। সে শিক্ষা বিদ্যাভ্যাস নয়, বি-এ, এম-এ পাস নয়, সে শিক্ষা শীল-শিক্ষা। মহানির্বাণ তন্ত্রের বচন সকলেই জানেন, "কন্যাপ্যেবপালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ," ইহা সেই শিক্ষা। বর বিদ্যা বিবাহ করতে চায় না, চায় সুশীলা নারী। এ বিষয়ে কন্যার পিতামাতার বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। তা' না রেখে কন্যাকে ইস্কুল-কলেজে পাঠিয়ে বিদ্যাভ্যাস করালে গার্হস্থ্য-শ্রমে সে সুখী হয় না, তার স্বামীও হয় না। এ কথা খুব সত্য, হাজার বিদ্যাভ্যাস করাও, ধর্মশাস্ত্র পড়াও, বেদাধ্যয়ন করাও, স্বভাব সকলের মাথায় চড়ে। যে কন্যা স্বভাবতঃ কলহপ্রিয়, ঈর্ষী, অসহিষ্ণু, সে শ্বশুর গৃহের অপর সকলকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে, সোনার সংসার ছারখার হয়। এরূপ দুঃশীল কন্যার বিবাহ না হ'লেই ভাল।

অনেক পিতামাতা জানেন না, কেমন করে' কন্যাকে পালন করতে ও শিক্ষা দিতে হয়। আমি কলিকাতায় এক পিতাকে বলতে শুনেছি, "জামাই নিয়ে কথা; শ্বশুর-শাশুড়ী ক'দিন? তার পর যারা থাকে, তারা খেলে কি খেলে না, রইল কি রইল না, তারা দেখবে। আমার মেয়ে কেন দেখতে যাবে?" সে কন্যা বড় হয়ে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে পিতৃবাক্য স্মরণ করে, আর পতিপুত্রাদি ছাড়া আর কারও মুখের পানে তাকায় না। একান্নবর্তী পরিবার পশ্চিমবঙ্গে প্রায় লুপ্ত হয়েছে। কেবল অর্থনৈতিক কারণে নয়, লোকের মনোভাব পালটে গেছে। ভাই-এ ভাই-এ ভাব থাকলেও বউ-এ বউ-এ ভাব থাকে না, তারা পাঁচ জনের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পারে না। এটা শিক্ষার দোষ বই আর কিছুই নয়। পূর্ববঙ্গে একান্নবর্তী পরিবার অনেক আছে। এক এক পরিবারের পোষ্যদের মধ্যে এমন সদ্ভাব, দেখলে চোখ জুড়ায়। "শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ", কন্যাকে শিক্ষা দিতে অতি যত্ন করবে। যদি না কর, সংসারে অশান্তি ভোগ করবে। এই রকম অশান্তি দেখে অনেক যুবক বিবাহে পরাঙ্মুখ হয়। দূরে দূরে বিবাহ হ'লে কুল চিনবার উপায় থাকে না। যখন অল্প বয়সে বিয়ে হ'ত, তখন দূরে দূরে বিবাহের দোষ শোধিত হ'তে পারত। এখনকার বেশী বয়সের বিবাহে তা' অসম্ভব।

বাড়ীর শিক্ষার গুণের বহু দৃষ্টান্ত আছে। এখানে একটা দিচ্ছি। ছয়-সাত বছর পূর্বে আট-দশটি ছোট ছোট মেয়েকে এক দিন একটা মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে' খেলতে দেখি। তাদের মধ্যে এক জন ভারি চঞ্চল। তাকে ডাকলাম।

"তোমার নাম কি?"

"ডালিয়া।"

"সে আবার কি নাম?"

তার এক সঙ্গিনী বললে, "আপনি ডালিয়া চেনেন না? সেই যে লাল লাল ফুল হয়; এবার ফুটলে আপনাকে দেখাব।"

"আচ্ছা দেখিও। ডালিয়া নামটা কিছু নয়। তোমার নাম অতসী।"

কন্যাটি অতসী পুষ্পের ন্যায় শ্যামা। এই কারণে অতসী নাম মনে পড়েছিল। পরদিন মেয়েটি আমায় দেখে বললে, "আমি অতসী না।"

"কেন না?"

"আমার দিদিরা বলেছে।"

'অতসী না' শুনে বুঝলাম, তাদের নিবাস পূর্ববঙ্গে। সেখানে বনশণা বা ঝনঝনাকে অতসী বলে। এর ফুল শণফুলের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ। তারা মনে করেছে, আমি শ্যামা কন্যাকে অতসী বলে' বিদ্রূপ করেছি।

"কোথায় তোমরা থাক?"

মেয়েটি আমাকে তাদের বাড়ী নিয়ে গেল, আর তার দিদিদিকে ডাকলে। দিদিরা বেরিয়ে এল, আর নতদৃষ্টি হয়ে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তাদের এই ব্যবহারে আকৃষ্ট হ'লাম, আর তাদের অপর ভাইবোনদের সঙ্গেও পরিচিত হ'লাম। তারা নিশ্চয় আমাকে দেখেছিল, আর আমি যে তাদের ঠাকুরদাদার বয়সী তাও বুঝেছিল। দু'জনেই এখানে এক বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা।

বড়টি বি-এ বি-টি, ছোটটি বি-এস্‌সি পাস। দু'জনেই অনূঢ়া। আমার কাছে অত লজ্জানত হবার কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু কি শিক্ষার গুণ! পরপুরুষের নিকটে নতদৃষ্টি হয়ে শিষ্ট-ব্যবহার করেছিল। সেই শিক্ষাই শিক্ষা, যে শিক্ষায় কর্ম যন্ত্রবৎ চলে' আসে, ভাবতে হয় না। পুরুষেরাও পরনারীর মুখের দিকে তাকায় না। ইহাই শিষ্টাচার। তাদের মা পক্ষপুটে রেখে মেয়েগুলিকে মানুষ করেছেন, আর তাদের এই শিষ্টব্যবহারের জন্য তা' দিকে আমার প্রিয় করে তুলেছেন। তারা এখন কলিকাতায়। মাঝে মাঝে চিঠি লেখে, আমিও লিখি। নিবাস বহু দূরে, মণিপুরের কাছে, আসামে। কিন্তু এই রক্তে কোন বাধাই হয় না। আর, যে শিক্ষায় পরকে আপন করতে পারা যায়, সে শিক্ষাই সংশিক্ষা।

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত বালিকারা বারব্রত করত। গ্রামে এখনও কিছু কিছু আছে। কিন্তু ক্রমশঃ সে শিক্ষা লোপ পাচ্ছে। বারব্রত পালনের দ্বারা সংযম শিক্ষা হয়, আত্মনির্ভরতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা অভ্যাস হয়। সংসারে মানুষ-খেগো বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। লাঙ্গুল হেলিয়ে চোখের চাহনিতে তারা শিকার মুগ্ধ করে, পরে লাফিয়ে তার ঘাড় মটকায়। এই সকল নরখাদক হ'তে কন্যাকে আত্মরক্ষার মন্ত্র না শেখালে তার জীবন বিপন্ন হয়। তখন সে হিতাহিত বিবেচনা করতে পারে না। কেহ সিনেমায় ঢোকে, কেহ প্রগতি-গোষ্ঠীতে যাতায়াত করতে থাকে। প্রথম প্রথম বেশ লাগে, বুঝতে পারে না, ভাবে না,—

হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া গাহিয়া
চিরদিন কভু যায় না।
কভু যায় না॥

পরে অনুতাপ আসেই আসে। যৌবন আর কত বছর? যে ধর্মকে রক্ষা করে, ধর্মও তাকে রক্ষা করে। সে ধর্ম সদাচার, সৎ বা সাধুজনের অনুমোদিত আচার। এই আচারই নারীকে রক্ষা করে। যুবা বয়সে যে বুড়ো হ'তে হবে, তা নয়, 'শেষের সেদিন'ও স্মরণ করতে হবে না। কিন্তু মাঝে মাঝে আপনাকে চিন্তা না করলে কাণ্ডারীহীন তরীর ন্যায় জীবনটা ভাসতে ভাসতে চলতে থাকে। কোথায় ঠেকবে, কোথায় ডুবরে, কিছুই স্থির থাকে না।

কোনও কোনও মাতা ছেলেবেলা হতেই মেয়েকে বিবি সাজতে শেখান। তাঁরা বলেন, "আমার আছে, মেয়ে পরবে না কেন?" তাঁরা ভাবেন না, এটি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। আর ক্রমশঃ বেশভূষার দিকে মেয়ের সখ বেড়ে যায়। না পেলে, সে মনের দুঃখে কাল কাটায়। কলিকাতায় নিত্য-নূতন ফ্যাশন উঠছে। আকাশ-তরঙ্গ যেমন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, সে ফ্যাশন তেমনই দূরে দূরে নগরে উপনগরে ছড়িয়ে পড়ছে। কিশোরীরা তার চমকে ভুলে যায়। এমন বালিকা-বিদ্যালয় প্রায় নাই, যেখানে বালিকাদের বেশভূষার দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। তাদের মায়েরাও ভাবেন, আজকাল এই রকমই চাই। মেয়ের মাথায় একরাশি লম্বা চুল, নাকের সোজা সিঁথি নাই, বাঁ পাশে টেরি। বিধবার খোঁপা বাঁধবার সুবিধা হয় না, তবু টেরি চাই।

এখানে একটা ইতিহাস মনে আসছে। তিন-চার বছর পূর্বের কথা। আমার দেখা অল্প, শোনাই বেশী। এক ডাক্তারের পুত্রের সহিত কলিকাতার এক ডাক্তারের কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ হয়েছিল। কলিকাতার লোকেরা কলিকাতার বাইরের লোকদিকে পাড়াগেঁয়ে বলে, জংলীও বলে। বরের পিতার জন্মস্থান পাড়াগাঁয়ে, কিন্তু এক ছোট শহরে ডাক্তারি করতেন, প্রচুর টাকা কুড়াতেন। তাঁকে কেহ 'পাড়াগেঁয়ে' বললে তিনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন। তিনি ধুতি পরতেন না; তাঁর বাড়ীর ছেলেরাও পরত না, দিনরাত প্যান্ট পরে' শার্ট গায়ে দিয়ে থাকতেন। কন্যার গাত্র-হরিদ্রা হবে, নানাবিধ জিনিসপত্র পাঠাতে হবে। কতক জানা আছে; কিন্তু অঙ্গরাগে কি কি দ্রব্য আজকাল চলেছে তা তিনি জানতেন না। তাঁর জানবার কথাও নয়। এক জন চালাক ছোকরাকে গাত্র-হরিদ্রার জিনিস কিনতে কলিকাতা পাঠালেন। কলিকাতায় বিবাহ-সামগ্রীর অনেক দোকান আছে। ছোকরা এক দোকানে গিয়ে কিনতে বসল।

"গাত্র-হরিদ্রার যা' যা' চাই সব বা'র কর।" কলিকাতার দোকানী বুঝতে পারলে, আর তার দোকানে যা' কিছু ছিল, সব সমুখে ধরে দিলে। মাথার জাল, মুখের জাল, তিনটে তিনটে নানারকমের সুগন্ধি সাবান, সুগন্ধি কেশ তৈল, চুলের সুগন্ধি অবলেপ (পমেড), নানাবিধ সুগন্ধি সার (এসেন্স), মুখে মাখবার মুখ-চূর্ণ (পাউডার) ও ধবল-লেপ (স্নো), গণ্ডরঞ্জিনী (রুজ), কপালে ফোঁটা দিবার তরল কুঙ্কুম (অর্থাৎ গঁদ মেশান বিলাতী লাল রং), ওষ্ঠরঞ্জিনী (লিপষ্টিক), পায়ের তরল আলতা (অর্থাৎ বিলাতী লাল রং), অঙ্গরাগ-পেটিকা বা রাগিনী (ভ্যানিটি ব্যাগ) ইত্যাদি। অবশ্য আরসী, কাঁকই, বুরুষ, একখান সিঁদুর, দু'পাতা আলতা, এসবও ছিল। বাড়ীতে জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এল। যথাদিবসে অন্যান্য বহু দ্রব্যের সহিত প্রসাধন দ্রব্যও গেল। কলিকাতায় কন্যার বাড়ীর পড়শীরা, নবীনা ও প্রাচীনা, সমালোচনা সুরু করে' দিলেন।

নবীনারা বললেন, "এ কি রকম জংলী?" নূতন এসেন্স কই? 'নিরোলী' কই? এ সব যে পুরানো? এ কি

কেশতৈল? এত কড়া গন্ধে পরিমলের মাথা ধরে' যাবে।"

প্রাচীনারা বললেন, "হলুদ কই?" বলে'ই কপালে হাত দিয়ে বসলেন। বাড়ীতে হুলস্থুল পড়ে' গেল। এক বৃদ্ধা কন্যার পিতাকে উদ্দেশ করে' বললেন, "আমি তখনই সতুকে বলেছিলাম, মেয়েটাকে বনবাসে পাঠাবে না। সে দেশে দিনের বেলা শিয়াল ডাকে। আদ্যি-কালের পাড়াগাঁ। চান করবার জল নাই। বড় বড় সায়র আছে, আর চারি পাড়ের ঘাটে বড় বড় কুমীর কিলবিল করে। লোকে হলুদ মেখে জলে নামে, হলুদের গন্ধে কুমীর কাছে আসে না। পরিমল কি হলুদ মাখতে পারবে? যার মাসে এক ডজন সাবান নইলে চলে না, সে হলুদ মাখবে? হা কপাল!"

সতু ডাক্তার কিছু কিছু জানতেন না, এমন নয়। কিন্তু মেয়েটি কালো, মুখশ্রীও তেমন ছিল না। টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম ছুটল, কিন্তু হলুদ ত তারে আসে না। পরের ট্রেন সন্ধ্যা বেলায়। কলিকাতা পৌঁছিতে রাত্রি ১১টা, ১২টা। কি হবে? রাত্রে গাত্র-হরিদ্রা হ'তে পারে কি? একজন স্মৃতিরত্নের বাড়ী ছুটল। স্মৃতিরত্ন বললেন, "কন্যার বয়স কত?" "উনিশ।" "তা' হ'লে ত অরক্ষণীয়া। অরক্ষণীয়া কন্যার বিধি-ব্যবস্থা নাই। যত শীঘ্র পার, কন্যাকে পাত্রস্থা করে' দাও।"

কলিকাতার দোকানী সব জিনিস দিয়েছিল, হলুদটা দেয় নাই। প্রসাধনের এত নূতন নূতন আবিষ্কার হচ্ছে, বাটা হলুদ অক্লেশে শিশিতে ভরে' 'বিন্ধ্যাচলের হরিদ্রারেণু', এই নামে এক নূতন 'অবদান' হ'তে পারত। বিলাতী মেমরা যা গায়ে মাখে, তাই বাঙ্গালী মেয়েকে মাখতে হবে। কিন্তু বিলাতী মেমের মুখ সাদা, তারা শীতদেশে থাকে, তার জন্যই সে দেশে তেমন অঙ্গরাগ হয়েছে। কালো মুখে সে সব মাখলে সং সাজা হয়। গ্রীষ্মদেশে মুখ-চূর্ণ ঘষলে ঘর্ম-বোধ হয়, ধবললেপে মুখকান্তি লুপ্ত হয়। অন্ধ অনুকরণের এই দশা। বার বার দেখেও নব্য-সভ্যদের চৈতন্য হয় না।

শ্রীমতী বন্দনা কলিকাতার মেয়ে, কলেজে পড়ে।

"দাদু, আপনি ক'লকাতা পছন্দ করেন না। আর, আমাদের কিছুই ভাল দেখতে পান না। আমরা কি পুকুর-ঘাটে বসে' হলুদ মাখব, না আবাটা মেখে গায়ের মলা ছাড়াব? এমন সুন্দর সাবান থাকতে কেন সে আদিম যুগে যাব? ইন্দু-দিদি সংস্কৃত কাব্যে এম-এ পাস। সে বলছিল, 'কালিদাসের নাগরীরা লোধ ফুলের ধুলো মেখে মুখ পাণ্ডুর করত।' যদি তারা সুবাসিত পাউডার পেত, ছাড়ত কি? তারা শিরিষ ফুল কানে পরত। আমাদের কানের রিং পেলে শিরিষ ফুল খুঁজে বেড়াত কি? আর বলবেন না, বলবেন না। আমাদের দিদিমারা কপালে, চিবুকে, হাতে উল্‌কি পরে' সুন্দরী সাজতেন। এক উল্‌কি-পরা মেয়েকে বিয়ে করে' এক শিক্ষিত যুবক বিলাত গিয়ে সিবিলিয়ান হয়ে এসেছিলেন। বড় চাকরি, তাঁকে সায়েব-সুবোদের সঙ্গে মিশতে হ'ত, তাদের ক্লাবে যেতে হ'ত, তাদের সঙ্গে ডিনার খেতে হ'ত। স্ত্রীটিকে কোনও রকমে দু'-পাঁচটা ইংরেজী কথা শিখিয়ে নিলেন। কিন্তু কপালের নীল চক্র বিপদ ঘটালে। কলিকাতার ডাক্তাররা অনেক কষ্টে চর্ম কেটে নীল গুঁড়া তুলে দিলেন। কিন্তু সেখানে একটা সাদা চক্র হয়ে রইল। মেমেরা জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার ওখানে কিসের দাগ?' 'ছেলে বেলায় একটা খোঁচা লেগে গেছল।' আমাদের সে বিপদ হ'তে দেখে-ছেন? আমরা কুঙ্কুম পরি, যখন ইচ্ছে ধুয়ে ফেলি। আমরা কি অলক করি? আর অলকের নীচে শ্বেত চন্দনের বিন্দু দিয়ে তিলকপাতা করি, না কালাগুরুর বিন্দু দিয়ে তমাল পত্র আঁকি? আর বলবেন না, বলবেন না। আমরা নূতন কিছুই করি নাই। কবিকঙ্কণে দেখবেন, 'দুকের করিয়া পরে তসরের শাড়ী'। এখনও পূর্ববঙ্গে দুকের কাপড় পরা আছে। চলাফেরা করতে অসুবিধা হয়, আমরা নীচের ফেরটা আলাদা কাপড়ের করি, উপরে শাড়ী পরি। কবিকঙ্কণে দেখবেন, কাঁচুলীতে কত চিত্র করা হ'ত। আমাদের বডিসে কোন চিত্রই থাকে না। বেশী দিন নয়, মেয়েরা কত কি গয়না পরত। পায়ের আঙ্গুলে আঙ্গুটি, পাঁয়জোর, চরণ-পদ্ম, জোড়া জোড়া মল, গুজরী পঞ্চম; ধনীরা কটিতে সোনার চন্দ্রহার, গোট; হাতে বালা, চুড়ী, নারকেল ফুল, বাউটি; উপর হাতে সোনার তাবিজ, অনন্ত, বাজু, জসম; গলায় চিক; বক্ষে সাতনরী পাঁচনরী হার; নাকে বালিকারা নোলক (আগে ছিল বেসর), একটু বয়স হ'লে নাকছাবি, আর একটু বয়স হ'লে বড় বড় নথ সোনার শিকল দিয়ে কানে আটকাতে হ'ত; কানে চৌদানী, কানবালা, অসংখ্য মাকড়ী, সোনার কান; সিঁথিতে সিঁথি, টায়রা; খোঁপায় কাঁটা, ফুল; আর কত নাম করব?"

"ক'জনে পরত? অধিকাংশ নারী রূপোর গয়নাতে তুষ্ট থাকত। মাত্র দু' তিনখানি হালকা হালকা সোনার গয়না থাকত। তিন চার শ টাকা হ'লেই যথেষ্ট হ'ত। এই সেদিন সুলোচনার বিয়ে হ'ল। পঞ্চাশ ভরি সোনার গয়না লেগেছিল। সে সব কে পরেছিল?"

শ্রীমতী নম্রা কলেজে অর্থনীতি পড়ে। সেদিন সে বলছিল,—

"সে সব কি আমরা চাই? বরপক্ষ চায়। তাদের সঙ্গে বুঝুন। আমরা বিয়ের দিন পরি, পরদিন খুলে বাক্সে রাখি। সে সব যৌতুক, স্ত্রীধন। আর শাস্ত্রেও আছে, সালঙ্কারা কন্যা দিতে হবে। আমরা হাতে দুগাছি দুগাছি চুড়ি পরি; গলায় সরু মালা কিম্বা হার; আর কানে কুণ্ডল, দুল কিম্বা পাশা।"

শ্রীমতী মায়া বলে, "দাদু, আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমরা আধুনিকা। আমরা কি সেকালে ফিরে যেতে পারি? আমাদিকে কালের সঙ্গে চলতে হবে। চলতে না পারলে মরণ নিশ্চিত।"

"সে কাল ঘড়ীর ঘণ্টা মিনিট নয়। কাল মানে অবস্থা। বলতে চাও কি, আমেরিকার কাল, রুষ দেশের কাল আর আমাদের দেশের কাল একই? তাদের দেশের সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থা আমাদের সঙ্গে মিলে কি? আমাদের দেশে 'নারীনাং ভূষণং লজ্জা',—লজ্জাই নারীর ভূষণ। সকল দেশেই নারীর কিছু না কিছু লজ্জা আছে, কিন্তু প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন। সকল দেশেই আচার দ্বারা লজ্জা প্রকাশিত হয়। আর, প্রত্যেক আচারের সঙ্গে বিধিনিষেধ আছে। কাল চলেছে বটে, নিত্য পরিবর্তন হচ্ছে। তোমরা সে সে দেশের কাল এ দেশে টেনে আনছ কেন? আমাদের দেশের কালের সঙ্গে সঙ্গে চলছ না কেন? চললে, তোমরা শোভাযাত্রায় যেতে না। সেদিন শুনলাম, তোমার সখীরা দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়েছিল। হাটবাজারের মাঝ দিয়ে আগে আগে চলেছে, পথের ধুলো ঝেঁটিয়ে বেণী দুলিয়ে চলেছে, আর তোমাদের বীর ভাইরা তাদের পৃষ্ঠরক্ষা করছে। পুলিসের গুলী খেতে হয়, বীরাঙ্গনারা খাবে, তখন তারা পালিয়ে যাবে। তারা তোমাদিকে নাচাচ্ছে। আমি জানতাম, তোমরা অবলা; এখন দেখছি, তোমরা অবোধাও বট।"

শ্রীমতী নম্রা বলে, "সেকালের মেয়েরা মুখ ঢাকত, পা দেখাত, আমরা পা ঢাকি, মুখ দেখাই। ঘোমটাও বাংলা দেশে বেশী দিনের নয়। সমুদয় দক্ষিণ ভারতে এখনও নারীর ঘোমটা নাই।"

"ঘোমটার নয়, দিগ্‌বিজয়ের কথা জিজ্ঞাসা করছি। উৎসবে কুমারীরা বেশভূষা করে' সারি সারি চলবে, খই কিম্বা ফুল ছড়াবে, গান গাইবে, সে এক মাঙ্গলিক ব্যাপার। আধুনিকাদের দন্ত-যাত্রায় সে ভাব দেখতে পাও কি?"

অপ্রতিগ্রাহী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

গ্রামের প্রান্তে অপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ এক থাকে,
বহু বহু লোক সম্মান করে তাকে।
অতি দরিদ্র তবু অযাচক—নির্ভর ভগবান,
কুণ্ঠিত বড় গ্রহণ করিতে দান।
যেদিন তাহার অন্ন না জোটে—কেবল বিল্বফলে
শুচি সুন্দর জীবন-যাত্রা চলে।
ভোজন ত আহা কোনো রূপে শুধু দেহ ধারণের তরে
অতি সামান্য—সহজেই পেট ভরে।
সৎ চিন্তার বিঘ্ন হলেই দারুণ কষ্ট তার,
তিক্ত হইয়া উঠে যেন সংসার।
স্বপ্নই তার সত্য নিত্য সকল বস্তু চেয়ে
স্বপ্নই আছে দৃষ্টি তাহার ছেয়ে।
পরমহংসের হাত বেঁকে যেত কাঞ্চন পরশনে
স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছে বহুজনে।

আমাদের এই দীন বিপ্রের চিনিতে হ'ত না ক্লেশ,
অত্যাচারীর দেওয়া ক্ষীর সন্দেশ।
না জানায়ে দিলে—তবুও কেমনে করিতেন পরিহার
সহিত স্বজন নীরব তিরস্কার।
পুণ্য জীবনে পাপের সূক্ষ্ম সংসর্গও পাপ
সত্য কি ফেলে কালিমার কোনো ছাপ?
জীর্ণ শীর্ণ দেহে ভগবান দিয়াছেন একি মন?
সহে না পাপের অতি ক্ষীণ স্পন্দন!
এমন মানুষ গলগ্রহ কি? অথবা অ-দরকারী?
ভাবিয়া ত কিছুই বুঝিতে নারি।
সংযম এক পুরাণো যন্ত্র ফেলিয়া গিয়াছে তার
সম্ভ্রমে তাই জানাই নমস্কার।

বাঁধ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

পরিচিতি : জীবানন্দ পূর্ব্ববঙ্গের জমিদার। প্রতুল তাঁহার বাল্যবন্ধু, মঞ্জুষা জীবানন্দের কনিষ্ঠা কন্যা আর মৃন্ময় প্রতুলের কনিষ্ঠ পুত্র। বাল্যকাল হইতেই উহাদের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া ছিল। মৃন্ময় কলিকাতায় থাকিয়া এম-এ পড়িতেছিল। সে কৃতী ছাত্র। পরীক্ষান্তে উভয়ের বিবাহ হইবার কথা ছিল, কিন্তু মৃন্ময়ের সহপাঠী সুনির্ম্মলের বিশ্বাসঘাতকতায় সে ব্যবস্থা বানচাল হইয়া যায়। তাহার স্কন্ধে এক মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়া দিয়া সুনির্ম্মল সরিয়া পড়িল। মৃন্ময় কোন কিছু অনুমান করিতে না পারিয়াই উহাদের ফাঁদে সহজে ধরা দেয়। নিতান্ত মানবতার খাতিরেই লিলিকে সে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া যায়। এই মেয়েটিকে সুনির্ম্মল আইনসম্মত ভাবে বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু আপন প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতেই তাহার নেশা কাটিয়া গেল এবং ভগ্নীর সহায়তায় মৃন্ময়কে অপরাধী প্রতিপন্ন করিয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিল। মৃন্ময় এত খবর জানিত না, কাজেই দ্বিধাহীন চিত্তে সে অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। সুযোগ-সন্ধানী সুনির্ম্মল সর্ব্বত্র রটাইয়া দিল যে মৃন্ময়ের সহিত লিলি গৃহত্যাগ করিয়াছে। লিলি তখন অন্তঃসত্ত্বা। লিলি কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও কোন প্রতিবাদ জানাইল না। মনুষ্য-সমাজের উপরেই তার কেমন ঘৃণা জন্মিয়া গেল। খবরটা পল্লবিত হইয়া মঞ্জুষা, তার বাবা এবং প্রতুলের কানেও পৌছাইল। মৃন্ময়কে সকলেই ভুল বুঝিল। ফলে উভয় পরিবারের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল এবং এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই মঞ্জুষার মাতার মৃত্যু পরিস্থিতিকে আরও জটিল করিয়া তুলিল—জীবানন্দ মেয়ের হাত ধরিয়া গ্রাম ত্যাগ করিলেন।

ধর্ম্মত্যাগী পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াও তিনি এতদিন মৃন্ময়ের মুখ চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার সে আশা ধুলিসাৎ হইতে তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কিন্তু মঞ্জুষা যথাসম্ভব ধৈর্য্যের সহিত পিতাকে সঙ্গে করিয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

লিলির অনুরোধে মৃন্ময় তাহাকে এক পাহাড়িয়া অঞ্চলে লইয়া গেল। সেখানকার ষ্টেটের স্কুলে সে শিক্ষয়িত্রীর কাজ লইয়া আসিয়াছে। ওখানকার রাজা ও তাঁর পুত্র মহীপাল তাহাদের অত্যন্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের কাছে মৃন্ময় নিজেকে লিলির ভাই বলিয়া পরিচয় দিল এবং সদ্য স্বামী হারাইয়া লিলি স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের পথ বাছিয়া লইয়াছে এই কথাটাই সে প্রচার করিয়া দিল।

দিনকয়েক পরে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া মৃন্ময়ের বিস্ময় সীমা ছাড়াইল। কেহই তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় আদরের সহিত স্থান দিল না—এমন কি তাহার মা বাবাও নয়। মা শুধু চোখের জল ফেলেন—বাবা কাজের অছিলায় অন্যত্র প্রস্থান করেন। মৃন্ময় প্রশ্ন করিয়াও কোন সদুত্তর পায় না। শেষ পর্য্যন্ত রাধু বোষ্টমের কাছে সকল সংবাদ অবগত হইয়া নিতান্ত অভিমানবশেই সে গ্রাম ত্যাগ করিল। যাইবার পূর্ব্বে বলিল, 'আমার' মুখে একটা কৈফিয়ৎ শুনবার জন্যও কেউ অপেক্ষা করলে না—আগাগোড়া মিথ্যাকেই তোমরা সত্য ব'লে গ্রহণ করলে!

মৃন্ময় পুনরায় লিলির কাছেই ফিরিয়া গেল।

রাধু বোষ্টম জীবানন্দের প্রজা। পরিচয় তার বোষ্টম রূপে, কিন্তু আসলে সে খাঁটি মানুষ। জাতি, ধর্ম্ম, ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সকলেই তার আপন জন। তাদের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার—বিশেষ করিয়া মঞ্জুষা ও মৃন্ময় তার বড় প্রিয়।

মৃন্ময় চলিয়া গেল। রাধু বাধা দিয়াও ফিরাইতে পারিল না, তবে কোথাও যে একটা মস্তবড় ভুল হইয়াছে ইহা সে বিশ্বাস করিল এবং কথাটা মঞ্জুষাকেও চিঠিতে জানাইল, কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, সে চিঠি বহু ঠিকানা ঘুরিয়া যখন মঞ্জুষার হাতে পৌছিল তখন তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে—শুধু কুশণ্ডিকা বাকী।

মৃন্ময়ের উপর নিছক শোধ তুলিবার জন্যই মঞ্জুষা তার বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও নান্টুকে বিবাহ করিল।

নান্টু তাদেরই গ্রামের ছেলে। মৃন্ময়ের বন্ধু। এক সময় কারণে-অকারণে বহুবার তাদের গ্রামের বাড়ীতে আসা-যাওয়া করিত। তখন সে নিতান্ত ছেলেমানুষ। তারপর একদিন শোনা গেল সে গৃহত্যাগ করিয়াছে। জীবনে নান্টু কোনদিনই বন্ধনকে স্বীকার করিত না। ছন্নছাড়া ভাবে ভাসিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ওয়ালটেয়ারে আসিয়া ঠেকিল। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আশ্রয় পাইল এক বিদেশীর গৃহে। লীলা রাও এবং তার দাদা তাকে ভালবাসা দিয়া, বিশ্বাস দিয়া, তার জীবনের ধারা একেবারে বদলাইয়া দিল। এমনি ভাবেই দিন চলিতেছিল। সহসা লীলার দাদা বিলাতে চলিয়া গেলেন, আর লীলা যোগদান করিল চিত্র-জগতে। নান্টু বাধা দিয়াও তাহাকে ফিরাইতে না পারিয়া শেষ পর্য্যন্ত নিজেই ভাসিয়া পড়িল এবং ভাসিতে ভাসিতে ঠেকিল আসিয়া মঞ্জুষার দোরগোড়ায়। মঞ্জুষা তাহাকে সমাদরে

তুলিয়া আনিল এবং তাহাকে সহায় করিয়া সে মৃন্ময়কে জব্দ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু শেষরক্ষা হইল না। কুশণ্ডিকার পূর্ব্বে রাধুর একখানি চিঠিতে প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ঘটনাটি নান্টুও অবিলম্বে জানিল। মঞ্জুষাকে তীব্র ভাষায় অনুযোগ দিয়া সরাসরি এই বিবাহকে অস্বীকার করিয়া বসিল। কথাটা জীবানন্দও শুনিলেন এবং সেই হইতেই তিনি যেন কেমন হইয়া গেলেন। তাঁর স্বভাবে ঘটিল অদ্ভুত পরিবর্ত্তন।

নান্টুও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না। কাগজে কাগজে সে বিজ্ঞাপন দিতে লাগিল মৃন্ময়কে উদ্দেশ করিয়া, অনুরোধ জানাইল অবিলম্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে।

বহু বিলম্বে সেই বিজ্ঞাপনের প্রতি মৃন্ময়ের দৃষ্টি পড়িল। একটা ক্ষীণ আশা তার মনে উদয় হইল। লিলির কাছে সে বিদায় চাহিল—বিগত কয়েক বৎসর একই গৃহে বাস করিয়া উহাদের প্রতি তার রীতিমত ভালবাসা জন্মিয়াছে বিশেষ করিয়া লিলির পুত্রের প্রতি।

মৃন্ময় কলিকাতা চলিয়া আসিল, কিন্তু নান্টু তখন শহরের বাহিরে গিয়াছে। মৃন্ময়কে অপেক্ষা করিতে হইল। ইতিমধ্যে লিলির পুত্রের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ আসিয়া তাহার কাছে পৌঁছিল।

নান্টু অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে ফিরিয়া আসিল। মৃন্ময়ের আগমন-সংবাদ পাইতেই সে যেন হাতে স্বর্গ পাইল। নান্টু আগাগোড়া সব কথা সবিস্তারে বিবৃত করিয়া, মৃন্ময়কে তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করিবার অনুরোধ জানাইল এবং তার পর বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

১

অতীত এবং বর্ত্তমান জীবনের সঙ্গে একটা যোগসূত্র স্থাপনের আগ্রহ লইয়াই মৃন্ময় ছুটিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবের সম্মুখীন হইতে তার সে কল্পনা শূন্যে মিলাইয়া গেল। যে আলোর শিখা তার চোখের সম্মুখে অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা তেমনি আকস্মিক ভাবে নিবিয়া গিয়া মৃন্ময়ের ভবিষ্যতের পথকে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল।

অন্ধের ন্যায় সে হাতড়াইতেছে—কোন্ পথ ধরিয়া সে এখন অগ্রসর হইবে। নান্টু অস্বীকার করিলেও মৃন্ময় একথা ভুলিতে পারে না যে, মঞ্জুষা আজ নান্টুর বিবাহিতা স্ত্রী। আত্মবিস্মৃত হইলে তার চলিবে না, ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিতেও সে নারাজ। অকারণে অনেক কুৎসিত গ্লানি তার অতীত জীবনের স্তরে স্তরে জমা হইয়া আছে। ইহাদের লৌহবেষ্টনী হইতে আজও সে মুক্ত নয়। সম্ভ্রম তার মসীকলঙ্কিত। কেহ তাহাকে বিশ্বাসের চোখে দেখিতে পারে নাই। অন্যায় সন্দেহ এবং মিথ্যা অপরাধের বোঝা অকারণে তার মাথায় তুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এদেরই মাঝে আবার সে কোন্ লজ্জায় মঞ্জুষার হাত ধরিয়া গিয়া দাঁড়াইবে—নিজেকে আরও ছোট, আরও ঢের বেশী অপমান করিতে। নান্টু যত সহজে তার অসমাপ্ত কাজের ভার মৃন্ময়কে দিয়াছিল সে তত সহজে সে কাজ সম্পন্ন করিতে পারে নাই। যুক্তি-বিচারটাই বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল। তাই সে মঞ্জুষার সহিত দেখা পর্য্যন্ত না করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তার পরে দীর্ঘ ছয়টি মাস যে তাহার কেমন করিয়া কাটিয়াছে তাহা একমাত্র মৃন্ময়ই জানে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে অন্তরের দাবি যুক্তির চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে তার পর আর একটি মুহূর্ত্তের জন্যও সে অপেক্ষা করে নাই—ছুটিয়া আসিয়াছে।

নাড়া পাইয়া কত কথাই আজ তার মনে উদয় হইতেছে। একের পর এক—ছন্দে—সুরে। অঙ্গুলি-স্পর্শমাত্রেই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। সংসার, সমাজ ও তার অনুশাসন—ইহার কোন কিছুই যেন কোন দিন তার কাজে আসিবে না। মিথ্যা বিধিনিষেধের সহস্র গ্রন্থি সে একের পর এক খুলিয়া ফেলিবে। তার পর—

অকস্মাৎ সে যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে। এমনি বিহ্বলতা তার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিজেকে সে চোখ রাঙাইয়া সংযত করিতে চেষ্টা করে। জীবনের এই অবেলায় আবার প্রভাতের ভৈরবী কেন!

কেন—এ কথা মৃন্ময় নিজেও জানে না, তথাপি তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে পরস্পরকে নূতন করিয়া বুঝিয়া দেখিবার জন্য। হয় তো আজও সে একেবারে নিঃশেষে ফুরাইয়া যায় নাই।

মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে খোলা জানালা-পথে দৃষ্টি রাখিয়া বাহিরের ঘরে অপেক্ষা করিতেছিল, সহসা সাড়া পাইয়া সে সোজা হইয়া বসিল।

—চা কি টেবিলের উপর রেখে যাব দিদিমণি?

মঞ্জুষা বহু পূর্ব্বেই আসিয়াছে, কিন্তু মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া থাকায় সে তার উপস্থিতির কথা জানিতে দেয় নাই নিঃশব্দে দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। সহসা ভৃত্যের প্রশ্নে তাহাকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইল। মৃদু কণ্ঠে বলিল, হাঁ তাই রেখে যাও।

মন্থর পদে মঞ্জুষা অগ্রসর হইয়া আসিল। ভৃত্য চায়ের ট্রে টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল। কোন প্রকার প্রশ্ন করা দূরে থাকুক, মৃন্ময় একবার মুখ তুলিয়া পর্য্যন্ত চাহিতে পারিল না। মঞ্জুষার মুখে মুহূর্ত্তের জন্য বড় অদ্ভুত ধরণের একটু হাসি দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল এবং আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সঙ্গোপনে একটি নিঃশ্বাস মোচন করিয়া চা প্রস্তুত করিতে মন দিল। মৃন্ময় তেমনি নির্ব্বাক।

মঞ্জুষা তার দিকে এক পেয়ালা চা ঠেলিয়া দিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, এ সময় তুমি কোন দিনই অন্য কিছু খেতে না তাই আর···মঞ্জুষা থামিল এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, সেই থেকেই অমন চুপ করে আছ কেন ? কি এত ভাবছ তুমি মিনুদা ?···

মৃন্ময় একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল। বারেকের তরে মুখ তুলিয়া চাহিয়াই পুনরায় নামাইয়া লইল। মঞ্জুষা এমন হইয়া গিয়াছে! এই সামান্য কয়টা বৎসরের ব্যবধানে আজ যেন তাহাকে আর চিনিবার উপায় নাই—পরিবর্ত্তনটা এতই সুস্পষ্ট। মৃন্ময় বিহ্বল হইয়া পড়িল। বুকের অতি গোপন স্থান হইতে একটা অব্যক্ত ব্যথা গুমরাইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু মুখে তার একটি কথাও যোগাইল না। শুধু তেমনি নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল।

মঞ্জুষাকে ঠিক বোঝা গেল না। একের পর এক আঘাত আসিয়া নিজের সম্বন্ধে তাহাকে ঢের বেশী সজাগ করিয়া তুলিয়াছে। সহ্য করিবার এবং দুঃখকে সাহসের সঙ্গে বরণ করিবার ধৈর্য্য সে বিশেষ করিয়াই আয়ত্ত করিয়াছে। হয় তো বা সেইজন্যই তার বিন্দুমাত্র ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল না, বরং যথা-সম্ভব সহজ কণ্ঠেই সে পুনরায় বলিল, আজ কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল, আর সেই থেকেই তুমি চুপ করে আছ। তুমি কি মিনুদা!

···সেই কণ্ঠস্বর···তেমনি অনুযোগ দিবার শান্ত নিরীহ ভঙ্গী। বলিবার কত কথাই ত মৃন্ময়ের আছে, কিন্তু তাহার আত্মপ্রকাশের সবগুলি দরজাই আজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অতীত তাহার কাছে মৃত, সহস্র আহ্বানেও সেখান হইতে কোন সাড়া পাইবার উপায় নাই। বর্ত্তমান সেই মৃত অতীতেরই একটা ছায়ারূপ। মৃন্ময়ের চোখে মুখে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার ভাব ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি সে মুখ খুলিতে পারিল না।

মঞ্জুষার মুখে পুনরায় এক বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, চা খাওয়া আজ কাল ছেড়ে দিয়েছ বুঝি ?

এতক্ষণে মৃন্ময় কথা কহিল, চা ছাড়ব কেন···এই যে··· বলিয়াই এক চুমুকে পেয়ালার চা শেষ করিয়া ফেলিল।

মঞ্জুষার দৃষ্টি সেই দিকেই ছিল। বলিল, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বুঝি ? হবার কথাও। আর এক পেয়ালা দেব ? কেৎলির চা এখনও বেশ গরম আছে।

মৃন্ময় আর একবার মঞ্জুষার মুখের পানে সহজ ভাবে তাকাইবার চেষ্টা করিল। তাকে আজ আর সঠিক বুঝিবার উপায় নাই। মুখে তাহার তপশ্চারিণীর ন্যায় প্রশান্ত উদাস অভিব্যক্তি। কোন দিক দিয়া এক বিন্দু ক্ষতিও যে তাহার জীবনে ঘটিয়াছে তাহার এতটুকু বহিঃপ্রকাশ নাই। অথচ কবে, অতীতের কোন্ এক দিনে সে এই সময় চায়ের সঙ্গে অন্য কিছু খাওয়া পছন্দ করিত না সে কথাটিও সযত্নে মনে করিয়া রাখিয়াছে।

মৃন্ময়ের জীবনে এই নব-পরিণতির জন্য সে নান্তুকেই দায়ী করিল। নান্তুর যাহা বলিবার তাহা বলিয়া, যাহা করিবার তাহা নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন করিয়া সে চলিয়া গিয়াছে; আর মৃন্ময়ের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল তার আজন্মের সংস্কার, আত্মীয়স্বজন, সমাজ এবং তার বহুবিধ অনুশাসন। এই গুলিকে চোখ বুজিয়া এক কথায় যদি অস্বীকার করা চলিত তাহা হইলে আজ হয়ত এমন করিয়া সঙ্কোচে তাহাকে অধোবদন হইয়া থাকিতে হইত না। অন্ততঃ মুখ তুলিয়া সহজ ভাবে দুইটা কথা বলিতে, পারিত। কিন্তু সেদিন কোন সহজ পথই তার চোখে পড়ে নাই, তাই নিঃশব্দে পলাইয়া গিয়া সে নিজেকে বাঁচাইতে চাহিয়াছিল। তার পর দীর্ঘ ছয়টি মাস ধরিয়া নিজের মনের সঙ্গে চলিয়াছিল তার নিরন্তর সংগ্রাম। সে সংগ্রামের মুখে শেষ পর্য্যন্ত সবকিছু ভাসিয়া গিয়া ভালবাসাটাই বড় হইয়া উঠিয়াছে—তাই সে ছুটিয়া আসিয়াছে অথচ এমনই মজা যে সে কিছুতেই সহজ হইয়া উঠিতে পারিতেছে না।

মঞ্জুষা পুনরায় বলিল, দরকার নেই বুঝি ?

মৃন্ময় এতক্ষণে নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়াছে, সে মৃদু কণ্ঠে কহিল, গরম থাকে ত আর এক পেয়ালা দাও।

মঞ্জুষা নিঃশব্দে আর এক বাটি চা আগাইয়া দিল। মৃন্ময় বারকতক চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিল, তোমাকে আমার গোটাকয়েক কথা বলবার ছিল।

মঞ্জুষা শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, সে আমি জানি— একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিল, নইলে এতদিন পরে যে তুমি নিতান্ত অকারণে আস নি এ কথা না বুঝবার মত অবোধ আজ আর আমি নেই মিনুদা।

এতক্ষণ পরে মৃন্ময় স্থির দৃষ্টিতে মঞ্জুষার পানে চাহিল। মঞ্জুষা কি বলিতে চাহে এ কথাটা আজ তার জানিতেই হইবে। কিন্তু তাহার ভাবলেশহীন মুখ দেখিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

মঞ্জুষা বলিতে লাগিল, কিন্তু তুমি কি এখনই চলে যেতে চাও ? তোমার যা বলবার তা পরে বললে চলবে না ?

মৃন্ময়ের কাছে সব কেমন যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। সে বলিল, কি জানি যদি শেষ পর্য্যন্ত কোন কথাই বলতে না পারি।

মঞ্জুষা বলিল, তা হলে সে সব কথা না হয় নাই বললে মিনুদা। তা ছাড়া—ভৃত্যের উপস্থিতিতে মঞ্জুষা কথার মাঝ-খানে থামিল। সে জিজ্ঞাসা করিতেছিল যে, বড়বাবুর দুধটা কি সে লইয়া যাইবে ? বেলা তিনটা বাজিয়াছে।

মঞ্জুষা তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, না না তুমি যাবে কেন, আমিই যাচ্ছি।

মৃন্ময় কহিল, কাকাবাবুর শরীর খুব খারাপ শুনেছিলাম—

মঞ্জুষা মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কবে ?···

মৃন্ময় ঈষৎ চমকিত হইল। কোন জবাব দিতে পারিল না। তার অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়াই মঞ্জুষা পুনরায় বলিয়া উঠিল, কথাটা তুমি মিথ্যে শোন নি তবে এখন তিনি ভালই আছেন, কিন্তু কোন কারণেই যাতে উত্তেজিত হয়ে না ওঠেন সেদিকে ডাক্তারবাবু বিশেষ নজর রাখতে বলেছেন।

মৃন্ময়ের কণ্ঠস্বরে হতাশা ফুটিয়া উঠিল, তা হলে আর কেমন করে দেখা করা সম্ভব হবে! সে যেন অনেকখানি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাহা মঞ্জুষার দৃষ্টি এড়াইল না। কিন্তু তখনই সে কোন জবাব দিতে পারিল না। অতি অকস্মাৎ তার অতীতের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল, কত দিনের কত ছোট বড় ও বহু তুচ্ছ ঘটনার কথা। মঞ্জুষা অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিল। বলিল, দেখা করাটা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয় মিনুদা, তবে একটা কথা···যদি কোন কারণে বাবা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তা হলে তাঁর কোন কথা গায়ে মেখ না।

মৃন্ময় তথাপি ইতস্তত: করিতে লাগিল।

মঞ্জুষা কহিল, তুমি অনর্থক সঙ্কোচ বোধ করছ।

কিন্তু মৃন্ময় ভাবিতেছিল সঙ্কোচ বোধ করিবার সত্যই কি কোন কারণ নাই ? যে ঘরের দরজা একদিন অকারণে তার কাছে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল আর একদিন নান্টু তাহাকেই আবার নূতন করিয়া খুলিয়া দিয়াছিল। মৃন্ময় সহজ মনে সে পথে প্রবেশ করিতে পারে নাই, ভয়ে পিছাইয়া গিয়াছিল—এমন কি মঞ্জুষার সহিত একবার দেখা করাও আবশ্যক বোধ করে নাই। তার পর দীর্ঘ ছয়টি মাস ধরিয়া সে শুধু পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কোথাও স্থিতিলাভ করিতে পারে নাই। একই চিন্তা তাহাকে অনুক্ষণ পীড়া দিয়াছে।

সত্যই ত মনের জ্বালাই যদি না মিটিল, শান্তি যদি ঘুচিয়া গেল তবে কি হইবে তার সমাজ আর পারিপার্শ্বিকের কথা চিন্তা করিয়া। আজ অকস্মাৎ নান্টুর প্রতি মৃন্ময়ের হৃদয় শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া গেল। কত সহজে সে এত বড় একটা ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া গিয়াছে।

মৃন্ময়ের চিন্তায় বাধা পড়িল মঞ্জুষার আহ্বানে, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে, না আমি একলাই যাব।

মৃন্ময় যন্ত্রচালিতের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। কুণ্ঠা এবং সঙ্কোচের নিগড় সে নিজের হাতে ভাঙিয়া ফেলিবে···

মঞ্জুষা অগ্রসর হইয়া চলিল। মৃন্ময় তাহাকে অনুসরণ করিল।

চলিতে চলিতে মঞ্জুষা কহিল, কথাটা তোমায় আগে থেকে জানিয়ে রাখাই ভাল মিনুদা।

মৃন্ময় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল। মঞ্জুষা বলিয়া চলিল, কোন কারণে উত্তেজিত হলে বাবা আজকাল অত্যন্ত বাজে বকেন। একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল, বুঝতেই পারছ কেন আমাকে আজ একথা বলতে হচ্ছে।···

মঞ্জুষা যন্ত্রচালিতের ন্যায় কথা বলিয়া চলিয়াছে। ঠিক যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে একটিও বেশী নয়; আগ্রহ নাই, বিরক্তি নাই। মৃন্ময় ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেও তার ব্যবহারে তাহা প্রকাশ পাইল না। তা ছাড়া যে অবস্থার মধ্য দিয়া সে চলিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাতে অধৈর্য্য হইলে যে চলিবে না এ কথা বুঝিবার মত বুদ্ধি মৃন্ময়ের আছে।

ভৃত্যের হাত হইতে দুধের বাটি গ্রহণ করিয়া মঞ্জুষা আর একবার কথাটা মৃন্ময়কে স্মরণ করাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে তার বাবার ঘরে প্রবেশ করিল।

জীবানন্দ দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া আছেন। জাগ্রত কিংবা নিদ্রিত তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মঞ্জুষা ডাকিল, তোমার দুধ খাবার যে সময় হয়েছে বাবা।

জীবানন্দ এদিকে মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর দিলেন, জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দাও মঞ্জু। এক কথা রোজই তোমায় বলতে হয় কেন। শুধু খাও আর খাও।

মঞ্জুষার মৃদু কণ্ঠের আহ্বান পুনরায় শোনা গেল, বাবা···

জীবানন্দ তেমনি ভাবেই উত্তর দিলেন, সে কি আজও বেঁচে আছে মা—

মঞ্জুষা অনুযোগপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, এ সব বাজে কথা বলতে তোমায় কত দিন আমি বারণ করেছি বাবা, কিন্তু এর পরেও যদি তুমি আমার কথা না শুন তা হলে একটা অনর্থ বাধাব আমি।

জীবানন্দ উঠিয়া বসিলেন। মৃন্ময়ের পানে দৃষ্টি পড়িতেই তাঁর মুখের ভাব কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি নীরস কণ্ঠে বলিলেন, কিন্তু ওকে তুমি আবার বাড়ীতে ঢুকতে দিয়েছ কেন? না, না মঞ্জু, আমি কাউকে চাই না। ওকে চলে যেতে বল। তোমার মা গেছেন, নিমু গেছে, ওকেও যেতে দাও। আমার কাউকে দরকার নেই—কাউকেই আমি চাই না। তিনি বার বার মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

মৃন্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। সে দৃষ্টি কি বলিতে চাহে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মঞ্জুষা একবার আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া জীবানন্দের সন্নিকটে আগাইয়া গেল। দুধের বাটি পাশের টিপয়ের উপর রাখিয়া মঞ্জুষা তার বাবার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল। স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, কাকে তুমি কি বলছ বাবা! একবার ভাল করে চেয়ে দেখ ত।

জীবানন্দ অধিকতর নির্লিপ্ত ভাবে বলিলেন, আমাদের কাছে সবাই সমান মা—সবাই সমান। মায়া নেই, দয়া নেই, একেবারে নিরেট পাথর। বলিয়াই তিনি থামিলেন এবং শুধু মঞ্জুষা শুনিতে পায় এইরূপ অনুচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, দুনিয়ায় কাউকে আজ আর বিশ্বাস করি না। শুধু তুই আর আমি—আর কেউ নয়। কিন্তু তুই যেন ওদের মত আমায় ছেড়ে চলে যাস নি মা।

মঞ্জুষার চোখে জল দেখা দিল। তাহা চোখে পড়িতে জীবানন্দ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, এইজন্যেই কোন কথা তোকে বলতে পারি না মঞ্জু!

মঞ্জুষা ডাকিল, বাবা!

জীবানন্দ সাড়া দিলেন, কি মা—

মঞ্জুষা কহিল, দুধটা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল বাবা।

জীবানন্দ বাধ্য ছেলের মত দুধের বাটিতে চুমুক দিলেন। দুধ খাওয়া হইয়া গেলে মঞ্জুষা মুখ মুছাইয়া দিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিল, তোমাকে ফেলে আমি কি কোথাও যেতে পারি বাবা—না তা সম্ভব?

মৃন্ময় নিঃশব্দে এই দুই পিতাপুত্রীর কথোপকথন পরম আগ্রহে অথচ ব্যথিত চিত্তে শুনিতেছিল।

জীবানন্দ কেমন এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে শূন্যে দৃষ্টি মেলিয়া যেন কোন্ অদৃশ্য সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, সেই জন্যেই একে একে সবাই আমার মাকে ছেড়ে চলে গেল। মিনু গেল নাড়ুও গেল। নইলে তার বুড়ো অথর্ব বাপের বোঝা বইবে কে! সুক্ষ্ম বিচার। ভগবানের সুক্ষ্ম বিচার··· সহসা জীবানন্দের হাতের মুঠি শক্ত হইয়া গেল, চোখের দৃষ্টিতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, এঃ! ভারি আমার বিচারক এসেছেন। কে চেয়েছিল তোমার কাছে বিচার? একটা দুধের বাছাকে তিল তিল করে হত্যা করবার অধিকার তোমায় কে দিয়েছিল?

মঞ্জুষা উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, বাবা—

জীবানন্দ যেন আত্মগত ভাবেই বলিয়া চলিলেন, কিন্তু এ আমি কোনদিন চাইনি।

মঞ্জুষা পুনরায় ডাকিল। জীবানন্দ সাড়া দিলেন।

মঞ্জুষা বলিল, তুমি কি বোঝ না বাবা যে, তোমার এই সব কথায় আমি কত ব্যথা পাই।

জীবানন্দ কেমন যেন আচ্ছন্নের মত বসিয়া আছেন। তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত শব্দগুলি যেন দূরাগত ধ্বনির ন্যায় শোনা যাইতেছে। তিনি বলিতেছিলেন, বার বার আমায় তোরা বাধা দিসনে মা। যা সত্য তা আমায় বুঝতে দে, আমায় বলতে দে মঞ্জু। আমারই ভুলের জন্য তোর জীবনটাকে সব দিক দিয়ে মাটি করে দিলাম।

বারংবার একই কথার উল্লেখে মঞ্জুষা রীতিমত বিব্রত বোধ করিতেছিল অথচ কেমন করিয়া যে জীবানন্দের বাক্য-স্রোতে বাধা দিবে তাহা সে সঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। হঠাৎ নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে সে বলিয়া বসিল, মিনুদা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু মঞ্জুষা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

জীবানন্দ বলিলেন, আমার সঙ্গে দেখা করে আজ আর কোন লাভ নেই মঞ্জু, কথাটা ওকে ভাল করে বুঝিয়ে দাও।

মৃন্ময় যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে। মঞ্জুষা ভিতরে বাহিরে চাঞ্চল্য বোধ করিল।

জীবানন্দ আপন খেয়ালেই বলিয়া চলিলেন, ভাগ্যবতী ছিলেন তোর মা, তাই বেশী দিন তাঁকে দুঃখের বোঝা বইতে হ'ল না। ভাল-মন্দ সব কিছুর বাইরে চলে গেলেন। একটু থামিয়া একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, মানুষের আশা কতই ক্ষণভঙ্গুর মঞ্জু! কত আশা, কত কল্পনা ছিল তাঁর। ছেলের বৌ আনবেন, মেয়ের বিয়ে দেবেন। নাতি নাতনীরা তাঁকে অষ্টপ্রহর ঘিরে থাকবে—তাঁর মাথার পাকা চুল বেছে দেবে!

জীবানন্দ কেমন অদ্ভুত ভাবে হাসিতে লাগিলেন। সে হাসির সম্মুখে মৃন্ময় যেন মাটির সহিত মিশিয়া যাইতেছিল। মঞ্জুষা রীতিমত শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

জীবানন্দ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, কত চেষ্টা করি সে সব কথা ভুলে যেতে, কিন্তু পারছি কোথায়? সবাই মিলে সড়যন্ত্র করে আমায় আরও বেশী করে মনে করিয়ে দিচ্ছে। আমি এক তিল মিথ্যে বলছি না মঞ্জু! নইলে মৃন্ময় কি জানে না যে আমাদের সঙ্গে ওর আর কোন সম্বন্ধই নেই; তবুও এখানে কিসের জন্যে এসেছে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখ মৃন্ময় তার বাপ মায়ের খবর রাখে না, রাখবার দরকারও বোধ করে না। মায়া নেই, দয়া নেই, বিচার-বিবেচনা নেই। সব নিমকহারামের দল।

মঞ্জুষাকে অধিকতর বিব্রত মনে হইল। মৃন্ময় নীরব। সে যেন কিছুই ঠিক মত অনুধাবন করিতে পারিতেছে না।

জীবানন্দ বলিতে লাগিলেন, আমি কোন কথা শুনতে চাই না মঞ্জু, ওকে যেতে বলে দাও। আমার দেবার মত কিছু নেই। আমি একেবারে নিঃস্ব, দেউলে!

মৃন্ময়ের মুখের চেহারা বেদনায় কালো হইয়া উঠিল। তার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে অতীতের শত স্মৃতি। সে দিন আর জীবনে ফিরিয়া আসিবে না। কিন্তু এই বিপর্যয়ের জন্য সে নিজে হয়ত এক বিন্দুও অপরাধী নয়। অথচ প্রতি-কারের জন্য যে দিকেই সে হাত বাড়াইতেছে সেই দিক হইতেই পাইতেছে লাঞ্ছনা, অপমান।

মঞ্জুষার আহ্বানে তার চিন্তার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। মঞ্জুষা বলিতেছিল, এতটা আমি ভাবি নি, তা হলে তোমাকে ডেকে নিয়ে আসতাম না মিনুদা। তুমি বরং এখন যাও। বুঝতেই ত পারছ সব। একটু থামিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে পুনরায় কহিল, অপেক্ষা করো। একটু পরেই আসছি। তুমি না গেলে বাবা শান্ত হবেন না।

মৃন্ময় নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইতে মঞ্জুষা তার বাবার নিকটে আসিয়া বসিল। জীবানন্দ উত্তেজনায় হাঁপাইতে-ছিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও যে তিনি এমন করিয়া চেঁচা-মেচি করিয়াছেন এই মুহূর্ত্তে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তিনি মঞ্জুষার আনত মুখের পানে ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, মাঝে মাঝে আমার যেন সব কেমন গোলমাল হয়ে যায় মঞ্জু। মনে হয় আমি যেন পাগল হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা মা, আমায় একটা সত্য কথা বলবি ?

এই আকস্মিক প্রশ্নে মঞ্জুষা মুখ তুলিয়া চাহিতেই জীবানন্দ বলিলেন, সত্যিই কি আমার মাথার কোন গোলমাল হয়েছে ? কি বলে তোদের ডাক্তার ?

মঞ্জুষা ঈষৎ চমকাইয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া প্রতিবাদ জানাইল। বলিল, আসলে এই সব বাজে চিন্তা করাটাই তোমার ব্যাধি বাবা।

জীবানন্দ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, কি জানি মঞ্জু কোন কথাটা সত্যি, কিন্তু ভাবছি কেমন করে আমার দ্বারা এটা সম্ভব হ'ল। কত দিন, কত বছর পরে মৃন্ময়ের সঙ্গে দেখা, আর আমি তাকে অনাদরে তাড়িয়ে দিলাম---ওকে কি ফিরিয়ে আনা যায় না মঞ্জু ? একবার দেখ ত মা।

মঞ্জুষা স্নিগ্ধ শান্ত কণ্ঠে কহিল, সেইটেই কি খুব ভাল কাজ হবে বাবা ? তা ছাড়া তুমি তো কিছু মিথ্যে বল নি।

জীবানন্দ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, সত্য কথাও সব সময় বলা উচিত নয় মঞ্জু, এটা আমার বোঝা উচিত ছিল। তিনি একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

মঞ্জুষা তার বাবার ব্যথিত মুখের পানে খানিক নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া কি ভাবিল---প্রকাশ্যে কহিল, বেশ ত বাবা না হয় আমি দেখেই আসছি মিনুদাকে পাওয়া যায় কিনা !

সমস্ত বাগ্‌বিতণ্ডা বন্ধ করিয়া দিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

২

একটা তীব্র অস্বস্তি এবং অবর্ণনীয় আত্মগ্লানিতে মৃন্ময়ের অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল। যুক্তি-বিচার দিয়া যাচাই করিয়া দেখিতে গেলে আজিকার এই লাঞ্ছনাটা হয়ত সবটাই তার একলার প্রাপ্য নয়।

মঞ্জুষাকে আজ আর যেন চেনাই যায় না, এমনি ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে সে চলাফেরা করিতেছে। নিজের চতুর্দ্দিকে সে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে। তার বাবা বরং স্পষ্ট, কিন্তু মঞ্জুষা বলে বর্ত্তমানে ইহা নাকি তাঁর একটা ব্যাধিতে দাঁড়াইয়াছে।...ওজন করিয়া তিনি কথা বলেন নাই বটে, কিন্তু অর্থহীন উক্তি একটিও তিনি করেন নাই।...

জীবানন্দের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মৃন্ময় পুনরায় বাহিরের ঘরে বসিল। মঞ্জুষা তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছে। যদিও সে জানে যে, এই বসিয়া থাকার কোনই সার্থকতা নাই তথাপি সে চলিয়া যাইতে পারিল না --মনের অস্থিরতা গোপন করিতে সে সহসা ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল। যে অবস্থার সম্মুখীন আজ তাহাকে হইতে হইয়াছে ইহার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। নিজের পর্ব্বত-প্রমাণ ত্রুটিটাই এতদিন তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া-ছিল, কিন্তু আজ বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সে কেমন যেন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহার চেয়ে আত্মগোপন করিয়া থাকাও যেন আজ তাহার কাছে সহজ মনে হইল। তাহাতে অন্ততঃ নিজের সঙ্গে ছলনা করিতে হইত না। মৃন্ময়ের চতুর্দ্দিকে পৃথিবী যেন টলিতেছে। বাসুকীর ফণায় আর তেমন শক্তি নাই যে এই দুর্ব্বিষহ বোঝা আরও কিছুকাল অনায়াসে বহন করিতে পারে।

মৃন্ময় গবাক্ষপথে বাহিরের আকাশের পানে চাহিল। দ্বিপ্রহরের আকাশে দুই-চারিটা চিলের নিঃশব্দ আনাগোনা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। পাশের বাড়ীর বেতার-যন্ত্রে একের পর এক গান চলিয়াছে। কোথায় একটা ছোট ছেলে তারস্বরে চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। প্রাত্যহিক নিয়মের ব্যতিক্রম নাই।

মৃন্ময় কান পাতিয়া শোনে---শোনে আপন জীবনের অতীত এবং বর্ত্তমানের কাহিনী---দূর হইতে ভাসিয়া আসা আনন্দ ও বেদনার প্রকাশের মধ্যে। এই ত জীবন---এই তার সত্যকার রূপ। এক দিনের মধুর কল্পনা আর এক দিনের ঘটনা-সংঘাতে এমনি করিয়াই বুঝি রূপ বদলায়। নিজের অজ্ঞাতে তার একটি নিঃশ্বাস পড়ে---সেই শব্দে মৃন্ময় চমকাইয়া উঠে। এতক্ষণের তন্ময়তা এক নিমেষে টুটিয়া যায়।...

অকস্মাৎ তার লিলির কথা মনে পড়ে। তার জীবনের বিক্ষিপ্ত ধারাকে সে সযত্নে নিয়ন্ত্রণ করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল, চতুর্দ্দিক হইতে যখন একটানা ছি ছি তাহাকে পথভ্রান্ত করিয়া দিয়াছিল, তার জীবনের ধারা অনির্দ্দিষ্ট পথে লক্ষ্যহারার মত ঘুরিয়া মরিতেছিল, লিলি তখন তাহাকে স্নেহে সেবায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

মৃন্ময়ের নীরব চিন্তায় বাধা পড়িল। মঞ্জুষা ঘরে প্রবেশ করিল। কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, অনেকটা দেরী হয়ে গেল। একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, আর দেরীই যখন হ'ল তখন আরও একটু অপেক্ষা কর আমি তোমার চায়ের কথা বলে আসছি—কিন্তু চায়ের সঙ্গে কি খাবে? গোটাকয়েক সিঙারা আর কিছু নোন্‌তা?

মঞ্জুষার এই স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে মৃন্ময় কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। মৃদু আপত্তি তুলিয়া সে কহিল, এই সময়—

মঞ্জুষা শান্ত কণ্ঠে বলিল, এইটেই ত ঐ সব খাবার সময় তোমার। তুমি আমায় কি মনে কর মিনুদা? এত সহজে সব ভুলে গেছি?

মঞ্জুষা আর দাঁড়াইল না। দ্রুত প্রস্থান করিল। ওর চলাফেরা কথা বলা সবই কেমন অদ্ভুত মনে হয় মৃন্ময়ের। তার এই নির্লিপ্ত অন্তরঙ্গতায় সে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। ইহাকে ঠিক স্বাভাবিক বলিয়া মৃন্ময় ভাবিতে পারিতেছে না, অথচ একটা অতিপরিচিত সুখানুভূতি তাহার মনকে নাড়া দিয়া গেল। এই অভিভূত ভাব কাটাইয়া উঠিতেই মনে হইল তার জীবনের বর্ত্তমান অধ্যায়টা একটা স্বপ্ন। কিন্তু এই স্বপ্নটা কি সত্য হইয়া উঠিতে পারে না। আবার তেমনই করিয়া তার চতুর্দ্দিক আনন্দমুখর হইয়া ওঠা কি সম্ভব নয়!

মৃন্ময় আপন মনে হাসিয়া উঠিল। এ হাসির ধরণ আলাদা। এই সব কল্পনা কল্পনামাত্র—তার বর্ত্তমান জীবনে শুধু অর্থহীন নয়, অনাবশ্যক। এই কল্পনার স্বর্গলোকে পৌঁছানো হয় ত আর কোন দিনই সম্ভবপর হইবে না।

কোথা দিয়া কি ঘটিয়া গেল। নান্টু আসিয়া উপস্থিত হইল—মঞ্জুষার সহিত তাহার বিবাহ ঘটিল, কিন্তু সে বিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কার অলক্ষ্য ইঙ্গিতে তাহা পুনরায় বানচাল হইয়া গেল। মঞ্জুষা বিব্রত বোধ করিল, নান্টু হইল বিচলিত। তথাপি নিজের পথকে সে দ্বিধাহীন চিত্তে নির্ব্বাচন করিয়া লইল। দায়, দায়িত্ব তাহারই বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দিয়া নান্টু বিদায় লইল, কিন্তু মৃন্ময় অকুণ্ঠ চিত্তে সে দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে পারে নাই, নান্টুর পিছনে পিছনে সেও অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। তার পর···

হায়রে কোথায় গেল সেদিনের সেই হারানো দিনগুলি, যখন মঞ্জুষার চিন্তায় ছিল কাব্যের স্নিগ্ধমধুর ভাব, কথা ছিল কবিতার মত। আর তাহাকে লইয়াই আজ কত সমস্যা দেখা দিয়াছে, কত আত্মবিশ্লেষণের নীরব প্রয়াস।

মঞ্জুষা পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। এক প্লেট গরম সিঙারা মৃন্ময়ের দিকে আগাইয়া দিয়া সে চা প্রস্তুত করিতে লাগিল। মৃন্ময় একদৃষ্টে তার চা তৈরি করা দেখিতে লাগিল।

চায়ের পেয়ালা মৃন্ময়ের সম্মুখে রাখিয়া মঞ্জুষা কহিল, খাও—

মঞ্জুষা যত্ন করিয়া খাওয়াইতেছে। কোন প্রকার অপচয় সে করিতে পারে না। হাত বাড়াইয়া একটা সিঙারা তুলিয়া সে মুখে পুরিল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে কি যেন মনে পড়িতেই সে হাত গুটাইয়া লইল। কোন প্রকারে সিঙারাটা গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, কিন্তু তোমার চা কই?

মঞ্জুষা মৃদু হাসিয়া কহিল, অতিথিকে আগে না খাইয়ে খেতে নেই যে।

অতিথি—তাই বটে! এ বাড়ীতে আজ তাহাকে অতিথির মর্য্যাদা দেওয়া হইতেছে। আর সে মর্য্যাদা দিতে অগ্রণী হইয়াছে স্বয়ং মঞ্জুষা। তার জীবনে ইহার চেয়ে আর বড় পরিহাস কি হইতে পারে! রাগ করিলে সে দিনের মত আজ আর কেহ শান্ত করিবার চেষ্টা করিবে না। প্রাণের যোগ নাই, আছে অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি সাধারণ ভদ্রতাবোধ। কিন্তু সত্যই কি তাই! মঞ্জুষার এই কুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশের মধ্যে আর কিছুই কি নাই?

মৃন্ময় যে হাত গুটাইয়া লইয়াছে তাহা মঞ্জুষার দৃষ্টি এড়াইল না। সে বলিল, খাচ্ছ না যে? কি হ'ল তোমার? একটু থামিয়া পুনশ্চ বলিল, তা ছাড়া চা খাওয়া ত আমি ছেড়েই দিয়েছি। বড্ড ভালবাসতাম কিনা।

মৃন্ময় কথা কহিল না, বটে, কিন্তু দু' চোখে তার নীরব জিজ্ঞাসা। মঞ্জুষা একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ঝাল নোন্‌তাও একই কারণে ছাড়তে হয়েছে, তা বলে তুমি খাচ্ছ না কেন? তুমি ত ছেড়ে দাও নি?

মৃন্ময় কহিল, না, ছাড়তে আর পারলাম কোথায়, কিন্তু এখন আর রুচবে না। খিদে নেই।

মঞ্জুষা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, তা হলে বরং না খেলে।···সে ভৃত্যকে ডাকিয়া প্লেটখানি লইয়া যাইতে বলিল।

ভৃত্য প্লেট লইয়া চলিয়া যাইতে মঞ্জুষা শান্তকণ্ঠে পুনরায় বলিল, তুমি রাগ করেছ মিনুদা, কিন্তু একটু ভেবে দেখলে তুমি নিজেই বুঝবে এই রাগ করা কত নিরর্থক।

মৃন্ময় সহসা বাঁকা উত্তর দিয়া বসিল, তোমার চা-সিঙারা ত্যাগ করার মত?

মঞ্জুষা হাসিল, বলিল, নেহাত মিথ্যে বল নি তবে কথা হচ্ছে এই যে, আমরা মেয়ের জাত, আর দিদিমা, ঠাকুরমাদের আমলের চালচলনগুলো একেবারে ভুলে যেতেও পারি নি, রক্তের মধ্যে কেমন যেন একাকার হয়ে আছে। ইচ্ছে থাকলেও সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারি না। যত গণ্ডগোল সেইখানেই।

মৃন্ময় গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

মঞ্জুষা বলিতে লাগিল, তোমাকে মিথ্যে বলছি না মিনুদা—আমাদের এই অনাবশ্যক দুর্ব্বলতা জীবনে বহু ক্ষতিই করে থাকে; আর তোমরাও সে সুযোগ বড় কম নাও না।

একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, কিন্তু একই অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না মিনুদা, তোমাদেরও হয়ত নূতন করে ভেবে দেখবার দিন আসছে। পৃথিবী দ্রুত বদলে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে আশপাশের সবকিছুই। নইলে···মঞ্জুষা মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ করিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, নইলে তোমার সামনেই কি এমন সহজ ভাবে আজ মুখোমুখি দাঁড়াতে পারতুম, না এমন স্বাভাবিক ভাবে কথা বলা সম্ভব হ'ত!

মৃন্ময় কেমন এক অদ্ভুত কণ্ঠে ডাকিল, মঞ্জু—

মঞ্জুষা নির্লিপ্ত কণ্ঠে সাড়া দিল, আমাকে কিছু বলবে তুমি!

এ সুযোগ মৃন্ময় ত্যাগ করিল না। শান্ত মৃদু সুরে বলিল, হ্যাঁ কিন্তু তুমি ত আমার কোন কথাই শুনছ না।

মঞ্জুষা কহিল, কিন্তু সত্যই কি তার আর কোন প্রয়োজন আছে মিনুদা!

মৃন্ময় বলিল, কি যে আছে আর কি নেই সে তর্ক তোলা থাক, কিন্তু একটা সত্য উপলব্ধি করেই তোমার কাছে আমায় ছুটে আসতে হয়েছে। নান্তুর অনুরোধ পালন করা ছাড়া আমার আর অন্য উপায় নেই।

মঞ্জুষার মুখের ভাব এতক্ষণে কঠিন হইয়া উঠিল, কিন্তু সহজেই সে নিজেকে সংবরণ করিল। বলিল, তোমার নান্তুদা তোমায় একটা কেন দশটা অনুরোধ করতে পারেন। সে অনুরোধ পালন করা না করা তোমার ইচ্ছা, কিন্তু এ সব কথা আমাকে শুনিয়ে ত কোন লাভ নেই মিনুদা।

মৃন্ময় বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, কিন্তু নান্তুদা যে তোমার সব ভার আমারই উপর দিয়ে গেছেন মঞ্জু।

মঞ্জুষার চোখে মুখে এক বিচিত্র হাসি খেলা করিয়া গেল। সে শান্ত কণ্ঠে বলিল, তুমি আমায় আশ্চর্য্য করে তুললে মিনুদা। আমার ভার সে তোমাকে দিতে যাবে কিসের জন্যে —আমি ত তার ভার-বোঝা হই নি। তা ছাড়া মঞ্জুষা থামিল।

মৃন্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

মঞ্জুষা পুনরায় বলিতে লাগিল, এত বড় অধিকার তাকে কে দিয়েছিল তা আমার জানা নেই। আমার নিজের কি কোন স্বাধীন সত্তা নেই?

মৃন্ময় দ্বিধাজড়িত স্বরে বলিল, নান্তুদার সঙ্গে তোমার কি বিয়ে হয়নি!

মঞ্জুষা অস্বাভাবিক ভাবে হাসিয়া উঠিল, কহিল, তা আর হল কৈ। শেষ পর্য্যন্ত গোল বেধে গেল যে। বিয়েটা হাত কপালে নেই কি আর করি বল।

মঞ্জুষাকে মৃন্ময় ঠিক যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তার মুখের পানে দৃষ্টি পড়িতেই কথাটা মঞ্জুষা অনুমান করিয়া লইল এবং সহসা অতিমাত্রায় গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তোমার নান্তুদা তোমাকে মিথ্যে বলেনি মিনুদা, কিন্তু আজ তুমি ফিরে এসেছ বলেই তোমার সেদিনকার চোরের মত পালিয়ে যাওয়াটা মিথ্যে হয়ে যেতে পারে না। এখন তুমিই বল তো আমি কি করি?

মৃন্ময় নীরব।

মঞ্জুষা বলিয়া চলিল, সেদিনের সত্যকে আজ আর সত্য বলে ভাবতে পারছি না মিনুদা।

মৃন্ময় বলিল, তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মঞ্জু।

মঞ্জুষা বলিল, তার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

প্রত্যুত্তরে কিছু বলিবার জন্যই মৃন্ময় মুখ তুলিয়াছিল। তাহাকে থামাইয়া দিয়া মঞ্জুষা পুনশ্চ বলিল, কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। তুমি আবার ফিরে এসেছ—ভালই হয়েছে, নইলে সব কথা তোমার জানা হ'ত না। সেদিন যদি অমন করে ভয়ে পালিয়ে না যেতে তা হলে আজ হয়তো অযথা তোমাকে হয়রান হতে হ'ত না। তুমি শুধু নিজের কথাটাই বড় করে ভেবে দেখেছ, কিন্তু আমারও যে একটা মতামত আছে, অথবা থাকতে পারে সে কথাটা একেবারে ভুলে যাওয়া মোটেই সঙ্গত হয়নি।

মৃন্ময় বলিল, সব কথা না শুনে তোমারও একটা সিদ্ধান্ত করে নেওয়া উচিত হয়নি মঞ্জু।

মঞ্জুষা কহিল, অতীতের কোন বিষয় নিয়েই আমি আর ভাবতে চাই না। আমি বর্ত্তমানের সঙ্গেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চাই। সেখানে আর কারুর প্রবেশাধিকার থাকবে না। ভুল অতীতে আমিও হয়তো করেছি তুমিও করেছ, কিন্তু তাই নিয়ে অনর্থক দুশ্চিন্তা করে লাভ কিছুই হবে না বরং বর্ত্তমানের প্রয়োজনকেও লঘু করে দেখা হবে।

মঞ্জুষা একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, আমি এক দিনের, এক মুহূর্ত্তের চিন্তায় এ কথা বলছি না। তোমার আমার পথ আজ আলাদা হয়ে গেছে—আমাদের যার যার নিজের পথ ধরেই চলতে হবে।

মঞ্জুষা থামিল। ভিতরে ভিতরে যে তার একটা দ্বন্দ্ব চলিয়াছে তা যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত সে চাপিয়া রাখিয়াছে। বাহির হইতে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। মৃন্ময়ও ভুল করিল, কিন্তু আত্মবিস্মৃত হইল না, বলিল, আমার ভুলের জন্য আমি বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নই, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না যে, আগাগোড়াই কি আমি শুধু ভুল করে এসেছি!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মৃন্ময় থামিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু কণ্ঠে পুনরায় বলিল, অযথা প্রশ্ন করে

তোমাকে আমি বিরক্ত করতে চাই না, কিন্তু আমার দুই-একটি কথার জবাব পাব কি?

মঞ্জুষা কষ্টে নিজের আবেগকে দমন করিল। বলিল, বলো---

'নান্টুদার কোন খবর তুমি রাখ?' মৃন্ময় প্রশ্ন করিল। 'তার ঠিকানাটা আর আমার মা বাবার খবরটাও যদি দিতে পার তা হলে বড় উপকার হয়।'

এনে দিচ্ছি বসো---মঞ্জুষা দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু খবরটা বহন করিয়া সে আর ফিরিয়া আসিল না। ঠিকানা লেখা কাগজ পাওয়া গেল ভৃত্যের মারফতে।

মৃন্ময় বিস্মিত হইল, আহত হইল। কিন্তু নীরবে ভৃত্যের হাত হইতে কাগজখানা গ্রহণ করিল। আরও কিছুক্ষণ নির্ব্বাকভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভৃত্যকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, তোমার দিদিমণিকে বলো আমি চলে যাচ্ছি, আর হয়ত কোন দিন তার সঙ্গে দেখা হবে না---বলিয়াই সে খোলা দ্বারপথে দ্রুত বাহিরের পানে অগ্রসর হইয়া গেল। একবার পিছন ফিরিয়াও দেখিল না। তাকাইলে দেখিত ততক্ষণে দরজার সম্মুখে মঞ্জুষাও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তার চোখ দুইটা ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে কিন্তু দেহটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। তার এতক্ষণের গাম্ভীর্য্য বুঝি আর থাকে না---এখনি হয়ত সে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

ক্রমশঃ

নারী শিক্ষা সমিতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

এ কথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, নারীদিগের উপযুক্ত শিক্ষার উপরেই জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি নির্ভর করে। কেবল যে সুমাতা ও সুগৃহিণী হইবার জন্য বালিকাদিগের উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন তাহা নহে, যদি আবশ্যক হয় নারীগণ যাহাতে সংসারের আয় বাড়াইতে পারেন তাহার জন্যও তাঁহাদের উপযুক্ত শিক্ষার দরকার। ইহা ছাড়া বিধবা নারীদের যাহাতে অন্যের গলগ্রহ হইয়া আজীবন বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে না হয়, তাঁহারা যাহাতে সম্মানের সহিত নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন এবং যাহাতে তাঁহাদের শিক্ষা ও কর্ম্মের দ্বারা সমাজের নানাবিধ কল্যাণ সাধিত হয় সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের জন্যও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার।

সকল সময়েই মনে রাখিতে হইবে যে, নারীই---সধবাই হউন, আর বিধবাই হউন---গৃহের প্রধান পরিচালিকা; তাঁহার উপরেই গৃহের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি, কল্যাণ ও শান্তি নির্ভর করে; তাঁহার শিক্ষা, কাজকর্ম্ম, চালচলন, আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা প্রভৃতি দ্বারাই পরিবারের প্রতি জনের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আনন্দ ও শান্তি বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং নারীর শিক্ষার উপরেই গৃহের মঙ্গল এবং প্রতি গৃহের মঙ্গলের উপরেই পল্লীর ও দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি নির্ভর করে। নারীকে উপলব্ধি করাইতে হইবে তাঁহার জীবনের আদর্শ কি, লক্ষ্য কি---তাঁহার দায়িত্ব কত বেশী এবং সেই আদর্শ ও লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে ও সেই দায়িত্ব বহন করিতে হইলে যে শিক্ষার প্রয়োজন সেই শিক্ষাই তাঁহাকে দিতে হইবে। নারী তাঁহার স্বাভাবিক ও সহজ বুদ্ধি এবং প্রেরণার সাহায্যে সেই শিক্ষা অতি সহজেই গ্রহণ করিতে পারিবেন। ইহার জন্য চাই কেবল উপযুক্ত শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা এবং অনুকূল পরিবেশ।

নারীশিক্ষার উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও আদর্শসমূহকে সম্মুখে রাখিয়াই ১৯১৯ সালে "নারী শিক্ষা সমিতি" স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার কার্য্যধারাকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে:

(ক) প্রধানতঃ পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন।

(খ) প্রধানতঃ পল্লী অঞ্চলে মাতৃনিকেতন এবং শিশু-কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন; এই সকল কেন্দ্রে নারীদের ধাত্রীবিদ্যা, প্রসূতি পরিচর্য্যা, শিশুপালন, শিশুশিক্ষা, প্রাথমিক সাহায্য (First Aid), গৃহ-সেবা প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

(গ) নানাবিধ শিল্পকলা শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় ও শিল্প-কেন্দ্র স্থাপন।

(ঘ) সমিতি ও সম-উদ্দেশ্যে স্থাপিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদান করিবার জন্য শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা।

(ঙ) উপযুক্ত পুস্তকাদি প্রণয়ন:

প্রত্যেক বিভাগের কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল:

কাশ্মিরী সূচীশিল্পের নিদর্শন
মহিলা শিল্পভবন, নারী শিক্ষা সমিতি

প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন

প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে সমিতি প্রথম দুই বৎসর কলিকাতা ও শহরতলীর মধ্যেই তাঁহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে তিনটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে "বালীগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়" প্রথম; উহা এক জন মাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণা শিক্ষয়িত্রী ও ২৫ জন ছাত্রী লইয়া ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়টি যখন বেশ উন্নতির পথে যাইতেছিল তখন ১৯২১ সালে "নারী সমুন্নতি সমিতি"র হস্তে ইহার পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয়। বর্ত্তমানে ইহা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও কলেজে পরিণত হইয়াছে। ইহার নাম "মুরলীধর বালিকা বিদ্যালয়।"

সবেমাত্র সাত জন ছাত্রী ও এক জন শিক্ষয়িত্রী লইয়া দ্বিতীয় বিদ্যালয়—"শ্যামবাজার বালিকা বিদ্যালয়"—১৯১৯ সালের জুলাই মাসে স্থাপিত হয়। ১৯২৫ সাল হইতে এই বিদ্যালয়টি একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। ইহার বর্ত্তমান অবস্থা খুবই সন্তোষজনক।

১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৫ জন ছাত্রী লইয়া তৃতীয় বিদ্যালয়—"নারিকেলডাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয়" স্থাপিত হয়। ১৯৩৬ সাল হইতে ইহা কলিকাতা করপোরেশনের তত্ত্বাবধানে আছে।

সমিতি স্থাপনের পর বৎসর অর্থাৎ ১৯২০ সালে সমিতি "হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে"র তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে বৌবাজারে স্থানীয় অধিবাসিগণের নির্ব্বাচিত একটি সমিতি কর্ত্তৃক এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া ১৯২০ সালেই সমিতি কর্ত্তৃক ভবানীপুরে কেবল পাঁচ জন ছাত্রী লইয়া "বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হয়। উপরোক্ত দুইটি বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা বাড়িয়া ১৪৪ জন হয়। ১৯২৩ সালে "হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়" "রাজেশ্বরী মিউনিসিপ্যাল বিদ্যালয়ের" সহিত সংযুক্ত হয়। বর্ত্তমানে "বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইয়াছে।

তাঁত ঘরের একটি দৃশ্য

সুতরাং দেখা যায় যে, কলিকাতা ও শহরতলীতে অতি ক্ষুদ্র আকারে ও ক্ষুদ্র ভাবে সমিতি কর্ত্তৃক যে কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল সেগুলির অবস্থা বর্ত্তমানে খুবই উন্নত হইয়াছে এবং ইহাদের দ্বারা স্ত্রী-শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতেছে।

রঞ্জন ও ছাপার কাজের ক্লাস

১৯২১ সাল হইতে সমিতি পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে মনোযোগী হন। উক্ত বৎসরেই হুগলী ও হাওড়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে সমিতি আটটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে এই আটটি বিদ্যালয়ের মধ্যে হুগলী জেলার "দেবানন্দপুর বালিকা বিদ্যালয়" এবং হাওড়া জেলার "তাজপুর কুম্ভকার বালিকা বিদ্যালয়ের" কার্য্য স্ব-স্ব পরিচালক সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইতেছে।

১৯২৩ সালে ঢাকা, ফরিদপুর এবং পাবনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ১৪টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অদ্যাবধি পল্লী অঞ্চলে সমিতি কর্ত্তৃক ৫৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যুদ্ধ, অর্থাভাব, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির জন্য গত কয়েক বৎসর হইতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হয় নাই।

পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন করিবার জন্য সমিতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত কর্ম্মী (Organiser) এবং মহিলা-তত্ত্বাবধায়ক আছেন; ইঁহারা নিয়মিত ভাবে প্রত্যেক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। মহিলা-তত্ত্বাবধায়ক প্রত্যেক স্থানে এক সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়া আদর্শ শিক্ষা-প্রণালী, সূচিশিল্প, বয়ন, স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকেন।

এখানে, পল্লী অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা বিশেষ আবশ্যক। যে অঞ্চলে অজ্ঞতা এবং নিরক্ষরতা সমধিক সেই অঞ্চলেই সমিতি বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রণী হন। কোন কোন ক্ষেত্রে সমিতি পুরাতন বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। বালিকাদিগের শিক্ষার প্রতি স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের যাহাতে উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়ে সেই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়গুলি কিছু দিন পরিচালনা করিবার পর সমিতি উহাদের তত্ত্বাবধানের ভার স্থানীয় পরিচালক সমিতির উপর ন্যস্ত করেন। এই সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে অনেকগুলি সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে। এগুলি সরকারী সাহায্য পাইলে সমিতির অর্থ অন্য নূতন বিদ্যালয় স্থাপনে ব্যয়িত হয়। যে সকল অঞ্চলে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই সাধারণতঃ সমিতি সেই সকল অঞ্চলেই বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করেন।

বয়স্কা-শিক্ষা কেন্দ্র

কয়েক বৎসর পল্লী-অঞ্চলে কার্য্যের ফলে সমিতির এই অভিজ্ঞতা জন্মে যে, পল্লীগ্রামসমূহের বয়স্কা নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে স্থায়ী কল্যাণ সম্ভব নহে। এই উদ্দেশ্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহোদয় নারী শিক্ষা সমিতির হস্তে এক লক্ষ টাকা অর্পণ করেন। মাননীয়া লেডী বসুর ইচ্ছা অনুসারে এই অর্থে একটি তহবিল গঠিত হইয়াছে। উহার নাম 'সিষ্টার নিবেদিতা উইমেন্‌স এডুকেশন ফণ্ড'। এই ফণ্ডের সাহায্যে ১৯৩৮ সাল হইতে নারীশিক্ষা সমিতি বয়স্কাদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হইতে সক্ষম হন :

প্রধানতঃ বয়স্কাদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয় :—

১। প্রাথমিক পর্য্যায় পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষা।

২। নানাবিধ কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা।

৩। প্রাথমিক সাহায্য সেবা-শুশ্রূষা, ধাত্রী-বিদ্যা, শিশু-কল্যাণ, প্রভৃতি।

৪। শাকসব্জী উৎপাদন।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত বয়স্কাদিগকে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, দৈনিক খবর ইত্যাদি পড়িয়া শুনানো হয়; দেশের উন্নতির পক্ষে জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধেও অতি সহজভাবে তাঁহাদের সহিত আলোচনা করা হইয়া থাকে। মোট কথা, সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য নিরক্ষর মহিলাদের মনে নানা বিষয়ে কৌতূহল সৃষ্টি করা এবং তাঁহারা যাহাতে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারেন সেজন্য বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা।

বয়স্কাদিগের শিক্ষার জন্য ১৯৩৮ সালের ১লা আগষ্ট ২৪ পরগণা জেলার রাজপুর গ্রামে সমিতি কর্ত্তৃক প্রথম কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৪১ সালে পাবনা জেলার স্থল-সম্হাটী গ্রামে

আর একটি কেন্দ্র খোলা হয় এবং ইহার এক বৎসর পর উক্ত গ্রামেই স্থানীয় শিল্পী সম্প্রদায়ভুক্ত (artisan class) স্ত্রীলোক-দিগের শিক্ষার জন্ত আর একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। প্রায় ঐ সময়েই ঢাকা জেলায় তিনটি গ্রাম (নালী, রূপসা, নীলগ্রাম) লইয়া আর একটি কেন্দ্রে কাজ আরম্ভ করা হয়। ১৯৪৪-৪৫ সালে ঢাকা জেলার বুতানী গ্রামে ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক প্রেরিত হয়। কতকগুলি মুসলমান স্ত্রীলোকও এই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক কেন্দ্রেই সাধারণ জ্ঞান ও শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। উপযুক্ত শিক্ষকও প্রেরিত হইয়াছিল। প্রত্যেক স্থানেই ইহা দেখা গিয়াছে যে, বয়স্কাগণ সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তবে সেলাই, কাটছাঁট এবং দরজীর কাজেই তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল।

হলঘরে ক্লাস লওয়া হইতেছে

ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা—শিশু-কল্যাণ :

বয়স্কাদিগের শিক্ষার জন্ত উপরোক্ত কেন্দ্রসমূহ ব্যতীত প্রধানত: ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্ত নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হয় :

১৯৩৯—ফরিদপুর	জেলার	বিলাখ খান গ্রাম
১৯৪০— ,,	,,	ডোমসার গ্রাম
১৯৪১— ,,	,,	পালং গ্রাম
১৯৪৩—পাবনা	জেলার	স্থল-মহাটা গ্রাম
১৯৪৪-৪৫—ঢাকা	জেলার	নালী-রূপসা গ্রাম।

প্রত্যেক কেন্দ্রের কাজেই স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ, বিশেষত: নারীসমাজ বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ সমিতির কাজের বিশেষ প্রশংসা করেন। সকল সম্প্রদায়ের ও সকল শ্রেণীর নারীগণ সমিতির শিক্ষাকেন্দ্রে এবং মাতৃনিকেতনে সানন্দে যোগদান করিয়াছিলেন। শিক্ষার্থিনীদের বয়স ১৬ হইতে ৬০ পর্য্যন্ত ছিল।

বাণীভবনের ছাত্রীদের খেলাধুলার ভিতর দিয়া শরীরচর্চা

বাংলাদেশ বিভক্ত হইবার পর হইতে সমিতির কর্ম্ম- প্রচেষ্টা, বিশেষত: পূর্ব্ববঙ্গে খুবই বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, এখন পর্য্যন্ত ঢাকা জেলার নালী-রূপসা-নীলগ্রাম এই কয়টি গ্রামের বয়স্কা-শিক্ষা কেন্দ্রে সমিতির অর্থসাহায্যে কাজ চলিতেছে। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সমিতি তাঁহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা বিস্তৃত করিবার জন্ত খুবই চেষ্টা করিতেছেন, এবং ইতিপুর্ব্বেই মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে একটি নূতন কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। এই কেন্দ্রে সাধারণ শিক্ষা ও শিল্প-শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

বিদ্যাসাগর বাণীভবন—কলিকাতা ও ঝাড়গ্রাম

আমাদের দেশে বালিকাদের শিক্ষাদান

বাণীভবনের ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রকার হাতের কাজের নমুনা

ও তাহার প্রসারের পথে প্রধান সমস্যা হইতেছে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব। বাংলাদেশের ১৮০০০ হাজার বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষয়িত্রী ছিলেন ৬০০০-এর কিছু কম; ইঁহাদের সকলের শিক্ষা এবং যোগ্যতাও সমান ছিল না; কেবল ১২০০ জন শিক্ষাদানের সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ছিলেন। সেইজন্য প্রথম হইতেই সমিতি উপলব্ধি করেন যে, বিধবাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া শিক্ষয়িত্রীর কাজে অনায়াসে নিযুক্ত করা যাইতে পারে এবং ইহাদ্বারা তাঁহাদিগকে নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত করা যাইতে পারে; আর ইঁহাদের কার্য্যের ফলে স্ত্রী-শিক্ষা যথেষ্ট প্রসারলাভ করিতে পারে। সকলেই জানেন আমাদের দেশে বিধবাদিগের সংখ্যা কত অধিক; সুতরাং ইঁহাদের মধ্য হইতে শিক্ষয়িত্রীর কাজের জন্য উপযুক্ত বিধবা নির্ব্বাচন করা খুবই সহজ। এই সম্পর্কে আরও একটি কথা এই যে, অল্পবয়স্কা বিধবাগণ বিবাহিতা নারী বা অবিবাহিতা বালিকাগণ অপেক্ষা শিক্ষাদান কার্য্যে অধিকতর উপযুক্ত, কারণ তাঁহাদের অভাবও কম, এবং ঝঞ্ঝাটও বিশেষ নাই। উপরন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অনেক ক্ষেত্রে বিধবাগণ সমাজের বা পরিবারের বোঝাস্বরূপ গণ্য হইয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে সমাজও উপকৃত হইবে এবং তাঁহারাও সম্মানের সহিত জীবিকা অর্জ্জনে সক্ষম হইবেন।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ১৯২২ সালে সমিতি কর্ত্তৃক "বিদ্যাসাগর বাণী ভবন" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভবনের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম সংযুক্ত করিয়া সমিতি তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইয়াছেন তাহা জনসাধারণের হৃদয় বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিবে। বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের ইতিহাসও চমকপ্রদ। ১৯২২ সালে কেবলমাত্র দুই জন বিধবা লইয়া একটি ভাড়াটে বাড়ীতে ইহা প্রথম স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে 'বাণী ভবনের' নিজস্ব সুবৃহৎ গৃহে প্রতি বৎসর সুদুর পল্লী অঞ্চলের ৫০ জনের অধিক বিধবা শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতেছেন।

এই প্রতিষ্ঠানে বিধবাদিগকে বিনা খরচে খাওয়া থাকা ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এখানে ষষ্ঠ মানের শিক্ষণীয় বিষয় পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া নানাবিধ কুটীরশিল্পও শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পল্লী অঞ্চল হইতেই অধিকাংশ বিধবা বাণী ভবনে শিক্ষা লাভ করিতে আসেন এবং শিক্ষা লাভের পর তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ গ্রামেই ফিরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু সমিতি বহুদিন হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন যে, কলিকাতা শহরের আকর্ষণ ও সুখসুবিধার মধ্যে শিক্ষালাভ করিবার পর শিক্ষার্থিনীগণ পল্লী অঞ্চলের আবেষ্টনীতে পূর্ব্বের মত আর নিজেদের খাপ খাওয়াইতে পারেন না। সুতরাং শিক্ষার্থিনীদের পল্লী অঞ্চলের আবহাওয়া ও পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। উদ্দেশ্য সাধু হইলেই উহার সফলতা সহজ হয়। ঝাড়গ্রামের রাজা বাহাদুরের বদান্যতা ও তাঁহার প্রধান কর্ম্ম-সচিব শ্রীদেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের ঐকান্তিক সহায়তায় ১৯৪০ সালে ঝাড়গ্রামে "বিদ্যাসাগর বাণীভবনে"র একটি শাখা স্থাপিত হয়। ইহার জন্য রাজা বাহাদুর ২৫ বিঘা জমি ও দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ঝাড়গ্রামের প্রতিষ্ঠানে চারিটি বিভাগ আছে:

(ক) শাকসব্জী উৎপাদন। (খ) গো-শালা। (গ) শিল্প। (ঘ) রেশম শিল্প।

প্রত্যেক বিভাগই সুপরিচালিত। উৎপন্ন শাকসব্জী, দুগ্ধ প্রভৃতি ভবনের বিধবাগণের আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়। শিল্প বিভাগের দ্রব্যসামগ্রী বাজারে বিক্রীত হয় এবং ইহাদের যথেষ্ট চাহিদা আছে। শিল্প বিভাগের উন্নতিকল্পে ঝাড়গ্রামের রাজা বাহাদুর দুই বৎসরের জন্য লেডী বসুর হস্তে পাঁচ হাজার টাকা অর্পণ করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাক্তার কৈলাসনাথ কাটজু "ঝাড়গ্রাম বিদ্যাসাগর বাণীভবন" পরিদর্শন করেন। তিনি ইহার কার্য্যপ্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন, মহাত্মা

গান্ধী গ্রামের উন্নতির জন্য যে আদর্শ দেশের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন তাহা লেডী বসু কার্য্যত: প্রতিপালন করিয়াছেন।

মেয়েরা চাদর বুনিতেছে

বাণীভবন ট্রেনিং বিদ্যালয়

শিক্ষয়িত্রীরূপে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ১৯৩৫ সালে "জুনিয়র ভার্ণাকুলার ট্রেনিং" শাখা খোলা হয়। দুই বৎসরে এই শিক্ষা সমাপ্ত হয়। সরকারী নিয়মানুযায়ী শিক্ষার্থিনীদিগকে পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষার শেষে তাঁহাদিগকে সরকারের অনুমোদিত বিদ্যালয়ে দুই বৎসর শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে হয়; ইহার পর তাঁহাদিগকে 'ট্রেনিং সার্টিফিকেট' দেওয়া হইয়া থাকে।

মহিলা শিল্পভবন

আমাদের সমাজের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অভাব, অনটন, দারিদ্র্য কত বেশী তাহা সকলেই জানেন মেয়েদের কোন প্রকার শিক্ষা দিবার ইচ্ছা থাকিলেও অর্থের অভাবে অনেকেই তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন না। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলে শিক্ষার ব্যয় বহন করা সহজ হয়। এইরূপ শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ১৯২৭ সালে সমিতি "মহিলা শিল্পভবন" প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধরণের বিদ্যালয় তখনকার কালে সমিতি কর্ত্তৃক প্রথম স্থাপিত হয়।

কাটিং বা দরজির কাজ

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিবাহিতা, অবিবাহিতা ও বিধবা নারীগণ এই প্রতিষ্ঠানে বিনা খরচে নানাবিধ কুটীরশিল্প শিক্ষা করিতে পারেন। শিক্ষা দিবার সময় এমনভাবে নির্দ্ধারিত করা হয় যাহাতে দ্বিপ্রহরে শিক্ষার্থিনীগণ নিজ নিজ গৃহস্থালির কাজকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া এই শিক্ষালাভ করিতে পারেন। নারীশিক্ষা সমিতি শিক্ষার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন; এমন কি শিক্ষাকালীন অবস্থায় যে সকল কাঁচা মাল, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির প্রয়োজন হয় তাহাও বিনামূল্যে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক বৎসর শিক্ষার্থিনীদিগকে লেডী ব্রাবোর্ণ ডিপ্লোমা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হয়। নানাবিধ কুটীরশিল্প, যথা খেলনা প্রস্তুত, বয়ন, সেলাই, রং করা, ছাপার কাজ কাশ্মীরী সূচিশিল্প, মাটির ও চামড়ার কাজ প্রভৃতি হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞানের জন্য চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা পর্য্যন্ত পড়ানো হয়। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীগণ প্রত্যহ নিজ নিজ গৃহ হইতে আসেন।

মহিলা শিল্পভবনে শিক্ষালাভের পর বহু নারী বিভিন্ন বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে শিল্পশিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইঁহাদের সংখ্যা দুই শতের অধিক।

উচ্চতর শিক্ষাদান : বিরাজনন্দিনী ফণ্ড

জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে দরিদ্র ও উপযুক্ত বালিকাদিগকে উচ্চ-শিক্ষা দিবার জন্য লক্ষ্ণৌ নিবাসী ডা: এইচ. এন্. বসু সমিতির হস্তে ৫০,০০০৲ টাকা অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে এই ফণ্ডের নাম হইয়াছে "বিরাজনন্দিনী ফণ্ড"। এই ফণ্ডের আয় হইতে বাণীভবনের এক জন প্রাক্তন ছাত্রীকে আই-এ পর্য্যন্ত পড়ানো হইয়াছে।

সমিতির কার্য্যের ফলাফল

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে সমিতির গত ৩০ বৎসরের কার্য্যের ফলাফল অনেকটা বুঝা যাইবে :

১। পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় :

(ক) ১৯১৯ সালে স্থাপিত— ৩টি—ছাত্রীসংখ্যা ৮২।
(খ) ১৯৪৯ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত পরিচালিত ৬১টি—
(গ) ১৯৪৯ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত— ৯টি ... ৭১৩
(ঘ) স্বাধীনভাবে পরিচালিত ৩৯টি —
(ঙ) বিদ্যালয় বন্ধ হইয়াছে ১৩টি
(চ) অদ্যাবধি শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা— ৭০০০

২। পল্লী অঞ্চলে বয়স্কা শিক্ষাকেন্দ্র :

(ক) ১৯৩৮ সালে স্থাপিত ১টি—ছাত্রী সংখ্যা ৩৬
(খ) ১৯৪৯ সালের মার্চ্চ মাস ৬টি— " ৫২০
(গ) ১৯৪৯ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত— ৩টি— " ৬৪
(ঘ) অদ্যাবধি শিক্ষিত — ৪৫৬

৩। ধাত্রীবিদ্যা ও শিশুকল্যাণ :

(ক) ১৯১৯ সালে স্থাপিত ১টি— ছাত্রী ২০
(খ) ১৯৩৮ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত— ৬ " ৮৮
(গ) ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত শিক্ষিত ৮৮

৪। বিদ্যাসাগর বাণীভবন (বিধবা আশ্রম) :

(ক) ১৯২২ সালে স্থাপিত ছাত্রী—২টি
(খ) ১৯৪৯ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত—ছাত্রী ৩৪
(গ) ১৯৪৯ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভর্ত্তি— ৩১৬
(ঘ) আবেদনকারিণীর সংখ্যা— ৮১৬
(ঙ) অদ্যাবধি শিক্ষিত— ৩৬২

৫। বিদ্যাসাগর বাণীভবন ট্রেনিং বিদ্যালয় :

(ক) ১৯৩৫ সালে স্থাপিত—ছাত্রীসংখ্যা ২২
(খ) ১৯৪৯ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত " ২৪
(গ) ১৯৪৯ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভর্ত্তি— ১৬৭
(ঘ) অদ্যাবধি শিক্ষিত— ১৪৩

৬। মহিলা শিল্পভবন :

(ক) ১৯২৬ সালে স্থাপিত— ছাত্রীসংখ্যা ১৬
(খ) ১৯৪৯ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত " ১২৩
(গ) ১৯৪৯ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভর্ত্তি— ১০২৭
(ঘ) অদ্যাবধি শিক্ষিত ৯০৪

নারী শিক্ষা সমিতির গত ৩০ বৎসরের কার্য্যের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে অনায়াসে বলা যায় যে, বাংলাদেশে জনহিতকর যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে তাহার মধ্যে নারী শিক্ষা সমিতির স্থান অতি উচ্চে। এ কথাও নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, এই সমিতির কার্য্যের ফল সুদূর পল্লী অঞ্চলের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করিয়াছে। বর্ত্তমানে বহু নারী নিজেদের জীবিকা অর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত শিক্ষালাভের প্রতি তাঁহাদের উৎসাহ ও আগ্রহ বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে; ইহা ছাড়া বহু নারী নিজ নিজ সংসারের আয় বাড়াইবার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত শিক্ষা পাইবার জন্য খুবই আগ্রহান্বিতা হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার ফলে নারী শিক্ষা সমিতির কার্য্যের পরিধি খুবই বাড়িয়াছে; কিন্তু প্রধানতঃ অর্থাভাবে সমিতি এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। জাতীয় সরকার ও জনসাধারণ সমিতির কার্য্যে সক্রিয় সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে দেশের যে প্রভূত কল্যাণ হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। যাঁহাদের প্রেরণা ও উৎসাহে নারী শিক্ষা সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল এবং যাঁহাদের কর্ম্মদক্ষতা ও নিষ্ঠায় ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তাঁহারা দেশের জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন।

রোল্যাঁর শিল্পদৃষ্টি

অধ্যাপক শ্রীসুধীর নন্দী
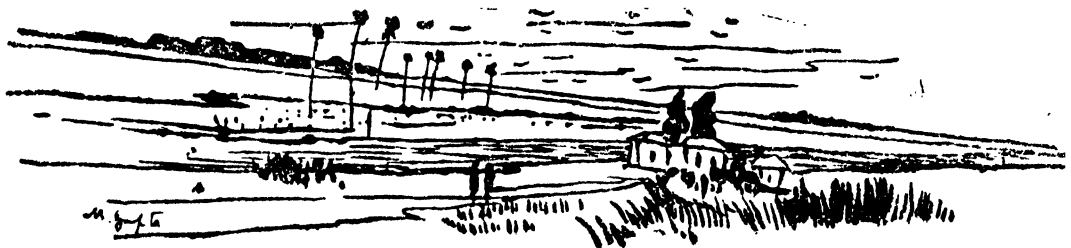
রোল্যাঁ ছিলেন গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের মতই মানব-হিতৈষী। স্বার্থহীন মন নিয়ে তিনি মানুষকে দিতে চেয়েছিলেন নিঃস্বার্থ সেবা। রোল্যাঁর সেবামন্ত্রের দীক্ষা-গুরু ছিলেন ঋষি টলষ্টয়। কোথায় কোন্ মানুষ জীবনের যুদ্ধে হেরে গিয়ে আত্মগোপন করেছে, রোল্যাঁ সেখানে গেছেন সাহস দিতে, শক্তি দিতে; কোথায় কে সবলের ভয়ে অন্যায়ের প্রতিকার চাইল না, সেখানে তিনি গেছেন বরাভয় নিয়ে। নাৎসী শাসনের লৌহভার তাঁর কণ্ঠকে কোন দিন মূক করে দেয় নি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বারবার তাঁর প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছে। আত্মবিস্মৃত দুর্বল মানুষকে ডেকে তিনি বলেছেন, 'যখনি জাগিবে তুমি, তখনি সে পলাইবে ধেয়ে পথ-কুকুরের মত।' আত্মশক্তির উদ্বোধন করতে হবে প্রতিটি মানুষের অন্তরে, নব নব কর্মলোকে মানুষের জয়যাত্রাকে সার্থক করে তুলতে হবে, এই স্বপ্নই দেখেছিলেন তিনি। কর্মের মধ্য দিয়ে শিল্পীর জীবন শিল্পায়িত হয়ে উঠুক, এই ছিল তাঁর কামনা। শিল্পীর ধ্যানে মানুষের কল্যাণ সূচিত হোক্, তার শিল্প-এষণায় সমাজে হোক্ ঐক্যবোধের প্রতিষ্ঠা। সুন্দর এবং শিবের প্রতিষ্ঠাভূমি হ'ল মানুষের এই ঐক্যবোধ। পারস্পরিক মিলনের এই মহাতীর্থ থেকে চিরদিনই অশিব এবং অসুন্দর নির্বাসিত। প্রেমের পথে, ঐক্যের পথে মানুষের কল্যাণ-সাধনের জন্য তপস্যা করেছিলেন ঋষি টলষ্টয়, আর সেই মহাসাধনার উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন মহামতি রোল্যাঁ। তিনি বুঝেছিলেন যে শিল্পীর সৃষ্টি সার্থক হতে পারে না, ঐক্যবোধের যদি অসদ্ভাব ঘটে। স্বার্থ-বিক্ষিপ্ত চিন্তা আর কল্পনা শিল্পীর মানসিক প্রশান্তিকে নষ্ট করে, শিল্পী 'সহৃদয়ে'র সঙ্গে অলক্ষ্য নিগূঢ় যোগসূত্রটি হারিয়ে ফেলে। তার ফলে শিল্পের অপমৃত্যু ঘটে। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্নমুখী মননের মাঝে রসের সেতু সৃষ্টি করে শিল্পী। মানুষের অন্তরশায়ী একাত্মবোধ জাগ্রত হয়, শিল্পীর আনন্দলোকে শিল্পরসিকের প্রবেশলাভ ঘটে।

ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে সাহিত্যের ব্যাকরণগত অর্থ হ'ল 'সহিত' অর্থাৎ নানা উপকরণের মিলনবোধক যে শব্দ তাই সাহিত্য। বিশেষজ্ঞদের মতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে ভাব ব্যক্ত হয়, তা সম্বন্ধ-বিশেষ স্বীকার বা পরিহার নিয়মের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত ও সাধারণগ্রাহ্য। সম্বন্ধ-বিশেষ স্বীকার পরিহার 'নিয়মানধ্যবসায়াৎ সাধারণ্যেন প্রতীতৈরভিব্যক্তঃ'। এই সাধারণ প্রতীতির বলে তখনকার মত সকল পরিমিত প্রমাতৃভাব অপনীত হয় এবং উন্মেষিত হয় অন্য কোন জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্কবিরহিত একটি অপরিমিত ভাব। সকল 'সহৃদয়ে'র মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্য থাকাতে এই ভাব-রসের যথার্থ অনুভূতি ঘটে। শিল্পীর সঙ্গে তার চতুষ্পার্শ্বের মানুষের যদি ভাবগত ঐক্য না থাকে, তা হলে শিল্প সার্থক হয় না, শিল্পীর সাধনা ব্যর্থ হয়, এই কথাই বারবার বলেছেন রোল্যাঁ। আবার এই কথাই অন্য ভাষায় বলেছেন আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা। শিল্প-লোকের এই ভাবগত ঐক্যকে সামাজিক ঐক্যের পর্য্যায়ে নামিয়ে এনেছেন রোল্যাঁ এবং এর পিছনে আছে তাঁর সমাজহিতৈষণা। মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় সর্বমানবীয় ঐক্যে এবং এই ঐক্যের প্রতিষ্ঠার জন্যই রোল্যাঁর জীবনব্যাপী সাধনা। যে শিল্প শ্রেণী-মানসের ছাপ বহন করে, তাঁর কাছে সে শিল্প কোনদিনই মর্যাদা পায় নি। তাই তিনি সমসাময়িক আর্টকে স্বধর্মচ্যুত বলে মনে করতেন। কেবল টলষ্টয় ছিলেন তাঁর কাছে আদর্শ শিল্পী যাঁর ধ্যানে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐকান্তিক যোগের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। টলষ্টয় সর্বমানবিকতার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তাঁর শিল্পে এই স্বপ্নের উজ্জীবন বারবার ঘটেছে। রোল্যাঁ লিখিত টলষ্টয়ের জীবনীতে আমরা পড়ি:

"Yes, the whole of our art is nothing but the expression of a caste, sub-divided from one nation to another, into small opposing groups. There is not one artistic soul in Europe which unites in itself all the parties and races. The most universal in our time was that of Tolstoy. In him we have loved each other, the men of all the countries and all the classes. And anyone who has tasted, as we have done, the powerful joy of this vast love, will never again be satisfied with the fragments of this great human soul which the art of the European coteries offers us."

রোল্যাঁ টলষ্টয়ের সমধর্মী শিল্পীর অন্বেষণ করেছেন সারা জীবন ধরে। কোথায় কোন্ শিল্পীর মধ্যে মানুষের প্রতি ভালবাসা মুখ্য স্থান লাভ করল, তিনি তাঁকেই খুঁজে ফিরেছেন অনন্যচিত্ত হয়ে। যে শিল্প শ্রেণীবিশেষকে আশ্রয় করে শ্রেণী-স্বার্থের কথা বলে, সে শিল্প সত্যধর্মী নয়। যে শিল্প শ্রেণী-বিদ্বেষ প্রচার করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদটাকে বড় করে দেখে, সে শিল্প অপাংক্তেয়। মানুষের কল্যাণ আসে

প্রেমের পথে, মিলনের পথে। তাই সর্বমানবীয় মিলনকে রোলাঁ্যা এত বড় করে দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন যে অবিরোধ ও ভালবাসার পথই হ'ল সার্থক শিল্প-সৃষ্টির পন্থা। তাই রোলাঁ্যা-পরিকল্পিত সর্বজনীন রঙ্গালয়ে (People's Theatre) মানুষের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব-বিরোধের কোন কথা নেই; সেখানে অবিরোধী মানবাত্মার ঐক্যকে মুখ্য করে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক শক্তির নিরন্তর সংগ্রামই হ'ল এই ধরণের রঙ্গালয়ে অভিনীত কাহিনীর প্রধান উপজীব্য। কর্মে এবং বিশ্বাসে মানবপ্রেমের পূর্ণ অভিব্যক্তি রোলাঁ্যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন টলষ্টয়ের মধ্যে। তাই জীবনের এক সন্ধিক্ষণে তিনি টলষ্টয়ের মন্ত্রেই দীক্ষা গ্রহণ করলেন। একদিকে সেক্ষপীয়র এবং বীটোফেন, অন্যদিকে টলষ্টয়। একদিকে শুধু শিল্প-রসিকের নিগূঢ় আনন্দলোকে কর্মহীন বিচরণ, অন্যদিকে শিল্প-সহায় কর্মের ক্ষেত্রে শিল্প-রসিকের আত্মনিবেদন। একদিকে শিল্পোদ্ভূত অকারণ পুলকে অবসর বিনোদন, অন্যদিকে শিল্পী-নির্দেশিত পথে নব নব কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ সাধনের অক্লান্ত প্রয়াস। রোলাঁ্যা চাইলেন কর্মের মধ্য দিয়ে সমাজের কল্যাণ এবং শিল্প হ'ল সমাজ-সেবার অন্যতম বাহন। শ্রম এবং সেবাই শিল্পীর শিল্প-প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে পারে। যে শিল্পী সমাজের সেবা করে না, শুধু সেবা গ্রহণ করে, তার পক্ষে সার্থক শিল্প-সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থপ্রয়াস মাত্র। সমাজ তাকে স্বীকার করবে না। তার শিল্পকে মর্যাদা দেবে না, কারণ সেবাহীন জীবনে শিল্পীর চেষ্টা কোনদিনই ফুল হয়ে ফোটে না—রোলাঁ্যা এ কথা বিশ্বাস করতেন। যে শিল্পী দানের পরিবর্তে গ্রহণটাকেই বড় করে দেখে, সেবাহীন জীবনে অপরের সেবা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করে, তাঁকে রোলাঁ্যা পরভুক্ পরগাছার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সমাজকে কিছু দেবার নৈতিক দায়িত্ববোধটুকুও যার নেই, তার নেবার অধিকারটুকুও রোলাঁ্যা স্বীকার করেন না। এবিষয়ে তিনি পুরোপুরি টলষ্টয়-পন্থী। এক পত্রের উত্তরে টলষ্টয় রোলাঁ্যাকে জানালেন:

> "A person who continues to fulfil his duty of sustaining life by the works of his hands and devotes the hours of his repose and of sleep to thinking and creating in the sphere of intellect, has given proof of his vocation. But one who frees himself from the moral obligations of each individual and under the pretext of his taste for science and art takes to the life of a parasite, would produce nothing but false science and false art."

শিল্পীর জীবনে কায়িক শ্রমকে মর্যাদা দিলেন ঋষি টলষ্টয় এবং ঘোষণা করলেন যে শ্রমই হ'ল শিল্পের প্রাণ। রোলাঁ্যা এই শ্রমকে মানবপ্রীতির সঙ্গে যুক্ত করে এক বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে এর মূল্য বিচার করলেন। শিল্প হ'ল মানুষের শুভ সহায়ক। যে শিল্প মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে, যে শিল্প কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের মিলনকে, সম্প্রীতিকে দৃঢ়তর করে, সেই শিল্পের সাধনা করলেন রোলাঁ্যা, প্রচার করলেন সেই শিল্পের মহিমা।

এখন প্রশ্ন জাগে যে, শিল্পের মর্যাদা কি মানব-সেবা বা বিশ্বসৌভ্রাত্র থেকে অর্জিত? শিল্প কি স্বমহিমায় মহিমান্বিত নয়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আর্টের মূল্যবিচারের প্রশ্ন ওঠে। ক্রোচে, জেন্টিলে প্রমুখ সমালোচকেরা বলবেন, আর্টের মূল্য বিচার করতে বসে আমরা যেন ভুলে না যাই যে বাইরের কোন প্রয়োজন দিয়ে আর্টের ধর্ম নির্ণয় করা যায় না। শিল্প হিসাবেই শিল্পের মূল্য বিচার হবে। আর্ট আমাদের কি কাজে লাগল না লাগল সেটা বড় কথা নয়। জল তোলা বা কাঠ কাটা, দাঁড় টানা বা মাল বহন করার জন্য আর্টের সৃষ্টি হয় নি। আর্ট মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করল কিনা, মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতিসাধন করল কিনা, সে কথা অবান্তর। যদি আমরা শিল্প বা আর্টকে এই ধরণের কাজে লাগাই, তবে আর্টের প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হবে। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে, কোন পরিকল্পনা নিয়ে শিল্পী যদি সৃষ্টি করে, তবে সে সৃষ্টি সত্যধর্মী না হয়ে প্রয়োজন-ধর্মী হয়ে পড়ে। তাতে কাজ হয়ত মেটে, কিন্তু শিল্প-রসিকের প্রাণের দাবি মেটে না। প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মেটাতে হলে আর্টকে স্বধর্ম ত্যাগ করতে হয়। শিল্পী তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। শিল্পের জাত যায়। দার্শনিকপ্রবর হেগেলও ঠিক এই ধরণের মত প্রকাশ করেছেন। শিল্প হ'ল হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন। তাই জোর করে ফরমায়েস মত তাকে বেঁধে আনা যায় না। হঠাৎ লাগা একটুকু ছোঁয়ায়, হঠাৎ শোনা একটুকু কথায় কবি-কল্পনা উদ্দাম হয়ে ওঠে, কবি মনে মনে তাঁর 'ফাল্গুনী' রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি:

> 'শুধু অকারণ পুলকে,
> ক্ষণিকের গান গারে আজি প্রাণ
> ক্ষণিক দিনের আলোকে।'

সামান্য কয়টি কথায় অসামান্যরূপে কবি শিল্পের অন্তরলক্ষ্মীর স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন। অকারণ পুলকেই শিল্পের জন্ম হয়। হঠাৎ দেখা 'স্কাই লার্ক' (চাতক পক্ষী) অমর হয়ে ওঠে কবির অকেজো কল্পনায়। সময়ের বেড়া ডিঙিয়ে আজও আমাদের মনের আকাশে উড়ে বেড়ায় শেলীর 'স্কাই লার্ক।' প্রমিথিউসের আগুনের স্বপ্ন আজও আমরা দেখি। এরা আমাদের কোন কর্ম-

পোতালা রাজপ্রাসাদ, লাসা নগরী
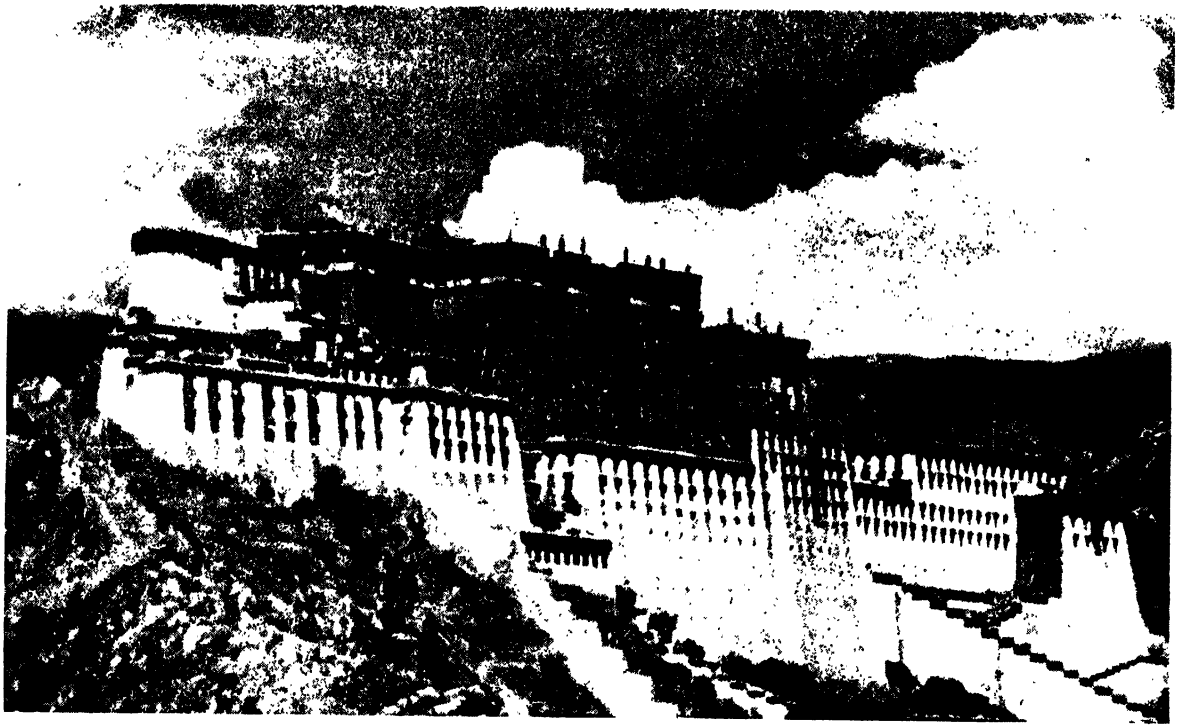
দালাই লামা ও তাঁহার 'রিজেণ্ট' বা প্রতিনিধি

মহিলা শিল্প-ভবন, কলিকাতা

শ্রীনিতাই পাল মৃৎশিল্পের ক্লাস লইতেছেন

উৎসব উপলক্ষে আল্‌পনা আঁকায় রত শিল্প-ভবনের ছাত্রীগণ

প্রেরণায় ত মাতিয়ে তোলে না। বরং আমরা কাজের কথা ভুলি। ইলোরা ও অজন্তার গুহা-মন্দিরে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে বিস্ময়ে মুগ্ধ হতে হয়। কই, কাজের কথা ত মনে পড়ে না। হাজার কাজ ফেলে মানুষ অকাজের পিছনে ছুটে শিল্পের মায়ামৃগকে বাঁধবার আশায়। 'মায়াবন-বিহারিণী হরিণী' ছুটে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে আর তার পিছনে দেশে দেশে কালে কালে কত শিল্পী ছুটেছে—কাজের কথা, প্রয়োজনের কথা তাদের কাছে একেবারেই নিরর্থক হয়ে গেছে।

তবে কি রোলাঁা ভুল বলেছেন? ঠিক যে ধরণের ভুল এক দিন মহাদার্শনিক প্লেটো করেছিলেন আর্টের শ্রেণী-বিশেষকে তাঁর আদর্শ-রিপাব্লিক থেকে নির্বাসিত করে, মহামতি রোলাঁাও অনুরূপ ভুলই করেছেন তাঁর প্রথম জীবনে। ক্ষয়িষ্ণু গ্রীসের মানুষকে নৈতিক অধঃপতন থেকে বাঁচাবার একান্ত আগ্রহে প্লেটো আর্টকে (amusement art) নির্বাসন দিলেন আর রোলাঁা স্বার্থ-কলুষিত মানুষের হৃদয়ে বিশ্ব-সৌভ্রাত্রের সেতু রচনার জন্য আর্টকে কাজে লাগাতে চাইলেন। মানুষ মানুষের জন্য কাজ করুক, মানুষের দুঃখ দূর করুক, মানুষকে ভালবাসুক—এই মহান্ আদর্শ শিল্পীরা আর্টের মাধ্যমে প্রচার করুক, এ কথা রোলাঁা বার বার বলেছেন। এটাই কিন্তু রোলাঁার শেষ কথা নয়। মানবসেবী রোলাঁার পরে আছেন শিল্পী রোলাঁা। এ রোলাঁা টলষ্টয়ের প্রভাবমুক্ত। শাশ্বত শিল্পী-মন কাজ-অকাজের বাধা ঠেলে সুনীতি-দুর্নীতিকে অতিক্রম করে ঘোষণা করল:

"But above all if you were musicians, you would make pure music, music which has no definite meaning, music which has no definite use, save only to give warmth, air and life. (*John Christopher,* Vol. III).

শিল্পের মূল্য কোন বিশেষ প্রয়োজনের মাপকাঠিতে পরিমেয় নয়। শিল্পের অমেয় দান শিল্প-রসিকের অন্তরে রসের প্লাবন আনে। এই অপূর্ব অনির্বচনীয় রসের স্বরূপ নির্ণয়-কল্পে রূপকের ভাষায় ভারতীয় দার্শনিক নিবেদন করেছেন: সমস্ত বিচার, বিতর্ক, উদ্দেশ্য অপসারিত করে ব্রহ্মানন্দ আস্বাদনের সদৃশ অনুভূতির উদ্রেক করে অলৌকিক চমৎকারকারী (ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর) এই রসস্বরূপের আভাস দেয়। "অন্যৎ সর্বমিব তিরোদধৎ ব্রহ্মাস্বাদমিবানু-ভাবয়ন্ অলৌকিক চমৎকারকারী······রসঃ।" রোলাঁার মধ্যে শিল্পরসের এই নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা পাই না সত্য। তবে একথা রোলাঁা বলেছেন যে, সুচারু শিল্পকর্মের ধ্যানে শিল্প-রসিকের মনে যে আনন্দের সঞ্চার হয়, সে আনন্দ যোগজ আনন্দের অনুরূপ। রোলাঁার চোখে স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানলোকে আত্ম-অন্বেষণ আর বীটোফেনের শিল্পময় তন্ময়তা সমধর্মী। বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে রোলাঁা বলেছেন যে, শিল্পীর শিল্পপ্রচেষ্টা যেন যোগজ ধ্যান। যুগে যুগে শিল্পীরা এই ধরণের ধ্যানই করেছেন সার্থক শিল্প-সৃষ্টির প্রয়াসে। বীটোফেনের সুনিবিড় শিল্পচিন্তা আর 'রাজযোগে'র মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য দেখতে পান নি। সে যাই হোক্, এখন আমরা শিল্পের ব্যবহারিক প্রয়োজনের কথা ভাবছি। হয়ত কখনও আমরা জীবনের সঙ্কটময় মুহূর্তে পথের দিশা পাই শিল্পীর কাছে, তাঁর শিল্পবস্তুর কাছে। কিন্তু সেই প্রয়োজনের দিকটাই আর্টের বিচারে মুখ্য নয়। রোলাঁা তাঁর এক বান্ধবীর কথা বলেছেন। এই বান্ধবীটি সেক্সপীয়রের 'ওথেলো' দেখে তাঁর জীবনের এক জটিল নীতিগত সমস্যার সমাধান খুঁজে পান। তাঁর ধূসর জীবনে আবার রঙীন স্বপ্ন সম্ভব হয়—তিনি নূতন করে জীবনকে গড়ে তোলেন। সার্থক শিল্পসৃষ্টি কখনও কখনও এইভাবে মানুষের প্রয়োজন মেটায়। তাই বলে আমরা কেউ 'ওথেলো'কে নীতিমূলক নাটকের পর্যায়ে নিশ্চয়ই স্থান দিব না। সেক্সপীয়র 'ওথেলোর' মধ্য দিয়ে কোন নীতি প্রচারের প্রয়াস পান নি, এ কথাই সমালোচকেরা বলেন। যদি আর্ট কোন দিন এমনি করে মানুষের প্রয়োজন মেটায়, তবে আমরা তাকে বলব আকস্মিক দুর্ঘটনা। আর্ট যেন সুনীল দিগন্তশায়ী প্রভাত-সূর্য। অজস্র কিরণধারায় শিল্পরসিককে অভিষিক্ত করাই আর্টের ধর্ম। আমরা যদি সূর্যালোকে কাপড় শুকাই বা ঐ ধরণের ছোটখাটো কাজ করে ভাবি সূর্যের আলো এই সব কাজের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে, তবে আমরা যে ভুল করব, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আর্টকেও যদি আমরা ছোট-খাটো প্রয়োজনে লাগিয়ে ভাবি যে, এতেই আর্টের সার্থকতা, তবে আমাদের ঐ একই ধরণের ভুল হবে। রোলাঁা আর্টের ধর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন:

"It is like the sun whence it is sprung. The sun is neither moral nor immoral. It is that which is. It lightens the darkness of space. And so does art." (*John Christopher,* Vol. IV).

সূর্যের মত আর্টও যেন স্বর্ণ-আলোর উৎস। এ আলোয় প্রাণ আছে, গান আছে আর আছে আনন্দ। এ আলো প্রাণের অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়ে রসের প্লাবনে ভাসিয়ে দেয় 'সহৃদয়ে'র হৃদয়কে। সেই আলোর একটুখানি কোথায় কি ভাবে পড়ে আমাদের প্রয়ো-জনের কোন দাবিটা হঠাৎ মিটিয়ে দিল সেটা বড় কথা

নয়, সেটা আকস্মিকতা। আবার সূর্যের আলোর গুণ বিচারে সুনীতি-দুর্নীতির কথা যেমন অবান্তর, আর্টের ক্ষেত্রে নীতিগত প্রশ্নও তেমনি নিরর্থক। দেশে দেশে, কালে কালে নীতিশাস্ত্রের মান বদলায়, কিন্তু তাই বলে আর্টকেও তার সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে, এমন ত কোন কথা নেই। আর যদি সেটাই সত্য হ'ত, তবে আর্টের সর্বজনগ্রহণীয়তা (universality) অলীক হয়ে যেত। আজ আর কেউ মেঘদূত পড়ে যক্ষের জন্য দু' ফোঁটা চোখের জলও ফেলত না। হ্যামলেটের অভিনয় দেখে আমাদের প্রাণ কেঁদে উঠত না। সে যুগের রুচি, প্রবৃত্তি, নীতি আজ আর নেই। এ এক নূতন যুগ নূতন জগতের মানুষ আমরা। তবু সে যুগের শিল্প আমরা বুঝি, সে যুগের শিল্প আমাদের আনন্দ দেয়—আর আমরা অভিনন্দিত করি সেই যুগকে সার্থক শিল্প-সৃষ্টির জন্য। রোলাঁ্যা আর্টের এই সার্বভৌম আবেদনকে স্বীকার করতেন। তাই তিনি দিলীপকুমার রায়কে পাশ্চাত্ত্যে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের প্রচারের জন্য বলেছিলেন। শিল্পের আবেদন সর্বত্রগামী। সেখানে পূর্ব নেই, পশ্চিম নেই, সাদা কালোর পার্থক্য নেই। সত্যধর্মী শিল্প মানুষের কাছে কখনই ব্যর্থ হবে না, এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন রোলাঁ্যা। শিল্পীকে তাঁর সর্বস্ব দিতে হবে শিল্পের মধ্য দিয়ে; শিল্পীর যেটুকু ভাল, যেটুকু মহৎ, সেটুকু অকুণ্ঠচিত্তে দান করতে হবে, তবেই তা সাড়া তুলবে লোকের মনে। আজ না হয় কাল, কাল না হয় তারও পরে অনন্ত ভবিষ্যৎ আছে। শিল্পীর সাধনা কখনই ব্যর্থ হবার নয়। অতীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা তাঁদের যা দেবার ছিল তা দিয়েছেন, যা পাওয়ার ছিল তা থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হন নি। তাই রোলাঁ্যা এ যুগের শিল্পীদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন :

"Give what you have to give with both hands. If there is anything of lasting value in your contribution, believe me, it can never altogether miscarry."

এর মর্মার্থ হচ্ছে—তোমার যা দেবার আছে দু'হাতে বিলিয়ে দাও। তোমার সৃষ্টির মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে যার আছে স্থায়ী মূল্য তা হলে বিশ্বাস করো তা কখনো একেবারে ব্যর্থ হবে না।

স্পর্শ

শ্রীকালিদাস রায়

ফুলটি ফুটিলে রূপ দেখি তার, গন্ধও পাই, তবু
নাকে গালে তার পরশ না পেলে তৃপ্তি হয় না কভু
আঁখির অভাব মোচন করিতে সব ইন্দ্রিয় হারে,
গোচরের রাজা স্পর্শই ক্ষতি পূরণ করিতে পারে।
চরণ না ছুঁয়ে প্রণাম করিলে ভক্তিই পড়ে বাদ,
শির না ছুঁইলে আশীর্বাদের হাতে থেকে যায় আধ।
স্বাতীর জলের স্পর্শ না পেলে শুক্তি মুকুতাহারা,
কমল ফুটে না প্রভাত-রবির করের পরশ ছাড়া।
বাংলার মাটি মা-লক্ষ্মীদের চরণ পরশই চায়,
কত না বেদনা দেয় তারে তারা পা মুড়িয়া চামড়ায়।
শিশুর অঙ্গ ধূলিভরা তবু পেয়ে সে স্পর্শসুখ
জুড়াইতে বুক সুবেশ-সুবেশা সকলেই উন্মুখ।
সোনার কাঠির পরশ ভিন্ন জীবন জাগে কি জড়ে ?
বনমানুষের হাড়ের পরশ কুহক সৃজন করে।
দেবতারে পায় রথের কাছিটি পরশি সরল লোকে,
শিশু হাত তুলে চাঁদ ছুঁতে, নয় তৃপ্ত সে দেখে চোখে
শুধু লোহা নয় যা-কিছু কঠোর, যা-কিছু পরুষ ভবে,
স্পর্শ-মাণিক ভরে দেয় তায় হেমময় গৌরবে।
পরশ বাঁচাতে জাতিগর্ব্বীরা দূরে দূরে রাখি জীবে,
ব্রহ্মের সাথে ব্যবধান রচি দূর ক'রে দেয় শিবে।
ব্যবধান রাখি প্রেমবিনিময়,—তত্ত্ব যায় না বুঝা।
অধরে অধর স্পর্শ না হ'লে, প্রেম নয়, তাহা পূজা।

১

যে ঘটনা ঘটবে আগে থাকতেই তার ছায়াপাত হয়, এই রকম একটা প্রবাদ ইংরেজদের মধ্যে চলতি আছে। কিন্তু আসন্ন ঘটনার ছায়াকে উক্ত ঘটনার কারণ বলে মনে করা ঠিক নয়, একটা আর একটার পূর্ব্বে ঘটে মাত্র।

বৈজ্ঞানিকেরা যতই বলুন তবু সবই ইন্দ্রজাল বলে বোধ হয়। যেন কোনো অদৃশ্য যাদুকর আড়ালে বসে সুতো টানছেন, আর তারই টানে টানে কেউ বলছে শান্তি চাই, কেউ বলছে রক্ত চাই, কেউ আরামে বসে চা খাচ্ছে, কেউ হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করছে।

এই ভাবে দেখতে গেলে ঘটনাপরম্পরা পুঞ্জীভূত হয়ে মনকে পিষে মারতে চায়, সুতরাং তত্ত্বকথা বেশি দূরে না টেনে দৃষ্টিকে সুশীল, মাধব আর মিহিরের সঙ্কীর্ণ পরিসরে নিবদ্ধ করা যাক।

সুশীল ওকালতি পাস করেছে সম্প্রতি, মাধব এম-এ পরীক্ষায় ফেল করেছে, মিহির গত এ-এস্‌সি পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণী লাভ করেছে। কিন্তু বুদ্ধিপ্রখরতায় ওদের মধ্যে মিহিরের ব্যক্তিত্বই আর সবার উপরে।

বয়স ওদের কারোই চব্বিশের বেশি নয়, সবাই অল্পবিস্তর ছিটগ্রস্ত, বিষয়বুদ্ধির ছোঁয়াচ লাগে নি কারো মনে, মন এখনও অপরিণত, যদিও কোন বিষয়ে আলোচনা কালে বুদ্ধি ওদের মুহূর্তের মধ্যে বেশ সজাগ হয়ে ওঠে। বহু জনের মতে যে সিনেমা ছবিটি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, টিকিট কিনে সেইটি দেখতে যায় ওরা আমোদ বেশি পাওয়া যাবে বলে, তা নিয়ে হাসা যাবে বলে। বাজার থেকে নিকৃষ্ট বই বেছে বেছে কেনে, আলোচনা এবং উত্তেজনার বিষয়বস্তু পাওয়া যাবে বলে। রেডিও খুলে চীনদেশীয় সঙ্গীত শোনে প্রতিবেশীকে বিভ্রান্ত করবে বলে। প্রবীণেরা বলেন, ওরা বালকই রয়ে গেল, সাবালক হ'ল না।

সন্ধ্যাবেলা। সুশীল বন্ধুদের আগমন অপেক্ষায় তার বৈঠকখানা ঘরটিতে বসে 'লিসেনার' সম্পাদক রিচার্ড ল্যাম্বার্টের লেখা বি-বি-সির আভ্যন্তরীণ অবস্থা সংক্রান্ত এক-খানা বই পড়ছিল। তার এক জায়গায় ইণ্ডিয়ান রোপ ট্রিক বা ভারতীয় দড়ির খেলার কথা বেশ বিস্তারিত করে লেখা আছে। সেই জায়গাটা সে বেশ তদ্গতচিত্ত হয়ে পড়ছিল। করাচী নামক এক জাদুকর ১৯৩৫ সালের ৭ জানুয়ারি তারিখে এক জাতীয় দড়ির খেলা দেখায় এবং তার রহস্যও সে পরে ল্যাম্বার্টের কাছে প্রকাশ করে।

কিন্তু সুশীল এই অধ্যায়টি যতটা আগ্রহের সঙ্গে পড়তে আরম্ভ করেছিল, পড়া শেষ হওয়ার পর কিন্তু তার ততটা আগ্রহ আর রইল না, সে যেন কিছু নিরাশ হয়ে পড়ল। কারণ দড়ির খেলা সম্পর্কে সে এতদিন যে সব কথা শুনে এসেছে, করাচীর খেলা সেরকম নয়। এ বিষয়ে সে বিলেতের বিচারকদের সঙ্গে এক মত হ'ল, কারণ করাচীর দড়ি মাত্র ছ'ফুট উঁচুতে উঠেছিল।

সুশীল এসব পড়ছিল, ভাবছিল এবং বিরক্ত হচ্ছিল, এমন সময় মাধব এসে হাজির। সুশীল তাকে পেয়ে যেন একটা বিরাট নৈরাশ্যের হাত থেকে বেঁচে গেল।

"আচ্ছা বলতে পার লোকে ম্যাজিক দেখে অবাক হয় কেন।"

মাধব তার অভ্যস্ত আসনখানি দখল করে বসল এবং বলল, "লোকে একটু আমোদ উপভোগ করতে চায়, তা যে কোনো উপলক্ষ্যেই হোক না, আপত্তি কি? তা কি বই পড়ছিলে?

"বইখানা ম্যাজিক সংক্রান্ত নয়"—বলে সে তার ভিতরকার ঐ অধ্যায়টি মাধবকে পড়ে শোনাল, এবং বলল, "ম্যাজিকের কৌশলটা তো একটা ধাপ্পা ছাড়া কিছু নয়। হাতের মুঠোয় একটা টাকা ছিল, মুঠো খুলে দেখা গেল টাকাটি নেই—এতে

অবাক হবার কি আছে? যদি জানা থাকে টাকাটা থাকবে না, আর সবাই যদি সেটা আগেই ভেবে নেয় তা হলে আমোদটা কোথায়?"

মাধব হেসে বলল, "আগে ভাববে কেন? যাতে না ভাবতে পারে জাদুকর সেই চেষ্টাই তো করে।"

এমন সময় উক্ত রঙ্গমঞ্চে মিহিরের আবির্ভাব ঘটল, আর সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেরই চোখ আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠল। দু'জনের দ্বন্দ্বে তৃতীয় ব্যক্তির দেখা মিললে দু'জনেই মনে করে তাকে নিজের দিকে টেনে যুক্তির জোর বাড়ানো যাবে।

মিহির একটু বিস্ময়ের সঙ্গে দু'জনের দিকে চেয়ে বলল, "সামনে বই খোলা এবং দু'জনেই সীরিয়স, ব্যাপার কি?"

সুশীল বলল, "জাদুবিদ্যা। বলছিলাম ম্যাজিক জিনিসটা আদিম প্রবৃত্তিকে তুষ্ট করে। যখন লোকে প্রকৃতির সমস্ত ঘটনাতেই অলৌকিকত্ব খুঁজত সেই সময়ের মন এখনও যাদের মধ্যে আছে তারাই ভেলকিতে ভোলে।"

মিহির বলল, "একটু চা খাওয়াবে?"

সুশীল ব্যস্তসমস্তভাবে উঠে গিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করে এলো।

"ভাগ্যিস আদিম লোকেরা চা খেত না, নইলে হয় তো শুনতে হ'ত এটাও আদিম অতএব এতে আনন্দ নেই।" বলে মিহির হাসতে লাগল।

মাধব বলল, "আদিম বল, এডাম বল, বা আদমি বল, এড়াবার উপায় নেই কারণ আমরা সবাই আদিম—একেবারে আদিম আদমি।"

সুশীল বলল, "আমরা আদমি নই, মানুষ।"

মিহির বলল, "তুমি একটি অমানুষ।"

সুশীল বলল, "মানুষ বলেই চট করে অমানুষ হতে পারি, কিন্তু আদমি তা পারে না, অনাদমি হওয়া কঠিন।"

"কিন্তু তোমার জাদুবিদ্যার কথা বল—বৈঠকখানা ঘরকে জাদুঘরে পরিণত করলে কেন দেখা যাক।"

সুশীল বলল, "আমার মতে ভেলকি জিনিসটি হাত সাফাইয়ের ব্যাপার, ওটা আর্টের পর্য্যায়ে পড়ে না। ওতে পরিণত মন ভোলে না, ছোটদের মন ভোলে, এই কথাটাই মাধবকে বোঝাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ওকে ভোলাতে পারছি না, এখন তোমার মতটা জানতে পারলেই একটা মীমাংসা হয়ে যায়।"

মিহির বলল, "চিন্তাশক্তিকে পোলারাইজ করে বসে আছ দেখছি। চারদিকে ছড়ানো আলোকরশ্মিকে নিয়ন্ত্রিত করে এমন করা যায় যাতে সে শুধু নিয়ন্ত্রকের খুশীমত এক দিকে ছড়াবে। চিন্তাকেও সেই রকম নিয়ন্ত্রণ করার দরকার অবশ্য মাঝে মাঝে হয়, কিন্তু তর্কের সময় নয়। তর্কের সময় বিষয়-বস্তুর চারদিকে চিন্তাটাকে বিকিরণ কর, দেখবে তুমি যা দেখছ তার চেয়ে আরও বেশি দেখা যায়।"

সুশীল কিঞ্চিৎ অসহায়ের মত মিহিরের দিকে চেয়ে বলল, "বুঝলাম না কথাটা।"

"না বোঝার কিছু নেই, সোজা কথা। অর্থাৎ যা কিছুতে মন ভোলে তা সবই জাদু। ভিতরের কৌশলটা জানলেই কি তার মাধুর্য্য কমে? তোমার এই আদমিকেও তো বৈজ্ঞানিক আদমি টুকরো টুকরো করে দেখেছে, সবই কতকগুলো রাসায়নিকের যোগাযোগ। জাদুকরের জাদু ফাঁস হয়ে গেছে অনেক কাল, কিন্তু—কি বল মাধব—মানুষের রহস্য কিছু কমেছে কি?"

মাধব কিছুটা রোমান্টিক ধর্ম্মী, সে ইতিমধ্যেই তার কোনো প্রিয়জনকে কল্পনার চোখে রহস্যাবৃত করে দেখতে সুরু করেছিল, মিহিরের প্রশ্নে চমকে উঠে বলল, "আমিও তো তাই বলি—নইলে তোমার দা ভিঞ্চি, মিশেল-আঁজ, রাফায়েল এত পূজো পেতেন কি করে?"

মিহির বলল, "তাঁরা তো তুলিতে এঁকেছেন মানুষকে, আমরা মনে মনে এঁকে চলেছি সর্ব্বক্ষণ"—

মাধব চমকে উঠে ভাবল, টের পেয়েছে না কি মিহির তার মনের কথা?

মিহির বলতে লাগল, "আসল কথা কি জান? এই যে তোমার টেবিলে—কি বইখানা পড়ে আছে?—এ-রি-য়ে-ল অ্যা-ও হি-জ কো-য়া-লি-টি—কি বিষয়ের বই এটা?—এর প্রথমেই দেখছি টেম্পেষ্ট থেকে উদ্ধৃতি—

"All hail, Great Master, grave Sir, hail : I come
To answer thy best pleasure"…

আশ্চর্য্য নয় কি এই এরিয়েল? এই কথাগুলো? সেক্সপীয়ার কি জাদুকর নন? যে শব্দগুলো ব্যবহার করে তিনি তাঁর নাট্যজগৎ সৃষ্টি করে গেছেন সে শব্দগুলো কি অভিধানে মেলে না? সেগুলো তুমি সাজাও না নিজের ইচ্ছামত—হও না দ্বিতীয় সেক্সপীয়ার? বাংলা শব্দকোষ নিয়ে বসে, হও না দ্বিতীয় রবি ঠাকুর?"

সুশীল বলল, "তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ—কোথায় ম্যাজিক আর কোথায় সাহিত্য!"

মিহির সন্তাগত চায়ের দিকে চেয়ে বলল, "দাঁড়াও আগে চা খেয়ে নি।"

চা খাওয়ার পরে মিহির এমন এক বক্তৃতা দিল যাতে সুশীলের আর কিছু বলবার রইল না। সে বুঝতে পারল বিশুদ্ধ উপভোগের ক্ষেত্র বিস্তৃত, সবারই মূল উদ্দেশ্য মন ভোলানো, তবে এটুকু স্বীকার্য্য যে জাদুবিদ্যা নিম্নশ্রেণীর আর্ট। আরও বুঝল ম্যাজিক দেখার সময় কৌশল টের পাওয়াটা বড় কথা নয়, জাদুকর তার সাহায্যে কতখানি মন ভোলাতে পারল সেটাই বড় কথা।

ঘরের মধ্যেকার আবহাওয়াটা একটু উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, এতক্ষণে সেটা কেবল একটুখানি স্বাভাবিক হয়ে আসছিল, এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল।

ওদের আর এক বন্ধু, উপেন, বেশি রকম উত্তেজিত ভাবে এসে বলল, "এখনও ঘরে বসে আছ তোমরা?"

"কেন, হঠাৎ উঠে যাবার কি ঘটেছে?" প্রশ্ন করল মাধব।

"অমর সিং এসেছে কলকাতায়!"

"অমর সিং?"—সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। "বল কি? কবে এসেছে?"

"বিশেষ সংখ্যা কাগজ বেরিয়ে গেছে এই খবর নিয়ে—পড়ে দেখ।"

সবাই উপেনের হাতের কাগজ খুলে মস্ত বড় বড় অক্ষরের মোটা শিরোনামা পড়ল—"কলিকাতায় বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর অমর সিং।"

"দেখতে হবে এই অমর সিং-এর খেলা।" বলল মিহির।

"আমিও দেখব।" বলল মাধব।

"আমিই কি বাদ যাব?" বলল সুশীল।

বলা বাহুল্য এর পর আর কোনও আলাপ জমল না। এত বড় একটা উত্তেজক খবর, একেবারে অভাব্য, অচিন্ত্য খবর। সুতরাং শহরের বিরাট মানবস্রোতের সঙ্গে এদের চিন্তাস্রোত অমর সিং-এর দিকে প্রবলবেগে ধাবিত হয়ে চলল।

২

পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করে উত্তর-দক্ষিণ পূব-পশ্চিম সকল দিকের জাদুকরকে পরাজিত করে এক জাহাজ মেডেল ও অজস্র পারিতোষিক নিয়ে অমর সিং এসেছেন কলকাতা শহরে। বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর উদ্যা এবং হুডীনির প্রধান শিষ্যেরা অমর সিং-এর কাছে হার মেনেছেন, ভারতবর্ষের এটা জাতীয় গৌরব।

এত দিন সবার জানা ছিল হাতকড়া লাগানো অবস্থায় বাক্সবন্দী জাদুকরের বাক্স থেকে অনায়াস নির্গমনই হচ্ছে জাদুবিদ্যার চরম খেলা। যেমন খুশী, যেখানে খুশী, দর্শকদের নিজ হাতে তৈরি সিন্দুকে তালার পর তালা লাগিয়ে যেখানে ইচ্ছা বন্ধ করে রাখা হউক না, সেই বন্ধন এবং বন্দিত্ব মুহূর্ত্তে ঘুচিয়ে জাদুকর বেরিয়ে এসে দর্শকদের সঙ্গে কোলাকুলি করেন—এর চেয়ে বড় কৌশল আর নেই। কিন্তু অমর সিং এ কৌশলকে ছাড়িয়ে বহু উর্দ্ধে উঠে গেছেন। অর্থাৎ তিনি বেরিয়ে আসেন না, আবির্ভূত হন না, অদৃশ্য হন। রাত্রের কাল যবনিকার সম্মুখে দর্শকদের দিকে কড়া আলো ফেলে অদৃশ্য হওয়ার যে খেলা সবাই জানে অমর সিং-এর খেলা সে খেলা নয়। তিনি প্রকাশ্য দিবালোকে লোকবেষ্টনীর কড়া পাহারার মধ্যে সবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অদৃশ্য হন।

এ খেলার বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে চোখে ধুলো দেওয়া নেই। শিবাজীর অদৃশ্য হওয়া, সুভাষ বসুর অদৃশ্য হওয়া, অথবা লায়েক আলির অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে এর তুলনা চলে না। এ একেবারে অলোকিক। অতএব লৌকিক আকর্ষণ যে এর সবচেয়ে বেশি হবে সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

৩

রেখাচিত্রে সূর্য্যোদয়ের ছবি আঁকবার একটা পরিচিত প্রথা আছে। একটি দিগন্ত ব্যাপক রেখা, তার সঙ্গে সংলগ্ন একটি

অর্দ্ধবৃত্ত, এবং সেই অর্দ্ধবৃত্ত থেকে বিচ্ছুরিত অনেকগুলি সরল-রেখা সূর্য্যরশ্মির পরিচয় বহন করে।

গত এক সপ্তাহ ধরে কলকাতা শহরের একটি বিশেষ অংশে এই রকম একটি সূর্য্যোদয়ের বৃহৎ রেখাচিত্র বিমান-ভ্রমণকারীরা আকাশ থেকে দেখতে পাচ্ছে।

বিষয়টিতে রহস্য কিছুই নেই। ঐ অর্দ্ধবৃত্ত হচ্ছে অমর সিং-এর প্রকাণ্ড প্যাভিলিয়ন, আর রশ্মিরেখাগুলি সাতটি বিভিন্ন 'কিউ'-এর রেখা।

প্রথম দু'দিন খেলা দেখানো সম্ভব হয় নি, শহরের যাবতীয় লোক একসঙ্গে গিয়ে ভেঙে পড়েছিল সেখানে, অনেকের হাড়ও ভেঙেছিল, অবশেষে সেনাবিভাগের সাহায্যে ভিড় নিয়ন্ত্রিত করে, সাতটি বিভিন্ন 'কিউ' রচনা করে তবে দেখানো সম্ভব হয়েছে। বৃদ্ধ পুরুষ, বৃদ্ধা মহিলা, যুবক পুরুষ, যুবতী মহিলা, বালক, বালিকা, এবং খোকা ও খুকীর (এটি সম্মিলিত) পৃথক গেট এবং 'কিউ' করাতে এবং সমস্ত আসনের নম্বর করে দেওয়াতে সবার পক্ষেই খুব সুবিধাজনক হয়েছে। প্রত্যেক গেট-মুখ পর্য্যন্ত যে এক একটি লাইন দাঁড়িয়েছে তার পিছনের দৈর্ঘ্য সীমাহীন।

বহু লোক মনুমেণ্টের মাথায় উঠে এই দৃশ্য দেখছে, কারণ এরও একটি আশ্চর্য্য শোভা আছে। তা ভিন্ন প্রত্যেক দুটি কিউ-এর মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটি করে সাঁজোয়া গাড়ী স্থাপিত হওয়াতে দৃশ্যটি সুন্দরতর হয়ে উঠেছে।

সাত দিনের চেষ্টার ফলে সুশীল, মাধব এবং মিহির বসতে পেরেছে ভিতরে গিয়ে। বহু রকমের খেলা, বিচিত্র সব ভেলকি, একটার পর একটা দেখানো হচ্ছে। কত ঘড়ি চূর্ণ হয়ে আবার নূতন হ'ল, কত পায়রা বেরিয়ে উড়ে গেল একটা টুপীর মধ্যে থেকে, কত তাসের খেলা, টাকার খেলা, ভূতের খেলা, কিন্তু তবু সেগুলো যেন দর্শকদের মনে ধরছে না। এরা শুধু দেখতে চায় সকল খেলার সেরা খেলা—অমর সিং-এর অন্তর্দ্ধান।

সেই খেলা অবশেষে দেখানো হ'ল। কঠিন দর্শক-প্রাচীর-বেষ্টিত অমর সিং প্রথমত ভারতীয় তান্ত্রিক সাধনা, হঠযোগ এবং বহু প্রকার কৃচ্ছ্রযোগের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে ছোট্ট একটি বক্তৃতা দিলেন এবং বললেন, "এবারে আসি?"

সবাই চমকিত বিস্মিত স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে দেখে অমর সিং নেই!

দীর্ঘস্থায়ী করতালিতে চন্দ্রাতপের নিচে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ পরিবেশ! হঠাৎ দেখা গেল অমর সিং দাঁড়িয়ে আছেন প্রধান অতিথি রাষ্ট্রপালের পাশে।—বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়! আবার করতালি ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল।

রাষ্ট্রপাল উঠে দাঁড়িয়ে জাদুকরকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে বললেন, "আজকের পৃথিবীতে অমর সিং-এর মত ঐন্দ্রজালিক আর কেউ নেই।"

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হতে না হতে এক স্থূলকায় ব্যক্তি বলে উঠলেন "জুড়ি আছে। সেই জুড়ির কাছে অমর সিং শিশু।"

দর্শকেরা এ কথা শুনে প্রায় ক্ষেপে গেল, বলল, "হতে পারে না—ও রকম অসম্ভব কথা আমরা শুনতে চাই না।" এই চীৎকারের মধ্যে সুশীল, মাধব, মিহির এবং উপেনের কণ্ঠও শোনা গেল।

স্থূলকায় বললেন, "সত্য কথা বলছি।"

গণ্ডগোলের সম্ভাবনা দেখে রাষ্ট্রপাল দ্রুত চলে গেলেন সেখান থেকে। জনতা স্থূলকায়কে চ্যালেঞ্জ করে বলল, "নিয়ে আসুন আপনার জাদুকরকে।"

স্থূলকায় বললেন, "তাঁর মঞ্চ এখানে নয়, উত্তর-প্রদেশে, সেখানে গিয়ে দেখতে হবে তাঁর খেলা।"

তখন স্থূলকায়ের পরিচয় নেওয়া হ'ল, এবং সবাই বুঝতে পারল, একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তিনি, তাঁর কথা অবিশ্বাস করা যায় না।

হৈ হৈ পড়ে গেল সভাস্থলে। সে কি উত্তেজনা! কি উৎসাহ! সঙ্গে সঙ্গে কমিটি গঠন করা হয়ে গেল এবং ঠিক হ'ল, স্বয়ং অমর সিং সেখানে গিয়ে সেই খেলা দেখবেন এবং তিনি নিজে যদি স্বীকার করেন সে খেলা তাঁর খেলার চেয়েও চমকপ্রদ তা হলে সে কথা মানা হবে, অন্যথায় হবে না।

কিন্তু অমর সিং-এর মুখে একটি কথা নেই। অমর সিং কিছু না বললে চ্যালেঞ্জ করার কোনো মানে হয় না। বহু সাধ্যসাধনা করে শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে রাজি করানো হ'ল। সুশীল, মাধব, মিহির বলল, "আমরাও যাব আপনার সঙ্গে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এর মধ্যে কোথায়ও ফাঁকি আছে, কিন্তু সেটা কি তা না দেখা পর্য্যন্ত বলা শক্ত।"

স্থূলকায় ব্যক্তিটি সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করে ফেললেন

এবং ঠিক হ'ল উত্তর-প্রদেশের প্রদেশপাল স্বয়ং খেলায় উপস্থিত থাকবেন।

কিন্তু সে খেলার কথা যা শোনা গেল তা সত্যই অবিশ্বাস্য। কিন্তু যদি সত্য হয়, তা হলে অমর সিং-এর ভাগ্যে কি হবে তা অনুমান করে সবাই শিউরে উঠল। শোনা গেল প্রকাণ্ড একটি পাহাড় সবার সম্মুখে উড়িয়ে দেওয়া হবে। কথার ফাঁকি নেই এর মধ্যে, কেউ হয় তো মনে করতে পারে পাহাড় তো ডাইনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় অথবা এটম বোমায়, কিন্তু ব্যাপার তা নয়। পাহাড়ের চারদিকে যত ইচ্ছা লোক থাকতে পারে, পুলিস থাকতে পারে, সৈন্যদল থাকতে পারে, কিন্তু তবু প্রকাশ্য সূর্য্যালোকে দৃশ্য পাহাড় কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে সবার চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

সুশীল মিহিরকে বলল, "ভাবতে পারছ কিছু?"

মিহির বলল, "কৌশলটা আমার কাছে অবান্তর, আমার কাছে এ রকম একটি ঘটনাই হচ্ছে বড় কথা। কি করে হয় জানতে চাই না, বুঝতেও চাই না, আমি শুধু উপভোগ করতে চাই।"

মাধব বলল, "আমি আর্টের জন্যেই আর্ট কথাটা ষোল আনা মানি না, তাই ওর কৌশলও খুঁজি, উদ্দেশ্যও খুঁজি।—সব আমি তলিয়ে বুঝতে চাই।"

সুশীল বলল, "তোমরা সবাই মিলে যা চাও আমিও তাই চাই।"

দিন ঠিক হয়ে গেল। কলকাতা থেকে অমর সিং-এর সঙ্গে বিমানে গেল পঞ্চাশ জন বিচারক। তার মধ্যে মিহির, সুশীল ও মাধব। পরে দেখা গেল উপেনও তার মধ্যে স্থান পেয়েছে কোনোমতে।

রেলগাড়িতে যে কত লোক গেল তার সংখ্যা নেই। তারা সবাই যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছল উত্তর-প্রদেশে। সব আয়োজন আগে থাকতেই পাকা করা ছিল।

বিপুল জনতা, বিপুল উল্লাস, বিপুল উত্তেজনা। একটি দিন ধরে কি যে হয়ে গেল তা প্রকাশের ভাষা নেই।

৪

খেলা দেখানো শেষ হয়েছে। নিশ্বাস রোধ করে সবাই সকল ভেলকির চরম ভেলকি দেখেছে। কিন্তু কলকাতার উৎসাহীদের চোখে সকল আলো নিবে গেছে, তাদের সকল আশা ভেঙে গেছে, সকল উৎসাহ জল হয়ে গেছে, রক্তের চাপ কমে গেছে, দাঁত বসে গেছে, কণ্ঠ নীরব হয়ে গেছে, মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে গেছে, হাঁটুর অস্থিবন্ধনী ঢিলে হয়ে গেছে, কটিদেশ বেদনায় টনটন করছে, কপালের শিরা দপ দপ করছে, পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে গেছে।

আর অমর সিং? তাঁর অবস্থা অবর্ণনীয়। এ সমস্তই তাঁর হয়েছে, তাঁর অবস্থা সবচেয়ে সঙ্কটজনক। এম্বুল্যান্সে করে তাঁকে হাঁসপাতালে আনা হয়েছে, হাত-পা ঠাণ্ডা—গরম সেঁক দিচ্ছে নার্সরা, উত্তেজক ইন্‌জেকশন দিচ্ছে ডাক্তাররা,

উপরন্তু পেটে কিছুই থাকছে না বলে শিরার ভিতর গ্লুকোসের জল ঢোকানো হচ্ছে।

দীর্ঘ সাত দিন কাটল এই ভাবে। ম্যাজিক বিষয়ে সকল তত্ত্বকথা ওদের মনে ওলোটপালট হয়ে গেছে। সবারই মুখ ঝুলে পড়েছে, সবাই নির্ব্বাক, শুধু বসে বসে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকানো।

দিন তিনেক পরে একে একে সবাই কলকাতা ফিরতে লাগল। অমর সিং বিমানে ফিরলেন, ফিরল না শুধু সুশীল, মাধব আর মিহির।

কলকাতায় যারা ফিরে এলো, তাদের আর কাউকে কিছু বলতে হ'ল না, খবর আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। তা ছাড়া বলবার কিছু ছিল না।

সেখানে যে খেলাটি সবাই দেখল সেটি হচ্ছে এই যে পাহাড়টি ঠিক পাথরের পাহাড় ছিল না, দশ লক্ষ মণ চিনির বস্তার পাহাড়।

সরকারের লোক সেখানে উপস্থিত ছিল, পুলিস ছিল, সেনাদল ছিল, স্বয়ং প্রদেশপাল ছিলেন, সরকারী খাতায় চিনির হিসাব ছিল, তাতে লেখা ছিল সাত লক্ষ মণ চিনি উদ্বৃত্ত আছে। কিন্তু যাদুদণ্ডের ছোঁয়া লেগে সবার সামনে চিনির পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল, পড়ে রইল নিচের স্তরের বস্তাগুলি, এবং হিসাব করে দেখা গেল সাড়ে ন'লক্ষ মণ ঘাটতি পড়েছে।

কি করে এটি সম্ভব হ'ল তা সরকারী বুদ্ধি, বে-সরকারী বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, অবৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অগম্য। স্বয়ং অমর সিং-এর জাদু-কৌশল পরাহত।

সুশীলরা পড়ে রইল উত্তর-প্রদেশে একটি প্রশ্নের উত্তর তাদের চাই-ই, নইলে তারা ফিরবে না পণ করল।

ওরা তিন বন্ধু জাদুকরের পদধূলি নিতে লাগল প্রতিদিন। কিন্তু তবু প্রশ্নের উত্তর মিলল না। মিহিরের মুখে একমাত্র প্রশ্ন, এত বড় পাহাড় গেল কোথায়।

অবশেষে জাদুকর ওদের অবস্থা দেখে করুণাভরে বললেন "সিঙ্গাপুর"।

"বন্দে মাতরম্"—"জনগণমন অধিনায়ক"

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

'বন্দে মাতরম্' এবং 'জনগণমন অধিনায়ক' গান দুটি সম্বন্ধে যার যে ধারণা থাক, একটি কথা বিশেষ করে জানা থাকা চাই, এ ছোট বড় পরিমাপের বাটখারা চাপানোর জিনিষ নয়; রবীন্দ্রনাথ নিজে কোনোদিনই 'জনগণ' বা 'বন্দে মাতরম্' নিয়ে তারতম্যের ধারণা পোষণ করেন নি। তাঁর স্বভাবোচিত দৃষ্টিতে তিনি সব বিষয়কে যথোচিত মর্যাদাতেই দেখতে চেয়েছেন এবং বিশেষ করে 'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে তিনি যে কথা বলে রেখেছেন, 'বন্দে মাতরম্'-এর মহৎ প্রেরণাকে উত্তুঙ্গ করে অত বড় ধারণা জাগানো বিস্ময়ের বিষয়। বন্দে মাতরম্ প্রসঙ্গে 'জনগণে'র চয়িতা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাংলাদেশের চিত্ত সর্বকালে সর্বদেশে প্রচারিত হোক, বাংলা দেশের বাণী সর্বজাতি সর্বমানবের বাণী হোক। আমাদের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনামন্ত্র নয়—এ হচ্ছে বিশ্বমাতার বন্দনা—সেই বন্দনা গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে।" (চিঠিপত্র ২য় খণ্ড)

এ রকম অনেক কথা আরো কয়েকবারই তিনি বলেছেন। আবার, বন্দে মাতরম্-এর গভীরতা যাদের কাছে কেবল বাহ্যিক উচ্ছ্বাসমাত্রেই পর্যবসিত হয়েছে, তাদের চাপল্যকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি।

দেশের নারীদের প্রতি তাঁর ভাষণে বন্দে মাতরম্-এর স্নিগ্ধোজ্জ্বল শক্তি ও শুচিতা বহুপূর্ব থেকেই প্রকাশ পেয়ে এসেছে; সেখানে তিনি আবেগভরে বলছেন, "দেশের হৃদয়নিকেতনের অধিষ্ঠাত্রী, তোমরা দেশের নবপ্রভাতের আরম্ভে শঙ্খধ্বনি করিয়া দেশের পুরুষযাত্রীদিগকে বলো, তোমাদের যাত্রা সার্থক হউক, তোমাদের কল্যাণ হউক, তোমাদের জয় হউক, তোমাদের যাত্রাপথে আমরা পুষ্পবর্ষণ করি। বাতায়নতলে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেশের পুরুষকণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলো—বন্দে মাতরম্।"

বন্দে মাতরম্ দেশের সর্বশ্রেণীতে না হোক একটা বড় অংশে মিলন ঘটিয়ে তুলছিল, তার সূচনাকালেই তিনি বন্দে মাতরম্ এর জন্য গর্ববোধ করে লিখেছিলেন, "সেইজন্য আমি বিবেচনা করি, অদ্যাকার বাংলা ভাষার দল যদি গদিটা দখল করিয়া বসে, তবে আর সকলকে সেটুকু স্বীকার করিয়া যাইতে হইবে—মনে রাখিতে হইবে, এই মিলনোৎসবের 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্রটি বঙ্গসাহিত্যেরই দান।"

ঐতিহাসিক কালানুক্রমিকতায় "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত 'জনগণ' সঙ্গীতের পূর্ববর্তী। তার প্রেরণাও স্বভাবতঃই "জনগণের" পটভূমিকায় দেশের মধ্যে ক্রিয়াশীল। সময়ের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে "বন্দে মাতরম্"-এর প্রবুদ্ধতার স্বাভাবিক পরিস্ফূর্তি ঘটেছে "জনগণ" সঙ্গীতে। এই সঙ্গীতটি বিশেষ দেশের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ থেকেও বিশ্বমানবের প্রেরণা বহন করছে। এমন একটি মহাসঙ্গীত যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে রচিত হয়, তার ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

"জনগণ" গানের প্রথম অনুচ্ছেদটিতে দেশ-পরিচয়, তৃতীয় ও চতুর্থটিতে ধর্ম বা বিধাতৃশক্তির পিতৃমাতৃ দ্বৈতরূপ পরিচয় এবং সর্বশেষ অনুচ্ছেদটিতে আছে মহাশক্তিকে সমগ্রভাবে বন্দনা। এই মহাশক্তি যে জনগণের মধ্য দিয়ে নিয়ত প্রকাশমান, প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের শেষেই বিশেষভাবে সেই জনগণের উল্লেখ করে বিধাতৃশক্তির জয়ধ্বনি উদীরিত।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার সে যুগে দেশের মধ্যে একটি যে বড় ঘটনা তাঁর কবিমানসকে উদ্বোধিত করে তুলেছিল সে হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। এই ঘটনা কবিকে এত গভীরভাবে আবিষ্ট করেছিল যে, শুধু বিশ্বজনীন ভাবাবেগের অভিব্যক্তিতেই তা কাব্যে গানে রূপায়িত হয় নি, এর থেকেই কবির মনে জেগেছিল স্বাধীন এক "বিশ্ববঙ্গ" মানবসমাজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ও পরিকল্পনা। ১৯০০ থেকে ১৯১২ সন—এই সময়কার নানা রচনার মধ্যে এই মহাভাবের বিকাশধারা লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশ থেকেই ভারতে জাতীয়তার প্রসার ঘটে। সে সময়ে বিশ্বের ঘটনা-সংঘাতে এবং দেশের পরাধীনতার চাপে শিক্ষিত শ্রেণী জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হয়। কবি ১৩০৮ সনে 'নেশন কী' প্রবন্ধে একজাতিত্বের মূলসূত্রটি বিশ্লেষণ করেন।

মানুষের সম্মিলিত চেতনাই নেশনের ভিত্তি, সুতরাং মানুষই জাতির মুখ্যবস্তু। সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ, ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প বাণিজ্য—সকলেরই সার্থকতা মানুষের মিলনের ক্ষেত্র সৃষ্টির সহায়তায়। এই মূল চিন্তাসূত্রেরই অভিব্যক্তি ঘটেছে সমগ্র রবীন্দ্র-রচনায়।—এর থেকেই "জনগণে"রও সৃষ্টি।

কবির দৃষ্টিতে, ভারতের জাতীয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে, মানুষের মিলন। পাশ্চাত্য জগতের নেশনের স্থান নিয়েছে এখানে, রাষ্ট্রতন্ত্রের স্বার্থবোধচালিত মানব-সংঘ নয়, হৃদ্যতা ও ধর্মবোধ যোগে মিলনোন্মুখ সমাজ।

তারপর অতীত থেকে বর্তমানের পটে কবির দৃষ্টি ফিরে তখন তাঁর ভাষণে দেখা দিয়েছে মানুষের কল্যাণ কল্পে আদর্শ

সমাজ গঠনের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। বরাবরই কবির জনকল্যাণ চেষ্টা আত্মনির্ভরতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পরিকল্পনার পূর্বে "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে (১৩১১) তিনি বলে নিয়েছেন, "আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, রাজা আমাদিগকে মাঝে মাঝে লগুড়াঘাতে তাঁহার সিংহদ্বার হইতে খেদাইতেছেন বলিয়াই যে অগত্যা আত্মনির্ভরকে শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি, কোনোদিনই আমি এরূপ দুর্লভ দ্রাক্ষাগুচ্ছ লুব্ধ হতভাগ্য শৃগালের সান্ত্বনাকে আশ্রয় করি নাই। আমি এই কথাই বলি, পরের প্রসাদ ভিক্ষাই যথার্থ 'পেসিমিষ্ট' আশাহীন দীনের লক্ষণ।

মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। আমরা যে-কোনো মানুষের যথার্থ সংস্রবে আসি, তাহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বসি। এইজন্য কোনো অবস্থায় মানুষকে আমরা আমাদের কার্যসাধনের কল বা কলের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহার ভালোমন্দ দুই দিকই থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের দেশীয়, এমন কি তদপেক্ষাও বড়ো, ইহা প্রাচ্য।"

"ঐক্যসাধনাই ভারতবর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাজ। ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দূরে রাখিবার পক্ষে নহে, ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার, বিরাট একের মধ্যে সকলেরই স্ব-স্ব প্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার পন্থা এই বিবাদনিরত ব্যবধানসংকুল পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দেশ করিয়া দিবে।"

ভারতবর্ষকে এই সুমহৎ কাজের যোগ্য হতে হলে তার নিজের ক্ষুদ্রতা, দুর্বলতা দূর করে আগে স্বাধীন, সবল, আত্মপ্রতিষ্ঠ মনুষ্য সমাজ গড়ে তুলতে হবে। সমানে সমানে তবেই জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিদের সঙ্গেও সে সমান তালে চলতে পারবে। ভারতের ইতিহাস থেকে, ভারতের সমাজিক অভিব্যক্তির ধারা থেকেও সেই একই সমন্বয়ের তত্ত্ব এবং মিলন-সূত্রের সন্ধান পেয়ে কবি ভারতবর্ষকেই সেই ঐক্যবদ্ধ মানবসমাজসংগঠন-সাধনার ক্ষেত্র করে দেখেছেন। ভারতের এই বিশেষ জাতীয়তাবাদই কবির আদর্শ মানবসমাজের ভিত্তি। গানে, কবিতায় ভারতের এই সর্বমানবিক জাতীয়তাবাদেই সকলকে তিনি উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। এই জাতীয়তাবাদই হয়েছে তার রূপান্তরে 'দেশমাতৃকা', হয়েছে 'জাতির ভাগ্য-বিধাতা।' তাঁর নাম করেই কবি সকলকে যে কিরূপ উদাত্ত-কণ্ঠে আহ্বান করেছেন— "স্বদেশী সমাজের" উপসংহারে তা পরিস্ফুট।

রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় জাতীয়তার আদর্শকে জাতিবর্ণধর্ম-নির্বিশেষে সর্বজনীন রূপ দেবার জন্য নানা বাস্তব সমস্যার মুখে কাজের কথা পেড়ে, ১৯০৮ সনে "পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনী" প্রবন্ধে আমাদের নিজস্ব গ্রাম্য ব্যবস্থা, জমিদার ও রায়তের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে কতকগুলি সারগর্ভ কথা বলে দেশবাসীর চোখ ফুটাবার চেষ্টা করেছিলেন।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে, যে সমস্যাগুলিকে সামনে রেখে কবি পাবনা-সম্মিলনে দেশের নিকট তাঁর পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছিলেন, আজ দেখা যাচ্ছে—সেই সব সমস্যাই স্বাধীন ভারতে অত্যুগ্র হয়ে উঠেছে। কবি প্রায় অর্ধশতাব্দ-পূর্বে যা ভেবেছেন যা লিখেছেন, তা আজও ধারণা ও ভাবনার বিষয়।

তখনকার যুগে লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' ইত্যাদি প্রবন্ধ থেকে তার জাতিগঠনমূলক মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মতে, আসলে জনসাধারণই সমবেত প্রচেষ্টায় রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা, শিল্পবাণিজ্যাদি সবকিছু পরিচালনা করবে। নিজেদের মধ্য থেকেই এক জন দেশনেতা মনোনীত করে তাঁর নির্দেশ মান্য করে তারা চলবে, কিন্তু সেই নেতা সর্ববিষয়ে একটি মন্ত্রণাপরিষদের পরামর্শ নেবেন। সে পরিষদ গঠিত হবে জনসাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে।

দেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দেশকে আপন• ও তার মানুষদের আপনার জন করে নিয়েছেন এমন লোকই দেশের নেতৃপদ লাভের যোগ্য। সমাজগঠন ব্যবস্থার একটি কাঠামো সম্বন্ধে কবি সেদিন যে প্রস্তাব করেছিলেন তার সঙ্গে আজও ভারতবাসী মোটামুটিভাবে একমতই।

১৯০০ থেকে ১৯১২ সনের মধ্যবর্তী সময়ের প্রবন্ধাবলী থেকে রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত মত জানা যায়। তখনই তিনি বলছেন,—স্বদেশী সমাজ চাই, দেশনেতা চাই,—আর সেই দেশ চাই যে দেশে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান পৃথিবীর সর্ব জাতিধর্ম ও শ্রেণীর মানুষ আপন হয়ে মিশে রয়েছে,—সেই জনগণের ভারতবর্ষ।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শে ছিল স্বদেশী সমাজ ও দেশনেতা। তিনি বলেছেন, রাজধর্ম হচ্ছে প্রজা বা জনসাধারণের মঙ্গলসাধন এবং সেরূপ রাজাকে বা নেতাকে পূজা করাই হচ্ছে এ দেশের লোক-ধর্ম। যিনি জনগণের মঙ্গলকামী, সেই রাজা ঈশ্বরেরই বিধাতৃশক্তির আধার, আবার পরিব্যাপ্ত-ভাবে যেমন আধার হ'ল—জনগণ বা জাতি। দেশের রাজাকে তো দেশ পায় নি, কিন্তু যে পরম রাজা দেশের জনগণের মধ্যে পরিব্যাপ্তরূপে রয়েছেন সেদিন সেই মঙ্গলদায়ক বিধাতৃশক্তিরই বন্দনা কবি করেছেন "জনগণ" গানে।

ভারতের কোন্ মঙ্গল ইংরেজের দ্বারা হয়েছে? বিচ্ছিন্ন ভারতকে একরাষ্ট্রসূত্রে একজাতি করে বাঁধবার চেষ্টা থেকে যে মঙ্গল তখন আপাতদৃষ্ট,—সেটা সাম্রাজ্যলোভী ইংরেজ-জাতির রাষ্ট্রব্যবস্থার গৌণ ফলমাত্র। "সফলতার সদুপায়" প্রবন্ধে (১৩১১) কবি বলেছেন—"ভারতবর্ষে একচ্ছত্র ইংরেজ রাজত্বের প্রধান কল্যাণই এই যে, তাহা ভারতবর্ষের নানা-

জাতিকে এক করিয়া তুলিতেছে। ইংরেজ ইচ্ছা না করিলেও এই ঐক্যসাধন প্রক্রিয়া আপনা-আপনি কাজ করিতে থাকিবে।"

কিন্তু সেই একজাতিত্বের সংহতি যে সেই রাষ্ট্রতন্ত্রের ঈপ্সিত নয় বরং অবাঞ্ছিত তা রবীন্দ্রনাথই সে সময়ে দেখিয়েছেন ব্রিটিশ নীতি বিশ্লেষণ করে। ভেদনীতি দ্বারা শাসনদণ্ডকে সুচিরভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাখবার জন্যে দেশ, ভাষা, ধর্ম, নানাদিক দিয়েই সেই বৈদেশিক রাষ্ট্রচক্র মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে বরাবর চেষ্টা করেছে। তারই প্রত্যক্ষ ফল তখন দেখা দিয়েছে "বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে।" এই ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করেই দেশে জাতীয়তাবোধ প্রবলভাবে জাগ্রত হয়। ক্রমশঃ তা পরিব্যক্ত হয়ে একদিন কেমন করে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটাল, তা আজ পরিস্ফুট। সেদিনও জাগ্রত জনশক্তির ঐক্যবদ্ধ অভিযানের মুখে বাধ্য হয়ে হার মানতে হয় ব্রিটিশকে এবং বঙ্গভঙ্গের নির্দেশ প্রত্যাহার করে বিক্ষুব্ধ জ্বালাকে জাতির মর্মবেদনাকে তাদের প্রশমিত করতে হয়। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করার সেই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান যে সব রকমেই বিশিষ্ট, সেটা মনে রাখা দরকার। তিনি যে প্রেরণা জাগিয়েছিলেন অগ্নিদীপ্ত বাণীতে আজও তা উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁর সেই সময়ের সাহিত্যে, গদ্যে, কবিতায়, গানে। তাঁর চিন্তাধারার পরিচয় পাব তাঁর সে সময়ের যে কোনো রচনায়।

পূর্ব্বেই বলেছি, স্বদেশের আবিষ্কারে ও গণদেবতার ধ্যানে রবীন্দ্রনাথের মন যে জাগ্রত ছিল তা জানা যায় তাঁর 'অবস্থা ও ব্যবস্থা প্রবন্ধে (১৩১২)। তাতে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের জনজাগরণ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "ঈশ্বরের শক্তি যে কেবল সম্ভবের পথ দিয়াই কাজ করে, তাহা নহে; ইহাতেই বুঝিতে হইবে, দুর্বলেরও বল আছে, দরিদ্রেরও সম্পদ আছে এবং দুর্ভাগ্যকেই সৌভাগ্য করিয়া তুলিতে পারেন যিনি, সেই জাগ্রত পুরুষ, কেবল আমাদের জাগরণের প্রতীক্ষায় নিস্তব্ধ আছেন। তাঁহার অনুশাসন এ নয় যে, গবর্ণমেণ্ট তোমাদের মানচিত্রের মাঝখানে যে একটা কৃত্রিম রেখা টানিয়া দিতেছেন, তোমরা তাহাদিগকে বলিয়া কহিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, বিলাতি জিনিস কেনা রহিত করিয়া, বিলাতে টেলিগ্রাম ও দূত পাঠাইয়া তাঁহাদের অনুগ্রহে সেই রেখা মুছিয়া লও। তাঁহার অনুশাসন এই যে, বাংলার মাঝখানে যে রাজাই যতগুলি রেখাই টানিয়া দিন, তোমাদিগকে এক থাকিতে হইবে, নিজের প্রেমে এক থাকিতে হইবে "

রবীন্দ্রনাথের সেই সময়ের রচনা ভাল করে আলোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর সুদূরপ্রসারিত দৃষ্টিতে ইংরেজের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, ইংরেজ রাজা, ইংরেজ উজির, ইংরেজকৃত বঙ্গভঙ্গ বা রদবা তার রকমফের—এর অস্তিত্ব কোথায়, এর মূল্য কি। ভারতভাগ্যের যে স্তরে এই সব সাময়িক অস্থির ঘটনাবলী কালের ভোজবাজির মত অহরহ ঘটে চলেছে সেইখানেই দেশের দৃষ্টিকে অন্তরকে উদ্যমকে সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ নিবদ্ধ রাখতে চান নি। তিনি ভারতবর্ষকে ভারতভাগ্যকে বিশাল দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বদাই দেখেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের স্তরে উন্নীত দেখেছেন তাকে, এবং মন্ত্রবৎ অমোঘবীর্য বাণীতে তার কথা প্রচার করেছেন—আজও তা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রবন্ধে বলেছেন, "ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কি,—প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে, অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এক ব্রহ্ম বা নরদেবতার আংশিকপ্রকাশ,—এক ব্রহ্মই হচ্ছেন বিচ্ছিন্ন সত্তাকে সমগ্রভাবে ধারণা করবার আধার। উদাত্ত কণ্ঠে কবি তাই বলেছেন, "যিনি আমাদের দেশের দেবতা, যিনি আমাদের পিতামহদের সহিত আমাদিগকে এক সূত্রে বাঁধিয়াছেন, যিনি আমাদের সন্তানের মধ্যে আমাদের সাধনাকে সিদ্ধিদান করিবার পথ মুক্ত করিতেছেন, যিনি আমাদের এই সূর্যালোক দীপ্ত নীলাকাশের নিয়ে যুগে যুগে সকলকে একত্র করিয়া এক বিশেষ বাণীর দ্বারা আমাদের সকলের চিত্তকে এক বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, আমাদের চিরপরিচিত ছায়ালোকবিচিত্র অরণ্যপ্রান্তর-শস্যক্ষেত্র যাঁহার বিশেষ মূর্তিকে পুরুষানুক্রমে আমাদের চোখের সম্মুখে প্রকাশ-মান করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের পুণ্য নদী সকল যাঁহার পাদোদক রূপে আমাদের গৃহের দ্বারে দ্বারে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, যিনি জাতিবর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টানকে এক মহাযজ্ঞে আহ্বান করিয়া পাশে পাশে বসাইয়া সকলেরই অন্নের থালায় স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া আসিতেছেন, দেশের অন্তর্যামী সেই দেবতাকে, আমাদের সেই চিরন্তন অধিপতিকে এখনও আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই।"

কিছুকাল পরে রচিত হলেও "জনগণ" সঙ্গীতে (১৩১৭) এই বিরাট দেশের ঐক্যবিধায়ক সেই মহান্ দেবতার জয়গানই উদাত্ত সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের উদ্দিষ্ট ভারতভাগ্যবিধাতা কে এবং তাঁকে ভক্তি করা বলতে কি বুঝায়, রবীন্দ্রনাথের পূর্বাপর সকল রচনায় তা উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রয়েছে দেখতে পাই। ভারত-ভাগ্যবিধাতা তিনিই যিনি মানব-ভাগ্যবিধাতা। তাঁর মধ্যে ভাগবত সত্তার জয় ঘোষণা রবীন্দ্রনাথ শেষবার করে গেছেন তাঁর "মানুষের ধর্ম" আর "Religion of Man" শীর্ষক ভাষণগুলিতে।

সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

জ্ঞান অর্জ্জনের সত্যকার স্পৃহা থাকিলে অদম্য অধ্যবসায় দ্বারা তাহা কিরূপে লাভ করা যায় সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তীর জীবন তার সাক্ষী। সূর্য্যকুমার ১৮২৭ সনে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত কনকসার গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়। ইহার পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর তাঁহার লালনপালনের ভার পড়িল, কিন্তু তিনিও অল্পকাল মধ্যেই ইহধাম ত্যাগ করেন। তখন আপনার বলিয়া সংসারে তাঁহার বিশেষ কেহ রহিল না। প্রতিবেশীদের আশ্রয়ে ত্রয়োদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি স্বগ্রামে অবস্থান করেন।

বিদ্যাশিক্ষার প্রতি শৈশব হইতেই সূর্য্যকুমারের ঝোঁক ছিল। নানা দুরবস্থার মধ্যে থাকিয়াও তিনি এই কয় বৎসরে সংস্কৃত, ফার্শী ও বাংলা ভাষা শিখিয়াছিলেন। তখন পল্লী অঞ্চলে ইংরেজী শিক্ষার সূচনা হয় নাই। সূর্য্যকুমার ইতিপূর্ব্বে কোন ইংরেজের মুখও দেখেন নাই। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সেই তিনি সর্ব্বপ্রথম একজন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর সাক্ষাৎলাভ করিলেন। এই কর্ম্মচারীটি শাসন সংক্রান্ত কার্য্যব্যপদেশে ঐ অঞ্চলে গমন করিলে, অন্যান্য দশ জনের মত সূর্য্যকুমারও কৌতূহলপরবশ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে যান। তাঁহার আচরণ ও কথাবার্ত্তায় তিনি মুগ্ধ হন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁহাকেও উক্ত শ্বেতাঙ্গের মত ইংরেজী বলিতে কহিতে শিখিতে হইবে।

সূর্য্যকুমার এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত না করিয়া ছাড়িলেন না। তিনি ঐ বয়সেই সামান্য বস্ত্র এবং কিছু চিড়া লইয়া দীর্ঘ পথ পদব্রজে রওনা হইলেন। তাঁহার গ্রাম হইতে ষাট মাইল দূরে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয়টি কুমিল্লার ইংরেজী বিদ্যালয়; ইহাই পরে জেলা স্কুলে পরিণত হইয়াছে। কুমিল্লায় পৌঁছিয়া সূর্য্যকুমার ঐ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের সহিত ইংরেজী পড়ার যে ব্যবস্থা করিয়া লইলেন তাহা সত্যই অভিনব। সূর্য্যকুমার জাতিতে ব্রাহ্মণ; তিনি প্রস্তাব করিলেন—তিনি শিক্ষক মহাশয়ের পাচকের কার্য্য করিবেন, তদ্‌বিনিময়ে তিনি তাঁহাকে ইংরেজী শিখাইবেন। শিক্ষক মহাশয় এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার পাঠে আশ্চর্য্য উন্নতি দেখিয়া তাঁহাকে ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সুযোগ করিয়া দিলেন। কুমিল্লা জেলা স্কুলের শতবার্ষিকী (১৮৩৭-১৯৩৭) উপলক্ষ্যে এই বিদ্যায়তনের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে প্রদত্ত বিখ্যাত ছাত্রদের বিবরণাংশ হইতে জানা যায়, সূর্য্যকুমার এই

গোপালচন্দ্র শীল

সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী, ভোলানাথ বসু, দ্বারিকানাথ বসু

বিদ্যালয়ে ১৮৩৯ সনের ১৯শে এপ্রিল তারিখে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। পাঠে অধ্যবসায় ও কৃতিত্ব দেখিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে একটি মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন।

সূর্য্যকুমার কুমিল্লা স্কুল হইতে কলিকাতায় আসেন এবং কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন বলিয়া জানা যায়। যাহা হউক, এই সময় ১৮৪০ সনে আলেকজাণ্ডার নামক একজন পদস্থ ইংরেজ সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী তাঁহার মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নের যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হন। এ বৎসরে তিনি কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারিলেন না। পর বৎসর ১৮৪৪ সনে তিনি মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশলাভ করেন। একটি বিবরণ হইতে জানা যায়, এই সময় প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সূর্য্যকুমার আস্থা হারাইয়া উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

এ বৎসরের শরৎকালে কলেজ কৌন্সিলের সেক্রেটরী অধ্যাপক ডক্টর মৌএট ছাত্রদের নিকট এই সংবাদ দেন যে, শীঘ্রই মেডিক্যাল কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে উন্নত ধরণের চিকিৎসা বিদ্যা শিখাইবার জন্য বিলাতে পাঠানো হইবে। দ্বারকানাথ ঠাকুর ইতিপূর্ব্বেই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বিলাতে উন্নত ধরণের চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য তিনি দুই জন ছাত্রের ব্যয়ভার বহন করিবেন। তাঁহার এই প্রস্তাব শুনিয়া কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ডাক্তার হেনরি হারি গুডিব আর একজন ছাত্রের ব্যয় স্বয়ং বহন করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া শিক্ষা-বিভাগকে পত্র লেখেন। চাঁদা তুলিয়া আরও একজন ছাত্র প্রেরণের ব্যবস্থা হইল। এইরূপ প্রারম্ভিক আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে কলেজ হইতে বিলাত-গমনেচ্ছু ছাত্র মনোনয়নের পালা আসিল। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। পুর্ব্বেও এইরূপ ছাত্র প্রেরণের বিষয় উত্থাপিত হইয়াছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪২ সনে প্রথম বার যখন বিলাত যান তখন চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়নার্থ মেডি-ক্যাল কলেজ হইতে একজন ছাত্রকে নিজ ব্যয়ে বিলাত লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্র-লাল মিত্র তখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। তিনি দ্বারকা-নাথের সঙ্গে বিলাত যাইতে উদ্যোগী হইলেও অভিভাবক-গণের প্রতিবন্ধকতায় তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হয়। এবারে মৌএটকে বিলাত-গমনেচ্ছু চারি জন ছাত্র সংগ্রহে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। ভোলানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল, দ্বারকানাথ বসু এবং সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী বিলাত যাইতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সূর্য্যকুমার ছিলেন বয়ঃকনিষ্ঠ, মাত্র অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক। পিতৃমাতৃহীন হইলেও আত্মীয়-স্বজন তাঁহার বিলাত গমনে বাদ সাধিতে কম প্রয়াস পান নাই। কিন্তু সূর্য্যকুমার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বন্ধুত্রয়ের সঙ্গে ডাঃ গুডিবের তত্ত্বাবধানে ১৮৪৫ সনের ৮ই মার্চ্চ কলিকাতা হইতে জাহাজযোগে বিলাত যাত্রা করিলেন। বদান্যবর দ্বারকানাথ ঠাকুরও নিজ দলবল সহ এই একই জাহাজে দ্বিতীয় বার বিলাত রওনা হন। তিনি সেখান হইতে আর স্বদেশে ফিরিতে পারেন নাই। ১৮৪৬ সনের ১লা আগষ্ট লণ্ডনে দেহত্যাগ করেন।

২

লণ্ডনে পৌঁছিয়াই সেখানকার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ইউনিভারসিটি কলেজ অব মেডিসিন নামক বিদ্যায়তনে বন্ধু-গণ সহ সূর্য্যকুমারও ভর্ত্তি হইলেন। ছাত্রচতুষ্টয়ের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ গুডিব তাঁহাদের পাঠোন্নতি সম্বন্ধে বিলাতে কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্সের নিকট ষাণ্মাসিক রিপোর্ট প্রদান করিতেন। ইহার অংশবিশেষ বাংলার কৌন্সিল অব্ এডুকেশন বা শিক্ষা-সমাজের ১৮৪৫-৪৬, ১৮৪৬-৪৭ ও ১৮৪৭-৪৮ সনের বার্ষিক বিবরণে মুদ্রিত হইয়াছে। বাঙালী ছাত্রেরা অল্পসময়ের মধ্যেই অধ্যয়নে আশ্চর্য্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ইংরেজ ছাত্র-গণকেও কোন কোন ক্ষেত্রে হটাইয়া দিতে কিরূপ সক্ষম হইয়া-ছিলেন এই বিবরণ হইতে সে সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা হয়। সূর্য্য-কুমার কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে এক বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং বয়সেও সকলের ছোট ছিলেন। তথাপি তিনিও নিজ বিষয়ে বিশেষ গুণপনা দেখাইতে সমর্থ হইলেন। এখানে তাহার কথাই কিছু কিছু বলা যাইতেছে।

সূর্য্যকুমার ইউনিভার্সিটি কলেজের তুলনামূলক শারীর-স্থান বিদ্যার (Comparative Anatomy) বিখ্যাত অধ্যাপক ডাক্তার রবার্ট ই. গ্রাণ্টের ছাত্ররূপে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। গ্রাণ্ট তাঁহাকে স্বীয় গ্রন্থসমূহের এক প্রস্ত এবং বিলাতে ও ফ্রান্সে প্রকাশিত চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট প্রামাণ্য পুস্তকগুলি অধ্যয়নার্থ দিলেন। সূর্য্যকুমার এরূপ অভিনিবেশ সহকারে এ সকল অধ্যয়নে লিপ্ত হন যে, প্রথম বৎসরেই তিনি একটি স্বর্ণপদক লাভ করিতে সক্ষম হইলেন। অবসর সময়েও সূর্য্যকুমার ছিলেন গ্রাণ্ট সাহেবের সঙ্গী। গুডিব বলেন, কলেজের দীর্ঘাবকাশে সূর্য্যকুমার গ্রাণ্টের সঙ্গে ফ্রান্সে গিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধানে তথাকার যাদুঘরে প্রাণিবিদ্যার বহু নিদর্শন স্বচক্ষে দেখিয়া লন এবং তৎসম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা ও অনুসন্ধানান্তর বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে তিনি ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইলেন। গ্রাণ্ট প্যারিসের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গেও সূর্য্যকুমারের আলাপ-পরিচয় করাইয়া দেন।

সূর্য্যকুমার এক বৎসরের মধ্যেই পুর্ব্বোক্ত স্বর্ণপদক ব্যতিরেকে শারীর-স্থান বিদ্যায় সপ্তম সার্টিফিকেট এবং শারীর-বৃত্তে দ্বাদশ সার্টিফিকেট লাভ করেন। ডাক্তার গুডিব দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক বিবরণে এ সকল বিষয় বিশদ ভাবে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, অধ্যাপক গ্রাণ্টের মতে গত দশ বৎসরের মধ্যে তুলনামূলক শারীর-স্থান বিদ্যা বিষয়ে এরূপ কঠিন প্রশ্ন কখনও প্রদত্ত হয় নাই; তথাপি এ সমুদয়ের যথোচিত উত্তর দিয়াই সূর্য্যকুমার সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর প্রাণি-বিদ্যায়ও সর্ব্বপ্রথম হইয়া তিনি ইহার একমাত্র পুরস্কার একটি রৌপ্যপদক লাভ করেন। রৌপ্যপদকের পরিবর্ত্তে একটি স্বর্ণপদক প্রদানের নিমিত্ত ডাঃ গ্রাণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে যে পত্রখানি লেখেন তাহা হইতে সূর্য্যকুমারের প্রাণিবিদ্যায় কৃতিত্বের বিষয় জানা যায়। পত্রখানি এই :

"To the Secretary of the Council of University College, London.

My Dear Sir,—From the transcendent excellence of the written replies given by the successful candidates this session in the Zoological competition, and from the great ability with which the prize has been contested (solely by Gold Medalists) on this occasion, I feel strongly induced

to solicit the Council to award a gold medal instead of the usual silver medal as the sole prize in the class of zoology, at the approaching distribution of prizes in the faculty of arts.

I remain etc.,
Robert E. Grant."

কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য গ্রাণ্টের এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। বয়সের অল্পতা এবং শিক্ষাকাল অসম্পূর্ণ বিধায় সূর্য্যকুমার অপর সঙ্গীদের সঙ্গে এই সময় প্রথম এম-বি পরীক্ষা দিতে না পারিলেও অধ্যয়নে তাঁহার উৎকর্ষলাভ সকলেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছিল।

অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় সূর্য্যকুমার যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন এরূপ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। গুডিবের তৃতীয় ষাণ্মাসিক রিপোর্টে (ডিসেম্বর ১৮৪৬) প্রকাশ, সূর্য্য-কুমার অল্প কালের নিমিত্ত একবার অধ্যাপক গ্রাণ্টের সঙ্গে প্রুশিয়ায় গিয়াছিলেন। সেখানে অবস্থানকালেই তিনি জার্ম্মান ভাষাও শিখিয়া ফেলেন। লাটিন, গ্রীক ও ফরাসী ভাষা তিনি ইতিপূর্ব্বেই শিখিয়া লইয়াছিলেন।

এবারকার দীর্ঘাবকাশে ছয় সপ্তাহ যাবৎ সূর্য্যকুমার তদীয় অধ্যাপক গ্রাণ্টের সঙ্গে জার্ম্মানীর বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন। তাঁহারা বেলজিয়মের পথে রাইন নদী দিয়া প্রথমে মেন্স এবং পরে নদীর অপর পারে ফ্রাঙ্কফোর্ট ও লাইপজিগ হইয়া বার্লিনে পৌছেন। বার্লিনে তাঁহারা এক মাস অবস্থান করেন। এই সময় সূর্য্যকুমার প্রাণিবিদ্যার বড় বড় যাদুঘর-গুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার সুযোগ পান। ইহার পর তাঁহারা হানোভার, ব্রান্সউইক এবং ক্যাসেলের দ্রষ্টব্য বিষয়-গুলি, বিশেষ করিয়া গাইসেনের অধ্যাপক লাইবিগের পরীক্ষা-গার দর্শনান্তর লণ্ডনে প্রত্যাবৃত্ত হন। প্রাণিবিদ্যা এবং অন্যান্য সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ বাদে এবারে সূর্য্যকুমার জার্ম্মান ভাষাটি বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিলেন এবং জার্ম্মান গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন ও জার্ম্মানদের সঙ্গে তাহাদেরই ভাষায় কথাবার্ত্তায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। ফ্রান্স ও জার্ম্মানী পরিক্রমার ফলে নানা বিষয়েই সূর্য্যকুমারের ভূয়োদর্শন জন্মে।

গুডিব প্রদত্ত চতুর্থ ষাণ্মাসিক বিবরণ (১৮৪৭ সনের প্রথম ছয় মাস) হইতে জানা যায়, সূর্য্যকুমার শারীর-স্থান বিদ্যা, শারীরবৃত্ত, ভৈষজ্য বিদ্যা এবং রসায়নে প্রশংসাসূচক সার্টি-ফিকেট প্রাপ্ত হন। তাঁহার পাঠোৎকর্ষ সম্বন্ধে গুডিব তৎপ্রদত্ত বিবরণে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ১৮৪৭ সনের আগষ্ট মাসে তিনি এম-বি উপাধির জন্য প্রথম পরীক্ষায় উপস্থিত হইবেন। তিনি এই পরীক্ষা এবং কলেজ অব্ সার্জ্জনসের ডিপ্লোমা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ইউরোপের প্রাচীন এবং আধুনিক ভাষাসমূহের অনুশীলনও কিন্তু এই সঙ্গে সমানেই চলিয়াছিল। দ্বারকানাথ বসু ইতিপূর্ব্বেই স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্‌টি অব্ মেডিসিনের ডীন বা অধ্যক্ষ মিঃ লিষ্টন নিজ রিপোর্টে ভোলা-নাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল এবং সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তীর আচরণ, অধ্যবসায় ও গুণপনার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী
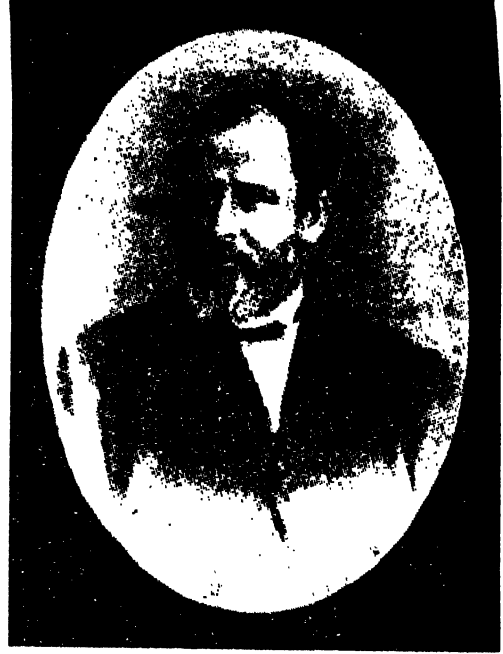
ডাঃ গুডিব শেষ ষাণ্মাসিক রিপোর্ট (১৮৪৭ সনের শেষার্দ্ধ) কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্সকে পেশ করিলেন। তিনি ইহাতে লেখেন, ভোলানাথ বসু এবং গোপালচন্দ্র শীল উভয়েই এম-বি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ভোলানাথ এম-ডি উপাধিও লাভ করেন। ভারতবাসীদের মধ্যে কি এদেশে কি বিদেশে ভোলানাথই প্রথম এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৪৮ সনের জানুয়ারী মাসে গুডিব ইঁহাদের লইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন। সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে তিনি কোর্টকে জানান যে, ১৮৪৭ সনের আগষ্ট মাসে তিনি (সূর্য্য-কুমার) এম-বি প্রথম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া অনার্সের সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছেন। ইহার পর তিনি পুনরায় অধ্যাপক গ্রাণ্টের সঙ্গে জার্ম্মানীতে যান এবং বার্লিন, প্রাহা, ব্রেসলাউ, মুনিক, ফ্রাঙ্কফোর্ট, বন, দি হেগ, লিডেন, আমষ্টার্ডাম প্রভৃতি শহরের প্রাণিবিদ্যা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক দ্রব্যের যাদুঘর এবং ঐ ঐ স্থানের শিল্পকলাদি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন করেন। লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া তিনি মিঃ লিষ্টনের সহকারীরূপে হাসপাতালে অস্ত্রোপচারাদি কার্য্যে লিপ্ত

হন। ইহার পর তিনি ভৈষজ্যবিদ্যার অধ্যাপকের অধীনে কার্য্য করিবেন স্থির হয়। অন্যান্য ছাত্রদের অপেক্ষা বয়:কনিষ্ঠ এবং অল্পসময় অধ্যয়নরত রহিয়াছেন বলিয়া তখনও উচ্চতম পরীক্ষা দিতে সূর্য্যকুমার সমর্থ হন নাই, যদিও তিনি পাঠে আশাতীত উৎকর্ষলাভ করিয়া অধ্যাপকদের নিকট প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। গুডিব কোর্টকে অনুরোধ করিলেন যে, লণ্ডনে থাকিয়া অধ্যয়ন ও পরীক্ষা শেষ করিতে সূর্য্যকুমারের আরও অন্তত: এক বৎসর সময় লাগিবে। সুতরাং কোর্ট যেন তাঁহাকে এই এক বৎসরের জন্য আরও দেড় শত পাউণ্ড মঞ্জুর করেন। বলা বাহুল্য, কোর্টও গুডিবের উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও জানান যে, সূর্য্যকুমার স্বেচ্ছায় খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গুডিবের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এই সময় পূর্ব্ব নামের সঙ্গে 'গুডিব' শব্দটি যুক্ত করিয়া 'সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী' নামে নিজের পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন।

ইহার পর সূর্য্যকুমার আরও দুই বৎসর লণ্ডনে ছিলেন। তিনি ১৮৪৯ সনে চিকিৎসাবিদ্যার সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম-ডি উপাধিলাভ করিলেন। তিনি এই সময় একজন ইংরেজ রমণীর পানিগ্রহণ করেন। গুডিবের শেষ রিপোর্টে কোর্টকে এই মর্ম্মেও অনুরোধ জানান হইয়াছিল যে, যুবকদের কৃতিত্ব স্মরণ করিয়া এবং ভবিষ্যতে ভারতীয় যুবকবৃন্দ যাহাতে অধিকতর সংখ্যায় উচ্চ বিদ্যালাভার্থ বিলাতে আগমন করিতে উৎসাহিত হয় সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেককে যথাযোগ্য সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত করা প্রয়োজন। যে তিন জন পূর্ব্বে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা সরকারী চিকিৎসা-বিভাগে নিয়োজিত হইলেন। সূর্য্যকুমারের ইচ্ছা ছিল, কভেনান্টেড মেডিক্যাল সার্বিসে—যাহা পরে আই-এম-এস নামে অভিহিত হয়—প্রবেশ করেন। সূর্য্যকুমারের বাসনা পূরণের অভিপ্রায় বোর্ড অব্‌ কণ্ট্রোলের সভাপতিরও ছিল, কিন্তু কোর্ট অব্‌ ডিরেক্টর্সের প্রতিবন্ধকতায় তাহা পূর্ণ হইল না। মেডিক্যাল কলেজে সহকারী অধ্যাপকের পদের নিয়োগপত্র লইয়াই ১৮৫০সনের মে মাসে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। সূর্য্যকুমারের প্রত্যাবর্ত্তনের কথা ১৮৫০-৫১ সনের শিক্ষা-সমাজের বিবরণে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে :

"The experiment of educating the natives of India in England, commenced by Dr. H. Goodeve, and conducted by him for some years, terminated in May last by the return to Calcutta of the remaining pupil Dr. S. G. Chuckerbutty. Dr. Chuckerbutty studied for five years at University College, London, and obtained the degree of Doctor of Medicine in that University. He laboured strenuously and diligently in Europe, and has brought with him testimonials from the Professors under whom he studied in England, who all testified to his zeal and honourable acquirements."

৩

সূর্য্যকুমারের পদের নাম হইল "এসিষ্টাণ্ট ফিজিসিয়ান এণ্ড ক্লিনিক্যাল লেকচারার"। তিনি এই পদে চারি বৎসর নিযুক্ত থাকিয়া ১৮৫৪ সনে অস্থায়ীরূপে মেটিরিয়া মেডিকা এবং ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক হন। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেরও তিনি দ্বিতীয় চিকিৎসকের পদ পাইলেন। কিন্তু সূর্য্যকুমারের বরাবর বাসনা—তথাকথিত আই-এম-এস সার্বিসে প্রবেশলাভ করিয়া শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গের বৈষম্য ঘুচানো। ইহার সুযোগ এই বারে পাওয়া গেল। বিলাত হইতে ঘোষিত হইল, অত:পর এই বিভাগে প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দ্বারা চিকিৎসক কর্ম্মী নিয়োজিত হইবে। ১৮৫৫ সনের প্রথমে এই পরীক্ষা সর্ব্বপ্রথম গ্রহণের ব্যবস্থা হইল। তিনি পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার জন্য ১৮৫৫ সনের জানুয়ারী মাসে দ্বিতীয় বার বিলাত গমন করিলেন। তিনি এক বন্ধুকে এই সময় লিখিয়াছিলেন :

"If I fail, it will be a satisfaction to me that I have used my best efforts in the service of my country, and that it is only physical difficulties thrown in our way 'by the Legislature which have been the cause of my disappointment and loss'."

কিন্তু সূর্য্যকুমারের আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হইল; কৃষ্ণাঙ্গ হইয়াও তিনি উক্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হইলেন। জাতি-বর্ণগত বাধা এইবার হইতে চিরতরে তিরোহিত হইল।

প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হইয়া সূর্য্যকুমার মার্চ্চ মাসেই স্বদেশে ফিরিলেন। তিনি এবারে আই-এম-এস শ্রেণীভুক্ত হইয়া মেডিক্যাল কলেজের কার্য্যে ব্রতী হন। ১৮৫৭ সনে তিনি অস্থায়ী অধ্যাপকের পদে উন্নীত হইলেন। এই পদে দীর্ঘ নয় বৎসর নিযুক্ত থাকিয়া ১৮৬৬ সনে স্থায়ী অধ্যাপকের আসন লাভ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি অধ্যাপক-পদেই সমাসীন ছিলেন।

চিকিৎসক হিসাবে সূর্য্যকুমারের সুনাম ছিল যথেষ্ট। কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজের বাহিরে তিনি চিকিৎসা করিতেন না। অন্য চিকিৎসকের উপদেষ্টা হিসাবে তিনি চিকিৎসা ব্যাপারে পরামর্শ দিয়া সহায়তা করিতেন। তাঁহার এত খ্যাতি ছিল যে, তাঁহাকে দেখিবামাত্রই রোগীর প্রাণে আশার আলো বিকীর্ণ হইত। চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার যেমন সুনাম ছিল, চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যও চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের সেইরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সূর্য্যকুমার উপদংশ রোগের প্রতিষেধ সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা করেন তাহা সমসাময়িক চিকিৎসাবিষয়ক পত্রিকাদিতে বাহির হয়। ইহাকে ভিত্তি করিয়া পরে এ রোগের প্রতিষেধক নির্ণীত হইবার সুবিধা ঘটিয়াছে। ল্যান্সেট, ব্রিটিশ মেডিক্যাল

জর্ণ্যাল, মেডিক্যাল টাইমস এণ্ড গেজেট, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট, ইণ্ডিয়ান এনালস্ অব মেডিক্যাল সায়ান্স প্রভৃতি চিকিৎসাবিষয়ক পত্রিকাদিতে সূর্য্যকুমারের বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। তিনি ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের ভারতীয় শাখাকে পুনরুজ্জীবিত করেন, এবং কিছুকাল ইহার সভাপতিও ছিলেন।

চিকিৎসা-শাস্ত্র ব্যতীত জাতীয় কল্যাণকর বিষয়সমূহের সঙ্গেও সূর্য্যকুমারের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ১৮৫১ সনের ১১ই ডিসেম্বর ডা: মোএটের আহ্বানে মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে ইংরেজ ও ভারতীয় সুধীজনকে লইয়া একটি সোসাইটি বা সভা গঠিত হয়, এবং তাহার নাম দেওয়া হয় সগু পরলোকগত ভারতহিতৈষী জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের নামের সঙ্গে যুক্ত করিয়া "বেথুন সোসাইটি"। বেথুন সোসাইটি সে যুগে রাজনীতি ব্যতীত শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধে বিদগ্ধ সমাজের একটি প্রকৃষ্ট আলোচনাস্থল ছিল। সূর্য্যকুমার সভা প্রতিষ্ঠার দিন হইতে ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য নির্ণয় সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা হয় তাহাতেও তিনি সাগ্রহে যোগদান করেন। কলিকাতার জনস্বাস্থ্য, বাঙালী জাতির শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি এখানে বহু বক্তৃতা প্রদান করেন। এখানে এবং অন্যত্র প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ ১৮৭০ সনে *Popular Lectures on Subjects of Indian Interest* নামে তিনি প্রকাশিত করেন। ১৮৬৩ সনে সূর্য্যকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হন। ইহা ছাড়া জাষ্টিস অব দি পীসও হইয়াছিলেন। অন্যান্য অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদেও তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সূর্য্যকুমার দীর্ঘ জীবন লাভ করেন নাই। ইহার একটি কারণ হয়ত তাঁহাকে নানা ক্ষেত্রে সংগ্রাম করিয়া উঠিতে হইয়াছে। তিনি হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হইয়া বহুদিন ভুগিয়াছিলেন। অবশেষে বন্ধুদের পরামর্শে ১৮৭৪ সনের মধ্যভাগে চিকিৎসার্থ বিলাত গমন করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি আরোগ্যলাভ করিতে পারিলেন না, ২৯শে সেপ্টেম্বর সেখানেই ইহলীলা সংবরণ করিলেন। ১৮৭৪ সনের ১৫ই অক্টোবর 'অমৃত বাজার পত্রিকা' সূর্য্যকুমার সম্পর্কে যাহা লেখেন তাহা হইতে এই কয়টি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব:

"বঙ্গদেশ আর একটি রত্নচ্যুত হইয়াছেন। ডাক্তার চক্রবর্ত্তী মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। প্রায় চারি মাস হইল ইনি ইংলণ্ড গমন করেন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ডাক্তার চক্রবর্ত্তী একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। ...ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর প্রকৃত নাম সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী। তিনি একজন বিলাতি মেমকে বিবাহ করেন, কিন্তু যেমন সচরাচর হইয়া থাকে, তাহার সহিত তিনি তত সুখে কাল অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর অমায়িক স্বভাব ছিল এবং যাহাতে দেশের উপকার হয় তৎপক্ষে তিনি যত্নশীল ছিলেন। ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর ৪৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে।"*

* সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেও কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখের টাইমস পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা বাহির হয়। ইহার দীর্ঘকাল পরে ১৮৭৪, ১৬ই জুন দিবসীয় "দি মেডিক্যাল রিপোর্টার" নামক পাক্ষিক পত্রিকায় তাঁহার জীবনকথা সংক্ষেপে প্রবন্ধাকারে প্রদত্ত হইয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ও ১৩১১ সনের শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে সূর্য্যকুমার সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও মনে হয় তাঁহার জীবনকথা আলোচনার অবকাশ রহিয়াছে। কৌন্সিল অব্ এডুকেশন বা শিক্ষা-সমাজের বিবরণে তাঁহার বিলাতে অধ্যয়ন কাল সম্পর্কে যে সব তথ্য লিপিবদ্ধ আছে উপরোক্ত প্রবন্ধাদি, এবং বিশেষ করিয়া এই সকল তথ্যের সাহায্যে বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচিত।—লেখক।

হাজারিবাগ সংশোধনী কারাগারের কথা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকগণ হয়তো হাজারিবাগ সংশোধনী কারাগারের বিশেষ কোনও খবর রাখেন না। এইজন্য এ বিষয়ে কিছু তথ্য এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত করিব। অল্পবয়স্কেরা যদি কোনও গুরুতর অপরাধ করে যাহার ফলে তাহাদের জেল হওয়া উচিত, সেই ক্ষেত্রে বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের জেলে পাঠাইয়া পাকা বদমায়েস, চোর, ডাকাত প্রভৃতির সঙ্গে মিশিবার সুযোগ না দিয়া, ইচ্ছা করিলে তাহাদের চরিত্র সংশোধন মানসে এই সংশোধনী কারাগারে দিতে পারেন। হাজারিবাগে এইরূপ একটি সংশোধনী কারাগার আছে, বাংলাদেশ হইতে এখানে বালক কয়েদীদের পাঠানো হয় এবং বাংলা-সরকারও আংশিকভাবে ইহার ব্যয়-ভার বহন করেন। কোন্ প্রদেশের বালক-কয়েদী এখানে গত

বৎসর ছিল তাহার হিসাব নিম্নে দিলাম। যথা :—

পশ্চিমবঙ্গ	৮৭
পূর্ব্ববঙ্গ	২২
মোট—	১০৯
বিহার	৮০
উড়িষ্যা	৯
আসাম	২
সর্ব্ব মোট	২০০

দুঃখের বিষয় সংশোধনী কারাগারে ৩৫০ জন বালক-কয়েদীর স্থান থাকা সত্ত্বেও মাত্র ২০০টি কয়েদী এখানে আছে। বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেটগণ সাজা দিতেই ব্যস্ত—যাহাতে বালক আসামীগণ চরিত্র সংশোধন করিবার সুযোগ পায় সেদিকে তাঁহাদের তাদৃশ দৃষ্টি নাই। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বাংলা-সরকার যদি ম্যাজিষ্ট্রেটগণের প্রতি একটি সার্কুলার জারি করেন ত ভাল হয়।

উপরোক্ত ২০০ আসামীদের বয়সভেদ কি প্রকার তাহা নিম্নের হিসাবে দেখান হইল। যথা :

১৪ বৎসরের কম	১৪।১৫ বৎসর	১৬।১৭ বৎসর
৪৩	৯০	৬৭

১৯৪৮-৪৯ সালে সংশোধনী কারাগারে ৭১ জন ভর্ত্তি হইয়াছিল। ইহাদের বয়স-ভেদ এইরূপ :

বয়স	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	মোট
	১	×	২	১০	২১	২৮	৯	×	×	৭১

কি কি অপরাধের জন্ত ইহাদের সাজা হইয়াছিল তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে :

চুরি (Theft)	সিঁদ দেওয়া (House breaking and trespass)	চোরাই মাল রাখা (Receiving stolen property)	বলাৎকার (Rape)	ঠকান (cheating)	বিশ্বাস-ঘাতকতা (Criminal breach of trust)	চোরাই মাল গোপন করা (Assisting in concealing stolen property)	মেয়ে বাহির করা (Kidnapping)
৪৬	১১	৮	২	১	১	১	১=৭১

দেখা যায়, অল্প বয়সেও কাহারও কাহারও বলাৎকার ও মেয়ে বাহির করিবার প্রবৃত্তি হয়। যে দুই জন বালক বলাৎকারের জন্ত দণ্ডিত তাহারা মুসলমান। এই ৭১ জনের মধ্যে ৪৪ জন নিরক্ষর।

সংশোধনী কারাগারে যাহারা আছে জাতিধর্ম্ম হিসাবে তাহাদের বিভাগ এইরূপ :

ব্রাহ্মণ ...	১৭
অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দু	১২৭
মুসলমান ...	৫০
আদিবাসী ...	৩
খ্রীষ্টান ...	২
কিরিঙ্গী ...	১
	২০০

সংশোধনী কারাগারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কিরূপ নিম্নে তাহা দেখানো হইল।

ভোর ৫টা—শয্যাত্যাগ
৫টা—৬টা—প্রাতঃকৃত্যাদি
৬টা—৬৷৷টা—ড্রিল, ব্যায়াম
৬৷৷টা—৭টা—প্রাতরাশ
৭টা—১১টা—কারখানা বা স্কুল
১১টা—১৷৷টা—আহারাদি, খেলাধুলা ইত্যাদি
১৷৷টা—৫টা—কারখানা বা স্কুল
৫টা—৬৷৷টা—খেলাধুলা (মাঠে)
৬৷৷টা—সান্ধ্য ভোজন
৭টা—৯টা—সান্ধ্যক্লাশ ও পড়াশুনা
৯টা—৫টা—নিদ্রা

২৪ ঘণ্টার মধ্যে কারখানা বা স্কুলে কাটে ৭৷৷ ঘণ্টা। দুঃখের বিষয়, ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিবার বিশেষ কোনও ব্যবস্থা এখানে নাই। যাহা আছে তাহা মনকে চোখ ঠারা গোছের।

আহারাদির কিরূপ ব্যবস্থা তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

সকালে প্রাতরাশের সময়—গুড় ও চাটনি
১১৷৷টায়—ভাত, ডাল, তরকারী ও চাটনি
৬৷৷টায়—রুটী, ডাল, তরকারী

সপ্তাহে তিন দিন প্রত্যেক বালককে দুই ছটাক করিয়া মাংস দেওয়া হয় ; এবং যে সকল বালকের বয়স চৌদ্দর কম তাহাদের প্রত্যেককে রোজ এক পোয়া করিয়া দুধ দেওয়া হয়। মাছের ব্যবস্থা নাই ; অথচ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কয়েদী বাংলাদেশ হইতেই যায়। আর যাহারা মাংস খায় না বা মাংস খাওয়া যাহাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ তাহাদের জন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নাই।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ভালই বলিয়া মনে হয়। নিম্নের তালিকাটি দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে :

সংশোধনী কারাগারে ভর্ত্তি হইবার পর যাহাদের ওজন

বয়স	বাড়িয়াছে	সমান আছে	কমিয়াছে
	(শতকরা হিসাবে)		
১৬—১৮	৯৩.৪	৫.৩	১.৩
১৪—১৬	৯৬.৫	১.২	২.৪
১৪র কম	৯১.৭	৫.৬	২.৮

যাহাদের বয়স চৌদ্দ বৎসরের কম তাহারা রোজ ত এক পোয়া করিয়া দুধ পায়, অথচ তাহাদের মধ্যেই ওজন কমিবার অনুপাত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ইহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

এখানে কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং কত জন এক এক বিষয়ে শিক্ষা পাইতেছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। সাধারণত: বালকের পিতামাতা বা অভিভাবকের ইচ্ছানুযায়ীই তাহাকে বৃত্তি শিখানো হইয়া থাকে। সময় সময় বালকের নিজের ইচ্ছা ও কর্ম্মপটুতা দেখিয়াও অপর বৃত্তি শিখিতে দেওয়া হয়।—

কামারের কাজ (Blacksmithy) ...	২২ জন
ছুতারের কাজ (carpentry) ...	১৯ জন
ছাঁচে ঢালা (Moulding) ...	১৫ জন
মোটর গাড়ী মেরামত ...	৬ জন
জুতার কাজ (Shoe-making) ...	৩ জন
রাং ঝাল ইত্যাদি (Tinsmithy) ...	১১ জন
বই বাঁধানো ...	৯ জন
কোঁদানো এবং জোড়া দেওয়া (Fitting & turning) ...	৪১ জন
রাজমিস্ত্রি ...	৬ জন
রং দেওয়া ও পালিশ করা (Painting & polishing) ...	১৪ জন
দরজির কাজ ...	২১ জন
তাঁতের কাজ ...	৩১ জন

লোকপ্রিয়তা হিসাবে 'Fitting and turning' সর্ব্বপ্রথম; তারপরেই তাঁতের কাজ। কামার ও দরজির কাজের স্থান ইহাদের পরেই।

এই ত গেল হাতের কাজ, লেখাপড়াও শিখানো হয় উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণী পর্য্যন্ত। বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া ও উর্দ্দু এই চারি ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। পরীক্ষার ফল ভালই হইয়া থাকে। এই সংশোধনী কারাগারে একটি ছোট গ্রন্থাগার আছে—পুস্তকের সংখ্যা ১৫৩৭। ইহাতে চারিটি ভাষারই পুস্তক রাখিতে হইয়াছে—তদুপরি প্রায় নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিতের জন্য এই লাইব্রেরি। কাজেই ইহার পুস্তক নির্ব্বাচন খুব সহজ নহে। বর্ত্তমানে বাংলার কোনও প্রতিনিধি ইহার পরিদর্শক কমিটিতে (Committee of Visitors) নাই। বাংলা-সরকার যদি এমন কোনও যোগ্য ব্যক্তিকে এই কমিটিতে মনোনীত করেন যিনি তাঁহার সময় ও শক্তি এই বিষয়ে নিয়োজিত করিতে সক্ষম তাহা হইলে ভাল হয়।

পাঠাগারে ক্যারম, লুডো প্রভৃতি খেলিবার বন্দোবস্ত আছে। প্রতি রবিবার গ্রামোফোনে গান শুনানো হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বায়োস্কোপের শিক্ষণীয় বিষয়ের ছবি দেখানো হইত, এখন বন্ধ আছে।

সংশোধনী কারাগারে শিক্ষার ফল কিরূপ দাঁড়ায় নিম্নের তথ্যগুলি হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। উপর্য্যুপরি ৩ বৎসরের হিসাব দেওয়া হইল:

বৎসর	যাহারা চাকুরী করিতেছে	পিতামাতার কাছে আছে বা বেকার	খবর পাওয়া যায় নাই	পুনরায় জেলে আসিয়াছে বা পুলিসের নজরবন্দীতে আছে	মারা গিয়াছে	মোট
১৯৪৬–৪৭	৬২	৬৮	৪২	২	০	১৭৪
১৯৪৭–৪৮	৭৬	৭৮	৪৪	৩	৩	২০৪
১৯৪৮–৪৯	৪৯	১১	১৫	১	০	৭৬
মোট	১৮৭	১৫৭	১০১	৬	৩	৪৫৪
গড়	৬২·৫	৫২·৫	৩৪	২	১	১৫১
	১১৫ (৬২·৫ + ৫২·৫)					
শতকরা	৭৫·৮		২২·৩	১·৩	০·৬	

মোটামুটি দেখিতে গেলে সংশোধনী কারাগারের শিক্ষার ফল ভালই হইয়াছে। শতকরা ৭৬ জন নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে কিংবা পিতামাতার নিকটে থাকিয়া জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছে। মাত্র শতকরা ১৩ জন পুনরায় অপরাধ করিয়া জেলে আসিয়াছে। এ বিষয়ে তথ্যসংগ্রহে কর্ত্তৃপক্ষের আরও মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

অন্নপূর্ণার পুত্রবধূ

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

পুত্রের বিবাহে প্রচুর পণ লইয়া কৃতার্থ হইবেন, এ আকাঙ্ক্ষা অন্নপূর্ণা কিছুমাত্র করিতেছেন না। তাঁর পুত্র অশোক বিশেষ মেধাবী ছাত্র—তার ভবিষ্যৎ পরম উজ্জ্বল। তাহাকে জামাতা করিবার অভিলাষ বড়লোকে যদি করে, এবং অন্নপূর্ণা যদি সেই দিকেই লক্ষ্য রাখেন, তবেই মানায়। কোন কোন বড়লোকের তরফ হইতে এই মানানসই কাজের প্রস্তাবও না আসিয়াছে এমন নয়; কিন্তু কোন বড়লোকের অভিলাষ পূর্ণ করিবার ইচ্ছা অন্নপূর্ণার নাই। তিনি চান দরিদ্র পরিবারের একটি কন্যা। কন্যাটির অসাধারণ রূপের গৌরব না থাকিলেও চলিবে, কিন্তু বুদ্ধিমতী আর সহিষ্ণু প্রকৃতির হওয়া চাই। দরিদ্রের ঘরেই নারীর বুদ্ধিমত্তার প্রভাবগত শিক্ষা, আর সহিষ্ণুতার সহজ কঠিন পরীক্ষা নিয়তই চলিতে থাকে বলিয়া অন্নপূর্ণার ধারণা; এবং গরীবের মেয়ের হিসাবী হওয়াই সম্ভব। যাহাকে তিনি পুত্রবধূ করিতে চান তার পিতামাতা যদি জীবিত থাকেন তবে তাঁহারা যথেষ্ট ভদ্র এবং সবলচিত্ত কিনা তাহা দেখিতে হইবে; তাঁহারা যদি জীবিত না থাকেন তবে সে অবস্থা আরও ভাল, অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল, ইহাও অন্নপূর্ণা এক সময় প্রকাশ করিয়াছেন।

অনেকেই মনে করিতেছে, অন্নপূর্ণার এ কেমন সৃষ্টিছাড়া খেয়াল! ছেলের বিবাহে টাকা লওয়াই রেওয়াজ, এমন কি আভিজাত্যের লক্ষণ; টাকা সম্বন্ধে যত চাপ, আভিজাত্য তত উচ্চ আর দুরতিক্রম্য—ইহা কে না স্বীকার করে! কিন্তু অন্নপূর্ণা একটি পয়সাও লইবেন না। শ্বশুর-শাশুড়ী না থাকিলে শ্বশুরবাড়ীতে জামাইয়ের সুখ থাকে না—কুটুম্বিতার প্রীতিই জন্মে না; বৈবাহিক ঐ অভাবটা লোকে সুখেরই ক্ষতি আর ষোল আনা আনন্দের পরিপন্থীই মনে করে; কিন্তু অন্নপূর্ণা পছন্দ করিতেছেন ছেলের শ্বশুর-শাশুড়ী না থাকাটাই! তার উপর ছেলের বয়স এখন মাত্র আঠার কি উনিশ; কিন্তু অন্নপূর্ণা অনুসন্ধান করিতেছেন একটি ডাগর মেয়ে—তার বয়স পনর কি ষোল হইলে আপত্তি নাই; কেবল আপত্তি নাই নয়, ঐ বয়সের মেয়েই তাঁর ছেলের জন্য চাই।

লোকে একটু অবাক্ই হইল।

ঘটক-ঘটকী এবং আত্মীয়স্বজনকে ইচ্ছা ও বিবরণ জানানো ছিল; তাহাদের এক জন সংবাদ দিল যে, নিকটেই এক ষ্টেশন পরেই, দুর্লভপুরে ৺পরমেশ্বর রায়ের ঠিক তেমনি একটি মেয়ে আছে যেমনটি অন্নপূর্ণা চান—গোত্রে না বাধিলে মেয়েটিকে লওয়া যাইতে পারে। মেয়ের বাপ বাঁচিয়া নাই; মা আছে। চিরকাল তারা দুঃখী মানুষ। এই মেয়েটিই মায়ের জ্যেষ্ঠ সন্তান; তার পর দুটি পুত্র। মেয়েটির রূপ আর রং চোখধাঁধানো না হইলেও চোখে ধরে; বয়স পনর পূর্ণ হইয়া আষাঢ়ে ষোলয় পড়িয়াছে। পুত্রদ্বয়ের বয়স যথাক্রমে তের এবং দশ।

প্রাথমিক সংবাদ অনুকূল, এবং সত্য হইলে গ্রহণীয়।

অন্নপূর্ণা নিজেই গেলেন মেয়ে দেখিতে; দেখিয়া তার চেহারা তাঁর পছন্দ হইল। পরিবার অভাবী সন্দেহ নাই; কিন্তু অভাবের মধ্যেই মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর একটি পরিপুষ্টি এবং পরিচ্ছন্নতা দেখা দিয়াছে।

মেয়ের মা শরৎ বলিলেন, বাপের চেহারা সুন্দর ছিল; স্বাস্থ্যও ছিল খুব ভাল।

—তিনি মারা গিয়েছিলেন কিসে? অন্নপূর্ণা জানিতে চাহিলেন।

সেও এক পরম দুঃখের কাহিনী। শরতের চোখ ছল্ছল্ করিতে লাগিল…

পরমেশ্বর রায় লেখাপড়া জানিতেন অল্প; তবে বাংলা-মতে হিসাব রাখায় এবং জমিদারী সেরেস্তার কাজে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। চাকরির চেষ্টা করিতে করিতে তাঁর চাকরি মিলিল রাজসাহীর এক বৃহৎ জমিদারের সেরেস্তায়; বেতন খোরাকী বাদে বার টাকা। কিন্তু সেখানে তিনি একটি দিনও কাজ করিতে পারেন নাই। রাস্তায় বোধ হয় অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়াছিলেন; ষ্টেশন হইতে জমিদারের কাছারিতে সন্ধ্যায় পৌঁছিবার পর ভোরবেলা কলেরায় আক্রান্ত হইয়া তিনি সেখানে, সেই নির্ব্বান্ধব বিদেশে, মারা যান—শুশ্রূষা কি চিকিৎসা সম্ভবতঃ হয় নাই।

কাঁদিতে কাঁদিতে বিধবা এই কাহিনী বিবৃত করিলেন; মেয়েটিও কাঁদিতে লাগিল, অন্নপূর্ণার চোখেও জল আসিল।

অন্নপূর্ণা দেখিলেন, মেয়েটির চোখে মুখে কথায় এমন একটি মৃদুতা আছে যা বিষণ্ণতার প্রকারান্তর নহে, নির্জ্জীবতার লক্ষণও নহে, নির্বুদ্ধিতার পরিণামও নহে, সুরুচিসম্পন্ন বিনয় এবং শোভনতার জ্ঞান। অন্নপূর্ণার মনে হইল, এই প্রকৃতির মানুষই হয় প্রকৃত প্রেমাকাঙ্ক্ষী, আর নিঃশব্দে যন্ত্রণা সহিতে পারে। কিন্তু কাজের বেলায় মেয়েটি ভারি দ্রুত, ভারি পরিচ্ছন্ন, একেবারে নিখুঁত।

এদিককার অবস্থাও অন্নপূর্ণা দেখিলেন, একখানা মাত্র

ঘর—তাহাতেই শোয়। ঘরখানা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া আছে; বাতাস কিছু প্রবল হইলেই ঘর ভূমিসাৎ হইবে বলিয়া অন্নপূর্ণার মনে হইল। ভূমিসাৎ হওয়ার সম্ভাবনার দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে শরৎ বলিলেন, হীরালাল বলে একটা লোক এখানে আছে; সে আমাদের দেখে শোনে। বাঁশ যোগাড় করে দেবে বলেছে। জলও পড়ে চাল দিয়ে; খড়ের ব্যবস্থা করতে পারলেই মেরামত করিয়ে দেবে।

মেয়েটি তার মাকেই বলিল, উইয়ে চাল রাখে না, মা···

—একটা কথা বলি যদি কিছু মনে না করেন।—অন্নপূর্ণা বিনীতভাবে বলিলেন।

—বলুন, বলুন। বলিয়া শরৎ অন্নপূর্ণার কথা শুনিতে আগ্রহান্বিতা হইয়া ভারি কুণ্ঠিত হইয়া রহিলেন; কথা বলিবার জন্য তাঁর অনুমতি চাহিয়াই যেন তাঁহাকে লজ্জাকর একটা গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, ঘর মেরামতের খরচটা আমিই দিতে চাই। নেবেন?

—সম্পর্ক ঘটুক, তার পর নেব।—বলিয়া শরৎ অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। হাসিটুকু ফুটিয়াছে সুখকর সম্পর্কের সূত্রেই, মন রাখিতে নয়, বা স্বার্থের প্রয়োজনে নয়, অন্নপূর্ণা তা পরিষ্কার ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলেন; বলিলেন: ঘটতে বাকি নেই। এ ত ঘটকের কথা নয়, আমি নিজে বলছি। ভাল করে মেরামত করান। এখন আমাকে নিঃসম্পর্কের লোক মনে করলে ভারি দুঃখিত হব।

শরৎ খানিক মুখ নত করিয়া রহিলেন; তার পর দান বা দয়া গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন; বলিলেন—নেব।

রান্নাঘরের সংস্কারের প্রস্তাবও অন্নপূর্ণা করিলেন; "অত খরচের" আপত্তি করিয়া শরৎ তাহাতেও সম্মতি দিলেন।

অন্নপূর্ণা তখন মেয়েটির নাম জানিতে চাহিলেন: মেয়ের নামটি কি?

—কিরণ, কিরণময়ী। ডাক নাম গুণ্‌না।

—বড় ছেলের নাম?

—অবনী।

—ডাকুন তাকে; একটু আলাপ করি তার সঙ্গে।

অবনীকে ডাকা হইল—

অন্নপূর্ণা তাহার সঙ্গে আলাপ করিলেন, অর্থাৎ জানিতে চাহিলেন: স্কুলে সে প্রত্যহই যায় কিনা, স্কুল কত দূরে অবস্থিত; মাহিনা দেয়, না, ফ্রী; কতগুলি বই পড়িতে হয়; সব বই আছে কি না; কখনো পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে কিনা, ইত্যাদি।

প্রথম সে দু'বার হইয়াছে; কিন্তু অন্য স্কুল হইতে একজন টিচারের সঙ্গে একটি ছেলে আসিয়াছে; তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছে না—দ্বিতীয় স্থানে নামিয়া আসিয়াছে।—বলিয়া অবনী পরাজয়ের দরুন অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল।

ছেলেটি বুদ্ধিমান সন্দেহ নাই; বইয়ের অভাবে তার অসুবিধা হয় এবং সে নানাজনকে তোয়াজ করিয়া লোকের অনুগ্রহভাজন হইয়া অর্দ্ধ বেতনে পড়ে, ইহাও দুঃখের বিষয়।

অন্নপূর্ণা বলিলেন: মেয়ের সঙ্গে ছেলেটিকেও আমি নেব; আমার কাছে রাখব, পড়াব।

জিজ্ঞাসু হইয়া শরৎ অন্নপূর্ণার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন···

অন্নপূর্ণা বলিলেন: এখানে থাকলে ছেলের সে-রকম উন্নতি হবে না। আমার কাছে থাকবে; বড় স্কুলে পড়বে; বাড়ীতে পড়া বুঝিয়ে দেবার লোক থাকবে। ছেলে মানুষ হলে এক দিন আপনার সুখের দিন আসতে পারে।

এক দিনকার এতবড় সৌভাগ্যের সম্ভাবনায় শরতের দু'চক্ষু সজল হইয়া উঠিল; বলিলেন: দিন বুঝি এসেছে, দিদি। আপনাকে পেয়ে বহুদিন পরে আজ আমি সুখের স্বাদ পাচ্ছি।

তার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন: আর একটি কথা, দিদি···

—কি কথা?

—দু'বছরের মধ্যে যদি ছেলে না হয় তবে আমি ছেলের আবার বিয়ে দেব।

শরৎ অকাতরে বলিলেন: নিশ্চয় দেবেন। অনেকেই তা দেয়। কিন্তু আপনার ছেলের বয়স ত বেশী নয়!

—অর্থাৎ দু'বছরের পরও আমি অপেক্ষা করতে পারি?

—হ্যাঁ।

অন্নপূর্ণা কথা কহিলেন না।

মেয়ে দেখিয়া অন্নপূর্ণা চলিয়া আসিলেন; কিরণকে তাঁর খুব পছন্দ হইয়াছে। অত্যন্ত নম্র ভদ্র পরিবার সন্দেহ নাই—অপরিচ্ছন্ন কি বুদ্ধিহীন নয় কেউই। কিরণই ভাই দুটিকে লালন করে; ভাইদের যত চাওয়া দিদিরই কাছে। কিরণের মুখের চেহারায় বেশ একটি লক্ষ্মীশ্রী আর বুদ্ধির স্বচ্ছ দীপ্তি আছে—কিন্তু তা শাণিত কি নগ্ন নয়, সহজ ব্রীড়ার আবরণে তা মধুর। সৌন্দর্য্যগত ত্রুটি ঢেরই আছে; কিন্তু অন্নপূর্ণা নিখুঁত অপ্সরা চান না—তিনি যা চান কিরণময়ীতে তা আছে। শরীরের গঠন আরও সৌষ্ঠবযুক্ত হইতে পারিত, কিন্তু এ-ও বেশ; রং কালো নয়; কণ্ঠস্বর ভারি মধুর; দাঁত-গুলি চমৎকার সাজানো—হাসিলে বেশ দেখায়। ভাবিয়া লইতে অন্নপূর্ণা কিছুমাত্র বাধা পাইলেন না যে, কিরণময়ী তৃপ্তি-প্রদ আর আনন্দজনক আর নিবিড়চিত্ত। আলস্যে কি অনিচ্ছায় তার হাত পা নিশ্চল হইতে জানে না—খাসা চলে; হস্তাক্ষর সুন্দর।

অন্নপূর্ণা অভয় দেন নাই, সে সুর তাঁর কণ্ঠে ফোটে নাই, কেবল বলিয়াছেন যে, বিবাহের দরুন "একটি পয়সাও" মেয়ের মাকে খরচ করিতে হইবে না—করিলে তিনি ব্যথিত হইবেন; উপকরণ বলিতে যা বুঝায় তা সমুদয়ই তিনি পাঠাইয়া দিবেন। ছেলেটিকেও তিনিই মানুষ করিবেন; ছুটিতে সে মায়ের কাছে আসিবে—যে-ক'দিন ইচ্ছা বাড়ীতে থাকিয়া যাইবে।

অবনী বলিয়াছিল: গরমের ছুটিতে আম কাঁঠাল খেয়ে যাব।

শুনিয়া ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে কিরণও হাসিয়াছিল।

অন্নপূর্ণা জানিতে চাহিয়াছিলেন, মেয়ের "কুষ্ঠী" আছে কি না? "নাই" শুনিয়া তিনি কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হন নাই; কারণ, ছেলের কোষ্ঠীতেই অদৃষ্ট এবং ভবিষ্যৎ লিপিবদ্ধ আছে—অদ্বিতীয় এক পণ্ডিত-দৈবজ্ঞের গণনা তা।

অন্নপূর্ণার হাতে টাকা আছে অনেক। শ্বশুরের টাকা ছিল প্রচুর; স্বামী জানকীজীবন হঠাৎ বড় চাকরি পাইয়া আগে করিয়াছিলেন ভবিষ্যতের চিন্তা—বহু টাকার জীবনবীমা করিয়াছিলেন। তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পর সেই টাকা অন্নপূর্ণা ভোগ করিতেছেন; কিন্তু মৃত্যুর দেওয়া দুঃখ তিনি ভুলিতে পারেন নাই। শরৎকুমারীকে তিনিও স্বামীর মৃত্যুর কাহিনী বলিয়াছেন—দুরন্ত সেই সান্নিপাতিকের কথা; এবং এ দুঃখও জানাইয়াছেন যে, এমন সুন্দর, এমন অপরূপ লক্ষ্মী মেয়ে কিরণময়ী এ জীবনে তৃষ্ণা মিটাইয়া বাবা বলিয়া ডাকিতে পাইল না।

এই কথায় সকলেরই মনে তখন অপার দুঃখ জন্মিয়াছিল

অন্নপূর্ণা সর্ব্বান্তঃকরণ ঢালিয়া দিয়া ভাবেন মেয়েটির কথা। এক কথায় সে 'দিব্যি", "প্রাণভরা", আর, এখনই যেন তাঁর চোখের তারা ভাবিতে ভাবিতে এক সময় হঠাৎ একটা নিঃশ্বাসের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া অন্নপূর্ণা দেখেন, তাঁহারই একটা নিঃশ্বাস পড়িয়াছে।

বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। অন্নপূর্ণার টাকায় এবং হীরালালের উদ্যমে শরৎকুমারী আয়োজন ব্যবস্থা করিলেন উৎকৃষ্ট, এবং বরযাত্রীরা পরি[illegible]রিল প্রচুর। আর, বউ দেখিয়া ওদিককার লোক এবং জামাই দেখিয়া এদিককার লোক প্রশংসা করিতে লাগিল ইহাই বলিয়া যে, ইহাকেই বলে শুভবিবাহ; দরিদ্রা বিধবার কন্যা অত্যন্ত আনন্দপ্রদভাবে বাঞ্ছনীয় ঘর আর বর পাইয়া গেল। ইহা, অর্থাৎ অসহায়ের নিঃসম্বল বিধবাকে কন্যাদায়ে উদ্ধার, যে করে সে নারী হইলে মহীয়সী, পুরুষ হইলে সে মহাশয় ব্যক্তি, ইত্যাদি।

উনিশ বছরের ছেলের এমন স্বাস্থ্যবতী ষোল বছরের বউ—ইহার ভিতরকার বেপরোয়া ভাবটার দিকে যে কেহই অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিল না এমন নয়, তবে তাহা চুপে চুপে; আবার, ইহাও অনেকের মনে হইল যে, অমন হইয়া থাকে—কোনো কোনো স্ত্রীলোকের পৌত্র কোলে পাইবার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত অসময়েই অতি দ্রুত অস্থিরকর হইয়া উঠে, বিশেষ করিয়া বিধবার—ক্ষুদ্রের প্রতি লোভ, আর, ক্ষুদ্র একটি তনুকে অবলম্বন করিয়া উদ্বেল স্নেহের সেচন, আর আত্মবিস্মৃতিকে এমন স্বর্গীয় সুখ মনে হয় যে, তার জ্ঞান থাকে না যেন! কাজে সাহায্য করিবার জন্যও কেউ কেউ বউ চায় বড়, আর তাড়াতাড়ি। এও হয়ত তাই।

তবু সকলেই স্বীকার করিল যে, বেমানান হয় নাই—ছেলের বয়স অল্প হইলেও শরীর বৃহৎ এবং বলিষ্ঠ—পুরুষশ্রী চমৎকার এখনই।

অল্প কথায়, দুর্লভপুরের লোকে বলিল, বৈবাহিকা নমস্যা, আর, জামাই সৎ এবং সুস্থ; আর কানাইগ্রামের লোকে বলিল, বধূ সুদর্শনা এবং সুলক্ষণযুক্তা।

বুদ্ধিমতী বধূ পাইয়া অন্নপূর্ণাও নিশ্চিন্ত হইলেন, খুশী হইলেন—বিস্মিতও হইলেন কম নয়; এমনটি পাইবেন বলিয়া তিনি সম্পূর্ণ আশা করেন নাই। ভগবান যেন স্বহস্তে সাজাইয়া আনিয়া হাতে তুলিয়া দিয়াছেন।

বধূ কিরণময়ী পিতৃগৃহে যেমন ছিল এখানেও সে ঠিক তেমনি কার্য্যকুশলা, সেবায় তৎপর, আর বেশ হাসিখুশী। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে তার ভাব হইয়াছে; তাহাদের সঙ্গে আলাপের সময়ে সে এমন সপ্রতিভভাবে এমন সঙ্গত সব কথা বলে যে, অন্নপূর্ণা অবাক না হইয়া পারেন না; তাঁর মনে হয়, তিনি কোনকালেই তা পারেন নাই, এখনও পারেন না। বাহিরের শিক্ষা নয়, প্রকৃতিই তাহাকে সর্ব্ববিষয়ে এমন নিপুণা করিয়া তুলিয়াছে। তাঁর আরও মনে হয়, এমনি মেয়েই সম্পদে বিপদে নিজেকে রক্ষা আর দৈবকে পরাস্ত করিয়া চলিতে পারে।

একটি বিষয়ে অন্নপূর্ণার অহেতুক আর অতিরিক্ত আগ্রহ দেখা যাইতে লাগিল: নিরবচ্ছিন্নভাবে বধূকে তিনি কাছে রাখিয়াছেন; মায়ের কাছে তাহাকে এক দিনের জন্যও যাইতে দেন না। অবনী তাঁরই কাছে থাকে। ছোট ছেলেকে সঙ্গে লইয়া শরৎ মাসে এক বার কি দুই বার আসিয়া দিনকতক মেয়ের বাড়ীতে থাকিয়া যান। তখন অন্নপূর্ণার দিনগুলি পরম আনন্দে কাটে।

ছেলে অশোককে কলেজ ছাড়িতে বাধ্য করিয়া অন্নপূর্ণা বাড়ীতে বসাইয়া রাখিয়াছেন; বলিয়াছেন: চাকরি করতে হবে না তোকে; টাকার জন্যে তোকে হয়রান হতে হবে

না। পুঁজি বাঁচিয়ে হিসেব করে চললে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব তোর কোনদিনই হবে না।

মা বিধবা। মায়ের সেই দুঃখই একান্ত আর দুস্তর। মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ আর মায়ের কথার প্রতিবাদ করিয়া অশোক তাঁর দুঃখ বাড়াইতে চাহে না। মায়ের আদেশে সে কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছে; বাড়ীতেই জ্ঞানার্জ্জন করে; আর সবজীবাগ প্রস্তুত করিয়া সেই উৎসাহেই সে স্বাস্থ্য এবং আনন্দ দুইই পাইতে চায়।

বধূ কিরণময়ীর বিষয়ে অন্নপূর্ণা আরও চিন্তা করেন এই সংশয় আর আনন্দের দোলায় দোল খাইতে খাইতে যে বউ যদি বন্ধ্যা হয়, অথবা যদি বন্ধ্যা না হয়! হইলে সে অনন্ত দুর্ভাগ্যের কি প্রতিকার সম্ভব, এবং না হইলে, অর্থাৎ বধূ পুত্রবতী হইলে, সে আনন্দ কতটা—অন্নপূর্ণা তা নিরূপণ করিতে পারেন না; ভাবিতে ভাবিতে অন্নপূর্ণার মাঝে মাঝে কিছুই ভাল লাগে না; মাঝে মাঝে অত্যন্ত কান্না পায়, সময় সময় মনে হয়, মানুষের প্রতি দুঃসহ নিষ্ঠুরতা করিয়াই অদৃষ্ট খুব কুটিল পথে জটিল গতিতেই চলে; অদৃষ্ট কখনও কখনও যেন যোগাযোগ আর ষড়যন্ত্রমূলক। মনের এই অবস্থায় তিনি বধূকে কাছে ডাকেন; কিন্তু তাহাকে কি বলিবেন, আর তাহাকে লইয়া কি করিবেন তার দিশা তিনি পান না; খানিকক্ষণ তাহাকে সামনে রাখিয়া হঠাৎ বলেন: কিছু নয়, মা। যাও।

কিন্তু অন্নপূর্ণা কেবল অদৃষ্টেরই উপর নির্ভর করিয়া নাই—কিরণময়ীকে তিনি যেন সহস্র চক্ষু মেলিয়া সতর্ক হইয়া পক্ষপুটে ধরিয়া রাখিয়াছেন—শরীরের এমনধারা অযত্ন সে না করে যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হইয়া তার সন্তানধারণের কাল বিলম্বিত বা সম্ভাবনা ব্যর্থ হইতে পারে; রোগের সৃষ্টি না হয়, জরায়ু ক্লিষ্ট না হয়!

এটা কেবল তাঁর স্নেহের চঞ্চলতা নয়, একটা আতঙ্কের অস্থিরতা যেন। কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া অশোক আর কিরণ উভয়েই কখনও অবাক হয়, কখনও হাসে।

বিবাহের দেড় বৎসর পরেই কিরণময়ীর গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পাইল; এবং তখনই দেখা গেল অন্নপূর্ণার এমন অদ্ভুত ভীতি আর অস্থিরতা যাকে বলা যায় প্রায় ক্ষ্যাপামি। বধূকে কেন্দ্র করিয়া এবং গর্ভস্থ সন্তানকে লক্ষ্য করিয়া সুরু হইল তাঁর অষ্টপ্রহরব্যাপী অভাবনীয় ঘূর্ণন, বাচনিক এবং দৈহিক···

—বউমা, খুব সাবধানে আছ ত?—বলিয়া বউয়ের দিকে নিষ্পলক চক্ষে তাকাইয়া অন্নপূর্ণা যেন অসাবধানতার লক্ষণই অনুসন্ধান করেন।—বলেন: খুব সাবধানে চলাফেরা করবে—পা টিপে, টিপে; মা, পা টিপে, টিপে। সিঁড়িতে উঠবে নামবে এমন আস্তে আস্তে যে, খবরদার যেন পা না হড়কায়! বুঝলে ত?

—হ্যাঁ।

—না, বোঝো নি।

কিরণময়ী বলে: না, মা, বুঝেছি।

—মনে থাকবে ত?

থাকবে মা।

অন্নপূর্ণা দৃঢ় স্বরে বলেন, থাকে যেন, সর্ব্বদাই যেন থাকে···

কেবল নিজে প্রহরা দিয়া, আর বধূকে সাবধানে থাকিতে আদেশ উপদেশ দিয়া ছেলেমানুষ বউয়ের সম্বন্ধে অন্নপূর্ণা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত নন—কিরণময়ীর ভাই অবনীকে তিনি গুপ্তচর, সেবক এবং শাসক নিযুক্ত করিয়াছেন। তার উপর তিনি ডাকাইলেন কবিরাজ রামপ্রাণ গুপ্তকে; তাঁর প্রশ্নের উত্তরে কবিরাজ বলিলেন, আছে বৈ কি সব; গর্ভিণীর স্নায়ু প্রভৃতি সুস্থ থাকবে, গর্ভস্থ সন্তান স্বাভাবিক সবল অবস্থায় থাকবে, এমন উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ঔষধ আমাদের আছে।

—তাই দেবেন; কিন্তু উগ্র না হয়।

—না, মা, মৃদুবীর্য্য।—বলিয়া কবিরাজ ঔষধ দিতে সম্মত হইলেন, এবং পাঠাইয়া দিলেন। সেই মৃদুবীর্য্য অথচ যথেষ্ট ফলপ্রদ ঔষধ কিরণময়ীকে প্রতিদিন সেবন করানো চলিতে লাগিল।

অশোক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপার কি?

কিরণময়ী বলে, মা আমাকে একেবারে রাজরাণী করে পাটে বসিয়ে রেখেছেন যেন! সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রাজপুত্র আসছেন।

—তা নয়তো কি! তিনখানা সিংহাসন তার জন্য পাতা আছে···

—কোন্ কোন্ রাজ্যে?

—মার বুকে, তোমার বুকে, আর আমার বুকে।

শুনিয়া কিরণময়ীর চোখ হঠাৎ সজল হইয়া ওঠে; অশোক চুম্বন করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করে, অর্থাৎ হাসায়।

কেবল কবিরাজই নয়, এবং কেবল ঔষধই নয়, আহ্বান পাইয়া জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিশালী এবং কররেখাবিচারক পরমব্রহ্ম ভট্টাচার্য্যও আসিলেন; তাঁর কাছে অন্নপূর্ণা জানিতে চাহিলেন আর কিছু নয়, কেবল এই কথাটি যে, প্রথম সন্তান পুত্র না কন্যা?

নানান স্থান এবং নানান সূত্র হইতে নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া পরমব্রহ্ম একেবারে নিঃসন্দেহ হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, প্রথম সন্তান পুত্রই।

শুনিয়া অন্নপূর্ণা আশ্বস্ত হইলেন—পরমব্রহ্মের উক্তি মিথ্যা হইবার নয়।

দেবালয়ে পূজা পাঠাইলে কোনও প্রকার সুফল পাওয়া যাইতে পারে কিনা তাহাও অন্নপূর্ণা জানিতে চাহিলেন।

কল্যাণার্থে দেবালয়ে পূজা প্রেরণ বাঞ্ছনীয় কার্য্য নিশ্চয়ই। পরমব্রহ্ম বলিলেন, পাঠাও মা, পূজা; তোমার যা কামনা দেবতাকে তা জানাও। দেবতা প্রসন্ন হলে সুফল নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

পূজা প্রেরিত হইল----

প্রসাদ আসিলে অন্নপূর্ণা বলিলেন, মাথায় ঠেকিয়ে মুখে দাও, বউমা; মনে মনে একটুও অভক্তি কি অবিশ্বাস করো না।

কিরণময়ী অঞ্জলি পাতিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিল; মাথায় ছোঁয়াইয়া তা মুখে দিল; অভক্তি কি অবিশ্বাস একটুও করিল না। অন্নপূর্ণা তার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন; দেখিলেন, বিশ্বাসে তৃপ্তিতে আর শ্রদ্ধায় তার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

মুখের এই ঔজ্জ্বল্য সম্পূর্ণ বজায় রহিল; এবং সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা সফল করিয়া হুলুধ্বনি আর অনন্ত পরমায়ুলাভের আশীর্ব্বাদের মাঝে কিরণময়ীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল; অন্নপূর্ণা চমকিত হইয়া উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁর এই অভিলাষটি ভগবান পূর্ণ করিয়াছেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটিল না---প্রসূতিপরিচর্য্যায় কিছুমাত্র ত্রুটি কি নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, ছেলের সর্ব্বাঙ্গই সুন্দর আর সুপরিপুষ্ট—সুস্বাস্থ্যের বৈলক্ষণ্য একটুও নাই।

ছেলের নাম রাখা হইল শুভময়। শুভময় বাড়িতে লাগিল···

এবং তারপরও কিরণময়ীর গর্ভে আর একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। ইহাদের দ্বারাই বংশের ধারা বহমান থাকিবে। অন্নপূর্ণা প্রায় নিশ্চিন্ত হইলেন।

মাত্র তেইশ বছর বয়সেই দুইটি সন্তানের জনক হইয়া অশোকের একটু ইতস্ততঃ ভাব আসিয়াছে—এটা যেন স্বেচ্ছাজনিত দুরবস্থার মত হাস্যকর আর করুণ। কিন্তু সেকথা ধর্ত্তব্য নয়, ধর্ত্তব্য ইহাই যে, জননী চরিতার্থ হইয়াছেন—তাঁর ইঙ্গিত ইহাই যে, পূর্ব্বপুরুষগণকে আর সংসারকে আনন্দপ্রদ দেয় বস্তু হিসাবে সন্তানের জন্মদান করিয়া সে তার কর্ত্তব্য সম্পাদন এবং ঋণ পরিশোধ করিয়াছে।

পরমব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য আসেন, যান; অন্নপূর্ণার সঙ্গে তাঁর কি কথা হয় তা জানা যায় না; কিন্তু দেখা যায় মাঝে মাঝে তিনি কিছু টাকা লইয়া চাদরে বাঁধেন; আর শনিবারে শনিবারে খুব সতর্কতা আর শুচিতার সহিত নিখুঁত আয়োজন করিয়া শনির পূজা করেন—সে পূজায় উল্লাস উৎসব কিছুই থাকে না, থাকে কেবল অটুট গাম্ভীর্য্য আর সুগভীর নিষ্ঠা।

দিন এমনি করিয়া পূজার্চ্চনার ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে শোচনীয় একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল অন্নপূর্ণার নিজের শরীরে আর মনে, কি কারণে তিনি নিঃশব্দ হইয়া উঠিতেছেন, আর সর্ব্বদাই তিনি অস্থিরচিত্ত তা বুঝা যায় না। দেখা যায়, তাঁর মুখ বড় শুকাইয়া উঠিতেছে; দিন দিন তাঁর শরীর শীর্ণতর হইয়া আসিতেছে; একটা শোকাচ্ছন্ন বৈরাগ্যবশতঃ তিনি যেন স্বতন্ত্র হইয়া যাইতেছেন···

অশোক আর কিরণের উদ্বেগ আর প্রশ্নের শেষ নাই: মা, তোমার শরীর এমন হয়ে যাচ্ছে কেন? কি হয়েছে তোমার বল।

অন্নপূর্ণা বলেন, কিছুই হয় নি রে! তোরা ভাবিস্ নে।

—নাতিরা এসে তোমার আয়ুহরণ করছে দেখছি! বলিয়া অশোক হাসিতে চেষ্টা করে। কিরণ বলে, মা বড্ড খাটেন ওদের নিয়ে।

—তা হতে দিও না। সেই মেয়েটাকে আবার রাখো না কেন? বেশ যত্ন করতে পারে। বলিয়া অশোক মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে।

কৈবর্ত্তদের একটি বার-তেরো বছরের মেয়েকে 'ছেলে ধরা'র জন্য রাখা হইয়াছিল। আন্না তার নাম। ছেলে রাখিতে রাখিতে আন্না ছোট ছেলেটাকে কোলে করিয়াই এক দিন আঁচলে পা বাঁধিয়া আছাড় খাইল। ছেলের গায়ে আঘাত কিছু লাগে নাই; কিন্তু সে ভয় পাইয়া কাঁদিল বিস্তর। আন্নার তেমন দোষ ছিল না; সে পরিয়া আসিয়াছিল তার মায়ের কাপড়; অতবড় কাপড় হঠাৎ এক সময় সামলাইতে পারে নাই—পায়ে জড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অন্নপূর্ণা তাহাকে ক্ষমা করিলেন না: যে মেয়ে অসাবধান তার কাছে ছেলে দিয়া বিশ্বাস নাই বলিয়া তিনি আন্নাকে তাড়াইয়া দিলেন। ছেলের হাত-পা ভাঙিতে পারিত; বুকে যদি আঘাত লাগিত!

শিহরিয়া উঠিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, সে মেয়েকে এনে আর কাজ নেই। সত্যি আমার শরীর খুব খারাপ দেখছিস তোরা?

—হাঁ, মা; খুব খারাপ হয়ে গেছে।

—তবে আমায় কল্‌কাতায় নিয়ে চল্। কিছু দিন স্থান বদ্‌লে আসি।

অশোকের মনে হইল, স্থানের একঘেয়েমিই বুঝি মায়ের কাতরতার কারণ; বলিল, চল।

বন্দোবস্ত হইয়া গেল—সবাইকে লইয়া অন্নপূর্ণা কলিকাতায় আসিলেন; বলিয়া আসিলেন, হে মা দুর্গা, সবাইকে বজায় রেখে যেন ফিরে আসতে পারি। বলিয়া দুর্নিবার একটা আবেগে বিহ্বল হইয়া এক বার পুত্রকে, এক বার বধূকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁর এই কান্নার কারণ না পাইয়া ওরা অত্যন্ত বিস্মিত হইল।

কিন্তু কলিকাতায় আসিয়াই অন্নপূর্ণা দেশে ফিরিবার জন্য

ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। দেখিলেন, কলিকাতায় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা অত্যধিক। বলিলেন, অনুমান করতে পারি নি যে, কলকাতা এমন প্রবল সাংঘাতিক স্থান! আমার বড় ভয় ভয় করছে।—বলিয়া তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিলেন; এবং দেশে ফিরিয়াই তাঁর মনে হইল, এখানে তাঁরা ভারি অসহায়। যে চিকিৎসকগণ অসুখ-বিসুখে এখানে তাঁদের শরণ্য তাঁদের ক্ষমতা অল্প। বলিলেন, চল্, কলকাতাতেই থাকি গিয়ে। কিন্তু তোরা কেউ বেরুতে পাবিনে আমার অনুমতি না নিয়ে। একটা চালাক-চতুর চাকর রাখতে হবে। তাকে সঙ্গে নিয়ে সবাই একসঙ্গে বেরুবো।

মা যেন দিশাহারা হইয়া গেছেন, এবং দিশাহারা করিয়া দিতেছেন; তবু সম্মত হইয়া অশোক সবাইকে লইয়া আবার কলিকাতায় আসিল। এবার সঙ্গে আসিলেন পরমব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য।

সবাইকে বাসা-বাড়ীতে আবদ্ধ রাখিয়া অন্নপূর্ণা পরমব্রহ্মকে সঙ্গে লইয়া নিত্য-নিয়মিতভাবে যাইতে লাগিলেন দেবতার দুয়ারে; সেখানে উপুড় হইয়া তিনি পড়িয়া থাকেন; তাঁর চোখের জলে সেই দুয়ার ভাসিয়া যায়; আশীর্ব্বাদভিক্ষা আর করুণাভিক্ষা তাঁর শেষ হইতে চাহে না।

পরমব্রহ্ম জানেন সব। কিন্তু এখন তিনি নিঃশব্দ, তিনি কেবল অন্নপূর্ণার সঙ্গী; বাড়ীতে থাকিতেই তাঁর যে কাজ ছিল তা সম্পন্ন হইয়াছে—সাত দিন তিনি হোমানল নির্ব্বাপিত হইতে দেন নাই।

আর একটি বিষয় অন্নপূর্ণা দিবারাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত্ত ধ্যান করিতেছেন, যার মত উগ্র আর সর্ব্বগ্রাসী আর কিছুই তাঁর সম্মুখে নাই। ১৩২১ সালে যার জন্ম, ১৩৪৫ সালে তার বয়স কত?

হিসাবটি অন্নপূর্ণা করেন—

তাঁর চোখের পাতা কখনো নিস্পন্দ হইয়া আসে, কখনো চক্ষু নিমীলিত হইয়া থাকে—সংসারের গতির দিকে আর আলোর দিকে আকর্ষণ বিলুপ্ত হইয়া যায়—বুকের শিরা ফট্-ফট্ করিয়া দুস্তর অন্ধকারের মাঝে তিনি মাটিতে লুটাইয়া পড়েন।

'৪৫ সাল চলিতেছে। অন্নপূর্ণা সবাইকে খুব সাবধানে, নিজেকে ধ্যানমগ্ন, আর সর্ব্বাঙ্গে ও সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভূত একটা অতলস্পর্শতার মাঝে একমাত্র ভরসাস্থল মনে হওয়াতে পরমব্রহ্মকে কাছে রাখিয়াছেন।

সাবধানে থাকিতে থাকিতে এবং রক্ষাকর্ত্তা দেবতাকে আহ্বান করিতে করিতে এক দিন অন্নপূর্ণা অশোকের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন—চক্ষের নিমেষে প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। অশোককে অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লিষ্ট পাণ্ডুর দেখাইতেছে···

অশোক বলিল, মাথাটা বড্ড ধরেছে মা; ফেটে যাচ্ছে যেন। তার পর "শোব" বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে যাইয়া সে উঠিতে পারিল না। অন্নপূর্ণা তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া শোয়াইয়া দিলেন—তখন অশোক ঘামিতেছে; দেখিতে দেখিতে ঘাম গলদধারে বহিতে লাগিল; তার পরই অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে।

পরমব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য অন্নপূর্ণার মুখের দিকে এক বার দৃষ্টিপাত করিয়াই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

তক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা হইল—

আরও ডাক্তার আসিল; তার পর আরও বড়; তার পর তাঁরও বড়; কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা এবং চিকিৎসা ব্যর্থ হইয়া গেল—অশোক বাঁচিল না; জননীকে পুত্রহীন, কিরণময়ীকে বিধবা, আর পুত্র দুটিকে পিতৃহীন করিয়া সে চলিয়া গেল।

তিন দিন নিঃশব্দ আর অনাহারে থাকিবার পর অন্নপূর্ণা কথা কহিলেন; বিধবা পুত্রবধূকে ডাকিয়া সম্মুখে আনিলেন—তার রিক্ত মূর্ত্তির দিকে শুষ্ক নিষ্পলক চক্ষে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে অন্নপূর্ণার যখন মনে হইতে লাগিল, তাঁর অপরাধের সীমা নাই, আর ক্ষমা নাই, তখন তিনি কথা কহিলেন; বধূর দুটি হাত দু'হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, মা, আমায় ক্ষমা কর। এ আমি জানতাম···

তার পর আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, কোষ্ঠীর কথা ফলেছে; তার আয়ুর শেষ দিয়ে সে গেছে। বংশধর চেয়ে সেই আকাঙ্ক্ষার যূপে তোকে বলি দিয়েছি।

কিরণময়ী বিভ্রান্ত চক্ষে অন্নপূর্ণার মুখের দিকে খানিক তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রার ঐতিহাসিক মূল্য অত্যধিক। এই মুদ্রাসমূহের গবেষণা দ্বারা অতীত ভারতের অনেক লুপ্ত ইতিহাসই আজ আমাদের জানা সম্ভব হয়েছে। কত বিস্মৃত-যুগের সাংস্কৃতিক আলেখ্য যে এই মুদ্রাতত্ত্ব আমাদের মানসপটে এঁকে দিয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। প্রাচীন ভারতের অধিবাসীরা কোন্ কোন্ ধর্ম্মে আস্থাবান ছিল, কোন্ কোন্ দেব-দেবীর নিকট তারা তাদের মনের কথা জানাত, বৈদেশিক সংস্কৃতি কিভাবে হিন্দু-সভ্যতার স্বর্ণ-উর্ণনাভের জালে ধরা দিয়েছিল এবং ভারতীয়দের সামরিক দক্ষতা ও বীর্য্যবত্তা কত উচ্চস্তরের ছিল, এ সকলের অনেকটাই উদ্ঘাটিত হয়েছে ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্বের গবেষণার দ্বারা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, ইন্দোগ্রীক এবং গুপ্ত রাজন্যবর্গের মুদ্রা আবিষ্কৃত না হলে তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কথাই আজ আমাদের অজানা থেকে যেত।

অতি প্রাচীন যুগে, সম্ভবতঃ বুদ্ধের সমসাময়িক কাল থেকে সমগ্র ভারতবর্ষে "লাঞ্ছনযুক্ত" অথবা "চিহ্নযুক্ত" রজত এবং তাম্র মুদ্রার (Punch-marked coins) বহুল প্রচলন ছিল।* এই মুদ্রাগুলি সাধারণতঃ চতুষ্কোণ অথবা গোলাকৃতি এবং দুই পৃষ্ঠই একাধিক চিহ্নসংযুক্ত। এর উপরিভাগের (obverse) চিহ্নগুলি নিম্নভাগের (reverse) চিহ্নগুলির চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী। এই লাঞ্ছনযুক্ত মুদ্রাগুলি থেকে আমরা অতীত ভারতের সংস্কৃতি, ধর্ম্ম এবং রাজনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করতে সক্ষম হই। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ ব্যাখ্যা করেন যে, এই রৌপ্য এবং তাম্রমুদ্রাগুলি যথাক্রমে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে বর্ণিত "পুরাণ" (অথবা "ধরণ") এবং কার্ষাপণ (পালী, "কাহাপন") মুদ্রা।(*) এই মুদ্রাগুলিতে বহুপ্রকার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এই চিহ্নগুলির নানারূপ ধর্ম্মগত সংজ্ঞা আছে। থিওবোল্ড সাহেব উপরোক্ত লাঞ্ছনসমূহকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, যথা:

১। মনুষ্যমূর্ত্তি; ২। মানুষের দ্বারা নির্ম্মিত অস্ত্র-শস্ত্র, নানাবিধ দ্রব্য এবং স্তূপ (অথবা চৈত্য) ইত্যাদি; ৩। পশু-সমূহ; ৪। বৃক্ষ এবং তৎশাখা-প্রশাখা ও ফলসমূহ; ৫। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র এবং শৈবপূজা-সম্পর্কিত চিহ্নসমূহ; ৬। অন্যান্য চিহ্নসমূহ।
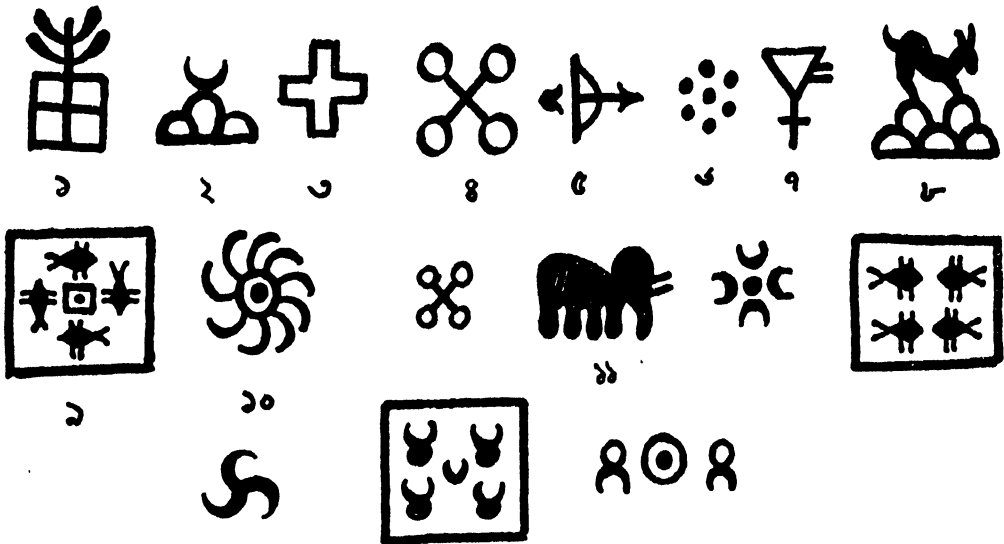
ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতানুযায়ী এই লাঞ্ছনগুলিতে পালী "মহাসুদস্সন সুত্তে" বর্ণিত রাজ-চক্রবর্ত্তীর অপরিমেয় শক্তি-

লাঞ্ছনযুক্ত মুদ্রার কয়েকটি সাধারণ চিহ্ন

(প্রাচীন মুদ্রা চিহ্নের অনুকরণে সাধারণ শিল্পী—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাল কর্ত্তৃক অঙ্কিত)

---

*Allan—*Catalogue of the coins of Ancient India,* Introducction.

এলানের মতে এই মুদ্রাসমূহের অধিকাংশই মৌর্য্যযুগে (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩২৫-১৮৭ অঃ) ভারতে প্রচলিত ছিল।

* আধুনিক "কাহন" কথাটি সম্ভবতঃ এই "কাহাপন" থেকেই এসেছে।

জ্ঞাপক "সপ্তরত্ন" চিহ্ন বিদ্যমান।* বৌদ্ধ-পালি সূক্তে বর্ণিত এই "সপ্তরত্ন" নিম্নরূপ, যথা: ১। চক্র, ২। হস্তী, ৩। অশ্ব, ৪। মণি, ৫। স্ত্রী, ৬। গৃহপতি, ৭। 'পরিণায়ক' অথবা মন্ত্রী। ডাঃ ভাণ্ডারকারের মতে প্রাচীন কার্ষাপণে "সপ্তরত্নে"র চিহ্নসমূহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। কারণ সেই অতীত-যুগে হিন্দু এবং বৌদ্ধ রাজন্যগণ নিজেদের রাজ-চক্রবর্ত্তীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকতেন। তিনি বলেছেন,

"All these symbols can be easily recognised on the Karshapanas, and their presence is quite natural and intelligible on coins which are indicative of sovereignty."

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, লাঞ্ছনযুক্ত মুদ্রাগুলির বিভিন্ন চিহ্নসমূহের মধ্যে 'রেলিং' পরিবেষ্টিত বৃক্ষ(১), চক্র, চৈত্য(২), (অথবা পর্ব্বত), স্বস্তিকা, ক্রুশ(৩), তথাকথিত উজ্জয়িনী-চিহ্ন (Ujjaini symbol)(৪), ধনুর্ব্বাণ(৫), মৎস্যপূর্ণ বঙ্কিম নদী, বিন্দুমণ্ডল(৬), জয়ধ্বজ(৭), সৌর চিহ্ন(১০), হস্তী(১১), চতুষ্কোণ পুষ্করিণী-মধ্যস্থ শিবলিঙ্গসমূহ(৯) অন্যতম। এই চিহ্নগুলির নমুনা উপরে দেওয়া হ'ল।

এই সমস্ত অঙ্কচিহ্ন সম্বন্ধে নানারূপ ব্যাখ্যা আছে। কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে এই চিহ্নগুলিতে প্রাচীন ইরাণের জরথুস্ত্রীয় ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান। অন্যান্য অনেক মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ এই লাঞ্ছনসমূহে হিন্দুধর্ম্ম অথবা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রকাশ দেখতে পান। আবার অনেকের মতে এগুলি মূলতঃ প্রাচীন ভারতীয় তান্ত্রিক চিহ্ন। এই সব মতের সমর্থক প্রমাণাদি আলোচনা করলে মনে হয়, লাঞ্ছনযুক্ত মুদ্রার চিহ্নসমূহ একযোগে একাধিক ধর্ম্মের দ্যোতক। সুতরাং এগুলিকে কোনও একটি বিশেষ ধর্ম্মের চিহ্ন বলে ধরে নিলে হয়ত আমরা ভ্রমে পতিত হব।

উপরোক্ত লিপিবিহীন লাঞ্ছনযুক্ত মুদ্রা ব্যতীত উত্তর এবং মধ্য ভারতের বিভিন্ন জনপদে এক রূপ লিপিসংযুক্ত মুদ্রার প্রচলন ছিল। এই সকল অনতিবৃহৎ জনপদ "কুলিন্দ", "যৌধেয়", "আর্জ্জুনায়ন", "কাড়", "মালব", "শিবি" এবং "বটাশ্বক" জাতি দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। এই মুদ্রাগুলি সাধারণতঃ তাম্র, রৌপ্য অথবা "পোটিন" (Potin) ধাতু দ্বারা গঠিত। এর কোন কোনটিতে প্রাচীন 'ব্রাহ্মী' অথবা "খরোষ্ঠি" অক্ষরে বিভিন্ন জাতির নামোল্লেখ আছে। যথা:

১। যৌধেয় গণস্য জয়—যৌধেয় 'গণে'র (প্রজাতন্ত্র) জয় হোক।

২। আর্জ্জুনায়নানাং জয়—আর্জ্জুনায়নগণের জয় হোক।

৩। কাড়স—কাড়গণের।

৪। রাজ্ঞকুণিংদস্য অমোঘভূতিস্য মহারাজস্য—কুণিন্দগণের মহারাজ অমোঘভূতির। ইত্যাদি।

এই সব জনপদের মুদ্রা প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের উপর প্রচুর আলোকপাত করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, এই ধরণের অনেক মুদ্রায় "নৈগম", "গণ", "জনপদ" ইত্যাদি গণতন্ত্রমূলক শাসনব্যবস্থার উল্লেখ আছে। অপর পক্ষে, "যৌধেয়"দের তাম্র এবং রজত-মুদ্রায় কার্ত্তিকেয়ের সমর-সজ্জা এই জাতির সামরিক প্রতিভা ও বীরত্বের অকাট্য সাক্ষ্য দিচ্ছে। যৌধেয় জাতির সামরিক দক্ষতার আভাস "গুপ্ত" বংশীয় সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের "এলাহাবাদ প্রশস্তি" থেকেও জানা

ছদ্মনামা গুপ্ত সম্রাট প্রকাশাদিত্যের মূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা
(মূল মুদ্রাচিত্র থেকে শিল্পী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাল কর্ত্তৃক অঙ্কিত)

যায়। এতদ্ব্যতীত যৌধেয়দের কয়েক শ্রেণীর মুদ্রার ওজন এবং নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য দেখে মনে হয়, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ উন্নত ছিল।

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩২৫ অব্দে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। পঞ্চনদ-বিধৌত পঞ্জাবের অগণিত ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজ্যের সেনাবাহিনীকে তিনি পরাজিত করেন। তৎপরে নিজ সৈন্যদল সংগ্রামবিমুখ হয়ে পড়লে স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করতে বাধ্য হন। কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথি-মধ্যে ব্যাবিলনে তিনি সপুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্ভবতঃ আলেকজাণ্ডার উপরোক্ত প্রাচীন নগরে পঞ্জাবের নির্ভীক নৃপতি পুরুরাজের সঙ্গে বিতস্তানদীর তীরবর্ত্তী যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের দৃশ্য অঙ্কিত করে এক শ্রেণীর মুদ্রার প্রচলন করেন। এই মুদ্রার এক দিকে হস্তিপৃষ্ঠে পুরুরাজকে অশ্বারোহী আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে সংগ্রামরত অবস্থায় দেখানো হয়েছে।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর উত্তর-ভারতে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং গ্রীক রণলিপ্সুগণ উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১৮৭

* D. R. Bhandarkar—*Charmichael Lectures*, 1921; p. 102. Maxmuller—"*Sacred Books of the East*," Vol. XI; pp. 152 ff.

3. Ibid, p. 102.

অব্দে শেষ মৌর্য্যসম্রাট বৃহদ্রথের মৃত্যুর পর উত্তর-ভারতে মৌর্য্যগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী শাসনব্যবস্থার পতন ঘটে এবং এই সুযোগে হিন্দুকুশের ওপারের "ব্যাকট্রিয়া" অথবা বহ্লিকের গ্রীক রাজন্যগণ ক্রমাগত উত্তর-ভারতে সামরিক অভিযান চালাতে থাকে। তারা পঞ্জাবের অধিকাংশ অঞ্চলও জয় করতে সক্ষম হয়। ভারত আক্রমণের সময় এই "ইন্দো-ব্যাক্ট্রীয়" নৃপতিরা আত্মসংঘর্ষেও লিপ্ত হয়। এই গৃহযুদ্ধে ইউথিডেমস (Euthydemas) এবং ইউক্রেটাইডিসে (Eucratides) এই দুটি রাজবংশের লোকেদের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এশিয়া-প্রবাসী হেলেনীয়দের এই অভিযানের কথা প্রাচীন "গার্গীসংহিতা" পুরাণসমূহ, পতঞ্জলির "মহাভাষ্য", কলিঙ্গরাজ খারবেলের "হতীগুম্ফা অনুশাসন",, সাতবাহন সম্রাট গৌতমী পুত্র সাতকর্ণির "নাসিক-প্রশস্তি", কবি কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্রম" ইত্যাদি থেকে বিশদ ভাবে জানা যায়। "ইন্দো-গ্রীক" যোদ্ধগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপলক্ষে গার্গী-সংহিতায় বর্ণিত আছে :—

"মধ্যদেশে ন স্থাস্যন্তি যবনা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ
তেষাম্ অন্যোন্য সংভাবা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ
আত্ম-চক্রোত্থিতং ঘোরং যুদ্ধং পরম দারুণং।"* ইত্যাদি।

কি করে গ্রীক প্রভুত্ব পঞ্জাব এবং আরও পূর্ব্ববর্ত্তী মথুরা অতিক্রম করে "পুষ্পপুর" অথবা পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় তা গার্গীসংহিতায় বর্ণিত হয়েছে। এখন আলেকজাণ্ডারের পরবর্ত্তী হেলেনীয় নৃপতিদের এই সব আক্রমণ এবং আত্ম-সংগ্রামের ("আত্মচক্রোত্থিতং ঘোরং যুদ্ধং..." ইত্যাদি) কথা তাঁদের দ্বারা অঙ্কিত মুদ্রা থেকে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা গেছে যে, ইউক্রেটাইডিস্ এবং তাঁর উত্তরাধিকারী আপোল্লোডোটাস্ তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীবংশীয় নৃপতি ডিমেট্রিয়স এবং প্রথম ষ্ট্রাটোর মুদ্রা পুনর্নির্ম্মাণ করেছিলেন। এর থেকে মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, ইউক্রেটাইডিস্ এবং আপোল্লোডোটাস্ যথাক্রমে ডিমেট্রিয়াস্, এবং প্রথম ষ্ট্রাটো ও এগাথোক্লিয়াস্‌কে পরাজিত করে তাঁদের মুদ্রা নিজ নিজ রাজ্যে পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন।

* Pargiter—"*Dynasties of the Kali Age*", pp. 56, 74.
H. C. Raychaudhuri—"*Political History of Ancient India,*" fourth edition, p. 322.
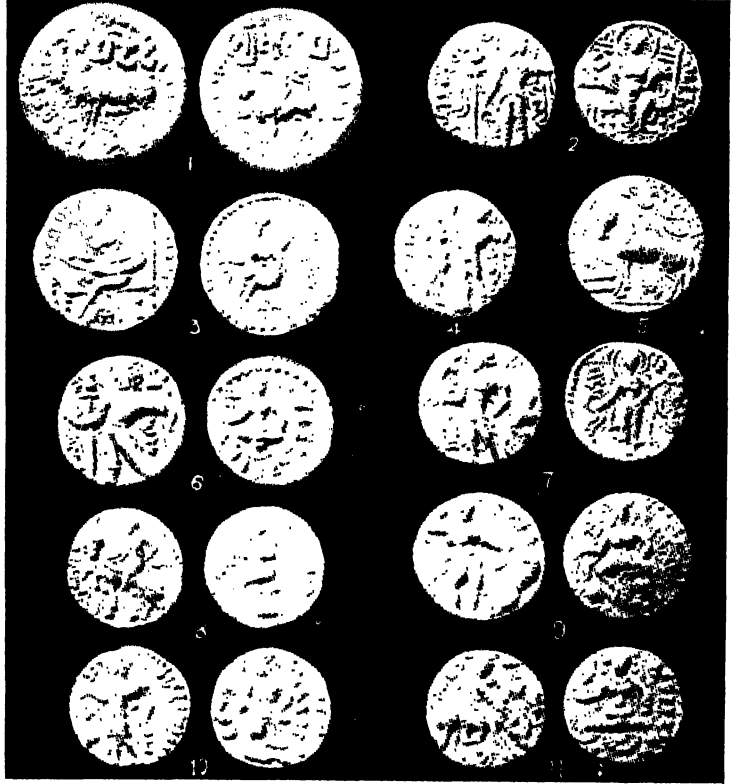
গুপ্ত সম্রাটগণের মুদ্রা
(৩২৫—৫১০ খ্রীঃ অঃ)

ইন্দো-গ্রীক মুদ্রায় সাধারণতঃ উপরিভাগে রাজার শিরস্ত্রাণ-পরিহিত আবক্ষমূর্ত্তি এবং নিম্নভাগে কোন হেলেনীয় অথবা হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্নাংশে দেব-দেবীর পরিবর্ত্তে তাদের বাহনের ছবি উৎকীর্ণ থাকে।* মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, এই "reverse"-এর চিত্র নিশ্চয়ই কোন বিশেষ বিশেষ নগর অথবা জনপদের লাঞ্ছন। দৃষ্টান্তস্বরূপ—জিউস দেবতার চিত্র সম্ভবতঃ প্রাচীন হিন্দুকুশে অবস্থিত কাপিশ (বর্ত্তমান কাফিরিস্থান) নগরের চিহ্ন। প্রাচীন চৈনিক বিবরণ থেকে অনুমিত হয় যে এই নগরে ইন্দ্রদেবের পূজার বিশেষ প্রচলন ছিল। সম্ভবতঃ ভারতীয় গ্রীকগণ এই দেবতাকে জিউস হিসাবে ভক্তি করত এবং স্বভাবতঃই এই নগরের মুদ্রাসমূহে জিউস অথবা ইন্দ্র-দেবের চিত্র অঙ্কিত করা হ'ত।

ইউথিডেমস বংশীয় নৃপতিগণ সাধারণতঃ তাঁদের মুদ্রায় বজ্রনিক্ষেপরতা যুদ্ধদেবী প্যালাস এথেনির† দণ্ডায়-মান মূর্ত্তি খোদিত করতেন। এই দেবীর চিত্রকে এক

* যথা—হস্তী, বৃষ ইত্যাদি।
† প্রাচীন রোমানদের নিকট "মিনার্ভা" নামে পরিচিত।

কথায় ইউথিডেমস্ এবং তৎপুত্র ডিমেট্রিয়-সের বংশগত লাঞ্ছন বলা যায়। অপর-পক্ষে, ইউক্রেটাইডিস্ বংশীয় নৃপতিগণের মুদ্রায় সিংহাসনে উপবিষ্ট দেবরাজ জিউস এবং যোদ্ধবেশে অশ্বারোহী ডিয়স্কুরি (Dioscuri) দেব-ভ্রাতৃদ্বয়ের* চিত্রই অধিক ব্যবহৃত হ'ত। কোন কোন ক্ষেত্রে ডিয়স্কুরির পরিবর্ত্তে তাঁদের একপ্রকার পিণ্ডাকৃতি শিরোভূষণও (Pibi) মুদ্রার reverse-এ পরিদৃষ্ট হয়।

মধ্য-এশিয়া থেকে আগত "শক" ও "পল্হব"গণ (Parthian) আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভারতীয় গ্রীক-গণকে পরাজিত করে পঞ্জাব এবং উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অনেক স্থান অধিকার করে। এই সব "শক-পল্হব" (Scytho-Parthian) নৃপতিগণ ইন্দো-গ্রীক মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা প্রস্তুত করেন এবং মুদ্রার দুই পৃষ্ঠে গ্রীক ও প্রাচীন "খরোষ্ঠি" অক্ষরে† নিজেদের নাম উৎকীর্ণ করেন। শক-পল্হব মুদ্রায় গ্রীক এবং হিন্দু দেব-দেবীর সমন্বয় প্রথম ব্যাপক ভাবে পরিদৃষ্ট হয়। সম্রাট মাওয়েস (Maues), প্রথম এজেস (Azes I), এজিলিসেস (Azilises), দ্বিতীয় এজেস (Azes II), ভোনোনিস (Vonones), স্পালাগদম (Spaladama), স্পালিডাইজিস (Spalideises), গোণ্ডোফারনিস (Gendophernes), আবডাগাসেস (Abagases), সস (Sasa), পাকোরিস (Pakores), সোটের মেগাস'‡ (Soter megas) এবং হাইড্রোকিসের (Hydrokes) মুদ্রায় যুগপৎ হিন্দু এবং গ্রীক ধর্ম্মের ভাব পরিলক্ষিত হয়। এজেসের (প্রথম কি দ্বিতীয়) স্বর্ণ, রজত এবং তাম্র মুদ্রায় যুগপৎ হিন্দু ও গ্রীক দেব-দেবীর যথা, পালাস এথেনি, জুপিটার, মহাদেব ইত্যাদি) সমাবেশ আছে। পল্হব নৃপতি গোণ্ডোফারনিসের নানাবিধ মুদ্রায়ও জুপিটার, পালাস এবং ত্রিশূল হস্তে মহাদেবের চিত্র দেখা যায়।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্য এবং শেষভাগে মধ্য-এশিয়া থেকে আগত বিখ্যাত "ইউ-চি" জাতির শাখা "কুশান"গণ কর্ত্তৃক প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত অধিকৃত হয়। এই কুশানগণও "ইন্দো-গ্রীক" এবং "শক-পল্হব" মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা নির্ম্মাণ করেন। তবে এই সব মুদ্রায় মধ্য-এশিয়াবাসী কুষাণ-রাজন্য-বর্গের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আকৃতি এবং যোদ্ধবেশে তাদের ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। কুষাণ নৃপতিদের লম্বা "বুট" এবং বড় "ওভার-কোট" আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর রুষদেশীয় দুর্দ্ধর্ষ "কশাক" সেনাপতিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রথম ও দ্বিতীয় কদফেস্, কনিষ্ক, হুবিষ্ক, বাসুদেব এবং অন্যান্য কুষাণনৃপতিগণ সম্ভবতঃ নিজেদের "দেবপুত্র" জ্ঞান করতেন। হয়ত এইজন্যই তাঁদের মুদ্রার উপরিভাগে (Obverse) দেখানো হয়েছে যে, তাঁদের স্কন্ধ থেকে ধূম্র অথবা মেঘ উৎপন্ন হচ্ছে।

"শক" এবং "পল্হব" নৃপতিগণের মুদ্রা
(খ্রীঃ পূঃ ১০০০—খ্রীষ্টীয় ১০০ অব্দ)

কুষাণমুদ্রাগুলির মধ্যে রাজা কনিষ্ক এবং তৎপুত্র হুবিষ্কের মুদ্রাসমূহ বিশেষ চিত্তাকর্ষক। এই মুদ্রাসমূহের নিম্নভাগের চিত্রে এশিয়ার বহু ধর্ম্মের শিল্পাভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। কনিষ্ক এবং হুবিষ্কের মুদ্রায় ইউরোপ এশিয়ার বিভিন্ন

* এই ভ্রাতৃদ্বয় হিন্দুশাস্ত্রের অশ্বিনী-ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে তুলনীয়।

† আনুমানিক খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পারস্যের প্রভাবে তক্ষশীলা ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে এই লিপির সৃষ্টি হয়।

‡ "সোটের মেগাস" অর্থ "মহাত্রাতা" (Great Saviour); রাজার প্রকৃত নাম জানা যায় না।

দেব-দেবীর বিচিত্র সমাবেশ সত্যই অতুলনীয়।* এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ কেনেডি মন্তব্য করেছেন,

"It was from Babylonia and Mesene that Kaniska derived the greater part of his pantheon—a pantheon, perhaps without an equal, until Heliogabadus in his youthful extravagance assembled all the gods of the empire on the Capital at Rome to do homage to the black-stone of Emesa.

কুষাণ সম্রাটগণের মুদ্রা
(খ্রীষ্টীয় ১০০—৫০০ অব্দ)

অর্থাৎ—"কনিষ্ক যে সব দেবদেবীর উপাসনা করতেন তার অধিকাংশ বেবিলন এবং মেসেনিতে পূজিত হ'ত। এইরূপ বিভিন্ন দেব-দেবীর অপূর্ব্ব সমাবেশ আর একবার দেখা গিয়েছিল যখন রোমক-সম্রাট হেলিয়গাবালাস্ তারুণ্যসুলভ খেয়ালবশত: এমেসার কৃষ্ণপ্রস্তরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তাঁর সাম্রাজ্যে পূজিত নানা দেব-দেবীর বিপুল সমাবেশ করেছিলেন।"

এই সকল দেব-দেবীর নাম সাধারণত: কনিষ্কের মুদ্রায় পাওয়া যায়—মজদুয়ানো, নানা, নানাইয়া, নানাশাও, ওয়েশো (মহাদেব), হেফাইষ্টস, মাও (চন্দ্র), হেলিওস (সূর্য্য), বোড্ডো (বুদ্ধ), অথ্শো (অগ্নি), সালেনি (চন্দ্র), ফারো (অগ্নি), আরডোক্সো, মানাওবাগো, ইত্যাদি।

সম্রাট হুবিষ্কের মুদ্রায় যে সকল দেব-দেবীর মূর্ত্তি পাওয়া যায় সেগুলি হচ্ছে :

মআসেনো (মহাসেন অথবা কার্ত্তিকেয়), মাও, নানা, ইরাকিলো (হারকিউলিস্), নানাশাও, স্কন্ধ কুমার বিশাখ, মীরো (মিহির), সরপো, উরোন (বরুণ), আরুয়াস্পে, ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শতকে কুষাণগণের পতনের ফলে উত্তর-ভারতের "ইউ চি" সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ফলে অর্থনৈতিক কারণে বহুদিন উত্তরাপথে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং ভারী সুবর্ণ, রজত ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন ক্রমেই বিরল হয়ে আসে। কারণ দেখা গেছে যে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি ভিন্ন উচ্চশ্রেণীর মুদ্রার প্রচলন সম্ভব নয়। এই অনুকূল অর্থনৈতিক পরিবেশ বৃহৎ সাম্রাজ্যে থাকাটাই সম্ভব।

উত্তর-ভারতে কুষাণ-সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় দেড় শত বৎসর পরে চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাচীন মগধকে কেন্দ্র করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়। এই বংশীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত (আনুমানিক ৩৩০-৩৮০ খ্রী: অ:), দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (আ: ৩৮০-৪১৪ খ্রী: অ:), কুমারগুপ্ত (আ: ৪১৪-৪৫৫ খ্রী: অ:), স্কন্দগুপ্ত (আ: ৪৫৫-৪৬৭ খ্রী: অ:), পুরুগুপ্ত(আ: ৪৬৭-৬৯ খ্রী: অ:), নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য (আ: ৪৬৯-৭৩ খ্রী: অ:), দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত (আ: ৪৭৩-৭৪ খ্রী: অ:) বুধগুপ্ত, (আ: ৪৭৬-৪৯৫ খ্রী: অ:), বৈন্যগুপ্ত (আ: ৫০৭-৫০৮ খ্রী: আ:) এবং অন্যান্য নৃপতিদের অসংখ্য সুবর্ণ, রজত এবং তাম্রমুদ্রা উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। সুবর্ণ মুদ্রাসমূহের এক পৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে এবং অন্য পৃষ্ঠে সাধারণত: সিংহাসন অথবা প্রস্ফুটিত পদ্মোপরি আসীন হিসাবে লক্ষীমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। গুপ্ত যুগের প্রারম্ভের মুদ্রাগুলির অধিকাংশ কুষাণমুদ্রার অনুকরণে তৈরি। মুদ্রাপৃষ্ঠে অঙ্কিত লক্ষীমূর্ত্তি ত কুষাণমুদ্রার আর্ডোক্সো-দেবীরই এক নবরূপ। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এক শ্রেণীর গুপ্তমুদ্রাও কুষাণমুদ্রার অনুকরণে রোমক-

* R. B. Whitehead—*Catalogue of coins in the Punjab Museum*, Vol. I, Section III, intro.

"The reverse of the coins of Kaniska and Huviska present us with a strange and extensive gallery of deities with Greek, Buddhist, Indian and Iranian names."

J. Kennedy—*Journal of the Royal Asiatic Society*, 1912, p. 1003.

তৌলরীতি অনুসারে প্রস্তুত হ'ত।* সমুদ্রগুপ্তের গরুড়ধ্বজ-হস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রাগুলি যেন এক শ্রেণীর কুষাণমুদ্রার প্রতিরূপ। পার্থক্য কেবল গুপ্তমুদ্রার লালিত্যমণ্ডিত ভারতীয় ভঙ্গিতে। এই মুদ্রার উপরিভাগে আছে গুপ্তসম্রাটের পৌরুষ-দৃপ্ত অপরূপ মূর্ত্তি, অঙ্গে তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গি এবং স্কন্ধে আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশদাম। এই সকল মুদ্রা থেকে গুপ্ত-সম্রাটদের শৌর্য্য এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে কতকটা ধারণা জন্মে।† সত্যই গুপ্তমুদ্রাগুলি যেন প্রাচীন ভারতের গুপ্ত সম্রাটগণের সুস্পষ্ট জীবনালেখ্য। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় যেমন তাঁর বীরত্বের নিদর্শন দেখতে পাই তেমনি এগুলি এক অনবদ্য শিল্পসুষমায়ও মণ্ডিত হয়ে রয়েছে। কোন কোন সুবর্ণমুদ্রায় ধনুর্ব্বাণ, পরশু অথবা গরুড়ধ্বজ হস্তে তাঁর শৌর্য্যদৃপ্ত মূর্ত্তি দেখতে পাই, আবার কোন কোন মুদ্রায় তিনি নগ্ন ও পেশীবহুল গাত্রে রত্নালঙ্কার ভূষিত হয়ে বঙ্কিম বীণাবাদনরত অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হন। এই মুদ্রাগুলি দেখলে মনে হয় সমুদ্রগুপ্তের জীবনে কোমল ও কঠোরের সম্পূর্ণ মিলন হয়েছিল।
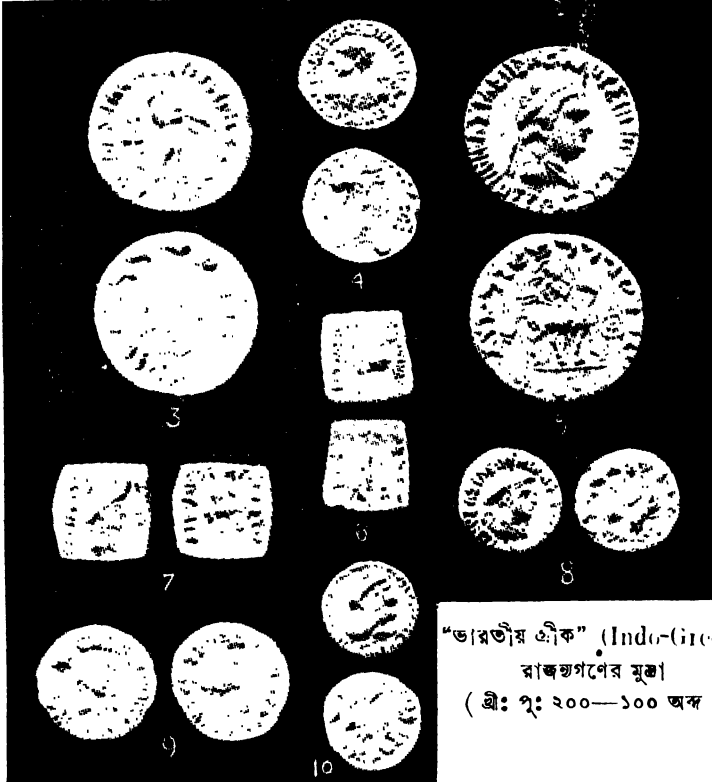
"ভারতীয় গ্রীক" (Indo-Greek) রাজন্যগণের মুদ্রা
(খ্রীঃ পূঃ ২০০—১০০ অব্দ)

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায়ও ভারতীয় স্বর্ণযুগের এক অপূর্ব্ব প্রতিচ্ছবি নজরে পড়ে। প্রকৃতই এই মুদ্রাগুলি অতীত ভারতের গৌরবকে মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত করে তোলে। কাশ্মীরের কবিশ্রেষ্ঠ কল্হনের "রাজ-তরঙ্গিণী," বিশাখদত্তের "দেবীচন্দ্রগুপ্ত" এবং একটি প্রাচীন অনুশাসন থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই সম্রাট উজ্জয়িনীর শেষ "শক" সম্রাট তৃতীয় রুদ্রসিংহকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং কৌশলে নিজ হস্তে তাঁর প্রাণনাশ করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের "সিংহহন্তা" মূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা দেখে অনেকে অনুমান করেন যে, এই শ্রেণীর মুদ্রাসমূহ তৃতীয় রুদ্রসিংহের পরাজয় উপলক্ষে প্রস্তুত হয়েছিল। মুদ্রাপৃষ্ঠে অঙ্কিত, গুপ্তসম্রাট কর্তৃক আক্রান্ত সিংহ হয়ত রুদ্রসিংহের কল্পিত রূপ। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অন্যান্য বীরত্বব্যঞ্জক চিত্র-সম্বলিত মুদ্রার মধ্যে "অশ্বারোহী" মূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রাসমূহ অন্যতম। এই শ্রেণীর মুদ্রাগুলি সম্ভবতঃ শক রাজগণের অনুরূপ মুদ্রার অনুকরণে তৈরি। শক রাজগণের দ্বারাই প্রথমে "অশ্বারোহী" মূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রাসমূহ উত্তর-ভারতে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুমারগুপ্ত বিপুল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। রণদেবতা কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তিসংযুক্ত কুমারগুপ্তের মুদ্রা সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাসমূহের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কুমারগুপ্তের শেষ-জীবনে গুপ্তসাম্রাজ্যের ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষের অধিবাসীরা পরাক্রান্ত "পুষ্য-মিত্রগণ এবং মধ্য-এশিয়া থেকে আগত রাজ্যলিপ্সু হূন-জাতি কর্তৃক বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। যুবরাজ স্কন্দগুপ্তের প্রাণপণ চেষ্টায় এই দুই আক্রমণ প্রতিহত হয়। অর্থ ও শক্তিতে গর্ব্বিত পুষ্যমিত্রগণের পরাজয় সম্পর্কে স্কন্দগুপ্তের "ভিতারি" প্রস্তর-স্তম্ভ অনুশাসনে বর্ণিত হয়েছে

"বিচলিত-কুল-লক্ষ্মী স্তম্ভয়োদ্যতেন
ক্ষিতিতল শয়নীয়ে যেন নীতা ত্রিযামা ......

* এই তৌলরীতি (Metrology) অনুসারে সুবর্ণমুদ্রার ওজন ১১৮ থেকে ১২২ গ্রেণ। এই মুদ্রাসমূহ রোমান "Dinarius"-এর নাম থেকে 'দীনার" বলা হ'ত। আর এক শ্রেণীর গুপ্তযুগীয় সুবর্ণমুদ্রা ভারতীয় তৌলরীতির (১৪৬.৪ গ্রেণ) অনুসারে তৈরি হ'ত। রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এইগুলির নাম সম্ভবতঃ "সুবর্ণ" ছিল (প্রাচীন মুদ্রা—পৃঃ ১২৫)।

† Allan—*"The Catalogue of the coins of the Gupta Dynasties,"* Intro.

সমুদিত-বল-কোষাণ-পুষ্যামিত্রাংশ-চ জিত্বা
ক্ষিতিপ-চরণ-পিটে স্থাপিত-বাম-পদ্য ॥"*

অর্থাৎ,

"(স্কন্দগুপ্ত) যিনি দেশের চরম দুরবস্থার কালে মৃত্তিকার উপর শয়ন করে নিশিযাপন করতেন এবং যিনি অর্থ ও বলদর্পী পুষ্যামিত্রগণকে পরাজিত করে তাঁদের দেহের উপর বামপদ স্থাপন করেছিলেন।"

পুষ্যামিত্রেরা পর্য্যুদস্ত হলেও হুণদের প্রতিরোধ করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাঁদের বারংবার আক্রমণে বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্য ক্রমশঃই অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়তে থাকে।

কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্তসাম্রাজ্যের এই বিপর্য্যয়ের কথা আমরা গুপ্তযুগের মুদ্রাতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। ক্রমাগত বৈদেশিক আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগ (সামন্তদের বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি) নিশ্চয়ই গুপ্তসাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এমন এক প্রবল আঘাত হানে, যার ফলে এই বিপুল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়ে যায়। কুমারগুপ্তের রাজত্বকালের পর থেকে মুদ্রা নির্ম্মাণ যে কত হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তা আমরা নিম্নের হিসাব থেকেই বুঝতে পারি :

সম্রাটগণ	সুবর্ণমুদ্রা	রজতমুদ্রা	তাম্রমুদ্রা
সমুদ্রগুপ্ত	৮ প্রকার	×	×
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত	৫ প্রকার	৯ প্রকার	×
প্রথম কুমারগুপ্ত	৯ প্রকার	৫ প্রকার	২ প্রকার
স্কন্দগুপ্ত	২ প্রকার	৩ প্রকার	×
পুরুগুপ্ত	১ প্রকার	×	×
পরবর্ত্তী সম্রাটগণ	১ প্রকার	×	×

উপরে প্রদত্ত হিসাব থেকে আমরা সহজেই "গুপ্তমুদ্রা"র বিপুল ঐতিহাসিক মূল্য উপলব্ধি করতে পারি। কুমার-গুপ্তের শাসনকালে গুপ্তসাম্রাজ্য গৌরবের শীর্ষস্থান অধিকার করে এবং তার পতনও সুরু হয় উক্ত সম্রাটের রাজত্ব-কালের শেষ ভাগ থেকে।† পুষ্যামিত্র এবং হুণদের ক্রমাগত নির্ম্মম আক্রমণের ফলে গুপ্তসাম্রাজ্যে যে চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটের উদ্ভব হয় তার প্রধান সাক্ষ্য হয় ত প্রথম কুমারগুপ্ত এবং তৎপুত্র স্কন্দগুপ্তের মুদ্রানির্ম্মাণের বিরাট পার্থক্য। এই পতনের পূর্ব্বাভাস কুমারগুপ্তের এক শ্রেণীর কৃত্রিম রৌপ্যমুদ্রা থেকেই পাওয়া যায়। এই মুদ্রাগুলি আসলে তামার, কিন্তু উপরিভাগ "রৌপ্য-জলে" (silverplated) ধোয়া। ফলে এই ধরণের তাম্রমুদ্রাগুলি রজত-মুদ্রার মতই দেখতে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাজ্যের গুরুতর অর্থ সঙ্কটে এইরূপ কৃত্রিম রজতমুদ্রার প্রচলন কৌটিল্য তাঁর "অর্থশাস্ত্রে" অনুমোদন করেছেন।

রাজা শশাঙ্কের মুদ্রা
(৬০০ খ্রীঃ অঃ)

মূল গুপ্তরাজবংশের পতনের পর তাঁদের মুদ্রার অনুকরণে অনেক মুদ্রা উত্তর-ভারতে তৈরি হয়েছিল। এই শ্রেণীর মুদ্রা-গুলির মধ্যে গৌড়ের সম্রাট শশাঙ্কদেবের "শিব, বৃষ এবং চন্দ্র" যুক্ত মুদ্রা এবং "রাজলীলা" যুক্ত মুদ্রা অন্যতম। সম্রাট শশাঙ্কদেবের শৈবধর্ম্মে অনুরাগের কথা আমরা আরও নানা সূত্র থেকে জানতে পারি। যেহেতু শশাঙ্ক চন্দ্রেরই এক নাম সেইহেতু অনেক মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে এই মুদ্রায় অঙ্কিত চন্দ্র এই নৃপতিরই নামের প্রতীক।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-ভারতে ঘোর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়েশ্বর শশাঙ্কদেব এবং থানেশ্বরের "পুষ্যভূতি" সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন উত্তর-ভারতে কিছুকাল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৬৪৮অব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর-ভারত পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। অষ্টম শতাব্দীতে বাংলার পাল-সম্রাটগণ এবং নবম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কনৌজের গুর্জ্জর-প্রতিহার সম্রাটগণ এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হন। শেষোক্ত নৃপতিগণ বহুদিন ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন। গুর্জ্জর-প্রতিহারগণের মুসলমান বিদ্বেষের দরুন সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তাদের ইস্‌লাম ধর্ম্মের চরম শত্রু বলে মনে করতেন। গুর্জ্জর-প্রতিহার বংশের বিখ্যাত সম্রাট প্রথম ভোজদেবই (আনুমানিক ৮৩৬-৮৮৫ খ্রীঃ অঃ) সম্ভবতঃ ছিলেন আরব-মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু। এইজন্য সমসাময়িক

---

* Fleet—"*Corpus Inscriptionum Indicarum.*" Vol. III, Gupta Inscriptions, no. 13.

† কুমারগুপ্তের বিপুল সাম্রাজ্যের বিস্তৃত বর্ণনা প্রসঙ্গে মান্দাসোরে প্রাপ্ত একটি বিখ্যাত অনুশাসনে কবিত্বপূর্ণভাবে বলা হয়েছে যে,"কুমারগুপ্ত-শাসিত পৃথিবীর কম্পিত কটিবাস (মেখলা) চতুঃসমুদ্র, সুমেরু ও কৈলাস পর্ব্বত বৃহৎ দুই স্তনযুগল এবং অরণ্যানীর পুষ্পরাজি তাঁর সুন্দর হাস্যচ্ছটা।"

'চতুস্ সমুদ্রান্ত-বিলোল-মেখলাং,
সুমেরু-কৈলাস-বৃহৎ পয়োধরাম।
বনান্ত-বান্ত-স্ফুট পুষ্প হাসিনিং
কুমারগুপ্তে পৃথিবীং প্রশাসতি।"

—Mandasore stone Inscription of Kumargupta and Bandhuvarman; Fleet-corpus, III, no. 18.
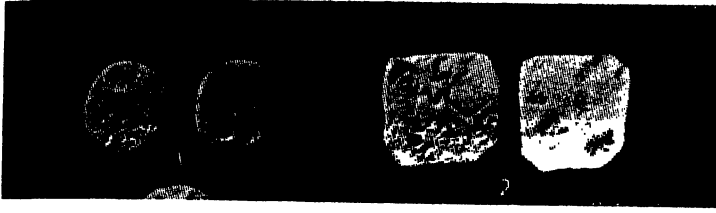
প্রাচীন লাঞ্ছনযুক্ত মুদ্রা
(আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩০০ বৎসর পূর্ব্বেকার)

আরব ঐতিহাসিক সুলেমান তাঁর সম্বন্ধে এই মর্ম্মে মন্তব্য করেছেন :

"He is unfriendly to the Arabs .... Among the princes of India there is no greater foe of the Muhammadan faith than he."*

ভোজদেব আপনাকে সর্ব্বপাপবিনাশকারী নারায়ণের অবতাররূপে কল্পনা করতেন। সম্রাট ভোজকর্ত্তৃক এক শ্রেণীর মুদ্রার পৃষ্ঠে বরাহ অবতারের দণ্ডায়মান মূর্ত্তি খোদিত আছে। মূর্ত্তির নিম্নে লেখা আছে "শ্রীমদ্ আদিবরাহ" ; মুদ্রার প্রথম দিকে ভোজদেবের নাম অঙ্কিত আছে। এই ধরণের মুদ্রাগুলি গুর্জ্জর সম্রাটদের সম্বন্ধে আরব ঐতিহাসিক সুলেমানের মন্তব্যকে নিঃসংশয়ে সমর্থন করছে।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা আমরা সহজেই প্রাচীন ভারতের মুদ্রাতত্ত্বের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করতে সক্ষম হই। উত্তর-ভারতের মুদ্রাসমূহের ন্যায় দক্ষিণ-ভারতের তথাকথিত "অন্ধ্র"-নৃপতিগণের মুদ্রাও ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের উপর আলোকসম্পাত করে।

* Elliot—*History of India,* Vol. I. p, 4.

বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে মহাত্মাজী

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

আজকাল বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রকার কথা, আলাপ ও আলোচনা শুনা যায়। অনেক অভিজ্ঞ লোকের অভিমতও খবরের কাগজে দেখা যায়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারও বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে নানা কথা প্রচার করিতেছেন এবং বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য কর্ম্মপন্থা ঠিক করিতেছেন। অনেকে মনে করেন যে, যাহাদের বয়স হইয়াছে এবং স্কুলে পড়ার বয়স অতীত হইয়াছে বা স্কুলে গিয়া লেখাপড়া শিক্ষার সময়ের অভাব, তাহাদের জন্য সাধারণ লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করাই বয়স্ক শিক্ষার মূলনীতি। যাহাতে বয়স্ক ব্যক্তিগণ সাধারণ লেখাপড়া শিখিয়া খবরের কাগজ, সাধারণ বই, চিঠিপত্র ইত্যাদি পড়িতে পারে এবং সাধারণ হিসাব রাখিতে ও চিঠিপত্র ইত্যাদি লিখিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকার বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি কলিকাতায় আসিয়া কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি শ্যামদেশে যে উপায়ে বয়স্কদের লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সফলকাম হইয়াছেন, তাহাই তাঁহার বক্তৃতার প্রধান বিষয় ছিল। তিনি বয়স্ক শিক্ষা প্রসঙ্গে অক্ষরপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ লেখাপড়ার কথাই বলিয়াছেন। তিনি যেসব কথা বলিয়াছেন তাহা শুনিয়া কেহ বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্র ব্যাপক বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

বর্ত্তমান অবস্থায় স্বাধীন ভারতে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্র যদি আমরা কেবল সাধারণ লেখাপড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করি, তাহা হইলে বোধ হয় ভুল করা হইবে। এই বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী কি মনে করিতেন এবং তাহার ক্ষেত্র কত ব্যাপক তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে করিবার চেষ্টা করিব। আমি যখন বৃন্দাবনস্থ রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের স্থাপিত প্রেম-মহাবিদ্যালয়ের গ্রাম্য কর্ম্মী শিক্ষা বিভাগের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বা তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম তখন প্রেম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আচার্য্য যুগলকিশোর আমাকে মহাত্মা গান্ধীর সবরমতী সত্যাগ্রহ আশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন—সেখানে কি প্রণালীতে কর্ম্মীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার জন্য আমি আশ্রমে গিয়া অনেক দিন আশ্রমিক হিসাবে বাস করি। এই সময় আশ্রম কর্ত্তৃক ও গুজরাট বিদ্যাপীঠ কর্ত্তৃক পরিচালিত গ্রাম-উন্নয়ন কার্য্য দেখিবার সুযোগ এবং গ্রাম-উন্নয়ন সম্বন্ধে বহু উপদেশ মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে ব্যক্তিগত ভাবে লাভ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।

আমি গান্ধীজীর সহিত ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনার সময় খুব কম পাইতাম ; কারণ তখনকার গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির সময়ে যে ভাবে এবং যে সকল লোকের সহিত দেশের আর্থিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্যা লইয়া তিনি

আলোচনা করিতেন, তাহার মধ্যে আমার মত একজন সাধারণ লোককে আমার আশানুরূপ সময় দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিত না। প্রত্যহ বিকালবেলা আহারের পর এবং প্রার্থনার পূর্ব্বে তিনি বেড়াইতে যাইতেন; তিনি আমাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, ঐ সময় যেন আমি তাঁহার সঙ্গী হই—তাহা হইলে এই সুযোগে আমার জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁর নিকট হইতে জানিয়া লইতে পারিব। সবরমতী নদীর তীরে অবস্থিত এই আশ্রমটির মধ্য দিয়া যে সুন্দর রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা ধরিয়া তিনি সবরমতী জেল ও ষ্টেশনের দিকে বেড়াইতে যাইতেন। তিনি মাইলখানিক বেড়াইয়া আসিয়া প্রার্থনা-সভায় বসিতেন। বেড়াইতে বাহির হইলেই আশ্রমবাসী বহু স্ত্রী পুরুষ ও দেশ-বিদেশের অতিথিগণ তাঁর সঙ্গ লইতেন, কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর প্রায় সকলেই তাঁর পিছনে পড়িয়া থাকিতেন—তাঁর সহিত সমান তালে চলিতে পারিতেন না। তাঁর সহিত সমান তালে চলা মানেই হইল—দৌড়ান। আমি তাঁর সহিত সমান তালে চলিতে না পারিলেও, প্রায় অর্দ্ধ-ধাবমান অবস্থায় চলিয়া তাঁর সহগামী হইয়া তখন নানা বিষয়ে বহু উপদেশ লাভ করিবার সৌভাগ্য আমার হয়।

এক দিন সকালে ডাকিয়া তিনি আমাকে বলিলেন যে, সেদিন তিনি বরোদা রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত কডী নামে একটি পল্লী-উন্নয়ন কেন্দ্রে যাইবেন। সবরমতী হইতে ঐ স্থানটি ৪০।৪২ মাইল দূরে অবস্থিত। গান্ধীজী আমাকে তাঁর সহিত যাইতে বলিলেন। তিনি সেদিন অন্য লোক বিশেষ সঙ্গে লইলেন না। তাঁহার সহযাত্রী হিসাবে চলিলাম আমি, গ্রাম্য কর্ম্মী শিক্ষা বিভাগের আমার দুই জন ছাত্র এবং অন্য একজন আশ্রমবাসী। আশ্রম হইতে সবরমতী ষ্টেশন মাইল খানেক হইবে। মহাত্মাজীর সহিত হাঁটিয়াই ষ্টেশনে গিয়া একটি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীতে বেশী ভিড় ছিল না। তিনি যে বেঞ্চে বসিয়াছিলেন তার সামনের বেঞ্চে বসিয়া আমি তাঁর সহিত আলোচনা করিয়া উপদেশগ্রহণ করিতে লাগিলাম। প্রথমেই তিনি বলিলেন যে, আমরা যেখানে যাইতেছি সেটি হইল একটি পল্লী-উন্নয়ন কেন্দ্র। তিনি আমাকে ঐ কেন্দ্রে গিয়া উহার সর্ব্বাঙ্গীণ কার্য্যক্রম ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে বলিলেন। সেখানে নাকি একটি স্কুল আছে। ঐ স্কুলকে কেন্দ্র করিয়া সুতাকাটা, খদ্দর বয়ন, চর্ম্মশিল্প, নৈশ বিদ্যালয়, লাইব্রেরি, বয়স্কদের শিক্ষা প্রভৃতি গঠনমূলক ও কৃষ্টিমূলক কাজ সেখানে চলে। এই প্রসঙ্গে অনেক কথাই গান্ধীজী বলিলেন। মাঝে মাঝে ষ্টেশন আসে আর তিনি জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া জোড়-হাতে হাজার হাজার দর্শকের নমস্কার ও শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত পাতেন ভিক্ষার জন্য। এই ভিক্ষা হরিজনদের উন্নয়নকল্পে। পয়সা, আনি দুয়ানিই বেশী সংগ্রহ হয়। মাঝে মাঝে দুই একটা টাকাও আসিয়া পড়ে। যথাসময়ে আমরা কডীতে গিয়া হাজির হইলাম।

কডী যাওয়ার পথে নানা কথার মধ্যে এমন একটি উপদেশ তিনি আমাকে দিয়াছিলেন, যাহা চির সত্য এবং যাহা সকলের জন্য এবং সকল সময়ের জন্য। তিনি বলিয়াছিলেন, "গ্রাম-উন্নয়নের ব্যাপারে কেবল আমার উপদেশেই কাজ চলিবে না, কেবলমাত্র কোন বই পড়িয়া বা আমার লেখা পড়িয়া সমস্যা সমাধানের সম্পূর্ণ নির্দ্দেশ পাইবে না। এজন্য যাইতে হইবে গ্রামে। গ্রামে যাও। গ্রামে গিয়া গ্রামের সমস্যাগুলি জানিবার চেষ্টা কর। সমস্যার স্বরূপ অবগত হইতে পারিলেই তাহার সমাধানের সন্ধানও জানিতে পারিবে। তোমার সামনের একখানা গ্রাম তোমার জন্য সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ পুস্তক এবং আমার শত শত উপদেশের চেয়ে বড় পথপ্রদর্শক।"

তাঁহার এই কথা কয়টির মধ্যে কত বড় সত্য যে নিহিত আছে এবং ঐ কথা মনকে কত আনন্দ দেয় ও শক্তি যোগায় তাহা সকলেই অনুভব করিবেন।

কডী গিয়া সারা দিন স্থানীয় কর্ম্মীদের সঙ্গে কাটাই-লাম এবং সেখানকার নানা বিভাগের গঠনমূলক কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিলাম। বিকালে আবার ট্রেনে চড়িয়া সবরমতী আশ্রমের দিকে রওনা হইলাম। কডীর বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র সম্বন্ধে কর্ম্মীদের সহিত বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। গাড়ীতে আসিয়া যখন মহাত্মাজী স্থির হইয়া বসিলেন, তখন বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধেই প্রথম কথা আরম্ভ করিলাম।

বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, বয়স্কদের কেবল বই পড়িতে, খবরের কাগজ পড়িতে, চিঠিপত্র লিখিতে এবং নাম দস্তখত করিতে পারাই বয়স্ক শিক্ষা নয়। বয়স্ক শিক্ষা আরও ব্যাপক। সাধারণ লেখাপড়া শিক্ষা উহার প্রধান একটা অঙ্গবিশেষ। সাধারণ লেখাপড়া ত শিক্ষা দিতেই হইবে। নিরক্ষর বয়স্কগণ বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ লেখা-পড়ার কাজ সবই শিখিবে, তাহারা চিঠিপত্র লিখিতে, বই পড়িতে, সাধারণ হিসাব রাখিতে, খবরের কাগজ পড়িতে শিখিবে এবং নিজেদের রুচিমত মাতৃভাষায় লিখিত সাহিত্য পড়িতে শিখিবে। লেখা এবং পড়ার দিক হইতে ইহা অবশ্যশিক্ষণীয়। কিন্তু কেবল লিখিতে এবং পড়িতে শিখা-ই বয়স্ক শিক্ষার মূল এবং শেষ কথা নয়। মহাত্মাজীর মতে এই বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত। বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে নিরক্ষর লোক সাধারণ লেখা-পড়া ছাড়াও নৈতিক জ্ঞান অর্জ্জন করিবে, অর্থনৈতিক জ্ঞানলাভ করিবে, সেবাপরায়ণ হইবে এবং নাগরিক কর্ত্তব্য

সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবে। সর্ব্বোপরি এই সব নিরক্ষর লোককে শিখিতে হইবে কি করিয়া তাহারা উপযুক্ত নাগরিক হইয়া দেশের ও দশের কল্যাণসাধন করিতে পারে।

মানুষের বয়স যখন বেশী হয়, তখন সাধারণতঃ তাহাদের লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছা কমিয়া আসে। লেখাপড়া শিক্ষা তাহাদের কার্য্য নয়, উহা বালক-বালিকাদের কর্ত্তব্য—ইহাই তাহাদের ধারণা। সংসারের চাপে বা অর্থ-উপার্জ্জনের চাপে লেখাপড়া শিক্ষার প্রতি রুচি আর তেমন থাকে না। মনে করে ছোটবেলা লেখাপড়া না শিখিয়া, কেবল খেলাইয়া বেড়াইয়া কি অন্যায়ই তাহারা করিয়াছে! অনেকে লেখাপড়া না শিখার জন্য মাতাপিতাকেও দায়ী করে। কিন্তু সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হইল বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি অনুরাগের অভাব। লজ্জাও এই লেখাপড়া শিক্ষার অনেকখানি অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। বয়স্কদের মধ্যে এই অননুরাগের জন্য এবং লজ্জার জন্য শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী লোকেদের অনেকখানি অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কাজেই যাঁহারা বয়স্কদের শিক্ষা দেওয়ার ভার গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হইবে লেখাপড়া শিক্ষার জন্য বয়স্কদের মনে অনুরাগ সৃষ্টি করা এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদের মন হইতে লজ্জা দূর করা।

এই অনুরাগ সৃষ্টি করিতে হইলে আমাদিগকে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাই আগে চিন্তা করিতে হইবে। অনেক উপায়ে ইহা সৃষ্টি করা যাইতে পারে। তাহার মধ্য হইতে আমাদিগকে সহজ উপায় বাছিয়া লইতে লইবে। আমরা ভারতবাসী সাধারণতঃ ধর্ম্মভীরু। এই মনোবৃত্তি সৃষ্টি করার জন্য আমাদের দেশের অনেক স্থানে, বিশেষ করিয়া অনেক গ্রাম্য পরিবারের দিদিমা ঠাকুরমাগণ সবচেয়ে বেশী কাজ করিয়াছেন এবং আজকালও অনেক স্থানে করিতেছেন। সন্ধ্যাবেলা যখন চারিদিকে অন্ধকার নামিয়া আসে তখন বাড়ীর বৃদ্ধা ঠাকুরমা তুলসীতলায় প্রণাম করিয়া আসিয়া নাতি-নাতিনী প্রভৃতিকে লইয়া আসর জমাইয়া বসেন। রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থের কাহিনী ও চরিত্রগুলির কথা এমন করিয়া বলেন যে, শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া শুনিতে থাকে। শ্রোতারা ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা বিচার করিবার ক্ষমতা ঠাকুরমার মুখে শুনা গল্পের মধ্য হইতে স্বাভাবিক ভাবে পাইতে থাকে। তখন তাহাদের মনে সত্যের প্রতি জাগে একান্ত নিষ্ঠা এবং এই সব গল্প যে সকল বইয়ে আছে সেগুলি পড়িবার জন্য তাদের মনে জাগে প্রবল আকাঙ্ক্ষা। যারা লেখাপড়া শিখিতে পারে নাই বলিয়া রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পড়িতে পারে না, তাহারাও ঠাকুরমার মুখে শুনা গল্প হইতে যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া রাখে, তাহাই হয় তাহাদের ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি এবং জীবনের পাথেয়। ঠাকুরমা যে কেবল রামায়ণ, মহাভারতের গল্পই বলেন তাহা নহে, তিনি স্বপ্নপুরীর রাজকন্যার কথা, পাতাল-পুরীর দেবকন্যার কথা, কাননভূমির পরীর কথা, দৈত্যদানার কথা, রাক্ষস, ভূতপ্রেতের কথা, রাজরাজড়াদের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের গল্প আর নাটাই ব্রত, তারা ব্রত প্রভৃতি বিবিধ ব্রতকথা বলিয়া ছেলেমেয়েদের মনে অলক্ষ্যে জাগাইয়া তুলেন বই পড়িবার প্রবৃত্তি।

যাঁহারা বয়স্ক শিক্ষার ভার লইবেন তাঁহাদিগকে ঠাকুরমার মত গল্পচ্ছলে শিক্ষাদানের মনোভাব লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিতে হইবে। সন্ধ্যাবেলা বাড়ীর এবং পাড়ার ছেলে-মেয়েরা যেমন ঠাকুরমাকে কেন্দ্র করিয়া আসর জমায়, তেমনই শিক্ষক মহাশয় গ্রামের বয়স্কদের লইয়া আসর বসাইবেন গ্রামের ঠাকুরবাড়ীতে, স্কুলে বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে। সে আসরে আসিবে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধসকলে। গল্পের ভিতর দিয়া তিনি শিক্ষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করিবার এবং নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা সুরু করিবেন। এই সব গল্প কেবল রামায়ণ, মহাভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। দেশ-বিদেশের নানাপ্রকার চিত্তাকর্ষক গল্প, মহাপুরুষদের জীবন-কথা, ঐতিহাসিক কাহিনী প্রভৃতি বলিয়া শ্রোতাদের মনে তিনি বই পড়িবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিবেন। যখন বই পড়িয়া নানা কথা জানিবার ইচ্ছা তাহাদের প্রবল হইবে তখন তাঁহার নিকট তাহারা আপনা হইতেই আসিবে। যিনি এই ভাবে বয়স্কদের মনে লেখাপড়ার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করিতে পারিবেন তিনিই এই কাজে সফল হইতেন।

যে কর্ম্মী বয়স্ক শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন তিনি যদি সকলের সামনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করিতে চান এবং নিজের পদগৌরব সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হন, তাহা হইলে তিনি সফলতা লাভ করিতে পারিবেন না। "আমি সরকারী কর্মচারী, আমার বিদ্যা অগাধ, আমার পদগৌরব অতি উচ্চ, আমি যাহা বলিব সকলকে তাহা শুনিতে হইবে", এ ধরণের ভাবনা লইয়া যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহাদের দ্বারা ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হইবে বেশী। শিক্ষাদাতা নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, মান-সম্মান, পদগৌরব, সব কিছু ভুলিয়া গিয়া সকলের সহিত এমন ভাবে মেলামেশা করিবেন, সকলের প্রতি এমন সুন্দর ও মধুর ব্যবহার করিবেন যেন সকলে মনে করে তিনি তাহাদেরই একজন। তিনি অকুণ্ঠচিত্তে সকলের সহিত সহযোগিতা করিবেন; সকলের দুঃখে, আপদ-বিপদে, রোগ-শোকে ও অভাব-অনটনে সাহায্য করিবেন। তিনি তাঁহার কর্ম্মময় জীবনদ্বারা তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রে সৃষ্টি করিবেন এমন একটি আদর্শ যাহার জন্য সকলে তাঁহাকে করিবে শ্রদ্ধা।

নিজের কর্ম্মময় জীবনের আচরণ দ্বারা শারীরিক পরিশ্রমকে এমন স্থান দিবেন যাহাতে সকলে কর্ম্মকে—তাহা যত ক্ষুদ্রই

হউক, অবজ্ঞা না করিয়া সম্মান করিবে। তিনি সকলের মধ্যে সকলের একজন হইয়া বাস করিবেন। সেখানে তিনি উদ্যান রচনা করিবেন, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য ফলমূলাদি ও তরিতরকারী উৎপন্ন করিবেন, চাষের মধ্যে প্রয়োগ করিবেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। গ্রামের চাষারা যাহাতে নিজ নিজ জমিতে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ফসল, তরিতরকারী ফলমূল প্রভৃতি উৎপন্ন করিতে পারে তার জন্য তিনি কার্য্যকরী উপদেশ দিবেন।

ভারতের চাষীর বৎসরে প্রায় ছয় মাস অবসর থাকে। অর্থাৎ ছয় মাস তাহাদের কোন কাজ থাকে না। এই অবসর অবশ্য একসঙ্গে আসে না। তাহারা এই অবসর কাটায় গল্প-গুজব ও গ্রাম্য কলহ দলাদলি ইত্যাদি লইয়া। এই অবসর সময়টুকু অযথা ব্যয় না করিয়া যাহাতে তাহারা উৎপাদন বাড়াইবার কাজে এবং আয়বৃদ্ধির কাজে ব্যয় করিতে পারে তার জন্য উপযুক্ত পন্থা বাহির করিতে হইবে। এই সব গ্রাম্য লোক অবসর সময়ের জন্য অনেক পেশা গ্রহণ করিতে পারে। সুতা কাটাই সব চেয়ে সহজ ও উপযোগী পেশা। অবসর সময়ে যদি কৃষকেরা সুতা কাটে তাহা হইলে অনায়াসেই বস্ত্র সম্বন্ধে তাহারা স্বাবলম্বী হইতে পারে। অন্যান্য পেশার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করা যাইতে পারে। অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষাব্রতীকে তকলীতে বা চরকায় সুতা কাটিতে হইবে এবং নিজের কর্ম্মদ্বারা দেখাইয়া দিতে হইবে যে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও লাভজনক। মহাত্মাজীর মতে ইহাদের পক্ষে সুতা কাটাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পেশা বা পন্থা। এই ভাবে কর্ম্মী বয়স্কদের মনে নূতন ভাবনা আনিবেন, এবং অর্থনৈতিক সমস্যা-সমাধানের নূতন পদ্ধতি দেখাইবেন। ইহার ফলে গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রায় আসিবে আমূল পরিবর্ত্তন।

অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করার উপায় উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষর লোকদের মধ্যে নাগরিক কর্ত্তব্যবোধ জাগাইতে হইবে এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও তাহাদিগকে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের দেশ বর্ত্তমানে স্বাধীন। এই স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায় এবং স্বাধীনতার অর্থ কি—ইহা সাধারণ লোক বুঝে কি? স্বাধীন ভারতের শাসন-ব্যবস্থার সহিত প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্বন্ধ কি—এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভারতের শতকরা ৯০ জন লোকই তাহার ঠিকমত জবাব দিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। তাই বয়স্ক শিক্ষার প্রধান একটি অঙ্গরূপে শিক্ষক মহাশয় বিরাট ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থার সহিত এক জন সাধারণ নাগরিকের কি সম্বন্ধ তাহা আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

ভারতের শতকরা ৮৭ জন লোকই নিরক্ষর। তাহারা কেবল নিরক্ষর নয়, রাজনৈতিক জ্ঞান, নাগরিক কর্ত্তব্যজ্ঞান, অর্থনৈতিক জ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহারা বহু পিছনে পড়িয়া আছে। আর আমাদের দেশের এই সব নিরক্ষর লোকের শতকরা ৯০ জনই গ্রামে বাস করে। এই গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে বয়স্ক শিক্ষা প্রদানের ও নিরক্ষরতা দূর করার কাজ। আর এই কাজে যাঁহারা ব্রতী হইবেন তাঁহারা হইবেন প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রাম-সেবক।

আমার প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন যে বয়স্ক-শিক্ষার অর্থ কেবল নিরক্ষরতা দূর করা নয়; ইহার ক্ষেত্র বিস্তৃত। ব্যাপক বয়স্কশিক্ষার কাজে যাঁহারা ব্রতী হইবেন তাঁহাদিগকে তকলী হাতে গ্রামে প্রবেশ করিতে হইবে। আর এই তকলীকে কেন্দ্র করিয়াই আরম্ভ হইবে বয়স্কদের আসল শিক্ষা।

বয়স্কশিক্ষারকাজে যাঁহারা ব্রতী হইবেন, তাঁহাদের মূল নীতি হইবে সেবা, অর্থ উপার্জ্জন নয়। অবশ্য জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন আছে। তবে এ ক্ষেত্রে অর্থের স্থান হইবে গৌণ। বয়স্ক শিক্ষার নামে প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মীরা করিবেন গ্রামের সেবা। বয়স্ক শিক্ষাদানে ব্রতী হইয়া লোকসেবক তকলী হাতে করিয়া সুতা কাটিতে কাটিতে গ্রামে প্রবেশ করিয়া বসিবেন গাছতলায়। এ ভাবে বসিয়া তকলীতে সুতা কাটা আরম্ভ করিলেই গ্রামের লোকের দৃষ্টি পড়িবে এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে অনেক গ্রামবাসী সেখানে আসিয়া তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বসিবে। আর এখানেই তিনি গ্রামবাসীদিগকে বয়স্কশিক্ষার প্রথম পাঠ দিবেন। সে পাঠ হইবে কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা, সহজ সরল ব্যবহার ও সত্য কথা। এই প্রথম পাঠে যদি তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার কাজ হইবে সহজ।

খাওয়াদাওয়ার জন্য তাঁহাকে ভাবিতে হইবে না। গ্রামের লোক যখন জানিতে এবং বুঝিতে পারিবে যে তিনি আসিয়াছেন তাহাদের বন্ধুরূপে, তখন তাহারা এই নবাগত বন্ধুকে আন্তরিকতার সহিত আদরযত্ন করিবে এবং তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিবে। কাজ আরম্ভ করিয়া তিনি গ্রামবাসীদের একজন হইবেন। তাদের মধ্যে বাস করিয়া তিনি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা করিবেন। ধীরে ধীরে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থার ভিতর দিয়া তাদের ভিতর হইতে নিরক্ষরতা দূর করিবেন এবং তাহাদের চরিত্রকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিবেন যাহাতে তাহারা দেশের, দশের, সমাজের এবং রাষ্ট্রের সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে।

জাগো নারায়ণ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শুনেছ কি ডাক ? আর্ত্তনাদে, বজ্রনাদে,
নরের অন্তিম শ্বাসে, নারীর ক্রন্দনে,
অসহায় অক্ষমের আশ্রয় ভিক্ষায়,
সকরুণ মিনতিতে; দুর্ব্বলের 'পর
প্রবলের অত্যাচারে, হত্যার উল্লাসে,
ক্ষমাহীন বর্ব্বরের দুর্ব্বার পীড়নে,
অন্যায়ের অনিয়মে, অসত্যের জয়ে,
সভ্যতার চিত্তাভ্রমে, নীতির বিলোপে,
নিরুপায় মানবের রুদ্ধ হাহাকারে,
জিঘাংসার ক্রুদ্ধ অভিযানে, জীবনের
দারুণ দুর্য্যোগে, শুনেছ কি শুনেছ কি ডাক ?

বজ্র-সম বেজে ওঠে আকাশে আকাশে,
সে আহ্বান ঘুরে মরে অন্তরে অন্তরে,
দ্বারে দ্বারে ফেরে সে আহ্বান, লুটে পড়ে
দয়াহীন, উদাসীন দেবতার পায়।

সাড়া দাও, সাড়া দাও। উন্মত্ত বিলাপে
লাঞ্ছিত নারীত্ব হোথা করিছে আহ্বান,
নিদারুণ ক্ষোভে আজ নির্ব্বাক—পৌরুষ,
বিদলিত মানবতা চাহিছে তোমার
আবির্ভাব। তবে সাড়া দাও, সাড়া দাও।

কত দিন, কত দিন, আর কত দিন,
হে নিদ্রিত নারায়ণ, অনন্ত-শয়নে
ঘুমে অচেতন রবে ? জেগে ওঠো আজ,
জেগে ওঠো আমাদের নিঃসাড় অন্তরে,
জেগে ওঠো এ বিমূঢ় জাতির জীবনে,
জেগে ওঠো হে অভয়, ভয়ঙ্কর রূপে ;
জেগে ওঠো ভীষণ-সুন্দর। চেয়ে দেখ,
চারিদিকে পুঞ্জীভূত পাপ, ক্রূর হিংসা
নাচিছে তাণ্ডব, ফুঁসিছে বিষাক্ত নাগ,
ধর্ম্মের গ্লানিতে আজ ভরিল ভারত।

হিংসা-অহিংসার উর্দ্ধে দেশের সম্মান,
হিংসা-অহিংসার উর্দ্ধে মানব-মর্য্যাদা।
হিংসা কি সে প্রাণের হনন শুধু ?
দুষ্কৃত-বিনাশ—সে কি হিংসা ? নিরন্তর
মৃত্যুলীলা চলিতেছে এ মর-জগতে,
সে কার হিংসার ফল ? ধ্বংসের উপর
সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা। লক্ষ কোটি জীবাণুর
নিত্য আক্রমণ চলিয়াছে অহরহ।
জীবন্ত জীবাণু তারা, কিন্তু সাংঘাতিক,
তাহাদের ধ্বংস—সে কি হিংসা ? জেনো, জেনো,
হিংসা আচরণে আর হিংসা মনোভাবে,
মরণের পরিমাপে কে মাপিবে তারে ?

প্রকৃতির দুই রূপ। এক রূপে সে যে
পালয়িত্রী, শুভদাত্রী, স্নেহ-প্রস্রবণ,
সৃষ্টি আর সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,
অনন্ত কল্যাণময়ী। আর এক রূপে
প্রকৃতি যে মৃত্যু আর ধ্বংসের দেবতা।

অচিন্ত্য যে ভগবান, তাঁরো দুই রূপ।
এক রূপে স্রষ্টা তিনি, বিশ্বের পালক,
আর এক রূপে তিনি প্রলয়-বিধাতা,
তিনি রুদ্র।—এ বিশ্বের নিয়ামক নীতি
নির্ণীত হয় নি আজো হিংসা-অহিংসায়।
চিরজীবী নহে কেহ হেথা, মৃত্যু-নদী
অতিক্রমি অমৃতের মিলিবে সন্ধান।
আছে ধর্ম্ম-যুদ্ধ, আছে অধর্ম্ম-সংগ্রাম,
ভিন্নরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই। অহিংসার—
পরিমাপ কোথা ? এই মানব-জীবন
সে-ই হোক চিরন্তন মানদণ্ড তার।

রক্ত-রাঙা করে যারা নিশীথ-আকাশ,
নির্ম্মলা উষারে করে ক্লিন্ন ও মলিন,
প্রকাশ্য দিবসে করে বিভীষিকাময়,
রজনীরে করে ভয়ঙ্কর, নর-বেশী
প্রেত আর পিশাচের দল, তারা পাবে
মানুষের অধিকার ? তারাও কি পাবে
মানবের প্রতি মানবের আচরণ ?

যুগে যুগে তব আবির্ভাব। জেগে ওঠো,
হে নিদ্রিত নারায়ণ। জাগো বাসুদেব।
মানব-কল্যাণ-পথ, সে-ই সত্য পথ।

সারথি চালাও রথ, ঘুচুক সংশয়,
জীবনের ক্লৈব্য আর জাড্য কর দূর।
সর্ব্বসহা বসুন্ধরা জাগে সে যেমন
প্রবল স্পন্দনে আর অগ্নির প্রবাহে,
তেমনি উদ্‌বুদ্ধ হোক জাতির অন্তর।

ভস্মীভূত হোক পাপ। অহিংসার ভাণ
যেন হীন ভীরুতার না দেয় প্রশ্রয়।
কাপুরুষতার ক্লৈব্য, নৈষ্কর্ম্যের দ্বিধা,
তার চেয়ে হিংসা ভাল—বীর্য্য যদি থাকে
সেথা, থাকে নির্ভীকতা। আপন গৌরবে
প্রতিষ্ঠিত হোক আজ স্বাধীন ভারত।

লিপিভারতী—সাক্ষরতার মূল ভিত্তি

শ্রীসতীশচন্দ্র গুহঠাকুর

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষার নামকরণ স্বাভাবিক রূপে 'ভাষা-ভারতী' (Lingua Indica), সংক্ষেপে 'ভারতী', হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত ; বিকল্পে তাকে যদি হিন্দী বা হিন্দুস্থানী, সুসংস্কৃত বা সু-প্রাকৃত বলা হয়, তাতে আপত্তি নেই। সমগ্র দেশে যদি 'এক-লিপি' (common-script) কখনো গৃহীত হয়, তবে তার নাম হওয়া উচিত 'লিপি-ভারতী'* (Scripta Indica)। ভারতবর্ষের অধিবাসীরাও 'ভারতী' এই গৌরবময় আখ্যা লাভের যোগ্য। দেশের নাম চিরকাল 'ভারত' বা 'ভারতবর্ষ'—হিন্দুস্থান বা ইণ্ডিয়া তো বিদেশী লোকের দেওয়া নাম। প্রদেশবাসী রূপে আমরা বাঙালী, পঞ্জাবী, গুজরাটী, মরাঠী, মলয়ালী—কিন্তু সবাই সমভাবে 'ভারতী'।

রাষ্ট্রভাষাকে সর্বমান্য হতে হবে। আজ আমাদের দেশে একটি সর্বমান্য ভাষা নেই : হিন্দী বা বাংলা নয়, উর্দু বা পঞ্জাবী নয়, তামিল বা তেলুগুও নয়। এক কালে সংস্কৃতই ভারতের সুধিসমাজে সর্বমান্য ভাষা (common langauge) ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় পর্যন্ত সংস্কৃত এই পদে আরূঢ় ছিল। কিন্তু আজ সংস্কৃত অপ্রচলিতপ্রায়।

রাষ্ট্র-ভাষা (State-language) এবং সর্বমান্য-ভাষা (common-language) এক কথা নয়। রাষ্ট্রের কাজকর্ম পরিচালনার সুবিধার জন্য সাধারণ ভাবে যে ভাষার ব্যবহার বিধিবদ্ধ হয়, তাকে বলি রাষ্ট্র-ভাষা। যেমন, ইংরেজ আমলে এ দেশের রাষ্ট্র-ভাষা ছিল ইংরেজী, মুসলমান আমলে ফারসী। এখন স্বাধীন ভারতে হিন্দী সেই পদে অধিষ্ঠিত হ'ল।

আর সর্বমান্য-ভাষা বলতে বুঝি : সাধারণ ভাবে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জনগণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান, বিচার-বিনিময় যে ভাষায় হয়। সাধারণতঃ যে ভাষাকে সমগ্র দেশ সম্মান করে ; যার সঙ্গে দেশের যাবতীয় ভাষার মূলগত সম্বন্ধ রয়েছে, অথচ যেটি শিখতে প্রদেশ-বিশেষের বিশেষ সহায়তা গ্রহণ অনিবার্য নয় ; যে ভাষা বৈজ্ঞানিক এবং ব্যাকরণ-সম্মত নিয়মবদ্ধ ; যে ভাষায় দুরূহ ভাবধারা ব্যক্ত করা যায় ; যার সাহিত্য-সম্পদ যথেষ্ট, যে ভাষা প্রাণবন্ত ও উন্নতিশীল এবং বিদেশেও যে ভাষার সম্মান রয়েছে, সর্বোপরি যার বর্ণমালা ও লিপি সরল, উপযোগী এবং বৈজ্ঞানিক বলে সমগ্র দেশে গ্রহণযোগ্য—তাকেই বলব আদর্শ সর্বমান্য-ভাষা।

রাষ্ট্রভাষা হলেই ভাষা সর্বমান্য হয় না, আবার, সর্বমান্য না হতে পারলে, আজ যে ভাষা রাষ্ট্র-ভাষার পদে অভিষিক্ত হবে, কাল তার সে পদ থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অতএব দেশের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আমাদের প্রযত্ন হওয়া উচিত, কি করে একটি সর্বমান্য-ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়।

২

আবার ভাষার প্রশ্নই মুখ্য নয়, সে তো পরে আসবে। তার পূর্বেই বর্ণমালা ও লিপির প্রশ্ন আসে। তার পর, শব্দ সঞ্চয় ; অর্থাৎ প্রধানতঃ কোন্ মহোদধি থেকে শব্দরত্ন আহরণ করতে হবে—ভারতীয় সকল ভাষার মাতৃস্বরূপা সংস্কৃত ভাষা থেকে, না গ্রীক্-লাটিন্-হিব্রু থেকে, অথবা আরবী-ফারসী বা আধুনিক ইংরেজী-জার্মান কিম্বা চীনা-জাপানী ভাষা থেকে।

পৃথিবীর দশ-বারোটি শ্রেষ্ঠ ও মান্য ভাষার মধ্যে ভারতের দুই-একটি ভাষার স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে তো এক দেড় গণ্ডাই দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু তথাপি আমাদের ভাষাগুলির মহত্ত্ব কম, কারণ আধুনিক ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তারা সবাই ক্ষীণপ্রভ—সর্বমান্য তো নয়ই।

বর্ণ বা অক্ষর দ্বারা রচিত শব্দসম্পন্ন অর্থযুক্ত পদে গঠিত বাক্য ভাষা-পদবাচ্য। পৃথিবীতে চার-পাঁচটি প্রসিদ্ধ বর্ণমালা রয়েছে, তন্মধ্যে ভারতীয় বর্ণমালা, অ-আ-ক-খ, শ্রেষ্ঠ। রোমান,

* শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর 'বাংলা লিপি সংস্কার' নিবন্ধে ('প্রবাসী' কার্ত্তিক ১৩৫৬) 'লিপি-ভারতী' নামক এক-লিপি পরিকল্পনাটির উল্লেখ করেছেন। উহা বর্তমান লেখকের প্রস্তাবিত।

গ্রীক্ বা সেমেটিক্ বর্ণমালা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এর কাছে দাঁড়াতে পারে না। ভারতীয় বর্ণমালার শ্রেষ্ঠত্ব (অকারাদি) (হকার পর্য্যন্ত) পৃথিবীব্যাপী সর্বসম্মত। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় দুই শত ভাষা আছে; তন্মধ্যে অধিকাংশই এই ভারতীয় বর্ণমালাই ব্যবহার করে; মাত্র দুই চারিটি ভাষার ক্ষেত্রে কিছু কাল ধরে সেমেটিক আরবী বর্ণমালার প্রয়োগ আরম্ভ হয়েছে।* বহির্ভারতেও বহুস্থানে এই 'ভারতীয় বর্ণমালা'ই প্রচলিত, যথা নেপাল, ভুটান, তিব্বত বর্মা, শ্যাম, সিংহল প্রভৃতি দেশে। মালয়, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সুমাত্রা, মহাচীন প্রভৃতি দেশেও ভারতীয় বর্ণমালার আংশিক প্রচার রয়েছে।

৩

বর্ণমালা (alphabet) ও লিপি (script) এক বস্তু নয়। বর্ণ বা অক্ষর লিপি দ্বারা লিখতে হয়। একই বর্ণমালা অনেক লিপিতে লিখিত হতে পারে। ভারতীয় অকারাদি হকার পর্যন্ত বর্ণমালা (Alphabeta Indica) বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন লিপিতে লিখবার প্রথা চলে আসছে। এই লিপিগুলির ভিতর, নাগরী (বা দেবনাগরী), বাংলা, গুজরাতী, গুরুমুখী, তেলুগু, তামিল, কন্নড়, মলয়ালী প্রভৃতি প্রধান। কিন্তু এই সব লিপিই দোষ-ত্রুটি পরিপূর্ণ। 'ভারতীয় বর্ণমালা' শ্রেষ্ঠ বটে; উহা উপযোগী এবং বৈজ্ঞানিক সন্দেহ নেই; কিন্তু ভারতের একটি লিপিও নির্দোষ নয়। এর ফলে এরূপ দাঁড়িয়েছে যে, দেশের অনেক ভাষাবিদ্ ও নেতৃবর্গ ঐ সকল ভারতীয় লিপি ছেঁটে ফেলে দিয়ে, একেবারে বিদেশী রোমান অক্ষরকে দেশের এক-লিপি করতে উদ্যত। তুরস্ক দেশ বহু কালের আরবী লিপিকে ত্যাগ করে কিছুকাল থেকে রোমান্ অক্ষর গ্রহণ করেছে। এখন ভারতবর্ষের বিচার্য—কোন্ প্রথা অবলম্বনীয়। ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটা রফা করে বলছেন,'আমাদের ভারতীয় বর্ণমালার ক্রমই বজায় থাকুক, রোমানের ভারতীয়করণ হলেই কার্যসিদ্ধি হবে।' রোমান লিপিতেই আমরা অ আ ক খ লিখব এবং 'পালি টেক্স্ট সোসাইটি' প্রকাশিত মূল পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থাদির মত অথবা উইলসন-কৃত সংস্কৃত অভিধানের আদর্শে রোমান লিপিতেই বই লিখব ও ছাপব। আমরা তুরস্কের অনুসরণ করে রোমান্ বর্ণমালা হুবহু গ্রহণ করব না, তবে রোমান্ লিপির যথাযোগ্য উপযোগ করে নিজেদের কাজ চালাব।

কিন্তু দেশবাসী সাধারণ ভাবে এইরূপ পরানুকরণের পক্ষপাতী নয়। বিশেষতঃ আমাদের বর্ণমালার শ্রেষ্ঠত্ব যখন সর্ববাদিসম্মত।

৪

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, রোমান্ বর্ণমালা অবৈজ্ঞানিক হলেও রোমান্ লিপি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমাদের লিপিগুলির চেয়ে উন্নত এবং অধিকতর উপযোগী। বহু প্রচারিত একই বিজ্ঞপ্তি—যথা রবিন্‌সন্ বার্লির প্রস্তুত প্রণালী, ভাষায় সেবনবিধি সম্বলিত প্রচারপত্র—সামনে রেখে তুলনা করলে দেখতে পাই যে, রোমান্ লিপিতে মুদ্রণে ইংরেজী ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষার ক্ষেত্রে যতটুকু স্থান লাগে আমাদের নাগরী, গুরুমুখী, তেলুগু, উড়িয়া, বর্মী, সিংহলী, উর্দু, গুজরাতী, বাংলা প্রভৃতি লিপির বেলায় তার চেয়ে অধিক স্থান আবশ্যক হয়, অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখতেও সুশ্রী হয় না।

এহেন রোমান লিপির বিশেষত্ব কি, এ বিষয়ে অনুধাবন করলে প্রথমেই দেখতে পাই, এতে capital এবং minuscules (বা small letters) নামক দুই প্রস্থ অক্ষর রয়েছে, যাকে বাংলায় আমরা বড় হাত ও ছোট হাত (বা বড় ছাঁদ ও ছোট ছাঁদ) বলে থাকি। পূর্বে রোমান্ ও গ্রীক অক্ষরে ছোট হাত ছিল না। একমাত্র বড় ছাঁদের যে অক্ষর ছিল, তা আমাদের পুরাতন ব্রাহ্মী প্রভৃতি লিপির মতনই সরল capital ছিল। ছোট হাত minusculesএর উদ্ভব শেষে হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে যখন রোমান্ লিপিতে, দ্রুত লেখার তাগিদে, ছোট হাতের অক্ষরের সৃষ্টি হ'ল, তার পরেই ক্রমশঃ সকল পাশ্চাত্য দেশে সেটি গৃহীত হতে লাগল; যার ফলে আজ তথায় সর্বত্র রোমান্ লিপির এই দ্বিবিধ (capital এবং small) রূপের আধিপত্য। ব্যবহারিক উপযোগিতার ফলেই রোমান্ লিপির প্রসার হয়েছে। গ্রীক্ লিপিও অবশেষে ছোট ছাঁদের অক্ষরের একটি রূপ করে নিয়েছে।

আমাদের দেশে এরূপ দ্বিবিধ বড় হাত ছোট হাতের অক্ষর প্রবর্তিত হয় নি।

ভেবে দেখুন, রোমান্ capital অক্ষরেই যদি ইংরেজী ভাষার সাহিত্য ছাপা হতে থাকে তবে সেই রকম রোমান্ লিপির এত গুণ ইংরেজীর পাঠক আর উপলব্ধি করবে কিনা। ছোট ছাঁদের অক্ষরকে বাদ দিলে রোমানের ব্যবহারিক শ্রেষ্ঠত্ব আর থাকবে কিনা সন্দেহ। ভারতের কোন কোন আধুনিক লিপিও—ধরুন, গুজরাতী বা তামিল—সে অবস্থায় capital রোমানের সমপর্যায়ে দাঁড়াতে পারে, তুলনা ও প্রয়োগমূলক আরও অনেক বিষয় বিবেচ্য রয়েছে। কাশীর অধ্যাপক ডক্টর শ্রীনারায়ণ মেননের *The Script Reform* পুস্তিকায় এ বিষয়ে অনেক কিছু আলোচিত হয়েছে।

'লিপি পরিষৎ' নামক সংস্থা—কাকা শ্রীদত্তাত্রেয় কালেল-

* উর্দু, পোশতো, সিন্ধী ও কাশ্মীরী এই চারিটি ভাষা আরবী বর্ণমালা গ্রহণ করেছে, তন্মধ্যে সিন্ধী ও কাশ্মীরী পুনরায় ভারতীয় বর্ণমালা গ্রহণের প্রয়াসী। সিন্ধী পণ্ডিত সাধু শ্রী ভাস্বানী প্রমুখ সাহিত্যিকগণ এবিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন। আরবী লিপি হিন্দী ভাষাকে তো দ্বিধা বিভক্ত করেছে। নাগরী অক্ষরে লেখা হিন্দী তো হিন্দী নামে চলে; কিন্তু আরবীতে লিখলে ভাষার নাম হয় উর্দু বা হিন্দুস্থানী। উভয়ই স্বতন্ত্রতা দাবী করে।

কর মহাশয়ের নেতৃত্বে অনেককাল ধরে লিপি 'সুধারণ' বিষয়ে গবেষণা করেছেন। 'অল্-ইণ্ডিয়া কমন স্ক্রিপ্ট এসোসিয়েশন' নামক একটি সংস্থাও এ কার্য্যে কিছু দূর অগ্রসর হয়েছিল। সাহিত্য-সভাগুলিও (যথা নাগরী প্রচারিণী সভা, হিন্দুস্থানী একাডেমী প্রভৃতি) এ বিষয়ে যত্নশীল। 'হিন্দী ও মরাঠী সাহিত্য পরিষদ'দ্বয় যুগ্মভাবে 'লিপি সুধারণ সমিতি' স্থাপন করতে ব্রতী হয়েছিলেন। ইংরেজের ভারত ত্যাগের পর সংযুক্ত প্রদেশের সরকার একটি লিপি সমিতি (কমিটি) স্থাপন করেন, যার সভাপতি ছিলেন আচার্য শ্রীনরেন্দ্র দেব। ব্যক্তিগত ভাবেও দেশে বহু প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কেহই রোমান লিপির 'বড়হাত-ছোটহাত' এই দ্বিরূপ পরিকল্পনার দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন নি। এ বিষয়েও আমাদের বিবেচনা করা আবশ্যক।

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও লিপিসংস্কারের বহু প্রস্তাব এবং প্রয়োগ হয়েছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, শ্রীশৈলেন্দ্র লাহা, শ্রীসুধীর চৌধুরী প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তি বহুকাল নানা আলোচনা করে আসছেন। বিশেষ ভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করে গেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এ দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। 'এক-লিপি বিস্তার পরিষৎ' কিন্তু সংস্কারের দিকে না গিয়ে প্রচলিত নাগরীকেই গ্রহণ করেছিলেন। কার্যক্ষেত্রে বাংলা লিপির কিছু কিছু সংস্কার করে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নূতন প্রয়োগ গ্রহণ করে অনেকটা সফলতা লাভ করেছেন। নাগরীর ক্ষেত্রেও নানা প্রয়োগ ও উপযোগের প্রচেষ্টা অদ্যাবধি চলছে। কিন্তু রোমান লিপির ছোট ছাঁদের অক্ষরের উপযোগিতা সম্বন্ধে বাংলাদেশে বা অন্যত্র বিশেষ আলোচনা হয় নি।

৫

আমাদের বর্ণমালা যখন বৈজ্ঞানিক এবং ব্যবহারিক শ্রেষ্ঠত্বও পেয়েছে—এমন কি পাশ্চাত্য 'শ্রুতিধর' (shorthand) সঙ্কেত পদ্ধতিগুলি দ্বারা এ বিশেষ লাভবান হয়েছে—তখন লিপি বিষয়েও যদি আমরা অনুরূপ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চাই, তা হলে এমনি ভাবে 'লিপি-সুধারণ' করে নিতে হবে, যাতে করে আমাদের বর্ণমালার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুন্ন রেখে, রোমান লিপির সবগুলি গুণ বা সুবিধাও আমাদের লিপিতে এনে ফেলা যায়। কেবলমাত্র প্রচলিত নাগরী লিপির অল্পবিস্তর সংস্কার বা সুধারণ হলেই মীমাংসা হতে পারে না বা তাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। ভারতের সকল লিপিরই সুধারণ বাঞ্ছনীয়। সর্বত্র সাক্ষরতা বাড়াতে হবে। আরো উত্তম হয়, যদি এমন একটি বৈজ্ঞানিক লিপির উদ্ভাবন বা অভিব্যক্তি হয়, যা প্রচলিত প্রত্যেক লিপির চেয়ে অধিক গুণসম্পন্ন কিংবা উপযোগী বলে আমাদের সকল ভাষার পক্ষেই গ্রহণযোগ্য। এরূপ একটি প্রতিসংস্কৃত 'এক-লিপি' (common-script)* উদ্ভাবিত হলে কোন ভাষার পক্ষেই তা উপেক্ষণীয় হবে না।

৬

এই উদ্দেশ্যের অনুকূলে 'লিপি-ভারতী' (Scripta Indica) নামক যে নব-সুধারণ সুধিজনের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হচ্ছে, তার দাবি এই যে, এই প্রথাটি আমাদের 'এক-লিপি' রূপে ব্যবহারযোগ্য এবং এটি গ্রহণ করলে এমন সব সুবিধা এসে যাবে, যা নিয়ে আমাদের লিপি অনায়াসে রোমান লিপির সমকক্ষ হতে পারে। তা হয়ে গেলে, বর্ণমালা ও লিপি উভয় বিষয়েই আমরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারি। আমাদের সুবিধার পরাকাষ্ঠা হয়।

হস্তলিপির দৃষ্টান্তস্বরূপ প্লেটের নিম্নাংশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'জন-গণ-মন' রাষ্ট্রগীতের প্রথম শ্লোক লিখে দেখান হ'ল। পংক্তির আদ্যক্ষরগুলি বিভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত অক্ষরে মুখ্যকায় (capital) রূপে দেওয়া হয়েছে।

'লিপি-ভারতী'র প্রধান বিশেষত্ব এই যে, রোমান লিপির মত এতে পাশাপাশি দুই প্রস্থ (বা 'সেট') কায় বা আকারের ব্যবস্থা রয়েছে—মুখ্যকায় 'অক্ষর' এবং সামান্যকায় 'অক্ষর' রোমানের যেমন capital ও minuscules বা small letters: ছোট-ছাঁদ বা ছোট হাতের লেখন। মুখ্যকায় অক্ষর নূতন করে তৈরি করতে হবে না; দেশের যে প্রদেশে যে লিপি বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে, তাকেই কিছু কিছু আবশ্যকমত সুধারণ করে, বা না করেই, মুখ্যকায় 'অক্ষর' বলে সেই প্রদেশে মেনে নেওয়া হবে। ইংরেজীতে যেমন বিশেষ বিশেষ স্থলে ক্যাপিটাল অক্ষর প্রয়োগের বিধি রয়েছে ইচ্ছা হলে আমরাও সেই সেই স্থলে বা কোন কোনটির বেলায় মুখ্যকায় অক্ষর ব্যবহার করতে পারি।

লিপিভারতীর দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে, সামান্যকায় 'অক্ষরী' নামক যে ছোট ছাঁদের অক্ষরীর মুসাবিদা সুধিজনের সামনে উপস্থাপিত করা হ'ল, তাকেই আটপৌরে ধুতির মতন সর্বদা ব্যবহারের অধিকার সকল প্রদেশের সমভাবে থাকবে। সকল অঞ্চলে এই প্রথা সাধারণ ভাবে গৃহীত হলেই এটি 'এক-লিপি' রূপে প্রতিভাত হবে।

* এই 'এক-লিপি' প্রচার সম্বন্ধেও আন্দোলন কিছু কিছু হয়েছে। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি ৺সারদাচরণ মিত্র প্রমুখ সুধিবৃন্দ প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে 'একলিপি-বিস্তার-পরিষৎ' স্থাপন করে প্রচলিত 'নাগরী'কেই এক-লিপি করতে প্রয়াস পান এবং 'দেবনাগর' নামক নানা ভাষার মুদ্রিত এক নিয়ত পত্র নাগরী অক্ষরে ছাপিয়ে কিছু-কাল চালিয়েছিলেন। কিন্তু লিপি-সুধারণের দিকে তখন বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। নাগরী লিপির দোষত্রুটি বর্জন করে একটি প্রতিসংস্কৃত রূপ দিতে পারলে হয়তো 'একলিপি বিস্তার-পরিষদের' আন্দোলন সফলতার দিকে অগ্রসর হতে পারে।

৭

'লিপি-ভারতী' গ্রহণ করলে নিম্নোক্ত সুবিধাগুলি সমগ্র ভারতে এসে যাবে :—

১। অক্ষর পরিচয় সহজে হবে; হস্ত-লেখনও সহজসাধ্য হয়ে যাবে—প্রায় প্রত্যেকটি শব্দ, এমন কি, সমাসবদ্ধ বড় বড় পদও, একটানা স্পষ্ট লেখা সম্ভব হবে। ফলে সাক্ষরতা সহজেই বৃদ্ধি পাবে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপি আদর্শস্থানীয়; তাঁর বাংলা হস্তলিপি একটানা হয়েও এমন সুস্পষ্ট এবং সুগঠিত ছিল যে, ভারতের বহু বিদ্বান এবং সাধারণ লিপিকারগণ তাঁর হস্তলিখন-শৈলী গ্রহণ করেছেন।

২। এক অক্ষরের সহিত অপর অক্ষরের ভ্রম দূরীভূত হবে।

বর্তমান নাগরী অক্ষরে লিখিত 'স্বর' কে 'র ব র' অথবা 'স্বর' পড়বার অবকাশ থাকবে না। উর্দু 'আজমের গয়া' তো 'আজই মর গয়া' পড়া অসম্ভব নয়। এবম্বিধ দোষ আমাদের অপরাপর লিপিগুলিতেও অল্পবিস্তর রয়েছে।

৩। সকল রকমের মুদ্রণকার্য—মনোটাইপ, লাইনোটাইপ টেলি প্রিন্টিং প্রভৃতি সবই সহজসাধ্য হবে। ক্যাপ (ক্যাপিটাল), স্মল-ক্যাপ প্রভৃতি নানাবিধ রুচিকর টাইপে মুদ্রণ-পারিপাট্য বেড়ে যাবে, অথচ ছাপাখানার কেসগুলি অসংখ্য অক্ষরাংশে ভারাক্রান্ত হবে না।

দেশের ষ্টেনোগ্রাফি শ্রুতিধর পদ্ধতিগুলির একীকরণ, অন্ততঃপক্ষে সমমান (standardization) সম্ভব হবে।

৪। যন্ত্র-লেখন বা টাইপরাইটিং-এর অসুবিধাগুলি দূরীভূত হবে।

৫। পাঠে চক্ষুকে অযথা অত্যধিক পীড়িত করবে না।

[রোমান লিপির এই গুণটি যথেষ্ট রয়েছে; চীনা ও জাপানী অক্ষরে এটি বড়ই কম, আমাদের নাগরী প্রভৃতি সকল লিপিরও কমই রয়েছে।]

৬। সর্ব্বোপরি, ক্ষুদ্র প্রাদেশিক মনোবৃত্তি হ্রাস পাবার সম্ভাবনা এসে যাবে। অথচ প্রত্যেক প্রদেশে এবং একত্রিত অঞ্চলে ব্যবহৃত লিপির প্রাধান্য 'মুখ্যকায়' (অক্ষর)রূপে থেকে যাওয়ায় ততৎ প্রদেশের পক্ষেও ক্ষোভের কারণ থাকবে।

ছোট ছাঁদের 'সামান্যকায়' "অক্ষরী"ই এখন সর্ব্বভারতে এক-লিপি (common-script) হবে। পরে এমন এক দিন আসতে পারে, যখন বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লিপিগুলির মধ্য থেকেও একটি সাধারণ প্রতিসংস্কৃতরূপ মুখ্যকায় অক্ষররূপে দাঁড়িয়ে যাবে, কারণ যোগ্যতমেরই উদ্বর্তন হয়—তখন মুখ্যকায় 'অক্ষরী' এবং সামান্যকায় 'অক্ষরী' উভয়ই সর্ব্বমান্য হয়ে যেতে পারে। যত দিন সে অবস্থা না আসে, তত দিন 'এক-লিপি' সামান্যকায় অক্ষর রূপেই সমগ্র ভারতে প্রচলিত হোক। স্থানীয় প্রাদেশিক লিপিটি কেবল যে মুখ্যকায় অক্ষররূপে আদ্যক্ষর প্রভৃতি স্থলেই ব্যবহৃত হবে, তা নয়; লেখকের ইচ্ছানুসারে বিকল্পে যে-কোন কাজেই তার ব্যবহার চলবে। সাইনবোর্ড প্রভৃতি যে-কোনো প্রদর্শনলেখাও মুখ্যকায় অক্ষর দ্বারা চলতে কোনো বাধা নাই, তবে সকল প্রদেশের লোকের সামান্যকায় 'অক্ষরী'র যথেচ্ছ ব্যবহারে পূর্ণ অধিকার থাকবে।

এই প্রথা গ্রহণ করলে মোটামুটি রোমান লিপির যাবতীয় গুণ আমাদের আয়ত্তে এসে যাবে, অথচ ভারতীয় বর্ণমালার বৈজ্ঞানিকত্ব ও উপযোগিতাকে ত্যাগ করতে হবে না।

বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য, এবং এর সুধারণ সময়-সাপেক্ষ। যে-কোনো লিপির অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করলে প্রতীত হবে যে বহুকাল ধরে ব্যবহারে পরিশেষে একটি প্রথা দাঁড়িয়ে যায়। পুরাতন সরল 'ব্রাহ্মী' লিপিরও অভিব্যক্তি অনেক কালের পরীক্ষায় হয়েছিল।

রাষ্ট্রভাষা যাই কেন হোক না, তা তো লিপি দিয়ে লিখতে হবে। সেই লিপিকে পরিশোধিত বৈজ্ঞানিক রূপ দিতে না পারলে লিপির উন্নতির পথে বাধা থেকে যায়। অক্ষর-জ্ঞান শতকরা দশ জনের স্থলে দশ গুণ বৃদ্ধি করতে হলে, অক্ষরকে সহজ বৈজ্ঞানিক এবং উপযোগী হতেই হবে। একবার দোষযুক্ত একটি লিপি শিখিয়ে বারংবার পূর্ব্বশিক্ষা ত্যাগ করে নূতন গ্রহণ করানো সাক্ষরতা প্রচেষ্টার অন্তরায়। সুতরাং লিপির বিষয় প্রথমেই বিবেচ্য। অতএব 'লিপি-ভারতী'র দাবিগুলি কতটা টেকসই তার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ভারতরাষ্ট্র এখনও 'এক-লিপি'র কোনো ফতোয়া বা নির্দেশ দেন নি; তবে দশমিক সংখ্যালিখন সম্বন্ধে আন্তঃরাষ্ট্রীয়*

* আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংখ্যা লিখন রীতি গ্রহণ করায় পৃথিবীসুদ্ধ সবার সঙ্গে আমরা এদিক দিয়ে একত্ব অনুভব করতে পারি, সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশে মহাজনী প্রথায় সংক্ষেপে ও অল্প খরচে হিসাবপত্র রাখা দুঃসাধ্য হয়ে গেল। অতঃপর ব্যাঙ্কের মত কলম (স্তম্ভ) টানা রূল করা কাগজ না পেলে দৈনন্দিন বাজার-খরচটি পর্য্যন্ত আর লেখা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। এখনও ১৷৹ লিখলে এক টাকা চার আনা বুঝি, /৷৹ লিখলে এক পোয়া বুঝি; এর পর সেটি বুঝাতে লিখতে হবে যথাক্রমে 'R (বা টা) 1-4-0' এবং 'মণ 0-0-4 ছটাক। যোগ-বিয়োগ গুণ ভাগ শুভঙ্করী প্রথায় মিশ্র হলেও যে কত শুভকর ছিল তা আর ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা জানতে পারবে না।

তবে এরও একটি সমাধান হতে পারে। প্রচলিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রথম '1' সংখ্যাটির আকার সরল দণ্ড স্থলে একটু পুঁটুলি-সমন্বিত ধনুষাকার,—নাগরী १ বোম্বাই ফন্টের 'এক'—করে নিলে শুভঙ্করী প্রথায় ভগ্নাংশ দেখানো অসম্ভব হবে না। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংখ্যা গ্রহণ করতে গিয়ে জার্ম্মানী, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ যদি 'L' কে পেটকাটা করে দেখাতে পারে যেমন ইংলণ্ডে পেটকাটা (£) পাউণ্ড-ষ্টার্লিং জ্ঞাপক। তবে ভারতরাষ্ট্রই বা প্রথমাঙ্কটি শুদ্ধ ভারতীয় প্রথায় লিখতে পারবে না কেন? বিশেষতঃ যখন

রূপ গ্রহণ করে এবার প্রকারান্তরে সমগ্র দেশে, অন্ততঃ সংখ্যা বিষয়ে একই রূপ প্রবর্ত্তন করলেন। এটিই হয়তো 'এক-লিপি' প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বসূচনা।

'লিপিভারতী'র সামান্যকায় "অক্ষরী"র দণ্ডায়মান রূপ এবং হস্তলিপির তির্যক (ইটালিক) উদাহরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে লিপিটি বোধগম্য হবে। উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'জনগণ মন' গানের প্রথমাংশ দেখান হয়েছে, তাতে আদ্যক্ষর প্রান্তের মুখ্যকায় অক্ষরে রয়েছে।

লিপিভারতীর সামান্যকায় 'অক্ষরী'গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই বোধগম্য হবে যে, স্বরবর্ণ একটিমাত্র মূল 'অ' কাঠামোর উপর আবশ্যক মাত্রা যোজনা করে দ্বাদশটি স্বরবর্ণ গঠিত হয়েছে। যুক্তাবস্থা দেখাতে গিয়ে ব্যঞ্জনবর্ণের আদি অক্ষর 'ক'কে ধরে বানান, ফলা ও বিন্দু-বিসর্গাদি যোগ দেখানো হয়েছে। হ্রস্ব 'ই'কারের চিহ্ন অক্ষরের পূর্ব্বে ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নয় বলে পরে বসানো হয়েছে অথচ দীর্ঘ 'ঈ'কারের সহিত প্রভেদ স্পষ্ট দেখানো হয়েছে। রেফ্‌ফলা অক্ষরের পূর্ব্বে এবং র-ফলা পরে, যেমন তর্ক (=তর্ক) তক্র (=তক্র)।

ব্যঞ্জনবর্ণের ভিতর প্রথমেই লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ মহাপ্রাণ বর্ণগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী অল্পপ্রাণ বর্ণের সহিত একটি সাধারণ চিহ্নযোগে নিষ্পন্ন হয়েছে—যে বিধি অনুসারে প্রচলিত নাগরীতে প ফ লেখা হয়। প্রথম তিনটি অনুনাসিক বর্ণ বর্গের তৃতীয় বর্ণের গোড়ার দিকে পুঁটুলি (০) সংযোগে সিদ্ধ হয়েছে এবং চতুর্থ পঞ্চম অনুনাসিক ও বর্গের প্রথম বর্ণে অনুরূপ পুটুলি বা বিন্দু সংযোগে গঠিত হয়েছে। 'র' অক্ষরটি যে ভাবে এসে গেছে তার উপরকার অংশ রেফ-ফলার জন্য এবং নীচেকার অংশ র-ফলার জন্য ব্যবহৃত হবে। 'র'-এর একটি 'বৈকল্পিক' রূপ বন্ধনীর ভিতর দেওয়া হয়েছে—ওটি বিশেষতঃ হাতের লেখার সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হতে পারবে। 'ড'-এর পাশে বন্ধনীর ভিতর ড় ঐরূপ নিম্ন-বিন্দুযুক্ত ঢ় প্রভৃতি অক্ষর এসে যাবে। তামিল, উর্দ্দু, মরাঠি প্রভৃতিতে এমন কয়েকটি অক্ষর রয়েছে যার ঠিক ঠিক উচ্চারণ বুঝাবার জন্য নিম্ন-বিন্দু, ঊর্দ্ধবিন্দু বা অপরবিধ সাঙ্কেতিক চিহ্ন (diacritical marks) প্রয়োগে বাধা নাই। ইংরেজী F Z প্রভৃতি অক্ষর, at প্রভৃতি শব্দের ভিতরকার স্বরের উচ্চারণ ইত্যাদি বুঝাতেও সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহার চলতে পারে, কিন্তু তৎস্থলে অতিরিক্ত অক্ষর বাড়িয়ে লাভ নেই।

যুক্তাক্ষর সাধারণতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরের অন্তিম দণ্ডটি তুলে দিয়ে সিদ্ধ হবে। তবে নাগরীতে প্রচলিত ওঁ, শ্রী ত্র ক্ষ প্রভৃতি কয়েকটি যুক্তাক্ষরের বিকল্প ব্যবহার রাখা যেতে পারে।

অক্ষরের অবয়ব বুঝাবার জন্য চার-রেখার (four-ruled) পটভূমিতে এমনি ভাবে অঙ্কিত করে দেখানো হয়েছে, যাতে পরস্পরের প্রভেদ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কোন-কোন লিপি-সুধারক পরামর্শ দেন যে, দুইটি মাত্র সমান্তরাল রেখার মধ্যবর্ত্তী স্থান জুড়ে অক্ষর বসালে সুবিধা হবে। 'লিপিভারতী' সে মতে আস্থা রাখে না, বরং রেখার উপরে নীচে, আশে-পাশে সর্ব্বত্র নিয়মবদ্ধ ভাবে অবস্থান করবে।

হস্তলিপির যে নমুনা ('জন-গণ-মন' গান) তির্যক (ইটালিক) কায়দায় দেওয়া হ'ল, তৎস্থলে খাড়া দণ্ডরূপ লেখায়ও কোনো বাধা নেই। ছয়টি পংক্তির আদ্যক্ষরগুলি বিভিন্ন প্রান্তীয় বর্ত্তমান প্রচলিত মুখ্যকায় অক্ষরে দেওয়া হয়েছে। ক্রম এইরূপ: নাগরী, বাংলা, গুজরাতী, তামিল, সিংহলী এবং মৈথিলী।

এরূপ সামান্য পরিবর্ত্তনেই মহাজনী খাতাপত্র রাখার সুবিধা হয়ে যায়। এতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় আদর্শও ক্ষুণ্ণ হবে না। টাকা আনা পাই, কড়াক্রান্তি, মণ-সের আদি সবই তা হলে দেশীয় সরল প্রণালীতেও দেখাতে পারা যাবে। আর এই দশমিক অঙ্ক তো ভারতেরই দান। ভুল করে কিছুকাল পাশ্চাত্ত্য দেশে এটি 'আরবী অঙ্ক' বলে চলেছিল। বর্ত্তমান লেখক ৩০ বছর ধরে একে বরং Indo-Arabic বলে আসছেন (*Educational Review, August*—1921, ইত্যাদি।)

দক্ষিণাপথের অনেক ভাষা—যথা তামিল, তেলুগু, মলয়ালী—ইংরেজের আমল থেকেই আন্তঃরাষ্ট্রীয় দশমিক অঙ্ক লিখনের বর্ত্তমান রূপ। 1,2,3, 4,5,6,7,8,9,0, গ্রহণ করে আসছে। আমাদের অঞ্চলেও দেশীয় ভাষায় ছাপা পাটীগণিতে দশমিক অঙ্কগুলি ইদানীং প্রায়শঃ ইংরেজীতে দেওয়া হচ্ছিল। এখন সেটি পাকাপাকি হ'ল। রোমান বর্ষগণনা ও মাস-নামও ভারতে বহু প্রদেশে নিত্যকর্ম্মে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পাকিস্থানের মতিগতি

রেজাউল করিম

ধর্ম্মান্ধতার ইতিহাসে পাকিস্থান অতীত যুগের সমস্ত নজীরকে অতিক্রম করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন জগতের সর্ব্বত্র লোকায়ত্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত, যখন যুক্তি ন্যায়বিচার ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বিধিব্যবস্থা রচিত হইতেছে সেই যুগে এমন দেশও আছে যেখানে আদিম যুগের বর্ব্বরতা, মধ্যযুগের স্বৈরাচার ও ধর্ম্মান্ধতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। সেই মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র হইতেছে পাকিস্থান। সভ্য জগতের বুকের উপর কেমন করিয়া একটি রাষ্ট্রে অসহায় মানুষের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নিপীড়ন চলিতেছে তাহা ভাবিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাই। যে ধর্ম্মান্ধতাকে পুঁজি করিয়া পাকিস্থান ব্রিটিশের শুভ-আশীর্ব্বাদ লইয়া জন্মলাভ করিয়াছে, আজও—স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরেও সেই ধর্ম্মান্ধতা তাহার একমাত্র অবলম্বন হইয়া রহিল। আজও মধ্যযুগীয় মনোভাব সে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। আজও সে যুগোপযোগী রাষ্ট্রের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাই পাকিস্থানে চলিতেছে বর্ব্বরতা ও অমানুষিকতা। পাকিস্থান কি চিরকাল ধরিয়া এই ভাবে দেশ শাসন করিতে থাকিবে? তাহার কি কোন দিন চৈতন্যোদয় হইবে না? এ বিষয়ে কি অপরাপর স্বাধীন রাষ্ট্রের কোন আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য নাই? সত্য বটে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অপর কোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা চলে না। আন্তর্জাতিক আইন এই প্রকার হস্তক্ষেপ সমর্থন করে না। কিন্তু যে আন্তর্জাতিক আইনের কয়েকটি ধারার সুযোগ লইয়া পাকিস্থান মানুষের উপর নানাবিধ অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে সাহসী হইতেছে সেই আইনই আবার কতিপয় ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার, এমন কি সশস্ত্র প্রতিরোধ করিবার যৌক্তিকতা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছে। সে প্রয়োজন কখন উপস্থিত হয়? যখন কোন রাষ্ট্রে নিরীহ জনসাধারণের উপর, ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার অজুহাতে—ব্যাপক ভাবে অত্যাচার করা হয়, রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে অপারগ হন এবং যখন আইনহীনতা, অরাজকতা, লুঠতরাজ, নারীধর্ষণ প্রভৃতি অপকর্ম্ম অবাধে চলিতে থাকে, অথচ রাষ্ট্রের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ নিরপেক্ষ দর্শকের মত ইহা দেখিয়াও কোন প্রতিকার করেন না, এবং যখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে কোনও রূপ নিরাপত্তা-বোধ থাকে না, আর রাষ্ট্রও সে নিরাপত্তাবোধ জাগাইতে পারে না—সেইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে শুধু পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্রেরই নহে, জগতের অপরাপর রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য হইতেছে সক্রিয় হস্তক্ষেপ দ্বারা এই সব অত্যাচার নিবারণের জন্য সমবেত ভাবে চেষ্টা করা—এই হস্তক্ষেপ "পুলিস এ্যাকসন" হইতে পারে অথবা সশস্ত্র প্রতিরোধ ও অর্থনৈতিক "স্যাংসনে"ও আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে। এই ভাবে সেই অত্যাচারী রাষ্ট্রকে এমন চাপ দিতে হইবে, এমন ভাবে সংখ্যালঘুদের রক্ষার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইতে হইবে যেন ভবিষ্যতে তথায় তাহাদের উপর আর কোনওরূপ অত্যাচার-অবিচার হইতে না পারে। এই প্রতিশ্রুতিও আবার নানাভাবে লওয়া হইয়া থাকে। সংখ্যালঘুদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য সেই রাষ্ট্রে আন্তর্জ্জাতিক সৈন্য মোতায়েন রাখা হয়, অথবা তাহার কিয়দংশকে আন্তর্জ্জাতিক তত্ত্বাবধানে ছাড়িয়া দিতে হয়। অথবা প্রয়োজন হইলে সমস্ত রাষ্ট্রকে আন্তর্জ্জাতিক পরিষদের অধীনে 'ম্যানডেট' রূপে রাখিবার ব্যবস্থাও করা হয়। এই কার্য্যাবলীর উদ্দেশ্য পররাজ্য গ্রাস নহে, পর-রাজ্য আক্রমণও নহে। ইহা অসহায় মানুষের উপর অত্যাচার বন্ধ করিবার উপায়বিশেষ। যে রাষ্ট্র মানবাধিকার পূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না, তাহাকে এইভাবে সংশোধন করা দরকার হইয়া পড়ে। নতুবা স্বাধীন সত্তার নামে এই শ্রেণীর ধর্ম্মান্ধ রাষ্ট্রে মানবতা-বিরোধী অপরাধসমূহ অব্যাহত ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। এই প্রকার হস্তক্ষেপের নজীর ইতিহাসে রহিয়াছে। একটি উদাহরণ দিব।

প্রাগ্‌বিপ্লব যুগে সুলতান-শাসিত তুরস্কে ধর্ম্মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। অথচ তুরস্কের অধীন প্রদেশ-সমূহে লক্ষ লক্ষ খ্রীষ্টান বসবাস করিত। তাহারা এই ধর্ম্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নানাভাবে উৎপীড়িত হইত। তাহারা ছিল সংখ্যালঘু এবং রাষ্ট্রীয় বহু অধিকার হইতে বঞ্চিত। ইউরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ তুরস্ককে পুনঃপুনঃ সাবধান করিয়া দিয়া-ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তুরস্ক সরকার সংখ্যাঘুদের উপর এই সব অত্যাচার নিবারণ করিতে পারেন নাই। তখন ইউরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাধ্য হইয়া ইহাদের রক্ষা করিবার জন্য সশস্ত্র প্রতিরোধ-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উদ্যত হইলেন। ইহার ফলে সংখ্যালঘুরা বাঁচিয়া গেল। অবশ্য ইউরোপের রাষ্ট্রপুঞ্জের আরও গোপন উদ্দেশ্য ছিল। তাই তাহাদের মূল উদ্দেশ্য সব সময় কার্য্যকরী হয় নাই। যদি সরল ও শুদ্ধ অন্তঃকরণে কেবলমাত্র সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টা করা হইত তাহা হইলে বল্কান প্রদেশে আরও শীঘ্র স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হইত। তুরস্কের সুলতান যুগের লক্ষণ বুঝিতে পারেন নাই। ইউরোপের হাতে পুনঃপুনঃ পরাজিত

হইয়াও তিনি তাঁহার সংখ্যালঘু দমননীতি পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করেন নাই। সুলতান ছিলেন ধর্ম্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্ব্বাধিনায়ক। তিনি তাঁহার ধর্ম্মতান্ত্রিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। সুতরাং যত দিন তুরস্কে ধর্ম্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, তত দিন সেখানকার সংখ্যালঘু সমস্যাকে উপলক্ষ করিয়া নানাপ্রকার গণ্ডগোল হইতে লাগিল। কামাল আতাতুর্কের অভ্যুদয়ের কিছুকাল পূর্ব্বে তুরস্কের শাসকগণ যদি ধর্ম্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থানে লোকায়ত্ত রাষ্ট্র স্থাপন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যের সীমানা তত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িত না। সে আজ বৃহৎ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অন্যতম হইয়া রহিত। ধর্ম্মান্ধতার কারণে হেলায় সে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছে। কামাল আতাতুর্ক ধর্ম্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই সব অসুবিধার কথা উপলব্ধি করিয়া নূতন তুর্কি রাষ্ট্র হইতে ধর্ম্মতান্ত্রিকতা রহিত করিয়া তৎস্থলে লোকায়ত্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাই আজ তুরস্ক ক্ষুদ্র হইয়াও প্রভূত উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। আজ সেখানে বহু ধর্ম্মসম্প্রদায় বসবাস করিতেছে। সকলের আছে সমান অধিকার ও দায়িত্ব—তাই সেখানে সংখ্যালঘু সমস্যা লইয়া আর কোন গণ্ডগোল নাই।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই বিংশ শতাব্দীতে পাকিস্থান সেই মধ্যযুগীয় ধর্ম্মতান্ত্রিক নীতি মানিয়া চলিতেছে। প্রাগ্‌বিপ্লব যুগের তুরস্কের মত শরীয়তী রাষ্ট্র স্থাপনই তাহার উদ্দেশ্য। পাকিস্থানের মৌলবী-মৌলানা হইতে আরম্ভ করিয়া নেকটাই ও সুট-কোট পরা কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেকেই শরীয়তী রাষ্ট্র, মুসলিম রাষ্ট্র প্রভৃতি মধ্যযুগীয় আদর্শকে এমন গালভরা ভাষায় প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন যে তাহাতে অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে। তাহারা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ধরিয়া লইয়াছে যে, শরীয়তী রাষ্ট্রকে হিন্দু নিধন ও হিন্দু বিতাড়ন দ্বারা সার্থক করিয়া তোলাই হইতেছে তাহাদের ধর্ম্মসঙ্গত কর্ত্তব্য। তাই তাহারা এই সব অত্যাচার ও অবিচারমূলক কার্য্য করিয়া এবং তাহার প্রশ্রয় দিয়াও মনের মধ্যে কোনও রূপ বিবেকের দংশন অনুভব করিতেছে না। বরং মনে করিতেছে যে এই ভাবে তাহারা ইসলামেরই সেবা করিতেছে। ইহাই হইতেছে আজিকার পাকিস্থানের বাস্তব চিত্র। সেখানে কাহারও মতের স্বাধীনতা নাই, বিবেকবুদ্ধির বালাই নাই—মধ্যযুগীয় পরিপূর্ণ স্বৈরাচারতন্ত্র সেখানে প্রতিষ্ঠিত। শুধু হিন্দু নয়, যে সব মুসলমান সেখানে যুগের দাবি মানিয়া পাকিস্থানী নীতির সমালোচনা করেন, তাঁহাদেরও অল্প নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় না। যে রাষ্ট্র এই ভাবে চলিতে থাকে, যেখানে এই ভাবে মানুষ প্রপীড়িত ও নিগৃহীত হয় সে রাষ্ট্রের সংশোধনের জন্য এবং দরকার হইলে তাহার বিলুপ্তি সাধনের জন্য বিশ্বের জনমত সৃষ্টি করিতে হইবে। স্বাভাবিক গতিতে সংশোধনের জন্য যুগধর্ম্মের উপর উহাকে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। আজ পাকিস্থানে প্রাগ্‌বিপ্লব যুগের তুরস্কের মত অবস্থাই বিদ্যমান। প্রত্যেক ধর্ম্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শেষ পরিণতি এইরূপই হইয়া থাকে। সুতরাং তুরস্কের ব্যাপারে সেদিন যেমন আন্তর্জ্জাতিক শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হইয়াছিল, পাকিস্থানের ব্যাপারে তেমনি আজ তাহারই প্রয়োজন হইয়াছে। এরূপ হস্তক্ষেপ কোন মতেই অন্যায় হইবে না। ইহা বিশ্বমানবতার দাবি যে পাকিস্থানের নীতিকে সংশোধন করিতে হইবে, সেখানে আজ মানুষের মর্য্যাদা অবলুণ্ঠিত—মানুষকে সেই মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। পাকিস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্র ভারতের দায়িত্ব একার নহে। সমস্ত সভ্য জগৎকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সভ্য জগৎ যদি এতদঞ্চলে শক্তির ভারসাম্য রক্ষার জন্য পাকিস্থানের এই সব অনাচার সহ্য করিয়া যান, তবে বুঝিব তাহাদের বিশ্বমানবের অধিকারের কথা বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র। তাই আজ সভ্য জগৎকে আহ্বান করিতেছি পাকিস্থানকে সংশোধনের ভার গ্রহণ করুন। নতুবা সেখানে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

এই প্রসঙ্গে পাকিস্থানকে দু-একটি কথা পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই। ভারত বিভাগের পর যখন পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন অনায়াসলব্ধ বস্তু পাইয়া তাহার নেতাদের মাথা এরূপ ভাবে বিগড়াইয়া গেল যে তাঁহারা হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। রাষ্ট্রের বৃহৎ কল্যাণবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া জনগণের সেবা করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের জাগ্রত হইল না। সস্তায় মূল্যবান বস্তু পাইলে মনের যে অবস্থা হয়, তাঁহাদেরও সেই অবস্থা হইল। তাঁহারা ধরিয়া লইলেন যে, যখন বিনা সাধনায় পাকিস্থান পাইয়াছেন, তখন সেখানকার হিন্দু শিখ প্রভৃতি সংখ্যালঘুদের প্রতি তাঁহাদের আর কোন কর্ত্তব্য রহিল না। সুতরাং তাঁহাদের বুলি হইল, ইহাদের তাড়াইয়া দাও। যেই কথা তেমনি কাজ। অতঃপর পশ্চিম পঞ্জাবে হিন্দু ও শিখ নরমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। ধর্ম্মান্ধতা দেশের কি ক্ষতি করিতে পারে তাহা পূর্ব্ব-পাকিস্থানের নেতারা পশ্চিম-পাকিস্থানের অভিজ্ঞতা হইতেও বুঝিলেন না। আজ পশ্চিম-পাকিস্থান হিন্দু ও শিখ শূন্য। কিন্তু ইহাতে রাষ্ট্রের কি কোন উপকার হইয়াছে? তাঁহাদের রাষ্ট্র যে ভাঙিয়া যাইতে বসিয়াছে তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্বদেশ হইতে উৎখাত করার ফলে সেখানে এমন সব জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে যাহার সমাধান দীর্ঘ কালেও হইবে না। বস্তুতঃ, এই সব অভূতপূর্ব্ব ও অকল্পনীয় সমস্যাই এক দিন

পাকিস্থানকে অকালে জরাগ্রস্ত ও অথর্ব্ব করিয়া ফেলিবে, তাহার মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিবে। কিন্তু পূর্ব্ব-পাকিস্থানের কর্ত্তারা ইহা হইতে কোন অভিজ্ঞতাই অর্জ্জন করিতে পারিলেন না। কোন শিক্ষাই তাঁহাদের লাভ হইল না। বরং তাঁহারা দুই বৎসর পর পূর্ব্বাঞ্চলে সেই একই প্রকার পীড়নমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাদের মতিগতি দেখিয়া মনে হয় যে, পূর্ব্বপরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁহারা পূর্ব্বাঞ্চল হইতে হিন্দু-বিতাড়ন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই হিন্দু-নির্যাতন একটা আকস্মিক ঘটনা নহে। তাহা গভীর অভিসন্ধিমূলক কার্য্যপদ্ধতির একটা অংশ মাত্র। হঠাৎ উদ্ভূত ঘটনা হইলে সহজেই নিবারিত হইতে পারিত। কিন্তু পাকিস্থানকে এই সাবধানবাণী শুনাইব যে, ইহাতে তাঁহারা একটুও লাভবান হইবেন না। পূর্ব্ব-পাকিস্থানের হিন্দুগণ রাষ্ট্রের গলগ্রহ-স্বরূপ নহে। বিদ্যাবত্তায়, যোগ্যতায় তাঁহারা এত দূর উন্নত যে তাঁহারা যে-কোন রাষ্ট্রের গৌরব ও সম্পদের বিষয়। ইঁহাদের উপর নির্যাতন চালাইয়া এবং পরিশেষে ইঁহাদিগকে স্বদেশ হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য করিয়া পাকিস্থান নিজের পায়েই কুড়ুল মারিতেছে।

ইতিমধ্যেই পূর্ব্ব-পাকিস্থানের রাজনৈতিক জীবনের উপর পশ্চিম-পাকিস্থান নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। আজ পূর্ব্ববঙ্গ ত পশ্চিম-পাকিস্থানের একটা উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে। কিছু দিনের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানগণ দেখিবে যে, তাহারা নিজেদের দেশে প্রবাসী হইয়া পড়িয়াছে, পশ্চিমের দাসে পরিণত হইয়াছে। তাহার সূচনা দেখা দিয়াছে। হিন্দুশূন্য পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানগণ শেষ পর্য্যন্ত অসহায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। তখন তাহাদের দুর্দ্দশার অন্ত থাকিবে না। যাহা হউক, ইহা তাহাদের সমস্যা। তাহারা যদি ইচ্ছা করিয়া পশ্চিমের দেওয়া দাসত্বের শৃঙ্খল গলায় পরে, তবে তাহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু আমরা যখন মানবতাকে পদদলিত হইতে দেখি তখনই বেদনায় অস্থির হইয়া পড়ি। আমাদের দাবি এই যে, পূর্ব্ববঙ্গে মানবতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আর সে দাবি কেবল ভারতের নিকট করিতেছি না—করিতেছি সমগ্র সভ্য জগতের নিকট। "Come down into Macedonia and save them"—বাইবেলের এই শাশ্বত বাণীর প্রতিধ্বনি তুলিতেছি। আন্তর্জ্জাতিক প্রতিরোধ, 'স্যাংসন' ও অপরাপর উপায়ে পাকিস্থানকে শায়েস্তা করার সময় উপস্থিত। জার্ম্মানী কর্ত্তৃক ইহুদী নির্যাতন যদি বিশ্বমানবতাবোধ জাগাইতে পারে, তবে পাকিস্থানের আচরণ কেন তাহা পারিবে না? সুতরাং পাকিস্থানের ব্যাপারে আজ আন্তর্জ্জাতিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হইয়াছে। যুদ্ধ আমরা চাহি না, বা ভালবাসি না। কিন্তু নিজেদের রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলিয়া পাকিস্থানের মানবতাবিরোধী কাজগুলিকে অবাধে চলিতে দেওয়াও সমীচীন নহে। আজ পাকিস্থানের এই সব মানবতাবিরোধী কার্য্য দমনের জন্য যদি সমবেত চেষ্টা না করা হয়, তবে ভবিষ্যতে সকল দেশেই মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে। বিশ্বকল্যাণের প্রয়োজনেই পাকিস্থানের নীতি সংশোধন করিতে হইবে।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীসুধাময়ী সেনগুপ্ত

হুগলী জেলার চাঁপ্তা গ্রামের ৺প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী সুধাময়ী সেনগুপ্ত এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় পালি ভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ইনি "প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও কৃষ্টি" বিষয়ে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে ইনি ঐতিহাসিক প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন।

শ্রীরমলা ভড়

শ্রীমতী রমলা ভড় বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় ফলিত গণিতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বিশুদ্ধ গণিতেও এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীমতী রমলা বেথুন কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় গণিত অনার্সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম গণিতের দুইটি বিভাগে এরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইলেন।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেন কি বিজয়সেন ?

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

সম্প্রতি বাঁকুড়ায় জিতরাম-এর ধর্ম্মমঙ্গলের অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ পুথি আমার নিকট রহিয়াছে। ঐ পুথি সম্বন্ধে আমার লিখিত প্রবন্ধ গত বৎসর শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় বর্দ্ধমান সাহিত্য-সভার অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন। উক্ত ধর্ম্মমঙ্গলে দেখা যায়, লাউসেনের সময় 'রমতি' নগর হইয়াছে। গৌড়ে গৌড়েশ্বর বাস করিতেছেন। আবার সে সময় 'বংসুলতান'ও হইয়াছে। লাউসেন ছদ্মবেশে রমতি নগরে আসিয়াছেন—'ভেটিতে বংসুলতানে'। রমতিতে গৌড়ের পাত্র মহামদ বাস করেন। তিনি লাউসেনের মাতুল। মহামদ রঙ্গপতি বিসুরায়ের পুত্র। অতএব বিসুরায় রঞ্জার পিতা এবং গৌড়েশ্বরের শ্বশুর—'বড়োরাজা'। মহামদ কর্ত্তৃক হস্তিচোর অপবাদে লাউসেন কারারুদ্ধ হইলেন।

এখন উক্ত কাব্যের এই গৌড়েশ্বর, লাউসেন, রঙ্গপতি—বিসুরায় বংসুলতান প্রভৃতি কে কে হইতে পারেন দেখা যাক।

রাজেন্দ্রচোলের বঙ্গদেশ আক্রমণকালে (১০১৮-৪৩) পশ্চিমবঙ্গে মহীপাল, দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে রণশূর, এবং পূর্ব্ববঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র (গোপিচন্দ্র) রাজা ছিলেন। তিন জনেই নাকি রাজেন্দ্রচোলের নিকট পরাভব স্বীকার করেন।

ইহারই পরবর্ত্তী কালে যখন গোবিন্দচন্দ্রকে লইয়া পূর্ব্ববঙ্গে কাব্য রচিত হইয়াছিল পশ্চিমবঙ্গেও তখন লাউসেনকে লইয়া কাব্য রচনা করা হইয়াছিল। অতএব লাউসেন নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গের একজন বড়োরাজা ছিলেন। কিন্তু এই কালে বিজয়সেনই পশ্চিমবঙ্গের বড়োরাজা যাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া কাব্যরচনা চলিতে পারে।

বিজয়সেনের সমসাময়িক পশ্চিমবঙ্গের হরিবর্ম্মা নামক আর এক রাজার কথা আজকাল জানা যাইতেছে। ইনি চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া বিক্রমপুর অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের হরিচন্দ্র হইতে পারেন।

রাজেন্দ্রচোলের বঙ্গবিজয়ের পূর্ব্বেও যখন রাঢ়ে সেনরাজবংশ এবং বর্ম্মরাজবংশের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে তখন বিজয়সেন এবং হরিবর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষগণ রাজেন্দ্রচোলের সেনাপতিরূপে এদেশে আসিয়াছিলেন একথা মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

সমুদ্রগুপ্তের কালে পুষ্করণার অধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা 'ব' দ্বীপ বাংলা হইতে বর্ত্তমান বাঁকুড়া পর্য্যন্ত ভূমি অধিকার করিয়া, শুশুনিয়াগাত্রে বাংলা ও অঙ্গদেশের সীমা চিহ্নিত করিয়া-

ছিলেন। বর্ম্মবংশীয় কেহ হয়ত "বাংলা" গ্রামের (বর্ত্তমান বাঁকুড়ানগর) সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। বাঁকুড়ার ক্ষুদিমগন্তরী গড়ের রাজা হরিবর্ম্মা হইতে পারেন। হরিবর্ম্মার বিক্রমপুর জয়ের ফলেই হয়ত একতাখরের শিবলিঙ্গে অথবা ধর্ম্মশিলায় নাথকল্পনা এবং কার্ত্তিকের অথবা অবলোকিতেশ্বরে ময়নারাণী কল্পনা আসিয়া পড়িয়াছিল। ময়নারাণী অবজ্ঞাত হইয়াও পূজিত হইয়াছিলেন।

যে কালে গৌড়পতি, রঙ্গপতি এবং শূররাজগণের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইয়া বিজয়সেন প্রতাপশালী হইয়া পড়িয়াছেন, সেকালে রাঢ়ে হরিবর্ম্মার অবস্থান আর অন্য কোথায় সম্ভব হইতে পারে?

ধর্ম্মমঙ্গলের কবিগণ ইতিহাস লিখেন নাই। কাশিয়াড়ী হইতে ময়না বেশী দূরে নয়। কর্ণগড়ের সেনবংশই বিজয়সেনের বংশ হওয়া স্বাভাবিক। ময়নার উত্তর-পশ্চিমে বর্ত্তমান বাঁকুড়ায় রায়পুর (রাইপুর)। রায়পুর-অম্বিকানগরের নিকট শ্রীরঙ্গগড়। কাব্যে উল্লিখিত রঙ্গপতি বিষ্ণুরায় এই স্থানের রাজা হইতে পারেন।

কবির লেখনীতে—হেমন্তসেনে—পুত্রবলিদান জন্য হরিবর্ম্মার 'কর্ণত্ব' আরোপ অসম্ভব নয়। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের দুর্লভভূবরাজ লভসেন—লাভসেন বা লাউসেন, বঙ্গবিজয় হেতু ইতিহাসে বিজয়সেন না হইয়া পারেন না। বীরভূমের লাভপুর ভূবরাজপুরের সহিত হয়ত নিদ্রাবলের বিজয়রাজের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে।

ধর্ম্মের সেবকদিগের নিকট যেই রামপাল—সেই ধর্ম্মপাল। হয়ত রামপাল বাঁকুড়ার অম্বিকানগরের নিকট শ্রীরঙ্গগড়ের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচোলের কাল ১০১৮-৪৩ হইলে এবং বিজয়সেনের কাল ১০৯৭-১১৫৯ হইলে, এবং বিলাসদেবী রণশূরের কন্যা হইলে বিজয়সেনের সহিত বিলাসদেবীর বিবাহ সম্ভব হইতে পারে না। হয়ত হেমন্তসেন (১০৭৫-৯৭) অথবা সামন্তসেনের (১০৫০-৭৪) সহিত বিলাসদেবীর বিবাহ হইয়া থাকিবে। অপুত্রক রণশূরের মৃত্যুর পর হয়ত শূররাজ্যে অধিকার স্থাপনের জন্য হেমন্তসেনকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। বিজয়সেন ৬২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি হেমন্তসেনের শেষ বয়সের সন্তান এবং হয়ত তাঁহাকে অল্প বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। নিদ্রাবলে থাকিয়া তিনি দিব্যভুমি উদ্ধারে রামপালকে সাহায্য করিয়াছিলেন। নিদ্রাবল বীরভূমের লাভপুর, ভূবরাজপুরের নিকট কোথাও হইতে পারে।

জিতরাম গৌড়েশ্বরকে 'বঙ্গপতি'ও বলিয়াছেন, 'বংসুলতান'ও বলিয়াছেন। বিজয়সেনের সময় বঙ্গে সুলতান ছিল না। লক্ষ্মণসেনের সময় তুর্কগণ কর্তৃক বিহার এবং বঙ্গ আক্রমণ হইয়াছিল। সে শত বৎসর পরে। সুলতানী আমলের অনেক পরে পল্লীকবি কাব্য লিখিয়াছিলেন। 'সুলতান' শব্দ প্রবচনরূপে তিনি কাব্যে ব্যবহার করিয়া থাকিবেন।

সেনবংশীয়গণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মী-রাজাকে ধর্ম্মের সেবক কল্পনায় মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইতেছে।

প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে রামাই পণ্ডিত একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। জিতরামের ধর্ম্মমঙ্গল সে অনুমান সমর্থন করিতেছে।

আলোচনা

"প্রাচীন বঙ্গে ধর্মপূজা"

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার 'প্রাচীন বঙ্গে ধর্ম পূজা' শীর্ষক প্রবন্ধে ধর্মঠাকুরের সহিত কূর্ম মূর্তির সম্বন্ধবিচার করিয়া এ সম্পর্কে পাঠক-সাধারণের মতামত আহ্বান করিয়াছেন (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৫৬)। সুখের বিষয়, তাঁহার আহ্বানে কেহ কেহ সাড়াও দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'ধর্ম ঠাকুর ও কূর্ম মূর্তি' শীর্ষক প্রবন্ধটি এক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬)। 'কোন ধর্মশিলাকেও প্রকৃত কূর্মরূপী দেখিতে পাই নাই'—তাঁহার এই উক্তিতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। কলিকাতা এবং ইহার উপকণ্ঠে বহু কূর্মাকৃতি ধর্ম ঠাকুর আছেন। সোনারপুরের নিকটবর্তী রাজপুর গ্রামের কূর্মাকৃতি এক ধর্মঠাকুরের মূর্তির আলোকচিত্র এতৎসহ প্রকাশিত হইল। ইহা যে সুস্পষ্ট কূর্মমূর্তি তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। লেখক একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে অনুসন্ধান করিলেও ঐরূপ মূর্তি দেখিতে পাইবেন। (*Handbook to the Sulptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parisat*—মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, পৃঃ ৮৯ দ্রষ্টব্য)। অন্যত্রও অনুরূপ মূর্তি প্রচুর আছে।

রাজপুরের কূর্মাকৃতি ধর্মরাজ · পৃষ্ঠে ধর্মের পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে

ভট্টাচার্য মহাশয় রিজলে সাহেব ও ধর্মপুরাণকার মাণিক গাঙ্গুলির বচন উদ্ধৃত করিয়া যথাক্রমে মৎস্যপুচ্ছবিশিষ্ট নরাকার ও কাঁকড়া বিছার মত আকৃতিবিশিষ্ট ধর্মঠাকুরের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা রথাকৃতিধর্মঠাকুরের কথাও শুনিয়াছি। কিন্তু যে সকল ধর্মঠাকুরের মূর্তি দৃষ্ট হয় তাহাদের অধিকাংশই কূর্মমূর্তি এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ডাঃ সরকার যথার্থই বলিয়াছেন—'বাংলাদেশে ধর্মঠাকুর প্রধানতঃ কূর্মমূর্তির সাহায্যে পূজিত হন'।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপপত্তি (Theory) অনুসারে এতদিন আমরা ধর্মপূজাকে বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ডঃ সুকুমার সেন, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ এ সম্পর্কে অভিনব তথ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অনুসন্ধানে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ধর্মঠাকুর শুধু অহিংসই নহেন, তিনি সহিংসও বটেন। পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে তাঁহার উদ্দেশ্যে হাঁস, ছাগ ও শূকর বলি হয় (দ্রষ্টব্য : শ্রীখণ্ড—শ্রীজনরঞ্জন রায়, 'বর্তমান', ফাল্গুন, ১৩৫৫)। উপরিউক্ত রাজপুরের ধর্মঠাকুরের মূর্তির সম্মুখেও কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত পশুবলি প্রচলিত ছিল।

ধর্মঠাকুরের পূজক তথাকথিত অনুন্নত-শ্রেণীর লোকেদের দারিদ্র্য তাহাদের দেবতাকেও স্পর্শ করিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ম ঠাকুরের মন্দির নাই। শ্যাওড়া, নিম, অথবা অনুরূপ বৃক্ষতলে তাঁহার পূজা হইতেছে। কোথাও বা মূর্তি, কোথাও বা এক টুকরা পাথরই ধর্মঠাকুর-রূপে পূজিত হইতেছেন। 'রূপরামের ধর্ম মঙ্গলে'র সম্পাদকদ্বয় সত্যই বলিয়াছেন—'ধর্মঠাকুরের দেউলিয়াদের দারিদ্র্য এখন দেবতাকেও দেউলিয়া করিয়াছে।' তবুও সমাজের এই অবজ্ঞাত অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরাই এই প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা বহন করিয়া চলিয়াছে।

ভট্টাচার্য মহাশয় কচ্ছপের খোলকে নিছক স্থানীয় ব্যাপার মনে করিয়া পূর্ববঙ্গে হিন্দুমুসলমান-নির্বিশেষে প্রত্যেক গৃহস্থের গোয়ালঘরে কচ্ছপের খোল ও গোরুর মাথার হাড় টাঙাইয়া রাখার কথা বলিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গেও (অন্ততঃ ২৪ পরগণার দক্ষিণ অংশে) এইরূপ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল এই যুক্তিতেই কচ্ছপের সহিত ধর্মঠাকুরের সম্পর্ককে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ভট্টাচার্য মহাশয়েরই উল্লিখিত, বর্ধমান শহরের দক্ষিণে দামোদর নদের অপর তীরবর্তী খুদকুড়ী গ্রামের জনৈক উগ্রক্ষত্রিয়ের বাড়ীতে স্থিত এক অপরিণতগঠন শিলাখণ্ডকে গৃহস্বামীর কূর্মমূর্তি বলিয়া দাবি করার পশ্চাতে সেই ঐতিহ্যেরই ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন নাই কি?

স্বর্ণসন্ধ্যা—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। দীপালি গ্রন্থশালা, ১২৩১, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

পঁয়ষট্টিটি কবিতার সমষ্টি। 'স্বর্ণসন্ধ্যা' কুমুদরঞ্জনের পরিণত বয়সের রচনা। রবীন্দ্রযুগে যে কয়জন কবি কবিতা লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁহাদের অন্যতম। পূর্ণ বিরাট, অসীম অথবা মানবের জীবন-দর্শন কবির আলোচ্য নহে, মানুষের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্মৃতি-বিস্মৃতি লইয়া তাঁহার কবিতাগুলি বিচিত্র বর্ণের বনপুষ্পের মত ফুটিয়া উঠে।

"ক্ষুদ্র সুখের দুখের কথা, হাঁটার আমোদ কাঁটার ব্যথা,
ভূর্জ্জপত্রে কস্তূরির এই রইল আলিঙ্গন।"

বনবিহগের কাকলী, খোকার হাসি, ফুলের হাসি, চণ্ডীর মন্দির, তুলসীর তল তাঁহার কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে। অনামা কবি, অখ্যাত কনেষ্টবল, মুদীর দোকান, অজয়ের চর, মজুরের মমতা, ফুল-ঝুমকা, বাবার চিঠি, মায়ের শেষ চিঠি, কুমুর, যুঁই, কৃপানাথ তাঁহার কবিতার বিষয়। মাতৃস্তোত্রে তিনি বলিতেছেন,

"বৎস হয়ে শ্যামলী তোর সাথে সাথে ছুটেছিলাম,
হরিণশিশু তোমার সাথে কোথায় তৃণ খুঁটেছিলাম।"

"পল্লী" কবিতায় বলিতেছেন,

"নই উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-দীপ, আমি কুটীরের মাটির প্রদীপ,
ক্ষণিকের তরে তুলসীতলায় ক্ষীণ আলো দিতে পারি।

"দীনতা এবং দীনবন্ধুরে" লইয়া কবি কোন্ দূরে থাকেন, অজয়ের চর, ভুলায় আমার মন, একটি গ্রাম "মধুর কল্পিত বেদনা আমার", "দুই ধারে ধান-ক্ষেত, আঁকা বাঁকা পথ, ওই পথ দিয়া যায় মোর মনোরথ",

"আজি হায় ফুরায়েছে সে পথের কাজ,
পিচ ঢালা পথে ডাকে সভ্য সমাজ।

মাথায় লাল পাগড়ী, ভীষণ-ভ্রূকুটি মঙ্গলকোট থানায় রামদীন পাঁড়েকে দেখিয়া লোকে ভয়ে কাঁপিত। এক দিন দেখা গেল থানার অঙ্গনে বেলতরুতলে বিশাল-বক্ষে সাদা-উপবীত কে যেন আপন মনে বই পড়িতেছে,

"আঁখির জলেতে আঁখর হারায় কোথায় উধাও মন,"

এ সেই রামদীন পাঁড়ে সুমধুর সুরে তুলসীর রামায়ণ পড়িতেছে।

"বাঁশের ভিতর বাঁশীর আওয়াজ বুঝিনে কেমনে আসে,
রাম নামে আজ সুমুখে দেখিনু সত্যই শিলা ভাসে।"

বর্দ্ধমান ষ্টেশন কবির একান্ত প্রিয়। জনক-জননী দূর প্রবাসের কষ্ট

স্কুল হইতে বহু দিন পর এইখানে আসিয়া নামিতেন, কবি তাঁহাদের জন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। এইখানে আসিলেই তিনি ছেলে হইয়া যান,

"এই ঠাঁই মোর মাতৃতীর্থ, এই ঠাঁই মোর কাশী,
বর্দ্ধমানের ষ্টেশনটি—বড্ডই ভালবাসী।"

তিনি বলেন, "পরিপূর্ণতা লইয়া করিব কি?

"কিছু খালি থাক্, এ কনক কলসী
পানিয়া ভরণ হয় নাকো যেন শেষ।"

"তুমি সব, তুমি সকল সম্ভাবনা," এই উক্তি করিয়া কবি কহিতেছেন,

"মাটির পৃথিবী এখনো খেতেছে পাক,
মুক্ত হয়নি কুম্ভকারের চাক।"

"মেঠো গানে হয়ত মিঠে—পাবে চেনা রঙের ছিটে।" এমনি ধারা মিঠে হাতের চেনা রঙের ছিটে গীতিকবিতাগুলিকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে।

"মেলা দেখা শেষ, পুরবীর সুরে সন্ধ্যা আসিছে ভাসি,
ময়ূরের কাঁধে চেপে ফিরে যাই বাজাতে বাজাতে বাঁশী।"

আমরাও কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া প্রার্থনা করি,

"সন্ধ্যা, জীবন-সন্ধ্যা আমার, স্বর্ণ-সন্ধ্যা হোক্,
রবির কিরণ মিলাবার আগে উঠুক চন্দ্রালোক।"

মাধুকরী—শ্রীসুধীর গুপ্ত। এম. সি সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বইখানিতে বত্রিশটি কবিতা আছে। 'মাধুকরী বৃত্তিলব্ধ হোক্' অনেকগুলি রচনার মধ্যে প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় পাই।

"অন্ধ গলির রন্ধ্র-বিহীন ঘরে,
স্বপন লোকের সোনার মেয়ের তরে,
স্বর্ণ-শিল্পী সোনার গহনা গড়ে।"

"তারা ও প্রদীপে" রচয়িতা বলিতেছেন,

"অনন্তের সাথে হোলো অন্তের ইসারা,—
মাটির প্রদীপ আর আকাশের তারা।
পরস্পর কহে যেন আলোর শিখায়,
প্রতীক্ষা হইল পূর্ণ এবার সন্ধ্যায়।"

ভাষা, ছন্দ, প্রকাশভঙ্গী এবং কবি-অনুভূতি "মাধুকরী"কে মাধুর্য্যময় এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ করিয়াছে।

"দু-ধারে সাগরে ঢেউ, শুধু হানাহানি,
মরণ-নিবিড় নীরে কতো কাণাকাণি।"

অথবা

"আলোকের যাদুকর মধুর তপন,"—এমনি সব উক্তি চিত্তকে সত্যই নন্দিত করে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সম্বন্ধনির্ণয়—মূল ঐতিহাসিক ভাগ, ১ম খণ্ড। ৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি। চতুর্থ সংস্করণ। সম্বন্ধনির্ণয় কার্য্যালয়, ৯৩।৪, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩৲।

প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যানিধি মহাশয় বঙ্গদেশের বিভিন্ন জাতির সামাজিক বিবরণ সঙ্কলন করিয়া সম্বন্ধনির্ণয় নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিলে সুধীসমাজে তাহা বিশেষ সমাদর লাভ করে। তাঁহার জীবদ্দশায় ইহার তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়—ইহাও এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তার অন্যতম নিদর্শন। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রায় ৪০ বৎসর পরে বিদ্যানিধি মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত মাণিকলাল ভট্টাচার্য্য ইহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। সম্বন্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্টাংশের নূতন সংস্করণ প্রকাশের কার্য্য কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ করা হইয়াছে। প্রথম হইতে পঞ্চম পরিশিষ্টের সমালোচনা ইতঃপূর্ব্বে প্রবাসীতে (ভাদ্র

১৩৫৯) প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান খণ্ডে গ্রন্থের সামান্য কাণ্ড অংশ স্থান পাইয়াছে। ইহা তৃতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ মাত্র নহে। কিছু কিছু নূতন উপকরণ ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে, এবং কিছু অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় সংযোজিত অংশগুলি কোন্ কোন্ পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহার নির্দ্দেশ গ্রন্থমধ্যে দেওয়া হয় নাই। বিভিন্ন জাতিসম্পর্কে নানাস্থানে নানাসময়ে যে সমস্ত নূতন বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদেরও কোন উল্লেখ ইহাতে নাই। আশা করি, বিশেষ খণ্ড নামক অংশের নূতন সংস্করণ প্রকাশের সময় এই ত্রুটিগুলির দিকে লক্ষ্য রাখা হইবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

নার্য্যালি—শ্রীশৈলেন নাথ, মণ্ডল ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড। ৫৪।৮ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

একখানি উপন্যাস। নার্য্যগুপ্ত উচ্চশিক্ষিত। তাহাকে ধনী শিক্ষিত মহলে শিক্ষকতার কার্য্য (বিশেষ করিয়া মেয়েদের) করিতেও দেখা যায়, আবার তাড়ির দোকানে, অস্থানে-কুস্থানেও তার স্বচ্ছন্দ গমনাগমন। প্রয়োজন হইলে চুরি ডাকাতি করে এমন কি অভাবে পড়িলে ছাত্রীর খোঁপা হইতে সোনার ফুল সরাইয়া ফেলিতেও দ্বিধা করে না। এমনি এক বেপরোয়া যুবক নার্য্যগুপ্ত। তাহার জীবন-পথে দেখা দিয়াছে একের পর এক, অলিক্ষরা, শান্তা, সাবিত্রী, বৃদ্ধ চাটুয্যে মশাই ও তাঁর স্ত্রী, রেবা, তাড়ির দোকানের বামু, ভুকুর গোলাপী তার ভাই রতনা এবং আরও অনেকে। অলিক্ষরার চরিত্রটি ফুটিয়াছে ভাল। লেখকের শক্তি আছে, কিন্তু তাহার সুষ্ঠু বিকাশ আরও সময় সাপেক্ষ।

খেয়াঘাট—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য। ১১৫, বনমালী নস্কর রোড, বেহালা, ২৪ পরগণা। মূল্য ২।০।

পদ্মাপারের একটি খেয়াঘাটকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসখানির আরম্ভ। এই ঘাট অতীত এবং বর্ত্তমানের বহু সুখ, দুঃখের, উত্থান পতনের সাক্ষ্য দেয়। ইহার অনতিদূরের একটী গ্রাম্য মধ্যবিত্ত সমাজের কাহিনী উপন্যাসখানিতে বর্ণিত হইয়াছে।

বালবিধবা কালীতারা তাঁর মৃত কন্যার একমাত্র বংশধর অরুকে লইয়া সংসারের সাধ-আহ্লাদ মিটাইতেছেন। অরু দিদিমার আদরে গ্রাম্য পরিবেশে মানুষ হইয়া উঠিতে লাগিল। চারু অরুর খেলার সাথী। বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে অরু ভালবাসিল চারুকে, কিন্তু চারুর কাছে তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া সে অপমানিত হইল—ফলে অরু পথে নামিল। চারু অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত নিজের আসল সত্তাকে আবিষ্কার করিল এবং তাহার ভুল সংশোধন করিবার চেষ্টাও করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। মোটামুটি কাহিনীটি এই। কালীতারাকে বড় ভাল লাগিল। এই পুস্তকে লেখক পূর্ব্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলের একটি সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন। উপন্যাসখানিতে বহু ত্রুটি পরিলক্ষিত হইল। ইহার শেষাংশে শরৎ চন্দ্রের 'দেবদাসের' ছায়াপাত বড়ই চোখে পড়ে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

সমাপ্তি—শ্রীঅমলা দেবী। বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়। গ্রাম—কুলগাছিয়া, পোঃ মহিষরেখা, জেলা হাওড়া। মূল্য চার টাকা।

বাংলা কথাসাহিত্যে অমলা দেবীর প্রতিষ্ঠা আছে। সমালোচ্য গ্রন্থে তাঁহার তিনটি গল্প স্থান পাইয়াছে। তিনটি গল্পই আকারে বড়। তিনটি গল্পই আমাদের ভাল লাগিয়াছে, তবে ইহাতে সবচেয়ে উপভোগ্য হইয়াছে দাসী নামক গল্পটি। স্বামী-প্রেমবঞ্চিতার চরম দুর্ভাগ্য ইহার বিষয়-বস্তু। প্লট পুরানো, কিন্তু গল্পটির treatment-এর মধ্যে অভিনবত্ব আছে।

রাত্রির অন্ধকারে লোকচক্ষুর অন্তরালে পৃথিবীতে কত বড় শোচনীয় ট্র্যাজেডি ঘটিয়া যায়, কিন্তু নিষ্ঠুরা প্রকৃতির তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না—মানুষের চরমতম দুঃখেও যে সে নির্বিকার উদাসীন, সরমার শোচনীয় মৃত্যু তাহাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

মানুষের জীবনে অদৃষ্টের পরিহাস যে কতদূর মর্মান্তিক হইতে পারে তাহাই দেখিতে পাই 'বিবাহ বার্ষিকী' গল্পটিতে। বিবাহ-বার্ষিকী-রজনীতে স্বামীর প্রতীক্ষায় সর্বাভরণভূষিতা, সুসজ্জিতা হইয়া বসিয়া থাকে নীরজা, ওদিকে আপিস হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে মোটর চাপা পড়িয়া মারা যায় নিরঞ্জন। প্রিয় প্রতীক্ষমাণা নীরজা ঘুমাইয়া পড়িয়া স্বপ্ন দেখে একটি গাঢ় কৃষ্ণ যবনিকা নিরঞ্জনকে তাহার দৃষ্টির আড়ালে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

মানুষের আদিম ক্ষুধা পেটের ক্ষুধা। মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যেমন করিয়াই হোক বাঁচিয়া থাকিয়া জীবধর্ম রক্ষা করা। এই পেটের ক্ষুধার তাড়নায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ভূপতির লালসার অনলে ইন্ধন জোগাইতে বাধ্য হইল কুলবধূ বিমলা, কিন্তু যখন সে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল তখন তাহার আজন্মের সংস্কারে লাগিল আঘাত—জীবনে দেখা দিল জটিল সমস্যা। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করিয়া সে সমস্যার সমাধান করিল। ইহাই সমাপ্তি গল্পের আখ্যানবস্তু। গল্পটি চমৎকার, কিন্তু স্থানে স্থানে অতি দীর্ঘ রিফ্লেক্‌শন এবং বিমলা ও ফটিকের লম্বা লম্বা লেকচার রসবোধকে পীড়িত করে। গল্পের প্রতিপাদ্যটুকু তো কাহিনীর ভিতর দিয়াই ফুটিয়াছিল, এমতাবস্থায় উপসংহারে উপদেশাত্মক অংশটুকু জুড়িয়া দিবার কি সার্থকতা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আর একটি কথা, প্রত্যেকটি গল্পেই নায়ক বা নায়িকার মৃত্যু ঘটাইয়া ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করা হইয়াছে—ইহাতে অনেকটা একঘেয়েমি আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু এই সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও গল্পগুলি যে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে দরদ ও আন্তরিকতা থাকিলে শিল্পী সত্যদৃষ্টি লাভ করেন লেখক পূর্ণমাত্রায় তাহার অধিকারী। তিন নারীর বেদনা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন। সংসারে নারী যে কত নিরুপায় ও অসহায় তাহা এই গল্প তিনটিতে অত্যন্ত মর্মান্তিক ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অজয়ের তীরে—শ্রীনিশাপতি মাজি। পি ঘোষ এণ্ড কোং, ২০, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

পল্লীর তথাকথিত নীচ শ্রেণীর দুর্গত জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া লেখক যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহাকেই তিনি এই উপন্যাসে রূপায়িত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। রাঢ়ের অজয়ের তীরবর্তী রাইপুর গ্রামের ডোম সর্দার জলধরের ছেলে চন্দ্র এই উপন্যাসের নায়ক। অস্পৃশ্য সমাজে নিতান্ত প্রতিকূল পরিবেশে তাহার জন্ম, কিন্তু দাদাঠাকুর এবং নীলকণ্ঠবাবুর মহৎ জীবনের সংস্পর্শে শুধু সে নিজেই যে মনুষ্যত্ব অর্জন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিল তাহা নয় তাহার 'জীবনে জীবনলাভ' করিয়া তথাকথিত নীচশ্রেণীর হাড়ি, ডোম, বাগ্দী প্রভৃতিও নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিল। চন্দ্রর জীবনে আসিল শত লাঞ্ছনা দুঃখ অপমান মৃত্যুশোক, কারাবরণ, কিন্তু সবকিছুতে অবিচলিত থাকিয়া সে কর্তব্য-কঠিন বন্ধুর পথে আগাইয়া চলিল। অবশেষে তাহার জীবনের সাধনা হইল জয়যুক্ত, ব্যবস্থা-পরিষদে তাহার চেষ্টায় অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ বিলটি পাস হইল। লেখক মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া বইখানি লিখিয়াছেন, নীচশ্রেণীর প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসা ও দরদ আছে সত্য, কিন্তু বইখানি রসসৃষ্টি হিসাবে খুব সার্থক হইয়াছে একথা বলিতে পারি না—জলধর, লক্ষ্মী মাণিক, নীলকণ্ঠবাবু এই চার জনের মৃত্যু ঘটাইয়া করুণ রসের বাড়াবাড়ি দেখানো হইয়াছে, সংলাপ অত্যন্ত অস্বাভাবিক; তবে অজয়ের তীরের বাসিন্দা বাউরি, বাগ্দী, ডোম, সাঁওতাল প্রভৃতির জীবনের এবং ভাঁজো প্রভৃতি গ্রাম্য উৎসবের ছবি ভালই ফুটিয়াছে। বাংলার যে প্রাণসত্তা লুকাইয়া আছে পল্লীর শান্ত বক্ষে পুস্তকখানিতে সেই পল্লীজীবনের ক্ষীণ প্রাণস্পন্দন শুনিতে পাওয়া যায়।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

অনন্তের সুরে—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন। এশিয়া পাবলিশার্স, কলিকাতা—১৪। মূল্য ৩৲।

মূলগ্রন্থ রাল্‌ফ ওয়াল্‌ডো ট্রাইনের "ইন্ টিউন্ উইথ দি ইন্‌ফিনিট" আদর্শানুরাগী বহু পাঠকের নিকট সুপরিচিত। গ্রন্থকার ইহার এই সরস সাবলীল অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ভাবের সহজ মহিমার সহিত ভাষার অনাড়ম্বর স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী সুন্দর মানাইয়াছে। কোথাও আড়ষ্টতা নাই, মৌলিক রচনার মতই অনুবাদ গ্রন্থখানি আদ্যন্ত সুখপাঠ্য।

সাহিত্যের নব জন্ম ও যুগচেতনা—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

যত্নের সহিত তথ্যসংগ্রহ করিতে এবং ভাবিবার কথা গুছাইয়া বলিতে আজকাল কম লেখককেই দেখি। বর্তমান লেখক সেই অল্পসংখ্যকদের এক জন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সাহিত্যে ও সমাজে যে নব-চেতনা আসিয়াছিল, নয়টি প্রবন্ধে তিনি তাহার সংক্ষিপ্ত, কিন্তু যথাযথ পরিচয় দিয়াছেন: (১) রাজা রামমোহন রায় ও যুগচেতনা, (২) বাংলার নবজাগরণে অক্ষয়কুমার দত্তের দান, (৩) বিদ্যাসাগরের অন্তর্জীবন ও সাহিত্যসাধনা, (৪) শ্রীমধুসূদনের ব্যক্তিসত্তায় দ্বৈতধারা, (৫) বঙ্কিমচন্দ্র ও নবদর্শন, (৬) কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দী, (৭) মীর মশাররফ হোসেন ও বাংলাসাহিত্য, (৮) নবীনচন্দ্রের ধর্ম ও জাতীয়তা, (৯) শতাব্দী পরিক্রমা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত-জ্ঞান-প্রবেশ—সঙ্গীতাচার্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-শিক্ষক এবং গায়ক শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই সঙ্গীত পুস্তকখানি এবং তদন্তর্গত স্বরলিপিগুলি যত্নপূর্বক পরীক্ষা করিয়া খুশি হইয়াছি। পুস্তকখানি প্রধানতঃ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার শিক্ষণীয় তালিকা ধরিয়া লিখিত হইলেও সাধারণ সঙ্গীতশিক্ষার্থীও ইহার দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন। পরীক্ষার্থীর প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে মিটাইয়া সাধারণ শিক্ষার্থীর জন্য লিখিত উচ্চতর মানের অতিরিক্ত বিষয়গুলি ফুটনোটে স্বতন্ত্রভাবে স্থাপিত হওয়ায় পুস্তকখানির উপযোগিতা বিস্তৃত হইয়াছে। সাধারণ শিক্ষার্থী বলিতে গাহিবার উদ্দেশ্যে যাঁহারা সঙ্গীত শিক্ষা করিবেন শুধু তাঁহাদের কথাই বলিতেছি না; সঙ্গীতের রসগ্রহণে সমর্থ হইয়া যাঁহারা সমঝদার শ্রেণীর অন্তর্গত হইবার অভিলাষী তাঁহাদের কথাও বলিতেছি। এই পুস্তকখানির সহায়তায় সঙ্গীতবিষয়ে কতকগুলি মৌলিক সূত্র এবং রাগাদির লক্ষণ সম্বন্ধে যিনি খানিকটা ওয়াকিবহাল হইবেন, তিনি কোন সঙ্গীত মজলিশে গানের সময়ে পার্শ্ববর্তী শ্রোতার সহিত গল্প করিয়া সঙ্গীতের আবহাওয়া ক্ষুণ্ণ করিবার পরিবর্তে রসিক সমঝদাররূপে সঙ্গীতরসে নিমগ্ন হইয়া মজলিশের, এবং বিশেষ করিয়া গায়কের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারিবেন। পুস্তকখানি যেরূপ প্রাঞ্জল এবং মনোজ্ঞ ভাষায় লিখিত হইয়াছে তাহাতে সহজেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিবে।

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস

—— অতীত ছিল পণ্ডিতের ধ্যান, শিল্পীর সাধনা, জনগণের আনন্দক্ষেত্র। পরাধীন দেশ ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি দেখেছে সেই অতীতে। তবু একান্ত প্রত্যক্ষতা ছিল না সেই অতীতের, আপন বলে তাকে চেনা হয়নি। বিদেশীর হাতে তৈরি ঘষা কাঁচের মধ্য দিয়ে তার অস্পষ্ট মূর্তিমাত্র দেখেছে শিক্ষিত সম্প্রদায়। তার বার্তা কখনো ছড়িয়ে পড়েনি সাধারণের রাজপথে।

আজ ভারতবর্ষের জীবনের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। শুধু অতীত নয়, ভারতবর্ষের সামনে বিপুল বর্তমান, বিপুলতর ভবিষ্যৎ। তাই অতীতকে আজ নিজের চোখে নতুন করে দেখতে হবে, বর্তমানের সঙ্গে মেলাতে হবে তাকে, ভবিষ্যতের পথকে দেখতে হবে তারই আলোকে।

ধর্মে, বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রতন্ত্রে, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ভারত অপ্রতিবীর্য ছিল। সেই ভারতের দীপ্ত ইতিহাসকে সাধারণের জন্য ব্যাপকভাবে মেলে ধরেছেন ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তাই এ বই নিষ্প্রাণ তথ্যের বোঝা নয়, সজীব আলেখ্য। শুধু জানা নয়, সানন্দে জানা। সচিত্র। দাম ৪৲

অচিন্ত্যকুমারের

দুখানা বিখ্যাত উপন্যাস

বেদে অচিন্ত্যকুমার চিরকাল নতুন পথের প্রণেতা। সনাতনের ঘেরাটোপ ভেঙে বাংলা সাহিত্যকে যাঁরা জীবনের প্রশস্ত পথে টেনে আনার বিপ্লবসাধন করেছিলেন, অচিন্ত্যকুমার তাঁদের অন্যতম অগ্রনায়ক। সেই সাহিত্যবিপ্লবের প্রথম দিকচিহ্ন 'বেদে'। অম্ল, মধুর, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত যেমন ছয়টি রস, তেমনি ছয়টি নায়িকা। কিন্তু প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন, প্রত্যেকেরই অন্তরে স্বতন্ত্র রহস্যের অন্ধকার। এই বিচিত্র, রহস্যঘন তটরেখা ছুঁয়ে ছুঁয়ে নদীর মত প্রবাহিত যায় জীবন, সেই 'বেদে'। সচিত্র। দাম ৩।০

জননী জন্মভূমিশ্চ মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারের একটি চিরকালিক সমস্যার আধুনিকতম আলেখ্যলিখন। ভঙ্গপ্রবণ সমাজের প্রথমতম প্রসঙ্গ। পুরনোর সঙ্গে নতুনের সংঘর্ষ, সংস্কারের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যের। একটি ঘরোয়া কাহিনীকে অনুভবের গুণে গভীর বর্ণাঢ্য করে আঁকা হয়েছে। জীবন্ত ভাষা, উজ্জ্বল চরিত্র, বলিষ্ঠ মনোভঙ্গি—যা অচিন্ত্যকুমারের বিশেষত্ব, সবই এই উপন্যাসে পরিস্ফুট। দাম ২।০

শচীন্দ্র মজুমদারের

দুখানা অভিনব উপন্যাস

লীলামৃগয়া উপন্যাসের আঙ্গিকে কাব্যের রস পরিবেশন করলে তার আস্বাদ কতো মধুর হতে পারে 'লীলামৃগয়া'য় তার নিঃসংশয় পরিচয় মিলবে। আধুনিক সমাজ ও আধুনিক নর-নারী এই উপন্যাসের উপজীব্য, কিন্তু বিষয় সেই চিরন্তন, সেই পরকীয়া-প্রেম। ইন্দ্রিয়াতীত হয়েও যা ইন্দ্রজালের অতীত নয়। আধুনিক কালের প্রসঙ্গে পরকীয়াপ্রেমের এমন সম্মোহনী কাহিনী বাংলা সাহিত্যে আর লেখা হয়নি। দাম ৩৲

পলাতকা স্থান : এলাহাবাদ। কাল : ১৯৪২। পাত্রী : বহ্নিশিখার মতো বাঙালী এক মেয়ে। এ-মেয়ে বিজ্ঞানের সাধনা করে, পুলিশের গুলির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, প্রয়োজনে পুরুষবেশে পালিয়ে বেড়ায়। কিন্তু ছায়ার মতো অবিরাম তাকে অনুসরণ করে শুধু পুলিশবাহিনীর গোয়েন্দা নয়, লম্পট বিত্তশালী এক পুরুষ। সেই লালসাময় আলিঙ্গন থেকে তার ঊর্ধ্বশ্বাস পলায়ন। নতুন যুগের নারী, যেন নারীচরিত্র থেকেই পলাতকা। সচিত্র। দাম ৩৲

১০/২ এলগিন রোড, কলিকাতা ২০

পুস্তকখানিতে আকারমাত্রিক পদ্ধতি অনুসারে কয়েকটি প্রধান এবং মনোরম রাগের ছেচল্লিশটি গানের স্বরলিপি আছে। গানগুলি বিখ্যাত এবং সুনির্ব্বাচিত, লেখকের গানগুলি সুরচিত। স্পর্শ সুর লইয়া অনাবশ্যক ভাবে জটিলতার সৃষ্টি করা হয় নাই বলিয়া গানগুলির স্বরলিপি উদ্ধার কষ্ট-সাধ্য নহে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিবেকানন্দ চরিত (সপ্তম সংস্করণ)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা। ৩৬০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫৲।

জীবনচরিতের সপ্তম সংস্করণ বাংলা সাহিত্যে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। বর্ত্তমান পুস্তকের বেলায় ইহা সম্ভব হইয়াছে এইজন্য যে, কোন মহাপুরুষের জীবনচরিত লিখিতে হইলে গ্রন্থকারের যে যে গুণ থাকা দরকার, ইহাতে তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন পাওয়া যায়। অনাবশ্যক ভাবোচ্ছ্বাসহীনতা, তথ্যপ্রমাণ ও যুক্তিতর্কের উপর সিদ্ধান্তের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা, সমসাময়িক ঘটনাপরম্পরার সুনিপুণ পর্য্যবেক্ষণশীলতা, দেশকালের উপর শিল্পীর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, তদুপরি ভাষার ওজোগুণ ও সংহত বিশুদ্ধ প্রয়োগ, এই সমস্ত মিলিয়া এই গ্রন্থকে পাঠকের নিকট প্রিয় ও সমাদৃত করিয়া তুলিয়াছে। যুগস্রষ্টা মহাপুরুষের এই জীবনী ভবিষ্যৎ জীবনীকারদের নিকট আদর্শস্থানীয় হইয়া থাকিবে এবং বাংলা সাহিত্যে এই অতুলনীয় গ্রন্থ মূল্যবান রত্নের মতই বিরাজ করিবে। আমরা এই গ্রন্থ দেশের যুবকদের পুনঃপুনঃ পড়িয়া দেখিতে বলি। জাতি ও চরিত্রগঠনের উপাদান তাঁহারা এই মহাপুরুষ-চরিতে প্রচুর পরিমাণে পাইবেন।

ভক্তিযোগ—(পঞ্চদশ সংস্করণ) অশ্বিনীকুমার দত্ত। চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য ২৷৷০।

জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ ইহাদের মধ্যে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ, কারণ ভক্তিবিহীন জ্ঞান ও কর্ম্ম প্রেমময় ভগবানের নিকট হইতে মানবকে বহু দূরে ঠেলিয়া দেয়—তাহা জগতের কল্যাণে নিযুক্ত না হইয়া দেশ জাতি ও বিশ্বের অকল্যাণকর এবং ত্রাসজনক হইতেও পারে। শাণিত ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি ও লক্ষ্যসাধনের জন্য নিরলস কর্ম্মনিষ্ঠা ভক্তির অভাবে জগতের মঙ্গলপ্রসূ না হইয়া মানব-সমাজকে সর্ব্বনাশের পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছে, অতীতের ইতিহাসে ও বর্ত্তমানকালে ইহার প্রচুর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কিন্তু যে সকল মহামানবের হৃদয় ভগবানে পরম প্রেম-ভক্তির অমৃতরসে অভিসিঞ্চিত হইয়াছে, যুগে যুগে তাঁহাদের কীর্ত্তি অবিনশ্বর ও অম্লান হইয়া বিশ্বমানবের হৃদয়সিংহাসনে বিরাজ করে। দেশপূজ্য গ্রন্থকার এই শিক্ষা দিবার জন্যই গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন। শুধু যে দেশের তরুণদিগের নিকটই এই গ্রন্থ আদরণীয় তাহা নহে, অনেক বয়স্ক গৃহী পাঠকও সাদরে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন। আমরা প্রকাশককে এই গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

নবযুগের মহাপুরুষ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৬৲।

গ্রন্থকার ইহাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ষোল জন সন্ন্যাসী শিষ্য ও আট জন গৃহী শিষ্য এবং স্বামী বিবেকানন্দের আট জন সন্ন্যাসী শিষ্যের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত একত্র সংগ্রহ করিয়া পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিতে লেখককে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে, কিন্তু যে ষোড়শোপচার নৈবেদ্য তিনি ভক্ত পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব ও উপভোগ্য হইয়াছে। রামকৃষ্ণকথামৃত প্রণেতা শ্রীম'খ্যা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান প্রতিষ্ঠাতা রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্র, সাধু নাগ মহাশয়, এবং বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ, সারদানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তগণের জীবনী এক জায়গায় হাতের কাছে পাইয়া পাঠকগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইবেন। বহু উৎকৃষ্ট ফটো পুস্তকখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

প্রাথমিক অনুবাদ শিক্ষা (২য় সংস্করণ)—শ্রীরেবতীরঞ্জন সিংহ। দি বুক সিণ্ডিকেট। ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য ।৵০।

বর্ত্তমান অনুবাদ পুস্তিকাটি এক দিকে বঙ্গভাষাভাষীদিগকে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা ও অপরদিকে রাষ্ট্রভাষাভাষীদিগকে বাংলা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে লিখিত। পুস্তিকাটির প্রতিটি বামদিকের পৃষ্ঠায় রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার জন্য হিন্দী ব্যাকরণের কোন প্রয়োজনীয় অংশ ব্যাখ্যা করিয়া কতকগুলি অনুবাদ এবং একটি অনুশীলনী দেওয়া আছে। আবার প্রতিটি দক্ষিণদিকের পৃষ্ঠায় বাংলা শিখিবার সৌকর্য্যার্থে বামদিকের পৃষ্ঠায় বিষয়টি বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম এবং অনুশীলনী সমেত দেওয়া আছে। পাশাপাশি দুটি পৃষ্ঠায় দুটি ভাষায় ব্যাকরণসহ একই পাঠ থাকায় এই পুস্তিকাটি বাংলা এবং হিন্দী দুটি ভাষারই প্রথম শিক্ষার্থিগণের উপযোগী হইয়াছে। হিন্দীতে লিখিত ভূমিকা অংশে রেবতীবাবু হিন্দীভাষীদিগকে বাংলাভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। বাংলা এবং রাষ্ট্রভাষার প্রথম শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুস্তিকাটির বহুল প্রচার হইবে, আশা করা যায়।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মীর কাসিম—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ২৪৭। মূল্য চারি টাকা।

"সিরাজদ্দৌল্লার" জীবনীকার রূপে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের নাম বাঙালী পাঠকের নিকট সুপরিচিত। 'মীর কাসিম' তাঁহার ইতিহাস আলোচনার অন্যতম অবদান। এখানিও ঐতিহাসিক তথ্য-সম্বলিত। বাংলার ইতিহাস-সাহিত্যেও ইহার স্থান অতি উচ্চে। বাঙালী পাঠকপাঠিকার নিকট 'মীর কাসিম' কতখানি জনপ্রিয় হইয়াছে, ইহার চতুর্থ সংস্করণ তাহা সূচিত করে। বাংলার হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারকল্পে মীর কাসিমের প্রযত্ন স্মরণীয়। বাঙালীর জীবন—বাংলার শিল্প ব্যবসায় যখন ইংরেজবণিকের কূটকৌশলে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম তখন মীর কাসিম ইংরেজের হস্তে ক্রীড়নকস্বরূপ না হইয়া ঐ সমুদয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর হন এবং তাহাদের বিষদৃষ্টিতে পড়েন। বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়িয়া যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পক্ষে এককভাবে যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব তখন তিনি অযোধ্যার নবাবের সাহায্যের আশায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গমন করেন। মীর কাসিমের শেষ জীবন সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার তেমন আলোকপাত করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী দলিলাদি হইতে যে সব তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, বর্ত্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টাংশে তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশ পরিত্যাগের পর শেষ দ্বাদশ বৎসর মীর কাসিমের জীবনে নানা ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তাঁহার এ বিশ্বাস ছিল যে, মুসলমান ও হিন্দু রাজন্যবর্গের সহায়ে তিনি শত্রুর হস্ত হইতে বাংলার মসনদ অধিকার করিতে পারিবেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহার এ আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। দৈন্য ও নৈরাশ্যের মধ্যে মীর কাসিম ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন শাহজহানাবাদে (দিল্লীতে) দেহত্যাগ করেন। পুস্তক-খানি পরিবর্দ্ধিতাকারে পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় একটি সত্যকার অভাব বিদূরিত হইয়াছে। ইহার বহুল প্রচার হইবে নিশ্চয়।

পরিষৎ-পরিচয়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৬। পৃ. ৯৫। মূল্য সাধারণ পক্ষে এক টাকা, সদস্য পক্ষে বার আনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাবধি ১৩০০ হইতে ১৩৫৬ সাল পর্য্যন্ত সাতান্ন বৎসরের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই পুস্তকখানিতে প্রদত্ত হইয়াছে। পরিষদের গ্রন্থাগার, পুথিশালা, চিত্রশালা, প্রকাশিত পুস্তকাবলী প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিচয়ও ইহাতে আছে। গত অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় বাংলার ভাষাসাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক যে মূল্যবান্ প্রবন্ধরাজি বাহির হইয়াছে তাহার একটি শ্রেণীবদ্ধ তালিকাও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ইতিবৃত্তকারের পক্ষে এগুলির প্রয়োজনীয়তা সমধিক। পরিষদের অন্যান্য কার্য্যকলাপের বিষয়ও ইহাতে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন—শ্রীসন্তোষকুমার দে। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ের একটি প্রধান অঙ্গ। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যে বিজ্ঞাপন মামুলি চটকদার প্রচারকার্য্য হইতে বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে বিজ্ঞাপনের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, আমাদের দেশেও দৈনন্দিন জীবনেই এখন বিজ্ঞাপনের ব্যাপক ব্যবহার আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইংরেজীতে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আছে, কিন্তু এদেশে বিজ্ঞাপন-ব্যবসায় এখনও জনসমাজের কাছে রহস্যাচ্ছন্ন। আমাদের যতদূর মনে পড়ে দীর্ঘকাল পূর্ব্বে এই বিষয়ে একখানি মাত্র পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান পুস্তকখানির বিশেষ সার্থকতা এইখানে যে, ইহাতে বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ের আধুনিকতম দিকটি অতিশয় দক্ষতার সহিত উদ্‌ঘাটিত এবং সহজ ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। 'উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন', 'বিজ্ঞাপনের দাম দেয় কে?', 'বিজ্ঞাপন', 'পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন',—এই চারিটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার ব্যাপক বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ের একটি সুষ্ঠু পরিচয় দিয়াছেন। বিজ্ঞাপনের দ্বারা মাল প্রস্তুতকারক এবং মালের ক্রেতা উভয়েই কি ভাবে লাভবান হন তার একটি হিসাব গ্রন্থকার দিয়াছেন—এই পরিচ্ছেদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'খুচরা খবর' পরিচ্ছেদটিতে ব্লকের দাম, ব্লকের মাপ, ব্লক অর্ডার দিবার নিয়ম, ছাপার হরফ, ভারতের বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ীদের নাম ও ঠিকানা প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য তথ্য দেওয়া হইয়াছে। বইখানি সাধারণ পাঠকের পক্ষে উপযোগী করিয়াই গ্রন্থকার নিশ্চিন্ত হন নাই, মাল-উৎপাদক ও বিক্রেতা এবং পত্র-পত্রিকার জ্ঞাতব্য বহু তথ্যও তিনি উহাতে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

আমরা ১৯৪৯ সালে ভারতীয় গণপরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত *Glossary of Technical Terms used in the Constitution of India* এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "সরকারী কার্য্যে ব্যবহার্য্য পরিভাষা" নামক দু'খানি পুস্তক সমালোচনার্থ পাইয়াছি। প্রথমটিতে ইংরেজীর পারিভাষিক শব্দগুলি দেবনাগরী অক্ষরে এবং দ্বিতীয়টিতে বাংলা অক্ষরে দেওয়া হইয়াছে। বই দুখানি শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্ম্মী সকলেরই বিশেষ কাজে আসিবে।

প্রণাম জানাই

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

সেদিন শতাব্দীশেষে পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত-ব্রত—
সে বিদ্রোহে প্রাণ পেল শ্রীভূমির শিশু-মৃত্যুঞ্জয়;
কৈশোরে বুকের রক্তে মুক্তিমন্ত্র হল বরাভয়,
যৌবনে সর্বস্ব পণে অগ্নিহোত্রী সাধনা-নিরত।
শৃঙ্খলিতা জননীর কোলে শিশু মৃত্যু-অভিহত—
দানবের অত্যাচারে প্রাণে শুধু শঙ্কা আর ভয়;
আয়ুর্বিজ্ঞানী তাই মন্ত্র নিলে জরা-পরাজয়—
আত্মদান-মহাযজ্ঞে জাতিমৃত্যু হল প্রতিহত।

তোমার সন্তান-ধর্ম এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই—
তাই ত গৈরিকধারী সর্বত্যাগী হে রিক্ত সন্ন্যাসী।
আজো দেখি অন্ধকারে বৃদ্ধা ধাত্রী রোজনাম্‌চা লেখে—
আলোর মহলে তাই শিশুমুখে সুধামাখা হাসি।
তোমাদের সাধনায় ধন্য মোরা মাতৃমূর্ত্তি দেখে,
ভারত-তীর্থের পথে, হে সাধক, প্রণাম জানাই।

ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস স্মরণে

পাটনায় শিশু-কলা প্রদর্শনী

গত ২০শে জানুয়ারী, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে 'কিশোর দলে'র উদ্যোগে প্রথম শিশু-কলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বিহারের প্রদেশপাল শ্রীমাধব শ্রীহরি আনে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্যর ক্লিফোর্ড আগারওয়ালা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। বহু স্থানের শিশু-শিল্পীরা এবং নিউ দিল্লীর অল-ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস সোসাইটি, শিশু-বিভাগ, শান্তিনিকেতন, পাটনা ও কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট স্কুল অফ্ আর্টস, 'কিশোর সভা' প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে ছবি পাঠায়। ছোটদের শিল্প-কলার চর্চ্চায় উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীটি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

কমলরাণী মিত্র

গত ২১শে মার্চ্চ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায়, কবি কমলরাণী মিত্র মেনিন্‌জাইটিস রোগে হাওড়ায় পরলোকগমন করিয়াছেন। কমলরাণী প্রথমে চন্দননগরে শিক্ষালাভ করেন। তারপর হাওড়া হইতে প্রবেশিকা পাস করেন। শৈশবকাল হইতেই কাব্যরচনা ও অভিনয় কলার উপর তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি দেশ, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে কবিতা লিখিতেন তাঁহার কবিতাসমূহ কাব্যামোদীদের তৃপ্তিবিধান করিত।

কবি কমলরাণী অতুলকৃষ্ণ বসুর কন্যা। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ২৯ বৎসর হইয়াছিল। তিনি একটি পুত্রসন্তান রাখিয়া গিয়াছেন।

খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ ৭ই চৈত্র ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। নাগ মহাশয় কিছুকাল মৈমনসিংহে ব্যারিষ্টারী করিয়া অবশেষে ধর্ম্মাধিকরণের বিচারপতিরূপে নির্ব্বাচিত হন। বাঙালীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মানলাভ করেন। জেলা জজের পদেও তিনি সিলেকশন গ্রেডে ছিলেন। বিখ্যাত তারকেশ্বর মোহন্তের মামলা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমার ভার সরকার তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। তৎপ্রদত্ত তারকেশ্বর মামলার রায় হাইকোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিলে

খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ

সমর্থিত ও প্রশংসিত হয়। ১৯৩৩ সনে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদে উন্নীত হন।

অবসর গ্রহণের পরও তাঁহার কর্ম্মজীবনের অবসান হয় নাই। ১৯৩৭ সনের নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বিচারপদ্ধতিকে সম্পূর্ণতা করিবার জন্য ত্রিপুরার মহারাজা তাঁহাকে ত্রিপুরার প্রধান বিচারপতি করিয়া লইয়া যান। দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইবার পূর্ব্বে ত্রিপুরার নবরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনার ভারও তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল।

বাঙালী যুবকদের মধ্যে যাহাতে ক্ষাত্রশক্তির চর্চ্চা হয় তাহা ছিল নাগ মহাশয়ের একান্ত কাম্য। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাঙালী সৈন্যদল গঠনে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।

স্যর হরি সিং গৌর

মধ্যপ্রদেশের সাগর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অধ্যাপক শ্রীঅমরেশ দত্ত, এম-এ, পিএইচ-ডি, দেশবিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও

দানবীর হরি সিং গৌর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জানাইয়াছেন :

হরি সিং গৌর ছিলেন বুন্দেলখণ্ডীয় ক্ষত্রিয়। তাঁহার মাতৃভাষা ছিল হিন্দী। তিনি প্রথমে নাগপুর, পরে দিল্লী এবং সর্ব্বশেষে সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হইয়াছিলেন। তিনিই ২০ লক্ষ টাকা অর্থসাহায্য করিয়া সাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সারা জীবনে প্রায় আড়াই কোটি টাকা উপার্জ্জন করেন। তাঁহার উইল অনুসারে সাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় দেড় কোটি টাকা (প্রতিষ্ঠা-ব্যয় ২০ লক্ষ ছাড়া) পাইবে। এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিরাট দান একটি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া কেবলমাত্র আত্মশক্তি-বলে স্যর হরি সিং গৌর জীবনে যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও অধ্যাপক শ্রীসুধীরকুমার নন্দী নন্দনতত্ত্বে মৌলিক গবেষণার জন্য গ্রিফিথ স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার থিসিসের বিচারকগণ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইহা অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছে।

সুধীরবাবু প্রবাসী, ক্যাল্‌কাটা রিভিয়ু, মডার্ণ রিভিয়ু, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক পত্রিকার নিয়মিত লেখক। ইনি কুচবিহার রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত কে. সি. নন্দীর পুত্র।

হ্যারল্ড লাস্‌কি

অকালে, মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে, এই ব্রিটিশ চিন্তানায়কের জীবনের অবসান হইল। যে বয়সে তিনি পাঠ সমাপ্ত করেন, তখন সাম্যবাদ বিলাতের চিন্তা জগতে কোন আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারে নাই ; হাইণ্ডম্যান, ওয়েব দম্পতি ও বার্ণার্ড শ এই নূতন মতবাদের আলোচনা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন মাত্র ; কিয়ার্ড হার্ডি শ্রমিক দল সংগঠনে মনঃসংযোগ করিতেছেন। ব্রিটিশ জাতির চিন্তাধারা উদারনীতিক (Liberalism) খাত ছাড়িয়া নূতন পথের সন্ধান করিতেছে। কিন্তু বেন্থাম-মিল, গ্লাডষ্টোন-ব্রাইট প্রভৃতি লোক-নায়কের প্রভাব একেবারে তিরোহিত হয় নাই।

এই যুগ-সন্ধিক্ষণে যুবক লাস্‌কি শিক্ষাব্রতীরূপে জীবন আরম্ভ করেন মার্কিনের কোন কলেজে ; পরিণত বয়সে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং সেই সম্পর্কে ব্রিটিশের সংসৃষ্ট দেশসমূহের শিক্ষার্থীবর্গের নিকট সাম্যবাদের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে এই বিষয়ে ভারতীয় ছাত্রবৃন্দেরও তিনি চিন্তাগুরু ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক হইয়া পড়েন। এই কথা স্মরণ করিয়া আমরা হ্যারল্ড লাস্‌কির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

লিঁয় ব্লুম

একজন প্রাক্তন ফরাসী প্রধান মন্ত্রী ও ঐ দেশের সাম্যবাদী নেতা পরিণত বয়সে, ৭৮ বৎসর বয়সে, মরলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁর জীবনকালে ফরাসী জাতি দুই-দুইবার বিশ্ব-সংগ্রামে জড়িত হইয়া পড়ে ; প্রথম বার ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে, দ্বিতীয় বার ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। পাশ্চাত্ত্য জগতে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক তাঁর জাতি এই বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িয়াছিল এইজন্য যে নূতন সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব হইতে তাঁরাও মুক্ত ছিল না ; আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল শাসন ও শোষণ করিয়া যে গৌরবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তার সঙ্গে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীর সঙ্গতিসাধন অসম্ভব। আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে এই যে ব্যবধান মানব জাতি বর্ত্তমান স্পর্দ্ধিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগেও তাহা অতিক্রম করিতে পারিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফরাসীর নতি স্বীকার জাতির সংহতি শক্তির পরিচায়ক নহে। আজও যে সেই বাধা অপসারিত হইয়াছে, তার কোন প্রমাণ নাই। কম্যুনিষ্ট মতবাদ ফরাসী জাতির একাংশকে অভিভূত করিয়াছে ; জার্ম্মান জাতির সামরিক অভ্যুত্থানের ভয় ফরাসী জাতিকে একাগ্রচিত্ত হইতে দিতেছে না। লিঁয় ব্লুম এই দ্বিধা বিভক্ত যুগের মানুষ। সেইজন্য তাঁর জাতির ব্যর্থতা দেখিয়া তাঁহাকে কর্ম্ম-জগৎ হইতে বিদায় লইতে হইল।

ভ্রম সংশোধন

ফাল্গুনের প্রবাসীতে প্রকাশিত "শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা" শীর্ষক রঙীন ছবিখানির শিল্পীর নাম 'শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত' স্থলে 'শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত' পড়িতে হইবে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্রবাসী, ৪৯শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫৬

সূচীপত্র

কার্ত্তিক—চৈত্র

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত
—ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন—১৯৪৯ ... ১৩
—মুদ্রামূল্য হ্রাস ও নূতন পরিস্থিতি ... ১৪৮

অনাদিনাথ সরকার
—পরিভাষা (গল্প) ... ৪৪৩

অমরকুমার দত্ত
—জীবন-সন্ধ্যায় (কবিতা) ... ৪৪

অমলেন্দু দত্ত
—তিমির বিদারি তোমার অভ্যুদয় (কবিতা) ... ৫৪৪

অমলেন্দু সেন
—একালে ভগৎশেঠ ... ৩৫৯

অমিতাভ চৌধুরী
—ঈপ্সিতা (কবিতা) ... ১৪৫

আবদুল ওদুদ
—কবিগুরু গেটের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী ... ৬৪

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য
—ধর্ম্মঠাকুর ও কূর্ম্মমূর্ত্তি (আলোচনা) ... ১৭৩

শ্রীআশুতোষ সান্যাল
—কবি ও কাব্য (কবিতা) ... ৩৮

শ্রীউপেন্দ্র রাহা
—এক দিনের স্মৃতি ... ৫২০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
—হেমাঙ্গিনীর সুটকেস্ (গল্প) ... ১১৯

ঊষা ভট্টাচার্য্য
—পাগল ... ১৭১

কমলরাণী মিত্র
—ঝড় (কবিতা) ... ৪৪৫

করুণাময় বসু
—তবু থাক (কবিতা) ... ২৬১
—নিষ্ফল কামনা (ঐ) ... ৪৬৮

কালিকারঞ্জন কানুনগো
—রাজা ভোজ ... ১৭

কালিদাস মুখোপাধ্যায়
—বাংলা সাহিত্যে বিনয়কুমার সরকার (সচিত্র) ... ৪০৯

কালিদাস রায়
—কবির সন্ধান (কবিতা) ... ৪২০
—স্মৃতিরক্ষা (ঐ) ... ৫০৪

কালীচরণ ঘোষ
—পশ্চিম বাংলার সালতামামি ... ৫৬০
—বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার ... ২১৬

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
—রাইপুরের মহামায়া ও শিখরবংশ ... ৪৪৫

শ্রীকালীপ্রসাদ ঠাকুর
—সেকালের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ... ২৩৭

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল
—ভারতের বস্ত্রশিল্প ... ৩৭৪

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক
—ব্রিটিশের বিদায় (কবিতা) ... ৩১১
—মাতৃরূপ (কবিতা) ... ২৪

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
—সংগঠনে সুভাষচন্দ্র ... ৪০২

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি
—সমবায় ... ৩৬৯

শ্রীচিত্রিতা দেবী
—ব্রিষ্টলের কথা (সচিত্র) ... ৪৩২

জগদীশ্বরানন্দ, স্বামী
—পুণ্য তীর্থ হরিদ্বার (সচিত্র) ... ৪৫৯

শ্রীজীবনময় রায়
—রবীন্দ্র-জীবনদর্শন ... ১৬৮
—শত্রু (গল্প) ... ৪৫২

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
—ভারতের শিল্পোন্নয়ন কোন্ পথে ? (সচিত্র) ... ৫১

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
—প্রাচীন ভারতে বিদ্যাপ্রতিষ্ঠা ... ১১৩
—বাংলার আদিকবি—চণ্ডীদাস না কৃত্তিবাস ? ... ৩০৫
—মহারাষ্ট্রে রাঢ়ীয় তান্ত্রিক সম্প্রদায় ... ৪৫

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার
—কলিঙ্গদেশে গুপ্ত অধিকার ... ৪১৫
—"প্রাচীন বঙ্গে ধর্ম্মপূজা" (আলোচনা) ... ২৭৪

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
—বনচারিণী (গল্প) ... ৩৩৮

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র
—খাদ্য সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিকল্পনা ... ৫১৯
—ধান-চালের মূল্য বৃদ্ধির আন্দোলন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৪২৮
—পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ... ২১০
—হরিণঘাটা (সচিত্র) ... ১৫৭

শ্রীদ্বিজেন্দ্র মৈত্র
—শিল্প-কলা প্রদর্শনী (সচিত্র) ... ৪২৫
—শিল্পী হীরাচাঁদ দুগার ও তাঁর চিত্রকলা (সচিত্র) ... ৫৪৫

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র
—ব্যর্থ সাধনা (কবিতা) ... ৩৩৭
শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
—শ্রীঅরবিন্দ (কবিতা) ... ৩৫৩
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী
—সাধক নাম্মালোয়ার ... ৪৬৯
শ্রীননীমাধব চৌধুরী
—ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার দুইটি অধ্যায় ... ২০৯
—সিন্ধুধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ... ১২৩
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র
—বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ (সচিত্র) ... ১৪৬
—শিল্প-কলা প্রসঙ্গে শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ... ৪৪৭
শ্রীনারায়ণ দত্ত
—প্রশ্ন (কবিতা) ... ৪১৪
শ্রীনিরুপমা নায়ার
—বিস্মৃত মহানগরী অশিও ... ২৩৩
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
—আন্দামান (সচিত্র) ... ২৫৭
শ্রীনির্ম্মলেন্দু রায়চৌধুরী
—যদি (কবিতা) ... ৭৫
শ্রীনীলরতন দাশ
—বৃথা তবে এই স্বাধীনতা (কবিতা) ... ৩২২
শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার
—পূর্ব্বরাগ (কবিতা) ... ৫২৮
শ্রীপরিমল গোস্বামী
—একটি অর্থনৈতিক গল্প (সচিত্র) ... ২২১
—পশ্চিম হিমালয়ের পথে (সচিত্র) ... ৭৬
শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত
—শিল্পময় শ্যাম (সচিত্র) ... ৩২
—শ্যামদেশের বৌদ্ধধর্ম্ম (সচিত্র) ... ২২৬
শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
—পতঙ্গ (উপন্যাস) ৪৫, ১৩৯, ২৪৮, ৩১১, ৪০৭, ৫০৫
শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
—সতী (গল্প) ... ৭১
বজলুর রশীদ, এ. এন. এম.
—আমীর খসরু ... ৫৪১
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
—গোরক্ষা ... ৫৬৬
—জাতি বিভাগ ... ১৮১
বি. এস. কেশবন
—"ন্যাশনাল লাইব্রেরী" (আলোচনা) ... ২৭৬
শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত
—কলঙ্কিনী (গল্প) ... ৩৬১
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
—রণ-তাণ্ডবে (গল্প) ... ৪২১
—রামায়ণী কারবার (ঐ) ... ২৫
শ্রীবিমলকুমার দত্ত
—নিম্নবঙ্গের কতিপয় প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন ... ২৪৬
শ্রীবিমলাচরণ দেব
—মহাপ্রস্থান ... ১১৭
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত
—দুঃখ-ঝড়ে (কবিতা) ... ৩২৮
শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সেন
—বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস ... ২৬৫
শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়
—নব-বোধন (গল্প) ... ৫৪৯
শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত
—বাংলার পালরাজাদের 'জয়স্কন্ধাবার' ... ৫২১
শ্রীমনোরঞ্জন সেন
—নাইনিতাল (সচিত্র) ... ৫১৬
শ্রীমিহিরকুমার দাস
—পল্লী অঞ্চলের জনচিকিৎসা ... ৪৬৪
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
—পাদ্রী লঙ ও আমাদের জাতীয়তা (সচিত্র) ... ১৩২
—বিদেশীর চক্ষে হিন্দু দেব-দেবী (ঐ) ... ৫৭
—শিক্ষাব্রতী রিচার্ডসন (ঐ) ... ৩২৯
শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার
—দাদু-বাণী (কবিতা) ... ১৩১
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি
—কোক-মুখা দুর্গা-প্রতিমা ... ৫৩৯
—বাঙ্গলা লিপি-সংস্কার ... ৩৯
শ্রীরবি গুপ্ত
—বিজনে (কবিতা) ... ৪৩১
শ্রীরাজশেখর বসু
—ভেজাল ও নকল ... ৩১৭
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়
—পথহারা (গল্প) ... ১৫৯
—প্রতিবেশিনী (ঐ) ... ৫২৯
শ্রীরাহুল সংকৃত্যায়ন
—তিব্বতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব ... ৫৬৮
রেজাউল করীম
—স্বাধীন ভারত ... ৪৫৭
শ্রীশান্তিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
—এংলো-ইণ্ডিয়ানদের পরিচয় ... ৫৫৭
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
—দার্জিলিঙে (কবিতা) ... ১৫৬
—বঙ্গভাষা ও রাষ্ট্রভাষা ... ৬৫
—মাঘী পূর্ণিমা (কবিতা) ... ৪৫৮
—শ্রীরামকৃষ্ণ (ঐ) ... ৫১৫
শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
—দুর্দ্দিন (কবিতা) ... ৫৬
শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
—বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সার্থকতা কোথায় ? ... ৫১২
শ্রীসতীশচন্দ্র বক্সী
—বিদ্যাপতির কবিতায় বিভিন্ন স্তর ... ২৬২
শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত
—মহাবল্লীপুর (সচিত্র) ... ৩২৩
শ্রীসরোজকুমার সাহা
—সরস্বতী .. ৩৫৪
শ্রীসাধনা কর
—আধুনিকী (গল্প) ... ২৪৩

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়
—বুদ্ধের বিদ্রোহী শিষ্য দেবদত্ত ... ৪৯৭
শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়
—ব্রহ্মদেশের সমাজ-জীবন ... ৫৩৪
—মালয়ের কথা ... ১৭৬
শ্রীসুধাময়ী সেনগুপ্ত
—রাজবৈদ্য জীবক ... ৫৫০
শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী
—অবিস্মরণীয় (কবিতা) ... ১৭০
শ্রীসুধীরকুমার নন্দী
—আর্টের মর্ম কথা ... ৪০৫
শ্রীসুনীতিকুমার পাঠক
—মেঘদূতের ফলপুষ্প ও তরুলতা ... ৪১৭
শ্রীসুনীলকুমার বসু
—একজন অর্দ্ধবিস্মৃত কবি ও তাঁর কাব্য ... ৩৬৫
শ্রীসুনীলপ্রকাশ সোম
—নিগ্রোদের দেশ (সচিত্র) ... ৩৪৭
শ্রীসোমেন্দ্রনাথ রায়
—রাসবিহারী বসু (সচিত্র) ... ১৫৩
স্বামী পরমানন্দ
—পূর্ব্ব-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা ... ৫৬৪
শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস
জার্ম্মান রাসায়নিক শিল্পোন্নতির মূল সূত্রের সন্ধান ... ২৬৮
শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
—শান্তিনিকেতনের ইতিহাস ... ১৬৪
শ্রীহেমপ্রভা দেবী
—গান্ধীজী স্মরণে ... ৪০১
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত
—দেশাবলি বিবৃতি ও বাঁকুড়া হইতে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত ভূমি ... ২১৮

বিষয়-সূচী

অবিস্মরণীয় (কবিতা)—শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী ... ১৭০
আধুনিকী (গল্প)—শ্রীসাধনা কর ... ২৪৩
আন্দামান (সচিত্র)—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৫৭
আমার খসরু—বজলুর রশীদ ... ৫৪১
আর্টের মর্ম কথা—শ্রীসুধীরকুমার নন্দী ... ৪০৫
আলোচনা ... ২৭৪
এংলো-ইণ্ডিয়ানদের পরিচয়—শ্রীশান্তিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ... ৫৫৭
ঈপ্সিতা (কবিতা)—শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী ... ১৪৫
একজন অর্দ্ধবিস্মৃত কবি ও তাঁর কাব্য—শ্রীসুনীলকুমার বসু ... ৩৬৫
এক দিনের স্মৃতি—শ্রীউপেন্দ্র রাহা ... ৩২০
একটি অর্থনৈতিক গল্প (সচিত্র গল্প)—শ্রীপরিমল গোস্বামী ... ২২১
একালের জগৎশেঠ—শ্রীঅমলেন্দু সেন ... ৬৫৯
কবি ও কাব্য (কবিতা)—শ্রীআশুতোষ সান্যাল ... ৩৮
কবিগুরু গেটের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী—কাজী আবদুল ওদুদ ... ৬৪
কবির সন্ধান (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ... ২২০
কলঙ্কিনী (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত ... ৩৬১
কলিঙ্গদেশে গুপ্ত অধিকার—শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার ... ৪১৫
কোক-মুখা দুর্গা-প্রতিমা—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ... ৫০৯
খাদ্য সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিকল্পনা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র ... ৫১৯
গান্ধীজী স্মরণে—শ্রীহেমপ্রভা দেবী ... ৪০১
গোরক্ষা—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৫৬৬
জাতি বিভাগ— ঐ ... ১৮১
জার্ম্মান রাসায়নিক শিল্পোন্নতির মূল সূত্রের সন্ধান—
শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস ... ২৬৮
জীবন-সন্ধ্যায় (কবিতা)—শ্রীঅমরকুমার দত্ত ... ৪৪
ঝড় (কবিতা)—শ্রীকমলরাণী মিত্র ... ৪৪৪
তবু থাক (কবিতা)—শ্রীকরুণাময় বসু ... ২৬১
তিব্বতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব—শ্রীরাহুল সংকৃত্যায়ন ... ৫৬৮
তিমির বিদারি তোমার অভ্যুদয় (কবিতা)—শ্রীঅমলেন্দু দত্ত ... ৫৪৪
দাদু-বাণী (কবিতা)—শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার ... ১৩১
দার্জ্জিলিংএ (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ... ১৫৩
দুঃখ-ঝড়ে (কবিতা)—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত ... ৩২৮
দুর্দ্দিন (কবিতা)—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ... ৫৩
দেশ-বিদেশের কথা (সচিত্র)— ১৯০, ২৮৮, ৩৮৩, ৪৮০, ৫৭৬
দেশাবলি বিবৃতি ও বাঁকুড়া হইতে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত ভূমি—
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত .. ২১৮
ধর্ম্মঠাকুর ও কূর্ম্মমূর্ত্তি—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য ... ১৭৩
ধান-চালের মূল্য বৃদ্ধির আন্দোলন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র ... ৪২৮
নব-বোধন (গল্প)—শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায় ... ৫৫৯
নাইনিতাল (সচিত্র)—শ্রীমনোরঞ্জন সেন ... ৫১৬
নিগ্রোদের দেশ (সচিত্র)—শ্রীসুনীলপ্রকাশ সোম ... ৩৪৭
নিম্নবঙ্গের কতিপয় প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন—শ্রীবিমলকুমার দত্ত ... ২৪৬
নিষ্ফল কামনা (কবিতা)—শ্রীকরুণাময় বসু ... ৫৫৮
"ন্যাশনাল লাইব্রেরী" (আলোচনা)—বি. এস. কেশবন ... ২৭৬
পতঙ্গ (উপন্যাস)—
শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৪৫, ১৩৯, ২৪৯, ৩১১, ৪০৭, ৫০৫
পথহারা (গল্প)—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ... ১৫৯
পরিত্রাণ (গল্প)—শ্রীঅনাদিনাথ সরকার ... ৪৪৩
পল্লী অঞ্চলের জনচিকিৎসা—শ্রীমিহিরকুমার দাস ... ৪০৪
পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র ... ২৩০
পশ্চিম বাংলার সালতামামি—শ্রীকালীচরণ ঘোষ ... ৫৬০
পশ্চিম হিমালয়ের পথে (সচিত্র)—শ্রীপরিমল গোস্বামী ... ৭৬
পাগল—শ্রীউষা ভট্টাচার্য্য ... ১৭১
পাত্রী লঙ্ ও আমাদের জাতীয়তা (সচিত্র)—
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ... ১৩২
পুণ্যতীর্থ হরিদ্বার (সচিত্র)—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ... ৪১৯
পুস্তক-পরিচয় ৯৩, ১৮৭, ২৮২, ৩৭৭, ৪৭৫, ৫৭১
পূর্ব্ব-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা—স্বামী পরমানন্দ ... ৫৬৪
পূর্ব্বরাগ—শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার ... ৫২৮
প্রতিবেশিনী (গল্প)—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ... ৫২৯

প্রশ্ন (কবিতা)—শ্রীনারায়ণ দত্ত ... ৪২৪
"প্রাচীন বঙ্গে ধর্মপূজা" (আলোচনা)—শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার ... ২৭৪
প্রাচীন ভারতে বিদ্যাপ্রতিষ্ঠা—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ১১৩
বঙ্গভাষা ও রাষ্ট্রভাষা—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ... ৬৫
বনচারিণী (গল্প)—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী ... ৩৩৮
বাংলা সাহিত্যে বিনয়কুমার সরকার (সচিত্র)—
শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় ... ৪০৯
বাংলার আদিকবি—চণ্ডীদাস না কৃত্তিবাস ?—
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ৩০৫
বাংলার পালরাজাদের 'জয়স্কন্ধাবার'—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ... ৫২১
বাঙ্গলা লিপি-সংস্কার—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ... ৩৯
বিজনে (কবিতা)—শ্রীরবি গুপ্ত ... ৪৫১
বিদেশীর চক্ষে হিন্দু দেব-দেবী (সচিত্র)—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ... ৫৭
বিদ্যাপতির কবিতার বিভিন্ন স্তর—শ্রীসতীশচন্দ্র বক্‌সী ... ২৬২
বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস—শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সেন ... ২৬৫
বিবিধ প্রসঙ্গ— ১, ৯৭, ১৯৩, ২৮৯, ৩৮৫, ৪৮১
বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সার্থকতা কোথায় ?—
শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ৫১২
বিস্মৃত মহানগরী অশিও—শ্রীনিরুপমা নাহার ... ২৩৩
বুদ্ধের বিদ্রোহী শিষ্য দেবদত্ত—শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৪৯৭
বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার—শ্রীকালীচরণ ঘোষ ... ২১৬
বৃথা হবে এই স্বাধীনতা (কবিতা)—শ্রীনীলরতন দাশ ... ৫২২
বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ (সচিত্র)—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র ... ১৪৬
ব্যর্থ সাধনা (কবিতা)—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র ... ৩৩৭
ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন (১৯৩৯) শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ... ৮৩
ব্রহ্মদেশের সমাজ-জীবন—শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় ... ৫৫৪
ব্রিটিশের বিচার (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ৩১০
ব্রিষ্টলের কথা (সচিত্র)—শ্রীচিত্রিতা দেবী ... ৪০২
ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার দুইটি অধ্যায়—
শ্রীননীমাধব চৌধুরী ... ২০৯
ভারতের বস্ত্রশিল্প—শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল ... ৩৭৪
ভারতের শিল্পোন্নয়ন কোন্ পথে (সচিত্র)—শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ... ৫১
ভেজাল ও নকল—শ্রীরাজশেখর বসু .. ৩১৭
মহাপ্রস্থান—শ্রীবিমল চরণ দেব ... ১১৭
মহাবলীপুর (সচিত্র)—শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত ... ৩২৩
মহারাষ্ট্রে রাঢ়ীয় তান্ত্রিক সম্প্রদায়—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ৪২
মাঘী পূর্ণিমা (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ... ৪৫৮
মাতৃরূপ (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ২৪
মালয়ের কথা—শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় ... ১৭৬
মুদ্রামূল্য হ্রাস ও নূতন পরিস্থিতি—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ... ১৪৮
মেঘদূতের কল্পপুষ্প ও তরুলতা—শ্রীসুনীতিকুমার পাঠক ... ৪১৭
যদি (কবিতা)—শ্রীনির্ম্মলেন্দু রায়চৌধুরী ... ৭৫
রণ-তাণ্ডবে (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ... ৪২১
রবীন্দ্র-জীবনদর্শন—শ্রীজীবনময় রায় ... ১৬৮
রাইপুরের মহামায়া ও শিখরবংশ—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৪৫
রাজবৈদ্য জীবক—শ্রীসুধাময়ী সেনগুপ্ত ... ২৪০
রাজা ভোজ—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো ... ১৭
রামায়ণী কারবার (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ... ২৫
রাসবিহারী বসু (সচিত্র)—শ্রীসোমেন্দ্রনাথ রায় ... ১৫৩
শত্রু (গল্প)—শ্রীজীবনময় রায় ... ৪৫২
শান্তিনিকেতনের ইতিহাস—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৬৪
শিক্ষাব্রতী রিচার্ডসন (সচিত্র)—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ... ৩২৯
শিল্প-কলা প্রদর্শনী (সচিত্র)—শ্রীদ্বিজেন্দ্র মৈত্র ... ৪২৫
শিল্প-কলা প্রসঙ্গে শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী—
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র ... ৪৪৭
শিল্পময় শ্যাম (সচিত্র)—শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ... ৩২
শিল্পী হীরাচাঁদ দুগার ও তাঁর চিত্রকলা (সচিত্র)—
শ্রীদ্বিজেন্দ্র মৈত্র ... ৫৪৫
শ্যামদেশের বৌদ্ধধর্ম্ম (সচিত্র)—শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ... ২২৬
শ্রীঅরবিন্দ (কবিতা)—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ... ৩১৩
শ্রীরামকৃষ্ণ (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ... ৫১৫
সংগঠনে সুভাষচন্দ্র—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৪০২
সতী (গল্প)—শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ... ৭১
সমবায়—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি ... ৩৬৯
সরস্বতী—শ্রীসরোজকুমার সাহা ... ৩৫৪
সাধক নাম্মালোয়ার—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী ... ৪৬৯
সিন্ধুধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য—শ্রীননীমাধব চৌধুরী ... ১২৩
সেকালের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়—শ্রীকালীপ্রসাদ ঠাকুর ... ২৩৭
স্বাধীন ভারত—রেজাউল করীম ... ৪১৬
স্মৃতিরক্ষা (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ... ৫০৪
হরিণঘাটা (সচিত্র)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র ... ১৫৭
হেমাঙ্গিনীর সুটকেস (গল্প)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ... ১১৯

বিবিধ প্রসঙ্গ

অধ্যাপক ধর্ম্মঘট ... ১০২
শ্রীঅরবিন্দ-জীবনের এক অধ্যায় ... ৩৯৯
"আশার কিরণ" ... ২০৪
আসাম গবর্ণমেণ্টের উদাসীনতা ... ৩০০
আসামে মুসলিম নির্যাতনের কাহিনী ... ২১৫
আসামের সঙ্গে রেল সংযোগ স্থাপন ... ১০৯
ইংরেজের চক্ষে "পাকিস্থান" ... ৩৮৮
ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা ... ১৩
ইসলামিস্থান ... ২০২
এটম্ বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা ... ৪৯৫
এশিয়া সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ... ৩৯৯
কংগ্রেস কমিটি গঠনে অভিযোগ ... ২৯০
কম্যুনিষ্ট আন্দোলন ... ৯৭
কম্যুনিষ্ট গৃহ-বিবাদ ... ১৩
কাশ্মীর ও পণ্ডিত নেহরু ... ৩৯৮
কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের শেষ চেষ্টা ... ৫৮৯
কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ৩০৩
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২০৬

কোচবিহার ও পশ্চিমবঙ্গ ... ২৯৭
ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ... ১৬
খাদ্য-উৎপাদনের হিসাব ... ১১
খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি ... ২৯৩
গোপীনাথ শ্রীবাস্তব ... ১৬
চিনির কথা ... ৪৯০
চিনির ভেল্কাবাজি ... ১৯৮
চীন-সোভিয়েট মৈত্রী-চুক্তি ... ৪৯৪
চীনের কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট ... ২০৪
চাষের জন্য সামরিক বিধি ... ২৯৪
ছাত্র-আন্দোলন ও ছাত্র-বিক্ষোভ ... ১
ছাত্রসমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা ... ২৯৯
জম্মু-কাশ্মীর সমস্যা ... ৩০১
জোসেফিন ম্যাক্লাউড্, কুমারী ... ২০৬
জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী ... ২০৭
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ... ৩০৪
জ্যোতিশচন্দ্র দাশ ... ১১২
ডাচ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ... ১১১
তন্তুবায় শ্রেণীকে হয়রান ... ২০১
তাল গুড় ও খেজুর গুড় ... ৩৯৪
দামোদর ক্যানেল ... ৪৯১
"দেশী খেলা" ... ২০৫
ধান্যের মূল্যবৃদ্ধি ... ৩৯২
ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ... ৩০৪
নিবারণচন্দ্র পাল ... ২০৭
নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্কট ... ২০৮
ন্যাশনাল লাইব্রেরী ... ১০১
পয়লা ডিসেম্বরের শিক্ষক ধর্ম্মঘট ... ১৯৫
পশ্চিমবঙ্গ। প্রগতি বা অধোগতি ... ২৮৯
পশ্চিমবঙ্গে অশান্তির ছায়া ... ৯৭
পশ্চিমবঙ্গে চাউলের ঘাট্তি? ... ১০৪
পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমি বৃদ্ধি ... ৩৯০
পশ্চিমবঙ্গে জন-শিক্ষা ... ৯
পশ্চিমবঙ্গে ধান সংগ্রহ ... ২৯১
পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কার্য্যপদ্ধতি ... ৪৯৩
পশ্চিমবঙ্গে সামরিক বৃত্তি ... ৭
পশ্চিমবঙ্গে সেচকার্য্যের প্রসার ... ৭
পশ্চিমবঙ্গের গণ-মনে বিক্ষোভ ... ১৯৯
পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য-বিভাগ ... ৮
পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান ... ৩৮৭
পশ্চিম বাংলার অবস্থা ... ১৯৩
পাকিস্থান ও আফগানিস্থান ... ১০২
পাকিস্থানে ভারতবিরোধী প্রচার ... ২৯৪
পুলিনবিহারী দাসের স্মৃতিরক্ষা ... ১৬
পূর্ণচন্দ্র মৈত্র ... ৩০৪
পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা ... ৪৮২
পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু অবস্থা ... ১০৬
পূর্ব্ববঙ্গের গণ-বিক্ষোভ ... ১৩
পৌর-প্রতিষ্ঠানে কর্ম্ম-বিরতি ... ১০৬
প্রস্তাবিত যুব-কংগ্রেস ... ২
বর্দ্ধমান ম্যাজিষ্ট্রেটের বিজ্ঞপ্তি ... ২৯৫
বর্দ্ধমানের তাঁত-শিল্প ... ১১০
বনলতা দাশ ... ৩০৪
বর্ত্তমান অবস্থায় লোকবিনিময় ... ৪৮৫
বর্ত্তমান অবস্থা ও শান্তিরক্ষা ... ৪৮৬
বর্ত্তমান সঙ্কটে টাকার অভাব ... ৪৮৭
বরিশাল—"পুণ্যে বিশাল" ... ১০৮
বাংলায় স্থায় ও শৃঙ্খলা ... ৩৮৫
বাঁকুড়ায় পল্লীসংগঠন ... ৩৯৫
বাঙালীর সামরিক ঐতিহ্য ... ২৯৮
বাঁশ বনাম লৌহ ... ২০৫
বাস্ আক্রমণ ও সরকারী প্রেসনোট ... ৯৮
বাস্তব ও অবাস্তব যুদ্ধ ... ৪৮১
বাস্তত্যাগীর বাস্তব অবস্থা ... ৪৯৩
বাস্তহারার সাহায্য-বিধান ... ১০
বিদ্যালয়ে কম্যুনিষ্ট সংগঠন ... ১৯৪
বিনয়কুমার সরকার ... ২০৬
বিশপ ফস্ ওয়েষ্টকট ... ১১২
বিহারে বাঙালী অঞ্চলের সমস্যা ... ৪৮৮
বিহারে ভাষার বিরুদ্ধে অভিযান ... ৩৯০
ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ... ৪০০
ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় ... ১৪
ব্রিটিশ "কমনওয়েলথভুক্ত" থাকার লাভ ... ১৫
ভারত-ইতিহাসের রহস্য ... ৩০২
ভারতরাষ্ট্রে বাগ্‌বিতণ্ডা ... ৩০০
ভারতরাষ্ট্রের আয়-ব্যয় ... ১১০
ভারতরাষ্ট্রদ্রোহী চোরাকারবারী ... ২০০
ভারতরাষ্ট্রের খাদ্য-সমস্যা ... ১০৫
ভারতীয় মুদ্রামূল্য হ্রাস ... ৩
ভারতীয় সংস্কৃতি ... ৩০২
ভারতে ইংরেজ বণিক ... ৩৯৬
ভারতে পাট উৎপাদন ... ৩৯৩
ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্ত ... ২০১
মণিমেলা সম্মেলন ... ২৯৯
ডাঃ মাথাইয়ের বক্তৃতা ... ১৯৭
মুদ্রামূল্য হ্রাস বিষয়ে পাকিস্থানের সিদ্ধান্ত ... ৬
মুদ্রামূল্য হ্রাস বিষয়ে সার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সের মন্তব্য ... ৪
মুদ্রামূল্য হ্রাস সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ মহলের অভিমত ... ৩
মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফল ... ৫
মৌমাছির চাষ ... ৩৯৪
ম্যালেরিয়া জ্বর ... ২০০
যুক্তপ্রদেশে জমীদারী প্রথার বিলোপ ... ১২
যুক্তপ্রদেশের সর্ব্বার্থক উন্নতি ... ২০৩
রাসায়নিক শিল্পের অবনতির কারণ ... ৩০৩
রেল-বিভাগের কার্য্য ... ১৯৯
শরৎ চন্দ্র বসু ... ৪৯৬
শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার সরকারী দায়িত্ব ... ১০০
শাসনকার্য্যে ব্যয়বাহুল্য ... ৩৯৫
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কম্যুনিষ্ট ... ১০৩
সচ্চিদানন্দ সিংহ ... ৪৯৬
সাম্রাজ্যবাদের তর্ক ... ১১১
সাম্প্রদায়িক গোলযোগ ... ৩৮৬

সাহিত্যে "উপেক্ষিতা" ... ৩০৩
সিভিল সাপ্লাই কনট্রোলারের ক্ষমতা ... ১২৬
সীমান্ত-রেখার হেরফের ... ১১৯
সুধীরচন্দ্র বসু ... ৪০০
সুরেন্দ্রকুমার বসু ... ২০৭
সোভিয়েট কৃষির প্রথম অধ্যায় ... ৪৯৪
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ... ৪৯০
হত্যাকারী গ্রেপ্তারে পুলিসের অনিচ্ছা ... ১০৪
হরিসিং গৌর ... ৩০৪
হরেন্দ্রনাথ ঘোষ ... ৪৯৬
হাইকোর্ট সংস্কার ... ২৯৬
হাইড্রোজেন বোমা ... ৪০০
হিন্দু মহাসভার কলিকাতা অধিবেশন ... ২৯৬
হুগলী জেলায় স্বাবলম্বন ... ৪৯২
হেমেন্দ্রনাথ বকসী ... ২০৭

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

জেলে—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ... ১
ব্রতচারিণী—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত ... ৯৭
মজুর—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ... ১৯৩
রসরাজ— ঐ ... ২৮৯
শাহজাহানের দরবারে পারস্য-দূত—শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৮১
শেষ শিক্ষা—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত ... ৩৮৫

একবর্ণ চিত্র

অনাদি মুখোপাধ্যায় ... ৫১৬
আন্দামান চিত্রাবলী ২৫৮-৬০
উদয়পুর, ফতেসাগর হ্রদ—শ্রীহীরাচাঁদ দুগার ... ৫৪৬
কনথল, সতীর মন্দির ... ৫২৮
কাঠখোদাই মূর্তি—শ্রীঋভেন্দ্র মজুমদার ... ৪২৫
কাথিয়াওয়াড়, গোধূলির আলোয়—শ্রীহীরাচাঁদ দুগার ... ৫৪৫
কালীপ্রসন্ন সিংহ ... ১৩৫
খড়্গপুর ষ্টেশন-প্রাঙ্গণ ... ১৪৬
গান্ধারে প্রাপ্ত প্লাষ্টার-নির্মিত তরুণের মুখাবয়ব ... ৯৭
জবাহরলাল নেহরু, ওয়াশিংটনে ১৪৪-৪৫
জয়পুর চিত্রাবলী—শ্রীহীরাচাঁদ দুগার ... ৫৪৬-৭
শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ... ৫১
ঝাড়গ্রাম সেবায়তন বিদ্যালয় ... ৩৮৩
তুষার শৈল—শ্রীরামকিঙ্কর বেইজ ... ৪২৭
দূরের যাত্রী (ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য)—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ... ৪৮১
ধারাস্নান—শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ... ৪২৬
নয়াদিল্লীতে সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজ ... ৫২৮
নাইনিতাল, দৃশ্যাবলী ৫১৬-১৮
নিগ্রোদের দেশ—চিত্রাবলী ৩১৭ ৫২
নেতাজী সুভাষচন্দ্র ... ২৮৯
ফরমোজার একটি উপত্যকা ... ২৩২
বিনয়কুমার সরকার ... ৪৩৯
বিশ্বশান্তিবাদী সম্মেলন, শান্তিনিকেতন ... ১৯৩
ব্রিষ্টল, চিত্রাবলী ৪৩২-৩৮
ভিজাগাপট্টম বন্দর ... ১৪৭
মহাত্মা গান্ধী ... ৪০৮
মহাবল্লীপুর—চিত্রাবলী ৩২৩-২৯
যবদ্বীপ :
—গণেশ, নরমুণ্ডোপরি ... ৬৩
—মহিষমর্দ্দিনী ৬৩
রাজগৃহ চিত্রাবলী—শ্রীহীরাচাঁদ দুগার ৫৪৭-৪৮
রাধাকান্ত দেব ... ১৩৩
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনথল ৪৫৯, ৪৬১, ৪৬৩
রিচার্ডসন, ডি. এল. ... ৩২৯
রেনেলের ম্যাপ ৫২৩, ৫২৫
লঙ, পাদ্রী জেম্‌স ... ১৩২
লছমনঝোলা সেতু ৫২৯
লণ্ডনে বাঙালী ছাত্রদের বিজয়া সম্মিলন ... ১৯১
লাঙ্গুলিয়া ব্রিজ, ডুলির নিকটে ... ১৪৭
রাসবিহারী বসু ১৫৩-৫৫
শীত (ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য)—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ... ৩৮৫
শ্যামদেশ :
—আঙ্কোর ওয়াট মন্দির, কম্বোজ ... ২৩৩
—আঙ্কোরথামের অবলোকিতেশ্বর মূর্তি ২২৬, ২৩৩
—আধুনিক চৈত্য ... ২২৭
—'ওয়াট্‌ আরুণ' বৌদ্ধ মন্দির ... ২৩২
—'ওয়াট্‌ পঞ্চম পবিত্র' মন্দির ... ২২৭
—'ওয়াট্‌ ফ্রা কেও' মন্দির ... ২২৮
—'ওয়াট্‌ রাজপ্রাদিৎ' বৌদ্ধ মন্দির ... ২২৯
—একটি প্রাচীন খেমির মন্দির ... ১
—থাই মন্দির ... ৬৬
—নৃত্যরত ইনাও ও বুস্‌বা ... ৬৭
—নৃত্যরত রাবণ ও তাঁহার যোদ্ধবৃন্দ ...
—বুদ্ধমূর্তি ... ৩৩-৪
—ব্যাঙ্ককের "ওয়াট্‌ ফ্রা কেও" মন্দির ... ৩৩
—রেভিনিউ ষ্টাম্পে বীণাবাদিনী সরস্বতী মূর্তি ... ৩৫
সতীশচন্দ্র দে ... ১৯২
সিমলার চিত্রাবলী ১, ৩২, ৭৬-৮০
স্নাতক (কাঠখোদাই)—শ্রীঋভেন মজুমদার ... ৪২৬
হরিণঘাটা, গোশালা প্রভৃতির দৃশ্য ১৫৭-৫৮
হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় ... ৩৮৪
হরিদ্বার—ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট ... ৫২৯
হরিদ্বারের দৃশ্য ... ৪০৯
হায়দরাবাদ-প্রবাসী বাঙালীদের বিজয়া সম্মিলন ... ১৯০
হিন্দু দেব-দেবীর চিত্রাবলী ৫৭-৬৩
হীরাচাঁদ দুগার (স্কেচ)—শ্রীনন্দলাল বসু ... ৫৫৫

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পঞ্চগ্রাম ৫৲ বেদেনী ৩৲
মন্বন্তর ৪৷৷০ পাষাণপুরী ২৸০
ছলনাময়ী ৩৲ শ্রীপঞ্চমী ২৲
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ছা ম তী ৬৲
অ প রা জি ত ৬৲
অনুবর্ত্তন ৪৲ দৃষ্টিপ্রদীপ ৫৲ অসাধারণ ৩৲
প্রবোধকুমার সান্যালের
যতদূর যাই ৩৲
শ্যামলীর স্বপ্ন ৪৲
আদি ও অকৃত্রিম ৩৷০
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের
অগ্নি সম্ভব ৪৷৷০
মহালগ্ন ২৸০
প্রমথনাথ বিশীর
অশ্বত্থের অভিশাপ ৪৷৷০ চলন বিল ৪৷৷০ রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ—১ম খণ্ড ৪৷৷০, ২য়—৩৷০
বাঙালীর জীবনসন্ধ্যা ২৸০ মাইকেল মধুসূদন ৩৷৷০
পারমিট ২৷৷০
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
বহুবিচিত্র ২৷৷০ স্বর্ণমুকুর ৩৷৷০ স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম ২৷৷০
পুরুষ ও রমণী ২৲ রাত্রির তপস্যা ৪৷৷০
মিত্রালয়—১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট :: কলিকাতা—১২
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ দ্বিতীয় ভাগ ৬৷৷০
তারাশঙ্করের
বিংশ শতাব্দী ২৷০
৫৲
প্রবোধ সান্যালের
উত্তরকাল ৪৲
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
কথাচিত্র ২৸০
বাণী রায়ের
রঞ্জনরশ্মি ২৷৷
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲
ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
পশ্চিমের ত্রী ৪৲
আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস
বলয়গ্রাস
সুমথনাথ ঘোষের
২৸০
চরণদাস ঘোষের
নিরক্ষর ৪৲
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
জন্মান্তর ২৷৷০
নরেন্দ্র মিত্রের
অদৃশ্যলোকে ২৸০
মিত্র ও ঘোষ :: ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রবাসী

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য :—

দেশী সডাক বার্ষিক মূল্য ৭॥০ ; ঐ ষাণ্মাসিক ৩৸০ ; ঐ প্রতি সংখ্যা ।৵০ । বিদেশী সডাক বার্ষিক মূল্য ১৩।০ বা ২১, শিলিং; ঐ ষাণ্মাসিক ৬৸০ বা ১০। শিলিং ; ঐ প্রতি সংখ্যা ১ শিলিং নয় পেনী মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসর বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। টাকা মনিঅর্ডারে অগ্রিম পাঠানোই ভাল, বাহিরের ব্যাঙ্কের চেকের সঙ্গে অতিরিক্ত ।৵০ ব্যাঙ্ক কমিশনও দেয়। প্রবাসী বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। যথাসময়ে প্রবাসী না পৌঁছিলে ১৫ তারিখের ভিতর স্থানীয় ডাকঘরের রিপোর্ট ও নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক নম্বর সহ :পত্র লিখিতে হইবে। পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ, তাঁহাদের চাঁদা যে সংখ্যার সহিত নিঃশেষ হইবে, সেই সংখ্যা পাইবার পর ২০ দিনের ভিতর পুনর্ব্বার চাঁদা বা প্রবাসী লইতে অনিচ্ছাজ্ঞাপক পত্র না পাঠাইলে, তাঁহারা পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃতে লইয়া চাঁদা দিতে ইচ্ছুক এই বিশ্বাসে ভিঃ পিঃ প্রেরণ করা হয়। চিঠিপত্র বা টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ না করিলে কার্য্যসাধনে গোলমাল অবশ্যম্ভাবী।

বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য :—

মাসিক মূল্য—সাধারণ পূর্ণ একপৃষ্ঠা (৮ইঃ × ৬ইঃ) ৬০৲

„ „ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা (৪ইঃ × ৬ইঃ)
বা এক কলম (৮ইঃ × ৩ইঃ) ৩২৲

„ „ সিকি পৃষ্ঠা (২ইঃ × ৬ইঃ)
বা অর্দ্ধ কলম (৪ইঃ × ৩ইঃ) ১৮৲

„ „ অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা (১ইঃ × ৬ইঃ)
বা সিকি কলম (২ইঃ × ৩ইঃ) ১০৲

বিশেষ বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের মূল্য পত্রে জ্ঞাতব্য

প্রবাসী প্রকাশিত হইবার অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে 'বিজ্ঞাপন' অগ্রিম মূল্যসহ কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। মূল্যসহ বিজ্ঞাপন প্রবাসী প্রকাশিত হইবার অন্ততঃ ১০।১৫ দিন পূর্ব্বে কার্য্যালয়ে পৌঁছিলে প্রুফ দেখাইবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রুফ দেখার দোষে যদি কোন ভুল থাকে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি। যাঁহারা বিজ্ঞাপনের প্রুফ দেখার ভার আমাদের উপর দিবেন, তাঁহারা সামান্য ভুল-ত্রুটির জন্য অভিযোগ করিলে গ্রাহ্য হইবে না। এক বৎসরের জন্য কণ্ট্র্যাক্ট করিলে এবং বৎসরের সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম জমা দিলে টাকায় ৵০ হিসাবে বাদ দেওয়া হয়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—প্রবাসী কার্য্যালয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড্

ম্যানেজিং এজেন্টস—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)। রেজিঃ অফিস ২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

— ১নং মিল —	— ২নং মিল —
কুষ্টিয়া (নদীয়া)	বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

এই মিলের ধুতি শাড়ী প্রভৃতি ধনীর প্রাসাদ হইতে কাঙ্গালের কুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমভাবে সমাদৃত।

প্রথিতযশা লেখিকা শ্রীশান্তা দেবীর

নূতন গল্পের বই **পথের দেখা**—মূল্য ১।৹

শ্রেষ্ঠ উপন্যাস **অলখ ঝোরা**—মূল্য ৩৲

সিঁথির সিঁদুর—মূল্য ১।৹

শ্রীশান্তা দেবী ও শ্রীসীতা দেবীর

সুবিখ্যাত গল্পের বই

হিন্দুস্থানী উপকথা (সচিত্র) মূল্য ৩৲

শিশুপাঠ্য সচিত্র **সাতরাজার ধন**—মূল্য ২৲

... প্রধান—পি ২৬, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা।

বৈজ্ঞানিক ফলিত-জ্যোতিষ

আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় মতেরই শ্রেষ্ঠতম প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকি। ফলিত-জ্যোতিষ ডাক-যোগে শিক্ষা দেওয়া হয়। সারা জীবনের ঘটনা ৮৲, ১৫৲, ৫০৲; ১ বৎসরের মাসিক ফলাফল ১০৲—২০৲; প্রতি প্রশ্ন ৩৲। জন্মের সময়, স্থান ও তারিখ আবশ্যকীয়। গণনার ফল ভিঃ পিঃ ডাকে ও "প্রসপেক্টাস্" চাহিলেই প্রেরিত হয়। বিশুদ্ধ "ভৃগু-সংহিতা" হইতেও "রিডিং" সরবরাহ করা হয়। **দি এষ্ট্রলজিকেল বুরো** (প্রফেসর এস, সি, মুখার্জ্জী, এম-এ মহাশয়ের), ইং ১৮৯২ সালে স্থাপিত।

বর্ত্তমান পূর্ণ ঠিকানা :—THE ASTROLOGICAL BUREAU (of Prof. S. C. Mukherjee, M. A.) Benares—1, U. P.

নির্ভরযোগ্য হাতঘড়ি

সব ঘড়িগুলিই যথার্থ লেভার মিকানিজমযুক্ত উচ্চ ধরণের সুইচ্ কারুশিল্পজাত।

[৫ পাঁচ বৎসরের গ্যারান্টি]

ঘড়িগুলি ঠিক চিত্রে প্রদর্শিত নমুনানুযায়ী

৫ জুয়েল ক্রোম-কেইস ২৮৲, ঐ রোল্ড গোল্ড ৩৮৲, ক্রোম কেইসযুক্ত ঘড়ি ১৮৲, কেন্দ্রে সেকেণ্ডের কাঁটা-সহ ক্রোম কেইসের ঘড়ি ২০৲, সোনালি রঙের কেইসযুক্ত ঘড়ি ২৫৲ টাকা। মূল্যঃ কলিকাতা ও ... অপেক্ষা আমাদের ঘড়ির মূল্য প্রত্যেকটি ৫৲ হইতে ১০৲ ... কম, কারণ আমাদের দোকান খরচা তুলনায় খুবই নগণ্য। ... গ্রাহকগণের জন্য ৶৹ তিন আনার ষ্ট্যাম্প প্রেরণ করুন।

... ওয়াচ কোং—নং ১০, পোঃ ঝরিয়া, (হাজারিবাগ)।

মডার্ণ ড্রাগস্ রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ কৃত

● ওয়েলফেয়ার টুথ পেষ্ট

[সাল্‌ফা ড্রাগ সমন্বিত]

● ওয়েলফেয়ার টুথ পাউডার

[সাল্‌ফা ড্রাগ যুক্ত]

● রসায়ন ব্র্যাণ্ড

সাল্‌ফো-মড (মলম)

শতকরা ৫ ভাগ করিয়া সাল্‌ফানিলামাইড

ও বোরিক অ্যাসিড সমন্বিত

যাবতীয় চর্ম্মরোগে অমোঘ

অফিস ও কারখানা—৮০নং লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—১৪

প্রাপ্তিস্থান :—ইষ্ট এণ্ড মেডিক্যাল হল, বৈঠকখানা; ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস্ লিঃ, ভিক্টোরিয়া মেডিক্যাল হল, শিয়ালদহ, ডালিয়া ষ্টোর্স, ৪৫৩, হ্যারিসন রোড; ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটি, কলেজ স্কোয়ার; ওয়াছেল মোল্লা, ধর্ম্মতলা, এবং অন্যত্র।

মতামতের
খাতার পাতায়
শ্রীযুত মহাদেব দেশাই বলেন :
"আমি ও আচার্য্য কৃপালনী অদ্য শক্তি ঔষধালয়ের
কারখানা পরিদর্শন করিয়া দেখিলাম যে ইহা একটি
বৃহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় কারখানা। এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের
সুপরিচালনার জন্য অধ্যক্ষ মহাশয় বাস্তবিকই প্রশংসার
পাত্র। এখানকার সুবিশুদ্ধ ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীতে
আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি।"
স্বাঃ মহাদেব দেশাই
তাঃ ১৯।৫।২৫
অধ্যক্ষ মথুর বাবুর
শক্তি ঔষধালয় - ঢাকা

বিষয়-সূচী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭

বিবিধ প্রসঙ্গ— ৯৬—১১২

কন্যাদের বিবাহ হবে না ?—
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি ... ১১৩

বর্ব্বরতা (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ১১৯

আঘাত (গল্প)—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ... ১২০

উত্তর (কবিতা)—এ. এন. এম. বজলুর রশীদ ... ১২৪

ব্রহ্ম রাষ্ট্র-বিপ্লবের স্বরূপ —
অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় ... ১২৫

মিষ্টি আলু (সচিত্র)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র ... ১২৯

চিত্র-প্রদর্শনী (সচিত্র)—"শিল্প-চক্র" ... ১৩৩

ঝরা পালক (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ... ১৩৫

বাঁধ (উপন্যাস)—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত ... ১৩৬

আমাদের স্বাধীনতা ও খাদ্যসঙ্কট—
শ্রীনীলরতন দাশ ... ১৪২

রামানন্দ-স্মৃতি—শ্রীকালীপদ সিংহ ... ১৪৬

দিবাশেষে (কবিতা)—শ্রীআশুতোষ সান্যাল ... ১৪৮

বিষয়-সূচী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭

গলতা বা গালবমুনির আশ্রম, জয়পুর (সচিত্র)—
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ১৬৯

পুনর্বসতি সমস্যা সমাধানের একটি উপায়—
শ্রীশিশিরকুমার কর, বি. এস্‌সি. ... ১৭২

প্রাচীন ভারতে গুপ্তচর নিয়োগ—
শ্রীঅজয়কুমার নন্দী .. ১৭৬

কঠোপনিষদ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ১৭৯

বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়

উড়কি ধানের মুড়কি ৸০
দেশকাল পাত্র ১৷০
জীয়নকাঠি ১৷০
তারুণ্য ১৷০ মনপবন ২৲
প্রকৃতির পরিহাস ২৲
যার যেথা দেশ ৪॥০
অজ্ঞাতবাস ৪॥০
কলঙ্কবতী ২৲
দুঃখ মোচন ৪॥০
মর্ত্ত্যের স্বর্গ ৪॥০ অপসরণ ৫৲
ইশারা ১৷০ আমরা ১৷০
রত্না রাধা (কবিতা) ২৷০
আগুন নিয়ে খেলা ৩৲
পুতুল নিয়ে খেলা ৩৲
বিনুর বই ২॥০ জীবনশিল্পী ১৷০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দুলিবালা ২৲
ফাল্গুনী ৩৲ পাষাণ ৩॥

অনিলবরণ রায় অনূদিত

শ্রীঅরবিন্দের গীতা
১ম ১৷০ ২য় ৩৲ ৩য় ২৷০ ৪র্থ ১৷০ ৫ম ৪৲

নজরুল ইসলাম

সঞ্চিতা ৫৲ নজরুল গীতিকা ২৷০
অগ্নিবীণা ২॥০ রিক্তের বেদন ২৲

রামনাথ বিশ্বাস

গোজাতির নূতন জীবন ২॥০

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য

দুই নৌকা ৩॥০ পরমায়ু (২য়ভাগ) ৩॥০
যক্ষ্মাও সারে ২॥০ মুক্তধারা ৪॥০
ঘূর্ণাবর্ত্ত ৩৲ পথপ্রান্ত ৪৲
কৃষ্ণদ্বীপের রাণী ৩॥০

বুদ্ধদেব বসু

আমি আর ওরা ও আরো অনেকে ৪৲
এলো হাওয়া ২৲ পারিবারিক ৩॥০
গালি পাখি ১॥০ বাসরঘর ৩॥০
ঘর বন্ধনা ২॥০ ফেরিওয়ালা ২॥০

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

মুক্তির আহ্বান ২৲

এস ওয়াজেদ আলি

রাঙা বাঁশী ২৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গমর্ত্ত্য ৪॥০
মাটি ২৲

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

উনিশ শ পাঁচ ২॥০

সুবোধ ঘোষ

ত্রিযামা ৫৲
কল্পলতিকা ৩৲
শতকিয়া ২৲
কালপুরুষের সাড়ে পাঁচ ২॥০

নৃপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সোনালী রং ৪॥০ শশিনাথ ৪॥০
অভিযান ৫৲ অনুরাগ ৪॥০
নাস্তিক ৩৲ বিশ্বস্ত ভার্য্যা ৩॥০
কৌতুক ২৲ ক্ষোভ-কল্পা ৩॥০

নরেন্দ্র ঘোষ

বসন্ত বাহার ৩॥০ ক্রিয়াস লেন ২৷০
নায়ক ও লেখক ২॥০

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সহরবাসের ইতিকথা ৩৲

ডাঃ নীহার গুপ্ত

কালো ছায়া ২৷০ অভিশপ্ত পুঁথি ২॥০

নরগোপাল দাস ২য় ৪৲

চলতি পথের বাঁশী ২॥০
হে আত্মবিস্মৃত ১॥০

নিরুপমা দেবী

অনুকর্ষ ৩॥০

ইসাডোরা ডানকান

আমার জীবন ২॥০

অমৃত দাশগুপ্ত

পলাশীর পরে ১॥০ রেল কলোনী ৪৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস

পাশাপাশি ২॥০
বিবাহের চেয়ে বড় ৪॥০

যায় যদি যাক

যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে বিপন্ন দেশ ও বিপর্যস্ত সমাজের আলেখ্য। আগুনের অক্ষরে লেখা। দাম তিন টাকা।

নবনীতা ৩॥০ ঊর্ণনাভ ৩॥০
কালোরক্ত ১॥০ অন্তরঙ্গ ১॥০
অমাবস্যা ১॥০

বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

মাটির ঘর ২৲ বিশ বছর আগে ২৲

বনফুল

নবদিগন্ত ৫॥০
জঙ্গম ১ম সং ৩॥০ ২য় সং ৪॥০
শ্রীমধুসূদন ৩৲ বিদ্যাসাগর ৩৲
নির্মোক ৪৷০ চতুর্দ্দশী ৷৵০

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মহানন্দা ৩॥০
সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী ২॥০

ভবানী মুখোপাধ্যায়

বিপ্লবী যৌবন ৫৲

জহরলাল নেহেরু

কোন পথে ভারত ও কারাজীবন ১॥০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচিত্র জগৎ (২য় সং) ৫৲
অথৈজল ৩॥০
হীরা মাণিক জ্বলে ২৲

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

স্ত্রীভাগ্যে ... ২॥০
কণ্ঠাভরণ ... ২৲
অভয়ের বিয়ে ৩৲
রবীন মাষ্টার ৩॥০
মর্ম্ম ও কর্ম্ম ৩৲
তরুণী ভার্য্যা ৩॥০
অগ্নি সংস্কার ২॥০
প্রহেলিকা ২॥০
টিকি বনাম টাক ৩॥০
বিয়ের খাতা ২॥০

শচীন সেনগুপ্ত

জননী ২॥০ প্রলয় ১॥০

যতীন্দ্রলাল বসু

সহযাত্রিনী ... ৪॥০

যামিনী কর

প্রাইভেট (নাটক) ৸০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

থার্ড ক্লাস ২৷০
ত্রিলোচন কবিরাজ ২৲

রবীন্দ্রকুমার বসু

তবলা বিজ্ঞান ও বাণী ২॥০

আশালতা সিংহ

অমিতার প্রেম ২৲ আবির্ভাব ১॥০

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরবাঁধা ৩॥০ দুইতার ৩॥০
শমীশাখা ১॥০

"চায়ের ঢাকনাটা
আমি নিজে বুনেছি"
"(মনে মনে) ঢাকনাটাই
সুন্দর চা-টা কিন্তু
তেমন নয় মোটেই!"

Lipton's Flowery Orange Pekoe
LIPTON'S
HIMALAYAN BLEND
DARJEEL
TEA
লিপটন
মানে
ভালো চা
LTX-180

হাঁপানী-যক্ষ্মা কে বলে সারে না ?

মৃত ভাওয়াল রাজকুমারের পুনর্জ্জীবনদাতা বাবা ধর্ম্মদাস নাগার গ্যারাণ্টি দেওয়া "এজমো-ভাইনা" সেবনে সারিবেই। ১ মাত্রায় উপশম, ১ শিশিতে আরোগ্য। বিফল প্রমাণে মূল্য ফেরৎ, শিশি ৩৲ টাকা।

শ্বেতকুষ্ঠ "শ্বেতকুষ্ঠবজ্র" প্রলেপে সারিবেই। শিশি ৩৲ টাকা।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। ডব্লিউ ডাই এণ্ড কোং, (প্র) আনন্দপুরী (ধনিয়াপাড়া), পোঃ বারাকপুর, ২৪ পরগণা।

নৈরাশ্যজনক ব্যাধি

অভিনব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রক্ত, মুত্র, কফ্ প্রভৃতি পরীক্ষার দ্বারা গ্যারাণ্টিসহ নির্ম্মল আরোগ্যের জন্য আমাদের বহুদর্শী (রেজিঃ) বিশেষজ্ঞের সুপরামর্শ লউন।

শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক

(ভি, ডি, চেম্বার) ১৪৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

সময় ও প্রাতে ৭—১০টা, বৈকাল ৫—৮টা।

বিনামূল্যে খবর

বা শ্বেতকুষ্ঠের ৫০,০০০ প্যাকেট

ঔষধ বিতরণ ভিঃ পিঃ খরচ ।৵০ আনা। ঔষধে উপকার না হইলে এই প্রকার প্রথমে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা সম্ভব কিনা তাহা আপনারা বিচার করিবেন। অনর্থক অর্থ ব্যয়ের পূর্ব্বে ঔষধে উপকার হইবে কিন যাচাই করিয়া লউন। কুষ্ঠ ও বাতরক্ত দরুণ, গাত্রে চাকা দাগ ও স্পর্শশক্তি লোপ, হস্তপদাদির অঙ্গুলীসমূহ বক্র, মুখ, নাক, কান ফোলা নির্দ্দোষ নিরাময়ের জন্য পত্র লিখুন।

সালিখা কুষ্ঠাশ্রম—কবিরাজ শ্রীবিনয়শঙ্কর রায়, বৈদ্যশাস্ত্রী, বাচস্পতি ৪নং হরগঞ্জ রোড, পোঃ সালিখা, জেলা হাওড়া। ফোন: হাওড়া, ১৮৭ ব্রাঞ্চ ঔষধালয়—৪৯সি, হারিসন রোড, কলিকাতা।

আমাদের আত্মবোধ ও আত্মবিস্মৃতি

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ দাশগুপ্ত প্রণীত

'প্রবাসী', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'যুগান্তর', পণ্ডিত ৺অশোকনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির দ্বারা প্রশংসিত।

মূল্য ছয় আনা।

মহেশ লাইব্রেরী,

২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা।

শুধু সমালোচনায় কী হবে?

জাতিগঠনের দায়িত্ব যে আপনারও।

শহীদ শচীন্দ্রনাথ মিত্রের প্রতিষ্ঠিত

গঠনকর্ম্মের পথনির্দ্দেশক মাসিক পত্রিকা

"সংগঠন"

পড়ে দেখুন—বাঙালী সমাজে গঠনকর্মীরা যে কাজ ক'রে চ'লেছে তার পরিচয়ে আপন পথ খুঁজে নিন্।

সম্পাদিকা: শ্রীঅংশুরাণী মিত্র

প্রাপ্তিস্থান: ৫।২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা—৩

বার্ষিক চাঁদা: ছয় টাকা।

বৈজ্ঞানিক ফলিত-জ্যোতিষ

আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় মতেরই শ্রেষ্ঠতম প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকি। ফলিত-জ্যোতিষ ডাক-যোগে শিক্ষা দেওয়া হয়। সারা জীবনের ঘটনা ৮৲, ১৫৲, ৫০৲; ১ বৎসরের মাসিক ফলাফল ১০৲—২০৲; প্রতি প্রশ্ন ৩৲। জন্মের সময়, স্থান ও তারিখ আবশ্যকীয়। গণনার ফল ভিঃ পিঃ ডাকে ও "প্রসপেক্টাস্" চাহিলেই প্রেরিত হয়। বিশুদ্ধ "ভৃগু-সংহিতা" হইতেও "রিডিং" সরবরাহ করা হয়। **দি এষ্ট্রলজিকেল ব্যুরো** (প্রফেসর এস, সি, মুখার্জ্জী, এম-এ মহাশয়ের), ইং ১৮৯২ সালে স্থাপিত।

বর্ত্তমান পূর্ণ ঠিকানা :—THE ASTROLOGICAL BUREAU (of Prof. S. C. Mukherjee. M. A.) Benares—1, U. P.

নির্ভরযোগ্য হাতঘড়ি

সব ঘড়িগুলিই যথার্থ লেভার মিকানিজমযুক্ত উচ্চ ধরণের সুইচ্ কারুশিল্পজাত।

[৫ পাঁচ বৎসরের গ্যারাণ্টি]

ঘড়িগুলি ঠিক চিত্রে প্রদর্শিত নমুনানুযায়ী

৫ জুয়েল ক্রোম-কেইস ২৮৲, ঐ রোল্ড গোল্ড ৩৮৲, ক্রোম কেইসযুক্ত ঘড়ি ১৮৲, কেন্দ্র সেকেণ্ডের কাঁটা-সহ ক্রোম কেইসের ঘড়ি ২০৲, সোনালি রঙের কেইসযুক্ত ঘড়ি ২৫৲ টাকা। মূল্য: কলিকাতা ও বোম্বাই মার্কেট অপেক্ষা আমাদের ঘড়ির মূল্য প্রত্যেকটি ৫৲ হইতে ১০৲ হিসাবে কম, কারণ আমাদের দোকান খরচা তুলনায় খুবই নগণ্য। সচিত্র ক্যাটালগের জন্য ৵০ তিন আনার ষ্ট্যাম্প প্রেরণ করুন।

সুপিরিয়র ওয়াচ কোং—নং ১০, পোঃ ঝরিয়া, (হাজারিবাগ)।

প্রথিতযশা লেখিকা শ্রীশান্তা দেবীর

নূতন গল্পের বই **পথের দেখা**—মূল্য ১।০

শ্রেষ্ঠ উপন্যাস **অলখ ঝোরা**—মূল্য ৩৲

সিঁথির সিঁদুর—মূল্য ১।০

শ্রীশান্তা দেবী ও শ্রীসীতা দেবীর

সুবিখ্যাত গল্পের বই

হিন্দুস্থানী উপকথা (সচিত্র) মূল্য ৩৲

শিশুপাঠ্য সচিত্র **সাতরাজার ধন**—মূল্য ২৲

প্রাপ্তিস্থান—পি ২৬, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা।

ভারতের সুপ্রসিদ্ধ জুয়েলার্স

নূতন ক্যাটালগ

বাহির হইয়াছে

মহাত্মা গান্ধী :—"আমি স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরীর নানা প্রকার শিল্পকার্য্য দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বড়ই সুখের বিষয় যে দেশীয় শিল্পের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ভগবানের নিকট আমি ইহাদের সর্ব্বোন্নতি কামনা করি।" খাঁটি গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

হজমের ব্যতিক্রম হইলে পাকস্থলীকে বেশী কাজ করান উচিত নহে। যাহাতে পাকস্থলী কিছু বিশ্রাম পায় সেরূপ কার্য্যই করা উচিত। ডায়াপেপসিন খাদ্যের সারাংশ শরীরে গ্রহণ করিতে সাহায্য করিবে। ডায়াপেপসিন ঠিক ঔষধ নহে, দুর্ব্বল পাকস্থলীর একটি প্রধান সহায় মাত্র।

পাকস্থলীর অভ্যন্তর হইতে জারক রস নিঃসৃত হয়, এই রস খাদ্যের সহিত মিশিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা খাদ্য পরিপাক করে। ডায়াপেপসিন সেই রসেরই অনুরূপ। ডায়াপেপসিন অতি সহজেই খাদ্য হজম করাইয়া দিবে ও শরীরে বল আসিলেই আপনা হইতেই হজম করিবার শক্তি ফিরিয়া আসিবে।

ডায়াস্টেস্ ও পেপসিন্ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংমিশ্রণ করিয়া ডায়াপেপসিন্ প্রস্তুত করা হইয়াছে। খাদ্য জীর্ণ করিতে ডায়াস্টেস্ ও পেপসিন্ দুইটি প্রধান এবং অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। খাদ্যের সহিত চা-চামচের এক চামচ খাইলে পাকস্থলীর কার্য্য অনেক লঘু হইয়া যায় এবং খাদ্যের সবটুকু সারাংশই শরীর গ্রহণ করে।

ইউনিয়ন ড্রাগ—কলিকাতা

জলসা

আবির্ভাব : ২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ সাল, ৭ই মে, ১৮৬১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	তিরোভাব : ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ সাল ৭ই আগষ্ট, ১৯৪১

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫০শ ভাগ ১ম খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির ভবিষ্যৎ

নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি স্বাক্ষরের পর মাসাধিককাল অতিবাহিত হইয়াছে। চুক্তি কার্য্যে পরিণত করা এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। ইতিমধ্যে ভারত ও পাকিস্থানের সাংবাদিকেরা মিলিত হইয়া আলাপ আলোচনা করিয়াছেন, একটা বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য অনেকের আগ্রহ দেখা যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের জনমত প্রকাশ্যভাবে এখনও চুক্তির বিরুদ্ধে কারণ পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুর উপর ন্যায় বিচারের আশা এখনও ফেরে নাই, এখানকার সংবাদপত্রে এই মনোভাবই প্রতিফলিত হইতেছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সংবাদপত্রসমূহ চুক্তি সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গ উহা করে নাই বলিয়া আমাদের কতকটা বিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে এরূপ একটা ধারণা এই প্রদেশের ভিতরে ও বাহিরে জন্মিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বাস্তত্যাগী যাতায়াত আগের তুলনায় বিশেষ কমিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। বাস্তত্যাগ এখনও বেশ চলিতেছে। বাস্তুতে প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে পূর্ব্ববঙ্গে যাওয়ার যে সমস্ত সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বা উহা দ্বারা যাহা বুঝাইবার চেষ্টা হইতেছে বস্তুতঃই তাহা ঘটিতেছে এ কথা বলা যায় না। যথা প্যাক্টের পর পূর্ব্ববঙ্গে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হিন্দু বাস্তুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে—বলা হইতেছে; ইহা ঠিক নয় বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। ইহাদের অধিকাংশই ঘর দুয়ারের বিলি-ব্যবস্থা করিতে যাইতেছে কি না তাহা স্পষ্ট নয়। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গ হইতে কতক বাস্তত্যাগী যাইতেছে বটে, কিন্তু মুসলমানেরা অনেকে ফিরিয়াও আসিতেছে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল লইবার জন্য পুলিশের সাহায্য লইতেছে। এই দখল দান লইয়া তিক্ততারও সৃষ্টি হইতেছে। এ বিষয়ে এই কথাটি বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার যে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের বাস্তুতে প্রত্যাবর্ত্তন স্থায়ী হওয়া সম্ভব হইবে না, যদি না পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা অনুরূপ ভাবে ফিরিয়া যাইতে পারে। একথা বাস্তবের দিক দিয়াই আমরা বলিতেছি।

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুতে প্রত্যাবর্ত্তন পাকিস্থানী শাসনযন্ত্রের উপর তাহার আস্থা ফিরিয়া আসার উপর নির্ভর করে। পাকিস্থানী উচ্চতম কর্তৃপক্ষের মনে চুক্তি কার্য্যকরী করিবার সদিচ্ছা আন্তরিক ভাবে জাগিয়াছে, ইহা আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান হইতেও আমরা বলিতে পারি, কিন্তু প্রশ্ন এই যে যাহারা দেশের মুসলমান জনতাকে অল্প দিন আগেও নাচাইয়াছিলেন এখন তাঁহারা তাহাদিগকে সংযত রাখিতে পারিবেন কিনা? যে সমস্ত এলাকা একেবারে হিন্দুশূন্য হইয়াছে সেগুলিতে অনুসন্ধান করিলে কি কি কারণে হিন্দুরা বাস্তত্যাগে বাধ্য হয় তাহা বুঝা যাইবে; তখন প্রতিকারের পথ বাহির করা সহজ হইবে। কোন কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা কঠোর হস্তে রক্ষিত হইয়াছে। ইঁহাদিগকে বাছিয়া, বিশেষ উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে পাঠাইয়া পুনর্বসতির দায়িত্ব দিয়া নিজেদের ইচ্ছামত কর্ম্মচারী লইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনার স্বাধীনতা দিলে অনেক সুফল হইতে পারে।

পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের চীফ হুইপ শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গে আস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইলে তিনটি কার্য্য করা দরকার। প্রথমতঃ কম্যুনিষ্ট ছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দিতে

হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সব গৃহ গবর্ণমেণ্ট রিকুইজিশন করিয়াছেন তার শতকরা অন্ততঃ ৫০টি অবিলম্বে মালিকদের ফিরাইয়া দিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের যে সব বন্দুক গবর্ণমেণ্ট কাড়িয়া লইয়াছেন তাহা অবিলম্বে ফেরত দিতে হইবে। মনোভাব পরিবর্ত্তনের যৎসামান্য প্রমাণ হিসাবে এই তিনটি কাজ অগৌণে করিতে পারিলে হিন্দুর মনে একটুখানি ভরসা জাগিতে পারে। গোবিন্দ বাবু আরও বলিয়াছেন যে রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম পৃথক বলিয়া পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী যখন স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তখন আর রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান স্বীকার করা উচিত নহে। চুক্তি কার্য্যকরী করিবার ইচ্ছা আন্তরিক হইলে উপরোক্ত তিনটি কাজ অল্পদিনের মধ্যে করিতে অসম্মত হওয়ার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এখনও ডাকাতি প্রভৃতির উদ্বেগজনক সংবাদ আসিতেছে। কথা উঠিতে পারে যে পূর্ব্ববঙ্গের কতকগুলি জেলায় বরাবরই ডাকাতি খুন প্রভৃতি বেশী হইত, ইহাতে অস্বাভাবিক কিছু নাই। কিন্তু ইহার আর একটা দিক আছে। এতদিন ডাকাতির সময় বাড়ীর মালিক ধনী কিনা শুধু তাহাই দেখা হইত; রায়বাহাদুরের বাড়ীতে যেমন ডাকাত পড়িত খাঁবাহাদুরও তেমনি আক্রমণ হইতে রেহাই পাইতেন না। এখন কেবলই রায়বাহাদুরের বাড়ীতেই ডাকাত পড়ে এটা ভাল লক্ষণ নয়। খাঁবাহাদুরের বাড়ীতেও ডাকাত পড়িয়া ডাকাতিতে সাম্প্রদায়িক হার বজায় থাকুক এ কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, খাঁবাহাদুরের বাড়ীতে যে নিরাপত্তা আছে রায় বাহাদুরের বাড়ীতেও তাহা ফিরিয়া আসুক ইহাই আমরা দেখিতে চাই।

চুক্তির সাফল্য সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের পুনর্ব্বসতি সম্পূর্ণ না হইলে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের পুনর্ব্বসতি কিছুতেই সফল হইতে পারে না। এখানকার গবর্ণমেণ্টের সকল চেষ্টা পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের চেষ্টার সাফল্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের জনতার উপর কতটা শাসন রাখিতে পারিবেন এবং হিন্দুদের মনে কতটা আস্থা ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন তার উপর চুক্তির ফলাফল বুঝা যাইবে।

বাস্তুত্যাগী হিন্দুদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে বাস্তু ছাড়িয়া অনিশ্চিতের মুখে ঝাঁপ দেওয়ার আগে শেষ একবার বাস্তুরক্ষার চেষ্টা করিয়া দেখা কি উচিত নয়? তাঁহাদের নেতৃবর্গ যাহাই বলুন, আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে তাহারা যাহা হারাইয়া আসিতেছেন তাহার শতাংশের একাংশও এখানে পাওয়া যাইবে না। পিতৃপিতামহের ভিটা কেহ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া স্ত্রীপুত্রকন্যার হাত ধরিয়া নিরুদ্দেশের যাত্রী হয় না ইহা আমরা বুঝি; কিন্তু সেই পিতৃকুলের পৌরুষ স্মরণ করিয়া বাস্তু রক্ষার একটা চরম চেষ্টা করাও দরকার এটাও আমরা মনে করি। মেয়েদের পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গ নিরাপদ নয় বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা স্ত্রীলোক, শিশু এবং অথর্ব্বদের বাদ দিয়া সবল ও সুস্থদেহ পরিজনবর্গ লইয়া ফিরিয়া যাইতে এবং দৃঢ়চিত্তে বাস্তু রক্ষার চেষ্টা করিতে কি পারেন না? চুক্তির ফলে আর কিছু না হউক অন্তত পক্ষে যে আট নয় মাস সময় পাওয়া গিয়াছে তার মধ্যে এই চেষ্টা একবার করিয়া দেখা অসম্ভব কার্য্য নয়। চুক্তি যদি ব্যর্থ হইবারই হয় তো হউক, কিন্তু তৎপূর্ব্বে চুক্তির ফলে বাস্তুরক্ষার কোন সুযোগ যদি আসিয়া থাকে তবে সেটাও গ্রহণ করিবার পক্ষে কি বাধা থাকিতে পারে? বহু বাস্তুহারা চতুর রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়ী ভাগ্যান্বেষীর পাল্লায় পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন; যে সামান্য শেষ সম্বল তাঁহাদের হাতে ছিল তাহাও নষ্ট হইতেছে। এই যেখানে অবস্থা সেখানে বীরের ন্যায় বাস্তুরক্ষার শেষ চেষ্টা করার প্রচুর মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি। চুক্তি রক্ষায় পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের আন্তরিকতা আর দুই একমাসের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে বুঝা যাইবে, কিন্তু আমাদের যাহা করণীয় আছে তাহা করিবার এবং চুক্তির যেটুকু সুযোগ আমরা লইতে পারি তাহা লইবার চেষ্টাটুকু করিতেও কি আমরা বিরত থাকিব?

চুক্তি ও সংবাদপত্র

চুক্তির সাফল্যসাধনে সংবাদপত্রের দায়িত্ব লইয়া প্রচুর আলোচনা গত এক মাসে হইয়াছে, এখনও হইতেছে। ভারত ও পাকিস্থানের সংবাদপত্র সম্মেলনের যুক্ত বৈঠক দিল্লীতে হইয়া গিয়াছে। সেখানে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব পাশ হইয়াছে যে উভয় দেশের সংবাদপত্রসমূহ সংবাদ প্রকাশ ও মন্তব্য লিখিবার সময় এমন ভাবে লক্ষ্য রাখিবেন যাহাতে চুক্তির সাফল্য বাধাপ্রাপ্ত না হয়। বাস্তুত্যাগের ন্যায় দুঃখজনক ঘটনাকে রাজনৈতিক মূলধন করা উচিত নয় ইহা আমরাও মনে করি। কিন্তু চুক্তি সফল করিবার ক্ষমতা সংবাদপত্রেরা রাখে ইহা মনে করা ভুল। উভয় রাষ্ট্রের যে কোন এক পক্ষ চুক্তির ধারাসমূহ কার্য্যক্ষেত্রে যদি প্রয়োগ না করে তবে ঐ দেশের সংবাদপত্রে চুক্তির সহস্র স্তুতিবাদেও চুক্তি সাফল্যের পথে অগ্রসর হইবে না। চুক্তি সফল করিবার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের। সংবাদপত্রসমূহ তাহাতে অনেকটা সাহায্য করিতে পারেন এবং আশা করি তাহা করিবেন। সমস্ত দায়িত্ব তাঁহাদের উপর চাপাইবার চেষ্টা করা ভুল। চুক্তি ব্যর্থ করার কথা আলাদা।

অবশ্য একথা আমরা বলিতেছি না যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রের দায়িত্ব নাই বা উহা সীমাবদ্ধ। আমরা বরং বলিব যে, সংবাদপত্রের সম্পাদক ও পরিচালকদিগের উপর

এখন অন্য নানারূপে বিষম দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় কেবলমাত্র জনমতের প্রতিচ্ছায়া অঙ্কন এবং দেশের ও বিদেশের ঘটনাবলীর ফিরিস্তি মোটামুটি সঠিক প্রদর্শন, ইহাতেই সম্পাদকের বা চালকের দায়িত্ব শেষ হয় না একথা বলা বাহুল্য। জনমতকে সকল সময় ও সকল অবস্থায় ঠিক পথে চালাইয়া লওয়ায় সংবাদপত্রের হাত খুব বেশী থাকে। আজিকার দিনে যে কোন ঘটনাই নিপুণ সাংবাদিকের হাতে পরিবর্তিত, বিকৃত বা অতিরঞ্জিত হওয়া সম্ভব এবং বর্তমান পরিবেশে ঐরূপ অদলবদলের ফলে জনমত উদ্বেলিত হইয়া বিপথে চলিতে পারে। এইরূপ স্থলে সম্পাদকের সহজ পথ হইল বিক্ষুব্ধ জনমতকে সমর্থন করিয়া এবং বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করিয়া দিনগত পাপক্ষয় করা। অন্যদিকে কঠোর দায়িত্বজ্ঞানের পথ হইল জনমতের গতি পরিবর্তনের চেষ্টা করায়,—অবস্থা যতই বিরূপ হউক বা জনমত যতই উত্তেজিত হউক,—এবং সংবাদ পরিবেশনে সত্যাসত্যের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখায়।

আজ একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে বাস্তুত্যাগী দুঃখীর দল রাজনৈতিক দাবাবড়ের ছকে খেলার ঘুঁটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উভয় দিকের মুষ্টিমেয় কতকগুলি চতুর লোক ইহাদের লইয়া এখনও বড়ের চাল চালিতেছেন। এই অভাগা-দের নানা লোকে নানা ফন্দি দিয়া বিভ্রান্ত করিতেছে যাহার ফলে তাহাদের দুর্দশার অবসান হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। মাঝখান হইতে একদল প্রতারক মেকী বাস্তু-হারা নিজেদের কাজ গুছাইয়া লইতেছে। দেশের সমস্ত অর্থ-নৈতিক কাঠামো এইরূপে চতুর্দিক হইতে চাপ পড়িবার ফলে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের হাস-পাতালের দুয়ারে রোগী বিনা চিকিৎসায় মরিতেছে, স্কুলের শিক্ষক বেতনের অভাবে পীড়িত এবং দেশবাসী প্রতিপদে সরকারী সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। এ সবই দেশের লোক সহিতেছে মানবতার নামে এবং দুঃখীর সমবেদনায়। কিন্তু আজ দেশে একথা ক্রমেই লোকমুখে প্রচারিত হইতেছে যে দেশবাসী নিজেকে বঞ্চিত করিয়া এবং নিজের পুত্রকন্যার ভবিষ্যৎ ভুলিয়া যে অর্থ, যে সম্বিৎ আর্তের ত্রাণের জন্য দিতেছে তাহার বিরাট অংশ অপচয় হইতেছে এবং অযোগ্য লোকের ভোগে যাইতেছে, উপরন্তু একদল প্রবঞ্চক বাস্তু-হারার নাম করিয়া দেশবাসীর সম্পত্তি গ্রাসে উদ্যত হইয়াছে। আমরা এইসব কথা মনগড়া লিখিতেছি না, আমাদের গ্রাহক ও পাঠকদিগের নিকট হইতে প্রায়ই যেরূপ পত্র পাইতেছি—যাহাতে আমাদের উপর অযথা আক্রোশও মাঝে মাঝে দেখা যায়—তাহারই ভিত্তির উপর ইহা লিখিতেছি। এরূপ সন্দেহ দেশের লোকের মনে জাগিলে তাহার কি বিষময় ফল ফলিতে পারে তাহা বলা বাহুল্য। আজ আসামে, বিহারে, উড়িষ্যায় যে বাঙালী বিরোধ দেখা দিয়াছে তাহারই আর এক পর্য্যায় কি ভ্রাতৃবিরোধরূপে শেষে পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিবে? উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত বাস্তুহারার একথা ভাবিবার অবসর নাই, ফন্দিবাজ নকল নেতার পক্ষে একথা ভাবাই স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায়, কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সাংবাদিকদের এ বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।

এইরূপ পরিবেশের মধ্যে আসিয়াছে নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি! সাংবাদিকের পথে কাঁকরের উপর কাঁটা। চুক্তি যদি সফল হয় তবে তো ভালই। স্বস্তি-শান্তি কে না চাহে? কিন্তু সে সাফল্যের লক্ষণ কোথায় দেখা দিয়াছে? এখনও বিভক্ত বাংলাদেশের দুই ভাগেই বাস্তুহারার আর্তনাদ সমানেই চলিয়াছে এবং দুই দিকেই বে-দখল সম্পত্তি লইয়া সমান বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতেছে।

কিন্তু চুক্তি অগ্রাহ্য করাও ত এখন বাস্তবের ক্ষেত্রে সম্ভব-পর হইতেছে না। বাংলাব্যতীত সমগ্র ভারত ইহাকে মহা-সমারোহে গ্রহণ করিয়াছে। এখন চুক্তি অগ্রাহ্য করার অর্থ বাংলাবর্জ্জিত সমগ্র ভারতের জনমতকে অগ্রাহ্য করা। সমস্যা অতি কঠিন, স্থিরবুদ্ধিতে এবং অটলচিত্তে আমাদের পথ খুঁজিয়া লইতে হইবে। অনেকে ভাবের আবেগে অস্থির মন লইয়া বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া এখন পাকিস্থানের উপরে যে ক্রোধ তাহা প্রাদেশিক সরকারের উপর চালাইতেছেন। তাঁহাদের প্রতি আমাদের নিবেদন এইমাত্র যে যদি তাঁহারা রাষ্ট্রবিপ্লবের পথেই চলিতে চাহেন তবে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্যপন্থা স্থির করুন। সময় যখন আসিবে তখন সঙ্গীই বা কে থাকিবে তাহাও তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা

ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য তাহাদিগকে অন্যান্য রাজ্যে পাঠাইতেছেন। এই সহজ পন্থা অবলম্বন করিলে ভবিষ্যতে অন্য একটি সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে। জাতির ভাষার সমস্যা দেখা দিবে, যেমন পঞ্চাশ ও এক শত বৎসর বাংলাদেশে থাকিয়াও অ-বাঙালী পঞ্চাশ লক্ষ লোক নিজেদের ভাষা ও আচার-আচরণে নিষ্ঠাবান হইয়া আছেন। ভবিষ্যতের এই বিপদের হাত হইতে মুক্তির উপায়রূপে কাছাড় কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্র পুরকায়স্থ একটি প্রস্তাব করিয়াছেন যাহা কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবটি ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য—

"...আসামকে রক্ষা করিতে হইলে সীমান্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রের অনুগত লোকদের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি

করা একান্ত প্রয়োজন। পূর্ব্ববঙ্গাগত হিন্দুদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিয়া, আসামের শোচনীয় দুরবস্থার প্রতিকার করা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে আসামের বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর উদাসীনতা সর্ব্বজনবিদিত। কেন্দ্রীয় সরকার যদি পুনর্বসতির ভার নেন, তবেই আসামের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দৃঢ় ও উন্নত হইতে পারে। আসামের বর্ত্তমান পরিমাপ (মণিপুর ও খাসিয়া রাজ্যসমূহসহ) ৬৬,১৪৩ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৮৬,০৯,০২৬। এই হিসাবে আসামে প্রতি বর্গমাইলের ১,২৮৯ জন লোকের বাস। আসামের প্রতিবর্গ মাইলের জনবসতির পরিমাণ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কত তাহা নিম্নোক্ত হিসাব হইতে বুঝা যায় :

প্রদেশের নাম	প্রতি বর্গমাইলে জনবসতি
পশ্চিমবঙ্গ	৮৪৮
বিহার	৫২১
উড়িষ্যা	২৭১
আসাম	১২৮.৯

যদি আসামে আরও পঞ্চাশ লক্ষ লোকের আমদানী করা হয়, তবে প্রতি বর্গমাইলে জনবসতির পরিমাণ ২০০ এবং যদি এক কোটি লোকেরও পুনর্বসতি করান হয়, তবে জনবসতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ২৭৮.৭। আসাম পর্ব্বতপূর্ণ প্রদেশ। এই অবস্থায় পঞ্চাশ লক্ষ লোককে আসামে অনায়াসেই স্থান দেওয়া যাইতে পারে। উত্তর কাছাড়ের জনবসতি প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ২০। এইখানে অন্ততঃ ৪।৫ লক্ষ লোকের বসবাসের ব্যবস্থা হইতে পারে।

আসামের পশ্চিম সীমান্তে লুসাই পাহাড়, কাছাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়, গারো পাহাড়, গোয়ালপাড়া, মণিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্য লইয়া আসাম সীমান্তে একটি নূতন প্রদেশও গঠন করা যাইতে পারে। আসাম সরকার বাঙালী গ্রহণের বিশেষ পক্ষপাতী নহেন, অথচ তাঁহারা প্রদেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করিতেও পারিতেছেন না। এই অবস্থায় কথিত অঞ্চলগুলি লইয়া আসাম ও পূর্ব্ববাংলার সীমান্তে একটি নূতন প্রদেশ গঠন করিয়া, ভারতের পূর্ব্ব সীমান্ত সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা অতি সহজেই করা যাইতে পারে। এই নূতন প্রদেশের পরিমাণ ৪৩,০৪৭ বর্গমাইল এবং বর্ত্তমান জনসংখ্যা ৩৮,৬১,২২২। এই প্রদেশের নূতন ৫০ লক্ষ লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিলে প্রতি বর্গমাইলে জনবসতি ২০৬-এ দাঁড়াইবে। এই প্রদেশ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন থাকিতে পারে। নবগঠিত প্রদেশের আয় প্রায় দুই কোটি টাকা হইবে। প্রদেশের অগণিত বনজ সম্পদের সদ্ব্যবহার ও বিস্তীর্ণ অনাবাদী অঞ্চলসমূহে শস্যোৎপাদনের ব্যবস্থা দ্বারা শুধু প্রদেশেরই উপকার হইবে তাহা নহে, ভারতের খাদ্য-সমস্যা সমাধানের ব্যাপারেও অনেকটা সহায়তা হইবে।"

পূর্ব্বাচল প্রদেশ গঠনের প্রস্তাবটি নূতন নয়। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তদুপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তার পর কি হইল বুঝিলাম না। "বদ্‌লে গেল মতটা"!

আসামে বাঙালী স্কুল তুলিয়া দেওয়ার দাবি

শিলচরের 'জনশক্তি' পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে :

"নওগাঁর জুবিলী মাঠে শ্রীহলধর ভূঞা এম-এল-এ'র সভাপতিত্বে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আসাম জাতীয় মহাসভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী তাঁহার চিরাচরিত পন্থায় আসামবাসী বাঙ্গালীদের উপর বেশ এক হাত লইয়াছেন। আসামে পূর্ব্বপাকিস্থান হইতে দুর্গত মানুষের আগমনের মধ্যে তিনি আসামকে বৃহত্তর বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তৎসম্পর্কে অসমীয়াদের ঐক্যবদ্ধ হইবার আবেদন করিয়াছেন ও আসামে বসবাসের জন্য বাঙালীদের উপর কয়েকটি সর্ত্ত আরোপ করিয়াছেন। একবার তিনি বলিয়াছেন এত লোককে জায়গা দিবার মত ভূমি আসামে নাই, আবার বলিয়াছেন—অসমীয়া কৃষ্টি ও ভাষাকে স্বীকার করিয়া লইলে তাহারা এখানে থাকিতে পারে। তিনি বলেন, 'বহুদিন হইতেই এখানে বহু বাঙালী আসিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মনে এই দুরভিসন্ধি আছে যে এখানে তাহারা বৃহত্তর বঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবে। এই উদ্দেশ্যেই তাহারা এখানে বাঙালী স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিতেছে। কিন্তু এখানে বাঙালী স্কুল থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। বাঙালীদিগকে অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিতে হইবে। এক মাত্র অসমীয়া ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষালাভ করিতে হইবে, নতুবা তাহাদিগকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্ব্বসতি সম্পর্কে আসামে জমি না থাকার ও ভূমিহীন ব্যক্তিদের দাবির অগ্রাধিকারের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, তাহাদিগকে (উদ্বাস্তু) জমি দিবার পূর্ব্বে গবর্মেন্টকে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়া লইতে হইবে তাহারা আপনাদিগকে অসমীয়া বলিয়া পরিচয় দেয় কিনা, অসমীয়া ভাষা ও কৃষ্টি তাহারা গ্রহণ করিবে কিনা।' শ্রীরায়চৌধুরী আরও বলেন, "আসামবাসী পুরাতন বাঙালীরা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আশ্রয়প্রার্থীদিগকে আহ্বান করিয়া আনিতেছেন, যাহাতে আসামে বাঙালীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয়। তাহা হইলে তাহাদের বৃহত্তর বাংলা সৃষ্টির স্বপ্ন সার্থক হইবে।" অতঃপর অসমীয়ারা বাঙালীর এই হীন ষড়যন্ত্র কখনও বরদাস্ত করিবে

না এবং বাঙালীরা চিরদিন অশান্তি সৃষ্টিকারী ও স্বার্থপর প্রভৃতি উক্তি করিয়া অসমীয়াকে অবিলম্বে আসামের রাষ্ট্র-ভাষারূপে ঘোষণা করার দাবি জানান এবং বাঙালীদের শাসাইয়া বলেন, আমি এই শেষবার বাঙালীদিগকে বলিতেছি তাহারা অবিলম্বে বাঙালী স্কুল উঠাইয়া দিয়া অসমীয়া ভাষা গ্রহণ করুক, নিজেদের অসমীয়া বলিয়া পরিচয় দিক; নতুবা অসমীয়া জাতি কিছুতেই সহ্য করিবে না। তাহারা ইহার প্রতিবিধানে আজ বদ্ধপরিকর।

শ্রীমলিন বরা নামে অপর এক বক্তা সুর আরও চড়াইয়া বলেন, 'কোন বাঙালী আজ পর্য্যন্ত অসমীয়া ভাষা গ্রহণ করেন নাই—কোন বাঙালী স্ত্রীলোক আজ পর্য্যন্ত অসমীয়া স্ত্রীলোকের মত 'মেখলা' পরিধান করেন নাই।'

অতঃপর বক্তা বলেন, যদি তিন মাসের মধ্যে বাঙালী স্কুল উঠাইয়া না দেওয়া হয়, যদি বাঙালীরা অসমীয়া ভাষা গ্রহণ না করে, যদি বাঙালী মেয়েরা 'মেখলা' পরিধান না করেন, তবে যে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিবে, তাহা প্রাদেশিক সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারও দমন করিতে পারিবেন না।"

আসামে বাঙালী বিদ্বেষ প্রচারে আসাম জাতীয় মহাসভার নেতৃত্ব এবং উহার সভাপতি শ্রীঅম্বিকা গিরি রায় চৌধুরীর প্রচারকার্য্য সুবিদিত। এই শ্রেণীর প্রাদেশিক বিদ্বেষ প্রচার আইনের সাহায্যে বন্ধ করা কঠিন, উহা বাঞ্ছনীয়ও নয়। প্রদেশের প্রকৃত জাতীয়তাবাদী শিক্ষিতদের, বিশেষতঃ সরকারী এবং বেসরকারী নেতৃস্থানীয় লোকদের সক্রিয় প্রতিবাদ এবং আন্তরিক প্রচারকার্য্য এই শ্রেণীর বিষোদ্গার বন্ধ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। দুঃখের বিষয়, আসামে তাহা হইতেছে না; সেখানে শিক্ষিত জনমত এবং নেতৃস্থানীয় লোকদের পরোক্ষ সমর্থন জাতীয় মহাসভার পিছনে রহিয়াছে ইহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে আসাম নিজে—ইহাও প্রাদেশিকতায় অন্ধ অসমীয়ারা বুঝিতে চাহিতেছেন না। বাঙালী বিদ্বেষের জন্য গণভোটে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া শ্রীহট্টকে পাকিস্থানে ঠেলিয়া দেওয়ার ফলে আসামের সমৃদ্ধির যে অনিষ্ট হইয়াছে তাহা ধরা পড়িতেছে, কিন্তু অনুশোচনার কোন লক্ষণ এখনও দেখা যায় না। এখনও আসাম পাকিস্থানীদের ডাকিয়া লইয়া আসামকে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিবার পথ পরিষ্কার করিতেও রাজী, তবু বাঙালী হিন্দুকে তাহারা স্থান দিতে চায় না। বাঙালী আসামে শোষণ করিতে যায় নাই, আসামের চা বাগানের ইংরেজ ও মাড়োয়ারীদের সঙ্গে তাহাদের কোন তুলনা হয় না। বাঙালীরা অসমীয়াদের সঙ্গে অসমীয়া ভাষাতেই কথা বলে, অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা স্থানীয় ভাষা শিখিয়া লয়; অসমীয়ারা কখনো বাঙালীদের সঙ্গে বাংলা বা ইংরেজীতে কথা বলে না। আসামের উন্নতিকর বহু কার্য্যে বহু বাঙালীর দান আছে। শিক্ষা বিস্তার এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে আসাম বাঙালীদের নিকট কম উপকৃত নহে। শোষণ যদি কেহ করিতে চায় তাহা সর্ব্বক্ষেত্রে নিন্দনীয়, আইন করিয়া শোষণের রাস্তা বন্ধ করিবার এবং শোষককে কঠোর শাস্তি দিবার অধিকার প্রত্যেক প্রদেশের এখন আছে। কিন্তু আসাম-প্রবাসী বাঙালীকে বাংলা ভাষা ভুলিতে হইবে, বাংলা স্কুল তুলিয়া দিতে হইবে, বাঙালী মেয়েদের নিজস্ব পোশাক ছাড়িয়া অসমীয়া পোশাক পরিতে হইবে এই সমস্ত দাবি অন্যায়।

শিলং-শিলচর রাস্তা নির্ম্মাণে সাধারণের অর্থ অপচয়

ভারতের সহকারী রেলওয়ে সচিব শ্রীযুক্ত শান্তনম পার্লামেন্টে আসাম গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে অর্থ অপচয়ের যে অভিযোগ করিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে নয়াদিল্লীর ভারত-সরকারের রাস্তা নির্ম্মাণের কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ারের নিকট কাছাড় কণ্ট্রাক্টর এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক লিখিত এক পত্রে আরও তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। পত্রটি করিমগঞ্জের "পূর্ব্বাচল" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত পত্রে এসোসিয়েশন বলেন, ১৯৪৮ সালের মে মাসে শিলং-শিলচর রাস্তার কাজ আরম্ভ হয়। পরবর্ত্তী সালের মার্চ্চ বা এপ্রিল মাসে রাস্তার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্তু আদতে ইহা সত্য নহে। এই ঘোষণার কারণ আজও অজ্ঞাত।

এই কাজ প্রারম্ভে একজন এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের তত্ত্বাবধানে ছিল; কিন্তু পরে ইহার পরিবর্ত্তন করিয়া এমন লোকের হাতে ন্যস্ত করা হয় যাহাদের ইঞ্জিনীয়ারিঙের কোন ডিগ্রি ছিল না। এইরূপ অনভিজ্ঞ লোকের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষ এই জাতীয় দুর্গম পাহাড়ীয়া রাস্তার কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা কত দূর সমীচীন হইয়াছিল, তাহা ভাবিবার বিষয়।

এসোসিয়েশন বলেন যে, শিলচর সীমা হইতে প্রথম সাত মাইলের কাজ ১৯৪৮ সালের শেষ ভাগে শেষ হয়। এর পর ১৯৪৯ সালে পরবর্ত্তী মাইলগুলির কাজ আরম্ভ হয় এবং মাস-খানেক চলার পর তৎকালীন নূতন এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার হঠাৎ কাজ বন্ধ করিয়া দেন। তিনি পুনরায় কাজের পুনর্ব্বণ্টন আরম্ভ করেন। ফলে বহু পুরাতন কণ্ট্রাক্টারকে কাজ হারাইতে হয়। তৎপর তিনি রাস্তার গতি পরিবর্ত্তন করেন। ইহার ফলে, পূর্ব্ব তৈরি রাস্তার একটা বড় অংশ পরিত্যক্ত হয়। ইহার দরুন কণ্ট্রাক্টারদের পূর্ব্বের তৈরি অস্থায়ী গৃহ-গুলি পরিত্যাগ করিয়া নূতন লাইনে নূতন করিয়া গৃহ প্রস্তুত

করিতে এবং পূর্ব্ব স্থান হইতে নূতন স্থানে যন্ত্রপাতি ও খাদ্য-দ্রব্য বহু টাকা ব্যয়ে আনাইতে হয়। এই অব্যবস্থার ফলে বহু পুরাতন মজুর (যাহাদিগকে মোটা টাকা আগাম প্রদত্ত হইয়াছিল) স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এইসব কার্য্য-মূলে কণ্ট্রাক্টারদিগকে সমূহ ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের এই সব খাম-খেয়ালীপূর্ণ কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করার জন্য চীফ বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার কেহই আসেন নাই। এখন জানা যায় যে, তাঁহারা এইসব পরিবর্ত্তন সম্পর্কে কিছুই জানিতেন না।

এসোসিয়েশন আরও বলেন যে, এরপর হইতেই এক্‌জি-কিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক কণ্ট্রাক্টার নির্য্যাতন আরম্ভ হয়। তাঁহার যথেচ্ছাচারিতা এমন চরমে উঠে, যার ফলে কাজ বন্ধ হইবার উপক্রম হয় এবং এই এসোসিয়েশনের এক প্রতি-নিধিমণ্ডলী শিলঙে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের অভিযোগ পেশ করিতে বাধ্য হন। এর পর ঐ সনের মে মাসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার সরেজমিন পরিদর্শন করেন। ইহার পর দীর্ঘদিন অতীত হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাবধি এই সব অভিযোগের কোন প্রতিকার-ব্যবস্থা করা হয় নাই। প্রতিকার করা ত হইলই না, অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষ কণ্ট্রাক্টরদের বিলের টাকা পর্য্যন্ত আটকাইয়া রাখিলেন, এই কার্য্যের কোন কারণও তাঁহারা প্রদর্শন করেন নাই। এসোসিয়েশন বিভাগীয় মন্ত্রী এমন কি প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া ব্যর্থ-কাম হইয়াছেন। তাঁহারা সব নীরবতা অবলম্বন করিয়া আছেন।

এই সব কার্য্যকলাপের দরুন শুধু যে কণ্ট্রাক্টারগণই ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছেন এমন নহে, গবর্ণ্মেণ্টেরও বহু লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

এই সব অভিযোগ করিয়া এসোসিয়েশন বলেন যে, যদি একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া বিভাগীয় কার্য্যকলাপ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে তাঁহারা প্রত্যেকটি অভিযোগ প্রমাণ করিতে সক্ষম হইবেন।

পাকিস্থানের রক্ষার ব্যবস্থা

গত ৩০শে চৈত্র নিউ ইয়র্ক হইতে প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রেরণ করিয়াছিল:

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খান 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার করাচীস্থ সংবাদদাতা মিঃ সুলজ-বার্জারের সহিত সাক্ষাৎকালে ভারত-পাকিস্থান বিরোধ হ্রাস-কল্পে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারত ও পাকিস্থান উভয় দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা হইবে বলিয়া ব্রিটিশ কমনওয়েলথকে সম্মিলিত ভাবে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হইবে। এ ধরণের অঙ্গীকারের একটি ফল হইবে এই যে, উভয় দেশই সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয় হ্রাস করিয়া গঠনমূলক কার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে সমর্থ হইবে। গত বৎসর ব্রিটিশ সরকারের নিকট সরাসরি এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু কোনই ফল হয় নাই।

পাক প্রধান মন্ত্রী আরও বলেন, ব্রিটেন যদি সরকারীভাবে ঘোষণা করে যে, পাক-আফগানিস্থান সীমান্তের ডুরাণ্ড লাইন লঙ্ঘন করিলে কমনওয়েলথের সীমানা লঙ্ঘিত হইয়াছে বলিয়াই গণ্য করা হইবে, তবে উহার ফল নিশ্চয়ই ভাল হইবে।

বর্ত্তমানে জনাব লিয়াকৎ আলী খাঁ যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী অতিথিরূপে সফর করিতেছেন এবং এক সাংবাদিক সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে তাঁহার নিজের রাষ্ট্রের বর্ত্তমান অখণ্ডতা সম্বন্ধে এইরূপ একটা প্রতিশ্রুতির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী তদুপলক্ষে এই কথাও স্বীকার করিয়া-ছেন যে যখন তিনি ব্রিটিশ গবর্ণ্মেণ্টের নিকট তাঁহার প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন, তখন ভারতরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে আক্রমণের আশঙ্কাই তাঁহার মনে সক্রিয় ছিল। আজ যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট অভয়-বাণীর জন্য আবেদন করিয়াছেন, তাহা কোন রাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার আশায়, তাহা উহ্য হইয়া আছে; কারণ জবাহরলাল নেহরু-লিয়াকৎ আলী চুক্তি ত ভারতরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে অভয় বাণী উচ্চারণ করিয়াছে।

কিন্তু একটা কথা আমরা এখনও বুঝিতেছি না। 'বাঘ আসিতেছে, বাঘ আসিতেছে'—এরূপ একটা চীৎকার পাকি-স্তানের প্রধানমন্ত্রী কেন তুলিয়াছেন? ইংরেজ ও মার্কিনী সংবাদপত্রসমূহ যে ভাবে তাহার ভারত-ভীতি উসকাইতেছে, তার কারণ বুঝা কঠিন নয়। এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে একটা রেষারেষি জিয়াইয়া রাখিতে পারিলে, ইঙ্গ-মার্কিনী স্বার্থ এবং সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ অটুট থাকিবে, এই ভরসায় এটলি-ট্রুম্যান যখন-তখন ভারত-পাকিস্তান ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং পাকিস্তানও এই ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় মনে করে বলিয়াই "নিরা-পত্তা"র দরখাস্ত লইয়া এটলি ও ট্রুম্যানের দরবারে উপস্থিত হয়।

এই বিষয়ে এই দুই রাষ্ট্রের বিরোধী সোভিয়েট ইউনিয়নের মতিগতি লক্ষণীয়। ভারত পাকিস্তান বিরোধে তার কোন স্বার্থ নাই এরূপ কথা কেহ বলিতে পারেন না। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্র চুপ করিয়া আছে; মুরুব্বিয়ানা করিতে আসিতেছে না। ইঙ্গ-মার্কিনী প্রচারে বিশ্বাস করিতে গেলে বলিতে হয় যে, আফগানিস্থানকে সম্মুখে রাখিয়া, পাক্‌-তুনিস্থান আন্দোলনে ইন্ধন জোগাইয়া, সোভিয়েট রাষ্ট্র তাহার কাজ গুছাইয়া লইতেছে। আমরা বর্ত্তমানে এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিব না, কেননা ইঙ্গমার্কিনী খেলা দেখিয়া, এশিয়া

মহাদেশের শান্তির জন্য ভুয়া আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া, আমরা আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছি না।

সেলস ট্যাক্স বিভাগের তদন্ত দাবি

সেলস ট্যাক্স পশ্চিমবঙ্গের রাজস্বের একটি প্রধান উপায়। বৎসরাধিককাল যাবৎ এই বিভাগের নানাবিধ গলদ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে অনেক কথা প্রকাশ পাইয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে সেলস ট্যাক্স এড়ানো বিষয়ে অতিশয় গুরুতর অভিযোগও হইয়াছে। সেলস ট্যাক্সকে জনসাধারণ পীড়নমূলক ট্যাক্স বলিয়া গণ্য করে এবং সরকারের উপর লোকের বিরক্তির একটি বড় কারণ এই ট্যাক্স। ইহার উপর এই ট্যাক্স যদি ঠিকমত আদায় না হয় এবং আদায়ে বৈষম্যের অভিযোগ হয় তবে উহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আরও বাড়িতে বাধ্য। সেলস ট্যাক্স হইতে পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হওয়ার কথা, তার চেয়ে অনেক কম আদায় হইতেছে এটা এখন একটি সাধারণ অভিযোগে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহার দুইটি কারণ আছে; প্রথমতঃ, কতকগুলি জিনিষের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা হয় নাই। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে কেবলমাত্র চট ও থলিয়ার উপর ট্যাক্স বসাইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বার্ষিক প্রায় ৬ কোটি আয়বৃদ্ধি হয়। বৎসরে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার চট ও থলিয়া ভারত স্বাধীন হওয়ার পর রপ্তানী হইয়াছে। এই সময়ে উহাদের উপর সেলস ট্যাক্স বসাইলে পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব বরাবরের মত ৬ কোটি টাকা বাড়িয়া যাইত। কারণ নূতন রাষ্ট্রবিধিতে রপ্তানী মালের উপর সেলস ট্যাক্স বসানো নিষিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু ঐ সঙ্গে একথাও বলা হইয়াছে যে, যাহারা আগেই এই ট্যাক্স বসাইয়াছে তাহারা ভারত-সরকারের নিকট হইতে ঐ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রতি বৎসর পাইবে। রপ্তানী মালের উপর সেলস ট্যাক্স বসানো যায় না এই যুক্তি অচল, কারণ মাদ্রাজ চামড়ার, বোম্বাই কাপড়ের এবং বিহার কয়লার উপর সেলস ট্যাক্স অনেক আগেই বসাইয়াছে এবং এই তিনটি ঐ তিন প্রদেশের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। পশ্চিমবঙ্গের ফাইনান্স এবং সেলস ট্যাক্স পলিসি নির্দ্ধারণের ভার যাহাদের হাতে তাঁহাদের দোষে পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক রাজস্ব ৬ কোটি টাকা বাড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাহা বাড়িল না—ইহা ফাইনান্স বিভাগের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা। ইহার পূর্ব্বে আয়করের ভাগ সম্বন্ধেও পশ্চিমবঙ্গের উপর গুরুতর অবিচার হইয়াছে এবং আজও তাহার সংশোধন হয় নাই। বাংলার করদাতারা অবিভক্ত বঙ্গের তুলনায় বর্ত্তমানে বহুগুণ বেশী খরচ ফাইনান্স ও সেলস ট্যাক্স বিভাগের জন্য করিতেছে, অনেক আন্দোলন সত্ত্বেও তাঁহাদের দিয়া রাজস্ব বৃদ্ধির এই উপায়টি অবলম্বন করাইতে পারে নাই ইহা ঐ দুই বিভাগের কর্ত্তাদের কৃতিত্বের পরিচয় নহে।

সেলস ট্যাক্স হইতে বাংলার রাজস্ব আশানুরূপ না হওয়ার দ্বিতীয় কারণ, যে সমস্ত জিনিষের উপর সেলস ট্যাক্স আছে তাহা বহুক্ষেত্রে ঠিকমত আদায় হয় না। ইহার মধ্যে কতটা কর্ম্মচারীদের গাফিলতি এবং কতটা অন্য কারণে অনাদায় থাকে তাহা অনুসন্ধান না করিয়া বলা চলে না। তবে সম্প্রতি এমন অনেক কিছু প্রকাশিত হইয়াছে যাহাতে সন্দেহ হয় যে প্রভাবশালী ধনী ব্যবসায়ীরা স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে সেলস ট্যাক্স এড়াইতে পারিতেছেন। এইভাবে একটা সন্দেহ সাধারণের মনেই জাগিতেছে যে, ফাইনান্স ও সেলস ট্যাক্স বিভাগের কর্ত্তারা রাষ্ট্রের স্বার্থ অপেক্ষা কতকগুলি ধনী ব্যবসায়ীর স্বার্থের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখিতেছেন।

এ সম্বন্ধে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন অবিলম্বে নিযুক্ত হওয়া উচিত। কর্পোরেশনের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গলদ তদন্ত করিবার জন্য তদন্ত কমিশন বসানো হইয়াছে। ইনকাম ট্যাক্স তদন্ত কমিশনও তাঁহাদের প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। কিন্তু যে সেলস ট্যাক্স বিভাগ প্রাদেশিক রাজস্বের একটি বৃহৎ অংশ আদায়ের জন্য দায়ী তাহার অব্যবস্থার তদন্তের জন্য এখনও কোন তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করা হইতেছে না কেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। দেশবাসীর পক্ষ হইয়া আমরা এই দাবি করিতেছি যে, পশ্চিমবঙ্গের সেলস ট্যাক্স বিভাগের কার্য্যকলাপ তদন্তের জন্য অবিলম্বে একজন হাইকোর্ট জজকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করা হউক।

ট্রেণে চলাচল

যশিডির নিকট পঞ্জাব মেলে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ভারতে রেল দুর্ঘটনার ইতিহাসে বিহ্‌টার পর তাহা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘটনা। এই দুর্ঘটনার পর লোকের মনে রেলভ্রমণ সম্বন্ধে আতঙ্ক জন্মিয়াছে, এরোপ্লেনে যাতায়াত রেলভ্রমণ অপেক্ষা নিরাপদ লোকে ইহা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে রেলের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে না।

যশিডির ঘটনা সাবোটাশ ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা উহার যে ফটোগ্রাফ দেখিয়াছি তাহাতে এই বিশ্বাসই দৃঢ় হয়। সাবোটাশ বন্ধ করিবার জন্য গবর্ন্মেণ্টের যতটা তৎপরতা লোকে আশা করে তাহা দেখা যাইতেছে না, ইহা বস্তুতঃ দুঃখের বিষয়। যশিডিতে একটি ইঞ্জিন নষ্ট হইয়াই প্রায় ২২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইল, তার উপর বহু মূল্যবান জীবন হানি হইল, অথচ গবর্ন্মেণ্ট দুষ্কৃতকারীদের ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিলেন মাত্র ১০ হাজার টাকা! এক বা একাধিক লোক এই সমস্ত দুর্বৃত্তদের

ধরিয়া দিতে পারিলে প্রত্যেকে অন্ততঃ ২০ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে এরূপে সর্ব্বসমেত লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা উচিত ছিল। দুর্ঘটনা অধিকাংশই ঘটিতেছে বিহারে। বিহার গবর্ণমেণ্টের উপর কোন দোষারোপ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তাঁহাদের দায়িত্ব কতখানি তাহাই আমরা উল্লেখ করিতে চাই। ভারতবর্ষের রেলপথগুলি পরিদর্শন এবং হিসাব দেখিবার জন্য লর্ড কার্জ্জন রেলওয়ে বোর্ড গঠন করিয়াছিলেন। বোর্ড শেষোক্ত কাজ ভালভাবে করিতেছেন কিন্তু প্রথম কাজটি বাদ গিয়াছে। রেলওয়ে বোর্ডের সদস্যপদ চাকুরী-জীবনের শেষ বয়সের 'প্রাইজ-পোষ্ট' হইয়া দাঁড়াইলে তাহা দেশের পক্ষে শুভ হয় না। রেল পরিচালনায় গলদ যথেষ্ট পরিমাণে হইতেছে এবং সাবোটাশ ছাড়া অন্য দুর্ঘটনার কারণ রেল পরিচালনার গলদ ইহা রেলসচিব আয়েঙ্গার মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন। তিনিই বলিয়াছেন যে মোট দুর্ঘটনার শতকরা মাত্র ১৫টি সাবোটাশ।

আসাম-লিঙ্ক রেলের গুরুত্বও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তের এই রেলপথটির উপর যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইতেছে না। যাত্রী এবং মালচলাচলে প্রচুর ত্রুটি ঘটিতেছে এবং সাধারণের খুব অসুবিধা হইতেছে। উহা দূর করিবার যতটা চেষ্টা হওয়া উচিত এবং সম্ভব তাহা হয় না। অথচ এই আসাম লিঙ্ক রেল ভারতের মূল অংশের সহিত তার দ্বিতীয় বৃহত্তম ডলার উপার্জ্জনকারী ব্যবসাকেন্দ্রকে যুক্ত রাখিয়াছে। চুক্তির ফলে এই রেলপথটির দিকে মনোযোগ কমাইলে তাহার ফল ভাল হইবে না। পশ্চিম বাংলার উত্তর ও দক্ষিণ অংশের সহিত এই লিঙ্ক রেলই একমাত্র সংযোগ এবং উহা বিহারের মধ্য দিয়া গিয়াছে। বিহারের দায়িত্ব এ বিষয়েও খুব বেশী। কেননা মণিহারিঘাটের ওপারে যাত্রী ও মাল দুইয়েরই দুর্গতির চরম ঘটিতেছে।

ষশিডি দুর্ঘটনায় রেল-পরিচালনার যে সমস্ত গলদ ধরা পড়িবে তাহার সবগুলির উপরই এখন হইতে তীব্র দৃষ্টি দিয়া ভারতে রেল-ভ্রমণ নিরাপদ করিবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা হওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে আসাম-লিঙ্ক রেলপথে চলাচলের সুরাহা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অবিলম্বে চাপ দেওয়া প্রয়োজন।

কাশ্মীর বিরোধে মধ্যস্থ

গত ২৯শে চৈত্র সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের কর্ম্মস্থল লেকসাকসেস হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটি পরিবেশিত হইয়াছে :

"অদ্য জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে অষ্ট্রেলিয়ান আইন-বিশারদ স্যার ওয়েন ডিক্সন কাশ্মীর বিরোধে মধ্যস্থ নিযুক্ত হন। স্যার ওয়েনের নিয়োগের অনুকূলে আট জন ভোট দেন। দুইটি রাষ্ট্র—ভারত ও যুগোস্লাভিয়া ভোট-দানে বিরত থাকে। বিপক্ষে কেহই ভোট দেয় নাই। চীনের ব্যাপারের জন্য সোভিয়েট প্রতিনিধি অনুপস্থিত ছিলেন।

গত ১৪ই মার্চ্চ তারিখে নিরাপত্তা পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত প্রস্তাবে স্যার ওয়েন ডিক্সনের করণীয় কার্য্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত নির্দ্দেশ রহিয়াছে :—(১) বিরোধমূলক এলাকার জন্য অসামরিকীকরণ পরিকল্পনা রচনা ও তত্ত্বাবধানে সাহায্য, (২) বিরোধ মীমাংসার পথ সুগম হইতে পারে, এরূপ কোন প্রস্তাব করিয়া সংশ্লিষ্ট দেশ দুইটি ও নিরাপত্তা পরিষদকে সাহায্য করা, (৩) জাতিসঙ্ঘের কাশ্মীর কমিশনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা গ্রহণ, (৪) এডমিরাল চেষ্টার নিমিৎস কাশ্মীর গণভোট পরিচালকের দায়িত্ব যাহাতে গ্রহণ করিতে পারেন, সেজন্য উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করা।

স্যার ওয়েনের নিয়োগ প্রসঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদ বর্ত্তমান যুদ্ধবিরতি চুক্তির মর্য্যাদা যাহাতে বিশ্বস্ততার সহিত রক্ষিত হয়, সেজন্য যথাবিহিত সতর্কতা অবলম্বনের নিমিত্ত উভয় গবর্ণমেণ্টের নিকট পুনরায় আবেদন জানাইয়াছেন। মীমাংসা আলোচনা যাহাতে অব্যাহত ভাবে অগ্রসর হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও রক্ষার জন্যও পরিষদ-সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়কে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন।

স্যার ওয়েনের নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব বিনা আলোচনায় গৃহীত হয়। ইকুয়েডরের প্রতিনিধি ডাঃ হোমেরো ভিতেরি লা ফ্রন্ট পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করার জন্য চতুঃশক্তিকে (ব্রিটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে এবং কিউবা) ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণকেও তাঁহাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ দেন।

ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের পক্ষ হইতে শ্রীগোপাল মেনন স্যার ওয়েনের নিয়োগে সম্মতি জ্ঞাপনের পর পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব স্যার জাফরুল্লা খাঁ পাকিস্তানের সম্মতি ঘোষণা করেন। তাঁহারা উভয়েই স্যার ওয়েনকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন।"

কাশ্মীরের ব্যাপারে বাহিরের লোকের সন্তোষ হইতে পারে। কিন্তু কাশ্মীরের নাগরিকবর্গের মনোভাব অগ্রাহ্য করিবার শক্তি কাহারও নাই। সেই মনোভাবই "আনন্দ-বাজার" পত্রিকায় ১০ই বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়; সংবাদ প্রেরণ করেন পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা। এই মনোভাবকে সংযত করিবার জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে কি কাশ্মীর যাইতে হইতেছে?

"কাশ্মীর ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যস্থ স্যার ওয়েন ডিক্সনের কাশ্মীর আগমনে শেখ আব্দুল্লার গবর্ণমেণ্ট অত্যধিক উৎসাহের সঙ্গে সরকারী অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিবেন না, ইহা স্পষ্টভাবেই মনে হইতেছে।

কর্তৃপক্ষস্থানীয় জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলেন, আমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব স্যার ওয়েন ডিক্সনকে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে। স্যার ওয়েন ও তাঁহার কর্ম্মচারীদের শ্রীনগরে থাকিবার জন্য শীঘ্রই ব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু কাশ্মীর কমিশনকে যে আনন্দোৎসব দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল, স্যার ওয়েনের বেলা সেরূপ হইবে না ইহা নিশ্চিত।

স্যার ওয়েনের আগমনে সরকারী ও রাজনৈতিক মহল বিশেষ উৎসাহবোধ করিতেছে না। সম্ভবতঃ কাশ্মীর কমিশন যে 'জেকিল ও হাইড'-এর দু'মুখো খেলার অংশ অভিনয় করিয়াছে, তাঁহারা এখনও উহা ভুলিতে পারেন নাই।

পূর্ব্ব কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী শেখ আব্দুল্লা যাহা বলিয়াছেন, উহা দ্বারাই এ ব্যাপারে কাশ্মীর গবর্ন্মেণ্ট ও কাশ্মীরবাসীর মনোভাব বুঝা যাইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, "মধ্যস্থ একজন বা এক হাজার আসুন, কাশ্মীরবাসী জানে তাহাদের ভবিষ্যৎ কি।"

প্রকাশ, কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের এক শ্রেণীর প্রভাবশালী ব্যক্তি শেখ আব্দুল্লা ও নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করিয়াছেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যস্থের প্রতি যেন সম্পূর্ণ অসহযোগের মনোভাব অবলম্বন করা হয়। তাঁহারা বলেন, কাশ্মীর গবর্ন্মেণ্ট সুস্পষ্ট জানাইয়া দিবেন যে, কাশ্মীরের জনসাধারণের পক্ষে মধ্যস্থের কোন প্রয়োজন নাই। প্রকাশ, সম্মেলনের কতিপয় প্রতিনিধি মধ্যস্থকে সম্পূর্ণভাবে বয়কট করিবার জন্য প্রধান রাজনৈতিক প্রস্তাব সম্পর্কে একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছিলেন।

কিন্তু শেখ আব্দুল্লা ইঁহাদের বুঝাইয়া বলেন যে, কাশ্মীর গবর্ন্মেণ্ট যদিও নিরাপত্তা পরিষদের এই প্রচেষ্টার ব্যর্থতা সম্পর্কে সচেতন, তবুও তাঁহারা স্যার ওয়েনের প্রতি অশোভন মনোভাব অবলম্বন করিতে পারেন না।

কাশ্মীর গবর্ন্মেণ্টের মনোভাব ভারত গবর্ন্মেণ্টের মনোভাব হইতে ভিন্ন হইতে পারে না। প্রকাশ, তিনি জাতীয় সম্মেলনে এই বিরোধী দলকে বলিয়াছেন যে, মধ্যস্থ এবং তাঁহার কর্ম্মচারিগণের প্রতি অতিরিক্ত সৌজন্য প্রদর্শন করা হইবে না।

যুদ্ধের প্রয়োজনে উদ্বাস্তু

যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণ করিয়া বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান যখন যোগদান করে তখন তাহাকে পরাস্ত করিবার জন্য ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলি ঘাঁটির প্রয়োজন হয়; অনেক লোকালয়কে উৎখাত এবং স্থানান্তরিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান জিলার পানাগড় সেইরূপ একটি অঞ্চল। "দামোদর" (অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক) পত্রিকার ৪ঠা বৈশাখ সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে সরকারী ঢিমে-তে-তলা নীতির পরিচয় পাওয়া যায়:

"পানাগড় রিজার্ভ বেসের অধিকৃত জমির মালিক শত শত কৃষকের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা সরকার আজ পর্যন্ত করিলেন না। রিজার্ভ বেসের জন্য যে সমস্ত জমি লওয়া হইয়াছিল, প্রজাদিগকে এজন্য বৎসর বৎসর ফসলের ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু কিছু টাকা দেওয়া হইতেছিল। তাহাতে একরকম করিয়া অন্যস্থানে মাথা গুঁজিয়াও তাহাদের উদরান্নের ব্যবস্থা হইতেছিল। তাহার পর চারি বৎসর পূর্ব্বে অস্থায়ীভাবে গৃহীত জমিজায়গাগুলি স্থায়ীভাবে গ্রহণ করিবার নোটিশ দিয়া একেবারে জমির মূল্য দেওয়া হইবে এই অজুহাতে ফসলের ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করা হইয়াছে। এই চারি বৎসর প্রজাদিগের একমাত্র সম্বল ও জীবিকার সংস্থান জমিজমাগুলি ফসলের ক্ষতিপূরণ না দিয়া আটকাইয়া রাখিলেও হাজার হাজার কৃষককে মূল্য বাবদ এতদিন একটি কপর্দ্দকও দেওয়া হয় নাই।

"এই লোকসমষ্টির দুর্দ্দশার কথা বিভিন্ন সম্মেলনে, বিভিন্ন মন্ত্রী ও সরকারী কর্ম্মচারীদের গোচরে আনা হইয়াছে। জানা গিয়াছে সম্প্রতি খেয়াল খুসীমত অত্যন্ত মন্থর গতিতে কিছু কিছু জমির মূল্য দেওয়া হইতেছে। এতদিন পরে যদিও জমির মূল্য দেওয়া হইতেছে, কিন্তু তাহার যে পদ্ধতি দেখা যাইতেছে তাহা আরও মর্ম্মান্তিক। যে কোন একজন প্রজা নাকি তাহার নিজস্ব জমির টাকা পাইবে না, যতক্ষণ না বর্দ্ধমানের মহারাজা এবং মহারাজার পত্তনিদার গ্রামের জমিদার ও ঐ জমির সঙ্গে সরকার কর্তৃক একই সময়ে গৃহীত অপর জমিগুলির মালিকগণ সকলে একসঙ্গে টাকা গ্রহণ না করেন। এই ব্যবস্থার ফলে প্রজাকে যৎপরোনাস্তি হয়রানি ভোগ করিতে হইতেছে এবং এজন্য অনেকে টাকা পাইতেছেন না। একটি গ্রামের উৎখাত প্রজারা কে কোথায় আছে, তাহাদের পক্ষে একসঙ্গে টাকা প্রদানের সংবাদ পাওয়া ও একসঙ্গে হাজির হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। রাজা মহারাজা ধনবান, জমিদারদের অবস্থা উৎখাত প্রজাদের ন্যায় নহে যে, ঐ টাকা তাড়াতাড়ি না পাইলে তাহাদের হাঁড়ি চড়িবে না। এজন্য তাঁহাদের ব্যস্ততাও নাই। যেহেতু একই সময়ে একই ডি, আই, কেসে একজন নাবালকের ও অন্য একশত জনের জমি গ্রহণ করা হইয়াছিল সেই হেতু বর্ত্তমান পদ্ধতিতে উক্ত নাবালকের যদি কোন অভিভাবক উপস্থিত না হইল, তাহা হইলে উক্ত নাবালকের সহিত সম্বন্ধহীন উক্ত একশত জন প্রজা তাঁহাদের জমির (যে জমিতে উক্ত নাবালকের কোন সম্বন্ধ বা অংশ নাই) দাম পাইবে না। দ্বিতীয়তঃ খতিয়ান ও জমির উল্লেখ করিয়া কোন নোটিশ না দেওয়ায় কাহার কত টাকা পাওনা জানা যাইতেছে না। ইহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে এক জনের টাকা অন্য জন অন্যায়ভাবে বেশী পাইলে জানিবার উপায় নাই। এই স্থলেই সংশ্লিষ্ট অফিসের

কর্ম্মচারীদের কবলে বাস্তু ও ভূমিহারা প্রজাদিগকে পড়িতে হইতেছে বলিয়া প্রায়ই অভিযোগ আসিতেছে। অধিকাংশ উদ্বাস্তুর নিরক্ষরতার সুযোগ লইয়া শান্তিপূর্ণভাবে লুণ্ঠনকার্য্য চলিতেছে। বর্দ্ধমানের দুর্নীতিদমন বিভাগটি এ বিষয়ে কি করিতেছেন তাহা আমরা অবগত নহি।"

আমরা এই জটিল পদ্ধতির কারণ বুঝিলাম না। ক্ষতি-পূরণ প্রাপ্তির ব্যাপারটা কি সহজ ও সরল করা যায় না? নিয়মকানুন দিয়া নাগরিক জীবন অসহ্য করিয়া তোলাই সরকারী দফতরে মাথাওয়ালা লোকের একমাত্র কাজ হইয়া উঠিয়াছে দেখিতেছি। এই গোয়াল ঘর ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিবার কেহ নাই কি? পশ্চিমবঙ্গের এই পুরাণো উদ্বাস্তু-দিগের পুনর্বসতি কবে হইবে? কলিকাতার সংবাদপত্রগুলি তো পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত অধিবাসীদিগের সমস্যাগুলির সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। পূর্ব্ববঙ্গ সম্পর্কে তাঁহাদের যে চেতনা দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে তাহার শতাংশ দেখিলেও আমরা সন্তুষ্ট হইতাম।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-শস্যের অভাব

গত ২রা চৈত্র পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থাপক সভায় প্রদেশের খাদ্য-সমস্যার আলোচনা হয়। কৃষি-মন্ত্রী ও সরবরাহ-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল-চন্দ্র সেন কৃষিবিভাগের খাতে প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার ব্যয় মঞ্জুর করাইতে সক্ষম হইয়াছেন; তাহার উপর পশু বিভাগের জন্য আরও প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। মন্ত্রীমহাশয়ের বক্তৃতায় এই সংবাদ পাইলাম যে সরকারী পরিকল্পনা মতে আগামী বৎসরে (১৯৫০-৫১) এই প্রদেশে প্রায় ৩৭,০০,০০০ টন চাউল উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে; পরের বৎসর উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ৪২,৯৩,০০০ টন চাউল পাওয়া যাইবে আশা করা যাইতেছে।

উপরোক্ত ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার মধ্যে খাল, বিল, দীঘির উন্নতিকল্পে কত অংশ ব্যয় হইবে এবং পশ্চিমবঙ্গের ২,০০০ ইউনিয়নে এক জন করিয়া "সহকারী" কৃষি কর্ম্মচারী রাখায় কতটা ব্যয় হইবে তাহার পৃথক হিসাব পাইলে প্রকৃত পক্ষে কৃষি উন্নয়নের চেষ্টা কতটা হইবে তাহার ধারণা করিতে পারিতাম। বর্ত্তমান বৎসরে প্রথমোক্ত কার্য্যের ফলে প্রায় ৯,৬২,১৬০ বিঘা জমি পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে, এবং তার কল্যাণে খাদ্য-শস্যের (চাল-গমের) উৎপাদন বাড়িয়াছে ১,৯৮,০৬৫ টন ও রবিশস্য বাড়িয়াছে ৪,১৭,৬৩৪ টন।

চাষের জমি ছাড়া চাষের বলদের অভাব পশ্চিমবঙ্গে আছে। সুতরাং কৃষি-মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে ৪২,৯৩,০০০ হাজার টন চাউল উৎপন্ন করিতে পারিলে আমাদের প্রদেশ খাদ্যে স্বাবলম্বী হইবে, তাহার পথে এই চাষের বলদ লাঙ্গল)। ১৯৪৯-৫০ সালে কৃষি-বিভাগের তাঁবে ১০টি ট্রাকটর ছিল; আরও ১০টি পতিত ও জঙ্গলা জমি চাষের উপযোগী কলের লাঙ্গল ক্রয় করা হইয়াছে। সাধারণ ও চাষের জন্য ক্রয় করা হইয়াছে ১০টি। এই হিসাবের মধ্যে হরিণঘাটার আট-দশটি ট্রাকটর অন্তর্ভুক্ত কিনা, বুঝা যায় না।

ইহার অতিরিক্ত অনেক ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ট্রাকটর আছে। রাণাঘাটের পশ্চিমে চূর্ণী নদীর তীরে ৪০০ বিঘায় বিস্তৃত একটি কৃষি ফার্ম্মে ট্রাকটরের কাজের বিবরণ পাইয়াছি; তাহা নাকি চাউলের কলের কাজও করে, এবং এইভাবে স্থানীয় কৃষক পরিবারের শ্রমের লাঘব করে। মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতার মধ্যে একটি বিষয়ের উল্লেখ দেখিলাম না যাহা তাঁহার সমস্ত পরিকল্পনাকে বানচাল করিতে পারে। সেই আশঙ্কার কথাই বনগাঁও, বারাসত, বসিরহাট মহকুমার মুখপত্র "সংগঠনী" পত্রিকার ১৬ই চৈত্রের সংখ্যার নিম্নলিখিত মন্তব্যে দেখা যায়:

"আরও কয়েকটি পাকিস্থানগামী এই অঞ্চলের মুসলমান অধিবাসী কেহ কেহ এমন কি নিজের পরিত্যক্ত ঘরে আগুন দিয়াছে। মাঠের ধান, কলাই গরুকে দিয়া খাওয়াইয়াছে এবং লাঙ্গল ধরিবে কিনা এ বিষয় চিন্তা করিতেছে। এগুলি সবই যে অন্তর্ঘাতী নীতি এবং রাষ্ট্রের ক্ষতিকারক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের বিভিন্ন বিভাগে মিলিয়া মিশিয়া কাজ চলিতেছে না বিভাগীয় রেষারেষিতে। তাহার পরিচয় পাই গত ১৬ই বৈশাখ তারিখের "খাদ্য-উৎপাদন" পাক্ষিক পত্রিকার মাধ্যমে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম:

"শ্রীকিরণকুমার ঘোষ, আই-এ-এস, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-বিভাগের অধিনায়ক (Director) ছিলেন; এই এপ্রিল মাসের প্রথমে ডা: এইচ. কে. নন্দী কৃষিবিভাগের অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন। যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্রীকিরণকুমার ঘোষ মহাশয়কে কৃষিবিভাগের অধিনায়কের দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছেন—কিন্তু বর্ত্তমানে কৃষিবিভাগের অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন; অর্থাৎ তাঁহাকে অধিকতর খাদ্য উৎপাদনের অধিনায়ক (Director of Food Production) নিযুক্ত করিয়াছেন। ঘোষ মহাশয় পূর্ব্বে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; সম্প্রতি আই-এ-এসে উন্নীত হইয়াছেন; এবং খুব শীঘ্রই তাঁহার অবসর গ্রহণের সময় আসিবে। আমাদের মনে হয় কৃষি বিভাগের এবং খাদ্য উৎপাদনেরও অধিনায়করূপে একজন কৃষি বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন ছিল বলিয়াই ডা: নন্দীকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে কৃষি বিভাগের অধিনায়কের উপরেই অধিকতর খাদ্য উৎপাদনের ভার ন্যস্ত ছিল। যদিও ডা: নন্দী

শ্রীযুক্ত কিরণকুমার ঘোষ যখন কৃষি বিভাগের অধিনায়ক ছিলেন তাঁহার অধীনে অধিকতর খাদ্য উৎপাদন কার্য্যের জন্য একজন সহকারী অধিনায়ক (Deputy Director) ছিলেন ; ইনি পূর্ব্বে সব-ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হইয়াছেন। খুব সম্ভবত: বর্ত্তমানে তিনি ঘোষ মহাশয়ের অধীনেই কার্য্য করিবেন।

"সুতরাং অধিকতর খাদ্য উৎপাদনের জন্য পূর্ব্বের ব্যবস্থাই বহাল রহিল। কিন্তু পূর্ব্বের ব্যবস্থার ফলে কৃষি বিভাগের বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারিগণের (Technical officers) মধ্যে এমন এক মনোভাব ও মর্ম্মজালার সৃষ্টি হইয়াছিল যা সুষ্ঠু-ভাবে কার্য্য পরিচালনার পক্ষে আদৌ অনুকূল নহে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাহা অধিকতররূপে প্রকট হইবারই আশঙ্কা। ইহা ছাড়া 'জগাখিচুড়ির' মতই কাজ চলিবে। 'জগাখিচুড়ির' একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি : আমরা অতি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছিলাম যে, কৃষি বিভাগের বর্ত্তমান অধিনায়কের (ডা: নন্দীর) এমন একটি পরিকল্পনা আছে যাহা কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারিলে আগামী দুই বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ধানের উৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। আমরা ইহাও শুনিয়াছিলাম যে, ইহা ব্যতীত কৃষির উন্নতি-কল্পে তাঁহার অন্যান্য পরিকল্পনাও আছে। সম্প্রতি তাঁহার নিকট হইতে আমরা তাঁহার ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনাটি চাহিয়াছিলাম, তিনি আমাদের জানাইয়াছেন যে, শ্রীকিরণকুমার ঘোষ অধিকতর খাদ্য উৎপাদনের অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন ; এই সম্বন্ধে সকল পরিকল্পনাভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ডা: নন্দী তাঁহার পরিকল্পনাটি আমাদিগকে পাঠান নাই। জানি না, তাঁহার পরিকল্পনা শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয়ের বিবেচনাধীন আছে কি না।

"আমরা যত দূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয় অ-বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী নিয়োগের ফলে এবং আরও বহু কারণে কৃষি বিভাগের নৈতিক অবস্থা (morale) খুবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং বিভাগের মধ্যে বহু দল-উপদলের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ফলে নিয়মানুবর্ত্তিতা, কর্ম্মচারিগণের দায়িত্ব বোধ, আশা, উৎসাহ প্রভৃতি খুবই হ্রাস পাইয়াছে। মাননীয় কৃষি ও খাদ্যসচিব কৃষির উন্নতিকল্পে, বিশেষত: অধিকতর খাদ্য উৎপাদনের জন্য বহু আয়াস ও পরিশ্রম করিতেছেন, কিন্তু প্রধানত: যাঁহাদের সম্পূর্ণ সাহায্য, সহানুভূতি এবং সহযোগিতার উপর তাঁহার আয়াস ও শ্রমের ফল নির্ভর করে তাঁহাদের বর্ত্তমান মনোভাবের উন্নতি করিতে না পারিলে তাঁহার চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার বিভাগের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

"এই সম্পর্কে ইহাও উল্লেখ করিতেছি যে, ইংরেজের আমলেও বিশেষজ্ঞের কাজের পদে কখনও ম্যাজিষ্ট্রেট বা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হয় নাই। অর্থাৎ ডেপুটি ডিরেক্টর অব এগ্রিকালচারের পদে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হয় নাই। বহু পূর্ব্বে তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার (Administration) জন্য একজন আই-সি-এস. অধিনায়ক (Director) নিযুক্ত হইতেন ; এই ব্যবস্থাও পরবর্ত্তীকালে লোপ পাইয়াছিল এবং একজন কৃষি-বিশেষজ্ঞই অধিনায়ক নিযুক্ত হইতেন।"

দামোদর নদী ও পশ্চিমবঙ্গ

দামোদর নদী প্রতি ১২ বৎসরের মধ্যে ৫ বৎসর বন্যার জল হইতে পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করে এবং ১০।১২ বৎসর অন্তর বন্যায় দেশ ভাসাইয়া লয়। এই নদীকে সংযত ও সুপরিচালিত করিবার জন্য প্রায় ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ের হিসাবে একটি পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গের লোকের মনে আশার সঞ্চার করা হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক বাংলা সংবাদপত্রে এই বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, এবং লোকের মনে ভবিষ্যতে কৃষি-উন্নতি ও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থাসম্বন্ধে নানা জল্পনার-কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। গত ১৭ই চৈত্রের 'সমাজ' সাপ্তাহিক পত্রিকার একটি প্রবন্ধ তাহার প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে :

"দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হলে, রাণীগঞ্জ থেকে ক'লকাতা পর্য্যন্ত নৌ চলাচলের উপযোগী জলপথের সৃষ্টি হবে। ফলে ক'লকাতা অনেক সস্তা খরচে রাণীগঞ্জ থেকে কয়লা আমদানী করতে পারবে। ক'লকাতার জিনিষও অনেক অল্প ব্যয়ে মফস্বলের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারবে। পশ্চিম-বাংলার সমস্ত নদীর উপরই এই বিরাট সম্ভাবনা কার্য্যকরী হতে পারে। শুধু স্বাস্থ্য ও কৃষির উন্নতিই নয়, নদীসংস্কারের ফলে জলস্রোতের ঘুমন্ত বিদ্যুৎ-শক্তিকে জাগিয়ে তোলা যাবে। শিল্পোন্নতির জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন একান্ত।

"পশ্চিমবাংলার অজয়, ময়ুরাক্ষী, দামোদর বিদ্যুৎ উৎপাদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। দামোদর ভ্যালী পরিকল্পনা কার্য্য-করী হলে বছরে ঘণ্টায় প্রায় ৮ কোটি কিলোয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। দামোদর পরিকল্পনার ন্যায় ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা কার্য্য-করী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা, যখন শেষ হবে, তখন তার স্রোত থেকে বীরভুম ও মুর্শিদাবাদ জেলার জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা খুব সহজ হবে।"

এত আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল যে পরিকল্পনা, শোনা যায় তাহারও কোন কোন বিশেষ অংশের উপর সন্দেহের অবকাশ আছে। সম্প্রতি এই বিষয়ে ২৭ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীকুমুদবন্ধু রায় একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার এবং এই পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁহার চিন্তা ও গবেষণা আছে। তিনি বলিতেছেন যে নদী-

নিয়ন্ত্রণ ও বন্যা-নিবারণ এক কথা হইতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গে চাষের জন্য জলের ব্যবস্থা জুড়িয়া দিলে সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিবে।

রায় মহাশয়ের আশঙ্কা যুক্তিসহ হইলে বলিতে হয় যে, দামোদর-পরিকল্পনা আংশিক ভাবে ভুল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু রায় মহাশয়ের পুস্তিকার ৯ম পৃষ্ঠায় একটা উপায়ের সঙ্কেত আছে। দামোদরের জনপদ বিধ্বংসী বন্যা নিবারণ কর, কিন্তু দামোদরের জলকে কৃষির জন্য খালে চালাইও না; দুর্গাপুর ব্যারেজের জন্য ১৩ কোটি টাকার ব্যয় বাঁচিয়া যাইবে। উত্তর প্রদেশ ও বিহারে বিদ্যুতের সাহায্যে টিউব ওয়েল হইতে জল তুলিয়া চাষের বিস্তার করা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে ভূগর্ভে জল অপ্রচুর নয়; সেই জল তুলিয়া ৩০ লক্ষ বিঘা জমিতে জল প্রদান সহজ হইবে, কম ব্যয়সাধ্য হইবে। হয়ত এই দুই প্রথাই সংযুক্ত করিয়া নূতন পরিকল্পনা রূপ গ্রহণ করিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের ঐ সকল অঞ্চলে টিউব ওয়েলের সাফল্য কতটা সম্ভব তাহাও পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং দুর্গাপুর ব্যারাজের নীচে কতটা জল চলা আবশ্যক তাহাও দেখা প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষা

বালীর "সাধারণী" পত্রিকা নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে এরূপ প্রচেষ্টার বিস্তার দেখিতে চাই:

"বালি শান্তিরাম বিদ্যালয়ের ব্যায়াম শিক্ষক শ্রীবেচারাম রায় চৌধুরী গত বৎসর 'ফতেগড় রাজপুত রেজিমেণ্টাল ট্রেনিং কেন্দ্র' হ'তে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ ক'রে কমিশন লাভ করেছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে বর্ত্তমানে এই বিদ্যালয়ে ৩০ জন ছাত্র নিয়ে ৬ষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় বাহিনীর (6th West Bengal N. C. C.) একটি শাখা খোলা হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে এখানকার কয়েকটি তরুণ যুবক ভারতীয় নৌবহর প্রভৃতিতে যোগ দিয়েছে। বহু শতাব্দীর পরাধীনতার পর রুদ্ধ দুয়ার খুলে গিয়েছে। আজ এদের কথা ভেবে আমরা গর্ব্ব অনুভব করছি। কিন্তু এতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। আজকে আমরা চাই যে গ্রামের যুবকরা দলে দলে জাতীয় রক্ষী বাহিনীতে যোগ দিয়ে সত্যকারের দেশপ্রেমের পরিচয় দিক্।"

ভারতের কৃষক

বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের চক্ষে ভারতের কৃষক অপটু, অজ্ঞানী। এই সংস্কারের প্রতিবাদ করিয়া গত ২৩শে চৈত্রের "সৈনিক" সাপ্তাহিক পত্রিকায় শ্রীনলিনাক্ষ বসু একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানে "অশিক্ষিত" কৃষকের পূর্ব্বপুরুষেরাই "হিঙ্গলী তামাক, রামপালের রকমারি কলা, মুর্শিদাবাদের রকমারি আম, মালদহের লেংড়া-ফজলী, ভেল্লামুখী, শামসাড়া, পুড়ি, ধলি ও কাজলে প্রভৃতি সুমিষ্ট ইক্ষু" ইত্যাদির বর্ত্তমান রূপ দিয়াছিল। তাদের বংশধরেরা তাদের কৌশলাদি ভুলিয়া যায় নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

"হুগলী জিলার অন্তর্গত সিঙ্গুর ও হরিপাল থানার যে অংশ লইয়া কাণা-দামোদর চলিয়া গিয়াছে, সেই নদীর ধারে যে সকল কৃষক বসবাস করে তাহারা হাতের কাছেই সেচনের জল প্রাপ্ত হয় বলিয়া ডোঙ্গার সাহায্যে এককালেই জল তুলিয়া সেচন ও জমিতে গোবর ও রেড়ির খইল সার প্রয়োগ করিয়া বিঘা প্রতি এক শত পনের মণ হইতে এক শত কুড়ি মণ আলু উৎপন্ন করে। বিজ্ঞানসম্মত তেজাল বিলাতী সার প্রয়োগ করিয়া ইহা অপেক্ষাও অধিক আলু উৎপন্ন করা যায়। কিন্তু তাহাতে হুগলী জেলার বেলে দোআঁশ উচ্চ ভূমির উৎপাদিকা শক্তির উপর আঘাত পড়ে বলিয়া কেহই ঐ সার প্রয়োগ করে না। বিলাতী সারের তেজ এত বেশী যে দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মৃত্তিকার সারবান পদার্থসমূহকে টানিয়া বাহির করিয়া লয় বলিয়া দুই এক বৎসরের মধ্যে জমি এত নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে বিনা সারে আর কোন ফসলই উৎপাদন করিতে পারে না। বিলাতী লাঙ্গলের সাহায্যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি কর্ষণ করিয়া জমি প্রস্তুত করিলে তাহাদের উৎপাদিকা শক্তিও শীঘ্র শীঘ্র ও দ্রুতে এঁটেল ও এঁটেল মাটির শক্তি একটু বিলম্বে নাশ হইয়া থাকে। পরীক্ষা করিলে যখন ইহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করা যায় তখন তর্ক না করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

চন্দননগরের ভারতভুক্তি

গত ১৯শে বৈশাখ আনুষ্ঠানিকভাবে চন্দননগরের ভারত-ভুক্তি পর্ব্ব সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা যেমন তিনটি গ্রাম অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ চন্দননগর গলিশানি, বোড়ো ও গোন্দলপাড়া এই তিন স্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আড়াই শত বৎসর ইহা ফরাসী শাসনের অধীনে ছিল। ভারতরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে শ্রীবি. কে. ব্যানার্জ্জি ফরাসী শাসনকর্তা মঁ তেউরের নিকট হইতে "কার্য্যত:" এই নগরীর শাসনভার গ্রহণ করেন।

"কার্য্যত:" কথাটির ব্যবহার আইনের দিক হইতে যুক্তি-সঙ্গত। কারণ খুঁটিনাটি বিষয়ে উহার সার্ব্বভৌম অধিকার, সন্ধিচুক্তি চূড়ান্তরূপে অনুমোদিত ও চন্দননগর 'আইনত:' ভারতে হস্তান্তরিত না হওয়া পর্য্যন্ত ফরাসী ইউনিয়নের হাতেই রহিল বলিয়া গণ্য হইবে। তৎসত্ত্বেও ভারত-সরকার অদ্য হইতে সম্পূর্ণ শাসন-কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সন্ধির প্রধান সর্ত্ত, চন্দননগর হস্তান্তরের প্রশ্ন ভারত ও ফ্রান্সের মধে

...পে'ষে মীমাংসিত হইয়াছে। অতি শীঘ্রই ইহা চূড়ান্ত ...প পরিগ্রহ করিবে। চন্দননগর হস্তান্তরের দলিল ...নৈতঃ স্বাক্ষরিত হওয়ামাত্র হস্তান্তর বৈধ ও সম্পূর্ণ হইবে।

ইহা অবশ্য স্মরণীয় যে, গণভোট দ্বারা নিজেদের ভবিষ্যৎ ...র করার জন্য ফরাসী অধিকৃত এলাকাসমূহের জনসাধারণকে ...দেশ দিয়া ফরাসী গবর্মেণ্ট কর্তৃক ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার ...র গত ১৯৪৯ সালের জুন মাসে চন্দননগরের জনসাধারণ ...নম্মতিক্রমে ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

"স্বদেশী" আন্দোলনের সময় হইতে ফরাসী চন্দননগর ...রতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ...তরাং ভারতভুক্তি তাহার নাগরিকবর্গের আদর্শ ছিল। সেই ...দর্শ রূপ গ্রহণ করিয়াছে গত ১১শে বৈশাখ। আমরা ...হাদিগকে সাদর-সম্ভাষণ জানাইতেছি। বাঙালীর উপর ...য়া দুর্যোগ চলিতেছে, তাহা না হইলে এই উপলক্ষে ...নন্দোৎসব হইত।

কলিকাতায় শিক্ষার ব্যবস্থা

"কলিকাতার স্কুল কলেজগুলির শিক্ষা-ব্যবস্থা" সম্বন্ধে মন্তব্য ...সঙ্গে "শিক্ষাব্রতী" লিখিয়াছেন—'বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সর্বা-...পেক্ষা দূষণীয় যাহা হইয়াছে, তাহা হইতেছে একই শিক্ষক বা অধ্যাপকের সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যা, বিভিন্ন একাধিক বিভাগে শিক্ষকতা করা। ইহা শিক্ষকতার নামে দু'পয়সা রোজগার করা ছাড়া আর কিছুই নহে। শিক্ষক বা অধ্যাপক-...দের শিক্ষাদানের জন্য নিজেদের জ্ঞানার্জ্জন এবং মানসিক বিশ্রামের যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। দুই তিন শিফ্‌টে' কারখানার মজুরের মতো শিক্ষকতা করা কখনো সম্ভব হইতে পারে না। কেবল তাহাই নহে, শিক্ষার দিক হইতে উহাতে যেমন ক্ষতি হইতেছে, তেমনি দেশের বেকার সমস্যার বিরাট গুরুত্বকেও ইহা পুষ্টতর করিতেছে। যেখানে তিন জন অধ্যাপক বা শিক্ষক অধ্যাপনা করিতে পারিতেন; সেখানে একজন শিক্ষক বা অধ্যাপক শিক্ষকতা করিয়া দুই জন শিক্ষক বা অধ্যাপককে বেকার করিয়া দিতেছেন। এই ব্যবস্থা কি শিক্ষা-নীতি কি অর্থনীতি কোনো দিক হইতেই বরদাস্ত করা চলে না।"

ইহা সমস্যার একটা দিক মাত্র। বর্ত্তমান সমাজে শিক্ষকের উপার্জ্জন সংসার প্রতিপালনের পক্ষে প্রচুর নয় সাধারণতঃ এই অবস্থা সমস্যার আর এক দিক। কিন্তু "এ বাহ্য"। কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন, তাঁহারাও সকলেই যে আদর্শ শিক্ষক তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, সমাজের সকল ক্ষেত্রেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

পুরুলিয়ার "মুক্তি" পত্রিকায় সেরূপ চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়:

"গত ৩রা ফেব্রুয়ারী মাঝিহিড়া বিদ্যালয় ভস্মীভূত হইবার পর তিন সপ্তাহের জন্য বিদ্যালয় ছুটি দেওয়া হয়। মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহেই পুনরায় বিদ্যালয়ের কাজ সুরু হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে নূতন পরিকল্পনায় কাজ চলিতেছে। মাঝিহিড়া গ্রামের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও দূরবর্ত্তী দশ-এগারটি গ্রামের কিছু ছাত্র বোর্ডিঙে থাকিয়া পড়িত। এইভাবে আবাসিক বিদ্যা-লয়ের রূপও একসঙ্গে গড়িয়া উঠিতেছিল। বর্ত্তমানে গ্রামের দুইটি ঘরে ক্লাস চলিতেছে। শিক্ষকগণ ছাত্রদের বাড়ী বাড়ী গিয়া কাজ তদারক করিতেছেন। যে সব ছেলে অন্য গ্রামে আছে তাহাদের বাড়ী সপ্তাহে এক দিন শিক্ষকেরা উপস্থিত হইয়া তদারক করিয়া আসিবেন, স্থির হইয়াছে।"

পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান নাগরিক

পূর্ব্ববঙ্গ এখন পর-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। তার কর্ম্ম ও অকর্ম্ম প্রতিবেশী হিসাবে আমাদের শান্তি ও স্বস্তির হানি করিতে পারে। সেইজন্য পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান জনসমষ্টির নিত্য নূতন মনোভাবের সম্বন্ধে আমাদিগকে সজাগ থাকিতে হইবে।

গত ২৬শে চৈত্রের "আজাদ" দৈনিক পত্রিকায় "লাহোরের চিঠি" শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ নগরীর "সিভিল ও মিলিটারী গেজেট" পত্রে সাত কলমব্যাপী শিরো-নামায় মালিক ফিরোজ খাঁ নুনের গভর্ণর পদে নিয়োগ সম্পর্কে বলা হয়—"পূর্ব্ববঙ্গে প্রথম পাঞ্জাবী গভর্ণর"। পত্রলেখক ইহার উপর মন্তব্য করিয়াছেন:

"পত্রিকাখানির এহেন ঘৃণ্য মনোভাব এখানকার জন-সাধারণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা এইরূপ হীন শিরোনামার তীব্র নিন্দা করিতেছে।"

পত্রলেখক লাহোরে বসিয়া লাহোরের "জনসাধারণের" মনোভাবের প্রশংসা করিয়াছেন। এই শিরোনামায় পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান জনসমষ্টির মনোভাব কি তাহা "আজাদ" পত্রিকা জানাইতে পারিতেন। লাহোরে বসিয়া লেখক পূর্ব্ববঙ্গ সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনাও করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় যে এখন পুরাতন সমস্যাগুলির দিকে পূর্ব্ব-পাকিস্তান আবার নজর দিতেছে।

"গত সপ্তাহে সকলের চিন্তা ছিল পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি। সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের জনাব নূর আহম্মদ বলিয়া-ছিলেন যে পূর্ব্ববঙ্গকে তাহার রক্ষার ব্যবস্থার ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া হউক। তাঁহার মন্তব্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত হইল এই যে, সামরিক ব্যাপারে পূর্ব্ব-পাকিস্তানকে স্বাধীনতা দিতে হইলে প্রদেশের জনসাধারণকে সামরিক মনোভাব-সম্পন্ন করিয়া তোলা প্রয়োজন।" এই সকল মহল আরও বলেন: "পূর্ব্ব পাকিস্তানে একটি স্বতন্ত্র মিলিটারি একাডেমি করার প্রস্তাব মন্দ নয়। কারণ প্রদেশ-বাসীকে সমর-মনা করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে নিকটেই

একটা শিক্ষা-কেন্দ্র থাকা প্রয়োজনীয়। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের যুবকবৃন্দ পাকিস্তানের যে কোন অংশের যুবকদের সমকক্ষ হইতে পারে যদি তাহাদের মধ্যে সামরিক মানসিকতা গড়িয়া তোলা যায়।

"গত সপ্তাহে পাকিস্তান নৌবহরের জন্য মনোনয়ন-প্রার্থী ছেলেরা এখানে আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়াছিল মাত্র ১৪ জন, এবং তন্মধ্যে মাত্র ১ জনকে মনোনীত করা হইল। জানিতে পারা গেল যে, তথায় প্রচার কার্য্যের অভাবেই এত অল্পসংখ্যক ছেলে আসিয়াছিল; তাহাদিগকে সময়ও দেওয়া হইয়াছিল অল্প।

"এই প্রসঙ্গে একটি মজার কথা মনে পড়ে—মজারও বটে, আশ্চর্য্যেরও বটে।

"পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমিতে লোকভর্ত্তির জন্য লাহোরের এমন কোন স্থান ছিল না, যেখানে প্রচারপত্র ও দেওয়ালপত্র দেওয়া হয় নাই। এমন কি এখানকার পশুশালা-গুলির দেওয়ালেও প্রচারপত্র লাগানো হইয়াছিল; কিন্তু ঢাকার বিখ্যাত কলেজগুলিতেও কোন প্রচারপত্র দেখা যায় নাই। "আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, একমাত্র পূর্ব্ব-পাকিস্তানের যুবকগণই তাহাদের প্রিয় 'পূর্ব্ব-বাংলাদেশকে' রক্ষা করিতে পারে; অন্য কেহ নহে।"

লাহোরের পত্র-লেখকের ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব-বঙ্গের শিক্ষিত মুসলমানের মনোভাব সম্বন্ধেও আমাদের অবহিত হওয়া উচিত বলিয়া মনে করি। সেইজন্য ঢাকার "ইমরোজ" (মাসিক) পত্রিকার গত অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত "সম্পাদকীয়" মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

"...আরবী হরফে বাংলা লেখায় সত্যিকার কোন উপকার হবে কিনা। এমনি স্থির ভাবে বিবেচনা করে দেখলেই দেখা যাবে যে এতে কারুরই কোন উপকার হবে না। বরং পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৃহত্তম অংশ এই পূর্ব্ব-পাকিস্তান সংস্কৃতির দিক দিয়ে আরও দুর্ব্বল, আরও পঙ্গু হয়ে পড়বে। পূর্ব্ব-পাকিস্তানকে সতেজ ও সবল করে তুলতে হলে দরকার হবে বাংলা ভাষাকে সহজ ও ইসলামি ভাবধারা দিয়ে ভরপুর করে তোলা।

"পূর্ব্ব-পাকিস্তানীদের এই মানসিক দৌর্ব্বল্য অন্য দিক থেকেও মারাত্মকভাবে দেখা দিয়েছে। পূর্ব্বে ইংরেজী ভাষা-ভাষী মাত্রেই যেমন একটা ভীতির পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল অনেক বাঙালী মুসলমানের নিকট, এখন উর্দ্দু ভাষাভাষীরা সব বিষয়ে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এমনি একটা ভাব অনেকের মনে শিকড় গেড়ে বসেছে। অনেক উচ্চপদস্থ বঙ্গবাসী মুসলিম কর্ম্মচারীকে সমকক্ষ বা নিম্নপদস্থ উর্দ্দুভাষী কর্ম্মচারীর নিকট অযথা হতবাক্ বা হৃৎকম্পিত হতে দেখেই আমাদের এমনি ধারণা জন্মেছে।...

"কতকগুলি উর্দ্দু ভাষাভাষী পূর্ব্ব-পাকিস্তানবাসীদের মনে এই inferiority complex-কে সুদৃঢ় করতে ইন্ধন জোগাচ্ছেন বলে মনে হয়। অন্ততঃ তাঁহাদের কার্য্য-কলাপে যে 'শাসক মনোভাব' প্রকাশ পায় সে কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়।... বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমরা সৈন্যবাহিনীতে স্থান পায় না শুধু ভাষার জন্যই; বাঙালী কর্ম্মচারী শুধু ভাষার জন্যই নানা বাহানায় অপদস্থ হয় এমন অভিযোগ প্রায়ই শুন যাচ্ছে।..."

উদ্বাস্তুর সেবা

গত ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে যখন নোয়াখালি-ত্রিপুরার অংশ বিশেষে পাকিস্তানী তাণ্ডব সমাজজীবনকে বিধ্বস্ত করে, তখন হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উদ্বাস্তু নারী ও শিশুর সেবা-ব্রত নূতন করিয়া গ্রহণ করেন। এই সাড়ে তিন বৎসর কলিকাতা নগরীর জনারণ্যে সেই সেবা অনির্ব্বাণ রহিয়াছে। আজ নূতন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হিন্দু নর-নারী পিতৃ-পুরুষের ভিটেমাটি ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে। ব্রাহ্ম সমাজের দায়ও বাড়িয়াছে। নিম্নলিখিত আবেদনখানি সেই স্বীকৃতির পরিচয় দিতেছে।

"আজ রাণাঘাটে, বানপুরে, শিয়ালদহ ষ্টেশনে যে হৃদয়-ভেদী ক্রন্দনধ্বনি উঠিয়াছে, 'আশ্রয় চাই, খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই' —তাহা চতুর্দ্দিক ছাইয়া ফেলিয়াছে। শত শত স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকা আরাম স্বার্থ ভুলিয়া সাহায্য দিতে ছুটিয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজ চিরদিন আর্ত্তের সেবায় সাড়া দিয়াছে। এবারেও ব্রাহ্ম সমাজ ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য বোধে এই অগণিত অসহায় আশ্রয়হীনদের সেবার জন্য আয়োজন করিয়াছেন। এই সেবা কার্য্য বিরাট; এ সমস্যা সমাধান আরও বিরাট। ব্রাহ্মসমাজ তাহার মুষ্টিমেয় লোকসংখ্যা সত্ত্বেও এই দায়িত্বভার কিছু পরিমাণে গ্রহণ করিবার সাহস এজন্য করিয়াছেন, কারণ নোয়াখালী বা অন্যান্য সেবাকার্য্যে তাহার সেবক ও অর্থের অভাব যাঁহারা মিটাইয়াছেন, তাঁহারাই মুক্ত হস্তে আবার আসিবেন, তাঁহারাই সাড়া দিবেন।

এই কাজে প্রচুর অর্থ, বস্ত্র, ঔষধ ইত্যাদি প্রয়োজন। আপনারা মুক্ত হস্তে দান করিয়া ও বন্ধুদের নিকট হইতে দান সংগ্রহ করিয়া এই সেবাকার্য্যকে সফল করুন, ইহাই বিনীত অনুরোধ। নগদ টাকা ভিন্ন খাদ্যাদি, যথা, চাউল, ডাল, ওষুধ, বস্ত্র ইত্যাদি পাইলেও যথেষ্ট উপকার হইবে।"

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬।

বিশ্বহিতৈষণা

ভারতবাসী আমরা ইংরেজের বিশ্ব-হিতৈষণার ফল হাড়ে হাড়ে ভোগ করিয়াছি। জাপানের "Co-prosperity" সম-সুখভোগের নমুনাও দেখিয়াছি। আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে নাকি বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণের ভার আসিয়া পড়িয়াছে। এই অধিকার ছিল ইংরেজের—উনবিংশ শতাব্দী জুড়িয়া। তাহার ফলে আসিয়াছিল দুইটি বিশ্ব-যুদ্ধ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবর্গ ও শাসকসম্প্রদায় প্রচার করিতেছেন যে তাঁহারা কম্যুনিজমের বিস্তারে বাধা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর। কি উপায়ে তাহা সম্ভব তাহাই তর্ক ও বিচারের বিষয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাদের শুনাইতেছেন যে লোকের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থার একটা সদুপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতে পারিলে কম্যুনিজম রোগের পোকা সমাজদেহে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইবে না; অর্থাৎ খালি পেটে ও খালি গায়ে থাকিলে এই রোগের বীজ সহজে মনুষ্যের শরীরে ও মনে বাসা বাঁধে। এই চিকিৎসার মধ্যে কোন সত্য বস্তু থাকিলে, তাহা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারে প্রতিফলিত হইবে, এই আশা অনেকেই করিতেছেন। ঐ রাষ্ট্রের অধিপতি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁহার "৪ দফা" (Point 4) পরিকল্পনায় আমাদের মতন দুর্ভাগা দেশসমূহের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা হইবে বলিয়াছেন।

প্রায় ৪ মাস যাবৎ এই পরিকল্পনার কথা শুনিতেছি এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারে তাহার পরিপূরণের প্রতীক্ষায় আছি। পরিপূরণের চেষ্টা কি ভাবে চলিতেছে তাহার সঠিক সংবাদ ওয়া সম্ভব নয়। নানা সভাসমিতির বিবরণ হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে হয়। সব বিবরণ পাওয়াও সহজ নয়।

এইরাষ্ট্রের কয়েকজন নাগরিক কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান আছে; তাঁদের মুখপত্রের নাম—World Over Press (ওয়ার্লড ওভার প্রেস)। মাত্র ৮ পৃষ্ঠার পত্রিকাখানি অনেক সময় যুক্তরাষ্ট্রের কার্য্যকলাপের মর্ম্মার্থ আমাদের নিকট বোধগম্য করিয়া দেয়।

সেইমত এই পত্রিকার ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বহিতৈষণার প্রকৃত মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়া পড়িয়াছে। সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের আদর্শের সহায়করূপে "খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠান" নামে একটি সঙ্ঘ আছে। বিশ্বের কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করা এবং খাদ্যদ্রব্যাদির বণ্টনের সমব্যবস্থার উপায় উদ্ভাবন করা এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কর্ত্তব্য। গত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ইহার একটি অধিবেশন হয়। ৬২টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, খাদ্য উৎপাদনে বাড়তি দেশসমূহ হইতে ঘাটতি দেশসমূহে [illegible]

[illegible] করা হউক যাহা নানা খুঁটিনাটি বাধার পথ সহজ ও সরল করিতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানের নাম হইবে International Commodity Clearing House—আন্তর্জাতিক খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চলাচল সহজ করিবার জন্য প্রতিষ্ঠান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকশ্রেণীর তিনটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান—National Grange, Farm Bureau, Farmer's Union ন্যাশন্যাল গ্রেঞ্জ, ফার্ম বুরো, ফার্মার্স ইউনিয়ন—এই প্রস্তাবের পক্ষে মত দেয়। স্বর্গত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের আমলের অর্থ-সচিব হেনরি মরগানথো জুনিয়র এই প্রস্তাবের এত বড় সমর্থক হইয়া উঠেন যে তিনি একটি প্রবন্ধে লিখেন, তাঁর দেশের বাড়তি খাদ্য-শস্য দান করিয়া দেওয়া হউক; তাতে ক্ষতি হইবে না, কারণ এই খাদ্য শস্য রক্ষা করিতে দৈনিক প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে দ্বিধার ভাব দেখা দিয়াছে। এক পক্ষে তাঁহারা ভাবিতেছেন যে বিশ্বব্যাপী খাদ্য-অনটনের সময় বাড়তি শস্য যক্ষের ধনের মতন ধরিয়া রাখা অন্যায় (immoral)। এই মনোভাবের পক্ষে কোন দৃঢ় কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা বিশ্বহিতৈষণার প্রেরণা নাই। থাকিলে পণ্ডিত নেহরু যখন ন্যায্য মূল্য দিয়া ২ কোটি ৭০ লক্ষ মণ গমের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হাত পাতিয়াছিলেন, তার উত্তরে দরকষাকষি করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী শ্রেণী এরূপ ভাবে প্রস্তাবটা বাতিল করিয়া দিত না। একটা চাল টিপিলে যেমন বুঝা যায় ভাত হইল কিনা, সেইরূপ ভারতবাসী বুঝিয়াছে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে প্রচারিত বিশ্বহিতৈষণা ও বিশ্ব-নেতৃত্বের মূল্য কি।

জার্ম্মানীকে লইয়া উভয় সঙ্কট

গত যুদ্ধে বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রধান চারিটি—যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স—জার্ম্মানীকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। পরাজিত জার্ম্মানীকে আবার মাথা তুলিতে দিবেন না, এইরূপ একটা নীতি বুঝিতে কষ্ট হয় না, তার সামরিক পুনরভ্যুত্থান অসম্ভব করিবার জন্য তার শিল্প-প্রতিষ্ঠানাদির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে হইবে, এ-ও বুঝিতে পারি। কিন্তু ৬।৭ কোটি লোককে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে ভাত-কাপড় জোগাড় করিবার সুযোগ দিয়া তাদের পরিশ্রম ও কৌশল সুপথে পরিচালিত করিতে না পারিলে বিজয়ী শক্তিবর্গকে এই লোক-সমষ্টিকে বসাইয়া বসাইয়া খাওয়াইতে হয়। মার্কিন রাজনীতিক হেনরি মরগেনথো (জুনিয়ার) প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে জার্ম্মানীকে একেবারে কৃষি-প্রধান দেশে পরিণত করা হউক, তার শিল্প-বাণিজ্যের বিরাট আয়োজন—কল-কলকারখানা প্রভৃতি—বিজয়ী দেশসমূহে স্থানান্তরিত [illegible]

হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে; এবং জার্ম্মানীর সামরিক পুনরুত্থানের আশঙ্কা চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

জার্ম্মানীর অনেক কলকারখানা ক্ষতিপূরণের নামে বিজয়ী রাষ্ট্রেরা নিজ নিজ এলাকায় লইয়া গিয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্র নির্ম্মমভাবে তাহা করিয়াছে; অন্য তিনটি উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছে। জার্ম্মানীর লোক-সমষ্টিকে বাঁচাইয়া রাখিবার পক্ষে শিল্পাদির কলকারখানা একেবারে নিঃশেষ করিতে গেলে যে দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে তুলিয়া নিতে হয়, তাহা দেখিয়া তাঁরা ভয় পাইয়াছেন। তাঁদের দ্বিধার আর একটা কারণও আছে। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনাধীনে শিল্প-বাণিজ্যের সংগঠন যুক্তরাষ্ট্র চায় না, তাদের ব্যষ্টিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এই নীতি-প্রবর্ত্তনের পথে বাধারূপে দাঁড়াইয়া আছে। ব্রিটেন অর্দ্ধেক সমাজতান্ত্রিক বলিয়া সোভিয়েট নীতির বিরুদ্ধে যাইতে পারে না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির বিরুদ্ধেও নানা কারণে যাইতে পারে না। ফ্রান্স জার্ম্মানীকে শক্তিমান দেখিতে চায় না বলিয়া মন খুলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নীতির সপক্ষে যাইতে পারিতেছে না। সোভিয়েট রাষ্ট্রের এরূপ দ্বিধার বালাই নাই। সে রাষ্ট্রের মালিকানায় বিশ্বাসী ও তার অধিকৃত অংশের জার্ম্মানীকে—ওডার নদীর পূর্ব্বাংশকে—নিজের ভাবে গড়িয়া তুলিতেছে। সে ২০ লক্ষ রাশিয়ান কৃষককে তাহার নীতির পায়ে বলি দিতে সঙ্কোচ বোধ করে নাই, তাহার জাতশত্রু টিউটনকে দয়া করিবার কোন কারণ নাই।

কিন্তু পশ্চিম জার্ম্মানীতে দো-টানা নীতি চলিতেছে। দুইটি দৃষ্টান্ত দিলে এই অবস্থাটা বুঝা সহজ হইবে। গত বৎসরের শেষভাগে স্থির হয় যে জার্ম্মানীর কলকারখানা আর ভাঙ্গা হইবে না। ব্রিটিশ এলাকায় অবস্থিত গেলছেনবার্জ বেনজিন এ-জি—Gelsenberg Benzin A. G—এই শিল্পের কারখানাটি রক্ষা করিবার জন্য প্রায় ১৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়, ভাঙাচুরা সারানো হয়, কোন কোন স্থলে নূতন কলকারখান'ও বসানো হয়। এই প্রতিষ্ঠানে কয়লা হইতে কৃত্রিম তৈল প্রস্তুত করা হইত, বর্ত্তমানে দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৭০ হাজার মণ হইতে পারে।

১৯৪৯ সালের মার্চ্চ মাসের শেষে নূতন উদ্যমে কারখানাটি চালাইবার ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ হয়। এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতে নূতন হুকুম আসিল কারখানাটি ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য। ১৯৪৯ সালের ৮ই এপ্রিল এই হুকুম আসে। যদি তাহা প্রতি-পালিত হয় তাহা হইলে প্রায় ৩০০০ পরিবার বেকার হইবে, প্রায় ১৭০ হাজার মণ তৈল বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে। গত নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই হুকুম পালন করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু কারখানাটি অচল হইয়া আছে।

গত চৈত্র মাসে ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনীর পাহারায় একটি ইস্পাত কারখানা ভাঙিয়া ফেলা হইতেছিল। জার্ম্মান শ্রমিক বাধা দিতে গিয়া গুলির আঘাতে মরিয়াছে। ফলে জার্ম্মান জাতির মন পাশ্চাত্য শক্তিত্রয়ের বিরুদ্ধে নূতন করিয়া বিষাইয়া উঠিতেছে; পূর্ব্ব জার্ম্মানী হইতে কম্যুনিষ্ট প্রচারযন্ত্র এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া জার্ম্মান শ্রমশক্তি ও বুদ্ধিশক্তির সদ্ব্যবহার করিবার সুযোগ-অপহরণকারীর বিরুদ্ধে জার্ম্মানীর গণ-মন উত্তেজিত করিতেছে। এই উভয় সঙ্কটের মুখে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের এই তিন প্রধান কার্পণ্য-দোষগ্রস্ত হইয়া আছেন।

অস্পৃশ্যতা

গান্ধীজী আজ ইহলোকে নাই। তাঁহার নানা অসম্পূর্ণ কার্য্যের মধ্যে অস্পৃশ্যতা প্রথার অবসান তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য বস্তু ছিল। কারণ তিনি অনুভব ও বিশ্বাস করিতেন যে, "অস্পৃশ্যতা যদি হিন্দু ধর্ম্মের অঙ্গ হয়" তবে তিনি হিন্দু থাকিতে পারেন না। এই বিষয়ে তাঁহার মনোভাব স্বর্গত "চার্লি" এনড্রুজের নিকট লিখিত একখানি পত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পত্রখানি তিনি কলিকাতা হইতে ১৯২১ সালে ২৯শে জানুয়ারি তারিখে লেখেন। গত ১৫ই মাঘের "হরিজন" পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিয়া আমাদের দেশের একটি অবশ্যকর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে:

"এ কাজে আপনার প্রভাব দ্বারা আমি পরিচালিত হইতেছি এই কথা বলিয়া গুজরাটীরা আমার চেষ্টাকে দুর্ব্বল করিতে চাহিতেছে। তাহারা বলিতে চাহে, আমি যাহা বলি তাহা হিন্দুরূপে বলি না, বলি আপনার প্রভাবে স্ব-ধর্ম্মভ্রষ্ট এক ব্যক্তি রূপে। আমি জানি এ সব বাজে কথা। আপনার নাম শুনিবার পূর্ব্বে দক্ষিণ-আফ্রিকায় এ কাজ আমি আরম্ভ করি এবং দক্ষিণ-আফ্রিকায় অন্য কোন খ্রীষ্টানের প্রভাবে পড়িবার পূর্ব্বেই অস্পৃশ্যতাকে আমি পাপ বলিয়া মনে করিতাম। আমি যখন শিশু ছিলাম তখনই এই সত্য আমার নিকট প্রকাশ পাইয়াছিল। আমি এবং আমার ভায়েরা যদি কোন পারীয়াকে স্পর্শ করিতাম তবে আমার মাতা আমাকে স্নান করিতে বাধ্য করিতেন বলিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতাম। ডারবানে ১৮৯৭ সালে শ্রীযুক্তা গান্ধীকে আমি গৃহ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, কারণ তিনি লরেন্সের সহিত সাম্যপূর্ণ ব্যবহার করিতে রাজী ছিলেন না। তিনি জানিতেন লরেন্স পারীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, আমি তাহাকে আমার সঙ্গে বাস করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলাম। অস্পৃশ্যদের সেবা আমার জীবনের এক গভীর স্পৃহা। কারণ আমি অনুভব করিয়াছিলাম অস্পৃশ্যতা যদি হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ হয় তবে আমি হিন্দু থাকিতে পারি না।"

ভবানী দয়াল

মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে এই সন্ন্যাসী তাঁহার প্রার্থিতলোকে চলিয়া গেলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী নিজের জাতির আত্মসম্মান রক্ষার্থ যে সংগ্রাম আরম্ভ করেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাহা চালাইয়া যাওয়ার দায়িত্ব ভবানী দয়ালের উপর আসিয়া পড়ে। তিনি গৃহী ছিলেন যদিও পত্নী বিয়োগের পর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আফ্রিকায় গিয়া তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়াইয়া পড়েন এবং প্রায় ২৫ বৎসর এই বিদেশে তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়া যান। আজমীড়ে তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে। আমরা তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্মজীবনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

কন্যাদের বিবাহ হবে না?

(২)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

[গত বৈশাখের 'প্রবাসী'তে ২১-এর পৃষ্ঠা, ২য় পাটি, ৬ষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে একটা বিষম ভুল ছাপা হয়েছে। 'বিধবার খোঁপা বাঁধবার' না হয়ে হবে—বিনাবার ও খোঁপা বাঁধবার।]

নরনারীর সৌন্দর্য-স্পৃহা স্বাভাবিক। সকল জাতিরই এই প্রবৃত্তি আছে, কেবল এক এক জাতি এক এক প্রকারে সে প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করে। আমাদের দেশে এই প্রবৃত্তি যে আকারে প্রকাশ পায়, অন্য দেশে সে আকারে পায় না। সকলের রূপ থাকে না, বেশভূষা দ্বারা সকলে রূপবান্ হ'তে চায়। নর ও নারী সুন্দর সেজে পরস্পরকে আকর্ষণ করতে চায়।

যৌবনকালেই সৌন্দর্য-স্পৃহা প্রবল হয়। কিন্তু আমাদের দেশে অতি অল্প বয়সেই বালিকারা বুঝতে পারে, তারা সুন্দর কি অসুন্দর। একবার আমি এক পাঁচ বছরের কন্যাকে বলেছিলাম, "তুমি ভারি সুন্দর।" সে তৎক্ষণাৎ বলেছিল, "আমি সুন্দর নই, আমি কালো।" সে বুঝেছিল, রং ফরসা হ'লেই সুন্দর। বয়স যত বাড়তে থাকে, "আমি সুন্দর, আমি অসুন্দর," এই জ্ঞানও তত পাকা হতে থাকে। আর, সুন্দরীই হউক, আর অসুন্দরীই হউক, কি করলে সুন্দরী দেখায়, সে কথা ভাবতে থাকে। এটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। নরজাতিকে আকর্ষণ করবার জন্য বিশ্বকর্মা নারীকে এই প্রবৃত্তি দিয়েছেন। কিন্তু এই প্রবৃত্তির আতিশয্য ব্যসন-স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। বয়েরা এরূপ কন্যাকে ডরায়, অন্যেরা অপদার্থ মনে করে।

বিশ্বকর্মা সকল নারীকে সমান রূপ দেন নাই। যার রূপ নাই, সে কৃত্রিম উপায়ে রূপসী হতে পারে না। রূপ শব্দে বুঝি শ্বেত-কৃষ্ণাদিবর্ণ, আকৃতি আর সৌন্দর্য। কবিরা উপমাদ্বারা এই তিন অর্থ বুঝিয়ে গেছেন। আমরা বলি, মেয়েটি কালো, মেয়েটি গোরা, মেয়েটির নাক-মুখ-চোখ ভাল; কিম্বা বলি, মেয়েটি সুন্দরী। যাকে দেখলে আনন্দ হয়, সে-ই সুন্দরী। উপরে যে পাঁচ বছরের মেয়েটির কথা লিখেছি, সে আ-কৃষ্ণ বটে, কিন্তু সত্যই সুন্দরী ছিল। তাকে দেখে আমার আনন্দ হ'ত। শুধু আমার নয়, যে দেখত তারই আনন্দ হ'ত।

কিসে সৌন্দর্য হয়, কিসে হয় না, তার বিশ্লেষণ ভাবি কঠিন। কন্যা গোরা হ'লেই সুন্দরী হয় না, কেবল নাক-মুখ-চোখের গড়ন ভাল হ'লেও হয় না, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য থাকলেও হয় না। কেহ লিখেছেন,

"বাহুতে মৃণাল হেরি, নয়নে কুরঙ্গ।
গ্রীবাতে মরাল হেরি, বেণীতে ভুজঙ্গ॥"

কেমন বাহু? মৃণালের তুল্য। বঙ্কিমচন্দ্র "মৃণালিনী"তে লিখেছেন, "কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে।" এখানে তিনি ভুল করেছেন। মৃণালে কণ্টক নাই। পদ্মের মূল হ'তে শাখা বহির্গত হয়, পাঁকের ভিতর দিয়ে একটু দূরে যেয়ে উপর দিকে বেড়ে আর একটি গাছ হয়। সেই শাখার নাম মৃণাল। মৃণাল শাদা কোমল ও গোল, আরম্ভ হতে ক্রমশঃ সরু হয়ে উপরে উঠে। চলিত বাংলা নাম মূলাম। কেহ মূলাম ভেজে খায়, কেহ বা কাঁচাই খায়। নয়ন কি রকম? কুরঙ্গ-নয়ন-তুল্য। কুরঙ্গ মেষতুল্য ছোট এক প্রকার হরিণ। সহজে পোষ মানে, কিন্তু বাঁচে না। চোখ বড়, ভাসা ভাসা, দৃষ্টি কোমল, আর সর্বদা যেন চকিত। কুরঙ্গকে ওড়িয়াতে খুরং বলে। গ্রীবাতে মরাল। মরাল রাজহাঁস। অর্থাৎ গ্রীবা দীর্ঘ, সম্মুখে তরঙ্গিত। বেণীতে ভুজঙ্গ, অর্থাৎ বেণী দীর্ঘ ও উপর হ'তে নীচের দিকে ক্রমশঃ সরু। কিন্তু এই বর্ণনা হ'তে সে কন্যা সুন্দরী কি অসুন্দরী, বুঝতে পারা যায় না।

কবিরা এইরূপ এক এক অঙ্গের এক এক উপমা দিয়েছেন। যেমন, জয়দেব ও বড়ু চণ্ডীদাস রাধিকার গণ্ড-যুগলে মহুয়ার ফুল দেখেছিলেন। অর্থাৎ গণ্ডযুগল পীতাভ ও স্ফীত। বড়ু রাধিকার নাসারন্ধ্র গোল দেখেছিলেন, দুই রন্ধ্র যেন দুই নল। কবি-বর্ণিত 'তিলফুল জিনি নাসা' কিম্বা 'খগ-নাসা' দুর্লভ নয়; গ্রাম্য নারী বলে, 'কাটারী-পারা নাক'। ধনুর তুল্য বক্র ভ্রূ-ও দুর্লভ নয়। কৃষ্ণ পদ্ম-পলাশ-লোচন ছিলেন, অর্থাৎ চক্ষু পদ্ম-দলের তুল্য দীর্ঘ ও মধ্যে স্ফীত, ভাসা ভাসা; ক্ষুদ্র ও কোটর-গত নয়। ইহাই পটোল-চেরা চোখ। যার দৃষ্টি কুরঙ্গের তুল্য চকিত, সে কুরঙ্গ-নয়না। যৌবনে অধিকাংশ নারী কুরঙ্গ-নয়না হয়। যে নয়ন আয়ত হয়, পল্লব আর্দ্র বোধ হয় এবং ভ্রূ দীর্ঘ ও বঙ্কিম হয়, তাতে যদি কুরঙ্গদৃষ্টি থাকে, সে নয়ন আমাদিকে মুগ্ধ করে। তখন পাশের নাক মোটা কি সরু, কিছুই লক্ষ্য হয় না। নয়নই হাসে, নয়নই কাঁদে, নয়নই স্নেহ করে, নয়নই ক্রোধ করে। নয়নের এই সকল অসামান্য শক্তি ভাষায় প্রকাশ করতে পারা যায় না। 'খঞ্জন জিনিয়া আঁখি',—সে চক্ষু-গোলক এ-পাশ হ'তে সে-পাশে, সে-পাশ হ'তে এ-পাশে নিরন্তর নড়তে থাকে।

এইরূপ আঁখি দুর্লভ, কিন্তু আমার সুন্দর মনে হয় না। বিম্বোষ্ঠ, ওষ্ঠ পাকা তেলাকুঁচা ফলের ন্যায় লাল ও মধ্যে স্ফীত। এরূপ ওষ্ঠ গোরী কন্যাতেই সম্ভবে। এইরূপ এক এক অঙ্গ সুদৃশ্য হ'লেও পরস্পর সামঞ্জস্যের অভাবে আমাদের আনন্দের উদ্রেক করে না।

মুখের লাবণ্য একটা বিশেষ গুণ। কিন্তু সকল বর্ণে অথবা সকল বয়সে এই গুণ থাকে না। রূপে ঘর আলো হয়, কথাটা সত্য। যুবতী কন্যার গৌর মুখে লাবণ্য-লহরী খেলতে থাকলে তদ্দ্বারা রবিকর কিছুদূর পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হয়। তখন ঘর আলো হয়। এরূপ সর্বাঙ্গ-সুন্দরী কন্যা 'কোটিক গোটিএ' মিলে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু সর্বাঙ্গ-সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী হলেও এক অনির্বচনীয় গুণ না থাকলে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। সে গুণ মাধুর্য। যে কবি লিখেছেন,

"মাধুরিতে মাখা মু-খানি তার,
অতৃপ্ত-নয়নে হেরি বার বার"—

তিনিই সৌন্দর্যতত্ত্ব বুঝতে পেরেছেন। অন্য কবিরা শরতের পূর্ণশশীর সহিত সুন্দরীর মুখের তুলনা করেছেন। পূর্ণচন্দ্র, এর বাচ্যার্থ কিছুই নয়। পূর্ণচন্দ্রের পীত, উজ্জ্বল, স্নিগ্ধবর্ণ সুন্দর বটে, কিন্তু আমরা কি অতৃপ্ত নয়নে দেখতে থাকি? এর নিগূঢ় অর্থ আছে। চন্দ্রে অমৃত আছে, দেবতারা সে অমৃত পান করে' অমর হয়েছেন এবং চিরযৌবন পেয়েছেন। সুন্দরীর মুখ হ'তে যেন অমৃতরশ্মি দ্রষ্টার চোখে পড়ে এবং তাতেই দ্রষ্টা যুবত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা বলি, 'তার গানে যেন অমৃত বৃষ্টি হয়।' এখানেও সেই নিগূঢ় অর্থ। চক্ষু দ্বারা কিম্বা কর্ণ দ্বারা রূপের কিম্বা ধ্বনির এক অনির্বচনীয় শক্তি অনুভূত হয়। সে শক্তিই মাধুর্য। যার মুখে মাধুর্য নাই, সে মুখ আমাদিকে বার বার আকৃষ্ট করে না। সুদৃশ্য অবয়বে এর উৎপত্তি নয়, গাত্রবর্ণে নয়, লাবণ্যেও নয়। এর উৎপত্তি বিস্ময়ে। এখানে ভাষা পরাভূত হয়। তখন আমরা কেবল বলি, "কি সুন্দর! কি সুন্দর!"

বরেরা ফরসা মেয়ে খোঁজে। যে কালো নয়, সে ফরসা। সেটা যে কত বড় ভুল, যার সৌন্দর্যের অনুভূতি আছে, সেই বুঝতে পারে। একদিকে গোরা, আর একদিকে কালো। গোরা গৌরবর্ণা, যার বর্ণ রাঁধবার বাটা হলুদের মত; কেবল গাঢ় পীত নয়, ঈষৎ রক্ত। এই বর্ণে শ্বেত মিশ্রিত হ'তে হ'তে ফেকাসে দাঁড়ায়। ফেকাসে রং স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। এর সহিত অল্প কৃষ্ণ মিশ্রিত হ'লে তাকেও ফরসা বলা চলে, কিন্তু সে গোরা নয়। কৃষ্ণ অধিক হ'লে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ অতসী-কুসুম-শ্যাম ছিলেন। এই বর্ণের সহিত কেহ কেহ নীলোৎপল অর্থাৎ নীলকমল বা নীল-সুঁধির তুলনা করে গেছেন। এই দুই-এরই বর্ণ ঈষৎ নীল। পূর্বকালে কৃষ্ণ বর্ণকেও নীল বলা হ'ত। এমন মনোহর বর্ণ দুর্লভ। আমি দুই ভাইবোনের এবং অন্য পরিবারে এক কিশোরের ও তার জননীর মুখে এই বর্ণ দেখেছি। তাদের নাক মুখ চোখও ভাল ছিল। পুরীতে এই বর্ণের এক কিশোর মোহন্তের কপালে শ্বেত-চন্দনের তোরণ এবং দু'পাশে তিলকপাতার (তিলপাতা নয়, তিলক গাছের পাতা, বনা তিলা গাছ) চিত্র দেখেছিলাম। তার মুখ কি সুন্দর দেখাচ্ছিল! কৃষ্ণবর্ণ অল্প গাঢ় হ'লে মহিষবর্ণ হয়। আরও গাঢ় হ'লে গ্রাম্যজনে বলে, 'ধান সিজা হাঁড়ির মত কালো' অর্থাৎ মীস কালো, মসীবর্ণ, একেবারে কান্তিশূন্য। কদাচিৎ বার্ণিশ-করা কালোও দেখতে পাওয়া যায়। হঠাৎ এই বর্ণ দেখলে চমকে' উঠতে হয়। যারা বিয়ের কনে' দেখে কিম্বা বর দেখে, তারা প্রায়ই গায়ের রং দেখে ভুলে যায়। কিন্তু মাধুর্য গায়ের রং এ হয় না।

বিবাহের কন্যা বাছাই বড় সোজা কাজ নয়। (১) প্রথমে তার কুল দেখতে হবে, সৎকুল কি দুষ্কুল। কুল অর্থাৎ বংশ। যে কুলে কীর্তিমান্‌ উদার-চরিত, সৎস্বভাব পুরুষের জন্ম হয়েছে, সে কুলের কন্যাও উত্তম দৃষ্টান্ত পায়, কন্যা সুশীল হয়ে থাকে। যে কন্যার পিতা কিম্বা ভ্রাতা কলহপ্রিয়, অসচ্চরিত্র, প্রবঞ্চক, চোর (যেমন উৎকোচ গ্রাহক, খাদ্য-মিশ্রক) পরস্বাপহরক, সে কন্যা এই এই কর্ম দেখে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তার স্বভাবও সেইরূপ হ'তে থাকে। সে কুল অবশ্য বর্জনীয়। দৈত্যকুলে প্রহলাদের জন্ম হয় বটে, কিন্তু কদাচিৎ। (২) কন্যার শীল, কন্যার আচরণ দেখতে হবে, কন্যা সুশীল কি দুঃশীল। কন্যার দাঁড়ান ও বসবার ভঙ্গি, তার কথার ধরণ, চোখের দৃষ্টি ইত্যাদি খুঁটিনাটি দ্বারা শীল কতকটা অনুমান করতে পারা যায়। (৩) বুদ্ধি। নির্বুদ্ধি কিম্বা জড়বুদ্ধি কন্যা পরিত্যাজ্য। আজকাল গ্রামের কন্যারাও অল্প-স্বল্প লিখতে পড়তে শিখেছে, তারা গৃহস্থালীও জানে। কিন্তু এই দুইএর বুদ্ধি এক প্রকার, আর সংসারে হঠাৎ কিছুর অভাব ঘটলে যে বুদ্ধি তা পূরণ করতে পারে, সে বুদ্ধি আর এক প্রকার। এর নাম প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। এই গুণের গৃহিণীই কোন কিছু ঘটলে অস্থির হয়ে পড়ে না। (৪) কন্যার কান্তি অর্থাৎ মুখের দীপ্তি। এর দ্বারা কন্যার স্বাস্থ্য বুঝতে পারা যায়। যৌবনারম্ভে অধিকাংশ কন্যার কান্তি প্রকাশ পায়। অতিশয় কৃষ্ণা কন্যার কান্তি অল্প কয়েক বৎসরেই অদৃশ্য হয়। কিন্তু মাধুর্য থাকলে শীঘ্র লুপ্ত হয় না। (৫) সঞ্চারী রোগ (যেমন যক্ষ্মা, উদরপীড়া)। পূর্বকালে কুষ্ঠ রোগকে সঞ্চারী মনে করা হ'ত, ইদানীং তা মনে করা হয় না। কিন্তু

বাড়ীতে কারও থাকলে সংস্পর্শের আশঙ্কা অবশ্য করতে হবে। বংশে কেহ বোবা, কালা, জড়, কিম্বা বিকৃত-মস্তিষ্ক থাকলে বুঝতে পারা যায়, সে বংশের পূর্বপুরুষ দুশ্চরিত্র ছিলেন। সে দোষ কন্যাতে না থাকলেও তাঁর পুত্র কন্যায় এমন কি তাঁর পৌত্র পৌত্রীতে প্রকাশ পেতে পারে। (৬) কন্যা বিকলাঙ্গ ও চিররুগ্ন হবে না। (৭) যে কন্যার অনেক বোন আছে, গৃহিণীরা সে কন্যাকে বউ করে' আনতে ভয় করেন। আশঙ্কা, তারও অনেক কন্যা হবে, আর সে সব কন্যার বিবাহ দুর্ঘট হয়ে পড়বে। (৮) কন্যার ভাই থাকা চাই। মনুও এই বিধি দিয়েছেন। "কুমার সম্ভবে" কালিদাস লিখেছেন, পার্বতীর এক ভাই ছিল। এই উল্লেখের নিশ্চয় প্রয়োজন ছিল, কবি তা লেখেন নাই। টীকাকার মল্লিনাথ লিখেছেন, কন্যার ভাই থাকা চাই, তাই কবি উল্লেখ করেছেন। কেন চাই, তা সবাই জানত, টীকাকার ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাই থাকার প্রথম প্রয়োজন, কন্যা পতিপুত্রহীনা হ'লে এবং শ্বশুর-বাড়ীতে অনাদর দেখলে বাপের বাড়ী যেয়ে থাকতে পারে এবং তাই থাকে। এ ছাড়া আরও প্রয়োজন আছে। দম্পতীর কলহ হয়ই হয়। তখন স্ত্রী দেখাতে চায়, তার শ্বশুরবাড়ীই একমাত্র আশ্রয় নয়, তার সুখে থাকবার অন্য ঠাঁই আছে। সে ঠাঁই বাপের বাড়ী ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না। কিন্তু সেখানে গেলেই দু'এক দিনের মধ্যে তার নিজের ঘরকন্নার কথা মনে আসে। ভাবতে থাকে, তার স্বামী কোথায় খাচ্ছে, কে খেতে দিচ্ছে, চাকর-বাকর থাকলেও সময়ে ঠিকমত খেতে জুটছে না, ঘরেও থাকতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে থাকে, তার সংসার লণ্ডভণ্ড হচ্ছে, পরে গুছিয়ে নিতে তাকেই ভুগতে হবে। তখন আর সে থাকতে পারে না, ফিরে আসবার জন্য ব্যগ্র হয়। যখন ফিরে আসে, তখন সে আলাদা মানুষ, যেন কিছুই হয় নাই। তার ভাই না থাকলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াত? শুনেছি, কলিকাতায় নব্য-সমাজে স্ত্রী ঘর আগলে' বসে' থাকেন, স্বামী হোটেলে চলে' যান। কিন্তু এখানে স্ত্রীর স্থান পরিবর্তন হ'ল না, ভাইবোনদের দেখা পেলে না, তার রাগও সহজে পড়ে না। এ দুইএর মধ্যে কোন্‌টা ভাল?

(৯) সকলেই জানে, সমান ঘরে বিবাহ হওয়াই শ্রেয়ঃ। সমান ঘর, অর্থাৎ আচারে, সংস্কারে, ধনে, মানে সমান। এরূপ স্থলে কন্যা পিতৃগৃহে যেমন ছিল, শ্বশুরগৃহেও তেমনই থাকে, শ্বশুরগৃহের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশে যায়। সমান ঘর না পাওয়া গেলে কন্যাকে উঁচু ঘরে দেওয়া উচিত, কদাপি নীচু ঘরে নয়। সকল জাতির মধ্যেই উঁচু-নীচু ভাব আছে, কুলীন-মৌলিক ভাগ আছে। এই কারণেই মৌলিকের ঘরে কুলীন-কন্যার বিবাহ হ'ত না, কুলীন মৌলিক-কন্যা আনতে পারত। পূর্বে যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, এই চারি বর্ণ-ভেদ ছিল, তখন ব্রাহ্মণ-বর ব্রাহ্মণ-কন্যা না পেলে ক্ষত্রিয়-কন্যা, তাও না পেলে বৈশ্য-কন্যা এবং কদাচিৎ শূদ্র-কন্যা বিবাহ করতেন। কিন্তু শূদ্রা পত্নী দাসী হয়ে থাকত, ধর্মকর্মে তার অধিকার থাকত না। এর নাম অনুলোম বিবাহ। কিন্তু এর বিপরীত, নিম্নবর্ণের পুরুষ উচ্চবর্ণের কন্যা গ্রহণ করলে সমাজে নিন্দিত হ'ত। এর নাম প্রতিলোম বিবাহ। এটা কুসংস্কার নয়, এর বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। পুরুষকে বীজ, নারীকে ক্ষেত্র বলা হ'ত। সন্তানে বীজের প্রভাব সমধিক, ক্ষেত্রের তত নয়। প্রাচীনেরা এর সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেন,—ধান্য হ'তে ধান্যই উৎপন্ন হয়, তিল হয় না, ক্ষেত্র যেমনই হউক। (১০) সকলেই জানে ও মানে, বর বয়সে বড়, কন্যা ছোট হওয়া চাই। কেন চাই, তারও বৈজ্ঞানিক হেতু আছে। কিন্তু কত বৎসরের অন্তর হবে? পূর্বে দশ বৎসরের কন্যার সহিত ত্রিশ বৎসরের বরের বিবাহ হ'ত। অন্ততঃ আট-দশ বৎসরের অন্তর থাকলে ভাল।

এখানে কন্যার রূপের উল্লেখ করলাম না। কারণ রূপ দ্বারা বংশের কিম্বা সংসারের ইষ্টানিষ্ট হয় না।

এত তত্ত্ব বুঝে কন্যা দেখা হয় কি না সন্দেহ। কলিকাতায় কনে' দেখা এক বিচিত্র ব্যাপার। অনেক বৎসর পূর্বে একদিন সকালবেলা আমি এক বন্ধুর সহিত দেখা করতে গেছলাম। তাঁর বসবার ঘরে এক পাশে এক তক্তাপোষ ছিল। তিনি তা'তে বসেছিলেন, আমিও বসলাম। ঘরের অন্য দিকে খানকয়েক চেয়ার আর একটা বড় টেবিল ছিল। একটু বসেছি, দেখি এক চাকর এসে বাইরের দরজার নিকটে দু'খানা চেয়ার আর ভিতরের দরজার নিকটে একখানা চেয়ার রেখে চলে' গেল। মাঝ-খানে টেবিল। একটু পরেই দেখি, দুটি আগন্তুক এসে সে দুই চেয়ারে বসল। আর ভিতর হ'তে বন্ধুর দৌহিত্রী অঞ্জলি এলোচুলে এসে সেই দিকের চেয়ারে বসে' টেবিলের দিকে চেয়ে রইল। আমি কিছুই জানি না, ভাবছি একি হচ্ছে। সেই আগন্তুক দু-জনের একজন গলা বাড়িয়ে অঞ্জলির পানে একদৃষ্টে এমন চেয়ে রইল, দেখে আমার রাগ হ'তে লাগল। কথা নাই। পাঁচ-সাত মিনিট এই মূক অভিনয় চলল। তারপর তারা দু-জন উঠল। "এর পর জানাব" বলে' চলে' গেল। অঞ্জলি ভিতরে ঢুকে তার মাকে বলছে, "এরা কি জুতো কিনতে এসেছিল?" আমি বলে' উঠলাম, "দেখ্, তুই যদি তোর চটি খুলে সেই বর্বরটার দু-গালে দু-ঘা বসিয়ে দিতিস্ আমি খুব খুসী

হ'তাম।" বন্ধু হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, "এ সব কি হ'ল? আপনি কেমন করে' চুপ করে' আছেন?" তিনি বললেন, "কনে' দেখতে এসেছিল। এই তিনবার হয়ে গেল।"

"একটা চৌদ্দ বছরের মেয়ের মুখ দেখতে কতক্ষণ লাগে?"

"এ সব সইতে হবে। কলিকাতার এই ধরণ।"

"আপনি অঞ্জলির ফটো তুলিয়ে রাখুন। আর, যখন ঘটক সম্বন্ধ আনবে, তখন ফটো দেবেন। বরের সগোষ্ঠী বাপ-মা সে ফটো নিরীক্ষণ করবে। আর, আপনিও বর ও তার ভাই বোনদের ফটো দেখবেন। তখন উভয়ের মন হ'লে দেনা-পাওনার কথা পাড়বেন। যখন সেখানেও মিটে যাবে, তখন কন্যা দেখাবেন।

"কলিকাতায় এ চলে না।"

"তা হলে দেখছি, বাড়ীতে বাড়ীতে কন্যা-প্রদর্শনী খুলতে হবে।"

সত্যই তাই। ঘটক বলে' আসে, অমুক দিন বেলা সাতটার সময়, কোথাও দশটার সময়, কোথাও দুটোর সময়, কোথাও সন্ধ্যাকালে বরের পিতা কিম্বা তার ভাই কিম্বা খুড়ো কনে' দেখতে আসবে। এরাও যথাসময়ে যায়। আর কন্যা এলোচুল করে' এসে দেখা দেয়। কখনও বা কন্যাকে দু-পাঁচটা কিছু জিজ্ঞাসা করে, কখনও বা তাও করে না। কন্যাদের এই অভিনয় অভ্যাস হয়ে যায়। মিষ্টি মুখ করাবার বালাই নাই, আর কতবার কতজনকেই বা করাবে?

এইরূপ কন্যা-প্রদর্শনী বরং সহ্য হয়, কিন্তু যখন শুনি কলিকাতার বরের পিতা দূরস্থ কন্যার পিতাকে হুকুম করেন, "তোমার মেয়েকে এখানে আন, আমরা যেতে পারব না." তখন সেই বরের পিতাকে জাল্ম বলব, না পামর বলব, বুঝতে পারি না। যিনি কন্যার এমন অপমান করতে পারেন, তিনি শ্বশুর হবার যোগ্য নন। পাণিপ্রার্থী হয়ে বরই কন্যার গৃহে যায়, কোথাও কন্যা বরের বাড়ী যায় কি? উদ্ভিদ কিম্বা প্রাণীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত আছে কি? সে কন্যা তাঁর পুত্রবধূ হ'তে পারে, সে পিতার এই সামান্য জ্ঞানটুকুও নাই। আর যিনি পুত্রবধূকে এইরূপ অপমান করতে পারেন, তাঁর সহিত সম্বন্ধ অবশ্য পরিত্যাজ্য। তিনি কন্যার ফটো চেয়ে পাঠাতে পারেন; তাতে মন হ'লে দেনা-পাওনা চুকিয়ে ফেলতে পারেন। এই দুই কর্ম নিষ্পত্তি হ'লে আর বরের পিতা বৃদ্ধ কিম্বা গমনাগমনে অসমর্থ হ'লে কন্যাকে কলিকাতায় কোনও আত্মীয়ের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারা যায়।

বর-বাছাই সম্বন্ধে এক প্রচলিত শ্লোক আছে,—

"কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবা কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥"

(১) কন্যা বরের রূপ চায়। যদি তাকে স্বয়ম্বরা হ'তে বলা হয়, সে কদাপি মৃদু, ভীরু, স্ত্রী-ভাব, দীর্ঘাঙ্গ, কুব্জপৃষ্ঠ, কোটর-চক্ষু, শীর্ণ, মহিষবর্ণ বরের গলায় মালা দেবে না। সে চায় সুপুরুষ, অর্থাৎ রূপবান পুরুষ, যে রূপে পৌরুষ ও বিক্রম আছে। যে যুবক গোঁফ কামিয়ে নারী সাজে কিম্বা মুখে পাউডার মাখে, কন্যারা তাকে অপদার্থ মনে করে। যে যুবক 'বাটারফ্লাই' অথবা ইদানীর 'ডগলাস' গোঁফ রেখে মনে করে, তাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, অথবা পোশাকে ফুলবাবু সাজে, তরুণীরা তাকে ঘৃণা করে।

(২) কন্যার মাতা চান বরের বিত্ত, মেয়েটি খেয়ে পরে' সুখে থাকবে। এই বিত্ত নূতন চাকরির বেতন নয়, চাকরি গেলেও কন্যা খেতে পাবে, সে পরিমাণে বরের সম্পত্তি থাকা চাই।

(৩) কন্যার পিতা চান বরের বিদ্যা, যা থাকলে বর সভ্য-ভব্য, সম্মানিত, মার্জিতরুচি ও বিবেকসম্পন্ন হ'তে পারে। আকাট মূর্খের হাতে কোনও পিতা কন্যা সমর্পণ করতে চান না। যাদের বিত্ত নাই, বিদ্যাও নাই, তাদিকে কন্যা ক্রয় করতে হয়। আমরা শুনি কেবল বরপণ, কিন্তু কন্যাপণ বহু বহু প্রচলিত আছে। এত লেখাপড়ার দিনেও ব্রাহ্মণ-জাতির মধ্যেও আছে। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে লেখাপড়া-জানা কিন্তু দরিদ্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে আড়াই-শ তিন-শ টাকা পণ দিয়ে তিন-চারি বৎসরের কন্যা ক্রয় করতে হ'ত। অন্য বহু জাতির মধ্যে আইবুড়া নাম ঘুচাবার জন্য ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের বরকে তিন-চারি বৎসরের কন্যা কিনতে হয়। নানাবিধ বিবাহের মধ্যে ইহা জঘন্য বিবেচিত হ'ত। অনার্যদের মধ্যেই এই বিবাহ প্রচলিত ছিল। এখনও যাদিকে অনার্য বলতে পারা যায়, তাদের মধ্যেই বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। বংশরক্ষার নিমিত্ত কদাচিৎ দ্বিজাতিরাও কন্যা ক্রয় করতেন। কন্যাপণের বদলে দু-একখানা অতিরিক্ত গয়না করে' দিলে দুঃখের দিনে তার একটা সম্বল থাকত। কিন্তু নিষ্ঠুর পিতা সে টাকা আত্মসাৎ করে' কন্যা বলি দেয়। কন্যা অল্প, বর বেশী হ'লেই এই অবস্থা ঘটে। শোনা যায় ঢাকায় 'ভরার মেয়ে'র এইরূপ বলি হ'ত। দালালেরা গ্রামে গ্রামে কন্যা কিনে নিয়ে ভরায় অর্থাৎ নৌকায় করে' ঢাকায় আনত, আর সেখানে বিবাহিত অবিবাহিত পুরুষেরা কন্যা বেছে কিনে নিত। দালাল কাকেও বামুনের মেয়ে কাকেও অন্যজাতির মেয়ে ব'লত। তার কথাই প্রমাণ হয়ে বিয়ে হয়ে যেত।

এক-শ বছর পূর্বেও নাকি এই 'ভরার মেয়ে' আসত। অন্য আকারে কন্যা-পণ উচ্চ জাতির মধ্যেও প্রচলিত আছে। কুলীন কন্যার পিতা কুলীন বর খোজেন, না পেলে মৌলিক বরে পণ নিয়ে বিবাহ দেন। কুলীনেরা এই পণকে কৌলিন্য মর্যাদা বলেন। কন্যা-পণের বিপরীত বরপণ। বরের পিতা পুত্র বেচে টাকা নেন। যদি বরের পিতা সে টাকা নিজে না নিয়ে কন্যার যৌতুক করে' দিতেন, তা হ'লেও মন্দের ভাল হ'ত। কন্যার পিতা মাত্রেই এই কুপ্রথায় উৎপীড়িত হয়ে আসছেন। বরেরাই এই প্রথা উঠ্‌তে দিচ্ছে না। বর-বাবাজীরা পণ আদায় করে' আত্মগরিমা তৃপ্ত করে,—দেখ, আমাকে পাবার জন্য ভাবী শ্বশুর কত সাধেন, আমি মানী, এই জন্যই টাকা দেন। যদি তারা টাকা না চাইত, তাহ'লে তাদের বাবারাও চাইতেন না। বরের পূজা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু সে পূজা শ্বশুরকে উৎপীড়ন নয়। পূর্বে অল্প বয়সে কন্যাদের বিবাহ হ'ত। তখন কন্যারা বরপণের প্রকৃত অর্থ বুঝত না। এখন বেশী বয়সে বিবাহ হচ্ছে। এখন তারা, বিশেষতঃ শিক্ষিতা কন্যারা বরপণকে তাদের সম্মানের হানিকর মনে করে। কারণ এর প্রকৃত অর্থ, তাকে কেউ চায় নাই, বাবা টাকা দিয়ে ভুলিয়ে বর এনে দিয়েছেন।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। পাঁচ-ছ বছর পূর্বে এক বি-এ, বি-টি পাস কন্যা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ছ-মাস পূর্বে তার বিয়ে হয়েছিল।

"কত পণ লেগেছিল ?"

"পণ লাগে নাই।"

"এ ত আশ্চর্য কথা !"

"প্রথমে যেখানে সম্বন্ধ হয়েছিল, তারা দু-হাজার টাকা চেয়েছিল। আমি সেখানে বিয়ে করতে চাই নাই। তার পর আর এক জায়গায় সম্বন্ধ হ'ল। আমার শ্বশুর ঠাকুরের আয় অল্প। তিনি বিয়ের খরচ মাত্র ছ-শ টাকা নিয়েছিলেন।"

কন্যার নিবাস বরিশালে। যদি শিক্ষিত কুমারীরা এই রকম বেঁকে বসে, তা হ'লে বর-বাবাজীদের চৈতন্য হয়।

(৪) বান্ধবেরা সৎকুল ইচ্ছা করেন। আমরা বান্ধব শব্দের অর্থ ভুলে গেছি; বন্ধু শব্দের অর্থও ভুলে গেছি। আমরা এখন যাঁদিকে কুটুম্ব বলি, তাঁরাই বান্ধব, তাঁরাই বন্ধু। এঁরা তিন প্রকার,—পিতৃ-বন্ধু, মাতৃ-বন্ধু ও শ্বশুর-বন্ধু। নীচ-কুলে বিবাহ হ'লে তাঁদেরও গৌরবের হানি হয়।

(৫) অন্যেরা বিবাহে মিষ্টান্ন ইচ্ছা করে। তারা বর-যাত্রী অর্থাৎ বিবাহ-কর্মে বরের সহায় হয়। তারা কন্যার বাড়ীতে গিয়ে উত্তম চর্ব্য-চোষ্য পেতে চায়।

সকল বরের পিতাই বর-পণ দাবি করেন না। এমন ক্ষেত্রও আছে যেখানে বরের পিতা কিছুই চান নাই। একবার এক কলিকাতাবাসী কন্যার পিতা বারম্বার লিখে-ছেন, ঘটক দিয়ে লিখিয়েছেন, নিজে এসেছেন, কিন্তু বরের পিতার এক উত্তর, "আপনার কন্যাকে যা ইচ্ছা দেবেন।" কন্যার পিতা ফাঁপরে পড়েছিলেন। এ ত নূতন কথা। তিনি ভাবলেন, এটা পাকা কথা হ'ল না, হয় ত অন্য কোথাও বিয়ের সম্বন্ধ দেখছেন। তিনি বিলম্ব না করে' কন্যার বিবাহ দিয়ে দিলেন। পর দিন বর বিদায়ের সময় জানবার জন্য বরের পিতা কন্যার বাড়ী গেছলেন। সে পাড়ার দশ-বার জন ভদ্রলোক বসেছিলেন। কন্যার পিতা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ইনি অদ্ভুত মানুষ। আমি পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করেছি, কত দিতে হবে ? ইনি কিছুই চান নাই।" ভদ্রলোকেরা বরের পিতার দিকে চেয়ে রইলেন। তখন তিনি বললেন, "আপনি ওকথা বার বার বলছেন কেন ? আমি আমার পুত্রের জন্য আপনার কন্যা প্রার্থনা করেছিলাম। আপনি আপনার প্রিয় কন্যা দান করেছেন, প্রদান করেছেন, সম্প্রদান করেছেন। এর অধিক আপনি আর কি দিতে পারতেন ? টাকা ? রোজগার করতে পারা যায়।"

সভাস্থ ভদ্রলোকেরা বললেন, "আমরা কথাটা এভাবে কখনও ভাবি নি।"

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী পুত্র-কামনা করেন। সে পুত্র কুল-পাবন হবে। সমাজ বা রাষ্ট্র সুজন বাঞ্ছা করেন। কেহ কুলাঙ্গার পুত্র চান না। কোনও রাষ্ট্র কুজন বা দুর্জন প্রজা ইচ্ছা করেন না। যে রাষ্ট্রের প্রজা যত সুজন হয়, সে রাষ্ট্র তত উন্নত হয়। এইজন্য রাষ্ট্র শিক্ষা-ব্যবস্থা নিজের হাতে রেখেছেন। কিন্তু গোড়ায় গলদ থাকলে কোনও শিক্ষায় সুফল হয় না। সুজন্য-বিদ্যা নামে এক বিদ্যা আছে। সমাজ-ব্যবস্থা কি রকম হ'লে সুজন-প্রজার সংখ্যা বাড়তে পারে, সুজন্য-বিদ্বানেরা সে বিষয়ে চিন্তা করেন। তাঁরা দেখেছেন, বর-কন্যা সুনির্বাচিত না হ'লে সুজন উৎপন্ন হয় না। রাষ্ট্র প্রজার যে যে গুণ বাঞ্ছনীয় মনে করেন, যোগ্য বরের সহিত যোগ্য কন্যার মিলন ব্যতীত প্রজায় সে সে গুণ আসে না। যুবক-যুবতীর অনু-রাগ জন্মের পর যে বিবাহ, তার নাম গান্ধর্ব বিবাহ। পশ্চিমদেশে এই বিবাহ প্রচলিত আছে। সুজন্য-বিদ্বানেরা বলেন, এর ফল ভাল হয় না। কারণ, দুর্বল-চিত্ত যুবক-যুবতীরাই অতি শীঘ্র পরস্পর আকৃষ্ট হয়; তাদের

সন্তানেরাও সেইরূপ দুর্বল-চিত্ত হয়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বহুকালের ভূয়োদর্শনের ফলে প্রাজাপত্য বিবাহকেই শ্রেষ্ঠ বলে গেছেন। এই বিবাহে পিতামাতা বা অন্য গুরুজন বর-কন্যা নির্বাচন করেন। ইহাতে প্রথমে বিবাহ হয়, পরে অনুরাগ জন্মে। প্রজাপতি ফড়িং নয়, চতুর্মুখ ব্রহ্মাও নন। যে জন্মে, সে প্রজা। যিনি সেই জন্মের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, সু-জন্মকে রক্ষা করেন এবং কু-জন্মকে বিনাশ করেন, তিনিই প্রজাপতি। বহু বহুকাল পূর্বে আর্যেরা প্রজাপতিকেই প্রধান দেবতা মনে করতেন। হিটলার প্রাজাপত্য বিবাহ দ্বারাই জার্মান জাতিকে আর্য করতে চেয়েছিলেন।

আধুনিকারা মনে করতে পারে, "কি সর্বনাশ! যাকে দেখলাম না, চিনলাম না, তার সঙ্গে সারা জীবন কাটাতে হবে?" তারা ভাবে না, আমাদের দেশে শত শত বৎসর ধরে কোটি কোটি নর-নারী প্রাজাপত্য বিবাহ করে' আসছে; তারা সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে। দম্পতীর মনান্তর হয় না, এমন নয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা কত? পশ্চিমদেশে পাণিপ্রার্থী হয়ে বর কন্যার নিকটে যাতায়াত করে। পরে উভয়ে সম্মত হ'লে তাদের বিবাহ হয়। তবে কেন তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়? এত দেখা-শোনা, এত মেলা-মেশার পর বিবাহ, তথাপি কেন তাদের মধ্যে কেহ কেহ বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করতে চায়?

অধুনা কন্যাদের বেশী বয়সে বিবাহ হচ্ছে। তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা অবশ্য জানতে হবে। প্রথমে পিতামাতা বরকন্যার ঘর-বর উত্তমরূপে বাছবেন। তার পর কন্যা বর দেখবে, বরও কন্যা দেখবে। প্রথম দৃষ্টিতেই যার প্রতি বিরাগ জন্মে তার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া কর্তব্য নয়। কন্যার মত ও বরের মত অবশ্য জানতে হবে। তারা সম্মত হ'লে বিবাহ হবে।

কেহ কেহ মনে করেন, ইংরেজী লেখাপড়া শিখলেই কন্যা প্রাজাপত্য-বিবাহের বিরোধী হয়, ইংরেজী-শিক্ষিতা কন্যা গান্ধর্ব-বিবাহ চায়, আর সেরূপ বিবাহ না হ'লে চির-কুমারী থাকতে চায়। এ ধারণা ভুল। আমি গোটা দুই উদাহরণ দিচ্ছি।

১। এক কন্যা ম্যাট্রিক পাস। বাংলা শিখতে আমার কাছে মাঝে মাঝে আসত। আমার চিঠি লিখে দিত, প্রবন্ধও লিখে দিত। আমাকে দাদু ব'লত। এক দিন শুনলাম, তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে।

"মাধু, দেখছি তারা ভারি লোভী। তারা শুধু তোমাকে চায় না, পঞ্চাশ ভরি সোনাও চায়। তাদের বুদ্ধি একটু মোটা। এই পঞ্চাশ ভরির মধ্যে সেকরা অন্ততঃ দশ ভরি চুরি করবে। এখন পঞ্চাশ ভরি সোনার দাম পাঁচ হাজার টাকা, দশ বৎসর পরে চল্লিশ ভরির দাম হবে এক হাজার টাকা। তখন ঠকে' যাবে। যদি তোমার নামে পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ চাইত, তা হ'লে বরাবরই সেই দাম থাকত, আর বছর বছর সুদও আসত। আর, পাঁচ হাজার টাকার সোনা নিয়ে তোমাকে চোরের ভয়ও করতে হ'ত না। বর তোমাকে দেখতে এসেছিল?"

"হাঁ।"

"কেমন দেখলে?"

"কেমন আবার কি? আমি কি বাবার চেয়ে বেশী বুঝি?"

নিরূপিত দিনে বিয়ে হয়ে গেল। আমি পর দিন সকালবেলা বর দেখতে গেলাম। বর চেনা খুব সোজা। আমি তার ডান হাতখানা জোরে ধরে' বললাম, "তুমি কে হে? তোমাকে যে নূতন দেখছি, তোমার ঘর কোথা? কেন এসেছ?"

বর হতভম্ব। মাধু কপাটের আড়াল হ'তে সুড়-সুড় করে এসে আমাকে প্রণাম করে' দাঁড়াল। বর আমার প্রশ্নবাণ হ'তে বেঁচে গেল।

"ওহে বর, এটি আমার শুধু নাতনী নয়, আমার অনুলেখিকা। এই বুঝে যত্নে রাখবে।"

বিয়ের পর প্রায় দুই বৎসর হয়ে গেল। মাধু আমাকে চিঠি লেখে, মাঝে মাঝে আসে, আমার সঙ্গে দেখা করে। সে বেশ আছে, শ্বশুর-বাড়ীতে যত্নে আছে।

২। মেয়েটি এম-এ পাস। এখানে কলেজে পড়ত, সেই সময় হ'তে আমি তার দাদু। বি-এ পাস হবার পরে বৎসর দেড়েক মেলেরিয়া না কি এক রোগে ভুগেছিল। সেরে গেলে কলিকাতায় এম-এ পড়তে দু' বৎসর ছিল। এম-এ পাস হবার কিছু পরে তার বাড়ী হ'তে আমাকে লিখলে, "আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে। শুনছি, সব ভাল। বাঁকুড়ায় বিয়ে হবে, তখন দেখা হবে।" তার বিয়ের দু-তিন দিন আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব শুধালাম।

"রাধু, বর তোমাকে দেখতে এসেছিল?"

"না।"

"কে এসেছিল?"

"বরের খুড়ো।"

"কে বর দেখতে গেছল?"

"বাবা।"

"তুমি বর দেখ নাই?"

"না।"

"তোমার দেখতে ইচ্ছা হ'ত না?"

"হ'ত, কিন্তু ভাবতাম, দু-পাঁচ মিনিট দেখে কি জানব? আর, দুই পক্ষেরই মতে বিয়ের আগে বর-কনে'র দেখা ভাল নয়।"

"বাঃ! বেশ তো যোগ ঘটেছে!"

"বাবা বলছিলেন, 'আমার সঙ্গে কলিকাতায় আয়, কি রকম শাড়ী চাস, বেছে নিবি।' আমি বললাম, 'যার সঙ্গে চিরজীবন কাটাতে হবে, আমি তাকেই দেখলাম না, আর একটা শাড়ী বাছতে কলিকাতা যাব? শাড়ী কিনতে পাওয়া যায়।"

নিরূপিত দিনে বিয়ে হয়ে গেল। পর দিন সকালবেলা রাধু বরকে নিয়ে আমাকে প্রণাম করতে এল। এসেই বলছে, "আমি যা চেয়েছিলাম, তার থেকে অনেক গুণ বেশী পেয়েছি।"

"দেখ, এই কথাটি চিরদিন স্মরণ রাখবে, তুমি সুখী হবে। কিন্তু ঐ লোকটির সামনে বলা ভাল হয় নাই, ওর বুক ফুলে উঠবে। আর একটি কথা মনে রেখো, জগদম্বা নারীকে সংযম ও সহিষ্ণুতা গুণ দিয়েছেন। কখনও ভুলবে না।"

"সীমা?"

"যতদূর বাড়াতে পার, ততই ভাল।"

বিয়ের পর প্রায় এক বৎসর হ'তে চলল। রাধুর দু-তিনখানা চিঠি পেয়েছি, এই ফাল্গুন মাসে একখানা পেয়েছি। তাতে লিখেছে, "আমার শ্বশুর-শাশুড়ী দু-জনেই বৃদ্ধ। আমি তাঁদের সেবা করতে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। বাড়ীর পরিজনেরাও আমাকে ভালবাসে।" প্রত্যেক চিঠিতেই স্বামীর কথা থাকে, সম্ভ্রমের সহিত থাকে। বেশী বয়সে বিবাহে ভাবোচ্ছ্বাস থাকে না।

এই দুই বিবাহ-সংবাদ পড়ে উচ্চ-শিক্ষিতা অথবা বিলাত প্রত্যাগতা মহিলা হয়ত সন্তুষ্ট হবেন না। তাঁরা বলবেন, "এই দুই কন্যা দেশের কু-সংস্কারের হাড়িকাঠে আপনাদিকে বলি দিয়েছে। যেখানে self-realization নাই সেখানে সন্তোষের সার্থকতাও নাই।"

আমি ইংরেজী বুলি ডরাই, বুঝতে পারি না। এই শব্দের বাংলা না শুনলে অন্ধকারে থাকতে হয়। এ কি আত্মসিদ্ধি, না আত্মোপলব্ধি? এতেও অর্থপ্রকাশ হ'ল না। আত্মসিদ্ধি, অর্থাৎ আমি যেমন চাই, তেমন পাওয়া। বোধ হয় মহিলারা self-realization শব্দের এই অর্থ ক'রে থাকেন। কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষার সীমা আছে কি? না তার তৃপ্তি আছে? এক স্থানে সীমা-রেখা টানতেই হবে। কে সে রেখা টানবে? বিবাহের পর যে অনুরাগ জন্মে, সেটা কি মিথ্যা, কাল্পনিক? [আগামী বারে সমাপ্য]

বর্ব্বরতা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সভ্যতা ও তো কৃপাণ শোণিত-মাখা,
যত্নে বদ্ধ সুচারু সোনালী খাপে,
বেশী দিন তার সহে না সেভাবে থাকা,
রক্তভৃষায় কাঁপায়, নিজে সে কাঁপে।
তার ইতিহাস বর্ব্বরতায় ভরা,
তার ইতিহাস পাপে ও দম্ভে গড়া,
অপহরণের পসরা তাহার শিরে।

সভ্যতম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি
বলিয়া—আত্মপ্রচার যাদের সাধ,
তারাও চলেছে নৃমুণ্ডমালা গাঁথি
আচরি ভীষণ হীনতম অপরাধ।
ভাবাঢ্য মন, বাক্‌জাল পরিপাটি
রচে আবরিয়া রক্ত-মাংস-মাটি
সুধার কুহেলি, গরল-সাগর-তীরে।

রাখো কৃষ্টির মহিমা ও গরিমার
যত আবরণ আভরণে তারে ঘিরে
মানব আদিম পিপাসা ও হিংসায়
যাবেই আবার বর্ব্বরতায় ফিরে।

দেবত্ব নয়, পশুত্ব তার প্রিয়,
মুনি, ঋষি, তার কেহ নয় আত্মীয়,
ধর্ম্ম নয়, সে শক্তি-আকাঙ্ক্ষীরে।

হয় জাতি যবে লুণ্ঠিত ধনে ধনী—
হতে চায় তারা ভদ্র সাধু ও সৎ।
সভ্যতার যে গড়ে দৃঢ় আবরণী
করিতে ক্ষুণ্ণ সম্পদ-নিরাপদ।
তখনি সর্ব্বশক্তিমানে সে স্মরে,
যত সদাচার বিধি ও বিধান গড়ে,
বাঁধন রচে সে সকল বাঁধন ছিঁড়ে।

ধরাকে পীড়িত করাই নরের কাজ,
ধ্বংস হরণ মারণেতে উল্লাস।
নমনীয় তার বিবেক—নাহিক লাজ,
নিপুণ সদাই সাধিতে সর্ব্বনাশ।
বর্ব্বরতায় কৃষ্টির উন্মেষ,
বর্ব্বরতায় পুনঃ হয় তার শেষ
সব উত্থান মিশে পতনের ভিড়ে।

আঘাত

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

সুমিত্রা যখন প্রথম শ্বশুরঘর করতে এল—সে দু'যুগ আগের কথা। তখন প্রকাণ্ড উঠানের মাঝখানে খানদুই জীর্ণ ঘর—আর তার সামনে কালিমত টানা রোয়াক দেখে ও সত্যিই চমকে উঠেছিল। ওর মনে হয়েছিল—কূল-কিনারাহীন মাঠের মাঝখানে দুখানা ঘর বসিয়ে দিলেই কি সে বস্তু বাসগৃহের মর্য্যাদা লাভ করে? বাড়ির সীমানা-নির্দ্দেশক প্রাচীর না থাক—নিদেনপক্ষে কঞ্চির বেড়াটাও থাকা উচিত। অত বড় উঠানে দুটি গাছ থাকলে—গ্রীষ্মকালের দুপুরটা কিছু সুসহ হয়—আর রোয়াকের উপর একটা আচ্ছাদন—অন্তত খড়ের—তা হলে এঘর থেকে ওঘরে যাবার সময় সিমেন্টের তপ্ত মেঝেতে দৌড়ঝাঁপ করতে হয় না। তা ছাড়া গ্রীষ্মকালের পাতকুয়োটা পাঁকগোলা জল দিয়ে গৃহস্থকে আপ্যায়িত করে না। যাই হোক—দু'যুগে এসব ত্রুটি প্রায় শুধরে নিয়েছিল সুমিত্রা। প্রথমে খানিকটা জমি বাইরে রেখে বেড়া তুলে বাড়িটাকে মাঠের গোত্র থেকে স্বতন্ত্র করলে—কয়েক বছর পরে সেই বেড়ার গায়েই উঠল প্রাচীর আর উঠানে-পোঁতা আম-কাঁঠালের গাছ দুটি এক যুগ পরে বেশ ঝাঁকড়া হওয়াতে রোয়াকের উপর ছায়া নামতে লাগল, রোয়াকের আচ্ছাদন দরকার হ'ল না। মনে কল্পনা রইল—আচ্ছাদন যদি দিতেই হয় তো খড়ের চালার নয় ইট-কাঠের পাকা দালানই তুলে ফেলবে। যেমন কাঁকালে রূপোর বিছের বদলে গলার সোনার ফাঁস হার হয়েছে আজকালকার রেওয়াজ।

পুরাতন ঘরের সংস্কার হ'ল এবং যেখানে যা মানায়—একে একে তাও যথাসাধ্য সংগ্রহ করলে সে। এখন বাড়িখানা দেখে অনেকেই প্রশংসা করেন, তোমার ভাই ব্যবস্থা আছে। কি সুন্দর করেই না সাজিয়েছ ঘরদোর। উঠানে গাছ দুটিও এমন হিসেব করে পুঁতেছ—

সুমিত্রা পুলকিত স্বরে বলে, তবু ভাই সব সাধ্যে কুলোয় নি। আমার ইচ্ছে বাড়ির লাগাও একটি পুকুর হয়। পুকুরের পাড়ে থাকবে সারি সারি নারকোলগাছ, আর শান-বাঁধানো ঘাটের ঠিক ওপরেই একটা ঝাঁকড়া বকুলগাছ। দু'ধারের মানায় বসবার জায়গায় ঝরে পড়বে ফুল—আঁচল ভরে কুড়িয়ে তুলব।

কেউ হয়ত হেসে রহস্য করে, ফুলও তুলবে—মালাও হয়ত গাঁথবে—কিন্তু কার গলায় পরাবে ভাই?

কেন—রাধাবিনোদের।

প্রশ্নকারিণী লজ্জিত হাস্যে বলে, তা বটে।

দু'যুগ আগেকার কথা অবশ্য আলাদা। তখন মালা গেঁথে দেবতার গলায় পরাবার সাধ জাগত, আজও দেবতার অঙ্গশোভার জন্য মালা গাঁথা—কিন্তু দু'কালের দেবতার রূপ এক নয়। কামনার লাল রঙ ফিকে গৈরিকের খোলস পরেছে।

২

স্বামী অমরনাথ কাজ করেন কোন সাহেবি কারখানায়। সে কারখানার অবস্থা এককালে ভালই ছিল। মাইনে ছাড়া বছরে দু'বার করে বোনাস দিত। যুদ্ধের মরশুমে তিনবারও দিয়েছে। সুমিত্রা হিসাবী মেয়ে। ছেলেমেয়েদের সাধ যথাসাধ্য মিটিয়ে ঘর গুছাবার কাজে মন দিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ থামলে মাইনে বাড়া সত্ত্বেও ঘর-গুছানোর কাজ আর এগোয় নি—বাড়ির বাইরের পড়ো জমিতে একটা বেড়া তুলবার সামর্থ্যও হয় নি। অবশ্য বেড়া তুলে লাভ নাই—ও জানে। দু-দুবার সে চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু ওর পড়ো জমির প্রান্ত থেকে আরম্ভ হয়েছে মুসলমানপাড়া—দরিদ্র রাজ-মিস্ত্রি-ঘরামির কাজ করে দিন-আনা দিন-খাওয়ার দল। তারা ওর বেড়া-ঘেরা জমি দেখে অস্বস্তি বোধ করে। গাবভেরেণ্ডা জীয়লের ডাল কেটে শুধু যাতায়াতের রাস্তাটি সুগম করে নি—বেড়ার কঞ্চি বাঁশ ও বাখারিগুলিও খুলে নিয়ে চুল্লীর ইন্ধন-রূপে ব্যবহার করেছিল—ও পক্ষ থেকে যথেষ্ট শাসানি ও গালাগাল দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু তার জন্য একপাড়া সর্ব্বহারা মানুষকে তো দায়ী করা চলে না।

সুমিত্রা স্থির করেছিল—ক্ষণভঙ্গুর বেড়া না দিয়ে পাকা প্রাচীর তুলবে। তার মধ্যে কাটাবে একটি মাঝারি গোছের পুকুর, পুকুরের চার পাশে তৈরি করবে আম নারকেলের বাগান। ঘরের লাগোয়া পুকুর আর বাগান না হলে ঘরের সৌন্দর্য্য বা মর্য্যাদা কিসের? পিছনে চিত্রিত চাল না থাকলে দেবী-প্রতিমার মহিমা কল্পনা করতে পারেন কেউ?

যুদ্ধ থেমে গেল—জিনিষপত্রের দর অগ্নিমূল্য হয়ে উঠল। তবু সুমিত্রার মনের স্বপ্ন মন থেকে মুছে গেল না। আর দু' বছর পরে স্বামী অবসর নেবেন—ছেলে ঢুকবে চাকরিতে। ছেলের রোজগার যাতে ভাল হয়—সেজন্য ওকে শিক্ষার উচ্চস্তরে তুলে দেওয়া হচ্ছিল। সে শিক্ষা শেষ হলেই···

কিন্তু ইতিমধ্যে মুসলমানেরা দাবি তুললে ভারতবর্ষ দু'ভাগ হোক। এর প্রতিবাদে তারা যা করলে তাতে হিন্দুরাও সায় দিলে—দু'ভাগ হয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল। এটা

অপ্রত্যাশিত—কাজেই স্বাধীনতা কি বস্তু—তার পরিচয় নেওয়ার অবসর রইল না কারও। অশনবসনের কৃচ্ছ্রতায় মানুষের প্রাণ কণ্ঠাগত—উদরপূর্ত্তির জন্য তাকে সর্ব্বস্ব খোয়াতে হচ্ছে—অন্য সাধের জায়গা কোথায়!

যাই হোক—এই সময়ে দেবু একটা চাকরি পেয়ে গেল। মাইনেটা আশানুরূপ মোটা নয়। না হলেও সুমিত্রা পূজা পাঠিয়ে দিলে সিদ্ধেশ্বরী তলায়—দেবুর বন্ধুরাও একদিন প্রীতি-ভোজ খেয়ে আনন্দ প্রকাশ করলে।

৩

প্রথম মাসের টাকাটা মানত শোধ আর প্রীতিভোজে গিয়েছে—দ্বিতীয় মাসে সুমিত্রা বললে—আসছে মাসে অন্তত পঞ্চাশটি টাকা আমায় দিস—দু'বছরে বাগানের পাঁচিল তুলব।

ছেলে হেসে বললে—ক্ষেপেছ তুমি! আর কি সেদিন আছে— শুধু দু'বেলা মেসে খেতেই পড়বে পঞ্চাশটি টাকা। কাপড় জামা ধোপা নাপিত ট্রাম বাস ভাড়া—বাড়ি আসা এ সবের হিসেবটা ধর।

সুমিত্রা বললে—তা হলে কত করে দিবি?

দেবু বললে—দিতে পারব কিনা সন্দেহ। তবে বাড়িতে না আসি—

দুর্ব্বল স্থানে আঘাত পড়তে সুমিত্রা তাড়াতাড়ি বললে—আচ্ছা আচ্ছা—মাস শেষ হোক—তার পর হিসেব।

পরের মাসে ছেলের কাছে সুমিত্রা আর হিসাব নিলে না। ছেলে যা হাতে তুলে দিলে—তাতে বুঝলে, পাঁচিল তোলার আশাটা আকাশকুসুম, কোনমতে ত্রৈমাসিক ট্যাক্সের বিলটা মিটানো যাবে। সুমিত্রা বুকের মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিলে।

এক দিন শনিবারে বাড়ি এসে অমরনাথ বললেন—ইটের দর দেখি দিন দিন উঠছে—পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ।

সুমিত্রা ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলে—আবার বুঝি যুদ্ধ বাধল।

না গো—পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা চলে আসছে দলে দলে। সব জিনিসই হয়ে উঠছে অগ্নিমূল্য।

তা এই বেলা কিছু ইট কিনে রাখলে হয় না?

অমরনাথ বললেন—এই পঞ্চাশ টাকা দরে? তার চেয়ে বছর দুই দেখাই যাক না—এইরূপ চড়া বাজার নিশ্চয় থাকবে না।

আরও দু' বছর! সুমিত্রা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

এদিকে বয়স বাড়ছে—শরীরের সামর্থ্যও কমছে। চারি-দিকে যা সব ব্যাপার ঘটছে—তাই কি সুমিত্রা কল্পনা করেছে কোন দিন। আজন্মকাল হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাস করে এল—বন্ধুত্বে বা শত্রুতায় তারা জাতিভেদের গণ্ডিটা স্পষ্ট করে টানে নি কোন দিন—তবু কেন জানি তারা পরস্পরকে মনে করছে শত্রু—পরম শত্রু। দিনের পর দিন লাঠি—ছোরা—বন্দুক—বোমা নিয়ে তেড়ে আসছে—পরস্পরের বুকে হানছে মৃত্যুশেল। ঘর পোড়ান, সম্পত্তি লুঠ, মেয়েছেলের সম্মান নষ্ট···সুমিত্রা মনে মনে বলে—কি লাভ হ'ল এই স্বাধীনতা পেয়ে! ঘরের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেল যদি—

ও বাড়ির শিক্ষিতা মেয়ে সুষমা—কথাটা একদিন শুনতে পেয়ে বললে, স্বাধীনতার মূল্য দেবেন না খুড়িমা? এমনিতেই কি রাজ্য লাভ করা যায়?

'কে জানে কিসের রাজ্য'—কারা লাভ করে কোন্ উপায়ে। রামায়ণ মহাভারতে অন্যায় যুদ্ধের কথা যে নেই তা নয়—কিন্তু তা পড়তে পড়তে এমন কলুষ-মাখানো বিভীষিকা মনকে অসাড় করে দেয় না তো। যুদ্ধ হবে রাজায় রাজায়—পৌর জনের ক্ষতি অবশ্য হবে, কিন্তু ঘর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে—মেয়েদের হবে চরম অসম্মান! ইংরেজ রাজত্বে ছিল কি এই অসম্মান।

সুষমা হাসে। কোথায় ছিল অসম্মান—কোথায় জমত কলুষ গ্লানি—অফুরন্ত রক্ত দানের মূল্যে লেখা হয়েছে—তিলে তিলে অগ্রসরোন্মুখ এই স্বাধীনতা—কে রেখেছে তার হিসাব? সুমিত্রা রেখেছে কি? সে অত্যাচারের কাহিনী পল্লীর অন্তঃ-পুরে অতিরঞ্জিত হয়ে যে পৌঁছত না তা নয়। প্রত্যক্ষ দর্শনের অভাবে তার স্বাদ ছিল অনুগ্র। মুখে হয়তো 'আহা' বলেছে—মনের গভীরে পৌঁছায় নি আঘাতগুলি। দিনের পর দিন খাওয়া শোওয়া গল্প আর ঘুম সবই ঘটেছে স্বাভাবিক নিয়মে। কিন্তু আজকাল···স্বাধীনতা পাওয়ার আগের বছরেই তো সপ্তাহকালের জন্য পালাতে হয়েছিল—গ্রামের এক প্রান্তে হিন্দু বসতির মাঝখানে। তাদের বাড়ির প্রান্ত থেকে দরিদ্র মুসলমান বসতির আরম্ভ—ওরা এত কাল অত্যন্ত নিরীহ ও অনুগত প্রতিবেশী ছিল, চুরি করা ছিল ওদের স্বভাব—আর সেইজন্যই অত্যন্ত ভীরু। অথচ পাকিস্তানের ধুয়ো উঠলে—শহরে খুনজখমের খবর পৌঁছলে ওই ভীরু মানুষগুলির ভয়ে গ্রামের অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত হয়েছিল সুমিত্রারা। সেইজন্যই তো জায়গাটিকে পাঁচিল দিয়ে—বাসস্থানকে খানিকটা নিরাপদ করতে সাধ হয়। কিন্তু দু' বছর—সে কত কাল—কত যুগের কথা! সুমিত্রার স্বপ্ন কি সফল হবে।

৪

—মাসের শেষ সপ্তাহে বাড়ি আসেন নি অমরনাথ। পক্ষকাল বাদে সুমিত্রাকে দেখে তিনি চমকে উঠলেন। একি—তোমার কি কোন অসুখ করেছে?

না তো। ম্লান হাসিতে সুমিত্রা স্বামীর সংশয় মুছে নিতে চাইলে।

তাতে বেশী করে চমকিত হলেন অমরনাথ। বললেন, না, না, তুমি নিশ্চয় আরশিতে নিজের মুখ দেখ না আজকাল।

দেখলেই বা—নিজের অসুখ-বিসুখের কথা কে না বুঝতে পারে! হাসিটা উচ্চগ্রামে তুললে সুমিত্রা। কিন্তু নিটোল প্রাণপূর্ণ সুর বার হ'ল না তা থেকে— কেমন যেন ক্লান্তির রেশটা কানে বাজল।

অমরনাথ এগিয়ে এসে স্ত্রীর পিঠে হাত রাখলেন। বললেন—কি হয়েছে—বলবে না?

সত্যি কিছু না—রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় না—মাথাটা চিন্ চিন্ করে···ইস্ ভেবে ভেবে যে গেলে! পরিহাসের ভঙ্গিতে অমরনাথের হাতখানা সে নেড়ে দিলে।

কিন্তু পরের দিন সকালেই অমরনাথকে চা দিতে গিয়ে তার সামনেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল সুমিত্রা। সুমিত্রার নিষেধ না শুনে ডাক্তার আনালেন অমরনাথ। ডাক্তার রায় দিয়ে গেলেন—রক্তের চাপ বৃদ্ধি। এ রোগের সেরা ওষুধ হ'ল সম্পূর্ণ বিশ্রাম—চিন্তাটিন্তা যেন বেশী না করা হয়।

কাজের দায় থেকে মানুষকে জোর করে মুক্ত করা যায়—চিন্তার শাসন থেকে অব্যাহতি দেবে কে!

তেমন চিন্তা সুমিত্রা আজকাল করে না। সংসার পরিচালনার জন্য এককালে যে ভাবনা জাগত—আজ তার শতাংশের একাংশও নাই, তবু মনের কোণে যে স্বপ্ন লেগে রয়েছে তার দাগ মুছে ফেলা যায় না। চিন্তার প্রসারে দিন দিন তা বেগশালী হচ্ছে। বাড়ির সামনে সুবিস্তীর্ণ একটি আম-নারকেলের বাগান—মাঝখানে স্বচ্ছতোয়া নাতিদীর্ঘ এক সরোবর। তার চাতালে ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে যে ঝাঁকড়া মাথা ফুলসর্ব্বস্ব বকুল গাছ—তাকে ভোলা কি এতই সহজ?

প্রলাপের মুখে স্বপ্ন-কথা বার বার উচ্চারিত হ'ল।

ডাক্তার অমরনাথকে বললেন—ওঁকে আশ্বাস দিন।

অমরনাথ বললেন—সে আশ্বাসের মূল্য কি?

উনি সেরে উঠবেন তাড়াতাড়ি। সংসারকে বাড়িয়ে তুলুন যে কোন উপায়ে—ফল পাবেন।

কেমন করে আশ্বাস দেবেন ভাবতে লাগলেন অমরনাথ।

পরের দিন প্রসঙ্গটা তুললেন—ডাক্তার কি বলছিলেন জান? একটা দোতলা তুলে ফেলুন।

দোতলা! সুমিত্রার দৃষ্টি আগ্রহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বালিশের উপর কনুই রেখে আধ-শোওয়া অবস্থায় বললে—দোতলা ঘর তুলতে খরচ কি কম হবে? পাঁচিল দেওয়ার চেয়েও কম?

কিন্তু দোতলা ঘর চাই তো। আজ বাদে কাল দেবুর বিয়ে হবে—জামাইরা আসবে—। পাঁচু বললে—জায়গাটা পাঁচিল দিয়ে আটকে রাখলেই তো হবে না—পুকুর কাটাতে হবে—বাগান তৈরি করতে হবে। তার যা খরচ—

বেশ তো—দোতলাই তোল। তার পর দেবুর মাইনে বাড়লে—

অমরনাথ হাসলেন—আশার সীমা নেই তোমার!

ভারি তো আশা! বালিশে মাথা রেখে সুমিত্রাও হাসল।

অতঃপর দোতলার জল্পনা-কল্পনায় মেতে উঠল সুমিত্রা।

হাঁ গা ক'খানা ঘর তুলবে ওপরে?

দুখানা—এক দেয়ালে পাশাপাশি দুখানা ঘর—

সামনে বারান্দা থাকবে না?

যদি খরচে কুলোতে পারি—

তা ঠিক—বনিয়াদটা অবশ্য পত্তন করা থাকবে—আর একবার সুবিধে ঘটলে···হঠাৎ মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুমিত্রার। সুবিধে ঘটবে না-ই বা কেন? দেবুর বিয়েতে কুলমর্য্যাদা পাওয়া যাবে। টালির ছাউনি একটি সুন্দর বারান্দা অল্প খরচেই উঠে যাবে। না হয়—নিজের গায়ের গহনা দু' একখানি···সুমিত্রা ত্বরান্বিত হয়ে উঠল।

পাঁচু মিস্ত্রিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা মিস্ত্রি—ওপরে দুখানা ঘরের কোলে যদি টানা বারান্দা করা যায়—কত খরচ পড়বে?

পাঁচু খুশী হয়ে বললে—ঘর তুলবেন ওপরে? বেশ হবে। কত খরচ পড়বে?

তা—তা—মাথা চুলকাতে চুলকাতে পাঁচু বললে—বড় মিস্তিরিকে শুধোব। তা পাঁচ ছ' হাজারে কুলিয়ে যাবে—মা ঠাকরোণ।

এত! মনে মনে সবিস্ময় প্রশ্ন করলে সুমিত্রা। মুখে বললে—তা বারান্দা যদি টালির দেওয়া যায়—

খরচ অবিশ্যি কমই পড়বে—তা কতই বা মা ঠাকরোণ! কুল্যে দু' এক শো টাকা। তার থেকে পাকা করাই ভাল—একেবারে ছির জেবন কেটে যাবে। একবারই তো—

ঠিক কথা—একবারই যা খরচ। যদিই ঋণ হয়, সারা জীবন রইল ঋণ শোধের জন্য। সারা জীবনে তো ঘরে বা বারান্দায় হাত দিতে হবে না।

কিন্তু অত টাকাই বা আসবে কোথা থেকে? দু' এক টাকার তফাৎ এমন কিছু নয়—কিন্তু উপরের সংখ্যায় একের সঙ্গে দুইয়ের প্রভেদ মারাত্মক রকমের। কথায় বলে না—গরীবের এক টাকাই এক শ'র সামিল।

৫

সুমিত্রা আশ্চর্য্য হয়ে গেল—এর কিছু দিন পরে অমরনাথ যখন পুরোপুরি পাঁচ হাজার টাকা জমা দিয়ে পাস বইখানা তার হাতে দিলেন।

সত্যি—এত টাকা কোথায় পেলে?

সে খোঁজে তোমার কাজ কি। অমরনাথ হেসে বললেন—যে খায় চিনি—তার চিনি যোগান চিন্তামণি।

চিন্তামণিটি কে—শুনিই না।

আজ নয়—আর একদিন শুনবে।

লটারিতে পেয়েছ বুঝি?

হাঁ—তা।

কই আমাকে তো জানাও নি কোন দিন যে টিকিট কিনেছ। আজকাল আমার কাছে অনেক কিছু লুকোও তুমি। কৃত্রিম অভিমানে সুমিত্রা মুখ ফেরালে। অভিমানটা অকৃত্রিম হতে পারত যদি ব্যাঙ্কের পাস বইখানায় স্বপ্ন-সাফল্যের আশ্বাস না থাকত।

অমরনাথ দু'হাত দিয়ে তার মুখখানা ঘুরিয়ে হাসতে হাসতে বললেন—লুকিয়ে মন্দ করেছি কি। তোমার নামেই অবশ্য—। বলতে বলতে থেমে গেলেন তিনি। এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। অনর্থক মিথ্যার জাল বুনে যাওয়ার প্রয়োজন কি? জীবনে সত্য কথা বলার নীতিকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু কোন গুরুতর সমস্যায় মিথ্যাশ্রিত সত্যের আশ্রয় নেওয়া অন্যায় মনে হয় না তাঁর। পুরাণ মহাভারতে এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে।...

যাই হোক সুমিত্রা আর কোন প্রশ্ন করলে না।

আরও কিছুদিন পরে খালি জমিতে ইট এসে জমতে লাগল—এল পারমিট সংগ্রহ করা সিমেন্টের বস্তা, চূণ—নূতন সুড়ি—নারকেলকাতার দড়ি।

সুমিত্রা বললে—তুমি ছুটি নাও দু'মাসের।

ছুটি নিয়েই এসেছি।

আবার সুরু হ'ল জল্পনা-কল্পনা। ছাদের পক্ষে লোহার কড়িই ভাল আর বরগাগুলি কাঠের। ইচ্ছামত বদলানো যাবে। ঘর হবে দক্ষিণ-দুয়ারী—ঘরে জানালা থাকবে অনেক-গুলো—আর বড় বড়। জানালার মাথায় যেন উঁচু খিলান করা হয়—কাঠের তাক বসিয়ে তাতে অনেক জিনিষপত্র রাখা যাবে। আলমারী কি দুটো করে থাকবে ঘরে? মেঝে হবে লাল টুকটুকে সিমেন্টের। সিমেন্ট বুঝি লাল হয় না, রং দিতে হয়? তা হলে মেঝের চারদিকে পাড় দিতে হবে কালো রঙের। কালোর মাঝে লাল—চমৎকার মানাবে। দরজা জানলায় কিন্তু আলকাতরা মাখালে চলবে না—বেশ সবুজ রং চাই—দুর্গাপ্রতিমার অসুরের গায়ের রঙের মত চকচকে সবুজ।

সুমিত্রা নূতন কল্পনায় মেতে উঠল।

৬

তারপর এক দিন মিস্ত্রি এল। অমরনাথ বাড়ী ছিলেন না—সুমিত্রা বললে, ওবেলা এসো।

মিস্ত্রি বললে, তা হলে যে রোজ কামাই হবে মা ঠাকরোন। কাল রবিবারে তো বাঁশ কাটা হবে না—আজ বাঁশ কেটে রাখব, কাল তারা বাঁধা হবে। আপনি শুধু বলে দিন কোন্ ঝাড় থেকে কাটা হবে।

যে খালি জায়গায় পুকুর প্রতিষ্ঠার কল্পনা ছিল—তার পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে ছিল দু' ঝাড় বাঁশ। কঞ্চিফু ঝাড়, বেড়া দেওয়ার অভাবে বাড়তে পায় না—কোঁড় বেরুলেই গরু, ছাগলে মুড়িয়ে খায়। তবু ঘন ব্যূহের মধ্যে দু' একটি কোঁড় সতেজ হয়ে ঝাড় দুটিকে রক্ষা করে আসছে।

বাড়ির দক্ষিণ দিক ফাঁকা রাখা স্বাস্থ্যনীতির অপরিহার্য্য অঙ্গ—ডাক্তারের এই উপদেশ মনে পড়ে গেল সুমিত্রার। সে একটু ভেবে বললে, দক্ষিণের ঝাড় থেকে কাটগে—ওখানে ঝাড় রাখা হবে না তো।

বাইরে দুখানা দায়ে কোপ পড়ছে—শব্দ উঠছে খটাখট খটাস। ঝপাস করে দুখানা বাঁশ পড়ার শব্দও হ'ল—সেই সঙ্গে মানুষের কণ্ঠেও জমল কোলাহল। সে স্বর ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে উঠাতে বোঝা গেল ওটা কলহের সুরই। কিন্তু বাঁশ কাটা নিয়ে কলহ বাধাবে কে? এ তো আর পরের ঝাড়ে বাঁশ কাটতে যায় নি কেউ।

ঘরামি এসে যা বললে—তার ভাবার্থটা ওই রকমই। ও বাঁশঝাড় আর নাকি সুমিত্রাদের নেই—জমিও নয়। কোন্ এক উদ্বাস্তু ভদ্রলোক বেশ চড়া দামে জমিটা কিনেছেন—সেই সঙ্গে বাঁশঝাড় দুটিও। বিশ্বাস না হয় পাট্টা কবুলতি দেখতে পার।

সুমিত্রার মুখ পাণ্ডাশ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বললে, তবে আজ থাক—উনি আসুন।

কিন্তু সারাদিনে কি কাজ করলে সুমিত্রা তার হিসাব রইল না। ছোট মেয়েটা পদে পদে কাজের ভুল ধরতে লাগল। তা ধরুক—শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে, মাথাটা কেমন খালি খালি বোধ হচ্ছে। সারা গায়ে আগুনের আঁচ—চোখ থেকে বেরুচ্ছে আগুন—নিশ্বাসেও আগুন। চলতে ফিরতে মনে হচ্ছে নাগরদোলার ঘুরুনি। হয়ত-বা জ্বরই এল। কিন্তু জ্বরের চেয়েও জ্বালা বোধ হচ্ছে। প্রাণের ভিতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে কান্নার সমুদ্র—চোখের কোলে অশ্রুর আভাসে সে মন্থন বেশ হয়েছে প্রসারিত। সারাদিন অভুক্ত আছে—তবু ক্ষুধাবোধ নাই।

সন্ধ্যাপ্রদীপ না জেলেই সে শুয়ে পড়ল।

অমরনাথ ফিরলেন সন্ধ্যার পর। বাড়িটায় আলো জলতে না দেখে মনটা তাঁর উদ্বেগে ভরে উঠল। শুষ্ক কণ্ঠে ডাকলেন—সুমিত্রা—

সদ্য ঘুম-ভাঙ্গা স্বরে সুমিত্রা জবাব দিলে, এসো।

একি আলো জাল নি? অন্ধকারে শুয়েই বা কেন। গীতা ছবি ওরা গেল কোথায়?

ওই কুলুঙ্গিতে দেশলাই আছে—তুমি আলোটা জাল। রোগখিন্ন স্বরে সুমিত্রা বললে।

আলো জেলে সুমিত্রার শিয়রে বসলেন আমরনাথ। এক

খানি হাত সুমিত্রার কপালে রেখে বললেন, কই জ্বর হয় নি তো—গা বেশ ঠাণ্ডা।

হাঁ—মিছেই ভাবছ। বলে ক্ষীণভাবে হাসল সুমিত্রা।

তবে শুয়ে আছ কেন ?

মাথায় যেন তিন মণ ভারি বোঝা কে চাপিয়ে দিয়েছে—মাথা তুলতে পারছি না।

আবার কি চাপটা—

না—তুমি বস। ওঁর হাত টেনে ধরলে সুমিত্রা।

কিন্তু তুমি অস্থির হয়ে উঠছ কেন ?

কৈ—নাতো। একটু চুপ করে থেকে সুমিত্রা বললে, দেখ একটা কথা রাখবে ?

অমরনাথ সবিস্ময়ে বললেন, কি ?

নাহক—কতকগুলো টাকা খরচ করে কি হবে—দোতলা তুলে কাজ নেই এখন।

অমরনাথের বিস্ময় বাড়ল। বললেন—তা কি হয়, এত কষ্টে পারমিট জোগাড় করে সিমেন্ট আনালাম—লোহা কিনলাম—

বেশ তো—বেচে দাও চড়া দামে—লাভই হবে।

লাভের জন্য কি আমি—বলতে বলতে সুমিত্রার মুখের পানে চেয়ে কথাটা শেষ করতে পারলেন না অমরনাথ।… আশ্চর্য্য নির্লিপ্ত সে মুখ। সেখানে নূতন জিনিষ পাওয়ার উৎসাহ কিছুমাত্র নাই…নব রচনার গৌরবে উজ্জ্বল নয় তার দৃষ্টি।

সুমিত্রা বললে—লাভের জন্যই তো মানুষ সব করে। লাভের জন্য না হলে—; সহসা সে উত্তেজিত হয়ে উঠল, না—না—দোতলা এখন হবে না। স্বর তার দৃঢ় অনমনীয়।

অমরনাথ সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন, তা হলে তোমার মতে—বাগানের পাঁচিল দিয়ে পুকুর—

সুমিত্রার চোখ অকস্মাৎ জ্বলে উঠল—দাঁতে দাঁত চেপে সে আত্মসম্বরণ করলে। মুখে তার ফুটে উঠল হাসি—ব্যঙ্গ মাখানো হাসি।

এখনও ছেলে-ভোলানো বয়সে আছি—নয় ?

কেন ?

কেন ? কেন ? তাও তুমি জান না ? আহা! আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারলে না সে—উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ল। এমন বিচিত্র পরিহাস ও যেন বহুদিন উপভোগ করে নি। তারই রসে মগ্ন হয়ে ও টেনে টেনে হাসতে লাগল। অপরিমিত—উচ্ছ্বসিত—প্রগল্‌ভ হাসি। পরিণয়-ক্ষণের প্রান্ত থেকে স্মৃতির সুতো টেনে আনলে—দীর্ঘ দূরত্বেও ও হাসির পরিচয় মিলবে না। কঠিন শিলাহত তরঙ্গের বিরামহীন কল্লোলে এ হাসি শ্রুতিকে পীড়িত করে বুকের রক্ত জমিয়ে দিচ্ছে।

স্তব্ধ অমরনাথের চৈতন্য এই হাসির প্রবাহে কোথায় যেন তলিয়ে যেতে লাগল।

উত্তর

এ. এন. এম. বজলুর রশীদ

পেয়েছি তোমার পত্র বহুদিন বহুদিন হয়ে গেল গত,
অবিরত ভাবিয়াছি কি তার উত্তর দিব মজনুনের মত।
তোমার সোনার লিপি, সোনার অক্ষরে লেখা সবুজ পাতায়,
মমতা ও প্রীতিরসে ঝলোমলো টলমলো লতায় লতায়।
কত না বেদনা বন্ধু কত না সে আবেদন, কত ভালবাসা,
কত সে বিস্ময়-ব্যথা, বিচ্ছেদের বহ্নিলেখা, কি যে তার ভাষা,
আমার ভুবন ভরি আলোড়িয়া মর্মমূলে কহিল ক্ষণেক
অনেক প্রীতির কথা, মধুর প্রেমের কথা—অনেক অনেক।
সে লিপির গন্ধ-রঙে রাঙিল আকাশ আর মাটির গোলাব,
আকণ্ঠ করিনু পান আলোকের পেয়ালাতে প্রেমের শরাব,
সে শরাব পান করি কত সুফী কত কবি তাপস-প্রেমিক,
ভুলিল বিরহ তার যোজন-অন্তর শত ভুলে গেল দিক,
ভুলিল আপন সত্তা—আমি তুমি, তুমি আমি—সে কি উন্মাদনা,
মদিরার সেই নেশা দুঃখের আঘাতে আর কভু ঘুচিল না—
ভুলিল না ক্ষণতরে চির-প্রাণ-প্রিয়তমে ভরিল অন্তর—
নির্মম আঘাতে শোকে ভুলিল না তবু সে যে, তথাপি সুন্দর।
আমি শুধু ভুলিলাম—প্রাণের বন্ধুরে, শুধু আমি ভুলিলাম,
শত তুচ্ছ দীনতার হীনতার পাঁকে পাঁকে আমি ডুবিলাম।
বিস্ময় কাটিয়া গেল, মিলাইল আলোকের অমৃত প্রসাদ,
মাটির ঢেলায় ভরি জীবনের পাত্র, ভুলি প্রেমের আস্বাদ—
তোমার প্রেমের স্বাদ—আঃ সে ভুলেছি কবে…মধুর মধুর
কি মধুর…আজ শুধু মিঠা লাগে কাঞ্চনের পাত্র ভরপুর—
প্রস্তরের বর্ণছটা—পথে ভিক্ষাপাত্র হাতে কেঁদেছে মানুষ,
ক্ষুধায় মরেছে শিশু—আমারি সে ভাইবোন, তবু নাই হুশ।
যে প্রাণ তোমারে চাহে তার টুঁটি চাপা দিয়ে করেছি সঞ্চয়,
কি তার উত্তর দিব—আজ শত দ্বন্দ্ব-দ্বিধা জড়তা সংশয়,
শুধু ক্লান্তি অবসাদ লজ্জা দুঃখ অনুতাপ অসংখ্য ধিক্কার।
তবু জানি তুমি আছ—আছে তব নিত্য প্রেম মমতা উদার,
আলোকে আলোকে মর্মে উচ্ছ্বসিত বিশ্বপ্রাণ-অমৃত সঞ্চার।
আজও আছে অধিকার একান্তে তোমারে শুধু ভালবাসিবার।

ব্রহ্ম রাষ্ট্র-বিপ্লবের স্বরূপ

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

যুদ্ধোত্তর যুগে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অচিরে নির্ব্বাপিত না হইলে এই আগুন এক দিন মানুষের ইতিহাসে এক প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাইবে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার যে সমস্ত অঞ্চল এখনও স্বাধীনতা লাভ করে নাই, সে সে অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদের সহিত জাতীয়তাবাদের মরণ-পণ সংগ্রাম চলিতেছে। আর যেখানে যেখানে পরাধীনতার নাগপাশ খসিয়া পড়িয়াছে, সেখানে সেখানে আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্বের তাণ্ডব সুরু হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণও পরিষ্কার। ভিন্নদেশীয় শাসক গোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজনে অধীন দেশসমূহে অন্তর্বিরোধের কারণগুলিকে সযত্নে জিয়াইয়া রাখে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজদেহে অনৈক্যের বীজ বপন করে। কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা দৃঢ় হস্তে পদানত দেশসমূহে শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করে। ফলে অনৈক্যের কারণগুলি চাপা পড়িয়া থাকিলেও নির্ম্মূল হয় না। সুযোগ-সন্ধানী শাসক-গোষ্ঠির উস্কানিতে মধ্যে মধ্যে মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়া ইহারা জাতীয় সংগ্রামকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার প্রয়াস পায়। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার যে সমস্ত দেশ সম্প্রতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, তাহার কোনটিতেই বিদেশীয় সরকারের উত্তরাধিকারী জাতীয় সরকার যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী নহে। ইহাদিগের দুর্ব্বলতার সুযোগে এবং ভূতপূর্ব্ব শাসক-গোষ্ঠির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিতে ঐ সমস্ত দেশের সমাজদেহে যে ভেদের বীজ বর্ত্তমান ছিল, তাহাই সক্রিয় হইয়া উঠিয়া জাতির সদ্যলব্ধ স্বাধীনতাকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এমনই একটি দেশ সুজলা-সুফলা, শস্যশ্যামলা ব্রহ্মদেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগে ১৯৪২ সালে জাপানের তীব্র আক্রমণের নিকট ব্রিটিশ সিংহ পরাজয় স্বীকার করিল। এই সময় হইতেই ব্রহ্মদেশের দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়। জাপান ব্রহ্মদেশ অধিকার করিল। ১৯৪৫ সালে ইংরেজ ব্রহ্মদেশ পুনরধিকার করে। ইংরেজ রাজ এইবার ব্রহ্মদেশকে স্বাধীনতা প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৯৪৮ সালে ৪ঠা জানুয়ারী ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিল।

১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রদেশরূপে শাসিত হইত। ঐ বৎসর ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া হয়। ব্রহ্মদেশীয় জনমতের একটি অংশ অবশ্য এই সময় ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মদেশকে পৃথক করিবার গভীরতর কারণ বিদ্যমান। এই খানে তাহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নহে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে ইংরেজ বণিকের অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং ইংরেজ রাজের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার তাগিদেই ব্রহ্মদেশকে পৃথক করা হইয়াছিল।* ইংরেজের মনে আশা ছিল যে ভারতবর্ষ হইতে স্বতন্ত্র ব্রহ্মদেশকে নির্ব্বিবাদে দীর্ঘকাল শোষণ করা চলিবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। সাম্প্রতিক ইতিহাসের পাতায় এই উক্তির সমর্থন মিলিবে।

ভারতবর্ষ হইতে পৃথক হইবার পর পাঁচ বৎসরও কাটিল না। ব্রহ্মদেশ জাপানের পদানত হইল। ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ্চ রাজধানী রেঙ্গুন জাপবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিল। এক মাসের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ ব্রহ্মের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং জাপান দক্ষিণ ব্রহ্মের মালিক হইয়া বসিল। উত্তর ব্রহ্মও দক্ষিণ ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। ব্রহ্মদেশে ইংরেজ শাসন অতীতের স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হইল। জাপান ব্রহ্মদেশকে 'স্বাধীন' রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিল। ডাঃ বা ম 'স্বাধীন' ব্রহ্মদেশের রাষ্ট্রপতি হইলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি জাপানের করধৃত পুত্তলিকামাত্র ছিলেন। জাপ তাঁবেদারির যুগ ব্রহ্মবাসীর সুখে কাটে নাই।

১৯৪৫ সালে ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে জাপানকে ব্রহ্মদেশ ছাড়িয়া যাইতে হইল। ব্রহ্মদেশে পুনরায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯৪৬ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর জেনারেল আউং সানের নেতৃত্বে অন্তর্ব্বর্ত্তী জাতীয় সরকার গঠিত হইল। পর বৎসর জানুয়ারী মাসে লণ্ডন কনফারেন্সে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়—

১। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে ব্রহ্ম গণ-পরিষদ নির্ব্বাচিত হইবে। পরিষদে কেবলমাত্র ব্রহ্মদেশীয় প্রতিনিধি থাকিবেন।

২। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ না করা পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কার আইনের বিশেষ ক্ষমতা অনুযায়ী এবং ১৯৪৫ সালে বিধিবদ্ধ শাসন-সংস্কার বিষয়ক আইনের অস্থায়ী বিধান অনুযায়ী শাসিত হইবে।

৩। অন্তর্ব্বর্ত্তীকালে ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণ প্রদেশপাল কর্ত্তৃক গণ-পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন। গণ-পরিষদ-রচিত শাসনবিধি কার্য্যকরী হওয়া পর্য্যন্ত ইঁহারা আইন-পরিষদের সদস্য থাকিবেন।

---

* এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে প্রকাশিত লেখকের 'British Rule in Burma' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪। ব্রহ্ম অন্তর্বর্তী সরকার মোটামুটিভাবে ভারতীয় অন্তর্বর্তী সরকার যেভাবে পরিচালিত হয়, সেভাবে পরিচালিত হইবে।

উ স এবং তাখিন বা সিনের নেতৃত্বে ব্রহ্ম জনমতের একটি বিশেষ প্রভাবশালী অংশ এই সর্ত্তাবলী অনুমোদন করিল না। উ স এবং বা সিনের দল লণ্ডন কন্‌ফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্ব্বাচন বর্জ্জন করিল। এই দল 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফার্ষ্ট এলায়েন্স' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া নির্ব্বাচন-বিরোধী আন্দোলন চালাইতে লাগিল। এই আন্দোলন মোটেই নিরুপদ্রব বা অহিংস ছিল না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শান্তিভঙ্গ এবং রেলরাস্তা নষ্ট করিয়া দেওয়া প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কার্য্যাবলীর খবর পাওয়া গেল।

জেনারেল আউং সানের নেতৃত্বাধীন 'এ, এফ, পি, এফ, এল' (Anti-Fascist People's Freedom League) দল নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিল। কিন্তু নির্ব্বাচনকালে শান্তিরক্ষার্থ সরকারী পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর সহায়তার জন্য 'এ, এফ, পি, এফ, এল' দলের নিজস্ব বাহিনী 'পি, ভি, ও'-র সাহায্য গ্রহণ হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে ব্রহ্ম রাজনীতিক্ষেত্রে দুর্য্যোগের কৃষ্ণমেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে। এদিকে জেনারেল আউং সানের জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। ১৯৪৭ সালের ১৯শে জুলাই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী উ স-র চক্রান্তে তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের অপর পাঁচ জন মন্ত্রীসহ রেঙ্গুন সেক্রেটারিয়েট ভবনে নিহত হইলেন।

জেনারেল আউং সানের হত্যার পর 'এ, এফ, পি, এফ, এল' দলের সহকারী সভাপতি তাখিন নু তাঁহার স্থান গ্রহণ করিলেন। স্বাধীন ব্রহ্মদেশের তিনিই প্রথম প্রধান মন্ত্রী। আজ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী ব্রহ্মদেশ নিজেকে সার্ব্বভৌম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিল। ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে ব্রহ্মদেশীয় কম্যুনিষ্টগণ সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করায় দেশে অন্তর্বিপ্লবের দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। এই দাবানল ক্রমশঃ বর্দ্ধিততেজাঃ হইয়া ব্রহ্মদেশে যে মাৎস্যন্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আজ ব্রহ্ম-স্বাধীনতাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশীয় কম্যুনিষ্টগণ প্রথম প্রথম সরকারের সহিত প্রকাশ্য শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত না হইয়া ধ্বংসাত্মক কার্য্যাবলীর উপর জোর দিয়াছিল। সরকারী রক্ষণ-ব্যবস্থা যেখানে দুর্ব্বল সেখানে অতর্কিতে আঘাত হানিয়া ইহারা সরিয়া পড়িত। দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের যুগে মার্কিন সেনাপতি চিনল্টের নেতৃত্বে পরিচালিত চীনা বিমানবহর এই নীতি অনুসরণ করিয়া যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছিল। ইহা 'মার এবং পালাও' (Hit and run) নীতি নামে পরিচিত। সরকারী সমর্থক মহলের ধারণা ছিল যে অচিরেই কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের অবসান ঘটিবে। জনৈক পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী একবার লেখককে বলিয়াছিলেন যে, ১৯৪৮ সালের বর্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কম্যুনিষ্টগণ নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। এই ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মদেশীয় লাল ফৌজে বর্ত্তমানে ন্যূনাধিক ১০,০০০ অল্পবিস্তর শিক্ষিত সৈন্য আছে এবং ব্রহ্মদেশের মোট ২৬১,৬১০ বর্গমাইল পরিমিত স্থানের ৪০,০০০ বর্গ মাইল আজ কম্যুনিষ্টদিগের অধীন। ব্রহ্মদেশ হইতে প্রাপ্ত সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে রাজধানী রেঙ্গুন হইতে ১৬০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ইরাবতী কূলে অবস্থিত প্রোমে তাখিন তান টুনের নেতৃত্বে একটি কম্যুনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্ম কম্যুনিষ্টগণ লাল এবং সাদা এই দুই দলে বিভক্ত। তাখিন সো'র নেতৃত্বাধীন প্রথমোক্ত দল ট্রট্স্কীপন্থী পক্ষান্তরে তাখিন থান টুনের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত শেষোক্ত দল ষ্টালিন-পন্থী। তাখিন তান টুনের অন্যতম প্রধান সহকর্ম্মী হরি-নারায়ণ ঘোষাল রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ উপাধি-প্রাপ্ত। ইঁহার পিতা ব্রহ্মসরকারের অধীনে জেল বিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহারা ঢাকা জেলার বেতকা গ্রামের অধিবাসী। সাদা কম্যুনিষ্ট দলে আরও একাধিক বাঙালী আছেন। ব্রহ্মদেশীয় কম্যুনিষ্টগণকে লাল চীন কোন সাহায্য প্রদান করিবে কিনা এখনও বলা যায় না। কিন্তু চীনে মাও সে তুং পরিচালিত কম্যুনিষ্টগণের হস্তে চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদীগণের পরাভব যে বিশ্বের সর্ব্বত্র কম্যুনিষ্টদিগের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগের মনোবল দৃঢ়তর করিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

উপরে একবার 'পি, ভি, ও' বাহিনীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা শ্বেত এবং হরিদ্রা এই দুই দলে বিভক্ত। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্বেতদল সরকার বিরোধী। সংখ্যাল্প হরিদ্রাদল সরকারের সমর্থক। ব্রহ্মরাজনীতি, বিশেষ করিয়া 'পি. ভি. ও' বাহিনীর রাজনীতির ধারা বোঝা ভার। জেনারেল আউং সানের হত্যার অব্যবহিত পরে 'পি, ভি, ও' বাহিনীর বেশীর ভাগ আত্মগোপন করে। ইহারাই পরে শ্বেত 'পি, ভি, ও' নামে পরিচিত হয়। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে যখন কারেনগণ সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে তখন শ্বেত 'পি, ভি, ও' বাহিনী সরকারের সহিত আপোষ করিয়া কারেনদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। এই সময় সরকার ইহাদিগকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই পুনরায় সরকারের সহিত তাহাদিগের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। শ্বেত 'পি, ভি, ও' দলের কোন সুনির্দ্দিষ্ট নীতি বা কর্ম্মপন্থা নাই। ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় ইহারা সুবিধাবাদী। ইহারা কোথাও সরকারের পক্ষে, কোথাও বা সরকারের বিপক্ষে যুদ্ধ করি-তেছে। কোন কোন অঞ্চলে ইহারা আবার নিজেরাই মারা-

মারি কাটাকাটি করিতেছে। 'পি, ভি, ও' বাহিনী অত্যন্ত বহিরাগত বিদ্বেষী হইলেও স্বদেশপ্রেমিক। কিন্তু ইহাদিগের সংগঠন এবং যুদ্ধকৌশল অত্যন্ত নিম্নাঙ্গের বলিয়া ইহারা মোটেই শক্তিশালী নহে। কারেন এবং কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহের ফলে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে না হইলে এতদিনে শ্বেত 'পি, ভি, ও' বাহিনী সরকারী সৈন্যদলের হাতে নির্মূল হইয়া যাইত অথবা সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইত।

এত দিন পর্য্যন্ত কারেন বিদ্রোহের জন্যই ব্রহ্ম সরকারকে খুব বেশী ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। কারেনগণ ব্রহ্মদেশের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু জাতি। ১৯৪১ সালের আদমসুমারির হিসাব অনুযায়ী ব্রহ্মদেশের মোট অধিবাসী সংখ্যা ছিল ১৬,৮২৩,৭৯৮। ইহার মধ্যে পনর হইতে কুড়ি লক্ষ ছিল কারেন জাতীয়। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অধিকাংশ কারেনই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অথবা প্রেতোপাসক। কারেন খ্রীষ্টানগণ বহুল পরিমাণে জাতীয়তা-বোধ বর্দ্ধিত। অতীতে সংখ্যাগুরু ব্রহ্মজাতীয়গণ কর্ত্তৃক ইহারা নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইয়াছে। সেই বেদনাদায়ক কাহিনী এখনও ইহাদের স্মৃতিতে জাগরূক রহিয়াছে। ফলে ইহারা সংখ্যাগুরু ব্রহ্মজাতীয়গণকে বিশ্বাস করে না। সেইজন্যই ইহারা ব্রহ্ম যুক্তরাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি সার্ব্বভৌম কারেন রাষ্ট্র স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর। স্বাধীন ব্রহ্মদেশের রাষ্ট্রবিধিতে একটি স্বয়ংশাসিত কারেন রাষ্ট্র স্থাপনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রথম দশ বৎসর কাল এই রাষ্ট্রকে ব্রহ্ম যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিতেই হইবে। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যবাদী কারেনগণ ইহাতে সম্মত নহে। সেইজন্য তাহারা 'কে, এন, ডি, ও' (K. N. D. O.—Karen National Defence Organisation) নামক একটি সংস্থা গঠন করিয়া ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাস হইতে থাখিন নু সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়াছে। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে এই বিদ্রোহের তীব্রতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে 'কে, এন্, ডি, ও' সমগ্র ব্রহ্মদেশ পদানত করিবে। নু সরকারের পতন আসন্ন এবং অবশ্যম্ভাবী মনে হইয়াছিল। সরকার আপাততঃ এই টাল সামলাইয়া উঠিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কারেন বিদ্রোহের সুযোগে অন্যান্য দলভুক্ত বিদ্রোহীগণ এবং সমাজ-বিরোধী শক্তিগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা সক্রিয় হইয়া উঠিবার ফলেই সরকারকে নিদারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ নেপাল হইতে আগত। ইহারা সাধারণতঃ ব্রহ্মদেশীয় গুর্খা নামে অভিহিত হয়। ইহারা নিঃসন্দেহে ব্রহ্মদেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোদ্ধসম্প্রদায়। ইহাদিগের নিয়েই কারেনদিগের স্থান। কিন্তু কারেন বিদ্রোহের ফলে সরকারী ফৌজে আজ একটিও কারেন সৈন্য নাই। কারেন সৈন্যদিগের মধ্যে অনেকেই 'কে, এন্, ডি, ও'-র পক্ষাবলম্বন করিয়া সরকারের বিরুদ্ধে লড়িতেছে। যাহারা তাহা করে নাই বা করিবার সুযোগ পায় নাই, তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া বন্দী করা হইয়াছে। সরকারী ফৌজে এখন ব্রহ্মজাতীয় সৈন্যগণই সংখ্যায় সর্ব্বাধিক। কিন্তু ইহাদিগের রণনৈপুণ্য, সাহসিকতা বা বিশ্বস্ততার সুনাম নাই।

অনেকেই বিশ্বাস করেন যে কারেন বিদ্রোহের পশ্চাতে এক বা একাধিক শক্তিমান্ পররাষ্ট্রের সমর্থন এবং সক্রিয় সহায়তা রহিয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলেও এই অনুমান বোধ হয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নহে। ইংরেজ সেনানী টুলক এবং ইংরেজ সাংবাদিক ক্যাম্বেলের কার্য্যকলাপ এই সন্দেহকে দৃঢ়তর করিয়াছে।

গত বৎসর মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে সমগ্র ব্রহ্মদেশের এক-দশমাংশও নু সরকারের হাতে ছিল কিনা সন্দেহ। আজ অবশ্য অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে সরকারী ফৌজ কারেন বিদ্রোহীদিগের প্রধান ঘাঁটি মধ্য ব্রহ্মের টাঙ্গু শহর অধিকার করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। ইহার ফলে সত্যই কারেন বিদ্রোহের অবসান ঘটিল কিনা বলিবার সময় এখনও আসে নাই। অতীতে একাধিকবার দেখা গিয়াছে যে নিদারুণ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পরও কারেনগণ পুনরায় স্বীয় শক্তি সুসংহত করিয়া টাল সামলাইয়া উঠিয়াছে। এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে কিনা কে জানে! ব্রহ্মদেশ হইতে সম্প্রতি প্রাপ্ত আর একটি সংবাদে প্রকাশ যে সরকার কারেন বিদ্রোহীদিগের সহিত আপোষের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। খবর সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে বিদ্রোহের মেরুদণ্ড এখনও অটুট আছে।

টাঙ্গু হইতে কারেনগণের পশ্চাদপসরণের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের অর্দ্ধাংশ বা তাহারও অধিক এবং সমগ্র দেশের জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশও নু সরকারের আনুগত্য স্বীকার করিত না। টাঙ্গুতে অবস্থিত 'কে, এন্, ডি, ও' সরকার একাই মধ্য এবং নিম্নব্রহ্মের ৫০,০০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থানের উপর শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। টাঙ্গু সরকারের একটি নিজস্ব বেতার কেন্দ্রও ছিল। বিদ্রোহী কারেন ফৌজে ন্যূনাধিক দশ সহস্র সৈনিক আছে। সরকারী সৈন্যসংখ্যা ইহার প্রায় দ্বিগুণ হইলেও সরকারী সৈন্য অপেক্ষা কারেন সৈন্য যুদ্ধবিদ্যায় অধিকতর পারদর্শী। প্রৌঢ় স বাউ জি (Saw BaU Gyi) কারেন বিদ্রোহীদিগের প্রধান নেতা। পূর্ব্বে ইনি আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনিই টাঙ্গুতে প্রতিষ্ঠিত 'কে, এন্, ডি, ও' সরকারের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

নিম্ন ব্রহ্মের আরাকানে বহু দিন যাবৎ ব্রহ্মদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার আন্দোলন চলিতেছে। এখানেও সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। আরাকানী বিদ্রোহী-দিগের দুইটি দলের মধ্যে একটি উ স্নিডার (U Sneida) নেতৃত্বে পরিচালিত। পূর্ব্বে ইনি বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। অপরটি মুসলমান 'মুজাহিদ' দল। সময় থাকিতে সাবধান না হইলে পূর্ব্ব পাকিস্থান নাতিদূর ভবিষ্যতে সমগ্র আরাকান না হইলেও ইহার বড় একটা অংশ নিশ্চয়ই গ্রাস করিবে। গত এক বৎসর বা তাহার কিছু অধিক সময়ের মধ্যে সহস্র সহস্র পাকিস্থানী মুসলমান আরাকানে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। এই স্রোত এখনও রুদ্ধ হয় নাই। আরাকান জেলার উত্তরাংশ, বিশেষত: রথিডং, বুথিডং এবং মংড অঞ্চল ত আজ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। পর্ব্বত ও নদীবহুল ব্রহ্ম পাকিস্থান সীমান্তে লোকজনের গতিবিধির উপর সম্যক্ দৃষ্টি রাখা সম্ভব নহে। ইহারই সুযোগে এবং স্থানীয় মুসলমান-দিগের সহায়তায় এবং হয়ত পাকিস্থানী নেতৃবৃন্দের উস্কানিতে পাকিস্থানী মুসলমানগণ দলে দলে নির্ব্বিবাদে আরাকানে প্রবেশ করিতেছে। সরকারী কর্ম্মচারীগণের অযোগ্যতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইঁহাদিগের অসাধুতাও অবশ্য ইহার জন্য কম দায়ী নহে। আসাম-পাকিস্থান সীমান্তেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটিতেছে। আসাম তথা ভারত সরকারের চোখ কি খুলিবে না ?

ব্রহ্মদেশের আর একটি সংখ্যালঘু জাতি শানগণও আজ আর সমগ্রভাবে তাখিন নু সরকারের অনুগত নহে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। গত আগষ্ট মাসে দক্ষিণ শানরাষ্ট্র-পুঞ্জের রাজধানী টাউঞ্জি শহর কারেন বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। বর্ত্তমান লেখক সেই সময় উত্তর ব্রহ্মের ম্যাণ্ডালে শহরে ছিলেন। ইহার পর দীর্ঘ দিন টাউঞ্জি কারেন-কবলিত থাকিবার কথা শোনা যায়। কিন্তু লেখকের একাধিক ভারতীয় এবং ব্রহ্মদেশীয় বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছেন যে টাউঞ্জি ঐ সময় প্রকৃত প্রস্তাবে শান বিদ্রোহীদিগের হাতে ছিল। এক জন ক্ষুদে শান সামন্ত এই বিদ্রোহীদিগের নেতা ছিলেন।

মন বা তালাইংগণ ব্রহ্মদেশের অপর একটি জাতি। সংখ্যায় ইহারা খুবই কম,—ইহাদিগের জাতীয় সংগঠন 'এম, এন, ডি, ও' (M. N. D. O.—Mon National Defence Organisation)-ও সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। মন বিদ্রোহের জন্য অবশ্য তাখিন নু সরকারের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। ব্রহ্মদেশের অপরাপর সংখ্যালঘু জাতির মধ্যে চিন, কাচিন এবং প্রবাসী নেপালীদিগের নাম করা যাইতে পারে। ইহারা এখনও সরকারের অনুগত। চিন, কাচিন এবং নেপালী সৈন্যগণই বহু রণাঙ্গনে সাহস ও নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বিদ্রোহীদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছে। কিন্তু সরকার ইহাদিগের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি উদাসীন এবং ইহাদিগের রাষ্ট্রানুগত্যের যোগ্য পুরস্কার দিতে পরাঙ্মুখ। প্রবাসী নেপালীগণ কয়েক-পুরুষ পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে স্থায়ী ঘর বাঁধিয়াছে। ইহারা বরাবরই নিষ্ঠার সহিত সরকারের সেবা করিয়াছে। কিন্তু স্বাধীন ব্রহ্মদেশের রাষ্ট্রবিধিতে ইহাদিগকে ব্রহ্মদেশের নাগরিক বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। জাতীয় পরিষদে ইহাদিগের কোন প্রতিনিধি নাই। অথচ শান, কাচিন, চিন, কারেন প্রভৃতি সংখ্যালঘু জাতিকে পরিষদে প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সামরিক কর্ম্মচারীগণ প্রায় সকলেই ব্রহ্ম-জাতীয়। ১৯৪৯ সালের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত কোন প্রবাসী নেপালী সরকারী সৈন্যদলে ক্যাপ্টেনের পদ অপেক্ষা উচ্চতর পদ লাভ করেন নাই। তাহার পরের খবর লেখকের জানা নাই। ফলে ইহারা ক্রমেই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। ন সেং-এর নেতৃত্বে কাচিন জাতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এক বৎসরেরও অধিক দিন যাবৎ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে স্বজাতির মধ্যে ন সেং-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমশ:ই বাড়িয়া যাইতেছে। কাচিনদিগের অনেকেরই ধারণা যে নু সরকারের কাচিন দফ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী (Minister for Karen Affairs) কাচিন জাতীয় দোয়া সিমা সিনোয়া নাওঁ (Dwn Sima Sinw Naong)-কে ব্রহ্মজাতীয় রাজ-নীতি ধুরন্ধরগণ স্বাভীষ্ট সাধনের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছেন। জনৈক উচ্চশিক্ষিত কাচিন সরকারী কর্ম্মচারী লেখককে বলিয়াছেন যে পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে দোয়া সিমা সিনোয়া নাওঁ-এর পক্ষে নির্ব্বাচিত হওয়া সম্ভব হইলেও মোটেই সহজসাধ্য হইবে না।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে তাখিন নু গঠিত সরকার অতি অল্পকালের মধ্যে মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী ব্যতীত দেশের প্রায় সকলকেই বিগ্ড়াইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছেন। ব্রহ্মদেশের সমস্যা অত্যন্ত জটিল ইহার সমাধান সত্যই দুষ্কর। ইতিহাসের সাক্ষী এই যে কঠোর একনায়কত্ব ব্যতীত অন্য কোন শাসন-ব্যবস্থাই অতীতের ব্রহ্মদেশের ঐক্য বা আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। ব্রহ্মদেশের পক্ষে আজও এক-নায়কত্ব অপরিহার্য্য এমন কথা না বলিলেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে একটি সাধু এবং শক্তিশালী সরকার আজ তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। দেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য নির্দ্ধারিত নীতি এবং কর্ম্মপন্থাকে রূপায়িত করিবার জন্য এই সরকারকে প্রয়োজন হইলে যে কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। একমাত্র এই উপায়েই ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা রক্ষা পাইতে পারে।

মিষ্টি আলু

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

যদিও আমরা গোল আলু ও মিষ্টি আলুকে আলু বলিয়া থাকি, কিন্তু উদ্ভিদশাস্ত্র অনুযায়ী ইহারা সমপরিবার (family) ভুক্ত নহে ; গোল আলু 'সোলান্সি' (solanceae) এবং মিষ্টি আলু 'কন্‌ভলভিউলেসি' (convolvulaceae) শ্রেণীর অন্তর্গত ; গোল আলুর নাম 'সোলেনাম টিউবারোসম' (solanum tuberosum) এবং মিষ্টি আলুর নাম 'আইপোমিয়া বাটাটস্' (Ipomaea batatus) ; গোল আলু কাণ্ডের রূপান্তর, মিষ্টি আলু বৃহত্তর শিকড়।

গোল আলু এবং মিষ্টি আলুর আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ নহে। অনেকে বলেন দক্ষিণ আমেরিকাই গোল আলুর আদি জন্মস্থান। স্পেন দেশের অধিবাসিগণ প্রথমে মিষ্টি আলুর সন্ধান পান এবং ইহার নাম ছিল 'বাটাটিস্' (batatus) ; তাঁহারাই ভুলক্রমে ইহার নাম 'পোটাটো' (potato) দেন ; যে সকল স্থানে মিষ্টি আলু এবং গোল আলু উৎপন্ন হয় সেই সকল স্থানে গোল আলুকে 'আইরিশ পোটাটো' বলা হয়। স্পেন দেশ হইতেই মিষ্টি আলু ইংলণ্ডে আসে, এবং তখন তথায় গোল আলুর প্রচলন ছিল না। সেক্সপিয়ার এবং তৎকালীন অন্যান্য লেখকদের রচনার মধ্যে যে আলুর উল্লেখ দেখা যায়, তাহা মিষ্টি আলু বলিয়া অনেকে মনে করেন।

বর্ত্তমানে অনেক দেশেই ব্যাপকভাবে ইহার চাষ হয় ; এবং ঐ সকল দেশের অধিবাসিগণের খাদ্যের ইহা একটি প্রধান অংশ। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, আমেরিকার অন্যান্য স্থানে, চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, উত্তর আফ্রিকা, মেদিরা, 'ক্যানারী আইলাণ্ড্স্' প্রভৃতি দেশে ইহার চাষের পরিমাণ কম নহে।

গোল আলু ও মিষ্টি আলু সমপরিবারভুক্ত না হইলেও উভয়ই আমাদের একটি উত্তম খাদ্য ; কিন্তু কি কারণে গোল আলুর তুলনায় মিষ্টি আলুর প্রচলন কম তাহা বলা কঠিন। তবে আমাদের দেশে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুতের জন্য মিষ্টি আলুর ব্যবহার বেশী। বর্ত্তমান খাদ্যাভাবের সময় মিষ্টি আলুর অধিকতর ব্যবহার বিশেষ দরকার ও বাঞ্ছনীয়।

খাদ্য হিসাবে গোল আলু অপেক্ষা মিষ্টি আলু অধিকতর পুষ্টিকর। আমেরিকার লুসিয়ানার 'ব্যাটন রোগে' অবস্থিত গবেষণা গৃহের অধ্যক্ষ ডা: জুলিয়ান সি. মিলার বলেন, "মিষ্টি আলুতে যত প্রকার পুষ্টিকর উপাদান আছে সম্ভবত: আর কোন সব্‌জীতে নাই। ইক্ষু ব্যতীত একর প্রতি আর কোন শস্য হইতে সমান পরিমাণ শ্বেতসার পাওয়া যায় না।" তাঁহার বিশ্লেষণ অনুযায়ী গোল আলু ও মিষ্টি আলুর খাদ্যাংশের গুণাগুণ নিম্নের হিসাব হইতে বুঝা যাইবে :
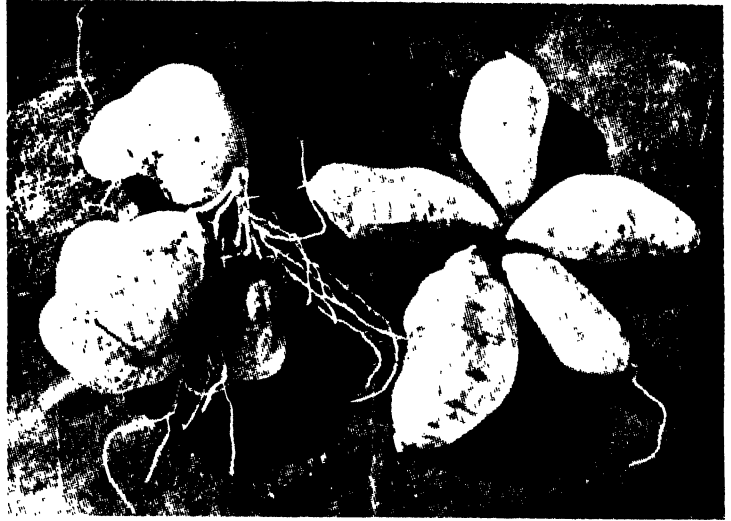
মিষ্টি আলু (বাংলা)

	মিষ্টি আলু	গোল আলু
ক্যালোরি	৫৬৭	৩৮৬
প্রোটিন (গ্র্যাম)	৮	৯
ফ্যাট (স্নেহ জাতীয়)—গ্র্যাম	৩	০'৫
কার্ব্বোহাইড্রেট (শ্বেতসার)—গ্র্যাম	১২৭	৮৭
ক্যালসিয়ম (চুন)—গ্র্যাম	১৫৯	৩৬
ফস্‌ফরাস (মিলিগ্র্যাম)	২২২	২২২
আয়রণ (লৌহ)—মিলিগ্র্যাম	৩'২	৩'৪
ভিটামিন 'এ' (ইউনিট্)	১৭,২০০	১৮০
থিয়ামিন (মিলিগ্র্যাম)	০'৪৫	০'৪১
রিবোফ্লেবিন (")	০'৩২	০'২৩
নিয়াসিন (")	৫'৯	৫'৪
এসকর্বিক এসিড "	১১৩	৪৫

উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে মিষ্টি আলুতে কার্বোহাইড্রেট, ক্যালসিয়ম এবং ভিটামিন 'এ' অধিকতর পরিমাণে বিদ্যমান আছে এবং এই সকল উপাদান আমাদের দেহের পুষ্টি ও রক্ষার জন্য বিশেষ দরকার।

মিষ্টি আলু (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

গত যুদ্ধের সময় আমেরিকায় অতি অল্প দিনের মধ্যেই মিষ্টি আলুর ব্যবহার দ্রুতগতিতে বাড়িয়া গিয়াছিল; ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কিন 'আর্মি কোয়াটার মাষ্টার কোরে'র নিকট নমুনা স্বরূপ ৫ পাউণ্ড (মোটামুটি আড়াই সের) মিষ্টি আলু পাঠানো হয়; অবিলম্বেই দুই হাজার পাউণ্ডের 'অর্ডার' আসে। ১৯৪২ সালের মধ্যে জল নিষ্কাশিত (dehydrated) মিষ্টি আলুর 'অর্ডার' ২০ লক্ষ পাউণ্ডে পৌঁছে। ১৯৪৫ সালে মার্কিন সামরিক বাহিনীর এবং 'ল্যাণ্ড-লিজ' ব্যবস্থায় দুই কোটি পাউণ্ডের 'অর্ডার' পাওয়া গিয়াছিল।

মিষ্টি আলুর ডগা, পাতা ইত্যাদি পশুখাদ্য হিসাবেও মূল্যবান এবং ঘোড়া ও গরুর উত্তম খাদ্য। এক একর জমি হইতে প্রায় ১½ টন জল-নিষ্কাশিত উচ্চশ্রেণীর পশুখাদ্য পাওয়া যায়। ডাক্তার মিলারের মতে "আল্‌ফাল্‌ফা" শুষ্ক ঘাস এবং মিষ্টি আলু পশুখাদ্য হিসাবে সমান পুষ্টিকর। তাঁহার বিশ্লেষণ এইরূপ :—

	মিষ্টি আলুর ডগা, পাতা	আলফালফা
প্রোটিন	১২'৬	১৪'৭
ফ্যাট	৩'৩	২'০
কার্বোহাইড্রেট	৪৫'৫	৩৬'৪
মিনারেল	১০'২	৮'৩

শিল্পক্ষেত্রেও মিষ্টি আলুর ব্যবহার আছে, নানাবিধ 'আঠা' জাতীয় পদার্থ, মাড়, বস্ত্র ও কাগজের 'সাইজিং', নানাবিধ প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য যে সকল মূলজ-শ্বেতসার ব্যবহৃত হয় তাহাদের তুলনায় মিষ্টি আলুর শ্বেতসার বেশী না হইলেও কম কার্য্যকরী নহে। রুটি (baking) এবং মিষ্টান্ন (confectionery) শিল্পেও মিষ্টি আলুর শ্বেতসার উপযুক্ত। যে সকল শ্রেণীর মিষ্টি আলু খাদ্যের উপযোগী নহে সেই সকল শ্রেণী হইতে সুরাসার প্রস্তুত করা যায়। নানাবিধ 'মার্ম্মালেড', এবং জেলি প্রস্তুতের জন্য যে 'পেকটিন্' ব্যবহৃত হয় মিষ্টি আলুতে তাহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মিষ্টি আলুর কোন কোন জাতি হইতে গাজরের সমপরিমাণ 'ক্যারোটিন্' পাওয়া যায়। মিষ্টি আলু হইতে সুরাসার প্রস্তুতের সময় "ফালতু দ্রব্য" (bye product) হিসাবেও 'ক্যারোটিন্' পাওয়া যায়। ক্যারোটিন্'ই ভিটামিন 'ক'-এর প্রধান উৎস। মিষ্টি আলু হইতে অতি সহজে 'সিরাপ প্রস্তুত' করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষে কুটীর শিল্প হিসাবে 'সিরাপ' প্রস্তুতের অধিকতর প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইক্ষু রসের 'সিরাপের' ন্যায় মিষ্টি আলু হইতে প্রস্তুত 'সিরাপ' মিষ্ট নহে; কিন্তু মিষ্টি আলুর 'সিরাপের' সহিত শতকরা ১০ ভাগ ইক্ষু-রসের 'সিরাপ' অনায়াসে মিশ্রিত করা যাইতে পারে। ডাঃ জি. এ. সুয়ের বিশ্লেষণ অনুসারে মিষ্টি আলুর 'সিরাপের' উপাদান এইরূপ :—

জল	ভস্ম	প্রোটিন	মল্টোজ	সুক্রোজ	ডেক্সট্রিন	অন্যান্য
৩০'১২	১'৭৫	২'৪৫	৪৩'০১	৭'০০	১৪'০৪	১'৬৩

অতি সহজেই মিষ্টি আলু হইতে ময়দা প্রস্তুত করা যায়। প্রয়োজন অনুসারে গৃহস্থেরা অল্প পরিমাণ মিষ্টি আলু রৌদ্রে শুকাইয়া উহা হইতে নিজেদের ব্যবহারের জন্য ময়দা প্রস্তুত করিতে পারেন। পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, শতকরা ২০ ভাগ (এমন কি ইহারও বেশী) মিষ্টি আলুর ময়দা রুটি, চাপাটি প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য আটার সহিত মিশ্রিত করা যাইতে পারে। এইরূপ রুটি, চাপাটি খুবই সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। আঁটপুর (হুগলী) নিবাসী শ্রীহরেরাম ঘোষ মিষ্টি আলু সিদ্ধ করিয়া উহা আটার সহিত চটকাইয়া প্রতি দিন রুটি প্রস্তুত করেন। এক সের আটার সহিত এক পোয়া মিষ্টি আলু মিশ্রিত করেন। আমরা উক্ত রুটি গ্রহণ করিয়াছি, খুব সুস্বাদু।

অধিক পরিমাণ মিষ্টি আলু শুষ্ক করিবার জন্য আধুনিক বিশুষ্ককরণ যন্ত্র ব্যবহার করাই প্রশস্ত। আমেরিকায় এইরূপ

বহু রকমের যন্ত্র আছে। এইরূপ যন্ত্রের সাহায্যে পশুখাদ্যের জন্য মিষ্টি আলুর ডাঁটা, পাতা ইত্যাদিও অতি শীঘ্র শুষ্ক করা যায়।

মিষ্টি আলুর খুব ছোট ছোট শিকড় এবং খুব বৃহৎ শিকড়গুলি খাদ্য হিসাবে উপযোগী নহে; এইগুলি শিল্পে ব্যবহার করা যাইতে পারে। সরু সরু শিকড়গুলি পশুখাদ্যরূপে ব্যবহার করা চলে। সুতরাং মিষ্টি আলুর প্রায় সমুদয় অংশই কোন না কোন কাজে লাগানো যায়।

মিষ্টি আলুর শিকড় নানা আকারের এবং নানা আয়তনের হয়। ইহাদের শ্রেণী বিভাগ প্রয়োজন। আমেরিকায় খাদ্যের জন্য নিম্নলিখিত রূপ শ্রেণী বিভাগ করা হয়। প্রথম শ্রেণী—ব্যাস ১¾ ইঞ্চি হইতে ৩½ ইঞ্চি। দৈর্ঘ্য ৩ ইঞ্চি হইতে ১০ ইঞ্চি। দ্বিতীয় শ্রেণী—ব্যাস চার ইঞ্চির অধিক এবং দেড় ইঞ্চির কম নহে।

অনেক রকমের মিষ্টি আলু আছে; ইহাদের আকার, গন্ধ, স্বাদ প্রভৃতিও বিভিন্ন। তবে আমাদের দেশে সাদা এবং লাল জাতীয় মিষ্টি আলুর চাষ সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। লাল জাতীয় আলু সাদা জাতীয় আলু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট।

মিষ্টি আলুর গাছ মাটিতে লতাইয়া যায়; পাঁচ ছয় ফুট লম্বা হয়। ইহার ফুলের রং লাল, সাদা কিম্বা ধূমল বর্ণের হয়। কাণ্ডের গ্রন্থি হইতে আস্থানিক শিকড় বাহির হয় এবং সেই শিকড় মাটিতে প্রবেশ করে ও মাটির ভিতরে স্ফীত হয়। এইরূপ স্ফীত শিকড়ই মিষ্টি আলু।

জাতি, আবহাওয়া, রোপণের সময়, চাষের প্রণালী, পরিচর্য্যা, উত্তোলনের সময় প্রভৃতির উপর মিষ্টি আলুর ফলন, ওজন ও শ্বেতসারের পরিমাণ নির্ভর করে। ইহাদের তারতম্য অনুসারে সাধারণতঃ শতকরা ১৯ হইতে ৩২ ভাগ শ্বেতসার মিষ্টি আলুতে পাওয়া যায়। ডাক্তার মিলারের উদ্ভাবিত 'পেলিক্যান্ প্রোসেসার' নামক জাতি হইতে শতকরা ২৬ হইতে ৩২ ভাগ শ্বেতসার পাওয়া গিয়াছে।

মিষ্টি আলুর চাষের জন্য জল দাঁড়ায় না এইরূপ উচু জমির প্রয়োজন; হালকা বেলে দোআঁশ মাটিই ইহার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। মাটি ভালভাবে ও আলগাভাবে প্রস্তুত করা দরকার, কেননা মাটির নীচেই মিষ্টি আলু জন্মায়। মাটিতে সার প্রয়োগেরও প্রয়োজন; উপযুক্ত পরিমাণ গোবর, 'কম্পোষ্ট' সার প্রভৃতি প্রয়োগ করিলেই চলে; একর প্রতি ১৫০।২০০ মণ এইরূপ সারই যথেষ্ট। একর প্রতি ৫।৬ মণ রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিলে উত্তম ফলন পাওয়া যায়। সবুজ সারও বিশেষ উপকারী। প্রত্যেক বৎসর একই জমিতে মিষ্টি আলুর চাষ করা উচিত নয়। শস্য পর্য্যায় অনুসারে

মিষ্টি আলু (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

তৃতীয় বৎসরে চাষ করা উচিত।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ ভাদ্র-আশ্বিন মাসে মিষ্টি আলুর চাষ করা হয়। জমি প্রস্তুত ও সার প্রয়োগের পর জমিতে তিন ফুট অন্তর এক বা দেড় ফুট উচ্চ আইল প্রস্তুত করিয়া প্রতি আইলে এক বা দেড় ফুট অন্তর টুকরা টুকরা কাণ্ড অর্থাৎ 'ডগা' রোপণ করিতে হয়; ডগাগুলি এক ফুট লম্বা হইলেই চলে। ডগা রোপণ করিবার পর তাহার চারি পাশের মাটি ভালভাবে চাপিয়া দিতে হয়। এক সপ্তাহের মধ্যেই ডগা হইতে শিকড় বাহির হয় এবং উহা মাটিতে বেশ লাগিয়া যায়। মাটিতে যদি রস থাকে গাছ খুব শীঘ্রই বাড়িয়া যায়। জমির রস যদি শুকাইয়া যায় এবং দুই-তিন সপ্তাহ বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে সপ্তাহে একবার জল সেচন করা উচিত। প্রথম অবস্থায় জমির ঘাস জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দেওয়া বিশেষ দরকার। গাছ বড় হইয়া যখন লতাইয়া যাইবে তখন উহা জমিকে আবৃত করিয়া ফেলিবে ও তাহার চাপে ঘাস জঙ্গল জন্মিতে পারিবে না।

তিন চার মাসের মধ্যেই মিষ্টি আলু তুলিবার উপযুক্ত হয়। এই সময়ে গাছের পাতার রং 'হলদে' হইয়া যায় এবং পাতা শুকাইয়া যায়। কয়েকটি আলু তুলিয়া এবং উহাদের কাটিয়া যদি দেখা যায় যে, উহাদের ভিতরের রস খুব শুকাইয়া যাইতেছে ও ভিতরে একটা সাদা দাগ পড়িয়াছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আলু তুলিবার উপযুক্ত হইয়াছে।

ফসল তুলিবার সময় যাহাতে আলু কাটিয়া না যায়, এমন

কি উহার ত্বকে কোনরূপ আঘাত বা আঁচড় না লাগে সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গুদামে রাখিবার ও বিক্রয়ের সময়েও বিশেষ যত্ন লওয়া দরকার। ইহা না করিলে ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী হইবার সম্ভাবনা থাকে। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, কোনরূপ আঘাতপ্রাপ্ত (কাটা, আঁচড় লাগা ইত্যাদি) মিষ্টি আলু সাড়ে পাঁচ মাস গুদামে থাকা অবস্থায় শতকরা ২৮·১ ভাগ শুকাইয়া গিয়াছে, ১৩·৮ ভাগ পচিয়া গিয়াছে, বিনা আঘাতপ্রাপ্ত আলু ঐ সময়ে ১৩·৮ ভাগ শুকাইয়াছে ও এক ভাগ পচিয়াছে। ইহাও বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার যে, মিষ্টি আলুর ত্বকে যদি কোন রকম আঘাত এমন কি আঁচড় লাগে তাহা হইলে উহা শীঘ্রই রোগাক্রান্ত হইবে। আলু গুদামে রাখিবার সময় উহার গায়ের মাটিও পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশে মিষ্টি আলু বেশী দিন গুদামে রাখা যায় না; শুষ্ক বালির মধ্যে রাখিলে বেশ কিছুদিন রাখা যায়।

বীজ-ক্ষেত্রে সবল সুস্থ খণ্ড খণ্ড মিষ্টি আলু রোপণ করিয়া উহা হইতে চারা প্রস্তত করা যায়, এবং উক্ত চারা আসল জমিতে রোপণ করা যায়। চারার পাঁচ ছয়টি পাতা হইলেই উহা নাড়িয়া রোপণ করা প্রশস্ত। একই শিকড় (মিষ্টি আলু) হইতে দুই তিন সপ্তাহ অন্তর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার চারা জন্মে। ডাঃ মিলারের মতে 'ডগা' হইতেই ফসল উৎপাদন করা প্রশস্ত। কারণ এই প্রণালীর দ্বারা অধিকতর পরিমাণে ফসল উৎপাদন করা যাইবে এবং ইহাতে রোগের আক্রমণও কম হয়।

আমেরিকার বিভিন্ন আবহাওয়াযুক্ত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতির মিষ্টি আলুর চাষের পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, চার ফুট অন্তর এক ফুট উচ্চ আইলে এক ফুট অন্তর 'ডগা' বা চারা রোপণ করাই বিধেয়।

আলমোরা বিবেকানন্দ গবেষণা মন্দিরে তথাকার অধিনায়ক শ্রীবশীশ্বর সেন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে আমেরিকার কৃষি বিভাগ হইতে প্রাপ্ত তের রকমের মিষ্টি আলুর শিকড় এবং এক রকমের বীজ রোপণ করিয়া নানাবিধ পরীক্ষা চলিতেছে। ইহা ব্যতীত বাংলাদেশে উৎপন্ন দুই জাতির শিকড় এবং বোম্বাই প্রদেশের দুই রকমের 'ডগা' রোপণ করিয়াও পরীক্ষা আরম্ভ করা হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত এই সকল পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে সঠিক ভাবে কিছু বলা যায় না। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে,

(১) গোল আলুর ফলন অপেক্ষা মিষ্টি আলুর ফলন অধিকতর;

(২) মিষ্টি আলু গোল আলু অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর;

(৩) আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত মিষ্টি আলু অপেক্ষা বাংলাদেশের সাদা জাতির ফলন অধিক: (আলমোরা পরীক্ষার ফল)।

(৪) পশু খাদ্য হিসাবেও মিষ্টি আলুর চাষ লাভজনক;

(৫) গোল আলুর চাষে যে পরিমাণ পরিশ্রম ও খরচ হয় তাহার তুলনায় মিষ্টি আলুর চাষে কম হয়।

পরিশেষে পুনরায় বলা আবশ্যক যে, খাদ্য হিসাবে মিষ্টি আলুর স্থান অতি উচ্চে এবং ইহার অধিকতর প্রচলন ও ব্যবহারের প্রতি সরকারের ও দেশহিতৈষিগণের অধিকতর মনোযোগ দেওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন আবহাওয়ায়, বিভিন্ন রকম চাষে কোন্ জাতীয় মিষ্টি আলুর ফলন, পুষ্টিকারিতা প্রভৃতি অধিক সে সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে পরীক্ষার আবশ্যক। এ বিষয়ে সরকারী কৃষি বিভাগ অবহিত হইলে দেশের মঙ্গল হইবে।*

* ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসের *Indian Farming* পত্রিকায় মিষ্টি আলু সম্বন্ধে শ্রীবশীশ্বর সেন মহাশয়ের এক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধের বহুলাংশ এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ছবিগুলিও তাঁহার প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

চিত্র-প্রদর্শনী

"শিল্প-চক্র"

প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট সময়ে কলিকাতায় দেশী-বিদেশী নানা-প্রকার চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়টিতে খ্যাত-অখ্যাত বহু শিল্পীর শিল্প-রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। 'ইণ্ডিয়ান স্কুল অব আর্টে'র উদ্যোগে এবার মার্চ্চ মাসের মাঝা-মাঝি থেকে যে শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন সুরু হয় তাতে বহু তরুণ শিল্পীর শিল্প-রচনার সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করা গেল। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কুশলী

মালাবারের তরুণী

শিল্পী—শ্রীদাশরথি পাল

শিল্পী শ্রীঅতুল বসু। অতুলবাবু আজ তথাকথিত চিত্র-সমালোচকদের ঢকানিনাদিত কলাজগৎ থেকে বহু দূরে সরে গেছেন। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্ত আজ শিল্পজগতেও বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করেছে—সত্যাশ্রয়ী শিল্পী তাই শিল্পকলার সত্যকে আঁকড়ে ধরে জনতার কোলাহলের বাইরে সাধনায় রত আছেন।

আজকাল বহুক্ষেত্রে দেখা যায় শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করবার জন্যে সেই সকল ব্যক্তিকে আহ্বান করা হয় যাদের পদমর্য্যাদা, বিত্ত সবকিছুই আছে, কিন্তু নেই শুধু রসবোধ।

শ্রমিকদের ভোজনাগার

শিল্পী—শ্রীগণেশ নায়েক

অতুলবাবুর কণ্ঠে এই প্রচলিত প্রথার প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেছেন—"আদর্শ শিল্পীরা বিত্তবানের হাতের ক্রীড়নক হলে তাদের শিল্পসৃষ্টি ব্যর্থ হতে বাধ্য। জীবন-সংগ্রামে কুশলী শিল্পীই প্রকৃত মানবদরদী শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন। কৃষ্টির যারা ধারক তারা কারো অঙ্গুলি হেলনে চালিত হতে পারে না।"

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের 'কমার্শিয়াল আর্ট' বিভাগের ছাত্র-শিল্পীদের অঙ্কিত ছবিতে মৌলিকতা আছে। তাঁদের শিল্পসৃষ্টিতে;

তরুবীথির ভিতর হইতে গঙ্গার দৃশ্য

শিল্পী—শ্রীসুধীর মৈত্র

গতানুগতিকতা নেই—তাঁরা যা এঁকেছেন তাতে তাঁদের বর্ণ-প্রয়োগ-কুশলতা এবং শক্তিপ্রাচুর্য্যের সন্ধান মেলে। এঁদের আঁকা প্রায় তিন শ' ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীদাশরথি পালের "মালাবারের তরুণী" (২২) ও আমার বোন (৭১) ছবি দুখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর অঙ্কন-পদ্ধতি দেখে মনে হয় শিল্পজগতের চিরাচরিত পন্থা অনুসরণ না করে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়েছেন এক নূতন

গ্রামের ঘাট

শিল্পী—শ্রীসত্য মুখোপাধ্যায়

পথে। সুধীর মৈত্রের জলরং-এর ছবি আঁকার নৈপুণ্য তাঁর আলো ও ছায়াতে (১০৪) প্রকটিত। তাঁর তেল রং-এর "পঞ্চবটি" (৬১) একটি সার্থক চিত্ররচনা। তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাস এই ছবিগুলোতে পাওয়া যায়। সত্য মুখোপাধ্যায়ের "পুরনো বটগাছ" (৩৫) ও "গাছের নীচে" (৫৪) তার বর্ণপ্রয়োগের নৈপুণ্য এবং সাহসিকতার পরিচায়ক। তার জল রং-এর ছবি "গ্রামের ঘাট" (১) নয়ন-মন মুগ্ধ করে। সুনীল বৈদ্যের "উঁচু মাটি" (৯১) ছবিটির অঙ্কনরীতি প্রশংসনীয়। তাঁর "বাংলার পল্লী" (৫০) ছবিটিতে উচ্চশ্রেণীর পেন্টিং-এর মর্য্যাদা অক্ষুন্ন। সুশীল দাশের সূক্ষ্ম চিত্রকর্ম্মে দক্ষতা উল্লেখযোগ্য। তাঁর এক টাকার নোটের নকল ছবি দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করেছিল। কমার্শিয়াল ডিজাইনে তাঁর হস্তনৈপুণ্য প্রশংসার্হ।

বাংলার পল্লী

শিল্পী—শ্রীসুনীল বৈদ্য

ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত ছবিগুলোর মধ্যে সরিৎ নন্দীর "যমজ-বোন" (১৮), গৌতম মজুমদারের "জল্‌কে চল" (১৬)

জল্‌কে চল

শিল্পী—শ্রীগৌতমকুমার মজুমদার
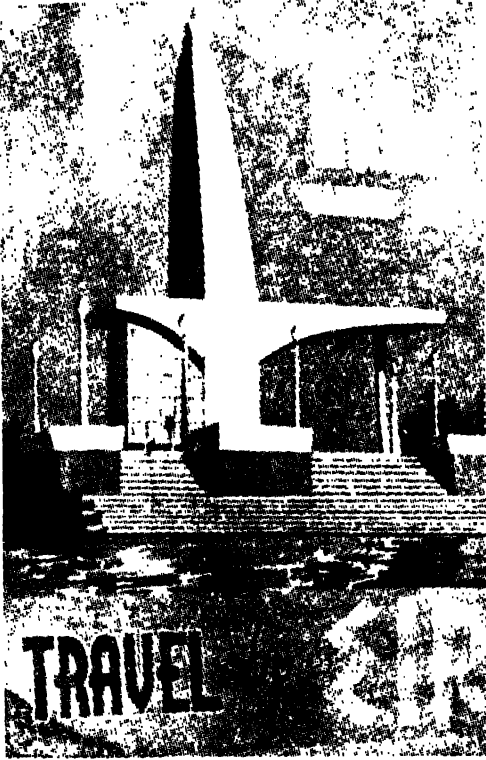
প্রাচীর চিত্র
শিল্পী—শ্রীমনোহর দে

ও অমরেশ গাঙ্গুলীর ভারতীয় সৌন্দর্য্য (২৫) সত্য মুখোপাধ্যায়ের "কালো মেয়ে" (১৫) প্রভৃতি কয়েকটি ছবিতে রেখার সুক্ষ্মতা আছে আর আছে একটা অপূর্ব্ব ছন্দ। তারাপদ বসুর প্রসাধন (২১১) ছবিটীতে দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব থাকলেও ড্রইং নির্ভুল নয়। অমিতাভ বর্দ্ধনের "কীর্ত্তন" (১৮০) ছবিটি বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে আঁকা—এতে শিল্পপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। গণেশ নায়কের "কুলি রেস্তোরাঁ"তে (৩৩) রং প্রয়োগে ত্রুটি থাকলেও ছবিটি মনকে পরিতৃপ্ত করে।

শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে একমাত্র কাশীনাথ দাশ মহাশয়ের কাজই প্রদর্শিত হয়েছে। তাঁর "সূর্য্যের আলো ও ছায়া"তে, (১১) শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

কমার্শিয়াল আর্ট সৃষ্টিতে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্যালেণ্ডারের ডিজাইন যারা এঁকেছেন নিয়মিত ভাবে চর্চ্চা রাখলে তাঁদের শক্তির বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। সরিৎ নন্দীর "মোহিনী মিলে"র, শৈলেন দের "রসুই"-এর ও অনিন্দ্য বসুর "ভারত" ক্যালেণ্ডার নয়নানন্দকর। প্রাচীর-চিত্রের মধ্যে সুনীল বৈদ্য, সুশীল দাশ ও মনোহর দে এই কয়জন শিল্পীর আঁকা রেলওয়ে পোষ্টার উল্লেখযোগ্য। কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগে গোপীবল্লভ অধিকারী, সুব্রত সেন, গৌতম মজুমদার, দীপ্তিমেধা বিশ্বাস, মনোরঞ্জন ঘোষ, পূর্ণেন্দু পত্রী ও শঙ্কর দাশের কাজ প্রশংসনীয়। অমরেশ গাঙ্গুলির স্কেচ তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সূচিত করে।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পরেশ চৌধুরীর শ্লেট খোদাই দেখে মুগ্ধ হতে হয়। এতে তিনি যে সৃজনী-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাতে মনে হয় যে, ভবিষ্যতে তিনি একজন কুশলী ভাস্কররূপে খ্যাতিলাভ করতে পারবেন।

কিছু কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের ছাত্রদের শিল্প সৃষ্টি দেখে তৃপ্তি লাভ করা যায়। অনেকগুলি ছবিই রস চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করবার শক্তি রাখে।

ঝরা পালখ

শ্রীকালিদাস রায়

পালখ তোমারে অঙ্গে বুলায়ে কোমল পরশ লভি,
সে পরশ মাঝে হরষ জাগায় বনের অজানা কবি।
সে পরশে পাই শত কাননের কত মধু সৌরভ,
নীল আকাশের উদারতা যেন করি তায় অনুভব।
তাহার মাঝারে পাই শুনিবারে সুনীল মুক্তি বাণী,
কত না তরুর শ্যাম তরুণিমা শিহরণ দেয় আনি।

কত না নীড়ের উষ্ণতাটুকু চঞ্চল করে স্নায়ু,
অঙ্গে আমার চামর ঢুলায় চৈত্রী মলয়-বায়ু।
নানা ভঙ্গীতে কত সঙ্গীত কুহরিয়া উঠে কানে,
বনমর্ম্মর, ঝর্‌নার ধারা, ঝঙ্কার তোলে প্রাণে।
অজানা পাখীর স্খলিত পালখ, তোমার পরশ পেয়ে
তরুণ-অরুণ-বন্দনা-গান মোর প্রাণ উঠে গেয়ে।

বাঁধ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

৩

কোথা দিয়া কি ঘটিয়া গেল। ইহা ছাড়া অন্য কোন পথই মঞ্জুষার চোখে পড়ে নাই, কিন্তু মৃন্ময় চলিয়া যাইতেই বার-বার তাহার মনে হইতে লাগিল যে, কাজটা হয়তো সে ভাল করে নাই। এমন করিয়া মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত হয় নাই। কেমন করিয়া সে এতখানি রূঢ় হইতে পারিল!

মৃন্ময় চলিয়া গিয়াছে। আর হয়ত কোন দিন তাহার সম্মুখীন হইবে না। মঞ্জুষা শিহরিয়া উঠিল, বিস্মিত হইল আত্মবিশ্লেষণ করিতে বসিয়া। নিজেরই হাতে যেন সে তার মৃত্যুদণ্ড লিখিয়া দিল! জীবনে আজ আর যেন কোন কিছুতেই তাহার প্রয়োজন নাই। অন্তত: এই মুহূর্ত্তে তাহার চতুর্দ্দিক একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছে। যে পথে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মৃন্ময় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে সেই দিকেই সে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। দু'চোখ তাহার জ্বালা করিতে লাগিল, কিন্তু সে বিচলিত হইল না, বরং যুক্তি দিয়া সে তাহার আচরণের সমর্থন খুঁজিতে লাগিল। সংসার তাহার জন্য নয়। অদৃষ্ট-লিপি তাহার অন্য ইঙ্গিত করিতেছে। তাই ত মঞ্জুষার পক্ষে এতখানি রূঢ় হওয়া সম্ভব হইয়াছে। মৃন্ময় তাহার সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে বলিয়াই এতখানি সাবধানতার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। নিজেকে সে পুরাপুরি বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। হয়ত কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তাহার ছদ্ম আবরণের ভিতর হইতে অন্তরের সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

মৃন্ময় চলিয়া গিয়াছে ভালই হইয়াছে। অন্তত: একটা দুর্ভাবনার হাত হইতে সে একেবারে মুক্তি পাইয়াছে। একে একে সকলেই তাহার পথ হইতে সরিয়া গেল—এবারে সে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিবে।

নূতন করিয়া যাত্রারম্ভের দিন আবার তাহার জীবনে দেখা দিবে—কিন্তু কোন্ পথে? মঞ্জুষা ভাবে, ঘরে সব চেয়ে বড় বন্ধন তাহার বাবা। যিনি আজ শিশুর মতই একান্ত ভাবে তার উপর নির্ভরশীল। তাঁহার ভাল সবকিছুর দায়িত্ব-ভার তাহাকেই বহন করিতে হইবে। বাহিরের জগতের সহিত মঞ্জুষার ঘনিষ্ঠ যোগ নাই অথচ ঘরের বদ্ধ আবহাওয়াও আজ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। শ্বাস রোধ হইয়া আসে, মাঝে মাঝে তাহার গ্রামে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। যদিও বর্ত্তমানের বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে গিয়া তাহার বিপন্ন হইতে পারে। তাহা হউক, এই বহুর কোনও একটিকে কেন্দ্র করিয়া যদি সে তাহার কর্ম্মশক্তিকে নিয়োজিত করিতে পারে তাহা হইলে দিন কাটানো তাহার পক্ষে আর তত বেশী ক্লান্তিপ্রদ মনে হইবে না। নতুবা নিরন্তর একই চিন্তার মারাত্মক বিষ তাহাকে অচিরাৎ জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিবে।

যুক্তি বিচার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সে যাহাই করুক না কেন উহা নিতান্তই বাহিরের বস্তু, অন্তরের সহিত এক বিন্দু যোগ নাই। সেখান হইতে মৃন্ময়কে কোন দিন সে নির্ব্বাসন দিতে পারিবে না।...

নান্টুর জন্য তাহার বিন্দুমাত্র চিন্তা নাই। ওর মত লোকেরা আর এক জাতের মানুষ। সুখ-দুঃখের বোধশক্তি ওদের আলাদা। নহিলে এই বিবাহের নাগপাশ হইতে এত সহজে নান্টু মুক্তি পাইত না। কিন্তু মৃন্ময় নান্টু নয়, একথাটা সে ভাল করিয়া জানে বলিয়াই দুশ্চিন্তায় মন তাহার ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ সংস্কার কাটাইয়া উঠাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। তাই ত মৃন্ময়ের সহিত তাহাকে এই অভিনয় করিতে হইল। ভগবান জানেন ইহাতে মঞ্জুষার অন্তরের কতটুকু সায় ছিল। তবুও তাহাকে এই পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ তাহার চোখে পড়ে নাই। দশ জনের কাছে মৃন্ময়কে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। এতখানি স্বার্থপর সে কেমন করিয়া হইবে? মৃন্ময় তাহার সম্বন্ধে যাহা খুশী ভাবুক. কিন্তু নিজের কাছে ত তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে না।

কিছুপূর্ব্বে সন্ধ্যা হইয়াছে। ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালানো হয় নাই, জ্বালিবার প্রয়োজনবোধও করে নাই। ভৃত্য দুই বার আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। ডাকে নাই। মঞ্জুষাও টের পায় নাই।

মঞ্জুষা ভাবিতেছিল, এত দিনের আশা-নিরাশা এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আজ পরিসমাপ্তি ঘটিল। এত দিন সে শুধু ভাবিয়াছে, কেমন করিয়া একটা সহজ সমাধানে পৌঁছান যায়, আর আজ ভাবিতেছে যে, এই পথেই কি সে সমাধান চাহিয়াছিল?

পুনরায় ভৃত্য আসিয়া দেখা দিল। এবারে সে সাড়া দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। আলোটা জ্বেলে দেব দিদিমণি?

এই আকস্মিক আহ্বানে মঞ্জুষা চমকাইয়া উঠিল। একটু নড়িয়া চড়িয়া স্থির হইয়া বসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, হ্যাঁ দিয়ে যাও—

সুইচ টিপিয়া দিয়া ভৃত্য পুনরায় বলিল, বড়বাবু আপনার খোঁজ করছিলেন। আমি আরও দু'বার এসে ফিরে গেছি।

মঞ্জুষা মনে মনে লজ্জিত হইল। প্রকাশ্যে বলিল, তুমি ডাক নি কেন—কিন্তু বামুনদিদির আজ হ'ল কি! বাবা কি খাবেন না খাবেন এ কথাটাও কি এতক্ষণে জিজ্ঞেস করবার তার সময় হ'ল না? এরা দিন দিন সব হচ্ছে কি? মঞ্জুষা অকারণে খানিক চেঁচামেচি করিল। ভৃত্য কিছু না বুঝিতে পারিয়া সরিয়া পড়িল।

বামুনদিদি আসিয়া প্রতিবাদ জানাইল। খাদ্যের ফিরিস্তি নাকি সকালেই তাহাকে দেওয়া হইয়াছে এবং মঞ্জুষা নিজেই দিয়াছে।

মঞ্জুষা একটু অপ্রস্তুত হইল, বলিল, তা বলে এবেলা আর একবার জিজ্ঞেস করায় কিছু দোষ ছিল না। ভুল হতে কতক্ষণ—

মঞ্জুষা আর দাঁড়াইল না, গম্ভীর মুখে প্রস্থান করিল। বামুনদিদি বিস্মিত হইল, কিন্তু সে কথা বাড়াইল না। ভাবিল, বড়লোকের মেজাজই আলাদা। অবশ্য প্রকাশ্যে এক প্রকার অপরাধটা স্বীকার করিয়া লইল।

মঞ্জুষা নিজের এই অকারণ রূঢ়তায় মনে মনে লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, তদুপরি বামুনদিদির এই নীরব স্বীকৃতিতে তাহা আরও চতুর্গুণ হইয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সে আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল এবং অনতিকাল মধ্যেই তাহার বাবার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। জীবানন্দ আত্মস্থভাবে বসিয়াছিলেন, মঞ্জুষা কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমায় তুমি ডাকছিলে বাবা?

এই আকস্মিক প্রশ্নে তিনি যেন সহসা ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়াছেন এমনি বিহ্বল দৃষ্টিতে খানিক কন্যার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, কই না—

মঞ্জুষা বলিল, কিন্তু নিবারণ বললে যে—

জীবানন্দ বলিলেন, তা হলে বোধ হয় ডেকেছিলাম মঞ্জু, নইলে নিবারণ তোমায়···কথার মাঝখানে সহসা থামিয়া তিনি অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, মিনু বুঝি এল না মঞ্জু? নিবারণ বলছিল সে নীচের ঘরে আছে···

মঞ্জুষা কোন জবাব দিল না।

জীবানন্দ পুনরায় বলিলেন, আমি জানি ও আসবে না।··· ছেলেবেলা থেকেই ওকে দেখে আসছি ত। তা ছাড়া মিনুর উপর খানিকটা অবিচারও আমি করেছি···

মঞ্জুষা প্রতিবাদ জানাইল, তুমি ত কিছু অন্যায় কথা বল নি বাবা—

জীবানন্দ বার বার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, অন্যায় বৈকি মা, কিন্তু তা বলে সে যে আমার এমন করে অগ্রাহ্যি করে চলে যাবে এ আমি ভাবতে পারি নি।···

মঞ্জুষা গম্ভীর হইয়া উঠিল, মৃদু কণ্ঠে বলিল, মিনুদা হয়তো কখনই তোমায় অগ্রাহ্যি করে চলে যেতে পারত না বাবা, কিন্তু আমিও যে তাকে ভবিষ্যতে আর এ বাড়ীতে আসতে নিষেধ করে দিয়েছি।

জীবানন্দ বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, মিনুকে এ বাড়ীতে আসতে তুমিও নিষেধ করে দিয়েছ মঞ্জু! কিন্তু তুমি কেন একাজ করতে গেলে মা?···

মঞ্জুষা ক্লান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, সে অনেক কথা বাবা, তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না।

জীবানন্দ বলিলেন, সত্যিই আমি কিছু বুঝতে পারছি না মঞ্জু। মান্নু চলে গেছে—ও যাবার জন্যেই এসেছিল। কিন্তু মৃন্ময়—

বাধা দিয়া মঞ্জুষা কহিল, সে যাবার জন্যে আসে নি—আমি তাকে যেতে বাধ্য করেছি। সত্যিই ত···তুমি ত মিথ্যে বল নি বাবা। তাকে আর আমাদের কিসের প্রয়োজন।

কথা কয়টি স্বাভাবিক ভাবে বলিবার চেষ্টা করিলেও মঞ্জুষা তাহা পারিল না। একটা অব্যক্ত বেদনায় তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল।

জীবানন্দ বার বার মাথা নাড়িতে লাগিলেন, বলিলেন, এ সব রাগের কথা মঞ্জু—এ সব অভিমানের কথা। তিনি একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, তোরা সবাই মিলে যদি আমার সঙ্গে শত্রুতা করিস তা হলে আমি যাই কোথা মা—

মঞ্জুষা করুণ দৃষ্টিতে তাহার বাবার মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল, তুমি এ সব কি বলছ বাবা···কে তোমায় এ সব কথা বলেছে?

জীবানন্দ একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, সব কথাই কি বলে দিতে হয় মঞ্জু, আমি কি কিছুই বুঝি নে। কিন্তু আমায় একটা সত্যি কথা বলবি মা?

প্রত্যুত্তরে মঞ্জুষা বলিল, আমি ত তোমায় মিথ্যে বলি না বাবা।

জীবানন্দ কহিলেন, মৃন্ময় কি আর কোন দিনই আসবে না?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মঞ্জুষা কহিল, আমার ত তাই মনে হয়। এখানে আসা তার আর উচিত নয় বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু এ নিয়ে কেন তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ বাবা।

জীবানন্দ অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দুই চোখ চক্ চক্ করিতে লাগিল। তিনি বেদনার্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, বলতে পার মঞ্জু কেন এমন হ'ল। যা কিছু হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলাম সবই আমার জীবনে মিথ্যে হয়ে গেল। এ কি আমার বিচারের ভুল, না এইটেই আমার অদৃষ্টলিপি—এ কথার সদুত্তর আমি আজও পেলাম না মা।

মঞ্জুষা নীরব।

জীবানন্দ সস্নেহে কন্যার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে দৃষ্টির সম্মুখে মঞ্জুষা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সহজেই সে ভাবটা কাটাইয়া উঠিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, শুধু একটা কথাই তুমি বড় করে ভাবছ বাবা, নইলে মিনুদার চলে যাওয়া নিয়ে কখনই তুমি এতটা ব্যস্ত হয়ে উঠতে না। একটু ভেবে দেখলেই তুমি আমার কথা স্বীকার করে নেবে।

জীবানন্দ বলিলেন, অস্বীকার কোন কিছুকে করতে পারি না বলেই ত এত অশান্তি পাচ্ছি মঞ্জু। পাষাণের মত আমার বুকের উপর কি যেন চেপে আছে। একে নামিয়ে ফেলতেও পারি না, বইবার শক্তিও আজ আর আমার নেই।

মঞ্জুষা এ সব কথার তাৎপর্য্য ভাল করিয়াই উপলব্ধি করে, কিন্তু প্রতিকারের কোন পথই তাহার জানা নাই। নিজের বুদ্ধিবিবেচনায় যাহা সে ভাল বলিয়া বুঝিয়াছে তাহাই প্রাণপণ চেষ্টায় সম্পন্ন করিয়াছে, যদিও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরাজয়ের গ্লানি তাহাকে মাথায় তুলিয়া লইতে হইয়াছে। সে নিজেও সুখী হইতে পারে নাই, তার বাবার দুশ্চিন্তার একবিন্দুও লাঘব করিতে পারে নাই। উপরন্তু নূতন নূতন সমস্যা আসিয়া তার চলার পথকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। তবুও—

মঞ্জুষার চিন্তাধারায় বাধা পড়িল। জীবানন্দ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, কিন্তু এমনি করে ত আর বাঁচি নে মা। হিসেব করে আর বিচার করে জীবনের এতগুলো বছর ত কাটালাম, কিন্তু তাতে লাভ কতখানি হয়েছে, তা ত বুঝতে পারছি না, বরং দেখছি দুঃখের বোঝা দিন দিন আরও ভারী হয়ে উঠছে। আমি আর পারি নে—এবার তোরা আমায় মুক্তি দে মা।

জীবানন্দের চোখের দৃষ্টি কেমন যেন অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। সেই দিকে চোখ পড়িতেই মঞ্জুষা চঞ্চল হইয়া উঠিল। বলিল, এ সব বাজে কথা তুমি আর কিছুতেই ভাবতে পারবে না বাবা। আমার মুখ চেয়েও তোমাকে অন্তত চুপ করে থাকতে হবে।

জীবানন্দ মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, তোর মুখের দিকে চাইলেই যে ভাবনাটা আরও বেশী করে দেখা দেয় মঞ্জু, নইলে আমার আর কি—কটা দিনই বা বাঁচব।...

মঞ্জুষার মুখের পানে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি থামিলেন। সে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। মুখের উপর তার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্থির অবিচলিত কণ্ঠে মঞ্জুষা বলিল, একথা আর কতবার বলা যায়। আসলে আমার কথা নিয়ে দুশ্চিন্তা করাটাই তোমার একটা ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে অথচ বললে কোন কথাই তুমি শুনবে না। খামোকা নিজেও কষ্ট পাও আমাকেও দুঃখ দাও। তার চেয়ে সোজা আমাকে হুকুম দিলেই ত পার, কি আমাকে করতে হবে—কি করলে তুমি নিশ্চিন্ত হবে।

মঞ্জুষা থামিল। খানিকক্ষণ জীবানন্দের মুখের পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, তোমার সব কথা আমি বুঝতে পারি না। যতটুকু বাইরে থেকে তোমাদের চোখে পড়ে সেইটুকুই কি আমার সব। কোন এক জন পুরুষের স্ত্রী হয়ে সংসার করা হ'ল না বলেই কি আমার সব কিছু ব্যর্থ হয়ে গেছে ?...

মঞ্জুষা তার বাবার শয্যার একাংশে বসিল, তাঁহার একখানি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, এ চিন্তা তোমাকে ত্যাগ করতে হবে বাবা। যা একেবারে মিথ্যা...

জীবানন্দ কথার মাঝখানে প্রতিবাদ জানাইয়া বলিয়া উঠিলেন, কথাটা তোমার ঠিক বলা হ'ল না মঞ্জু।

মঞ্জুষা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল। জীবানন্দ বলিলেন, তোমার কথায় তুমি নিজেই জড়িয়ে পড়েছ। আমিও বলি তুমি সত্য কথা বলেছ। যেটুকু বাইরে থেকে বোঝা অথবা শোনা যায় সেইটুকুই সব একথা ভাবতে পারলে ত কোন গোল থাকে না। একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

মঞ্জুষা এ কথার কোন জবাব দিতে পারিল না। হয়ত জবাব দিবার কিছু নাই বলিয়াই। সে শুধু তার বাবার হাতখানি লইয়া নিঃশব্দে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, এবং নিজের বর্ত্তমান অবস্থাটা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে লাগিল। তার জীবনের গতি আজ একটা নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় মানুষ বেশী দিন থাকিতে পারে না। থাকা সম্ভবও নয়।

জীবানন্দ পুনরায় বলিতে সুরু করিলেন, যে কথাটা তুমি আমাকে বোঝাতে চাও তাও আমি ভেবে দেখেছি। কিন্তু মন বলে, সব মিথ্যে। সেইজন্যেই আমি কোন কিছু বিশ্বাস করতে পারছি না মা। তা ছাড়া আমাকে ত তোমরা কোন কথা খুলে বল না মঞ্জু।

মঞ্জুষা তথাপি নিরুত্তর, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। জীবানন্দ থামিতে পারিলেন না—বলিয়া চলিলেন, এবারে আর ভাবব না ঠিক করেছি। এতে কারুরই কোন লাভ হচ্ছে না। যার জন্যে ভাবছি তারও না, আমার নিজেরও না।

পিতার কথায় মঞ্জুষা কিছু আশ্বস্ত হইলেও পুরাপুরি আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না।

জীবানন্দ বলিলেন, কথাটা যে এর আগে আমি ভাবি নি তা নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার সব গোলমাল হয়ে যায় মঞ্জু। দিনরাত শুয়ে থেকে থেকে মাথার ভেতরটা যেন দুশ্চিন্তার

কারখানা হয়ে গেছে। ধীর স্থির ভাবে ভাল কোন কিছু চিন্তা করতেও যেন ভুলে গেছি।

মঞ্জুষা সহসা মুখ খুলিল, নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য প্রসঙ্গ তুলিল, দিনকয়েকের জন্য দেশের বাড়ীতে যাবে বাবা ?

এই আকস্মিক প্রশ্নে জীবানন্দ চমকাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, কি বললে, তুমি মা ? দেশে যাব ?...তিনি চোখ বুজিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিলেন, যেতে পারলে ত বেঁচে যেতাম মঞ্জু। কিন্তু তা কি কোন দিন আর সম্ভব হবে ?

মঞ্জুষা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, কেন সম্ভব হবে না বাবা !

জীবানন্দ বলিলেন, বাধা ত বর্ত্তমানে শুধু একটাই নয় মঞ্জু। যার জন্যে এক দিন বাধ্য হয়ে গ্রাম ছেড়েছিলাম সে কারণ ছাড়াও অবস্থা আজ আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। আমাদের নিজেদের দিক থেকেও—দেশের অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তনের জন্যও। এর কোনটিকে অবহেলা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না মা।

মঞ্জুষা জবাব দিল, দেশের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে যদি তুমি পিছিয়ে যাও সে আলাদা কথা, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত কোন কিছু নিয়ে তোমাকে একতিল চিন্তা করতে হবে না। তোমার মঞ্জু সব অবস্থার সঙ্গেই মানিয়ে চলতে শিখেছে। কিন্তু আমি বলি—এসব কথা এখন থাক। পরে বরং ধীরে সুস্থে ভেবে দেখা যাবে। আপাতত দেখে আসছি তোমার খাবার তৈরি হয়েছে কিনা—রাত নিতান্ত কম হয় নি।

মঞ্জুষা দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে তার বাবাকে যাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করুক না কেন নিজের মনকে আজ আর কিছুতেই আয়ত্তে আনিতে পারিতেছে না। শরীর খারাপ এই অছিলায় সে আজ জলস্পর্শ করিল না। মৃন্ময়ের পরিত্যক্ত সিঙ্গারার প্লেট-খানি এখনও খাবার ঘরে পড়িয়া আছে। সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া মঞ্জুষার একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। মনে পড়িল বিগত দিনের নানা ছোটবড় ঘটনার কথা যাহা বর্ত্ত-মানে তাহার কাছে এক অমূল্য সম্পদ—সযত্নে এবং সঙ্গোপনে মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত আছে। সুযোগ এবং সুবিধা মত সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ রাখিয়া অনুভব করে তার অস্তিত্বকে। একটা অপূর্ব্ব পুলকানুভূতিতে তার দুই চোখ বুজিয়া আসে।

নান্টুকে সে বিবাহ করিয়াছে। তার জীবনে এ এক চমৎকার প্রহসন। রাধুর নিকট হইতে একখানি চিঠি পাইবার পর বিবাহটা আনুষ্ঠানিক ভাবে শেষ হইতে পারে নাই। নান্টু অনুষ্ঠানটিকে সরাসরি অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে। তাহার অপরাধ কি ? সে বরং তাহার প্রকৃত সত্তাকে অপমৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইয়াছে। তার এই উদারতার কথা মঞ্জুষা আমৃত্যু অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। তার বাবার এত কথা তলাইয়া দেখা সম্ভব নয়। তাঁর চোখে পড়িয়াছে শুধু কতকগুলি অকৃতজ্ঞ মানুষের অনুদার আচরণের কুৎসিত রূপ যাহা তাঁহার প্রকৃতির একেবারে ভিত্তিমূলে গিয়া আঘাত করিয়াছে।

মঞ্জুষা বাহিরের পথে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। রাত বেশী হয় নাই, কিন্তু ইহারই মধ্যে লোক চলাচল একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আকাশের পানে মঞ্জুষা দৃষ্টি ফিরাইল। মাত্র একটি তারা তার চোখে পড়িল। একি তার ভবিষ্যৎ নিঃসঙ্গ জীবনের নীরব ইঙ্গিত ! এমনি একাকিত্বের দুঃসহ বেদনার বোঝাই কি তাহাকে সারা জীবন বহন করিতে হইবে !

মঞ্জুষার ঠোঁটের কোণে কেমন এক প্রকারের হাসি দেখা দিল। কত দুর্ব্বল, কত অসহায় মানুষ। নিজের উপর তার কতটুকু বিশ্বাস, কতখানি আস্থা। কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে যে কাজ করিয়াছে পরক্ষণেই তাহাই আবার কাঁটা হইয়া তাহাকে বিঁধিতেছে।

পাশের ঘরে নিশ্চয় তার বাবা মন্থরগতিতে পায়চারি করিতেছেন। কিন্তু কেন ? মঞ্জুষা নিজেকে প্রশ্ন করে।

লঘুপদে মঞ্জুষা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। দরজা খুলিতেই এক ঝলক বাতাস তাহার সারা দেহ জুড়াইয়া দিল। ধীরে ধীরে মঞ্জুষা আসিয়া তার বাবার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কিছু চিন্তা করিল, তার পর ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল।

জীবানন্দের বিস্ময়াহত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কে ! কে ওখানে ?

আমি—মঞ্জুষা সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিল।

জীবানন্দ তেমনি বিস্ময়ভরা কণ্ঠেই বলিলেন, তুমি মঞ্জু। বড্ড চমকে উঠেছিলাম, কিন্তু এত রাত পর্য্যন্ত তুমি জেগে আছ মা !

একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া মঞ্জুষা কহিল, আমিও তোমায় সেই কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যেই এসেছিলাম। রাত জেগে একটা কাণ্ড বাধালে তখন একলা যে আমি সামলাতে পারব না বাবা।

বাপ এবং মেয়ের মধ্যে আর একবার দৃষ্টি বিনিময় হইল। জীবানন্দ টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন। সে হাসি এবং দৃষ্টির সম্মুখে মঞ্জুষা কেমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল এবং আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া নীরবে প্রস্থান করিল।

জীবানন্দ তার চলার পথের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখেও কোন কথা ফুটিল না শুধু বুক ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

৪

যাক, এতদিনে অন্ততঃ একটা ভাবনার হাত হইতে মৃন্ময় মুক্তি পাইয়াছে। আর তাহাকে মঞ্জুষার জন্য অনাবশ্যক

চিন্তা করিতে হইবে না। শুধু নিজের ভবিষ্যৎ পথের সন্ধান করিয়া লইতে পারিলেই চলিবে। অকস্মাৎ তার মনে পড়িল মা বাবার কথা। একবার অন্তত: চোখের দেখা দেখিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

গ্রামে পারতপক্ষে সে আর ফিরিতে চাহে না। তার অতীত জীবনের সহস্র মধুর স্মৃতি মঞ্জুষার কথা তাহাকে নিরন্তর স্মরণ করাইয়া দিবে। সেগুলি মানসপট হইতে মুছিয়া ফেলিবার প্রয়োজন আজ বড় হইয়া উঠিয়াছে—জাগাইয়া তুলিয়া মনকে সে অকারণে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবে না। অন্তত: সেই চেষ্টাই তাহাকে আজ করিতে হইবে।

মঞ্জুষাকে সে অনুযোগ দেয় না। দেওয়া উচিতও নয়। ঘটনা-প্রবাহ তাহাদের আজ যেখানে টানিয়া আনিয়াছে তাহাতে সে হয়ত ঠিকই করিয়াছে। ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দিয়া বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে সে সবকিছু দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং একটা নির্দ্দিষ্ট পথকে সে বাছিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে। হয়ত একটা দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছে আর দশটার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে।

তাহার আহ্বানে আজ যদি মঞ্জুষা সাড়া দিত আর এক দিন হয়ত মৃন্ময়ের কাছেই সে ঢের বেশী ছোট হইয়া যাইত। দৈনন্দিন জীবনের নানা ছোটবড় ঘটনা এক একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়া বসিত। যে সংশয় সহস্র যুক্তির কাছেও একদিন নি:সঙ্কোচে মনের বেড়াজাল ছিন্ন করিতে পারে নাই সুযোগ পাইলেই আবার তাহা মাথা চাড়া দিয়া উঠিত। মন আজও সংস্কারমুক্ত হইয়া উঠিতে পারিল কোথায়? তাইতো নান্টু যাহা পারিয়াছে সে তাহা পারে নাই—না একেবারে ছাড়িয়া যাইতে, না পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে।

নান্টু পূর্ণ বিশ্বাসে মঞ্জুষার সমস্ত ভার মৃন্ময়ের উপর ন্যস্ত করিয়া একান্ত নির্ব্বিকার ভাবে চলিয়া গেল, আর তার কাছে একটা অসম্পূর্ণ লৌকিক অনুষ্ঠান এত বড় হইয়া উঠিল যে তার আওতায় আর সব তুচ্ছ হইয়া গেল। মঞ্জুষাকে সে অকুণ্ঠচিত্তে আগের মত কাছে টানিয়া লইতে পারে নাই। হাসিমুখে তার একখানি হাত ধরিয়া বলিতে পারে নাই যে, সত্যের আসন বুকের মধ্যে—ভুলভ্রান্তি বাইরের জিনিষ। তাহা ছাড়া অন্যায় অথবা অবিচার যে-ই করিয়া থাকুক, না জানিয়া করিয়াছে। জানিয়া শুনিয়া যাহা করিতেছে তাহা এই মুহূর্ত্তে, সুতরাং অপরাধ বা অন্যায় করিলে তাহা এখনই করিবে—পূর্ব্বে করে নাই।

ভুল মৃন্ময় করে নাই এমন কথা সে বলে না, কিন্তু তাহা আত্মবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এবং সেইজন্যই আজ আবার নূতন করিয়া তাহাকে পথে আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। এই পথের মাঝেই সে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ খুঁজিয়া বাহির করিবে। বহু মূল্যবান সময় সে নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু আর নয়। নূতন করিয়া আবার যাত্রা সুরু করিবার দিন তার আসিয়াছে। তার চলার পথ হইতে সরিয়া গিয়া আরও সহস্র পথের সন্ধান দিয়াছে। সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আর তাহাকে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে না।

মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলিতেছিল।...

একথা মৃন্ময় ভাল করিয়াই জানে যে, আজ যতটুকু তাহার চোখে পড়িল ঠিক ততটুকুই মঞ্জুষার সত্য এবং সমগ্র পরিচয় নয়। অন্তরালে অনেকখানি আত্মগোপন করিয়া আছে, কিন্তু তথাপি সে জোর করিয়া তাহার দাবি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। কোন যুক্তি দ্বারাই ইহার সমর্থন খুঁজিয়া পায় নাই। বিগত দিনের সহিত বর্ত্তমানের যে বহু প্রভেদ। তখন একটা পথই তাহার চোখের সম্মুখে ছিল আজ তাহা সহস্রে পরিণত হইয়াছে।

অকস্মাৎ মনে পড়িল নান্টুকে। সে যাহা বলে তাহা হয়তো একেবারে মিথ্যা নয়—হয়ত সে খাঁটি কথাই বলিয়াছে।

নান্টু বলে, তোদের মত নিয়ম মেনে চলা ভাল ছেলে না হয়ে জীবনে আমি ঠকি নি। কোন বাধাই আমার পথ রোধ করে দাঁড়ায় না।

মন সংস্কারমুক্ত না থাকিলে এমনি করিয়া কেহ অবাধ গতিতে সংসারের পথে চলিতে পারে না, শুধু তাহারই মত একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিরন্তর পাক খাইতে থাকে। না পারে অগ্রসর হইতে, না পারে পিছাইয়া যাইতে।

মৃন্ময়ের হাসি পাইল। মানুষ এমনিই বটে। এই নান্টুকেই সে এক দিন কৃপার চোখে দেখিত। অথচ জীবনের পথে আজ তারই কাছে ঘটিল কত বড় পরাজয়। ঘর আর বাহির তাহার কাছে একাকার হইয়া গেল। কোন একটা পথকে সে দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারিল না। আর নান্টুর স্বচ্ছন্দ গতি রহিয়া গেল অব্যাহত। মাঝের কয়েকটি বৎসরকে একটা দুঃস্বপ্ন বলিয়া সে গ্রহণ করিয়াছে। দিনের আলোর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই চোখের ধাঁধা কাটিয়া গিয়াছে।

কিন্তু মৃন্ময় সহজভাবে ঘটনাটাকে মানিয়া লইতে পারে নাই—সে চুলচেরা হিসাব করিতে বসিয়াছিল। ফলে জীবনের একটি বহুবাঞ্ছিত দুর্লভ ক্ষণকে সে হারাইয়াছে। এই অমূল্য মুহূর্ত্ত বারে বারে আসে না।

আজ ব্যথিত হইলে কি হইবে—দুঃখ করিলেই বা শুনিবে কে। মঞ্জুষা তাহাকে ভাল করিয়াই চিনিয়াছে, জানিয়াছে অত্যন্ত দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়া। হয়ত সেইজন্যই...কিন্তু সত্যই কি সে তাই? মৃন্ময় নিজের মনকে প্রশ্ন করে, অন্তরের সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারিয়া আর ত সে কালবিলম্ব করে নাই। ছুটিয়া আসিয়া আগ্রহভরে হাত বাড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু মঞ্জুষা সে হাতে হাত রাখিতে পারিল না। হয়ত

সেদিনের প্রত্যাখ্যানটাই মঞ্জুর কাছে আজও বড় হইয়া তাহার মনকে বিরূপ করিয়া রাখিয়াছে।

মৃন্ময় অন্যমনস্কভাবে পায়ে হাঁটিয়া বহুদূর চলিয়া আসিয়াছে। অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পাগলের মত এ সে কি করিতেছে। এমনি করিয়া পায়ে হাঁটিয়া সে কতক্ষণে বাসস্থানে পৌঁছাইবে। সম্মুখেই একটা বাস ষ্টপের পানে চোখ পড়িল। মৃন্ময় সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। আপাতত তাহাকে হোটেলে পৌঁছাইতে-হইবে। তারপরে চিন্তা-ভাবনার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে।...

বাস আসিয়া দাঁড়াইল। তিল ধারণের স্থান নাই—তথাপি মৃন্ময় উঠিয়া পড়িল।

আজিকার ব্যাপারে মৃন্ময় ক্ষুব্ধ হইলেও মোটামুটি শান্ত ধৈর্য্যের সহিত অবস্থাটাকে মানিয়া লইল। আহারে প্রবৃত্তি না থাকিলেও জোর করিয়া কিছু খাইল। সে তাহার প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।...

মৃন্ময়ের কাছে এতদিনে যথার্থই মঞ্জুষার মৃত্যু ঘটিয়াছে।...

নামমাত্র কিছু মুখে গুঁজিয়া মৃন্ময় ফিরিয়া আসিয়া শয্যার আশ্রয় লইল। ভিতরটা তাহার একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে। বিভিন্নমুখী চিন্তাধারায় তাহার মনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। স্থির চিত্তে কিছু চিন্তা করিবার শক্তিও যেন তাহার ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে। অবসাদগ্রস্তের ন্যায় সে চুপচাপ পড়িয়া আছে। কিছুই ভাল লাগিতেছে না। কিছুক্ষণ ঘুমাইবার নিষ্ফল চেষ্টায় কাটিল—পরমুহূর্ত্তেই উঠিয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল। পকেট হইতে একবার মঞ্জুষার নিজের হাতে লেখা তাহার বাবার এবং নান্টুর বর্ত্তমান ঠিকানা লেখা কাগজখানি বাহির করিয়া চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল।

মঞ্জুষার স্বহস্তে লিখিত সুন্দর হস্তাক্ষর আরও সুন্দর হইয়াছে। তাহার লেখা আরও বহু চিঠি আজও মৃন্ময় সযত্নে রাখিয়া দিয়াছে।...

চিঠিগুলি সে ট্রাঙ্ক খুলিয়া বাহির করিল—একবার সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিল। আপন মনে খানিক সে হাসিল। এ হাসির রূপ আলাদা। মৃন্ময়কে ঠিক প্রকৃতিস্থ বলিয়া মনে হইল না। চিঠিগুলিতে অকস্মাৎ সে আগুন ধরাইয়া দিল। নিজের হাতেই সে সব শেষ করিয়া দিবে। কিন্তু আগুন জ্বলিয়া উঠিতেই তার কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ বাহির হইয়া আসিল। চোখ দুইটা সম্মুখের অগ্নিশিখার ন্যায় এক বার মাত্র জ্বলিয়া উঠিয়াই যেন দীপ্তিহীন হইয়া গেল। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, যখন সবই শেষ হইয়া গিয়াছে তখন এই অনাবশ্যক মিথ্যার বোঝা বহিয়া বেড়াইবে সে কিসের জন্য। আগুন নিভিয়া গিয়াছে। পড়িয়া আছে ছাই। মৃন্ময় দুই পায়ে তাহা ঘষিতে লাগিল। একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাক। কিন্তু সত্যই কি তাহা সম্ভব। এত সহজে কি সবকিছু শেষ হয়! যাহা বাহিরের বস্তু, চোখে দেখা যায় তাহাকেই না হয় মৃন্ময় ধ্বংস করিয়াছে, কিন্তু তার সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যাহা বিজড়িত তাহার বিলুপ্তি ঘটাইবে সে কেমন করিয়া?

মৃন্ময় পুনরায় পাদচারণ করিতে লাগিল। কিন্তু এভাবেও বেশীক্ষণ কাটান তার পক্ষে সম্ভব হইল না। সহসা সে তার বাবার কাছে চিঠি লিখিতে বসিল—কিন্তু অনেকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকিয়াও একটি ছত্র লেখা হইল না। সত্যই ত লিখিবার মত তার আছেই বা কি। তার চেয়ে সে বরং নান্টুকে চিঠি লিখিবে। জানিতে চাহিবে কেমন করিয়া সে দিন কাটাইতেছে।

নান্টুকে সত্যই সে চিঠি লিখিল। কোন কথাই গোপন করিল না। একের পর এক এই দীর্ঘ ছয় মাসের কাহিনী সে লিপিবদ্ধ করিল। ইহার প্রয়োজন ছিল। মনের রুদ্ধ আবেগকে মুক্তি দিতে না পারিলে মানুষ বুঝি বাঁচিতে পারে না। চিঠির উপসংহারে মৃন্ময় সত্বর জবাব পাইবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু নিজের ঠিকানা জানাইতে গিয়া গোলমালে পড়িল। ভবিষ্যতে সে কোথায় থাকিবে, কি করিবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

মৃন্ময় পুনরায় ভাবিতে বসিল। প্রকৃতপক্ষে এই ভাবে মানুষের চলিতে পারে না। চলা সম্ভবও নয়। তাহাকে বাঁচিতে হইবে। চেষ্টা করিলে সে এখানেই একটা ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে। কিন্তু সে তাহা চায় না, বরং দূরে, বহু দূরে কোথাও চলিয়া যাইতে পারিলেই তাহার পক্ষে ভাল হয়।

মনে পড়িল রাজাবাবুকে, মনে পড়িল লিলিকে। সেই ভাল। অনাত্মীয়ই আজ তার পরমাত্মীয়।

মৃন্ময় সহসা নিজের ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্র গোছগাছ করিতে লাগিল। যেন এই মুহূর্ত্তেই তাহাকে কোথাও চলিয়া যাইতে হইবে। মোটের উপর এখানকার পারিপার্শ্বিকে তার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে। আজিকার রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে বাহির হইয়া পড়িতে চায়। তার পরে দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা কিছু করিলেই চলিবে।

লিলির সহিত তাহার একবার দেখা করিবার প্রয়োজন আছে। নইলে সেখানকার বন্ধুবান্ধবরা তাহাকে কি ভাবিবে। লিলি তাহার পুত্রকে হারাইয়াছে। হারানোটা মর্ম্মান্তিক দুঃখজনক, কিন্তু লিলির পক্ষে ইহা আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ। আজ সে সবদিক দিয়াই মুক্ত। হয়ত আবার একদিন সে স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিবে। অতীতের সাক্ষ্য দিবার জন্য কেহ আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে না।

মৃন্ময় পুনরায় নান্কুকে লেখা চিঠিখানি লইয়া বসিল। চিঠির শেষে সে নিজের ঠিকানা লিখিয়া তাহা বন্ধ করিল। আপাততঃ সে তার গন্তব্যস্থান স্থির করিয়াছে।

মৃন্ময় উঠিয়া আসিয়া খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল। অন্ধকার আকাশ—কোন নূতন অনুভূতি তার মনে জাগাইল না। এ যেন তার একান্ত পরিচিত, আপন জীবনের প্রতিচ্ছবি।

একটা চাপা মিষ্ট হাসি মৃন্ময়ের কানে আসিল। সে চমকিত হইল। একটা অতিপরিচিত সুর তার মনে অনুরণিত হইয়া উঠিল। মৃন্ময়ের সমগ্র সত্তা আগ্রহে উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে।

জীবনে ফেলিয়া আসা দিনগুলির মধুর স্মৃতি হয়তো এমনি করিয়াই তার চলার পথের বাঁকে বাঁকে আসিয়া দেখা দিবে, তার মনে বেদনার সৃষ্টি করিবে। হাসিতে আজ সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। অথচ এক দিন সেও কারণে-অকারণে হাসির ঝড় তুলিত। সেদিনের কথা আজ তার কাছে স্বপ্ন। শুধু স্মৃতির বেদনা বহন করিয়া আনিবার জন্যই বাঁচিয়া থাকিবে।

পুনরায় চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল—সেই সঙ্গে গুটি-কয়েক কথার টুকরা। মৃন্ময়ের অসহ্য ঠেকিল। সে সশব্দে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া পুনরায় শয্যার আশ্রয় লইল।

ক্রমশঃ

আমাদের স্বাধীনতা ও খাদ্যসঙ্কট

শ্রীনীলরতন দাশ

রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে আমরা দেখিতে পাই—নির্ব্বাসিত রামচন্দ্র রাজধানী হইতে আগত ভরতকে প্রশ্ন করিতেছেন—"ভ্রাতঃ! অযোধ্যাপুরীতে ত দুর্ভিক্ষ হয় নাই? ভূমিসকল ত শস্যপূর্ণ আছে? কৃষককুল ত স্বকার্য্য পরিত্যাগ করে নাই? তাহারা কোন দস্যু কর্ত্তৃক ত প্রপীড়িত হয় নাই?"

ইসলাম-রাজ্যের খলিফা হজরত ওমর ছদ্মবেশে প্রজাদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি একদা অনাহারক্লিষ্ট সন্তানগণসহ রোরুদ্যমানা এক দুঃখিনী বিধবার কুটীরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বাছা! তুমি তোমার দুরবস্থার কথা খলিফাকে জানাও না কেন?" উত্তরে বিধবাটি বলিয়াছিল, "আমার মত দুঃখিনীর কথা শুনিবার অবসর কি খলিফার আছে? সেই পামরের মস্তকে বজ্রপাত হউক!" মহামতি খলিফা ইহাতে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই বিধবা ও তাহার সন্তানগণের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

যে ভারতবর্ষে প্রজাপুঞ্জকে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ রাজধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত, সেই দেশে এখন নিত্য অন্নাভাব এবং দুর্ভিক্ষের হাহাকার। যে দেশের শাসনকর্ত্তা একদা অনশনক্লিষ্ট নরনারীর অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন, সে দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ আজ আদর্শভ্রষ্ট এবং কর্ত্তব্যবিমুখ। এতদিন বিদেশী শাসন দেশের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া ছিল, এবং বৈদেশিক শোষণনীতির ফলে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা ভারতভূমি দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। এত বড় একটা বিরাট দেশে এত শ্রমশক্তি, এত ধনসম্পদ, এত জোত-জমি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ আসিয়া সমস্ত দেশের বুকে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছে এবং সমগ্র সামাজিক কাঠামোটিকে বিধ্বস্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হ'ল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন, বস্ত্র, পানীয়, শিক্ষা, আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর মনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসনচালিত কোন দেশেই ঘটে নি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য্য জুগিয়ে এসেছে।"

বহু সাধনায়, দীর্ঘদিনের দুঃখকষ্ট এবং ত্যাগের মধ্য দিয়া দেশ এখন বিদেশীশাসনের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে বটে; কিন্তু জনগণের মনে মুক্তির উল্লাস কই? এত বড় একটা সৌভাগ্যলাভে তাহাদের মনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ-উচ্ছ্বাস কোথায়? স্বাধীন ভারতে লোকের এই দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে পড়ে কবি নজরুলের উক্তি, "ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দু'বেলা দুটি ভাত আর একটু-নুন।" জনসাধারণ একান্তভাবে আশা করিয়াছিল যে, ব্রিটিশ সরকার ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গেলেই দেশে স্বর্ণযুগ বা রামরাজত্ব ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু হায়! যথা পূর্ব্বং তথা পরং—দেশ 'যে তিমিরে সেই তিমিরে!' রবীন্দ্রনাথ যেন দিব্যদৃষ্টি বলে ইংরেজ পরিত্যক্ত ভারতবর্ষের শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—"ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা এক দিন না এক দিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে

ত্যাগ ক'রে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জ্জনাকে ? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হ'য়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্ব্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে !" শোষণরিক্ত স্বাধীন ভারতে তাই আজ দেখিতেছি। এ দেশে খাদ্যসঙ্কট ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিতেছে—অনাহারে, অর্দ্ধাহারে জনগণ তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে ; তাই আজ দিকে দিকে চাঞ্চল্য আর বিক্ষোভ, গণচিত্ত পীড়িত এবং ক্ষুব্ধ। দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত এ দুর্গতি মোচনের অন্য কোন উপায় নাই, আর্থিক সচ্ছলতা ব্যতিরেকে গণবিক্ষোভ উপশমের আশাও সুদূরপরাহত।

বস্তুতঃ আজ সমগ্র জগৎ জুড়িয়া যে অশান্তির অনল জ্বলিতেছে, তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান বিশ্বে গড়িয়া উঠিয়াছে দুইটি শ্রেণী—সব-পাওয়া (Haves) এবং সব-হারা (Have-nots)। জগতের এক দল লোক বিনাপরিশ্রমে বা অল্পপরিশ্রমে সর্ব্বপ্রকার সুখ ও সম্পদ লাভ করিতেছে, আর এক দল উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও দু'বেলা দুই মুঠি অন্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না। এদেশেও এক শ্রেণীর ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আজ প্রাচুর্য্যের মধ্যে ভোগবিলাসে মত্ত, আর এক শ্রেণীর হতভাগ্য জীব অন্নবস্ত্রের সমস্যায় বিব্রত—দুঃখদারিদ্র্য অভাবের কশাঘাতে জর্জ্জরিত। দেশের অগণিত জনগণ স্বভাবতঃই অধীর হইয়া যে অর্থনৈতিক বৈষম্য তাহাদের দুর্গতি ও দুর্ভোগের কারণ হইয়াছে তাহার আশু প্রতিকারের জন্য দাবি জানাইতেছে। বস্তুতঃ জীবজগতের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান দাবি হইতেছে বাঁচিয়া থাকার অধিকার। এই অধিকারকে রক্ষণ ও পোষণ করার জন্য স্মরণাতীতকাল হইতে মানুষ সাধনা করিয়া আসিয়াছে। সেই সাধনার ফলে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে সমাজ ও রাষ্ট্র। সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য—মানুষের বাঁচিয়া থাকার পথকে সুগম করিয়া দেওয়া। স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি লোকের খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে। বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কটের আতঙ্কে ও ইহার ভয়াবহ পরিণামের আশঙ্কায় ভারতের কোটি কোটি মানবের জীবনযাত্রা আজ যে ভাবে ব্যাহত হইতেছে তাহার আশু প্রতিবিধান করিয়া সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথকে সুগম করিয়া দেওয়াই আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। 'শিশু-রাষ্ট্রে'র দোহাই দিয়া এই সমস্যাকে ধামা-চাপা দেওয়া অথবা এই বিরাট দায়িত্বকে লঘু করিয়া দেখা কোনমতে সমীচীন নহে।

আজিকার বিশ্বের জটিল সমস্যাসমূহের মধ্যে খাদ্য-সমস্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই সমস্যার সমাধানকল্পে প্রতি বৎসর আন্তর্জ্জাতিক খাদ্য-সম্মেলনে বহু দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ সমবেত হন। তাঁহাদের আলোচনা ও মতামত পাঠ করিলে পৃথিবীর ভাবী খাদ্যসঙ্কটের ভয়াবহতা উপলব্ধি করিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তাঁহাদের মতে, যুদ্ধজনিত লোকক্ষয়সত্ত্বেও গত দশ বৎসরে পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় বিশ কোটি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পৃথিবীতে প্রতিদিন অর্দ্ধ লক্ষের অধিক নূতন লোকের মুখে অন্ন জোগাইবার প্রয়োজন হইতেছে।...দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোকের প্রয়োজনানুরূপ খাদ্যের সংস্থান ছিল না ; অতিরিক্ত খাদ্য-উৎপাদনের আয়োজন যথোচিত ভাবে করিতে না পারিলে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাতেই খাদ্যাভাবে হাহাকার পড়িয়া যাইবে। আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খাদ্য-বিশারদ লর্ড বয়েড অর্ ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বিশ্বের খাদ্য-পরিষদের অধিবেশনে বলিয়াছেন—"এখনও যদি আমরা বিশ্বের খাদ্যসঙ্কটের সমাধান করিতে না পারি, তবে ভবিষ্যতে মানবজাতির অস্তিত্ব লোপ পাইবে।"

এখন আন্তর্জ্জাতিক এই খাদ্যপরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের খাদ্যসমস্যা আলোচনা করা যাক। ভারতবর্ষে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে প্রধানতঃ দুইটি কারণে, (১) লোকসংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধি এবং (২) খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্রমিক হ্রাস। অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেন, লোকসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিই খাদ্য-সঙ্কটের প্রধান কারণ। নিম্নে ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা বৃদ্ধির মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইল :—

সপ্তদশ শতাব্দীতে লোকসংখ্যা ছিল ১০ কোটি
অষ্টাদশ " " " ১৩ "
উনবিংশ " " " ২৯ "
১৯৩১ সালের আদমশুমারি মতে লোকসংখ্যা ছিল ৩৫ "
১৯৪১ " " " " " ৪০ "

কিন্তু ১৯৩৯ সাল হইতে ভারতবর্ষে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৩৯-৪০ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয় ৪৬ মিলিয়ন টন ;

১৯৪২-৪৩ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয় ৪৮ মিলিয়ন টন
১৯৪৭-৪৮ " " " " ৪৫.৬ " "

ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁহার *Food Supply and Population* নামক গ্রন্থে এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন, "বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই প্রয়োজনীয় খাদ্য ও লোকসংখ্যা প্রায় সমান সমান হইয়া আসিয়াছিল। পরে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্য উৎপাদন কম হইতে আরম্ভ হয় ; ১৯৩০-৩১ সালে লোকসংখ্যার তুলনায় খাদ্য উৎপাদন দাঁড়ায় শতকরা ১৫ ভাগ কম।" কাজেই অপ্রত্যাশিত লোকবৃদ্ধির সঙ্গে দেশের খাদ্য-উৎপাদন সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারায় খাদ্য-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি এলাহাবাদ রোটারি ক্লাবে Mr. Mason vogh (of Nani Agriculture Institute)

ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্যসঙ্কট সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,—

"India is crowded as any one will realise who notices the people in the streets of any town. A time will come, if it goes on indefinitely, when there will no longer be standing room, let alone room for producing food."

ভারতবর্ষে এইরূপ লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। আবার জমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ার এবং ত্রুটিপূর্ণ জমি বিলি-ব্যবস্থার দরুন বড় বড় জমি খণ্ডে খণ্ডে পরিণত হওয়ায় জনসাধারণ ভূমিহীন পর্য্যায়ে পরিণত হইয়াছে। অভাবের তাড়নায় এবং শিল্পাঞ্চলের প্রয়োজনে লক্ষ লক্ষ চাষীকে শহরমুখো হইয়া মজুর ও শ্রমিকের বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এইরূপে ক্রমশঃ চাষের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ কমিয়া যাওয়ায় খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রভূত ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। সাধারণ অবস্থায় ভারতবর্ষে চাউলের গড়পড়তা বাৎসরিক উৎপাদন ছিল ২৬৪৪ লক্ষ টন; সেই উৎপাদন উল্লিখিত কারণে কমিয়া আসিতেছিল। ইহার উপর ব্রহ্মদেশ থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি হইতে যে পরিমাণ চাউল আমদানী হইত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভেই তাহা বন্ধ হইয়া যায় এবং ভারতের খাদ্যসঙ্কট ক্রমশঃ চরমে উঠিতে আরম্ভ করে। ইহারই প্রতিক্রিয়া রূপে দেখা দেয় পঞ্চাশের (১৯৪৩ সালের) ভয়াবহ মন্বন্তর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কবে শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উহার ফলে বিশ্বব্যাপী যে দারুণ সঙ্কট দেখা দেয় তাহার প্রভাব হইতে ভারতবর্ষ আজও মুক্ত হইতে পারে নাই—বিপুল অর্থব্যয়ে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিয়াও এই সমস্যার সমাধান হইতেছে না। নিম্নে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে খাদ্যশস্য আমদানীর সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদত্ত হইল :—

১৯৪৫-৪৬ সালে খাদ্যশস্য আমদানী হয় ৮০ কোটি টাকার
১৯৪৬-৪৭ " " " " ১০০ " "
১৯৪৭-৪৮ " " " " ১৩০ " "
১৯৪৮-৪৯ " " " " ১৭৫ " "

সম্প্রতি মুদ্রামূল্য হ্রাসের দরুন ডলার অঞ্চল হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইলে ভারতবর্ষকে আরও অধিক অর্থব্যয় করিতে হইবে। এই উপ-মহাদেশটি যদি খাদ্যশস্য বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিত, তবে এই বিপুল অর্থ গঠনমূলক কার্য্যে ব্যয় করা যাইত এবং তাহার ফলে এ দেশ জগতের স্বাধীন রাষ্ট্রগোষ্ঠির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইত। এই সম্বন্ধে পণ্ডিত জবাহরলাল যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"Vast sums were spent for purchasing foodgrains from abroad, and if this continued, the country would very soon go into bancruptcy. If war broke out, imports would become impossible. Unless any country was self sufficient in food, it had to be dependent on other countries."

দেশের এই ভয়াবহ খাদ্যসঙ্কট দূর করিতে হইলে, যাহাতে খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, অচিরাৎ তাহার সুব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়হেতু স্বাধীনতা রক্ষা করাই কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। তাই পণ্ডিতজী বলিয়াছেন—

"Production of more food is necessary to protect our freedom and remain free from influences of foreign countries. All the economic problems which India is facing today centre round our food problem."

ভারতের কৃষি-সচিব ১১।৩।৪৯ তারিখের ঘোষণায় বলিয়াছেন, "১৯৫১ সালের পর ভারতবর্ষে খাদ্যশস্য আমদানী করা দরকার হইবে না। আট লক্ষ একর পতিত জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া নলকূপ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এবং অপ্রয়োজনীয় শস্যাদির বপন বন্ধ করিয়া খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা মনে করিয়া আমাদের এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।" প্রধান মন্ত্রীও বলিয়াছেন যে, খাদ্যসমস্যাকে যুদ্ধকালীন জরুরী সমস্যার মত গুরুত্ব দিতে হইবে এবং যেরূপ উদ্যমের সহিত যুদ্ধকালীন জটিল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে হয়, সেইরূপ উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত আমাদিগকে খাদ্য-সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, খাদ্যসংগ্রামে আসল সৈনিক চাষী। সৈনিক ভাল খাইতে পরিতে না পাইলে তাহার পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। চাষী যদি রোগে, অনাহারে এবং অর্দ্ধাহারে জীবন্মৃত ও ঋণভারে জর্জ্জরিত হইয়া থাকে, তাহার ফসলনাশের যদি প্রতিকার না হয়, যে ফসল সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া এবং শরীরের রক্ত জল করিয়া উৎপন্ন করে, তাহা যদি যথাযথভাবে তাহার ভোগে না লাগে তবে ভগ্নোদ্যম, অনশনক্লিষ্ট, ঋণভারগ্রস্ত চাষীর দ্বারা খাদ্যসংগ্রামে সাফল্যলাভ করাও সম্ভব হইবে না। যুদ্ধকালীন জরুরী সমস্যার সমাধানকল্পে যেরূপ অজস্র অর্থের প্রয়োজন, খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি ব্যাপারেও সেইরূপ প্রভূত অর্থ চাই। কিন্তু দেশে যখন কোন গুরুতর সমস্যা সমাধানের জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখনই রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদ্‌গণ ও রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ অর্থাভাবের অজুহাত দেখাইয়া থাকেন। লর্ড ওয়াভেল ভারতের বড়লাট পদ গ্রহণের পূর্ব্বে যে কয়েকটি কথা আক্ষেপ সহকারে বলিয়াছিলেন, তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য—"যে পরিমাণ অর্থ যুদ্ধবিগ্রহে শত্রুর বিনাশসাধনের জন্য ব্যয়িত হইতেছে, কোন জাতিই অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ,

ব্যাধি প্রভৃতি শান্তিকালীন শত্রুকে রোধ করিবার জন্য সেই পরিমাণ অর্থ উৎপাদনে সমর্থ হয় নাই।"

অধিক শস্য উৎপাদন করিতে হইলে, প্রথম প্রয়োজন, বর্ত্তমানে যে পরিমাণ কৃষিকার্য্যের উপযোগী জমি আছে সেগুলিতে সারা বৎসর ধরিয়া চাষবাসের ব্যবস্থা করা, এবং ইহার জন্য চাই (ক) জলসেচের ব্যবস্থা, (খ) বন্যা-নিরোধের ব্যবস্থা, (গ) উপযুক্ত বীজ ও সারের ব্যবস্থা, (ঘ) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উন্নত প্রণালীর কৃষিব্যবস্থা, (ঙ) কৃষিজীবীদের ঋণদানের ব্যবস্থা। আর বিশেষ প্রয়োজন পতিত জমিকে ক্রমশঃ চাষবাসের যোগ্য করিয়া তোলা। এই সকল ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করিতে গেলে বিপুল অর্থব্যয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং অর্থের যাহাতে সদ্ব্যবহার হয় সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে "যুগবাণী" পত্রিকা যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য। আমাদের দেশে কৃষির উন্নতি না হইলেও তার নামে টাকা যে কি ভাবে খরচ হইতেছে তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়কর। স্বাধীনতালাভের পর 'ফসল বৃদ্ধি আন্দোলনে'র জন্য বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয়ের খরচের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ হইতে ৩১শে মার্চ্চ,

১৯৪৮ পর্য্যন্ত......	২২,৬৬,১৭৭৲
১৯৪৮-৪৯ (বজেট)	১,২৬,৩৫,০০০৲
১৯৪৯-৫০ (ঐ)	১,২৮,৩৬,০০০৲

অন্যান্য কয়েকটি খরচের নমুনা :—

'রোগমুক্ত' আলুবীজ বিতরণ—বীজের দাম	১০,০০০৲
বিলির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর বেতনাদি	১,৩৭,০০০৲
	১,৪৭,০০০৲
২। গাছসংরক্ষণ স্কীম—গাছের দাম	৫০০০৲
রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের বেতনাদি	৫,২২,০০০৲
	৫,২৭,০০০৲
৩। হাঁসমুরগীর বংশবৃদ্ধি স্কীম—হাঁসমুরগীর দাম	১০,০০০৲
কর্ম্মচারীদের বেতনাদি	১,৪৬,০০০৲
	১,৫৬,০০০৲

মহানগরীতে বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসিয়া, বৃহৎ পরিকল্পনা রচনা করিয়া বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়া অথবা শুধু সভাসমিতি করিয়া 'ফসল ফলাও' আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করা আদৌ সম্ভব হইবে না। বরং যখন লক্ষ লক্ষ দেশবাসী অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে মৃতপ্রায়, তখন তাহাদের নিকট কেবল বড় বড় বুলি আওড়াইয়া আশার সৌধ রচনা করা মর্ম্মান্তিক পরিহাস মাত্র। আবার অন্নহীনকে উপবাসের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য শুনাইলে, অথবা তাহার নিকট "আহার কমাও" এই বাণী প্রচার করিলে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতিরও সম্ভাবনা। দেশের দুর্গতি দূর করিবার জন্য সকলকেই অল্পবিস্তর দুঃখ বরণ করিতে হইবে সত্য, কিন্তু ইহাতে রাষ্ট্রের কর্ণধারকে এবং নেতৃবর্গেরও সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে সমানভাবে অংশীদার হইতে হইবে ; তবেই জনগণ বুঝিতে পারিবে যে, রাষ্ট্রনায়ক ও নেতৃবৃন্দ তাহাদের প্রকৃত হিতৈষী। মহাত্মাজীর কটিবাস পরিধান এবং দৈনিক সাড়ে তিন আনার খাদ্য গ্রহণের আদর্শ তাঁহাকে জনসাধারণের নিকটতম আত্মীয় করে। রাশিয়ার নব রাষ্ট্রের স্রষ্টা লেনিন সাধারণ নাগরিকের জীবনযাপন করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনা করিতেন।

সম্প্রতি ভারত-সরকার দামোদর বাঁধ প্রভৃতি কতকগুলি বিরাট পরিকল্পনা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন ; সে সকলের সুফল যে দেশবাসী কত দিনে ভোগ করিবে তাহা বলা কঠিন। ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে শুধু বড় বড় পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে না। আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে ব্যষ্টির প্রতি এবং কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিতে হইবে গ্রামাঞ্চলে। বড় বড় শহরের সরকার পরিচালিত তথাকথিত আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের গণ্ডী ছাড়িয়া কৃষি-বিশারদ ও কৃষিশিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগকে আসিতে হইবে পল্লী অঞ্চলে, এবং সেখানে চাষীদের সুখদুঃখের অংশীদাররূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া হাতেকলমে উন্নত ধরণের কৃষিপদ্ধতি শিক্ষা দিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টে সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সত্যই বলিয়াছেন—

"Our methods of agriculture are primitive whereas our agricultural problem is grimly modern. Our agricultural methods must be modernised and our education must be directed towards that purpose."

নায়কের মুখ দিয়া কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র তাঁর কোনও উপন্যাসে প্রসঙ্গক্রমে চাষীদের সম্বন্ধে যে কয়টি মূল্যবান্ কথা বলাইয়াছেন পল্লী-উন্নয়নকামী কৃষকবন্ধু কর্ম্মিগণের তাহা স্মরণ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। উক্ত নায়ক বলিতেছে,—"আমাদের দেশে সত্যিকার চাষী নেই। চাষ করা পৈতৃক পেশা, তাই সময়ে অসময়ে জমিতে দু'বার লাঙ্গল দিয়ে, বীজ ছড়িয়ে আকাশের পানে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকে। একে চাষ করা বলে না, লটারী খেলা বলে। কোন্ জমিতে কখন সার দিতে হয়, কাকে সার বলে, কাকে সত্যিকার চাষ করা বলে, এসব জানে না। ...এসব শিক্ষা ত শুধু কেবল মুখের কথায় বই মুখস্থ করিয়ে দেওয়া যায় না। তাদের হাতেনাতে চাষ করিয়ে দেখাতে হয় যে, এ জিনিষটা রীতিমত শিখে করলে দু'গুণো এমন কি চার গুণো ফসলও পাওয়া যায়। তার জন্য মাঠ দরকার, চাষ করা দরকার। কপাল ঠুকে মেঘের পানে চেয়ে হাত পেতে বসে থাকার দরকার নয়।" আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে জাতির মেরুদণ্ড ও দেশের আশাভরসাস্থল কৃষককুল। তাহাদের উন্নতি অবনতির উপর নির্ভর করে জাতীয় উন্নতি-অবনতি। অতএব ভারতের কৃষিজীবীদের অবস্থার উন্নয়নই বর্ত্তমান খাদ্যসমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায়।

রামানন্দ-স্মৃতি

শ্রীকালীপদ সিংহ

দীর্ঘদিন পরদুঃখকাতর, শিক্ষা-সংস্কৃতির একনিষ্ঠ উপাসক লোক-হিতব্রতী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার জনহিতৈষণার যে পরিচয় পাইয়াছিলাম তাহাই এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

১৯২৭ সনে বাঁকুড়ার অভয় আশ্রমে একটি সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য তিনি আসিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয় হয়। তারপর দুর্ভিক্ষে সেবা-কার্য্যে, প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনের উদ্যোগপর্ব্বে, গ্রাম উন্নয়ন বিষয়ে, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রয়াসে, গ্রন্থাগার পরিচালনা প্রভৃতি বিভিন্ন জনহিতকর কর্ম্মে বহু প্রকারে তাঁহার অনুপ্রেরণা ও সহায়তা লাভ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।

১৯৩৬ সনে যখন বাঁকুড়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুর সম্মুখীন হয় তখন তাঁহার সহায়তায় দুর্ভিক্ষ নিবারণের একটি ব্যাপক প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হয় এবং সেই অন্নসঙ্কট হইতে বহু লোক রক্ষা পায়।

তখনকার দিনে এদেশবাসীর দুঃখ কষ্টে উদাসীন বৈদেশিক সরকারের মনোভাবের কথা সকলেরই স্মরণ আছে। বাঁকুড়া জেলায় ভীষণ খাদ্যাভাব উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও সরকার বিশেষ কোনও চেষ্টা করেন নাই। শুধু তাহাই নয়, বিপদের গুরুত্ব স্বীকার করিতেও তাঁহারা পরাঙ্মুখ ছিলেন, কেননা দুর্ভিক্ষ হইয়াছে একথা একবার স্বীকার করিলে ফেমিন কোডের নিয়মানুযায়ী দুর্ভিক্ষ নিবারণের যাবতীয় ব্যয়ভার সরকারকে বহন করিতে হইত। বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট রিলিফ কমিটির সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুত শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এক দিন এই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জানিলাম যে, উপযুক্ত অর্থের অভাবে তাঁহাদের রিলিফের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে না, তাঁহাদের সংগৃহীত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে, উপরন্তু জনসাধারণের পক্ষ হইতেও বিশেষ সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। তিনি দুঃখ করিয়া আরও বলিলেন যে, সংবাদপত্রেও এই বিষয়ে কিছুই প্রকাশিত হইতেছে না।

ইহার পর কোন্ কোন্ থানায় কি পরিমাণ ফসল হইয়াছে, কি পরিমাণ ঘাটতির সম্ভাবনা, ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি স্থান হইতে তথ্যানুসন্ধান করিয়া অবগত হইলাম। এই ভাবে সমগ্র জেলার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রস্তুত করিলাম। বৃষ্টির অভাবে কোথাও ছয় আনা, কোথাও চারি আনা পরিমাণ ফসল হইয়াছিল এবং শুধু খাদ্যাভাব নয়, পুষ্করিণীগুলিও শুকাইয়া যাওয়ায় মারাত্মক জলাভাব উপস্থিত হইয়াছিল।

কলিকাতায় গিয়া বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা করার জন্য দেশব্যাপী একটি আন্দোলন চালাইবার কথা বলিলাম। অনেকেই সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, কিন্তু এই প্রচেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে ভরসা দিতে পারিলেন না। তখন নিরাশ হৃদয়ে শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবুর নিকট যাই। কি আশ্চর্য্য! প্রথম কথাবার্ত্তার পরই তিনি ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন এবং শুধু মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একটি পূর্ণ বিবরণ 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করিলেন এবং 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইহার উপর খুব জোরালো মন্তব্য করিয়া দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

তাঁহার নিকট উৎসাহ পাইয়া আমি কয়েকজন তরুণ সহকর্ম্মী লইয়া বাঁকুড়া সম্মিলনীর পৃষ্ঠপোষকতায় জনসাধারণের পক্ষ হইতে কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে ১৯৩৬ সনের ২রা এপ্রিল একটি জনসভার আয়োজন করি। উক্ত হল সংগ্রহ ব্যাপারে রামানন্দবাবু নিজে উহার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি সভাপতিত্ব করিতে অসমর্থ হওয়ায় অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় ইহার সভাপতির কাজ করেন। তিনি এবং বাঁকুড়া সম্মিলনীর ৺বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুর্ভিক্ষের কথা বিশদ ভাবে আলোচনা করেন। এই সভায় একটি কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন এবং সরকারকে অবিলম্বে দুর্ভিক্ষের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার বিবরণ পরদিন অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, বসুমতী, এডভান্স প্রভৃতি সংবাদপত্রে বিশদ ভাবে প্রকাশিত হয় এবং দেশব্যাপী একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। অবশ্য ইতিপূর্ব্বেই রামকৃষ্ণ মিশন, বাঁকুড়া সম্মিলনী, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও ডিষ্ট্রিক্ট রিলিফ কমিটি প্রভৃতি দুর্ভিক্ষের সেবা-কার্য্য চালাইতেছিল।

তারপর ভারত-ভবনে অমৃতবাজার পত্রিকার সিটি আপিসে ২৯শে এপ্রিল একটি জনসভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া একটি কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতি গঠন করা হয় এবং ইহার বিবরণ তৎপরদিন কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

সভাপতি—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি—শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ ও শ্রী পি. এল. ত্রিবেদী, সম্পাদক—ডাঃ বিনয় সিংহ, সহ-সম্পাদক—শ্রীকালীপদ সিংহ ও ডাঃ আবদুল মালেক,

কোষাধ্যক্ষ ভূতনাথ কোলে, সদস্যগণ—শ্রীঋষীন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীকমলকৃষ্ণ রায় (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূতপূর্ব্ব সচিব), বিজয়-কুমার ভট্টাচার্য্য, ডাঃ যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযামিনী রায়, হরিসাধন সিংহ, শ্রীবিপিন দাস, শ্রীমণীন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই সমিতির নাম দেওয়া হইল "বাঁকুড়া সম্মিলনী কেন্দ্রীয় দুর্ভিক্ষ সাহায্য সমিতি।"

তারপর প্রায় প্রত্যহই কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই সমিতির আবেদন প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং দুর্ভিক্ষের প্রচারকার্য্য চলিতে লাগিল। তৎকালীন সরকারী মুখপত্র ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকাও সহানুভূতিসূচক মনোভাব লইয়া দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় সংবাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দেশবাসীর নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য আসিতে লাগিল এবং বহু স্থানে সেবা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল।' যাহাই হউক, সরকারী সাহায্য ব্যতীত শুধু বেসরকারী সাহায্যে কখনই এইরূপ বিরাট সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। দেশব্যাপী একটি প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি হওয়ায় জনমতের চাপে সরকার আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। বাংলার তৎকালীন রাজস্ব-সচিব বি. কে. বসু মহাশয় তুষারবাবুর সহিত দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে গিয়া স্বচক্ষে লোকের দুরবস্থা দর্শন করেন এবং সংবাদপত্রে একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। তারপর সরকার এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের প্রায় ষোল আনা দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কৃষিঋণ, দুঃস্থদের অর্থসাহায্য, পুষ্করিণী খনন, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ প্রভৃতি পূর্ত্ত-কার্য্যে আন্দাজ আট-দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন।

উক্ত দুর্ভিক্ষ সাহায্য সমিতির যাবতীয় মুদ্রণকার্য্যের ব্যবস্থা রামানন্দবাবু প্রবাসী প্রেস হইতে বিনামূল্যে করিয়া দিয়াছিলেন। অন্যান্য যে সব সেবা-সমিতি সেবাকার্য্য করিতেছিল. বলা বাহুল্য, দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে তাহাদের কার্য্যের পরিমাণও বহু গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং সারা বাংলার তথা ভারতের দৃষ্টি এই দিকে পতিত হইয়াছিল।

ইহার পর ১৯৪০ সনে জামসেদপুরে প্রবাসী-বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে রামানন্দবাবুর সক্রিয় সহযোগিতার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে হয়।

জামসেদপুরে উক্ত সভা আহ্বান করার প্রসঙ্গ ১৯৩৯ সনের প্রথম দিকে বেঙ্গলী এসোসিয়েসনের একটি সভায় আমি উত্থাপন করি। উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে কোনও কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহার বিরোধিতা করেন। তাঁহারা বলেন, এই এসোসিয়েসন শুধু বাঙালীদের সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনা করিবার জন্য গঠিত, ইহার সহিত সাহিত্যালোচনার কোনও সংস্রব থাকিতে পারে না। তাঁহারা বলেন লোহার কারখানায় যাদের কাজ তাদের আবার সাহিত্য লইয়া মাথা ঘামানোর অবসর কোথায়? কিন্তু উহার সভাপতি বিশিষ্ট জনসেবক শিল্পপতি নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয় আমার প্রস্তাব আগ্রহের সহিত সমর্থন করেন। তার পর ১৯৩৯ সনের জুন মাসে আমি রামানন্দবাবুকে এ বিষয়ে একখানি পত্র লিখি। ইহার পর আমি তাঁহার সহিত কলিকাতায় দেখা করি। তিনি এই প্রস্তাব সাগ্রহে সমর্থন করেন এবং আমাকে এ বিষয়ে প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি কানপুরের ডঃ সুরেন্দ্র-নাথ সেন মহাশয়ের সহিত পত্রব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে আমি ডঃ সেনকে একখানি পত্র লিখি। এই পত্রখানি একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি করে। আমার পত্র পড়িয়া কর্তৃপক্ষ ইহাকে জামসেদপুরের পক্ষ হইতে সম্মেলন আহ্বানের আমন্ত্রণ মনে করেন এবং পরিচালক সমিতির একটি সভায় উক্ত আমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন; সেই বৎসর আবার অন্য কোনও স্থান হইতে সম্মেলনকে আহ্বান করা হয় নাই। পরিচালক সমিতি বোম্বাইয়ের বাঙালী এসোসিয়েসনকে সম্মেলন আহ্বান করার জন্য অনুরোধ করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের অসামর্থ্য জানাইয়া দেন। অগত্যা সেই বৎসর পরিচালক সমিতি সম্মেলন বন্ধ রাখার কথাই চিন্তা করিতেছিলেন।

আমি তাঁহাদের পত্র পাইয়া বিশেষ ভাবে বিব্রত হইয়া পড়িলাম। চলন্তিকা সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য শ্রীবৈদ্য-নাথ সরকার, ডঃ ব্রহ্মপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায়, শ্রীসুধীর সেন, শ্রীহরিপদ সাহিত্য-রত্ন প্রভৃতিকে এই পত্রগুলি দেখাই এবং এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে পরামর্শ করি। তাঁহারা খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটি তত সহজ ছিল না। বিরাট সমারোহ এবং বিপুল অর্থের প্রয়োজন, কেন না সারা বাংলার এবং প্রবাসের বাঙালী সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ এই উপলক্ষে একত্রিত হইয়া থাকেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় এ বিষয়ে আমার কয়েকটি বিবৃতিও প্রকাশিত হয়। কিন্তু জনসাধারণের পক্ষ হইতে সেরূপ কোনও আগ্রহ দেখা যাইতেছিল না। অগত্যা পুনরায় রামানন্দ-বাবুকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া পত্র লিখিলাম। তিনি ইহার উত্তরে জামসেদপুরে আসিয়া একটি জনসভায় বক্তৃতা দিতে সম্মত হন। তিনি ৬ই আগষ্ট ১৯৩৯ সনে জামশেদপুর মিলনী হলে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সম্মেলনের ভার গ্রহণ করিতে জন-সাধারণকে আবেদন জানান। এই বক্তৃতার ফলে এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অনেকেই ইহার উপযোগিতা উপলব্ধি করেন এবং তাঁহারা এই বিষয়ে উদ্যোগী হইতে স্বীকৃত হন। পরবর্ত্তী বড়দিনের সময় জামসেদপুরে ইহার অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হইল।

কিন্তু তাহার পর বড়দিনের ছুটিতে রামগড়ে নিখিল ভারতীয়

জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইবার কথা ঘোষিত হওয়ায় ঐ বৎসর জামসেদপুরে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়।

তাহার পর পুনরায় যখন রামগড় কংগ্রেসের অধিবেশনের তারিখ পিছাইয়া যাওয়ার কথা প্রকাশিত হইল তখন রামানন্দ বাবু আমার নিকট ৬।১১।৩৯ তারিখে এক পত্র মারফত জামসেদপুরের বাঙালীদের বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন যেন ঐবৎসর বড়দিনের ছুটিতেই উক্ত সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা হয়। উক্ত পত্রে তিনি লেখেন, "জামসেদপুরে এবার প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইলে বড় ভাল হয়। জামসেদপুরের ও টাটানগরের সমুদয় প্রধান বাঙালীদের অনুরোধ করিবেন এবং আবশ্যক হইলে তাঁহাদিগকে আমার এই পত্র দেখাইবেন। ডিসেম্বরের গোড়াতে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিতে যাইতে পারি যদি আবশ্যক হয়।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, সময়ের স্বল্পতার জন্য উহা আর সম্ভব হইল না এবং পর বৎসরের জন্য অধিবেশন স্থগিত রহিল। তখন অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া ৭।১২।৩৯ তারিখে আমাকে লেখেন "আপনি প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন জামসেদপুরে করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া নিজের কর্ত্তব্য করিয়াছেন। চেষ্টা সফল না হওয়ায় দুঃখিত হইলাম। এবার উক্ত সম্মেলনের অধিবেশন কোথাও হইবে না ইহা আমাদের অর্থাৎ বাঙালীদের পক্ষে লজ্জার বিষয়।" পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯৪০ সনের ডিসেম্বর মাসে নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত, শ্রীসন্তোষ গুপ্ত সুস্থির বসু প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আনুকূল্যে, চলন্তিকা সাহিত্য পরিষদের ও জনসাধারণের সহযোগিতায় গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে জামসেদপুরে উক্ত সাহিত্য সম্মেলন মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইল। রামানন্দবাবু সম্মেলনের অধিবেশনের বহু পূর্ব্ব হইতে জামসেদপুরে গিয়া ইহার উদ্যোগ আয়োজনের তত্ত্বাবধান করেন। বাংলা ও বাংলার বাহিরের বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহা যে শুধু বাঙালীদের মধ্যেই সাড়া জাগাইয়াছিল তাহা নয়, বহু অবাঙালীও ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। টাটা কোম্পানীর তৎকালীন জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে. জে. গান্ধী বাংলাভাষায় সভার উদ্বোধন-ভাষণ পাঠ করিয়া সকলকে বিস্মিত করেন।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত আমাদের স্বগ্রাম ভাদুলস্থ গ্রন্থাগারের বার্ষিক অধিবেশনে ১৯৪১ সনের শ্রাবণ মাসে বর্ষাকালের দারুণ দুর্য্যোগে রামানন্দ বাবু একবার সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভায় প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ছিলেন প্রধান বক্তা।

তাঁহারা উভয়ে গ্রামবাসিগণকে পল্লী-উন্নয়ন-কার্য্যে প্রভূত উৎসাহ দান করেন। রামানন্দবাবু উক্ত গ্রন্থাগারের এক জন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ইহাতে অনেকগুলি পুস্তক দান করেন। এই গ্রন্থাগারটিকে কি ভাবে পল্লীগ্রামের আদর্শ গ্রন্থাগারে পরিণত করা যায় তিনি তৎসম্বন্ধে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থাগারটিকে কেন্দ্র করিয়া কিরূপে শিক্ষাবিস্তার, নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা, ম্যালেরিয়া নিবারণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন প্রভৃতি পল্লীসংগঠনমূলক কার্য্য করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

আমার নিকট তাঁহার লিখিত পত্রগুলির ছত্রে ছত্রে তাঁহার সরলতা, সৌজন্য এবং হৃদয়ের স্বচ্ছতা সুপরিস্ফুট। ১৯৪১ সনে রামানন্দবাবুর চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ যখন বাঁকুড়ায় আসেন তখন তাঁহাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয় এবং তিনি শহরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

দিবাশেষে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

ক্ষয়রোগগ্রস্তসম পাণ্ডুর আকাশ
ধুঁকিতেছে শুয়ে কোন্ বিস্তীর্ণ শয্যায়
এই বুঝি এইবার উঠে নাভিশ্বাস,
ত্রস্ত দিগঙ্গনাদল করে হায় হায়!
সমীর আতপ্ত শুষ্ক শিথিল মন্থর,
নীরব নিশ্চল শ্যাম বিটপী-পল্লব,
নিরজন পল্লীবাটে ঝিল্লীকলস্বর—
সহস্র কণ্ঠের যেন তীব্র আর্ত্তরব!

এখনি নামিবে সন্ধ্যা ধূসর আঁচলে
কনক-গাগরী ভরি' তরল তিমিরে,
বিছাইয়া স্নিগ্ধশান্তি শূন্যে জলে স্থলে—
সুপ্তি-যবনিকা দিবে টানি' ধীরে ধীরে।
আজি সাধ যায়,—নিয়ে ক্লান্ত দেহমন
তব বক্ষ-সমাধীতে করিতে গাহন।

ভারত-আশ্রমে (১৮৭৪) কেশবচন্দ্র সেন (মধ্যস্থলে), শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ ও অন্যান্য মহিলাগণ। (১) জগন্মোহিনী সেন (কেশব-পত্নী), (২) রাধারাণী লাহিড়ী, (৩) সৌদামিনী মজুমদার, (৪) রাজলক্ষ্মী সেন, (৫) সুকক্ষিণা গঙ্গোপাধ্যায়, (৬) বরদাসুন্দরী চট্টোপাধ্যায় (৺সরোজিনী নাইডুর মাতা), (৭) যোগমায়া গোস্বামী, (৮) অন্নদায়িনী সরকার, (৯) শিবনাথ শাস্ত্রীর পত্নী

স্ত্রীশিক্ষা-আন্দোলনে কেশবচন্দ্র সেন

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন জনসমাজে ধর্ম্মনেতা ও সমাজ-সংস্কারক বলিয়াই সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সমাজের কল্যাণ-কর্ম্মে তাঁহার প্রতিভা কত গভীরভাবে প্রযুক্ত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই হয়ত সম্যক্ ধারণা নাই। স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রচেষ্টা কেশবচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তাঁহার জীবনী-গ্রন্থসমূহে এবিষয়ে উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু ইহার যথাযথ বিবরণ তাহাতে তেমন মিলে না। সমসাময়িক সংবাদপত্র ও সাময়িক-পত্র, শিক্ষাবিষয়ক সরকারী বিবরণ এবং প্রামাণ্য পুস্তকাদি হইতে এ বিষয়ে বিস্তর তথ্য পাওয়া যায়। আমি এই সমুদয়ের নিরিখে এখানে কেশবচন্দ্রের স্ত্রীশিক্ষা-আন্দোলনের কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাই।

স্ত্রীশিক্ষা তথা স্ত্রীজাতির উন্নতি-প্রচেষ্টা কেশবচন্দ্রের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই আরম্ভ হয়। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনকালে যে-সব পুস্তিকা লেখেন সেগুলির মধ্যে শিক্ষাহীনতার দরুনই যে নারীজাতির এরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। মিশনরী প্রতিষ্ঠানসমূহের আনুকূল্যে বহু বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু হিন্দুদিগকে "খ্রীষ্টান" করাই তাঁহাদের মনোগত বাসনা ছিল বলিয়া সমাজে তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। স্ত্রীশিক্ষা প্রচারকল্পে রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রচেষ্টা ও পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের "স্ত্রীশিক্ষাবিধায়কে"র কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। নব্যশিক্ষিত বাঙালী যুবকেরা নিজেদের পত্নীগণকে স্বগৃহে রাখিয়া আধুনিক শিক্ষাদানে অগ্রসর হন। স্ত্রীশিক্ষা যাহাতে সমাজে অবাধে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে সেজন্যও তাঁহারা নানারূপ জল্পনাকল্পনা করিতে-ছিলেন। বারাসতে প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ নব্যশিক্ষিত বাঙালীগণ কর্ত্তৃক ১৮৪৭ সনে যে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহা আধুনিক কালের সাধারণ বালিকাবিদ্যালয়-গুলির আদি বলিয়া ধরা যায়। ইহার দুই বৎসর পরে, ১৮৪৯ সনের ৭ই মে ভারত-সরকারের ব্যবস্থাসচিব জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন প্রধানতঃ রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহায়ে ইদানীন্তন পরিচিত বেথুন বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দীর্ঘকাল সম্পাদকরূপে এই বিদ্যায়তনটি পরিচালনা করিয়াছিলেন। সরকার কর্ত্তৃক বিদ্যালয়ে সাহায্য-দানের ব্যবস্থা হইলে তিনি কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি জেলায় বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। সরকারী সাহায্য বন্ধ হইলেও তিনি সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া এগুলি চালাইয়াছিলেন।[১]

কিন্তু তখন বালিকাদের অল্প বয়সে বিবাহ হইবার রীতি প্রচলিত থাকায় তাহারা অধিক দিন বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ পাইত না, দশ-বার বৎসরের মধ্যেই তাহাদিগকে বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইতে হইত। শ্বশুরগৃহে লেখাপড়ার চর্চ্চা সম্ভব না হওয়ায় বালিকাদের শিক্ষা নাম মাত্রেই পর্য্যবসিত হইত।

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৭৩।

মিশনরীরা ইতিপূর্ব্বে জেনানা মিশন প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্তঃপুরে নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু যে কারণে তাঁহাদের বিদ্যালয়গুলি জনপ্রিয় হয় নাই ঠিক সেই কারণে তাঁহাদের এ প্রচেষ্টাও কার্য্যকরী হইল না। উচ্চ-শিক্ষিত যুবকগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়া কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে উক্ত অভাব পূরণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। জন-কল্যাণকর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিকতা—দুই-ই ছিল কেশবচন্দ্রের জীবনাদর্শ। সাধারণের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচারোদ্দেশ্যে ১৮৬১ সনের ৩রা অক্টোবর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সুবিখ্যাত শ্যামাচরণ সরকারের সভাপতিত্বে যে জনসভার অধিবেশন হয় তাহাতেই উক্ত সভার আহ্বায়ক কেশবচন্দ্র নারী-শিক্ষার আবশ্যকতার বিষয়ও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।২ ১৮৬৩ সনের মাঝামাঝি কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম যুবকগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মবন্ধু সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সভার দুইটি উদ্দেশ্য—দেশোন্নতি এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' অগ্রহায়ণ ১৭৮৫ শক (ইং ১৮৬৩) সংখ্যাতেই লেখেন, "বঙ্গস্থ নারীগণের শিক্ষার্থে সভ্যেরা এক অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন,…"। সাধারণ বিদ্যালয়সমূহের পরিপূরকরূপে ব্রাহ্মবন্ধু সভা 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা'র প্রবর্ত্তন করেন। সভার পক্ষ হইতে "অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সম্পাদক শ্রীহরলাল রায়"—এই স্বাক্ষরে ইহার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঘোষিত হইল :

"ঈশ্বর প্রসাদে এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত কতিপয় বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু বালিকাগণ বিদ্যালয়ে দুই তিন বৎসরের অধিক পড়িতে না পারায় যথাবাঞ্ছিত ফল উৎপন্ন হইতেছে না। যাহাতে বালিকাগণ উত্তমরূপে শিক্ষা-লাভ করিতে পারে এই রূপ একটি প্রণালী কলিকাতার ব্রাহ্মবন্ধু সভা অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রণালী ক্রমে বালিকাগণ বিদ্যালয়ে না গিয়া বাটীতে নিযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বা পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি দ্বারা সুশিক্ষিত হইতে পারিবেক। পাঠের বিবরণ বর্ষে চারিবার উক্ত সভায় প্রেরণ করিতে হইবেক। বৎসরে দুই বার বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত পাত্রী-দিগকে পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক। যাঁহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া আপন আপন পরিবারস্থ বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে চাহেন তাঁহারা তাঁহাদিগের নাম, ধাম, বয়স, পাঠ্য পুস্তক ও পাঠে কতটুকু উন্নতি হইয়াছে, এই সমুদায় বিবরণ সহ আমাকে পত্র লিখিবেন। আমার নামে পত্র কলুটোলার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন।"৩

শিক্ষার্থীদের পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রতি শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারিত করা হইল। ব্রাহ্মবন্ধু সভা প্রায় দুই বৎসরকাল পরে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার কার্য্য বামাবোধিনী সভার হস্তে অর্পণ করেন। শেষোক্ত সভা উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্ম যুব-নেতাদের দ্বারা ইহার মুখপত্র 'বামাবোধিনী পত্রিকা' পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাবধি অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অক্টোবর ১৮৬৭ (আশ্বিন ১২৭৪) সংখ্যায় 'বামাবোধিনী পত্রিকা' লেখেন :

"বিগত ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে(৪), ১২৭০ বঙ্গাব্দে এই কলিকাতা মহানগরীতে 'খিস্টিক্ ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটি' নামে একটি ব্রাহ্মবন্ধু সভা সংস্থাপিত হয়। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিবিধানার্থে কিয়ন্মাস পরে উক্ত সভার অন্তর্গত অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাসভা নামে একটি স্বতন্ত্র সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।…১২৭১ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ কলিকাতা ব্রাহ্মবন্ধু সভা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্গত ১২টি ছাত্রীকে পুরস্কার প্রদান করেন। এই পুরস্কার প্রদত্ত হইলে, অনন্তর ১২৭১ বঙ্গাব্দের শেষে ব্রাহ্মবন্ধু সভা এই অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীর ভার বামাবোধিনী সভার হস্তে অর্পণ করেন। তদবধি বামাবোধিনী সভা তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের পূর্ব্বাবলম্বিত প্রণালীর সহিত তাহা একত্রিত করেন এবং ১২৭২ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে বৈশাখ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকায় সভ্যদিগের অনুমত পরীক্ষা পুস্তক সকলের একটি নূতন তালিকা প্রকাশ করেন। তাহাতে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার সময় পাঁচ বৎসরে বিভক্ত করা হয়…১২৭০।১২৭১ এই দুই বৎসর ব্রাহ্ম-বন্ধু সভার হস্তে তাহার ভার থাকে। এবং ১২৭২।৭৩।৭৪ এই তিন বৎসর উহা বামাবোধিনী সভার হস্তে আসিয়াছে।"

তৎকাল প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষার পরিপূরক হিসাবে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা কেশব-মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিকল্পিত ও অনুসৃত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বালিকা-বিদ্যালয়গুলিরও যাহাতে সম্যক্ উন্নতি হয়, সে উদ্দেশ্যেও ১৮৬৬ সনের শেষভাগ হইতে আয়োজন চলিতে থাকে। শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা দ্বারাই প্রধানতঃ উহা সম্ভব। ঐ বৎসর নবেম্বর মাসে ভারত-হিতৈষিণী কুমারী মেরী কার্পেণ্টার ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন এবং কলিকাতায় আসিয়া নারী-শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনায় রত হইলেন। তাৎকালিক সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া ইহার সাফল্য সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। কেশবচন্দ্র কিন্তু কার্পেণ্টারের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে উৎসুক হইলেন। কলিকাতার বেথুন স্কুলের সঙ্গে একটি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত-সরকারকে কার্পেণ্টার

২। তত্ত্বোধিনী পত্রিকা—কার্ত্তিক ১৭৮৩ শক (ইং ১৮৬১)।
৩। ঐ —ভাদ্র ১৭৮৫ শক (ইং ১৮৬৩) পৃ. ৮৩।

৪ ইহা ভুল, '১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দ' হইবে।

একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রে বিশেষ কাজ হইল। কিছুকাল আলাপ-আলোচনার পর সরকার এইরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্মতি দিলেন। ১৮৬৯ সনের জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগ হইতে তিন বৎসরের জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে একজন ইউরোপীয় মহিলা শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে বেথুন স্কুলের সঙ্গে ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল বা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের কার্য্যও আরম্ভ হইল। কেশবচন্দ্রের সহায়তায় কুমারী কার্পেন্টারের উদ্দেশ্য কার্য্যকরী হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

বিলাত পরিভ্রমণকালে (এপ্রিল-অক্টোবর ১৮৭০) কেশবচন্দ্র স্বদেশের নারী জাতির উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় উপায়াদি সম্বন্ধে সেখানকার জনসভায় একাধিক বক্তৃতা করেন। তাঁহার উপস্থিতিতে কুমারী কার্পেন্টার ব্রিষ্টল নগরীতে ১৮৭০, ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে একটি জনসভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সভায় ভারতবর্ষের, বিশেষত: ভারতীয় নারীজাতির মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার দ্রুততর করিবার উদ্দেশ্যে "নেশন্যাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। কেশবচন্দ্র একটি বক্তৃতায় এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সূচনাকে ভারতবাসীদের পক্ষ হইতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। নেশন্যাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন মাদ্রাজ, বোম্বাই, করাচী, কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে শাখা-সভা গঠন করিয়া বিদ্যালয়ে সাহায্য, উৎকৃষ্ট ছাত্রীদের বৃত্তি, স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকাদি প্রকাশ ইত্যাদি নানা ভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে তৎপর হইয়াছিলেন।

৩

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কেশবচন্দ্র জাতিধর্ম্মবর্ণ নির্ব্বিশেষে স্বদেশবাসীদের সংঘবদ্ধভাবে বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কলিকাতায় একটি সভা স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। ইহার নাম হইল—"Indian Reforms Association" বা ভারত-সংস্কার সভা। ৭ই নবেম্বর (১৮৭০) তারিখে অনুষ্ঠিত ইহার প্রথম অধিবেশনে কার্য্যক্রম যথাযথ নির্দ্ধারিত হইল। সভার কার্য্য পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত হয়। "স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি-সাধন বিভাগ"—কার্য্যসূচীতে স্বভাবতঃই প্রথম স্থান অধিকার করিল। কেশবচন্দ্র সেন হইলেন ভারত-সংস্কার সভার সাধারণ সভাপতি, গোবিন্দচাঁদ ধর সাধারণ সম্পাদক। প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য তত্ত্বাবধানের জন্য ইহার অন্তর্গত স্বতন্ত্র সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। "স্ত্রীজাতির উন্নতি-সাধন" বিভাগের সভাপতি হন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত। উমেশচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই 'বামাবোধিনী পত্রিকা' সম্পাদন ও পরিচালন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া নানাপ্রকারে নারীজাতির সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। কাজেই উপযুক্ত পাত্রেই এই বিভাগের সম্পাদনাভার অর্পিত হইল। এই বিভাগের কার্য্য সাধিত হইবার কথা হয় "বালিকা-বিদ্যালয়, অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা, বামাগণের উপযোগী পত্রিকা প্রচার, সময়ে সময়ে পুস্তকাদি প্রকাশ এবং পরীক্ষা গ্রহণ ও পারিতোষিক দান" ইত্যাদি৫ দ্বারা।

স্ত্রীজাতির উন্নতি-সাধন বিভাগের কার্য্যও শীঘ্রই আরম্ভ হইল। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, কেশবচন্দ্র শিক্ষয়িত্রী তৈরি করিবার উদ্দেশ্যে কুমারী কার্পেন্টারের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। বেথুন স্কুলের সঙ্গে যে ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল বা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ উন্নতি হয় নাই, ১৮৭১ সন নাগাদ বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। কেশবচন্দ্র স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া উক্ত বিভাগে একটি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ১৮৭১ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী স্থাপন করিলেন। "বামাবোধিনী পত্রিকা" মার্চ্চ ১৮৭১ সংখ্যায় বিদ্যালয় সম্বন্ধে লেখেন,

-"ভারত-সংস্কার সভার অধীনে যে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় হইয়াছে, ইতিমধ্যে তাহার ছাত্রী সংখ্যা ১৭টি হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রতিদিন বাঙ্গালা শিক্ষা দেন এবং একটি বিবি [মিস্ পিগট—বেথুন স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট] ইংরাজী ও শিল্পকার্য্য শিখান। ভক্তিভাজন বাবু কেশবচন্দ্র সেন মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপকারী বিষয় সকল অতি সহজে বুঝাইয়া দিয়া থাকেন।"

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অল্প দিন পরেই, এই বৎসরের মে মাসে কেশবচন্দ্রের প্রেরণায় এবং ছাত্রীদের উদ্যোগে নারীজাতির কল্যাণকর বিভিন্ন বিষয়ের যথাযথ আলোচনার উদ্দেশ্যে 'বামাহিতৈষিণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়।৬ প্রতি পক্ষান্তে শুক্রবার ইহার অধিবেশন হইত। এই সভায় কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ বিভিন্ন নেতার সভাপতিত্বে নারীজাতির উন্নতি বিষয়ক এবং সাধারণ শিক্ষামূলক নানা বিষয়ে ছাত্রীরা প্রবন্ধ পাঠ করিতেন এবং তদুপরি নানারকম আলোচনা চলিত। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের সঙ্গে এ সভাও বহু বৎসর জীবিত ছিল।

প্রথম বৎসর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে অঘোরনাথ গুপ্ত৭ এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-কার্য্যে ব্রতী হন। ছাত্রীগণ প্রায় সকলেই বয়স্থা; অল্পকালের মধ্যে তাঁহারা পাঠে উৎকর্ষ দেখাইতে সমর্থ হইলেন। তাঁহাদের প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষায়ই ইহার প্রমাণ পাওয়া গেল। ছাত্রীসংখ্যাও ক্রমে বাড়িয়া জুলাই মাস (১৮৭১) নাগাদ বাইশ জনে দাঁড়ায়। বিদ্যালয়ের আয়ব্যয় এবং ষাণ্মাসিক পরীক্ষাদি সম্বন্ধে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'—শ্রাবণ ১২৭৮ লেখেন,

---

৫ বামাবোধিনী পত্রিকা—অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (ডিসেম্বর ১৮৭০)।

৬ ঐ —বৈশাখ ১২৭৮ (মে ১৮৭১)

৭ ধর্ম্মতত্ত্ব—১৬ ফাল্গুন, ১৭৯৩ শক (ইং ১৮৭২)।

"বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় ন্যূনাধিক ১৫০৲ দেড়শত টাকা হইয়া থাকে, তজ্জন্য বামাকুলহিতৈষী মহাত্মাগণের দাতব্যের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর। এইরূপ অবস্থায় বিদ্যালয়টির কার্য্য চলিয়া গত মাসের প্রথমে ইহার ষাণ্মাষিক পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণ হইয়াছে।...

"৮ই আগষ্ট ছাত্রীগণের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হয়।..."

উক্ত পত্রিকা পারিতোষিক-প্রাপ্ত ছাত্রীদের নাম এইরূপ উল্লেখ করেন,

"১ম শ্রেণী। শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সেন৮, কুমারী সৌদামিনী কাস্তগিরী৯, কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী১০।

২য় শ্রেণী। শ্রীমতী যোগমায়া গোস্বামী১১, জগন্মোহিনী রায়, জগত্তারিণী বসু, সারদা সুন্দরী ঘোষ, কুমারী সরলা বসু।

৩য় শ্রেণী। শ্রীমতী মনোমোহিনী সেন, কৃষ্ণবিনোদিনী বসু, বসন্তকুমারী মৈত্র।"

'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় পারিতোষিক-প্রাপ্ত ছাত্রীদের উৎকৃষ্ট রচনাবলী প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। এখানে এই পত্রিকাখানির সঙ্গে স্ত্রীজাতির উন্নতি-বিধান বিভাগ তথা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের সম্পর্কের কথাও একটু বলা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি, উক্ত পত্রিকার সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত স্ত্রীজাতির উন্নতি-বিধান বিভাগেরও সম্পাদক। এই বিভাগের একখানি মুখপত্রের আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছিল, বামাবোধিনী পত্রিকাই এ অভাব পূরণ করিল। ভাদ্র ১২৭৮ সন (সেপ্টেম্বর ১৮৭১) হইতে পত্রিকাখানি ইহার মুখপত্র রূপে গৃহীত হয়।১২ বামা-রচনা অধ্যায়ে ছাত্রীদের উৎকৃষ্ট রচনাসমূহ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। বামাহিতৈষিণী সভায় পঠিত ছাত্রীগণের প্রবন্ধাদিও ইহাতে স্থান পাইতে থাকে।

পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে (১৮৭১) শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রথম বাৎসরিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। পণ্ডিত (পরে মহামহোপাধ্যায়) মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সে যুগের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌গণ বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করেন। ছাত্রীরা বাংলা শিক্ষায় কতখানি উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন কৃষ্ণমোহনের ইংরেজী মন্তব্য১৩ হইতে তাহা জানা যাইতেছে,—

I return the Bengali exercises of the students of the Female School of the I. R. Association. They have all done very well indeed. I do not at this moment remember any Bengali Mss. written by Hindoo ladies with the accuracy and correction which characterise the enclosed papers so free from mistakes as these."

(Revd.) K. M. BANERJEE.

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পুরা ইংরেজী নাম "Female Normal and Adult School"। বিদ্যালয়টি কলিকাতার মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে প্রথম আরম্ভ হয়। পরে ১৮৭২ সনের প্রারম্ভে কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী বেলঘরিয়ায় ভারত-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা তথায় স্থানান্তরিত হয়। এখানে তিন মাস অবস্থানের পর আশ্রমের সঙ্গে বিদ্যালয়টি মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড়গাছি উদ্যান-বাটিকায় চলিয়া যায়। এইখানেই ৬ই এপ্রিল (১৮৭২) তারিখে তৎকালীন বড়লাটের পত্নী লেডী নেপিয়ারের পৌরোহিত্যে প্রথম সাম্বৎসরিক পারিতোষিক-প্রদান উৎসব সম্পন্ন হইল। উৎসব অন্তে ফাদার লাফোঁ বিজ্ঞান বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন ("বামাবোধিনী পত্রিকা" চৈত্র, ১২৭৮)। কাঁকুড়গাছি হইতে অল্প কাল পরেই ভারত-আশ্রম কলিকাতা মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসিলে স্ত্রীবিদ্যালয়ও এখানে স্থানান্তরিত হইল। "ধর্ম্মতত্ত্ব" (১৩ মে ১৮৭২) এই সংবাদ দিয়া লেখেন যে, "বিদ্যালয়ের কার্য্য ১২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত আরম্ভ হইয়া থাকে। ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ।"

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয়—১৮৭২ সনের প্রারম্ভে প্রায় এক শত আশী টাকা—দেশী-বিদেশী কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তির অর্থসাহায্যে মিটানো হইতেছিল। কিন্তু শুধু মাত্র চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া ইহার স্থায়িত্ব বিধান সম্ভব নহে। সুতরাং সরকারের সঙ্গে কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে পত্র-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৭২ সনের ৩১শে জানুয়ারী বেথুন স্কুল সংলগ্ন শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সরকার তুলিয়া দিলেন। এই সময় ছোটলাট সার জন ক্যাম্‌বেল এই মর্ম্মে মন্তব্য করেন যে, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কাহারও পক্ষে এরূপ বিদ্যালয় সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করা সম্ভব নহে। কেশবচন্দ্র পরবর্ত্তী ৩রা ফেব্রুয়ারী সরকারের জ্ঞাতার্থ তাঁহার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের বিষয় একখানি পত্রে বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়া লেখেন যে, তাঁহার বিদ্যালয় দ্বারা সরকারের উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎও সিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সুতরাং সরকারী সাহায্য ন্যায়তঃ ইহার প্রাপ্য। এই পত্র হইতে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমরা সম্যক্ জানিতে পারি। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের চব্বিশটি ছাত্রী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এতদ্‌ব্যতীত ছয়টি বালিকা লইয়া ইহার সঙ্গে

---

৮ কেশবচন্দ্র সেনের বিলাতযাত্রার অন্যতম সঙ্গী ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক প্রসন্নকুমার সেনের স্ত্রী।

৯ ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীরের কন্যা ও (পরে) সিবিলিয়ান বিহারীলাল গুপ্তের পত্নী।

১০ রামতনু লাহিড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্রী ও (পরে) বেথুন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

১১ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহধর্ম্মিণী।

১২। "বর্ত্তমান ভাদ্র মাস হইতে ইহার সম্পাদকীয় ভার ভারত-সংস্কারক সভার বামাকুলোন্নতি সাধক (Female Improvement) বিভাগের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। বামাবোধিনী পত্রিকার স্বত্ব যেমন বামাবোধিনী সভার ছিল সেইরূপ থাকিবে। ইহার লেখন কার্য্য কেবল ভারত-সংস্কার সভার উক্ত বিভাগ হইতে সম্পন্ন হইবে।"—বামাবোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১২৭৮।

১৩। বামাবোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১২৭৮।

হানাবাড়ী

চোর

শিল্পী—শ্রীসুশীল মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীসূর্য্যের মন্দির—গলতা, জয়পুর
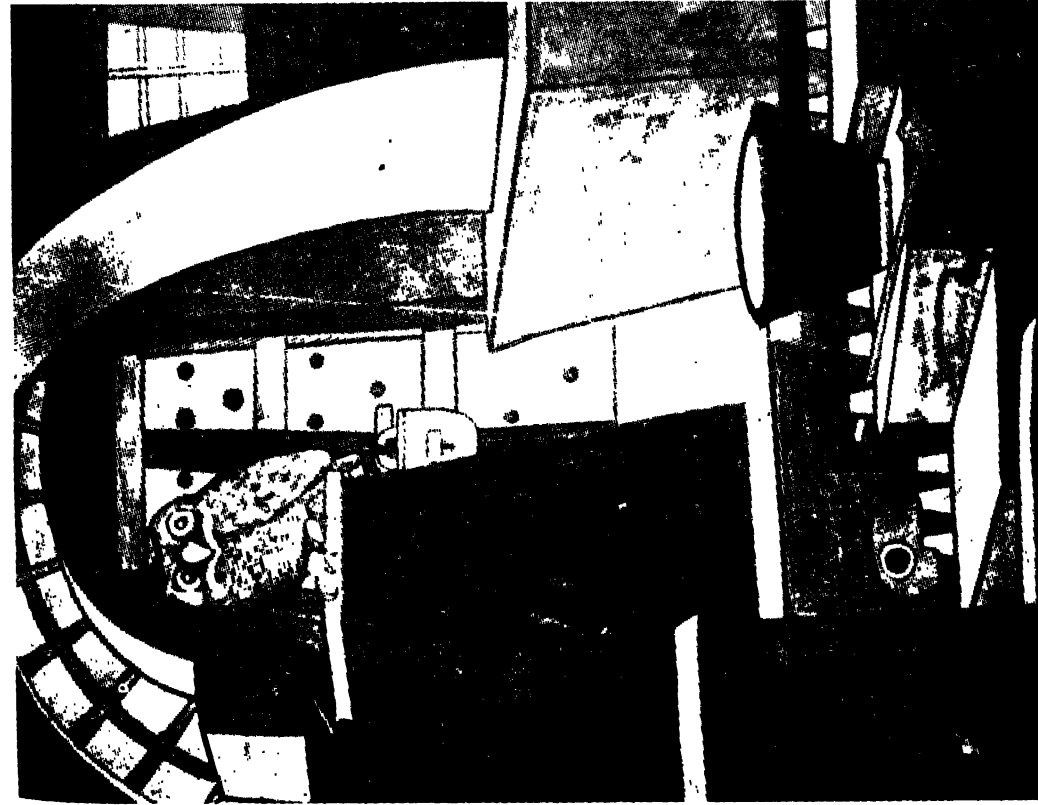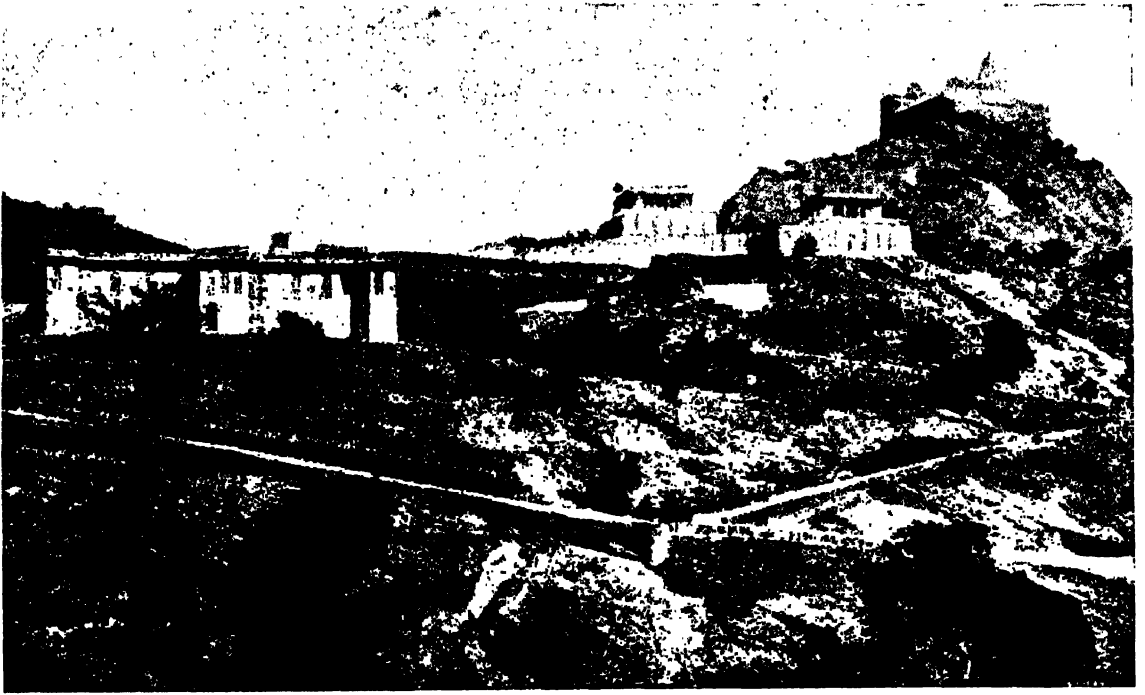
গলতা পাহাড়ের নিম্ন ভাগের সাধারণ দৃশ্য

একটি বালিকা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তকের তালিকা এই পত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে কিরূপ উন্নত ধরণের শিক্ষা দেওয়া হইত প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের নাম দৃষ্টে তাহা বেশ বুঝা যায়। বাল্মীকি রামায়ণ, নারী জাতি-বিষয়ক প্রস্তাব, মেঘনাদবধ কাব্য, পদ্মিনী উপাখ্যান, অলঙ্কার শাস্ত্র, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা, গণিত ও শারীর বিদ্যা— বাংলা পাঠ্য পুস্তক। প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী পাঠ্য পুস্তক ছিল—P. C. Sircar's Fifth Book of Reading, M. C. Culische's Course of Reading, Lennie's Grammar। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সভা বা পরিচালনা-সমিতির সভাপতি কেশবচন্দ্র স্বয়ং, সহকারী সভাপতি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত, এবং সভ্য—ক্ষেত্রমোহন দত্ত, কৃষ্ণবিহারী সেন, হরগোপাল সরকার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও মহেন্দ্রনাথ বসু।১৪ কেশবচন্দ্রের এ আবেদন যে বৃথা হয় নাই, একটু পরেই আমরা তাহা দেখিতে পাইব।

দ্বিতীয় বৎসরে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের আরও উন্নতি হইল। কেশবচন্দ্র ইহার উন্নতি বিষয়ে সবিশেষ যত্নপর হইলেন। শিবনাথ ভট্টাচার্য্য (পরে শিবনাথ শাস্ত্রী) কেশবের প্রতি নিতান্ত ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি এই বৎসর সবে এম-এ পাস করিয়া ভারত-আশ্রমে আসিয়া যোগ দিলেন। এখানকার বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্যেও তিনি ব্রতী হন। শিবনাথ লিখিয়াছেন—কেশবচন্দ্র বিদ্যালয়ের শিক্ষায় ইউনিভারসিটির রীতি অনুসরণ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। মেয়েদের জ্যামিতি লজিক মেটাফিজিক্স্ পড়াইবার কথা উত্থাপন করিলে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, "এ সকল পড়াইয়া কি হইবে? মেয়েদের আবার জ্যামিতি পড়িয়া কি হইবে? তদপেক্ষা elemeatary principles of science মুখে মুখে শিখাও।" অতঃপর শিবনাথ বলিতেছেন, "আমি science এর মধ্যে mental science আনিলাম। তখন আমি তাজা কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, mental scienceএ মাথা পূরিয়া রহিয়াছে, আমার ছাত্রীদিগকে তাহা না পড়াইলে কি থাকিতে পারি? আমি মুখে মুখে mental science বিষয়ে ও logic বিষয়ে উপদেশ দিতাম, ছাত্রীরা লিখিয়া লইতেন। সে সকল note এখনও আমার পুরাতন ছাত্রীদের কাহারও কাহারও নিকট থাকিতে পারে।১৫ আমার প্রধান ছাত্রী ছিলেন তিন জন, রাধারাণী লাহিড়ী, সৌদামিনী খাস্তগির (যিনি পরে Mrs. B. L., Gupta হইয়াছিলেন) ও প্রসন্নকুমার সেনের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী সেন। ইঁহারা সকলেই তখন বয়স্থা ও জ্ঞানানুরাগিণী। ইঁহাদের পড়াইতে আমার অতিশয় আনন্দ হইত।"১৬

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে বয়স্কা নারীগণ অধ্যয়নে লিপ্ত ছিলেন। শিবনাথ লিখিয়াছেন—কেশব-পত্নীও এখানে অধ্যয়ন করিতেন এবং তিনি তাঁহাকেও পড়াইতেন। বিদ্যালয়ের কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট ইহাকে সাহায্যদানে অগ্রসর হইলেন। ক্ষেত্র যে আগে হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। গবর্ণমেণ্ট ১৮৭২ সনের ৯ই আগষ্ট বিদ্যালয়কে বার্ষিক দুই হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিলেন। তবে ইহার সঙ্গে এই মর্ম্মে একটি সর্ত্ত জুড়িয়া দিলেন যে, বেসরকারী দান হইতেও উক্ত পরিমাণ টাকা প্রতি বৎসর সংগ্রহ করিতে হইবে। পাঁচ বৎসরের জন্য এইরূপ সরকারী সাহায্য প্রদত্ত হইল। ১৮৭৩, ৩রা এপ্রিল অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পারিতোষিক উৎসবে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক কন্যা মিস বেরিং সহ যোগদান করিয়া বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের প্রতি স্বীয় সহানুভূতি ও সমর্থন প্রদর্শন করিলেন। ১৮৭২-৭৩ সনের *Report of Public Instruction* বা শিক্ষাবিষয়ক সরকারী বিবরণে (পৃ. ৪৮৯) এই পারিতোষিক প্রদান উৎসবে সকন্যা লর্ড নর্থব্রুকের উপস্থিতি, ইংরেজ মহিলাগণ কর্ত্তৃক উপস্থিতমত ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ, সরকারী সাহায্যদান প্রভৃতির নিম্নরূপ উল্লেখ আছে,—

"The Brahmo Samaj Normal School is in a flourishing state and was visited in the month of April last by the Governor-general and Miss Baring, Miss Milman and several other ladies were all much pleased with the short but satisfactory examination which preceded the distribution of prizes. Mrs. Woodrow, who had attended two successive examinations, was of opinion that much progress has been made in the year. The Lady Superintendent of the School is Mrs. Wince, who some years ago was one of the pupils of the Normal School above mentioned [the Normal School which was incorporated with the Central Female School, Cornwallis Square]. A yearly grant of Rs. 2000 was first given to the school on the 9th August 1872, subject to the condition of its being met by Rs. 2000 from private contributions. The number of pupils on the 31st March last was 30.

বিদ্যালয়ের কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। তৃতীয় বৎসরে (১৮৭৩) ইহার ছাত্রীসংখ্যা দাঁড়ায় আটাশটিতে। ইহার

১৪। শ্রীযুত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত তথ্য অবলম্বনে।

১৫। এখানে শিবনাথ তাঁহার বক্তৃতার যে সব note ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক লিখিয়া রাখার কথা বলিয়াছেন তৎসমুদয় 'মনোবিজ্ঞান' শিরোনামে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'—শ্রাবণ ১২৮০; মাঘ-ফাল্গুন ১২৮১; বৈশাখ, এবং কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। শেষোক্ত (কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ) সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পাদটীকায় 'বামাবোধিনী পত্রিকা'-সম্পাদক লেখেন,—

"পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম-এ ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে মনোবিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল উপদেশ দেন, ছাত্রীগণ তাহা লিখিয়া লইয়া পুস্তকাকারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাই ক্রমশঃ বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইল।"

১৬। [illegible]

সংলগ্ন বালিকা বিদ্যালয়ে চল্লিশটি ছাত্রী পাঠাভ্যাস করে। শিক্ষয়িত্রী বা বয়স্থা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ বাংলা ভাষায় আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তাঁহারা প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী পুস্তকাদি পাঠেও নিবিষ্ট হন। এ বৎসর বিদ্যালয়ের শিক্ষা-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন—মিসেস্ উইন্‌স (লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট), শশিভূষণ দত্ত, এম-এ,—১ম শিক্ষক, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—২য় শিক্ষক, যোগমায়া চক্রবর্ত্তী—সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, রাজলক্ষ্মী সেন এবং রাধারাণী লাহিড়ী প্রভৃতি ছাত্রী-শিক্ষক। এ বৎসর ছাত্রীদের পরীক্ষাকার্য্য সম্পাদন করেন—কুমারী পিগট, কুমারী হেসাব, পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত মহেশ-চন্দ্র ন্যায়রত্ন, শিবচন্দ্র দেব, কৃষ্ণবিহারী সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি। শিবনাথ তখন স্বীয় মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রতিষ্ঠিত হরিনাভি এংলো-সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইয়া যাওয়ায় এখানকার কার্য্যে যুক্ত থাকিতে পারেন নাই। এবারকার উৎকৃষ্ট ছাত্রীদের পারিতোষিক বিতরণ প্রসঙ্গে "বামাবোধিনী পত্রিকা", ফাল্গুন-চৈত্র ১২৮০ (মার্চ-এপ্রিল ১৮৭৪) লেখেন,—

"কলিকাতা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতাশ্রমের সুপ্রশস্ত গৃহে এই বিদ্যালয়ের কার্য্য এক্ষণে নির্ব্বাহিত হইতেছে। এই স্থানেই পারিতোষিক দানের সভা হয়। সভাস্থলে অনারেবল হবহাউস (ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক) ও তাঁহার পত্নী, ফাদার লেফণ্ট, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং বহুসংখ্যক হিন্দু ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। বিবি হবহাউস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।...

"এই শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ১৮৭১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি সংস্থাপিত হইয়া প্রায় দুই বৎসর কাল গবর্ণমেণ্ট হইতে বার্ষিক দুই সহস্র মুদ্রা সাহায্যলাভ করিতেছে।..."

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের কার্য্যে কেশবচন্দ্র কিন্তু সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। যে উচ্চ আদর্শ ও মনোভাব লইয়া বিদ্যালয় পরিচালনে তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা দ্বারা তাহা তেমন পরিপূরিত না হওয়ায় সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্তকে লিখিত ১৮৭৩ সনের ২রা নবেম্বর তারিখের একখানি পত্রে তিনি এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করেন,—

"আমি অনেক দিন হইতে বলিতেছি যে, স্ত্রীবিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল নহে। এত টাকা ব্যয় হইতেছে, কিন্তু ফল তদ্রূপ হইতেছে না। মেয়েগুলি ধর্ম্মেতে, জ্ঞানেতে, যথার্থ উন্নতি লাভ করেন এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। আমি তাঁহাদিগকে আপনার বলিয়া ভালবাসি। কেবল কতকগুলি অসার কথা শিখাইয়া তাঁহাদিগকে বিকৃত করিতে কোনমতে ইচ্ছা হয় না। প্রকৃত জ্ঞান দিতে না পারিলে আমার মনে বড় কষ্ট হইবে। এই বিদ্যালয়টি যেন অন্যান্য বিদ্যালয়ের মত না হয়। তোমাদের নিকট আমি এই প্রার্থনা করি, এবং আশাও করি। একটী মণ্ডলীকে যথার্থ মানুষ করিয়া দিতে হইবে। আর দুই মাস দেখা যাক্, এই দুই মাস খুব চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিং উপায় অবলম্বন করিলে বিদ্যালয়টি ভাল হয় এবং আমার মেয়েগুলি সুখী হয়? সে বিষয়ে তোমরা কি করিতে পার আমাকে লিখিলে আমি মতামত প্রকাশ করিতে পারি। আপাততঃ তোমার ইচ্ছানুসারে একটী তালিকা পাঠাইতেছি, তদনুসারে নিয়মিত বক্তৃতা দ্বারা উপদেশ প্রদত্ত হইবে। জানুয়ারী মাসে ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা হইবে।"[১৭]

কেশবচন্দ্রের উচ্চ ভাবাদর্শানুযায়ী কার্য্য না হইলেও ছাত্রীগণ যে পাঠে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিতেছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের মধ্যে নানা বিষয় লইয়া এই সময় মতভেদ উপস্থিত হইল। এ কারণ স্ত্রীবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেও বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। চতুর্থ বৎসরে, ১৮৭৪ সনে কেশবচন্দ্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণ এখানকার অধ্যাপনাকার্য্যে রত হইলেন। মহেন্দ্রনাথ বসু অধ্যক্ষ হন; গৌরগোবিন্দ রায় (উপাধ্যায়), উমানাথ গুপ্ত, প্রসন্নকুমার সেন ও গিরিশচন্দ্র সেনকে ভারত সংস্কার সভার অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে এ বৎসর এখানে শিক্ষাদানে ব্রতী হইতে দেখি।[১৮] চতুর্থ সাম্বৎসরিক পারিতোষিক প্রদান উৎসব সম্পন্ন হয় ১৮৭৫ সনের ২৭শে মে দিবসে। প্রথম শ্রেণীর রাধারাণী লাহিড়ী, রাজলক্ষ্মী সেন, অন্নদায়িনী সরকার প্রভৃতি পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। স্ত্রী-বিদ্যালয়-সংলগ্ন বালিকা বিদ্যালয়ের কোন কোন ছাত্রীও পুরস্কার লাভ করে। এবারকার পারিতোষিক দান প্রসঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যালয়ের উন্নততর শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কে "বামা-বোধিনী পত্রিকা" (জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) লেখেন,—

"ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ৫ বৎসর চলিতেছে এবং এখানে যতগুলি বয়স্কা হিন্দু ছাত্রী অধ্যয়ন করে, বঙ্গদেশের আর কোথায়ও সেরূপ দেখা যায় না। অধিক বয়স্কা শিক্ষার্থিনী ভদ্র রমণীগণের থাকিবার জন্য ভারতাশ্রম উপযুক্ত স্থান সমাবেশ করিয়া থাকেন। এই বিদ্যালয়ের এত দূর উন্নতি হইয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরা যে ইংরাজী পুস্তক অধ্যয়ন করেন, ইহার ছাত্রীরা তাহাই করিতেছেন।"

বিদ্যালয়টি ১৮৭৬-৭৭ সনেও ভাল রূপে চলিতেছিল। ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের মধ্যে প্রকাশ্য মতবিরোধ এ সময় যে কতকটা নিরসন হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। 'প্রগতিশীল' ব্রাহ্মদের নেতা দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ

---

১৭ বামাবোধিনী পত্রিকা—জ্যৈষ্ঠ ১৩২২: "উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী (তাঁহার লিখিত ডায়েরী)"।

১৮ ধর্ম্মতত্ত্ব—১ ফাল্গুন ১৭৯৬ শক: "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক বিবরণ।"

গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত বালিগঞ্জের বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় এই স্ত্রীবিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা যে তখন চলিতে থাকে তাহার আভাস আমরা ১৮৭৬-৭৭ সনের সরকারী শিক্ষা বিবরণে (পৃ ৭৭) এইরূপ পাইতেছি,—

"The Mirzapore school is maintained by Babu Keshub Chunder Sen; it is rather an adult female school than a normal school, its objects being similar to those of the Banga Mahila Bidyalaya of Ballygunge, with which it may shortly be amalgamated."

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উভয় বিদ্যালয় মিলিত হইল না। তথাকথিত প্রগতিশীল ব্রাহ্ম এবং কেশব-পন্থীদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ বাড়িয়া চলিল। অবশেষে ১৮৭৮ সনের ৬ই মার্চ্চ তারিখে কুচবিহার-বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার ফলে এই মতান্তর বিচ্ছেদে পরিণত হয়। ইহার প্রতিক্রিয়া স্ত্রীবিদ্যালয়ের উপরও প্রতিফলিত হইল, বিদ্যালয়ের আয় হ্রাস পাইল। ইহা দ্বারা আশানুরূপ কাজ হইতেছে না—এই অজুহাতে গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৮ সনে ইহার সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন।১৯

৩

ব্রাহ্মসমাজে অন্তর্বিরোধ, সরকারী সাহায্য প্রত্যাহার প্রভৃতি নানা কারণে ভারত সংস্কার সভার অন্তর্গত এই স্ত্রীবিদ্যালয়ের কার্য্য রীতিমত চলিতে পারে নাই। কেশবচন্দ্র ১৮৭৯ সনের প্রথমেই যে আর একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন তাহার কথা 'সংবাদ প্রভাকরে' ১১ মার্চ্চ ১৮৭৯ তারিখে এইরূপ পাইতেছি,—

"বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ভারত সংস্কার সভার অধীনে একটি স্ত্রীবিদ্যালয় ছিল, কিন্তু তাহার ফল সন্তোষপ্রদ না হওয়ায়, ইডেন সাহেব গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক সাহায্য ৫০০ টাকা রহিত করায় বিদ্যালয়টি উঠিয়া যায়। কেশববাবু এক্ষণে আর একটি স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, পাইকপাড়ার কুমার ইন্দ্রনাথ সিংহ তাহাতে ১০০০ টাকা এবং কুমার পূর্ণচন্দ্র সিংহ ৫০০ টাকা চাঁদা দান করিয়াছেন।"

এই বিদ্যালয়টির নাম দেওয়া হইল 'মেট্রোপলিটান ফিমেল স্কুল'। কেশবপন্থী ব্রাহ্মদের স্ত্রীগণ ও তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মহিলারা ১২৮৬ সালের ২৭শে বৈশাখ কেশবচন্দ্রেরই অনুপ্রাণনায় 'আর্য্যনারী সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। 'পরিচারিকা' নামে মাসিক পত্রিকাখানি (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত) ইহার মুখপত্র হইল। কেশবচন্দ্রকে তাঁহারা এই সমাজের সভাপতি পদে বৃত করিয়াছিলেন। ১৮৮০ সনের নবেম্বর মাস হইতে এই সমাজ উক্ত স্কুলের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিলেন। আর্য্যনারী সমাজের মুখপত্র 'পরিচারিকা' ফাল্গুন ১২৮৭ সংখ্যায় উহার সাম্বৎসরিক বিবরণ প্রদান প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে লেখেন,—

"গত নবেম্বর মাস হইতে ভারত সংস্কার সভার অধীনস্থ স্ত্রীবিদ্যালয় আর্য্যনারী সমাজের অধীন হইয়াছে, বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যের অধিকাংশ ভার আর্য্যনারী সমাজের সভ্যগণ গ্রহণ করিয়াছেন।"

ইতিমধ্যে স্ত্রীজাতির শিক্ষা-ব্যবস্থায় বঙ্গদেশে নব নব পন্থা অবলম্বিত হইতে থাকে। বেথুন স্কুল বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া একটি প্রথম শ্রেণীর বিদ্যাপীঠে পরিণত হয় (আগষ্ট ১৮৭৮)। পর বৎসর হইতে এখানে কলেজের শ্রেণীও খোলা হয়। প্রবেশিকা ও তদূর্দ্ধ পরীক্ষাসমূহে নারীগণ পরীক্ষা দিয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র ছিলেন পুরুষ এবং নারী উভয় শ্রেণীর একই প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থার বরাবর বিরোধী। নিজ আদর্শানুযায়ী অগ্রসর হইতে না পারায় প্রিয় স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীও তাঁহার পছন্দ হইত না। কাজেই প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে, বিশেষতঃ নারী ও পুরুষের একই ধরণে উচ্চশিক্ষা প্রদানে তাঁহার ঘোরতর আপত্তি ছিল। ইহার ভিতরকার ত্রুটি নিবারণকল্পে কেশবচন্দ্র নারীদের জন্য একটি নূতন ধরণের উচ্চশিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রণী হন। ১৮৮২ সনের প্রথমে এই উদ্দেশ্যে তিনি যে অনুষ্ঠানপত্র রচনা করেন (৩১ মার্চ্চ ১৮৮২) তাহা হইতে তাঁহার মূল উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। অল্পবয়স্কা বালিকাদিগের শিক্ষাদান ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে ইহাতে তিনি বলেন,—

"এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী উচ্চতম ও সমগ্র শিক্ষারীতির অভাবে এদেশীয় স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী অত্যন্ত অসম্পন্ন ভাবে অবস্থান করিতেছে। ভারত সংস্কারক সভার কমিটি এই সেই গুরুতর জাতীয় অভাব মোচনে অগ্রসর হইয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের মনের বিশেষ উপযোগী একটী শিক্ষাপ্রণালী বিধিবদ্ধ করাই তাঁহাদের বিশেষ উদ্দেশ্য। এই শিক্ষা প্রণালী দ্বারা এদেশের স্ত্রীলোকেরা জনসমাজে আপনাদের প্রকৃত মর্য্যাদার উপযুক্ত হইতে পারিবেন। স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য এবং কার্য্যক্ষেত্রের জন্য যে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক তাহা অস্বীকার করা যায় না। পুরুষ জাতির উপযোগী শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদিগের মত উপাধি এবং সুখ্যাতির অনুসন্ধান করিতে স্ত্রীলোকদিগকে বাধ্য করা অত্যন্ত অনিষ্টকর ও অন্যায় কার্য্য। এ কারণ যাহা পুরুষের উপযোগি শিক্ষা দিয়া স্ত্রীলোকদিগের স্বভাবকে বিকৃত করে অথবা যাহা তাঁহাদিগকে কেবল বাহ্য বেশভূষা ও অসার সভ্যতার অনুসরণ করিতে শিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগের দুর্গতি সাধন করে, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে তাহা যত্নের সহিত পরিত্যক্ত হইবে। এবং সর্ব্বপ্রযত্নে এখানে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে সুশিক্ষিত হিন্দু স্ত্রী

১৯ *Report of Public Instruction, Bengal, for 1878-79*, p. 85.

এবং হিন্দু মাতা হইবার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। স্বাভাবিক এবং জাতীয় শিক্ষা প্রণালী দ্বারা এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের হিন্দুপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করাই সভার উল্লিখিত কার্য্যের বিশেষ লক্ষ্য। কলিকাতা নগরীতে এজন্য সরল ভাষায় কতকগুলি বক্তৃতা হইবে।...বিজ্ঞানের সরল সত্য সকল, নীতি, স্বাস্থ্যরক্ষা, ব্যাকরণ এবং রচনা, ইতিহাস, ভূগোল, গৃহকার্য্য এবং আদর্শ হিন্দু স্ত্রীচরিত্র এই সমস্ত উপদেশের অন্তর্গত বিষয় হইবে; তত্ত্ববিদ্যা, চিত্র এবং সূচীর কার্য্যও শিক্ষা দেওয়া হইবে। যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা এখানে উপদেশ শ্রবণ করিবেন তাঁহাদিগকে বার্ষিক পরীক্ষার অধীন হইতে হইবে, ছাপান প্রশ্নের কাগজ সকল তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইবে। কলিকাতা ও বিদেশের অন্যান্য যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা উপযুক্ত রূপে শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দিতে আসিবেন তাঁহাদিগকেও পরীক্ষায় গ্রহণ করা হইবে। পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগকে অলঙ্কার, প্রশংসাপত্র এবং ৫০ টাকা হইতে ২০০ টাকা পর্য্যন্ত ছাত্রবৃত্তি পুরস্কাররূপে প্রদত্ত হইবে।"২০

ভারত সংস্কার সভার অধীনে এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। কেশবচন্দ্র ইহার সভাপতি হইলেন। স্থির হইল যে, পূর্ব্বোক্ত মেট্রোপলিটন ফিমেল স্কুল প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ১৮৮২, ১লা মে দিবসে ১০নং আপার সারকুলার রোডে এই উচ্চ স্ত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কেশবচন্দ্রের সভাপতিত্বে বিদ্যালয়ের একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিও গঠিত হয়। বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনাদির ব্যবস্থা বিস্তারিত ভাবে এইরূপ ধার্য্য হইয়াছিল—মহিলাদের জন্য পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট করা, পাঠ্য পুস্তকের অনুমত কলেজ-গৃহে নিয়মিত ভাবে সপ্তাহে একবার বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা ও মহিলাগণকে তাহাতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দান, বৎসরে একবার পরীক্ষা গ্রহণ এবং উৎকৃষ্ট ছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ। কলেজ সিনিয়র ও জুনিয়র মাত্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়।২১ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসেই ফাদার লাফোঁ চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণাদি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রথম দিনে প্রায় পঞ্চাশটি মহিলা উপস্থিত ছিলেন।২২ ইহার পরে এইরূপ বক্তৃতাদান নিয়মিতভাবে চলিতে লাগিল। অগ্রহায়ণ-পৌষ ১২৮৯ সংখ্যা 'পরিচারিকা' নিম্নলিখিত বক্তা ও বক্তৃতার উল্লেখ করেন,—

"সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ফাদার লাফোঁ বিজ্ঞান বিষয়ে, বাবু কেশবচন্দ্র সেন নীতি বিষয়ে, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন এম-এ ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিষয়ে, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নারীজীবন বিষয়ে, ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি শারীর বিধানবিদ্যা বিষয়ে, পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র রায় প্রাচীন আর্য্যনারীদিগের আচার ব্যবহার বিষয়ে, এক এক জন করিয়া প্রতি শনিবারে ১০নং আপার সারকুলার রোডস্থিত এই বিদ্যালয়ে উপদেশ দান করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের উপদেশের সারাংশ গত কয়েক সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করিয়াছি। গড়ে প্রায় চল্লিশ জন মহিলা উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন।"

১৮৮৩ সনের জানুয়ারী মাস নাগাদ এই বিদ্যালয়টি ভিক্টোরিয়া কলেজ নামে অভিহিত হয়। ২রা জানুয়ারী ছাত্রীগণের বাৎসরিক পরীক্ষা গৃহীত হইল। গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন. কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীননাথ মজুমদার এবং কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং পরীক্ষা লইয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট ছাত্রীদের বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়। দুই জন নারীকে ইংরেজী ও বাংলা পুস্তক রচনার জন্যও পুরস্কার দিবার কথা ঘোষিত হইল। পরীক্ষক সভার সভাপতি ছিলেন কেশবচন্দ্র এবং সম্পাদক কৃষ্ণবিহারী সেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী তিন শত এবং বিজনগ্রামের মহারাণী পাঁচ শত টাকা দান করিলেন। ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর ও কুচবিহারের মহারাজা, এবং বরোদার গাইকোয়াড়ের নিকট হইতেও অর্থসাহায্য পাওয়া গেল।

কলেজের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য ৯ই মার্চ্চ ১৮৮৩ দিবসে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইল। কলিকাতার লর্ড বিশপ এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। গৃহকর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া ঘরে বসিয়া দেশীয় রীতি অনুসারে মহিলাগণের এরূপ শিক্ষালাভের নূতন ব্যবস্থাকে তিনি বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত করেন। যে যে বিষয়ে উৎকর্ষের জন্য পারিতোষিক বিতরিত হয় তাহা দৃষ্টে জানা যায়—নারীজাতির কিরূপ ব্যাপক শিক্ষা কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছিল। শুধু কলিকাতায় নহে, সুদূর মফস্বল হইতেও মহিলাগণ এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পারিতোষিকের বিষয়, পারিতোষিক ও তৎপ্রাপ্ত ছাত্রীদের বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল,—

"শ্রীমতী মোহিনী সেন উচ্চ শ্রেণীর সমুদায় বিষয়ের পরীক্ষায় অত্যুৎকৃষ্ট রূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনি বার্ষিক দুই শত টাকার ছাত্রীর বৃত্তি স্বনামাঙ্কিত একটি সুন্দর রূপার ঘড়ী পুরস্কার পাইয়াছেন, কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী উক্ত শ্রেণীর পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি একশত টাকার ছাত্রীর বৃত্তি ও রৌপ্য মেডল পারিতোষিক পাইয়াছেন, কুমারী চারুবালা সেন নিম্নশ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনি বার্ষিক একশত টাকার ছাত্রীর বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীতে উত্তম বাংলা গদ্য রচনার জন্য যে পঞ্চাশ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল তাহাতে কিশোরগঞ্জের শ্রীমতী কিশোরী-

---

২০ পরিচারিকা—বৈশাখ ১২৮৯।

২১ *The New Dispensation*, March 11, 1883.

২২ পরিচারিকা—জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯।

মোহিনী সেন এবং ঢাকা জেলার কোন পল্লীগ্রামের এক কুলবধূ এই দুই জনে তুল্যরূপে অত্যুচ্চ নম্বর পাইয়াছেন। দুই জনেই পঁচিশ টাকা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত কুলবধূটি উত্তম হস্তলিপির জন্যে পনর টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ঢাকা জেলার পল্লীগ্রামের একটি হিন্দু কন্যা শিল্পের জন্য দশ টাকা একটি ব্রাহ্মিকা উত্তম রন্ধনের জন্য ২৫ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। এবং পরীক্ষোত্তীর্ণা সকল ছাত্রীই পুস্তকাদি পারিতোষিক লাভ করিয়াছেন।"২৩

কলেজের কার্য্য সুচারুরূপে আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু ইহা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই, প্রতিষ্ঠার দেড় বৎসর মধ্যে ১৮৮৪ সনের ৮ই জানুয়ারী উক্ত কলেজ-সংস্থাপক কেশবচন্দ্র সেন ইহধাম ত্যাগ করিলেন। ইহার পর কলেজ বিপদ্‌গ্রস্ত হইল। কিন্তু কিছু কাল পরেই কেশবের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবী ও তদীয় স্বামী কুচবিহারের মহারাজা ইহার পরিচালনের জন্য নিয়মিত অর্থ-সাহায্য করিতে থাকিলে ইহার কার্য্য আবার সুষ্ঠুভাবে সুরু হয়। ১৮৮৯ সনে তাঁহারা কলেজ এবং তৎসংলগ্ন বিদ্যালয়ের সমগ্র পরিচালনা-ভার নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিলেন।

কেশবচন্দ্র দীর্ঘায়ু ছিলেন না। তথাপি তাঁহার কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ সময়ই অন্য দশ কাজের মধ্যে দেশের ও সমাজের উন্নতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে যাপিত হয়। কিন্তু তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতির একান্ত বিরোধী ছিলেন। নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত বৈষম্য স্বীকার করিয়া নারীর উপযোগী শিক্ষাপ্রদানেই তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন সহকর্ম্মীর সঙ্গে পরবর্ত্তী কালে যে দারুণ মতভেদ উপস্থিত হয় ইহা তাহার অন্যতম কারণ। কিন্তু তিনি বরাবর স্বমতে দৃঢ় ছিলেন। নারীর দেহ-মনের উপযুক্ত শিক্ষা প্রচারে তিনি কোন দিন বিরত হন নাই। নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যেও স্ত্রীবিদ্যালয় জীয়াইয়া রাখিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে একটি কলেজে পরিণত করার মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠাই সপ্রমাণ হয়। নারীকে সুকন্যা, সুগৃহিণী ও সুমাতা করিয়া তোলাই স্ত্রীশিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া কেশবচন্দ্র ভিক্টোরিয়া কলেজের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতে অগ্রসর হন। বর্ত্তমানে আবার আমাদের দৃষ্টি শিক্ষা-সংস্কারের দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে, স্ত্রীশিক্ষার ত্রুটি বিচ্যুতিও আজ আমাদিগকে বিদূরিত করিতে হইবে। এই সময় কেশবচন্দ্রের উক্ত আদর্শ আমাদের সম্মুখে রাখা প্রয়োজন।*

২৩ পরিচারিকা—ফাল্গুন ১২৮৯।

* ১৯৪৯, ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে নববিধান সাহিত্য পাঠচক্র কর্ত্তৃক আহূত সভায় পঠিত "কেশবচন্দ্র সেন" প্রবন্ধের একাংশ।

জয়টীকা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

মর্ম্মান্তিক এ আঘাত, তবু উচ্চ শির,
বিভীষিকা পারে নি কো দেখাইতে ভয়,
বিধ্বস্ত, বিভক্ত বঙ্গ, এ কি দুঃসময়,
ছিন্নমস্তা পান করে আপন রুধির।
অগ্নি-পরীক্ষায় আজ হোয়ো না অধীর,
বেদনার মাঝে হবে ভাগ্যের নির্ণয়,
জাতির জীবন-উৎস অচ্ছিন্ন, অক্ষয়
তুমি যে বাঙ্গালী, তুমি বিনিঃশঙ্ক বীর।

কণ্টকে আকীর্ণ পথ—সে তোমার পথ,
প্রজ্বলিত রাখ চির প্রাণবহ্নি-শিখা,
হউক উজ্জ্বলতর দিব্য ভবিষ্যৎ,
মিলাবে ছায়ার মত মিথ্যা বিভীষিকা,
দুর্য্যোগের অন্তে শুভ্র আসিবে শরৎ,
ললাটে অঙ্কিত হবে দীপ্ত জয়টীকা।

এখানে

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

রৌদ্রের গহন দুপুর, উড়ে চলা ক্লান্তপক্ষ চিল,
খোলা মাঠ, বনছায়া, অনাবিল আকাশের নীল—
চেয়ে থাকি শুব্ধ একা, দুরাক্রান্ত মন উদাসীন।
এক দীর্ঘ ক্লান্তি-বলয়ের পথে বহে যায় দিন।
অবারিত দিক দেশ নির্জ্জনতা অগাধ অপার,
এ দিগন্ত অনির্ণীত আকাঙ্ক্ষার ডানা ভাসাবার।
নিঃসীম রাত্রির শান্তি, প্রান্তরের মন্দাক্রান্তা শ্লোক
নিরন্তর ঝরায় এ হৃদয়ের জরার নির্মোক।

ভোরের আলোর শিশু এখানে অবাধ খেলা করে,
কাঁচা-সোনা মাঠের ফসলে তার মুঠি নেয় ভ'রে।
ফেলে যায় চারিদিকে উজ্জ্বল পালক রাশি রাশি—
হেসে উঠে গাছপালা, বাজে মিহি কচিপাতা-বাঁশি।
ফেরে নীল প্রজাপতি প্রতিবেশী রৌদ্রের পাড়ায়।
নিরন্ত রঙের ছবি আঁকে মেঘ আকাশের গায়।
ভোরের আলোর খুশি—গলে পড়ে সোনার সময়,
আকাশের মাঠে মাঠে ছড়ায় কি সুনীল বিস্ময়।

চিঠিপত্র

১। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

পূর্ণিয়া—৬-৩-৪৫

প্রীতিভাজন প্রিয়বর,

···দেখা না থাকলেও সাহিত্যিকরা নিজের জাতের খোঁজ-খবর রাখে, স্বঘর ও স্বগোত্রের কুলীনরা তাদের পরিচিত। তুমি তাদের গৌরবের একজন। তোমার "মজা নদীর" স্রোত বাংলার 'ঘর-ঘর' না হউক, প্রত্যেক গ্রাম ও পল্লী স্পর্শ করে তাদের হৃদয়কে সরস করে' গেছে। মধ্যবিত্তের চেয়ে দুঃখের জীবন অন্নহীন ভিক্ষুকেরও নয়, ইহাই আমার ধারণা ও বেদনা। তুমি তাকে রূপ দিয়েছ, ধন্য হয়েছ। যা দিবার আছে, যথাসাধ্য দিয়ে যাও ভাই।

তুমি এই বার্দ্ধক্যজীর্ণের জীর্ণ ও পতিত ভিটা দেখে এসেছ। এক দিন ঐ বারবাড়ীর (অধুনা দেহত্যাগী) চণ্ডী-মণ্ডপই ছিল আমাদের সাহিত্যকুঞ্জ, বহু সুধীর পদধূলিপূত। সুতরাং কষ্টটা নিরর্থক হবে না ভাই। এক দিন—

হেথা মোর যৌবন-প্রাসাদ—
ছিল লয়ে অফুরন্ত সাধ।

যাক, মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল···

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী,
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২

পূর্ণিয়া—১১-৫-৪৫

প্রিয়বরেষু,

রামপদ ভায়া, দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকা কেবল অপরাধ বাড়াবার জন্য। ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও তা এড়াবার উপায় নেই। গত দু' মাস শরীর সুস্থ নয়। তোমার "শাশ্বত পিপাসা" সম্বন্ধে কিছু লিখতে না পারায় অশান্তি ভোগও তার সঙ্গে ছিল। দ্বিতীয় কথা—বইখানি আসার পর পক্ষাধিক তার পাত্তাই পাইনি, মেয়েদের দখলে গিয়ে পড়েছিল। কেউ ছাড়তে চায় না। পড়তে গিয়ে তার কারণ বুঝলুম, সে যে তাদেরি জীবনী। নিজেদের নূতন করে দেখবার "আয়না" তারা পেয়েছিল।

আমাদের সংসারটা অনেকটা সেকালের মতই আছে। তাই তারা বধূজীবনের প্রত্যেক stage-টি খুঁটিয়ে উপভোগ করেছে। একটা যুগকে, এখন ইতিহাস হিসেবে, জীবন্ত করে দিয়েছ। অথচ আমার মত—সেকালের লোক কোথাও একটু অতিরঞ্জন পায় নি। তাতেই তোমার বাহাদুরী লক্ষ্য করলুম। আজকাল গতযুগের কথা খাঁটি রেখে লেখা যে কত কঠিন, সেটা অনুমান করতে পারি। তুমি নিশ্চয়ই সেকালের সম্ভ্রান্ত বনেদি-বংশের ছেলে, নচেৎ এমন নির্ভুল ছবি আঁকতে পারতে না। এটির মূল্য অনেক। মূল্য ও মর্য্যাদা ওর মধ্যেই সত্য হয়ে থাকবে। তোমার চেষ্টা ও শ্রম সফল ও সার্থক হয়েছে। সাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়েছে।

কল্পনা-প্রসূত উপন্যাস ও গল্প আমরা যথেষ্ট পাই। তারাই আমাদের সাহিত্যকে পুষ্ট করে চলেছে, শিক্ষিত ও শিক্ষিতা-দের ক্ষুধা মেটায়—আনন্দও দেয়। তোমার "শাশ্বত পিপাসা" সত্যের গৌরবও বহন করে। পাঠান্তে আমি বড় আনন্দ পেয়েছি। তুমি নূতন লেখক নও, জনপ্রিয় সাহিত্যিক। শ্রম-সাধ্য হলেও যতটা পার দেশের কথা দিয়ে যেও। নূতন ব্রতী-দের খুঁজে পেটে লেখবার আগ্রহ এখন আসবে না।

আর হাত চলছে না ভাই। এখন ভালবাসা ও শুভাশিস জানাই। সুখে, স্বাস্থ্যে, আনন্দে থাক।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

পূর্ণিয়া—১৬-১০-৪৬

প্রিয়বরেষু,

সর্ব্বাগ্রে আমার ৺বিজয়ার শুভাশিস গ্রহণ কর। সুখে, স্বাস্থ্যে, আনন্দে থাক। যেরূপ দিনকালের মধ্যে দিয়ে চলাফেরা, তাতে আমার শুভেচ্ছাগুলো যেন মুখস্থ কথার মত নিজের কানেই লাগে। প্রকৃত কিন্তু তা নয় ভাই, যাকে ভালবেসেছি, তাকে মঙ্গল ইচ্ছা বাদ দিয়ে ভালবাসি নি। সাহিত্যে নাম রেখে যাবে। তোমার সাধনা ও বিষয়বস্তু সে প্রমাণ দেয়।

আমি ২৫শে বৈশাখের পর থেকে অসুস্থ হই। সে ভাব গেল না। বয়স তো আর সাহায্য করবার মত নাই। তবু তাগাদার জ্বালায় লিখতে হয়। সময় কাটে, কিন্তু শক্তি আর সাহায্য করে না।

তুমি বর্ত্তমান সাহিত্যের গতি সম্বন্ধে জানতে চেয়েছ কিছু ভেবে বা গুছিয়ে বলার সামর্থ্য এখন নেই, চিঠিও অন্যের

সাহায্যে লেখাতে হচ্ছে। তবে একথা মনে হয় যে বিশ্বব্যাপী যে বিরাট বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে আজ আমরা অগ্রসর হচ্ছি তার প্রতিক্রিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই আসবে। আমাদের পরিচিত সমাজ অতিক্রত ভেঙ্গে পড়ছে, আমরা দীর্ঘ দিন ধরে যে শিক্ষা, সংস্কার, বিশ্বাস আহরণ করেছিলাম, তার অনেক কিছুই হয়তো শীঘ্রই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই পরিবর্ত্তনের সময়ে বোধ হয় শিল্প-সাহিত্যের গতিশূন্যতাই স্বাভাবিক— কারণ পুরনো যা, তা খসে পড়ছে, নূতন এখনও আসে নি। এই রকম যুগসন্ধিক্ষণ এসেছিল আমাদের সময়ে, যখন পশ্চিমের আহ্বান আমরা সবে শুনতে সুরু করেছি। তার মধ্যেও ভাঙ্গনের অধ্যায় ছিল—নিষ্ঠার, ধর্ম্মবিশ্বাসের, ব্রাহ্মণ্যচালিত সমাজ-ব্যবস্থার, তবে তা এত ব্যাপক ও বিস্তৃত নয়। সেই পরিবর্ত্তনের পরে আমরা যাঁদের পেয়েছিলাম—রবীন্দ্রনাথই তার শেষ এবং শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই বৈপ্লবিকযুগের অবসানেও দেশে ঐরূপ বিরাট কর্ম্মীদের আবির্ভাব হোক—এই প্রার্থনা করি।

এইবার একটি অন্য কথা বলি।...একটি ভাল Publishing business করতে চায়। বর্ত্তমানে সে স্থানীয় জেলাবোর্ডের হেডক্লার্কের কাজে আছে কিন্তু চাকুরীতে ইচ্ছা না থাকায় এবং বিহারে বাঙালীর চাকুরী-জীবন নানা অসুবিধা এবং বিপৎসঙ্কুল হওয়ার দরুণ তাদের এই প্রচেষ্টা। তারা ইতিমধ্যে বনফুল, বিভূতি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আমার কয়েক জন সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেছে এবং তাঁদের সহযোগিতা এবং ২।১টি বই পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে।...ওদিকে যাওয়ার সুযোগ হলে তোমার সঙ্গে দেখা করবে—তাই জানিয়ে রাখলুম। বর্ত্তমান গোলযোগ একটু কমলেই তাদের কাজ আরম্ভ করার ইচ্ছা। নিজেদের চেষ্টায় যদি করতে পারে—আমার আপত্তি নেই, কারণ আমার বংশে সাহিত্য সংস্রবটা থাকে, এ ইচ্ছা অন্তরে গোপনে থাকাই স্বাভাবিক, নচেৎ আমার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে। যাক্—আমি এ রোগ থেকে মুক্তি পাব কিনা জানি না। আমার নিজের লেখবার সামর্থ্য নেই। বসুমতীতে তোমার লেখা(১) পড়বার ইচ্ছা সত্ত্বেও এখনো পারি নি। একটু ভাল বোধ করলেই পড়বো। সব যেন ভুল হয়ে যাচ্ছে। যাক্ দুঃখ নাই, কেবল মাকে যেন না ভুলি।...

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

(১)। ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস 'জীবন-জল-তরঙ্গ'।

২। শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রীতিভাজনীয়েষু—

শ্রীভীশবাবু, পত্রোত্তরে দেরী হল, আশা করি ইতিমধ্যে কোন অভিযোগ প্রস্তুত হয়ে ওঠে নি। "নিজের কথা" সম্বন্ধে আপনি যেভাবে সঙ্কোচহীন প্রশংসা পাঠিয়েছেন তাতে বাকি অংশ লিখে ফেলবার তাগিদ পাচ্ছি। আপনার মত বুকের পাটা নিয়ে দু'চার জন কিছু আগে এগিয়ে এলে হয়ত সাহিত্যের আসরেই হুকুম বরদার হ'য়ে যেতাম। আরও কি লিখেছি জানার ইচ্ছা দেখছি প্রবল, সুতরাং এখুনি আত্মবিজ্ঞপ্তির সুবিধা কাজে লাগিয়ে দেওয়া ভাল। সাত আটটা বই লেখা হ'য়ে গিয়েছে, ইংরাজী ও বাংলাতে। পাঁচ মিশেলী ব্যাপার— যেমন ছোটগল্প, উপন্যাস ও নাটক। বইগুলি বাজারে এখন চলছে, প্রকাশকের নাম সহ তালিকা অন্যত্র পাবেন।

"নিজের কথা" লেখার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিল্পীকে জনসাধারণের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়া। আত্মজাহির, বক্তব্যের ভিতর জমকে বসলেও, আসল কথা যা বলতে চেয়েছিলাম তা শিল্পীর বাঁচার চেষ্টায় দারুণ সংগ্রাম। এই সূত্রে অনেক কঠোর সত্যকে আপনাদের সামনে ধরতে হয়েছে। গত্যন্তর ছিল না,—কারণ বলছি,...অকস্মাৎ কৃষ্টির আলোচনায় বেরসিকের দরদ যখন উৎকট হয়ে উঠল, নবতম আলোকপ্রাপ্তরা কৃপাপরিবেশনের জন্য নিরীহ শিল্পীদের তাড়া সুরু করলেন। কৃপা আত্মগোপন করল গ্রানিকর স্বার্থের আড়ালে, এবং অনেক শিল্পীও যখন তাড়ার তোড়ে নির্লজ্জের মত, প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক, চালাক হ'য়ে উঠতে লাগল, তখন মিথ্যার কেল্লাকে আক্রমণ না ক'রে পারি নি। ঘটনাটি আত্মরক্ষার্থে বাধ্যতামূলক ব্যাপার। আমার চেষ্টা ছিল প্রমাণ করা তথাকথিত কৃষ্টির নতুন দুর্গ তাসের ঘরের মতই ক্ষণভঙ্গুর। যে শক্তির উপর নির্ভর করে নবদীক্ষিত রসপ্রচারকরা তাঁহাদের আদর্শকে ব্যোমমার্কা (আকাশচুম্বি) করার জন্য উদ্যত হয়ে উঠছেন তা একেবারে ভিত্তিহীন। হুজুগের স্রোতে কৃষ্টির সাধনা কর্ত্তব্যের অঙ্গ হয়ে উঠেছে মাত্র। হুজুগ বা আন্তরিকতাহীন কর্তব্যের প্রতিক্রিয়া অধিকাংশ স্থলেই অনির্ভরশীল; কারণ স্রোতের ধর্ম্ম ভেসে যাওয়া—স্থায়িত্ব নয়। অপরদিকে কৃষ্টির কারবার স্থায়ীকে নিয়ে।

ছবি সম্বন্ধে রস-চেতনাকে তাজা করতে হলে রূপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন আছে। যাকে ভিন্নপ্রকারের সাধনা বললেও অত্যুক্তি হয় না। অস্থায়ী, উড়ন্ত বা ছুটন্ত মত অনুসরণে সাধনা অসম্ভব। "জলদি-চলো-আর্টের" পৃষ্ঠপোষকরা হয়ত যুক্তি টেনে আনবেন এই ব'লে যে রুচি পরিবর্ত্তনশীল; কালের গতির সঙ্গে তাকে চলতে হয়। পুরাতনকে ফেলে

নতুনকে তোয়াজ না ক'রে উপায় নেই। সুতরাং স্থায়িত্বের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এগিয়ে চলার পক্ষে বাধা।

দার্শনিক যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করার সাহস আমার নেই। পরিবর্ত্তন যে অবশ্যম্ভাবী তাও অস্বীকার করি না। তবে পরিবর্ত্তনকে বোঝার অবকাশ যদি না পাওয়া যায় তা হ'লে পার্থক্যের বিচার হয় কেমন ক'রে, কিসের ভরসায়? এবং কোন্ আদর্শের তুলনায় এটিকে বলি অনুকরণীয় এবং অপরটি পরিত্যাজ্য?

আমার বক্তব্য, যে কোন সংস্কার বা রুচি বিশেষ প্রয়োজনে গড়ে ওঠে এবং তার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে রীতিমত লেগে থাকার উপর। যার সার কথা রুচি সংগ্রহ, অর্থাৎ Acquirement of taste, মনোরাজ্যে এই রুচি দখলের জন্ত তোড়জোড় দরকার হয়ে থাকে। জমির চৌহদ্দি ঠিক করতে সময় লাগে। বৃহৎ মামলার ব্যাপার এক কথায় নিষ্পত্তি হবার উপায় নেই। সুতরাং রাতারাতি রসগ্রাহী গড়ে তোলার চেষ্টার উদ্দেশ্য সাধু হলেও সফলতার সম্ভাবনা কম। হুজুগের টানে আমরা গা ভাসিয়ে দিয়েছি; স্রোত চড়ায় না ঠেকা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনকে আশ্রয় ভাবা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক মনে করি না। স্রোতের টানে যা ভেসে যায় তা কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারে; ভাসমান বস্তুর অবলম্বনে কল্পনা অনেক কিছু গড়ে তোলে; কিন্তু সাঁতার না জেনে ভেসে-যাওয়া কল্পনার-সূত্রকে ধরতে গেলে ডুবতে হয়। যাঁরা এই প্রকার আত্মহত্যাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, তাঁদের মন সুস্থ কিনা জানতে হলে মনস্তাত্ত্বিকের উপদেশ বাঞ্ছনীয়।

রসপ্রচারে যে স্রোত অধুনা চলেছে তাকে হুজুগ বলায় অপরাধী মনে করছি না। ছবি নিজগুণে আত্মপ্রতিষ্ঠ; রূপের কাহিনী সে নিজেই বলে। বলার ভাষা আছে যা ধ্বনির মতই সাঙ্কেতিক। সঙ্কেতগুলি নানা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—যা বুঝতে হলে দরদ ও ধৈর্য্যের দরকার হয়ে থাকে। ছবির ভাষা কতকটা বোবার ভাব-অভিব্যক্তির মত। এইখানে ঘনিষ্ঠতার কথা উঠে পড়ে। আমাদের দেশে ছবির ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এখনও হয় নি। যেটুকু পালিশ-করা বোলচাল ছাপার অক্ষরে বার হয় তাও ধার-করা কেতাবি বুলির পুনরাবৃত্তি। বিদেশী প্রোপ্যাগাণ্ডার জোরে ছবি বোঝা একটি ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্ত্তমানে ছবির প্রধান আকর্ষণ দুটি—একটি প্যাঁচাল ও অবোধ্য নক্সা; অপরটি Sentimental appeal। নক্সার আদর্শে দেখি পিকাসো, ম্যাটিসি, গোগেঁ, সীজান ইত্যাদির ডাহা নকল বা উৎকট প্রভাব—এবং Sentiment-এর চাহিদায় থাকে। দেশপ্রেম, ধর্ম্ম, নীতি, দুঃস্থ মানুষের কাহিনী ইত্যাদি। Sentiment-ই যদি রসের প্রধান অঙ্গ হ'য়ে পড়ত, তা হলে কষে কাঁদতে পারলেই আর্টের চরম সার্থকতালাভ হয়ে যেত। দেবতার মূর্ত্তি বা নীতির সমর্থনে শিল্পীরা যাবতীয় উপদেশ লিখলেই পারতেন এবং দেশপ্রীতি প্রকাশের জন্ত কেবল খদ্দরের কাপড় আঁকলেই ছবির বড় কথা বলা হয়ে যেত। সব ক'টিই Sentiment-জড়িত বিষয়বস্তু, কিন্তু কোনটিই ছবির রূপে সার্থকতা আনতে পারে না—ছবির নিজ গুণের অভাব থাকায়। সুতরাং বুঝতে হবে, Sentiment-এর উপরেও এমন জিনিস আছে যার যোগ না থাকলে ছবি নির্ব্বিকার হয়ে যায়।

ভেসে-আসা মতের সমর্থনে, বিশেষ করমায় ফেলা নক্সার অনুকরণকেও রসনিবেদনের শেষ কথা ভাববার উপায় নেই, কারণ এক জনের বলার ভঙ্গী অপরে নকল করলে তাকে হরবোলার তারিফ দেওয়া চলে, তার বেশি কিছু না। শিল্পীর ধর্ম্ম হ'ল রূপকে বুঝে তার গুণ প্রকাশ করা। যে রূপ প্রকাশ হ'ল তা আপন গুণেই সম্পূর্ণ—বাহির থেকে বিশেষণ বর্ষণে তার শ্রী বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। রূপকার যেখানে নক্সা ডিঙিয়ে অতিমাত্রায় ভাবের পিছনে ছুটাছুটি করে সেখানে বুঝতে হবে তার কারিগরিতে গলদ আছে—ছবির সাঙ্কেতিক মালমসলার অভাব ঘটেছে।

এ তো গেল ব্যক্তিগত কথা। এক-আধ জন ধড়িবাজের খপ্পর থেকে ছাড়ান পেলে ভাবা চলে ফাঁড়া কেটে গেল। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের মতো যখন দল পাকাতে আরম্ভ করে, মিটিং করে, কনফারেন্স করে, রেজলিউসন্ পাস হয়, আর্টের আদর্শ তৈয়ারীর জন্ত তখনই হাটের মাঝে হাঁড়ি ফাটে। ঘরোয়া কথা বেরিয়ে আসে। রসের ভাঁড় ফাঁস ক'রে দেয় ফাঁকির তেজারতি। যে রস নিরিবিলিতে তোয়াজ না পেলে জমাট বাঁধতে চায় না, তাকেই মজলিসি আওতায় ঘাঁটালে সার যা থাকে তা সফেন বুদ্বুদ। আমি এদিক দিয়ে ঘোরতর Primitive। রসভোগ একলা না হলে মন মজে না। Conference ক'রে প্রেম আমার কাছে ভয়াল বস্তু। সব সময় তটস্থ হ'য়ে থাকতে হয়—ঐ বুঝি নিল কেড়ে।

আপনি হয়তো ভাবছেন যে লোক কনফারেন্স, মিটিং ইত্যাদিতে সর্দ্দার সেজে থাকে তার মুখে এ কি বাণী! উত্তরে আমার কিছু বলবার আছে। সব খুঁটিয়ে লেখার সময় নেই। প্রথম কারণ, আপনি সম্পাদক মানুষ। ধৈর্য্য মিনিট ধ'রে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়, অধিক মাত্রায় সত্য বেআবরু হয়ে যাবে। ফলে আমি ঘায়েল হতে পারি—এমন অপকর্ম্ম আমি করি না। বলার কথা সংক্ষিপ্ত এই: মিটিং-এ চিৎকার করি স্রেফ্ প্রাণে বেঁচে যাবার জন্ত। আর্টের কথা যা বলি তা Intellectual লড়াই-এর অস্ত্র, অস্ত্ররক্ষার সহায়। Intellectual কসরতে আর্টের বিশ্লেষণ কতকটা চলে, কিন্তু রসভোগ

বা সৃষ্টির সঙ্গে Emotion যোগ না দিলে লড়াই-এর নথিটাই টিকে যায়, আসল উদ্দেশ্য পড়ে মারা। সোজা কথা, মিটিং-গুলো জন্মোৎসবের পরিবর্ত্তে শ্রাদ্ধ-বাসরের আয়োজন। রূপ জন্মাবার আগেই তার Dissection-এর আয়োজন চললে ছুরির শানের আওয়াজ বড় হয়ে ওঠে, কাটে না কিছু।

চতুর্দ্দিকে এখন কেবল আওয়াজ শুনছি। কান ঝালাপালা হয়ে গেল। এইবার একটু জিরুতে চাই।

চিঠিও প্রবন্ধের আকার নিতে বসেছে, সুতরাং থামি।

আশা করি ভাল—ইতি
প্রীতিবদ্ধ
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

শ্রীপ্রীতিশ মিত্রকে লিখিত

যবনিকার অন্তরালে

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

তখনো বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হয় নি। পূর্ব্ববঙ্গের সুদূর প্রান্তে অবস্থিত ফুলপুর গ্রামে সেদিন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব ছিল না।

গ্রামটি হিন্দুপ্রধান। গ্রামে যে কয় ঘর মুসলমানের বাস তাদের অধিকাংশই বাজনদার শ্রেণীর লোক। প্রান্তিক ভাষায় এদের বলে নাগার্চ্চি। হিন্দুদের পালপার্ব্বণ, বিবাহ ইত্যাদিতে বাজনা বাজানোই তখন ছিল এদের প্রধান পেশা।

ধর্ম্ম আলাদা হলেও সুদীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করায় ফুলপুরের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তখন এক মধুর আত্মীয়তা। হিন্দু পরিবারের গিন্নীদের এরা খুড়ী জেঠী মানী বলে সম্বোধন করত—হিন্দুদের পূজাপার্ব্বণে এরা এসে প্রসাদ গ্রহণ করত, সঙ্কীর্ত্তনে ওস্তাদ ঢুলী সোনা মিঞার মিঠা-হাতের খোলের বোল সবাইকে মুগ্ধ করত। বিজয়া-দশমীর দিনে প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর হিন্দুরা যখন ঘরে ফিরত তখন তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ওরাও গাইত,

"মাকে ভাসাইয়া জলে কি লইয়া ফিরিব ঘরে
ছাইড়া যাইতে বিদরে পরাণ গো অভয়া।"

এই নাগার্চ্চিদের মাতব্বর গুলমামুদ। লোকটি যেমন জোয়ান তেমনি অদম্য তার সাহস। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় পা দিলেও মাথার একগাছি চুলেও তার পাক ধরে নি। গায়ের রং মিশ কালো, ছ' ফুট দীর্ঘ পেশী-বহুল সুগঠিত দেহ-খানি তার দু'দণ্ড তাকিয়ে দেখবার মত। মাথার কুচকুচে কালো লম্বা চুল পেছন দিকে খোঁপাবাঁধা—মুখে একমুখ কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি। ভাঁটার মত গোল চোখ দুটো যেন সব সময় জ্বলছে। গুলমামুদ যখন ক্রুদ্ধ হয়ে চোখ পাকিয়ে তাকায় তখন সে দৃষ্টির সামনে অতিবড় বীরপুরুষের হৃদয়ও সঙ্কুচিত হয়ে বিন্দুবৎ হয়ে যায়।

গুলমামুদের দেহে অমিত শক্তি—লাঠিখেলায় অমন ওস্তাদ এতল্লাটে আর নেই, লাঠির কেরামতিতে একা একশ লোকের মহড়া নিতে পারে সে। দাঙ্গা বাধলে লাঠি ঘুরিয়ে সে ভানুমতীর খেল দেখিয়ে দেয়। নিপুণ পক্ষী-শিকারীও বটে গুলমামুদ। বাঁশের ধনু আর মাটি দিয়ে তৈরি ছোট ছোট গুলি এই তার শিকারের সম্বল। এই মাটির গুলি দিয়ে প্রধানত সে বক শিকার করে। গাছের যত উঁচু ডালেই বক বসে থাকুক না কেন গুলমামুদের গুলির আঘাতে সে ঘায়েল হবেই—অব্যর্থ তার লক্ষ্য।

আর ওস্তাদ সে নৌকা বাওয়ায়। এতেও দশ-বিশখানা গাঁয়ে তার জুড়ি নেই। মনসার ভাসান উপলক্ষে যখন গ্রামের হাওরে বাচখেলার প্রতিযোগিতা হয় তখন গুলমামুদ যে নৌকার হাল ধরে বসে সেটির জয় অনিবার্য্য।

গুলমামুদ বিপত্নীক। সংসারে তার একমাত্র বন্ধন ছিল তের বছরের মেয়ে গুণাই। গুণাইর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তার মা মারা যায়। পাছে বিমাতার হাতে মেয়ের অযত্ন হয় সেজন্যে গুলমামুদ আর দ্বিতীয় বার সাদি করে নি। স্ত্রীর অবর্ত্তমানে সে হয়ে উঠল একাধারে গুণাইর বাপ মা দুই। বাপের আদরে মায়ের অভাব গুণাই একদিনের জন্যেও টের পায় নি।

নাগার্চ্চিদের সমাজে খুব অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়। কৈশোরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই গুণাইর বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল, কিন্তু মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারবে না বলে গুলমামুদ সেদিকে গা করলে না।

গুণাই কিন্তু একদিন তাকে চিরতরে ছেড়ে চলে গেল। কি কাল ব্যাধিতে যে তাকে ধরেছিল! একটি মাস রোগে ভুগে বাপের কোলে মাথা রেখে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

গুণাইর মৃত্যুর পর গুলমামুদের কাছে সংসারটা যেন নেহাত ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগল। দুনিয়ায় সে যে কত একা এবার সে তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করলে। যে ঘরে

গুণাই নেই সে ঘরের প্রতি কোনো আকর্ষণই আর তার রইল না। স্থির করলে, ঘরবাড়ী বিক্রী করে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে ফকিরী নিয়ে সে চলে যাবে সাহাজী-বাজারে মাণিক-পীরের আস্তানায়—সেখানে আল্লার নাম নিয়ে সে বাকী জীবন কাটিয়ে দেবে।

গুলমামুদের গৃহত্যাগের সঙ্কল্পের কথা জমিদার অঘোর রায়ের কানে গিয়ে পৌঁছল।

ফুলপুরে দু' ঘর জমিদার—অঘোর রায় আর বিজয় রায়—এঁরা জ্ঞাতি এবং পরস্পরের প্রবল প্রতিপক্ষ। এঁদের মধ্যে শত্রুতা তিন-পুরুষের। জায়গা-জমি ইত্যাদি নিয়ে এদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের অন্ত ছিল না—দুই দলের প্রজাদের মধ্যে লাঠালাঠি মারামারি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

গুলমামুদ আর তার স্বজাতিরা বেশীর ভাগই অঘোর রায়ের প্রজা। মনিবের মানরক্ষা করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে দলবল নিয়ে কতবার যে জান কবুল করে লড়েছে গুল-মামুদ তার আর অন্ত নেই।

মোট কথা শত্রুপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামে গুলমামুদ ছিল অঘোর রায়ের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ। এখন সেই গুলমামুদ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে দৃঢ়সঙ্কল্প একথা শুনে বড় ভাবিত হয়ে পড়লেন অঘোর রায়। তিনি বুড়ো হয়েছেন, ক'দিনই বা আর বাঁচেন তার নিশ্চয়তা নেই। একমাত্র পুত্র সুরেশ্বর এখনো সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। তাঁর অবর্ত্তমানে গুলমামুদের সাহায্য ছাড়া কি সুরেশ্বর জমিদারী রক্ষা করতে পারবে!

অনেক ভাবনা চিন্তার পর গুলমামুদকে ডেকে পাঠালেন অঘোর রায়। গুণাইয়ের মৃত্যুর পর এই প্রথম তাকে দেখলেন তিনি। দেখে একেবারে চমকে উঠলেন। গুলমামুদের চেহারার এ কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন। একটা প্রকাণ্ড বনস্পতির উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেলে তার যে অবস্থা হয় তেমনি হাল হয়েছে গুলমামুদের। এত বড় শক্ত-সমর্থ মানুষটা শোকের ঝড়ে যেন একেবারে ভেঙে পড়েছে। একান্ত সহানুভূতির স্বরে অঘোর রায় বললেন—"মামুদ, এ কি চেহারা হয়েছে তোমার?" এই দরদভরা কথা কয়টি শুনে গুলমামুদ আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলে না। ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়ে একেবারে মেয়েমানুষের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সে। হৃদয়াবেগ একটু শান্ত হলে চোখ মুছে বললে—"আর কইয়েন না কত্তা, গুণাই বেডী আমারে অক্করে মাইরা গেছে। আর কি লইয়া ঘরে থাকুম—আমার আর কেডা আছে।"

গুলমামুদকে কখনো বিচলিত হতে দেখেন নি অঘোর রায়, তার চোখে জল দেখে অবাক হলেন তিনি। বাইরে যে লোকটা দেখতে এত ভীষণ, তার অন্তরের অন্তস্তলে যে এমন অনাবিল স্নেহের অমিয়ধারা লুক্কায়িত ছিল সে সন্ধান তো এতদিন তিনি পান নি। গুলমামুদকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বললেন—"অত উতলা হয়ো না মামুদ। তোমার দুঃখ বুঝি, কিন্তু আমাদের ছেড়ে যেতে দেবো না তোমাকে। আমি বুড়ো হয়েছি, টের পাচ্ছি যে আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাই আমার সুরেশ্বরকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। মনে রেখো অঘোর রায়ের অবর্ত্তমানে তার জমিদারীর মর্য্যাদা রক্ষার দায়িত্ব ষোল আনা তোমারই।"

গুলমামুদ কোনো কথা না বলে অঘোর রায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিলে।

দিনকতক বাদেই সুরেশ্বরের মায়া, জমিদারীর আকর্ষণ সবকিছু ছেড়ে অঘোর রায় পরলোক-যাত্রা করলেন।

অঘোর রায়ের মৃত্যুর পর প্রতিপক্ষ বিজয় রায় সুরেশ্বরকে জব্দ করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সুরেশ্বরকে আগলে দাঁড়াল গুলমামুদ। অঘোর রায়ের শেষ আদেশ তার কাছে আল্লার হুকুমের মত অমোঘ।

কালাশৌচ অতিক্রান্ত হলে পর সুরেশ্বরের বিধবা জননী এখানে সেখানে ছেলের বিয়ের আলাপ চালাতে লাগলেন। শেষ পর্য্যন্ত সম্বন্ধ স্থির হ'ল ধলেশ্বরী নদীর ওপারের রামপুর গ্রামের গোলক দত্তর একমাত্র কন্যা গুণময়ীর সঙ্গে। গোলক দত্ত অবস্থাপন্ন লোক নন, কিন্তু মেয়েটি তাঁর অপরূপ রূপ-লাবণ্যবতী, অত্যন্ত নম্র এবং গৃহকর্ম্মে নিপুণা—ঠিক এমনি একটি মেয়েকেই সুরেশ্বরের জননী পুত্রবধূরূপে কামনা কর ছিলেন।

এদিকে অঘোর রায়ের বাড়ীতে আসন্ন বিবাহের আয়োজন যখন পুরোদমে চলছে তখন খবর পাওয়া গেল এই বিয়েতে ব্যাঘাত জন্মানোর জন্যে বিজয় রায় একেবারে আদাজল খেয়ে লেগে গেছেন। স্থির হয়েছে, বরযাত্রীদলসহ নৌকাযোগে সুরেশ্বর যখন বিয়ে করতে রামপুর রওনা হবে তখন বিজয় রায়ের লাঠিয়ালেরা তাদের উপর চড়াও হয়ে যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করবে।

এই খবর পেয়ে গুলমামুদের চোখ দুটো বাঘের মত জ্বলে উঠল—দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে সুরেশ্বরের পানে তাকিয়ে সে বললে—"পিপড়ার পাখা উঠছে, মরবার লাইগ্যা। দেখি বাবাজী কার ঘাড়ে কয়ডা মাথা, তোমার বিয়া আটকায় কেডা।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে বরযাত্রীদল আর এক নৌকাভর্ত্তি লাঠিয়াল-সহ সুরেশ্বর বিয়ে করতে রওনা হ'ল—লাঠিয়ালদের মধ্যে হিন্দুও আছে মুসলমানও আছে। সকলেই তারা গুলমামুদের শাগরেদ।

নৌকা ছাড়লে পর গুলমামুদ হুঙ্কার ছেড়ে বললে—"হুনরে ওস্তাজের(১) চেলারা, ইবলিসের বাচ্চারা যদি হাঙ্গা...

(১) ওস্তাদ

করত আয় ত হালারার হাড্ডিত বিয়ার বাজনা বাজাইয়া দিবে।"

রূপমতী নদী উজিয়ে নৌকাগুলো রামপুরের অভিমুখে এগুতে লাগল—লাঠিয়ালেরা নিজ নিজ লাঠি দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে তৈরি হয়ে রইল। কিন্তু রাস্তায় কোনো গোলমাল হ'ল না। যথা সময়ে রামপুরে বিয়েবাড়ীর ঘাটে গিয়ে নৌকাগুলো ভিড়ল। বরপক্ষীয়দের অভ্যর্থনা করবার জন্যে নদীর ঘাটে যারা এসেছিল লাঠিয়ালদের দেখে তারা তো হকচকিয়ে গেল—গুলমামুদ সবাইকে আশ্বস্ত করলে।

বিয়ের পর কনেকে নিয়ে বরপক্ষ নৌকাযোগে নিজেদের গাঁয়ে ফিরছে। গুলমামুদ আছে কনের নৌকায়।

পাশাপাশি ছয়-সাতখানা নৌকা চলেছে ধলেশ্বরী নদীর বুকের উপর দিয়ে। আকাশ থেকে সূর্য্যদেব আগুনের হল্‌কা বর্ষণ করছেন—সূর্য্যের আলো নদীর জলে প্রতিফলিত হয়ে গলানো রূপার মত ঝকঝক করছে—নদী-পরপারের গ্রাম-তরুশ্রেণী যেন খর রৌদ্রদাহে মূর্চ্ছাতুর। নদীর বুকে ছোট ছোট ঢেউ উঠেছে—সেগুলো এসে অতি মৃদুভাবে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আঘাত করছে নৌকার গায়ে—সবকিছুতে মিলে ভারি একটা উদাস-করুণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

কিশোরী বধূ নৌকায় উঠে অবধি সেই যে কান্না সুরু করেছিল তার আর বিরাম নেই। একেবারে ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদছে—তার বাঁধনহারা চোখের জলে ধলেশ্বরীতে ঢল নামবে বুঝি।

মেয়েটির আকুল ক্রন্দন গুলমামুদের অন্তর স্পর্শ করল। বুকের ভিতরটা তার গভীর ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। তার গুণাই বেঁচে থাকলে আজ ঠিক এত বড়টিই হ'ত—সেও তার বুকখানা খালি করে দিয়ে এমনিভাবে কাঁদতে কাঁদতে স্বামীর ঘর করতে চলে যেত।

নববধূকে সম্বোধন করে গুলমামুদ বললে—"ও মাই, ও গোলক দত্তর বেডী, আমি তর বুড়া ছাওয়াল, আমারে তর লজ্জা কিয়ের। সুইরা বাজানের ঘরখান খালি পইড়া রইছে, তুই গিয়া ঘরখান পরকাশ করবি গো মাই।"

গুলমামুদের দরদভরা কথাগুলো যেন নববধূর দুঃখাভিতপ্ত মনে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দিলে। দীর্ঘ ঘোমটার আড়াল থেকে সে গুলমামুদকে ভালো করে দেখে নিলে। কি রুক্ষ কঠোর ভীষণ মূর্ত্তি—চোখের পানে তাকালে বুকের ভেতরটা পর্য্যন্ত যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে ওঠে। এই পরুষপ্রকৃতি বৃদ্ধের বুকের গহনতলে যে এত দরদ, এত স্নেহ কেমন করে লুকিয়ে আছে কিশোরী বধূ তা বুঝতে পারে না।

একটু চুপ করে থেকে গুলমামুদ বড় করুণ সুরে বলতে লাগল, "তর নাম বুলে গুণমাই! আমারও একটা মাইয়া আছিল গো মাই, তাইর নাম গুণাই। আইজ বাইচ্যা থাকলে তর বয়সীই হইত, তর লাকান* কাচা হলদির পারা রঙ আছিল আমার মাইয়াডার। আইজ থেইক্যা তিন বছর আগে রূপসী খালের পাড়ে নিজের হাতে বেডীরে মাডী দিছি। তুই ত কয়দিন পরে আবার তর বাপের কাছে যাইতে পারবি, কিন্তু আমার গুণাই ত আর আমার কাছে আইব না।" বলতে বলতে গুলমামুদের চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল, কঠিন কুৎসিত কালো মুখে নামল বেদনার একটা স্নিগ্ধ-মেদুর ছায়া।

বধূ সদ্য পিতৃগৃহ ছেড়ে এসেছে। যে বাপ নিজের এক-মাত্র মেয়েকে এ জীবনে আর বুকে ফিরে পাবে না তার অন্তর্গূঢ় বেদনা সরাসরি তার একেবারে মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত গিয়ে স্পর্শ করল—এই কন্যাহারা বৃদ্ধের জন্যে তার বুকে জাগল অপরিসীম মমতা।

কিছুক্ষণ পরে গুলমামুদ অত্যন্ত স্নেহমাখা সুরে বললে, "মাই গো, তরে আমি গুণাই মাই বইল্যা ডাকুম—তুই আমার মাই, আর আমি তর বাপ গোলক মিঞা।" বলে নিজের রসিকতায় উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল—সে হাসি এই ভীষণদর্শন লোকটির শিশুর মত সরল অন্তরটিকে যেন গুণময়ীর চোখের সামনে পরিপূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করে দিলে।

গুণাইয়ের মৃত্যুর পর গুলমামুদের বুকের যে স্থানটা খালি হয়েছিল এতকাল আর তা কিছুতেই পূর্ণ হয় নি। একটা বিরাট শূন্যতাকে বুকের ভেতরে সে বহন করছিল অনুক্ষণ। আজ সে এই মেয়েটির মধ্যে তার হারানো গুণাইয়ের প্রতিচ্ছবিই দেখতে পেলে—তার মনে হ'ল দীর্ঘ তিন বৎসর পরে গুণাই-ই আবার নূতন নামে, নূতন রূপে তার কাছে ফিরে এসেছে। এই মেয়েটিকে 'মাই' ডেকে অন্তর তার যেন এক অনির্ব্বচনীয় শান্তিতে ভরে উঠল।

স্নেহ অন্ধ, তার কাছে জাতিভেদ নেই—ধর্ম্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-গত পার্থক্য নেই—বিধাতা সংসারে কোথায় যে কার জন্যে মায়ার ফাঁদ পেতে রেখেছেন তা কে জানে?...

সন্ধ্যা নাগাদ নৌকাগুলো এসে ভিড়ল ফুলপুরে নদীর ঘাটে। বরকন্যা নৌকা থেকে তীরে অবতরণ করলে পর তাদের পেছনে কাঁসি বাজাতে বাজাতে নামল গুলমামুদ আর লাঠিয়ালের দল। গুলমামুদের খুশির আর অন্ত নেই—বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাচতে নাচতে সে বাজাচ্ছে কাঁসি আর তালে তালে লাঠিয়ালদের লাঠিতে লাঠিতে ঠোকাঠুকি হয়ে হচ্ছে ঠকাঠক আওয়াজ।

বরকন্যা পাল্কীতে বসলে পর লাঠিয়ালেরা চার দিক দিয়ে সেটিকে ঘিরে দাঁড়াল আর পাল্কীর সামনে দাঁড়িয়ে গুল-

---

* মত

মামুদ আবার সুরু করলে সনৃত্য বাজনা। বেয়ারারা তালে তালে পা ফেলে চলতে লাগল পাল্কী কাঁধে।

তরুশ্রেণীর মাথার উপর দিয়ে অষ্টমীর খণ্ড চাঁদ আকাশে উঠেছে। পল্লীর পথ-ঘাট মাঠ-বন যেন রুপালি জ্যোৎস্না-ধারায় ভেসে যাচ্ছে। ছেলে-বুড়ো সবাই এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে পথের পাশে—শুধু বিজয় রায়ের পক্ষের কারও টিকি দেখা যাচ্ছে না।

জনতা দেখে গুলমামুদের উৎসাহ হয়ে উঠল উদ্দাম—তাণ্ডব নৃত্যে মেতে উঠল বুড়ো—তার দীর্ঘ কেশ আর দাড়ি উড়তে লাগল হাওয়ায়—মুখে তার কেল্লা মার দিয়া এই ভাব।

ঘরকন্যা বাড়ীতে পৌছলে এয়োস্ত্রীরা এসে যথারীতি তাদের বরণ করলে। গুলমামুদ বাজনা থামিয়ে সুরেশ্বরের মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললে—"বুইন দিদি গো, দুগ্‌গা পরৃতিমা লইয়া আইলাম রামপুর থেইক্যা। বেডী খালি তর মাইয়া না, আমারও মাইয়া। তিন বছর পরে আমার গুণাইরে আবার ফিরা পাইলাম। বাপের নাম বুলে গোলক দত্ত—আমিই ত বেডীর বাপ, নাম ত আমার গুলমামুদ না—গোলক মিঞা।' আবেগে কেঁপে উঠে বুড়োর গলা—দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দু'ফোঁটা অশ্রু।

কন্যাবিয়োগবিধুর বৃদ্ধের নিগূঢ় মর্ম্মবেদনা বিধবার মনকে স্পর্শ করে, তাঁর বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে ওঠে।...

সুরেশ্বরের বিয়ের পর দেখতে দেখতে বছর গড়িয়ে গেল, ইতিমধ্যে ঘটল এক বিপর্য্যয়। তিন দিনের জ্বরে সুরেশ্বরের মা স্বামীর অনুগামিনী হলেন। তরুণী বধূ গুণময়ী হ'ল নূতন সংসারে গৃহিণীর পদে প্রতিষ্ঠিত।

গুণাইয়ের মৃত্যুর পর গুলমামুদ কেমন যেন দেওয়ানার মত হয়ে গিয়েছিল—সুরেশ্বরের সংসারে সে কাজকর্ম্ম করত বটে, কিন্তু তা নেহাত কর্ত্তব্যের খাতিরে—কোনকিছুতে তার আকর্ষণ ছিল না।

কিন্তু গুণময়ীর প্রতি কি স্নেহ যে জাগল বুড়োর মনে—ঘর তার তেমনি খালিই রইল বটে, কিন্তু বুকটা যেন তার ভরে উঠল। গুণময়ীর কল্যাণহস্তের সেবাযত্ন দিয়ে গড়া সংসার যেন তাকে শতপাকে জড়িয়ে ধরল—সাধ্য কি তার এ আকর্ষণ ছিন্ন করে অন্যত্র যায়!

ধর্ম্ম আলাদা হলেও গুলমামুদ হল গুণময়ীর ধর্ম্মের বাপ। বাইরের ধর্ম্ম রচনা করে মানুষের মধ্যে বিরাট ব্যবধান—অন্তরের ধর্ম্ম মানুষকে পরস্পরের কাছে টেনে নিয়ে আসে—স্থাপন করে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের গভীর যোগসূত্র।

জীবন-সায়াহ্নে গুলমামুদের হ'ল বাৎসল্য-রসের এক নূতন অভিজ্ঞতা। গুণাইয়ের মৃত্যুর পর জীবন তার নিকট হয়ে গিয়েছিল উদ্দেশ্যহীন, নিরর্থক—এখন যেন সে বেঁচে থাকার নূতন অর্থ খুঁজে পেলে

ওদিকে কিন্তু অলক্ষ্যে ফুলপুরের বুকের উপর চরম অনর্থ-পাতের পটভূমিকা তৈরি হতে লাগল। গ্রামটি বর্দ্ধিষ্ণু। থানা ডাক্তারখানা সব-রেজেষ্ট্রি আপিস সবকিছুই এখানে আছে। এতকাল দারোগা ডাক্তার সব রেজিষ্ট্রার সবই ছিল হিন্দু, কিন্তু সম্প্রতি বাইরে থেকে দু'এক জন শিক্ষিত মুসলমান এসব পদে নিযুক্ত হয়ে এখানে এলেন—তারা নিয়ে এলেন ভ্রান্ত, বিকৃত আদর্শ। গ্রামের মুসলমানদের মধ্যে তাঁরা হিন্দু-বিদ্বেষের বীজ ছড়াতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে তাঁদের অপপ্রচারের প্রতিক্রিয়া সুরু হয়—মুসলমানদের মনে ক্রমে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, হিন্দুরা তাদের দুশ্‌মন।

এমনিভাবে শুধু ফুলপুরে নয়, সারা বাংলার পল্লীতে পল্লীতে মুসলমানদের মনে হিন্দুবিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে থাকে।

তারপর কালচক্রের আবর্ত্তনে বাংলাদেশ একদিন হ'ল দ্বিধাবিভক্ত। বিষবৃক্ষের বীজ পূর্ব্বেই উপ্ত হয়ে ছিল—এবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়ে তা অঙ্কুরিত হয়ে পূর্ব্ববঙ্গের নিভৃত পল্লী-সমূহের আকাশ-বাতাসকে পর্য্যন্ত কলুষিত করে তুলল।

এ বিদ্বেষের বিষবাষ্পের ছোঁয়াচ এসে পূর্ণমাত্রায় লাগল ফুলপুরের বুকে—যত দিন যায় মুসলমানদের মনে হিন্দুদের উপর একটা অকারণ আক্রোশ ততই বাড়তে থাকে। ক্রমে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান হয়ে উঠে দুরতিক্রম্য।

এত দিন পরে এল ক্ষুদ্র ফুলপুর গ্রামের অতি সাধারণ একঘেয়ে ইতিহাসে পটপরিবর্ত্তনের পালা। পল্লীটিতে লাগল কঠোর দারিদ্র্যের স্পর্শ—এর স্বচ্ছন্দ, শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা হ'ল ব্যাহত। হিন্দু জমিদারের আওতায় এতকাল পুষ্ট হচ্ছিল হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের প্রজারা। আজ গাঁয়ের সকল মুসলমান মনে মনে জমিদার সুরেশ্বর রায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে—তাদের শেখানো হয়েছে কাফেরের গোলামী করা 'গোনা'।

অতিক্রত সুরেশ্বরের জমিদারীতে ভাঙন ধরে গেল। পর পর দু'বৎসর অজন্মা—খাজনা আদায় এক রকম বন্ধ। তার উপর মুসলমান প্রজাদের মধ্যে একটা দারুণ অসন্তোষ ক্রমবর্দ্ধমান। সবকিছুতে মিলে সুরেশ্বরের নিদারুণ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সুচনা দেখা দিলে।

ক্রমে মধুভাণ্ডার শূন্য দেখে আত্মীয়স্বজনেরা তাকে ছেড়ে চলে যেতে লাগল, দাসদাসীদের দিতে হ'ল বিদায়। যে বাড়ী বহুজনের কোলাহলে সকল সময় গম গম করত সেখানে এখন বিরাজ করতে লাগল বিরাট শূন্যতা। সেই শূন্য-পুরীতে স্ত্রীকে নিয়ে সুরেশ্বর নিদারুণ চরম অশান্তি ও উদ্বেগের মধ্যে বাস করতে লাগল।

আত্মীয়স্বজন সবাই সুরেশ্বরকে পরিত্যাগ করলে বটে,

কিন্তু করলে না শুধু একজন। সে গুণময়ীর ধর্ম্মের বাপ গুলমামুদ। এই দুর্দ্দিনেই তো তার ইমানদারির চরম পরীক্ষা। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের চেয়ে অন্তরের ধর্ম্ম যে ঢের বড় বাৎসল্যরসের ভেতর দিয়ে সেই সার সত্যের উপলব্ধি তার হয়েছে। অঘোর রায় সুরেশ্বরের সকল দায়িত্ব তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। সে জানে এই দায়িত্ব প্রতিপালন করার চেয়ে বড় ধর্ম্ম তার কাছে আর কিছু নেই—তাই ধর্ম্মের নামে তাকে ক্ষেপিয়ে তোলা তার স্বজাতিদের পক্ষে সম্ভবপর হ'ল না।

যে বিদ্বেষের বহ্নি দীর্ঘ দু' বছর ধরে সারা পূর্ব্ববঙ্গে ধূমায়িত হচ্ছিল হঠাৎ তা রাজধানীতে পূর্ণতেজে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে সে আগুন ছড়িয়ে পড়ল দেশের সর্ব্বত্র। নির্ব্বিচারে চলল হত্যা, লুণ্ঠন আর নারীধর্ষণ। অসহায় নরনারীর আর্ত্ত ক্রন্দনে মুখরিত হয়ে উঠল পূর্ব্ব-বাংলার আকাশ-বাতাস। ঘরে আগুন লাগলে লোকে যেমন করে পালায় তেমনি করে অসহায় হিন্দু নর-নারী পিতৃ-পিতামহের পদরেণুকণাপূত বাস্তুভিটা ছেড়ে যেদিকে দু' চোখ যায় পালিয়ে যেতে লাগল।

রাজধানী থেকে বহুদূরে অবস্থিত ফুলপুর গ্রামেও যথাসময়ে হিন্দুনিধন এবং হিন্দুবিতাড়নের খবর এসে পৌঁছায়—ফলে গ্রামের মুসলমানদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার সঞ্চার হয়। তার উপর বাইরে থেকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের মুসলমানেরা দল বেঁধে ফুলপুরে এসে স্থানীয় মুসলমানদের উস্কানি দিতে থাকে। মহা দুর্দ্দৈবের পূর্ব্বাভাস পেয়ে গুলমামুদ তার স্বজাতিদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে সবাইকে বলে বেড়ায়—"ফুলপুরে হিন্দুমুসলমানে মিল্যামিশ্যা আমরা বেহেশতে আছলাম ভাই, গ্রামডারে দোজখ* বানাইও না।" কিন্তু আজ আর সেদিন নেই যখন ফুলপুরের সকল মুসলমান গুলমামুদের কথায় উঠত বসত, আজ তাদের নূতন মাতব্বর, নূতন নীতি—কাজেই তার কথা অরণ্যরোদনে পর্য্যবসিত হয়।

গ্রামটিতে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করতে লাগল। এ যেন আসন্ন প্রলয়-ঝটিকার অগ্রসূচনা।

লক্ষণ দেখে মনে হ'ল অকস্মাৎ যে-কোনো মুহূর্ত্তে এই নিভৃত শান্ত পল্লীর বুকে প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে বিদ্বেষের কালানল—সেই দাবাগ্নিশিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এতকালের হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির বন্ধন।

ফুলপুরের আকাশ-বাতাস যেন শত শত কালনাগিনীর উষ্ণ নিশ্বাসে বিষাক্ত হয়ে ওঠে। প্রতিদিন বাইরে থেকে দলে দলে মুসলমানেরা এসে জব্বার মিঞার বাড়ীতে জমায়েৎ হয়—সেখানে চলে হিন্দু উৎসাদনের সলাপরামর্শ। সেখানকার ছিঁটেফোঁটা খবর গিয়ে হিন্দুপল্লীতে পৌঁছায়। আতঙ্কে কেউ ঘরের বার হয় না—হিন্দুপল্লীর পথেঘাটে বিরাজ করে শ্মশানের ভয়াবহ নিস্তব্ধতা—পল্লীর বুকে রাত্রি নামে দুঃস্বপ্নের মত—রাত্রির আকাশ বিদীর্ণ হয় হিংসায় উন্মত্ত মুসলমানদের আল্লা হো আকবর ধ্বনিতে। সে সর্ব্বনাশা গর্জ্জন শুনে স্বামীর বক্ষলগ্ন হিন্দু-কুলবধূরা আতঙ্কে কেঁপে উঠে।

প্রতি রাত্রে এ পৈশাচিক উল্লাসধ্বনি এক বৃদ্ধ মুসলমানের বুকে এসে শেলসম বাজে—সে গুণময়ীর ধর্ম্মের বাপ গুলমামুদ—গভীর রাত্রে ধলেশ্বরী নদীর তীরস্থ তার নিভৃত কুটীরের দাওয়ায় বসে ঊর্দ্ধে আকাশের পানে তাকিয়ে সে আকুল কণ্ঠে চীৎকার করে উঠে—"আল্লা এ তোমার কি মরজি।"

গুলমামুদকে দলে টানতে না পেরে তার জাতভায়েরা সবাই তার ওপর খাপ্পা হয়ে ওঠে। শেষে এক দিন সন্ধ্যার পরে আব্দুল জব্বার, গফুর মিঞা, জনাব আলি প্রভৃতি কয়েক জন তার নিভৃত কুটীরটিতে গিয়ে হাজির হ'ল। কিছুমাত্র ভূমিকা না করে আব্দুল জব্বার বললে—"মামুদ ভাই, তোমার আপত্য আর আমরা হুনমু না—দুশমনগুলাইনরে আইজই কোতল করন লাগব। আইজ আওরাইল, ছিরিঘর আর বেণীপাড়া থেইক্যা দুইশ লাইঠ্যাল* আইয়া মতি মিঞার বাড়ীত জমায়েৎ হইছে। মামুদ মিঞার লাঠির জোরডা আইজ আবার দেখাইতে হইব। বুঝলা মামুদ ভাই, তোমার লাঠি গাছডা লইয়া রাইত চাইর ডণ্ডের পরে মতি মিঞার বাড়ীতে গিয়া আমরার লগে মিলাত হইবা।...তার পরের তালডা তো বুঝতায়অই পার। পয়লা লইতে হইব সুরেশ্বর রায়ের মাথাডা। অঘোর রায়ের ছাইলা—ইডা হইছে তোমার গিয়া জাত কেউডের বাচ্চা।"...

গফুর মিঞার বয়স অল্প, সবে গোঁফের রেখা উঠেছে। আবদুল জব্বারের কথা শেষ হলে সে একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললে—"সুরেশ্বর রায়ের আওরৎ জবর খুবছুরৎ—আমরায় মামুদ চাচারে বুলে বাপজান ডাকে, বুঝলা চাচা তোমায় পুরীরে† ধইরা আন্তা আমার লগে নিকা দিবা।"

গফুরের কথা শুনে সবাই উৎকট উল্লাসে অট্টহাস্য করে ওঠে। কিন্তু তার কথাগুলো গুলমামুদের গায়ে যেন লঙ্কা-বাটা লাগিয়ে দেয়—রাগে তার সমস্ত শরীর রি রি করতে থাকে। ইচ্ছা হয় লাঠির এক বাড়িতে ঐ ডেপো ছোকরায় মাথাটা একেবারে গুঁড়ো করে দেয়। কিন্তু সে মুখে কিছু বলে না—মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গভীর ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে যায়।

তাকে চুপচাপ দেখে জব্বার মিঞা হঠাৎ বাজখাঁই গলায় বলে উঠে—"মাইয়ার কথা হুইন্যা যে বড় ভাবনায় ডুইব্যা গেলা মিঞা। মাইয়া ফাইয়া বুঝি না, হিন্দুরা আমরার দুশমন।

* নরক

* লাঠিয়াল † মেয়ে

কাফেরের মাইয়ারে আল্লা যদি গফুরের লগে নিকা দেও তৈলে* আল্লার দোয়া হইব। থাউক, কথা বাড়াইয়া আর কাম† নাই। মোদ্দা কথা আইজ রাইত যদি আমরার লগে না যাও তৈলে বুঝুম হিন্দুরার মত তুমিও আমরার দুশমন—আর ইডা হাছা‡ জানবা যে ফুলপুরে হিন্দুই হউক আর নিজেরার জাতভাই-ই হউক্—কোন্ দুশমনরে আমরা জিতা রাখুম না।···

কথা শেষ করে সে গুলমামুদের পানে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালে। গুলমামুদ দেখলে চোখ দুটো যেন তার হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলছে আর একটা পৈশাচিক উল্লাসে বিশ্রী মুখখানা বিকটতর হয়ে উঠেছে।

সকলে চলে গেলে গুলমামুদ ঘরের দাওয়া ছেড়ে উঠানে এসে দাঁড়াল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। চন্দ্র-তারা-লুপ্ত অন্ধকার আকাশের পানে তাকিয়ে গুলমামুদ আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করে বলে উঠল—"আল্লা বড় আন্ধাইর বান্দারে পথ দেখাও।"

এত বড় সঙ্কট-মুহূর্ত্ত তার পঞ্চাশ বছরের জীবনে আর কখনো আসে নি। কি সাংঘাতিক ইঙ্গিতই না এরা করে গেল। শুধু সুরেশ্বরকে খুন করেই এদের তৃপ্তি হবে না—এরা চায় তার গুনমাই মাকে ভোগ করতে আর সেই পাপ-কার্য্যে তাকেই তাদের সহায় হতে হবে! 'তোবা' 'তোবা'—এমন কথা কানে শুনলেও যে গোনা হয়।

ছয়-সাত বছর আগে নববধূ গুণময়ীকে যেদিন গুল মামুদ রামপুর থেকে নৌকাযোগে ফুলপুরে নিয়ে আসে সেদিনকার তার অশ্রুসিক্ত মুখচ্ছবি হঠাৎ বুড়োর চোখের সামনে ভেসে উঠল; কিন্তু কি আশ্চর্য্য—গুণময়ী দেখতে দেখতে যেন গুণাইয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল। গুলমামুদ স্পষ্ট শুনতে পেলে গুণাই যেন বলছে—"বাজান§, ওরা আমারে কাইড়া নিত আইছে—তুমি আমারে বাঁচাও।"

মৃত্যুশয্যায় ঐ এক বুলি ছিল গুণাইয়ের। সারাক্ষণ সে শুধু ঐ এক প্রলাপোক্তিই করত।

গুলমামুদ ভাবে, গুণাইয়ের মৃত্যুর পর যে মেয়েটি তার কন্যার অভাব পূর্ণ করে রেখেছে তাকে আজ শয়তানেরা ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায়—তাকে কি সে রক্ষা করবে না?···

কিন্তু আরেক দিকে জীবনের মায়া। যদি জাতভায়েদের কথামত কাজ না করে তা হলে তার পরিণাম কি সে ভালো করেই জানে।···কঠোর সমস্যা—নিজের প্রাণ না মেয়ের মান কোন্‌টা বড়—বহুক্ষণ ধরে এই কথাটাই সে মনে মনে তোলপাড় করতে লাগল।

অনেকক্ষণ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মুখের রেখাগুলি কঠিন হয়ে উঠল—চোখে মুখে ফুটে উঠল দৃঢ় সঙ্কল্পের আভাস—কর্ত্তব্য স্থির করে নিয়েছে গুলমামুদ।

* তা হলে † কাজ ‡ সত্য § বাবা

ঘরের ভেতর ঢুকে সে তাকের উপর থেকে তার সারা-জীবনের সাথী লাঠিগাছটা পেড়ে আনলে। লাঠিটার তৈল-নিষিক্ত মসৃণ গাত্রে একবার পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে নিলে, তারপর ঘরের এক কোণ থেকে রামদাখানা বের করে তার ধার পরখ করে কোমরে বেঁধে নিলে। অবশেষে দৃঢ় পদক্ষেপে পথে বেরিয়ে পড়ল—খালি ঘর তার খোলাই পড়ে রইল।

গুলমামুদের বাড়ীটা গ্রামের উত্তর প্রান্ত-সীমায় একটা উঁচুমত জায়গায় লোকবসতি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। বাড়ীর পেছন দিক থেকে সুরু হয়েছে প্রকাণ্ড বাঁশঝাড়। গায়ে গায়ে লাগাও সরল সমুন্নত সুদীর্ঘ বাঁশগাছগুলো একটা রহস্যময় রোমাঞ্চকর এবং ভীতিজনক আবেষ্টন সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে। দুধারে ঘনসন্নিবিষ্ট বহুদূরপ্রসারিত বাঁশবন—মাঝখান দিয়ে একটা গড়ানে সুঁড়ি পথ এঁকেবেঁকে রায়পাড়ার দিকে চলে গেছে—রাস্তাটি যেন বনতলশায়ী একটি অতিকায় সরীসৃপ।

এই বাঁশবনকে গাঁয়ের লোকেরা বলে হাছন ফকিরের বাঁশঝাড়। বহুকাল আগে এই বাঁশবনের ভেতর নাকি ছিল এক ফকিরের দরগা। নাম তাঁর হাছন ফকির। তাঁর উপর হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেদেরই ছিল সমান শ্রদ্ধা। মুসলমানেরা তাঁর দরগায় সিন্নি দিত, আর হিন্দুরা করত মানত। আজ সে ফকির ইহলোকে নেই—সে দরগার চিহ্ন-মাত্রও নেই।

এখন এই বনের ভেতরে দিনমানেই বিরাজ করে আবছা অন্ধকার, অগণিত বিষাক্ত সরীসৃপ এর লতাগুল্মের অন্তরালে কিলবিল করে ঘুরে বেড়ায়—রাত্রে নিতান্ত দুঃসাহসী ছাড়া কেউ এই ভয়াবহ বনপথ দিয়ে চলাফেরা করে না।

এই বাঁশবনের ভেতরকার জমাটবাঁধা অন্ধকারের স্তূপকে যেন দু'হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে, সন্তর্পণ পদক্ষেপে অকুতোভয়ে এগিয়ে চলেছে গুলমামুদ। এই তমিস্র অরণ্যে তার সঞ্চরণশীল নিকষ-কালো মূর্ত্তিখানি যেন এক খণ্ড চলমান অন্ধকারের স্তূপ। বনের ভেতরে কি সুগভীর নৈঃশব্দ্য! মাঝে মাঝে রাতজাগা পাখীর কর্কশ কণ্ঠস্বর সে নিস্তব্ধতাকে ভগ্ন করছে। গুলমামুদের মনে হচ্ছে যেন গ্রামের হিন্দু মুসলমানকে একদা যিনি সুদৃঢ় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন সেই হাছন ফকিরের আত্মা যেন আসন্ন ধ্বংসলীলার আভাস পেয়ে বেদনায় ফরিয়াদ করে উঠছে।

বাঁশবন অতিক্রম করে গুলমামুদ ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা ধরে অবশেষে সুরেশ্বরের বাড়ীর পেছন দিককার পানা-পুকুরের পাড়ে আমবাগানে এসে পৌঁছল।

পুকুরের দক্ষিণ পাড় দিয়ে সুরেশ্বরের বাড়ীর পেছন দিক-কার রাস্তা। কিন্তু সে অনেকটা ঘুরপথ। ওপথে সুরেশ্বরে

বাড়ীতে পৌঁছুতে তার বেশ কিছুক্ষণ লাগবে, কিন্তু অত সময় গুলমামুদের নেই।

কালবিলম্ব না করে গুলমামুদ ঝপাং করে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার পর ডুবসাঁতার কেটে ওপারে পুকুর-ঘাটে গিয়ে উঠল এবং বাড়ীর পিছদুয়ারের রাস্তা দিয়ে টিপিটিপি চলে বড় ঘরের পেছনে হাজির হয়ে দরজায় মৃদু ভাবে টোকা মেরে ডাকলে—"সুইরা বাবাজী, চট কইরা দরজা খুল।"

প্রকাণ্ড বাড়ী। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। ঘরের ভেতরে ম্লান দীপালোকে পাশাপাশি বসে সুরেশ্বর আর গুণময়ী। আজ কয়দিন ধরে রাত্রে তাদের চোখে ঘুম নেই। চরম বিপদ যে নিশ্চিত এবং তার স্বরূপ কি একথা তারা জানে—সে বিপদ কখন ঘাড়ে এসে পড়বে তাই তারা ভাবছিল।

আসল বিপদের চেয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে এই যে চরম বিপদের আশঙ্কা সেইটেই সহস্র গুণ বেশী মারাত্মক।

দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই প্রথমে চমকে উঠেছিল। একটু বাদে সুরেশ্বর বললে—"মনে হচ্ছে যেন মামুদ কাকার গলা···" একটু সাহস সঞ্চয় করে বললে—"কে মামুদ কাকা? অত রাত্রে।" "হয় বাবাজী আমি। কথা পরে কইয়ো—আগে ত দরজা খুল।"

সুরেশ্বর উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে গুল-মামুদ। কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! দীর্ঘ ছয় ফুট দেহ যেন একটা প্রচণ্ড উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। চোখে একটা অস্বাভাবিক দৃষ্টি—কষ্টিপাথরের মত কালো কঠিন মুখের প্রতিটি রেখায় কি যেন একটা দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের আভাস। দীর্ঘ কেশ আর দাঁড়ি-গোঁফ বেয়ে জল ঝরছে—সারা গায়ে লেপ্টে রয়েছে পুকুরের পানা—এক হাতে তার লাঠি, আর এক হাতে তীক্ষ্ণধার রামদা।

সাক্ষাৎ যমদূতকে সামনে দেখলেও বোধ করি, সুরেশ্বর ও গুণময়ী এত ঘাবড়ে যেত না···চরম দুর্ভাগ্য যেন বীভৎস বিকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে তাদের একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। গুণময়ী একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল। সুরেশ্বর তাকে আগলে গুলমামুদের সামনে দাঁড়িয়ে বললে—"মামুদ কাকা, শেষ পর্য্যন্ত তুমিই এলে আমাদের সর্ব্বনাশ করতে। আমাকে মারো কাটো, কিন্তু তোমার আল্লার দোহাই, একে তুমি মেয়ে বলে ডেকেছিলে এর ইজ্জৎ নষ্ট করো না।"

গুলমামুদের চেহারা মুহূর্ত্তের মধ্যে বদলে গেল—সে যেন হয়ে দাঁড়াল সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। লাঠিগাছটা আর রামদাখানি ঘরের একটেরে রেখে সে গুণময়ীকে সম্বোধন করে বললে—"উঠ গো মাই, তর ছাইলার দিকে একবার চাইয়া দেখ।"··· একটু থেমে সুরেশ্বরকে লক্ষ্য করে মৃদু ভৎর্সনার সুরে বললে—

"ছি ছি, সুইরা বাবাজী, তুমি আমারে কি ঠাওরাইলা। কি কইরা মনে করলা যে বেবাক মুসলমান বেইমান। আরে তুমি কইলা কি বাবাজী—আমার মাইয়ারে আমি বেইজ্জত করুম—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—আমি গুণমাই মাইয়ের বাপ গোলোক মিঞা না।···" বলেই গুলমামুদ একেবারে দিলখোলা হাসি হেসে উঠল।

গুণময়ী এবার ভালো করে গুলমামুদের মুখের পানে তাকালে। সেই প্রসন্ন হাসিতে বুড়োর মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে যা একদিন কিশোর বয়সে বধূরূপে নৌকাপথে প্রথম স্বামীগৃহে আগমনকালে তাকে আশ্বস্ত করেছিল। গুণময়ী দেখলে এই বিশ্বস্ত বৃদ্ধের দৃষ্টিতে উদার আশ্বাস, শক্ত বাহু দুটিতে তার আশ্রিতকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি। যার চেয়ে বড় হিতৈষী সংসারে তাদের আর কেউ নেই তাকে তারা এমন অন্যায় সন্দেহ করেছিল বলে স্বামীস্ত্রী দু'জনেই যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছিল।···

ক্ষণকাল গভীর নীরবতা। ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। নীরবতা ভঙ্গ করে গুল-মামুদ বললে, "কিন্তুক, সুইরা বাবাজী, মাই আর দেরী না। চট কইরা নগদ টাকা-পইসা আর দুই-চাইরখান কাপড়-চোপর যা আছে লইয়া লও। অখনই যাইতে হইব।"

একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে গুণময়ী বললে, "কোথায় বাবা?" গুলমামুদের কানে এ ডাক যেন মধুবর্ষণ করলে। গুণময়ীর মুখে এই পিতৃসম্বোধন শুনবার জন্যে তার আত্মা কত যুগ-যুগান্তর ধরে যেন তৃষিত হয়েছিল।

অন্তরের আবেগ দমন করে গুলমামুদ বললে, "আমার জাতভাইরা আর থোড়া বাদেই তোমরার বাড়ী চড়াও করব। মাই গো, সব যাউক তরার জানডা আর মানডা ত বাচুক। চালাক* কর, চালাক কর। চামারহাটির খালের ঘাটে আমার ডিঙ্গি নাও† বান্ধা আছে—আগে নাও তো গিয়া উঠি, তার পরে খোদায় যেখান লইয়া যায়।"

ক্ষিপ্রহস্তে ক্যাশ বাক্স খুলে সুরেশ্বর নগদ টাকাকড়ি জামার পকেটে পুরলে এবং অতিসংক্ষিপ্ত একটি বিছানা ও কাপড়ের বোঁচকা বেঁধে-ছেঁদে নিলে। তার পর চট করে স্বামীস্ত্রী উভয়ে চিরতরে বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশ-যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে নিলে।

ঘর থেকে উঠানে নেমে সুরেশ্বর এবং গুণময়ী উভয়ে গল-বস্ত্র হয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করলে। পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতিপূত এই বাস্তুভিটার সঙ্গে কত জন্ম-জন্মান্তরের যোগ—এর প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে অন্তরের কি অচ্ছেদ্য বন্ধন! আজ কার অভি-শাপে তারা এই স্বর্গলোক থেকে চিরতরে নির্ব্বাসিত হতে চলেছে কে জানে!

---

* তাড়াতাড়ি † নৌকা

বাঙালী-ঘরের বধূ গুণময়ী। এই তার শ্বশুরের ভিটা—তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। এই বাস্তুভিটাকে কেন্দ্র করেই তার নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা—তার নীড়-রচনার স্বপ্ন সার্থকতার পথে এগিয়ে চলেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে সে স্বপ্ন ভেঙে গেল—নির্ম্মম নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে বোধনেই বেজে উঠল বিসর্জ্জনের বাজনা। বড় বেদনার সঙ্গে তার মনে হ'ল এই গৃহ আর তাঁর সযত্ন পরিমার্জ্জনে নিত্য কল্যাণশ্রীতে মণ্ডিত হবে না—এখানকার তুলসীতলায় মঙ্গল-করে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানোর পালা তার এ জন্মের মত শেষ হয়ে গেল।

গুণময়ী আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলে না—একেবারে ডুকরে কেঁদে উঠল। তার তপ্ত অশ্রুধারায় ভিজে গেল মাটির বুক—সুরেশ্বর এতক্ষণ আত্মসম্বরণ করে ছিল, এবার তারও বুকে নামল অশ্রুর প্লাবন।

এই করুণ দৃশ্য দেখে গুলমামুদও অলক্ষ্যে চোখ মুছলে, মনে মনে বললে, "আল্লা এডাও দেখন লাগল!'

অঘোর রায়ের ভিটায় বাস্তুদেবতার তর্পণ হ'ল আজ এই তিন জনের তপ্ত অশ্রুধারায়।

কিন্তু বাস্তুভিটার মায়ায় আর দেরি করা চলবে না—চরম সর্ব্বনাশের লগ্ন এগিয়ে আসছে।

রায়বাড়ীর পেছনদিককার পুকুরের দক্ষিণ পাড় দিয়ে কাটানটে ভাটগাছ আর আসশ্যাওড়ার জঙ্গল ভেঙে চামারহাটির খালের দিকে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলল তারা—আগে গুলমামুদ আর তার পেছনে গুণময়ীর হাত ধরে সুরেশ্বর। গুলমামুদ চূড়ান্ত দুঃসাহসী, আকৈশোর দুর্গম পথের যাত্রী। তার চোখে বুঝি আছে সন্ধানী আলো—সে ছাড়া আর কেউ তাদের এ অন্ধকারে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারত না।

কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। আতঙ্কে সুরেশ্বর আর গুণময়ীর গা শিউরে উঠছে—সামান্য একটু শব্দ হলেই তারা ভাবছে কারা বুঝি তাদের অনুসরণ করে কাছে এসে পড়ল। গুলমামুদ কিন্তু নির্ভীক। দৃঢ়মুষ্টিতে সে ধরেছে রামদা আর লাঠি—যৌবনের সেই তেজ, সেই উন্মাদনা আবার যেন তার ফিরে এসেছে। দরকার পড়লে একাই এক শ জনের মহড়া নিতে পারবে সে।

বহুক্ষণ ঝোপঝাড় বনজঙ্গল ভেঙে অবশেষে তারা চামারহাটির খালের পাড়ে এসে পৌঁছল। অপরিসর খালটির দু' পাড়ে বেতকাঁটা ও অন্যান্য গাছের গভীর জঙ্গল। দু' দিককার গাছের ডালপালা খালের ওপরে ঝুঁকে পড়ে যেন একটি ঘেরাটোপ রচনা করেছে। এই নিভৃত আবেষ্টনীর মধ্যে কত যুগ-যুগান্তরের রহস্য যেন পুঞ্জীভূত!

খালের দক্ষিণ তীরে একটা বরুণ গাছের গুঁড়িতে ছইহীন ছোট একটি ডিঙি বাঁধা। মাঝে মাঝে বড় বড় বরুণফল খালের জলে টপ টপ করে ঝরে পড়ছে। পচা বরুণফলের উৎকট দুর্গন্ধে এখানকার বদ্ধ বাতাস ভারাক্রান্ত।

জলে নেমে গুলমামুদ ডিঙিটি'কে পাড়ের দিকে টেনে আনলে। সুরেশ্বর ও গুণময়ী ডিঙিতে উঠলে পর গুলমামুদ দড়ির বাঁধন খুলে দিয়ে গলুইয়ের উপর দাঁড়িয়ে ঊর্দ্ধপানে তাকিয়ে বললে, "খোদা মেহেরবান, মুখ রাইখো—মাইয়ার ইজ্জত বাচাইয়ো আল্লা।"

খোদাতাল্লার দোয়া ভিক্ষা করে খালের জলে নৌকা ভাসিয়ে দিলে গুলমামুদ। সিকি মাইলটাক এগিয়ে একবার বড় গাঙে গিয়ে পড়তে পারলে তাদের আর পায় কে?

গুলমামুদের লগির ঠেলায় অন্ধকার ভেদ করে নৌকাখানি চলল তীরবেগে ছুটে...

হঠাৎ যেন শোনা যায় দূরাগত হৈ-হল্লা, সমুদ্র-কল্লোলের মত প্রচণ্ড গর্জ্জন। বহু কণ্ঠের মিলিত আল্লা হো আকবর ধ্বনিতে রাত্রির আকাশ মুখরিত হয়ে উঠে।

হট্টগোলটা অঘোর রায়ের বাড়ীর দিক থেকেই আসছে যেন...

অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে, হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রতীক্ হাছন পীরের সাধনাপূত নিভৃত ফুলপুর পল্লীর শান্ত বক্ষে আজ গভীর রাত্রে রক্তের অক্ষরে ইতিহাসের কোন্ কলঙ্কিত অধ্যায় লিখিত হতে চলেছে কে জানে?......

গলতা বা গালবমুনির আশ্রম, জয়পুর

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ছেলেবেলায় পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগে পড়িয়াছিলাম—

"জয়সিংহ পুরী জয়পুর চারুদেশ,
যার শোভা মনোলোভা বৈকুণ্ঠবিশেষ।"

জয়পুরের মহারাজ জয়সিংহ বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্যের* পরিকল্পনানুসারে জয়পুর নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই জয়পুর দেখিবার আকাঙ্ক্ষা অনেক দিন হইতেই ছিল—এবার সে বাসনা পূর্ণ হইল। দিল্লী হইতে ৬ই নবেম্বর ২০শে কার্ত্তিক ৮-৩০ মিনিটের গাড়ীতে জয়পুর রওনা হইলাম, বম্বে বরোদা সেণ্ট্রাল রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরা রিজার্ভ করায় গাড়ীতে বেশ আরামেই যাইতে পারিয়াছিলাম। দিল্লী হইতে আমার পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রভা গুপ্তা এবং পৌত্র গৌতম সঙ্গী হইল। ষ্টেশনে বেশ গরম বোধ হইতেছিল। এ গাড়ীতে আমরা মাত্র তিন জনই ছিলাম। গাড়ী ছাড়িবার পরে ক্রমশ: বেশ শীত বোধ হইতে লাগিল। গভীর রাত্রিতে শীত প্রবলতর হইয়া উঠিল। অন্ধকার রাত্রিতে বাহিরের কিছুই দেখা যাইতেছিল না—ক্রমে ক্ষীণতর আলোকে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল—দিগন্তবিস্তৃত মরু-প্রান্তর—মাঝে মাঝে ছোট ছোট গুল্মবৃক্ষের ঝোপ। এই ভাবে রাত্রি কাটিল। প্রত্যূষে সাড়ে সাতটার সময় জয়পুর পৌছিলাম। পূর্ব্বেই আমি জয়পুরের বিখ্যাত ডাক্তার এস. কে. সেনগুপ্ত মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার উত্তর পাইবার আগেই রওনা হইয়া আসায় তাঁহার ওখানে আকস্মিক ভাবে যাইতে কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হইল তাই বন্ধুবর শ্রীযুত অসিতকুমার হালদারের ও জয়পুর আর্ট ও ক্রাফ্‌ট কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দের বাসার দিকে চলিলাম। শৈলেন্দ্রবাবু আমাদের পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে নিম্নতলে স্থানান্তরিত করিয়া আমরা উপরের একটি ঘর দখল করিলাম। ষ্টেশনের অল্প দূরেই তাঁহার বাড়ী।

* মতান্তরে, রামচন্দ্র বিদ্যাধর। ইনি মথুরার প্রবাসী বাঙালী; স্থাপত্য-বিদ্যায় দিল্লীর দরবারে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মহারাণা রাজসিংহ কর্ত্তৃক সম্রাট আওরঙ্গজেব বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে তাঁহাকে উদ্ধার করায় জয়সিংহ সম্রাটের নিকট হইতে চারিটি উপহার লাভ করেন, তন্মধ্যে এই তিনটি প্রসিদ্ধ: (১) দেওয়ান রাজা রায়মলজী, (২) স্থপতি রামচন্দ্র বিদ্যাধর বা বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য এবং (৩) রজম্‌ নামা—সম্রাট আকবরের আদেশে আবুল ফজল ও ফৈজী কর্ত্তৃক অনূদিত বহুচিত্রে সুশোভিত 'মহাভারত'।

শহরের বাহিরে সিনেমা হলের বিপরীত দিকেই তাঁহার বাসা। সকালে স্নান সারিয়া ও চা পান করিয়া প্রথমে অম্বর দেখিতে গেলাম। অম্বরের কথা পরে বলিব। প্রথমে গলতা বা গালবাশ্রমের কথা বলিতেছি। আমি প্রথমে গলতা শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি নাই। শৈলেনবাবুর কাছে শুনিলাম গলতা জয়পুরে পূর্ব্বসীমায় একটি পাহাড়—শহর হইতে একটু দূরে। আমরা প্রথমে বাসে আসিয়া শেষে টাঙ্গায় রওনা হইলাম। জয়পুর শহরের প্রশস্ত সরল পথ—টাঙ্গায় অল্প সময়ের মধ্যেই পাহাড়ের নীচে আসিয়া পৌছিলাম। একটু আগেই নগর-প্রাচীর শেষ হইয়াছিল। এখানে আর একটি তোরণের মধ্য দিয়া টাঙ্গা হইতে পাহাড়ের পাদদেশে নামিলাম। সেখানে ছোট ছোট দোকান, দুই-একটি ধর্ম্মশালা—বাঁ দিকে উপত্যকা ও প্রান্তর, দক্ষিণে সূর্য্যকিরণ-ঝলসিত শ্যামল গিরিশ্রেণী, কোনটি ছোট কোনটি বড়। পাহাড়ের

গালবকুণ্ড
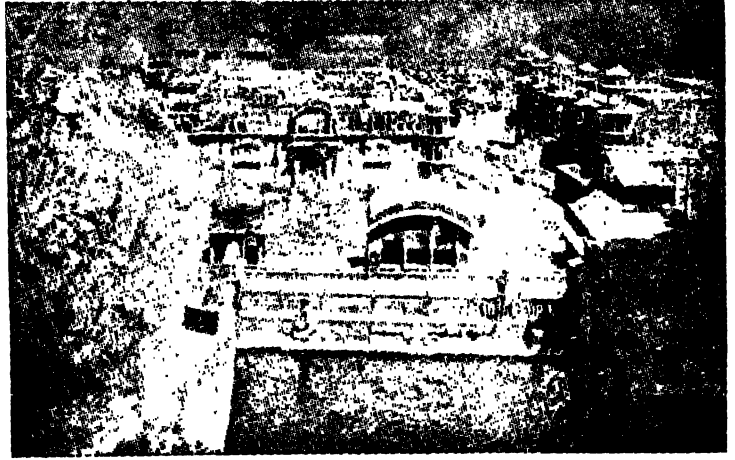
শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত পাথরের বেশ প্রশস্ত সিঁড়ি। গৌতম তো দৌড়াইয়া লাফাইয়া সিঁড়ির পর সিঁড়ি পার হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গী শৈলেন্দ্রবাবুকে সে নানা প্রশ্ন করিতেছিল। আমি ও বৌমা চারিদিক দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম।

একটির পর একটি সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিতেছি, আর চারিদিকের দৃশ্য সুন্দর হইতেও সুন্দরতর দেখাইতেছে। দূরে দেখা যাইতেছে অম্বর পাহাড় ও দুর্গ। নজরে পড়িতেছে প্রাসাদ ও বিপণিশ্রেণী, মিনার ও ঋজু রাজপথ। নীল আকাশের পটে সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত প্রাসাদ, গিরি ও দুর্গ

সবই অতীব মনোহর দেখাইতেছে। যাত্রীরা কেহ উঠিতেছে, কেহ নামিতেছে। প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, তরুণ-তরুণী সকলেই আছেন। হনুমানের পাল দীর্ঘ লাঙ্গুল নাড়িয়া ছোলার দানা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের আশায় ছুটিয়া আসিতেছে, হাত পাতিয়া লইতেছে—খাবারটা মুখে পুরিয়াই আবার হাত পাতিতেছে। ইহাদের ব্যবহার ভদ্র রকমের দেখিলাম। শুনিলাম, সময় সময় তাহাদের আচরণ ঠিক ভদ্রোচিত হয় না।

গলতা পাহাড়ের নীচেকার উপত্যকাটি বড় সুন্দর—মাঝে মাঝে দুই একটি শীর্ণকায়া উপলবাহিনী নদী ও নির্ঝরিণীর সর্পিল গতি নয়ন মুগ্ধ করিতেছে। গলতা পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় সূর্য্যদেবের সুন্দর মন্দির। মন্দিরের চূড়া দূর হইতেই চোখে পড়ে। গলতা পাহাড়—সূর্য্যমন্দির ও গালবাশ্রমের জন্য বিখ্যাত।

আমরা প্রথমে আসিলাম সূর্য্যমন্দিরে। সূর্য্যমন্দিরটি এখানকার সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতচূড়ায় অবস্থিত। মন্দিরের পূজক পার্শ্বস্থ বাসগৃহে সপরিবারে বাস করেন। এখানকার কূপের জল সুপেয়। আমরা মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। শীতল জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম এবং শ্রীশ্রীসূর্য্যমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। পার্শ্বে সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা দেবীর মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর। সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত। পুরোহিত শহরে গিয়াছিলেন, তাঁহার কিশোর পুত্র মন্দিরের দরজা খুলিয়া আমাদের সমুদয় বিগ্রহ দেখাইল, প্রসাদ দিল। তরুণ কিশোরটি অবশেষে নিজেদের ঘর-সংসারের গল্প জুড়িয়া দিল। তাহাদের পয়স্বিনী গাভী আছে—ক্ষেতে গম হয়। দেবোত্তর সম্পত্তি আছে—ভক্তদের দানে ও পূজার উপকরণে খাদ্যসমস্যা তাহাদের নাই। পাহাড়ের নির্ম্মল বায়ু তাহাদের দেহে ও মনে আনে শান্তি। সে বলিল, বর্ষায় যখন আকাশ মেঘে ঢাকিয়া ফেলে তখন বহু ময়ূর-ময়ূরী কেকারবে চারিদিক মুখরিত করিয়া নৃত্য করিয়া বেড়ায়। তখন এই উচ্চ পাহাড় হইতে চারিদিকের দৃশ্য বড় সুন্দর দেখায়। পাহাড়ের উপর হইতে কলকল শব্দে জলধারা নীচে নামিয়া শুষ্ক নদীর বুক প্লাবিত করিয়া দেয়। শৈলেন্দ্র বাবু 'মাষ্টার সাব'—এখানকার সকলের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় আছে। তাঁহার সঙ্গে অনেক পরিচিত ব্যক্তির গল্পসল্প হইল।

আমরা সূর্য্যদেব ও তাঁহার পত্নীর মূর্ত্তি দেখিলাম। জয়পুরের রাজবংশ লবকুশের বংশ হইতে উৎপন্ন। ইঁহারা আপনাদের সূর্য্যবংশোদ্ভব বলেন, রাজারা সূর্য্যের উপাসক। গলতা পর্ব্বতের সূর্য্যদেবের মন্দির দর্শনীয়। শুনিলাম, কছ্-বাহরাজ বিশ্রুতকীর্ত্তি সম্রাই জয়সিংহজী প্রথম এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা জয়সিংহ দিল্লীর সুবাদার হইয়া বিশেষ পদ-মর্য্যাদার অধিকারী হইয়াছিলেন—রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিতে ও বীরত্বে তিনি ছিলেন রাজস্থানে সমুদয় রাজার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হইলে প্রথমে গণেশ ও সূর্য্যমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতে হয়। মহারাজা এই শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী 'নাহার' (ব্যাঘ্র) নামক পর্ব্বতে গণেশ ও গলতা পর্ব্বতে শ্রীসূর্য্যদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শতাধিক বর্ষের প্রাচীন এই মন্দির, 'সুরয সপ্তমী' তিথিতে এখানে মেলা বসে এবং খুব ধুমধামের সহিত শ্রীশ্রীসূর্য্যদেবের পূজা হয়। সেজন্য ঐ মেলার নাম 'সুরয সপ্তমীর মেলা।' সে সময়ে জয়পুরের মহারাজা মন্ত্রী ও সভাসদগণের সহিত মহাদোলে আরোহণ করিয়া নগরপরিক্রমা করেন। সঙ্গে সঙ্গে চলে নানা বর্ণের রথ ও যানবাহন—উট, ঘোড়া, হাতী ইত্যাদি। নগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আনন্দ ও উত্তেজনার মধ্য দিয়া সমস্ত্রী মহারাজা সূর্য্যমূর্ত্তি আনাইয়া প্রজাদের সম্মুখে শ্রীশ্রীসূর্য্যদেবের পূজা করেন। পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয় রাজারা সূর্য্যরথে অর্থাৎ আট ঘোড়া (সপ্তাশ্ব) বাহিত যানে আরোহণ করিয়া মহাসমারোহের সহিত রাজধানী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেন।

আমরা শ্রীশ্রীসূর্য্যদেবের মন্দির দর্শন করিয়া পুলকিত হইলাম। পাহাড়ের ঢালু জমিতে ছাগ ও গরুর পাল চরিতেছে—হনুমান হনুমতীরা নির্ভয়ে পরম নিশ্চিন্ত মনে লাফালাফি ছুটাছুটি করিতেছে। দূরে একটি পাহাড়ের উপর কোচবিহার-রাজকন্যা জয়পুরের মহারাণীর নবনির্ম্মিত সুন্দর প্রাসাদটি দৃশ্যমান।

শ্রীসূর্য্যের মন্দির হইতে আমরা ক্রমশঃ নীচে নামিতে নামিতে গলতার দিকে চলিলাম। নিম্নাবতরণ করিবার দুইটি পথ আছে। একটি দুর্গম-পর্ব্বতারোহণ এবং অবতরণে দক্ষ লোকেরা সাধারণতঃ সেই খাড়াই পথে চলাফেরা করিয়া থাকেন। আমি অন্যান্য যাত্রীদের সহিত অপেক্ষাকৃত সুগম পথেই চলিলাম। শৈলেন্দ্র বাবু শ্রীমান গৌতম সহ আমাদের আগে আগে চলিয়া গেলেন। রৌদ্রকিরণ প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে কঠিন পার্ব্বত্য শিলা ও মন্দিরের পর মন্দির নজরে পড়িতে লাগিল। অবশেষে সাধু সন্ন্যাসী এবং স্নানার্থী ও স্নানার্থিনী নরনারীদের কুণ্ডে স্নান করিতে দেখিলাম। দুইটি কুণ্ড। কুণ্ড দুইটি বেশ বড় ও গভীর, অনেকটা ছোট পুকুরের মত। পাহাড়ের গা হইতে জলের ধারা পড়িয়া কুণ্ড দুইটিকে জলে পূর্ণ করিতেছে। চারিদিকই শানবাঁধানো। বেশ চওড়া ঘাটের সিঁড়ি। পুরুষ ও স্ত্রীলোক-দের স্নান করিবার ভিন্ন ভিন্ন কুণ্ড। স্নানার্থিনীদের মধ্যে আমরা একটিও বাঙালী মহিলাকে দেখিতে পাইলাম না। অধিকাংশই রাজপুতানা, যুক্তপ্রদেশ, গুজরাট ও পঞ্জাবের। স্থানীয় পুরুষ ও মহিলা অনেক ছিলেন। সকলেরই পরিধানে রঙীন শাড়ী ও ঘাঘরা।

শ্রীমতী প্রভা স্নান করিলেন না। কুণ্ডের পবিত্র জল মাথায় ছোঁয়াইলেন। এখানেও পাণ্ডারা আছেন—মন্ত্র পড়ান, কপালে অলকা-তিলকা রচনা করেন, দক্ষিণা লইয়া থাকেন। অনেকে দেখিলাম শ্রাদ্ধ এবং তর্পণাদিও করিতেছেন। আমরা কুণ্ডের পাশ দিয়া মন্দির ও ধর্মশালা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। এইবার একেবারে সমতলভূমিতে নামিয়া আসিয়াছি। এখানে অনেক মন্দির আছে। প্রত্যেক মন্দিরে বহু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণ, হনুমানজী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি বিবিধ মূর্ত্তি সুসজ্জিত শ্রেণীবদ্ধ কক্ষে বিরাজমান। বড় বড় ঘর প্রকাণ্ড আঙ্গিনা, দর্শকের বিপুল ভিড়। শ্রীরাম সীতার মন্দিরে রামায়ণের সমুদয় ঘটনা প্রাচীরগাত্রে ছাদে বারান্দায় সর্ব্বত্র চিত্রিত। চিত্রগুলি বৃহৎ ও সুন্দর—কোথাও অস্পষ্ট, কোথাও স্পষ্ট। একটি মন্দিরের মোহন্ত এক জন বাঙালী বৈষ্ণব। আমাদের দেখিয়া আনন্দিত হইয়া গল্প জুড়িয়া দিলেন, বাংলা-দেশের খবরাখবর লইলেন। বিদায় লইয়া ফিরিবার পথে দেখিলাম বালুকাস্তৃত মরুভূমির পথে, রুক্ষ শিলাকীর্ণ পথে গ্রামবাসীরা কাঠ, বিবিধ শস্য, দুগ্ধ প্রভৃতি লইয়া নগরের দিকে চলিয়াছে। আমরা এখানে একটু বিশ্রাম করিলাম। তার পর আবার শহরের দিকে সেই পুর্ব্ব-পথে শ্রীসূর্য্যের মন্দিরের নিম্ন দিক দিয়া সোপান বাহিয়া নীচে চলিলাম। খুব প্রত্যুষে আসিয়াছিলাম, এখন বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। রৌদ্র বেশ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্দেশে আমরা টাঙ্গায় আরোহণ করিলাম। পথে জয়পুররাজের আর্টস এণ্ড ক্র্যাফ্‌ট স্কুল ও কলেজ দেখিতে গেলাম। ছাত্রদের হাতের নানা কাজ, কাঠ, লোহা ও ব্রোঞ্জ এবং গালার কাজ, আর বিবিধ চিত্রাবলী দেখিয়া খুশী হইলাম। শ্রীযুত কুশল মুখোপাধ্যায় এখানকার অধ্যক্ষ এবং শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রবাবু সহ-কারী অধ্যক্ষ। ইঁহাদের চেষ্টা ও যত্নে এই শিল্প-বিদ্যালয়টি দিন দিনই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। বাঙালী ছাত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না। স্থানীয় ছাত্র ও শিক্ষকগণ অসাধারণ পরিশ্রমী এবং ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত তাঁহারা তাক্ষর্য্য চিত্র-বিদ্যা ইত্যাদি শিখেন। কি সুন্দর ভাবে তাঁহারা কাঠ খোদাই করিতেছেন, রং লাগাইতেছেন, এনামেলের কাজ করিতেছেন, মূর্ত্তি গড়িতেছেন, অতি ছোট ছোট বালকেরা পর্য্যন্ত কি মনোযোগের সহিত কাজ করিতেছে! শৈলেন্দ্র বাবু, অধ্যক্ষ কুশল বাবু ও অন্যান্য শিক্ষকেরা আমাদের সব ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখাইলেন। বন্ধুবর শিল্পী শ্রীযুত অসিতকুমার হালদারও এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন।

এইবার গালবাশ্রম বা গলতার কথা কিছু বলিব। এ সম্বন্ধে নানা পৌরাণিক কাহিনী ও অনেক গল্প প্রচলিত আছে। অতি প্রাচীন কালে এখানে গালব নামে এক ঋষির আশ্রম ছিল। গলতা সম্ভবতঃ গালব নামের অপভ্রংশ। মহাভারতেও এক গালব ঋষির নাম আছে। পাণিনির ব্যাকরণে গালব ঋষিকৃত একটি ব্যাকরণের উল্লেখ দেখা যায়। পুরাণে ও মহাভারতে গালব নামধেয় অনেক ঋষিরই উল্লেখ পাওয়া যায়। গালবাশ্রম মাহাত্ম্য নামে একখানা মুদ্রিত পুথি আছে। তাহাতে এক গালব ঋষির কথা জানিতে পারা যায়। এই গালব ঋষি গালু ঋষির পুত্র ছিলেন :

"পিতা তস্য গলু র্যযৌ পুত্রে সমাদিশ্য স্বর্গে ধর্ম্মসনাতনম্।
(গালবাশ্রম মাহাত্ম্য)

"আসীদগলর্মহা যোগী বেদবেদাঙ্গ পারগঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো মিতাশী চ দেবপিতৃ পরায়ণঃ॥
উদারো দারো কৃষ্ণীরো ধীমান্ ধর্ম্ম সনাতনঃ।
শান্তো দান্তো দয়াসিন্ধু দীনবন্ধু র্দয়াশ্রয়ঃ।
(গালবপশুং মাহাত্ম্যম্)

কিম্বদন্তী এই যে, পূর্ব্বে গালব ঋষি পুষ্কর-তীর্থে তপস্যা করিতেন, পরে গলতা পর্ব্বতে আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁহার আশ্রমটি দেখিলাম। তাঁহার কৃত সাতটি পবিত্র কুণ্ডও বিদ্যমান। গালব ঋষি ছিলেন জলের পরম ভক্ত। তাঁহার বিশ্বাস ছিল :—"জলাজ্জাতং জগৎ সর্ব্বং জলেনৈবোপজীবতি।" তিনি জল দিয়া হোম হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ববিধ ধর্ম্মকৃত্য করিতেন। দেবতারা দেখিলেন সমূহ বিপদ। অগ্নিদেব কি করিবেন, তিমি পড়িলেন মহা বিপাকে। যন্ত্রণার একশেষ। অবশেষে ব্রহ্মার পরামর্শে তিনি বিষ্ণুদেবের নিকট গেলেন এবং এই প্রার্থনা জানাইলেন যে, তিনি যেন গালব ঋষিকে জলদ্বারা হোম ইত্যাদি করিতে নিষেধ করেন। ভক্তবৎসল বিষ্ণু দেবতাদের সহিত গালব ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন :—"গালব ঋষি বিষ্ণুর আগমনে কৃতার্থ হইলেন এবং বলিলেন, আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে আপনার দর্শনলাভ করিলাম। আপনাকে দর্শন করিয়াই আমি চরিতার্থ হইয়াছি। আমি অন্য কোন বর যাচ্ঞা করি না।" ব্রহ্মা বলিলেন, "গালব ঋষি! তুমি জলদ্বারা হোম করিও না, ইহাতে অগ্নির ক্লেশ হয় এবং অন্যান্য দেবতাদেরও আহারে বিঘ্ন ঘটে।"

গালব মুনি বলিলেন, "আমি দরিদ্র তপস্বী ঘৃত কোথায় পাইব?"

বিষ্ণু তাঁহাকে একটি কামধেনু দিয়া বলিলেন, "তুমি এই গাভীর নিকট হইতে আকাঙ্ক্ষানুযায়ী দুগ্ধ ও ঘৃত পাইবে। গালব ঋষি দেবতাদের চরণে প্রণত হইয়া কামধেনুটি গ্রহণ করিলেন। বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা তখন এই গালব আশ্রমকে মহাতীর্থ বলিয়া প্রচার করিলেন। তদবধি ত্রিভুবনে গালবাশ্রমের কথা প্রচারিত হইল। এখানে স্নান করিলে কি ফললাভ হয় তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে :

গয়ায়াং শতশঃ পুণ্যাত্তর্পণাজ্জায়তে নৃণাং।
পিতৃণাং চ ততঃ কোটি গুণাধিক শতং বিদুঃ।

পুষ্করে কৃত্তিকা যোগে প্রয়াগে মকরেরবৌ
কুম্ভে কেদারকে সিংহে গৌতম্যাং চ নরেশ্বর।
তৎফলং বিধিনা প্রোক্তং প্রাপ্নুয়াম্মানবোভুবি
সোমবত্যাং নরোভক্ত্যাস্নায়াম্মহাশ্রমে মুনেঃ।

গলতা সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী শুনিলাম। স্থানীয় অধিবাসীরা বলে, মহারাজা পৃথ্বীরাজজীর রাজত্বকালে (আঃ ১৫৫০—১৫৮৪ সম্বৎ) গলতা পাহাড়ে এক যোগী ধ্যান ধারণা করিতেন, তাঁহার নাম ছিল কৃষ্ণদাসজী। কৃষ্ণদাসজী কেবলমাত্র বায়ু ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতেন বলিয়া সাধারণ লোকে তাঁহাকে বলিত "পওহারী বাবা।" তিনি রামানুজ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। জয়পুর রাজবংশাবলীতে তাঁহার কথা লিখিত আছে। গলতার ঘাটে এখনও তাঁহার ধুনী বিদ্যমান। তাঁহার ধুনী অনির্ব্বাণ রাখিবার জন্য প্রত্যহ চারিজন যোগী নিযুক্ত থাকিতেন। একবার কোন কারণে কৃষ্ণদাসজীর শিষ্যেরা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া সম্ভবতঃ তাঁহার জীবননাশ করিবার জন্যই একটি সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ড তাঁহার দিকে গড়াইয়া দিয়াছিল, কৃষ্ণদাসজী দৈবশক্তি-বলে মধ্যপথে সেই প্রস্তরটির গতিবেগ রোধ করিয়াছিলেন।

বাড়ী ফিরিতে বেলা দুইটা বাজিয়া গেল। বাসায় ফিরিয়া স্নান-আহারের পর সন্ধ্যায় শুইয়া পড়িয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে লাগিলাম। শৈলেন্দ্র বাবু কিন্তু ছাদের উপরে উঠিয়া তাহার পোষা কবুতরের দলকে খাদ্য দিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

পুনর্ব্বসতি সমস্যা সমাধানের একটি উপায়

শ্রীশিশিরকুমার কর, বি. এস্‌সি. ইঞ্জিনিয়ারিং (ইউ, এস, এ)

গত কয়েক বৎসর ধরে বাংলার বুকে একটার পর একটা দুর্দ্দৈব নেমে আসছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জাপানীদের বোমাবর্ষণ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইত্যাদি সবকিছুকেই ম্লান করে দিয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর পাকিস্থানীদের অত্যাচার-উৎপীড়ন। আজ যে সর্ব্বহারা ভীত-সন্ত্রস্ত শরণার্থীর দল কূলপ্লাবী স্রোতের ন্যায় পশ্চিম বাংলা এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের দিকে ছুটে আসছে তাদের আশ্রয় দেবার, জীবিকার্জ্জনের সুযোগ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব সমগ্র ভারতের হলেও সেটা আজ বিশেষভাবে বাঙালী জাতির উপরই পড়েছে। অন্য প্রদেশবাসী এদিকে যা কিছু করবে আমরা সেজন্যে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। তাদের দিক থেকে সেটা আসবে কর্ত্তব্য-বোধের প্রেরণায়। বাংলা যা করবে তা অন্তরের দরদে, বেঁচে থাকবার স্বাভাবিক প্রেরণায়।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী বাংলার এই সমস্যাকে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার পর্য্যায়ে স্থান দিয়েছিলেন। কোন দেশ যখন বৈদেশিক শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য একতা, সংঘবদ্ধতা এবং চরম আত্মত্যাগের প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে জেগে ওঠে। তখন "আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারই লয়ে কাড়াকাড়ি" পড়ে যায়। তাই আজ উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে ঠিক তেমনি অনুপ্রাণনা জেগে না উঠলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

বাংলার শরণার্থী-সমস্যার অনেকগুলি দিক আছে। আমি এই প্রবন্ধে তার একটির সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করব। এই দিক দিয়ে বাংলার স্থপতিগণের একটা বিরাট দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য আছে। কেমন করে এই ৪০।৫০ লক্ষ লোককে অতি শীঘ্র অর্থকরী কাজে লাগিয়ে তাদের অন্নসমস্যার সমাধান করা যাবে, কি করে অতি অল্প খরচে, অতি অল্প সময়ে তাদের জন্য এমন বাড়ী তৈরি করা যাবে যা হবে দীর্ঘস্থায়ী, বাংলাদেশের আবহাওয়ার অনুকূল, স্বাস্থ্যনীতিসম্মত অথচ যা ঘন ঘন সংস্কারের দরকার হবে না—এই সকল বিষয় আজ আমাদের গভীর ভাবে ভেবে দেখতে হবে। বর্ষাকাল প্রায় এসে পড়ল। তাই এখন সময়ক্ষেপের অর্থ হবে অর্দ্ধ লক্ষাধিক লোকের অকালমৃত্যু। বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকবার দুর্ভাগ্য যাদের হবে, তাদের হবে মরণাধিক যন্ত্রণা।

মানব-সভ্যতার আদি যুগ থেকে গৃহনির্ম্মাণের উপাদান হিসাবে মাটির ব্যবহার চলে আসছে। বর্ত্তমান যুগের গৃহনির্ম্মাণের উপাদান—যেমন ইট, পাথর, পাথর কুচি, চুণ, সুরকি, সিমেণ্ট, লোহা—বাজারে যখন দুষ্প্রাপ্য এবং প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, তখন সেই মাটির দিকে নজর দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় আছে বলে মনে হয় না। এ ক্ষেত্রে পাওয়া না-পাওয়ার প্রশ্নই উঠবে না। পায়ের নীচে যা পাওয়া যাবে তাই দিয়েই কাজ চলবে। এর দামও কিছু লাগবে না।

ইট তৈরির জন্য যেমন মাটি ছেনে নেওয়া হয়, সেই রকম মাটির দেয়ালযুক্ত ঘর নির্ম্মাণের প্রথা বাংলাদেশে স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু স্বাভাবিক খোদাই করা মাটি কর্ম্মার মধ্যে ফেলে দুরমুশ বা কোটাই করে যে দেয়াল করা হয় তা পঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, পাতিয়ালা ষ্টেট ইউনিয়নে সুদূর অতীতকাল থেকে চলে এলেও বাংলাদেশে অজ্ঞাত। রোমানরা

যখন ইংলণ্ড অধিকার করে তখন তারাই ইংরেজদের কোটাই করা মাটির দেয়াল তৈরি করার প্রণালী শিখিয়ে দেয়। তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে এই প্রথা চলে আসছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চলে এই প্রণালীতে গৃহনির্ম্মাণ পুনরায় ব্যাপক ভাবে আরম্ভ হয়। স্পেনের কয়েকটি প্রদেশে এবং ফ্রান্সের লাইওনাইজ প্রদেশে বহু শতাব্দী ধরে এই প্রথায় ঘর তৈরির কাজ ব্যাপকভাবে চলে আসছে। প্লীনি তাঁর বিখ্যাত *National History*তে ('জাতীয় ইতিহাসে') উল্লেখ করে গেছেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মসিয়ে গর্ফান্ এ সম্বন্ধে একটা উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ লেখেন। ১৯১৮ সালে ইংলণ্ডের "দি কান্ট্রি-লাইফ" ম্যাগাজিনে এ সম্বন্ধে একটি জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ বেরিয়েছিল।

আজ আমেরিকা আর্থিক সমৃদ্ধিতে জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। সেদেশেও উপনিবেশ স্থাপনের প্রাথমিক যুগে টমাস্ জেফার্সন সর্ব্বপ্রথমে সেণ্ট আগষ্টিনে এই ধরণের ঘর তৈরি করেন। পরীক্ষা এবং গবেষণার দ্বারা সেদেশে এ প্রণালীর যথেষ্ট উৎকর্ষসাধন করা হয়েছে। বর্ত্তমান সময়ে রাশিয়ার কমিউনিষ্ট সরকার জনসাধারণের গৃহনির্ম্মাণ-সমস্যা সমাধানের জন্য এবিষয়ে বহু পুস্তিকা ছেপে বিতরণ করেছেন।

মাটি নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, গৃহনির্ম্মাণের উপাদান হিসাবে এ উৎকৃষ্ট। এর সংকোচন-শক্তি (high compressibility) অত্যধিক বলে এই দেয়াল অত্যন্ত জমাট (monolithic) হয় এবং শক্ত হয়। দেয়াল উই পোকা এবং অগ্নি নিরোধক। মাটি শীত এবং গ্রীষ্ম নিরোধক বলে "শীতকালে ভবেদুষ্ণ গ্রীষ্মকালে চ শীতলং।"— ফলে পাথর অথবা কংক্রীটের প্রাসাদের চেয়ে এ ধরণের মাটির দেয়ালযুক্ত ঘর অনেক বেশী আরামদায়ক। মাটির অণুগুলি অতি সূক্ষ্ম। তাই তারা যখন গায় গায় মিশে থাকে তখন তার মাঝে খুব বেশী ফাঁক থাকে না। তাই সেই অতি সূক্ষ্ম ফাঁকের ভিতর দিয়ে জল চলে যেতে পারে না বলে মাটির ঘরের মেঝে স্যাঁৎসেঁতে হয় না। ঘর তৈরি করার সময় দেয়াল এবং মেঝের এক পরদা মাটি কোটাই করার পর গরম আলকাতরার পাতলা প্রলেপ লাগিয়ে দিলে কখন কোন অবস্থায়ই সে ঘরের স্যাঁৎসেঁতে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কোটাই করা মাটির দেয়াল এক ঘন ফুটে ৪৮৬ থেকে ৮৯১ মণ পর্য্যন্ত ভার বহন করতে পারে। দেয়াল যত পুরনো হয় ততই তার ভারবহন শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে পরীক্ষা-প্রণালী অতি সহজ। প্রথমে ৬ ইঞ্চি ব্যাসের একটা লোহার পাইপের এক ফুট লম্বা একটা টুকরার এক দিকে একটা লোহার পাত জুড়ে দিতে হবে। এর বন্ধ করা দিকটা নিচের দিকে রেখে উপর থেকে এর মধ্যে প্রত্যেক বারে ৬ ইঞ্চি পরিমাণ মাটি ভরে দিয়ে ভাল করে কোটাই করতে হবে। ক্রমে যখন পাইপটা ভরে যাবে তখন পাইপ থেকে মাটির স্তম্ভটাকে বের করে নিয়ে সমান জায়গায় দাঁড় করিয়ে ক্রমে ক্রমে ভার চাপালে এর ভার বইবার শক্তি কতটুকু তা জানা যাবে।

মাটির মধ্যে মাটির কণা আর বালুর কণা কম বেশী পরিমাণে একত্র থাকে। তাই কোন্ ধরণের মাটি দেয়াল তৈরির পক্ষে সবচেয়ে ভাল সে বিচারের আগে এই দুই রকম কণার গঠন-প্রণালী এবং দোষ-গুণের আলোচনা করা দরকার। এই দু'রকমের কণাই কয়েকটা খনিজ পদার্থের সম্মিলনে গঠিত। জলে গুলে দু' রকমের কণাকে আলাদা করা যায়। এই দুই রকম কণার মধ্যে প্রথম পার্থক্য হচ্ছে তাদের আকৃতিতে। বালুকণাগুলির বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে "সিলিকন্"। এর আকৃতি সাধারণতঃ $\frac{১}{৫০০}$ ইঞ্চি। মাটির কণার নাম হচ্চে "ক্লে মিনারল"—আকৃতি $\frac{১}{১৫০০}$ ইঞ্চি। মাটির কণার মধ্যে সিলিকন্ অতি সামান্য পরিমাণে থাকে, কিন্তু বালুকণার মধ্যে থাকে খুব বেশী পরিমাণে।

মাটির কণাগুলির গঠন-প্রণালী অত্যন্ত জটিল। এগুলি আকারে অত্যন্ত ছোট বলে এদের নিয়ে গবেষণা করা কষ্টকর। রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে গবেষণার দ্বারা এই ক্লে মিনারল ধরা পড়ে। এগুলি সাধারণতঃ "হাইড্রাস এলুমিনিয়াম সিলিকেট"। কখনও কখনও এর কিয়ৎপরিমাণ এলুমিনিয়াম পরমাণুর জায়গায় লৌহ-পরমাণু আবার কোথাও বা ম্যাগনেসিয়াম-পরমাণু এবং কিছু পরিমাণ আল্‌কালিও পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ এর আকার বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেছেন "They occur in flat flake shape crystal which have a layer-latice structure"। ক্লে মিনারলের মধ্যে আরও কয়েকটা জিনিষ কম-বেশী মাত্রায় থাকে। তন্মধ্যে জলকণাই প্রধান। তার জন্যই মাটির নমনীয়তা গুণ জন্মে। মাটির কণার অণুগুলির চারিপাশে জলের অণু একটা পাতলা পরদার মত লেগে থাকে। এই ক্ষুদ্রতম অণুগুলির সংযোগস্থলের মাঝখানে যে সব সঙ্কীর্ণতম ফাঁক থাকে জলের অণুগুলি সে সব যায়গাও জুড়ে থাকে। এই জলকণার পর্দাসংঘর্ষ নিরোধ করে বলে মাটির কণার অণুগুলি সহজেই স্ব-স্ব স্থান পরিবর্ত্তন করতে পারে। তাই একই আকারের দুটি বালুর কণা সর্ব্বাংশে একই প্রবণতাসম্পন্ন; অথচ একই আকারের দুটি মাটির কণার মধ্যে প্রায়ই কোন মিল থাকতে দেখা যায় না।

যেখানে বাড়ি তৈরি হবে তারই ধারে-কাছে সুবিধামত জায়গায় যে মাটি পাওয়া যেত প্রাথমিক অবস্থায় তাই দিয়েই দেয়াল তৈরি করা হ'ত। এমনকি এই শতকের প্রথম

দিকেও যে মাটিতে সহজে গাছপালা জন্মে তাকেই কাজের উপযুক্ত মনে করা হ'ত। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দেয়ালের মাটির যে যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার সেগুলি হচ্ছে এই : (১) ভাল রকম জমাট বাঁধার ক্ষমতা, (২) জল শুকিয়ে গেলেও সংকোচনের জন্য ফাটল না ধরা। মাটি বেশ জমাট বাঁধতে পারে, কিন্তু শুকিয়ে গেলে বেজায় ফেটে যায়। বালু শুকিয়ে গেলে মোটেই ফাটে না, কিন্তু আদৌ জমাট বাঁধতে পারে না। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এই দুটা জিনিষ উপযুক্ত পরিমাণমত মিশিয়ে যে জিনিষ সৃষ্টি হবে, সেটাই হবে আদর্শ উপাদান। প্রাথমিক অবস্থায় উপর থেকে গাছ, ঘাস, মূল, শিকড় সমেত ৫।৬ ইঞ্চি মাটি কেটে ফেলে দিয়ে নিচে থেকে নমুনাস্বরূপ কিছু মাটি নেওয়া হ'ত। ঐ নমুনা হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে শক্ত করে চেপে চেপে দেখা হ'ত জমাট বাঁধে কি না। যদি বেশ জমাট না বাঁধত তা হলে ধরে নেওয়া হ'ত যে এর মধ্যে মাটির অংশ যথেষ্ট আছে। তারপর সেই ঢেলাটাকে কোমরসমান উঁচু থেকে মাটিতে ছেড়ে দেওয়া হ'ত। সেটা মাটিতে পড়ে চেপটা না হয়ে যদি ভেঙে ছড়িয়ে পড়ত তা হলে ধরে নেওয়া হ'ত যে ওতে বালুর অংশও যথেষ্ট আছে। এখন বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে মধ্যযুগের এই পরীক্ষা অচল হয়ে গেছে। এখন আর অনুমানের উপর নির্ভর করার আদৌ দরকার হয় না।

পরীক্ষার জন্য গত ১৯৪৪ সনের মে মাসে আমেরিকার কনেক্‌টিকাট্ প্রদেশের ডানবেরীতে এই ভাবে দুটি দেয়াল তৈরী করা হয়। দেয়াল দুটি দেড় ফুট চওড়া ৪॥ ফুট লম্বা এবং ৫ ফুট উঁচু করা হয়। দুটো দেয়ালেরই নিচের অর্দ্ধেকটা হাতে কোটাই করা হয়। উপরের অর্দ্ধেকটা হাওয়ার চাপে চালিত যন্ত্র দ্বারা কোটাই করা হয়। একটাতে মাঝারি ধরণের মাটি ব্যবহৃত হয়। অন্যটাতে শতকরা ৫ ভাগ মাটির সঙ্গে ব্যবহারোপযোগী সিমেণ্ট (Soil cement) মিশিয়ে দেওয়া হয়। দু' বছর পরে দুটি দেয়ালই সম্পূর্ণ ভারবহনক্ষম বলে প্রমাণিত হয়। হাওয়ার চাপের সাহায্যে কোটাই-করা দেয়ালের শ্রেষ্ঠতা এ থেকে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হয়ে যায়।

এই পরীক্ষা-কেন্দ্রে আটটি বিভিন্ন জায়গা থেকে মাটির নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এই সব মাটি ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে ওজন করা হয়। পরে সেগুলিকে পৃথক ভাবে জলে গুলে—সুবর্ণরেখা নদীর তীরের অধিবাসীরা যেমন কুলার উপরে নদীর তলার বালি তুলে জলের সাহায্যে একটু একটু করে চেলে সোনা সংগ্রহ করে ঠিক তেমনি করে—মাটির অংশ ধুয়ে ফেলে বালিকণাগুলো সংগ্রহ করা হয়। এই বালি শুকিয়ে ওজন করে ঐ মাটিতে বালির অংশ কত তা ঠিক করা হয়। এই পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, ঐ মাটিতে বালির অংশ ছিল শতকরা ৬১ ভাগ। এই পরিমাণ অনুযায়ী এটাকে মাঝারি শ্রেণীর মাটি বলে ধরা হয়েছে। আমেরিকার সাউথ ডাকোটা কলেজের পরীক্ষা-কেন্দ্রে "হাউড্রো মিটারের" সাহায্যে পরীক্ষা করে জানা গেছে যে, যে মাটিতে শতকরা ৭৫ ভাগ বালি আছে তাই এ ধরণের দেয়ালের পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপাদান।

এই ধরণের দেয়ালে যে মাটি ব্যবহার করা হবে তাতে জলের অংশ শতকরা পনর ভাগের বেশী হওয়া সমীচীন নয়। জলের ভাগ বেশী থাকলে ভাল রকম জমাট বাঁধবে না।

মাটির দেয়ালের উপরে পলস্তারা লাগান চুণকাম করা অথবা রং ধরানো চলে। ব্যয়সংক্ষেপের জন্য বা অন্য কোন কারণে না করালেও বাস করবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হয় না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ব্যুরো এই প্রকারের দেয়ালে তিন রকমের পলস্তারার নির্দ্দেশ দিয়েছেন :—(১) অর্দ্ধেক বালি, অর্দ্ধেক পাথর চুণ, (২) অর্দ্ধেক বালি, অর্দ্ধেক খড়ি চুণ, (৩) অর্দ্ধেক বালি, অর্দ্ধেক সিমেণ্ট। আগে দেয়ালের গায়ে গরম আলকাতরার একটা পোঁচ লাগিয়ে তারপর সেটা ঠাণ্ডা হলে উপরে রঙের প্রলেপ লাগান হ'ত। ব্যয়সঙ্কোচের দিক থেকে এটা খুবই ভাল ব্যবস্থা। এই ধরণের দেয়ালে ভবিষ্যতে মেরামতের খরচ কিছুই লাগে না বললেও চলে।

গত ১৫ বৎসরে মার্কিন সরকার এই ধরণের বহু বাড়ী তৈরী করিয়েছেন। ১৯৩৬ সনে টমাস হিবেন নামে একজন অভিজ্ঞ স্থপতির তত্ত্বাবধানে ফার্ম সিকিউরিটি এডমিনিষ্ট্রেশনের জন্য গার্ডেন ডেলে এই ধরণের সাতটি বড় বাড়ী নির্ম্মাণ করান হয়। ১৯৪২ সনে সরকারী ফেডারেল ওয়ার্কস্ এজেন্সীর জন্যও আমেরিকার আলেকজেন্ড্রিয়াতে এই ধরণের বহু বাড়ী নির্ম্মিত হয়েছে।

বাংলাদেশে ছানা মাটির দেয়াল করতে আড়াই থেকে তিন মাস সময় লাগে। পঞ্জাবে হাতে কোটাই করে দেয়াল তুলতে লাগে পাঁচ থেকে সাত সপ্তাহ। আমেরিকায় হাওয়ার চাপে চালিত যন্ত্রের সাহায্যে এক দিনে (আট ঘণ্টায়) খুব বড় বাড়ীর দেয়ালও ন' ফুট পর্য্যন্ত তুলতে দেখা গেছে। কাজেই সেদেশে একটা বাড়ী সম্পূর্ণ করার জন্য দুই দিন সময়ই যথেষ্ট।

পঞ্জাবে তিন পোয়া থেকে এক সের ওজনের কাঠের মুগুর দিয়ে দেয়াল কোটাই করা হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় সাড়ে তিন সের ওজনের কাঠের মুগুর চালান হ'ত। সাধারণতঃ দেয়ালের ফর্ম্মার মধ্যে পাঁচ থেকে ছয় ইঞ্চি পুরু করে মাটি বিছিয়ে দিয়ে কোটাই করা হয়। এটা যখন জমাট বেঁধে আড়াই ইঞ্চি, তিন ইঞ্চিতে নেমে আসে তখন তার উপরে আবার পাঁচ-ছ ইঞ্চি মাটি বিছিয়ে দেওয়া হয়। ফর্ম্মার

শেষের দিকে মাটিটাকে ঢালু করে রাখা হয়। পরে ফর্মা সেই দিকে সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন এই ঢালু অংশ দুটি মাটির পর্দাকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। মেশিনের সাহায্যে জমাট এত উৎকৃষ্ট হয় যে, সঙ্গে সঙ্গে তার উপরে ছাদ বা চাল বসান চলে। বাংলাদেশের ছানা মাটির দেয়ালের মত পঞ্জাবের হাতে কোটাই করা দেয়ালও ৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হতে দেখা গেছে। ফ্রান্স এবং স্পেনে এই ধরণের দেয়াল ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়েছে।

এই রকমের মাটির দেয়াল কত দূর পর্য্যন্ত উঁচু করা চলে সে সম্বন্ধেও পরীক্ষা চলছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই ধরণের বাড়ী পাঁচ-তলা পর্য্যন্ত তোলা যেতে পারে। এই প্রণালীতে তৈরি স্পেনের একটা ৮০ ফুট লম্বা, ৪০ ফুট চওড়া, ৫০ ফুট উঁচু গির্জ্জা ৮০ বৎসর স্থায়ী হতে দেখা গেছে। তারপর এই গির্জ্জাটা আগুনে পুড়ে গেলেও দেয়ালগুলো তাদের দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের নিদর্শনস্বরূপ সগর্ব্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। যখন এই দেয়ালগুলো ভেঙে ফেলা হয় তখনও সেগুলো এত শক্ত ও জমাট ছিল যে, বয়ে নিয়ে যাওয়ার সুবিধার জন্যে তাদের ছোট ছোট টুকরো করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। এই দীর্ঘ ৮০ বছরের মধ্যে দশ-পনর বৎসর অন্তর দেয়ালের গায়ে একটা সাধারণ রঙের পোঁচ দেওয়া ছাড়া আর কোন রকম সংস্কারের দরকার হয় নি। আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেণ্ট অব ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সের অধ্যাপক ফার্ডিনাণ্ড এন্‌মোনাফী ১৯২৬ সনে অ্যান্ আরবরে ছয় কামরাযুক্ত একটি অতিশয় সুদৃঢ় দোতলা বাড়ী তৈরি করেন। এই বাড়িটিতেই কোটাই করার জন্য সর্ব্বপ্রথম হাওয়ার চাপের সাহায্যে পরিচালিত যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

ধরুন, একটা গোটা বাড়ি। এতে দুটি বড় কামরা, একটা ১৬ ফুট × ১৪ ফুট, অন্যটা ১৬ ফুট × ১২ ফুট, দুটি ছোট কামরা ৮ ফুট × ৬ ফুট (এ দুটিকে রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর রূপে ব্যবহার করা চলবে) একটা ২৭ ফুট ৬ ইঞ্চি × ৬ ফুট সামনের বারান্দা, একটা ৮ ফুট × ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি পেছনের বারান্দা। এমনই আয়তনের একটা বাড়ীর দেয়াল সম্পূর্ণ করার জন্য দু'দিনের বেশী সময় লাগবে না। যদি দরজা, জানালা, চালের জন্য কাঠ, টিন ইত্যাদি তৈরি অবস্থায় হাতের কাছে পাওয়া যায় তা হলে সব মিলিয়ে সাত দিনের মধ্যেই এমন একটা বাড়ী তৈরি করে শরণার্থীদের বাসের জন্য ছেড়ে দেওয়া যেতে পারবে।

এই ধরণের বাড়ি তৈরির সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এই যে, এর জন্য কয়েকজন ছুতার-মিস্ত্রি এবং হাওয়ার চাপ উৎপাদন যন্ত্রচালক (Compressor driver) ছাড়া অন্য কোন কর্ম্মী বা কারিগরের দরকার হবে না। উপরোক্ত দুই শ্রেণীর কর্ম্মীই শরণার্থীদের মধ্যে থেকে বহু পাওয়া যাবে। তাই জিনিষপত্রের যোগান দিলে তারা নিজেরাই সমবায় প্রথায় নিজেদের বাড়িঘর করে নিতে পারবে।

অনেকেরই জানা আছে যে, ভারত-সরকারের পুনর্বসতি সচিবের বিশেষ পরামর্শদাতা, আমেরিকার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্থপতি শ্রীযুক্ত এস্. কে. দের উদ্যম, সংগঠনশক্তি এবং জনসেবার অনুপ্রেরণার ফলে আজ নীলোখেরীর বার শত একর জঙ্গলময় জলাভূমি একটি অতি-আধুনিক প্রগতিশীল শহরে পরিণত হয়েছে। পশ্চিম-পাকিস্থান থেকে আগত দশ হাজার শরণার্থী আজ সেখানে আশ্রয় এবং জীবিকা অর্জ্জনের সুযোগ পেয়ে বেঁচে গেছে। তেমনি সীমান্ত প্রদেশের শরণার্থীরা নিজেদের চেষ্টায় ফরিদাবাদ শহরটি সমবায় প্রথায় গড়ে তুলেছে। পূর্ব্ববাংলার যুবশক্তি ত্যাগ, কর্ত্তব্যজ্ঞান, আদর্শনিষ্ঠা এবং কর্ম্মোৎসাহে সমগ্র বাংলার আদর্শস্বরূপ। সুযোগ-সুবিধা পেলে তারা যে কখনই পেছনে পড়ে থাকবে না এতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। ইতিমধ্যে ঢাকার শ্রীযুত জে. কে. গোস্বামী সমবায় প্রথায় দমদমে "মনোহর কলোনী" গড়ে তুলে এবং সেখানে এক হাজার শরণার্থী পরিবারের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করে দিয়ে জনকল্যাণকর্ম্মের এক নূতন পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। এমনি ভাবে দশ-বার হাজার শরণার্থী নিয়ে একটি করে সমবায়-সঙ্ঘ গড়ে তুলে তাদের সুযোগ-সুবিধা দিলে এবং উপযুক্ত উপাদান সরবরাহ করলে তারা নিজেরাই মাত্র ছয় মাসের মধ্যে এই প্রণালীতে তাদের গৃহসমস্যার অনেকটা সমাধান করে পুনর্বসতি ব্যাপারের জটিলতাকে সহজ করে তুলতে পারবে। অবশ্য ডাক্তার দে-মহাশয়ের মত অভিজ্ঞ স্থপতির তত্ত্বাবধানে কাজ করলে তবেই তাদের সাফল্যলাভ করবার সম্ভাবনা বেশী।

দরজা, জানালা, ছাদ বা চালের সরঞ্জামের কথা আগেই বলা হয়েছে। তা ছাড়া এর জন্য দরকার হবে কয়েকখানা কোদাল, কয়েকটা ঝুড়ি, মাচানের জন্য কতকগুলি বাঁশ আর কিছু রশি। আর দরকার ছুতার-মিস্ত্রির জন্য করাত, বাটালি প্রভৃতি হাতিয়ার এবং মাপের ফিতা, গুনিয়া, স্পিরিট-লেভেল এবং ওলন। বিশিষ্ট সরঞ্জাম হিসাবে দরকার হবে—হাওয়ার চাপ সৃষ্টির যন্ত্র (Air Compressor), রবারের নল, হাওয়ার চাপে চালিত দুরমুশ (floor rammer অথবা backfill tamper)—প্রত্যেক বাড়ীর জন্য এই সমস্ত জিনিষের দরকার হবে মাত্র দুই দিনের জন্য। তারপরই এই সমস্ত জিনিষ অন্য বাড়ীতে কাজে লাগবে। প্রত্যেকটি ব্যাকফিল্ ট্যাম্পার বা ফ্লোর র‍্যামারের জন্য একটি করে রবারের নল লাগবে। একটা ইঙ্গার সোল র‍্যাণ্ড ৩১৫ সি. এফ. এম. এয়ার কম্প্রেসার ৪ থেকে ৫টি পর্য্যন্ত এবং একটা ৫০০ সি. এফ. এম. এয়ার-কম্প্রেসার ৭টা থেকে ৮টা ট্যাম্পার বা র‍্যামার চালাতে

পারবে। তাই প্রথমোক্ত শ্রেণীর কম্‌প্রেসারের সাহায্যে একই সময়ে ২টা বাড়ীর কাজ এবং শেষোক্ত শ্রেণীর কম্‌প্রেসারের সাহায্যে ৩টা বাড়ীর কাজ যুগপৎ চলবে।

এ ছাড়া দেয়ালের ফর্ম্মা তৈরির জন্ম কিছু লোহার প্লেট, নাট, বলটু, ফিস্‌প্লেট দরকার হবে। এও মাত্র দুই দিনের জন্ম। তারপরই আবার সেই ফর্ম্মা অন্য বাড়ী তৈরির কাজে লাগবে। কংক্রিটের ঢালাই করা দেয়ালের জন্ম যে ধরণের ফর্ম্মা ব্যবহৃত হয়, এও অনেকটা তারই মত হবে। র‍্যামার যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে সেজন্ম ফর্ম্মার কোণগুলো গোলাকার করে দেওয়া ভাল। লোহার পাতের ফর্ম্মা ব্যবহারের ফলে দেয়ালের গা অসমান হবে না। তাই ছানা মাটির দেয়ালের মত ছাঁটাই করে সমান করার দরকার হবে না।

এই দেয়ালের জন্ম আসলে যা খরচ হবে তার হিসাব দেওয়া গেল :—প্রতি ৮ ঘণ্টায় ২০ থেকে ২৪ গ্যালন হাইস্পীড ডিজেল অয়েল, তিন-চতুর্থাংশ গ্যালন মোবিল অয়েল, এক-অষ্টমাংশ গ্যালন পেট্রোল এবং আধ পাউণ্ড অকেক্সো সুতা। র‍্যামারে যে তেল লাগবে তাও এর মধ্যে ধরা হয়েছে। প্রতি ১০০ ঘণ্টা চলার পর কম্‌প্রেসারের ক্রাঙ্ক কেস্ থেকে যে ব্যবহৃত তেল পাওয়া যাবে তাই ফর্ম্মার ভিতর দিকে একটা পোঁচ দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এ ছাড়া লাগবে দরজা, জানালা, ঘোষণদানীর উপরের লিন্টেল তৈরির জন্য সিমেণ্ট, পাথরকুচি এবং লোহার রড। এর বদলে অবশ্য শক্ত কাঠের তক্তা ব্যবহার করা চলে এবং তাতে খরচও কম পড়বে। এই তক্তার যে সব জায়গা মাটির সঙ্গে লেগে থাকবে সেখানে গরম আলকাতরার একটা পোঁচ লাগিয়ে দিলে বহুদিন টিকে যাবে।

আজকাল ইংগারসোল-র‍্যাণ্ড কোম্পানীর কাছ থেকে অথবা ডিস্‌পোজাল থেকে এয়ার কম্‌প্রেসার এবং রবারের নল পাওয়া খুব কঠিন নয়। ফ্লোর র‍্যামার অথবা ব্যাক্‌ফিল ট্যাম্পার প্রচুর না পাওয়া গেলেও ঐ কোম্পানীর অন্যান্য অনেক মেশিন, যেমন ফ্লোর ব্রেকার, পেভিং ব্রেকার, ডিগার ইত্যাদি যথেষ্টই পাওয়া যাবে এবং সেগুলি পরিবর্ত্ত (Substitute) হিসাবে ব্যবহার করা চলবে। এমন কি ঐ কোম্পানীর যে মেশিন সব সময়ে এবং যথেষ্ট পাওয়া যায় সেই "জ্যাক-হ্যামারের" আবর্ত্তনের তিনটা অংশ খুলে রেখে এ কাজে ব্যবহার করা চলবে।

বাংলাদেশে বর্ষাকাল এ ধরণের বাড়ী করার পক্ষে উপযুক্ত সময় নয়। নীচু জমি—যেখানে বর্ষার জল জমে বা বানের জল এসে দাঁড়ায়—এই ধরণের বাড়ীর পক্ষে প্রশস্ত নয়। যেখানে ভাল বেলে মাটি খুব কাছে পাওয়া যায় না তেমন জায়গা নির্ব্বাচন করলে অন্য জায়গা থেকে বালি আনতে এবং তা মাটির সঙ্গে মেশাতে খরচ বেশী পড়ে যাবে। যে মাটিতে গাছের ডালপালা, পাতা, মূল, শিকড় ইত্যাদি মেশান রয়েছে তেমন মাটি এ কাজে ব্যবহার করা ঠিক হবে না; কারণ মাটির সঙ্গে এগুলিও যখন শুকিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে যাবে তখন দেয়ালে ফাটল ধরতে পারে।

ব্যয়সঙ্কোচ প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলে, উপরে কাঠ, টিন অথবা এস্‌বেস্‌টো সিমেণ্ট শীটের বদলে বাঁশ, খড় অথবা গোলপাতা ব্যবহার করা চলতে পারে। পরে সময় এবং সুবিধামত টিন ইত্যাদি লাগান চলবে।

এই প্রবন্ধ লেখায় Ingersoll-Rand Inc-এর বম্বে শাখা এবং তাদের মাসিক পত্রিকা *Compressed Air Magazine* থেকে সাহায্য পেয়েছি।—লেখক

প্রাচীন ভারতে গুপ্তচর নিয়োগ

শ্রীঅজয়কুমার নন্দী

বর্ত্তমানকালে গুপ্তচর নিয়োগ-প্রথা প্রত্যেক রাজ্যেই আছে। তাহারা রাষ্ট্রের অপরিহার্য্য অঙ্গ। শুধু রাষ্ট্রের শাসনকার্য্যের জন্য তাহাদের প্রয়োজনীয়তা নহে, অন্যান্য বিদেশী রাজ্যের যাবতীয় খবরাখবর সংগ্রহের জন্য তাহাদের দরকার। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের গোপন সংবাদ আনিয়া দিয়া তাহারা স্বপক্ষীয় সৈন্যদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। এই বিপৎসঙ্কুল কার্য্যের জন্য চতুর, বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে রাজদূত (ambassador) প্রেরিত হন। পূর্ব্বে তাঁহাদের কার্য্য ছিল, বিদেশী রাজসভায় থাকিয়া তথাকার খবর সংগ্রহ করা। অতি প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন দেশে গুপ্তচর নিয়োজিত হইত। এই প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতে গুপ্তচরগণের নিয়োগ ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

প্রাচীনকালে ভারতে রাজগণকে "চার-চক্ষুঃ" নামে অভিহিত করা হইত। ইহা হইতে বুঝা যায়, তাঁহারা চার (চর) নিয়োগ করিতেন। রামায়ণে আছে, 'যস্মাৎ পশ্যন্তি দূরস্থান সর্ব্বানর্থান নরাধিপাঃ। চারেণ তস্মাদুচ্যন্তে রাজানশ্চারচক্ষুষঃ।" (গোরেসিয়োর রামায়ণ, ৩-৩৭-৯)। অর্থাৎ, যেহেতু রাজগণ দূরস্থিত পদার্থ-সমূহ চারের দ্বারা দেখেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে 'চারচক্ষু' বলা হয়। "(রাজা) চারচক্ষুঃ স্যাৎ।" বিষ্ণু, ৩-২০।

কোন্ সময় হইতে ভারতে গুপ্তচর নিয়োগ-প্রথা প্রচলিত

হইয়াছিল, তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে ঋগ্বেদে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। "বিভ্রদ্রাপিং হিরণ্যয়ং বরুণো বস্ত নির্ণিজম্। পরিস্পশো নিষেদিরে।" ঋক্ সংহিতা ১-২৫-১৩। অর্থাৎ, সুবর্ণময় কবচ ধারণ করিয়া বরুণ নিজের পুষ্ট শরীর আচ্ছাদন করেন। (তাঁহার) সর্ব্বদিকে স্পর্শসমূহ অবস্থিত। যদিও সায়ণ "স্পশ" শব্দের অর্থ "হিরণ্যস্পর্শী রশ্মি করিয়াছেন, তবে ইহার প্রচলিত অর্থ হইল 'চর'। "যথার্হবর্ণ: প্রণিধির পসর্পশ্চর: স্পশ:। চারশ্চ গূঢ়পুরুষশ্চাপ্ত প্রত্যয়িতৌ সমৌ।" (অমরকোষ)।

মনুসংহিতায় চরের কার্য্যাবলী বর্ণিত হইয়াছে। পররাজ্যে চর প্রেরিত হইত তথাকার সংবাদ জানিবার জন্য। অন্ত:পুর-চারিণীদের মনোভাব জানিবার জন্য চর নিয়োগ করা হইত।

"দূত সংপ্রেষণঞ্চৈব কার্য্যশেষং তথৈব চ।

অন্ত:পুরপ্রচারঞ্চ প্রণিধীনাঞ্চ চেষ্টিতম॥ মনু, ৭.১৫৩

অর্থাৎ, দূতকে পররাজ্যে কিরূপে প্রেরণ করা যায়, যে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, অথচ সমাপ্ত হয় নাই, তাহা কিরূপে পরিসমাপ্ত হয়, স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার সখ্যাদি দ্বারা কিরূপে অবগত হওয়া যায়, পররাজ্যে যে সকল চর নিযুক্ত করা হইয়াছে, চরান্তর দ্বারা তাহাদের চেষ্টা কিরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, রাজা এই সকল বিষয় চিন্তা করিবেন।

"কৃৎস্নং চাষ্টবিধং কর্ম্ম পঞ্চবর্গঞ্চ তত্ত্বত:।

অনুরাগাপরাগৌ চ প্রচারং মণ্ডলস্য চ॥ মনু, ৭.১৫৪।

অর্থাৎ, অষ্টকার্য্যের প্রতি রাজার অত্যন্ত মনোযোগ আবশ্যক। এইরূপে পঞ্চবর্গের সর্ব্ববিষয়ক চিন্তা করিবেন। এই পঞ্চবর্গ দ্বারা অমাত্যবর্গের অনুরাগ, বিরাগ জ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ চিন্তা করিবেন এবং মণ্ডলরাজসমূহের কথা অবগত হইয়া তদনুরূপ চিন্তা করিবেন।

কাপটিক, উদাস্থিত, গৃহপতি-ব্যঞ্জন, বৈদেহিকব্যঞ্জন ও তাপসব্যঞ্জন এই পাঁচটি চারের নাম পঞ্চবর্গ। ইহা হইতে বুঝিতে পারি, চরগণ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিল। এক এক রকম চর এক এক রকম উপায় অবলম্বন করিত এবং তদনুযায়ী তাহাদের নাম হইত। কপট ছাত্ররূপে নিয়োজিত চরকে কাপটিক বলা হইত। যে সকল সন্ন্যাসী চররূপে কার্য্য করিত, তাহারা উদাস্থিত নামে পরিচিত। কৃষকরূপে যাহারা নিয়োজিত হইত, তাহারা ছিল গৃহপতি-ব্যঞ্জন। বণিক্-চরগণের নাম ছিল বৈদেহিকব্যঞ্জন। কপট ব্রহ্মচারীগণ তাপসব্যঞ্জন নামে অভিহিত হইত। তাহারা অমাত্য ও রাজপুরুষগণের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত ও মণ্ডল-রাজসমূহের গোপন সংবাদ কৌশলে সংগ্রহ করিয়া রাজাকে জানাইত। যে সকল স্ত্রীলোক নৃপতি-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইত, তাহারা গুপ্তচর কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইত। অপর রাজগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত চরসমূহের উপর তাহারা লক্ষ্য রাখিত। দেশের শাসনব্যবস্থা ব্যতীত, শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার জন্য তাহারা শত্রুদেশে প্রেরিত হইত। এইভাবে প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে একটি সুসংবদ্ধ গুপ্তচর বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

মহাভারতেও চরের উপযোগিতা স্বীকৃত হইয়াছে। সেখানে তাহাদিগকে "রাজ্যের মূল" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বাস্তবিকই গুপ্তচর নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অসীম। শত্রু-মিত্রের কার্য্যকলাপ জানিতে হইলে তাহাদের সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত প্রজাগণের প্রকৃত মনোভাব অবগত হইবার জন্য তাহারা নিয়োজিত হইত। মহাভারতের যুগে রাজ্যমধ্যে গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া শত্রুর গতিবিধি সম্বন্ধে সমস্ত খবর লওয়া হইত। রাজ্যের বাহির ও ভিতরে, জনপদে সর্ব্বত্র চরগণ বিচরণ করিত। অমাত্য, মিত্র, এমন কি, রাজপুত্রদিগের কার্য্যকলাপ পরীক্ষা করিবার জন্য গুপ্তচরসকল নিযুক্ত হইত। পুর, জনপদ এবং সামন্ত-রাজগণের নিকট গুপ্তচর প্রেরিত হইত। এই সকল গুপ্তচর পরস্পরের পরিচয় জানিতে পারিত না। শত্রুপ্রেরিত চরের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য মল্ল-ক্রীড়াস্থান, সমাজ, ভিক্ষুদের আবাসস্থল, পুষ্প-বাটিকা, বহির্বাটিকা, পণ্ডিতগণের সভা, আকর-স্থান, অধিকারিগণের উপবেশন-স্থান, রাজসভা এবং প্রধান লোকের গৃহ, এই সকল স্থানে তাহারা অনুসন্ধান করিত। বিপক্ষের চর ধৃত হইলে তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইত। বিপক্ষ শত্রুদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য চরদিগকে ছদ্মবেশে পাঠানো হইত। পাষণ্ড ও তাপসের বেশে তাহারা পর-রাজ্যে প্রবেশ করিত। শত্রু, মিত্র ও উদাসীনের মনোভাব অবগত হই-বার জন্য রাজা চরদিগকে চক্ষুরূপে ব্যবহার করিতেন। কোন্ ব্যক্তি রাজার প্রতি ভক্তিমান, কে বিরুদ্ধভাবাপন্ন," এই সকল সংবাদ চরগণ রাজাকে জানাইত, "গত দিবসে যে কার্য্য করিয়াছি, প্রজাগণ তাহা পুনর্ব্বার প্রশংসা করিতেছে কিনা, আমার এই কার্য্য প্রজারা যদি জানিয়া থাকে তবে তাহা পুনরায় প্রশংসা করিতেছে কিনা, জনপদ এবং রাষ্ট্রমধ্যে আমার যশ প্রজাদিগের অভিলষিত হইয়াছে কি না," এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য রাজা চতুর্দ্দিকে চর প্রেরণ করিতেন। এই চরবর্গ বিশেষভাবে পরীক্ষিত ও স্বরাষ্ট্রবাসী ছিল।

মৌর্য্যযুগে শাসনব্যবস্থা ছিল শক্তিশালী নরপতির হস্তে। রাজ্যের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইলে গুপ্তচরগণের সাহায্য অপরিহার্য্য। তখন রাজনৈতিক প্রভুত্বলাভের আশায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজকর্ম্মচারীগণ অতিশয় ব্যগ্র ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, মৌর্য্যরাজগণ নিজেদের আত্মীয়স্বজনকে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না, এমন কি, পুত্রগণকেও নয়। কারণ কৌটিল্য বলিয়াছেন, রাজ্যের জন্য পিতা পুত্রগণকে

ঘৃণা করেন এবং পুত্রগণ পিতাকে ঘৃণা করে। আর এক জায়গায় কৌটিল্য বলিয়াছেন, "কর্কটক সধর্ম্মাণো হি জনকভক্ষাঃ রাজপুত্রাঃ।" অর্থাৎ, যেরূপ কর্কট স্বজনককে মারিয়া জন্মলাভ করে, সেইরূপ রাজপুত্রেরাও জন্মদাতাকে ভক্ষণ করিয়া থাকে।" গ্রীক ঐতিহাসিকগণও অনুরূপ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরও এই একই ধরণের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন, "রাজত্ব পুত্র ও জামাতা স্বীকার করে না। রাজার আত্মীয় কেহ নহে।" সুতরাং রাজার জীবন অতি বিপদপূর্ণ ছিল। সেইজন্য রাজারা নিজেদের জীবন ও রাজত্ব রক্ষা করিবার জন্য গুপ্তচরগণের উপর নির্ভর করিতেন। যাহাতে গুপ্তচর-বিভাগ সুপরিচালিত হয়, সে বিষয়ে মৌর্য্য-সম্রাট্গণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন।

এইরূপ রাজনৈতিক পরিবেশে মৌর্য্য-রাজগণ গুপ্তচরদের উপর যে অধিকতর নির্ভরশীল হইবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। এই সকল কারণে, মৌর্য্যযুগে গুপ্তচর-বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এই গুপ্তচরদিগের কথা বলিয়াছেন। এপিসকপই (Episkopoi) নামে এক শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীর কথা এরিয়ান উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের কাজ ছিল, নগরে এবং রাজ্যে কি ঘটিতেছে তাহা রাজাকে জ্ঞাপন করা। ষ্ট্র্যাবো এই শ্রেণীর লোকদিগকে এপরি (Eppori) নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহাদের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "যাহা কিছু ঘটিতেছে, তৎসমুদয়ই পরিদর্শনের জন্য তাহারা নিযুক্ত ছিল এবং গোপনে রাজাকে সংবাদ জ্ঞাত করা তাহাদের কর্ত্তব্য ছিল। উপযুক্ত ও অতি বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ পরিদর্শকের কার্য্যে নিযুক্ত হইত। এরিয়ানের Episkopoi, ষ্ট্র্যাবোর Eppori, জুনাগড় শাসনোক্ত রাষ্ট্রীয় এবং অর্থশাস্ত্রের গূঢ়-পুরুষ সম্ভবতঃ একই শ্রেণীর কর্ম্মচারী।

সুসংবদ্ধ গুপ্তচর-বিভাগের বিবরণ বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। তখনকার দিনে রাজ্যের সকল কর্ম্মচারী গুপ্তচরদ্বারা ভালভাবে পরীক্ষিত হইত। এই গুপ্তচরবর্গ রাজ্যের সর্ব্বশ্রেণীর লোকেদের কার্য্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। রাজ্যের কোন তুচ্ছ ঘটনা গুপ্তচরদের চক্ষু এড়াইতে পারিত না। কোন ব্যক্তি, তিনি সাধারণ প্রজা অথবা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী যাই হউন না কেন, তাহাদের চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারিতেন না। সমস্ত গুপ্তচর একটি কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়দ্বারা পরিচালিত হইত। গুপ্তচর-বিভাগের রাজকর্ম্মচারীগণ (সংস্থানামন্তেবাসিনঃ) ইঙ্গিতে অথবা লিখিয়া অধীনস্থ গুপ্তচরদিগকে নির্দ্দেশ দিতেন। গুপ্তচর কর্ত্তৃক সংগৃহীত সংবাদ কার্য্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষিত হইয়া রাজার নিকট প্রেরিত হইত। এমন কি, স্ত্রীলোকেরাও গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত হইত। যে সকল ব্রাহ্মণ-বিধবা এই বৃত্তি গ্রহণ করিত তাহাদিগকে পরিব্রাজিকা বলা হইত। তাহারা সাধারণতঃ রাজার প্রধান মন্ত্রীর (মহামাত্রকুলানি) বাসভবনে যাতায়াত করিত। যে সকল নারী-গুপ্তচরের মুণ্ডিত মস্তক ছিল, তাহাদিগকে "মুণ্ডা" বলা হইত। শূদ্রা রমণীগণও এই কার্য্যে নিয়োজিত হইত। বারবনিতারাও এই কার্য্যে রাজাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিত। "ভিক্ষুকী" নামে একদল স্ত্রী-গুপ্তচর ছিল। এই সকল গুপ্তচরের মধ্যে যাহারা সদ্বংশ-সম্ভূত, রাজভক্তিপরায়ণ, নির্ভরযোগ্য, ছদ্মবেশ ধারণে পটু, বহু ভাষায় অভিজ্ঞ, রাজা তাহাদিগকে তাঁহার মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, রাজপুত্র, প্রশাস্তৃ, সমাহর্ত্তৃ, সন্নিধাতৃ প্রভৃতি কর্ম্মচারীর যাবতীয় কার্য্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য নিযুক্ত করিতেন। নির্ভরযোগ্য সংবাদ অবগত হইবার জন্য, যাহাতে গুপ্তচরগণ পরস্পরের সহিত পরিচিত না হইতে পারে, রাজা তাহার ব্যবস্থা করিতেন। পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত এইরূপ তিন জন গুপ্তচর একই সংবাদ বহন করিয়া আনিলে তাহা নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু একই বিষয়ে পরস্পরবিরোধী সংবাদ আনয়ন করিলে তাহারা দণ্ডনীয় হইত। প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, কষ্টসহিষ্ণু, মৃত্যুভয়হীন অঙ্গবিদ্যা, যাদুবিদ্যা, জম্ভকবিদ্যা প্রভৃতির অধিকারী ব্যক্তিগণকে এই কার্য্যে নিয়োগ করা হইত। গোপন সংবাদ বহন করিবার জন্য গুপ্তলিপি (গূঢ়লেখ্য) ও পারাবত ব্যবহৃত হইত বলিয়া জানা যায়। ছদ্মবেশ ও কার্য্য অনুযায়ী গুপ্তচরগণ বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত; যথা, কাপটিক ছাত্র, উদাস্থিত, গৃহপতিক, বৈদেহক, তাপস, সত্রী, তীক্ষ্ণ, রসদ, কুহক, প্রচ্ছন্দক, কার্ত্তান্তিক নৈমিত্তিক, মৌহূর্ত্তিক, সিদ্ধ, মুণ্ডা, পরিব্রাজিকা ইত্যাদি।

এই গূঢ়-পুরুষগণ শুধু চোর-দস্যুর সন্ধান করিত তাহা নহে, বর্ত্তমান কালের সংবাদপত্রের ন্যায় তাহারা জনমত পরিচালিত করিত। তাহারা কোন তীর্থস্থানে, গৃহে, জনসঙ্কুল স্থানে এবং উদ্যানে একত্রিত হইত। একজন চর রাজার দোষ প্রচার করিত। আর একজন তাহার অনুযোগ খণ্ডন করিয়া রাজার গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিত, "তাঁহারা (রাজগণ) নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ; অতএব তাঁহারা ইন্দ্র ও যমের তুল্য। তাঁহাদের অবমাননাকারীদিগকে দেবদণ্ড স্পর্শ করে।"

রাজকর্ম্মচারীদের মনোভাব জানিবার জন্য কোন এক চর সন্ন্যাসীর বেশে অবস্থান করিত। একদল গুপ্তচর তাঁহার শিষ্য-রূপে সন্ন্যাসীর গুণকীর্ত্তন করিয়া রাজকর্ম্মচারীদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিত। রাজকর্ম্মচারীগণ তাহাদের গুপ্ত মনোভাব কপট সন্ন্যাসীর নিকট প্রকাশ করিলে, সেই চর তৎক্ষণাৎ রাজাকে তাহা জানাইত। এইভাবে রাজা তাঁহার কর্ম্মচারীদের গোপন মনোভাব অবগত হইতেন

কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য রাজা তীক্ষ্ণ অথবা রসদের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। তীক্ষ্ণগণ উক্ত ব্যক্তিকে নিষ্ঠুরভাবে বধ করিত। রসদেরা বিষ-প্রয়োগে তাহাকে হত্যা করিত। রসদের কার্য্যে সাধারণত: নাপিত (কল্পক), পাচক (অরালিক), স্নাপক, পরিচারক, শয্যাপ্রস্তুতকারী, প্রসাদক প্রভৃতি ব্যক্তি নিযুক্ত হইত। যে ব্যক্তি মুদ্রা জাল করিত, গুপ্তচর তাহার অধীনে ছদ্মবেশে শিক্ষানবীশ হইয়া তাহাকে ধরাইয়া দিত। যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দিত, গুপ্তচর তাহাকে সে কার্য্যে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিত। যে সকল ব্যক্তি চুরি, ডাকাতি করিত ও ব্যভিচারে লিপ্ত থাকিত, গুপ্তচরেরা তাহাদের নিকট যাইয়া বলিত যে, তাহারা মন্ত্রশক্তি দ্বারা পলায়ন করিতে সক্ষম, তাহারা অদৃশ্য হইতে পারে, বদ্ধ দরজা খুলিতে পারে এবং স্ত্রীলোকদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে। তাহারা সেই যুবকদিগকে ছল করিয়া গৃহে প্রবেশ করাইত এবং পরিশেষে কৌশলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিত। এইভাবে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদিগকে গুপ্তচরেরা বন্দী করিত।

রাজা নিজের রাজ্য-বিস্তারের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন রাজ্যে চর প্রেরণ করিতেন। তাহারা সে সকল রাজ্যের ব্যর্থমনোরথ রাজপুত্র ও বিপক্ষীয় দলের সহিত মিলিত হইয়া সেই রাজ্যসমূহে উত্তেজনা ও বিদ্রোহের সৃষ্টি করিত এবং ধ্বংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত হইত। তাহারা শত্রুপক্ষের রসদ নষ্ট করিত, যুদ্ধে নিযুক্ত অশ্ব-হস্তী বিনষ্ট করিত, এমন কি, শত্রুরাজের প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করিতে চেষ্টা করিত। বর্ত্তমান যুগের পঞ্চমবাহিনীর কার্য্যকলাপের সহিত তাহাদের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

কামন্দকীয় নীতিসারে গুপ্তচরের উল্লেখ আছে। শুক্র-নীতিসারেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। 'সূচক' নামে গুপ্তচরের উল্লেখ ইহাতে পাওয়া যায়।

"নৃপেণ বিনিযুক্তো যঃ পরদোষাণুবীক্ষণে
নৃপং সং সূচয়েজ্‌ জ্ঞাত্বা সূচকঃ স উদাহৃতঃ।"

শুক্রনীতিসার ৪-৫-৭২।

অর্থাৎ, রাজার দ্বারা পরের দোষ সন্ধানে নিযুক্ত হইয়া পরের দোষ জানিয়া যে রাজার নিকট নিবেদন করে তাহার নাম সূচক।

পরবর্ত্তীকালে রাজগণ কৌটিল্যের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইলে এই প্রথা নিন্দিত হইতে লাগিল এবং শেষে লোপ পাইয়া গেল।

কঠোপনিষদ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কঠোপনিষদে দেখা যায় যমরাজ নচিকেতাকে তিনটি বর চাহিতে বলিয়াছিলেন। নচিকেতা প্রথম বর চাহিলেন, যেন তাঁহার পিতার ক্রোধ নিবৃত্ত হয় এবং তিনি প্রশান্ত চিত্তে নচিকেতার সহিত কথা বলেন।(১) নচিকেতা দ্বিতীয় বর চাহিলেন এই ভাবে—

"স্বর্গলোকে কোনও ভয় নাই, সেখানে যমের অধিকার নাই, জরা নাই; যাহারা স্বর্গে থাকে তাহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা অতিক্রম করে, শোক পায় না এবং আনন্দে থাকে। যে অগ্নির উপাসনা করিয়া স্বর্গলাভ করা যায় আপনি তাহা জানেন, আমাকে বলুন। যাহারা স্বর্গে বাস করে তাহারা অমৃতত্ব লাভ করে।"(২)

(১) শান্তসংকল্পঃ সুমনাঃ যথাস্যাদ্‌ বীতমন্যুর্গৌতমো মাভিমৃত্যো।
ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীতঃ এতত্ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে।
কঠ—১।১।১০

(২) স্বর্গেলোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে-তীর্ত্বা অশনায়া-পিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।
কঠ—১।১।১২

শঙ্কর বলেন, পুণ্যের ফলে যে স্বর্গলাভ হয় নাচিকেতা তাহার কথাই বলিয়াছেন, রামানুজের মত এই যে, জীব মোক্ষলাভ করিলে যেখানে বাস করে এস্থলে তাহার কথা বলা হইয়াছে। অমৃতত্ব কথাটি মোক্ষ সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা যায়। শঙ্করের মতে স্বর্গে দীর্ঘকাল বাস করা যায় বলিয়া গৌণভাবে অমৃত শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। নচিকেতা বলিয়াছেন, এই "স্বর্গলোকে" কোনও ভয় নাই, শোক নাই, আনন্দে থাকা যায়। কিন্তু দেবতারা অসুরদের দ্বারা পরাজিত হন, দুঃখ ভোগ করেন, যাঁহারা স্বর্গভোগের পরে পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম-গ্রহণ করেন তাঁহাদের জন্য শোক হওয়াও সম্ভব। সুতরাং নচিকেতা যে "স্বর্গের" কথা বলিয়াছেন, মনে হয় তাহা মোক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। কঠোপনিষদের পরবর্ত্তী অংশে দেখা যায় যে, নচিকেতার ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ হইয়াছিল। যাঁহার স্বর্গ-সুখের কামনা থাকে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ হইতে পারে না। নিষ্কাম না হইলে কেহ ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের অধিকারী হয় না। এ জন্যও বুঝিতে হইবে যে নচিকেতার স্বর্গভোগের কামনা ছিল না। সুতরাং দ্বিতীয় বরে

নচিকেতা সাধারণ স্বর্গভোগের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন ইহা বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। দ্বিতীয় বরে মোক্ষ অবস্থাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ইহা বলিলে তৃতীয় বরের সহিত সামঞ্জস্য হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে হইলে চিত্ত নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক। নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞ করিলে চিত্ত নির্ম্মল হয়।৩ দ্বিতীয় বরে সেই নিষ্কাম যজ্ঞেরই উল্লেখ আছে। প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় বল্লীর ১১ শ্লোকে যমরাজ বলিতেছেন যে যজ্ঞের পুণ্যফলের জন্য নচিকেতার কোনও কামনা নাই।(৪) এজন্য ইহা বলা সঙ্গত নয় যে, দ্বিতীয় বরে নচিকেতার ক্ষয়িষ্ণু স্বর্গ-সুখলাভের আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বর্গ অনেক প্রকার আছে। ব্রহ্মলোকও একটি স্বর্গ। জীব সেখানে গেলে আর ফিরিয়া আসে না। নচিকেতা যখন বর প্রার্থনা করেন তখন যমরাজ তাঁহাকে বলেন, এই অগ্নির উপাসনা করিলে "অনন্তলোক" পাওয়া যায়।(৫) শঙ্কর বলেন, স্বর্গে দীর্ঘকাল থাকা যায় বলিয়া ইহাকে "অনন্তলোক" বলা হইয়াছে। রামানুজের-মতে মোক্ষলাভ হইলে আর জন্ম হয় না, এজন্য তাহাকে "অনন্তলোক" বলা যায়—ইহাই "অনন্ত" শব্দের মুখ্য অর্থ। মধ্বাচার্য্যের মতে এখানে স্বর্গলোক বিষ্ণুলোককেই বুঝায়। তিনি "অনন্ত" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "বিষ্ণু"—অনন্তলোক অর্থাৎ বিষ্ণুলোক। উপনিষদ বলেন, এই জ্ঞান "হৃদয়ে নিহিত"। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান এক বস্তু। উপনিষদে বহুস্থলে ব্রহ্মকে "হৃদয়ে নিহিত" বলা হইয়াছে।(৬) স্বর্গরূপ ভোগস্থান বা উহার প্রাপক অগ্নিবিদ্যাকে হৃদয়ে নিহিত বলিবার বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই। বর প্রদান করিয়া যমরাজ বলিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রদত্ত অগ্নিবিদ্যা "অত্যন্ত শান্তির" উপায়।(৭) একথাও মোক্ষকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হওয়াই সমীচীন, সাধারণ স্বর্গ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। শঙ্করও ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—যে অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয় ইহার অর্থ বিরাট পুরুষের অধিকার প্রাপ্ত হয়। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বের উক্তি—এই অগ্নিবিদ্যার দ্বারা সাধারণ স্বর্গলাভ হয়, যুক্তিযুক্ত হয় না। অধিকন্তু মৃত্যুর পর নিম্নলিখিত বিভিন্ন গতির কথা উপনিষদে পাওয়া যায়—(ক) পিতৃযান পথে চন্দ্রলোক, (খ) দেবযান পথে ব্রহ্মলোক ও মোক্ষপ্রাপ্তি, (গ) কীটপতঙ্গরূপে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ। বিরাট পুরুষপ্রাপ্তিরূপ কোনও গতি উপনিষদে উল্লিখিত নাই। সুতরাং "অত্যন্ত শান্তি" বলিলে যদি সাধারণ স্বর্গভোগ না হয় তাহা হইলে ইহাকে মোক্ষপ্রাপ্তিই বলা উচিত—বিরাট পুরুষের অধিকারপ্রাপ্তি বলিবার কোনও সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। যমরাজ পুনশ্চ বলিয়াছেন এই অগ্নিবিদ্যার দ্বারা শোক অতিক্রম করা যায় এবং মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করা যায়।৮ যতক্ষণ না ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিয়া পুনর্জ্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় ততক্ষণ মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন হয় না।৯ সুতরাং বুঝিতে হইবে যে এই বিদ্যার দ্বারা পুনর্জ্জন্ম নিবারণ করা যায় অর্থাৎ মোক্ষলাভ করা যায়।

ইহার পর তৃতীয় বর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। নচিকেতা তৃতীয় বর চাহিতেছেন এই ভাবে:— "মনুষ্য প্রেত হইলে এই যে সন্দেহ হয়—কেহ বলে 'আছে' কেহ বলে 'নাই' এবিষয়ে আমি আপনার নিকট শিক্ষা পাইতে চাহি।"১০ শঙ্কর বলিয়াছেন—মৃত্যুর পর আত্মা আছে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ হয়, সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য এই প্রশ্ন। রামানুজ বলেন, তাহা নহে, মৃত্যুর পর যে আত্মা থাকে এ বিষয়ে নচিকেতার মনে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না, কারণ দ্বিতীয় বরে নচিকেতা বলিয়াছেন, যে অগ্নি উপাসনা করিয়া স্বর্গলাভ করা যায় সেই অগ্নিবিদ্যা কি, অতএব মৃত্যুর পরে যে আত্মা আছে এ বিষয়ে নচিকেতার কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। (আমরাও বলি নচিকেতা মৃত্যু পার না হইলে যমরাজের কাছে যাইতেই পারিতেন না, সুতরাং মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে নচিকেতার সন্দেহই থাকিতে পারে না।) প্রশ্ন হয় তাহা হইলে নচিকেতার সন্দেহ কি? রামানুজ বলেন—নচিকেতার সন্দেহ এই যে মোক্ষলাভ হইলে জীবাত্মা থাকে, না জীবাত্মা পরমাত্মার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়? রামানুজের

---

(৩) তমেব ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন। (বৃঃ উঃ ৬.৪।২২)

(৪) কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরানন্ত্যং অভয়স্যপারং।
স্তোমং মহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ। (কঃ উঃ—১।২।১১)

(৫) এতে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধিত্বমেতন্নিহিতং গুহায়াং।
(কঃ উঃ—১।১।১৪)

(৬) গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং (কঃ উঃ ১।২।১২)
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং (কঃ উঃ ১।২।২০)
ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে (কঃ উঃ ১।৩।১)
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎ স্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং (মুঃ উঃ ৩।১।৭)
এষ ম আত্মা অন্তর্হৃদয়ে (ছাঃ উঃ ৩।১৪.৩)

(৭) ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি (কঃ উঃ ১।১।১৭)

৮। স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে (কঃ উঃ ১।১।১৮)

৯। তমেব বিদিত্বা ইতিমৃত্যুমেতি (শ্বেঃ উঃ ৬।১৫)

১০। যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ। (কঃ উঃ ১।১।২০)

মতে১১—"প্রেতে" শব্দের অর্থ "প্রকৃষ্ট গতি হইবার পরে" অর্থাৎ মোক্ষলাভ হইলে। যতক্ষণ না মোক্ষলাভ হয় ততক্ষণ প্রকৃষ্ট গতি হয় না। কারণ আবার ফিরিয়া আসিতে হয়। মোক্ষপ্রাপ্তি হইলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না—এজন্ত মোক্ষলাভের গতিকে প্রকৃষ্ট গতি বলা যায়। অদ্বৈতবাদ অনুসারে জীবাত্মা বলিয়া কোনও বস্তু নাই, একমাত্র চেতন বস্তু ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, তাহা ভিন্ন অচেতন মন, বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম শরীর এবং রক্তমাংসের স্থূল শরীর আছে; মন বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিযুক্ত পরমাত্মাকেই জীব বলা হয়; মোক্ষলাভ হইলে স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর উভয়ই বিনষ্ট হয়, কেবল পরমাত্মা বা ব্রহ্মই থাকেন; সুতরাং মোক্ষলাভ হইলে জীবাত্মা থাকে না। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, জীবাত্মা চেতন ও অবিনাশী, সুতরাং মোক্ষ হইলেও জীবাত্মা থাকে। নচিকেতার সন্দেহ এই—মোক্ষের পরে জীবাত্মা থাকে কিনা। কেহ বলেন (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী) যে জীবাত্মা থাকে, কেহ বলেন (অদ্বৈতবাদী) যে জীবাত্মা থাকে না—এ স্থলে কোন্ মত সত্য। এই তৃতীয় বর সম্বন্ধে শঙ্করের ব্যাখ্যা অপেক্ষা রামানুজের ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

যমরাজ নচিকেতার প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা আলোচনা করিলেও বোধ হয় যে রামানুজের ব্যাখ্যাই অধিকতর সন্তোষজনক। সে উত্তর এইরূপ: "সেই দুর্দর্শ, গূঢ়ভাবে অবস্থিত, হৃদয়-মধ্যবর্ত্তী শাশ্বত বস্তুকে (ব্রহ্মকে) উপলব্ধি করিয়া হর্ষ ও শোক ত্যাগ করে।"১২ শঙ্করের মতে প্রশ্ন এই ছিল, মৃত্যুর পরে আত্মা থাকে কি না। যদি এই প্রশ্নই করা হইয়াছিল তাহা হইলে উত্তর হইত যে আত্মা থাকে। কিন্তু তাহা না বলিয়া যমরাজ বলিলেন যে, আত্মা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে। মৃত্যুর পরে সকল আত্মাই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে না। কেবল যাহারা মোক্ষলাভ করে তাহাদেরই ব্রহ্মোপলব্ধি হয়। ইহাতে বোধ হয় যে, যাহারা মোক্ষলাভ করে তাহাদের কথাই প্রশ্ন করা হইয়াছিল। মোক্ষলাভ করিবার পরে জীবাত্মা থাকে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে এরূপ বলা যায় যে জীবাত্মা থাকে এবং ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া সংসারের সুখদুঃখ হইতে মুক্ত হয়। পরের শ্লোকে যম বলিয়াছেন, যাহা প্রকৃত আনন্দের বস্তু মুক্ত আত্মা তাহাই লাভ করে, তুচ্ছ সংসারের সুখদুঃখে বিচলিত হয় না।১৩

রামানুজ কঠোপনিষদের যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে সমগ্র উপনিষদটির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠজ্ঞান, এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষলাভই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। বিভিন্ন উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ এবং তাহা লাভের উপায় কি তাহাই বলা হইয়াছে। কঠোপনিষদেও তাহা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় মোটামুটি এই ভাবে বলা যায়, নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে, সেই শুদ্ধ চিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। কর্ম্মের মধ্যে প্রধান পিতামাতার সেবা এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা।১৪ এজন্য দেখা যায়, প্রথম বরে নচিকেতা পিতার প্রসন্নতা, দ্বিতীয় বরে যজ্ঞের দ্বারা অগ্নির উপাসনা, এবং তৃতীয় বরে ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহাই রামানুজ মতের ব্যাখ্যা। শঙ্কর মতে প্রথম বরে পিতার প্রসন্নতা, স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় যজ্ঞ এবং তৃতীয় বরে আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ক প্রশ্ন আছে। তিনটি বরের কথাই যে এক উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা শঙ্করের ব্যাখ্যায় তেমন পরিস্ফুট হয় না, যতটা রামানুজের ব্যাখ্যায় হয়।

---

১১ ব্রহ্মসূত্র ১।২।১২ "(বিশেষণাচ্চ)" এই সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ উপনিষদের পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যের অর্থ বিচার করিয়াছেন।

১২ তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি॥ (কঃ উঃ ১।২।১২)

১৩ এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেতমাপ্য। স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে। (কঃ উঃ ১।২।১৩)

১৪ "দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্" তৈঃ উঃ ১।১১।২

উত্তিষ্ঠত

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

তুমিই নাকি মুক্তিযাগের অগ্নিশিখার ফুল্‌কিতে
জন্মেছিলে কাশ্মীরেরি বীর তনয়,
তুমিই নাকি নির্যাতনের কল্লোলেতে কূল দিতে
দাঁড়িয়েছিলে জন্মভূমির জন্যে নয় ?
তুমিই নাকি অত্যাচারের রক্তমাতাল ঝঞ্ঝাতে
পড়লো যেদিন বজ্র মাথায় ঝন্‌ঝনি',
সত্যাগ্রহের সংগ্রামেরি মৃত্যুমুখর সন্ধ্যাতে
বাজাওনি কি মাভৈঃ তোমার শঙ্খনি ?
তারুণ্যেরি তপ্ত দুপুর সেদিন তোমার সূর্য্য যে
দীপ্ততেজে যাত্রাপথে দিক্‌দাহী,
ছুটিয়েছিল সপ্তঘোড়া বাজিয়ে বিজয় তূর্য্য যে
চিত্ত মোদের নাচতো তোমার মুখ চাহি'।
সেদিন নরমপন্থীদেরি দীপ্ত চরমপন্থী বীর,
ক্লৈব্যশিরে করলে প্রথম বজ্রাঘাত,
তুমিই নাকি সেদিন প্রথম বিদ্রোহেতে উচ্চশির
বিপ্লবেরি চালিয়েছিলে রুদ্রহাত।
ব্রিটিশ-ষড়যন্ত্র বহি' চার্চ্চিলেরি মন্ত্রপূত্
ক্রিপ্‌সে দিলে ব্যর্থ করি মন্ত্র তার,
চক্ষুলাজে টললে নাকো শৌর্য্য তোমার কি অদ্ভুত
বললে সবাই—অবাক্ জহর চমৎকার!
সেই কি তুমি ?—বন্দীবেশে বললে যেদিন জেলখানায়
মুক্ত হয়ে দুর্নীতদের চট্‌কাবো,
মুনফাখোর এই শত্রু যারা জাতির বধের হাত শানায়
গাছের 'পরে তাদের মাথা লট্‌কাবো।
সেই কি তুমি বজ্রমানব ? বিদ্যুতের আজ দীপ্তি কই ?
যাত্রা তোমার আজকে নায়ক কোন্ পথে,
আদর্শেতে অটল জানি—চক্ষে চেয়ে চমকে রই
সব্যসাচি, চড়লে আজি কোন্ রথে ?

দুর্য্যোধনের দুঃশাসনের কাঁপছে না তো চিত্ত আর
তোমার রথের ঘর্ঘরিত ডাক শুনি,'
তোমার শাসন-সিংহাসনের কল্পনারি দিলবাহার
চলছে আজি কোন্ স্বপনের জাল বুনি ?
তোমার বেদীর বোদ্ধারা সব যোদ্ধারা আজ হেঁটমুখে
সামনে তোমার অঙ্গনারা ধর্ষিতা,
ভাইরা তব লক্ষ ছেলের মৃত্যুবলির শেল বুকে
পড়ছ বসে আজকে তুমি কোন্ গীতা ?
গুণ্ডারা সব করছে তোমার সম্মুখেতে আস্ফালন
কন্যা জায়া ভগ্নী মাতার অসম্মান,
ব্রিটিশসাথে যুদ্ধজয়ের সিদ্ধ যাহার দীপ্তমন
কোন্ বিষাদে রইলো সে আজ মুহ্যমান ?
বিষাদ দলি' গর্জ্জে দাঁড়াও ধৈর্য্য-নাশি' শৌর্য্য বীর,
বীর্য্যে জাগুক সর্ব্বজয়ের কল্পনা,
রক্ষা করি সতীত্ব আজ আশিস্‌পূত সব নারীর
জন্মভূমির পা'র তলে দাও আল্‌পনা।
চিন্তা দলো, দুঃখ মোছ নিন্দাকে আজ পায় দলি'
তূর্য্য দাঁড়াও সূর্য্যে তোমার শাঁখ বাজে,
দিক্‌দাহী আজ অগ্নিদেবের উঠুক তোমার তেজ জ্বলি'
পথটি তোমার দিক্ পাহারা দেবরাজে।
শৌর্য্যে তোমার সিন্ধু এবং হিমাদ্রি দিক্ বন্দনা
নদনদীরা বাজাক জয়ের শঙ্খনি,
তারুণ্যেরি তরুণ জহর বজ্রপাখীর চন্দনা
মেঘফেটে আজ গর্জ্জে পড়ো ঝন্‌ঝনি'।
অট্টহাসির ঝঞ্ঝাতে ঐ উলঙ্গিনীর ভীম নাচে
অত্যাচারীর মুণ্ডমালার দীপ জ্বলে,
আর দেরী নয় তূর্ণ এসো দর্পহরা মার কাছে
শয়তানেরা পড়ুক লুটে' পা'র তলে।

আলোচনা

"রামায়ণ ও আয়ুর্বেদ"

শ্রীবিমলাচরণ দেব

গত ভাদ্র মাসের (১৩৫৬) "প্রবাসী"তে শ্রীবাসনা সেন, এম-এ, কাব্যতীর্থ লিখিত "প্রস্থানভেদ" (অনুবাদ) পড়িয়া বড় আনন্দ হইল। লেখনটি মনোজ্ঞ ও বিষয়বস্তু বিবেচনায় প্রাঞ্জল হইয়াছে। তাহা ছাড়া পাদটীকা দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছে।

যতদূর মনে হইল, অনুবাদটি সর্বত্র মূলানুযায়ী হয় নাই। যাহাকে ইংরেজীতে free translation বলে কয়েক স্থলে তাহা হইয়াছে। আমার বোধ হয় এরূপ বিষয় মূলানুযায়ী অনুবাদ করিয়া উপযুক্ত স্থলে পাদটীকাদি দিলে ভাল হয়।

আজ প্রবন্ধের ভিতরকার দুইটি কথা সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি—

১। মধুসূদন সরস্বতী রামায়ণকে মহাভারতের সমপর্যায়ে ফেলিয়া "ইতিহাস" বলিতে চাহেন। ইহা কি ঠিক?

যত দূর জানা যায়, মধুসূদন সরস্বতী আকবরের সমসাময়িক। কিংবদন্তী আছে যে তিনি আকবরের সভায় নাকি একবার গিয়াছিলেন। আকবরের মৃত্যু হয় ১৬০৫ খ্রীঃ। এ অবস্থায় মধুসূদন সরস্বতী কিঞ্চিদূর্ধ্ব ৩৫০ বৎসরের লোক।

এক্ষণে—ভাগবত ১২, ১৩, ৯-১০-এর শ্রীধর টীকায় পাইতেছি—"মহাভারতং ত্বিতিহাসঃ রামায়ণং চ ঋষিপ্রোক্তং কাব্যম্।"

বাণভট্টের "কাদম্বরী"তে পাইতেছি—

"কথাসু নাটকেষু আখ্যায়িকাসু কাব্যেষু মহাভারত-পুরাণেতিহাসরামায়ণেষু সর্বলিপিষু সর্বদেশভাষাসু সর্বশিল্পেষু ছন্দঃসু অণ্যেষ্বপি কলাবিশেষেষু পরং কৌশলমবাপ।"

এখানে দ্রষ্টব্য যে "মহাভারত" ও "রামায়ণ" উভয়ই "ইতিহাস" হইতে ভিন্ন বলিয়া উল্লিখিত। যাহাই হউক, বাণভট্ট মতেও রামায়ণ "ইতিহাস" নহে।

শ্রীধর স্বামী ও বাণভট্ট উভয়েই মধুসূদন সরস্বতীর পূর্বের লোক।

তাহা ছাড়া—আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ৩, ৩, ১-এ আছে—"অথ স্বাধ্যায়মধীয়ীত ঋচো যজুংষি সামান্যথর্বাদিরসো ব্রাহ্মণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসীরিতিহাসপুরাণানীতি।"

এখানে নারায়ণবৃত্তি বলিতেছেন—"ইতিহাসং মহাভারতমাদ্যঃ। যত্র সৃষ্টিস্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াঃ কথ্যন্তে তৎ পুরাণম্।"

নারায়ণের আবির্ভাবকাল ঠিক বলিতে পারি না। তবে মধুসূদন সরস্বতীর পরবর্তী নহেন বলিয়া মনে হয়।

আরও আগেকার কথা বলি—ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৭, ১, ২-এ আছে—"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদ্ আথর্বণং চতুর্থম্ ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্" ইত্যাদি।

এখানে শাঙ্কর ভাষ্য বলিতেছেন—"ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদম্। বেদানাং ভারত-পঞ্চমানাং বেদং ব্যাকরণম্ ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ "ইতিহাসপুরাণ" বলিলে "মহাভারত" বুঝায়। উহাই "পঞ্চম বেদ"। রামায়ণের উল্লেখ নাই।

তাহা ছাড়া শ্রাদ্ধাদি সম্পর্কে ইতিহাসপুরাণ পাঠের যে বিধি আছে, তাহাতে মহাভারত পাঠই দেখা যায়। রামায়ণ পাঠের ব্যবস্থা আছে বলিয়া জানি না। ইহা নেতি-প্রমাণ (negative evidence)। নেতি-প্রমাণ একেবারে উপেক্ষণীয় নয়।

আর একটি নেতি-প্রমাণ, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২, ৪, ১০ ও ৪, ১, ২-এ "ইতিহাসঃ পুরাণম্" আছে।

প্রথম স্থলে শাঙ্কর ভাষ্যে আছে—"ইতিহাস ইত্যুর্বশী পুরূরবসোঃ সংবাদাদিরুর্বশী হাপ্সরা ইত্যাদি ব্রাহ্মণমেব। পুরাণমসদ্বা ইদমগ্র আসীদিত্যাদি।"

এখানে "মহাভারত" বা "রামায়ণ" কাহারও উল্লেখ না থাকিলেও "মহাভারত" টানিয়া আনা যায়। "রামায়ণ" নহে।

তবে মহাভারতের বনপর্বে রামায়ণের গল্প বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হওয়ায় মনে হয় সে সময়ে রামায়ণের আখ্যান দেশে বেশ প্রচলিত ছিল।

কিন্তু এই সমস্ত হইতে মনে হয় যে মধুসূদন সরস্বতী কর্তৃক রামায়ণকে "ইতিহাস" পদবীতে উন্নয়ন সমর্থনযোগ্য নহে।

২। আয়ুর্বেদকে মধুসূদন সরস্বতী "উপবেদ" বলিয়াছেন। "বেদচতুষ্টয়ক্রমেণ" বলিবার ধরণ হইতে মনে হয় যেন তিনি ইহাকে ঋগ্বেদের উপবেদ বলিতেছেন। আয়ুর্বেদ কি উপবেদ?

যত দূর দেখিয়াছি—চরকে এমন কোনও কথা নাই, যাহা হইতে দেখান যায় যে আয়ুর্বেদ একটি উপবেদ, যে বেদেরই হউক।

সুশ্রুতে অবশ্য আয়ুর্বেদকে অথর্ববেদের উপাঙ্গ বলিয়া দাবি আছে—"ইহ খল্বায়ুর্বেদো নাম যদ্ উপাঙ্গম্ অথর্ববেদস্য"। এখানে কথাটি "উপাঙ্গ"। "উপবেদ" নহে। আরও "অঙ্গ" নহে, "উপাঙ্গ" (সুশ্রুত, ১, ১, ৩)।

মহাভারত ২, ১১, ৩৩ (চিত্রশালা) টীকায় নীলকণ্ঠ বলিতেছেন "উপবেদাঃ আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্বশ্চার্থশাস্ত্রকম্" ইতি। ভাষা হইতে মনে হয়, কোনও পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

কিন্তু আকর নির্দেশ নাই। নীলকণ্ঠ ও মধুসূদন পরস্পর সমর্থন করেন।

যাদবপ্রকাশের বৈজয়ন্তীকোশে আছে—

"আয়ুর্বেদো বৈদ্যশাস্ত্রং গান্ধর্বো গীতশাসনম্।

অর্থশাস্ত্রং দণ্ডনীতির্ধনুর্বেদোঽস্ত্রশাসনম্॥

চত্বার উপবেদাস্তে"

ইহাও মধুসূদন সরস্বতীকে সমর্থন করে।

ইহার পর দেখি, অথর্ববেদের সায়ণভাষ্য, উপোদ্‌ঘাতে আছে—"অস্য বেদস্য সর্পবেদাদয়: পঞ্চোপবেদা: অঙ্গত্বেন সমনন্তরং ব্রহ্মণা সৃষ্টা:। তথা চ ব্রাহ্মণম্। "স দিশোঽন্বৈক্ষত প্রাচীং দক্ষিণাং প্রতীচীং উদীচীং ধ্রুবাম্ উর্ধ্বাম্" ইতি প্রক্রম্য পঞ্চ বেদান্ নিরমিমীত সর্পবেদং পিশাচবেদম্ অসুরবেদম্ ইতিহাসবেদম্ পুরাণবেদম্ ইতি" (গোপথব্রাহ্মণ, ১, ১০)। এখানে পূর্বে "উপবেদ" শব্দ থাকায় "বেদান্" প্রৌঢ়ীবাদ বলিয়া বুঝিতে হইবে, বলা বাহুল্য।

এখানে আয়ুর্বেদের উল্লেখ নাই। নেতি-প্রমাণ এরূপ স্থলে উপেক্ষণীয় নহে।

আয়ুর্বেদের উপবেদত্ব সম্বন্ধে যে কয়টি গ্রন্থের উল্লেখ করিলাম, তাহার মধ্যে প্রাচীনতম গোপথব্রাহ্মণ। তাহার দ্বারা আয়ুর্বেদের উপবেদত্ব সমর্থিত হয় না।

ইহাও দ্রষ্টব্য যে মধুসূদন সরস্বতীর মতে আয়ুর্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ। নীলকণ্ঠ ও যাদবপ্রকাশের মতও সেইরূপ মনে হয়। কিন্তু সুশ্রুত মতে ইহা অথর্ববেদের "উপাঙ্গ"।

এখন, তাহা হইলে আয়ুর্বেদ বস্তুত: কি? ইহা "শিল্প" মাত্র। "বেদ"-এর সহিত কোনও সম্পর্ক নাই।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ২,১৮৪তে আছে—

"কৃতশিল্পোঽপি নিবসেৎ কৃতকালং গুরোর্গৃহে।

অন্তেবাসী গুরুপ্রাপ্তভোজনস্তৎ ফলপ্রদ:॥

অর্থাৎ, অন্তেবাসী গুরুগৃহে আসিবার সময় যত দিন সেখানে বাস করিবার কথা দিয়াছেন, সে সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেও সেই অন্তেবাসী "কৃতশিল্প" অর্থাৎ তাঁহার শিল্পশিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়া গেলেও, তিনি পূর্বনির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়া পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস করিবেন।

এখানে মিতাক্ষরা টীকা বলিতেছেন—"অন্তেবাসী গুরোর্গৃহে কৃতকালং বর্ষচতুষ্টয়ম্ আয়ুর্বেদাদিশিল্পশিক্ষার্থং ত্বদ্‌গৃহে বসামীতি যাবদঙ্গীকৃতং তাবৎকালং বসেৎ, যদ্যপি বর্ষ চতুষ্টয়াদ্ অর্বাগেব লব্ধাপেক্ষিতশিল্পবিদ্য:।

এখানে স্পষ্টই আয়ুর্বেদকে "শিল্প" বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থীকে "অন্তেবাসী" বলা হইয়াছে। আয়ুর্বেদ "বেদ", "উপবেদ" বা তৎসম্পর্কীয় কিছু হইলে "অন্তেবাসী" না বলিয়া "শিষ্য" পদ প্রযুক্ত হইত। "শিষ্য" বেদবিদ্যার্থী, "অন্তেবাসী" শিল্পবিদ্যার্থী।

এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয় যে আয়ুর্বেদ শিল্পমাত্র, "উপবেদ" হওয়ার দাবি সমর্থনযোগ্য নহে।

ভারত দর্শনসার—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা চার আনা।

ভারতের মুখ্য দর্শনগুলির সাধারণ পাঠকের উপযোগী পরিচয়প্রদান আলোচ্য গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থের প্রারম্ভে দর্শনসম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ কথার অবতারণা করা হইয়াছে। মানব-সভ্যতার কোন্ অবস্থায় দর্শনের উৎপত্তি হইল—মনুষ্যসমাজে দার্শনিকের স্থান কোথায়—দর্শনের স্বরূপ বা আলোচ্য বিষয় কি সাধারণ ভাবে এবং বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের দিক্ দিয়া এই সমস্ত প্রশ্নের আলোচনা এই প্রসঙ্গে করা হইয়াছে এবং ভারতীয় দর্শনের শ্রেণীবিভাগ ও পৌর্বাপর্য সমস্যার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। তার পর চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিনটি নাস্তিক বা বেদবিরোধী দর্শনের পরিচয় দিয়া সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা ও বেদান্ত এই ক্রমানুসারে আস্তিক বা বেদানুগ দর্শনগুলির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। উপসংহারে দর্শনের শাখা প্রশাখা হিসাবে শৈবদর্শনের উল্লেখ করিয়া তন্ত্রসাহিত্যের দার্শনিক মূল্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হইয়াছে—হিন্দু দর্শনের সমন্বয়সাধনের চেষ্টার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে এবং মুসলমান প্রভাবের আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে যে ভারতীয় দর্শনে ইসলামিক দর্শনের প্রভাবের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। পরিশেষে ভারতের বাহিরে ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারা কতটা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহার আভাস দিয়া ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহার ত্রুটি ও অপূর্ণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। খুঁটিনাটি বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত স্থানে স্থানে মতভেদ থাকিলেও একথা অসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছি যে, গ্রন্থখানি স্বল্প পরিসরের মধ্যে ভারতীয় দর্শনের একটি মনোরম চিত্র বাঙালী পাঠকসমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অভাব দূর করিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ফেলোসিপের বক্তৃতা এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হইলেও বর্তমানে অপ্রাপ্য এবং সাধারণ পাঠকের নিকট অপেক্ষাকৃত দুরূহ। আলোচ্য গ্রন্থখানি সুপাঠ্য—ইহার স্বচ্ছ জড়তাহীন ভাষা পাঠককে তৃপ্ত করিবে। মতভেদের প্রসঙ্গে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করি। তন্ত্র-সাহিত্য সম্পর্কে গ্রন্থকারের মন্তব্য একদেশদর্শী। তন্ত্রের দার্শনিক অংশ বাংলাদেশে তেমন প্রচলিত না হইলেও একেবারে অপরিচিত বা কম মূল্যবান্ নহে। তাহা ছাড়া বাংলাদেশে এক যুগে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে বহুল প্রচলিত যে সব তান্ত্রিক গ্রন্থের ও আচারের উল্লেখ শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার করিয়াছেন, সর্বভারতীয় তান্ত্রিক সমাজে তাহাদের স্থান খুব উচ্চে নয়—তাহাদের প্রামাণ্যও অসন্দিগ্ধ নহে—এ কথা বিস্মৃত হইলে ভুল করা হইবে। তারপর, নব্য ন্যায়ের ভাষার জড়তা ও কাঠিন্য নৈয়ায়িকদিগের ভাষাজ্ঞানের অভাবের পরিচায়ক বলিয়া গ্রন্থকার মহাশয় যে অভিমত

প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও সুসঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি না। বস্তুতঃ নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে ভাষার সৌন্দর্যরসিক কবিও যে ছিলেন না এমন নয়। তবে পরিমিত সংশয়রহিত কথার মধ্য দিয়া কর্কশ তর্কের বিষয় নিখুঁতভাবে প্রকাশ করিতে যাইয়া ভাষার কাঠিন্য অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজীতেও এজাতীয় অবস্থা একেবারে দেখা যায় না এমন কথা বলিতে পারা যায় কি? একটা অভাবের উল্লেখ করিয়া সমালোচনা শেষ করিব। কোন কোন দর্শনের সাহিত্যের কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এরূপ পরিচয় সকল স্থানেই থাকিলে ভাল হইত। আশা করি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহা থাকিবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

প্রতিশোধ (কিশোর-নাট্য)—'স্বপনবুড়ো'। শ্রী পাবলিশিং লিমিটেড। ২০৩।৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

আমাদের ছেলেবেলায় 'স্বপনবুড়ো' যখন স্ব-নামে লিখতেন, আমরা মুগ্ধচিত্তে তাঁর লেখা পড়তাম। আজকাল তিনি ছদ্মনামের আড়ালে লিখলেও—তাঁর রচনা ঠিক তেমনিভাবেই আমাদের মনকে আকর্ষণ করে; 'স্বপনবুড়ো'র লেখার এমনি যাদু যে, ছেলেরা তা পড়ে মুগ্ধ হয় আর বয়স্করাও তা থেকে প্রচুর আনন্দ পান। 'প্রতিশোধ' একখানি শিক্ষামূলক কিশোর-নাটক। কিন্তু কুশলী নাট্যকার এমন নিপুণ ঘটনাবিন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রতিপাদ্য বিষয় ফুটিয়ে তুলেছেন যে, কোথাও বক্তৃতা বা উপদেশ-দানের কষ্ট-কল্পনা বা প্রয়াস নেই। একটি সুসম্বদ্ধ গল্পের সাহায্যে হাল্‌কা ঢঙে 'স্বপনবুড়ো' একটি গুরু-গম্ভীর মূল নীতিকে নাটকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং তাতে বেশ সাফল্যলাভও করেছেন। শিক্ষায়তন এবং কিশোর-সংঘ কর্তৃক এই শিক্ষামূলক অথচ রসসমৃদ্ধ নাটকখানি অভিনীত হওয়া উচিত। কিশোর জীবনগঠনে এই ধরণের সাহিত্যের প্রচার এবং প্রসার হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

শিল্পী (নাটক)—শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান—২৫, গোবিন্দ ঘোষাল লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা। দেড় টাকা।

বাংলা রঙ্গমঞ্চ ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটক আঁকড়ে পড়ে আছে, যেখানে নতুন নাট্যকারের প্রবেশাধিকার সঙ্কুচিত—এমন অভিযোগ প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় এবং তা অতিরঞ্জিত বা অসঙ্গতও নয়। কিন্তু মঞ্চের আওতা হতে মুক্ত থেকে অর্থাৎ ফরমায়েসী লেখা ছাড়াও যদি নতুন নাট্যকাররা 'শিল্পী'র মত ভঙ্গুর স্বপ্ন-বিলাসিতা সর্বস্ব নাটক লেখেন, তবে বলিষ্ঠ চিন্তাধারার বাহক নূতন নাটক মঞ্চস্থ করবার দাবিকেই পরোক্ষভাবে দুর্বল করা হয় নাকি? নতুন নাট্যকারকে কোন ভাবেই নিরুৎসাহ করতে চাই না—শুধু কামনা করি তাঁর লেখনী সত্যিকার প্রগতিমূলক নব ভাবধারার বাহক নাটক-রচনায় জয়যুক্ত হোক।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

কাস্তলাঙের কলিকাতা দর্শন—লেখক ও প্রকাশক: প্রোফেসার জে. চৌধুরী এম-এ। ৬০।১এ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২।

পুস্তকখানি রসরচনা হিসাবে সার্থক হয় নাই। তিনি যে ধরণের হাস্যরস সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা উচ্চস্তরের নহে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত
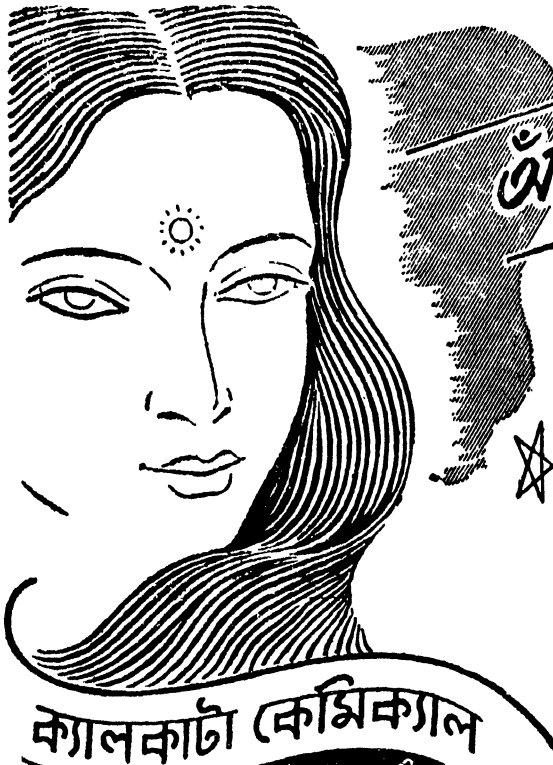
করনীতি ও ভারতের রাজস্বনীতি—৺হৃদয়গোপাল সেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত। বুক কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা। পৃ. ৭২। দাম দুই টাকা।

বঙ্গভাষায় অর্থনীতিবিষয়ক পুস্তকের সংখ্যা অধিক নহে। এই অভাব মিটাইবার জন্ম ইদানীং যে সকল লেখক অগ্রণী হইয়াছিলেন ৺হৃদয়গোপাল সেন তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার লিখিত 'টাকার কথা' বাংলার সুধীসমাজে প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছে। বঙ্গভাষার মাধ্যমে অর্থনীতির মূল সূত্রগুলির ব্যাখ্যান ও সাধারণ পাঠকের সম্মুখে তাহা উপস্থাপিত করিবার পথও তিনি দেখাইয়া ছেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে করনীতির সাধারণ সূত্রগুলি অতি সুন্দরভাবে পরিবেশন করা হইয়াছে। করনীতি অর্থশাস্ত্রের একটি প্রধান শাখা। করের আবশ্যকতা, করের প্রকারভেদ, করের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনে সামাজিক কল্যাণ কিরূপে সংসাধিত হইতে পারে, ধনোৎপাদনের উপর বিভিন্নরূপ করের কিরূপ প্রভাব, আধুনিক রাষ্ট্রে ধনবৈষম্য দূরীকরণে ইহার কার্য্যকারিতা কিরূপ ইত্যাদি বিষয়ের সুষ্ঠু পর্য্যালোচনা দ্বারা পুস্তিকাখানিকে অতিশয় চিত্তাকর্ষক করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতের রাজস্বনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। পরাধীন জাতির রাজস্বনীতিতে কিরূপ দুর্নীতি প্রকাশ পাইয়াছিল ভারত-সরকারের আয়ব্যয়ের সম্যক্ আলোচনা করিয়া লেখক তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। কোম্পানীর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত স্বাধীন হইবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে নীতি অনুসৃত হইয়াছে তাহা যে দেশগঠন তথা জাতি-গঠনের অনুকূল নহে ইহা অনস্বীকার্য্য। সরকারী ঋণগ্রহণ ব্যাপারেও উক্ত নীতির কোনও রূপ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই।

অল্প কথায় অধিক তথ্য পরিবেশনে লেখকের খ্যাতি আছে। আলোচ্য গ্রন্থেও তিনি তাঁহার সেই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। স্বাধীন দেশের নূতন পরিবেশে ইহার বহুল প্রচার সুনিশ্চিত। করনীতির প্রাথমিক জ্ঞানলাভ যাঁহাদের উদ্দেশ্য তাঁহাদের নিকট ইহার সমধিক সমাদর হইবে।

শ্রীনকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বীরেশ লাহিড়ী—শ্রীদমর সরকার। এইচ সরকার এণ্ড সন্স. ৩এ লাইব্রেরী রোড, কালীঘাট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা বার আনা।

এই উপন্যাসখানি ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। বাংলা সিনেমার বই সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে ইহাও ঠিক সেই ধরণের। আজগুবি কাহিনী, অস্বাভাবিক চরিত্রসৃষ্টি, অসম্ভব ঘটনাসংস্থান সব-কিছুতে মিলিয়া বইখানি উদ্ভট কল্পনার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইহাতে জাল, জুয়াচুরি, খুন, নারীহত্যা কিছুরই অভাব নাই, এবং উপসংহারে নায়ক বীরেশ লাহিড়ীর পটাসিয়াম সায়নাইড খাইয়া আত্মহত্যা পর্যন্ত আছে। যেমন প্লট তেমনি অপূর্ব্ব শব্দ প্রয়োগ—যেমন মরাল ভ্রূ, নিজেকে সামলিয়ে নেবো, দারিদ্র্যসাপ, বীরেশ মদনদেবের শরাহত, আত্মন্তর রূপ।

পর্দ্দায় এক শ্রেণীর দর্শক এই শ্রেণীর ওঁচা ছবি দেখিয়া পুলকিত হইতে পারে কিন্তু ইহার সাহিত্যিক মূল্য এক কাণাকড়িও নাই।

রোলাঁর আলোকে গান্ধীজী—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু। ভারতী বুক ষ্টল। রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা আট আনা।

ফরাসী মনীষী রম্যা রোলাঁ ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনকামী এবং তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, এই মিলন সাধিত হইবে আধ্যাত্মিকতার ভিতর দিয়া। সেইজন্ত বর্ত্তমান ভারতের সেই সকল মহামানবের প্রতিই তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যাঁহাদের জীবনের সাধনা ছিল ধর্ম্মের ভিতর দিয়া মানবজাতির ঐক্যবিধান—তাঁহার নিজের কথায়—human unity through God। এক বিরাট ভাব-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া রোলাঁ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ এবং মহাত্মা গান্ধীর জীবনের যে ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে যোগসূত্র রচনার কার্য্যে বিশেষভাবে সহায়ক হইবে। রোলাঁর নিকট গান্ধীজী শুধু যে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মূর্ত্ত বিগ্রহই ছিলেন তাহা নয়, তিনি ছিলেন Hero of action বা কর্ম্মবীর। এই মহাসাধক কর্ম্ম-বীরের জীবনের উপর রোলাঁ অভিনব আলোকসম্পাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

রবীন্দ্রবাবুর 'রোলাঁর আলোকে গান্ধীজী', রোলাঁকৃত গান্ধীজীবনীর ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে লিখিত। রচনার আন্তরিকতার গুণে বইখানি পাঠকদের ভালো লাগিবে। লেখক রোলাঁর আলোকে গান্ধীবাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং গান্ধীজীর জীবনাদর্শ বিশ্লেষণে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

ভারতের স্বাধীনতা আনলেন যাঁরা—শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশবন্ধু বুক ডিপো। ৮৪এ, বিবেকানন্দ রোড, কলি-কাতা—৬। মূল্য—এক টাকা চারি আনা।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে রাশি রাশি পুস্তক বাহির হইয়া বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশই নামকরা কতকগুলি বইয়ের গিলিতচর্ব্বণ মাত্র। সেগুলি দ্বারা পাঠকের কিছুমাত্র জ্ঞানবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্বন্ধে শিশুদের জন্য যে সকল পুস্তক রচিত হইতেছে সেগুলি এত বাজে গালগল্প ও মনগড়া ভুল তথ্যে পরিপূর্ণ যে, শিশুদের দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধি করা ছাড়া সেগুলির অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সমালোচ্য পুস্তকখানি তাহার ব্যতিক্রম। লেখক অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের উপযোগী করিয়া অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় বইখানি লিখিয়া-ছেন। ইহাতে কোথাও অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস নাই বা সত্যকে বিকৃত বা অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাইবার প্রয়াস নাই। পুস্তকের গোড়ায় অতি সংক্ষেপে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে সুকুমারমতি শিশুদের ঠিক ততটুকু তথ্যই পরিবেশন করা হইয়াছে যতটুকু তাহাদের পক্ষে গুরুপাক নহে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস যাঁহাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও দুঃখবরণের কাহিনীতে সমুজ্জ্বল তন্মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, সরোজিনী নাইডু, জবাহরলাল, সুভাষচন্দ্র, ক্ষুদিরাম এই কয়জনের জীবন ও কর্ম্মসাধনার কথা এই পুস্তকে বলা হইয়াছে। রচনার গুণে প্রত্যেকটি জীবনী গল্পের মত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। উপসংহারে 'স্বাধীন ভারতের মর্ম্মবাণী' অধ্যায়ে ভারতের আদর্শ যে সমগ্র পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা লেখক সে কথা শিশু-দের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বইখানি শিশুদের শুধু জ্ঞানবৃদ্ধিই করিবে না, ইহা তাহাদের কোমল হৃদয়ে দেশপ্রীতির বীজ বপন করিবে এবং তাহাদিগকে মহৎ জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবে। দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দের কতকগুলি রেখাচিত্র এই পুস্তকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

যুগবাণী—কাজী নজরুল ইসলাম। দ্বিতীয় সংস্করণ. নূর লাইব্রেরী। ১২।১, সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা। মূল্য—আড়াই টাকা।

অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের যুগে প্রতিক্রিয়াশীল ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে কাজী নজরুল ইসলাম দৈনিক নবযুগ পত্রে যে সকল প্রবন্ধ লেখেন তন্মধ্যে কতকগুলি 'যুগবাণী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। রাজদ্রোহের গন্ধ পাইয়া তদানীন্তন সরকার এই পুস্তকের প্রকাশ ও প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। বর্ত্তমান জাতীয় সরকার

সম্প্রতি এই পুস্তকের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করায় বহুদিন পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে 'নবযুগ', 'ডায়েরের স্মৃতিস্তম্ভ' 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান', 'রোজ কেয়ামত বা প্রলয় দিন', 'বাঙালীর ব্যবসাদারী' প্রভৃতি ২১টি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। প্রবন্ধগুলি উচ্ছ্বাসবহুল। কিন্তু এগুলিতে জ্বলন্ত দেশপ্রেম, পরাধীনতার তীব্র জ্বালা, এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলনাকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত।

হিন্দু সমাজের গড়ন—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—আড়াই টাকা।

সমালোচ্য পুস্তকখানি বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থের লেখক একজন বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্। তিনি নৃতত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণশাসিত ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থাকে যেমনটি দেখিয়াছেন তাহাই তথ্য প্রমাণ পরিসংখ্যানাদি statistics সহ প্রকাশ করিয়াছেন।

লেখকের প্রতিপাদ্য এই যে, বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদই ছিল হিন্দু সমাজের মূল ভিত্তি। এই ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন কর্ম্ম ও শিল্পবৃত্তির উপর মানুষের মৌলিক অথবা জাতিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই "বর্ণ ব্যবস্থার মূলে একটি বুদ্ধি ছিল, মানুষ সমাজের দাস। সমাজের জন্য নির্দ্ধারিত সেবা করিয়া কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষী স্বীয় জীবনযাপন করিয়া থাকে। সমাজকে তাহারা দেখে এবং সমাজও তাহাদের দেখে।" (পৃ ১০৩)। ব্যষ্টি এবং সমাজ উভয়ে এই দায় সম্বন্ধে যতদিন সচেতন ছিল ততদিন হিন্দু সমাজের আর্থিক স্থৈর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায় নাই। বর্ণ-ব্যবস্থানিয়ন্ত্রিত এই আর্থিক সংগঠনের উপর প্রথম আঘাত লাগিল মুসলমান অধিকার কালে। রাজা বাদশাদের মর্জ্জি অনুসারে কোন কোন শিল্পে কৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ঘটিল শুধু শহরে, গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর কৌলিক বৃত্তি পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল। কিন্তু এই বর্ণ ব্যবস্থা তথা আর্থিক সংগঠনের মূলে ভাঙন ধরিতে সুরু হইল প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রিটিশ আমলে, ইউরোপের প্রচুর উৎপাদন-ব্যবস্থামূলক ধনতন্ত্রের সংঘাতে। ইহার ফলে আমাদের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে এবং সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। "মুচি চাষী হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ঔষধের দোকান করিতেছে—" ইত্যাদি (পৃ. ১২৩)।

লেখক প্রাচীন বর্ণ-ব্যবস্থার দোষগুণ সবই খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু একথা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, এত সব বিপর্য্যয় এবং ঘাতপ্রতিঘাত সত্ত্বেও হিন্দু সংস্কৃতি যে বিনষ্ট হইয়া যায় নাই তার কারণ ব্রাহ্মণ-শাসিত বর্ণাশ্রম যাহা ব্যক্তি এবং সমাজের সংশ্লেষে এক অভিনব উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল—আপাতদৃষ্টিতে সঙ্কীর্ণ এবং স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত মনে হইলেও যাহার মধ্যে উদারতার অভাব ছিল না। এই ভারতীয় বর্ণাশ্রমই হিন্দু আচার অনুষ্ঠান অবলম্বনকারী উরাও প্রভৃতি আদিম জাতিকে পর্য্যন্ত আপন বক্ষে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা আজ আর যুগোপযোগী নহে। কিন্তু যে ব্যবস্থা একটি বিরাট জাতির মহান্ সংস্কৃতিকে যুগ যুগান্তর ধরিয়া টিকাইয়া রাখিয়াছে তাহার গুণ সম্বন্ধে অন্ধ হইলে আমাদের নিজেদের কল্যাণই যে ব্যাহত হইবে লেখক সেকথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। উপসংহারে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া শুনাইয়াছেন—"আমরা যেন না ভাবি যাহা পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি তাহার সবই বলি। তাহার মধ্যেও যে সোনার দানা আছে, এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার উদ্দেশ্য।"

লেখকের এই উদ্দেশ্য অনেকখানি সার্থক হইয়াছে। ভারতীয় বর্ণব্যবস্থাকে আমরা এক ভাবে দেখিতে অভ্যস্ত, কিন্তু তাঁহার নিপুণ ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে আমরা ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক সংগঠনকে এক নূতন রূপে দেখিতে পাইলাম। বর্ণাশ্রম ও আমাদের আর্থিক সংগঠন যে এমন অঙ্গাঙ্গি ভাবে বিজড়িত ছিল এ বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়া তিনি সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার একটি নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছেন। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী যেমন অভিনব তেমনি সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের মত জটিল বিষয়কে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতাও তাঁহার অপরিসীম। এক কথায়, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিকের, কিন্তু প্রকাশভঙ্গী সাহিত্যিকের।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ব্যবসায়ীর বিলাত-ভ্রমণ—শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এরিয়ান প্রেস এণ্ড পাবলিসিটি সে: লিঃ, ১২ চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা, মূল্য—২॥০

স্টক এক্সচেঞ্জ অব বেঙ্গলের সভাপতি ও বিখ্যাত ব্যবসায়ী শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ব্যবসায় উপলক্ষে বিলাত-ভ্রমণ কালে ইংলণ্ডের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, রাজনীতি, সমাজ, স্বাস্থ্য ও খাদ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয় সম্বন্ধে যে ধারণা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তাহা 'উত্তরা' নামক মাসিকে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমানে লেখক গ্রন্থাকারে তাহা পাঠককে উপহার দিয়াছেন। রয়েল আকারে আটপেজি চিকন কাগজে মুদ্রিত এবং বহু আলোকচিত্র ও উৎকৃষ্ট মলাটে শোভিত বইখানির বাহ্য সৌষ্ঠব নয়নমুগ্ধকর। ব্যবসায়ী হইলেও লেখকের শিল্পীর দৃষ্টি আছে, একটা জাতির জীবনের বহুমুখী অভিব্যক্তিকে দেখিবার চোখ আছে। খেলা-ধূলা ও আমোদ-প্রমোদ হইতে রাজনীতি ও শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি সকল বিষয়েই তাঁহার সজাগ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রলয় শিখা—শ্রীনজরুল ইসলাম। নূর লাইব্রেরী, ১২।১, সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা। মূল্য ২॥০

মহাত্মা গান্ধীর লবণ-সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সময় বইখানি প্রকাশিত হইবামাত্র রাজরোষে পতিত হইয়া কবি কারারুদ্ধ হন ও বইখানি বাজেয়াপ্ত হয়। গান্ধী-আরউইন চুক্তির সময় কবি মুক্তি পান। দেশ স্বাধীন হইবার পর সরকার বইখানির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইয়াছেন। ইহাতে 'প্রলয়-শিখা', 'নমস্কার', 'রক্ত তিলক', 'শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্র', 'চাষার গান', 'সমর-সঙ্গীত', 'হবে জয়', 'বহ্নি-শিখা', যতীন দাস', 'নব-ভারতের হলদীঘাট' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতাগুলি আছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদসার—শ্রীশ্যামাচরণ দেবদাস। বীরশ্রী, শ্রীহট্ট হইতে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ।০+৭২+৩ পৃষ্ঠা, মূল্য দশ আনা।

গ্রন্থকার অশীতিপর বৃদ্ধ। যে বয়সে আধ্যাত্মিক জীবনের পাথেয় সংগ্রহ আত্মকল্যাণেচ্ছু মানবের কর্ত্তব্য, সেই পরিণত বয়সে অনলস দেহ-মন লইয়া তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের পরম সাধনীয় তত্ত্ব একাদশ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষাংশ হইতে ঊনত্রিংশ অধ্যায় মন্থনপূর্ব্বক এই শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদসার সরল পদ্যছন্দে পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। যদুবংশ ধ্বংস-লীলার সময়ে, তিরোভাবের পূর্ব্বক্ষণে নিত্যপার্ষদ শ্রীউদ্ধবের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমূল্য কথোপকথন হইয়াছিল। ভগবানের নির্দ্দেশেই উদ্ধব পরমগতি লাভ করিয়াছিলেন। ভাগবতের দুরূহ তত্ত্ব ও রস মূল হইতে আস্বাদন সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না, এ জন্য এই সরল পদ্যানুবাদ সকলের পক্ষেই পারমার্থিক কল্যাণকর।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আমরা ক্যালকাটা কেমিক্যাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'বাঙালীর পাঁজি, ১৩৫৭' পাইয়াছি। ইহাতে দিন তারিখ ব্যতীত সাধারণের জ্ঞাতব্য আরো অনেক বিষয় আছে।

ব.

বল্লভপুরে অবৈতনিক কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠান

গত ১৬ই এপ্রিল শ্রীরামপুরে বল্লভপুর ঠাকুরবাটী ষ্ট্রীটস্থ ৺বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবনে 'সবুজ সঙ্ঘ অবৈতনিক শিক্ষায়তন' নামে একটি কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির সহঃ-সম্পাদক শ্রীশ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। স্থির হইয়াছে, আপাততঃ টেলারিং, কারপেণ্টারী ও বুক বাইণ্ডিং বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। প্রতিষ্ঠানটির কার্য্য পরিচালনার জন্য শ্রীদাশুরথী গুপ্ত মহাশয়কে স্থায়ী সভাপতি করিয়া ও ১৩ জন উৎসাহী নাগরিককে লইয়া একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে।—'নির্ণয়', ১৬ বৈশাখ।

শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি

বিগত ১৪ই এপ্রিল বেদান্ত ধর্ম্মের মূর্ত্ত প্রতীক শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি দেহত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি বঙ্গদেশে তেমন পরিচিত না হইলেও সমগ্র দাক্ষিণাত্যে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে, এমন কি পাশ্চাত্যেও তাঁহার ভক্ত এবং অনুরাগীর অভাব ছিল না। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক আত্মানুসন্ধিৎসু সত্যানুরাগী ব্যক্তি এই কৌপীনধারী মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক শক্তির কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। তাঁহার পাশ্চাত্ত্য ভক্তদের মধ্যে ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক পল ব্রাণ্টন, বিশ্ববিখ্যাত জার্ম্মান মনঃসমীক্ষক ডঃ জীমার, মিঃ ফ্রেডারিক ফ্লেচার, মেজর চ্যাডউইক, মিস্ ইথেল মারটন, মিস্ ম্যালেট প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গীতায় জিতাত্ম, প্রশান্ত, কূটস্থ, বিজিতেন্দ্রিয় প্রভৃতি যোগীর যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষির মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

এই মহাপুরুষ মাদুরার নিকট এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন আইনজীবী। পূর্ব্বাশ্রমে রমণ মহর্ষির নাম ছিল বেঙ্কট রমণ। সপ্তদশ বৎসর বয়সে স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে আধ্যাত্মিক প্রেরণায় তিনি গৃহত্যাগ করেন। তিরুবন্নমালাই শহরে জ্যোতির্লিঙ্গ অরুণাচলেশ্বর মূর্ত্তির নিকট তিনি প্রথমে ধ্যানস্থ হন। শেষে লোকালয়ে ধ্যান-ধারণায় বিঘ্ন ঘটে বলিয়া অরুণাচল পর্ব্বতে চলিয়া যান। তথায় পর্ব্বতগুহায়

শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি

আত্মগোপন করিয়া তিনি দুশ্চর তপশ্চর্য্যায় ব্রতী হন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি অরুণাচল শৈলের পাদমূলে তাঁহার জন্য ভক্তগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত আশ্রমে বাস করিতেন। এই আশ্রম "শ্রীরমণাশ্রম" বলিয়া পরিচিত।

সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য মহর্ষির গুরুকরণের আবশ্যকতা হয় নাই। তাঁহার উপদেশাবলী সহজ সরল। "আমি কে" এই আত্মানুসন্ধান হইতেই আত্মোপলব্ধি হয়—ইহাই এক কথায় মহর্ষির তত্ত্বোপদেশের সার। স্বয়ং অদ্বৈতবাদী

বৈদান্তিক হইলেও তিনি জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের মধ্যে কোনও পার্থক্য স্বীকার করিতেন না। দীক্ষা বা অযাচিত উপদেশ তিনি কাহাকেও দেন নাই। তবে কাহারও কোন বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেন। তাঁহার কেহ মন্ত্রশিষ্য নাই, সকলেই তাঁহার ভক্তমাত্র। দেশ-দেশান্তর হইতে আগত হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্সী, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের নরনারী তাঁহার সঙ্গসুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন।

সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ একবার তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "ঈশ্বরময় জীবনের একটি জীবন্ত বিগ্রহ, মনুষ্যসত্তার মুকুরে দিব্যজীবনের একটি পরিপূর্ণ মূর্ত্তি যে আমাদের মধ্যে আজ বিরাজ করিতেছেন ইহা আমাদের সৌভাগ্য।"

এই মহাপুরুষ কিছুকাল যাবৎ রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার প্রশান্ত সহাস্য মুখ দেখিয়া ধারণা করা যাইত না যে, তিনি শারীরিক কষ্ট পাইতেছেন। শারীরিক ক্লেশ তাঁহার আত্মার দীপ্তিকে ম্লান করিতে পারে নাই। এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের তিরোধানে ভারতবর্ষ একজন শ্রেষ্ঠ সাধককে হারাইল।

শ্রীনীলিমা মজুমদার

চারুচন্দ্র মিত্র

স্বদেশী যুগের সময়ে চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় এটর্ণি ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। সেই সময়ে দেশে যে জাগরণ দেখা যায়, তাহার মধ্যে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা একটা বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি পুনরুদ্ধার করিয়া আমাদের বালক-বালিকা এবং যুবকদের নূতন শিক্ষা দিতে হইবে—এই আদর্শের মধ্যে চারুচন্দ্র বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহার নীরব সেবা সেই যুগেও প্রায় অজ্ঞাত ছিল। তারপর ক্রমে চারুচন্দ্র প্রাচীনপন্থী, পরিবর্ত্তন-বিরোধী হইয়া পড়িলেন। সমাজের নূতন সংগঠনের জন্য ১৯২০-২১ সনে যে আহ্বান আসিল তাহার মধ্যে কোন অনুপ্রেরণা তিনি পাইলেন না। হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া এই বিষয়ে বিরাট পুস্তক লিখিয়া তিনি অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

হরিপ্রসাদ দেশাই

গুজরাট-আহমদাবাদের এই ভিষগ শ্রেষ্ঠ ৭০ বৎসর বয়সে গত ১৬ই চৈত্র তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগাওকারের মত ডাঃ দেশাইও স্বদেশী যুগে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা জাতীয় মেডিক্যাল কলেজে পাঠ সমাপন করেন। তাঁহার সেই যুগের অনুপ্রেরণা পরিণতি লাভ করে গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত কর্ম্মপ্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগে। "হরিজন" পত্রিকায় তাঁহার কর্ম্মজীবনের একটা পরিচয় পাই। ১৯২০সালের পূর্ব্বেকার আহমদাবাদ ও বর্ত্তমান আহমদাবাদের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহাই হরিপ্রসাদ দেশাইয়ের জনকল্যাণ-প্রচেষ্টার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ

প্রধানতঃ হিন্দু দর্শনসমূহের আলোচনায় জীবন কাটাইয়া প্রায় ৭১ বৎসর বয়সে কৃষ্ণচন্দ্র দেহত্যাগ করিয়াছেন। যৌবনে স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি "বন্দেমাতরম্" প্রভৃতি সংবাদ পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, কিন্তু সাংস্কৃতিক বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা রাজনীতির কণ্টকিত পথ হইতে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যায়। গত ৩০ বৎসর কৃষ্ণচন্দ্র এই ধ্যান-ধারণায় জীবন কাটাইয়াছেন।

রসময় ধাড়া

প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে এই বাঙালী সাংবাদিকের জীবনাবসান হইল। তাঁহার পিতা "ইয়ং বেঙ্গল" শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তিনি হাইকোর্টের বিশিষ্ট চাকরে ছিলেন এবং পুত্রদের ডাভটন প্রভৃতি খ্রীষ্টান স্কুলে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা সকলেই ইংরেজী, ফরাসী, লাটিন প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। ইঁহাদের মধ্যে আনন্দময় প্রায় ৪।৫টি বিদেশী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। রসময় ইংরেজী ভাষার ব্যবহারে একটা স্বকীয় ষ্টাইলের অধিকারী ছিলেন। "ওরিয়েণ্ট" প্রভৃতি সচিত্র পত্রিকার প্রথম সম্পাদক রূপে আমরা তাঁহার পরিচয় লাভ করি। অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত রসাল রচনায় তাঁহার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইত।

অমূল্যধন আঢ্য

এই বাঙালী ব্যবসায়ীপ্রধান ৮৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। চালের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির এবং অবিভক্ত বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নতিমূলক নানা কার্য্যের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল। বাঙালীর পুরাতন সামাজিক রীতি-নীতির একজন প্রত্যক্ষ দ্রষ্টারূপে তাঁহার নিকট অনেক কথা পাওয়া যাইত

অনিল বিশ্বাস

এই যুবক ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজে পাঠরত ছিলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তদের সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারত-রাষ্ট্রের পূর্ব্ব-দক্ষিণ সীমান্তে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত দর্শনা প্রভৃতি অঞ্চলের অপর পারে চিকিৎসাদি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি পাকিস্থানী পুলিশ বা আনসার বাহিনীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন। এই সেবাব্রতী যুবকের মৃত্যুবরণের মাহাত্ম্য ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া থাকবে।

কেশব একাডেমির বার্ষিক উৎসব

গত ১৮ই মার্চ্চ, ১৯৫০, রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে কেশব একাডেমির বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভার অনুষ্ঠান হয়। বিদ্যালয়ের চতুঃষষ্টি বর্ষ পূর্ণ হইল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার আদর্শে ও সঙ্কল্পে অনুপ্রাণিত রেভারেণ্ড প্রসন্নকুমার প্রমুখ মনীষীবর্গ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

সভার প্রারম্ভে বিদ্যালয়ের সম্পাদক, কৃষ্ণনগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন বার্ষিক বিবরণী উপস্থাপিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ছাত্রদের যে টিফিন দেওয়া হয় তাহা সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যপ্রদ। বর্ত্তমানে ছাত্রেরা নিজেদের বঞ্চিত রাখিয়া উদ্বাস্তদের সাহায্যকল্পে এই টিফিন ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যকেন্দ্রে ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে বিতরণ করিতেছে। বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিয়া সভাপতি শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা প্রসঙ্গক্রমে বলেন, এখানে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে একটি সুন্দর সম্বন্ধ বর্ত্তমান। একদিকে রহিয়াছে স্নেহ ও সহানুভূতি, আর এক দিকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন। স্বাধীনতার মধ্যেই শিক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ পাওয়া যায় স্বাধীনতা আত্মবিশ্বাস আনে। আত্মবিশ্বাসেই মনুষ্যত্ব গড়িয়া উঠে। স্বাধীন দেশে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শিক্ষা। আলো চাই, আরো আলো। দেশ জ্যোতির্ম্ময় হোক। অপরে শুধু সাহায্য করিতে পারে, নিজেকে শিক্ষিত হইতে হইবে। শুধু নিজেকে নয়, অন্যকেও শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। শরীর এবং মনকে সুস্থ, সবল এবং দৃঢ় করিতে হইবে। পারিতোষিক বিতরণের পর সভা ভঙ্গ নয়।

এণ্টালী একাডেমির নববর্ষোৎসব

গত ১লা বৈশাখের শুভ প্রভাতে এণ্টালী একাডেমির সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে বিদ্যালয়ের নববর্ষোৎসব সুসম্পন্ন হয়। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। সভাপতি মহাশয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভায় কয়েকজন ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সকলেই বর্ত্তমান সঙ্কটের কথা উল্লেখ করেন। প্রতিষ্ঠাতা ও রেক্টর শ্রীগোষ্ঠবিহারী মুখোপাধ্যায় ছাত্রদের চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রয়োজনের উপর বিশেষ ভাবে জোর দেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন, ছাত্রজীবন শক্তিসঞ্চয়ের জীবন। শক্তিকে বিক্ষিপ্ত হইতে দেওয়া উচিত নয়। উত্তরকালে সমালোচনার যথেষ্ট অবসর পাওয়া যায়। মানুষ হওয়া এবং মানুষ গড়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিবে। শুধু জ্ঞানার্জ্জনের মধ্যেই শিক্ষা আবদ্ধ নয়। প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং সবল মনুষ্যত্বের প্রয়োজন। শিক্ষা বলসঞ্চার করে। শুধু আত্মা কেন, বলহীনের নিকট কিছুই লভ্য নয়। দেশের এই সঙ্কটে বলবান লোক চাই।

বেথুন বিদ্যালয় শতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ

বেথুন বিদ্যালয় শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ প্রকাশক কমিটি উক্ত বিদ্যালয়ের বিগত শতবর্ষের প্রাক্তন ছাত্রীদের একটি সংক্ষিপ্ত রেজিষ্টার সংকলনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে উক্ত বিদ্যালয়ের স্কুল ও কলেজ উভয় বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী এবং তন্মধ্যে যাঁহারা পরলোকগত তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনদিগকে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রেরণ করিবার জন্য আহ্বান করা যাইতেছে:—(১) নাম ও বর্ত্তমান ঠিকানা; (২) বংশ-পরিচয়—পিতামাতার নাম প্রভৃতি; (৩) কোন্ কোন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাহার তারিখ এবং অন্যান্য বিশেষত্ব, যথা—পুরস্কার, পদক, বৃত্তি (সরকারী ও বেসরকারী) ইত্যাদির পরিচয়; (৪) কর্ম্মজীবন; (৫) রাজনীতি, সমাজকল্যাণ, সাহিত্যসেবা, সাংবাদিকতা প্রভৃতি বিভিন্ন কর্ম্মপ্রচেষ্টা।

আগামী ১৬ই জুন, ১৯৫০এর মধ্যে উক্ত বিষয়ক তথ্যসমূহ নিম্নের ঠিকানায় পৌঁছানো আবশ্যক:—

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫০শ ভাগ ১ম খণ্ড } আষাঢ়, ১৩৫৭ { ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী

ঝড়-বাদলের তাণ্ডবের মধ্যে বজ্রভেরী বাজাইয়া "আষাঢ় আসিল দ্বারে।"

কালিদাসের যুগে দেশে সুখী লোক ছিল তাই "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" মেঘালোক দেখিলে তাহার কেবলমাত্র "অন্যথা-বৃত্তি চেতঃ" হইত, এখন হয় অনাবৃষ্টির আতঙ্ক, নহিলে হয় অতিবৃষ্টির প্রলয় তাণ্ডব। আজিকার দিনে চতুর্দ্দিক হইতে যে অসম্পূর্ণ সংবাদ আসিতেছে তাহাতে মনে হয় অভাগা পশ্চিমবঙ্গের বুঝিবা আবার কপাল পুড়িল। মেদিনীপুর, বীরভূম, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং এই চারিটি জেলায় তো ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত ও প্লাবনের ফলে দেশ বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছে, অন্য কোথায় কি হইয়াছে তাহার খবর এখনও জানা যায় নাই। খবর জানিবারও উপায় নাই, কেননা পশ্চিমবঙ্গের হৃতভাগ্য লোকদের খবরাখবর রাখেই বা কে, করেই বা কে। দৈনিক সংবাদপত্রে পশ্চিমবঙ্গ বলিতে বুঝায় কলিকাতা বা তাহার উপকণ্ঠ। আজ পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারার আগমনের ফলে রাণাঘাট, বনগাঁ, মুর্শিদাবাদও কিছু উল্লেখ পাইতেছে। নহিলে হুগলী-ভাগীরথীর ওপারে একমাত্র হাওড়া জনপদ আছে তাহার পর অজানা দেশ। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরখণ্ডের সম্পর্কে ত সকলেই উদাসীন; একমাত্র সংবাদপত্র আপিসে চা পানের সময় দার্জ্জিলিঙের কথা হয়ত কেহ কেহ অকস্মাৎ স্মরণ করেন।

বস্তুতঃ পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব দৈনিক সংবাদপত্র একটিও নাই। যদি পাঠকগণ বিশ্বাস না করেন তো কোন দৈনিক সংবাদপত্র খুলিয়া দেখুন। তিনি দেখিবেন যেদিন বিজ্ঞাপন কম থাকে সেদিন হয়ত দু-চারিটি পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বলের কথায় কলম বোঝাই হইয়াছে। নচেৎ পূর্ব্ববঙ্গ আছে, দিল্লী আছে, তিব্বত-চীন-জাপান আছে, সম্প্রতি পণ্ডিত নেহরুর দৌলতে জাভা-বালিও স্থান পাইয়াছে, নাই কেবল পশ্চিমবঙ্গ। এরূপ দারুণ দৈববিপর্য্যয়ের পরে পশ্চিমবঙ্গের সংবাদ দেখি এইমাত্র : প্রধানমন্ত্রী বীরভূমে প্লাবনের ফলে ময়ূরাক্ষী বাঁধ দর্শন করিতে পারেন নাই, মেদিনীপুরের উপরের আকাশে শ্রীমান্ নিকুঞ্জ মাইতি উড্ডীয়মান হইয়াছেন এবং দার্জ্জিলিঙে মহামান্য কাটজু মহাশয় আটকা পড়িয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের পরম সৌভাগ্য যে এই তিন জন মহাশয় ব্যক্তি এ দুর্ভাগা দেশে আছেন, না হইলে এই ঘূর্ণাবর্ত্ত ও প্লাবনের সংবাদটাই খবরের কাগজের আসরে উল্লেখই পাইত না।

বাস্তবিকই সারা ভারতবর্ষে যদি "গত গৌরব হৃত আসন", দিশাহারা, বাস্তুহারা কেহ থাকে তবে সে নির্ব্বোধ, নির্ব্বাক, অসহায় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী—বিশেষতঃ যদি সে দামোদর-রূপনারায়ণের ওপারের হয়। বাংলা দৈনিকের আপিসে টাঙানো বাংলার মানচিত্রে হুগলী-ভাগীরথীর ওপারে শুধু হুগলী-বর্দ্ধমান কিছু কিছু দেখা যায়—তাও শ্রীমান্ প্রফুল্ল সেনের দৌলতে—দামোদর-রূপনারায়ণের ওপার তো সুদূর অজানা দেশ। এখন একমাত্র উপায় যদি পণ্ডিত নেহরু ইন্দোনেশিয়া আবিষ্কারের পর পশ্চিমবঙ্গ আবিষ্কারের অভিযান করেন। না হইলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী আর কিছুদিন পরে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবেই।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী, তুমি কবে বুঝিবে যে মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পরের "কংগ্রেস", পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের স্বর্গারোহণের পর "হিন্দু মহাসভা" ও লেনিনের মৃত্যুর পর "কম্যুনিজম" ঐগুলি কূটনৈতিক পেটেণ্ট ঔষধের মোড়ক মাত্র হইয়া গিয়াছে। আর "সোস্যালিজম"! সে তো কয়েকটি বিকৃতমস্তিষ্ক নেতার কৃপায় "পাগলা কালীর মহাপ্রসাদ" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদেশের পরিত্রাণের একমাত্র আশা যদি দেশের লোক বুঝে যে "ইয়ে সব ঝুটা হ্যায়" এবং নূতনভাবে নিজেদের জন্মগত অধিকারের দাবিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়ায়। সরকারী-বেসরকারী চাকুরী তো কতিপয় সরকারী বিশ্বাসঘাতকের চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর কপালে আর বিশ বৎসরে একটিও জুটিবে না। অন্য সকল দিকেও তাহাকে বঞ্চিত করার চেষ্টা পুর্ণোদ্যমে চলিতেছে। এইতো অবস্থা!

ডাঃ মাথাইয়ের পদত্যাগ

পণ্ডিত নেহরু যাঁহাকে অল্পদিন আগেও ভারত গবর্ন্মেণ্টের শক্তির স্তম্ভ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন সেই ডাঃ মাথাই পর্য্যন্ত মন্ত্রিসভায় কেন টিকিতে পারিলেন না ইহা লইয়া দেশে আলোচনা চলিতেছিল। ইতিপূর্ব্বে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীও প্রধানমন্ত্রীর সহিত মতভেদের জন্য পদত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং ডাঃ মাথাই কেন পদত্যাগ করিলেন তাহা সকলে জানিতে চাহিবে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনিও শ্রীক্ষিতীশ নিয়োগীর ন্যায় এক প্রকার চুপ করিয়াই গিয়াছিলেন, শুধু এইটুকু বলিয়াছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর সহিত তাঁহার মূলনীতি লইয়া মতভেদ ঘটিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী উত্তরে বলেন যে, তাঁহার সহিত ডাঃ মাথাইয়ের মতভেদের একমাত্র কারণ প্ল্যানিং কমিশন। এইবার ডাঃ মাথাই দীর্ঘ বিবৃতি দিয়া দেশবাসীকে সমস্ত বিষয়টি জানিবার সুযোগ দিলেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মন্ত্রীদের পদত্যাগের কারণ নিছক ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রের কোন গোপন ব্যাপার সম্পর্কিত না হইলে তাহা জানিবার অধিকার প্রত্যেকের আছে, পদত্যাগকারী মন্ত্রীদের উচিত তাহা জানাইয়া দেওয়া। তিনি তাহা করিয়া উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন।

ডাঃ মাথাইয়ের বিবৃতিতে প্রকাশ, নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য প্রধানমন্ত্রীর সহিত তাঁহার মতভেদ ঘটিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—(১) প্ল্যানিং কমিশনকে মন্ত্রীসভার উর্দ্ধে স্থান দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে অর্থসচিবের ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে; (২) ভারত-পাকিস্থান চুক্তিতে তাঁহার মত ছিল না; (৩) কোন কোন বিদেশী স্বার্থের খাতিরে টাকার মূল্য পুনর্ব্বিবেচনার ব্যবস্থা হইতেছিল; (৪) বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রীরা অর্থসচিবকে ডিঙাইয়া প্রধানমন্ত্রীর নিকট হইতে টাকার বরাদ্দ বাহির করিয়া লইতেন; (৫) প্ল্যানিং পরিকল্পনাগুলিতে কোন শৃঙ্খলা ছিল না, প্রায় ৩০০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা তৈরি হইয়াছে কিন্তু কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে কার্য্যে পরিণত হইবে তাহা ঠিক করা হয় নাই; (৬) বিভাগীয় অপচয় নিবারণ অসম্ভব হইতেছিল এবং এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব বিভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী।

ইহাদের কোনটিকেই সামান্য মতভেদ বলা যায় না।

ডাঃ মাথাইয়ের এই বিবৃতি যখন প্রকাশিত হয় প্রধানমন্ত্রী তখন ইন্দোনেশিয়ার পথে, জাহাজে। মৌলানা আজাদ ইহার জবাব দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ভারত-পাকিস্থান চুক্তিতে ডাঃ মাথাইয়ের আপত্তি ছিল একথা তিনি এই প্রথম শুনিলেন। মৌলানা আজাদ ডাঃ মাথাইয়ের সমকক্ষ মন্ত্রী, তাঁর পক্ষে এইরূপ জবাব দেওয়া অত্যন্ত অসমীচীন হইয়াছে। অতঃপর ডাঃ মাথাইকে সমর্থন করিয়া অপর কোন মন্ত্রী বিবৃতি দিলে বলিবার কিছু থাকিবে না অথচ এইরূপ চলিতে থাকিলে মন্ত্রীসভার শৃঙ্খলা রসাতলে যাইবে। এইরূপ বিবৃতির উত্তর দানের একমাত্র অধিকারী প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, ডাঃ মাথাইয়ের সহিত তাঁহার মতভেদের একমাত্র কারণ প্ল্যানিং কমিশন। ডাঃ মাথাই গত ডিসেম্বর মাসে প্রথম পদত্যাগ করিয়াছিলেন, পরে প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে তিনি উহা প্রত্যাহার করেন। ফেব্রুয়ারী মাসে তিনিই পার্লামেণ্টে প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যদের নাম প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনিই বলিতেছেন যে কমিশনের সদস্যদের বেতন এবং পদমর্য্যাদা লইয়া তাঁহার সহিত প্রধান মন্ত্রীর মতভেদ হইয়াছে; কমিশনের সদস্যগণকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সমান বেতন ও মর্য্যাদা দিতে তাঁহার আপত্তি ছিল, অর্থসচিবকে কার্য্যতঃ উহার অধীনস্থ করিয়া দিতে ঘোর আপত্তি ছিল। এই ব্যাপার অবশ্যই ফেব্রুয়ারীর পর ঘটিয়াছে। 'ভিজিল' লিখিয়াছেন যে, ডিসেম্বরে ডাঃ মাথাইয়ের পদত্যাগ প্রত্যাহারের সময়ই প্ল্যানিং কমিশন গঠিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং উহা পদত্যাগের প্রধান কারণ হইতে পারে না, ইহার পর একমাত্র ভারত-পাকিস্থান চুক্তি ও বাণিজ্য চুক্তি ভিন্ন আর কোন বড় ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু ডাঃ মাথাই প্ল্যানিং কমিশন সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহার সবগুলিই ফেব্রুয়ারীর পরের ঘটনা। সুতরাং তাঁর পদত্যাগের মূল কারণ-স্বরূপ তিনটিকেই ধরা উচিত। বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন সেক্রেটারীরা, বিভাগীয় মন্ত্রীদের ডিঙাইয়া তাঁহারা কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী এবং ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন। অর্থ এবং বাণিজ্য সচিবেরা ইহা অসম্মানজনক মনে করিতে বাধ্য।

প্ল্যানিং কমিশনের কাজ সম্বন্ধে ডাঃ মাথাই বলিয়াছেন যে তাঁহারা এক একটা জিনিষ তৈরি করিয়া আনিতেন এবং ক্যাবিনেটের অনুমোদন চাহিতেন। ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মধ্যে যে ব্যাপার লইয়া পরামর্শ হইল সেই সব জিনিষ এই ভাবে চোখ বুজিয়া অনুমোদন করার অর্থ প্ল্যানিং কমিশনকেই ক্যাবিনেট বলিয়া স্বীকার করা। কমিশন এবং ক্যাবিনেটের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র প্রধানমন্ত্রী। এইরূপে পার্লামেণ্টের প্রতি দায়িত্বশীল ক্যাবিনেটের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া পার্লামেণ্টের প্রতি দায়িত্বহীন এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতি দায়িত্বশীল কমিশনের ক্ষমতা বাড়িতে দেওয়ার একমাত্র তাৎপর্য্য প্রধানমন্ত্রীর ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা। এই ধারা প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছু দিন যাবৎ আরম্ভ করিয়াছেন। কথায় কথায় উদ্ভট "হাই পাওয়ার কমিটি" গঠন করিয়া বিভাগীয় মন্ত্রীদের ক্ষমতা খর্ব্ব করা এবং ঐ সব কমিটিতে অযোগ্য স্তাবকদের স্থান দেওয়া তিনি প্রায় রেওয়াজ করিয়া তুলিয়াছেন। খাদ্য বিভাগে এবং পুনর্ব্বসতি বিভাগে এরূপ হইয়াছে, প্ল্যানিং কমিশনেও তাহাই ঘটিয়াছে। প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যেরা পুরানো ব্যুরোক্রাট

আমলের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অথবা ব্যবসাদার; দেশের আপামর সাধারণের বা কংগ্রেসের আদর্শের সহিত তাঁহাদের যোগ কস্মিনকালেও ছিল না বরং তার বিরুদ্ধাচরণ করাই তাঁদের কাজ ছিল। কংগ্রেস পণ্ডিত নেহরুরই সভাপতিত্বে যে প্ল্যানিং কমিটি গঠন করিয়াছিল এবং যে কমিটি তাহাদের কাজ যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিল সেই কমিটি ভাঙিয়া দিয়া একেবারে বিরুদ্ধ ধরণের লোক লইয়া প্ল্যানিং কমিশন গঠন দেশবাসী ভাল চোখে দেখে নাই। ইঁহারা তুলার দাম নির্দ্ধারণে পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করায় ডাঃ মাথাইয়ের অসহ্য হয়। জনসাধারণের প্রতি দায়িত্বশীল ক্যাবিনেটকে ডিঙাইয়া প্রধানমন্ত্রীকর্তৃক নিযুক্ত এবং একমাত্র তাঁহার প্রতি দায়িত্বশীল হাই পাওয়ার কমিটি বা কমিশন গঠন গণতন্ত্রের পথ নহে, ডিক্টেটরশিপের লক্ষণ। প্ল্যানিং কমিশন লইয়া প্রধান মন্ত্রীর সহিত ডাঃ মাথাইয়ের মতভেদের কারণ অত্যন্ত গভীর; প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করিয়া যে পথে পা দিয়াছেন তাহা ধ্বংসের পথ বলিয়া ডাঃ মাথাই উহার সহিত তাঁহার পা মিলাইতে পারেন নাই। ভারত-পাকিস্থান চুক্তিতে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ এবং পাট-চুক্তিতে শ্রীক্ষিতীশ নিয়োগীর পদত্যাগেও এই মূল প্রশ্নই উঠিয়াছে যে প্রধানমন্ত্রী তাঁহার মতটাকেই একমাত্র গ্রাহ্য বলিয়া মনে করিবেন, না সমগ্র ক্যাবিনেটের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যাবিনেটের সহিত পরামর্শক্রমে প্রধানমন্ত্রী যে মত ও পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাই ছিল গণতন্ত্রসম্মত, সমগ্র দেশবাসী তাহা সমর্থন করিয়াছিল। মার্চ্চ হইতে তিনি ক্যাবিনেটের মত বদলাইবার জন্ত যাহা করিয়াছেন তাহা গণতন্ত্রসম্মত হয় নাই এবং এইজন্তই ক্যাবিনেটের তিন জন মন্ত্রী এবং বিবেকবান মিনিষ্টার অফ ষ্টেট শ্রীমোহনলাল শকসেনাকে সরিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে।

উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস বিদ্রোহ

উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসে যে ভাঙ্গন দেখা দিয়াছিল তাহা এবার চরমে উঠিয়াছে, বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইয়াছে। বিদ্রোহী কংগ্রেসীরা লক্ষ্ণৌতে কনভেনসন করিয়া নূতন দল গঠন করিয়াছেন। নাম দিয়াছেন পিপ্‌লস কংগ্রেস। কনভেনসনে উত্তর প্রদেশ ব্যবস্থাপরিষদের ২১জন সদস্য, এ-আই-সি-সির ১৮ জন সদস্য এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের ৬০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। প্রদেশের ৫২টি জেলার মধ্যে ৩৭টি হইতে ৩৩০ জন প্রতিনিধি কনভেনসনে যোগ দিয়াছিলেন। সভাপতিত্ব করেন উত্তর প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণদত্ত পালিওয়াল। নবগঠিত পার্টির সভাপতি তাঁহাকেই করা হইয়াছে, জেনারেল সেক্রেটারী হইয়াছেন শ্রীযুক্ত ত্রিলোকী সিং।

কনভেনসনের পর নূতন পার্টির ২১ জন সদস্য পরিষদের স্বতন্ত্র আসন দাবী করিয়া স্পীকারকে চিঠি দিয়াছেন। ইহাই উত্তর প্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদে সর্ব্ববৃহৎ বিরোধী দল হইবে। শ্রীত্রিলোকী সিং এই দলের নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পিপ্‌লস কংগ্রেস তাঁহাদের কনভেনসনে কোন নূতন প্রোগ্রাম প্রস্তুত করেন নাই, কংগ্রেসের প্রোগ্রামই তাঁহাদেরও কর্ম্মসূচী এই কথাই তাঁহারা বলিয়াছেন। তাঁহাদের দাবি এই যে কংগ্রেসে এখন যাহারা সংখ্যায় বেশী হইয়া আপিস দখল করিয়া আছে তাঁহাদের চেয়ে বিরোধী সদস্যেরা কংগ্রেস প্রোগ্রাম কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত।

উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসী দলের নেতৃত্ব করিতেছেন স্বাস্থ্য ও সরবরাহ সচিব শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্ত। তিনি শ্রীত্রিলোকী সিংহকে বলিয়াছেন যে বিদ্রোহী সদস্যদের পক্ষে পদত্যাগ করিয়া নূতন নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত ও সম্মান-জনক পন্থা। শ্রীত্রিলোকী সিংহ জবাব দিয়াছেন যে তাঁহাদের পদত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না। সরকারী দল কংগ্রেসের প্রোগ্রাম মানিয়া চলিতেছেন না ইহাদের বিরুদ্ধে ইহাই তাঁহাদের অভিযোগ, সুতরাং পদত্যাগ তাঁহাদেরই করা উচিত।

উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের এই বিদ্রোহ নিবারণের জন্ত পণ্ডিত নেহরু খুব চেষ্টা করিয়াছেন, কয়েকবার তিনি লক্ষ্ণৌ গিয়া সদস্যদের বুঝাইয়া বিরোধ আপোষে মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত ব্যবস্থা পরিষদের ২১ জন সদস্যকে ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস হইতে বহিষ্কারের আদেশ দেন। বিরোধ ইহাতে একেবারে খোলাখুলি হইয়া যায়। ইহারই পর আসে কনভেনসন এবং পিপ্‌লস কংগ্রেস।

উত্তর প্রদেশের এই ঘটনার গুরুত্ব খুব বেশী, স্বাধীনতার পর ইহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া মনে করা যায়। "কংগ্রেস স্বাধীনতার আগে যে ভাবে কাজ করিয়াছে, এখন আর সে ভাবে চলিবার প্রয়োজন নাই, কংগ্রেস অতঃপর লোকসেবক সঙ্ঘে পরিণত হওয়া উচিত," মহাত্মা গান্ধী একথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্যশাসন ক্ষমতায় কংগ্রেসী নেতারা এমনই মাতিয়া উঠিয়াছিলেন যে গান্ধীজীর এই সৎপরামর্শে তাঁহারা কর্ণপাত করেন নাই। ফলে একটি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পরিষদের ভিতরে এবং বাহিরে সর্ব্বপ্রকার সমালোচনার কণ্ঠরোধ করিয়া শাসনকার্য্য যেভাবে চালানো আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে সাধারণ লোকের মন তিক্ত হইয়া উঠিতেছে। কংগ্রেসেরও অনেক লোক অন্তর হইতে ইহাতে সায় দিতে পারিতেছেন না। ইহার উপর আছে ক্ষমতা-লোভীদের চক্রান্ত। বাংলায়, মাদ্রাজে, পঞ্জাবে এবং উত্তর প্রদেশে এই বিদ্রোহ ধূমায়িত হইতেছিল। এতদিনে উত্তর প্রদেশে তাহা প্রকাশ্য রূপ ধারণ করিয়াছে। লক্ষ্ণৌ কনভেন-সনের বক্তৃতা এবং যোগদানকারীদের নাম হইতে অসন্তোষের

গভীরতা অনুমান করা যায়। বিনা কারণে অথবা কেবল-মাত্র গদীর লড়াই লইয়া এত বড় অসন্তোষ সৃষ্টি হইতে পারে না। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, যানবাহন কোন সমস্যারই সমাধান তিন বৎসরে কংগ্রেস গবর্মেণ্ট করিতে পারে নাই। জনসমাজে ইহা কংগ্রেসের অযোগ্যতার পরিচয়রূপে বিকৃত হইতেছে; ইহার উপর নিত্য নানাভাবে দুর্নীতি ও কংগ্রেস নেতাদের অসাধুতার পরিচয় অবস্থা আরও ঘোলাটে করিয়া তুলিতেছে। আমরা গণতন্ত্র গঠন করিয়াছি, গণতন্ত্রে এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায় শক্তিশালী বিরোধী দল গঠন। বিরোধী দলের সদাজাগ্রত চক্ষু গবর্মেণ্টের উপর থাকিলে অযোগ্যতা এবং দুর্নীতি উভয়ই কমিতে বাধ্য। পণ্ডিত নেহরুর নিজ প্রদেশের এই বিদ্রোহ স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় যোগ করিয়াছে।

উত্তর প্রদেশের বিদ্রোহীর দল যে সোস্যালিষ্ট পার্টির ন্যায় পদত্যাগ করিয়া বনবাসে গমন করেন নাই ইহা তাঁহাদের সুবুদ্ধির পরিচায়ক। বস্তুতঃ সোস্যালিষ্ট পার্টির ঐরূপ প্রব্রজ্যা গ্রহণ দেশের পক্ষে অতিশয় অনিষ্টকর ব্যাপার হইয়াছে।

কংগ্রেসে স্বেচ্ছাচার

কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বেচ্ছাচারের কি বিষময় ফল ফলিবে তাহার পূর্ব্বাভাষ অনেক দিকেই দেখা যাইতেছে। একটি সামান্য উদাহরণ মানভূম খাদিদলের মুখপত্র "মুক্তি" ২২শে জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় দিয়াছেন, প্রবন্ধের নাম "শোচনীয় পরিণাম"। ইংরেজীতে প্রবাদবাক্য আছে, "উত্তপ্ত খড় ঝড়ের নিদর্শন"। সেইমত উক্ত প্রবন্ধের সারাংশ নীচে দেওয়া হইল :

"মানভূমের বরাবাজার-পটমদা হইতে নির্বাচিত জিলা বোর্ডের কংগ্রেসী সদস্য পদত্যাগ করাতে উক্ত নির্বাচনক্ষেত্রে একটি উপনির্বাচন হয়। এই উপনির্বাচনে শ্রীসুর্চাদ সিং কংগ্রেস প্রার্থীরূপে এবং শ্রীগঙ্গাধর সিং স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীগঙ্গাধর সিং কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া সদস্য নির্বাচিত হন।

"বর্ত্তমান সময়ে সাধারণভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাহার প্রতিষ্ঠা জনগণের নিকট হারাইয়াছে। ক্ষমতা লাভের পরে যে নৈতিক অধোগতি ইহাকে গ্রাস করিয়াছে তাহার জন্য যে বা যাহারাই দায়ী হোক না কেন দেশবাসীর নিকট ইহাকে অতি শোচনীয়ভাবে অশ্রদ্ধেয় করিয়া তোলা হইয়াছে। কিন্তু মানভূমের ক্ষেত্রে ইহা ছাড়াও আরও অন্যান্য যে সমস্ত বিশেষ কারণ রহিয়াছে তাহা মানভূম ছাড়া অন্য কোথাও নাই বলিলেই চলে।

"ভাষার সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সমর্থন ও কার্য্যকরী করি-বার জন্য, বাংলাভাষী মানভূম জিলাকে বাংলাভাষী নহে এবং প্রধানতঃ হিন্দীভাষী ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য গত কয়েক বৎসর হইতে বিহার গবর্মেণ্ট, বিহার কংগ্রেস এবং তৎসংশ্লিষ্ট নেতৃবর্গ ও ব্যক্তিবর্গ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। মানভূমের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যে সমস্ত বর্ব্বরোচিত নীতি ও ব্যবস্থা গৃহীত ও কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে ও হই-তেছে তাহার সহিত দেশবাসী সুপরিচিত ও জিলাবাসী ভুক্ত-ভোগী। কিন্তু বিহারে ও বিহার প্রদেশের বাহিরে যাহারা এই জিলার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাহাদের নিকট, বিশেষ করিয়া শাসন ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট, মানভূম জিলা সম্বন্ধে সত্যকে নিরন্তর মিথ্যা প্রচারের দ্বারা যে ভাবে তাঁহারা বিকৃত করিয়া রাখিয়াছেন তাহার ইতিহাস দেশবাসী হয়ত সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহেন।

"বিহারের বর্ত্তমান কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষ করিয়া মানভূমের বর্ত্তমান জিলা কংগ্রেস কমিটি সম্পূর্ণভাবে এই নীতির সমর্থক ও পোষক। বস্তুতঃ বর্ত্তমান জিলা কংগ্রেস কমিটির সম্বন্ধে এই কথাই বলা যাইতে পারে যে, ইহা এই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র এই ভাষায় সাম্রাজ্যবাদের নীতিকে সফল করিয়া তুলিবার জন্যই ইহার বর্ত্তমান অস্তিত্ব। মানভূম জিলায় বর্ত্তমানে কংগ্রেসের কার্য্য ও নীতি বলিয়া যাহা বলা যাইতে পারে তাহা এই মিথ্যা ও অন্যায় হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের নীতি।

"বরাবাজার-পটমদার উপনির্ব্বাচনে আর একটি দিক যাহা জনসাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হইল তাহার জন্য প্রত্যেক দেশবাসীই লজ্জিত হইবেন। কংগ্রেস-প্রার্থীর সমর্থনে কোন রূপ হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া সরকারী কর্ম্মচারীরা প্রকাশ্যভাবে কাজ করিয়াছেন। সরকারী কর্ম্মচারীগণ প্রকাশ্যেই জয়লাভের জন্য এমন কোন উপায় বা পন্থা নাই যাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হইয়াছেন। কংগ্রেসের প্রচারক ও সমর্থক হিসাবে এসিষ্টেণ্ট পাবলিক প্রসিকিউটারগণ মোকদ্দমা মুলতুবী রাখিয়া ছুটিয়াছেন। এইরূপ জনৈক ব্যক্তি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই যে, বাক্স ভাঙিয়াও আমরা জয়লাভ করিব।

"ইহার উপরে সর্ব্বাধিক শোচনীয় ব্যাপার এই যে, কংগ্রেসের প্রচারকগণ অকুণ্ঠিতচিত্তে ভোটারদের মদ খাওয়াইয়া ভোটদানে প্রলুব্ধ করিয়াছে। মদের প্রলোভনে এবং খাওয়াইয়া নিজেদের পক্ষে ভোট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মাতালদের নিযুক্ত করিয়াছে। এই সমস্ত উপায়ে যে বীভৎস ঘটনা ও অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছিল তাহার বর্ণনাও লজ্জার বিষয়।

"জনসাধারণের মনোভাব এ বিষয়ে বাস্তবিকই লক্ষ্য করি-বার বিষয় ছিল। কুমীর গ্রামে ভোটারদের ভোট দিবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে টাকা দিবার প্রস্তাব করা হয়। তাহারা প্রথমে অবাক হয়, পরে তাহা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান

করে। অথচ এই সব অঞ্চলে এক দিন একমাত্র কংগ্রেসেরই অপ্রতিহত প্রভাব ছিল।

"স্বতন্ত্র প্রার্থী একটি ২৫।২৬ বৎসরের যুবক। সবেমাত্র কলেজ হইতে বাহির হইয়াছেন। সমস্ত কংগ্রেস শক্তি, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং সরকারী শক্তি সর্ব্বপ্রকার ন্যায় অন্যায় জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু জনসাধারণ যেন দুর্ভেদ্য দেওয়ালের মত ইহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ কংগ্রেসের এই নির্ব্বাচনে স্বতঃই প্রশ্ন আসিতেছে—ইহা কেন? কেন এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইল? এবং এই মহান্ প্রতিষ্ঠানকে এরূপ শোচনীয় অবস্থায় যাহারা আনিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের অপেক্ষা দেশের বৃহত্তর শত্রু আর কেহ আছে কিনা তাহাই আজ বিবেচনার বিষয়।"

গণতন্ত্র ও কংগ্রেসী শাসননীতি

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ প্রায়ই দুঃখ করিয়া বলেন যে দেশের লোকের মন তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের প্রভাব হইতে সরিয়া যাইতেছে। তাঁহাদের মুখে কিন্তু এই কার্য্য-কারণের কোন ব্যাখ্যা কখন শুনি নাই। সম্প্রতি ভারতরাষ্ট্রের নানা রাজ্যে পল্লী স্বায়ত্তশাসন বিধান অনুযায়ী নির্ব্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। আসাম ও বোম্বাইয়ে—এই দুই রাষ্ট্রে এই নির্ব্বাচনের ফল আশাপ্রদ নয়। তাহার জন্য আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোপীনাথ বরদলৈ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই কংগ্রেসী বিফলতার কারণ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। কংগ্রেসী শাসন-নীতির ফলে, শ্রীগোপীনাথ বরদলৈর শাসননীতির ফলে, দেশের লোকের মনে কি বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায় করিমগঞ্জের "যুগশক্তি" পত্রিকার ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের সম্পাদকীয় মন্তব্যে:

"গণতান্ত্রিকতার সমাধি রচনার আরও জলন্ত দৃষ্টান্ত এই অভিশপ্ত কাছাড় জেলায়ই রহিয়াছে। জেলার সব কয়জন কংগ্রেসী এম-এল-এ এবং সকল কংগ্রেস কমিটি ও সংবাদ-পত্র একযোগে জনৈক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনয়নক্রমে মন্ত্রিসভা হইতে অবিলম্বে তাহার অপসারণ দাবি করেন। কিন্তু 'গণতান্ত্রিক' আসাম রাজ্যের পরিচালকগণ এরূপ সর্ব্বসম্মত দাবি মানিয়া লওয়া দূরে থাকুক, ইহার উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয় না।

"কাছাড় জেলার বর্ত্তমান পুলিস সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেবের অবাঞ্ছিত কার্য্যকলাপে অতিষ্ঠ হইয়া কাছাড়ের জনপ্রতিনিধি-স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও বহু প্রতিষ্ঠান এবং সাংবাদিকগণ অনতি-বিলম্বে তাঁহার স্থানান্তরের ব্যবস্থা করিতে কর্তৃপক্ষকে এক-বাক্যে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই। ফলে উক্ত কর্ম্মচারী প্রশ্রয় পাইয়া বেপরোয়া হইয়া স্বেচ্ছা-চারিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন; প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের অহেতুক শাস্তিদানের চেষ্টা অথবা লঘুপাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন।

"এই অবস্থায় কাছাড়ের কংগ্রেসী এম্-এল-এ.-গণকে পদত্যাগের জন্য বিভিন্ন মহল হইতে বলা হইতেছে। জনস্বার্থ ও আত্মসম্মান রক্ষার্থ তাঁহাদের পদত্যাগ অবশ্য অপরিহার্য্য হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কেবল তাঁহারাই নহেন, তিন মহকুমার জেলা কংগ্রেস কর্ম্মকর্তাদেরও একই কারণে পদত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। অতঃপর কি কর্ত্তব্য—সকলে মিলিয়া তাহাও এখনই স্থির করিতে হইবে। কংগ্রেস সরকার যদি গণতান্ত্রিক নীতি বর্জ্জন করাই স্থির করিয়া থাকেন এবং তাহার কোন প্রতিকার করাই সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে এককালে যে কংগ্রেস জনসাধারণের অতি প্রিয় প্রতিষ্ঠান ছিল, দেশের ও দশের কল্যাণের নিমিত্ত তাহা আজ ত্যাগ করিয়া···সেইরূপ একটি গণতান্ত্রিক দলগঠনের উদ্দেশ্যে সর্ব্বত্র দেশসেবকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সক্রিয় হইতে হইবে।"

পাট, পাকিস্থান ও ভারতবর্ষ

ভারত-পাকিস্থান পাটচুক্তিতে লাভ কাহার হইয়াছে এতদিনে তার খতিয়ানের সময় আসিয়াছে। যেটুকু হিসাব-নিকাশ হইয়াছে তাহাতে ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে অল্প কয়েকটি ইংরেজ ও মাড়োয়ারী ম্যানেজিং এজেন্টের পকেটে সমস্ত লাভের টাকা চলিয়া যাইতেছে, ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে ভারতীয় পাটচাষী এবং ভারত-সরকার। পাটচুক্তি পাকি-স্থানকে এক পরম সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছে এবং গুটি চারেক লোকের বিশেষ লাভের কারণ হইয়াছে।

গত অক্টোবর মাসে চট ও থলিয়ার অত্যধিক উচ্চমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য কন্ট্রোল বসানো হয়। পাটজাত দ্রব্যের উচ্চতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হয়, একজন পাট কন্ট্রোলার নিয়োগের ব্যবস্থা হয় এবং রপ্তানীকারকদের কমিশন শতকরা পাঁচ টাকা ধার্য্য হয়। উচ্চতম মূল্য বাঁধার ফল হইল এই সরকারী দাম চেকে এবং বাকিটা নগদ টাকায় দাখিল করা সুরু হইল। ওয়াকার সাহেব জুট কন্ট্রোলার নিযুক্ত হইলেন। পাট স্বার্থের সঙ্গে পাটচাষী, শ্রমিক, পাটব্যবসায়ী, মিল বিদেশ হইতে ষ্টোর আমদানী এবং দেশে ষ্টোর উৎপাদনকারী ও গবর্মেন্টের স্বার্থ জড়িত। ইহার মধ্যে আবার দেশী ও বিদেশী স্বার্থের সংঘাত রহিয়াছে। মিলের স্বার্থের সঙ্গে অপর অনেকের স্বার্থেরও বিরোধিতা আছে। এই অবস্থায় কেবলমাত্র মিলের প্রতিনিধিকে পাট সম্পর্কিত সমগ্র স্বার্থের ঊর্দ্ধে স্থান দেওয়া জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হইতে পারে না।

উপরোক্ত সমস্ত স্বার্থের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত পাট-বোর্ডের হাতে পাটের স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া উচিত ছিল। কাজেই 'জুট কণ্ট্রোলা'র নিয়োগেও গলদ রহিয়া গেল। তৃতীয়তঃ, রপ্তানীকারকদের কমিশন শতকরা পাঁচ টাকা দৃশ্যতঃ কম হইলেও উহা অত্যন্ত বেশী। সাধারণতঃ ইহারা শতকরা আট আনা হইতে এক টাকা কমিশন পাইলেই ভাগ্য বলিয়া মনে করে। তৎস্থলে পাঁচ টাকা কমিশন ধার্য্য হওয়ায় বহু ম্যানেজিং এজেণ্ট রপ্তানী ব্যবসা খুলিয়া বসিয়াছে। ইহারা এই বাড়তি টাকাটা আত্মসাৎ করিতেছে। কেহ কেহ বেনামীতে এরূপ কারবার আরম্ভ করিতেছে। এই ভাবে ম্যানেজিং এজেণ্টরা মাসিক প্রায় ৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত লাভ করিতেছে। পাটজাত দ্রব্য এখনও সরকারী নির্দ্দিষ্ট দামে বিকায় না। অতিরিক্ত দাম পকেটস্থ করিবার জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টরা এ ক্ষেত্রেও বেনামী প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছে। ইহাতে এক দিকে মিলের অংশীদারদের যেমন ক্ষতি হইতেছে অপর দিকে রাষ্ট্রও ন্যায্য ট্যাক্স আদায়ে বঞ্চিত হইতেছে।

ভারতীয় পাটচাষীদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়াছে। অধিক পাট ফলাইবার জন্য গবর্মেণ্ট তাহাদের উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন কিন্তু পাটচুক্তির পর তাহাদেরও কপাল পুড়িয়াছে, পাকিস্থানের পাট আমদানীর ভয় দেখাইয়া ভারতীয় পাটের দাম দাবাইয়া রাখিবার প্রবল চেষ্টা হইতেছে। পাকিস্থান হইতে হাবিজাবি ছাঁটাই পাট কেনার চুক্তি যে দামে হইয়াছে, ভারতীয় পাটচাষী তাহা পাইলে খুশী হইত।

পাট চুক্তির পর পাকিস্থানে পাটের দাম ৮ টাকারও বেশী চড়িয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে চালাকী করিয়া সাজানো খবর প্রকাশ করিয়া পাটের বাজার চড়া রাখিবার ব্যবস্থাও চলিতেছে। পাকিস্থান চুক্তিবদ্ধ পাট নির্দ্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করিতে পারে নাই। পাটের অভাব এই অক্ষমতার কারণ নহে, পাটের সহিত সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ লোকেরা মনে করেন যে, পাট ক্রয়ের উপযুক্ত নগদ টাকার অভাব ইহার প্রধান কারণ। গত ফসলের পর ৫৫ লক্ষ গাঁইট পাট পাকিস্থানের হাতে ছিল, তন্মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া রপ্তানী এবং কলিকাতায় আমদানী পাটের পরিমাণ প্রায় ৪০ লক্ষ গাঁইট হইবে। মরশুম শেষ হইয়াছে, নূতন পাট আর মাস দেড়েকের মধ্যেই উঠিবে। এবার ফসল এত ভাল হইয়াছে যে, গত ১০ বৎসরের মধ্যে এরূপ দেখা যায় নাই। কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন যে এবার ৭০ লক্ষ গাঁইট পাট উঠিবে, ৬৫ লক্ষের কম হইবে এ কথা কেহ বলেন না। সুতরাং গত ফসলের উদ্বৃত্ত ১৫ লক্ষ এবং এবারকার ৬৫ লক্ষ মোট ৮০ লক্ষ গাঁইট এবার পাকিস্থানের হাতে থাকিবে। এই বিপুল ষ্টকের চাপে পাটের দাম কমিতে বাধ্য। ইহা জানিয়া শুনিয়াও বছর শেষে চড়া দরে পাটের দাম ঠিক করা এবং ডেলিভারির তারিখ কেবলই পিছাইতে দেওয়ার একমাত্র অর্থ এই হইতে পারে যে, মিলগুলি পাকিস্থান জুট-বোর্ডকে আগামী ফসলের পাট অসম্ভব সস্তায় কিনিয়া পুরানো চুক্তির চড়া দরে ভারতের ঘাড়ে চাপাইবার সুযোগ দান করিতেছে। কমিশন হয়ত ভাগাভাগি হইবে। চুক্তিতে পাট ডেলিভারি দেওয়ার যে তারিখ ছিল সেই তারিখে পাট না দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চুক্তি বাতিল করিয়া দিলে ভারতের বদনাম হইত না, অনেকগুলি টাকার অনাবশ্যক লোকসানও বাঁচিত। তাহা না করিয়া বার বার সময় দেওয়া হইতেছে, ইহা নিঃসন্দেহ প্রতারকের দলের কারসাজী, এবং এই ঠকদের দলে সরকারী অধিকারী দলও আছেন সন্দেহ হয়।

পাটের ব্যাপারটা নূতন করিয়া দেখা দরকার। অবস্থা যেভাবে চলিতেছে সেইভাবে চলিতে দিলে পাকিস্থানী পাটের দড়ি গলায় বাঁধিয়া আমাদের বঙ্গোপসাগরে ডুবিতে হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

সততার পুরস্কার (?)

চৈত্র মাসের প্রবাসীতে আমরা একটি বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে সেলস ট্যাক্স আদায়ে একজন অফিসারের উপরওয়ালাদের নিকট হইতে বাধা পাওয়ার কথা লিখিয়াছিলাম। এই বিভাগের একজন এসিষ্টাণ্ট কমিশনার ঐ ব্যবসায়ীর নিকট হইতে প্রায় এক কোটি টাকা পাওনা হয় এই হিসাব দিয়াছিলেন; কমিশনার তাঁহাকে ট্যাক্স আদায়ে নিবৃত্ত হইতে আদেশ দেন। ইহা লইয়া অনেক দিন টানাহেঁচড়া চলিবার পর উক্ত এসিষ্টাণ্ট কমিশনারকে মফস্বলে বদলী করিয়া দেওয়া হয়। সম্প্রতি জানা গেল যে, তাঁহাকে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে কিন্তু মাসাধিক কাল সাসপেন্সনে থাকা সত্ত্বেও উহার কোন কারণ দেখানো হয় নাই। ব্যাপারটা খুব বেশী রকম জানাজানি হইয়াছে এবং এই বিনা কারণে সাসপেন্সনে সমগ্র বিভাগের মর‍্যাল অত্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। সেলস ট্যাক্স বিভাগ সম্বন্ধে আমরা অনেকবার সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি, কারণ ইহা এক দিকে যেমন গবর্মেণ্টের অর্থাগমের একটি বৃহৎ উপায় তেমনি উহার সহিত প্রতিটি লোকের দৈনন্দিন জীবন জড়িত। গত মাসে আমরা এই বিভাগের কার্য্যকলাপ তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছিলাম, আমরা উহার পুনরুক্তি করিতেছি। উপরোক্ত অফিসার বিনা বিচারে সাসপেন্সনে থাকিলে লোকে মনে করিবে যে তাঁহার সততা ও দক্ষতার প্রতিদান মিলিয়াছে। এরূপ ঘটনা রাষ্ট্রের পক্ষে খুব ক্ষতিকর।

রেলে সাবোটাজ

গত মাসে মশিদির নিকট পঞ্জাব মেলের দুর্ঘটনা সম্পর্কে আমরা বলিয়াছিলাম যে আমরা যেরূপ ফটোগ্রাফ দেখিয়াছি তাহাতে আমাদের মনে সন্দেহ নাই যে এই দুর্ঘটনা ইচ্ছাকৃত সাবোটাজ। এই মাসে আমরা ঐ তিনখানি চিত্র অন্যত্র দিলাম। ফটোগুলি আনন্দবাজার পত্রিকার ফটোগ্রাফার দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই অকুস্থলে যাইয়া নিজে তুলেন। সুতরাং ওগুলি "সাজান ছবি" বলা কোন মতেই চলে না। প্রথম যে দুটি ছবি এক পাতায় দেওয়া হইয়াছে তাহা রেলের একই স্থলের দুই পাশে তোলা ফোটো।

ছবিতে স্পষ্ট দেখা যায় যে দুর্বৃত্তেরা ফিশবোল্ট ও নাট খুব সুষ্ঠু ভাবে খুলিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় তাহারা এ কাজ বুঝে এবং যন্ত্রপাতিও ঠিকমত ছিল। বাইরের কোচস্ক্রুগুলি ঢিলা করিয়া রেলের ফ্লাঞ্জ মুক্ত করিয়া ও ভিতরের কোচস্ক্রু সম্পূর্ণ খুলিয়া ইহারা সমস্ত রেলটি ছাড়াইয়া ও সরাইয়া রাখিয়াছে তাহা ছবিতে স্পষ্ট দেখা যায়। রেলের গায়ের বোল্ট পরাইবার বিঁধগুলি পরিষ্কার অক্ষত দেখা যায় এবং রেল ও স্লিপারগুলিও একেবারেই জখম হয় নাই। রেলপথও (track) বিশেষ কিছু চোট পায় নাই। যদি ভারী ইঞ্জিনের দ্রুতগতিবেগের প্রচণ্ড আঘাতে ফিশবোল্ট-নাট ও ফিশপ্লেট ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া আলাদা হইয়া যাইবার ফলে ট্রেন লাইনচ্যুত হইত তাহা হইলে রেল ও স্লিপার ভীষণ জখম হইয়া বাঁকা-চোরা ও থেঁৎলান অবস্থায় দেখা যাইত। কোচবোল্ট ঢিলা ও অক্ষত অবস্থায় থাকিত না এবং রেলের বিঁধগুলির মুখ ছেঁড়াকাটা হইত।

ইঞ্জিনের প্রচণ্ড আঘাতে রেলপথের অবস্থা কি হয় তাহা বড় ছবিটিতে দেখা যায়। লাইনচ্যুত হইবার পর যেখানে ইঞ্জিন রেলপথ ছাড়িয়া নীচে গড়াইয়াছে সেখানের রেল, স্লিপার ইত্যাদির অবস্থার সঙ্গে যেখানে সাবোটাজ হইয়াছে সেখানকার ছবি মিলাইয়া দেখিলেই প্রভেদ বুঝা যাইবে। কোচবোল্ট স্বাভাবিক ভাবে কি রকম থাকে তাহাও বড় ছবিতে দেখা যায়। উহার ক্যাপ স্লিপারের গায়ে প্রায় সমানভাবে লাগিয়া রেলের ফ্লাঞ্জ চাপিয়া ধরিয়া থাকার কথা। ক্যাপ ঢিলা করিলে পরে রেল মুক্ত হয়।

সাবোটাজ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। প্রশ্ন এই যে করিল কাহারা। ঘরের শত্রু তো আছেই যাহারা দিবারাত্র বিদেশীর দালালী করিয়া দেশে অশান্তি ও ধ্বংসলীলা ছড়াইবার চেষ্টায় লাগিয়াই আছে। সম্প্রতি প্রকাশিত পুরণচন্দ যোশীর পুস্তিকায় এ বিষয়ে স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে। এদের দলের বহুলোক রেল-বিভাগে আছে। এ ছাড়া আরও এক দল লোক আছে যাহারা দেহমন আমাদের এক বিশেষ শত্রুপক্ষকে নিবেদন করিয়াছে। তাহারা অন্নের সংস্থানের অজুহাতে এখানে আসিয়া ভারত-রাষ্ট্রের অনিষ্ট চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। বহিরাগত এই দল ও পূর্ব্বোক্ত দল দুই-ই কন্দিও পায় অর্থ-সাহায্যও পায়। আমরা শেষের দলের কথা ভাবিয়াও ভাবি না, এই হইয়াছে আমাদের মূর্খতা।

এখন কথা এই, কি করিয়া এই সব দুর্বৃত্তদের দমন করিয়া রাখা সম্ভব হয়। সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন দেশের লোকের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের যোগসাধন। মাদ্রাজী মন্ত্রী মহাশয়দ্বয়ের এ বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞানের লেশমাত্রও নাই। অন্য সকল দিকেও বুদ্ধির কোনও পরিচয় আমরা পাই না। রেল-বিভাগের পুলিশ ও ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড এই দুই-ই প্রায় অকর্ম্মণ্য। এগুলি ঢালিয়া সাজিয়া নূতন অধ্যক্ষ, কর্ম্মচারী এবং কর্ম্মী দিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবস্থা না করিলে উপায় নাই।

এরূপ দুর্বৃত্তদিগকে ধরিলে বা ধরাইয়া দিলে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে ইহাও জানান দরকার। সরকারী বিজ্ঞপ্তি বিভাগেও তো বুদ্ধিমান লোক নাই। সুতরাং উপায় কি হইবে বলা দুষ্কর।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

ময়ূরাক্ষী বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও জল-সেচনের উপর পশ্চিম-বঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের কৃষির ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে। সম্প্রতি কলিকাতার সাংবাদিক-বৃন্দের এক প্রতিনিধিদল এই পরিকল্পনার কাজ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। বীরভূম জেলার সিউড়ী শহরের সন্নিকট-বর্ত্তী তিলপাড়ায় ও ২০ মাইল দূরে সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মেসাঞ্জোরে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীরামপুরের "নির্ণয়" পত্রিকার ৬ই জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় তার একটা মোটামুটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে :

"বিহারের সাঁওতাল পরগণার পাহাড় হইতে উদ্‌গত ১৫০ মাইল দীর্ঘ ময়ূরাক্ষী নদী হইতে উক্ত পরিকল্পনার অধিকাংশ প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করা হইবে। উৎপত্তি স্থল হইতে ৬০ মাইল দূরে মেসাঞ্জোর নামক স্থানে একটি ২৩৪৫ ফুট দীর্ঘ এবং নদীর গভীরতম অংশ হইতে ১১৭ ফুট উচ্চ বাঁধ নির্ম্মিত হইবে। উহার আয়তন হইবে ২৪ বর্গমাইল এবং ইহাতে জল মজুদ থাকিবে। মেসাঞ্জোর বাঁধের প্রায় ২০ মাইল নীচে সিউড়ী শহরের নিকটে প্রায় ১৬টি স্লুইস গেট সমন্বিত ১০১৩ ফুট দীর্ঘ তিলপাড়া বাঁধ নির্ম্মিত হইতেছে। বিভিন্ন দিকে বহু খাল কাটিয়া এই জল সেচের জন্য বাহিত করান হইবে। এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ ৯ শত মাইল খাল কাটা হইবে। তিলপাড়া বাঁধের এলাকায় ৩ লক্ষ বিঘা সেচের উপ-যোগী খাল কাটার শতকরা ৫০ ভাগ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং অবশিষ্ট আগামী বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে। খাল কাটার সমগ্র পরিকল্পনার হিসাবে শতকরা ১০ ভাগ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ

সরকারকে আর্থিক দিক হইতে কিঞ্চিৎ অসুবিধায় পড়িতে হইতেছে। অবশ্য ৩ লক্ষ বিঘা জমিতে সেচের ব্যবস্থা করাই কর্ত্তৃপক্ষের যে আশু লক্ষ্য, তাহা ব্যাহত হইবে না। এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের নিকট ২ কোটি টাকা প্রদানের আবেদন জানাইয়াছিলেন, মাত্র ১ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে। ভারত সরকারের ব্যয়-সঙ্কোচ অভিযানের ফলেই অর্থের পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে। পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করিতে মোট ব্যয় পড়িবে ১৫।১৬ কোটি টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের নিকট হইতে ঋণের ভিত্তিতে অর্থ সাহায্য পাইবেন, এইরূপই ব্যবস্থা। ভারত সরকার উক্ত পরিকল্পনার জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থ দিতে পূর্ব্বের ন্যায়ই সম্মত আছেন, তবে এককালে ইতিপূর্ব্বে যে পরিমাণ অর্থ দিতেন, এখন তাহা হইতে কম দিবেন, এই মাত্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্থিক অনটন থাকা সত্ত্বেও পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য চালাইয়া যাইতে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ।"

এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিরূপ আশার সৃষ্টি হইতেছে তাহা "নির্ণয়" পত্রিকার ভাষায় প্রকাশ করিতেছি :

"পরিকল্পনার ফল আমরা আগামী বৎসর হইতেই ভোগ করিব। বীরভূমের তিলপাড়া অঞ্চলের বাঁধ নির্ম্মাণকার্য্য ১৯৫১ সালে বর্ষা সমাগমের পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইবে এবং তখন হইতেই ৩ লক্ষ বিঘা জমি জলসেচের আওতায় আনা সম্ভব হইবে। অপর যে বাঁধ মেসাঞ্জোর বাঁধ, তাহার নির্ম্মাণ কার্য্য আগামী শীতের সময় হইতেই আরম্ভ হইবে এবং নির্ম্মাণ কার্য্য যত অগ্রসর হইবে, বৎসরের পর বৎসর সেচের জমিও তত বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৫৪ সালে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী হইলে মোট ১৮ লক্ষ বিঘা জমিতে জলসেচ করা যাইবে। মোট ১৮ লক্ষ বিঘার মধ্যে বীরভূম শতকরা ৬০, মুর্শিদাবাদ শতকরা ৩৫ ও বর্দ্ধমানের শতকরা ৫ অংশ সেচ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবে। অনুমান, এই জেলাগুলির উক্ত অঞ্চলের কৃষি সম্পদ শতকরা একশত গুণ বৃদ্ধি পাইবে। বৈদ্যুতিক শক্তিও যথেষ্ট উৎপন্ন হইবে, পরিকল্পনার পরোক্ষ ফল হিসাবে প্রায় ৪০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইবে।" স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়নের পক্ষে এই পরিকল্পনা অত্যধিক সহায়তা করিবে। বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ খাদ্যবস্তু উৎপাদনে এখনই উদ্বৃত্ত অঞ্চল। জলসেচের সুব্যবস্থা হইলে আরো অধিক খাদ্যসম্ভার মিলিবে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার পরিচালনায় মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় বিশেষ ভাবে উদ্যোগী। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, এই পরিকল্পনার জন্য বাঙালী শ্রমিকের সন্ধান পাওয়া কঠিন; সেই অভিযোগের পুনরুক্তি কলিকাতার সাংবাদিকবৃন্দের নিকট কর্ত্তৃপক্ষীয়গণও করিয়াছেন। অথচ আমরা জানি যে এই পরিকল্পনার কর্ত্তৃপক্ষ দৈনিক দেড় টাকা হারে মজুরী দিয়া রাজমিস্ত্রীর কার্য্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন; তবুও বাঙালী বেকারশ্রেণী সমাজের একটি অত্যাবশ্যক কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে না। জীবনের বৃহত্তম শিক্ষা এই—পরিশ্রম না করিলে বাঁচিয়া থাকা যায় না, বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারও জন্মায় না। এই শিক্ষা কলমপেশা বাঙালীকে নূতন করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

উপরোক্ত নিরাশার মধ্যে আশার আলোও দেখা যায়। "গণরাজ" পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিবরণটি সেই আলোর একটি কণামাত্র :

"ফরক্কা থানায় সম্প্রতি ৮ ফুট চওড়া ২ মাইল লম্বা এক পয়ঃপ্রণালী খনন গ্রামবাসীগণের স্বেচ্ছাশ্রমে এবং বিনা অর্থব্যয়ে সম্পন্ন হইয়াছে। অধিক ফসল ফলাইবার কাজে এ অঞ্চলের গ্রামবাসীগণ ক্রমশঃই বৃহত্তর কাজে হাত দিতেছেন। এই সব গ্রামের লোকেরা গত বৎসর এই থানায় আজুয়া পুরাণ চণ্ডীপুর খাল খনন করিয়াছিলেন। যাহার ফলে ১৬০০ বিঘা অজন্মা জমি আবাদযোগ্য হইয়াছে। জঙ্গল-খাল খনন করার ফলে ফরক্কা থানার বিস্তৃত জলাভূমির বদ্ধজল গঙ্গায় যাইয়া পড়িবে এবং নিয়ন্ত্রিত জল নিকাশের ফলে ৩০০০ বিঘা জমি আবাদযোগ্য হইবে।

মানভূমে উচ্চশিক্ষায় বাধা

মানভূম জেলার সদর মহকুমায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য কোন প্রথম শ্রেণীর কলেজ ছিল না। কিছুদিন যাবৎ পুরুলিয়ায় একটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু নানাবিধ বাধা আসায় কলেজটির কাজ ব্যাহত হইতেছে এবং কলেজটি দাঁড়াইয়া উঠিবার আগেই উহা নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, যাহাদের নিকট হইতে কলেজটির সবচেয়ে বেশী সাহায্য পাওয়ার কথা, সেই দুই জন অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেই বেশী বাধা আসিতেছে। কয়েক দিন আগে পুরুলিয়ায় কলেজ পরিচালনা সম্বন্ধে জনসাধারণের একটি সভা হইয়াছে এবং উহাতে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত ২৮ জন সদস্য লইয়া কলেজ স্থাপনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় এবং মানভূম জেলার ডেপুটি কমিশনার উহাতে সভাপতিত্ব করেন। ইহার পর কলেজের গভর্ণিং বডি গঠনের জন্য যে সভা হয় ডেপুটি কমিশনার আর উহাতে উপস্থিত হন না। তাঁহার উপস্থিতি প্রয়োজন মনে করিয়া পর পর তিন বার তাঁহার উপস্থিতির জন্য সভা স্থগিত রাখা হইয়াছিল, সভার দিনও তাঁহারই নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য করা হইয়াছিল। ডেপুটি কমিশনার কিছুতেই সভায় উপস্থিত না হওয়ায় অগত্যা তাঁহার অনুপস্থিতিতে গভর্ণিং বডি গঠিত হয়। কলেজের কাজও আরম্ভ হয়। ডেপুটি কমিশনার এইবার কলেজের গভর্ণিং বডির বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট নানা-

রূপ অভিযোগ আরম্ভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় তদন্তের জন্য দুই জন ইন্সপেক্টর পাঠান। ডেপুটি কমিশনারের অভিযোগসমূহ তদন্তে ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হয়। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত গভর্ণিং বডির পরিবর্ত্তে ডেপুটি কমিশনারের সভাপতিত্বে এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নূতন গভর্ণিং বডি গঠনের সুপারিশ করিয়া রিপোর্ট দেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমোক্ত গভর্ণিং বডিকে ইন্সপেক্টরদের সুপারিশানুযায়ী গঠিত গভর্ণিং বডির হাতে কলেজের দায়িত্ব হস্তান্তরিত করিতে নির্দ্দেশ দেন। প্রথম গভর্ণিং বডি জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হইয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ অসঙ্গত নির্দ্দেশ প্রত্যাহারের জন্য স্থানীয় জনসাধারণ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন কথা শুনিলেন না। পুরাতন গভর্ণিং বডি কলেজের স্বার্থের খাতিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অসঙ্গত নির্দ্দেশই মানিয়া লইলেন এবং ডেপুটি কমিশনারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশ অনুযায়ী গভর্ণিং বডি গঠন করিতে বলিলেন ও পুরানো গভর্ণিং বডির সেক্রেটারীকে বলিলেন যে তিনি যেন নূতন বডি গঠিত হইবামাত্র উহাকে কার্য্যভার বুঝাইয়া দেন। অতঃপর ডেপুটি কমিশনারের সভাপতিত্বে নূতন গভর্ণিং বডি গঠিত হয়।

এই গভর্ণিং বডির পরিচালনায় কলেজ দ্রুত অবনতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। অধ্যাপক ও কর্ম্মচারীরা নিয়মিত বেতন পান না, অর্থাভাবে কলেজের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। কলেজটিকে এই অবস্থায় আনিয়া দাঁড় করাইয়া এই গভর্ণিং বডি অতঃপর একটি জনসভা আহ্বান করে এবং কি করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে পরামর্শ চায়। সদর মানভূমে ইহাই একমাত্র কলেজ; উহার অর্দ্ধেকেরও অধিক মাহাতো এবং আদিবাসী ছাত্রের অন্যত্র গিয়া পড়া সম্ভব নহে। স্থানীয় লোকেরা কলেজটি চালাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় উহাতে বাধা দিয়াছেন। ডেপুটি কমিশনারকে লইয়া গভর্ণিং বডি গঠিত হইয়াছে; ঐ কমিটি টাকা তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন না। বিহার সরকার শিক্ষার জন্য বহু টাকা ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু এই কলেজকে কোন টাকা দিতেছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ও অর্থসাহায্য করিবেন না, কিন্তু যে কমিটি কলেজের ভার লইতে অগ্রসর হইয়াছিল তাহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে আগাইয়া আসিয়াছেন। উপরোক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, "এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে নির্ব্বাচিত গভর্ণিং বডির দ্বারা যে কলেজটি গড়িয়া উঠিতেছিল এবং যাহার ফলে মানভূমের অনুন্নত সম্প্রদায়ের এবং মাহাতো শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সুযোগ আসিয়াছিল, সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় ডেপুটি কমিশনার তথা বিহার সরকার ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় জনসাধারণের নির্ব্বাচিত গভর্ণিং বডিকে বিতাড়িত করিয়া নূতন কমিটি গঠন করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান গভর্ণিং বডি কলেজটিকে ধ্বংসের মুখে উপস্থিত করিয়া নিজেদের মুখরক্ষার জন্য এই সভা আহ্বান করিয়াছে।"

এই কমিটি কর্ত্তৃক আহূত সভাতেই উপরোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীক্ষুদিরাম মাহাতো, এম-পি, এবং তিনি বাধা দেওয়া সত্ত্বেও প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। প্রস্তাবটির শেষে বলা হয়: "এতৎসত্ত্বেও জনসাধারণ এই কমিটির নিকট হইতে কলেজ-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে পারিত, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে গভর্ণিং বডি গঠনের অধিকার জনসাধারণের নাই। অধিকন্তু ডেপুটি কমিশনারের কার্য্যকলাপ হইতে জনসাধারণের সুস্পষ্ট ধারণা হইয়াছে যে জনসাধারণ কর্ত্তৃক এই জেলায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারের যে কোন চেষ্টাই হউক না কেন, ডেপুটি কমিশনার তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেনই।"

ডেপুটি কমিশনারের বিরুদ্ধাচরণের অর্থ বিহার গবর্ন্মেণ্টের বিরূপতা, লোকে ইহা মনে করিতে বাধ্য। মানভূমের উন্নতির জন্য বিহার গবর্ন্মেণ্ট বা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় কিছুমাত্র চেষ্টা নিজেরা করেন না, স্থানীয় লোকেরা কিছু করিতে গেলে তাহাতে বাধা দেন ইহা গুরুতর কথা। মানভূম তাঁহারা বাংলাকে ফিরাইয়াও দিবেন না, অথচ নিজেরাও তার জন্য কোন কিছু করিবেন না ইহা শুধু বিহার গবর্ন্মেণ্ট নয় সমগ্র বিহার প্রদেশের পক্ষে গভীর কলঙ্কের কথা। কলেজের ঘটনাটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নহে।

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতির মানভূম সফর

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীপ্রজাপতি মিশ্র গত ১০ই মার্চ্চ হইতে ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত মানভূম জেলার নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। তাঁর কয়েকটি স্থানের ভ্রমণের বিবরণ পুরুলিয়ার 'মুক্তি' পত্রিকায় (১লা মে) প্রকাশিত হইয়াছে। বিলম্ব হইলেও বিবরণগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে, কারণ উহা হইতে বিহার কংগ্রেসের মতিগতি এবং তাহাদের মানভূম-নীতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এখানে দুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত তুলিয়া দিলাম:

"লক্ষ্মণপুর—হুড়া থানার লক্ষ্মণপুর গ্রামে গত ১০ই মার্চ্চ প্রায় সোয়া বারোটার সময় পঃ প্রজাপতি মিশ্র আদিবাসী ছাত্রাবাসে গমন করেন। তাঁহার বেলা ৯টার সময় তথায় পৌঁছিবার কথা ছিল। সভাস্থলে আদিবাসী ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ, স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ও থানা কংগ্রেস কমিটির কতিপয় কর্ম্মী উপস্থিত ছিলেন। জনসাধারণ বিশেষ কেহ সভায় যোগদান করেন নাই।

সভায় অভিনন্দন পাঠের পর মানভূম জিলা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণ হয়। তৎপরে পণ্ডিত মিশ্র বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পরে বিখ্যাত দস্যু দলপতি শ্রীসৃষ্টিধর ব্যানার্জি

তাঁহাকে একটি টাকার তোড়া উপহার দেন। আদিবাসী হোষ্টেলের ভারপ্রাপ্ত শ্রীফণী ব্যানার্জি সভাপতির নিকট তাঁহার পরিচয় দিয়া বলেন যে, শ্রীসৃষ্টিধর ব্যানার্জি মানভূমে একজন খ্যাতনামা ডাকাত হিসাবেই পরিচিত। দুই মাস পূর্বেও ইনি জেলে ছিলেন। এখন কংগ্রেসের কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছেন। আমরা তাঁকে কংগ্রেসের কাজে লাগিয়েছি। আজ ১০।১৫ দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে সৃষ্টিধর কংগ্রেসের জন্ত এই টাকা-পয়সা সংগ্রহ করেছেন।

ইহার পরে গত ১২ই মার্চ তারিখে সৃষ্টিধর ডাকাতির চেষ্টার সন্দেহে গ্রেপ্তার হন এবং পুনরায় ৪।৫ দিন পরে ছাড়া পান।

ইহার আরও কিছুদিন পূর্বে জেল হইতে বাহিরে আসিবার পরে ইনি স্থানীয় সোশ্যালিষ্ট পার্টির কর্মী হিসাবে কাজে নামিয়াছিলেন। বহুদিন হইতেই ইনি একজন পেশাদার ডাকাত।

মানবাজার—গত ১০ই মার্চ প: মিশ্র অপরাহ্নের দিকে মানবাজার স্কুল প্রাঙ্গণে সভা করেন। রাজা হিকিম, ডাক্তার অন্নদাবাবু প্রভৃতি সভার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সভার কিছুদিন পূর্বে জিলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীহরিপদ সিং জন-সাধারণের নিকট বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের অভিযোগাদি সম্বন্ধে জানিতেই পণ্ডিত মিশ্র মানবাজারে আসিতেছেন। সভায় রাজার তরফ হইতে, ছাত্রদের পক্ষ হইতে এবং জন-সাধারণের পক্ষ হইতে অভিযোগাদি জানাইয়া ৩টি মানপত্র দেওয়া হয়। মানপত্র দেওয়ার পর পণ্ডিত মিশ্র তাহার উত্তর দেন। কোন মানপত্রে বিহার গবর্মেন্টের 'হিন্দি সাম্রাজ্য-বাদে'র উল্লেখ ছিল। তাহার উত্তর দিতে গিয়া পণ্ডিত মিশ্র প্রথমে বলেন যে, তোমাদের ভাষা বাংলা, আমার হিন্দি ভাষা বুঝিতে পারিবে না; কিন্তু আমাকে হিন্দি ভাষাতেই বলিতে হইবে। তিনি বলেন যে, হিন্দি রাষ্ট্রভাষা, প্রত্যেককেই হিন্দি শিখিতে হইবে, বিহার সরকারের ভাষা হিন্দি সেজন্য তাহারা হিন্দি প্রচার করিবেই। তোমরা বাংলার নিকটে আছ, তোমাদের ভাষা বাংলা, মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত হিন্দি বাংলার ঝগড়া হইবেই। অতুলবাবু সত্যাগ্রহ করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। স্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে কেহ অন্যায় করিতে পারিবে না। ভোটের দ্বারা সেই সরকারকে পরিবর্তন করিতে হইবে। অতুলবাবুর সত্যাগ্রহ বিচার করিবার জন্ত বোর্ডকে ভার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অতুল বাবু সত্যাগ্রহ করিব না এ কথা না বলিলে বোর্ড বিচার করিবে না। অতঃপর তিনি বর্তমান খাদ্য-পরিস্থিতি ও কমিউনিষ্টদের সম্বন্ধে বলেন। তাঁহার বক্তৃতার পর মানবাজার থানার কংগ্রেসকর্মী মেটালার শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাত এবং চেপুয়ার শ্রীদিবাকর মাহাত কিছু বলিবার জন্ত অনুমতি চাহিলে তিনি অনুমতি দিয়া প্রশ্ন করিতে বলেন। শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত বলেন, "স্বাধীন ভারতেও গবর্মেণ্ট অন্যায় করিলে তাহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিবার অধিকার আছে বলিয়া গান্ধীজী বলিয়াছেন।"

প: মিশ্র—গান্ধিজী মুখে বলিয়াছেন কিন্তু করেন নাই। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনশন করিয়াছেন।

শ্রীগিরিশ—গান্ধিজী দুটি পথই দেখাইয়াছেন।

প: মিশ্র—গান্ধিজীর সত্যাগ্রহের নীতিতে ভুল আছে বলিয়া মনে হয়।

অতঃপর দিবাকর মাহাত প্রশ্ন করেন—পাঁচ বৎসর অন্তর ভোট হয়। যদি কোন সরকার জনসাধারণের উপর অন্যায় করে তবে জনসাধারণ কি করিবে?

প: মিশ্র—সরকারের যে কোন অন্যায় পাঁচ বৎসর পর্যন্ত জনসাধারণকে মানিয়া লইতে হইবে। পরে ভোট দ্বারা পরি-বর্তন করিতে পারে।

এই সময় জিলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীহরিপদ সিং বলেন যে, অতুলবাবুর সত্যাগ্রহ করিবার কোন শক্তি নাই, সব শক্তি নষ্ট হইয়াছে।

প: মিশ্র ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, তোমার এ কথা বলা উচিত হয় নাই।

প: মিশ্র মানপত্রগুলির সম্বন্ধে বলেন—এগুলি নিজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারা লিখ নাই, অন্য লোকসাজস লিখিয়া পাঠাই-য়াছে। পরিশেষে তিনি বলেন—আমি মনে করিয়া-ছিলাম যে তোমরা খুব অভ্যর্থনা ইত্যাদি করিয়া পাঠাইবে। কিন্তু যে মানপত্র দিয়াছ তাহার উত্তর দিতেই সমস্ত সময় গেল। জনসাধারণ তাঁহার বক্তৃতা বাংলায় বুঝাইয়া দিতে বলেন। সভাপতি মহাশয় কোন উত্তর না দিয়াই সভা হইতে উঠিয়া যান। ব্যবস্থাপকগণ তাহার জন্য চা, জলখাবার প্রভৃতির আয়োজন করেন, তাঁহাকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়াই চলিয়া যান। পূর্বে কংগ্রেস হইতে জনসভা বা এইরূপ অনুষ্ঠানে থানা কংগ্রেস কমিটিকে সংবাদ দেওয়া হইত এবং তাঁহারাই সমস্ত ব্যবস্থা করিত। কিন্তু এই ব্যাপারে থানা কংগ্রেসকে কোন সংবাদই দেওয়া হয় নাই।".

এই অভিনব সফরের পর পাটনার 'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রিকায় ২০শে মার্চ নিম্নলিখিত মর্ম্মের বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়:

"মানভূমের পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হইয়াছে। দৃশ্যতঃ এই জেলায় এখন বিরোধ ঘটিত কোন ক্ষোভ আছে বলিয়া মনে হয় না। এই জেলার লোকসেবক সঙ্ঘের সত্যাগ্রহেরও সুযোগ নাই। আমি যেখানেই গিয়াছি সেখানেই বাঙালীরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকের সহিত উৎসাহ সহকারে আমার অভ্যর্থনায় যোগ দিয়াছে। পুরাতন বাঙালী কংগ্রেস কর্ম্মীগণ

জেলা কংগ্রেস কমিটি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর উহার যে অবনতি ঘটিয়াছিল বর্ত্তমান জেলা কংগ্রেস তাহা বহুলাংশে পুনরুদ্ধার করিয়াছে।"

কুচবিহারে পাকিস্থানী ষড়যন্ত্র

কুচবিহারে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির পর হইতে ঐ রাজ্যের সমস্যা নানা দিক দিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। কুচবিহারের জনসাধারণ যে সময় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ঐ রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি দাবী করিয়া প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিল সেই সময়ে তথাকার একদল মুসলমান কুচবিহারকে পূর্ব্ব পাকিস্থানের কুক্ষিগত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। ভারত বিভাগের পর হইতেই কুচবিহার রাজ্য এবং ত্রিপুরা মণিপুরসহ সমগ্র আসাম প্রদেশ পাকিস্থানের কুক্ষিগত করিবার ষড়যন্ত্র চালাইয়া আসিতেছে। এ কাজ সম্ভব ইহা তাহারা এখনও বিশ্বাস করে। আসামে এইরূপ ষড়যন্ত্রের অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, সম্প্রতি কুচবিহার সম্বন্ধেও কিছু তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। মুসলিম লীগ পন্থীরা কুচবিহারের এক বাঙালী বিদ্বেষী প্রধানমন্ত্রীর সহায়তায় 'কুচবিহার হিতসাধিনী সভা' নামে একটি সঙ্ঘ গড়িয়া তোলে এবং উহাতে কিছু-সংখ্যক তপশীলী হিন্দুর সমর্থন লাভ করে। কুচবিহারকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করিবার জন্য ইহারা রংপুর ও ময়মনসিংহ হইতে ভূমিহীন কৃষক আনাইতে থাকে। কুচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইহাদের এই চেষ্টা আপাততঃ ব্যর্থ হইয়াছে। হিতসাধিনী সভার নেতা আসাহুল্লা সিরাজীকে পাকিস্থানী চর হিসাবে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। আর কতকগুলি মুসলমানকে রাষ্ট্র-বিরোধী কার্য্যের জন্য রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। এই বহিষ্কারে তাহারা নিবৃত্ত হয় নাই। তাহাদের কার্য্যতৎপরতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রংপুরে সদর ঘাঁটি স্থাপন করিয়া ইহারা কুচবিহারের গ্রামে গ্রামে হিন্দু উদ্বাস্তুদের আর্থিক বয়কট করিবার জন্য প্রচারকার্য্য চালাইতেছে। ইহাদের প্রচারকার্য্যের ফলে সম্প্রতি দিনহাটা, মাথাভাঙা ও তুফানগঞ্জ মহকুমায় কয়েকটি গ্রামে গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন হাঙ্গামা এত দূর গড়াইয়াছে যে, পুলিসকে গুলিবর্ষণ করিতে হইয়াছে। বহিষ্কৃত পাকিস্থানীদের চরেরা অশিক্ষিত চাষীদের শস্য উৎপাদন করিতে নিষেধ করিতেছে; দুর্ভিক্ষ আনয়নের দ্বারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ইহাদের উদ্দেশ্য। গবর্ন্মেণ্টের ধান সংগ্রহে ইহারা প্রবল ভাবে বাধা দিতেছে এবং গ্রাম-বাসীদিগকে ধান দিতে নিষেধ করিতেছে। কয়েকদিন হইল এই সম্পর্কে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহারা স্বীকার করিয়াছে যে; রংপুর ঘাঁটি হইতে তাহারা এই সমস্ত কাজ করিবার নির্দেশ পাইয়া আসিতেছে।

'যুগান্তরে' ৯ই জুন তারিখে এই সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের আন্তঃডোমিনিয়ন চুক্তি এবং গত এপ্রিল মাসের নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি দুইটিতেই বলা হইয়াছে যে, ভারত বা পাকিস্থান একে অপরের বিরুদ্ধে বা পুনর্ম্মিলনের জন্য কোন প্রচারকার্য্য করিবে না। ভারতের সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে পাকিস্থান গোলযোগ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দ্বারা যদি প্রচারকার্য্যের চেয়েও অনেক বড় অপরাধ করে তবে তাহাতে চুক্তিভঙ্গ হয় কিনা এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ দেওয়া উচিত। উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, কুচবিহারের শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাইয়াছেন; এই সমস্ত তথ্য ও প্রমাণ ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরকে তাঁহাদের দেওয়া উচিত।

আসামে উদ্বাস্তু বসতির সমস্যা

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীহট্টের একজন জমিদার ও চা-বাগানের মালিক। ১৯৪৬ সালের নির্ব্বাচনের পর যখন আসামে শ্রীগোপীনাথ বরদলৈর নেতৃত্বে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তখন তাঁহাকে অর্থসচিবপদে নিয়োগ করা হয়। সেই সময় হইতে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তিনি অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া এই মন্ত্রিমণ্ডলীকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাহার পর যদিও তিনি ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক পদ বরণ করিয়া লইয়াছিলেন তবুও গোপীনাথ বরদলৈর মন্ত্রিসভায় তাঁহার স্থান হয় নাই। বর্ত্তমানে তিনি আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভ্য আছেন। গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে দৈনিক সংবাদপত্রে তাঁহার এক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে কাছাড় জেলায় উদ্বাস্তু সমস্যার বর্ত্তমান ব্যবস্থাদির সমালোচনা আছে। তার কিয়দংশ নিম্নে তুলিয়া দিলাম :

"গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সাহায্য সংক্রান্ত কার্য্যে যেন কাহারও কোন দায়িত্ব নাই বলিয়া মনে হইতেছে। আমরা জানি যে, কাছাড় জেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে সাহায্য ও পুনর্বসতি সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম চলিতেছে। কিন্তু উদ্বাস্তুগণ জানে না সাহায্যের জন্য কাহার নিকট যাইতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার যেসব অফিসার নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রস্তুতের কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন বলিয়া মনে হয়। যে সাহায্য-কার্য্যের জন্য তাঁহাদের নিয়োগ করা হইয়াছে, তাঁহারা কিন্তু সরাসরি সাহায্যদান সংক্রান্ত কোন কার্য্যই করেন না। মহকুমার সাহায্য ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত অফিসার রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কোন কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয় নাই। তাঁহার কার্য্যের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থও মঞ্জুর করা হয় নাই। অতএব তথায় নামেমাত্র অফিসার রহিয়াছেন। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, এই শোচনীয়

অবস্থার জন্য দায়ী কে এবং এই অবস্থা সৃষ্টির পিছনে উদ্দেশ্যই বা কি ?

এই সব তথ্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিগোচরে আনিয়াছিলাম। ১৩ই মে তারিখে আমি করিমগঞ্জ হইতে শ্রীযুত শকসেনার নিকট এক তার প্রেরণ করি এবং উহার নকল প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করি। কিন্তু এ সম্পর্কে আমি কোন উত্তর পাই নাই।

এই সব কপর্দ্দকহীন উদ্বাস্তর খাদ্য ও বস্ত্রের কোনরূপ ব্যবস্থা না করিয়া খয়রাতি সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় ও অমানুষোচিত হইয়াছে। তাহারা কাজ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু তাহাদের কাজ করিবার কোন সুবিধা নাই। কয়েক মাসের মধ্যেই বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা যে কঠিন, তাহা আমরা বুঝি। পুনর্ব্বসতির কার্য্যের জন্য ন্যায়সঙ্গত কারণে বিলম্ব হইলে কেহ সরকারের উপর দোষারোপ করিতে পারিবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে সকলে ইহাও আশা করে যে, সরকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকেদের খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করিবেন।

সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা সম্পর্কে দিল্লী চুক্তির পর নেতৃবৃন্দ মনে করিয়াছিলেন যে, চুক্তি কার্য্যকরী হইবে এবং উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হইবে।...

চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্বের সমান মর্য্যাদা দেওয়া হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু আসল ব্যাপার হইল যে, পাকিস্থান ধর্ম্মের ভিত্তিতে ঐসলামিক রাষ্ট্রগঠনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং এখনও করিতেছেন।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তগণ মনে অনেক আশা লইয়া ভারতে আসে এবং গোড়ার দিকে সত্যসত্যই তাহারা আমাদের নিকট হইতে সদ্ব্যবহার পাইয়াছিল। ইতিমধ্যে পাকিস্থানের শোষণ চলিতে থাকে এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাহারা কপর্দ্দকশূন্য হইয়া এখানে চলিয়া আসে। দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্ব্ব-পাকিস্থানে এখনও যে অবস্থা আছে, তাহাতে এই সব উদ্বাস্তর মনে কোনরূপ আস্থার ভাব ফিরিয়া আসিতেছে না। পূর্ব্ব-পাকিস্থান এখন বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসামে উদ্বাস্ত বসতির যে অব্যবস্থার বিবরণ দিয়াছেন তাহার কারণ সাময়িক নয়। আসামের বর্ত্তমান শাসকশ্রেণীর মনোভাবই তাহার প্রকৃত কারণ। এই শ্রেণী আসামের বাঙালী নাগরিকদের মনে করেন তাঁহাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। বাঙালীদের সংখ্যা কমাইতে পারিলে তাঁহাদের শ্রেণীর স্বার্থ নিরঙ্কুশ হইবে এই দুরাশার প্রেরণায় তাঁহারা শ্রীহট্টের গণভোটের সময় নানা চালাকি খেলিয়াছিলেন ; তাহার পরেও পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তরা আসামে বসতি করিলে বাঙালীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে এই আশঙ্কায় উদ্বাস্ত ব্যবস্থায় নানাপ্রকারে বাধার সৃষ্টি করিতেছেন।

সম্প্রতি আসামের নানাস্থানে বাঙালী বিদ্বেষী যেসব কার্য্যকলাপের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পশ্চাতে এই বাঙালী বিদ্বেষী মনোভাবই কার্য্য করিতেছে। শত চেষ্টা করিয়াও অসমীয়াগণ আসামে সংখ্যাগুরু হইতে পারিতেছেন না। আসামের জনসংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ—তন্মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা ২০।২২ লক্ষ ; অসমীয়ার সংখ্যা ২৫।২৬ লক্ষ ; অন্যান্য জাতি মণিপুরী, খাসিয়া, লুসাই, নাগা, মিকির ইত্যাদির সংখ্যা অসমীয়াদের প্রায় সমান।

এই সংখ্যা-বিচারে অসমীয়াদের দাবি টিকে না। রাষ্ট্রের ক্ষমতা সাময়িক ভাবে তাঁহাদের হাতে আসিয়াছে বলিয়া, তাঁহারা এইরূপ অত্যাচার ও অনাচার চালাইতে পারেন। সেই জন্যই শ্রীঅম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর মত লোকে গর্জ্জন করিয়া যাইতে পারিতেছেন। দৈনিক সংবাদপত্রে শ্রীমধুসূদন গোস্বামী (শিলং) একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তার একাংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি ; অসমীয়া মনোভাবের পরিচয় তাহাতে পাওয়া যাইবে :

"আসামের কুখ্যাত প্রাদেশিকতাবাদী শ্রীঅম্বিকগিরি রায় চৌধুরী নাকি নওগাঁয় এক জনভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে হুমকি দিয়েছেন যে আসামবাসী বাঙালীরা যদি আজও তাদের বাঙালীত্ব বজায় রাখতে চায়, আজও যদি তারা তাদের নিজেদের ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিসর্জ্জন দিয়ে অসমীয়া ভাষা, অসমীয়া কৃষ্টি ও অসমীয়া সংস্কৃতি গ্রহণ না করে তবে তিনি এই 'শেষবারের মত' স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিতে চান যে তা হলে অসমীয়া জাতি কিছুতেই ইহা সহ্য করিবে না। তাহারা ইহার প্রতিবিধানে আজ বদ্ধপরিকর।'

শ্রীরায় চৌধুরীর সুরে সুর মিলিয়ে আর একজন বক্তা (নলিন বরা) নাকি এই হুমকিও দিয়েছেন যে যদি তিন মাসের মধ্যে বাঙালী স্কুল উঠিয়ে না দেওয়া হয়, যদি বাঙালীরা অসমীয়া ভাষা গ্রহণ না করে, যদি বাঙালী মেয়েরা শাড়ী ছেড়ে 'মেখলা' পরিধান না করে, তবে যে বিদ্রোহানল জ্বলে উঠবে তা প্রাদেশিক সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারও দমন করতে পারবেন না।"

সম্প্রতি জোড়হাটে যে আসাম প্রাদেশিক রাজনীতিক সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতেও এইরূপ দাবির কথা শোনা যায় এবং কোন কোন বক্তার বক্তৃতায় এই বিদ্রোহের ধ্বনিও ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীদেবেশ্বর শর্ম্মা এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় মোলায়েম ভাষায় অম্বিকাগিরি রায়ের কথারই প্রতিধ্বনি করা হইয়াছিল।

বিদ্রোহের কথা যে শোনা যায়, তার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট ; বিশেষ করিয়া সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীবল্লভভাই প্যাটেল।

তিনি বরদলৈ মন্ত্রিসভার সমস্ত বাঙালী বিদ্বেষী কার্য্যকলাপের কথা জানেন। যে কোন কারণের জন্যই হোক্ তাহা দমন করিবার বা সংযত করিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। প্রশ্রয় পাইয়া বরদলৈ মন্ত্রিসভা বাঙালী উদ্বাস্ত সমস্যা লইয়া রাজনীতিক খেলা খেলিতেছেন। তার বিপদ শ্রীনলিন বরার মুখে ফুটিয়াছে। এই শ্রেণীর অসমীয়া নেতৃবৃন্দের কার্য্য ও কথার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইলে সেই বিপদও সর্দ্দার প্যাটেলের দায়িত্বভার বৃদ্ধি করিবে।

উদ্বাস্ত সমস্যার গ্লানি

সামাজিক বিপর্য্যয়ের সময়, রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় মানবপ্রকৃতির সৎ ও অসৎ গুণাবলী প্রকাশ পাইবার সুযোগ পায়। পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্ত বসতির সম্পর্কে এই কথার প্রমাণ পদে পদে পাইতেছি। অনিল বিশ্বাস ও কান্তিকুমার রায় আত্মভোলা হইয়া উদ্বাস্ত সেবা ও রক্ষার সময়ে "পাকিস্থানী" গুলিতে নিহত হইয়াছেন। অনিলকুমার সম্বন্ধে গত মাসের 'প্রবাসী'তে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি—আজ কান্তিকুমারের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি সহানুভূতি নিবেদন করি।

গত ফাল্গুন মাসে শান্তাহারে আসাম-যাত্রী মেল ট্রেনের উপর "পাকিস্থানী" আক্রমণ চলে। কান্তিকুমার তাঁর দুই ভগিনীর সম্মানরক্ষার্থে অগ্রসর হন; "পাকিস্থানী" গুলিতে আহত হইয়া প্রায় দুই মাসকাল নওগাঁ হাসপাতালে চিকিৎসার পর অব্যবস্থা ও কুব্যবস্থার ফলে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

নেহরু-লিয়াকৎ আলী চুক্তির আর এক দিক

নেহরু-লিয়াকৎ আলী চুক্তি সম্পর্কে বিতর্কের অবসর সব সময়েই থাকিয়া যাইবে। আজ সেই চুক্তির পরীক্ষা চলিতেছে এবং চল্লিশ কোটি নর-নারীর শান্তি ও স্বস্তি তার ফলাফলের উপর নির্ভর করিতেছে। চুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক বলিবার আছে। সে সবের উল্লেখ এইখানে করিব না। পাকিস্থানের গণ-মন এই চুক্তি কিভাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহা উল্লেখ করিব। মুর্শিদাবাদের "গণরাজ" পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে:

"অনেক সময় নৌকা পারাপার বন্ধ করার জন্য প্রেমতলীঘাট (গোদাগাড়ী) হইতে সহজে কেহ পার হইয়া লালগোলায় আসিতে পারিতেছে না। অনেক সাঁওতালের তীর-ধনুক, টাকাকড়ি কাড়িয়া লইয়া তাহাদের পার হইতে দিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

গত ৪ঠা মে কয়েকজন সাঁওতাল গোদাগাড়ী থানার কমলপুর গ্রামে স্বগৃহে ফিরিয়া গেলে, তাহাদের চোর বলিয়া মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহাদের সঙ্গের টাকাকড়িও পাক-পুলিশ ও আনসারে কাড়িয়া লয়। রাজসাহী-মুর্শিদাবাদ সীমান্তের পাক-পুলিশ ও আনসারেরা বলে যে নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি প: নেহরু ও লিয়াকতের মধ্যেই হইয়াছে, তথাকার পুলিশ বা আনসারের সহিত চুক্তি হয় নাই।..."

ইহাই হইতেছে গণ-মনের অন্তত: একাংশের কথা। ভারত-রাষ্ট্রের উদারনীতিক দল (Liberal Party) এই চুক্তি সম্বন্ধে কি বলেন তাহাও জানিয়া রাখা ভাল। এই চুক্তি গ্রহণের পর তাঁহাদের কাউন্সিল এক প্রস্তাবে বলিয়াছেন:

"এই চুক্তি দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের নীতি স্বীকার এবং ইহা কার্য্যকরী করার জন্য উভয়বঙ্গে কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা করায় ভারতীয় রিপাবলিকের শাসনতন্ত্রের মূলনীতির ও ইহার ধর্ম্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে।"

এইরূপ আশঙ্কা কেবল উদারনীতিক দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ঘটা করিয়া ভারতরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভায় মুসলিম মন্ত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা—যদিও সংখ্যালঘু শ্রেণীর সন্তুষ্টির নামে তাহা করা হইয়াছে—১৯৪৭ ইং ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বের অবস্থায় আমাদের লইয়া গিয়াছে। তার ফলে ভারত বিভাগ হইয়াছিল। নেহরু-লিয়াকৎ আলী চুক্তির ফলে কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা ভাবিয়া ভারতরাষ্ট্রের অনেকেই চিন্তান্বিত হইয়াছেন।

কলিকাতার জাহাজ-ঘাটায় "মাঝি-মাল্লা"

কলিকাতার পোর্টকমিশনারদের বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ আছে—তাঁদের অধীনে ভারতীয় নাগরিকবৃন্দ "মাঝি-মাল্লা"র কাজে নিযুক্ত হইবার সুযোগ পায় না। পররাষ্ট্র পাকিস্তানের মুসলিম নাগরিকবৃন্দ এই 'মাঝি-মাল্লাদের' কাজ প্রায় একচেটিয়া ভাবে অধিকার করিয়া আছে; ইহা তাহাদের পরিশ্রমের কল্যাণে অর্জ্জিত এবং পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকবৃন্দের আলস্য ও শ্রমবিমুখতার ফল। সুতরাং আমরা কলিকাতার পোর্ট ট্রাষ্টকে এখন আর বেশী দোষ দিতে পারি না। পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকবৃন্দ তাদের শ্রমবিমুখতার অভ্যাস না ছাড়িলে কলিকাতার জাহাজ-ঘাটার অত্যাবশ্যক কর্ম্মপ্রবাহ বন্ধ করিতে পারা যায় না। পররাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের সাহায্যেও তাহা চালাইতে হইবে।

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে পোর্টকমিশনারদের চেয়ারম্যান শ্রী এন্. এম্. আয়ার সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় মাঝি-মাল্লা নিয়োগের সুবিধা ও অসুবিধার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া যে বিবৃতি দান করেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা এই কথাই বুঝিয়াছি এবং পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকবৃন্দকে আবার সাবধান করিয়া দিতেছি।

গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এই সাংবাদিক সম্মেলনের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কলিকাতার জাহাজ-ঘাটায় মাঝি-মাল্লার সমস্যা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। সেইজন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :

ভারতের স্বাধীনতা লাভের তারিখে বিগত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট কলিকাতা পোর্টকমিশনারগণের অধীনে মাঝি-মাল্লারা সকলেই ছিল অভারতীয় ও পাকিস্থানী এবং উহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫০০। কিন্তু এক্ষণে ঐ সংখ্যার মধ্যে ভারতীয়গণের মোটামুটি সংখ্যা হইবে প্রায় ৫০০।...

স্বাধীনতা লাভের তারিখ হইতে মাঝি-মাল্লা ও অন্যান্য চাকুরীতে অভারতীয় নাগরিক নিয়োগ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে উচ্চাঙ্গের কারিগরী দক্ষতার দিক হইতে পোর্টকমিশনারগণের অধীনে অভারতীয় নাগরিক নিযুক্ত করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহাতে ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমতি লওয়া আবশ্যক। এই ক্ষেত্রেও ঐরূপ ব্যক্তিকে স্বল্প-কালের মেয়াদে নিযুক্ত করা হয়।

পোর্টকমিশনারগণের ছোট-বড় প্রায় ১৩০খানি জাহাজ আছে। গত ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসেও জাহাজের ইঞ্জিন ঘরগুলির সমুদয় মাঝি-মাল্লাই ছিল পাকিস্থানী। কিন্তু গত পাঁচ মাসে ঐ সংখ্যার মধ্যে শতকরা ১৪ জন ভারতীয় নাগরিককে কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। টহলদার জাহাজ, ড্রেজার, বড় বড় মালের জাহাজ ও ছোট জলযানসমূহের ডেকের খালাসীরা ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে সকলেই পাকিস্থানী ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকদের সংখ্যা হইতেছে শতকরা ৬৭ জন। যে সকল মাঝি-মাল্লাকে নদীর উপকূলে কাজ করিতে হয় তাহাদের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা হইতেছে শতকরা ৪৫ জন। মুরিং মাষ্টারের মাঝি-মাল্লার মধ্যে ভারতীয়ের সংখ্যা হইতেছে শতকরা ২৫ জন। পাইলট জাহাজের মাঝি-মাল্লার মধ্যে ভারতীয় নাগরিকগণের সংখ্যা হইতেছে শতকরা ৬২ জন। ইঞ্জিনের ঘরে কাজ করিবার লোকের অবশ্য বিশেষ অভাব আছে এবং ঐরূপ লোকজনও সহজে পাওয়া যায় না।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশ বিভাগের পরে পোর্ট-কমিশনারগণের কর্ম্মচারীদিগকে ভারত অথবা পাকিস্থানে কর্ম্ম বাছিয়া লইবার কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই—কেননা পোর্টকমিশনার্সের ন্যায় কোন অনুরূপ সংস্থা পাকিস্থানে ছিল না। সেই সময়ে কর্ম্মচারীবৃন্দকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, পাকিস্থানী কর্ম্মচারীদিগকে চাকুরীর পূর্ণ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া অবধি কার্য্যে নিযুক্ত রাখা হইবে; যাহারা পদত্যাগ-পত্র দাখিল করে তাহাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত পদে ভারতীয় নাগরিককে নিয়োগ করা হয়; সকল মাঝি-মাল্লা ছুটি লইয়া অন্যত্র গিয়াছে, তাহারা যদি ফিরিয়া আসে তাহা হইলে তাহাদিগকে চাকুরীতে গ্রহণ করা হইবে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর কোন ইউরোপীয়কে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় নাই।

বিগত হাঙ্গামাকালে অনুমান তিন শত মাঝি-মাল্লা কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যায় এবং ২২০ জন মারাঠি মাঝি-মাল্লাকে বোম্বাইয়ের কল্যাণ আশ্রয় শিবির হইতে পোর্টকমিশনার-গণের কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। ইহারা সিন্ধু প্রদেশে করাচী বন্দরে কার্য্য করিত এবং সেখান হইতে বরখাস্ত হইয়া উদ্বাস্ত হিসাবে উক্ত আশ্রয়শিবিরে বাস করিতেছিল। যেদিন তাহাদিগকে কল্যাণ আশ্রয়শিবির হইতে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, সেইদিন হইতেই তাহাদের বেতন প্রাপ্য হয় এবং বহু ব্যয়ে তাহাদিগকে কলিকাতায় আনয়ন করা হয়। তাহাদের সহিত কার্য্যের ও কার্য্য-সম্পর্কিত বিষয়ে এইরূপ সর্ত্ত স্থির করা হয়:—তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে কার্য্য করিতে হইবে। জাহাজের একমাত্র রন্ধনশালায় নিজেদের পৃথক বাসনকোসনের সাহায্যে তাহাদিগকে রন্ধনকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। তাহাদিগকে ক্ষুদ্র জাহাজে সমুদ্রে যাইতে হইবে এবং সেই সময়ে তাহাদের রন্ধনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নিযুক্ত একজন পাচক থাকিবে, এবং তাহাদিগকে মুসলমান মাঝি-মাল্লার সহিত কার্য্য করিতে হইবে।

ঐ সকল ব্যক্তিকে রেশনের সহিত গো-মাংস দেওয়া হইয়াছিল কি না—এইরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুত আয়ার বলেন যে, একখানি সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অলীক। রেশনের সহিত মাঝি-মাল্লাদিগকে মাংস দেওয়া হয় না। হিন্দু ও মুসলমান সকল মাঝি-মাল্লাই মাংসের দরুণ কিছু অর্থ পাইয়া থাকে এবং তাহা দিয়া তাহারা মাছ বা যে-কোন প্রকার মাংস ক্রয় করিতে পারে।

উক্ত ২২০ জন মারাঠি মাঝি-মাল্লার মধ্যে এক্ষণে ১৯০ জন কার্য্য করিতেছে। অবশিষ্ট ৩০ জন কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ঐ সকল মারাঠি মাঝি-মাল্লাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া দেখা যায় যে, যে সকল কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে আনয়ন করা হইয়াছে, তাহাদের অনেকেই ঐরূপ কার্য্য ইতিপূর্ব্বে করে নাই। এই কারণে কর্ত্তৃপক্ষ অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করেন। যে সকল লোক চলিয়া গিয়াছে, তাহারা সম্ভবতঃ তাহাদের কার্য্যের সর্ত্ত পছন্দ করিতে পারে নাই বলিয়াই কাজ ছাড়িয়া গিয়াছে।

বাঁকুড়া শহরের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা

বাঁকুড়া শহরের ইলেকট্রিক্ কোম্পানীর বিরুদ্ধে বাঁকুড়ার প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে অনুযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই

অভিযোগের খুঁটিনাটি সত্যাসত্যের বিচার করিবার তথ্য আমাদের কাছে নাই।

গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের "হিন্দুবাণী" পত্রিকায় "শ্রীদুর্মুখ" লিখিত—"ঘরের কথা" স্তম্ভে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়ে একটু মনোযোগ দিলে ভাল হয়:

"ভোল্টেজ এখন আইন অনুযায়ী যতটা বজায় রাখা উচিত তার থেকে যথেষ্ট কম। ১৯০।২০০ এর বেশী সন্ধ্যাবেলায় কোন দিন থাকে না। দিনের অন্যান্য সময়েও অবস্থা প্রায় এক; ফ্লাকচুয়েট করা সমানে চলেছে।...শহরে যখন এই অবস্থা তখন বিদ্যুৎ সংযোগের দূরতম প্রান্তে কি হয়, তা সহজেই অনুমেয়। এই একটি কারণই কোম্পানীর লাইসেন্স বাতিলের পক্ষে যথেষ্ট। সম্প্রতি আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনৈক ইলেকট্রিক ইন্সপেক্টর এসেছিলেন। যথারীতি পাওয়ার হাউসে অবস্থান করে কোম্পানীর আতিথ্য গ্রহণ করে চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দ্বারা পরিতুষ্ট হয়ে ফিরে গেছেন। ভদ্রলোক নাকি একটু 'লজ্জা' করে বলে গেছেন যে, 'কাগজে বড্ড লেখা-লেখি হচ্ছে, এরপর থেকে আর আপনাদের এখানে উঠবো না।' এই ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক এসে ভোল্টেজের নৈরাশ্যজনক অবস্থা নিশ্চয়ই পরিদর্শন করে গেছেন। কিন্তু রিপোর্টে পূর্ব্ববৎ 'হোয়াইটওয়াশ' আমরা দেখতে পাবো আশা করি। রাস্তার বৈদ্যুতিক আলোর নৈরাশ্যজনক অবস্থা শহরবাসীর প্রভূত অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। কোন কোন অঞ্চলের রাস্তাগুলি বা কোন কোন আলোর পয়েন্ট অন্ধকার রয়েছে দেখা যায়। ঝড়বৃষ্টি হলে সেদিন এই দুর্ভোগ বেড়ে উঠে বেশী করে। পৌরসভা কর্ত্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানালে তার উত্তর দেন যে এই সকল বিষয়ের আশু প্রতিকার চেয়ে চেয়ে তাঁদের মুখ ভোঁতা হয়ে গেছে। কোম্পানীর কর্ত্তারা কোন বিষয়েই কান দেন না। আরো জানা গেছে যে, আলোগুলি না জ্বললেও মিটার না থাকার জন্য ঘণ্টা-ওয়াটের হিসাব অনুযায়ী বিদ্যুতের মূল্য তাঁদের যথারীতি দিতে হয়। বছরের পর বছর পৌরসভা থেকে মিটার বসানোর দাবি জানালেও কোম্পানীর কর্ত্তারা তাতে কর্ণপাত করে নি। সুতরাং এক রকম জোচ্চুরি ও প্রতারণার দ্বারা করদাতাদের অর্থ পকেটস্থ করা হচ্ছে বললে ভুল হবে কি? পৌরসভারই বা এই অসহায় অবস্থার কারণ কি?"

পণ্ডিত নেহরুর ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ

ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডক্টর সুয়েকর্ণের আমন্ত্রণে ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় গমন করিয়াছেন। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি ডক্টর সুয়েকর্ণ ও প্রধানমন্ত্রী ডক্টর হাতা অনেকবার দিল্লীতে পদার্পণ করিয়াছেন; কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতাদান করিয়াছেন। পণ্ডিত জবাহরলালের ইন্দোনেশিয়া গমন আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

এই উপলক্ষ্যে তিনি যেসব বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন তাহার মধ্যে কোন রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য নাই; তার কোনও রাজনৈতিক গুরুত্বও নাই। ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র প্রায় দুই হাজার দ্বীপপুঞ্জের সমষ্টি। একসময়ে তাহারা ভারতবর্ষের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। আজিও বলী দ্বীপে হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠান বিদ্যমান এবং সমগ্র ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের আচার-আচরণেও এই প্রাচীন সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইন্দোনেশিয়ার লোকসমষ্টির সংখ্যা প্রায় ৭ কোটি, তন্মধ্যে প্রায় ৬॥ কোটি লোক ইসলামপন্থী। যদিও ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রনায়কগণ দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে তাঁহাদের রাষ্ট্র "ঐস্লামিক" নহে, তবুও ঐস্লামিক জগতে যে নূতন মনোভাবের আবির্ভাব হইয়াছে তাহার প্রভাব হইতে কত দিন এই রাষ্ট্র মুক্ত থাকিতে পারিবে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে। পাকিস্থানের রাষ্ট্রনায়কগণ এইরূপ ঐস্লামিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সংগঠন করিবার জন্য সতত সচেষ্ট। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা ইহার ফলাফল দেখিতে পাইব। পণ্ডিত নেহরুর বর্ত্তমান পরিভ্রমণ এইরূপ দুষ্ট পরিণতির পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করিতে পারিলে আমরা সুখী হইব।

"শ্বেত-অশ্বেতে"র বিরোধ

দক্ষিণ আফ্রিকার "শ্বেত" রাষ্ট্রনায়কগণ শ্বেত ও অশ্বেতের বিরোধকে বিষাক্ত না করিয়া ছাড়িবে না।

গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠের দৈনিক সংবাদপত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী কেপটাউন হইতে প্রেরিত যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ ব্যবস্থাপক সভা (Senate) বর্ণানুযায়ী অঞ্চল বিভাগ বিলটি চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছে। এই বিল অনুসারে ইউরোপীয়ান, নেটিভ ও অশ্বেতকায়-ভেদে সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীকে তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হইবে।

গত ফাল্গুন মাসে কেপটাউনে ভারতরাষ্ট্র পাকিস্থান ও দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রের প্রতিনিধির মধ্যে এক আলোচনা সভা বসে; তাহাতে স্থির হয় যে ভবিষ্যতে একটি "গোলটেবিল" বৈঠক আহ্বান করিয়া ভারতবাসীগণ ও তাহার বংশধরগণের বিরুদ্ধে যে অবিচার ও অনাচার করা হয় তাহার চূড়ান্ত মীমাংসায় আসিবার চেষ্টা করা হইবে।

এইরূপ স্বীকৃতির উদ্দেশ্য লঙ্ঘন করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবস্থাপক সভা উপরোক্ত বিলটি আইনে পরিণত করিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট নাকি প্রস্তাবিত "গোলটেবিল" বৈঠক বর্জ্জন করিবার

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অবশ্য এখনও চিঠিপত্র ও তার বিনিময় ইত্যাদি চালাইয়া এই সঙ্কট এড়াইবার চেষ্টা হইতেছে। তাহা সফল হইবে বলিয়া আমাদের কিন্তু বিশ্বাস নাই। কারণ ইংরেজী ভাষাভাষী শ্বেতাঙ্গ জাতির বর্ণবিদ্বেষ একটা রোগে দাঁড়াইয়াছে; তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে যে চিকিৎসার প্রয়োজন তাহা প্রয়োগ করিবার সাধ্য এই জাতিগুলির আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুঁয়ার

বাংলাদেশের জমিদার পরিবারবর্গের ও ভারতবর্ষের রাজন্য পরিবারবর্গের পারিবারিক ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া এই বাঙালী সাহিত্যিক আপনার স্মৃতির ব্যবস্থা নিজেই করিয়া গিয়াছেন। এই সংগ্রহ ও সঙ্কলন কার্য্যে তাঁহাকে বহু বৎসরব্যাপী যে পরিশ্রম ও সাধনা করিতে হইয়াছে তাহাই জ্ঞানেন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের পরিচয়। তিনি প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে ৭৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

লর্ড ওয়েভেল

স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে ব্রিটিশ লাট-বেলাটের কার্য্যকলাপ লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু লাট ওয়েভেলের কর্ম্মকথার আলোচনা করিতে হয়। কারণ তিনি ১৯৪৩ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন। তাঁহার কর্ম্ম-নীতির ফলে ভারতবর্ষ দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে।

তাঁহার প্রভাবের চাপে পড়িয়া পণ্ডিত নেহরু ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে মুসলিম লীগের প্রতিনিধি পাঁচ জনকে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টে স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং মুসলিম লীগের এই প্রতিনিধিবর্গ কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে বিভক্ত করিয়া দেয়—এক দিকে থাকেন পাঁচ জন মুসলিম মন্ত্রী, অন্য দিকে থাকেন নয় জন কংগ্রেসী মন্ত্রী। ইহার অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হয় নোয়াখালি, ত্রিপুরায় মুসলিম তাণ্ডব, বিহারে হিন্দু তাণ্ডব এবং পঞ্জাবে মুসলিম তাণ্ডব। তাহার ফলেই ভারতবর্ষের বিভাগ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।

ইহাই হইল ভারতবর্ষ সম্পর্কে লর্ড ওয়েভেলের পরিচয়। সম্প্রতি তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে; ইনি এখন নিন্দা-প্রশংসার অতীতে গিয়াছেন।

মণীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে এই বাঙালী সাংবাদিক ও সাহিত্যিক দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমরা শোক প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার পরিবার-পরিজনের উদ্দেশ্যে সমবেদনা নিবেদন করিতেছি।

মণীন্দ্রনাথ পাটনার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথের পুত্র। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তার প্রেরণায়ই তিনি "বিহার হেরাল্ড" (সাপ্তাহিক) পত্রের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং "প্রভাতী" নামক মাসিক পত্রিকার পরিচালনভার লন।

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে গুরুপ্রসাদ সেন "বিহার হেরাল্ড" প্রতিষ্ঠা করেন; তিনি সেই যুগের এক জন কংগ্রেস-নেতা ছিলেন। বিহার তখনও বাংলা ও উড়িষ্যার সহিত এক জন লেফটেন্যান্ট গবর্ণরের অধীন ছিল। গুরুপ্রসাদ সেন পাটনায় আইন ব্যবসা করিয়া বিহারের জমিদারবর্গের উপদেষ্টারূপে কৃতিত্ব লাভ করেন। বিহারের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথপ্রদর্শকরূপে তিনি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পূর্ণেন্দু-নারায়ণ সিংহ, মথুরানাথ সিংহ প্রভৃতি বাঙালী প্রধানগণ গুরু-প্রসাদের কর্ম্মধারা অব্যাহত রাখেন। যুবক মণীন্দ্রনাথ সেই ঐতিহ্যের উত্তরসাধক ছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রকৃত পরিচয়।

দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

ঝাড়গ্রাম রাজের পরিচালক ও ঝাড়গ্রাম রাজ-পরিবারের বর্ত্তমান প্রধান শ্রীনরসিংহমল্ল দেব মহাশয়ের পরামর্শদাতা দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তাঁহার পরলোকগমনে মেদিনীপুর জেলার সকলপ্রকার গঠনমূলক কার্য্যের সহায়কগণের মধ্যে প্রধান এক জন চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্থান পূরণ করা সহজ হইবে না।

তাঁহার পরামর্শে ঝাড়গ্রামরাজ নারী শিক্ষা সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন বিধবাশ্রমকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-কলেজকে এক লক্ষ টাকা ও কয়েকশত বিঘা জমি দান করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় তাঁহারই সাহায্যে।

সতীশচন্দ্র দত্ত

শ্রীহট্ট আইন-ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রধান এক জন সম্প্রতি ৭৬ বৎসরে পরলোকগমন করিয়াছেন। আইন-ব্যবসায়ে কৃতিত্ব অর্জ্জনই সতীশচন্দ্রের একমাত্র পরিচয় নহে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে শ্রীহট্টের "উইক্‌লি ক্রনিকল্‌" পত্রিকার বিশিষ্ট লেখক রূপে তিনি দেশের সেবা আরম্ভ করেন; ১৯৩৫ হইতে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। কংগ্রেসের সমুদয় নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া সতীশ-চন্দ্র ১৯৩৭ সালের নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের মনোনয়ন লাভ করিতে পারেন নাই।

শেষ জীবনে তিনি নানা সংবাদপত্রে ভারতবর্ষের রাজনীতিক সমস্যাবলীর আলোচনা করিয়াছেন। সেই সব প্রবন্ধের মধ্যে তাঁহার দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালী কায়স্থের দান

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

যে মানবসমাজে প্রতিভার অবাধ স্ফূর্ত্তি হয় না তাহার জীবনীশক্তি পঙ্গু হইয়া বিনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ সজীব থাকিয়া প্রজাসাধারণের কল্যাণ সাধনে সমর্থ ছিল, সামাজিক ইতিহাস সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিলে এইরূপ প্রতিপন্ন হইবে। সেকালের আদর্শ সমাজের চিত্র নিম্নলিখিত শ্লোকে অঙ্কিত পাওয়া যায়:

ধনিকঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যশ্চ পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ॥

শ্লোকটি জাতিবর্ণবিভাজক নহে, দেশের প্রধান সামাজিক অঙ্গ নির্দ্দেশক। পাঁচটি অঙ্গ হইল যথাক্রমে—Banking, Education, Administration, Transport and Health. তন্মধ্যে বাঙ্গলার সম্ভ্রান্ত কায়স্থসমাজ প্রধানতঃ "রাজ"-তন্ত্রের অন্তর্ভূত থাকিয়া গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিভার প্রেরণায় অন্যান্য তন্ত্রেও বাঙ্গালী কায়স্থের কৃতিত্ব বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান সংগ্রহ করিতে গিয়া আমরা বহু কায়স্থ গ্রন্থকারের নাম পাইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের বিবরণ এই প্রবন্ধে সঙ্কলিত হইল।

১। মহামহোপাধ্যায় কামদেব ঘোষ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় ভট্টিকাব্যের পূর্ব্বার্দ্ধের একটি উৎকৃষ্ট টীকা রক্ষিত আছে (৭৪৬ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি)। ইহা প্রাচীন টীকা হইতে সঙ্কলিত বলিয়া প্রারম্ভ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে:

নত্বা সীতাপতিং সীতাং রামং রামস্য কামিনীং।
কুর্ব্বেঽহং সুলভাং টীকাং দৃষ্ট্বা প্রাচীনসংগ্রহম্॥

টীকামধ্যে জয়মঙ্গলা, রামতর্কবাগীশ (৭।১ পত্র), দিবাকর, টীকাসংগ্রহ প্রভৃতির ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত হইলেও কামদেবের ব্যাখ্যাই অধিকস্থলে গৃহীত হইয়াছে। সপ্তম সর্গের শেষে পুষ্পিকা আছে—"ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীশ্রীকামদেবকৃতাদিব্যাখ্যা।" এক স্থলে (২২ পত্রে) "ইতি কামদেবাঃ বর্ণ্যাঃ" বলিয়া সশ্রদ্ধ উদ্ধৃতি আছে। এই কামদেব কে ছিলেন? সৌভাগ্যবশতঃ এই প্রশ্নের যৎকিঞ্চিৎ উত্তর এখন দেওয়া সম্ভব। কামদেব-রচিত ভট্টিকাব্যের "পদকৌমুদী"-নামক টীকার একটি খণ্ডিত তাড়িপত্রে লিখিত সুপ্রাচীন প্রতিলিপি উক্ত পুথিশালায় রক্ষিত আছে (৩৭৮ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি—পত্রসংখ্যা ২৪০, ভট্টির একাদশ সর্গের ৪৬ শ্লোক পর্য্যন্ত)। প্রথম সর্গের শেষে (১৩।২ পত্রে) পুষ্পিকা আছে—"ইতি মহোপাধ্যায়-শ্রীকামদেব-ঘোষকৃতায়াং পদকৌমুদ্যাং……।" ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয়, কামদেব কায়স্থকুলতিলক "ঘোষ"-বংশীয় ছিলেন এবং তাঁহার "মহোপাধ্যায়" উপাধি হইতে অধ্যাপনাবৃত্তি সূচিত হয়। প্রারম্ভের শ্লোক দুইটি ত্রুটিত, প্রথম শ্লোকের শেষার্দ্ধ এই:

রামং সত্যাভিরামং বিবুধগণসখং চারু নত্বাবিরামং
সশ্রীকঃ কামদে (বঃ কি) মপি বিতনুতে ভট্টিকাব্যস্য
টীকাং॥

কামদেবের এই টীকা অতি সমীচীন এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বটে। তিনি কাতন্ত্রমতে একজন প্রধান বৈয়াকরণ ছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার মতে ভর্ত্তৃহরিই ভট্টিকাব্যের রচয়িতা। বর্দ্ধমান (২ পত্র), ভাষাবৃত্তিকার পুরুষোত্তম (৩।১, ৬৯।২, ৭৭।১ পত্র), পূর্ণচন্দ্র (২৪।২), সুভূতি (৬৪।১, ১০০।১) প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারের সন্দর্ভ ব্যতীত কামদেব দিবাকর (১৪।২) ও বিশ্বেশ্বর (৯২।১) নামক অপ্রসিদ্ধ দুই জন টীকাকারের ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভট্টিকাব্যের বাঙ্গালী টীকাকারদের মধ্যে কাতন্ত্রপ্রদীপকার মহাপণ্ডিত "পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই বিদ্যাসাগরের "কলাপদীপিকা" টীকাই পরবর্ত্তী বিখ্যাত টীকাকার ভরত মল্লিকের প্রধান উপজীব্য ছিল (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৭, পৃ. ১৫২-৩)। অদ্বৈত-প্রকাশের এক নিতান্ত অপ্রামাণিক উক্তি অবলম্বন করিয়া এখনও কেহ কেহ মনে করেন যে কলাপের "বিদ্যাসাগরী"-টীকা স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের রচনা, যদিও তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।[১] কাম-

---

১। বিদ্যাসাগর-রচিত কলাপটীকা কাতন্ত্রপ্রদীপ, পরিশিষ্টটীকা ও ভট্টিটীকা কলাপদীপিকার অংশ বহুকাল পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছে এবং পুথিও পাওয়া যায়। ইহাদের গ্রন্থকার যে পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর, অপর কেহ নহেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। পুণ্ডরীকাক্ষের প্রামাণিক বিবরণ আমরা অন্যত্র লিখিয়াছি (সা-প-প, ১৩৪৭, পৃ. ১৪৯-৫৮; ১৩৫৩, পৃ. ১৪-৫)। শ্রীহরিদাস দাস-রচিত "শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য" নামক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থে (পৃ. ৩৬ পাদটীকা) বিদ্যাসাগরী টিপ্পনীর সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, "নবদ্বীপবাসী গোপীনাথ তর্কাচার্য্য পরিশিষ্টগ্রন্থের টীকায় দুর্গসিংহের মত খণ্ডন করিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহার গর্ব-খর্ব করিবার জন্য এই টিপ্পনী রচনা করেন (বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ৬ষ্ঠ বর্ষ); আদিম শ্লোক—"বিকশতু নখকুসুমালী" ইত্যাদি। এই উক্তি সর্ব্বাংশে ভ্রমাত্মক—পরিশিষ্টের অতি প্রসিদ্ধ টীকাকার গোপীনাথ নবদ্বীপবাসী ছিলেন না। তাঁহার বংশ অদ্যাপি ঢাকা জিলায় বিদ্যমান আছে। তিনি বিদ্যাসাগরের পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। "বিকশতু" শ্লোকটি পুণ্ডরীকাক্ষরচিত কাতন্ত্রপ্রদীপের ধাতুসূত্রের ব্যাখ্যার প্রারম্ভে বহুদিন যাবৎ মুদ্রিত হইয়াছে (গুরুনাথ, প্রসন্নশাস্ত্রী প্রভৃতির কলাপব্যাকরণের বিভিন্ন সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চনার জন্য এইরূপ আকাশকুসুমরচনা নিতান্ত কলঙ্কজনক।

দেব নামোল্লেখ না করিয়া এই বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্যের ন্যায় তৎকালীন মহাপণ্ডিতেরও প্রমাদবচন তীব্রভাষায় খণ্ডন করিয়া পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন (ঐ, ঐ, পৃ. ১৫৬ দ্রষ্টব্য)। বৈয়াকরণের পাণ্ডিত্যপ্রকাশের একটা স্থল হইল কাব্যাদিতে উপলভ্যমান দুর্ঘট প্রয়োগসমূহের সঙ্গতিবিচার। মৈত্রেয়রক্ষিত ও পুরুষোত্তমের পৃথক্ "দুর্ঘট" গ্রন্থ ছিল। অধুনা শরণদেবের "দুর্ঘটবৃত্তি" এ বিষয়ে পরম প্রমাণ গ্রন্থ (প্রথম ১০৯৫ শকে রচিত ও পরে বর্ত্তমানাকারে সংক্ষিপ্ত)। ইঁহারা সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। কামদেব "কাতন্ত্রদুর্ঘট-প্রবোধ" নামে এ জাতীয় গ্রন্থ লিখিয়া পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন—ভট্টিটীকার বহুস্থলে (৬৯।২, ৮১।১, ৮৭।১, ৯৭।২, ১০৮।২ ও ১১৪।২ পত্রে) কামদেব স্বরচিত অধুনালুপ্ত এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কামদেব এতদ্ভিন্ন অন্যান্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় আমরা তদ্রচিত "শব্দরত্নাকর" গ্রন্থ দেখিয়াছি (৫১২ গ সংখ্যক পুথি, ৭৫ পত্র, ১৬৫৭ শকের অনুলিপি)। পুষ্পিকা এই :—"ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীকামদেবঘোষ-কৃতঃ রত্নাকরঃ সমাপ্তঃ শ্রীবলরামশর্ম্মণঃ পুস্তিকেয়ং লিপিশ্চেতি।" (৭৫।১ পত্র) শব্দরূপবিষয়ক এই গ্রন্থও পাণ্ডিত্যপূর্ণ—এই গ্রন্থেও দিবাকর (৭।২ পত্র), নারায়ণ-ভট্ট (৮।২), 'অষ্টবৃত্তৌ' (১৬।২), স্বভূতি (২১।১, ২৫।১), রত্নমতি (২১।১), তন্ত্রপ্রদীপে রক্ষিতেন (ঐ) প্রভৃতি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের বচন উদ্ধৃত করিয়া কামদেব স্বকীয় প্রাচীনতা সূচিত করিয়াছেন।

কামদেবের অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করা কঠিন নহে। তিনি পুণ্ডরীকাক্ষের পরবর্ত্তী, আর পুণ্ডরীকাক্ষ ছিলেন বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতৃব্যপুত্র ও সমকালীন। সুতরাং ধরা যায় কামদেব ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন না। পক্ষান্তরে কলাপের সুপ্রসিদ্ধ "কবিরাজ"-টীকার এক স্থলে (সন্ধি ৭০ সূত্র) সুষেণ বিদ্যাভূষণাচার্য্য "কামঘোষস্তু" বলিয়া কামদেবের ব্যাখ্যা (বোধ হয় কাতন্ত্রদুর্ঘটপ্রবোধ হইতে) উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। সুষেণ খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক এবং কামদেব ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্ত্তী নহেন, ধরা যায়। ভট্টিটীকার প্রারম্ভে ২য় শ্লোকে কামদেব স্বকীয় গুরু "সুদর্শনে"র বন্দনা করিয়াছেন—যিনি পত্নীর সহিত কাশীপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সুদর্শন সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের অন্যতম শিক্ষাগুরু সুদর্শন পণ্ডিত। তাহা হইলে কামদেব শ্রীচৈতন্যের সহাধ্যায়ী ও সমকালীন ছিলেন এবং তাঁহার অভ্যুদয়কাল হয় খ্রীঃ ১৫০০-৫০ মধ্যে।

২। মহামহোপাধ্যায় পুরুষোত্তম দেব

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় অতিজীর্ণ একটি চণ্ডীটীকা রক্ষিত আছে (১০৬৫ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি, পত্র-সংখ্যা ৩৪)। আরম্ভাংশ ত্রুটিত, শেষ পুষ্পিকাটি উদ্ধৃত হইল :—

যদত্র চণ্ডিকাপাঠে ন্যূনাতিরিক্তং জাতং তদ্দেবীপ্রসাদাৎ সাঙ্গমস্তু ইতি হারাবলীয়ং সমাপ্তেতি। ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীপুরুষোত্তম-দেববিরচিতায়াং সপ্তশতিকাটীকা সমাপ্তা শ্রীপদ্মাপতিশর্ম্মণঃ স্বা (ক্ষরং) শাকে ১৫৮১ ॥

"হারাবলী" নামক এই টীকা সুপ্রাচীন ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাবচন হইতে অনুমান হয় গ্রন্থকার শূদ্র-বংশীয় ছিলেন :—(১৮-৯ পত্র)

অধুনাতনপদপ্রচারাদুচ্চৈঃশ্রবঃসঙ্গমিতি (চণ্ডী ৫।৬১) ভবিতুং যুক্তং। কিন্তু পারাশরিপদতাৎপর্য্যং কো বেত্তি। তথা চোক্তং,

অষ্টাধ্যায়ী মৃগী বালা তৃণারণ্যকৃতা (শ্রমা)।
ব্যাসভাষামহারণ্যং নাবগাহিতুমীশ্বরী।

ব্যাসভাষার্থং বেত্তি মূলং ন না (?)। ক্বচিৎ পাঠশুদ্ধিঃ পরা কাষ্ঠা হি যদি "শূদ্রাণাং" দৃশ্যতে তথাপি যথাবোধং ব্যুৎপত্তিশ্চ ক্রিয়তে—উচ্চৈঃ শৃণোতীতি সরতীতি অচ-প্রত্যয়ঃ .....সংজ্ঞায়া নাম্না চেতনয়া বা বর্ত্ততে ইতি সসংজ্ঞঃ... (অনেক পরবর্ত্তী শান্তনবী টীকায় এই বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি দৃষ্ট হয়)। সুতরাং "মহামহোপাধ্যায়"-উপাধিক এই শূদ্র পণ্ডিতের রচনা বিশেষভাবে আলোচনীয়। টীকায় মেদিনিকোষ ভিন্ন অপর কোন আধুনিক প্রমাণবচন উদ্ধৃত হয় নাই (৫।২ পত্র, পশুশব্দঃ পশ্বার্থেঽব্যয়ং তথা চ...ইতি মেদিনিঃ)। পুরুষোত্তম পাঠানযুগের কিম্বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রায় ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের লোক হইতে পারেন। পাণিনি-তন্ত্রানুযায়ী এই টীকা বর্ত্তমানে প্রচলিত টীকাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হওয়া সম্ভব। পাণ্ডিত্যের নিদর্শনস্বরূপ একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইল :—প্রধানেন মহামাত্রেণ সহ বর্ত্ততে, "মাহুত" ইতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ (চণ্ডী ১।১২)। অথবা ধানং লুডন্তং, প্রকৃষ্টং ধানং পোষণং যস্য, তুল্যযোগ ইতি সমাসঃ, প্রকৃষ্ট-পোষণমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ প্রধানশব্দো বাক্য-লিঙ্গোপি দৃশ্যতে। তথা চ কাব্যং—"যে প্রধানাঃ প্রবঙ্গমাইতি। যদ্বা প্রধানবান্ প্রধানঃ অর্শ আদিত্বাদচ॥ (৩-৪ পত্র)

৩। কবি রামচন্দ্র গুহ-মজুমদার

তাঞ্জোরের সরস্বতীমহাল পুথিশালায় রামচন্দ্র কবি-রচিত যযাতি-চরিত্রবিষয়ক "ঐন্দবানন্দ" নামক নাটকের প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। প্রস্তাবনায় কবির পরিচয় হইতে জানা যায় তিনি "গুহ"-বংশীয় গৌড়েন্দ্রমহামাত্য "কবি-পণ্ডিত" শ্রীহর্ষ বিশ্বাসখানের পুত্র ছিলেন (*Tanjore Cat.*,

p. 3355)। রামচন্দ্র নামক এক রাজচক্রবর্ত্তীর সম্যগানন্দের জন্য ইহা রচিত হইয়াছিল। এই রামচন্দ্র উৎকলাধিপতি গজপতি মুকুন্দদেবের (১৫৫২-৬৮ খ্রী.) পুত্র রামচন্দ্র বলিয়া অনুমিত হইয়াছে (*Indian Culture*, VI, pp. 480-1)। তাহা হইলে নাটকটীর রচনাকাল হয় ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পরে। বঙ্গজকায়স্থের কুলজীতে গুহবংশে এই রামচন্দ্র মজুমদারের নাম যথাযথ পাওয়া গিয়াছে—তিনি রাজা প্রতাপাদিত্যের (১৫৮৪-১৬১১ খ্রীঃ) পিতামহ পর্য্যায়ের জ্ঞাতি ছিলেন। তদ্দ্বারাও উক্ত রচনাকাল সমর্থিত হয়। কবির পিতা শ্রীহর্ষের "কবিপণ্ডিত" উপাধি হইতে এই বংশধারায় পূর্ব্ব হইতেই সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি প্রমাণিত হয়।

"রসেন্দ্রচিন্তামণি" নামক আয়ুর্ব্বেদের রসশাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বহুকাল মুদ্রিত হইয়াছে (জীবানন্দের ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। গ্রন্থকার "গুহকুলসম্ভব-শ্রীরামচন্দ্রাহ্বয়ঃ" কবি রামচন্দ্র হইতে অভিন্ন হইতে পারেন। কিন্তু এই গ্রন্থের মনোহর মঙ্গলাচরণ শ্লোক—

অথ প্রকাশকাসারবিমর্ষাম্বুজিনীময়ম্।
সচ্চিদানন্দবিভবং শিবয়োর্বপুরাশ্রয়ে॥

গ্রন্থকারের তান্ত্রিক সাধনা সূচনা করে এবং উক্ত নাটকের নান্দীশ্লোকের সহিত ভাবগত পার্থক্য পরিস্ফুট হয়। সুতরাং উভয় গ্রন্থকার একবংশীয় এবং একনামধারী হইলেও পৃথক্ ছিলেন মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। প্রতাপাদিত্যের প্রপিতামহের নামও ছিল রামচন্দ্র গুহ—তিনিই রসেন্দ্রচিন্তামণি-কার কি না বিবেচ্য। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্য গ্রন্থকার ভরত মল্লীক "চন্দ্রপ্রভা"-নামক বৈদ্যকুলপঞ্জীর এক স্থলে "গুহ"-উপাধি বৈদ্যবংশের উল্লেখ করিয়াছেন :— (পৃ. ২১৩।২)

ধর্ম্মসেনসুতৌ জাতৌ রাঘবোঽথ গুণাকরঃ।
"গুহপদ্ধতিবৈদ্যস্য" তনয়াগর্ত্তসম্ভবৌ॥

তাহা হইলে রসেন্দ্রচিন্তামণিকার কায়স্থবংশীয় নাও হইতে পারেন। বৈদ্য গুহ-বংশ এখনও বিদ্যমান আছে কি না অনুসন্ধানযোগ্য।

৪। কায়স্থ হরিদাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় "জাতকচন্দ্রিকা" নামক জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় গ্রন্থের প্রথমাংশের একটী প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। গ্রন্থারম্ভ যথা, (৬৪৭ সংখ্যক পুথি)

প্রণম্য গোবিন্দপদারবিন্দং বিধীয়তে জাতকচন্দ্রিকেয়ং।
নভোনভোবাণশশাঙ্কহীনঃ শাকেন্দ্রকালো নিজহায়নঃ স্যাৎ॥
শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত ... ... (ত্রুটিত) ... ... স্য হানিঃ।
শ্রীমল্লভূবল্লভদেশমধ্যে তথাবিধং পুস্তকমাতনোমি॥

এতদনুসারে ১৫০০ শকাব্দে (১৫৭৮-৯ খ্রীঃ) এই গ্রন্থ "মল্লরাজে"র অধীনে রচিত হইয়াছিল। মল্লরাজ সম্ভবতঃ কোচবিহারের রাজা "মল্লদেব" নরনারায়ণ (১৫৫৫-৮৭ খ্রীঃ)। কিম্বা মল্লরাজদেশ বলিতে বর্দ্ধমান প্রভৃতি রাঢ়দেশের অংশবিশেষকেও বুঝাইতে পারে। বর্ত্তমান বর্দ্ধমান রাজগোষ্ঠীর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে পাঠান আমলে বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল "মল্লাবনীনাথে"র অধিকারভুক্ত ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশও তৎকালে প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রন্থকারের নাম পুষ্পিকায় প্রদত্ত হইয়াছে :—"ইতি 'কায়স্থ'-শ্রীহরিদাসবিরচিতায়াং জাতকচন্দ্রিকায়াং মধ্যবিবরণং নাম প্রথমোধিকারঃ" (১১।২ পত্র)। এই পুথির ৭।২ পত্রে একটী পত্র লিপিবদ্ধ আছে—শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মা কর্ত্তৃক "রামচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কারে"র নিকট লিখিত।

৫। হরিবল্লভ বসু

ঢাকার পুথিশালায় অপর একটী জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় গ্রন্থের খণ্ডিত তালপত্রে লিখিত প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম (১৮৭১ক সংখ্যক পুথি)। মনোহর মঙ্গল শ্লোকটী উদ্ধৃত হইল :—

একং গুণাতীতমজং নিরীক্ষং নিরাকৃতিং
নির্ব্বিষয়ং নিরীহং।
ব্যাপ্তাখিলং যং নিগদন্তি বেদা-স্তস্মৈ নমঃ শ্রীপুরুষোত্তমায়॥

তৃতীয় শ্লোকে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় যথা,

দৃষ্ট্বা বরাহাদিমতং মুদে বিদাং হিতায় দৈবজ্ঞগণস্য কামদং।
"আয়ুঃপ্রকাশং" হরিবল্লভো বসু-স্তনোতি
ধীরঃ কবিরাজখানজঃ॥

কুলীন বসু-বংশীয় এই গ্রন্থকারের পিতাও সুপণ্ডিত ছিলেন, "কবিরাজখান" উপাধি হইতে তাহা বুঝা যায়। গ্রন্থকারের নাম কুলপঞ্জীতে গবেষণীয়। জ্যোতির্গ্রন্থে রচনাকাল প্রায় সর্ব্বত্র লিপিবদ্ধ থাকে—আলোচ্য গ্রন্থেও পাওয়া যায় :—"রামেন্দুতিথিভির্হীনঃ শাকঃ শাস্ত্রাব্দপিণ্ডকঃ" (২।২ পত্র)। অর্থাৎ ১৫১৩ শকাব্দে (১৫৯১-২ খ্রীঃ) ইহা রচিত হইয়াছিল। সুতরাং গ্রন্থকার সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ রাঘবানন্দের সমকালীন ছিলেন।

৬। রামেশ্বর মিত্র তত্ত্বানন্দ

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়ক "প্রবোধমিহিরোদয়" নামক একটী উৎকৃষ্ট তান্ত্রিক নিবন্ধের প্রতিলিপি রক্ষিত ছিল (পত্রসংখ্যা ২০৫)। গ্রন্থটি আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। মুদ্রিত পুথিবিবরণী হইতে (তন্ত্র-ভাগ পৃ. ৪৭-৯) ইহার বিবরণ সঙ্কলিত হইল। গ্রন্থারম্ভে গুরুবন্দনাশ্লোক যথা,

সম্বিৎকমলসঞ্চারিহংসপীঠকৃতাসনং।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাকারং শ্রীগুরুং সততং ভজে॥

আট "অবকাশে" সম্পূর্ণ এই গ্রন্থের বিষয়সূচি যথা, (১) ভ্রমজ্ঞাননিবারণ, (২) কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃবিবেচন, (৩) পরমেশ্বরনির্ণয়, (৪) ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিলয়নির্ণয়, (৫) জীবতত্ত্ব, (৬) ব্রহ্মবিদ্যা, (৭) পূজাবিধি এবং (৮) ভাবাচারনির্ণয়। তন্ত্রমতে এ জাতীয় দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ বিচারবহুল গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ। ইহা "সকলশাস্ত্রতাৎপর্য্যসাধারণ সংগ্রহ" রূপে রচিত হইয়াছিল এবং বহু তন্ত্রগ্রন্থ ব্যতীত গীতা, উত্তরগীতা, বিষ্ণুপুরাণ, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতির সন্দর্ভ ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার দুই শ্লোকে গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন :—

সংসারে বিষয়াগারে লোভাদিকণ্টকাবৃতে।
অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্নে কথং ন স্যাদমার্গগঃ॥
অতঃ প্রবুধ্যতে শাস্ত্রাৎ প্রবোধমিহিরোদয়ঃ।
যস্য প্রকাশমাত্রেণ সন্মার্গদর্শনং ভবেৎ॥

এতদ্দ্বারা বুঝা যায় তন্ত্রমতে সাধনা করিয়া গ্রন্থকার শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুযায়ী পরম জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন। গ্রন্থশেষে রচনাকাল ও রচয়িতার পরিচয় লিখিত আছে :—

ঈশে নাগাঙ্কবাণেন্দুশকে (১৫৯৭) বিংশতিবাসরে।
সাধকানাং হিতার্থেন সংগ্রহঃ পূর্ণতাং গতঃ॥
কামদেবো মহানাসীৎ কুলীনঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ।
তৎপুত্রো নন্দনঃ শ্রীমান্ কুলতন্ত্রবিশারদঃ॥
রাজেন্দ্র-রঘুনাথাখ্যৌ তৎসুতৌ পুণ্যভাজনৌ।
রঘুনাথসুতঃ শ্রীমান্ মিত্রো রামেশ্বরঃ স্বয়ং॥
* * *
সারমাকৃষ্য শাস্ত্রাণামকরোৎ কৃপয়া ভুবি॥

অর্থাৎ ১৫৯৭ শকাব্দের ২০ আশ্বিন (১৬৭৫ খ্রীঃ) "সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ" কুলীন কামদেবের প্রপৌত্র "কুলতন্ত্রবিশারদ" নন্দনের পৌত্র এবং "পুণ্যভাজন" রঘুনাথের পুত্র রামেশ্বর মিত্র ইহা রচনা করিয়াছিলেন। পিতামহের বিশেষণপদ হইতে অনুমান হয় এই সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী "কৌল"মার্গী তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। কুলীন মিত্রবংশের কুলবিবরণ হইতে এই সাধক পরিবারের সম্যক্ পরিচয় উদ্ধার করা আবশ্যক। গ্রন্থের পুষ্পিকাটী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল—তন্মধ্যে গ্রন্থকারের গুরুর নাম ও বাসস্থানের উল্লেখ আছে :—"ইতি তত্ত্বানন্দপ্রকটীকৃতে প্রবোধমিহিরোদয়ে আচারবিবরণং নামাষ্টমাবকাশঃ। ইতি "বিন্ধ্যপুর"-বাস্তব্য-সর্ব্ববিদ্যা-মহামহোপাধ্যায়-শ্রীমত্তর্কবাগীশভট্টাচার্য্যচরণানুগৃহীত-কায়স্থমিত্ররামেশ্বরাখ্য-তত্ত্বানন্দেন প্রকটিতং সকলশাস্ত্রতাৎপর্য্যসাধারণীসংগ্রহং তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়কং প্রবোধমিহিরোদয়ং সমাপ্তম্॥"

"বিন্ধ্যপুরে"র অবস্থান আমরা নির্ণয় করিতে অসমর্থ। একটা অনুমান লিখিত হইল। বিখ্যাত তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধ সর্ব্বানন্দনাথের বংশধরগণ অদ্যাপি "সর্ব্ববিদ্যা" ঠাকুর নামে পরিচিত। ইঁহারা প্রসিদ্ধ গুরুগোষ্ঠী এবং পূর্ব্বাপর বীরাচারী তান্ত্রিক ছিলেন। একটী বংশধারা বহুকাল যাবৎ যশোহর জেলার "বেন্দা" গ্রামে অধিষ্ঠিত আছে—পুষ্পিকায় উল্লিখিত "সর্ব্ববিদ্যা" শব্দের উক্ত পারিভাষিক অর্থ স্বীকার করিলে বেন্দাই সংস্কৃত হইয়া বিন্ধ্যপুরে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বেন্দার সর্ব্ববিদ্যাগোষ্ঠীতে তর্কবাগীশ কেহ ছিলেন কিনা এবং তাঁহাদের শিষ্যমধ্যে মিত্রবংশীয় কেহ ছিলেন কিনা অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

৭। হরিনারায়ণ মিত্র

আমাদের নিকট শঙ্করাচার্য্য রচিত সুপ্রসিদ্ধ শক্তিস্তব "আনন্দলহরী"র এক বিস্ময়জনক ব্যাখ্যাগ্রন্থের অনুলিপি রক্ষিত আছে—পত্রসংখ্যা ১১৭। ইহাতে শক্তিপক্ষে বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর প্রত্যেক শ্লোকের "বিষ্ণুপক্ষে" ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। এই পাণ্ডিত্য-পূর্ণ টীকার রচয়িতা ছিলেন মিত্রবংশীয় সুবিখ্যাত "বঙ্গাধিকারী" হরিনারায়ণ রায়। গ্রন্থারম্ভ যথা,

হরিনারায়ণঃ শ্রীমান্ বিশ্বামিত্র কুলোদ্ভবঃ।
তনোত্যানন্দলহরী-হরিভক্তিসুধোদয়ং॥

নিদর্শনস্বরূপ প্রথম শ্লোকের বিষ্ণুপক্ষে ব্যাখ্যাংশ উদ্ধৃত হইল :—"বিষ্ণুপক্ষে তু শিবো গোপালাষ্টাদশাক্ষরঃ, শক্ত্যা পঞ্চদশ্যা, অষ্টাদশাক্ষরপ্রত্যেকপদাদৌ পঞ্চদশীমন্ত্রস্য ক্রমেণৈকৈককূটদানেন মন্ত্রে সুন্দরীগোপালমন্ত্রোদ্ধারাদিত্যর্থঃ।

কদাচিদাদ্যা ললিতা পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা।
বেণুনাদসমারম্ভাদকরোদ্বিবশং জগৎ॥
ইতি তন্ত্ররাজোক্তেঃ

স্ত্রীণাং ত্রৈলোক্যজাতানাং কামোন্মাদৈকহেতবে।
বংশীধরং কৃষ্ণদেহং চকার দ্বাপরে যুগে॥
ইতি মহাকালসংহিতাবচনাচ্চ

কৃষ্ণস্যাপি কাত্যায়নীরূপতয়া তৎপরতয়া এব ব্যাখ্যানেনাভেদো নিরাবাধ এব ইতি" (৫ পত্রে)। গ্রন্থশেষে শিক্ষাগুরুর নাম ও গ্রন্থকারের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে—উভয়ই অজ্ঞাতপূর্ব মূল্যবান্ তথ্য।

তর্কালঙ্কারধীরেণ শ্রীরামকৃষ্ণশর্ম্মণা।
শঙ্করাচার্য্যভাবো মে বিচার্য্যেত্থং প্রকাশিতঃ॥
আনন্দকন্দ-"সানন্দমিত্র"-নন্দননন্দনঃ।
চকারানন্দলহরী-হরিভক্তিসুধোদয়ং॥

(পুথিটীর লেখক নীলকণ্ঠ, লিপিকাল "রবীন্দুক্ষৌণীধর-

পৃথ্বিমানে শাকে" অর্থাৎ ১৭১১ শকাব্দে)। সুতরাং হরিনারায়ণ সানন্দমিত্রের পৌত্র ছিলেন—প্রচলিত বংশাবলী-সমূহে যে তাঁহাকে অমোঘের পৌত্ররূপে ধরা হইয়াছে তাহা ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইল (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ খণ্ড, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩-৫৪ দ্রষ্টব্য)। সম্রাট্ আরঙ্গজেবের সনন্দানুসারে (ঐ, পৃ, ৪৪) হরিনারায়ণ বঙ্গবিনোদের ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ ভগবান রায়ের পুত্র ছিলেন।

হরিনারায়ণের কার্য্যকাল ১৬৭৮-১৭০০ খ্রী:। ঐ সময়ের শেষাংশে এই টীকা রচিত হইয়াছিল অনুমান করা যায়। কারণ শিক্ষাগুরু রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার আগমতত্ত্ববিলাসকার সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ তর্কবাগীশের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। রঘুনাথ ১৬০৯ শকের চৈত্র মাসে (১৬৮৮ খ্রী.) সুবৃহৎ তন্ত্রনিবন্ধ সম্পূর্ণ করেন এবং তাহার সারসঙ্কলন করিয়া রামকৃষ্ণ 'মুনিবেদনৃপে' (১৬৪৭) শকে "আগম চন্দ্রিকা" রচনা করেন (L 269)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রামকৃষ্ণ রচিত মহিম্নস্তোত্রের টীকা রক্ষিত ছিল, তাহাও হরিনারায়ণের আদেশে রচিত। তদ্ভিন্ন "বঙ্গেশ্বর-শ্রীহরি-নারায়ণ রায়ে"র আদেশে রামনারায়ণ মিত্রদাস (সম্ভবতঃ হরিনারায়ণের আত্মীয়) "সভাকৌস্তুভ" নামে গ্রন্থ (১০৭৭ বঙ্গাব্দে) রচনা করিয়াছিলেন (H. P. Shastri : *Notices*, II 240)।

আমরা দিগ্‌দর্শনস্বরূপ পাঠান-মুঘল যুগের ৭ জন মাত্র কায়স্থপণ্ডিতের বিবরণ এই প্রবন্ধে সঙ্কলন করিয়া দিলাম। এতদ্ভিন্ন বহু কায়স্থ রচিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং নানা স্থানের পুথিশালা পরীক্ষা করিলে অনেক গ্রন্থ নূতন আবিষ্কৃত হইবে সন্দেহ নাই। বাংলার সারস্বত ইতিহাসের এই অন্ধকারময় অধ্যায়টী কষ্টসাধ্য গবেষণাদ্বারা আলোকিত করুন, শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের নিকট আমাদের এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গালীর কবি

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

বাঙ্গালীর কবি, কোথা ভৈরবী
অভয় রাগিণী তব?
বিশ্ব বিপুলে নিঃশেষ আশা,
অনন্ত স্রোতে ক্লান্তিতে ভাসা,
অসহায় ডুবে যায় যত তৃণ
তাহারে শোনাও নব
জীবনের গাথা, শোধ তার ঋণ,
দূর করো পরাভব।

নিঃস্ব নিশীথে নিস্ফলা গীতে
ভরায়ো না কবিতারে;
লক্ষ মূকের মুখর বক্ষে,
অশ্রুশুকানো স্তিমিত চক্ষে
যে ভাষা জাগিছে আশ্বাসহীন
বাণী দাও আজি তারে;
দূরে উদাসীন ধ্যানে সমাসীন
থেকো না অন্ধকারে।

রুক্ষ আলোকে রুদ্রের লোকে
জেগে ওঠো তুমি কবি।
ত্যজ প্রেমগাথা কল্পনাকথা,
মৃত্যুঞ্জয়-জীবন-বারতা
গাহ যাহা শুনি' চিত্ত লভিবে
সত্য শিবের ছবি,
দুখ দুস্তরে সুখ সন্ধানি' নিবে
তুলে ভয় শোক সবি।

পূর্বদেশের কীর্ত্তিনাশার ডাকে
সর্বদা হেসে যারা
বন্যার মাঝে দৈন্যের রাতে
মগ্ন না হয়ে নগ্ন দু'হাতে
যুঝে যায়, আজ কাতারে কাতারে
পথ প্রান্তেতে হারা,
রচ নব নভ তাহাদের তরে
তব গীতে তোল সাড়া।

আজি যারা ভয়ে বিপুল প্রলয়ে
উন্মাদ কালো জলে
ঝাঁপায়ে পড়িয়া দু'হাতে লড়িয়া
ভাগ্যের সাথে পরাণ ভরিয়া
পায় নি আত্ম-নির্ভর সুর
অভয় মন্ত্রবলে,
হে কবি, তাদের যন্ত্রণা করো দূর
দুঃখ নিরাশা দলে।

আনো দুর্বার প্রেরণা তোমার
অপার উন্মাদনা,
হানো ঝঞ্ঝার বাণীসম্ভার,
উড়াইয়া দাও ভীরু অঙ্গার,
তব ভৈরবী সুরেতে, হে কবি,
জাগাও অমৃত প্রাণ,—
মেঘমুক্তিতে শক্তি লভুক রবি,
আনো পথ-সন্ধান।

কৈফিয়ৎ

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দীশর্ম্মা)

নন্দী বেলগাছে উঠিয়া বিল্বপত্র সংগ্রহ করিতে করিতে দেখিল, আকাশে কি একটা সাঁ সাঁ করিয়া চলিয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই কার্ত্তিকের কাছে এয়ারোপ্লেন হইতে বোমা-বৃষ্টির কথা শুনিয়াছিল। ভয়ে মাথায় হাত দিয়া, সোজাসুজি এক লাফ দিয়া ভূতলে পতন, কারণ শোনা ছিল straight line is the shortest distance—পরে হ্যাংচাইতে হ্যাংচাইতে, একটা কয়লা কুড়াইয়া কপালে ৭৪॥ লিখিয়া, গুঁড়ি মারিয়া গোয়ালঘরে প্রবেশ ও দুর্গানাম জপ।

এমন সময় ঢেঁকিসুদ্ধ নারদের অবতরণ ও বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রবেশ এবং কিছুক্ষণ পরে বাহির হইয়া অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দিরে গমন।

বিশ্বনাথ নন্দীকে ডাকিয়া বলিলেন—পাজি ব্যাটা মরেচ ?

নন্দী। তবে প্রণাম হই, পায়ের ধুলো দিন, মার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না। গাঁজার ঝুলি ত্রিশূলের আগায় ঝোলানো আছে, আর কোল্‌কেটা ধুনির ধারে পাবেন। আমি এই সময় পায় পায় এগুই, এখনও চলতে পারচি—

বিশ্বনাথ। কোথায় ?

নন্দী। মণিকর্ণিকায়।

বিশ্বনাথ। কেন—

নন্দী। আজ্ঞে—মারা যখন গিছি, এর পর বইবে কে ?

বিশ্বনাথ। গাঁজার থলি সাবাড় করেচিস্ বুঝি ? মরিচিস কে বললে ?

নন্দী। আজ্ঞে এই ত বললেন—

বিশ্বনাথ। ওঃ তাই বল্, বেটা এখুনি নেশা ছুটিয়ে দিছলি। আমায় না মেরে কি আর তুই মরবি ? তার জোগাড়ও ত করেচিস—বুড়ো বয়সে নাকি সাহিত্যচর্চ্চায় মন দিয়েচিস্ ? তাই ত বলি, ছিলিমের নম্বর কমচে কেন। ও রোগটি বড় সোজা নয়, মেয়েটা ঐতে গোল্লায় গেছে, ছত্রিশ জাতের ঘরে ঢুকে রয়েচে, গণশা ব্যাসের মুহুরি হয়ে আমার মাথা হেঁট করিয়েচে, এই কাগজের কসানের দিনে বাংলাদেশ উচ্ছন্ন যেতে বসেচে, আর তুমি বেটা কিনা তার ওপরে সাতা ক্রপ্ করে ভিড় বাড়াতে গেছ ? আজ সাত দিন সাঁপি নেই, হাতে শেষটান্ মেরে ফোস্কা পড়ে গেল, —সে দিকে দৃষ্টি পর্য্যন্ত নেই।

নন্দী। আজ্ঞে, সেদিন যে মোক্কম্ টান্ দিলেন—ছেঁদা হাউয়ের মত কোল্‌কের নীচে পর্য্যন্ত হল্‌কা এসে সাঁপি পর্য্যন্ত পুড়িয়ে দিলে। আপনার ত ন্যাংটা দরবার, বাঘছালে ত আর সাঁপি হবে না। হয়েচে—দেখি এখনো আছে কিনা।

এই বলিয়া নন্দী বাহিরে আসিয়া নারদের ঝুলিটার তলা সাবাড় করিয়া, সাঁপি করতঃ, ভাল করিয়া এক ছিলিম ঘাড়োয়ালী গপ্পা সাজিয়া দেওয়ায়, বিশ্বনাথ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"বেটা আমার সঙ্গে সহমরণে যাস, তা না ত মলেও বাঁচবো না। কিন্তু খবরদার—ফের যেন সাহিত্যের দায়িত্ব ঘাড়ে করে- মুখ্যুমির খাঁটিত্ব (সতীত্ব) মাটি করিস নি।"

নন্দী বাহিরে আসিয়া দেখে নারদ মা'র বাড়ী হইতে ফিরিয়া ঢেঁকিতে জিন কসিতেছেন, নন্দীকে দেখিয়া বলিলেন—"মা ডেকেছেন, কি জরুরী কাজ আছে, শিগ্‌গীর যাও!"—এই বলিয়া হুস্ করিয়া ঢেঁকি ছাড়িয়া দিলেন, ঝোলা হইতে মালা, গোপীচন্দন প্রভৃতি ঝুপঝাপ পড়িতে লাগিল, তিনি টেরও পাইলেন না। নন্দী হাসিতে হাসিতে প্রণাম করিল।

মায়ের মন্দিরে গিয়া প্রণাম করিতেই অন্নপূর্ণা বলিলেন—"তুই নাকি সাহিত্যিক হয়েচিস্ ? লেখাপড়া শিখলি কবে ?"

ন। মা—গো সেবা করলে কি না হয়, তোমাদের সংসারে গরু নিয়েই থাকি, সাধুসঙ্গে সবই সম্ভব—তাই কিছু কিছু এসে থাকবে।

অ। কিন্তু এমন নেমকহারাম হলি কি করে ?

ন। কই মা, এ সংসারে ত নুনের কারবার নেই ! বাবা গাঁজা খেয়েই থাকেন, তুমি রাবড়ী পেঁড়া পরমান্নেই জীবন ধারণ কোরচো, ষাঁড় আর গরুগুলো ফুল বিল্বিপত্র খেয়েই আছে। বিরাটরাজা বাবার গর্ভেই বোধ হয় তাঁর গোধনগুলি ঝেড়ে দিয়ে স্বর্গলাভ করেন। ঘাস কিনে খাওয়াতে হলে কুবেরকে আর বেশীদিন চাকরী রাখতে হোতো না—এ শহরে ছ' আনায় এক মোট ঘাস। তারা ত আর নন্দী নয় যে সেরেফ কলা খেয়ে জন্মটা কাটাবে; কাজেই মুখ বদলাবার জন্যে হাটে বাজারে দোকানে দিনে ডাকাতি করে বেড়াচ্চে। সেয়ানা কত—কিছুতে হাত দেয় না, কেবল মুখ দেয়। আর একবার যা মুখে নেয়—তার আর চিহ্নমাত্র রাখে না। বামাল পেলে কি রক্ষে

ছিল, আদালতে আর অন্য মামলা নিতে হোতো না। অনেকে অনেক চেষ্টা করেচে, কিন্তু এরা উদরস্থ করে বামালগুলিকে এমন আকার আর রঙ বদলে বার করে দেয়, বড় বড় বৈজ্ঞানিকে দু' হাতে ঘেঁটেও মালের হদিস পায় না। একেই বলে প্রতিভা। ঘাটে একজন সাধু কয়েকখানা পুঁথি মাথায় দিয়ে ঘুমুচ্ছিল একটি ষাঁড় ধীরে ধীরে এসে সেইগুলো টেনে নিয়ে কণ্ঠস্থ করতে আরম্ভ করলে। গিয়ে দেখি—গীতাখানির কর্ম্মযোগের বেবাক মর্ম্ম তখন উদরস্থ করে পাণিনির কর্ত্তা হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়াটি সমাপ্ত করতে ব্যস্ত। 'অব্যয়ের' অপব্যয় ও 'প্রত্যয়ের' ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী ভেবে, সাধুকে তুলে দিলাম। ষণ্ড মহোদয় মন্থরগতিতে কার্য্যান্তরে চলে গেলেন—শব্দমাত্র হ'ল না, যেন আধুনিক রবার টায়ার দিয়ে খুরগুলি বাঁধানো! সাধু অবশিষ্ট ছিন্নপত্রগুলো সংগ্রহ করে দেখলেন—শুদ্ধিপত্র ও কয়েকটি পারাবার্জ্জিত অমূল্য ঔষধের ও দাদের মলমের বিজ্ঞাপন মাত্র হাতে এলো। আর সব বেকাম হয়ে গেছে। তখন শুদ্ধিপত্রটি ফেলে দিয়ে বাকিগুলি সযত্নে পোঁটলায় পুরলেন। ইত্যবসরে একটি সহানুভূতিশীল জনতা জমে গিয়েছিল। একজন সহমর্ম্মী পণ্ডিত বললেন—"একেই বলে পূর্ব্ব সংস্কার নচেৎ পাণিনিতে এতটা স্পৃহা গোজাতির সম্ভবে না।" জনৈক নৈয়ায়িক প্রমাণের দাবি উপস্থিত করায়, পূর্ব্ববক্তা বললেন—"প্রহ্লাদের বিদ্যা-শিক্ষায় হিরণ্যকশিপু ষণ্ডকেই যে আচার্য্য নিযুক্ত করেছিলেন, এ ত আমাদের চতুষ্পাঠীর তরুণী শ্যামা ঝি পর্য্যন্ত জানে।" চোস্ত অলষ্টার গায়ে একগাছি ছিপ্‌ছিপে বাবু বললেন—"এর উপর আর কথা চলতে পারে না—আমাদের গৌহাটির মধ্য ইংরাজি ইস্কুলের গোবরধন মাষ্টার যদিও লোকসমাজে মানুষ বলে চলে গিয়েছিলেন—কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালকেরা তাঁর মুখ নাক চোখ এবং কণ্ঠস্বরে তাঁতে ষণ্ডেরই সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছিল। যদিও তাঁর শিং ছিল না, কিন্তু অন্তর্নিহিত স্বভাবের তাড়নায়, তর্জ্জনী দুটি সোজা করে বালকদের ঘুঁতানই তাঁর অন্যতম শাসন-প্রণালী ছিল। তদ্ভিন্ন কারও বাগানের বেড়া ভেঙে শাক-সব্জী বা ফল অদৃশ্য হলে, তা যে গোবরধন মাষ্টারের কাজ সে বিষয়ে গৌহাটীতে কখনও দ্বিমত শোনা যায় নি। ফল কথা এই, সামান্য সামান্য পূর্ব্বসংস্কারগুলি উত্তরাধিকার-স্বত্বে লাভ করে মানুষ যদি এতটা উন্নত হতে পারে এবং আমাদের জ্যোতিষ-শাস্ত্র থেকে latest পি-এম বাকচীর পঞ্জিকা পর্য্যন্ত যখন মানুষের বৃষরাশি সম্বন্ধে একমত, কেবল তাই নয়, বরং বৃষরাশিস্থ স্ত্রীপুরুষ মাত্রই বিদ্যা-বুদ্ধি ও সৌভাগ্যে উচ্চতর বলে প্রমাণিত—তখন সেই জাতির উন্নতিকল্পে আমাদের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? এই সর্ব্ব-বিষয়িণী সভাসমিতির শিলা-বৃষ্টির দিনে, এই ধোপোন্নতি, হাড়্‌ড়োন্নতির প্রচেষ্টার দিনে, ষণ্ডোন্নতির জন্য কেউ কি একটি অনড্বান University বা বৃষ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব পেশ করে বৃষভ-বাহন বিশ্বনাথের আশীষ অর্জ্জন করবেন না? যে জাতির যৎসামান্য গুণলাভ করে আমরা অমানুষ বা অতিমানুষ হয়ে পড়ছি সামান্য চেষ্টায় তারা যে অচিরে ভারতের মুখোজ্জ্বল করতে পারবে কোন্ মূর্খ এ কথার প্রতিবাদ করতে পারে? বারাণসীর ন্যায় বলদবহুল স্থান হতেই এ প্রস্তাব হওয়া সর্ব্বাংশে সমীচীন।"

সকলে সাধু সাধু করে উঠলেন। একজন মারোয়াড়ী সাগ্রহে নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করায় বাবু অতি বিনয়ের সহিত বললেন—বৃষধ্বজ বাগচী, নিবাস গোবরডাঙা, গোরক্ষপুরে বিদ্যা সমাপ্ত করে গাইবাঁধায় দিনকতক খোঁয়াড়রক্ষকের কাজ করেছিলেন এখন গোকর্ণপুরে মোক্তারী করছেন এবং মোক্তার বলেই কংগ্রেসে বা সাহিত্য সম্মিলনে যেতে পারেন নি, কাশীতেই লেগে পড়েছেন। আগামী বছরে ওকালতী পাস করে সে খেদ মেটাবেন। মারোয়াড়ীটি একটি বিড়ি উপহার দিলেন। বৃষধ্বজ বাবু ধরিয়ে অগ্নি-বাণের মত সোজা, শিবালয়ের দিকে চলে গেলেন। সাধুটি আর গীতার দুর্গতি এবং পাণিনির প্রাণান্তজনিত শোক-প্রকাশের অবকাশ মাত্র পেলেন না। বলদ-বিশ্লেষণ তথা বৃষ-মহিমা কীর্ত্তন শুনেই তাঁকে খুশি হতে হ'ল, ইত্যবসরে অক্ষুন্ন স্বাস্থ্য অপকারী জীবটি সাফ সরে পড়ে অন্যত্র বিদ্যা-চর্চ্চার চেষ্টায় মনোনিবেশ করলে।

আরো দেখ—বিনায়ক, বৃহস্পতি, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, বঙ্কিম এমন কি ব্যারিষ্টার প্রভৃতি বাণীর বাছা-বাছা পুত্রগুলি বেবাক ব'কারেই আরম্ভ, অতএব বৃষ বা বলদ বা বলীবর্দ্দ কোন প্রকারেই সে দাবি থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। চিরকালটা সেই সৎসঙ্গেই কাটচে—এ ছাড়া ত আমার সাহিত্যিক হবার অন্য কোন দাবি দেখি না।

ভ—কি রে নন্দী তুই এখনো বকে যাচ্ছিস্? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তুই যে মোক্তারের চেয়েও বক্তার হলি! তোর সাহিত্যিক হবার মতি গজিয়েছে দেখে খুশি হয়েছি, পাপটা বেশী দিন বাড়তে পাবে না, বোঝাটাও কম হবে—ভাষার, ভাবের আর ভারতের বেশী অনিষ্ট করবার সময় কুলুবে না। সে যা হোক, তুই কিন্তু বড় বেইমান ছেলে—শুনলুম তুই নাকি একখানা বই লিখে একা তোর বাবাকেই সেখানা উৎসর্গ করেছিস? সেই নিয়ে নারদ আমাকে খুব লজ্জা দিয়ে গেল, সে এখুনি গিয়ে গঙ্গার কাছে, শচীর কাছে আমার মুখ হেঁট করবে—

ন—মা, আমার ত কোন পুরুষে কেউ কখন বই লেখেনি, আমিই গ্রহদোষে স্বকৃতভঙ্গ হয়ে পড়েছি। উৎসর্গ-পত্রটাই যে ওর প্রধান 'আর্ট' সেটা বুঝতে পারি নি। পুরুষ-দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করতে হয়, আর মেয়ে-দেবতাদের কাছে উচ্ছুগ্গু করতে হয়, তাই মা, আমার খুবই ভরসা ছিল, বইখানা বস্তুতঃ তুমিই পাবে; কারণ, আমার এ পিঁজরাপোলের পইটেয় বসে লেখা বইখানি, আমি লোক-দেখানো হিসাবে বাবার নামে উৎসর্গ করলেও সমালোচক মহাশয়েরা যে তোমার কাছেই উচ্ছুগ্গু করে দেবেন, এ বিশ্বাস আমার সতেরো আনাই ছিল। এখন দেখছি—আমার সমালোচকগুলো পরম বৈষ্ণব—এঁরা পাতা খাওয়ান, কোপ্ মারেন না, আবার শিঙে সিঁদুর দিয়ে ছেড়ে দেন! এমনটা যে হবে তা জানতাম না।

অ—তা যা হোক বাছা—আমার কিন্তু তোর ব্যাপার দেখে বড় দুঃখু হয়েছে—

ন—তোমাদের মা একটুতেই দুঃখু হয়, আর হলেও তা সহ্য হয় না। আমাদের কিন্তু ঐটেই সম্বল, ঐটে আছে বলেই বেঁচে আছি। তা না ত যে কি নিয়ে থাকতুম তা হাতড়ে পাই না। তাড়ির মালিস, তাড়ির দাওয়াই, তাড়ির সেবা করতে করতেই দুঃখের লম্বা দিনগুলো ঝাঁ কোরে কেটে যায়। একবার গালে হাত দে বসেছি কি—দেড় ঘণ্টা কাবার। এক একটা দীর্ঘনিশ্বাসে ৫.৭ মিনিট ফর্সা করে দি। বাবা বলেন—"বেটা কেবল গাঁজা পোড়াচ্ছে!" গাঁজা পোড়াচ্ছি, কি দুক্ষু ওড়াচ্ছি সেটা মা বাপের একজনও ভাবেন না। এসব হিকমৎ না অভ্যাস থাকলে, যে কিসমৎ নিয়ে ঘর করি, তাতে কি আর একদিন বাঁচোয়া ছিল! এই সেদিন বুকের ওপর দে যে পাহাড়ে পেসনটা গেল, সেটা কি সইতে পারতুম! কই, খোঁজ নিছলে কি মা?

অ—কি রে—কি হয়েছিল আবার?

ন—ঐ যে তোমার বুটে কাণ্ডটা;—অন্নের আড়ত—মেঠাইয়ের মৈনাক, পেঁড়ার পিরামিড, প্রণামীর পাহাড়—টাকার ট্যাকশাল! কেবল অর্থহীন গরীবদের ক্ষুধাতুর গর্ত্তে প্রবেশ নিষেধ। বিদেশী ফ্যাশানের বিজ্ঞাপনের জোরে—বড়লোক ধরে তুমি ত মা ব্যবসাটা বেশ ফ্যালাও করে অন্নকুটের লিমিটেড কোম্পানী ফেঁদে নিলে, চিত্রকুটের পাট্টা বাঁদরে নিয়ে বসে আছে, বিলাতী বালকদের মুখের বিস্কুট ব্রাহ্মণেরা কেড়ে নিয়েছেন, গরীবদের কোন এক বিশেষ রোগের মহৌষধি ছিল তাম্রকূট, কপিপাতা শুকনো সিগারেট আর বিড়ি—তারে পাততাড়ি গুটোবার পরোয়ানা দিয়েছে। শেষে আশা ভরসা ছিল অসহায়ের সহায়, নিরুপায়ের উপায়, জীবনমৃতের বন্ধু কালকূট, বাবা সেটুকু চেঁচে-পুঁছে সাবাড় করে বসে আছেন! আর গণেশদাদার ঘটার বে'তে যে ভুটানী গামছাখানা পেয়েছিলুম—সেই-খানি চিরকুট নাম ধারণ করে ক্রোড়পত্র হিসাবে শর্ম্মার দোছোট হয়ে এতকাল বিরাজ করছিল; লাভের মধ্যে তোমার অন্নকুটের মহিলা মেলায় স্বাধীন জেনানার মান রাখতে সেখানি খুইয়ে এসেচি।

অ—কেন—কি হয়েছিল?

ন—কেবল ভূতেই বিরাজ মা, মানুষের খোঁজ রাখলে বা বর্ত্তমানে বিরাজ করলে, নারী-নিগ্রহটা দেখে চমকে যেতে। সেদিন দশ-বিশ হাজার সালঙ্কারা রাজকন্যে বন্যের মত অন্নকুটের কাঠগড়ায়, হাজার হাজার পুরুষের পাশা-পাশি, ঘেঁষাঘেঁষি, ঠাসাঠাসির ঘূর্ণিপাকে পোড়ে, লজ্জা, মান সম্ভ্রম খুইয়ে তোমার পোষ্যপুত্রদের কৃপায় কি লাঞ্ছনাই না ভোগ করেছিল। গয়নায় ত আর লজ্জা নিবারণ হয় না, তখন গরীবের গামছাখানি আর আরও দু'একটি বাবুর চাদর, তাদের রক্ষা করে। মা—নিজের জাত বলেও কি তাদের দিকে একটু চাইতে নেই, পয়সাও খেলে ভরাও ডুবুলে! এই দেখে প্রসাদের পিত্তেস উড়ে গেল, গামছা গচ্চা দিয়েই সরে পড়লুম।

তাই বলছিলুম মা—আমরা যদি দুঃখুর ফন্দি ফাঁদি—তা হলে দুনিয়া ভরাট হয়ে যায়—

অ—তাই ত বাবা—তোর দুঃখু শুনে যে বড় কষ্ট হচ্চে, আহা তোর গামছাখানিও গেছে! তা আমার ত নিজের কিছু নেই বাবা—এ ঘুনির ভেতর যা এসে পড়ে সেটা সেতো আর সেবায়েতের। কেউ একখানা খাট দিলে, তার ছারপোকাটি পর্য্যন্ত ভাগ করে নেয়। এ যা দেখচিস—এ ত আমার যাত্রার সাজ, থিয়েটারের মা সেজে বসে আছি। আজ যদি দেশে নিরাকারের উপাসনা জারি হয়, তা হলে আমাকে গভীর রাত্রে নগ্নবেশে গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে হবে। তবে একেবারে যে কিছুই আমি পাই না তা বললে বেইমানী হয়—ঘড়া, ঘটি, গেলাস, অনন্ত, বালা এসব ফাঁপা জিনিস এলে তাদের ফাঁপ্টা আমারই থাকে, তখন ঐ ফাঁকটা আমিই পাই, নিরেটের মধ্যে তুমি আর তোমার বাবা ছাড়া আমার বলতে ত কিছু দেখি না। তা এক কাজ কর···মধ্যে আমার সব বড় বড় লক্ষপতি ভক্ত আছে, তাদের ঘরেই আমার প্রগাঢ় পসার-প্রতিপত্তি; কিন্তু তারা লাভ না খতিয়ে কাজ করে না, দু'পাঁচ হাজার পাবার অকাট্য আশা থাকলে দু'পাঁচ টাকা বার করতেও পারে। কিন্তু এখন সব ইংরিজী পড়েচে, স্বপ্নে কি বিশ্বাস করবে?

ন—কেন মা, এইত সব স্বপ্নাদ্য মাদুলী, ঔষধ বেশ চলচে, বিশ্বাস না করলে কি লোকে কেনে—

অ—সে কোন্ জাত কেনেরে পাগল! সে দরিদ্র ব্রাহ্মণ জাতই কেনে আর সরল স্বভাবের মূর্খ পাড়াগেঁয়েরাই কেনে। আমার ঐ সব ভক্ত জাতেরাই ত ঐ স্বপ্নগুলো পায়। যা হোক, আমি আমার এক ভক্তকে স্বপ্নে কিছু কবুল করাচ্চি, তুই তার কাছে যা দেখি, বোধ হয় গামছার বদলে শাল পেতেও পারিস।

ন—তোমায় অত কষ্ট করতে হবে না মা, বড়-লোকের কাছে গরীবরা চিরকালই ওটা না চেয়েই পায়। ওটা আমার কোন পুরুষে অভ্যেস নেই—সহ্যও হবে না। এইবার নারদ এলে তার নামাবলী থেকে খানিকটে পাচার করে নেব, তা হলেই আমার চলে যাবে।

অ। আর যা করিস তা করিস, কিন্তু অমন কাজটি করিস নি, শেষে যেন মার্কামারা মহাপুরুষ সাজিস নি। ওটা এখন দেখচি মেয়েরাও সুরু করেচে।

ন। তবে মা, আমার কিছুই কাজ নেই, আমি বেশ আছি, তোমাকে আর ভাবতে হবে না। এখন আমাকে কেন ডেকেচ তা বল; বাবার দু' ছিলিমের ওক্তো উথড়ে গেল, দেরি হয়ে যাচ্চে—

অ। ঐ দেরি করবার উপায়ই ত আমি খুঁজচি। তোর সাহিত্যচর্চ্চার কথা শুনে আমি বড় খুশি হয়েচি; শুনেছি এ নেশা ধরলে পরিবারও পর হয়ে যায়। আর কিছুতে জ্ঞান থাকে না। জ্ঞান যে ছিল যদিও এমন বদনাম তোর কখনও শুনিনি; তবে তোর বাবাকে সময়মত গাঁজা খাওয়ানোয় কখন ভুল হতে দেখি নি, ঐটুকু ফরসা হয়ে গেলে—কতকটা ভরসা হয়। কোন দিন কি দম আটকে গে—আমার মাথাটা খাবে।

ন। তুমি মিছে ভয় করচ মা, বাবা ত মৃত্যুঞ্জয়—

অ। তা ত জানি—তাই ত এত চিন্তা; এখন বয়েস হয়েচে—যদি পথ আটকে গে, না ইদিক না উদিক হয়ে কাট হয়ে থাকেন, সে কি বিভ্রাট্ বল দিকি! তার চেয়ে যে—

ন। ওঃ ব্বাবা,—উঃ সে কি বিটকেল ব্যাপার। ফ্যালাও দায়, ঘরে রাখাও দায়। ও অবস্থায় শাস্ত্রেও কোন ব্যবস্থা নেই, না আছে মন্ত্র না আছে শ্রাদ্ধ—

অ। বল্ দিকি বাবা—তুই ত এখন পণ্ডিত হয়েছিস, সবই জানিস বুঝিস। তাই বলছিলুম—তুই সাহিত্যচর্চ্চা বজায় রাখলে, ব্যাধিটা ক্রমে কমে আসবে; তোর আর ঘন ঘন যোগান দেবার সময় হবে না।

ন। কিন্তু মা—আমার যা কিঞ্চিৎ ছিল তা ত ফুরিয়ে ফেলেচি।

অ। সে কথা আমি শুনচি না; গঙ্গা যে গাল কাত করে হাসবে, শচী মুখ টিপে টিপে ঠোকর মারবে, সে আমার বড় লাগবে, তোকে একটা কিছু লিখে আমার নামে উৎসর্গ করতেই হবে। তাতে তোর বাপ-মা দু'জনেরই উপকার আছে।

ন। তোমার ত উপকার আছে, ঐ সঙ্গে আমারও ত দেনদার হওয়া আছে। কাগজের দর এখন অন্নের পাঁচ গুণ, তার উপর ছাপাই আছে। আর হাল ফ্যাশানের মলাটের হাটে আমার মত মাতব্বরকে চাট খেয়েই ফিরে আসতে হয়।

অ। সে জন্যে ভাবিস নি।

ন। তোমার ত মা—স্বপ্নই পুঁজি।

অ। তুই তখন দেখিস্ না।

ন। সেটা আমাকেই যেন দিয়ে বসো না।

অ। তুই আমাকে বিশ্বাস করেই দেখ্ না—

নন্দী ভাবিল—এ প্রমাণের যুগে বিশ্বাসের কথা যে শিক্ষিত সমাজে উপহাসের কথা, আমার সেকেলে মা'র তা খেয়ালই নেই। কিন্তু আর কথা চলিল না, নন্দীকে নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, মনে মনে নারদের মুণ্ডপাত করিতে করিতে চলিয়া আসিতে হইল।

২২—১—১৯১৭

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুরের অর্থে পরিচালিত ইসলাম সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা-কার্য্য পরিচালনা করিবার একটা ব্যবস্থা আছে। বিশ্বভারতী সেই নিধির (Trust Fund) রক্ষক ও পরিচালক। প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে ইহার পক্ষ হইতে কাজী আবদুল ওদুদকে বক্তৃতাদান করিবার জন্ম আহ্বান করা হয়। কাজী সাহেব তাঁহার বক্তৃতার বিষয় নির্ব্বাচন করেন 'হিন্দু-মুসলমান বিরোধ'। অনেক দিন পূর্ব্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত এই বক্তৃতা পাঠ করিবার সুযোগ হইয়াছিল; সেই বিরোধ যখন জটিল সমস্যায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়াও যখন সেই বিরোধের অবসান হইল না, তখন নূতন করিয়া সেই বই-খানি আবার পাঠ করিলাম এবং তাহার একটা কথা আমার মনে গাঁথিয়া আছে।

ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজের প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ তাঁহাদের প্রতিবেশীর ভাব-চিন্তার, আশা-আকাঙ্ক্ষার গতি-পরিণতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবর রাখেন না। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত হিন্দুর সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সত্য, রূঢ় সত্য। দেড় শত দুই শত বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষিত হিন্দু এই বিষয়ে এতটা অজ্ঞ ছিলেন না; তাঁহাদের সমাজপতিগণ ইসলাম সংস্কৃতি, সভ্যতা, সাধনা সম্বন্ধে "মৌলবী"—পণ্ডিত—ছিলেন অনেকেই।

বর্ত্তমানে যে অজ্ঞতা দেখা যাইতেছে তাহার কারণ আছে। যেদিন হইতে এদেশে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বাহন হইল সেই দিন হইতে ফার্সী ভাষা শিখিবার প্রয়োজন শেষ হইয়া গেল; শিক্ষিত হিন্দুর মনে এই ভাষা শিখিবার জন্য কোন আগ্রহ রহিল না। ফলে প্রতিবেশী সমাজ দুইটির মনের মাঝখানে একটি কপাট পড়িয়া গেল, পাশাপাশি বাস করিয়াও আমরা পরস্পরের অপরিচিত রহিয়া গেলাম, হিন্দু মুসলমানের মনের ভাষা বুঝে না; মুসলমান হিন্দুর মনের ভাষা বুঝে না যদিও বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের মুখের ভাষা এক। একটি হিসাবে দেখিয়াছি যে, হিন্দু ও মুসলমান বাঙালী যে ভাষায় সাধারণতঃ কথা বলেন তার শতকরা ৮৫টি শব্দ এক—তাহা সংস্কৃত বা আরবী ফার্সী হইতে উৎপন্ন হইলেও। তবুও তারা পরস্পরকে আত্মীয় বলিয়া মনে করে না।

কাজী আবদুল ওদুদ এই বিষয়ে একটা উদাহরণ দিয়াছেন। ওহাবী আন্দোলনের কথা আমরা শুনিয়াছি। শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু তিতুমীরের কথা শুনিয়াছেন। তাহার "গুলি খা ডালা" এই মিথ্যা স্পর্দ্ধায় উপহাস করেন। ১৮৭০ সালের "অমৃত বাজার পত্রিকা"য় ওহাবী বিদ্রোহের ও ষড়যন্ত্রের কিছু কিছু বিবরণ আছে। কিন্তু এই উন্মাদনার দূর-প্রসারী ফলাফল বুঝিবার চেষ্টা ১৯১০ সালের পূর্ব্বে কেহ করেন নাই। সেই আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি, তাহার প্রকৃতি কি এবং তাহার পরিণতি কি, তৎসম্বন্ধে হিন্দুর মনে কোন কৌতূহল নাই; সেই আন্দোলন যে ভারতীয় মুসলিম গণমনকে প্রতিবেশী হিন্দুর নিকট হইতে দূরে লইয়া গিয়াছে এবং এই দূরত্বই যে পাকিস্থানের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আমরা বুঝি না। ওহাবী আন্দোলনের প্রবর্ত্তক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরবদেশের মরুভূমিতে আবির্ভূত হন। মুসলমান সমাজের মধ্যে ইসলামবিরোধী ভাব-চিন্তা ও রীতি-নীতি প্রবেশ করিয়া তাহাকে পৌত্তলিক সমাজের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। এই অনুভূতি ও বিশ্বাস হইতে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব তাঁহার সংস্কার-প্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। দরগায় বাতি জ্বালিয়া পীর-দরবেশের পূজা করা, মসজিদে অনুষ্ঠানের বাহুল্য, বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে ধার-করা মালা-জপ প্রভৃতি আচার ইসলাম ধর্ম্মের অনুমোদিত নয়। এই নববিধান অনুসারে বাংলাদেশে "সত্যপীরে"র বিবর্ত্তন ইসলামের ভাব ও আদর্শের বিরোধী, পৌত্তলিকতার পরিপোষক। মধ্যযুগে এই দুইটির সমন্বয়ের যে চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া ঐতি-হাসিকগণ বলিয়া থাকেন ওহাবী আন্দোলন তাহা ব্যর্থ করিয়া দেয়।

এই বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান চিন্তানায়কগণের দুই-চারখানি বই পড়িয়াছি। ডক্টর বেণীপ্রসাদ ও ডক্টর সৈয়দ মামুদের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে চাই। তাঁহারা বলেন যে, এই সমন্বয় চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা ঠিক নয়, এবং ব্যর্থ হইলেও তাহা সাময়িক। কিন্তু এই কথায় ত আমরা সান্ত্বনা পাই না, যখন দেখি "পাকিস্থান" (পবিত্র স্থান) হইতে ঝাঁটাইয়া হিন্দু-শিখকে বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে, এবং ভারতেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে। পরস্পর এই রেষারেষির একটা কারণ আছে। সেই কারণটি খুঁজিয়া না পাইলে ভারত-রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে বাধা উপস্থিত হইবে। উপরোক্ত দুই জন পণ্ডিতের প্রতিপক্ষ পণ্ডিতও আছেন। তাঁহাদের মতে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের কার্য্যের ফলে। এই বিষয়ে একজন

মুসলমান পণ্ডিতের মত এই তথ্যের সমর্থন করে। শ্রীহট্ট শহরে একটি কেন্দ্রীয় "তমদ্দুন মজলিস" আছে, গত ১৯৪৯ সনের ২৬শে জুন তাহার বার্ষিক অধিবেশনে জনাব মোহাম্মদ আজরফ এম-এ একটি অভিভাষণ পাঠ করেন। এই অভিভাষণের প্রথমেই দেখিতে পাই "তমদ্দুন" শব্দের ব্যাখ্যা :

"তমদ্দুন শব্দের অভিধানগত অর্থ নাগরিকতা। 'মদন' বা শহর শব্দ হইতেই তমদ্দুনের উৎপত্তি। শহরকে কেন্দ্র করিয়া যে কালচার গড়িয়া উঠে, তমদ্দুন বলিতে প্রধানতঃ তাহাকেই মনে করা হয়। সকল যুগেই, সকল দেশের সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক বলিয়া প্রাচীন গ্রামীণ সভ্যতা অপাংক্তেয় শ্রেণীর পর্য্যায়ে পরিণত হইয়াছে। আমাদের তমদ্দুন মজলিসে ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম্য সভ্যতারও পুনর্জীবনের সুযোগ থাকিবে বলিয়া তমদ্দুনকে আমরা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিব, এবং তমদ্দুন বলিতে নাগরিক ও গ্রাম্য সভ্যতা উভয়কেই স্বীকার করিব।"

এই অভিভাষণের মধ্যে আমরা যখন নিম্নোদ্ধৃত বাক্য-গুলি পাঠ করি, তখন কি করিয়া ডক্টর বেণীপ্রসাদ ও ডক্টর সৈয়দ মামুদের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা যায় তাহা বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ যখন মুসলিম সংস্কৃতির নামে ভারতবর্ষকে দু' ভাগ করা হইয়াছে এবং হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক সংস্কৃতির ধারক এই তত্ত্ব মুসলিম গণ-মনে দৃঢ় হইয়া আছে। জনাব মোহাম্মদ আজরফ এই পার্থক্য লইয়া কোন তর্ক তুলেন নাই বা কোনরূপ হা-হুতাশ করেন নাই। তিনি ইহা ইতিহাসের বিবর্ত্তনের একটি ফল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। "পাকিস্থান" প্রতিষ্ঠার পর তাহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। জনাব আজরফ বলিতেছেন :

"ভারতীয় ও মুসলিম সভ্যতার এই সংমিশ্রণে এক নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হইয়াছিল, এবং এই নব্য সংস্কৃতির পুরোহিতরূপে সম্রাট আকবর দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনার এই ধারাকে তাঁহার প্রপৌত্র দারাশেকো অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেবের নিকট শোচনীয় পরাজয়ে তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।"

"ভারত ইতিহাসে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সাফল্য সংস্কৃতির দিক দিয়া এক অভিনব বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে, তখন হইতেই ভারতীয় হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। আওরঙ্গজেব ইসলামের বিশুদ্ধ রূপ এদেশীয় মুসলমানের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তেমন সফলকাম না হইলেও পরবর্ত্তীকালে ওহাবী বিদ্রোহের সময় তাঁহার সেই সাধনা বিশেষভাবে সিদ্ধিলাভ করে। প্রকৃতপক্ষে আওরঙ্গজেবের সময় হইতেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুই-জাতি তত্ত্বে ভারত বিভক্ত হইয়া পড়ে।"

এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস বিচার করিলে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের একটা অর্থ করা যায়; এবং অন্ততঃ আড়াই শত বৎসর মুসলিম জনগণের মনে যে বীজ রোপিত ছিল তার সন্ধান পাওয়া যায়। ইংরেজ আমলে তাহা বিষ-বৃক্ষরূপে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায়। এই পর্য্যন্ত ইংরেজের দোষ। ভেদনীতি একটা রাষ্ট্রধর্ম্ম; ইংরেজ তাহা আবিষ্কার করে নাই। তবুও একজন বিদেশী, ফরাসী নাগরিকের চক্ষে এই নীতির উৎ-পত্তির ইতিহাস কি ভাবে ধরা দিয়াছিল, তাহা জানিয়া রাখা ভাল। পিরিউ তাঁর নাম। তিনি ১৯০০ সালের লাহোর কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন, এবং ভারতবর্ষের নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি আমাদের বর্ত্তমান বিবর্ত্তনের একটা ইতিহাস লেখেন; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই নিবন্ধের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইংরেজ ও মুসলমানের মিতালি সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যার সাহায্যে গত ৫০ বৎসরের ইতিহাস নূতনভাবে বুঝিতে পারা যায়। সেই নিবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

"আজকাল ভারতবর্ষে মুসলমান সমস্যাই একটি প্রধান সমস্যা। জন-সংখ্যার পঞ্চমাংশ লোক কংগ্রেসের প্রতিকূল কেন, তার কারণ স্পষ্টই রহিয়াছে। মুসলমানেরা এখনও হিন্দুদিগকে বিজিত প্রজার জাতি বলিয়া মনে করে। মুসলমানেরা দেখিতেছে যে, হিন্দুরা অন্যপ্রকার যুদ্ধক্ষেত্রে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাজারে, সরকারী চাকুরীতে জয়লাভ করিয়া তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইয়াছে।...এই বিপদ নিবারণের একমাত্র উপায় মুসলমানদের অপরিসীম অজ্ঞতাকে একেবারে ধ্বংস করা। বিপদ দেখিয়া সর্ব্বপ্রথমে যিনি চীৎকার করিয়া নিজের জাত-ভাইকে সাবধান করিয়া দিলেন তাঁর নাম সৈয়দ (অর্থাৎ মহম্মদের উত্তরাধিকারী) আহম্মদ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আলিগড়ে তিনি একটি কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। কলেজটি বেশ উন্নতিলাভ করিতেছিল। এমন সময় খবর আসিল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দুরা কেমন অগ্রসর হইতেছে। যাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছে তাহাদের পক্ষে সমূহ বিপদ। সৈয়দ এক লাফে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মুসলমানেরা অনেকেই তাঁহার অনুগামী হইলেন।

"ইংরেজ ভাল খেলোয়াড়, টপ করিয়া গোলাটা ধরিয়া ফেলিল। বিবাদ উস্‌কাইয়া দিবার এমন সুযোগ তাহারা কি ছাড়িতে পারে?...যদি অভিজ্ঞতা হইতে ইংরেজ না জানিয়া থাকে যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রচণ্ড দাবানল এখন শুধু চাইচাপা আছে মাত্র, তাহা হইলে তাহারা প্রচণ্ড ধর্ম্মোন্মত্ততা জাগাইয়া তুলিবার ঝুঁকি স্বীকার করিয়াও এইরূপ বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা করিবে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।...আলিগড় কলেজে ইংরেজ মুসলমানের মধ্যে একটা বুঝা-পড়া হইল।"

"আমি যদি ঠিক বুঝিয়া থাকি, জাতি, ধর্ম্ম, অহঙ্কার, ঈর্ষা, বিশেষতঃ ক্ষণিক স্বার্থ-বিরোধ এই সব কারণেই উহারা (মুসলমানেরা) কংগ্রেসে যোগ দিতে বিরত হইয়াছে।"

এই ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সত্য হইলেও ইহা বাহ্য। বর্ত্তমানে যে অঞ্চল উত্তর প্রদেশ বলিয়া পরিচিত সেখানে ভারত বিভাগের পূর্ব্বে সরকারী কোন কোন বিভাগে মুসলমানেরা সংখ্যার অতিরিক্ত পদসমূহ অধিকার করিত। তাহারা ছিল লোকসমষ্টির শতকরা ১৪ ভাগ মাত্র। কিন্তু পুলিস বিভাগে ও রেজিষ্ট্রি বিভাগে তাহারা শতকরা ৪'০২ ভাগের অধিকারী ছিল। "ক্ষণিক স্বার্থ বিরোধ" ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কারণ নয়। প্রকৃত কারণ সংস্কৃতির সংঘর্ষ। সাত শত বৎসরের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায় ভারতকে স্বকীয় করিতে পারিল না। বাঙালী মুসলমান কবি বুলবুল,

গোলাপ, উট সম্বন্ধে কবিতা লেখেন। বাঙালী আলেম প্রধানগণ মনে করেন যে, নবাবদের আমলেও বাংলাদেশে ইসলামের আদর্শ আচরিত হয় নাই; সেইরূপ ভাবাবেশেই সুপ্রসিদ্ধ উর্দ্দু কবি আলতাফ হোসেন হালি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা ভারতবর্ষে স্থিতিলাভ করিতে পারিল না, কারণ তাহাদের প্রতিবেশী সমাজ মনে করে যে তাহারা অতিথিরূপে আসিয়া অনেক দিন রহিয়া গিয়াছে। বাঙালী মৌলানা আক্রাম খাঁ প্রায় তের বৎসর পূর্ব্বে মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি রূপে বলিয়াছিলেন—নবাবদের আমলে তাঁহাদের বাংলা ভাষার প্রতি প্রীতি ইসলামের মর্ম্মার্থ প্রচারে সাহায্য করে নাই; ফলে, বাঙালী মুসলিম সম্প্রদায় প্রায় পৌত্তলিক-মনোভাবাপন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুরের শরিয়ৎউল্লা ও বেরেলীর সৈয়দ আহাম্মদের কল্যাণে সেই বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ আউল-বাউল, পীর-ফকিরের চেষ্টায় হিন্দু-মুসলিমের যে সমন্বয় চেষ্টা চলিয়াছিল তাহা ইস্‌লাম-বিরোধী।

আমি এই প্রবন্ধে রাজনীতির তর্ক-বিতর্ক এড়াইয়া গিয়াছি। কারণ আমি বিশ্বাস করি ইহা বাহ্য। অন্তরের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলে, তাহা প্রকাশ প্রায় আমাদের কথা-বার্ত্তায়, আচার-আচরণে। হিন্দু-মুসলিম সমস্যা রাজনৈতিক ভাগ-বাটোয়ারার প্রশ্ন নয়। তাহা হইলে "পাকিস্থান" প্রতিষ্ঠার পরে এই সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইত। পশ্চিম পাকিস্থান হিন্দু-শিখ-শূন্য হইয়াছে; পাকিস্থান রাষ্ট্রের সেই অংশ মানসিক ও সাংস্কৃতিক স্থৈর্য্যলাভ করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছে; পূর্ব্ব পাকিস্থানের হিন্দুদের উৎসাদিত করিতে পারিলে সেই অঞ্চলও মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিবে—যাহা সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের নবাবী আমলে হয় নাই। এরূপ আত্মকেন্দ্রিক সংগঠনের চেষ্টা সকল সমাজকেই করিতে হয়। সুতা আশ্রয় করিয়া যেমন মিশ্রি দানা বাঁধিয়া উঠে, সেইরূপ একটা বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া সমাজ গড়িয়া উঠে। ভাল হউক, মন্দ হউক, পাকিস্থান ইসলামকে অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। ভারতরাষ্ট্র কোন্ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে তাহা তার প্রজাপুঞ্জের বোধগম্য বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ ভারতরাষ্ট্র পাকিস্থানের পাশে, উগ্রপন্থী "ধার্ম্মিক" রাষ্ট্রের পাশে, শান্তিতে থাকিতে পারিবে না—যেমন পারিতেছে না সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কম্যুনিষ্ট সোভিয়েট রাষ্ট্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পার্শ্বে স্বস্তিতে বাস করিতে। এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণ কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থান রাষ্ট্রের বিরোধ জ্ঞাতি-বিরোধের মত অপরিহার্য্য। উভয় রাষ্ট্রই এই আশঙ্কার তাড়নায় সমর-সজ্জায় নিজেদের নিঃশেষ করিবে, ইহাই ভবিতব্য।

কবি

শ্রীকালিদাস রায়

"তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী"

গভীর রাতে কবির সাথে দেখা,
অন্যমনা ঘুর্‌ছে কবি একা
নদীর ধারে ধারে হেরি।
হয়ে গেছে ফিরতে দেরী
গ্রামান্তরে ছিল আমার ঠেকা।

শুধাই তায় "একলা এত রাতে
ঘুর্‌ছ কেন হেথায় নিরালাতে?"
চমকে উঠে বললে কবি,
"এইত সময়, শুব্ধ সবি
বিশ্ব এখন কয় কথা মোর সাথে।

দিনের বেলায় সবই মায়া ফাঁকি,
রাতের বেলায় ফোটে আমার আঁখি,
কাজ তোমাদের সাঙ্গ যখন
আমার কাজের সুরু তখন
সবাই ঘুমায় তখন জেগে থাকি।"

অন্যমনা ঘুর্‌ছে কবি একা,
পড়েছি ত কবির সবই লেখা,
চিনি নি তায় কাব্য প'ড়ে
আজকে চিনি যেমন ক'রে,
আসল রূপটি আজকে হ'ল দেখা।

ভারতীয় সেচ-বিদ্যায় বাংলার স্থান

শ্রীকনকভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, এ-এম-আই-ই

অনেকেই হয়ত একথা জানেন না যে, ভারতবর্ষ সেচ-বিদ্যায় সমগ্র জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। শুধু সেচের জমির পরিমাণ দেখিলেই তাহা অনেকটা বুঝা যাইবে। এই বিষয়ে ভারতবর্ষের পরেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। আয়তনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষের প্রায় দ্বিগুণ, কিন্তু ভারতীয় সেচের জমি যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় তিন গুণ। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর কমবেশী সাত কোটি একর জমিতে জলসেচ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র বাদ দিলে, ভারতবর্ষের সেচের জমির পরিমাণ পৃথিবীর অপর যে-কোনও প্রগতিশীল দশটি দেশের সমষ্টিগত সেচের জমির তুলনায় বেশী হইবে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর অগ্রগামী দেশগুলির তুলনায় নানা দিক দিয়া পশ্চাৎপদ হইলেও, সেচ-বিষয়ে কেমন করিয়া এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে—প্রয়োজনের তাগিদ, বহু বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনা, সরকারী সাহায্য, ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের কৃতিত্ব ও অধ্যবসায়, বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনায় সাহসিকতার সহিত মূলধন বিনিয়োগ ও অতীতের পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতা—এই সকল একত্রে মিলিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে সেচ বিষয়ে এইরূপ উৎকর্ষলাভ সম্ভব হইয়াছে।

যাহা হউক, ভারতবর্ষের সেচন বিষয়ের বিশদ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের এই প্রগতিমূলক অভিযানে বাংলাদেশের স্থান কোথায় তাহাই আমার আলোচ্য।

নিম্নের তালিকা হইতে দেখা যাইবে, ভারতবর্ষে যে পরিমাণ জমিতে জল সেচন করা হয়, তন্মধ্যে বাংলাদেশের স্থান অতি নগণ্য,—

প্রদেশের নাম	প্রদেশের আয়তন (১০ লক্ষ একর)	বাৎসরিক আবাদী জমির পরিমাণ (১০ লক্ষ একর)	মোট জমির তুলনায় আবাদী জমির পরিমাণ (শতাংশে)	বাৎসরিক সেচের জমির পরিমাণ (১০ লক্ষ একর)	আবাদী জমির তুলনায় সেচ-জমির পরিমাণ (শতাংশে)	মোট জমির তুলনায় সেচ-জমির পরিমাণ (শতাংশে)
সিন্ধু	৩০	৬	২০	৬	১০০	২০
পঞ্জাব	৬১	৩২	৫২	১৯	৬০	৩১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২৩	৩	১৩	১	৪৩	৫
যুক্তপ্রদেশ	৬৮	৪৫	৬৭	১২	২৭	১৮
মাদ্রাজ	৮০	৩৭	৪৬	১০	২৬	১২
উড়িষ্যা	২২	৭	৩৪	২	২২	৬
বিহার	৪৪	২৪	৫২	৫	২২	১২
মহীশূর	১৯	৭	৩৫	১	১৬	৬
বাংলাদেশ (অবিভক্ত)	৪৯	৩০	৬০	২	৬	৪

এই তালিকা হইতে দেখা যাইবে, অবিভক্ত বাংলায় মোট জমির প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ আবাদ হইত। একমাত্র যুক্তপ্রদেশ ব্যতীত অন্য কোনও প্রদেশে মোট জমির তুলনায় আবাদী জমির পরিমাণ এত বেশী নহে। অথচ মোট জমির তুলনায় সেচের জমির পরিমাণ বাংলাদেশে মাত্র শতকরা ৪ ভাগ এবং মোট আবাদী জমির তুলনায় সেচের জমির আয়তন মাত্র শতকরা ৬ ভাগ। উক্ত তালিকার অন্যান্য প্রদেশগুলি এই বিষয়ে বাংলাদেশের অপেক্ষা অনেকখানি প্রগতিশীল। এখানে একটি বিষয় জানিয়া রাখা দরকার যে, উল্লিখিত তালিকায় বাংলাদেশে যে বাৎসরিক ২০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে সকল প্রকার সেচের জমিই ধরা হইয়াছে; অর্থাৎ পুষ্করিণী, কূপ, নদী, নালা, খাল সরকারী ব্যবস্থাধীনে এবং বেসরকারী প্রচেষ্টার সকল প্রকার জমিই এই হিসাবের অন্তর্গত। শুধু যদি সরকারী প্রচেষ্টার কথা বলা হইত তাহা হইলে সেচের জমির পরিমাণ অনেকটা কমিয়া যাইত। অবিভক্ত বাংলায় সরকারী প্রচেষ্টায় যে সকল জমিতে সেচ-প্রথা বিদ্যমান ছিল, তাহার সবটাই ছিল পশ্চিম বাংলায়। বর্ত্তমানে পশ্চিম বাংলার মোট জমি, আবাদী জমি ও সরকারী সেচ-ব্যবস্থাধীন জমির পরিমাণ তুলনা করিলে দেখা যাইবে—যদিও অবিভক্ত বাংলার সরকারী প্রচেষ্টার অন্তর্গত সকল সেচের জমিই ছিল পশ্চিম বাংলায়, তথাপি মোট জমি অথবা মোট আবাদী জমির তুলনায় তাহার পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম :

প্রদেশের নাম	মোট জমির পরিমাণ (১০ লক্ষ একর)	মোট আবাদী জমির পরিমাণ (১০ লক্ষ একর)	মোট জমির তুলনায় আবাদী জমির শতকরা পরিমাণ	সরকারী ব্যবস্থাধীন সেচের জমির পরিমাণ (১০ লক্ষ একর)	আবাদী জমির তুলনায় সরকারী ব্যবস্থাধীন সেচের জমির শতাংশ	মোট জমির তুলনায় উক্ত সেচের জমির শতকরা পরিমাণ
পশ্চিম বাংলা	১৮	১৩	৭২	০'২	১'৬	১'১

সিন্ধু ও পঞ্জাবের সেচের জমির সবটুকুই সরকারী প্রচেষ্টার ফল, অর্থাৎ ঐ দুইটি প্রদেশে যথাক্রমে মোট আবাদী জমির শতকরা ১০০ ভাগ ও ৬০ ভাগ জমিতে সরকারী প্রচেষ্টার ফলে সেচ সম্ভবপর হইতেছে। আর পশ্চিম বাংলায় অনুরূপ ক্ষেত্রে মাত্র শতকরা ১·৬ ভাগ জমি সরকারী তত্ত্বাবধান লাভ করিতেছে। অতএব দেখা যায় যে, যে সরকারী সমর্থন ও প্রচেষ্টার ফলে ভারতবর্ষ সামগ্রিক ভাবে বিশ্বের দরবারে সেচ-বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে, বাংলাদেশে সেই সাহায্য, সমর্থন ও অর্থবিনিয়োগ যথোপযুক্ত প্রসারলাভ করে নাই। বৃহৎ রেলওয়ে ও রাস্তার মত বৃহদাকার সেচ-পরিকল্পনাও সরকারী প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে। সেচ-পরিকল্পনার সহিত নদনদীর গতিবিধি, সাধারণ জল নিকাশ-ব্যবস্থা প্রভৃতি এমন কতকগুলি সমস্যা জড়িত, যাহার কোনও স্থানীয় সমাধান বাঞ্ছনীয় নহে। বেসরকারী প্রচেষ্টায় কোনও স্থানীয় সেচ-ব্যবস্থা করিতে গেলে হয়ত পরে দেখা যাইবে, তাহা অপর কোনও স্থানীয় পরিকল্পনার পরিপূরক না হইয়া প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক স্থানের সমাধান হয়ত অপর স্থানে সমস্যা সৃষ্টি করিবে। এই সকল কারণেই সেচ-পরিকল্পনায় সরকারী সমর্থন এবং সামগ্রিক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিগত ছোটখাটো সেচ-ব্যবস্থা অবশ্য বাংলাদেশে বরাবরই চলিয়া আসিয়াছে এবং আসিতেছে,—যেমন পুষ্করিণী, ডোবা প্রভৃতি হইতে জল তুলিয়া রবিশস্যে সেচন অথবা ছোট ছোট নালায় বাঁধ দিয়া জল সঞ্চয় করিয়া বোরো অথবা হৈমন্তিক ধান্যে জলের যোগান দেওয়া ইত্যাদি। পুষ্করিণীতে জল সংরক্ষণ করিয়া মহাকর্ষের সাহায্যে চতুষ্পার্শ্বস্থ ধান্যের জমিতে অথবা রবিশস্যের ক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে এককালে বহুলপ্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে সংস্কারের অভাবে ঐ সকল পুষ্করিণী প্রায় বুজিয়া আসিয়াছে এবং ফলে এখন উহাদের ব্যবহারও কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু উক্ত অঞ্চলের মাঠে, ঘাটে অসংখ্য পুষ্করিণীর জরাজীর্ণ অস্তিত্ব দেখিয়াই বুঝা যায় যে, কোন কালে ঐ সকল অঞ্চলে পুষ্করিণীর সাহায্যে জলসেচের প্রচুর আয়োজন ছিল। এখন উপযুক্ত জলসেচন-ব্যবস্থার অভাবে বীরভূম, বাঁকুড়া অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। বাৎসরিক বারিপাত অপ্রচুর নহে, কিন্তু জমির পৃষ্ঠদেশ উঁচুনীচু হওয়ায় জলসংরক্ষণের স্বাভাবিক সুযোগের অভাব। এইজন্য বৃষ্টির জল বিনা বাধায় নীচু জমিতে, নদী-নালায় বহিয়া যায়; শস্যোৎপাদনের কোন সাহায্যই করে না। এককালে এতগুলি পুষ্করিণী সংস্কার সরকারী সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা,—পুষ্করিণী সংস্কারের জন্য পূর্ব্বতন ইংরেজ সরকারের আমলে "পুষ্করিণী উন্নয়নে"র জন্য একটা আইন পাস হইয়াছিল এবং তাহার সাহায্যে ঐ সকল অঞ্চলের কতকগুলি পুষ্করিণীর সংস্কারও হইয়াছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। যে উদ্যম, আন্তরিকতা এবং অর্থব্যয় সিন্ধু, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের সেচব্যবস্থাকে সমগ্র জগতে শ্রেষ্ঠ আসনে উন্নীত করিয়াছে, বাংলাদেশের পূর্ব্বেকার গবর্ণমেণ্টের আমলে সেই ধরণের আগ্রহ, দরদ ও অকুণ্ঠ অর্থব্যয় কোনকালেই দেখা যায় নাই।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সিন্ধু পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাভাবিক বারিপাত এতই কম যে সেখানে নদীর জলের সাহায্যে সেচব্যবস্থা না করিলে আশানুরূপ ফসল হইত না। প্রয়োজনের তাগিদই ঐ সকল অঞ্চলে সেচব্যবস্থার প্রেরণা যোগাইয়াছে। কিন্তু বাংলা দেশের বারিপাত, আবহাওয়া, অবস্থান প্রভৃতি অনেকটা অনুকূল বলিয়াই এখানে সেচের প্রয়োজন তেমন অনুভূত হয় নাই এবং এই কারণেই বাংলাদেশের সেচ-ব্যবস্থার স্থান ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সর্বনিম্নে অথবা অতি নিম্নে। এই ধরণের প্রশ্ন ও মীমাংসা আপাতত সমীচীন মনে হইলেও শেষ পর্যন্ত ইহা যুক্তিসহ নহে।

জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং বাদ দিলে পশ্চিম বাংলার স্বাভাবিক বারিপাত বাৎসরিক ৫০ ইঞ্চি হইতে ৭০ ইঞ্চির মধ্যে। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার বারিপাত যথাক্রমে ১৪২ ইঞ্চি এবং ১২২ ইঞ্চি। কিন্তু এই বারিবর্ষণ এতই অনিয়মিত যে প্রায় প্রতি বৎসরই কোন-না-কোন অঞ্চলে অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি লাগিয়াই আছে।

১৯৪০ সালের বঙ্গীয় রাজস্ব কমিশনের (ফ্লাউড কমিশন) রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ প্রায় ২,৬১১ বর্গমাইল। অতএব পতিত জমির আয়তন মোট আবাদযোগ্য জমির প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ। এই আবাদযোগ্য পতিত জমিতে চাষ করিতে পারিলে যে ধান্য উৎপাদন হইতে পারে, তাহার বাৎসরিক মূল্য বর্তমান বাজারে কম করিয়া ধরিলেও প্রায় ২৫ কোটি টাকা। অথচ এই বিরাট সম্ভাবনা সত্ত্বেও এত আবাদযোগ্য জমি পতিত রহিয়াছে কেন? এই প্রশ্নের সদুত্তর পাইতে হইলে অনেকগুলি আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। ১৯৪১ সনের লোকগণনা অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ছিল ৭৫৬ জন। বর্ত্তমানে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের আগমনে ঐ জনসংখ্যা বাড়িয়া প্রতি বর্গমাইলে প্রায় নয় শতের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। যে দেশে জনবসতি এত ঘন সেখানে কেমন

করিয়া এত জমি পতিত ফেলিয়া রাখা হয়! অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে পশ্চিম বাংলার গড়পড়তা লোকসংখ্যা এত অধিক হওয়া সত্ত্বেও এখানে কৃষি-মজুরের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান এমন কি হুগলী জেলাতেও অনেক ক্ষেত্রে ধান্য রোপণ ও ফসল কাটার সময় বহিরাগত সাঁওতাল-মজুরদের উপর বিশেষ রূপে নির্ভর করিতে হয়। কৃষি-মজুরের অভাব এবং স্থানীয় চাষীদের শ্রমবিমুখতা অথবা তাহাদের ম্যালেরিয়া-জর্জর দেহের অক্ষমতা—কিছু জমি পতিত অবস্থায় থাকার একটা কারণ ত বটেই; তবে ইহা গৌণ কারণ। মুখ্য কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে, এই পতিত জমির অধিকাংশই হয় অতিরিক্ত জলের চাপে ডুবিয়া যায়; অথবা কোনও কোনও পতিত জমির নৈসর্গিক অবস্থানই এমন যেখানে জলের অভাবে চাষ-আবাদ সম্ভব হইতেছে না। ইহা ব্যতীত যে সকল জমি নিয়মিত আবাদ হইতেছে সেখানেও জল-সরবরাহ ও জল-নিষ্কাশনের সুব্যবস্থার অভাবে ষোল আনা ফসল প্রায়ই হইতেছে না। কোথায়ও ছয় আনা, কোথায়ও আট আনাতেই চাষীকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

জল-সেচ ও জল-নিকাশ বাংলার চাষ-আবাদের ক্ষেত্রে কত প্রয়োজনীয় তাহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্তও তেমন ব্যাপক ভাবে অনুভূত হয় নাই। এই শতাব্দীর শেষ পর্যায়েই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকার বন্দনা-গীতি গাহিয়াছিলেন:

> ··· সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
> শস্য শ্যামলাং মাতরম্···

সেই যুগে দেশের জনসংখ্যা ছিল কম। নদনদীগুলির, বিশেষতঃ ভাগীরথী-অববাহিকার নদীনালাগুলির অবস্থাও ছিল বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক উন্নততর। মাথাপিছু চাষের জমির পরিমাণও ছিল বেশী। কাজেই পতিত জমি থাকিলেও, অথবা সেচের অভাব কিম্বা জলের চাপ থাকিলেও তাহা দেশের খাদ্যসংস্থান অথবা আয়ব্যয়ের দিক দিয়া আজকার মত এমন জটিল সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় নাই। 'বন্দেমাতরম্' রচিত হওয়ার পরে প্রায় সত্তর বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিল। ইহার মধ্যে দেশের নদীনালাগুলির আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। ভাগীরথী অববাহিকায় যে স্বাভাবিক জল সেচ হইত, নদীনালাগুলি পলি পড়িয়া বুজিয়া যাওয়ায় সেখানে এখন সেচ-সমস্যা ও জল-নিকাশ দুই-ই মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। আগেকার যুগের জাতীয় প্রয়োজন অপেক্ষা বর্তমান যুগের প্রয়োজনের তাগিদ বাড়িয়াছে অনেক বেশী। অথচ সেই প্রয়োজন মিটাইবার সুযোগ পশ্চিম বাংলায় পূর্বেকার তুলনায় কমিয়া যাইতেছে। যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেচ, জলনিকাশ, বন্যা-নিরোধ, জলপথ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই অধিকতর অনুভূত হইতেছে। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের পূর্বতন গবর্ণমেণ্টের সেচ-সম্বন্ধে অব্যবস্থা অথবা ভুল ব্যবস্থা, অমনোযোগিতা, অবহেলা, অর্থ-বিনিয়োগে কার্পণ্য ইত্যাদি ত্রুটিগুলি সাধারণের সমালোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ বাংলাদেশে সেচ ও জল-নিষ্কাশনের যে সকল সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার কারণ অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে অনেক ক্ষেত্রেই এই সকল সমস্যা স্বতঃস্ফুরিত নহে, কোন প্রাকৃতিক সংঘাতেও সৃষ্ট হয় নাই। মানুষেই ভুল করিয়া শিব গড়িতে বানর গড়িয়াছে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সুব্যবস্থা করিতে গিয়া অব্যবস্থা করিয়াছে, এক সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া অপর জটিলতর সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। আজ সমস্ত পশ্চিমবাংলা সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।

একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। ১৮৫৭ সনে সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা। ঐ ঘটনা হইতে তদানীন্তন ইংরেজ সরকার বুঝিতে পারেন যে, এই দেশে রাজত্ব করিতে হইলে সর্বাগ্রে তাহাদিগকে দেশের অভ্যন্তরে দ্রুত সৈন্যচলাচলের উপযোগী রাস্তাঘাট নির্মাণ করিতে হইবে এবং যে সকল রাস্তাঘাট রহিয়াছে, সেগুলির আমূল সংস্কার ও যাবতীয় ত্রুটির সংশোধন করিতে হইবে। এদিকে প্রায় ১৮৫১ সন হইতেই ভারতবর্ষে রেলওয়ের প্রবর্তন সুরু হইয়াছিল। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম তখন ছিল ইংরেজ সরকারের সৈন্যসংরক্ষণের প্রধান ঘাঁটি এবং সামরিক আয়োজনের প্রাণকেন্দ্র। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইন ছিল কলিকাতা এবং ভারতের অন্যান্য কেন্দ্রের যোগাযোগের একটি প্রধান ব্যবস্থা। কিন্তু ১৮২৩ এবং ১৮৫৫ সনের দামোদর-বন্যার অভিজ্ঞতা হইতে ইংরেজ সরকার বুঝিতে পারেন যে, কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইন, এবং গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দামোদর বন্যার স্রোতে তৃণ-খণ্ডের মত ভাসিয়া যাইতে পারে। এই অভিজ্ঞতা হইতে তদানীন্তন রাজ-পুরুষদের একান্ত চিন্তনীয় হইয়া দাঁড়াইল কেমন করিয়া দামোদরের বন্যা হইতে তাহাদের কায়েমী স্বার্থের ধ্বজা রেলওয়ে লাইন, জি. টি. রোড ও কলিকাতার দুর্গ-প্রাকার রক্ষা করা যায়। কমিশন বসিল, সামরিক ইঞ্জিনীয়ারদের ডাকা হইল, সলা-পরামর্শ চলিল। বর্দ্ধমানের মহারাজার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া স্থির হইল, দামোদর-বন্যার জল যাহাতে ভবিষ্যতে কোন অবস্থায় আর বর্ধমান,

হাওড়া ও হুগলী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে দামোদরের বাম তীর দিয়া প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য বরাবর দৃঢ় বাঁধ নির্মাণ করিতে হইবে। যেই কথা সেই কার্য্য। ১৮৬২ সালের মধ্যেই অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া প্রায় শত মাইল দীর্ঘ দামোদর-বাঁধ তৈরি করা হইল। এই বিশালকায় সুদীর্ঘ বাঁধকে বাংলাদেশের চীনের প্রাচীর বলা চলে। কিন্তু এই যে বিপুল প্রচেষ্টা, অর্থব্যয়, পরিশ্রম, এই সব করা হইল কার জন্য? খতিয়ান করিলে দেখা যাইবে, দামোদর বাঁধ পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের যত অনিষ্ট-সাধন করিয়াছে আর কোনও একক পরিকল্পনাই এতটা ক্ষতি করিতে পারে নাই।

একথা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, দামোদর-বন্যা দেশে একটা বিভীষিকার মত আসিয়া বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিত। কিন্তু ঐ জাতীয় অনিষ্টকর বৃহৎ বন্যা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল না। দশ-বিশ বৎসরে এক-আধবার মারাত্মক বন্যা আসিয়া দেশের কোন কোন অঞ্চল বিধ্বস্ত করিয়া দিত। তবে সেই অনিষ্টের পরিমাণ বর্তমানের তুলনায় অনেক কম ছিল; কারণ তখন বরাবর সুদৃঢ় বাঁধ না থাকায় বন্যার জল নদীর তীরে বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িত এবং ফলে জলের গতিবেগ ও গভীরতা বর্তমানের তুলনায় অনেক কম হইত। কিন্তু বর্তমানক্ষেত্রে বাঁধ একবার ভাঙিলে, যে রাস্তায় তীব্র জলস্রোত এক-বার চলার পথ করিয়া লয়, সেই পথে অথবা আশে-পাশে কিছু আর থাকে না। ঘর, বাড়ী, মাঠ, ঘাট, শস্যক্ষেত্র, রেলওয়ে লাইন—সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই জাতীয় অনিষ্টকর বন্যা যাহা কালেভদ্রে এক-আধবার আসিত, তাহা বাদ দিলে, প্রতি বৎসরেই দামোদর নদে ছোট ছোট বান ডাকিত। এই বানের জলের উপর নির্ভর করিয়া দেশের ধানচাষ হইত। জমিতে পলি পড়িত, পুষ্করিণী খাল বিল ভর্ত্তি হইয়া অসময়ে পানীয় জল সরবরাহ করিত এবং রবিশস্যের সেচের ব্যবস্থা বজায় রাখিত। ইহা ছাড়া বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় প্রবাহিত কতক-গুলি স্বাভাবিক নদী—যেমন বাঁকা, গাঙ্গুর, বেহুলা, ধুসী, ইলসুরা, ঘীয়া, কুন্তী, জুলকীয়া, কানানদী, কানাদামোদর, কৌশকী প্রভৃতি দামোদরের বন্যাজলে সঞ্জীবিত হইয়া দেশের সঞ্চিত আবর্জ্জনা ধুইয়া মুছিয়া লইয়া যাইত; এই নদীগুলি দামোদরের বন্যাজল বহিয়া শেষপ্রান্তে ভাগীরথীতে ঢালিয়া দিত। ইহার ফলে ভাগীরথীর পলি কাটিয়া যাইত এবং ভাগীরথী ও যমুনা, সরস্বতী ইত্যাদি তাহার শাখা-প্রশাখা নদীগুলি নবজীবন লাভ করিত।

এই স্বাভাবিক সুযোগের অধিকারী ছিল বলিয়াই, বর্ধমান জেলা তখন স্বাস্থ্য ও সম্পদে বাংলাদেশে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল। ক্রমবর্ধমান ঐশ্বর্যের প্রতীক বলিয়া জেলার প্রধান শহরের নাম হইয়াছিল বর্ধমান।

কিন্তু এই সহজ সম্পদ, স্বাস্থ্য সকলই বৃথা হইয়া গেল কূটবুদ্ধি ইংরেজ সরকারের স্বার্থের প্ররোচনায়। তাহারা দামোদর-বন্যার সমূহ ক্ষতিটাই লোককে বুঝাইয়া দিল, লাভটার দিকে নজর দিয়া কেউ দেখিয়াও দেখিল না বা দেখাইল না। তখনও দেশে জনমত তেমন গড়িয়া উঠে নাই। মূক জনসাধারণ দামোদরের প্রস্তাবিত বাঁধ ভাল কি মন্দ হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিবারও অবসর পাইল না। বিশেষ করিয়া তখন কোনও সরকারী পরিকল্পনা সম্বন্ধে সাধারণের মতামত গ্রহণের রেওয়াজ ছিল না। যাহারা সরকারী ভাঁওতায় ভুলিল, তাহারা বুঝিল 'ভালই হ'ল, বন্যার উৎপাত থেকে বাঁচা গেল। নিশ্চিন্তে ঘর-দোর নিয়ে থাকা যাবে।' যে আসল কথা বুঝিল, সে রাজরোষের ভয়ে প্রতিবাদ করিল না। এই গেল মানুষের বুঝাবুঝির কথা—যেখানে রাজরোষের ও লোকনিন্দার ভয় আছে, আরও অনেক কিছু চিন্তা-ভাবনার অবসর আছে। কিন্তু প্রকৃতির দরবারে ত এই সকল লৌকিক বাধা-বিপত্তির, দ্বিধা-সঙ্কোচের, ভুল-ভ্রান্তির স্থান নাই। সেখানে কোন ভুলের, কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষমা নাই। সামরিক ইঞ্জিনীয়ারের পরামর্শে ইংরেজ সরকার দেশবাসীর বুকের উপর বাঁধের যে জগদ্দল পাষাণ চাপাইয়া দিল, প্রকৃতি সুদে আসলে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। বাঁধ নির্ম্মাণ শেষ হইয়া তখনও দশ বৎসর অতিক্রান্ত হয় নাই। ইতিমধ্যেই দামোদরের বাঁধের সংরক্ষিত এলাকায় হাহাকার উঠিল। ম্যালেরিয়া রোগ মহামারীর আকারে দেখা দিয়া সমগ্র বর্ধমান বিভাগে প্রচুর লোকক্ষয় করিতে লাগিল। দশ বৎসরের মধ্যে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এই মারাত্মক ব্যাধিতে প্রাণত্যাগ করিল। দামোদর-বাঁধের পূর্বে ম্যালেরিয়া কি জিনিষ তাহা কেহ জানিত না। বর্ধমান বিভাগে ইহা প্রথম প্রকাশ পায় বলিয়া এই জ্বরকে তখন 'বর্ধমান জ্বর' (Burdwan Fever) বলিত। এদিকে দামো-দরের বন্যাজলের অভাবে চাষ-আবাদ নষ্ট হইল, স্বাভাবিক পলিসারের অভাবে জমির উর্বরাশক্তি কমিয়া গেল। পানীয় জলের অভাব অতি তীব্র আকারে দেখা দিল। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে, খাদ্য-সংস্থানের অভাবে, পানীয় জলের অভাবে বর্ধমান ও হুগলী জেলার বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলি একে একে জন-শূন্য হইয়া শ্মশানে পরিণত হইতে লাগিল। যাহারা ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া রহিল, তাহাদের মধ্যে অবস্থাপন্ন লোকেরা শহর অঞ্চলে চলিয়া আত্মরক্ষা করিল। আর

যাহাদের সেই সুযোগ-সংস্থান ছিল না, তাহারা কঙ্কালসার দেহ লইয়া পৈতৃক ভিটা-মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল।

এদিকে রাজসরকারের অবস্থাও হইয়া উঠিল অতীব শোচনীয়। জন-মজুর অভাবে, পলি-সার ও সেচের জলের অভাবে বিস্তীর্ণ এলাকা অনাবাদী পড়িয়া থাকায়, খাদ্য-সংস্থান—রাজস্বের যোগান সকল দিক দিয়াই সরকারী রাজকোষ শূন্য হইতে চলিল। অবস্থা-বিপর্যয় দেখিয়া আবার কমিশন ডাকা হইল; কমিটি বসিল—কেমন করিয়া এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কমিশন একবাক্যে রায় দিলেন, যত অনর্থের মূল দামোদরের বাঁধ; পুনরায় যদি দামোদরের জল দেশের বুকের উপর দিয়া প্রবাহিত করা যায় তবেই দেশ এই সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইতে পারে। রোগনির্ণয় হইল ঠিকই, কিন্তু ঔষধের ব্যবস্থা করিবে কে! সামরিক প্রয়োজনের তাগিদ—দামোদরের বাঁধ রাখিতেই হইবে। অথচ রাজস্বের খাতিরে এবং কতকটা জনমতের মুখ চাহিয়া দামোদরের জলও দেশের উপর দিয়া বহাইতে হইবে। এখন "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি"!

ব্যবস্থা করা হইল—বর্ধমান শহর হইতে প্রায় ১৫ মাইল পশ্চিমে জুজুটী ও ঝাঁপুর নামক গ্রাম দুইটির নিকট দামোদর-বাঁধের তলা দিয়া দুইটি কপাট-কল বসাইয়া কিছু বন্যার জল দেশের অভ্যন্তর-ভাগে প্রবেশ করাইয়া যতটা সম্ভব জনমতকে শান্ত রাখিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু পর্বত মূষিক প্রসব করিল। দামোদরের স্বাভাবিক বাৎসরিক বন্যার জলের পরিমাণ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২,৫০,০০০ হইতে ৩,০০,০০০ ঘনফুট। বন্যা-জলের সাহায্যে হুগলী ও বর্ধমান অঞ্চলের প্রায় ৬,০০,০০০ লক্ষ একর জমি স্বাভাবিক সেচ পাইত। কিন্তু এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থার ফলে যে জল পাওয়া যাইবে, তাহার পরিমাণ হইল প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র ৫০০ ঘনফুট এবং সেচের জমির পরিমাণ মোট ২৫,০০০ একর। তদানীন্তন ছোটলাট স্যর এস্‌লী ইডেনের নামে ১৮৮২ সনে ইডেন কেনেল নাম দিয়া একটি ২৭ মাইল দীর্ঘ খাল ও উক্ত কপাট-কল দুইটি নির্মাণ করিয়া এই প্রহসনের যবনিকাপাত হয়। দামোদরের বাঁধ হইতে বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলী জেলার স্বাস্থ্য ও সম্পদের যে ক্ষয়ের খতিয়ান সুরু হইয়াছে আজও তাহার শেষ হয় নাই। কোনও কালে শেষ হইবে কিনা তাহা ভবিতব্যই বলিতে পারেন।

আজ যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, দামোদর-বাঁধই যদি সকল অনর্থের মূল হয়, তবে আজ এই স্বাধীন সরকারের আমলে, এই বাঁধটাকে তুলিয়া দিলেই ত সকল মুশকিলের আসান হইয়া যায়। কিন্তু তাহা আর হয় না। পলিবাহী নদীর তীরে একবার বাঁধ দিলে, পলি জমাট বাঁধিয়া নদী-তলদেশ ক্রমেই উঁচু হইতে থাকে। জলের সমতলও তদনুসারে উঁচু হইতে থাকে; অথচ সংরক্ষিত অঞ্চল পলির অভাবে পূর্বের সমতলেই থাকিয়া যায়। ইহার ফলে যতই দিন যায় ক্রমেই সংরক্ষিত অঞ্চল হইতে বন্যাজলের সমতল উঁচু হইতে উচ্চতর হইতে থাকে। ইহার ফলে আজ হইতে ৯০ বৎসর পূর্বে দামোদরে বাঁধ না থাকিলে যে লাভ হইত আজ সেই বাঁধ সহসা উঠাইয়া দিলে ক্ষতির পরিমাণ হইবে লাভের তুলনায় অনেক বেশী। অবস্থা এখন এমন এক পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেখানে এই অনিষ্টকর বাঁধ রাখাও বিপজ্জনক অথচ তুলিয়া দেওয়াও সহজ কথা নহে। এই বাঁধ দেওয়ার নীতি লইয়া তখনকার যুগের সামরিক ইঞ্জিনীয়ারদের অপরিণামদর্শিতা ও রাজশক্তির নীতি একযোগে যে অনিষ্টসাধন করিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়াই মিশরের বিশ্ববিশ্রুত সেচ ইঞ্জিনীয়ার (অধুনা পরলোকগত) স্যর উইলিয়ম উইলকক্স ১৯২৮ সনে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেচ-সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতাকালীন এই বাঁধগুলিকে "শয়তানের বাঁধ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

মানুষ যখন না বুঝিয়া ভুল করে এবং ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহা শুধরাইতে অগ্রসর হয়, তখন ভুলের সংশোধন হয় সহজ। কিন্তু ভুল যেখানে স্বেচ্ছাকৃত এবং স্বার্থবুদ্ধিদুষ্ট সেখানে ভুল সংশোধন না করিয়া, একটির পর একটি ভুল করিয়া পূর্বকৃত ভুলগুলিকে চাপা দিবার প্রয়াস চলিতে থাকে। বাংলাদেশের সেচ-ব্যবস্থা এমনই এক ভুলের ধারাবাহিক ইতিহাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও জনস্বার্থ বাংলাদেশে সর্বক্ষেত্রে একসূত্রে ধরিয়াই চলে নাই। যে যে ক্ষেত্রে এই বিপরীতমুখী স্বার্থের সংঘাত বাধিয়াছে, সেখানেই সরকার-পক্ষ হইতে দেখা গিয়াছে গোঁজামিল দিয়া ত্রুটি সংশোধনের একটা বাহ্য প্রয়াস।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার চালু হয়, তখন হইতে সেচ-বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন হইতে প্রাদেশিক সরকারের অধীনে আসে। ইহার ফলে অন্যান্য প্রদেশে সেচ-বিভাগে দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা প্রায় "যথাপূর্বং তথা পরম্" চলিতে থাকে। প্রাদেশিক সরকারের অধীন হইলেও সরকার সেচ-বিভাগটিকে বিশ্বাস করিয়া, প্রাদেশিক আইন-সভার নিকট দায়ী জনপ্রিয় মন্ত্রীদিগের অধীনে না দিয়া সংরক্ষিত বিভাগ হিসাবে ছোটলাটের খাস-কামরায় চাবিবন্ধ করিয়া রাখিলেন। যাহা হোক, প্রাদেশিক

সরকারের আওতায় আসার ফলে এই বাংলাদেশেও সেচ-সমস্যা লইয়া প্রাদেশিক আইন-পরিষদে এবং ব্যবস্থাপক সভায় বেশ আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হয়। ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কারের পর হইতে সেচ-বিভাগটিকে সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রীদের কর্তৃত্বাধীনে আনা হয় এবং উত্তরোত্তর সেচ সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ সৃষ্টি হইতে থাকে।

অতএব দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে যখন পঞ্জাব, সিন্ধু, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে সেচ-ব্যবস্থার জন্য সরকার মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিয়া সকলপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিয়া আসিতেছিলেন তখন হইতেই বাংলা-সরকারের অপরিণামদর্শিতার ফলে ভুলের পর ভুল করিয়া বাংলার সুন্দর, সুস্থ জনপদগুলি, ধান্যে ভরা মাঠগুলি হতশ্রী করিয়া দিবার উদ্যোগপর্ব সুরু হইয়াছিল। অতীতের অজস্র ভুল-ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান সেচ-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সহজসাধ্য নহে। এখন জোড়াতালি দিয়াই আরও কিছুদিন অগ্রসর হইতে হইবে এবং ধীরে ধীরে সকল ভুলের সংশোধন করিয়া যে দিন বাংলাদেশের সেচ-ব্যবস্থায় নূতন অধ্যায় সুরু হইবে তখন হয়ত ভারতবর্ষ তথা সমগ্র পৃথিবীতে বাংলাদেশ যোগ্য স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারিবে।

বাংলাদেশে সেচের প্রয়োজন যথেষ্ট রহিয়াছে, এই বিষয়ে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদ সত্ত্বেও বাংলাদেশের তদানীন্তন সরকার কখনও সেচের প্রয়োজনে অকুণ্ঠ ব্যয় করিতে অগ্রসর হন নাই। তাঁহাদের দ্বিধা-সঙ্কোচপূর্ণ নীতি, একনিষ্ঠ কর্ম্মীর অভাব, মূলধন বিনিয়োগে ঔদাসিন্য এই সকল মিলিয়া এতদিন বাংলা-দেশের সেচ-ব্যবস্থার অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আজ হাওয়া ফিরিয়াছে, সু-বাতাস বহিতেছে। বাংলা-দেশে স্বাধীনতা আসিয়াছে, জনসাধারণ তাহাদের নিজেদের নীতি নির্দ্ধারণে অধিকার লাভ করিয়াছে। এদিকে বঙ্গ-বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে, অতএব খাদ্য-সংস্থানের প্রয়োজনও অনুরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে। যে অর্থে ঋষি বঙ্কিম 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে বাংলাদেশকে "শস্য-শ্যামলা" বলিয়াছিলেন, আজ সত্তর বৎসর পরে বাংলাদেশের সেই গৌরব আর নাই। মানুষের ভুলে বাংলাদেশ শ্রীহীন হইয়াছে, মানুষের চাপে বাংলাদেশের প্রয়োজন বাড়িয়াছে। কাজেই স্বাধীন বাংলার কর্ম্মনীতির অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দায়িত্বও বাড়িয়াছে বহুগুণ। বর্ত্তমান সরকারের নীতি জনস্বার্থের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। কাজেই নীতির দিক দিয়া কোনও জড়তা, দ্বিধা, সঙ্কোচ এখন আর বাংলার অগ্রগতিতে বাধা দিবে না আশা করা যায়।

প্রাচ্যের প্রাচীন শিল্পকলা

শ্রীগোপীনাথ সেন

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ যে কেবল বাসোপযোগী ঘর তৈরি করতে শিখল তা নয়, সে নিজের সৌন্দর্য্যবোধকেও নানাভাবে জাগিয়ে তুলতে লাগল। সেই সুদূর অতীতে শিল্পশাস্ত্র বলে কিছু ছিল না, কিন্তু তখনকার যুগে অশিক্ষিত শিল্পীগণ নিজেদের শিল্পরচনার মাধ্যমে যে কলাকুশলতার পরিচয় দিয়েছিল তার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য কম নয়। তাদের শিল্পের মধ্যে দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন এবং অঙ্কনের বৈশিষ্ট্যগুলি যদিও খুব স্পষ্ট হয়নি, তা হলেও তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবির মধ্যে আদিম কৃষ্টির বিভিন্ন দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। আদিম জাতিসমূহের শিল্পকলার নিদর্শন কিছুদিন পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া, নিউগিনি, সেপিক, বাম্মু, আফ্রিকা এবং এশিয়া ও ইউরোপের নানা স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সকল চিত্রকলা থেকে আদিবাসীদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রস্তর-যুগের আদিবাসীদের সভ্যতা সকল দেশেই একই রকমের, কিন্তু পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে তা বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ধরণে গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন মনুষ্যগোষ্ঠীর শিল্পকলা যেন একই সূত্রে গাঁথা। প্রত্যেক দেশের শিল্পকলার মধ্যে সে দেশের মানুষ, প্রকৃতি, জীবজন্তু, আহারবিহার ও জীবনের নানা দিক্‌কার পরিচয় পাওয়া যায়। এক হিসাবে শিল্পই জাতির সবচেয়ে বড় ইতিহাস।

কালচক্রের আবর্ত্তনে পৃথিবীতে মনুষ্যজাতির মধ্যে নানা প্রকার শিল্পকলার উদ্ভব হয়েছে। আদিম জাতির আঁকা ছবির মধ্যে বিশেষ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যারা যে রকম প্রাকৃতিক পরিবেশে লালিতপালিত ও বর্দ্ধিত

কৃষ্ণ কর্তৃক কেশী-বধ (পাহাড়পুর)

নর্ত্তকী (পাহাড়পুর)

হয়েছে তাদের মধ্যে তদনুযায়ী দৃষ্টিভঙ্গীই গড়ে উঠেছিল। বিচিত্র বেশভূষা দ্বারা তারা নিজেদের দেহের শোভা বর্দ্ধন করত। তারা যে সকল অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করত সেগুলির কারুকার্য্যও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। তাদের উৎসব ও ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে সকল চিত্র আঁকা হয়েছে তন্মধ্যে শিল্পকুশলতা যেন স্বতঃস্ফূর্ত্ত। শান্ত ও নিঝুম পর্ব্বত এবং জঙ্গলময় পল্লী অঞ্চলে আদিম চিত্রকলার জন্ম। যদিও বর্ত্তমান যুগে আদিম সভ্যতার অনেক নিদর্শন লোপ পেতে বসেছে, তা হলেও পৃথিবীর কোন কোন স্থানে এখনও আদিম চিত্রকলার সন্ধান মেলে। ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার আদিম চিত্রকলা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এই চিত্রসমূহ উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করলে মনে হয়, অনার্য্যেরা তাদের স্বাধীন মুক্ত কল্পনাশক্তির সাহায্যে নিজেদের অন্তরের ভাবকে রূপ দিয়েছে।

আর্য্য এবং আর্য্যেতর জাতি উভয়েই বহু দেবতার উপাসনা করতেন— সূর্য্য অগ্নি জল মেঘ নদনদী বনস্পতি কত কি যে দেবতা তার আর অন্ত নেই। ভাষার দিক দিয়ে দেখতে গেলে আর্য্যে এবং আর্য্যেতরে বড় একটা মেলে না, কিন্তু দেবতার নামে এবং তাঁদের ক্রিয়াকলাপে আশ্চর্য্য একটা মিল পরিলক্ষিত হয়।

নিউজিল্যাণ্ডের মাওরী জাতির একজন বজ্রদেবতা আছেন, তাঁকে বলে Waitari বা দৈত্যারি। বহু দেবতার নামের সঙ্গে তাদের পূজার উপচার এবং বিধি আর্য্যগণ যে আর্য্যেতরগণের কাছ থেকে পান নি, তাই বা কে বলবে। বেদীনির্ম্মাণ, অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসে গান ও সোমরস পান, পূজানুষ্ঠানে যূপকাষ্ঠে পশুবলি সবকিছুই প্রমাণ করছে আর্য্য এবং আর্য্যেতরের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের কথা। লিওনহার্ড এডামও বলেছেন—'To the primitive mind the mythical world is a reality.'

আদিম চিত্রকলার ন্যায় আদিম জাতির ব্যবহারিক

মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত বিবিধ দ্রব্য

পোড়া মাটির স্ত্রী-মূর্ত্তি, মোহেন্-জো-দড়ো

শিল্পও আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কাঠের জিনিষপত্র, কাপড়, মাছধরার জাল, কাঁচকাঠির মালা প্রভৃতিতে তাদের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল শিল্পের মধ্যে তাদের বাস্তব জ্ঞান এবং সৌন্দর্য্য-বোধ দুয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি তাদের তৈরি কুঁড়েঘর দেখলেও চোখ জুড়ায়।

আদিম চিত্রকলার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আদি-বাসীরাও স্বপ্ন দেখতে জানত— তাদের চিত্রকলা সেই স্বপ্নেরই প্রকাশ। এর মধ্যে তাদের জাতির ঐতিহ্য লুকিয়ে আছে। তাদের এই স্বপ্ন ও কল্পনার সৃষ্টি থেকে তাদের শিল্প, ব্যবসা, বৃত্তি ও জীবনযাত্রার হদিস পাওয়া যায়। আদিম সংস্কৃতিকে তারা কাঠের তৈরি জীবজন্তু, মানুষের মুখোশ ও নানা প্রকার চিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত করেছে।

এশিয়ার আদিম চিত্রকলার বিশদ আলোচনা করা কঠিন ব্যাপার। এই বিরাট মহাদেশে যে কত বিচিত্র আদিম শিল্প-কলা বিদ্যমান তার অন্ত নেই। যবদ্বীপের ape man সম্ভবতঃ এশিয়ার আদিমতম মানুষ। সেখানে এ'সময়ার আদিম মানবের জীবনধারার নিদর্শন ফসিল ইত্যাদির মধ্যে দেখা যায়।

চীনদেশের পিপিঙের কাছে চউ কউ তিয়েন নামে চুনের গুহায় পাথরের নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে সেখানকার আদিম অধিবাসীদের শিল্পকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। চীনদেশে যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্ক্রিয়া ও খনন-কার্য্য হয়েছে তা সকল ক্ষেত্রে ঠিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হয় নি। রাস্তা ও রেলপথ তৈরির সময় প্রাচীন শিল্পনিদর্শন কিছু কিছু আবিষ্কার হয়েছে। উত্তর চীনা ও মাঞ্চুরিয়াতে খনন-কার্য্য যথারীতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হয়েছিল। এর আবিষ্কার করেছিলেন সুইডেনের বৈজ্ঞানিক ও ভূতত্ত্ববিদ্ জে. জি. এণ্ডারসন।

সাইবেরিয়ায় প্রস্তর যুগের কৃষ্টির কিছু কিছু নিদর্শন আছে। সেখানকার পাথরের গায়ে আঁকা ছবিগুলি দেখলে নব (Neo) প্রস্তর যুগের বলে মনে হয়। মিনুসিনসক জেলায় আবানসক নামে একটি স্থানের নিকটে প্রস্তরে অঙ্কিত একখানা ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি তীরধনুক হাতে একজন শিকারীর ছবি। ব্রোঞ্জযুগের পূর্ব্বেকার ছবিগুলিতে দেখি সাইবেরিয়ার লোকেরা তখন লম্বা জামা পরত। রুশিয়ার প্রত্নদ্রব্য অনুসন্ধানীরা সাইবেরিয়ায় বহু আদিম

চিত্র আবিষ্কার করেছেন। সম্প্রতি পূর্ব্ব-সাইবেরিয়ায় যকুৎসক এবং উজবেকিস্থানে (আফগানিস্থানের উত্তরে) বহু প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

অধ্যাপক ওকলাডনিকভ মধ্য এবং উচ্চ লেনা উপত্যকায় আশিটি প্রাগৈতিহাসিক স্থান এবং বহু প্রস্তরশিল্পের নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। এই সমস্ত আদিম চিত্র ব্রোঞ্জ ও লৌহ যুগের এবং প্রাচীন প্রস্তর-যুগ থেকে নব প্রস্তর-যুগ পর্য্যন্ত বিভিন্ন যুগের সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। মিস টাটিয়ানা পাসেক লেনা নদীতীরবর্তী অঞ্চলকে আদিম চিত্রকলার যাদুঘর বলে বর্ণনা করেছেন। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিকহেল ভোয়েভোডস্কি বলেছেন, 'মধ্য এশিয়া আদিম

অষ্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্ত, গাছের ছালে আঁকা চিত্রকলার নিদর্শন। ডানদিকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি কুঠার অঙ্কিত

শিল্পকলার কেন্দ্র।' মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কৃত কোন কোন চিত্রের নীচে আরবীয় লিপি উৎকীর্ণ আছে—তা একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী কালের বলে মনে হয়। উজবেকিস্থানের জারাউৎসয়া গিরিপথের অন্যান্য গুহায় বহু চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

সাইবেরিয়ায় ব্রোঞ্জ যুগে সিথিয়ান চিত্রকলার বিশেষ ভাব বিস্তৃত হয়েছিল। সিথিয়ান চিত্রকলা অতীত যুগের স্মৃতি বহন করে নিয়ে আসে। এই চিত্রকলা সম্বন্ধে জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেছেন,—

"The scythian style may be described as a combination of primitive vision and technical perfection, a strange mixture of decorative stylization with naturalism. In almost every instance the artists show

বোর্ণিওতে প্রাপ্ত কাঠের মূর্ত্তি

an admirable observation of nature, but they adopted the designs with perfect freedom to the shape of the decorative field."

কাঠের পিকদানী—হাওয়াই

ভারতবর্ষেও প্রাচীন চিত্রকলার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে রবার্ট ব্রুস ফুট মাদ্রাজের নিকটবর্ত্তী

কোনো এক স্থান থেকে চিত্রখোদিত পাথর আবিষ্কার করেন। ১৮৮০ সালে আর্চিবল্ড কারলাইল এবং জে ককবার্ণ প্রথম পাহাড়ের গায়ে আঁকা ছবির দিকে শিল্পানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই বিবরণ ১৮৮৩
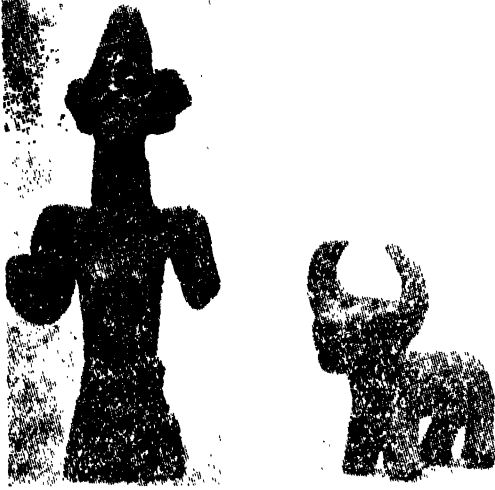
দক্ষিণ-ভারতের নীলগিরি পর্ব্বতে প্রাচীন সমাধিতে প্রাপ্ত মৃৎশিল্পের নিদর্শন

খ্রীষ্টাব্দে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে ছাপা হয়। এই ছবিটির বিষয়বস্তু গণ্ডার-শিকার, ছয় জন লোক কয়টি গণ্ডারকে আক্রমণ করছে, তন্মধ্যে কয়েকজন টুপি পরিহিত। তারপরে বহু পাহাড়ের গায়ে ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে। এণ্ডারসন কতকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র রায়গড় জেলায় সিংহলপুরের নিকটে আবিষ্কার করেন। এগুলি ঈষৎ লাল, বেগুনি এবং হলদে রং দিয়ে আঁকা—তন্মধ্যে মানুষ, পাখী এবং নানা জীবজন্তু ইত্যাদি হরেকরকমের ছবি আছে। মধ্যভারতে প্রাচীরগাত্রে আদিম যন্ত্রপাতি, সাজপোশাক প্রভৃতি আঁকা আছে। এ সমস্ত ছবি দেখলে বোঝা যায় সারা এশিয়া মহাদেশে যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র এবং বেশভূষা ইত্যাদি সুপ্রাচীনকাল থেকে যে ভাবে চলে আসছে তার সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের ঐ সমস্ত দ্রব্যাদির কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। এ সকল চিত্রকলার কাল সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কয়েকজন প্রত্নতত্ত্ববিদ এগুলিকে খ্রীষ্টের জন্মের এক হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার বলে মত প্রকাশ করেছেন। বর্ত্তমান যুগে আদিম চিত্রকলার যে নিদর্শন মোহেন-জো-দাড়ো এবং হরপ্পা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে তার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকলা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হলে মোহেন্-জো-দাড়ো এবং হরপ্পার প্ল্যাসটিক চিত্রকলার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। এই প্ল্যাসটিকের সঙ্গে তামা এবং ষ্টিয়েটাইট নামে আর একটি পদার্থের ব্যবহারে নানা রকমের জিনিষপত্র তৈরি হ'ত। আদিম চিত্রকলার ক্রমবিকাশ, এ তিনটি পদার্থের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন যুগের পরিচয় দেয়। প্রথম যুগে মাটি দিয়ে সাধারণ ও সহজ ভঙ্গিমার নানা মূর্ত্তি তৈরি হয়েছিল। যখন শিল্পকলা উন্নতির পথে অগ্রসর হতে আরম্ভ করল সেই সময়ে তামা দিয়ে মানুষ ও জন্তুজানোয়ারের মূর্ত্তি গড়ার রেওয়াজ হ'ল।

ভারতীয় আদিম চিত্রকলা ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। মোহেন্-জো-দাড়োর প্রাচীন মাটির মূর্ত্তিগুলির সঙ্গে মেক্সিকোতে প্রাপ্ত মৃন্মূর্ত্তির হুবহু মিল দেখতে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন দ্রাবিড় সভ্যতা সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া, পূর্ব্ব ও মধ্য এশিয়ার নানা স্থানে বিস্তারলাভ করেছিল।

এখনও ভারতবর্ষ থেকে আদিম চিত্রকলা লোপ পেয়ে যায় নি। এখানে আড়াই কোটি আদিম জাতির লোকের

নিউজীল্যাণ্ডের মাওরিদের মৃতের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত স্মৃতি-স্তম্ভ

বাস। তাদের লোকশিল্প বর্ত্তমান কালেও বেশ সমাদৃত হয়েছে। ভারতের আদিবাসীদের চিত্রকলা সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণও প্রচুর গবেষণা করছেন। আসামের নাগাদের বস্ত্রশিল্পেও নৈপুণ্য আছে। দক্ষিণ মহীশূরের নীলগিরি পর্ব্বতের টোডা জাতির মাটির শিল্প বাস্তবিকই চমৎকার। পল্লীগ্রামে বেনুগুলটা

নামে একটি স্থানে আদিবাসীদের বিবাহে চীনামাটির তৈরি নানা রকম জিনিষপত্র ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এ সকল শিল্প বরকে উপহার দেওয়া হয়।

সিংহলে দৈত্যের মুখোস আদিম চিত্রকলার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কাঠ কুঁদে তার ওপর তেল-রঙ দিয়ে বিকটাকৃতি মূর্ত্তি আঁকা হয়। এখানকার অন্যান্য আদিম চিত্রকলা ঠিক ভারতীয় আদিম চিত্রকলার মত। সুমাত্রা, নিয়াস, বোর্ণিও, ফিলিপাইন এবং অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জে কাঠের তৈরি জীবজন্তু এবং নিছক কল্পনার সৃষ্ট ছবিগুলিতেও স্থানীয় প্রতিবেশের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বোর্ণিওর কেনিয়া-কয়ান জাতিদের Decorative art বা মণ্ডন-শিল্পে দক্ষতা আছে এবং তা একেবারে তাদের নিজস্ব।

মধ্য-পূর্ব্ব-এশিয়া অর্থাৎ সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া এবং লুরিস্থান এই তিনটি স্থানের আদিম চিত্রকলা বিশেষ উৎকর্ষ-লাভ করেছিল। ১৯৩৮ সালে এম. ই. এ. মালোয়ান সিরিয়ার টেল ব্রাক নামে একটি স্থানে বহু আদিম ভাস্কর্য্যের নিদর্শন উদ্ধার করেছেন। এইগুলিকে ৩১০০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বের মধ্যে ধরা হয়। মেসোপটেমিয়া থেকে চীনামাটির একটি বিরাট মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। ডা: মার্ক্স ব্যারনডন ওপেনহিম ১৯১১-১৩ এবং ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বহু প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন আবিষ্কার করেন। মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন উর সভ্যতার নিদর্শনগুলি এইচ. আর. হল এবং স্যার লিওনার্ড উলি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। এই সকল স্থানের বেশীর ভাগ শিল্পকলা পেন্‌সিলভেনিয়া ও ব্রিটিশ যাদুঘরে রক্ষিত আছে। পশ্চিম ইরাণের একটি প্রদেশ লুরিস্থান কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে প্রত্নতত্ত্ববিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ. গডাবড, আর. ডব্লিউ. হাচিনসন প্রভৃতি অনুসন্ধিৎসুগণ কর্ত্তৃক লুরিস্থানে আবিষ্কৃত শিল্পকলা ইতিহাসের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত করেছে।

কাজের জন্য দুগ্ধবতী গাভীর ব্যবহার

শ্রীহলধর

১৯৫১ সনের মধ্যে খাদ্য সম্বন্ধে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে হইবে—ইহাই ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃঢ় সঙ্কল্প; এই সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহারা নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং কাজে (ও অকাজে ?) অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন। 'কমিটি' ও কর্ম্মচারীর সংখ্যা বহুলপরিমাণে বাড়িয়াছে এবং এখনও বাড়িতেছে। যাহা হউক, এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের জনসাধারণ সুখী ও সন্তুষ্ট হইবে, কেন না 'কণ্ট্রোলের' তখন কোন প্রয়োজন থাকিবে না এবং "কণ্ট্রোল-জনিত" নানাবিধ অসুবিধা জনসাধারণকে আর ভোগ করিতে হইবে না।

কিন্তু দেশকে খাদ্য সম্বন্ধে আত্মনির্ভরশীল করিবার পথে বহু বাধাবিঘ্ন বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি সহজে দৃষ্টিগোচর হয়, এবং কতকগুলি হয় না। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সকল বাধাবিঘ্ন সহজে ও শীঘ্র অতিক্রম করা খুবই কঠিন। তবে জনসাধারণের—বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের পূর্ণ সহযোগিতা থাকিলে এ সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে সফল হওয়া সম্ভব।

যে সকল বাধা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের বলদের কার্য্যশক্তির অল্পতা অন্যতম। বলদের কার্য্যশক্তির উন্নতি ও বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রধানতঃ উন্নত উপায়ে প্রজনন ও উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক; প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এ সম্বন্ধে চেষ্টা, গবেষণা ও পরীক্ষা চলিতেছে এবং এ বিষয়ে জন-

সিন্ধী গাভী হাল্‌কা গাড়ী টানিতেছে

সাধারণকে অবহিত করিবার জন্য প্রচারকার্য্যও চলিতেছে। কিন্তু কবে ইহার ফল দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে বলা যায় না।

সিন্ধী গাভী দ্বারা জমি চাষ করানো হইতেছে

যুদ্ধের সময় হইতে বলদ সম্বন্ধে আর একটি অন্তরায় দেখা দিয়াছে। যুদ্ধকালীন ব্যবস্থায় শহরের যানবাহনের জন্য বলদ, মহিষ প্রভৃতি অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার ফলে পল্লী অঞ্চলে ইহাদের তীব্র অভাব ঘটিয়াছিল। সেই অভাব অদ্যাপি চলিতেছে এবং ইহা খুব শীঘ্র পূরণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই অবস্থার উপর আর এক অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। সেই অন্তরায় হইতেছে গরু, বলদের খাদ্য—ঘাসের (fodder) "দুর্ভিক্ষ"। সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, কচ্ছ প্রদেশে এই 'দুর্ভিক্ষ' তীব্রভাবে চলিতেছে। অন্যান্য অঞ্চলেও গরু-বলদের খাদ্য—ঘাসের অভাব যথেষ্ট আছে। এই "দুর্ভিক্ষের" ফলে সৌরাষ্ট্র, গুজরাট ও কচ্ছ প্রদেশে বহুসংখ্যক বলদ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং যাহারা জীবিত আছে খাদ্যাভাবে তাহাদের অবস্থাও জীর্ণ ও ক্লিষ্ট; উপযুক্ত পরিমাণ কাজ করিবার শক্তিও তাহাদের নাই। অথচ স্বাভাবিক কৃষিকার্য্যের জন্য এই সকল অঞ্চলে হাজার হাজার বলদের প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমানে অপর কোন অঞ্চলেই এমন বাড়তি বলদ নাই যাহাদের আমদানী করিয়া এই সকল অঞ্চলের অভাব মিটানো যায়। সাধারণতঃ পূর্ব্ব-পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ এবং রাজস্থান বলদ সম্বন্ধে বাড়তি অঞ্চল বলিয়াই গণ্য হইত। বর্ত্তমানে এই সকল স্থানেও বলদের অভাব অনুভূত হইতেছে।

বহু ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় ভূমি-সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য যন্ত্রের ব্যবহার করা হইবে বটে, কিন্তু ইহার ফলে বলদের প্রয়োজন কম হইবে না, বরং বাড়িবে; কারণ পরে সেই সকল অতিরিক্ত পরিমাণ জমি প্রধানতঃ বলদের সাহায্যেই চাষ করিতে হইবে। বলদের অভাব-জনিত অসুবিধা অতিক্রম করিবার একটি উপায় হইতেছে কৃষিকার্য্যে ব্যাপকভাবে যন্ত্রের প্রচলন; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় এই উপায় গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব নহে। প্রথমতঃ শীঘ্র এবং সহজে উপযুক্ত যন্ত্রাদি বিদেশ হইতে আমদানী করা যাইবে না; দ্বিতীয়তঃ সাধারণ কৃষক তাহার বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবে না। তাহার পক্ষে ইহা মোটেই লাভজনক নহে। ইহা ব্যতীত যন্ত্রের প্রচলনের বিরুদ্ধে অনেক মতবাদ আছে।

সুতরাং বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই অসুবিধা ও অন্তরায় কি উপায়ে অতিক্রম করা যায় তাহাই আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে। একটি উপায় হইতেছে—দুগ্ধবতী গরুকে লাঙ্গল ও গাড়ী চালানোর কাজে ব্যবহার করা। এই প্রস্তাবটি প্রথমেই আমাদের সংস্কারে তীব্র আঘাত দিবে এবং অনেকেই এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত ও যুক্তি প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু অবস্থা ও পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বহু রকমের সংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছি, করিতেছি এবং আমাদিগকে ভবিষ্যতে করিতেও হইবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে আমাদের সংস্কার ত্যাগ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মত গ্রহণ করা হইয়াছিল। তিনি এই প্রস্তাবকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার মতে ইহার ফলে কৃষকের অর্থনৈতিক সুবিধা ত হইবেই, পরন্তু অপ্রত্যক্ষ ভাবে দুগ্ধবতী গাভীরও উপকার হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতীয় গোজাতির 'বাহন-শক্তি' (draught quality) খুবই অধিক এবং দুগ্ধবতী গাভীকে 'বাহনের' কাজে নিযুক্ত না করার কোন কারণ নাই। এই সম্পর্কে আমাদের ইহাও মনে রাখা দরকার যে, ভারতবর্ষে দুগ্ধবতী গরুকে লাঙ্গল, গাড়ী প্রভৃতি টানার কাজে নিযুক্ত করা মোটেই নূতন কথা নহে; এইরূপ কার্য্যে পূর্ব্বকালে দুগ্ধবতী গরু নিযুক্ত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে মহীশূর ও কুর্গে এই প্রথা প্রচলিত আছে। পশ্চিম পঞ্জাবে 'ধানী' গরুও এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইত। বাংলাদেশে খুলনা জেলায়, বিশেষতঃ বাগেরহাট মহকুমায় দুগ্ধবতী গরুর সাহায্যে চাষের কাজ হইয়া থাকে। পৃথিবীর অন্যত্রও এই প্রথা

প্রচলিত আছে। ভারতীয় কৃষি-গবেষণা সংসদের সহকারী সভাপতি স্যার দাতার সিং মিশর ভ্রমণের সময় দেখিয়াছেন যে, সেখানে দুগ্ধবতী গাভীকে লাঙ্গল ও গাড়ী টানার কাজে নিযুক্ত করা অতি সাধারণ প্রথা। এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার দরুণ গরুর দুগ্ধদায়িনী শক্তি মোটেই হ্রাস পায় না। তাহাদের স্বাস্থ্যেরও কোন অবনতি ঘটে না। এই প্রথার ফলে তথাকার কৃষকগণ গরুর খাদ্যের খরচ অনেক পরিমাণে কম করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ভারতরাষ্ট্রে গরুর সংখ্যা প্রায় সাড়ে একুশ কোটি; এই অঙ্ক পৃথিবীর গরুর মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, সাড়ে একুশ কোটি গরুর মধ্যে প্রায় ১২ কোটি গরু অকেজো (uneconomic and unproductive)। এই ১২ কোটি গরুর প্রত্যেকের দৈনিক আট আনা হিসাবে খরচ ধরিলে প্রত্যেক দিনের খরচ ৬ কোটি টাকা, প্রত্যেক মাসের খরচ প্রায় ১৮০ কোটি টাকা এবং প্রত্যেক বৎসরের খরচ প্রায় ২১০০ কোটি টাকা। কি বিরাট অপচয়? এই সকল অকেজো গরুকে ভালভাবে তত্ত্বাবধান করিয়া ও খাওয়াইয়া লাঙ্গল ও গাড়ী টানার কাজে নিযুক্ত করিতে পারিলে এই অপচয় কতকটা নিবারণ করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া দুগ্ধবতী গাভী দুগ্ধপ্রদান বন্ধ করিয়া দিলে অর্থাৎ উহার 'শুষ্ক কালে' (dry period) উহা অকেজো হইয়া পড়ে এবং এই কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গরু 'শুষ্ক' (dry) হইলে উহাকে বিক্রয় করিয়া দিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। এইরূপ বিক্রয়ের ফলে কত ভাল জাতীয় গরুর বংশ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহাও প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। প্রতিরোধ করিতে হইলে 'শুষ্ক কালে' দুগ্ধবতী গরুকে কাজে লাগাইতে হইবে।

দুগ্ধদায়িনী গরুকে বাহনের কাজে লাগাইতে হইলে প্রথমে তাহাকে এ কাজের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে এবং প্রস্তুতির সময়টা তাহার পক্ষে কঠোর হইবে, কারণ এই সময়ে তাহার শক্তি অতিরিক্তভাবে ব্যয়িত হইবে। কিন্তু কিছু দিন পরেই এই কাজে গরু অভ্যস্ত হইয়া যাইবে। যখন কোন দুগ্ধদায়িনী গরু বা বকনাকে এইরূপ কাজে নিযুক্ত করা দরকার হইবে তখন প্রথমে উহাকে আর একটি দুগ্ধদায়িনী গরুর সহিত যুগ্ম করিয়া (pair) দেওয়া দরকার। প্রথমে জোড়াটিকে কৃষিক্ষেত্রে গাড়ী টানার কিম্বা কর্ষণোপযোগী জমিচাষের কাজে নিযুক্ত করাই ভাল; দৈনিক ছয় ঘণ্টার বেশী কাজ করানো উচিত নয়। দুগ্ধদায়িনী গাভীর প্রসবের দুই মাস পূর্ব্ব হইতে প্রসবের এক মাস পর পর্য্যন্ত এইরূপ কাজে তাহাকে নিযুক্ত করা উচিত হইবে না।

দুগ্ধবতী গরুকে এইরূপ কাজে নিযুক্ত করিতে হইলে তাহাকে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য দিতে হইবে। তাহাকে এইরূপ খাদ্য দিতে হইবে যাহাতে সে উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ দিতেও পারে, কাজও করিতে পারে। সাধারণতঃ সাত-আট মণ ওজনের গরুর জন্য সাড়ে সাত সের শুষ্ক পদার্থের (dry matter) প্রয়োজন হয়। ইহার জন্য প্রত্যেক গরুর প্রতি দিনের প্রয়োজন হইবে—দশ সের ঘাস এবং পাঁচ সের 'ঘনীভূত খাদ্য' (concentrates); এইরূপ খাদ্যে গরু শরীর রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে, দৈনিক ছয় ঘণ্টা কাজ করিতে পারিবে এবং তাহার পাঁচ সের দুগ্ধ দিবার শক্তি থাকিবে। ঘাসের মূল্য মণ প্রতি আড়াই টাকা এবং 'ঘনীভূত খাদ্য' মণ প্রতি দশ টাকা ধরিলে দৈনিক খাদ্যের খরচ এক টাকা চৌদ্দ আনা অর্থাৎ দুই টাকা পড়ে; ইহার মধ্যে কাজের জন্য সিকি অর্থাৎ আট আনা খরচ হইবে। কেবল কাজের জন্য পৃথকভাবে একটি পশুকে পোষণ করিতে যে খরচ হয় তাহার তুলনায় দৈনিক আট আনা অতিরিক্ত খরচ খুবই কম।

এই প্রথা প্রচলিত হইলে কেবল যে বহুলাংশে বলদের অভাব পূরণ করা যাইবে তাহা নহে, ঘাসের অভাবও কতকাংশে দূর করা সম্ভব হইবে; কারণ অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক গরুর দ্বারা 'বাহনের' কাজ সম্পন্ন করা যাইবে। এই সম্পর্কে ইহাও বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বর্ত্তমানে আমাদের দেশের গোধন আমাদের ঘাড়ে বোঝাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ ইহাদের নিকট হইতে আমরা খরচের অনুপাতে উপযুক্ত পরিমাণ কার্য্য বা দুগ্ধ প্রাপ্ত হই না। গোজাতি ও গোপালন সম্বন্ধে আমাদের পুরাতন বহু সংস্কার, বহু রীতি, নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে; ইহা যদি করিতে পারি, তবেই পুনরায় আমাদের দেশের গোজাতি আমাদের "সম্পদে" পরিণত হইবে, দেশের কৃষিরও প্রভূত উন্নতি হইবে।

এই সম্বন্ধে ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংসদের তত্ত্বাবধানে চারিটি কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় গরু লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে। বাঙ্গালোরে ভারতীয় ডেয়ারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে "সিন্ধি" গরু এবং মহীশূরে সরকারী পশুক্ষেত্রে 'অমৃত মহল' ও "হাল্লিকর" জাতীয় গাভী লইয়া এই পরীক্ষা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের হরিণঘাটা গো-উন্নয়ন ক্ষেত্রে এইরূপ পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।*

---

* ১৯৪৯ সালের জুলাই সংখ্যা *Indian Farming* পত্রিকায় প্রকাশিত "The use of cows for work" প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত। ছবিগুলিও সেই প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

(একাঙ্ক নাটিকা)

শ্রীকুমারলাল দাসগুপ্ত

জাদুঘরের অভ্যন্তর, একটা মস্ত বড় ঘর, তার দেয়ালে সাজান মৌর্যযুগের গুপ্তযুগের, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত যুগের বহু ভাস্কর্য; কোনটাতে সুন্দরী নর্ত্তকী নৃত্য করছে, তাকে ঘিরে বাদকের দল কেউ মৃদঙ্গ, কেউ করতাল, কেউ বাঁশী বাজাচ্ছে, কোনটাতে পদ্মবনে কলহংস লীলা করছে, কোনটাতে রাজসভা বসেছে।

রাত বারটা বাজে ঢং ঢং, অন্ধকার ঘর ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে ওঠে, চারদিকে একটা অস্ফুট আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়, ক্রমে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—হঠাৎ ঘর আলোয় ভরে যায়।

ঘরের মধ্যে দুটি মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথম মানুষ—তুমি কে?

দ্বিতীয় মানুষ—তুমি কে?

(দু'জনেই হেসে ওঠে)

প্রথম—আমি হচ্ছি দৌবারিক—দ্বারপাল।

দ্বিতীয়—আমি হচ্ছি অমাত্য।

দৌবারিক—বোধ হয় মহাপাপ করেছিলাম তাই পাথর হয়ে ঠায় দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।

অমাত্য—আমারও সেই দশা, রাজসভায় বসে আছি তো বসেই আছি, (হাঁটুতে হাত বুলিয়ে) হাঁটু দুটো ধরে গেছে।

দৌবারিক—দারোয়ানী আর পোষাবে না, রাখালী করব তাও স্বীকার কিন্তু দারোয়ানী আর করব না।

অমাত্য—ঠিক ঐ কথা আমিও ভাবছিলাম, সভায় বসবার আর সখ নেই, কিছুদিন পথে পথে ভবঘুরের মত ঘুরতে ইচ্ছে হচ্ছে।

(এক ঝাঁক কলহংস ঘরের মধ্য দিয়ে পাখা ঝটপট করে উড়ে যায়—থালায় অর্ঘ্য সাজিয়ে পূজারিণীগণ প্রবেশ করে।)

প্রথম পূজারিণী—স্তূপ কোনদিকে বলতে পার?

দৌবারিক—দেশটার সঙ্গে এখনও পরিচয় হয় নি।

অমাত্য—মন্দির না খুঁজে বৌদ্ধস্তূপ খুঁজতে বেরিয়েছ কেন?

দ্বিতীয় পূজারিণী—আমরা যে ভগবান বুদ্ধের দাসী।

অমাত্য—তোমরা বৌদ্ধ! বল কি গো? কোন্ দেশে বাড়ী? পোশাক-পরিচ্ছদ আর গহনাপত্র দেখে এদেশের বলে মনে হচ্ছে না!

পূজারিণী—এ দেশেই আমাদের বাড়ী, মহারাজ কণিষ্কের জয় হোক।

অমাত্য—(হো হো করে হেসে) মহারাজ কণিষ্ক! শুনতে পাওয়া যায় প্রায় চার শ বছর আগে কণিষ্ক নামে এক বুনো রাজা রাজত্ব করতেন। এটা বিক্রমাদিত্যের যুগ—সভ্যতার যুগ।

দৌবারিক—(অবাক হয়ে) বিক্রমাদিত্য! মহাকবি কালিদাসের যুগ বল। সে কি আজকের কথা, পাঁচ শ বছর আগেকার কথা। এখন রাজচক্রবর্ত্তী মহীপাল রাজত্ব করছেন, বুঝলে বন্ধু, এটাই চরম সভ্যতার যুগ।

অমাত্য—তুমি নিতান্তই শিশু হে, নিতান্তই শিশু, তোমার চেয়ে আমি পাঁচ শ বছরের বড়। (পূজারিণীকে সম্বোধন করে) তা হলে তোমাদের বয়স কত হবে—কম করেও চার শ বছর, তাই না ?

(প্রথম ও দ্বিতীয় পূজারিণী লজ্জিত ভাবে এ ওর দিকে তাকায়।)

দৌবারিক—(আঙ লে গুনে) উঁহু—চার শ বছর নয়, প্রায় ন'শ বছর—তা বয়স কিছু হয়েছে বৈকি। দেখে কিন্তু বোঝবার জো নাই।

অমাত্য—মেয়েদের চেহারা দেখে বয়স আঁচ করতে পারবে না বন্ধু। লোধ ফুলের রেণু দিয়ে মুখ মার্জ্জনা করলে, তাম্বুলরাগে ঠোঁট ছুটি আরক্ত করলে, আঁখিতে অঞ্জন পরলে আর কাঁচুলি এঁটে বাঁধলে সামান্ত ছু-চার শ বছরের তফাৎ চোখে পড়বে না।

প্রথম পূজারিণী—তুমি নাকি সত্যযুগের লোক, অথচ কথা শুনে বিশেষ সভ্য বলে তো মনে হচ্ছে না।

দৌবারিক—কালিদাসের কালের লোক কিনা তাই উনি স্ত্রীচরিত্রে বিশেষজ্ঞ।

অমাত্য—(হেসে) নিসর্গনিপুণাঃ স্ত্রিয়ঃ—বুঝলে বন্ধু।

(পূজারিণীগণ দ্রুত প্রস্থান করে, এক ঝাঁক হাঁস উড়ে চলে যায় ; নেপথ্যে বাঘের ডাক ও হাতীর বৃংহিত শুনতে পাওয়া যায়।)

দৌবারিক—যেমন এখানে আমরা জেগে উঠেছি তেমনি এদিকে-ওদিকে অনেকেই জেগে উঠেছে দেখছি। ডাক শুনছ ?

অমাত্য—বাঘ ডাকছে না ?

দৌবারিক—আরো অনেক জানোয়ার ডাকছে।

অমাত্য—(সভয়ে) এদিকে আসবে না ত ?

দৌবারিক—(তলোয়ার বার করে) এলে মন্দ হয় না।

অমাত্য—তলোয়ারখানা মরচেধরা নয় ত ?

(যক্ষের প্রবেশ)

অমাত্য—স্বাগত !

দৌবারিক—তুমি কে ?

যক্ষ—আমি যক্ষ

অমাত্য—(সানন্দে) কশ্চিৎকান্তা বিরহগুরুণা স্বাধিকার-প্রমত্তঃ—তা বিরহী বলেই মনে হচ্ছে।

(যক্ষের প্রস্থানোদ্যোগ)

দৌবারিক—আহা চললে যে, একটু দাঁড়িয়ে ছু-চারটে কথা বলেই যাও।

যক্ষ—আমার যক্ষিণীকে দেখেছ ?

দৌবারিক—(হেসে) এরই মধ্যে হারিয়ে গেল ?

যক্ষ—খুঁজে পাচ্ছি না।

অমাত্য—দেখতে কেমন ?

যক্ষ—(বিরক্ত ভাবে) কেমন আবার, যেমন হয়ে থাকে তেমন।

অমাত্য—দাড়িম্ববীজের মত দশন, অধরোষ্ঠ পক্ক বিম্বের মত লাল, কটিদেশ ক্ষীণ, চোখ ছুটি হরিণীর মত চঞ্চল, দেহযষ্টি কুচভারে কিঞ্চিৎ আনত আর গতি শ্রোণীভারে মন্দ মন্দ—

যক্ষ—(সন্দিগ্ধভাবে) দেখেছ নাকি ?

অমাত্য—না গো না, তোমার যক্ষিণী এ পথে আসেন নি, তুমি উল্টো পথ ধরেছ।

দৌবারিক—হয় তো তুমি একটু দ্রুতপদে এগিয়ে এসেছ, হয় তো তিনি পেছনে পড়ে আছেন।

অমাত্য—ঐ যে কে এদিকে আসছে, তোমার যক্ষিণীই আসছেন বোধ হয়।

(যক্ষের দ্রুত প্রস্থানোদ্যোগ)

অমাত্য—(যক্ষের হাত চেপে ধরে) আরে ওকি, তুমি পালাচ্ছ যে ?

দৌবারিক—তা হলে যক্ষিণী পলাতকা নন, পলাতক যক্ষ-মশাই নিজে।

যক্ষ—হাত ছাড়, আমার অবস্থা তোমার হলে তুমিও পালাতে।

অমাত্য—(হাত ছেড়ে দিয়ে) বলো কি বন্ধু, অমন যার পরমাসুন্দরী স্ত্রী, তার অবস্থা কল্পনা করতেও যে আমার পুলক হচ্ছে ; ছুটি কুরঙ্গনয়নের দৃষ্টি, ছুটি মৃণালবাহুর নিবিড় বন্ধন—

যক্ষ—হাজার বছর ধরে, ছু'চার দিন নয়, ছু'চার বছর নয়, হাজার বছর ধরে, হা-জা-র বছর ধরে—কল্পনা করো, পুলক হচ্ছে কি ?

অমাত্য—পুলকের পরের অবস্থা—স্বেদ হচ্ছে।

(রাজ-নর্ত্তকী, মুরজ-বাদিকা, মুরলীবাদিকার প্রবেশ)

অমাত্য—(যক্ষকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে) তোমরা কি কারো সন্ধানে ফিরছ ?

মুরজবাদিকা—না, আমরা ইতস্তত ভ্রমণ করছি।

মুরলীবাদিকা—আমরা কারো সন্ধানে ফিরি না, সবাই আমাদের সন্ধানে ফেরে।

দৌবারিক—বেশ বলেছে।

অমাত্য—(বাধা দিয়ে) তুমি থাম, ভদ্রভাবে কথাটাও বলতে জান না (মুরলীবাদিকাকে সম্বোধন করে) অয়ি ইন্দু-বদনে, তুমি যথার্থ ই বলেছ, কমল কি কখনও অলির সন্ধানে ফেরে, অলিকুলই ঝাঁকে ঝাঁকে কমলের কাছে ছুটে আসে। তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

রাজ-নর্ত্তকী—আমি রাজ-নর্ত্তকী আর এরা হচ্ছে আমার সঙ্গিনী—মুরজবাদিকা এবং মুরলীবাদিকা।

অমাত্য—তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হলে এ আমাদের পরম সৌভাগ্য।

রাজ-নর্ত্তকী—এটা রাজপ্রাসাদের কোন কক্ষ ?

অমাত্য—আর যে কক্ষই হোক না কেন, প্রমোদ-কক্ষ নয়।

দৌবারিক—হয় তো বা মন্ত্রণা-কক্ষ।

অমাত্য—অথবা কারাকক্ষ।

দৌবারিক—প্রমোদ-কক্ষে তো বহু কাল কাটিয়েছ, আবার প্রমোদ-কক্ষের সন্ধান কেন ?

যক্ষ—সোনার খাঁচার পাখী এরা, খাঁচা খুলে উড়িয়ে দাও, পালাবে না ; ঘুরে ফিরে আবার খাঁচায় এসে ঢুকবে।

মুরজবাদিকা—আমরা সোনার খাঁচা ভালবাসি।

অমাত্য—সোনার খাঁচা না হলে তোমাদের মানাবেই বা কেন ?

মুরলীবাদিকা—তা হলে দয়া করে মহারাজ অনঙ্গভীমের প্রাসাদটা আমাদের দেখিয়ে দাও।

অমাত্য—তোমাদের মহারাজার যে নামই শুনি নি !

মুরজবাদিকা—উৎকলের প্রবল প্রতাপ মহারাজ অনঙ্গভীমের নাম শোনো নি—বলো কি ?

অমাত্য—পাঁচ শ বছর আগে, না—পাঁচ শ বছর পরে ?

দৌবারিক—থাক্—বয়সের হিসেবে আর দরকার নাই।

অমাত্য—এ বড় মজার দেশ, এখানে স্থান কাল আর পাত্র সব এলোমেলো, উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের অমাত্য আর উৎকলের অনঙ্গভীমের নর্ত্তকী বিশ্রম্ভালাপ করছে ! (উচ্চহাস্য)

মুরজবাদিকা—ব্যাপারটা আমাদের মোটেই হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে না, সখী, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

রাজ-নর্ত্তকী—কিন্তু যাব কোথায়, রাজা নেই, রাজপ্রাসাদ নেই।

যক্ষ—চাটুবাক্য নেই, মনরাখা হাসি নেই, মিথ্যা প্রেমের অভিনয় নেই—সমস্যা বটে !

অমাত্য—চাটুবাক্যের অভাব এখানেও হবে না।

মুরজবাদিকা—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল কথা শুনবার ধৈর্য্য আমাদের নেই।

দৌবারিক—বুঝেছি, বুঝেছি—সমস্যা আরও গুরুতর, ভারী একটা মৃদঙ্গ বয়ে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় ; তা, আমি বলি তোমার মুরজটি রেখে এখানে একটু বোসো।

অমাত্য—(সোৎসাহে) এ অতি যুক্তিযুক্ত পরামর্শ, এখানে আজ সভা বসান যাক।

দৌবারিক—যেখানে রাজ-নর্ত্তকী সেখানেই রাজসভা।

অমাত্য—ঠিক কথা, ঐ কুরঙ্গনয়না, গজগামিনী, ক্ষীণমধ্যা, মৃণালবাহু, বিম্বাধরা রাজ-নর্ত্তকী যদি দয়া করে একটি নৃত্য সুরু করেন এবং এই চটুলা, সুহাসিনী, সুনিপুণা মুরজবাদিকা আর মুরলীবাদিকা যদি সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গত করেন, তা হলে আমরা কৃতার্থ হই।

রাজ-নর্ত্তকী—(সলজ্জভাবে) আমি এত প্রশংসার উপযুক্ত নই।

যক্ষ—সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তোমার দেহের গঠন অপূর্ব—দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দুকান্তি বদনং ইত্যাদি, অর্থাৎ নর্ত্তকীর চোখ দুটি দীর্ঘ হবে, মুখ শরতের চাঁদের মত সুন্দর হবে, বাহু দুটি স্কন্ধদেশে নম্রভাবাপন্ন হবে, হৃৎপ্রদেশ উন্নত কুচদ্বয়ের সন্নিবেশে অপ্রশস্ত হবে, মধ্যপ্রদেশ পাণিমাত্র দ্বারা পরিমাপ করা যাবে, জঘনদ্বয় বিশাল হবে, পায়ের আঙুলগুলো কুটিলভাবযুক্ত হবে—এ সব লক্ষণ তোমাতে বর্ত্তমান।

রাজ-নর্ত্তকী—(যক্ষের দিকে অনুরাগসহকারে তাকিয়ে) আপনার পরিচয় পেলে ধন্য হই।

যক্ষ—আমি নৃত্যগীত-অনুরাগী এক সামান্য যক্ষ।

রাজ-নর্ত্তকী—(বিনীতভাবে) নটরাজ, আপনাকে চিনতে পারি নি। আমাদের বাচালতা মার্জ্জনা করবেন।

যক্ষ—তোমাদের বাক-চাতুরী আমি উপভোগ করছিলাম।

রাজ-নর্ত্তকী—এই নতুন দেশে আপনার দেখা পেয়ে আমরা আশ্বস্ত হলাম।

অমাত্য—কিন্তু আশ্বাসবাণী প্রথমে আমিই বলেছি, আমার কথায় দয়া করে একবার কর্ণপাত কর।

রাজ-নর্ত্তকী—(অমাত্যকে উপেক্ষা করে, যক্ষের প্রতি কটাক্ষপাত করে) আপনার সামনে নাচতে আমার ভয় হচ্ছে।

যক্ষ—তুমি নাচলে আমি আনন্দিত হব।

রাজ-নর্ত্তকী—সখী, নটরাজের ইচ্ছে হয়েছে আমরা এখানে একটু নাচ-গান করি।

মুরলীবাদিকা—কিন্তু তার আয়োজন কোথায় ?

দৌবারিক—আয়োজন এখখুনি হচ্ছে। (মাথার প্রকাণ্ড পাগড়িটা খুলে বিছিয়ে দিতে দিতে) যেখানে যেমন সেখানে তেমন আয়োজন।

অমাত্য—(দৌবারিকের পিঠ চাপড়ে) বন্ধুর উপস্থিত বুদ্ধি আছে।

(মুরজবাদিকা, মুরলীবাদিকা, রাজ-নর্ত্তকী, অমাত্য, দৌবারিক ও যক্ষ বসে পড়ে, মুরজবাদিকা ও মুরলীবাদিকা সঙ্গত সুরু করে, রাজ-নর্ত্তকী গীত আরম্ভ করে দেয়—গ্রীক সৈনিক ও আরও কয়েকজন নরনারী একে একে প্রবেশ করে এবং আশেপাশে উপবেশন করে—একটু পরে রাজ-নর্ত্তকী উঠে দাঁড়িয়ে নৃত্য সুরু করে।)

অমাত্য—অহো, কি সুন্দর, কি অপূর্ব।

(নেপথ্যে শোনা যায় 'রাজচক্রবর্তী কাশীরাজের জয়' এবং একটু পরে কতিপয় পারিষদ সঙ্গে কাশীরাজের প্রবেশ—মাথায় তাঁর রাজছত্র; নাচ-গান বন্ধ হয়, সকলে উঠে দাঁড়ায়।)

পারিষদ—রাজচক্রবর্তী কাশীরাজের জয়।

অমাত্য—(কৃতাঞ্জলিপুটে) অহো, কি ভাগ্য মহারাজের দর্শন পেলাম।

(অন্যান্য সকলে নতমস্তকে অভিবাদন করে)

কাশীরাজ—(মৃদু হাস্য করে) কি হচ্ছে এখানে?

অমাত্য—প্রভু, এখানে একটু নাচ-গান হচ্ছে।

কাশীরাজ—(রাজ-নর্তকীকে দেখে) এ সুন্দরী কে?

যক্ষ—ইনি কোন এক গুণীরাজার সভানর্তকী।

অমাত্য—অহো, নিশ্চয় গুণী, এমন রত্ন যাঁর সভা আলো করত তিনি মহাগুণী।

কাশীরাজ—আমার সভাতে একে দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।

গ্রীক সৈনিক—রাজসভাও বহু, রাজ-নর্তকীও বহু।

কাশীরাজ—এদেশে একটিমাত্র রাজসভা এবং সে সভা আমার।

অমাত্য—আজ্ঞে মহারাজ, এটা ঠিক কাশীরাজ্য নয়, এখানে স্থান ও কালের বড় গোলমাল।

যক্ষ—স্থান পৃথিবী এবং কাল বর্তমান, এ বিষয়ে তো সন্দেহ নেই।

অমাত্য—মহারাজ যখন উপস্থিত আছেন তখন রাজ্য আর রাজসভা কাশীরই মনে করা যাক। এখন মহারাজ দয়া করে মাঝখানে আসন গ্রহণ করলে আর কোন ত্রুটি থাকে না।

পারিষদ—তুমি তো অত্যন্ত বেয়াদপ, সিংহাসন না হলে মহারাজ বসবেন কেমন করে?

গ্রীক সৈনিক—মহারাজের তা হলে এদেশে বসাই হবে না।

যক্ষ—আমি বলি মহারাজ তো ধরণীর ঈশ্বর, ধরণীতে বসলে তাঁর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না।

(বহু কণ্ঠ)—ঠিক, ঠিক, মহারাজ উপবেশন করুন।

(কাশীরাজের আসন গ্রহণ এবং অন্য সকলের উপবেশন)

অমাত্য—মহারাজের আদেশ হলে আবার নৃত্যগীত সুরু হতে পারে।

কাশীরাজ—সুন্দরী, তুমি নৃত্য সুরু কর, নৃত্যগীতে আমার অরুচি নেই।

(আবার নৃত্যগীত সুরু হয়, কিছুক্ষণ পরে নেপথ্যে ধ্বনি ওঠে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি', সভায় সকলে চঞ্চল হয়, ধ্বনি আরো কাছে আসে, দুই তিন জন পীতপরিচ্ছদধারী শ্রমণ প্রবেশ করে।)

শ্রমণগণ—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—প্রভু বুদ্ধ আসছেন।

কাশীরাজ—(ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে) ভগবান তথাগত আসছেন। বন্ধ কর নৃত্য, বন্ধ কর গীতবাদ্য, প্রভুর চরণ দর্শন করে আজ কৃতার্থ হব।

(সকলে উঠে দাঁড়ায়, ভগবান বুদ্ধ প্রবেশ করেন, ধীরে ধীরে এগিয়ে যান, ঘর অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সকলে হাত জোড় করে দাঁড়ায়—বুদ্ধদেব মৃদুপদবিক্ষেপে অপর দিক দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান, জনতা কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থাকে।)

কাশীরাজ—আজ আমি ধন্য হলাম।

পারিষদ—আজ আমরা ধন্য হলাম।

পারিষদ—ধরণী নিষ্পাপ হ'ল।

কাশীরাজ—মনের যত গ্লানি মুছে গেল।

গ্রীক সৈনিক—কতক্ষণের জন্য?

অমাত্য—মহারাজ, আসন গ্রহণ করুন।

কাশীরাজ—(বসে) এর পরে আর নাচগান ভাল লাগবে না, মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল।

অমাত্য—দোলায়মান চিত্ত ভাল নয় মহারাজ, যেদিকে হোক একদিকে ঝুঁকে পড়ুন।

কাশীরাজ—তোমাদের সমবেত ঝোঁকটা যে আমার ঘাড়ে ফেলে দিলে।

অমাত্য—মহারাজ, তা হলে ঘাড় নাড়ুন আবার নাচগান সুরু হোক।

কাশীরাজ—তা হলে আবার নাচ সুরু হোক।

(আবার নৃত্যগীত সুরু হয় এবং কিছুক্ষণ পরে শেষ হয়।)

কাশীরাজ—(সোৎসাহে) ওহে অমাত্য—নাচ কেমন দেখলে বলো?

অমাত্য—মহারাজ, আপনিই বলুন—পত্তনেসতি কিং গ্রামে রত্নপরীক্ষা।

কাশীরাজ—সুন্দর, অতি সুন্দর।

গ্রীক সৈনিক—অতুলনীয়।

কাশীরাজ—(নিজের গলার মণিহার খুলে) এই নাও সুন্দরী পুরস্কার; যেমন তোমার রূপ, তেমনি তোমার গুণ।

(নর্তকী এগিয়ে এসে হার গ্রহণ করে)

কাশীরাজ—তুমি ক্লান্ত হয়েছ—এইখানে বসো।

রাজ-নর্তকী—(বসে) মহারাজের অনুগ্রহ অশেষ।

কাশীরাজ—নর্তকী, তোমার নাম কি?

রাজ-নর্তকী—দাসীর নাম মদনমঞ্জরী।

অমাত্য—তিলোত্তমা বা উর্বশী হলেও বেমানান হ'ত না।

কাশীরাজ—আজকে থেকে তোমাকে রাজ-নর্তকী নিযুক্ত করলাম।

গ্রীক সৈনিক—রাজ্য কিন্তু এখনও আবিষ্কার হয় নাই।

কাশীরাজ—ক্ষত্রিয়ের হাতে তলোয়ার থাকলে রাজ্য গড়ে তুলতে কতক্ষণ?

যক্ষ—আবার তা ভেঙে পড়তেই বা কতক্ষণ?

কাশীরাজ—ওদিকটা ভেবে দেখবার মত প্রচুর অবসর আমার হয় নি।

যক্ষ—পাঁচ শ, হাজার বছরেও চিন্তা করবার অবসর হ'ল না?

কাশীরাজ—চিন্তা অনেক করেছি, কিন্তু সে সৃষ্টি আর স্থিতির দিকটাই; প্রলয়ের দিকটা ভাবতে ভালও লাগে না, ভাবিও নি।

যক্ষ—অর্থাৎ বয়স হয়েছে হাজার বছর, কিন্তু বুদ্ধিতে এখনও ছেলেমানুষ!

পারিষদ—মহাশয়ের কথাবার্ত্তা যথেষ্ট স্বাভাবিক নয়।

যক্ষ—আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এতগুলো লোকের মধ্যে একমাত্র আমিই স্বাভাবিক; আমার বয়স ও বুদ্ধি একসঙ্গে বেড়েছে।

কাশীরাজ—তুমি স্বাভাবিক বলতে কি বোঝ?

যক্ষ—যা সমঞ্জস তাই স্বাভাবিক।

কাশীরাজ—না, বেশীর ভাগ লোকের যে অবস্থা সেইটেই স্বাভাবিক, বেশীর ভাগ লোক যদি পাগল হয়, পাগলামিই স্বাভাবিক।

যক্ষ—(ভীতভাবে চারদিকে তাকিয়ে) মহারাজের কথাটা সত্য বলেই মনে হচ্ছে, অন্তত এখানে।

(হঠাৎ একদল ভীত হরিণ ছুটে এসে ঢোকে, জনতার মধ্য দিয়ে লাফালাফি করে পালিয়ে যায়, নেপথ্যে বাঘের ডাক ও হস্তীর বৃংহিত শুনতে পাওয়া যায়।)

অমাত্য—বাঘ ডাকছে না? এদিকে আসবে না তো?

গ্রীক সৈনিক—এদিকে আসছে বলেই মনে হচ্ছে, হরিণগুলোকে তাড়া করেছে।

কাশীরাজ—(সোৎসাহে) হাতের কাছে এত শিকার, খুবই আনন্দের বিষয়! চল, চল শিকার করা যাকগে, শরীরের পেশীগুলো আবার তাজা হয়ে উঠুক।

(তলোয়ার খুলে কাশীরাজ ও পারিষদগণ এক দিক দিয়ে প্রস্থান করে, আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে যায় অমাত্য, মুরজবাদিকা, মুরলীবাদিকা, গ্রীক সৈনিক, প্রস্থানোদ্যত রাজ-নর্ত্তকীকে বাধা দেয়।)

গ্রীক সৈনিক—একটু দাঁড়াও রাজনর্ত্তকী, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।

রাজ-নর্ত্তকী—না না, আমি দাঁড়াতে পারব না, সঙ্গিনীরা চলে গেল, আমার ভয় করছে, আমাকে যেতে দাও।

গ্রীক সৈনিক—আমি কাছে থাকতে তোমার কোন ভয় নেই, অনেক সিংহ ব্যাঘ্র আমার বর্শার আঘাতে প্রাণ দিয়েছে, ডাক শুনেই আমি পালাই না।

রাজ-নর্ত্তকী—কি বলবে তাড়াতাড়ি বল।

গ্রীক সৈনিক—রাজ-নর্ত্তকী, তুমি সুন্দরীশ্রেষ্ঠা।

রাজ-নর্ত্তকী—(হেসে) এই কথা! এই সামান্য কথাটা বলবার জন্য এত ব্যগ্রতা?

গ্রীক সৈনিক—সামান্য! আমি বলি অসামান্য।

রাজ-নর্ত্তকী—এখন আমাকে যেতে দাও, সৌন্দর্য্য আলোচনা পরে হবে।

গ্রীক সৈনিক—না, অপেক্ষা করবার মত ধৈর্য্য আমার নেই, রাজ-নর্ত্তকী, আমি তোমাকে ভালবাসি।

রাজ-নর্ত্তকী—(হেসে) এটা অভিনয় করবার সময় নয়।

গ্রীক সৈনিক—আমি অভিনয় করছি নে, আমি সত্যিই তোমাকে ভালবাসি।

রাজ-নর্ত্তকী—আমি ভীরু নর্ত্তকী, তোমার মত বীরের ভালবাসা পাবার উপযুক্ত আমি নই।

গ্রীক সৈনিক—কে বলে তুমি উপযুক্ত নও, তুমি সম্রাটের প্রেম পাবার উপযুক্ত।

রাজ-নর্ত্তকী—আমি সামান্য নর্ত্তকী মাত্র।

গ্রীক সৈনিক—আমি তোমাকে আমার হৃদয়-মন্দিরের দেবী করব।

রাজ-নর্ত্তকী—তুমি তো দেখছি বিদেশী, তোমাদের দেশেও কি মেয়েদের কাছে মিথ্যে কথা বলবার রীতি আছে?

গ্রীক সৈনিক—আমি তোমাকে মিছে কথা একটিও বলিনি, আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি, গ্রীকেরা ভালবাসা নিয়ে খেলা করে না।

রাজ-নর্ত্তকী—বেশী অভ্যাস হয়ে গেলে আর খেলা বলে মনে হয় না।

গ্রীক সৈনিক—ওগো ভেনাস, আমাকে তুমি কৃপা কর, আমিও তোমার জন্যে রাজ্য জয় করব।

রাজ-নর্ত্তকী—এখন আমাকে যেতে দাও, রাজ্য জয় করে এস, তখন তোমার কথা শুনব।

(দ্রুত চলে যায়)

গ্রীক সৈনিক—তুমি হরিণীর মত চঞ্চল।

(পিছনে পিছনে যায়)

(খালি ঘরের ভিতর দিয়ে আবার এক দল হরিণ ছুটে চলে যায়, উপর দিয়ে এক ঝাঁক হাঁস উড়ে যায়, বিপরীত দিক থেকে যক্ষ প্রবেশ করে।)

যক্ষ—পৃথিবীটা হঠাৎ এত ছোট হয়ে গেছে যে কোথাও

একটু নির্জন স্থান নেই যেখানে এক মুহূর্ত একা থাকতে পারি।

(অন্য দিক থেকে আবার রাজ-নর্ত্তকী প্রবেশ করে)

যক্ষ—(হেসে) এই দেখ, দু' পা যেতে না যেতেই আবার তোমার সঙ্গে দেখা। তা, তুমি যে নিতান্ত একা!

রাজ-নর্ত্তকী—এখন আর একা নেই।

যক্ষ—আমাকে গণনার মধ্যে এনো না, আমি নগণ্য।

রাজ-নর্ত্তকী—আপনি গণনার বাইরে।

যক্ষ—চাও ত আমি এখ্খুনি বিদায় হই।

রাজ-নর্ত্তকী—আমি যে আপনাকেই খুঁজছিলাম।

যক্ষ—(আশ্চর্য্য হয়ে) কেন বল ত?

রাজ-নর্ত্তকী—(নীরব হয়ে থাকে)

যক্ষ—নিঃসঙ্কোচে বল।

রাজ-নর্ত্তকী—(অনুরাগপূর্ণ কটাক্ষপাত করে) কিছু না, আপনার সান্নিধ্য চাচ্ছিলাম।

যক্ষ—(সন্দিগ্ধভাবে) আমার সান্নিধ্য কি প্রীতিকর বলে মনে হয়!

রাজ-নর্ত্তকী—(মাথা নীচু করে) খুব।

যক্ষ—তাই নাকি, আচ্ছা বল ত, আমার দূরত্বটা কি সেই অনুপাতে কষ্টকর বলে মনে হয়?

রাজ-নর্ত্তকী—(মাথা নীচু করে) খুব।

যক্ষ—আর আমার কণ্ঠস্বর শুনলে হর্ষ—

রাজ-নর্ত্তকী—(ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়)

যক্ষ—এবং চোখে চোখ পড়লে পুলক উপস্থিত হয়?

রাজ-নর্ত্তকী—(সম্মতি জানায়)

যক্ষ—(চিন্তিতভাবে) মানুষের কি হলে যেন এই সব বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়?

রাজ-নর্ত্তকী—(কটাক্ষপাত করে) ভালবাসলে।

যক্ষ—ভালবাসলে! তুমি তা হলে আমাকে ভালবেসেছ?

রাজ-নর্ত্তকী—আপনার চরণে আমার জীবন যৌবন সমর্পণ করেছি।

যক্ষ—(দুঃখিত ভাবে) এই সময় আমার গলায় এক গাছা মুক্তামালা নেই যা তোমাকে উপহার দিতে পারি।

রাজ-নর্ত্তকী—কিন্তু আপনার হৃদয় ত আছে।

যক্ষ—কেবল হৃদয়ের বিনিময়ে কি এ খেলা জমে রাজ-নর্ত্তকী?

রাজ-নর্ত্তকী—এ ত হৃদয়েরই খেলা।

যক্ষ—তুমি রাজ-নর্ত্তকী, তোমার মুখে এমন কথা শুনব আশা করি নি।

রাজ-নর্ত্তকী—রাজ-নর্ত্তকীও ভালবাসতে পারে।

যক্ষ—নিশ্চয় পারে, ভালবাসলে কিছুক্ষণ সময় কাটে বেশ।

রাজ-নর্ত্তকী—আমার এ ভালবাসা কিছুক্ষণের নয়, চিরজীবনের।

যক্ষ—এই ত বেশ কথাটা খেলাচ্ছলে বলছিলে, আবার এর মধ্যে গাম্ভীর্য্য টেনে আনলে কেন?

রাজ-নর্ত্তকী—যেখানে অনুভূতি গভীর সেখানে গাম্ভীর্য্য আসবেই।

যক্ষ—একটা কথা বলতে পার, ভালবাসা কি মিথ্যার অলঙ্কার না হলে শোভা পায় না?

রাজ-নর্ত্তকী—এ প্রশ্ন কেন?

যক্ষ—(হেসে) বল তো আজ পর্য্যন্ত কতজনকে এই চিরজীবনের স্বীকৃতি দিয়েছ?

রাজ-নর্ত্তকী—(মাথা নীচু করে থাকে)

যক্ষ—আজ পর্য্যন্ত কত জনকে ভালবেসেছ, আর কত দিন সেই সব গভীর, অক্ষয়, অমর ভালবাসা টিঁকেছে?

রাজ-নর্ত্তকী—হৃদয় ভালবাসে একবারই।

যক্ষ—হাজার, দেড় হাজার বছর ধরে মানুষের চরিত্র দেখেও ও কথা বলতে পারলে? যারা একবার ভালবাসে তারা মানুষ নয়, তুমি আমি মানুষমাত্র।

রাজ-নর্ত্তকী—হয় ত তাই, কিন্তু প্রথম যখন ভালবাসি তখন তা চিরজীবনের বলে মনে হয় কেন?

যক্ষ—সেটা সাময়িক।

রাজ-নর্ত্তকী—হোক সাময়িক, তবু তা সত্য; সাময়িক সত্য বলে কি কিছু হতে পারে না?

যক্ষ—(চিন্তিত ভাবে) সাময়িক সত্য! কথাটা বেশ,—তা বোধ হয় হতে পারে; প্রথম যখন ভালবাসি তখন তা যে চিরজীবনের বলে মনে হয় একথা আমিও অস্বীকার করতে পারছি না।

রাজ-নর্ত্তকী—সাময়িক সত্য যে চিরজীবনের সত্য হবে না তা কে বলতে পারে?

যক্ষ—কেউ বলতে পারে না, কেননা ভগবান মানুষকে ত্রিকালজ্ঞ করেন নি, সেইখানেই মুশকিল।

রাজ-নর্ত্তকী—না, সেইখানেই মঙ্গল।

যক্ষ—এক হিসেবে কথাটা ঠিক, জীবনের পথে আলো-অন্ধকার আছে বলেই খেলাটা চলে ভাল।

(গ্রীক সৈনিকের প্রবেশ)

গ্রীক সৈনিক—এই যে, তুমি এইখানে এসে লুকিয়েছ আর তোমাকে আমি চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

যক্ষ—এত খোঁজাখুঁজি কেন?

গ্রীক সৈনিক—(বিরক্তভাবে) ভুল বুঝেছ, তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি না।

যক্ষ—(হেসে) তাই নাকি—তা হলে আমি চলি।

রাজ-নর্ত্তকী—না না, আমাকে একা ফেলে আপনি যাবেন না।

গ্রীক সৈনিক—ওগো বিদেশিনী, তুমি আমাকে এমনভাবে উপেক্ষা করো না।

রাজ-নর্ত্তকী—বিদেশী, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

গ্রীক সৈনিক—সুন্দরী, তোমার কি হৃদয় নেই?

যক্ষ—অনুমান ঠিকই করেছ বন্ধু, ইদানীং ওঁর হৃদয় যথাস্থানে নেই।

(অমাত্যের প্রবেশ)

অমাত্য—অহো কি সৌভাগ্য, মদনমঞ্জরী যে এখানে বিরাজ করছে।

যক্ষ—মৌমাছিরা একে একে আবার জুটতে সুরু করল।

গ্রীক সৈনিক—এক আধটা মৌমাছি তাড়াতে আমার বেশীক্ষণ লাগবে না। (তলোয়ার বার করে)

অমাত্য—আহা কর কি, তলোয়ার রাখ—তুমি লোকটা একেবারে বর্ব্বর। এস বাগ্‌যুদ্ধে অগ্রসর হও, তবে না বুঝব তুমি প্রেমিক।

যক্ষ—এ প্রস্তাব মন্দ নয়, আমি বলি তোমরা দু'জনে নর্ত্তকীর রূপ বর্ণনা করে দুটি শ্লোক রচনা কর।

অমাত্য—চমৎকার, চমৎকার, তুমি হবে বিচারক—যার শ্লোক উৎকৃষ্ট হবে, জয় তার।

যক্ষ—এবং রাজ-নর্ত্তকীও তার।

অমাত্য—আমি প্রস্তুত।

যক্ষ—একটু অপেক্ষা কর, ঐ দেখ আরো অনেকে এদিকে আসছে, হয়তো ওরাও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগদান করতে পারে।

অমাত্য—(ব্যস্তভাবে) সপারিষদ মহারাজ আসছেন যে!

রাজ-নর্ত্তকী—এখানে থাকা আমার পক্ষে আর রুচিকর হবে না। (সে প্রস্থান করে, গ্রীক সৈনিক তাকে অনুসরণ করে।)

(প্রথমে মুরজবাদিকা, মুরলীবাদিকা, পরে সপারিষদ কাশ্মীরাজের প্রবেশ)

মুরজবাদিকা—তোমরা আমাদের প্রিয়সখী মদনমঞ্জরীকে দেখেছ?

অমাত্য—দেখেছি বৈ কি, আহা সুন্দরী মদনমঞ্জরী!

মুরলীবাদিকা—কেন কি হয়েছে আমাদের সখীর!

অমাত্য—এতক্ষণ যে কি হয়েছে তা ঠিক বলতে পারি নে।

কাশ্মীরাজ—সভানর্ত্তকীর কি কোন বিপদ ঘটেছে?

অমাত্য—সমূহ বিপদ মহারাজ, একটা মত্ত হস্তী তাকে তাড়া করেছে।

কাশ্মীরাজ—(সভয়ে) মত্ত হস্তী!

অমাত্য—হ্যাঁ মহারাজ, চেহারাটা মানুষের মত, কিন্তু রসবোধ একেবারে মত্ত হস্তীর মত।

(সকলে হেসে ওঠে)

মুরজবাদিকা—ওমা, সে আবার কে?

অমাত্য—সে আমাদের বিদেশী সৈনিক পুরুষটি, রাজ-নর্ত্তকীকে প্রেম নিবেদন করে বেড়াচ্ছে।

মুরজবাদিকা—তোমাদের মধ্যে তারই রসবোধ দেখছি আছে।

কাশ্মীরাজ—(সরোষে) একটা সামান্য সৈনিকের এতখানি স্পর্দ্ধা! যাও তো তোমরা, সেই দুঃসাহী বিদেশীকে ধরে নিয়ে এসো আর আমার সভানর্ত্তকীকেও সঙ্গে এনো।

দৌবারিক—রাজাই অবলার বল।

অমাত্য—এতক্ষণে সত্যিকার রাজসভা বলে মনে হচ্ছে।

দৌবারিক—এতক্ষণে বেঁচে আছি বলে মনে হচ্ছে।

যক্ষ—জীবন যথেষ্ট জটিল না হলে জমে না দেখছি।

অমাত্য—যেখানে মানুষ সেখানেই জটিলতা।

যক্ষ—বন্ধু এতক্ষণে একটা দামী কথা বলেছে, এই যে অপরিসর স্থান, স্বল্পকাল, আর গুটিকয়েক পাত্র, এ নিয়েই কেমন রসসৃষ্টি সুরু হয়ে গেছে।

(পারিষদগণ, গ্রীক সৈনিক ও রাজ-নর্ত্তকীর প্রবেশ)

অমাত্য—এসো বীরবর।

গ্রীক—এই যে বাগ্‌যোদ্ধা।

পারিষদ—মহারাজ, অপরাধীকে উপস্থিত করেছি?

কাশ্মীরাজ—বিদেশী সৈনিক, তুমি যে অপরাধ করেছ তার দণ্ড কি জান?

অমাত্য—প্রাণদণ্ড মহারাজ।

গ্রীক সৈনিক—বাক্যবাণে?

যক্ষ—ও অপরাধের যদি প্রাণদণ্ড হয় তা হলে মহারাজ আমাদের প্রত্যেকের একাধিক বার মরা উচিত।

কাশ্মীরাজ—চুপ কর তোমরা, শোনো সৈনিক, তোমার প্রাণদণ্ড, আর সে দণ্ড দেব আমি স্বহস্তে।

অমাত্য—রাজোচিত।

(কাশ্মীরাজা তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন, এমন সময় নেপথ্যে ঢং ঢং করে চারটা বাজে, হঠাৎ আলো স্তিমিত হয়ে যায়, একটা ব্যস্ততা, ছুটোছুটি সুরু হয়, এক ঝাঁক কলহংস উড়ে আসে, একদল হরিণ ছুটে চলে যায়, তার পরে হয় সব চুপ, আলো আরো কমে আসে)

কন্যাদের বিবাহ হবে না?

(৩)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

নরনারীর বিবাহ-ইচ্ছা স্বাভাবিক ধর্ম। এত কাল আমাদের দেশে কোনও কন্যা অবিবাহিত থাকত না। প্রায় কোন পুত্রও থাকত না। কদাচিৎ কোনও কোনও পুরুষকে কন্যার অভাবে কিম্বা অন্য কারণে আইবুড়া থাকতে হ'ত, কিন্তু কোনও কন্যাকে থাকতে দেখা যেত না। রুগ্ন বা বিকলাঙ্গ কন্যার বিবাহ হ'ত না।

কিন্তু গত ৮।১০ বৎসর হ'তে কোন কোন সুস্থ কন্যারও বিবাহ হচ্ছে না। এত দিন কেবল যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাবার জন্য কলেজে পড়ছিল। ডিগ্রি না পেলে চাকরি পাবে না, আর চাকরি না পেলে খেতে পাবে না। এই দারুণ দুশ্চিন্তায় তারা পঠদ্দশা শেষ করছিল। এখন কন্যাদের বিবাহের বয়স বেড়ে গেছে। তারা দেখছে, শুনছে, তাদের বিবাহ অনিশ্চিত, তাদের বিবাহ হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে। বিবাহ না হ'লে তাদের কি দশা হবে, এই দারুণ চিন্তায় তারাও কাতর হয়ে পড়েছে। যাদের সুযোগ আছে, তারা কলেজে ঢুকছে। তারাও ভাবছে, পরে কি হবে।

শ্রীমতী দীপ্তি কলেজে পড়ে। মুখে, চোখে, কথায় দীপ্তিই বটে। কিন্তু যখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কথা উঠে, তখনই তার দীপ্তি ম্লান হয়। সে বলে, "পাস হ'তেই হবে, একটা আশ্রয় করে' রাখতে হবে।"

শ্রীমতী কান্তি বি-এ পড়ে। সে স্বভাবতঃ গম্ভীর। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি তোমার নিজের ইচ্ছায় পড়ছ, না বাবার ইচ্ছায়?"

"বাবা কিছু বলেন নাই। আমি নিজের ইচ্ছায় পড়ছি।"

"কেন ইচ্ছা হ'ল?"

"একটা ত কিছু করতে হবে।"

অর্থাৎ, পরে কি হবে, কে জানে।

শ্রীমতী দীপ্তি ও কান্তির রূপ আছে, রূপেয়াও আছে, তথাপি ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কেহ কেহ ধরে' নিয়েছে, চাকরি করতেই হবে। শ্রীমতী চিত্রাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি বি-এ পড়ছ কেন?"

"বিদ্বান্ হ'তে হবে।"

"তার পর?"

"ভবিতব্যে যা আছে, হবে।"

অর্থাৎ, পরে সে শিক্ষিকা হ'তে পারবে।

অল্পকাল পূর্বেও কুমারীরা শিব-পূজা করত। এখনও কেহ কেহ করে। তারা চায় মহেশ্বরের তুল্য ঐশ্বর্যশালী স্বামী, আর উমার তুল্য স্বামী-সৌভাগ্য। এইরূপে উমা-মহেশ্বর প্রতিমা কল্পিত হয়েছিল। এখন সব অনিশ্চিত।

কোন কোন কন্যা নিজের বিবাহের পথ নিজেই পরিষ্কার করে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এক কন্যা কলেজে চতুর্থ বর্ষে পড়ত। মাঝে মাঝে আমার কাছে আসত, এটা ওটা জিজ্ঞাসা করত। বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেল। সে একদিন ভাগবত পুরাণের বঙ্গানুবাদ নিয়ে গেল। মাস দুই পরে এসে বলছে—"দাদু, আমি পুরাণ-পরীক্ষায় পাস হয়েছি, 'ভারতী' উপাধি পেয়েছি।"

"বেশ, এখন তোমার নাম লেখ, শ্রীমতী কাদম্বিনী ভারতী।"

"আমার লজ্জা করে।"

"তবে উপাধির লোভ কেন?"

"একটা রইল।"

সে বি-এ পাস হ'ল। দু-এক দিন যেতে না যেতে এসে বলছে, "দাদু, আমরা একটা মাসিক-পত্র বার করব। আপনি একটা নাম বলে' দিন।"

"তোমরা কারা?"

"আমাদের কমিটি আছে, তারা মহিলা, আপনি চিনবেন না। আমি সম্পাদিকা হব।"

"তোমায় এ বায়ু রোগে কেন ধরল? রোগটি দুশ্চিকিৎস্য। এই রোগে ধরলে রোগী মনে করে, সে অতিশয় বিদ্বান্ ও বিজ্ঞ, তার লেখকদের রচনা বিচার করবার ক্ষমতা আছে, তার নাম ও প্রতিপত্তি আছে। উত্তম লেখকেরা তার কাগজে লিখবে, আর শত শত পাঠক উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়বে। তুমি সম্পাদিকা, তোমার এ সব আছে কি? এই বাঁকুড়ায় কত কাগজ এল, গেল। তুমি মনে করছ, তোমার কাগজের সে দশা হবে না?"

"জলে না নামলে সাঁতার শিখব কেমন করে'?"

"দেখছি, রোগটি পেকে দাঁড়িয়েছে। আমি নাম টাম বলতে পারব না।"

"আপনি না পারলে কে পারবে?"

"আমি কি জানি?"

"আপনি না জানলে কে জানবে?"

শ্রীমতী কাদম্বিনীর এই অসামান্য যুক্তিজাল ছিঁড়তে

পারলাম না। তার জলবিম্ব কাগজের নাম দিতে হ'ল। আর প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য দুটি ছোট ছোট প্রবন্ধও লিখতে হ'ল।

তৃতীয় মাসে আর এল না। তাঁর জলবিম্ব মিলিয়ে গেল। শুনলাম, এম্-এ পড়তে কলিকাতা গেছে। দু-বৎসর পরে এম্-এ পরীক্ষা দিয়েই এসেছে। কাঁদ. কাঁদ. স্বরে বলছে, "দাদু, আমি ভাল লিখতে পারি নি। যদি ফেল হই, কি হবে ?"

"সর্বনাশ! করেছ কি? পৃথিবীর ঘূর্ণন রুদ্ধ হবে, দিবারাত্রির বিচ্ছেদ থাকবে না।"

"আমার কি হবে ?"

"তুমি আবার পড়বে। না পার, দাদার কাছে থাকবে। দাদার বড় চাকরি, তিনি তোমায় ভালবাসেন, তোমার বউদিদিও যত্ন করেন।"

"আমি দু-তিন মাসের বেশী থাকতে পারব না।"

"তুমি কি স্বাতন্ত্র্য চাও ?"

চুপ করে' রইল। আমি তখন বুঝলাম, কোথাকার জল কোন্ দিকে গড়াচ্ছে। মাস দুই পরে শুনলাম সে এম্-এ পাস হয়েছে।

অনেক দিন পূর্বে একটা হিন্দী বচন শুনেছিলাম—

পহেলে দর্শন-ধারী। পিছে গুণ বিচারী ॥

আমরা প্রথমে লোকের দর্শন অর্থাৎ আকৃতি বা চেহারা দেখি, পরে তার গুণ বিচার করি। কিন্তু বিধাতা সকলকে সুদর্শন করেন না। পুরাণ-ভারতী হউক, আর মাসিক পত্রের সম্পাদিকা হউক, আর এম্-এ পাসই হউক, বিনা দর্শনে কোন গুণেই ফল হয় না। বিবাহ-ক্ষেত্রে মোটেই না।

এর ৮।৯ মাস পরে দৈবাৎ এক দিন পথে কাদুকে দেখতে পেলাম। এক গা গয়না ঝক্ ঝক্ করছে। প্রথমে আমি তাকে চিনতে পারি নি।

"আমি কাদু।"

"তুমি একেবারে বদলে গেছ।"

সে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে, "আশীর্বাদ করুন, আশীর্বাদ করুন।" উঠে দাঁড়িয়ে "আমি সাত মাস কলিকাতায় ছিলাম, আমার বিয়ে হয়ে গেছে।"

"তুমি চিরায়তি হও।"

আবার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে, "আশীর্বাদ করুন, আশীর্বাদ করুন।"

সকল শ্রীহীনা কুমারীর এইরূপ অধ্যবসায় থাকে না, সুযোগও হয় না, তাদের বিবাহও হয় না।

বিবাহেচ্ছার কাল আছে। নারীর পনর হ'তে কুড়ি বৎসর, নরের কুড়ি হ'তে পঁচিশ বৎসর বলা যেতে পারে। এই এই বয়সেই তাদের চিত্তে বসন্তের হিল্লোল বইতে থাকে। তখন যা দেখে, সব সুন্দর। যদি সন্ন্যাসী হয়, ত এই সময়। আর, যদি প্রাণ দিতে হয়, তা-ও এই সময়। কারও এই বয়স এগিয়ে যায়, কারও পেছিয়ে পড়ে। কেহ অকাল-পক্ক হয়, কেহ কালাপক্ক থাকে।

এখন সকল কন্যার বিবাহ হচ্ছে না, সমাজের এক নূতন দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়েছে। কোন কোন কন্যাও বিবাহ করতে চায় না। কিন্তু যখনই এ কথা শুনি, তখনই বুঝি সে প্রকৃতিস্থ নয়।

আমরা মানব জাতিকে নর ও নারী, এই দুই ভাগ করি। কিন্তু অনেক নর নারীভাবাপন্ন, তারা কা-নর। তারা যৌবনেও বিবাহের জন্য ব্যগ্র হয় না। তেমনই, কোন কোন নারী নরভাবাপন্ন, তারা কা-নারী। তারা সাহসী হয়, পুরুষোচিত কাজ করতে ধাবিত হয়। কখনও উত্তেজনা-বশে স্বাভাবিক নারী-প্রকৃতির বিপরীত কাজ করে, এরা বিবাহ করতে চায় না।

আর, কোন কোন কুমারী নৈরাশ্যে, দুঃখে কিম্বা ভয়ে বিবাহ হ'তে দূরে থাকতে চায়। এই অনিচ্ছা সাময়িক বলতে পারা যায়। পরে নারী-প্রকৃতির জয় হয়, সুবিধা হ'লেই তারা বিবাহ করে।

নৈরাশ্যের দুই কারণ আছে। (১) কুমারী যাকে চায়, তাকে পাবার সম্ভাবনা নাই। (২) যেমন ঘরের যেমন বর চায়, তেমন পাবার সম্ভাবনা নাই।

দুঃখের দুই কারণ। (১) কন্যার মা নাই, ছোট ভাই-বোন আছে। পিতাকে তাদের দেখাশুনার কষ্ট দিতে চায় না। নিজে বিয়ে না করে' তা'দিকে পালন করতে চায়। (২) কন্যা বিবাহের খরচ দেখছে; শুনছে, কোন কোন পিতা সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। সে পিতাকে সে দশায় ফেলতে চায় না।

ভয়ের নানাবিধ কারণ আছে। (১) কুমারী দেখেছে, তার পরিচিত এক নারীর স্বামী কু-সঙ্গে পড়ে' দুশ্চরিত্র হয়েছে, তাকে যন্ত্রণা দেয়। তখন সে ভাবে, "না বাপু, বিয়েতে কাজ নাই, আমি বেশ আছি।" (২) কখনও দেখে, তার পরিচিত এক অল্পবয়সী কন্যা বিবাহের কিছুদিন পরেই বিধবা হয়েছে। সে বিধবার দুঃখ দেখে, নিজে অনুভব করে। সে দশা তারও হ'তে পারে, সে অনিশ্চিতে ঝাঁপ দিতে ডরায়। (৩) দেখেছে বিবাহের পরেই কন্যা কোনও গুরুতর শোক পেয়েছে। বিবাহের সঙ্গে শোকের কারণ জড়িয়ে রাখে, বিয়ে করতে ভয় পায়। আমি দুটি উদাহরণ দিচ্ছি—

১। এগার বৎসর হ'ল শ্রীমতী প্রীতি এখানকার কলেজে

পড়ত। সে একটা সূত্র ধরে' আমাকে 'দাদু'-পদে প্রতিষ্ঠিত করলে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি তার সঙ্গিনীদেরও দাদু হয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে তিন-চারিজন আসত, একথা সেকথা হ'ত, চলে' যেত। কুমারীদের বয়স যতই হউক, আমি কারও সাথে বিবাহ-প্রসঙ্গ করি না।

একদিন তারা বললে, তারা এক তরুণী-সঙ্ঘ করেছে। শনিবারে শনিবারে তাদের সঙ্ঘ বসে। নানা বিষয় আলোচনা করে, গান-বাজনাও করে। সেখানে পুরুষ-প্রবেশ নিষিদ্ধ।

তাদের মধ্যে চারিজন কলেজে পড়ত। একজন বোধ হয়, এম-এ পাস। আমি তাকে দেখিনি। অপর সভ্যারা অল্প-স্বল্প ইংরেজী জানত, আর বাংলা গল্প উপন্যাসের শ্রাদ্ধ করত। সঙ্ঘের প্রতিজ্ঞা, বিয়ে করবে না। তাদের মধ্যে দু-তিন জন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। দেশে এত দুঃখ-দুর্দশা দেখতে পাচ্ছে, আর তারা বিয়ে করে' ঘরের বউ হয়ে থাকবে ?

সেই সময়ে (১৯৪৩ ?) জাপানীরা কলিকাতায় বোমা ফেলছিল। কলিকাতাবাসী সন্ত্রস্ত হয়ে যে যেখানে পারে পালিয়ে যাচ্ছিল। জাপানীরা এল বলে। লাটসাহেবের হুকুমে নোয়াখালির শত শত নৌকা জলে ডুবল, চাউলের হাজার হাজার বস্তা নদীগর্ভে ফেলা হ'ল। জাপানীরা এলে যাতায়াতের নৌকা পাবে না, খেতেও পাবে না। দেশময় সন্ত্রাস। আমরা বাঁকুড়ায় ভাবতাম ; জাপানীরা রাণীগঞ্জের লোহার কারখানা দখল করবে, আর নিশ্চয় এই পথ দিয়ে জামসেদপুর যাবে। জাপানী সৈন্যেরা নৃশংস, দুরাচার। পথে যে-কেহ, যুবতীর কথাই নাই, বৃদ্ধ বা শিশু পড়বে, তাদের হাতে কারও রক্ষা হবে না। এক দিন প্রীতি ও তার তিন-চারিজন মিতিন এসে বললে, "দাদু, শুনছেন দেশের অবস্থা ? পুরুষেরা যে যেখানে পারে পালাবে, কে আমাদিকে রক্ষা করবে ? আপনারা আসবেন না, নিশ্চয়। আমরা নিজেরা নিজদিকে রক্ষা করবার উপায় ভাবছি। ছোরা-খেলা শিখছি। তীর-ধনুক শেখাবার লোক পাচ্ছি না।" আমি নিস্তব্ধ, নিরুত্তর। কিন্তু তাদের এই সঙ্কল্প শুনে মনে মনে তাদের প্রশংসা করতে লাগলাম। বোধ হয় সে সময়ে কলিকাতায় ও অপর স্থানে "মহিলা-আত্মরক্ষা-সমিতি" হয়েছিল। তরুণীসঙ্ঘও সেইরূপ সমিতি করেছিল। এখন মহিলা-আত্মরক্ষা-সমিতির দুর্নাম হয়েছে, তারা কম্যুনিষ্ট, কিন্তু আরম্ভে এ ভাব ছিল না।

এক দিন প্রীতি ও তার মিতিনরা এসে একখানা মাসিকপত্র দিয়ে বললে, "দাদু, আশীর্বাদ করুন।"

ছাপাখানা হ'তে কাগজটা ছাপা হয়ে এসেছে। তারপর আর যা কিছু কাজ, তারা নিজেরাই করেছে। আমি আদ্যোপান্ত পড়লাম। আর আশ্চর্য হয়ে গেলাম, কাগজে একটি ভুল নাই। অর্থনীতির আলোচনা হয়েছে, দেশের দুঃখ-দুর্দশাও সুন্দর ভাষায় লেখা হয়েছে। একটা উপন্যাস আরম্ভ হয়েছে, সুন্দর কবিতাও আছে। কলেজে তিনজন অর্থনীতির বই পড়ত, তাদের পত্রে তারই কাঁচা আলোচনা থাকত। একজন লিখেছে, "আমাদের অন্যের ভরসা করা চলবে না, নিজেদিকে দেখে শুনে নিতে হবে।" উপন্যাসে দেখলাম, এক ধনীর দুলালী এক দেশ-সেবক দরিদ্র যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সব রচনাই নারীর। এখানেও পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

তরুণ-তরুণীরা কবিতা ও গল্পে আপনাদিকে প্রকাশ করে। তারা যা চায়, সেটা বেরিয়ে পড়ে। আমি বুঝলাম এদের এত আস্ফালন, সেটা সাময়িক। যৌবনের চাঞ্চল্য, কিছু করতে চায়।

আর এক দিন তারা চারিজন এসেছে। তাদের মধ্যে যে 'দেখে শুনে নিতে' চায়, সে আসে নাই।

"সে তেজস্বিনী আজ আসে নাই ?"

"তার বিয়ে হয়ে গেছে।"

"বাঁচা গেল। এখন দিন-রাত দেখে-শুনে নিক।"

তারা হেসে উঠল।

কিছুদিন পরে এক দিন সন্ধ্যাবেলা এক চাকর-সঙ্গে তাদের একজন এল। সে কলেজে চতুর্থ বর্ষে পড়ত। সে কবি, 'তৃষিত হাসনা-হানার গন্ধে' লিখত। আমি বাইরে একটা বেঞ্চিতে বসেছিলাম। সে পাশে বসে' বললে, "দাদু, আমি শুনেছি, আপনি জ্যোতিষ জানেন, আমার হাতটা দেখুন।"

হাত বাড়িয়ে দিলে। আমি বুঝলাম, সে কি জানতে চায়। সে বিষয় নিয়ে হাসি-খেলা উচিত নয়।

"হাত-গণা, কোষ্ঠী-গণায় তোমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে ? যদি থাকে, তাহ'লে এও বিশ্বাস করতে হবে, তোমার জন্ম-কালেই তোমার যাবজ্জীবনের দশা নিরূপিত হয়ে গেছে। কারও সাধ্য নাই, তার অন্যথা করে। যদি সুখ থাকে, সুখ আসবেই। যদি দুঃখ থাকে, দুঃখ আসবেই। যখন দুঃখের প্রতিকার নাই, তখন আগে হ'তে সেটা জেনে দুঃখ বাড়িয়ে ফল কি ?"

সে বিষণ্ণ-মুখে চলে' গেল।

কিছুদিন পরে তার বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেল। সে অন্য স্থানে চলে' গেল। সে পাস হ'ল। আর শুনলাম তার বিয়েও হয়ে গেছে।

তরুণী-সঙ্ঘের ছুটি খসল। এম-এ পাস মেয়েটির অভিভাবক বদলি হয়ে গেলেন, সেও গেল। এক বৎসর

পরে তার বিবাহে নিমন্ত্রণ-পত্র পেলাম। যে তাদের কাগজে উপন্যাস লিখছিল সে ধনীর দুলালী, নিকটের এক যুবকের সহিত বিবাহপাশে বদ্ধ হ'ল। সে একেই চেয়েছিল।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সঙ্ঘ ভেঙে গেল। তাদের মাসিকপত্রও তিন সংখ্যার পর অদৃশ্য হ'ল। দু'জন অচল-অটল। দেখতে সুশ্রী, অক্লেশে বিয়ে হতে পারত। কিন্তু তারা দেশসেবা ছাড়তে পারবে না। আর যে কিছু করত না, তাও নয়। সে বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় এখানে তিন-চারি জায়গায় অন্নসত্র খোলা হয়েছিল। তারা এক সত্র চালাবার ভার নিয়েছিল। তাদের কড়া নজরে একটি দানাও চুরি হয় নাই। আর একবার জল-ঝড়ে অনেক দরিদ্র লোকের চাল উড়ে গেছল। ছেলেপিলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে, স্থান ছিল না। কেউ দেখে না। এরা এক দিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যেয়ে তাদের দুঃখের কথা জানিয়ে প্রায় হাজার দুই টাকা মঞ্জুর করিয়ে আনলে। এই রকম কাজ করত, আর কাজের অভাব হ'লেই ছট্‌ফট্‌ করত। আমি সব জানতাম না, তারা আমার কাছে আসত না।

এক দিন কি উপলক্ষ্যে শ্রীমতী প্রীতি সকালবেলা আমার কাছে এসেছিল। একটা খবরের কাগজ পড়তে লাগল। আমি একটু দূরে কি কাজ করছিলাম। পড়তে পড়তে সে বললে, "দাদু, Love marriage is never happy." (প্রেম-বিবাহ কখনও সুখের হয় না)।

"তোমার সে চিন্তা কেন ?"

"না দাদু, আমি পাঁচ-ছ'টা কেস্ (case) জানি। প্রথম প্রথম বেশ ছিল, তারপর খিটিমিটি। তারপর এমন দাঁড়িয়েছে, কেউ কারও মুখ দেখে না।"

তার কথায় বুঝলাম, সে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু ঠিক করতে পারছে না। ইতিমধ্যে অপরটি খসে' ছিল। আরও মাস কতক পরে শ্রীমতী প্রীতিও খসল। বোধ হয়, ভয় বিবাহে দ্বেষ-ভাবের গূঢ় কারণ, উত্তেজনা একটা কাল্পনিক আবরণ। তারা সময়ে বিয়ে করে'ও দেশসেবা করতে পারত।

২। কন্যাটি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে এম-এ পাস, এক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। বয়স হয়েছে, বিবাহ হয় নাই। শুনলাম সে মাতা আনন্দময়ীর শিষ্যা হয়েছে, সন্ন্যাসিনীর মত দিন কাটাচ্ছে। এক দিন যেয়ে দেখলাম, সরু নরুনপেড়ে ধুতী পরে আছে। মাথার চুল রুক্ষ, পিঠে এলিয়ে পড়েছে। মুখ নিষ্প্রভ। সে 'রাজাবাস' পরলে তাকে যোগিনী মনে হ'ত। আমি একবার তাকে হাসাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেছল। কন্যার রূপ ছিল না, বরং মনে হ'ত পুরুষের মুখ। এক দিন শুনলাম, গোপনে তার বিয়ে হয়ে গেছে। বর ও কন্যার পিতামাতা এ সংবাদ শুনে মর্মাহত হ'লেন। প্রেম-বিবাহে যোগ্যাযোগ্য বিচারের ধৈর্য থাকে না, উত্তমের সহিত অধমের মিলন প্রায়ই ঘটে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। বিবাহের বৎসর দেড়েক পরে আমি তাকে দেখতে গেছলাম। তখন সে রঙ্গিন শাড়ী ও হাতে দু-একখানা গয়না পরেছিল। আমি গেলে তার মুখে হাসিও ফুটে উঠেছিল।

"দেখ, তুমি প্রত্নতত্ত্বান্বেষণে এত রত ছিলে, সে প্রবৃত্তি কোথায় গেল ?"

নিকটে একটি ছোট খাটে এক শিশু শুয়ে ছিল। সে তাকে দেখিয়ে দিলে। সে পুনঃ পুনঃ শিশুর প্রতি অনিমেষ দৃষ্টিতে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, উত্তর দিলে না।

বিবাহের সময় তার বয়স ৩৬ বৎসর। তার পিতা নির্ধন ছিলেন না, অনেকবার জেদ করেছিলেন, কিন্তু কন্যা বিবাহে সম্মত হয় নাই। বোধ হয়, সে যেমন বর ইচ্ছা করেছিল, তেমন পাবার আশা ছিল না ভেবে সন্ন্যাসিনী হ'তে গেছল। দু-তিন বৎসর হ'ল সে পরলোকে গেছে।

গান্ধর্ব-বিবাহ ও প্রেম-বিবাহ এক নয়। গান্ধর্ব-বিবাহে গুরুজনেরা বর-কন্যা বাছেন না, তারা নিজেরাই বাছে। অন্য বিষয়ে অপর বিবাহের তুল্য। সবর্ণে বিবাহ, কদাচিৎ অনুলোম বিবাহ হ'ত। বর অবশ্য দেখে কন্যা তার পিতার সাত পুরুষের ও মাতার পাঁচ পুরুষের মধ্যে না হয়। ইহা বৈজ্ঞানিক বিধি। প্রায় ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এই বিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রেম-বিবাহে জাতিকুলের বিচার থাকে না।

এই রকম আরও শুনেছি। দুটি উচ্চশিক্ষিতার কথা মনে পড়ছে। দু-জনেই দেশপ্রেমী, দু-জনেই দেশহিতব্রত গ্রহণ করেছিল, নিজেদের সুখ চিন্তা করে নাই। কিন্তু ৩৬।৩৭ বৎসর বয়সে বিবাহ করে' ঘরকন্না করছে।

কোন কারণে বিবাহ না হলে সকল কন্যারই শূন্য হৃদয় হাহাকার করতে থাকে। বালবিধবাদেরও সেই দুঃখ, যে দুঃখ দেখে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় কেঁদে উঠেছিল। কেহ কেহ মনে করেন, প্রেম-বিবাহ প্রচলিত হলে বিবাহ-সমস্যার পূরণ হবে। তাঁরা ভ্রান্ত। পশ্চিমদেশে প্রেম-বিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু অসংখ্য বৃদ্ধা কুমারীও আছে।

শিক্ষিত বংশের ও নগরবাসীর কন্যাদের বিবাহ-চিন্তা করছি। তাদেরই বিবাহ এক সমস্যার মধ্যে দাঁড়িয়েছে।

অশিক্ষিত কিম্বা গ্রামবাসীদের মধ্যে এ সমস্যা নাই। মেয়ে গোরা কি কালো, সে চিন্তাও তত প্রবল নয়। কন্যাদের বিবাহ কেন দুর্ঘট হয়েছে? এর তিন কারণ দেখতে পাওয়া যায়। ১। যুবকদের মনোভাবের পরিবর্তন। তারা আত্মম্ভরি হয়েছে।

২। ভয়। "যাকে বিয়ে করব, সে কেমন হবে, কে জানে?"

৩। দেশের দারিদ্র্য। যুবকদের বিবাহের একটা বয়স আছে। সে বয়স পেরিয়ে গেলে সে বিবাহের জমা-খরচ কষতে বসে। ভাবে, একটি পরের মেয়ের অশন-বসন-ভূষণ-প্রসাধন যোগাতে পারলেও তাকেই তার পুত্রকন্যাদের লালন-পালন করতে হবে। আজ ভুতোর জ্বর, কাল ছেনীর কাসি, ডাক্তারের বাড়ী ছুটাছুটি। সে যে কি খরচ আর কি উদ্বেগ! বাবা! আমি একা মানুষ, এত পেরে উঠব কি করে'? বেশ আছি। সকালে চা খাই, খবরের কাগজ পড়ি, দশটার সময় হোটেলে খাই, আপিসে যাই, ৪টার সময় ফিরি, বন্ধুরা আসে, চা পান করি, সকলে মিলে সিনেমা দেখতে যাই। আবার হোটেলে খেয়ে বাড়ী ফিরি। আর, সিনেমা-নক্ষত্রদের রূপ ধ্যান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ি। বেশ আছি, নির্ঝঞ্ঝাট। ছুটি পেলে যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে' যাচ্ছি, কেউ পেছু ডাকে না। এই তো স্বাধীনতা।

কিন্তু বছর দশ পরে এই নিঃসঙ্গ-দশা ভাল লাগে না। তখন সে এক সঙ্গিনী খোজে। আপিস হ'তে ফিরে এসে সে এমন একজনের অভাব বোধ করে, যাকে নিয়ে তার শূন্য গৃহ পূর্ণ করতে পারে। ৩৫।৩৬ বৎসর বয়স হ'লে বিয়ে না করে' থাক্‌তে পারে না। যেমনই হউক, নিজের একটি বাসায় কপোত-কপোতীর ন্যায় সুখে-শান্তিতে কাল কাটাতে চায়।

২। কেহ কেহ দেখে, বিবাহ করা আর অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া একই কথা। তিনি যে কেমন হবেন, কিছুই জানা নাই। সকল নারীই সুশীলা নয়, সকল নারীই পতিগতপ্রাণা নয়। সংস্কৃতে একটা বচন আছে, "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।" স্ত্রীর চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্য, দেবতারা জানেন না, মানুষের কথা কি। এই দেখ না মিহিরের কি দশা হয়েছে। স্ত্রীটি রত্নই বটে, দিন রাত মানেই বসে' থাকেন। বুঝতে হবে, তিনি কি চান। মিহির বেচারী কতই বা মান ভাঙ্গাবে? তার দশা দেখে কান্না পায়। আমি বিহঙ্গম, উড়ে বেড়াই, আর, সে পিঞ্জরের পাখী। আরও দেখছি, কত পরিবারে খিটিমিটি লেগেই আছে। যেখানে এত অনিশ্চিত, সেখানে কেন যাই?

সত্য বটে, বিবাহরূপ ব্যাপারে অনেক অনিশ্চিত থাকে। তথাপি লোকে বিবাহ করে, অধিকাংশ লোক সুখে-শান্তিতে জীবন কাটায়। আমাদের জীবনের পদে পদেই অনিশ্চিত। কাল কি ঘটবে, কেউ জানে না। কিন্তু সর্বদা কি ঘটে, সেই দেখেই আমরা জীব-যাত্রা নির্বাহ করি। ভবিষ্যতে কি ঘটবে, তা জানবার জন্য পূর্বকালে লোকে ব্যাকুল হ'ত, এখনও হয়। এই কারণেই লোকে বরকন্যার কোষ্ঠী নিয়ে দৈবজ্ঞের বাড়ী যায়। কিন্তু গণনার ফল মেলে না, এই কারণেই বিবাহের পূর্বে বর-কন্যা বাছাই করে। প্রেম-বিবাহের দোষই এই, সেখানে বাছাই নাই, সমস্তই অন্ধকার। অতি অল্প লোকে, যারা দুর্বল-দেহ ও দুর্বল-চিত্ত, তারাই ভবিষ্যতের ভয় করে। যৌবনে সাহস বাড়ে। ভবিষ্যতের ভয় সাময়িক দুর্বলতা। সুবিধা হ'লেই তারা বিবাহ করে।

৩। দেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যই কন্যাদের বিবাহের প্রধান অন্তরায় হয়েছে। যে আপনাকে ভরণ-পোষণ করতে পারে না, সে আর একটির ভার কেমনে নিবে? যারা ধনবান, তাদের কন্যাদের বিবাহ আটকাচ্ছে না। আর, যারা কায়িক পরিশ্রম করে' জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তাদেরও বিবাহ-আটকাচ্ছে না। যে মধ্য-শ্রেণী সমাজের মেরুদণ্ড হয়েছিল, তাদের দুর্দশার সীমা নাই। আর, তাদেরই কন্যাদের বিবাহ দুর্ঘট হয়ে পড়েছে। সেইরূপ, মধ্য শ্রেণীর যুবকেরাও অন্নবস্ত্রের চিন্তায় কাতর হয়েছে, বিবাহ-চিন্তা করতে পারে না।

যাদের সঙ্গে যে মেশে, তারাই তার সমাজ। প্রত্যেকের সমাজের জীবনোপায়ের মানদণ্ড পৃথক্‌। কেহ সে মান-দণ্ডের বাইরে যেতে পারে না। আমরা প্রাণের চেয়ে মানের মূল্য বেশী ধরি। তার সাক্ষী, প্রসিদ্ধ ডাক্তার যা উপার্জন করেন, উকীল, ব্যারিষ্টার তার বহু গুণ অধিক করেন। সে অর্থনীতিবিদ্‌ অতিশয় নিষ্ঠুর, যিনি বলেন, তুমি রিক্‌শা টান, প্রত্যহ ছ-সাত টাকা পাবে। তিনি টাকাই দেখেন, মানুষের মন নামে যে একটা পদার্থ আছে, তা তাঁর স্মরণ হয় না। তাঁরা হিসাব করেন, আমাদের দেশে এত লোক মেলেরিয়াতে ভুগে, তারা এত দিন কর্ম করতে পারে না, দেশে বৎসরে বৎসরে এত টাকা লোকসান হচ্ছে। তাঁদের কাছে শারীরিক ও মানসিক দুঃখভোগ কিছু নয়, টাকার হিসাবই বড়। তাঁরাই বলবেন, "বাপু, তুমি বিবাহ করো না।" কিন্তু যদি যুবকেরা বিবাহ না করে, কন্যারা কোথায় যাবে? সমাজ কেমনে টিকবে?

অধিকাংশ যুবক নিজের সামাজিক মানদণ্ড অতিশয় দীর্ঘ করে। কলিকাতায় একখানি বাড়ী, পাঁচ হাজার টাকার একটা মোটর, আর মাসিক বাঁধা আয় পাঁচ-শ টাকা না থাকলে ভদ্রলোকের মত থাকতে পারা যায় না, বিবাহও করতে পারা যায় না। এই অতিরিক্ত সুখ-ভোগ-স্পৃহা আমাদের দেশের অকল্যাণের মূল হয়েছে। এ স্পৃহা কমাও, আর দেখবে, অনেক যুবক বিবাহ করে' তাদের উপস্থিত আয় দ্বারাই স্বচ্ছন্দে সংসার চালাতে পারছে।

যে রাজ্যে প্রজারা সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে না, সে রাজ্য টিকে না। সে রাজ্যে অন্তঃকোপ হবেই হবে। বিপ্লব তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। বিবাহ একটা দৃঢ় বন্ধন, মানুষকে স্থির রাখে। সমুদ্রে তুফান উঠেছে, তরী টলমল করছে, নাবিক নোঙ্গর ফেলে দেয়, তরী স্থির হয়। নরের নোঙ্গর নারী, নারীর নোঙ্গর নর। নোঙ্গরের রজ্জু উভয়ের প্রেম। প্রেম যত গাঢ় হয়, রজ্জুও তত দৃঢ় হয়, তুফানে ছিঁড়ে না। যাতে নরনারী পরস্পর প্রেমে বদ্ধ থাকে, উদ্‌ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে না বেড়ায়, সেজন্যই বিবাহ মানব-জীবনের একটা বড় সংস্কার বলে' গণ্য হয়েছে। সকলেই জানেন, যে গ্রামে দু-পাঁচটি আইবুড়া ষণ্ডা থাকে, সে গ্রামের গৃহস্থেরা বউ-ঝি নিয়ে সর্বদা সন্ত্রস্থ থাকে। এই উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারেরা আদেশ করেছেন, "তুমি বিবাহ করে' গৃহস্থ হবে, পুত্র উৎপাদন করবে। না করলে তোমার পূর্বপুরুষেরা চিরকাল নরকে পচতে থাকবেন।" ইহার অপেক্ষা গুরুতর শপথ তাঁরা কল্পনা করতে পারেন নাই। পূর্বকালের লোকেরা পিতৃ-পুরুষকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করত। আর যে পিতৃ-পুরুষকে অস্বীকার করে, সে ত পশু।

অতএব, কন্যাদের বিবাহ-চিন্তা মাত্র একটা সামাজিক প্রশ্ন নয়, ইহা রাজনীতির প্রধান সমস্যা। অন্নচিন্তার পর বিবাহচিন্তা, আহার ও বিহার—এই দুই কর্ম জীবকুল বাঁচিয়ে রেখেছে। এই দুই সমস্যা অবহেলা করাতেই দেশে চার্বাকী অর্থাৎ কম্যুনিষ্টের উৎপত্তি হয়েছে। যুবক-যুবতী দেখছে, সম্মুখে অন্ধকার, পশ্চাতে অন্ধকার, চারি পাশেই অন্ধকার। আলো নাই, কি করবে, কোন্ পথে যাবে, ভেবে পাচ্ছে না। "ভোজনং যত্র কুত্রাপি শয়নং হট্টমন্দিরে।" যেখানে পায় সেখানে খায়; যেখানে পায় সেখানেই শোয়। বন্ধন নাই।

যুবকেরা ও বালিকারা ইস্কুল-কলেজে এমন শিক্ষা পায় না, যাতে তারা কল্যাণ-পথ দেখতে পায়। এমন বই পড়ে না যাতে তাদের চিত্তের সাম্য আসতে পারত। পড়ে সংবাদ-পত্র আর গল্প। সংবাদ-পত্রে যা পড়ে, তা হাওয়ায় উড়ে যায়, গল্পে যা পড়ে, তা' মনে দাগ বসায়। গল্প পড়ে' পড়ে' তারা 'কল্পলোকে' বিচরণ করে, যে লোক নিছক মিথ্যা। 'ট্রেনে এক রাত্রি' যেতে যেতে হঠাৎ 'থির বিজুরী' দেখে তারা মনে করে, পৃথিবীতে কেবল বিদ্যুল্লতাই আছে, বজ্র নাই। পুরীর সমুদ্রতটে সৈকত-পুলিনে সাত দিন সকালে সন্ধ্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু 'সাগরিকা'র সন্ধান পায় না।

কুমারী রাত্রে ছাতে শুয়ে আছে, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে' রাজপুত্র এসে তাকে সুবর্ণপুরীতে নিয়ে গেল। সেখানে সূর্যের প্রকাশ দরকার হয় না। হীরা-মাণিকের অগণ্য গাছ আছে, তাতে অজস্র মুক্তা ফলে। এত ফলে যে সকালে দাসীরা ঝেঁটিয়ে সরাতে পারে না। কখনও দেখে, তেপান্তর মাঠ দিয়ে চলেছে, সমুখে, পেছুতে, পাশে লোকালয় নাই। অকস্মাৎ কোথা হ'তে এক মীস কালো দুষমন এসে তার পথ আগলেছে। এমন সময় রাজপুত্র এসে অসি তুলে তাকে ধরাশায়ী করলে। কিন্তু, হায়! রাজপুত্র দূরে থাক, কোটাল-পুত্রেরও দেখা নাই। এই রকমেই তাদের শিক্ষা চলতে থাকে।

উপন্যাস-লেখক বলছেন, আমরা আনন্দ-রস বিতরণ করি, হিতোপদেশ করি না। সে রস গরল কি অমৃত, সে চিন্তা আমাদের নয়।

কারও চিন্তা নয়। কিন্তু আকাশে শোনা যাচ্ছে—"যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে?"

যুবকেরা বলছে, "আমরা রোধিব। চলে' এস, আমরা সব সেঙ্গাৎ, আমাদের দলে ভিড়ে যাও, আমাদের সেঙ্গাৎনী হও।" তখন সব সেঙ্গাৎ ও সেঙ্গাৎনী মিলে সমাজ-দ্রোহী ও রাষ্ট্র-দ্রোহী হয়ে পড়ে। তারা বলে. "যা কিছু আছে, সব ভেঙ্গে ফেল। ভেঙ্গে ফেললেই দেখবে, নন্দন কানন গজিয়ে উঠেছে। সেখানে গাছে গাছে রসাল অমৃত-ফল ধরেছে, গন্ধর্বে গান গায়, অপ্সরা নৃত্য করে।"

সেই কারণেই বলছি, কন্যাদের বিবাহ-সমস্যা কেবল সামাজিক সমস্যা নয়, রাষ্ট্রীয় সমস্যাও বটে। কিন্তু বর্তমান ভারতরাষ্ট্র বলছেন, "আমরা নর-নারীকে সমান মনে করি। সকলকেই শিক্ষা-দীক্ষায় ও রাজকার্যে সমান অধিকার দিয়েছি। তোমরা নিজের নিজের পথ বেছে নাও। কিন্তু বিবাহিতা নারীকে রাজকার্যে নিব না।" শিক্ষিতা নারীকে অন্ন-চিন্তা করতে হচ্ছে। সে রাজসেবা চায়। রাষ্ট্র বলছেন, তুমি বিবাহ না করলে রাজসেবার উপযুক্ত হবে। অর্থাৎ, পাকে-প্রকারে রাষ্ট্র কুমারীদের বিবাহের বিরোধী হয়েছেন। অভাগা দেশে কন্যারা দাসী হচ্ছে, পুত্রদের প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে। পুত্রেরাই খেতে পরতে পায় না, কন্যারা

চাকরিতে ভাগ বসাচ্ছে। নর-নারীর কর্মভেদ উঠে যাচ্ছে। হে দেশ-চিন্তক, আপনি কি ইহাই চান ?

কিন্তু অন্ন-চিন্তাই একমাত্র চিন্তা নয়। কে সংসার-সমুদ্রে কন্যাদের নোঙ্গর হবে ? যে অফুরন্ত প্রেম নিয়ে নারীর জন্ম হয়, যার সন্তান-স্নেহের তুলনা নাই, বিবাহ না হ'লে কেমনে এ সব চরিতার্থ হবে ? অতএব বিবাহের অন্তরায় দূর করতে হবে।

১। (১) কন্যাকে এমন শিক্ষা দাও, যাতে সে কাচ ও কাঞ্চনের মূল্য বুঝতে পারে, বিবিয়ানা শিখবে না, বসন ভূষণের প্রতি আসক্ত হবে না। (২) কন্যাকে ধর্ম-শিক্ষা দাও, যে ধর্ম সদাচার। (৩) কন্যাকে শিক্ষিকা হবার যোগ্য কর। নানা প্রকার শিক্ষিকার প্রয়োজন আছে। যথা —বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করাবে। গীত শিক্ষিকা বালিকাদিকে গান গাইতে শেখাবে। সূচি-কর্ম শিক্ষিকা নানাবিধ সূচিকর্ম শেখাবে। ভোজ্য-শিক্ষিকা আমাদের আবশ্যক ভোজ্য প্রস্তুত করতে শেখাবে, যেমন— ডাইলের বড়ী দেওয়া, নানাবিধ ফলের আচার করা, মোরব্বা করা, মুড়ি ভাজা, মুড়কি করা, অন্ন-ব্যঞ্জন পাক করা, ইত্যাদি। আমি বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠ্য গৃহস্থালী ও রন্ধন-শিক্ষার বই দেখেছি। কিন্তু সে সব ধনবান্ পশ্চিম দেশের। আমাদের দেশে কয়জন পাকা ঘরে থাকে ? অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজ্য প্রস্তুত করবার উপদেশে দেখি, রন্ধনের যুক্তি আছে, অর্থাৎ কি কি উপকরণ কি কি পরিমাণে চাই। কিন্তু এর মধ্যে যে বিজ্ঞান আছে, তার কিছু মাত্র উল্লেখ থাকে না। কন্যা মাটির ঘরে থাকবে, তাকে ঘর নিকাতে হবে। কেন মাটির সঙ্গে গোবর মেশান চাই, তার কোন উল্লেখ থাকে না। কেমন করে' সুদৃশ্য উনান পাততে হয়, যাতে কাঠের অপচয় হবে না, কন্যারা সে শিক্ষা কোথায় পাবে ? কেমন করে' সন্তান-পালন করতে হয় ও মুষ্টিযোগ দ্বারা সামান্য সামান্য রোগের চিকিৎসা করতে হয়, কন্যাকে সে জ্ঞান দিতে হবে।

কন্যারা এইরূপে শিক্ষিতা হ'লে অল্প আয়ের যুবকেরাও অসঙ্কোচে তা'দিকে বিবাহ করতে চাইবে। কালো মেয়ের বিবাহ হয় না, এমন নয়। শীলবতী ও গুণবতী কন্যা চির-কুমারী হয়ে থাকে না। এমন যুবকও আছে, যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী কন্যা কালো হ'লেও পছন্দ করে। প্রয়োজন হ'লে স্ত্রীও অর্থ উপার্জন করতে পারবে। আর, যে সকল কন্যার বিবাহ হবে না, তারাও তাদের ভাই-এর সংসারে বাস করে' নিজের ভরণ-পোষণের উপায় করতে পারবে।

২। আইন দ্বারা বরপণ ও কন্যাপণ নিবিদ্ধ করতে হবে। এই দুই পণ বরের ও কন্যার পিতা খরচ করেন, কন্যা পায় না। এই সেদিন বিহার রাজ্যে বরপণ নিষিদ্ধ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই বা হবে না কেন ? বরপণের একটা গুণ আছে, মেয়ে যেমনই হউক, অর্থশালী কন্যার পিতা অক্লেশে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে পারেন। কিন্তু কয়টি কন্যার পিতা অর্থশালী ? আইনে বরপণ ও কন্যা-পণ নিষিদ্ধ হ'লেও গোপনে কিম্বা অন্য প্রকারে বর ও কন্যার পিতা টাকা আদায় করতে পারেন। তথাপি সাধারণের পক্ষে এই নিষেধের ফল ভালই হবে।

৩। বিবাহে ব্যয়বাহুল্য কমাতে হবে। ইহা আইনের কর্ম নয়। সমাজ-হিতৈষী মাত্রেরই চিন্তা করা উচিত যে সমাজের প্রতি তাঁরও কর্তব্য আছে, তিনি সৎ-দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন।

৪। বঙ্গদেশে অসংখ্য জাতির উৎপত্তি হয়েছে। এক ব্রাহ্মণদের মধ্যেই কত জাতি আছে—রাঢ়ী, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্ত্য বৈদিক, দাক্ষিণাত্য বৈদিক, সপ্তশতী, কনৌজ, মধ্যশ্রেণী, উৎকলশ্রেণী, অগ্রদানী, বর্ণ-ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। রাম ও শ্যামের কন্যার আদান-প্রদান হ'তে পারলে তারা এক জাতি, অন্যথা নয়। এক্ষণে আহারে জাতিভেদ উঠে যাচ্ছে, কিন্তু বিবাহে জাতিভেদ এখনও অটুট আছে। পূর্ব কালের মত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, এই চারি বর্ণে বর্তমান হিন্দু সমাজকে বিভক্ত করলে কোনও দোষ হয় না। হিন্দু শাস্ত্র বলেন, সবর্ণে বিবাহ ভাল। কিন্তু বলেন না, এক এক বর্ণের অসংখ্য জাতি ও উপজাতির মধ্যে বিবাহ অকল্যাণ-কর। আর, দেখাও যাচ্ছে, বিবাহে উপজাতিভেদ ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে আসছে। কন্যার পিতার একটু সাহস হ'লেই তিনি অনেক যোগ্য বর খুঁজে পাবেন।

শাস্ত্রকার সবর্ণে বিবাহ কেন শ্রেষ্ঠ বলেছেন, একটু অনু-ধাবন করলেই বুঝতে পারা যায়। এক এক বর্ণের বিশেষ বিশেষ গুণ ও কর্ম লক্ষ্য হয়েছিল। এখন দেখা যায়, সকল বর্ণের গুণ ও কর্ম এক হয়ে গেছে। আকারে, বর্ণে, আচারে ও শিক্ষায়, চতুর্বর্ণ পৃথক করতে পারা যায় না। এরূপ স্থলে পূর্বকালের বর্ণভেদের সার্থকতাও নাই। অবশ্য সামাজিক ব্যবধান চিরকাল থাকবে। মুসলমানদের মধ্যে জাতি-ভেদ নাই। কিন্তু বিবাহে সামাজিক ভেদ আছে। পশ্চিম দেশেও এই ভেদ আছে। মোট কথা, সমান ঘর ও যোগ্য বর পেলেই কন্যার বিবাহ চলতে পারবে এবং আজ না চলুক, দু-দিন পরে চলবেই চলবে। (যিনি আমাদের বিবাহের মূল তত্ত্ব জানতে চান, তিনি পড়তে পারেন, *"The Eugenics of Hindu Marriage" in Ancient Indian Life* by J. C. Ray. Sen, Ray & Co, College Square, Calcutta.)

৫। কখনও কখনও দেখা যায় কন্যার পিতার কিম্বা ভ্রাতার অবহেলা বা অবিবেচনাহেতু তার বিবাহ হয় না। আমি দুটি উদাহরণ দিচ্ছি।

(১) কন্যা রূপবতী, শীলবতী, এম-এ, বি-টি পাস। কুলীন বংশ, পিতামাতা নাই। ভাইরা কুলরক্ষার নিমিত্ত অযোগ্য পাত্রের সহিত তার বিবাহ-সম্বন্ধ করছে। কন্যা তেমন পাত্র কিছুতেই চায় না। মৌলিক কুলে যোগ্য পাত্র পাওয়া যেত, কন্যার আপত্তি হ'ত না। কিন্তু ভাইদের অবিবেচনাহেতু কন্যা তার অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিয়ে মর্মান্তিক দুঃখ ভোগ করছে। আমি তার এক মিতিনের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনেছি। কন্যাটি কায়স্থ।

(২) কন্যা এম-এ পাস। কায়স্থ। তেমন রূপ নাই বটে, কিন্তু কুশ্রী নয়। মা নাই, পিতা ধনাঢ্য। তিনি কন্যার বিবাহে উদাসীন ছিলেন। তিনি মারা গেছেন, ভাইরাও উদাসীন। অল্পদিন হ'ল এক রেল-ষ্টেশনের বিশ্রাম-গৃহে তার এক মিতিনের ছোট বোন কথায় কথায় বলে' ফেলছিল, "তোমার এখনও বিয়ে হয় নাই?" আর, সেই অনূঢ়া ধৈর্য ধরতে পারে নাই। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আধ ঘণ্টা কেঁদেছিল। সেই ছোট বোনের ভগ্নীপতির মুখে আমি এ কথা শুনেছি।

এই দুজনের মা থাকলে তাদের এ দশা হ'ত না। মা মেয়ের দুঃখ বুঝতে পারেন। ২০।২৫ বৎসরের আইবুড়া মেয়ে থাকলে মায়ের মুখে অন্ন রুচত না। এই রকম আরও কত মেয়ে আছে। ২০।২৫ বৎসরেরও বেশী বয়স হয়েছে, বিবাহ হয় নাই। কন্যাদের এই দুরবস্থা দূর করতে হবে। মনু আদেশ করেছেন, এরূপ কন্যা নিজে 'সদৃশ' বর গ্রহণ করবে। আইনেও প্রাপ্তবয়স্কা নারী নিজের ইচ্ছামত বিবাহ করতে পারে। মনুর আজ্ঞা বর্তমান লোকাচার-বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু যে সময়ে এই লোকাচারের উৎপত্তি, সে সময়ে কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ হ'ত। আর, সকল কন্যারই হ'ত। তিনি কন্যার ১৫ বৎসর বয়স হ'লে তাকে এই স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আমরা সে স্থলে ২০ বৎসর করতে পারি।

হিন্দু-কোড-বিল।

কয়েক বৎসর হ'ল, ভারত-পরিষদে হিন্দু-কোড-বিল নামে এক আইনের প্রস্তাব হয়েছে। আর সমগ্র হিন্দু সমাজ, আকুমারিকা হিমাচল বিশাল ভারতের অসংখ্য সামাজিক স্তরের চব্বিশ কোটি নরনারী বিক্ষুব্ধ ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। প্রস্তাবের শোধন, সংশোধন ও পরিশোধন হয়েছে, তথাপি তারা এ প্রস্তাব সমাজ-বিপ্লবী মনে করছে। অসংখ্য সভাসমিতি 'ত্রাহি ত্রাহি' করেছে, কিন্তু প্রস্তাব-কর্তারা অটল অচল। অর্থাৎ তাঁরা যেমন জ্ঞানী, ভবিষ্যদ্দর্শী সমাজ-হিতৈষী, তেমন অপর কেহ নয়। কে তারা, যারা এইরূপ আইন চায়? তারা কি হিন্দু? তারা কি পরলোকে বিশ্বাস করে? তারা কি হিন্দুর সংস্কৃতির সমাদর করে?

পতি সৌভাগ্যবতী নারী এই আইন চাইবেন না। যে অভাগী নারী সে সুখে বঞ্চিত, সে-ই এই আইন চাইবে। কিন্তু তার জীবন তিক্ত হয়ে গেছে, সে প্রকৃতিস্থ নাই। হিন্দু-কোড.-বিলের আরম্ভে বলা হয়েছে, The Progressive Elements of the Hindu Society এইরূপ আইন চায়। এই Progressive শব্দটা শুনলেই আমার ভয় হয়। কারণ, এ পর্যন্ত আমি এই শব্দটার বিশদব্যাখ্যা শুনতে পাই নাই। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়েছে, "What is progress, my friend? বন্ধু, আপনি কাকে অগ্রগতি বলেন?" 'প্রগতি' শব্দ পুনঃ পুনঃ শুনতে পাই, কিন্তু কেহ তার অর্থ বুঝিয়ে দেন নাই। "হে প্রগতি-বাদী বন্ধু, আপনার গন্তব্য কি? পথ কি? কোনও দৃষ্টান্ত দিতে পারেন?" উত্তর নাই। কিন্তু বুঝি, তাঁরা পশ্চিম-দেশের অনুকরণ-প্রয়াসী। পশ্চিমদেশ ধনে, মানে, বিদ্যায়, বিজ্ঞানে, রাজনীতি-যুদ্ধনীতি, এই সকল বিষয়ে ভারত অপেক্ষা বড়, কিন্তু সে দেশের নরনারী কি সুখে ও শান্তিতে কালযাপন করছে? বিজ্ঞান তাদের সুখের অসংখ্য উপকরণ জুগিয়েছে, কিন্তু তারা সুখে আছে কি?

এখানে আমি হিন্দু-কোড-বিলের মাত্র তিনটি ধারা সম্বন্ধে কিছু লিখছি।

১। কন্যাকে পুত্র-তুল্য জ্ঞান করে' পিতার সম্পত্তির ভাগ দিবার প্রস্তাব হয়েছে। পণ্ডিতেরা কেমন করে' এ প্রস্তাব করলেন, আমি ভেবে পাই না। এর অন্য কু ফল দূরে থাক, কোনও ভাই আর তার ভগ্নীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা করবে না। কারণ, বিবাহ দিলেই পৈতৃক সম্পত্তির অংশ অন্য কুলে চলে' যাবে। আর, সে সম্পত্তি নিয়ে ভাই-এর সঙ্গে ভগ্নীর মনান্তর ও বিবাদ চলতে থাকবে। একে কন্যাদের বিবাহ দুর্ঘট হয়েছে, তার উপর এই বিধি হ'লে অধিকাংশ কন্যার বিবাহ হবে না। হে বন্ধু, আপনি কি কন্যাদের বিবাহ চান না?

এর পরিবর্তে, যদি এই বিধি হয় যে, অবিবাহিতা ভগ্নী ভ্রাতার সমান ভাগ পাবে, তা হ'লে সে ভগ্নী নিজের অধিকারে পিতৃগৃহে বাস করতে পারবে, কোনও ভ্রাতার অনুগ্রহপ্রার্থী হবে না। কিন্তু তার বিবাহ হয়ে গেলে সে আর সে সম্পত্তি পাবে না, তার স্বামীই তাকে ভরণ-পোষণ করতে থাকবে। স্বামী-স্ত্রীর একই স্বার্থ। স্বামী তার পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করবে, স্ত্রীও করবে।

সাবোটাজ। যশিদির নিকট পাঞ্জাব মেল ধ্বংস

চিত্রে কোচ স্ক্রু ঢিলা করা, ফিসবোল্ট খোলা এবং সরানো রেলের অক্ষত অবস্থা লক্ষণীয়

ঐ লাইনের রেলের বোল্টের বিঁধ অক্ষত। রেল ও স্লিপার অক্ষত

(আনন্দবাজারের সৌজন্যে)

সাবোটাজ। রেললাইনে স্লিপারে ও রেলপথে লাইনচ্যুত করা ইঞ্জিনের আঘাতের ফল। নীচে ইঞ্জিন

(আনন্দবাজারের সৌজন্যে)

উভয়ের সংসার এক। স্বামী ও স্ত্রী স্বতন্ত্র নয়। স্ত্রীর পৃথক সম্পত্তির কোনও প্রয়োজন নাই। সে একেবারে নিঃস্বও নয়, সে বিবাহের সময় যৌতুক পায়, উৎসবে ও পর্বে প্রীতি-উপহার পায়। স্ত্রীকে স্বামীর সম্পত্তির কিছু অংশ দিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু স্বামী বর্তমানে সে ধর্মান্তর ও স্বামী-বিয়োগে ধর্মান্তর কিম্বা পত্যন্তর গ্রহণ করলে শ্বশুর-গৃহের সম্পত্তি হ'তে বঞ্চিত হবে।

২। বিবাহ-বিচ্ছেদ কথাটা শুনলেই প্রকৃত হিন্দু কানে আঙুল দিবেন। বেদের কাল হ'তে অদ্যাবধি কেহ কল্পনাও করে নাই, স্ত্রী স্বামী ত্যাগ করতে পারে। কোন্ কোন্ অবস্থায় স্ত্রী পত্যন্তর গ্রহণ করতে পারে, পরাশর তার বিধি দিয়ে গেছেন। ইহাই যথেষ্ট, দম্পতীর বনিবনাও না হ'লে বর্তমান আইনেই তার প্রতিকার আছে। যে নারী বিবাহ-বিচ্ছেদ খুঁজছে, সে বুঝছে না, সমাজের চক্ষে সে হীন বিবেচিত হবে। কে সে নারীকে বিবাহ করবে? যদি কেহ করে, তখনই সন্দেহ হবে, তাকে পাবার জন্যই সে বিবাহ-বিচ্ছেদ করেছে। বিধবাদের পুনর্বিবাহ হ'তে পারে। কিন্তু কয়জন বিধবার বিবাহ হচ্ছে? পশ্চিম-দেশেও পতিবিচ্ছিন্না নারী ভদ্রসমাজে বাইরে না হউক, মনে মনে হীন বিবেচিত হয়। আমেরিকায় তিনটি বিবাহের একটি ভঙ্গ হয়।

৩। প্রস্তাব হয়েছে, এক পত্নী থাকতে কেহ দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করতে পারবে না। এই বিধি অনাবশ্যক। পূর্বকালেও অতি অল্প লোকের বহু পত্নী থাকত। এখন দেখতে পাওয়া যায় না। অতিশয় ধনবান্ ও বিলাসীরাও দ্বিতীয় দার গ্রহণ করতে ডরায়। এমনও দেখা গেছে, স্ত্রী বন্ধ্যা কিম্বা চিররুগ্না, সে স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করতে জেদ করেছে। সুতরাং এক পত্নী সত্ত্বেও দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণের পথ রোধ করবার আইনের কোনও প্রয়োজন নাই।

হিন্দু-কোড্-বিলের এই তিন ধারাই হিন্দু-সমাজকে ব্যাকুল করে' তুলেছে। কত মহিলা-সমিতি বিরোধী হয়েছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের জজেরা বিরোধী। তথাপি, যদি কেহ চান, তাঁরা প্রগতিসমাজ নাম নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ুন, আমাদের ধীরগতিদের কোনও আপত্তি নাই। ত্রিশ কোটি হিন্দুর দুই-তিন শত চলে' গেলে হিন্দু সমাজের অনিষ্ট হবে না।

কোন কোন ভারতীয় ইয়োরোপীয়দের তুল্য জীবন-যাপন করছে, তারা এক পৃথক সমাজ গড়ে' তুলছে। কেহ কেহ ইয়োরোপ আমেরিকার মেম বিয়ে করে' আনছে। কিন্তু মেমদিকে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী পাঠাতে হচ্ছে। আর পতিবিয়োগে মেমেরা 'ইতঃ নষ্ট স্ততঃ ভ্রষ্টঃ' হয়ে জীবন কাটাচ্ছে। প্রগতিসমাজ এই রকম হবে।

এই ভারতখণ্ডে অসংখ্য জাতি, অসংখ্য আচার, অসংখ্য সামাজিক ব্যবস্থা আছে। এই বহুত্ব হেতু রাষ্ট্রের কি ক্ষতি হয়েছে? আমাদের ধর্ম-ব্যবস্থাপকেরা কাল অনন্ত মনে করতেন। স্বাভাবিকক্রমে ধীরে ধীরে পরিবর্তনে সকলকে উন্নতির পথে যেতে দিতেন। বলপূর্বক অনার্যকে আর্য করতে চান নাই। এই কারণেই হিন্দু-সংস্কৃতি এত দিন টিকে আছে। খ্রীষ্টান মিশনারী আমাদের দেশের কত নিম্ন শ্রেণীর নরনারীকে খ্রীষ্টধর্ম দিয়ে সভ্য' করে তুলছেন। ফলে এই নূতন আলোকে তাদের চরিত্রের অধোগতি হচ্ছে, সভ্যতার যত পাপকর্ম শিখে ফেলছে। কিন্তু

চোরা না শুনয়ে কভু ধর্মের কাহিনী।

যে গতিক দেখা যাচ্ছে, মনে হয়, কালে মনুষ্য-সমাজ মধুমক্ষিকা-সমাজে পরিণত হবে। যে সকল নারীর বিবাহ হবে না, কিম্বা যারা কা-নারী, তারা সমাজের দাসী হয়ে থাকবে। তারা পরের সন্তান পালন করবে, পরের সেবা করবে। কদাচিৎ তাদের পদ-স্খলন হবে। এইরূপে কয়েক পুরুষ যেতে যেতে তাদের বিবাহ-ইচ্ছাই থাকবে না। এইরূপ বহু নরেরও বিবাহ-ইচ্ছা থাকবে না। তখন মনুষ্য-সমাজে পুং-স্ত্রী ব্যতীত নপুংসকের সংখ্যা বেড়ে উঠবে। মনুষ্য জাতি শীঘ্র বিলুপ্ত হবে না। নপুংসকের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রচুর সময় আছে এবং নপুংসকেরা সমাজের দাসরূপে জীবনযাপন করবে। নরনারীর কর্মভেদ অস্বীকার করলেই নপুংসকের সংখ্যাবৃদ্ধির পথ পরিষ্কার হবে।

অজ্ঞাত বিভীষিকা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

জগৎ ভরিয়া আজ ধূমায়িত দারুণ সংশয়,
জমে পুঞ্জীভূত মেঘ মানুষের মনের আকাশে,
সন্দেহ-আকুল চিত্তে সমুজ্জ্বল সূর্য্য নাহি হাসে,
সন্ত্রাসে শিহরে পৃথ্বী—চারি দিকে অজানার ভয়।
সৃষ্টি কি সার্থক হবে? অথবা সে ঘটিবে প্রলয়?
বদ্ধ-পাত্রে কি অনর্থ জালুকের জালে উঠে আসে,
আবরণ-মুক্ত হয়ে কোন্ দৈত্য এল তার পাশে?
ধূম মিল রূপ এ কি ভয়ঙ্কর, দারুণ, দুর্জ্জয়!

বিক্ষুব্ধ অন্তরে কবে প্রশান্তি সে ফিরিবে আবার?
শারদ আকাশ সম মন হবে প্রসন্ন নির্ম্মল,
অজ্ঞাত আশঙ্কা আর রচিবে না ছায়া-অন্ধকার,
মুছে যাবে, ঘুচে যাবে পরস্পর সন্দেহ প্রবল,
মানব করিবে রুদ্ধ দানবের কারাগার-দ্বার,
প্রেমে ও বিশ্বাসে হবে এ জীবন সুন্দর সবল।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-বিভাগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ

"খাদ্য নিয়ন্ত্রণ" বলবৎ রাখার পক্ষে যেমন জনমত আছে ইহার বিপক্ষেও তেমন আছে। দুই পক্ষই নিজেদের মতের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেক পক্ষের যুক্তিই চিন্তাপ্রসূত এবং বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার "খাদ্য নিয়ন্ত্রণের" পক্ষেই যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন যে, খাদ্য সম্বন্ধে দেশ (ভারতবর্ষ) সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত "খাদ্য নিয়ন্ত্রণ" চালু রাখা হইবে। "খাদ্য নিয়ন্ত্রণের" পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও খাদ্য সচিব মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় প্রধানতঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেন :

(১) ১৯৪৮ সালে আসাম, উত্তর প্রদেশ, পূর্ব্ব পঞ্জাব, বোম্বাই এবং অন্যান্য স্থানে "খাদ্য নিয়ন্ত্রণ" তুলিয়া দিবার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আমাদের সর্ব্বাগ্রে মনে রাখিতে হইবে।

(২) দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে না ; এই সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; প্রতি বৎসর পশ্চিমবঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার প্রায় তিন লক্ষ ; ইহা ব্যতীত গত আড়াই বৎসরে ১৪ লক্ষ লোক পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন। সম্প্রতি পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে লোকের আগমন বহুল পরিমাণে বাড়িতেছে।

(৩) বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিবার জন্য ভারত-সরকারের প্রতি বৎসর প্রায় ১৩০ কোটি টাকা খরচ হয় ; এই খরচ নিবারণার্থে ভারত-সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৫১ সালের মধ্যে বিদেশ হইতে খাদ্যের আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে হইবে। সুতরাং দেশের (ভারতের) মধ্যে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয় তাহা সুষ্ঠু ভাবে বণ্টিত না হইলে দেশের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিবে। অথচ উৎপন্ন খাদ্যের সুষ্ঠু বণ্টন একটি জটিল ব্যাপার। কিন্তু সমস্যা যতই জটিল হউক না কেন জনকল্যাণের জন্য আমাদিগকে এ সমস্যার সমাধান করিতেই হইবে।

(৪) সর্ব্ববিধ শরীররক্ষাকারী খাদ্য সম্বন্ধেই আমাদের দেশ পরনির্ভরশীল ; পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অধিকতর মন্দ। বিবিধ খাদ্য সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের ঘাটতির পরিমাণ এইরূপ :

(ক)	ডাল শস্য	—৩৯১০০০ টন
(খ)	চিনি ও গুড়	—৩৩৪০০০ ,,
(গ)	আলু	—১৬৫০০০ ,,
(ঘ)	ফল	—২৬৬০০০ ,,
(ঙ)	দুধ	—১৭৭৬০০০ ,,
(চ)	মাংস, মাছ	—৫৮২০০০ ,,
(ছ)	ডিম	—সাড়ে সাত কোটি
(জ)	ঘি, মাখন, সরিষার তৈল	—৪০৯০০০ টন

বিশেষজ্ঞগণের মতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য প্রতি দিন ১৪ আউন্স (মোটামুটি ৭ ছটাক) তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, অন্যান্য খাদ্যের উপযুক্ত পরিমাণ জোগান হইলেই ১৪ আউন্স চাউলও উপযুক্ত পরিমাণ হইবে। কিন্তু উপরের তালিকা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে ঘাটতি বশতঃ আমরা অন্যান্য খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারি না ; সুতরাং আমাদের অধিকতর পরিমাণ তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হয়। সেই হেতু বিশেষজ্ঞগণের মতে বর্ত্তমান অবস্থায় প্রতি দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জন্য অন্ততঃ ১৫ আউন্সের কিছু অধিক পরিমাণ তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যের দরকার। এই হিসাব অনুসারে পশ্চিম বাংলায় বার্ষিক তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন ৩৮ লক্ষ টন—আড়াই কোটি লোকের জন্য। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় স্বাভাবিক তণ্ডুল জাতীয় শস্যের বার্ষিক উৎপাদন ৩৭ লক্ষ টন ; ইহার মধ্যে বীজ, অপচয় ও ক্ষতি প্রভৃতির জন্য ৩ লক্ষ টন বাদ দেওয়া দরকার। সুতরাং কেবল খাদ্যের জন্য পাওয়া যায় ৩৪ লক্ষ টন। অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাণ ৪ লক্ষ টন। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মাথা পিছু প্রতি দিন ১৪ আউন্স হিসাবে সাড়ে বত্রিশ লক্ষ টনের প্রয়োজন হয় ; সুতরাং এই হিসাবে বাড়তির পরিমাণ দাঁড়ায় দেড় লক্ষ টন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই হিসাব ভুল হইবে।

(৫) দেশে তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যের অভাব আছে—এই মত যাহারা সমর্থন করেন তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, উৎপন্ন খাদ্য যদি সুষ্ঠু ও সমান ভাবে বণ্টন করা না হয় তাহা হইলে জনসাধারণের অধিকাংশের দুঃখ-দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। এই সম্পর্কে ইহাও আমাদের বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার যে, আমাদের দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর ব্যক্তিগণের সমান ক্রয়শক্তি নাই। ১৯৪৩ সালের অবস্থা কি হইয়াছিল তাহা মনে করিলেই বিষয়টি সম্যক্ ভাবে বুঝা যাইবে। কলিকাতার ধনী ব্যক্তিগণ এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠান সমুদয়ের অত্যধিক ক্রয়শক্তির বলেই ১৯৪৩ সালে চাউলের মূল্য অসম্ভব রূপে বাড়িয়া গিয়াছিল এবং পল্লী অঞ্চলের

অধিকাংশ লোকের সেই মূল্যে চাউল ক্রয় করিবার শক্তি ছিল না; ইহার ফলে প্রধানতঃ পল্লী অঞ্চলের লোকেরাই খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

(৬) যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতার অধিকাংশ লোক একই সময়ে তাঁহাদের এক মাসের উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য ক্রয় করিয়া রাখিতেন; এমন কি অনেকেই একেবারে তিন মাসের, ছয় মাসের, এমন কি এক বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করিতেন। ইহার ফলে পল্লী অঞ্চলের বাজারসমূহে চাউলের টান পড়িত। কিন্তু বর্ত্তমানে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে 'রেশনিং' চালু থাকার জন্য যে সকল অঞ্চলে 'রেশনিং' নাই সেই সকল অঞ্চলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণ খাদ্যশস্য পাওয়া যাইতেছে।

(৭) খাদ্য নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে ইহাও বলা যায় যে, ইহার দ্বারা "গণতান্ত্রিক শিক্ষার" সুযোগ ঘটে; ছোট বড় সকলকেই একই রকমের এবং একই পরিমাণে খাদ্য ক্রয় করিতে হয়।

ধান-চাউল সংগ্রহ

ধান-চাউলের সংগ্রহ নীতি প্রধানতঃ স্বেচ্ছাধীন। যে সকল অঞ্চলে বড় বড় কৃষকদিগের নিকট বহু পরিমাণ বাড়তি ধান-চাউল থাকে এবং যে সকল বড় বড় কৃষক নিজেদের ব্যক্তিগত লাভের আশায় বহুল পরিমাণে ধান-চাউল মজুত করিয়া রাখেন কেবল সেই সকল অঞ্চল হইতে এবং এইরূপ মজুতকারী বড় বড় কৃষকদিগের নিকট হইতে বাধ্যতামূলক হিসাবে ধান-চাউল সংগ্রহ করা হয়; বাড়তি অঞ্চলসমূহ হইতেই ধান-চাউল বিনা অনুমতিতে রপ্তানী করা আইন-বিরুদ্ধ। অর্থাৎ এই সকল অঞ্চলে ধান-চাউল 'আটক' রাখা হয়। ইহার ফলে বাড়তি অঞ্চলসমূহ হইতে ন্যায্য মূল্যে সরকারের পক্ষে ধান-চাউল সংগ্রহ করা সম্ভব হয় এবং এইরূপ সংগৃহীত খাদ্য দ্বারাই অসংখ্য বুভুক্ষুর আহার জোগানো হয়।

পল্লী অঞ্চলের সহিত যাঁহাদের যোগাযোগ আছে তাঁহারা সকলেই জানেন যে, ১৯৪৪ সালের পূর্ব্বে বড় বড় কৃষকগণ সাধারণতঃ দুই-তিন বৎসরের প্রয়োজনীয় ধান মজুত করিয়া রাখিতেন; কিন্তু বর্ত্তমানে সরকারী সংগ্রহ-নীতির ফলে তাঁহারা এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং সাধারণতঃ এক বৎসরের প্রয়োজন মত ধান মজুত করিয়া রাখিতেছেন। সুতরাং ইহার ফলে বাজারে অধিকতর পরিমাণ ধান-চাউল আমদানী হইতেছে এবং ভক্ষণকারিগণ অধিকতর পরিমাণে ধান-চাউল পাইতেছেন। অবশ্য সকল বড় বড় কৃষকই যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাদের বাড়তি ধান সম্পূর্ণরূপে বাজারে আনিতেছেন, তাহা নহে; তবে বাড়তি ধান সরকার আইনতঃ সংগ্রহ করিতে পারেন এই ধারণার বশে অনেকেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাদের অতিরিক্ত পরিমাণ ধান বিক্রয় করিয়া ফেলেন।

বাড়তি অঞ্চল হইতে ঘাটতি অঞ্চলে বিনা অনুমতিতে ধান-চাউল রপ্তানী না করিতে পারার জন্য বাড়তি অঞ্চলের কৃষকদের এবং ঘাটতি অঞ্চলের অধিবাসিগণের মধ্যেও বিক্ষোভ দেখা যায়। বাড়তি অঞ্চলের উৎপাদনকারিগণ মনে করেন যে, ধান-চাউল অবাধে রপ্তানী করিতে পারিলে তাঁহারা ধান-চাউলের বর্ত্তমান মূল্য অপেক্ষা অধিকতর মূল্য পাইতেন; আবার ঘাটতি অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ মনে করেন যে, চাউলের এইরূপ "আটক-প্রথা" উঠাইয়া দিলে তাঁহারা বর্ত্তমান মূল্য অপেক্ষা নিম্নতর মূল্যে ধান-চাউল ক্রয় করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু উভয় পক্ষের বিক্ষোভই ভিত্তিহীন। বর্দ্ধমান জেলার সদর, কাটোয়া এবং কালনা মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানের বড় বড় কৃষকগণের মাসিক খরচের হিসাব গ্রহণের ফলে জানা গিয়াছে যে, বর্ত্তমানে তাঁহারা ১৯৩৯ সাল অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিতেছেন এবং অধিকতর পরিমাণে বস্ত্র ব্যবহার করিতেছেন। নিম্নের হিসাবে ইহা বুঝা যাইবে।

	মাসিক ব্যবহার (সের)	
	১৯৩৯	১৯৪৮
চাউল	২৩.০৯	২৪.৯৪
আটা	০.৮১	০.৬৯
ডাল	১.৩৮	১.৩৪
চিনি	০.৫৬	০.৪৬
গুড়	২.৫৬	২.৫৯
সরিষার তৈল	০.৬২	০.৬২
লবণ	০.৮১	০.৯৭
বস্ত্র	১.৭৯ গজ	১.৮৫ গজ

সুতরাং ধান-চাউল "আটক-প্রথার" জন্য বাড়তি অঞ্চলের ধান্য-উৎপাদনকারিগণের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় নহে, বরং উন্নত।

বাড়তি অঞ্চলের ধান চাউলের আটক-নীতি পরিত্যক্ত হইলে বর্ত্তমানে সরকার ধান-চাউলের যে মূল্য দিতেছেন তাহা বাড়াইতে বাধ্য হইবেন এবং 'রেশন' এলাকায় বর্ত্তমানে যে মূল্যে চাউল সরবরাহ করা হইতেছে তাহাও বাড়াইতে হইবে। ইহার ফলে জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যাইবে এবং দেশে এক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। কারণ মূল খাদ্যের মূল্যের উপরেই অন্যান্য জিনিষের মূল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে।

বর্ত্তমানে সরকার যে মূল্যে ধান বা চাউল ক্রয় করিতেছেন সে সম্বন্ধে অনেকেই তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে সকলেরই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার।

(১) আমাদের জীবন-যাত্রার জন্য মোট যে পরিমাণ খরচ হয় তাহার শতকরা ৭০ ভাগ খাদ্য বাবদে যায়; এবং প্রধান

প্রধান খাদ্যসামগ্রীর মূল্যই সাধারণতঃ অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করে।

(২) বিশেষভাবে অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, যে সকল কৃষকের ৪ একরের অধিক পরিমাণ ধান-জমি আছে কেবল তাঁহাদেরই বিক্রয়ের জন্য উদ্বৃত্ত ধান থাকে; কিন্তু এইরূপ কৃষকের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ৪০ লক্ষ; এবং অবশিষ্ট দুই কোটি ১০ লক্ষ লোকের মোটেই উদ্বৃত্ত ধান থাকে না। সুতরাং ধানের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে তাঁহাদের কোনই উপকার হইবে না, বরং অধিকাংশেরই ক্ষতি হইবে, কেননা তাঁহাদের ধান কিনিয়া খাইতে হইবে।

(৩) যুদ্ধের পূর্ব্বে কৃষকদিগের জীবনযাত্রার ব্যয়ের যে মান ছিল বর্ত্তমানে তাহা শতকরা ২০০ ভাগ বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই হিসাবে ধানের দাম শতকরা ৪৫০ হইতে ৫০০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ইহার ফলেও ধানের উৎপাদন তেমন বাড়ে নাই।

(৪) বিভিন্ন অঞ্চলে ধানের চাষের খরচের হিসাব গ্রহণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত মণ প্রতি সাড়ে সাত টাকা মূল্যেও ধানের চাষে লোকসান ত হয় না, বরং লাভ হয়; এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন অবস্থার উপর এবং ধানের চাষে সার প্রয়োগ ও অন্যান্য পরিচর্য্যার উপর লাভের পরিমাণ নির্ভর করে। অনুসন্ধানে ইহাও জানা গিয়াছে যে "কম্পোষ্ট" সার প্রয়োগ করিয়া কৃষকেরা বিঘা প্রতি ৫০৲ টাকা লাভ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের গত 'বাজেট' বক্তৃতায় বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। "প্রবাসী", "জ্ঞান-বিজ্ঞান" ও "খাদ্য-উৎপাদনে" লেখকের সংগৃহীত কয়েকটি হিসাবও প্রকাশিত হইয়াছে।

ধান-চাউল সংগ্রহের ও সরবরাহের মূল্য

ধান-চাউল সংগ্রহ করিতে সরকারের কি পরিমাণ খরচ হয় তাহা নিম্নের হিসাবে বুঝা যাইবে; ইহা এই প্রদেশের মধ্যে সংগ্রহের হিসাব।

	চাউল	ধান
(১) ক্রয় মূল্য	১২৸০	১১।০
(২) ডি, পি এজেণ্টের কমিশন	।০ (ক)	৴০
(৩) মজুতকারী এজেণ্টের কমিশন	৴০	।১০
(৪) বস্তা	৸০	৸০
(৫) সংগ্রহের স্থান হইতে বিতরণের স্থান পর্য্যন্ত আনার খরচ	১৸৴০	১৸৴০
(৬) ধান ভাঙ্গার খরচ		১।০
(৭) রাস্তায় এবং গুদামে ক্ষতি (শতকরা ৩ ভাগ)	।৶০	।৶০
মোট—	১৬৶০	১৬/১০

(ক) গড়-পড়তা; মণ প্রতি ৶০ কমিশন; মিল হইতে সংগৃহীত চাউলের জন্য কোন কমিশন দেওয়া হয় না।

উপরের হিসাবে দেখা যাইবে যে এক মণ চাউলের জন্য গড়পড়তা ১৬৶০ খরচ হয়। কলিকাতার সরকারী গুদাম হইতে পাইকারী ১৬৶০ মূল্যেই চাউল সরবরাহ করা হইয়া থাকে। চাউলের ক্রেতাগণকে মণ প্রতি ১৬৸৶০ দিতে হয়, কারণ খুচরা বিক্রেতাগণকে মণ প্রতি ৸০ আনা লাভ দেওয়া হইয়া থাকে। বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্ব্বে খুচরা বিক্রেতাগণকে মণ প্রতি ১।০ লাভ দেওয়া হইত; পরে উহা কমাইয়া ১৲ টাকা করা হইয়াছিল; ১৯৫০ সালের প্রথম হইতে ৸০ দেওয়া হইতেছে। কলিকাতার বাহিরে অন্যান্য 'রেশন এলাকায়' পাইকারী ও খুচরা চাউল বিক্রেতা আছেন, এবং সেই সকল অঞ্চলে মণ প্রতি ১৬৶০ অপেক্ষা কম মূল্যে চাউল সরবরাহ করা হয়; সাধারণতঃ ১৫৸৶০ হইতে ১৬/০ মূল্য। যে সকল অঞ্চলে 'রেশনিং' নাই, সেই সকল অঞ্চলে মণপ্রতি ১৬৲ টাকা দরে গবর্ণমেণ্ট চাউল সরবরাহ করিয়া থাকেন এবং ১৬৸৶০ মূল্যে ইহা খুচরা বিক্রেতাগণ কর্ত্তৃক বিক্রীত হয়। মোট কথা, এক মণ চাউল সংগ্রহ, মজুত ইত্যাদি বাবদে সরকারের ১৬৶০ আনা খরচ হয়, কিন্তু গড়ে ইহা অপেক্ষা কম মূল্যে উহা সরবরাহ করা হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার যে, খাদ্য বিভাগ পরিচালনার জন্য বাৎসরিক আড়াই কোটি টাকা খরচ হয়; এবং এই খরচ চাউলের মূল্যে যোগ করা হয় না।

ভারতের বাহির হইতে চাউল সংগ্রহ ব্যাপারে মণপ্রতি ২২৲ টাকা (খিদিরপুর ডক পর্য্যন্ত) খরচ পড়ে, এবং ভারতের মধ্যে অন্যান্য প্রদেশ হইতে চাউল আমদানী করিতে মণপ্রতি ১৬৲ টাকা হইতে ১৮৲ টাকা খরচ হয়। ১৯৪৯ সালে ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টন চাউল এই প্রদেশের মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং বাহির হইতে ৯৮ হাজার টন আমদানী করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে এই প্রদেশের বাহির হইতে ১০ হাজার টন আমদানী করা হইবে।

পূর্ব্বে গমজাত দ্রব্য আমদানী ও বিক্রয় ব্যবস্থায় সরকারের বার্ষিক তিন কোটি টাকা ক্ষতি হইত; এই ক্ষতিপূরণের জন্য ভারত-সরকার দুই কোটি টাকা দিতেন; সুতরাং এই প্রদেশের ক্ষতির পরিমাণ ছিল এক কোটি টাকা। কিন্তু বর্ত্তমানে এই ব্যবস্থায় কোন ক্ষতি বা কোন লাভ নাই।

ইহাও দেখা গিয়াছে যে, পূর্ব্বে যে পরিমাণ চাউল বা ধান

সংগৃহীত হইত—তাহার প্রায় শতকরা ৫ ভাগ নষ্ট বা ক্ষতি হইত; বর্ত্তমানে ইহার পরিমাণ শতকরা তিন ভাগ। চাউল সংগ্রহ, চালান, মজুত প্রভৃতি সর্ব্ব অবস্থায় খরচ কমাইবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমানে সকল জিনিষের মূল্যস্ফীতির জন্য ইহার অধিক কমান সম্ভব হইতেছে না।

বর্ত্তমান বৎসরে আভ্যন্তরিক সংগ্রহের পরিমাণ

১৯৪৯ সালের প্রথমে এই রাষ্ট্রে রেশন এলাকায় মাথা-পিছু সপ্তাহে ২ সের চাউল দেওয়া হইত; উক্ত সালের ১৮ই জুলাই হইতে ২ সের ১০ ছটাক দেওয়া হইতেছে; বর্ত্তমান বৎসরে এই হারই রাখা হইবে। সুতরাং ১৯৪৯ সাল অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে অধিকতর পরিমাণ তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হইবে। ভারত-সরকার এই প্রদেশকে আড়াই লক্ষ টন তণ্ডুল জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করিবেন—ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; ইহার মধ্যে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টন গম এবং ১০ হাজার টন চাউল। গত বৎসরে ভারত-সরকারের সরবরাহের পরিমাণ ছিল—৩ লক্ষ ১৪ হাজার টন গম এবং ৯৮ হাজার টন চাউল—মোট ৪ লক্ষ ১২ হাজার টন।

১৯৫০ সালে বর্দ্ধিত পরিমাণ খাদ্য সরবরাহের এবং ভারত-সরকারের পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কম সরবরাহের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই প্রদেশ হইতেই অধিকতর পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করিতে হইবে; গত বৎসর তাঁহারা এই প্রদেশ হইতে ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টন সংগ্রহ করিয়াছিলেন; বর্ত্তমান বৎসরে তাঁহারা ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন সংগ্রহ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে ধানের ফলন অধিক হইয়াছে; সুতরাং সর্ব্বশ্রেণীর সহযোগিতা থাকিলে বর্ত্তমান বৎসরে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টন চাউল সংগ্রহ করা কঠিন নহে। এই সম্পর্কে আমাদের পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে আগত শরণার্থীদিগের কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে এবং ইঁহাদের জন্য সংগ্রহের পরিমাণ বাড়াইতেই হইবে।

গত বৎসর "বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায়" ৫৫ লক্ষ লোককে খাদ্য সরবরাহ করা হইয়াছিল; ইহা ছাড়া বড় বড় প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত ৮ লক্ষ লোক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্য পাইয়াছিলেন। ১২ লক্ষ লোক modified rationing-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আমাদের বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫১ সালের পর ভারতের বাহির হইতে খাদ্য আমদানী একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন; সুতরাং আমাদের পশ্চিম বাংলা বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে যে পরিমাণ খাদ্য পাইতেছেন তাহা ক্রমশ: কম হইয়া যাইবে। এ ক্ষেত্রে আমাদিগকে আভ্যন্তরিক সংগ্রহ বাড়াইতেই হইবে। প্রদেশের বাহির হইতেও আমদানী বন্ধ করা খুবই বাঞ্ছনীয়; কারণ বাহির হইতে আমদানী খুবই ব্যয়বহুল ব্যাপার; ভারতের বাহির হইতে আমদানী করিতে ১৯৪৯ সালে মণ প্রতি ২৩৲ টাকা খরচ পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাস হইতে কেন্দ্রীয় সরকার ২২৲ টাকা মূল্যে সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ১৯৪৯-৫০ সালে যুক্ত প্রদেশ হইতে চাউল আমদানী করিতে মণপ্রতি ২৫৲ টাকা খরচ লাগিয়াছিল। এ ক্ষেত্রে ইহাও মনে রাখা দরকার যে, প্রদেশের মধ্যে সংগ্রহ করিলে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার হইতে মণ প্রতি ৷৷০ আনা "বোনাস্" পাইয়া থাকি। এই অর্থের শতকরা ৭৫ এবং ২৫ ভাগ আমরা যথাক্রমে অধিকতর খাদ্য উৎপাদনে এবং সংগ্রহের উন্নতিমূলক ব্যবস্থায় ব্যয় করিতে পারি। কিন্তু বাহির হইতে সংগ্রহ করিলে আমাদের কোন আয় হয় না। অপর পক্ষে যে সকল প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা হয় তাহারা 'বোনাস' পায়—এবং আমাদেরই সেই "বোনাস" বহন করিতে হয়।

গম সম্বন্ধে আমরা কবে যে আত্মনির্ভরশীল হইব তাহা বলা খুবই কঠিন। সুতরাং গম আমাদের বাহির হইতে আমদানী করিতেই হইবে। গমের বার্ষিক প্রয়োজন ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টন; আমাদের উৎপাদনের পরিমাণ ২৫ হাজার টন। এই সম্পর্কে আমাদের ক্ষতি বহন করিতেই হইবে; কিন্তু চাউলের সংগ্রহ বাড়াইয়া এই ক্ষতি আমরা অনেকটা নিবারণ করিতে পারি।

দেশের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন ও সংগ্রহ যাহাতে বাড়ে সে বিষয়ে সকলেরই, বিশেষত: পল্লী অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া দরকার এবং এই সম্বন্ধে সরকারের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করা আবশ্যক।

বাঁধ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

৫

লিলি বিস্মিত দৃষ্টিতে খানিক মৃন্ময়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মৃন্ময় আর কোন দিন ফিরিয়া আসিবে না বলিয়াই সে ধরিয়া লইয়াছিল। আজ দীর্ঘ ছয় মাস যাবৎ প্রতিদিনই লিলি তাহার ফিরিয়া আসার অপেক্ষায় দিন গুনিয়াছে। লিলি খুশী হইয়া উঠিল। হাত বাড়াইয়া মৃন্ময়ের নিকট হইতে সুটকেসটি টানিয়া লইয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, দাঁড়িয়ে আছ কেন…চল…

মৃন্ময় নিঃশব্দে তাহাকে অনুসরণ করিল। চলিতে চলিতে লিলি পুনরায় কহিল, তুমি তা'হলে সত্যিই শেষ পর্য্যন্ত ফিরে এলে মিনু-দা!

মৃন্ময় শান্ত মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল, তোমার বুঝি সন্দেহ ছিল লিলি?

লিলি বলিল, সেটা কি অন্যায় মিনুদা? তা ছাড়া ভেবেছিলাম, হয়ত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এত দিন পরে ফিরে গিয়ে আমাদের কথা ভুলেই গেছ!

আত্মীয়স্বজন…মৃন্ময় একটুখানি হাসিল। এ হাসির সহিত লিলির পরিচয় আছে: সে চমকাইয়া উঠিল। বিস্ময়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া পুনরায় নিঃশব্দে চলিতে লাগিল। অল্পক্ষণেই যে ঘরে মৃন্ময় পূর্ব্বে থাকিত সেইখানে আসিয়া দুজনে উপস্থিত হইল। মৃন্ময়ের চোখে মুখে খানিকটা বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল। ঘরখানি চমৎকার ভাবে সাজানো-গোছানো রহিয়াছে।

লিলি কতকটা কৈফিয়ৎ দিবার ভঙ্গীতে বলিল, হাতে কাজ না থাকলে যা হয় মিনুদা। কোনকিছু নিয়ে সময় কাটাতে হবে ত? কিন্তু সেকথা এখন থাক। যতদূর মনে হচ্ছে সারাদিনে তোমার কিছু খাওয়া হয় নি। বাথরুমে জল তোলাই আছে। একটু বিশ্রাম করে স্নানটা সেরে ফেল, আমি ততক্ষণে তোমার কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করে আসি।

মৃদু হাসিয়া মৃন্ময় বলিল, তার জন্য তুমি ব্যস্ত হয়ো না লিলি—

কি যে তুমি বল মিনুদা—লিলি বাধা দিয়া কহিল, আমি ব্যস্ত না হলে আর কে হবে বল দেখি।…লিলি আর অপেক্ষা করিল না, দ্রুত প্রস্থান করিল। মৃন্ময় সেই দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। এমনি করিয়া ইতিপূর্ব্বেও আর একটি মেয়ে তাকে একই কথা বলিত। শুধু বলিতই না—সব দিক দিয়া তাহাকে সেবায় যত্নে, ভালবাসায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। প্রাণ ভরিয়া সে সেই সেবার মাধুর্য্য উপভোগ করিয়াছে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত সে কত স্বপ্নই না দেখিয়াছে। কিন্তু তার পর…কোথায় গেল সে স্বপ্নমাধুর্য্য?…দেখা দিল প্রচণ্ড ঝড়। তার দাপটে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। সেই তুমুল ঝটিকা মৃন্ময়ের স্বপ্নসৌধকে কোথায় উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। আজ সে উন্মুক্ত প্রান্তরে একাকী দাঁড়াইয়া। সঙ্গী নাই, সাথী নাই—শুধু অন্ধের ন্যায় সে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। নীড়-রচনার সাধ তাহার মিটিয়াছে—আজ সে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির কাঙাল।

লিলি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। মৃন্ময়ের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করিয়া সে কহিল, এখনও চুপ করে বসে আছ? ওঠো এবারে।

মৃন্ময় উঠিবার নামও করিল না। বলিল, তুমি ভেবেছিলে আমি আর ফিরব না—আর আমি কি ভাবছিলাম জান—মৃন্ময় সহসা থামিল। একটি নিঃশ্বাস চাপিয়া গিয়া বলিল, আর হয়তো কোন দিন এখান থেকে যাব না। জান লিলি সে এক প্রকাণ্ড ইতিহাস।

লিলি বলিল, জানি মিনুদা জানি, অন্ততঃ আন্দাজ করে নিতে আমি ভুল করি নি, কিন্তু দোহাই তোমার সে ইতিহাসের কথা শোনাবার ঢের সময় তুমি পাবে। শুধু নিজের কথাটাই তুমি ভাবছ—একবার চেয়ে দেখতো আমার পানে…

মৃন্ময় একটু বিস্মিত হইল, কহিল, আমার সম্বন্ধে কোন কথা ত তোমায় বলি নি লিলি?

লিলি মৃদু কণ্ঠে বলিল, সব কথা বলবার দরকার হয় না মিনু দা। কিন্তু সে থাক, তুমি সত্যিই আর দেরি করো না। চায়ের জল এতক্ষণে ফুটেছে। লিলি পুনরায় চলিয়া গেল।

…চায়ের জল ফুটিয়াছে…এই বারে চা আসিবে। চায়ের সে ভক্ত—বহুদিন হইতেই। অভ্যাসটা আজও সে ত্যাগ করিতে পারে নাই। মঞ্জুষা চা খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। বেশী ভালবাসিত বলিয়া।

মৃন্ময় উঠিয়া দাঁড়াইল। এখনি হয়ত লিলি আসিয়া উপস্থিত হইবে, আবার হয়ত প্রশ্ন করিবে, কিন্তু তাহাকে সে এড়াইয়া যাইতেই চায়।

আজ দুই দিন পরে মৃন্ময় প্রাণ ভরিয়া স্নান করিল। শরীর ও মনের অনেকখানি গ্লানি দূর হইয়াছে।

লিলির পুনরায় সাড়া পাওয়া গেল। সে বলিতেছিল, অত জল ঢেল না মিনুদা, সহ্য হবে না। কথাটা মৃন্ময়ের কানে পৌঁছাইল না। লিলি পুনশ্চ কহিল, তোমার চা নিয়ে এসেছি মিনু-দা।

মৃন্ময় সাড়া দিল এবং তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া সোজা গিয়া চায়ের টেবিলে বসিল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই লিলি আয়োজন নিতান্ত মন্দ করে নাই। মৃন্ময় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল। সোনালী চায়ের মধ্যে যেন ভাসিয়া উঠিল আর একখানি মুখ। মৃন্ময় চমকাইয়া উঠিল। খানিকটা চা ছলকাইয়া পড়িল।

লিলি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল ?···

একটু অন্যমনস্ক ভাবেই মৃন্ময় জবাব দিল, বেশী ভালবাসি বলেই ত্যাগ করতে হবে এ আবার একটা যুক্তি হ'ল নাকি।···

লিলি বলিল, এ সব তুমি কি বলছ মিনুদা ?···কি তুমি বেশী ভালবাস ? কে আবার তোমাকে ত্যাগ করতে বলেছে ? ···

মৃন্ময়ের মুখে একটুখানি হাসি দেখা দিল। সে বলিল, আমাকে আবার ত্যাগ করতে বলবে কে ? আর বললেই বা শুনছে কে। কথাটা আমার নয়—

মৃন্ময় থামিল। লিলি চাহিয়া আছে। দৃষ্টিতে তার নীরব প্রশ্ন। মৃন্ময় পুনশ্চ বলিতে লাগিল, মঞ্জুষা চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে—সেই সঙ্গে সিঙ্গাড়াও। ওগুলো সে অত্যন্ত বেশী পছন্দ করত বলে। কি ছেলেমানুষী বলতো।···

মৃন্ময় হাসিয়া উঠিল। বলিল, এমনি পাগলামি মেয়েরাই করতে পারে···

লিলি এ হাসিতে যোগ দিতে পারিল না। বরং তার মুখখানি বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

লিলির এই আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তন মৃন্ময়ের দৃষ্টি এড়াইল না। সে মৃদু কণ্ঠে বলিল, কিন্তু তুমি অমন চুপ করে আছ কেন লিলি।···

একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া লিলি বলিল, চুপ করে না থেকে কি করি মিনুদা। তা ছাড়া কথাটা ত আর তুমি একেবারে মিথ্যে বলো নি। মেয়েদের এই পাগলামির জন্যে কি তারা কম দুঃখ পায়···কিন্তু তবুও দেখ তারা দুঃখটাকে জেনে শুনে মেনে নেয়।

লিলির কথা শুনিতে শুনিতে সে আর এক বার চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল। লিলির মনে হইল সে যেন বিষ গলাধঃকরণ করিতেছে।

লিলি কিন্তু থামিতে পারিল না, সে বলিতে লাগিল, এই দুঃখের মধ্যেও মেয়েরা একটা সান্ত্বনা খুঁজে পায়, কিন্তু যারা জেনে শুনে আত্মপ্রবঞ্চনা করে তারা নিজেকেও ঠকায়, অপরের সম্বন্ধেও ভুল করে।···কথার মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া সে অন্ত প্রসঙ্গে আসিল,- ও কি ডিম যে একেবারেই ছুঁলে না। ওটা তুলে নাও মিনু দা। না না, কোন কথা তোমার আমি শুনতে চাই না।

মৃন্ময় হাসিল। বলিল, এই অসময়ে আর বেশী খেতে ইচ্ছে নেই, আবার রাত্রেও এমনি জুলুম করবে ত তুমি!

লিলি সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। শান্ত কণ্ঠে বলিল, তোমাকে অকারণে ব্যথা দিতে আমি চাই না মিনু-দা। কোথাও যে নূতন করে গোল বেধেছে সে ত দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু তা বলে নিজের উপর এক তিল অত্যাচার করতেও তোমায় আমি দেব না—কিছুতেই নয়।

লিলি থামিল, একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিল, একবার আমার কথাটা ভাবতো। সত্যিই কি দুঃখ করবার মত আমার কিছুই নেই ? না আমাকে তোমরা পাথরে গড়া মনে করো।··· সে আর দাঁড়াইল না—দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তার চোখে জল দেখা দিয়াছিল।

মৃন্ময় একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়া জাগিয়া উঠিল। হয়তো তার খানিকটা বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছিল, লিলি সেই কথাটাই তাহাকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়া গেল। লিলি একথা বলিতে পারে বটে। মৃন্ময় উঠিয়া গিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। চোখে পড়িল লিলির ফুলের বাগান—তার পরেই ছোট একটি লন। ঐ লনে লিলির ছেলের সঙ্গে কত দিন সে খেলা করিয়াছে। ঐ বাগানে প্রত্যহ দেখা যাইত নানা জাতীয় ফুলের সমারোহ। ছেলের সহিত লিলি রোজই যাইত ঐ বাগানে—নিজের হাতে সে প্রত্যেকটি গাছের সেবা যত্ন করিত। আজ যে লিলির আর সে যত্ন নাই··· বাগানের দুরবস্থা দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।···

মৃন্ময় পুনরায় চায়ের টেবিলে ফিরিয়া আসিল। বাকী চাটুকু এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া সে অনুচ্চ কণ্ঠে লিলিকে ডাক দিল, কিন্তু লিলির পরিবর্ত্তে দেখা দিল মহীপাল। ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে সে মৃন্ময়কে অভিবাদন জানাইল। বলিল, খবরটা পেয়েই ছুটে এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে। এমন করে কি ভুলে থাকতে হয়।

প্রত্যুত্তরে মৃন্ময় একটু হাসিল—কোন জবাব দিল না। মহীপাল পুনরায় বলিল, এতদিন কোথায় ছিলেন আপনি ? এদিকে আপনি নেই আর কতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কিন্তু দিদিমণিকে সত্যিই ধন্যবাদ দিতে হয়। এত বড় আঘাতটাকে তিনি আশ্চর্য্য ধৈর্য্যের সঙ্গে সামলে নিয়েছেন। এক দিনের জন্যও ভেঙে পড়েন নি!

মৃন্ময় মৃদুকণ্ঠে বলিল, ভেঙে পড়বার উপায় ছিল না যে ভাই।

মহীপাল বলিল, একথা বলছেন কেন মৃন্ময়বাবু।

মৃন্ময় বলিল, আমি মিথ্যে বলি নি।

মহীপাল অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হইল। বলিল, আপনাকে আমরা অনেক আগেই আশা করেছিলাম।

মৃন্ময় মৃদু কণ্ঠে কহিল, আপনাদের আশা সফল করা

ছিল আমার কর্তব্য, কিন্তু নানা দুর্দৈবের জন্ম তা সম্ভবপর হয় নি। তবে আমার ভরসা ছিল যে, লিলি আপনাদের কাছে আছে, কিন্তু এ সব কথা এখন থাক—লিলি হয়তো শুনে ফেলতে পারে।

মহীপাল লজ্জিত হইল। বলিল, আমার এতক্ষণ এটা বোঝা উচিত ছিল, অতটা তলিয়ে আমি দেখি নি। এখন ত আছেন নিশ্চয় কিছুদিন।

মৃন্ময় জবাব দিল, সেই ইচ্ছে নিয়েই ত এসেছি।

মহীপাল উঠিয়া পড়িল। বলিল, আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না—আপনি বরং একটু বিশ্রাম করুন। কাল সকালে আবার দেখা হবে।

মৃন্ময় হাসিমুখে বলিল, আমার এখন বিশ্রামের কোন প্রয়োজন নেই। আপনি এখন না গেলেই বরং আমি খুশী হতাম।

মহীপাল হাসিল, বলিল, আপনি অবশ্য একথা বলতে পারেন। কিন্তু জানেন কি, বাবা বলেন যে, আমি এখন সাবালক হয়েছি। সে যা হোক আমি এখন আসি—বলিয়া সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু লিলির কি হইল। এতক্ষণে একবারও সে আসে নাই। মহীপাল আসিয়াছিল, এতক্ষণ বসিয়া গল্প করিয়া গেল—ইহা নিশ্চয় লিলির অজ্ঞাত নয় অথচ ভদ্রতার খাতিরেও একবার আসিয়া দেখা করিল না—ইহাতে মৃন্ময় যার পর নাই বিস্মিত হইল। সে ধীরে ধীরে আসিয়া পাশের ঘরে উপস্থিত হইল। লিলি খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কোন দিকে তার খেয়াল নাই। মৃন্ময় লিলির এই তন্ময়তা ভাঙ্গিতে চাহিল না। কিন্তু এ কি চেহারা হইয়াছে লিলির ঘরের। শ্রীহীন ঘরটির সর্বত্র বিশৃঙ্খলা। শুধুমাত্র টেবিলটা সযত্নে সাজানো। টেবিলের উপর লিলির মৃত পুত্রের একখানি ফটো রক্ষিত। তার পাশে পঙ্কজের ব্যবহৃত দু'জোড়া জুতা, একটি ছোট ফুটবল, দুধ খাইবার কাপ—তাহাতে দুধ রাখিতেও ভুল হয় নাই। ফুলদানিতে রহিয়াছে একরাশ ফুল। টেবিলের পাশে আছে একটি পেরামবুলেটর, একটি ট্রাইসাইকেল, এমন কি পঙ্কজের খরগোসের খাঁচাটিও সেখানে স্থানলাভ করিয়াছে। মৃত পুত্রের স্মৃতির মাঝে লিলি হয়তো একেবারে ডুবিয়া আছে। তাহার নিদর্শন এই কক্ষটিতে বিদ্যমান। অথচ তার কিছুক্ষণ পূর্ব্বের ব্যবহারে একথাটা বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। মৃন্ময় বিস্মিত হইল, ব্যথিত হইল, কিন্তু মুখে তাহার একটি সান্ত্বনার বাক্য যোগাইল না। সে শুধু একদৃষ্টে লিলির নিশ্চল মূর্তির পানে চাহিয়া রহিল। আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মৃন্ময় মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, লিলি—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটুখানি হাসিল, বলিল, মহীপাল চলে গেল বুঝি? বড় ভাল ছেলে। রোজ দু' বেলা খোঁজ নিয়ে গেছে। কিন্তু তুমি আবার উঠে এলে কেন, আমায় একবার ডাকলেই ত পারতে।

মৃন্ময় একথা বলিল না যে, ইতিপূর্ব্বে বহুবার ডাকিয়া সাড়া না পাইয়াই সে উঠিয়া আসিয়াছে। বরং কথাটা এক-প্রকার মানিয়া লইয়াই সে বলিল, ভাবলাম যে দেখে আসি তুমি এতক্ষণ ধরে কি করছ, তাই আর ডাকি নি। তা ছাড়া একলা চুপচাপ বসে থাকতেও আর ভাল লাগছিল না।

লিলি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, আমার কিন্তু বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে।

মৃন্ময় নীরব। লিলি তার নির্ব্বাক মুখের পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ বলিল, তোমায় মিথ্যে বলছি না মিনু-দা —অবশ্য এক এক সময় তোমার উপর রাগ হ'ত। আচ্ছা এর কি সত্যিই কোন মানে হয়। কেন তুমি ফিরে এলে না— কিসের জন্য এত দেরি হচ্ছে এ নিয়ে কম দুশ্চিন্তা ভোগ করিনি আমি। অথচ তুমি একটা খবর দেওয়াও আবশ্যক বোধ কর নি। তোমাকে মিথ্যে বলব না মিনু-দা— তোমার এই ব্যবহার আমায় কম দুঃখ দেয় নি।

মৃন্ময় তথাপি নিরুত্তর। সব কথা ঠিক তার বোধগম্য না হইলেও একথা মৃন্ময় বুঝিল যে, যাহা লিলি প্রকাশ করিল এইখানেই তার শেষ নয়, তার মধ্যে আরও কিছু গোপন রহিয়াছে।

লিলি থামিতে পারিল না। বলিয়া চলিল, নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হ'ত। একটা-কিছুকে আপন করে আঁকড়ে ধরে রাখবার জন্য মনটা আকুল হয়ে উঠত। পঙ্কজ আমায় সবদিক থেকেই রিক্ত করে গেছে। লিলি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, মনটা ভেঙে-চুরে এমন হয়েছে যে, এখন তাকে না পারছি নূতন করে গড়ে তুলতে, না সম্ভব হচ্ছে পুরাতন অবস্থার মধ্যে ফিরে যাওয়া। অথচ দশজনার মত হেঁটে চলেও বেড়াচ্ছি—দরকারমত হেসে কথাও বলছি। লিলি একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল।

মৃন্ময় যে এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই সহসা লিলির সে খেয়াল হইল। সে একটু লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল, ঐ দেখ! পোড়া মন একটু সুযোগ পেয়েছে কি অমনি কাঁদুনি গাইতে সুরু করেছে। আর তুমিও তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছ মিনু-দা!...

মৃন্ময় গভীর স্নেহে ডাকিল, লিলি—

লিলি সাড়া দিল, কিছু বলবে মিনু-দা?

একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃন্ময় কহিল, না—আজ থাক। চল ঘরে যাই।

লিলি পুনরায় একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ভাবছ বুঝি লিলি দুঃখ পাবে। একটুও নয় মিনুদা...একটুও না।...

মৃন্ময় ইহার কোন জবাব দিতে পারিল না, তার চোখের সম্মুখে তখন উজ্জ্বল হইয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে পঙ্কজের ছবি। ঘরের ভিতরকার বহুবিধ স্মৃতিচিহ্ন দুঃখটাকেই নিরন্তর মনে করাইয়া দেয়। অথচ ইহাকেই গোপন করিবার জন্য তার কি প্রাণপণ চেষ্টা। কিন্তু ইহা কি শুধুই আত্মগোপন করিবার আকাঙ্ক্ষা? মৃন্ময় একটু চিন্তিত হইল। এই শ্রেণীর মানুষকে লইয়াই বিপদ বেশী। যাহারা চিৎকার করিয়া আত্মপ্রকাশ করে তাহাদের জন্য ভাবনা হয় না, কিন্তু দৃষ্টির আড়ালে দুঃখের আগুন যাহার মনে মনে ধিকিধিকি জ্বলিতে থাকে ধ্বংসের মারাত্মক আক্রমণের হাত হইতে তাহাকে বাঁচান শক্ত। লিলিকে তার আজ একান্ত প্রয়োজন। তার নিজের জন্যও বটে, লিলির জন্যও বটে।...

মৃন্ময় এই মুহূর্তে নিজের কথা ভুলিয়া গেল।

লিলি কিয়ৎক্ষণ মৃন্ময়ের চিন্তাকুল মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, তুমি হঠাৎ একেবারে চুপ করে গেলে কেন মিনু-দা?...

মৃন্ময় কহিল, না, চুপ করে যাব কেন!

লিলি বলিল, তা ছাড়া আবার একে কি বলব! কতদিন পরে এসেছ, কোথায় তোমার কাছ থেকে কত গল্প শুনব, না তুমি সেই থেকেই মুখ বন্ধ করে আছ।

মৃন্ময় বলিল, কিসের গল্প আবার তুমি শুনবে?

লিলি হাসিয়া ফেলিল, বলিল, বেশ যা হোক—গল্প আবার কিসের হয়! যেখানে গিয়েছিলে সেখানকার।

লিলি একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, কত দিন যে আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের চোখে দেখি নি। তাই তো মাঝে মাঝে ভাবি কেন এমন হয়। যাদের কাছ থেকে চিরদিনের জন্য চলে এসেছি, কোন দিন কোন ছলেও আর যাদের মাঝে ফিরে যাব না তাদের জন্যেও মন এমন করে কাঁদে কেন?... একটা খবর জানবার জন্য এমন ব্যাকুলতা কেন?

মৃন্ময় বলিল, বিদেশে অনাত্মীয়ের মধ্যে থাকতে গেলে সকলেরই এই অবস্থা হয় লিলি।—

লিলি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, হয়তো তাই ঠিক, তবে সকলের সঙ্গে আমাকে এক মাপকাঠিতে বিচার করতে বসো না মিনুদা।...কিন্তু কি কাণ্ড দেখ ত, সন্ধ্যে হয়ে গেল অথচ ঝিয়ের এখনও দেখা নেই। অন্তত দু'ঘণ্টা হ'ল তাকে বাজারে পাঠিয়েছি।

মৃন্ময় বিস্মিত হইয়া বলিল, এ সময় আবার বাজারে কেন লিলি।

লিলি গম্ভীর হইয়া উঠিল। কহিল, আজকের রাতটাও উপোস করে কাটাতে চাও নাকি তুমি? না না হাসি নয় মিনু-দা, আমার কাছে যে ক'টা দিন থাকবে তোমাকে নিয়ম মেনে চলতে হবে, নইলে আমি অনর্থ বাধাব—একথা তোমায় আগেই জানিয়ে রাখছি।

আলোচনাটা একটা সহজ পথে ফিরিয়া আসায় মৃন্ময় খুশী হইল। সে হাসিমুখে জবাব দিল, নিয়ম না মেনে চললে বরং পত্রপাঠ বিদেয় করে দিও লিলি।

লিলি হাসিল, কহিল, ঠাট্টা নয় মিনু-দা। আয়নায় নিজের মুখ দেখাও বোধ হয় ছেড়ে দিয়েছ, নইলে একথা বলতে তোমার আটকাত।

লিলি আর দাঁড়াইল না। দ্রুত রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

৬

দিন কয়েক পরে—

লিলি বলিল, তারপর মিনুদা?

মৃন্ময় একাগ্রচিত্তে একখানি বই পড়িতেছিল। লিলির এই আকস্মিক প্রশ্নে মুখ তুলিয়া স্মিতহাস্যে কহিল, কিসের পর লিলি?...

লিলি বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, এরই মধ্যে ভুলে গেছ!

মৃন্ময় একটু নড়িয়া-চড়িয়া স্থির হইয়া বসিল। কোন-প্রকার ভূমিকা না করিয়া বলিল, কিন্তু আজকের এই পরিণতির জন্য আমি মঞ্জুকে একতিল অনুযোগ দিতে পারি না। নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়েই সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে—'এ ছাড়া আর কোন পথ তার ছিল না লিলি।

লিলি বলিল, ছিল বৈকি মিনুদা কিন্তু বোকা মেয়েটার মিথ্যা আত্মসম্মানজ্ঞান এবং আত্মপ্রবঞ্চনাই সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে উঠল।

মৃন্ময় তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, অন্যায় ভাবে অবিচার করো না লিলি। তার সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করবার আগে আমার কথাটা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। যেদিন সব কয়টা দরজা আমার কাছে খোলা ছিল আমি কেন তখন সেখানে অসঙ্কোচে প্রবেশ করতে পারি নি। সত্যকে মেনে নিতে দেখা দিয়েছিল দ্বিধা—না লিলি তোমার কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারব না। যা সত্য তা মানতেই হবে।

লিলি শান্ত কণ্ঠে বলিল, ভুল তুমি কর নি, একথা কেউ বলছে না মিনুদা। কিন্তু সেই ভুলের সংশোধন আর পাঁচটা ভুল দিয়ে ত করা যায় না। এ যেন একটা প্রকাণ্ড লড়াই হয়ে গেছে।

বাধা দিয়া মৃন্ময় বলিল, লড়াই সে করে নি লিলি, শুধু নিঃশব্দে আমার পথ থেকে সরে গেছে।

লিলি কহিল, ও একই কথা হ'ল মিনুদা। কিন্তু আমি ভাবছিলাম এতে মঞ্জু কতখানি সুখী হবে!

'সেটা আমার বিচার করে দেখবার নয়।' মৃন্ময় বলিল, তবে আমার মনে হয় তার এই ব্যবহার একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। অনেক দিনের অনেক চিন্তার ফল এটা। কিন্তু মঞ্জুর কথা এখন থাক লিলি। ওকে এখন আমাদের চিন্তা-ভাবনার বাইরে রাখাই উচিত।

মঞ্জুষা সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলেই মৃন্ময় সযত্নে তাহা এড়াইয়া যাইতে চায়, কিন্তু কি জানি কেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই লিলির আগ্রহ ইদানীং মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে।

লিলি বলিল, বাইরে রাখব বললেই ত সব সময় তা পারা যায় না মিনুদা। এ কথাটা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন?

মৃন্ময় বলিল, ভুলে আমি কোনকিছুই যাই নি লিলি, কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্তই আজ এ কথা আমাকে বলতে হচ্ছে।

লিলি কহিল, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্ত্তন ঘটা সম্ভব হলে অবশ্য কোন গোল থাকত না।

মৃন্ময় বলিল, খুব সত্য কথা। আর সেইজন্যেই উন্মুক্ত দ্বার-পথে খোলা মনে প্রবেশ করতে অত ভয় পেয়েছিলাম—নিজেকে ভাল করে বুঝে দেখবার প্রয়োজনটা বড় হয়ে উঠেছিল। ভিতরের তাগিদটা মনের পরিবর্ত্তন না সাময়িক উত্তেজনার প্রকাশ এই কথাটা বিচার করতে বসেছিলাম।

লিলি কহিল, কথাটা খোলাখুলি মঞ্জুকে তুমি জানালে না কেন?

মৃন্ময় মৃদু কণ্ঠে বলিল, কি কারণে কোন্ কাজটা করি নি তা এখন তোমায় বোঝাতে পারব না, তবে একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, মন তখনও আমার পরিষ্কার ছিল না। সংস্কারের বেড়াজাল থেকে সে মুক্ত ছিল না। মঞ্জু হয়ত কথাটা বুঝতে পেরেছিল—

লিলির ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, এ তোমার বাড়িয়ে বলা। মঞ্জুর কথা ভেবে আমার দুঃখও হয় রাগও হয়। মিথ্যা দম্ভকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে সে এ কি করলে!

মৃন্ময়ের মুখ প্রশান্ত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে ধীর কণ্ঠে বলিল, তুমি অকারণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছ লিলি। মঞ্জুর জন্ত দুঃখ আমারও হয়, কিন্তু সে অন্ত কারণে। আর দম্ভের কথা যদি বল—ওটা তার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। মনে প্রাণে যেটা সে বিশ্বাস করেছে কোনকিছুর প্রলোভনেই তা ত্যাগ করতে পারে নি। এতে বরং তার উপর আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেছে।

একটু থামিয়া সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, দুঃখের ভিতর দিয়েই সে দুঃখকে জয় করবার চেষ্টা করছে। সে সফল হোক—জয়যুক্ত হোক। আমার নিজের কথা আর আমি ভাবি না। হিসেব করে আর বিচার করে করে ত অনেক দিনই চলে দেখেছি, তাতে জীবনের সত্যরূপ দেখা আজও ভাগ্যে ঘটল না—এবারে না হয় অদৃষ্টের হাতেই নিজেকে ছেড়ে দিয়ে দেখি কোথায় সে টেনে নিয়ে যায়। দুঃখকে আর আমি ভয় করি না। সুখের অনুভূতি দুঃখের মধ্যেই একদিন জন্মলাভ করবে। একলা এর কোনটাই সত্য নয়।

লিলি বিস্ময়ভরা চোখে মৃন্ময়ের মুখের পানে এতক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। সে থামিতেই লিলি বলিয়া উঠিল, এ সব তুমি কি বলছ মিনুদা—

মৃন্ময় বড় অদ্ভুত ভাবে হাসিতে লাগিল। মাথা নাড়িতে নাড়িতে জবাব দিল, স্রেফ পাগলামি লিলি, কিন্তু চটপট্ একটু চা খাওয়াতে পার। এখুনি একবার বেরুতে হবে।

এই আকস্মিক প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তনে লিলি রীতিমত বিস্মিত হইল, কিন্তু মুখে কোন কথা না বলিয়া সে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, এইমাত্র উনুন ধরান হয়েছে, চা পেতে দেরি হবে।

মৃন্ময় কহিল, তা হোক দেরি তুমি বসো—

লিলি হাসিয়া ফেলিল, বলিল, এই যে বললে তোমাকে বেরুতে হবে।...

মৃন্ময় নির্ব্বিকার কণ্ঠে কহিল, বলেছিলাম বটে, কিন্তু বাইরের রোদের পানে চোখ পড়তে আমাকে মত বদলাতে হয়েছে।

লিলি বুঝিল মৃন্ময় মঞ্জুষাকে লইয়া কোনপ্রকার আলোচনা করিতে চায় না, কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও সে বারে বারে তারই প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতে থাকে। তাহাকে যেন কেমন নেশায় পাইয়াছে। মঞ্জুষাকে লইয়া আলোচনা করিতে করিতে সে মৃন্ময়কে লক্ষ্য করে। তার মুখের উপর যে গভীর ভালবাসার প্রকাশ দেখা যায় লিলি তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ রাখিয়া তাহা অনুভব করে। কোনকিছু সে অনুসন্ধান করে, কিন্তু তাহাতে ওর শূন্য মুঠি ভরিয়া উঠে না—বরং শূন্যতাটাই আরও বড় হইয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

মৃন্ময় চলিয়া যাইতে সে ক্ষুণ্ন হইয়াছিল। তার পরিত্যক্ত ঘরের পাশ দিয়া চলিতে গেলেই একটা বিচিত্র অনুভূতি মুহূর্ত্তের জন্য তাহার গতিবেগ রুদ্ধ করিত, কিন্তু পঙ্কজের পানে চোখ পড়িলেই তার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা একস্থানে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইত। ফলে বাহিরের কোন কিছুই তার মনকে তেমন করিয়া দোলা দিতে পারে নাই। কিন্তু পঙ্কজের মৃত্যুর পরে সে নিজেকে নূতনভাবে আবিষ্কার করিল। এই আবিষ্কার তাহাকে শঙ্কিত ও চিন্তিত করিয়া তুলিল। যাহার ফলে পুত্রের স্মৃতিকে ঘিরিয়া...

মৃন্ময় পুনরায় কথা বলিয়া উঠিতে লিলির চিন্তাধারায় বাধা পড়িল। মৃন্ময় বলিল, ভালবাসায় দ্বিধা থাকলে তা কোনদিন

সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না লিলি। সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হলেই সুন্দরের আবির্ভাব ঘটে। আসল কথা দোষ মঞ্জুষার নয়, আমার নিজের।

লিলি বলিল, তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মিনুদা। খামোকা নিজেদের এ ভাবে বিপন্ন করবার দুর্ম্মতি তোমাদের কেন হয়? তা ছাড়া এ কথাটাও আমি বুঝে উঠতে পারছি না, কথাগুলি তুমি কাকে লক্ষ্য করে বলছ? আমার যতদুর মনে হয় তোমার নিজেকে নয়।

এই প্রশ্নে মৃন্ময় চমকাইয়া উঠিল। তার এতক্ষণের কথাগুলি একবার মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিল, কিন্তু লিলির উক্তির সমর্থনে কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাইল না। প্রকাশ্যে সে কহিল, তুমি ভুল করেছ লিলি, কথাটা আমি নিজেকে লক্ষ্য করেই বলেছি। তুমি ত জান আমার অকারণ দ্বিধাই আবার নূতন করে মঞ্জুষাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিতে পারি নি।

লিলি বলিল, তুমি ত হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলে মিনু-দা। সে হাতে হাত রাখতে মঞ্জু পারলে কোথায়?···

মৃন্ময় বাধা দিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, এটা ঠিক কথা হ'ল না লিলি। তোমার শুধু একটা দিকই চোখে পড়েছে, নইলে মঞ্জুর দেওয়া দায়িত্বকে এড়াবার জন্য আমার চোরের মত পালিয়ে যাওয়াটাও তোমার চোখে পড়ত এবং হয়তো তার জন্য তুমি আমায় তিরস্কার করতে। আসলে কোন প্রকারেই আমি একটা সামঞ্জস্য করে নিতে পারি নি।

লিলি বলিল, তুমি দুঃখ পাবে জানলে আমি এসব কথা তুলতাম না মিনুদা! কিন্তু সংসারে ভুল না করে কে—তাই বলে তাকে সংশোধন করে নেওয়া চলবে না কেন! ভুলটাকে চিরদিন ভুল হয়েই বেঁচে থাকতে হবে এ একটা কথাই নয়।

মৃন্ময়ের মুখে বড় চমৎকার একটুখানি হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, কি জানি হয়তো তোমার কথাই ঠিক।

লিলি কহিল, হয়তো নয়, সেইটেই সত্য কথা।

মৃন্ময় হাসিমুখে কহিল, বেশ ত না হয় তাই হ'ল—তাতেই বা দোষ কি।

লিলি বলিল, দোষ-গুণের কথা নয়, মোট কথা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়াও অন্যায় মিনুদা।

মৃন্ময় প্রত্যুত্তরে বলিল, সত্য কথাই তুমি বলেছ লিলি, কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের হিসাব ত সকলে এক পথ ধরে করে না। মঞ্জু যে পথ বেছে নিয়েছে সেটা তার বুদ্ধি-বিবেচনায় সঙ্গত মনে হয়েছে বলেই সে তাকে গ্রহণ করেছে। তার পথে সে পূর্ণ হয়ে উঠুক—আমার মতের সঙ্গে তার মতের মিল হয় নি বলে, কিংবা আমার পথকে তার নিজের পথ বলে সে গ্রহণ করে নি বলেই সে ভুল করেছে এমন কথা আমি বিশ্বাস করি না।

একটা জবাব দিবার জন্যই হয়তো লিলি মুখ তুলিয়াছিল, কিন্তু সহসা ঝিয়ের উপস্থিতিতে সে থামিল এবং ঝিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, তোমার চুলো ধরলো?

ঝি জানাইল যে, চুলা বহুক্ষণ ধরিয়াছে এবং চায়ের জলও এতক্ষণে ফুটিতে সুরু করিয়াছে।—লিলি প্রস্থান করিল।

ঝি মৃন্ময়ের ঘর পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। হাতের সঙ্গে তাহার মুখও সমানে চলিতে লাগিল। সব কথাই সে লিলিকে উপলক্ষ করিয়া বলিতেছিল। পঙ্কজের মৃত্যুর পর সে নাকি অসম্ভবরকম বাতিকগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পান হইতে চুণ খসিবার উপায় ছিল না। অকারণে চেঁচামেচি করিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিত। চুপ করিয়া থাকিত শুধু পূজা-অর্চ্চনার এবং মৃন্ময়ের ঘরের জিনিষপত্র গোছগাছ করিবার সময়। একটা তরকারি রান্না করিতে গিয়া পঞ্চাশ বার তাহাতে হাত ধুইতে দেখা যাইত। পঞ্চ ব্যঞ্জনে ভোগ সাজাইয়া রোজই সে তার মৃত পুত্রের ফটোর কাছে ধরিয়া দিত। নিজে সে দিনান্তে কোনদিন বা একবার আহার করিত, কোনদিন একেবারে উপবাস করিয়া কাটাইয়া দিত। বারণ করিলে গ্রাহ্য করিত না। শুধু হাসিয়া উড়াইয়া দিত, কিন্তু মৃন্ময়ের উপস্থিতি নাকি দৈব-শক্তির মত কাজ করিয়াছে। উপসংহারে সে একথা জানাইতেও ভুলিল না যে মৃন্ময় যেন এখন কিছুদিন এখানে থাকিয়া যায়। নতুবা আবার হয়ত তেমনি···কথাটা ঝি সমাপ্ত করিতে পারিল না। লিলি এদিকেই আসিতেছে। দূর হইতে সে ঝিয়ের হাত-পা নাড়া লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, কাছে আসিয়া হাসিয়া বলিল, হাত-মুখ নেড়ে এত কি বলছিলে লছমিয়া?

যেন মস্তবড় একটা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে এমনি মুখের ভাব করিয়া সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু জবাব দিল মৃন্ময়, লছমিয়ার বুঝি গল্প করবার কিছু থাকতে নেই?

লিলি বলিল, থাকবে না কেন। আর সেই কথাই ওকে আমি জিজ্ঞেস করেছি মিনুদা।

মৃন্ময় হাসিয়া বলিল, কথাটা সকলের সামনে বলবার হলে তোমার সামনেই বলতো। ওটা গোপন কথা। ব্যক্তিগত।

লিলি হাসিতে লাগিল। লছমিয়া এক পা দুই পা করিয়া সরিয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

সেকালের বেথুন কলেজ ও স্কুল

শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী

আমার মা লীলাবতী মিত্র (রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের চতুর্থ কন্যা ও সঞ্জীবনী-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের পত্নী) ১৮৭৯ সালে বেথুন স্কুলে পড়তেন। তিনি তখনকার স্কুলের কথা নিজের ডায়েরীতে যা লিখে রেখে গিয়েছিলেন তা পূর্ব্বে থেকে এখানে কিছু বলছি। বেথুন স্কুলটি মাইনর স্কুলের মত ছিল। মা এই স্কুলের প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ে ১৮৭৯ সালে পূজার বন্ধের সময় তাঁর পিতার সঙ্গে দেওঘরে চলে যান। ১৫ বৎসর বয়সেই তাঁর ঐ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হয়।

বেথুন স্কুলে তখন শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শ্রীমতী প্রতিভা দেবী (পরে সার আশুতোষ চৌধুরীর পত্নী হয়েছিলেন), শ্রীমতী জ্ঞানদা মজুমদার, হরনাথ বসু মহাশয়ের কন্যা হেমলতা রায় (পরে কালীনাথ রায়ের পত্নী হয়েছিলেন), দীনবন্ধু মিত্র (সুবিখ্যাত সাহিত্যিক) মহাশয়ের কন্যা তমালিনী মার সঙ্গে পড়তেন। তিনি এই সহপাঠিনীদের কথা প্রীতি ও স্নেহের সঙ্গে স্মরণ করতেন। মা অতিশয় শান্ত-প্রকৃতির ছিলেন, এজন্য স্কুলের কি ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রী, কি বাঙালী পণ্ডিতেরা সকলেই তাঁকে খুব স্নেহ করতেন।

সেকালে ইংরেজ-মহিলারা স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হতেন। তাঁরা শিক্ষাদানে তেমন নিপুণা ছিলেন না, শিক্ষার ব্যবস্থাও আশানুরূপ উৎকৃষ্ট ছিল না। তাঁর বিলাতী সুরে বাংলা গান শেখাতেন।

একবার গবর্ণর-জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের কন্যা মিস্ ব্যারিং স্কুলে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে এসেছিলেন। তাঁর অভ্যর্থনার জন্য একটি বাংলা গান রচিত হয়েছিল—সেই গানের কয়েকটি পদ এই রকম ছিল—

নমস্কার, নমস্কার সুমতি মিস্ ব্যারিং
এখন আমরা হর্ষিত হই,
কারণ আপনার দর্শন পাই
নমস্কার, নমস্কার!
দয়া কর এই বিদ্যালয়ের প্রতি,
নমস্কার নমস্কার।

ছাত্রীরা যখন স্কুলে গোলমাল করত, তখন তাদের গোলমাল থামাবার জন্য একটি গান রচিত হয়েছিল। কোন শ্রেণীতে গোলমাল হলেই শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীদের সেই গান গাইতে বলতেন—গানটি এইরূপ :—

চুপ, চুপ, একেবারে চুপ,
কারণ শিক্ষক বলেন চুপ,
চুপ, চুপ, চুপ,

ছাত্রীরা স্কুলের কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে নীচের গানটি গাইত—

আইস আমরা পাঠশালে যাই,
ছোট মেয়ে, ছোট মেয়ে
পাঠশাল মাঝে শিষ্ট রয়, শান্ত রয়।

ছাত্রীরা স্কুলের ছুটির পর যখন স্কুলের গাড়ীতে বাড়ী ফিরত, তখন খুশীমনে সমস্বরে গাইত—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।

মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে যখন গাড়ী উপস্থিত হ'ত, তখন ছাত্রীরা উচ্চৈঃস্বরে গাইত—

মেডিকেল কলেজ
Have no knowledge
বড় বড় থাম
কুছ নাই কাম।

সেকালের স্কুলের উচ্চশ্রেণীতে *Royal Reader IV*, নবনারী, সীতার বনবাস, রোমের ইতিহাস প্রভৃতি বই পড়া হ'ত।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে, ১৯০১ সালে, আমি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় হতে এণ্টান্স (বর্ত্তমান ম্যাট্রিক) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেথুন কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই। তখনকার দিনে ঘোড়ায় টানা লম্বা বড় 'বাস'-গাড়ীতে ছাত্রীদের কলেজে যাতায়াত করতে হ'ত। বলা বাহুল্য, মোটর বাসের তখন চলন হয় নাই। এই বাসে চড়ে মাঝে মাঝে বড়ই বিপদে পড়তে হ'ত।

কোন দিন চলতে চলতে হঠাৎ ঘোড়া ক্ষেপে যেত, গাড়ীতে লাথি মারতে থাকত আবার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়ে গাড়ী নিয়ে পাগলের মত ছুটত। কোচম্যান প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিকে সংযত করতে চেষ্টা করত, কিন্তু সব সময়ে তা সম্ভবপর হয়ে উঠত না। বাসসহ ঘোড়া ফুটপাতের উপর উঠে গিয়ে ল্যাম্পপোষ্টের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থেমে যেত। কোন দিন ঘোড়াগুলি ছুটতে ছুটতে সোজা রাস্তা ছেড়ে পাশের রাস্তায় ঢুকে বাস গাড়ীকে অনেক দূর পর্য্যন্ত নিয়ে যেত। মাঝে মাঝে কোচম্যানের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে দাঁড়াত। ঘোড়া পিছনের পা তুলে জোরে জোরে গাড়ীতে লাথি মারত, কোচম্যান স্থির ভাবে লাগাম ধরে থাকতে পারত না—সে গাড়ী থেকে পড়ে

যেত আর ঘোড়া বেদম ছুট দিত—কোচম্যানও ঘোড়া ধরবার জন্তে চাবুক হাতে বাসের পিছনে পিছনে দৌড়াত আর মেয়েরা গাড়ীর মধ্যে চেঁচাতে থাকত। এই হাঙ্গামায় বাড়ীতে পৌছাতে আমাদের রাত্রি হয়ে যেত—মা বাবা কত ভাবতেন আর খোঁজখবর নেবার জন্য কলেজে লোক পাঠাতেন।

আমি যখন বেথুন কলেজে ভর্ত্তি হই তখন চন্দ্রমুখী বসু প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। প্রথম দিনই তিনি আমাকে কাছে ডেকে আদর করলেন, আমি তাঁর আদরে মুগ্ধ হয়ে ভাবলাম, আমার কি সৌভাগ্য যে, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আমাকে স্নেহভরে কাছে ডেকেছেন। কয়েক মাস পরেই তিনি কলেজের কাজ হতে অবসর নিলেন। তাঁর বিদায়ের দিনে ছাত্রীরা সকলে মিলে চাঁদা তুলে জড়োয়ার ব্রেসলেট উপহার দিয়েছিল।

তিনি চলে যাবার পরে কুমুদিনী দাস বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি বেশ মিষ্টি সুরে গান গাইতেন আর বেশ ভাল বীণা বাজাতে পারতেন। তিনি বি-এ ক্লাসে আমাদের শেক্সপীয়ার পড়াতেন। তখনকার দিনে অন্যান্য যাঁরা অধ্যাপনা করতেন তাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করছি:

সুরবালা ঘোষ (এম্-এ ক্লাসে ইংরেজী) পরেশনাথ সেন (বি-এ ক্লাসের ইংরেজী), আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় (লজিক ও ফিলজফি, এফ-এ ও বি-এ ক্লাসের) হেমপ্রভা বসু (বোটানি—এফ-এ ক্লাসে), বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায় (বি-এ ক্লাসের ইংরেজী), হেমচন্দ্র দে (বি-এ ক্লাসের ফিলজফি), কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত (ম্যাথেমেটিকস্ বি এ ক্লাস) আদিত্যনাথ চট্টোপাধ্যায় (ম্যাথেমেটিক্‌স, এফ-এ ক্লাস) এঁরা সকলেই অতি যত্নের সঙ্গে আমাদের পড়াতেন। তাঁদের আজ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি।

তখন বেথুন কলেজে বিজ্ঞান পড়ান হ'ত না। কাজেই কোন গবেষণাগার ও যন্ত্রপাতি ছিল না। বি-এ ক্লাসে যখন Astronomy (জ্যোতির্বিজ্ঞান) পড়তাম, তখন একটি মাত্র পুরাণো গ্লোব বা গোলক ছিল, আর কোন সরঞ্জাম ছিল না। অধ্যাপক এক হাতের মুঠাকে সূর্য্য বানাতেন ও আর এক হাতের মুঠাকে পৃথিবী ধরে নিয়ে, পৃথিবীর গতির ব্যাখ্যা করতেন।

আমি যখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে (ফার্ষ্ট আর্টস—এখনকার আই-এ) পড়ি তখন আমাদের ক্লাসে মোট ১৫ জন ছাত্রী ছিল। তার মধ্যে এক জন ইংরেজ (মার্গারেট নেলসন), দুই জন এংলো-ইণ্ডিয়ান (ডলি ও রোজি) আর একটি নিগ্রো (গার্ট্রুড কম্ব) ছিল—বাদবাকী কয়েকটি বাঙালী মেয়ে।

তখন স্কুলগৃহের বড় হল-ঘরে বেথুন স্কুল বসত। উঠানের দক্ষিণদিকের হলে কলেজের ছাত্রীরা পড়ত।

আমরা যখন ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে পড়তাম তখন খালি পায়ে, সেমিজ, ব্লাউজ ও শাড়ী পরে স্কুলে যেতাম। টিফিনের ছুটির সময় উঠানে স্কিপ করতাম, চোর চোর ও হা ডু ডু খেলতাম। কিন্তু বেথুন কলেজে ভর্ত্তি হবার সময় আমাদের বেশভূষার একটু পরিবর্ত্তন হ'ল। আমরা তখন সেমিজ, ব্লাউজ, শাড়ীর সঙ্গে পেটিকোট ও জুতা পরতে লাগলাম। কলেজের টিফিনের সময় আমাদের খেলাধুলাও ছাড়তে হ'ল। তখন শান্তশিষ্ট হয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে দল বেঁধে বারান্দায় বেড়াতাম, না হয় কমন রুমে বসে বই পড়তাম।

তখনকার দিনেও স্কুল ও কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভা হ'ত। ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত থেকে আবৃত্তি ও সঙ্গীত হ'ত। একবার টেনিসনের "ইন মেমোরিয়ম" থেকে ও সংস্কৃতে শকুন্তলা থেকে আবৃত্তি করেছিলাম।

১৯০৬ সালে আমি বি-এ পাস করি। সে বছর আমরা তিনটি মাত্র মেয়ে বি-এ পাস করেছিলাম। আমি বেথুন কলেজের মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান—আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলাম। সেজন্ত বাইশ টাকার পুরস্কার পাই। সেবার বড়লাট লর্ড মিণ্টো পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কারের বইগুলি সংখ্যায় বেশী ও অনেক ভারী হওয়াতে বড়লাট বলেছিলেন, "এতগুলি বই তুমি কি একবারে নিয়ে যেতে পারবে?" আমি দু'বার এসে বইগুলি নিয়ে যাই।

যাদের সঙ্গে কলেজে পড়েছি তাদের সঙ্গে দেখা হলে এখনও কত আনন্দ হয়। আর সে সব পুরানো দিনের কথা মনে হয়।

বেথুন কলেজের নিকট আমরা ঋণী—কারণ এ কলেজটি স্থাপিত না হলে আমরা তখনকার দিনে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারতাম না—যেটুকু জ্ঞানের আলোয় আমাদের মনের অন্ধকার খানিকটা অপগত হয়েছে তা থেকে বঞ্চিত থাকতাম। আজ বিশ্ববিধাতার চরণে কৃতজ্ঞতা জানাই আর প্রার্থনা করি আমাদের এই প্রিয় কলেজটি অক্ষয় পরমায়ু লাভ করুক।*

---

* বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী উৎসবে পঠিত।

কমলাকান্তের কিঞ্চিৎ

অধ্যাপক শ্রীপুলিনবিহারী পাল

কমলাকান্তের প্রথম দেখা মিলে 'বঙ্গদর্শনে', বাংলা ১২৭৯ সালে। ইংরেজীর গন্ধ না থাকিলে যাহারা গ্রাস মুখে লইয়াও হাই তুলিতে থাকেন, গিলিতে পারেন না, তাঁহাদের লইয়া আর কি করা যায়? তাহাদের মুখ চাহিয়া গাণিতিকের উপর বরাত দেওয়া রহিল, সন তারিখ খতাইয়া তিনি ইংরেজী সালটা বাহির করিয়া দিবেন। মনে হয় আজকাল আর কেহ 'বঙ্গদর্শন' লইয়া গোলে পড়িবেন না। কমলাকান্ত নিজে সেই ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইবার পথ বাতলাইয়া দিয়াছে। 'বঙ্গদর্শন' 'বঙ্গদেশ দর্শন' নয় বা 'বাংলার দাঁত'ও নয়, এমন কি 'A Guide to East Bengal'ও নয়। উহা একটি মাসিক পত্রিকা, তাহাতে কমলাকান্ত শর্ম্মার মাসিক পিণ্ডদান হইত। যাহাই হউক, কেমন করিয়া যে তাহার শৈশব এবং বাল্যকাল কাটিয়াছিল তাহার এতটুকু ইঙ্গিত গ্রন্থের মধ্যে কোথাও নাই। বোধ হয় গ্রন্থকারের সে ইচ্ছাই ছিল না।

কমলাকান্ত জাতিতে বামুন—উপাধি চক্রবর্ত্তী, রাজচক্রবর্ত্তী ভাবিয়া অঞ্জলি পাতিলে কাহারও রাজপ্রসাদ লইয়া ফিরিবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই। জনশ্রুতি—কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয়তম পুত্র, তা মানসপুত্রই হোক বা পোষ্যপুত্রই হোক। কিন্তু গোল বাধিয়া যায়, চাটুজ্জে-তনয় কেমন করিয়া চক্রবর্ত্তী হইয়া উঠিল। শোনা যায় আজকাল নাকি পৈতৃক খেতাব বরখাস্ত করিয়া নয়া খেতাব কুড়াইবার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে —এ যেন সেই 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়...' হয়ত বা কমলাকান্ত সেই দলে ভিড়িয়া তাহাদের খাতায় নাম লিখাইয়া থাকিবে।

কমলাকান্ত কিছু লেখাপড়া জানিত, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে বিদ্বান্ বলা চলে না। কেননা যে বিদ্যায় তালুক-মুলুক হইল না তাহা বিদ্যাই নয়। একবার তাহার একটা চাকুরী জুটিয়াছিল, তাহার ইংরেজী শুনিয়া কোন সাহেব খুশি হইয়া করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু সে তাহা পাইয়াও রাখিতে পারিল না। বোধ হয় চাকুরী করা তাহার ধাতে সহিত না। 'ন শ্বরত্ত্যা কদাচন' মনুর এই বচন স্মরণ করিয়াই যে সে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়াছিল তাহা নহে। আপিসের খাতাপত্রে কেবলই কবিতার আবির্ভাব হইতে থাকিলে তাহার জন্য অন্য যে-কোন ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয় হোক সওদাগরী আপিসের চাকুরী নিশ্চয়ই নয়। অর্থে তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই 'যেন তেন প্রকারেণ' অর্থ-সংগ্রহের জন্য তাহার মাথায় একেবারে খুন চাপিয়া বসে নাই। সামান্য কিছু জুটিয়া গেলে যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না—সে গোশালাই হোক বা সরকারী অতিথিশালাই হোক, অর্থাৎ 'যত্র তত্র ভোজনঞ্চ শয়নং হট্ট মন্দিরে' ইহাই সে জীবনের সার করিয়াছিল। সংসারে সবকিছুর মায়া কাটাইয়া উঠিলেও একটি বস্তুর নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। ইহার অভাব হইলে তাহার মগজের ভিতর যতকিছু বুদ্ধির আস্ফালন 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ'র মতই তলাইয়া যাইত।

সেই দ্রব্যগুণেই তাহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে বিস্তর ফসল ফলিয়াছিল। তাই জীবনের সব কিছু খোয়াইয়াও সে সম্বল করিয়াছিল—সাত রাজার ধন মাণিক নয়, আফিঙের ডেলা—মোটেই সরিষা ভোর নহে, একেবারে এক আধ ভরি। এই আফিঙের মাত্রা চড়াইয়াই সে আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছে তাহার অমূল্য দপ্তর। ইহার অভাবে কমলাকান্তের কেরামতি বিলকুল বানচাল হইয়া যাইত, সব কিছু তালগোল পাকাইয়া উঠিত। না বসিত 'বড়বাজার', না হইত 'ফুলের বিবাহ,' না ডাকিত 'বসন্তের কোকিল'। 'দুর্গোৎসবের' বোধন-বেলায় বাজিয়া উঠিত বিসর্জ্জনের বাজনা, 'বিড়াল' হইতে মায় 'ঢেঁকি' পর্য্যন্ত সব কিছু ভোজবাজির ভেল্কির মত একেবারে উধাও হইয়া যাইত।

অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত। শেক্সপীয়ার লিখিয়া গিয়াছেন—

> 'The lover, the lunatic and the poet
> Are of imagination all compact.'

অর্থাৎ প্রেমিক, পাগল এবং কবি ইহারা সকলেই এক-গোত্রের মানুষ। হয়ত পাগলামি তাহার কতকটা ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার মধ্যে কবিত্বের ছিটেফোঁটাও যেটুকু ছিল তাহাও পাগলামির দাপটে বাষ্প হইয়া উবিয়া গিয়াছিল ইহা মানিয়া লইতে মন নিতান্তই নারাজ। বরং উভয়ই কখনো কখনো উগ্ররূপে ফুটিয়া উঠিত, বড় বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিত নতুবা তাহার চাকুরীর ক্ষেত্রটা কবিতার আখড়া হইয়া উঠিত না, আপিসের খাতাপত্রগুলা হিসাব-নিকাশের বালাই ঘুচাইয়া দিয়া কাব্যবধূর সোহাগে মাতামাতি দাপাদাপি করিত না। তবে কাব্যরসের কিঞ্চিৎ তাহার মধ্যে স্থান পাইলেও তাহা যে অত্যন্ত মোটা রকমের ইহা বলাই বাহুল্য। না হইলে আমাদের সাধের সংসারটা হরকিসিমের নাচ-গানের আসর না হইয়া তাহার চোখে ঢেঁকিশাল বলিয়া ঠেকিবে কেন? ইংরেজী সাহিত্যে পাই—'প্রেম অন্ধ', আমাদের সাহিত্যে প্রেমের অন্ধত্ব ঘুচিয়া একটু একটু করিয়া চোখ ফুটিতেছে না কি?

সকলেই জানেন যে, কমলাকান্ত বিবাহের ফাঁসিকাষ্ঠে গলা বাড়াইয়া দিয়া 'দুর্গা' বলিয়া ঝুলিয়া পড়িতে রাজী ছিল না, ও বিষয়ে তাহার উৎকট অরুচি এবং দস্তুরমত অনিচ্ছা ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া প্রেমের মজলিসে সে নিতান্তই আনাড়ী—চোখ বুজিয়া কেহই এ যুক্তি মানিয়া লইবে না। ইহা জানা কথা যে, অনেকে বিবাহের বোঝা ঘাড়ে না লইয়াও মধুকরের ন্যায় ফুল হইতে ফুলে উড়িয়া মধুসংগ্রহে ব্যস্ত—তাঁহারা কি প্রেমিক নহেন? প্রেম নামক পদার্থটি একেবারেই নাকি বিশ্বজোড়া, ইহার তড়িৎ-প্রবাহ সবকিছুই নাড়া দিয়া যায়। ইহার ছোঁয়া লাগিলে মৃত অস্থিতেও নাকি প্রাণ নাচিয়া উঠে। ইহাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আটক রাখিলে ইহা একেবারে অতলে তলাইয়া যাইবে। এই ভরাডুবির হাত হইতে ইহাকে বাঁচাইতে হইলে ইহার রাশ টানিয়া ধরিলে চলিবে না, আল্‌গা করিয়া দিতে হইবে। প্রেমের এই বহুৎ রকমের কসরত দেখাইয়াই ত উপন্যাসের যা কিছু রুজিরোজগার। না হইলে উপন্যাস বাঁচে কি করিয়া? ইহার অভাবে হয় আরব্যোপন্যাস, না হয় বড়জোর ঠাকুরদাদার ঝোলা বা ঠাকুরমার ঝুলিতে দেশটা ছাইয়া ফেলিত, আর আসল উপন্যাস-সাহিত্য গা ঢাকা দিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িত।

সংসারে কমলাকান্তের বড় কেহ আপনার ছিল না। ভীষ্মদেব খোসনবীস, নসীরামবাবু এবং প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল। নসীরামবাবুর বাড়ীতে কমলাকান্ত একটা আশ্রয়ও বসাইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আশ্রয় তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে তাহার সম্পর্কটা ছিল বেশ কাছাকাছি এবং পাকাপাকি গোছের, কিন্তু উভয়ের মাঝখানে ছিল মঙ্গলা গাই। কাজেই তাহাদের সম্পর্কটা বরাবরই কেমন গব্যরসাত্মক হইয়া রহিল, কখনো কাব্যরসাত্মক হইয়া উঠিতে পাইল না। কাব্যরস আর গব্যরসের বিনিময়ে গোড়া হইতেই ওখানে দাঁড়ি পড়িয়া গেল, কিছুতেই দুই রসে মিলিয়া মিশিয়া গলাগলি ঢলাঢলি হইয়া উঠিল না। না হইবারই কথা। অধুনা যে হালচাল দেখা যাইতেছে তাহাতে গব্যরস, খাদ্যরস যে পরিমাণে কমিয়া আসিতেছে, ওবিষয়ে বক্তৃতার বহর সেই পরিমাণে জোরালো হইয়া নির্জলা কাব্য-রস পরিবেশন করিতেছে। সেইজন্যই বোধ হয়, চারিদিকেই একটা কাব্যিক পরিবেশ কায়েম করিবার ওঠবোস আরম্ভ হইয়াছে। তাই এক একবার বলিতে ইচ্ছা করে, 'হায় মঙ্গলা এক দিন তোমার অক্ষয়বাঁট হইতে নির্জলা দুধ দিয়া কমলাকান্তের দপ্তর রচনা করিয়াছিলে, আজ কিন্তু ভারত-মাতার বাঁট হইতে দুধের বদলে বক্তৃতার পর শুধু বক্তৃতা ঝরিতেছে আর নেপথ্যে ভাবী মহাভারত-রচনার মহড়া চলিতেছে। বোধ হয় অদ্ভুত রসের ফোড়নে উহাই হইবে ঐ মহাকাব্যের একমাত্র কাব্যরস।'

বঙ্কিমচন্দ্রের না ছিল কি? প্রসন্ন গোয়ালিনী, মঙ্গলা গাই, ভীষ্মদেব খোসনবীস, নসীরামবাবু, স্বয়ং কমলাকান্ত, তাহার আফিঙের ডেলা, তাহার প্রসাদে দিব্যদৃষ্টি, সর্বোপরি কল্পনার রঙীন চশমা। তা ছাড়া চাতক-চকোর, দিবাকর-নিশাকর, কূজন-গুঞ্জন দখিনা পবন কিছুরই অভাব হইত না। তবু তাহারা সকলেই কেমন যেন আল্‌গা আল্‌গা রহিয়া গেল, বেশ আঁটসাট হইয়া জমাট বাঁধিয়া উঠিল না। মনচুরির ব্যাপার লইয়া কমলাকান্ত মাত্র একটু রসিকতা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহা বঙ্কিমবাবুর মোটেই পছন্দসই হইল না, অমনি তর্জন-গর্জনে তাহাকে বিদায় করিলেন—সামান্য একটু অছিলায়ও রতিপতি এমুখো না হন, কোন অজুহাতে কোথায়ও ঢুকিয়া না পড়েন সেই দিকে তাঁহার কড়া নজর ছিল। চারিদিকেই কাঁটার বেড়া খাড়া করিয়া ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন সাইনবোর্ড, বড় বড় হরফে রং করা 'প্রবেশ নিষিদ্ধ'। মতলবটা অনধিকারপ্রবেশ করিলেই যেন ভস্ম করিয়া ছাড়িবেন। তাই ক্ষেত্রই প্রস্তুত হইয়া রহিল, কিন্তু তাহাতে প্রেমের বীজ পড়িয়া অঙ্কুর গজাইয়া উঠিল না। কোন দিন পথ ভুলিয়া আসিয়াও দখিনা হাওয়া ভিতরের পর্দাখানি একটু সরাইয়া দিয়া চারিচোখের চোরা চাহনির পথটা খুলিয়া দিল না। এমন হইবারই কথা। নিতান্ত একটা ভবঘুরে, গুণের মধ্যে সে আফিংখোর, জীবনে যার এক পয়সার সম্বল নাই, মাথা গুঁজিবার মত ত্রিভুবনে যার এতটুকু ঠাঁই নাই তাহাকে লইয়া উপন্যাসের কৌলীন্য বজায় থাকে কেমন করিয়া? 'যস্য ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ' উপন্যাসের বাজারে তাহার দর যাচাই করিতে যাওয়া নিছক বিড়ম্বনা। তবে যে মুচিরাম গুড় আসর জঁাকাইয়া বসিল তা শিশুকাল হইতেই সে বাবাকে শালা বলিতে শিখিয়াছিল বলিয়া নয়। সে রহস্যের চাবিকাঠি অন্য কোথাও আছে। রজতচক্রের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক ছিল কি না ইচ্ছা করিলে গবেষকেরা সেই বিষয়ে গবেষণা চালাইতে পারেন। তারপর কেহ কেহ হাতে পায়ে ধরিয়া কোনমতে উপন্যাসের আসরে আসিবার অনুমতি পাইলেও কোনরূপ মর্যাদাই তাহাদের কপালে জুটিল না। না হইলে চন্দ্রশেখরের মত লোকের কপাল পুড়িবে কেন? পাইয়াও তিনি শৈবলিনীকে রাখিতে পারিলেন না কেন? যৌবনের ভরা জোয়ারে শৈবলিনীর প্রতি অঙ্গের উপর দিয়া যে লাবণ্যের বান ডাকিয়া গেল, তাহাতে প্রতাপ ডুবিল, শৈবলিনী নিজে ভাসিয়া গেল, চন্দ্রশেখর তখন পুঁথির ভিতর মাথা গুঁজিয়া তত্ত্বের অথৈ জলে একেবারে বেহুঁস হইয়া আছেন। বনবাসে কোন রকমে বাঘের গ্রাস এড়াইয়া আসিলেও নবকুমার

কাপালিকের কাছে করালী চামুণ্ডার বলি হইয়াই রহিল। কপালকুণ্ডলা অনেকটা ঝুঁকি ঘাড়ে লইয়াই তাহাকে মৃত্যুর মুখ হইতে টানিয়া আনিল, কিন্তু সে-ই আবার তাহাকে সর্ব্বনাশের মুখে ঠেলিয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। স্বামিগৃহকে নরককুণ্ড জানিয়া সূর্য্যমুখী মরিতে গিয়াও মরিতে পারিল না, আবার ফিরিয়া আসিয়া তাহারই মধ্যে তাহাকে ঘরকন্না ফাঁদিয়া বসিতে হইল। ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, সে ত জমিদার নগেন্দ্রনাথের তিনমহলা চকমিলান আর চোখ-ধাঁধান ইমারত।

তা ছাড়া কথায় বলে একহাতে তালি বাজে না। পুরুষ মহাপুরুষ হইলেও শুধু তাহাকে লইয়া ঘরসংসার চলে না। এইজন্যই সৃষ্টির মূলে প্রকৃতি-পুরুষের কল্পনা—অর্দ্ধনারীশ্বরে তার রূপায়ণ। বাইবেলে আদমের হাড়পাঁজরা হইতে ইভের জন্ম, তাই অর্দ্ধাঙ্গিনী আমাদের আদুরে সোহাগিনী। তাই শুধু কমলাকান্তকে দিয়া আর কি হইবে? সর্ব্বদোষের রাহুগ্রাস হইতে ছাড়া পাইলেও শুধু তাহাকে লইয়া আর যাহাই চলুক না কেন, অন্ততঃ উপন্যাসের বাজার বসানো চলে না। কথা উঠিতে পারে, প্রসন্নও ত ছিল, তাহাকে লইয়াও নায়িকার কাজটা চলিতে পারিত। হাঁ, প্রসন্ন ছিল বটে এবং সতীসাধ্বী পতিব্রতা বলিয়া তাহার কিছু সুনামও ছিল। কমলাকান্ত যে বলিয়াছিল—একপোয়া দুধে তিন পোয়া জল দেখিলেই চিনিতে পারা যায় প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ, একথা তাহাকে অসতী বলা যায় না, কেন না ইহা নিছক রসিকতা। তবে সাধু ঘোষের স্ত্রী বলিয়া সাধ্বী এবং বিধবা হইয়াও পতিছাড়া নহে একজন্য পতিব্রতা—ইহা বদলোকের বদমেজাজী হুকার, মোটেই গ্রাহ্য করিবার মত নয়।

আসল কথা প্রসন্ন জাতিতে গয়লানী, তাহার উপর আবার বিধবা। ঘরে নাই কানাকড়ির পুঁজি, কাজের মধ্যে দুধ দই মাথায় করিয়া পাড়ায় পাড়ায় বিক্রী করা। এইরূপে কোন রকমে হাড়মাস জোড়া দিয়া তাহার দিন গুজরান হয়। কিসের গরজে এবং কোন্ খেয়াল-খুশীতে বিধাতা ইহাদের মত জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহারা সংসারের কি কাজে লাগিবে তা জানার প্রয়োজন না থাকিলেও এটুকু জানা উচিত যে, উপন্যাসের ভোজসভায় ইহারা ছিল অপাংক্তেয়। কখনো যেন এইসব অনাহূত রবাহুতের দল কোন ছুতায় ঢুকিয়া না পড়ে সেইজন্য দেউড়িতে দারোয়ানের ব্যবস্থা করিতেই হয়। শুধু তাই নয়, 'বন্ধ দুয়ার দেখ্‌লি বলে, অমনি কি তুই আস্‌বি চলে'—এই জিগির তুলিয়া, সকল রকম বিধি-নিষেধের আগল ভাঙিয়া, যাহারা একরকম জোর করিয়াই উপন্যাসের অন্দরমহলে ঢুকিয়া পড়িল, তাহাদের জন্য অনধিকার-প্রবেশের অভিযোগে পুলিস ডাকিতে হয় নাই বা হাজত-বাসের হুকুম হয় নাই সত্য, কিন্তু মনে হয় তাদের প্রবেশাধিকার না দিলেই ছিল ভাল। বিধবার কন্যা অনাথা কুন্দ, তাহাকে আপন কুটিরেই মানাইত ভাল। ঠেলাধাক্কা খাইয়া গড়াইতে গড়াইতে কোন রকমে হয়ত তাহার দিন কাটিয়া যাইত, কিন্তু কিসে তাহাকে পাইয়া বসিল। সর্ব্বনাশের পাখা মেলিয়া সে উড়িয়া আসিয়া বসিল কুটীর হইতে একেবারে জমিদার নগেন্দ্রনাথের অন্তঃপুরে। এই অপরাধেই কি এই বিরাট সংসারে তাহার জন্য শুধু মরণের পথটাই খোলা রহিল। যে কাননে কত ফুল ফুটিল, সৌরভ ছুটিল, সেখানে 'অকালে কুন্দকুসুম শুকাইল' কেন? পরের বাড়ী হাঁড়িকুড়ি ঠেলিয়া হেঁসেলের মধ্যেই বিধবা রোহিণী তাহার দুনিয়াদারী লইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু সে যখন ধাক্কা খাইয়া বাহিরে আসিয়া 'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ'র মতই হরলালের দিকে হাত বাড়াইল, তখন অলক্ষ্যে বসিয়া বিধাতা-পুরুষ বোধ করি একটু মুচ্‌কি হাসিয়া লইলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাহার কপালে না জুটিল হরলাল, না টিকিয়া গেল গোবিন্দ-লাল। তাহার জন্য বাছিয়া বাছিয়া বরাদ্দ হইয়া রহিল পিস্তলের গুলি এবং বোধ হয় পাথেয়-স্বরূপ একরাশ গায়ে-পড়া বহুমূল্য উপদেশ। তবে যে রজনী অন্ধ হইয়াও অচল হইয়া রহিল না, তাহার কারণ সে রাজকন্যা। রাজকন্যা অন্ধ হইলেও চোখ ফুটিতে কতক্ষণ?

যাহা হউক, এক দিন কমলাকান্ত সকলের মায়া কাটাইয়া উধাও হইয়া গেল। যাইবার বেলায় লোকহিতৈষণা প্রবৃত্তি তাহার কিছু প্রবল হওয়ায় সে দপ্তরটি বক্‌শিস করিয়া গেল। উহা নাকি অনিদ্রা-রোগে ধন্বন্তরি বিশেষ। যাহারা কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমায় এই দাওয়াইটি তাহাদের কোন কাজে লাগে কিনা জানা যায় নাই। এই দেশে ঐরূপ একটি দাওয়াইয়ের বিশেষ প্রয়োজন। বর্ত্তমানের কাজ অনিদ্রা তাড়ানো নয় সুনিদ্রা ভাঙান। কেননা আমরা সকলেই প্রায় এক একটি আস্ত কুম্ভকর্ণ-বিশেষ।

সেই যে কমলাকান্ত চলিয়া গেল বঙ্কিমচন্দ্র আর তাহার কোন হদিস পান নাই। কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা ডুবিল' বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে হাল ছাড়েন, দামোদর সেই হাল ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া লন।

নিরুদ্দিষ্ট কমলাকান্ত সম্বন্ধে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাদের মনে হয় এই নেশাপ্রিয় ব্রাহ্মণ তনয় বঙ্কিমচন্দ্রকে ছাড়িয়া শরৎ চন্দ্রের আশ্রয় লইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আধ আলোতে যে কুঁড়ি কুটি করিয়াও ফুটিতে পায় নাই তাহাই শরৎ চন্দ্রের পূর্ণ আলোতে পাপ্‌ড়ি মেলিয়াছে তবে 'কমলাকান্ত' 'শ্রীকান্ত' হইয়াছে এই যা তফাৎ। শ্রীকান্ত যে কমলাকান্তেরই চেহারা বদল তাহা সহজেই মালুম হইবে। প্রথমেই দেখুন নামটা। 'কমলা' যে 'শ্রী' ছাড়া আর কেহ নয় অভিধানেই তাহার অকাট্য প্রমাণ মিলিবে

পাতা খুলিলেই সেখানে চোখে পড়িবে 'লক্ষ্মী: পদ্মালয়া পদ্মা কমলা শ্রীহরিপ্রিয়া'। 'কমলা' 'শ্রী' হইয়াছে বিশ্রী ত হয় নাই। হইবে না কেন? হালের রেওয়াজ দাঁড়াইয়াছে তাই।

এখন যে কুমুদিনী সৌদামিনী সরোজিনী পঙ্কজিনী মাতঙ্গিনী ইন্দুনিভাননীকে সরিয়া গিয়া যুঁই বেলা কৃষ্ণা শিপ্রা রেবা রেখার দলের জন্য পথ করিয়া দিতে হইয়াছে! ইহাতে বর্ণে যেটুকু ফিকা হইয়াছে, লাবণ্যে সেটুকু ফুটিয়াছে; বর্ণবাহুল্য যেটুকু গিয়াছে গড়নপেটনে সেটুকু পুরিয়াছে। কমলা যেন কতকটা শিথিল, কেমন যেন আল্‌গা আল্‌গা ঢিলাঢিলা; শ্রী বেশ গোলগাল, আঁটসাঁট, একেবারে যেন ঠাসবুনানি।

শ্রীকান্ত যে বামুন বিনা আপত্তিতে ইহা মানিয়া লওয়াই ভাল। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে হয়ত রাগিয়া বলিয়া বসিবে 'দেখছ না গলায় আমার ঝুলছে কেমন পৈতে, আমি যে কুলীন বামুন একথা কি আর কইতে।' পাঁড়েজী যে বলিয়াছিল, বামুন বলিয়াই সে যাত্রা শ্রীকান্ত শ্মশান হইতে প্রাণটা লইয়া আসিয়াছিল তাহা মোটেই মিছা কথা নহে। বামুন বলিয়া এক জন ত রেঙ্গুনের রাস্তার উপরই তাহার পায়ের উপর ঢিপ করিয়া পড়িল। আজিকার দিনে যেখানে হিন্দু কোড বিলের বিধানে বামুন কায়েত শূদ্রের ব্যবধানটাই লোপ পাইতে বসিয়াছে সেখানে শ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তী কি চাটুজ্জে তাহা লইয়া কাহারও বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার কথা নয়।

শ্রীকান্তও কিছু লেখাপড়া জানিত, কিন্তু তাহার দৌড় কি পর্য্যন্ত এখানে ওখানে হাতড়াইয়াও তাহার কোন ঠিকঠিকানা মিলে না। তবে স্কুলের অনেকগুলি সিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া সে যে একেবারে ডগায় চড়িয়া বসিয়াছিল অর্থাৎ এনট্রান্স ক্লাসের পড়ুয়া হইতে পারিয়াছিল তাহার নজির হাজির রহিয়াছে। স্কুলের সীমা-সহরদ্দ ছাড়াইয়া অনেকটা দূরে সরিয়া যাইবার পর পুঁথিপত্রের সঙ্গে মাঝে মাঝে মোলাকাৎ হইলেও বিদ্যাটা তাহার ঠিক কেতাবদুরস্ত হইয়া উঠে নাই। বলা বাহুল্য, এ বিদ্যাও তালুকমুলুক করিবার মত নহে। অন্তত: তাহার বেলায় তালুকমুলুক করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। কেহ তাহাকে ডাকিয়া লইয়া চাকুরী করিয়া দেয় নাই, রেঙ্গুনের কথায় তাহার মায়ের 'গঙ্গাজল' যে বলিয়াছিল জাহাজ হইতে নামিতে না নামিতে সাহেবেরা বাঙালীদের কাঁধে তুলিয়া লইয়া গিয়া চাকুরী দেয় ইহা নিতান্তই শিকার পাকড়াও করিবার ছেঁদো কথা। রেঙ্গুনের পথে পথে ঘুরিয়া, অনেক কাঠখড় পোড়াইয়া এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তাহাকে চাকুরী জুটাইতে হইয়াছিল—আপনি আসিয়া জুটে নাই। বোধ হয় ইংরেজী পড়নেওয়ালা এবং বুঝনেওয়ালারা দলে এত ভারী হইয়া উঠিয়াছিল যে কে কাহাকে ডাকিয়া চাকুরী দেয়। তা ছাড়া ফন্দি-ফিকির, তদ্বির-তদারক, সই-সুপারিশ, ঘুষঘাষ বলিয়াও ত কতকগুলা কথা আছে। না হইলে করিয়া খাইবার জন্য তাহাকে সাগর পাড়ি দিয়া সুদূর বর্ম্মামুলুকে ছুটিতে হইবে কেন? তবে চাকুরীর মসনদে বসিয়া কখনো তাহাকে কাব্যচর্চ্চায় মাতিয়া উঠিতে দেখা যায় নাই, আপিসের খাতাপত্রে আপিসের হিসাবপত্র ছাড়া কখনো কবিতার মহামারী লাগিয়া যায় নাই। বরং কাব্যরসের বদলে যাহাতে চাকুরীটা বজায় থাকিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ গব্যরসের সংস্থান হইতে পারে সেই দিকেই তাহার মন পড়িয়া থাকিত। সুতরাং চাকুরীতে তাহার জবাব হওয়া ত দূরের কথা সে 'হাত বাহির করা টেবিল ছাড়িয়া একেবারে সবুজ বনাতমোড়া টেবিলের' মালিকানায় বহাল হইয়া গেল এবং মাহিয়ানার অঙ্কটাও ফুলিয়া ফাঁপিয়া আড়াই গুণ হইয়া উঠিতে একটুও টালবাহানা করিল না।

শ্রীকান্তের বাল্যকালটা কাটিয়াছিল অদ্ভুত রকমে, ঠিক আর পাঁচটা ছেলের মত নয়। নিতান্ত সুবোধ ছেলের মত খানকতক কেতাব কায়দা করিতে করিতে একজামিনের পর একজামিন পাশ করিয়া দশ জনের বাহবা কুড়াইবার জন্য তাহার কোনই মাথাব্যথা ছিল না। বরং দৌড়াইয়া ছুটিয়া, লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া গাছে উঠিয়া, নৌকা চড়িয়া, ছিপ ফেলিয়া, দেয়াল ডিঙ্গাইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি, ঠেলাঠেলি, করিবার দিকেই তাহার মাথা খেলিত বেশী। ইহার উপর সাথী জুটিল ইন্দ্রনাথ—ঠিক যেন 'মুড়ির সঙ্গে কড়াই ভাজা, মদের সঙ্গে হরিনাম।' ইন্দ্রনাথ ছিল আরও অদ্ভুত। সে যে ঠিক কেমন বলা শক্ত, তবে তাহার প্রকৃতি বুঝাইতে 'ধস্যি ছেলে', 'দস্যি ছেলে', 'ডাকাত ছেলে' এবং আরও ঐ গোত্রের নাকসিটকানো এবং মুখ-ভেঙচানো বিশেষণগুলিই চলিত ছিল। সে ছিল দাঙ্গাহাঙ্গামায় পাকা, ভয়ডর বলিয়া কোনকিছু তাহার ছিল না। হাত দুখানি ছিল 'হাত-তিনেক করিয়া লম্বা', বুকখানা বোধ হয় পাথর দিয়া তৈরি, কিন্তু ঐ পাথরের মধ্যেই আবার স্নেহ-কারুণ্যের ঝরণাধারা বহিত। স্কুলে সে ঢুকিয়াছিল কিন্তু বীণাপাণির সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায় এবং মাষ্টারমশায়ের জবরদস্তির জন্য সে কলম ফেলিয়া নৌকার হাল ধরিল। শ্রীকান্ত তাহার সাগরেদি করিয়া হাত পাকাইল এবং রাত-বেরাতে নদী নালা, বনবাদাড়, শ্মশান-মশানে ঘুরিয়া গুরুর যোগ্য চেলা হইয়া উঠিল।

অর্থে শ্রীকান্তের কোন প্রয়োজন ছিল না বলিতে পারিলে হয়ত শুনাইত ভাল। যাঁহারা অর্থই সকল অনর্থের মূল বলিয়া গলাবাজি আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহারাও খুশী হইতেন, কিন্তু তাহাতে সত্য কথাটা চাপা পড়িয়া যাইত। তাহার নিজের জন্য তেমন না হোক অন্তত: পরের জন্যও তাহার কিছু কিছু অর্থের প্রয়োজন হইত। না হইলে আজ পর্য্যন্তও বোধ হয় তাহার মায়ের 'গঙ্গাজল'-দুহিতা এবং পুঁটুর আইবুড়ো নাম

ঘুচিত না। ধূমপানে শ্রীকান্তের অভ্যাস থাকিলেও তাহাকে 'খোর' বলা চলে না। চুরুটের ধোঁয়া ফুঁকিয়া ফুঁকিয়া তাহার হাতে খড়ি হইলেও সে বহাল হইয়াছিল গুড়গুড়িতে। আফিং গাঁজায় মজিয়াছিল তেমন প্রমাণ নাই। এমন কি সিদ্ধিতেও তাহার সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া উঠে নাই।

গুড়গুড়ির অভাবে তাহার কি হাল হইত বুঝিয়া উঠা দায়, কিন্তু তাহার ধোঁয়ায় তাহার মাথা খুলিয়া যাইত ইহারও প্রমাণাভাব। কেহ তাহাকে পাগল বলিত এমন শোনা যায় নাই, তবে তাহার স্বভাবটা ছিল ভবঘুরেগোছের। কোথাও দু'দিন স্থির হইয়া বসা তাহার কুষ্টিতে ছিল না। সুতরাং তাহার ছিল 'ছি-ছি' মার্কামারা একটানা একটা হতচ্ছাড়ার জীবন। তাহার মধ্যেকার এই ভবঘুরেটাই তাহার ছন্নছাড়া জীবনের ছিন্নসূত্রগুলি কোনরূপে জোড়াতালি দিয়া ভ্রমণ-কাহিনীর ভিতর দিয়া আমাদের সামনে হাজির হইয়াছে। তাহার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও ছিল না বলিয়া সে তাহার পোড়া দু'টা চোখে যাহা দেখিয়াছে তাহাকে ঠিক তাহাই দেখিয়াছে, জলকে জল এবং আকাশকে আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখে নাই। আকাশের দিকে চাহিয়া ঘাড়ে ব্যথা হইয়া গিয়াছে কিন্তু কাহারও নিবিড় এলোকেশের রাশি ত চুলোয় যাক্ একগাছা চুলও চোখে পড়ে নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গেলেও কাহারও মুখচন্দ্রমা তাহার নজরে পড়ে নাই। কাজেই তাহাকে সত্য কথাটাই সোজা করিয়া বলিতে হইয়াছে। কোনরূপ রং ফলাইয়া, পালিশ লাগাইয়া খরিদ্দার হাত করিবার বুজরুকি করিতে হয় নাই। বোধ হয় ইংরেজীতে ইহাকেই বলে—'To call a spade a spade.' মোট কথা রাখিয়া ঢাকিয়া বলা অর্থাৎ ঢাকঢাক গুড়গুড় ভাব তাহার মনে কখনো ঠাঁই পায় নাই।

পাগলামি এবং কবিত্ব তাহার কাছ ঘেঁষিতে না পারিলেও প্রেমের হাটে সে বড় করিয়াই চালা বাঁধিয়াছিল এবং দামী জিনিষেই দোকান সাজাইয়াছিল। বিবাহের দিকে তাহার তেমন টান না থাকিলেও নিতান্ত চাপিয়া বসিলে বিবাহের বোঝা ঘাড়ে করিতে সে মোটেই পিছ-পা ছিল না। পুটু ত পোটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া ঝুলিয়া পড়িবার জন্ত একরকম প্রস্তুত হইয়াই ছিল, শেষ পর্য্যন্ত রাজলক্ষ্মী বাঁকিয়া বসিয়াই সব মাটি করিয়া দিল।

সংসারে শ্রীকান্তের আপনার জন বলিতে বড় কেহ ছিল না, কিন্তু এমন একটাকিছু তাহার মধ্যে ছিল যাহাতে সে পরকে আপন করিয়া লইতে পারিত। কত দেশ-দেশান্তরের মাটিই না সে দুপায়ে মাড়াইয়াছে, বনে গিয়াছে, শ্মশানে ঘুরিয়াছে, মোসাহেবি করিয়াছে, গেরুয়া ধরিয়াছে, রোগীর পাশে বসিয়াছে, মড়া ঘাড়ে করিয়াছে—এমন কি আপিসের বড়বাবু পর্য্যন্ত হইয়াছে। এই জীবনে দয়ামায়া স্নেহ হিংসাদ্বেষ প্রেম-প্রীতি কলহ-ঈর্ষার জটিল-কুটিল আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়াছে এবং কত রকম-বেরকম মানুষের সঙ্গেই না তাহার পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু সকলের সঙ্গেই নিজের সম্পর্কটাকে যথাসম্ভব মধুর ও মোলায়েম করিয়া লইতে সে ত্রুটি করে নাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটাকে সে সত্যদৃষ্টি দিয়া যাচাই করিয়াছে এবং তাহার উচিত মূল্য দিতে কখনো কসুর করে নাই। নারীকে বিচার করিতে গিয়া সে কখনো নারীত্বের অবমাননা করিয়া বসে নাই। জীবনের রঙ্গমঞ্চে সে নিজেও অভিনয়ে নামিয়াছে, দর্শকের গ্যালারিতে বসিয়া দূর হইতে হাততালি দেয় নাই।

তাহার জীবনের ভারকেন্দ্রটা নানা দিকে হেলিয়া দুলিয়া শেষে একটা জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সবাই তাহাকে জানিয়া রাখিল পাটনার বিখ্যাত পিয়ারী বাঈজী বলিয়া। তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই উদ্ভ্রান্ত গ্রহের মত জীবনের পথে সে অবিরত ঘুরিয়াছে, কখনো কক্ষচ্যুত হইয়া পড়ে নাই। কে'ন্ শৈশবে রাজলক্ষ্মী বৈঁচির মালা গাঁথিয়া সাগ্রহে তাহার গলায় পরাইয়া দিত, তাহার পর পিয়ারী বাঈজীর বিড়ম্বিত জীবনের বন্ধুর পথেও সে নিজেকে হারাইয়া ফেলে নাই, তাহার আসল সত্তা শুধু আত্মগোপন করিয়াছিল। তাই এক দুর্য্যোগের রাত্রিতে পিয়ারী বাঈজীকে জীর্ণবাসের মত পরিত্যাগ করিয়া তাহার ভিতর হইতে ধ্রুবজ্যোতির দিগ্‌দর্শনী লইয়া বাহির হইয়া আসিল রাজলক্ষ্মী। সেইদিন শিকার-পার্টির আসরে পিয়ারী বাঈজী মরিয়া রাজলক্ষ্মীকে চিরদিনের জন্ত বাঁচাইয়া দিল।

শ্রীকান্তের জীবনের গ্রন্থিগুলা এই নারীর জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়া পাক খাইতে খাইতে অম্লান প্রণয়ের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রচনা করিয়াছে। তাহার অনেকগুলি অধ্যায় জুড়িয়া রহিয়াছে তিনটি নারী, নারীত্বের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ধৈর্য্য ও মাধুর্য্য লইয়া—তাহারা অন্নদাদিদি, অভয়া ও কমলিলতা। জানি, সতী সাবিত্রী বলিয়া তাহাদের পায়ে মাথা ঠেকাইবার জন্ত কেহ বসিয়া নাই, কিন্তু যথার্থ প্রেমের যদি কিছুমাত্র মূল্য থাকে তবে ইহাদিগকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে হইবে কেবল গায়ের জোরেই শুধু হাতে বিদায় করা চলিবে না।

দুনিয়ার যত হতভাগা ও হতভাগিনীদের লইয়াই শ্রীকান্তের জীবনের যাহা-কিছু সঞ্চয়। ভাল যাহারা তাহারা হয়ত ভালই, কিন্তু মন্দের ভিতরে ভালটুকু দেখিয়া লইবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা তাহার ছিল। সে জানিয়াছিল প্রেমপ্রীতি এমন জিনিষ নয় যে শুধু দর চড়াইয়া তাহার সেরা জিনিষটুকু ঘরে তোলা যায়। ও জিনিষ ওজনদরে বিক্রী হয় না, বহর মাপিয়াও কেহ উহা কিনিতে যায় না, এমন কি পেটেণ্ট আপিসের ছাপ মারিয়াও উহা বাজারে চালু করা যায় না।

প্রেমপ্রীতি ভালবাসা—এক কথায় মানুষের হৃদয় লইয়া যদি সাহিত্যের কারবারে নামিতে হয় তবে শুধু ক্লাইভ ষ্ট্রীটের

দিকে চাহিয়া থাকিলে লোকসানের অঙ্কটাই ব্যাঙের মত লাফাইয়া চলিতে থাকিবে এবং লাভের দিকটায় কেবল শূন্যের পর শূন্যের জঞ্জাল জমিয়া উঠিবে। তাই শরৎ চন্দ্রকে উপন্যাসের উপকরণ কুড়াইতে গিয়া নামিয়া আসিতে হইয়াছে পথঘাট, হাটবাজার, গলিঘুঁজির মধ্যে। সমাজের যাহারা 'কেউকেটা' নয়, তাহাদেরই ডাকিয়া আনিতে হইয়াছে, 'কেষ্টবিষ্টু'দের ধার ঘেঁষিয়া যাইতেও তাহার দ্বিধা-সঙ্কোচের অবধি ছিল না। তাই সেকালের 'কমলাকান্ত' তাহার হাতে পড়িয়া হইল একালের 'শ্রীকান্ত।'

আফিং ছিল কমলাকান্তের হাতিয়ার, খোলা চোখ দুটা শ্রীকান্তের এক্তিয়ার। উভয়েরই চাকুরী হইয়াছিল—একজন রাখিতে পারিল না, আর একজন থাকিতে চাহিল না। একজনের আশ্রয় চারিপায়া, আর একজনের দুই হাত দুই পা। একজন আশ্রম গড়িয়াছে, আর একজন ভাঙিয়াছে। কমলাকান্ত আকাশে উড়িয়াছে, শ্রীকান্ত মাটিতে গড়াইয়াছে। কমলাকান্ত কল্পনার ছায়া, শ্রীকান্ত বাস্তবের কায়া। কমলাকান্ত বুঝাইয়াছে প্রেমের তত্ত্ব, শ্রীকান্ত ঘাঁটিয়াছে প্রেমের তথ্য। কমলাকান্ত প্রসন্নকে দূরে সরাইয়াছে, শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে কাছে টানিয়াছে। কমলাকান্তের লক্ষ্য পরলোক, শ্রীকান্তের ইহলোক। কমলাকান্ত অতীত, শ্রীকান্ত বর্তমান। এক কথায় কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীকান্ত শরৎ চন্দ্র।

আলোচনা

"প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব"

শ্রীস্বাতী রায়

গত বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীপরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত "প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব" প্রবন্ধে ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের মুদ্রা সম্বন্ধে নানাকথা আলোচনা করেছেন।

এক জায়গায় তিনি লিখছেন, "কাশ্মীরের কবিশ্রেষ্ঠ কল্‌হনের রাজতরঙ্গিণী, বিশাখদত্তের দেবীচন্দ্র গুপ্ত এবং একটি প্রাচীন অনুশাসন থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই সম্রাট্ (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) উজ্জয়িনীর শেষ শক সম্রাট্ তৃতীয় রুদ্রসিংহকে যুদ্ধে পরাজিত করেন ও কৌশলে নিজ হস্তে তাঁর প্রাণনাশ করেন।"

সমগ্র রাজতরঙ্গিণীতে গুপ্তবংশের কোনও নৃপতির উল্লেখ মাত্র নেই। তৃতীয় রুদ্রসিংহ দূরের কথা, সুদীর্ঘ অষ্টম তরঙ্গ ব্যাপী এই গ্রন্থে কোন শক সম্রাটের নাম এমন কি শক কথাটি পর্য্যন্ত অনুল্লিখিত। এ অবস্থায় রাজতরঙ্গিণী কেমন করে যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের হস্তে তৃতীয় রুদ্রসিংহের পরাজয় ও মৃত্যু সপ্রমাণ করতে পারে—তা বোঝা দুষ্কর।

রাজতরঙ্গিণীর কথা ছেড়ে দিলেও অন্য এমন কোনো উপাদান কি বর্ত্তমান আছে যা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও তৃতীয় রুদ্রসিংহের সংঘর্ষ ও গুপ্তরাজের নিকট শকরাজের পরাজয় ও প্রাণনাশের কথা প্রমাণিত করে? দাসগুপ্ত মহাশয় বিশাখদত্তের দেবীচন্দ্রগুপ্তের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। 'দেবী চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের মাত্র কয়েকটি খণ্ডিত অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেখানে ধ্রুবদেবীর স্বামী চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক জনৈক শকরাজাকে হত্যার কথা লিখিত হয়েছে বটে, কিন্তু সে শকরাজা যে তৃতীয় রুদ্রসিংহ তার কি প্রমাণ আছে? গুপ্তযুগে শকরা শুধু পশ্চিম ভারতেই নয়, সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশাঞ্চলেও বাস করতেন। তা ছাড়া, বিশাখদত্ত কর্ত্তৃক উল্লিখিত ঘটনার মধ্যে কতটা যে সত্য ও কতটা কবিকল্পনা তাও তো জানা যাচ্ছে না। তৃতীয়তঃ যে একটি প্রাচীন অনুশাসনের কথা লেখক বলছেন তা সঞ্জান অথবা ক্যাম্বেতে প্রাপ্ত রাষ্ট্রকূট তাম্রশাসন, কারণ এই দুইটি শাসনেই জনৈক গুপ্তান্বয়ের উল্লেখ আছে যিনি তাঁর ভ্রাতাকে হত্যা করে ভ্রাতার রাজ্য ও পত্নী অধিকার করেন। অসম্ভব নয় যে এই 'গুপ্তাধম' দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁর ভ্রাতা দেবীচন্দ্রগুপ্ত উল্লিখিত রামগুপ্ত আর ভ্রাতৃজায়া ধ্রুবদেবী। কিন্তু লেখক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক শকরাজা তৃতীয় রুদ্রসিংহকে পরাস্ত করার ও কৌশলে নিজ হস্তে তাঁর প্রাণনাশ করার কাহিনী কোন্ অনুশাসনে পেলেন তা জানবার জন্য স্বতঃই ঔৎসুক্য বোধ করি।

গুপ্তরাজবংশের পতনের পর তাঁদের মুদ্রায় অনুকরণে উত্তর-ভারতে যে সকল মুদ্রা নির্ম্মিত হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দাসগুপ্ত গৌড়ের সম্রাট শশাঙ্কদেবের "শিব, বৃষ এবং চন্দ্রযুক্ত মুদ্রা" এবং "রাজলীলা" যুক্ত মুদ্রার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু "রাজলীলা" যুক্ত মুদ্রা শশাঙ্ক তৈরি করেন নি, করেছিলেন শশাঙ্কের প্রায় সমসাময়িক বাংলাদেশের অন্য একজন নৃপতি, যাঁর নাম সমাচারদেব

গুপ্ত সম্রাটগণের মধ্যে কোন্ জন কয়প্রকারের মুদ্রা নির্ম্মাণ করেছিলেন তার একটি হিসাব লেখক দিয়েছেন। তাঁর হিসাবে দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কোন প্রকার তাম্রমুদ্রা নির্ম্মাণ করেন নি। কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই প্রথম গুপ্ত সম্রাট্ যিনি স্বীয় নামাঙ্কিত তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন। জন এল্যান তাঁর ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মুদ্রার তালিকায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের তাম্রমুদ্রার কথা উল্লেখ করেছেন। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মেও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের তাম্রমুদ্রা রক্ষিত আছে।

দাসগুপ্ত মহাশয় গুপ্তসম্রাটগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বিভিন্ন রীতির

সুবর্ণ মুদ্রার যে হিসাব দিয়েছেন তাও সম্পূর্ণ নয়। তাঁর হিসাব মত বিভিন্ন রীতির (?) স্বর্ণমুদ্রা ব্যতীত নূতন নূতন আরও বহু রীতির সুবর্ণ মুদ্রার প্রচলন গুপ্তসম্রাটগণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে *Journal of the Numismatic Society*তে বৎসরাধিক কাল হতে অধ্যাপক আলটেকার বায়োনায় প্রাপ্ত গুপ্ত মুদ্রার যে তালিকা প্রকাশ করছেন—তার প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রকাশাদিত্যের মূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা বিশেষ ভাবে অঙ্কিত করে মুদ্রিত করা হয়েছে অথচ সমগ্র প্রবন্ধে প্রকাশাদিত্যের উল্লেখ পর্য্যন্ত নেই কেন, তা হৃদয়ঙ্গম হ'ল না।

জাগ্রত ভারত

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

স্বর্গ হইতে হৃত ভূখণ্ড—
হের এ ভারত ভূমি,
হীনতা এবং পরাধীনতার
গ্লানি ভুলে যাও তুমি।
হের আনার্ত্তি ধীর নির্ভীক জাতি—
সত্যধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া খ্যাতি,
জীবন যাদের সুদীর্ঘ এক
বসন্ত পঞ্চমী।

আকাশ—দেবের আঁখিতারা ভরা
দেখ উর্দ্ধেতে চাহি,
বায়ু রাজসূয় অশ্বমেধের
যজ্ঞ-গন্ধবাহী।
ভূতল ভূষিত মহতের পদরজে,
শান্তির বারি ছিটাইছে দিক্‌গজে,
দেব করুণার পবিত্র নীরে
উঠ তুমি অবগাহি।

জন্ম মুনি ও ঋষির গোত্রে—
অপাপবিদ্ধ, সৎ,
গৌরবময় অতীত তোমার,
উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।
শুদ্ধ তুমি যে, তুমি কল্যাণকৃৎ,
যুগে যুগে কর ধরাকে অকুৎসিত,
শুভ সুন্দর মঙ্গলময়
তোমার যাত্রাপথ।

সিদ্ধ শুদ্ধ এই মৃত্তিকা
বিবিধ জমাট স্নেহ,
উহার বিকার করিতে পারে না
দস্যু কি দানবেও।
মানুষ হয়েছে সতীর স্তন্য পিয়ে,
দেশ যে তোমার ঘেরা মহাপীঠ দিয়ে
কবর রচিয়া কলুষিত তারে
করিতে পারে না কেহ

হাজার বছর ব্যাপী দুর্গতি,—
দারুণ বিড়ম্বন,
মহাকাল দেহে মসীর বিন্দু
রহিবে কতক্ষণ?
গত-গর্ব্বের গলিত মেধের স্তূপ
ভাসে, গঙ্গার বদলাতে নারে রূপ,
বুকে আঁকা যার মহালক্ষ্মীর
শুভ্র আলিম্পন।

পুণ্য প্রাচীন এই ভারতের
প্রোজ্জ্বল ইতিহাস,
মানব জাতিরে ছোট-করা নয়,
বড়-করা তার আশ।
রাজরাজাদের খেয়াল খাতা সে নয়।
দেয় না দন্তী দুষ্টের পরিচয়,
মানব-মনের ক্রমোন্নতিই
হয় তাহে পরকাশ।

সে জানায় প্রতি অণুকণিকায়
হরির অধিষ্ঠান,
জ্যোতির্ম্ময়ের আলোক-প্রপাতে
করে এ ভুবন স্নান।
সব প্রাণময়, পরমাত্মার দেশ,
মৃত্যুতে হেথা কিছুই হয় না শেষ,
সকল প্রাণীই করিতেছে এক
অমৃতের সন্ধান।

তুলিয়া যেয়ো না নর-নারায়ণ
অধ্যুষিত এ ধাম,
শ্যাম ও শ্যামার আদরে শ্যামল
তরুলতা অভিরাম।
তোমার ফুলের গন্ধ তাঁহার প্রিয়,
তব ফল জল জেনো তাঁর গ্রহণীয়,
মধুর এ দেশ সব চেয়ে মধু
তব মুখে তাঁর নাম।

বামাহিতৈষিণী সভা ও ভারতাশ্রম

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

"স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনে কেশবচন্দ্র সেন" প্রবন্ধে প্রসঙ্গত: "বামাহিতৈষিণী সভা" ও "ভারতাশ্রমে"র কথা উল্লেখ করিয়াছি। কেশবচন্দ্র-প্রবর্ত্তিত সমাজ-কল্যাণপ্রচেষ্টাসমূহ সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করিতে হইলে এই দুইটি সম্পর্কেও আমাদের কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ কারণ ইহাদের কথাও এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অনুপ্রাণনায় ১৮৬৫ সনে কলিকাতায় ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় সমসময়ে ভাগলপুরে ও বরিশালে অনুরূপ সভা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ সভা ছিল নিছক ধর্ম্মসম্পর্কিত। নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনোদ্দেশ্যে ধর্ম্মের ভিত্তিতে বামা-হিতৈষিণী সভা নামক সর্ব্বপ্রথম মহিলা সমাজ বা সমিতি ১৮৭১ সনের ২৮শে এপ্রিল কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহায়তায় শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের বয়স্থা ছাত্রীগণ স্থাপন করেন। পরবর্ত্তী-কালে বহু ছাত্র-ছাত্রী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক হিসাবে ইহাকে তাহারও আদি বলা যাইতে পারে।

ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ইহার প্রায় এক বৎসর পরে ১৮৭২ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। একদল দেশহিতব্রতী ত্যাগী কর্ম্মী গঠনে এই আশ্রম কতখানি সহায় হইয়াছিল তাহা এতৎসম্পর্কিত আলোচনা হইতে জানা যাইবে। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় তথা বামাহিতৈষিণী সভাও পরে এই আশ্রমের অঙ্গীভূত হইয়া যায়।

১। বামাহিতৈষিণী সভা

বামাহিতৈষিণী সভা নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে ১৮৭১ সনের ২৮শে এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়াছি। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' এই সভার উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা এবং ইহার প্রথম দুইটি অধিবেশনের বিষয় বৈশাখ ১২৭৮ (মে ১৮৭২) সংখ্যায় এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন :

"গত আশ্বিন মাসের বামাবোধিনীতে একটি স্ত্রীসমাজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করা যায়, তদনুসারে কলিকাতায় কয়েক-বার স্ত্রীলোকদিগের একটি সভা হয় এবং কুমারী পিগট তাহার অধ্যক্ষতা করেন। আমরা পাঠকগণের অবগত করিয়াছি, এই সভা পরে ভারত সংস্কার সভার অধীনে বিদ্যালয় আকারে পরিণত হয় এবং তাহা হইতে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রস্তুত হইয়াছে।...এক্ষণে যারপর নাই মহোল্লাসের বিষয় বলিতে হইবে, সেই শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় হইতে আবার নারী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের কার্য্য যেমন চলিতেছে চলিবে, অথচ স্বতন্ত্র একটি সভাদ্বারা স্ত্রীজাতির সর্ব্ববিধায় উন্নতিসাধনের উপায় অবলম্বিত হইবে ইহা অপেক্ষা সুসংবাদ আর কি আছে ?

"ভারত সংস্কারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে এবং শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের উৎসাহে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার নাম বামাহিতৈষিণী সভা। বামাগণের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা ইহার উদ্দেশ্য। ইহার অধিবেশন পক্ষান্তে শুক্রবার অর্থাৎ মাসে দুই বার হইবে। সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মাক্রান্ত মহিলাগণ এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন, শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পুরুষ শিক্ষকগণও সভ্য শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। সভাস্থলে স্ত্রীজাতির হিতজনক রচনা পাঠ বক্তৃতা ও কথোপকথন হইবে। এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রায় ৩০ জন ভদ্র হিন্দু মহিলা উপস্থিত হন এবং মহামান্য জজ ফিয়ার সাহেবের স্ত্রী বিবি ফিয়ার দর্শক হইয়া আইসেন। সভাপতি বাবু কেশবচন্দ্র সেন সভাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। প্রথমত: বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। এবং তাহাতে তাহাদের শরীর মন ও আত্মা এই তিন বিষয়ক উন্নতি অর্থাৎ সুস্থতা, বিদ্যা ও ধর্ম্ম সাধন না হইলে পূর্ণ উন্নতিসাধন হইবে না সুন্দর রূপে প্রদর্শন করেন। পরে তাঁহার চারিটি ছাত্রী সেই বিষয়ে রচনা পাঠ করিলেন। কেশববাবু বিবি ফিয়ারকে এই সকল বিষয় ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিলে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সভ্য শ্রেণী মধ্যে তাঁহার নাম সংযুক্ত করিতে বলিলেন। কুমারী পিগট, ব্যারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ, বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু দুর্গামোহন দাসের পত্নীগণ ও উপস্থিত অন্যান্য মহিলাগণ সভার সভ্য হইলেন।"

বামাহিতৈষিণী সভার সভাপতি হইলেন কেশবচন্দ্র সেন এবং সম্পাদক শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী রাধারাণী লাহিড়ী। প্রথম বৎসরে প্রতিপক্ষান্তে অন্যূন ষোলটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। একটি অধিবেশনে নারীর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হয়। রাজলক্ষ্মী সেন এবং সৌদামিনী খাস্তগিরি এই বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং এই দুইটিই ১২৭৮, ভাদ্র সংখ্যা 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাঙালী মহিলার কিরূপ পরিচ্ছদ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রের সিংহগড় হইতে জনৈকা বঙ্গনারীর একখানি পত্র পরবর্ত্তী কার্ত্তিক সংখ্যা বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইল। ইনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।

রাণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড়গাছিস্থ উদ্যানে ১৮৭২ সনের ২৬শে এপ্রিল এই সভার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব হয়। স্থায়ী সভাপতি

কেশবচন্দ্র সেনের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হয়। সম্পাদক রাধারাণী লাহিড়ী বৎসরের কার্য্যাবলীর একটি বিবরণ পাঠ করেন। সূচনাতেই তিনি বলেন,—

"অন্ত কি শুভদিন! অদ্য আমাদের বামাহিতৈষিণী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন! ১২৭৮ সালের ১৭ই* বৈশাখ শুক্রবার এই সভা সংস্থাপিত হয়। স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির নিমিত্ত ভক্তিভাজন বামাহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন এবং স্ত্রীনর্ম্যাল ও বয়স্থা বিদ্যালয়ের অন্যতর শিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়দ্বয় ইহা স্থাপন করেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছা ছিল যে এই সভার তাবৎ কার্য্য স্ত্রীলোক-দিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা সমস্ত ভার গ্রহণে অসমর্থ হওয়াতে ইহাতে তাঁহাদিগকে কোন কোন অংশে সাহায্য করিতে হইয়াছিল। এই সভার স্থাপন অবধি এই পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত কেশব বাবু ইহার সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিতেছেন। নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্রীগণ লইয়াই প্রথমতঃ সভা সংগঠিত হয়, তাঁহারাই ইহার সভ্য শ্রেণীরূপে পরিগণিত হয়েন। ১৩।১৪ জন হইতে ক্রমে ক্রমে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে ২৪।২৫ জনে পরিণত হইয়াছে।"

সভার পাক্ষিক অধিবেশনগুলিতে যে যে বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল তাহা এই,—১ প্রকৃত শিক্ষা, ২ প্রকৃত স্বাধীনতা, ৩ স্ত্রীলোকদিগের নিরুদ্যম ও উৎসাহহীনতা, ৪ লজ্জা, ৫ বিনয়, ৬ অভ্যর্থনা, ৭ সভ্যতা, ৮ পরিচ্ছদ, ৯ নম্রতা, ১০ অহঙ্কার, ১১ ক্রোধ, ১২ গৃহকার্য্য, ১৩ পরস্পরের প্রতি ব্যবহার, ১৪ হিংসা, ১৫ ভগ্নীভাব, ১৬ দয়া। বলা বাহুল্য, কেশবচন্দ্রের সভাপতিত্বে ছাত্রীগণ আলোচনায় যোগদান করিতেন এবং এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের প্রবন্ধাবলীও পঠিত হইত। সভার নিয়মিত সভ্য ছিলেন রাজলক্ষ্মী সেন, সৌদামিনী খাস্তগিরি, সৌদামিনী মজুমদার, যোগমায়া গোস্বামী, সারদাসুন্দরী ঘোষ, বিধুমুখী মুখোপাধ্যায়, সরলাসুন্দরী দাস, সুশীলাসুন্দরী দাস, জগত্তারিণী বসু, ভবতারিণী বসু, কৃষ্ণবিনোদিনী বসু, জগন্মোহিনী রায়, কৈলাসকামিনী দত্ত, অন্নদায়িনী সরকার, কৃষ্ণকামিনী দেব এবং মহামায়া বসু। ইহা ভিন্ন সময়ে সময়ে ইংরেজ ও বাঙালী মহিলারাও সভায় যোগদান করিতেন।

প্রথম সাম্বৎসরিক সভায় রাধারাণী লাহিড়ী, সৌদামিনী মজুমদার প্রমুখ মহিলা ছাত্রীরা নারীজাতির উন্নতিমূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি কেশবচন্দ্র স্ত্রীজাতির শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করিলেন। ইহা হইতে স্ত্রীশিক্ষার ধারা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত—যাহা পরে ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে সম্যক্ পরিস্ফুট হয়, সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা করিয়া লওয়া যায়। তিনি বলেন,—

"স্ত্রী ও পুরুষ বিভিন্ন প্রকৃতি। উভয়ের স্বভাব ভিন্ন এবং অধিকারও ভিন্ন। দুই জনেরই উন্নতির পথে চলিবার অধিকার এবং উভয়েরই তদুপযোগী স্বভাব আছে। কিন্তু এ অধিকার ভিন্ন; যদিও পরিমাণে সমান। অধিকার প্রকৃতি ও স্বভাব অনুসারে। সাহস ও বলসাপেক্ষ কার্য্য পুরুষজাতির অধিকার; দয়া মমতার কার্য্য স্ত্রী জাতির কোমল প্রকৃতির উপযোগী। যখন স্ত্রী পুরুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, তখন তাঁহাদের উন্নতিসাধনের চেষ্টাও এ দেশে বিভিন্ন হওয়া উচিত। স্ত্রী জাতির উন্নতিসাধন তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ বিদ্যাশিক্ষা; ২ গৃহের সুনিয়ম সংস্থাপন; ৩ জনসমাজে স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার।

"দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয়, ভারতবর্ষের কোন স্থানে স্ত্রীশিক্ষার বিশুদ্ধ প্রণালী সংস্থাপিত হয় নাই। কেবল ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল প্রভৃতির আলোচনাতে স্ত্রীজাতির উন্নতি হয় এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। স্ত্রীজাতিকে স্ত্রীজাতীয় সদ্গুণে উন্নত করিতে হইবে, পুরুষজাতীয় গুণে তাহাদিগকে উন্নত করিলে উন্নতি না হইয়া অবনতিই করা হইবে। স্ত্রী জাতির যথার্থ উন্নতি করিতে হইলে হৃদয়ে স্বাভাবিক কোমলতা ও মধুরতা রক্ষা করিতে হইবে। কাঁঠালকে আম্র বা আমড়াকে নিম করিলে তাহাকে উন্নতি বলা যায় না। প্রকৃতি বিনাশ উন্নতি নহে। প্রকৃতি রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দেখা উচিত যে প্রকৃতিসঙ্গত শিক্ষা হইতেছে কি না? গৃহকার্য্য সম্পাদন, পিতামাতার সেবা, সন্তানপালন, পুরুষগণসহ সমুচিত ব্যবহার এ সকল বিশেষরূপে শিক্ষা করা উচিত ইতিহাস অঙ্ক ন্যায় প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিত হওয়া যায়, দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে সম্ভ্রান্ত লোকের বাটিতে বিদায় লাভ করা যায়, এক একজন স্ত্রী জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় বিখ্যাত হইতে পারেন; কিন্তু ইহা স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। বিশুদ্ধ স্ত্রী, বিশুদ্ধ মাতা, বিশুদ্ধ কন্যা, বিশুদ্ধ ভগ্নী হওয়া স্ত্রীজাতির জ্ঞানলাভের এই লক্ষ্য। স্বামী, কন্যা, মাতা ও ভ্রাতার প্রতি কর্ত্তব্য না জানা নারীদিগের পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয় মূর্খতা। কেবল ইতিহাস, ভূগোল পড়িলে তোমরা কৃতবিদ্য বলিয়া প্রশংসিত হইতে পারিবে না। ব্যাকরণে সন্ধি শিখিয়াছ বটে, কিন্তু আপনার পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে এখনও সন্ধি স্থাপন করিতে পারিলে না। যেখানে গৃহকার্য্যের সুশৃঙ্খলা নাই, বস্ত্র মলিন, শয্যা মলিন, শরীর অপরিষ্কৃত, বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব, যেখানে পিতামাতা পুত্র কন্যা ইহাদিগের মধ্যে অসদ্ভাব, স্বামী স্ত্রীতে অপ্রণয় ও অসম্মিলন, সেখানে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা নাই। যাহাতে পরস্পরের প্রতি বিশেষ অনুরাগ জন্মে, সংসার ধর্ম্ম পালনে তাচ্ছিল্য ভাব দূর হইয়া তৎপ্রতি অনুরাগ হয় এরূপ জ্ঞান শিক্ষা অত্যাবশ্যক।"*

বামাহিতৈষিণী সভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশনের

* ইহা ভুল। ১৬ই বৈশাখ হইবে।

* বামাবোধিনী পত্রিকা—বৈশাখ ১২৭৯ (মে ১৮৭২)

একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণও পাওয়া যাইতেছে। ১৮৭৩ সনের ২১শে জুন বেলঘরিয়ার এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এবারেও কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদিকা রাধারাণী লাহিড়ী বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করিলেন। ইহা হইতে জানা যায়:

"প্রতি পক্ষে শুক্রবার বেলা চারি ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় নানা কারণ বশতঃ প্রথম বৎসরের ন্যায় দ্বিতীয় বর্ষে ইহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় নাই। গত বৎসরে ক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ কয়েকটি পঠিত হয় ও তদ্বিষয় লইয়া সভাপতি মহাশয় সভ্যগণের সহিত আলোচনা করেন। আলোচনার পর সভাপতি মহাশয় মীমাংসা স্থির করিলে সভা ভঙ্গ হয়।"

বিভিন্ন অধিবেশনে যে কয়টি বিষয় আলোচিত হয় তাহা যথাক্রমে—(১) পুরাকালের হিন্দু ও বর্ত্তমানকালের সুসভ্য ইংরেজ রমণীদিগের কি কি গুণ অনুকরণীয়, (২) সন্তান পালন, (৩) দয়া, (৪) আদর্শ রমণী, (৫) বঙ্গীয় রমণীদিগের বর্ত্তমান অবস্থা এবং তাঁহাদিগের প্রতি ইংলণ্ডীয় নারীগণের কর্ত্তব্য, (৬) নারীগণের ধর্ম্মহীন শিক্ষা অনুচিত কিনা, কি প্রকার শিক্ষা দিলে নারীগণের সমগ্র উন্নতি হইতে পারে, (৭) নারীজীবনের উদ্দেশ্য। যে সব সভ্য সভায় নিয়মিত উপস্থিত হন তাঁহাদেরও নাম এইরূপ পাইতেছি, যথা—রাজলক্ষ্মী সেন, অন্নদাময়িনী সরকার, মহামায়া বসু, মহালক্ষ্মী ঘোষ, মতিমালা দেবী, মালতীমালা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলাসুন্দরী দাস, বরদাসুন্দরী চট্টোপাধ্যায়, নিস্তারিণী রায়, কৃষ্ণবিনোদিনী বসু, কুমারী সিংহ, কৈলাসকামিনী দত্ত, রাধারাণী লাহিড়ী। পূর্ব্ব বৎসরের মত এবারকার অধিবেশনগুলিতেও সময়ে সময়ে ইংরেজ ও বাঙালী মহিলারা উপস্থিত হইতেন।

আলোচ্য বার্ষিক অধিবেশনে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ এবং কলিকাতার ভদ্রপরিবারস্থ বহু মহিলা উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন নূতন সভ্য মনোনয়নের পর 'বিজ্ঞান পাঠের আনন্দ ও উপকারিতা' এবং 'শিক্ষিতা রমণীগণের কর্ত্তব্য' বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা পঠিত হয়। গৌরগোবিন্দ রায় (উপাধ্যায়), উমানাথ গুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিগণ সময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহার পর সভাপতি মহাশয় একটি সুদীর্ঘ, সরল ও মনোহর বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত সকলকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

বামাহিতৈষিণী সভার আর কোন বিবরণ এতাবৎ পাওয়া যায় নাই। কিছুকাল চলিবার পর এই সভাটির কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ "প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ" নামক পুস্তকে (পৃ. ৬৪) ২৯ মাঘ ১৮০০ শকের সভায় এই নির্দ্ধারণটি পরিদৃষ্ট হয়,—'ব্রাহ্মিকা সমাজ এবং বামাহিতৈষিণী সভা পুনরুদ্দীপনের কথা হইল।' ইহার পর সভা যে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাইতেছি। 'পরিচারিকা' আশ্বিন ১২৮৬ (১৮৭৯) সংখ্যায় "লণ্ডন" শীর্ষক একটি বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পাদটীকায় আছে, "বামাহিতৈষিণী সভায় সভাপতি কর্ত্তৃক বিবৃত।" এই সময় 'আর্য্যনারী সমাজ' (মে, ১৮৭৯) ও 'বঙ্গমহিলা সমাজ' (আগষ্ট, ১৮৭৯) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজের, বিশেষ করিয়া স্ত্রীজাতির উন্নতিমূলক কার্য্যে ইঁহারা ক্রমে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু এ বিষয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে বামাহিতৈষিণী সভাই প্রথম বলা চলে। ভারত সংস্কার সভার (Indian Reform Association) অধীনস্থ স্ত্রীজাতির উন্নতি বিভাগের সম্পাদকরূপে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত এবং বামাহিতৈষিণী সভার সম্পাদক শিক্ষয়িত্রী ও বয়স্থা বিদ্যালয়ের ছাত্রী রাধারাণী লাহিড়ীর কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া কেশবচন্দ্রের ইংরেজী জীবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"The steadiness and perseverance with which this gentleman (Umesh Chandra Datta, Principal, City College, Calcutta), a veteran in the cause of female education, has laboured in this department of the work of the Brahmo Somaj, deserves the highest praise. Miss Radharani Lahiri (Teacher, Bethune School, Calcutta) was the Secretary of the *Bama Hitaishini Sava* as long as the Society was alive. Her example and acquirements, the devoted self-sacrifice with which she has given the best years of her life to the improvement of her sex, have won the admiration of the whole Brahmo Community. This gentleman and lady were of great service to Keshub's cause at this time."*

২। ভারতাশ্রম

গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকেই কেশবচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এক দল যুবক গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। ক্রমে তাঁহারা নিজ নিজ পরিবার-পরিজনকেও লইয়া আসিতে বাধ্য হন। তাঁহাদের আশ্রয় বা আবাসস্থলের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে লাগিল। প্রথমে অনেকে একক ভাবে পরস্পরকে সাহায্য করিতেন। কিন্তু ক্রমশঃ পরিবার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে তাঁহারা কেহ কেহ একত্রে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। কেশবচন্দ্র এই সকল ব্রাহ্মকে একটি আদর্শ সুখী পরিবারে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৭২ সনের প্রারম্ভে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হইলেন। এই বৎসর ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বেলঘরিয়ায় জয়গোপাল সেনের উদ্যানবাটিতে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল।† কেশবচন্দ্র ইহার নাম দিলেন ভারতাশ্রম। আষাঢ় ১২৭৯ সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র

The Life and Teachings of Keshub Chandra Sen. By P. C. Mozoomdar, third edition, p. 156.

† আচার্য্য কেশবচন্দ্র ২য় খণ্ড—উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, পৃ. ৯২৭।

ভারতাশ্রম সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ বাহির হয়। ভারতাশ্রমের উদ্দেশ্য তাহাতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"যখন পুরাতন হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সংস্কার এদেশে প্রবল ছিল, তখন নর-নারীর একই ভাব ও রীতি ছিল। সুতরাং তাহারা এক প্রকার সদ্ভাবে ও কুশলে থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু একণে ইংরাজি শিক্ষা প্রভাবে হিন্দু সমাজের পত্তন ভূমি বিকম্পিত হইয়াছে এবং রীতি পদ্ধতি আচার ব্যবহার, এমন কি মনের সংস্কার ও রুচি পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইয়াছে। এ অবস্থায় ভগ্ন হিন্দু সমাজকে পবিত্র ধর্ম্ম ও উন্নত জ্ঞান অনুসারে পুনরায় গঠন করা আবশ্যক।

"এই উদ্দেশ্যেই ভারতাশ্রম খোলা হইয়াছে। কয়েকটি পরিবার নিয়মিত উপাসনা, বিদ্যাশিক্ষা ও স্বাস্থ্য সাধন দ্বারা বালক যুবা বৃদ্ধ সকলকে উন্নত করা সংস্থাপকদিগের লক্ষ্য। তাঁহাদের এই অভিপ্রায়, যে কিরূপে স্বীয় মন ও আত্মাকে রক্ষা করিতে হয়; পরস্পরকে ভাই ভগিনী বলিয়া ভালবাসিতে হয়; কিরূপে পিতামাতার সেবা ও সন্তান পালন করিতে হয়; ও কিরূপে ধর্ম্মের অনুগত হইয়া সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য সমাধা করিতে হয়, তাহা সকলে শিক্ষা করেন।"

ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠা তখন যুবক-মনে কিরূপ উন্মাদনার উদ্রেক করিয়াছিল, কেশবের অনুরক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর নিম্ন-লিখিত কবিতাংশটি তাহার প্রমাণ,—

"ভারতাশ্রম বাসিদিগের প্রতি।

কোথাকার যাত্রি তোরা ভাই রে।
বাঁধ ভেঙ্গে আসে ঢেউ, এবার বাঁচবে না কেউ
প্রেম সাগরে লেগেছে তুফান।
ঘন ঘন ঢেউ উঠে, ব্রহ্মাণ্ড বা যায় ফুটে
উত্তরেতে ডাকিতেছে বাণ।
ওই ডেকে আসে বাণ, সামাল আমার প্রাণ
ঢেউ খা রে নির্ভয় অন্তরে;
ও ঢেউ লাগিলে গায়, মহাপাপী স্বর্গে যায়,
দুঃখীদের দুঃখ শোক হরে।
ব্রহ্মনাম হৃদে ধরে, ব্রহ্মেতে নির্ভর করে,
ক্ষণ কাল এই কিনারায়
সাবধানে বসে থাক্, আগে বান ডেকে যাক্
পরে পাড়ি দিবি পুনরায়।
ওই দেখ সারি গেয়ে, আনন্দে আসিছে ধেয়ে
ছোট বড় কতগুলি তরি;
বোধ হয় যাবে পারে, দেখ যেন ভুল না রে
কাছে এলে যাস্ সঙ্গ ধরি।

কোথাকার যাত্রি তোরা ভাই রে।
সারি গেয়ে উচ্চ স্বরে, মহা কোলাহল করে,
কোথা যাস্ একা আমি যেতে যে ডরাই রে।
বসে শুধু ভাবিতেছি তাই রে।..."*

আশ্রমের বসবাস ও প্রাত্যহিক কার্য্য উক্ত নিবন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"আশ্রম মধ্যে ভিন্ন লোক ও ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের জন্য স্বতন্ত্র ঘর আছে। আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ঘরে তাঁহারা বাস করেন। উপাসনা বিদ্যাশিক্ষা ও আহার সাধারণ স্থানে নির্ব্বাহিত হয়। বায়ু সেবনের জন্যও নির্দ্দিষ্ট ছাদ আছে। ধর্ম্ম জ্ঞান সংসার সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা:—

৬টা	হইতে	৭	পর্য্যন্ত	পাঠ
৭টা	...	৮	...	স্নান
৮টা	...	৯।০	...	উপাসনা
৯।০	...	১০	...	গৃহকার্য্য
১০টা	...	১০।০	...	স্ত্রীলোকদিগের আহার
১০।০	...	১১	...	পুরুষদিগের আহার
১১	...	১২	...	গৃহকার্য্য
১২	...	৫	...	বিদ্যালয়
৫	...	৬	...	গৃহকার্য্য
৬	...	৭	...	বায়ু সেবন
৭	...	৮	...	পাঠ
৮	...	৯	...	উপাসনা
৯	...	৯।০	...	স্ত্রীলোকদিগের আহার
৯।০	...	১০	...	পুরুষদিগের আহার
১০	...	১১	...	পাঠ
১১	...	৫	...	নিদ্রা

ভারতাশ্রমের সঙ্গে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ও বামাহিতৈষিণী সভা যুক্ত হইল। একটি পুস্তকালয়ও স্থাপিত হইল। প্রতিষ্ঠা-বধি প্রথম দুই মাস বেলঘরিয়ায় থাকিয়া এপ্রিল মাসে আশ্রমটি রাণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড়গাছিস্থ উদ্যানবাটিতে স্থানান্তরিত হয় এবং এখানে এক মাস অবস্থান করে। তৎপর ইহা কলিকাতায় ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসে। আশ্রম পরিচালনা অর্থসাপেক্ষ। এ বিষয়ে উক্ত নিবন্ধে আছে,—

"আহার বিভাগের তত্ত্বাবধানের জন্য এক জন অধ্যক্ষ আছেন, তাঁহার এক জন বৈতনিক সহকারী আছেন। অধ্যক্ষ মহাশয় আহারের সমস্ত ব্যবস্থা করেন এবং যাহার যাহা প্রয়োজন তাহার বিধান করেন। সাধারণের জন্য অন্ন এবং

* ধর্ম্মতত্ত্ব—১ ফাল্গুন ১৭৯৩ শক। শিবনাথ শাস্ত্রী 'আত্মচরিতে' লিখিয়াছেন,—

"আমি কেশব বাবুর আশ্রমোৎসাহের মধ্যে প্রাণমন ঢালিয়া দিলাম। সে সময়ে আশ্রমের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখি, তাহা বোধ হয় ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।" ২য় সং, পৃষ্ঠা ১৮৩।

রুটির বরাদ্দ আছে। রোগ বা অস্বাস্থ্য হেতু বিশেষ পথ্যের প্রয়োজন হইলে চিকিৎসকের বিধানানুসারে তাহা দেওয়া হয়।"

আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রত্যেককে মাসে মাসে এইরূপ টাকা দেওয়ার বিষয় ধার্য্য হয়—পূর্ণবয়স্ক ৬৲ টাকা, ১০ বৎসরের ন্যূন বালকবালিকা ৩৸০ আনা, দুগ্ধপোষ্য ১।।০ আনা, ভৃত্য ৪।০ আনা। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধ, জলখাবার ইত্যাদির ব্যয় এবং ঘর-ভাড়া প্রত্যেকের স্বতন্ত্র দিতে হইত। এক জন অধ্যক্ষের হস্তে 'উপাসনার ও ধর্ম্মশাসনের' ভার অর্পিত ছিল।

সে যুগের নব্যবাংলার সামাজিক জীবন সংগঠনে ভারতাশ্রমের কৃতিত্ব অনন্যতুল্য। ভারত-সংস্কার সভার বিবিধ বিভাগের কার্য্য সম্পাদনের জন্য এক দল নির্ভীক সাংসারিক চিন্তা-বিমুক্ত ত্যাগী কর্ম্মীর প্রয়োজন ছিল। ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠাবধি এরূপ কর্ম্মীদলের অভাব বিদূরিত হইল, তাঁহারা বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনা করিতে সক্ষম হইলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত (২য় সং পৃ. ১৮১-৯৭) পাঠে ভারতাশ্রম সম্পর্কে অনেক কথা আমরা জানিতে পারি। আশ্রমবাসীদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান ছিল এবং কোন কোন বিষয়ে দ্বন্দ্ব, কলহ ভীষণাকার ধারণ করে। সংবাদপত্রেও নানারূপ সমালোচনা হইতে থাকে। কেশবচন্দ্র একবার একখানি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে বিচারাদালতের শরণ লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভারতাশ্রমের সার্থকতা স্বতঃই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। ভারতাশ্রমের শিক্ষয়িত্রী ও বয়স্থা বিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্রী সুদক্ষিণা গঙ্গোপাধ্যায় (পরে, সেন) ১৮৭৩ সনের ৮ই নবেম্বর এখানে আসিয়া যোগদান করেন। তখন আশ্রম ও বিদ্যালয় কলিকাতা ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। আশ্রমের লোকসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার অল্পকাল পরেই বর্ত্তমান ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের বিপরীত দিকে আপার সারকুলার রোডের পূর্ব্ব পারে ব্রজনাথ ধরের বাগান ও পুকুরসহ একটি বৃহৎ বাটিতে স্থানান্তরিত হয়। সুদক্ষিণা স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে ভারতাশ্রমের আভ্যন্তরিক ব্যাপারাদি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"প্রচারক উমানাথ গুপ্ত মহাশয় ভারতাশ্রমের আহারের ভার লইয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি ছিলেন ম্যানেজার। প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া বাজার করিতে যাইতেন। প্রতিদিনই ঝুড়ী ঝুড়ী মাছ তরকারী ও কলাপাতা ক্রয় করিয়া আনিতেন—প্রতিদিনই ভোজ। এতগুলি লোকের দুই বেলা আহারের আয়োজন করা সহজ ব্যাপার ছিল না। রান্না বাড়ীটি একটু দূরে পৃথক ছিল। সেটিও নিতান্ত ছোট নহে। দুই বেলাই আহারের জন্য ঘণ্টা পড়িত। ঘণ্টা শ্রবণ মাত্র আমরা নিজ নিজ গ্লাসে করিয়া এক গ্লাস জল লইয়া রান্নাবাটী অভিমুখে ছুটিতাম। দুই তিন জন ব্রাহ্মণ রন্ধন করিত, ও দুই তিন জনে পরিবেশন করিত। কলাপাতা ও আসন বিছান থাকিত।...

"আশ্রমের কথাই বলি। আমাদের ভারতাশ্রমের নিয়ম ছিল প্রত্যেক মেয়ে একদিন করিয়া একটি তরকারী রন্ধন করিবেন। আমি এক দিবস একটি ব্যঞ্জন রন্ধন করিব বলিয়া ভাণ্ডার হইতে আলু, নারিকেল, কিছু ছোলা ও তদুপযোগী তেল, ঘি, মসলা ইত্যাদি জোগাড় করিয়া লইলাম।...

"আমরা কখন কখন পুষ্করিণীতে সাঁতার দিতাম। ভারতাশ্রমের অনেক মেয়েরাই সাঁতার জানিতেন না। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে; বাল্যকালেই সাঁতার দিতে শিখিয়াছিলাম। কার্য্যতঃ আমিই সর্ব্বাপেক্ষা সন্তরণপটু ছিলাম। এক দিন আশ্রমের পুষ্করিণীটি আমি সাত বার সাঁতার দিয়া পার হইয়াছিলাম। সেই সব আনন্দের দিন আর ফিরিয়া আসিবে না! স্মৃতির পটেই তাহাদের অনুলিপি সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

"আমাদের ভারতাশ্রমের ডাক্তার ছিলেন দুকড়ি ঘোষ মহাশয়। তিনি প্রত্যহ সকলের ঘরে যাইয়া কে কেমন আছে সংবাদ লইতেন। কাহাকেও অসুস্থ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। তাঁহার সুচিকিৎসায় আমাদের অসুখ পড়িলেও কখনও চিন্তিত হইতে হয় নাই।

"সর্ব্বাপেক্ষা প্রচারক কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় সকলকে স্নেহ করিতেন, তজ্জন্য সকলে তাঁহাকে 'মা' আখ্যা দিয়াছিলেন। কি ছেলে কি মেয়ে সকলকেই ইনি মায়ের মতন ভালবাসিতেন। প্রচারক মহাশয়ের বধূরাও ইঁহাকে শ্বশ্রূমাতার স্থানে পাইয়াছিলেন।"*

কেশবচন্দ্রের আদর্শ ছিল অতি উচ্চ। সেই আদর্শে পৌছিতে না পারিলে তিনি কিছুতেই মনে সোয়াস্তি পাইতেন না। এইজন্য যখন শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল তাহার মধ্যেও তিনি একবার ছাত্রীদের শিক্ষা সম্বন্ধে স্বীয় অসন্তোষ ব্যক্ত করিতে ক্ষান্ত হন নাই। ১৮৭৪ সনে তিনি ভারতাশ্রম হইতে ঐ একই কারণে বেলঘরিয়ায় স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন।+ ভারতাশ্রম ইহার পরও চারি বৎসরাধিককাল স্থায়ী ছিল। পরিশেষে কেশবচন্দ্রের সহকর্ম্মী প্রচারকদের জন্য ১৮৭৯ সনের ২১শে জানুয়ারী আপার সারকুলার রোডে স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মিত হইলে আশ্রমটি উঠিয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে বঙ্গদেশে যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নিষ্ঠাবান, স্বধর্ম্মপরায়ণ, আদর্শ মানুষ ও পরিবার সমূহের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার মূল পাই এই আশ্রমটির মধ্যে।

---

* জীবন স্মৃতি—সুদক্ষিণা সেন, পৃ. ৯০-১, ৯৩।

+ কেশবচন্দ্রের "সুখী পরিবার" পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।
(আচার্য্য কেশবচন্দ্র, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৯৭)

মৎস্যেন্দ্রনাথের জন্মরহস্য

শ্রীরাজমোহন নাথ

নাথ-সিদ্ধা মৎস্যেন্দ্রনাথের জন্ম ও জীবন-কাহিনী নানারূপ রহস্যজালের মধ্যে বিজড়িত। স্কন্দপুরাণ নাগরকাণ্ড (২৬৩ অধ্যায়), হাড়মালা, গোরক্ষবিজয়, কৌলজ্ঞান নির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থে একই কথার সামান্য অদল-বদল করিয়া পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে, এবং এই কাহিনীগুলিই নাথ-সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণাকারী পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রধান উপজীব্য।

গণ্ডযোগে ভৃগুবংশীয় এক ব্রাহ্মণের একটি পুত্র জাত হয়। জ্যোতিষের বিচারে এই অপবিত্র যোগে জাত বালক বংশের সর্ব্বনাশসাধক এবং মাতৃহন্তা ("গণ্ডযোগে জনমিলে সে হয় মা-খেকো ছেলে"—রামপ্রসাদী সঙ্গীত) বলিয়া নবজাত শিশুটিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র-মধ্যস্থ এক বৃহদাকার রাঘব-মৎস্য শিশুটিকে উদরসাৎ করিয়া ফেলে, মৎস্যের উদরে থাকিয়া শিশুটি ক্রমশ: বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

মহাদেবের নিকট হইতে জন্মমৃত্যুর পাশ-ছিন্নকারী যোগ-শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বমূলক "মহাজ্ঞান" জানিবার জন্য পার্ব্বতীর সাধ হইল। হরপার্ব্বতী ক্ষীরোদসাগর মধ্যস্থ চন্দ্রদ্বীপের নিভৃত টঙ্গী-ঘরে বসিয়া মহাজ্ঞান আলোচনা আরম্ভ করিলেন। পার্ব্বতী তন্ময় হইয়া শিবের কোলে নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িলেন। শিব পার্ব্বতীর অবস্থা লক্ষ্য না করিয়া আপন মনে নিজ বক্তব্য বলিয়া যাইতেছেন। টঙ্গীর নীচে জলমধ্যস্থ রাঘবের উদরে ব্রাহ্মণ বালক শিব-মুখনি:সৃত তত্ত্বকথা শুনিতেছে এবং পদে পদে "হুঁ" "হুঁ" করিয়া উপলব্ধির সাড়া দিতেছে। পার্ব্বতীর নিদ্রাভঙ্গের পর মহাযোগী মহেশ্বর প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন, এবং রাঘব-মৎস্যের উদর ছিন্ন করিয়া নরশিশুটিকে উদ্ধার করিলেন। পার্ব্বতী সস্নেহে শিশুটিকে মন্দার পর্ব্বতে লইয়া গিয়া লালন-পালন করিলেন। এই শিশুই কালে মহাযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ নামে জগতে খ্যাতিলাভ করেন।

বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে মৎস্য বা হাঙ্গর ভক্ষিত কোনও প্রাণী উদরাভ্যন্তরে কতক সময় প্রায় অক্ষত অবস্থায় থাকিলেও তাহার মধ্যে প্রাণের লেশমাত্রও থাকা সম্ভবপর নয়। কিন্তু পুরাণাদিতে এরূপ অবৈজ্ঞানিক ঘটনাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ভাগবত পুরাণ দশম স্কন্ধ ৫৫শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের নবজাত পুত্র প্রদ্যুম্নকে শম্বরাসুর হরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবামাত্র এক বৃহদাকার মৎস্য শিশুটিকে উদরসাৎ করে—পরে ধীবরেরা ঐ মৎস্যটিকে জালে ধৃত করিয়া শম্বরাসুরকেই প্রদান করে। পাচকেরা মৎস্যটিকে কর্ত্তন করিবার সময় তাহার উদরস্থ শিশুটিকে প্রাপ্ত হয় এবং মায়া নাম্নী পাচিকা এই শিশুটিকে লালনপালন করে। শিশু বয়:প্রাপ্ত হইলে পালিকা মায়াই তাহাকে স্বামিত্বে বরণ করে; এবং শম্বরাসুরকে বধ করিয়া প্রদ্যুম্ন পত্নী সমভিব্যাহারে দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক পিতামাতার চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

এই ভাগবতেই (৮ম স্কন্ধ ২৪-অধ্যায়) দ্রবিড় দেশের সত্যব্রত রাজার অঞ্জলিস্থ জলের মধ্যে প্রবিষ্ট শফরী মৎস্য কর্ত্তৃক বেদ উদ্ধারের কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে।

বঙ্গদেশে মৎস্যেন্দ্রনাথকে ঐতিহাসিক আলোচনার গণ্ডীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে স্থান দিয়াছেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। নেপাল হইতে আনীত হাজার বৎসরের প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন "চর্য্যাপদ"কে "বৌদ্ধ গান ও দোহা" নাম দিয়া ১৩২৩ বাংলায় প্রকাশ করিবার সময় ঐ গ্রন্থের মুখবন্ধে (১৬ পৃ:) তিনি লিখিয়া-ছেন—"নেপালীরা মৎস্যেন্দ্রনাথকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করে। মৎস্যেন্দ্রনাথের পূর্ব্বনাম মচ্ছঘ্ননাথ, অর্থাৎ তিনি মাছ মারিতেন। বৌদ্ধদিগের স্মৃতিগ্রন্থে লেখা আছে যে, যাহারা নিরন্তর প্রাণী হত্যা করে, সে সকল জাতিকে অর্থাৎ জেলে মালা কৈবর্ত্তদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবে না। সুতরাং মচ্ছঘ্ননাথ বৌদ্ধ হইতে পারেন না। কৌলদিগের সম্বন্ধে তাঁহার এক গ্রন্থ আছে; তাহা পড়িয়া বোধ হয় না যে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন; তিনি নাথপন্থীদিগের একজন গুরু ছিলেন, অথচ তিনি নেপালী বৌদ্ধদিগের উপাস্য দেবতা হইয়াছেন।" সমস্যা থাকিয়াই গেল—মৎস্যঘাতী কৈবর্ত্ত বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার অধিকারী না হইয়াও কিরূপে বৌদ্ধদিগের উপাস্য দেবতার স্থান অধিকার করিলেন? বিষয়টি হেঁয়ালিপূর্ণ সন্দেহ নাই।

১৩২৯ সালের ১১ আষাঢ় সাহিত্য-পরিষদের সভা-পতির অভিভাষণে শাস্ত্রী মহাশয় মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রকৃত স্বরূপের আলোচনায় এক নূতন অধ্যায়ের অবতারণা করিয়া-ছেন। তিব্বতী ও নেওয়ারী চিত্রে লুইপাদের এক ছবিতে অঙ্কিত আছে—"তিনি একটি বড় মাছের পেট চিরিয়া তাহাতে একটি পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। * * * * তাহার পাশে অনেকগুলি বড় বড় রুই মাছ পড়িয়া আছে। উহার একটির পেট চিরিয়া তিনি কাঁচা নাড়ী খাইতেছেন। * * * লুইপাদের আর একটি নাম মৎস্যান্ত্রাদ পাদ। সুতরাং মাছের পোটায় পা দেওয়া হইয়াছে, অথবা পা দিয়া মাছের পোটা খাইতেছেন। নেওয়ারীরা

মৎস্যান্ত্রাদের অর্থ করিয়াছে—মাছের আঁতরী কাঁচা খায়। দুটি দেশই (তিব্বত ও নেপাল) পাহাড়ের উপরে; মাছের সঙ্গে লোকের বড় সম্পর্ক নাই, মাছ কেমন করিয়া খাইতে হয় জানে না। নামের ব্যাখ্যায় এক অদ্ভুত চিত্র তৈয়ার করিয়াছে। আমরা মাছ খাই, আমাদের দেশে মাছ অনেক আছে। আমরা মৎস্যান্ত্রাদের অর্থ করিয়াছি—মাছের পোটায় তৈরি তরকারি খাইতে ভালবাসিতেন।"

"মহাকৌলজ্ঞান বিনির্ণয়" নামক একখানি বই আছে। বইখানি মৎস্যেন্দ্রপাদাবতারিত। * * * মৎস্যেন্দ্রনাথের আর একটা নাম মচ্ছঘ্ননাথ। আমি ভাবিলাম—তবে কি তিনি কৈবর্ত্ত? শেষে পড়িতে পড়িতে দেখি তিনি সত্য সত্যই কৈবর্ত্ত ছিলেন; তাঁহাকে অনেক স্থলে কেওট পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে—ধীবরও বলা হইয়াছে। পার্ব্বতী একবার মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কেওটের বাড়ী গেলে কেন? বইখানি পড়িতে পড়িতে আমার মনে হইল—কোনও ব্রাহ্মণের ছেলে যত বড়ই মূর্খ হউক, এরূপ সংস্কৃত লিখিবে না। শেষে দাঁড়াইল যে উহা কেওটের লেখা। তার পর আবার দেখি মৎস্যেন্দ্রনাথের বাড়ী ছিল চন্দ্রদ্বীপে। * * *"

ইটালী দেশীয় পণ্ডিত Guissep Tucci মনে করেন—মীননাথ জাতিতে কামরূপদেশীয় একজন কৈবর্ত্ত ও তদ্দেশীয় রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। সংসারাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল সামন্ত শোভা (*Early History of Kamrupa by K. L. Barua, page 158*)। ডক্টর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী তিব্বতদেশীয় লামা তারানাথের বৃপাগ্ বৃশাম্ বৃজোন্ ব্জান্ গ্রন্থের নজির দেখাইয়া লুইপাদকে কৈবর্ত্তজাতীয় লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন (কৌলজ্ঞান নির্ণয়, ভূমিকা, ২২-২৩ পৃঃ)

প্রথম প্রশ্ন হইল—যে সব মহাপুরুষ অখ্যাত ও অজ্ঞাত অবস্থায় সংগোপনে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক বিজন বনে বা পর্ব্বতগুহায় সাধনে নিমজ্জিত হন এবং বহুদিন পরে জন্মভূমি হইতে বহু দূরে নূতন নামে ও নূতন ভাবে পরিচিত হইয়া লোক-সমাজে আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁহাদের সংসারাশ্রমের জাতিকুলের তথ্য কে জানিতে পারে এবং কেই বা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? ইহা সন্ন্যাসীদের শুধু রীতিবিরুদ্ধ নহে—মহা পাপ। "সন্ন্যাসীদের সাধারণ রীতি এই যে তাঁহারা নিজমুখে পূর্ব্বাশ্রমের কোন পরিচয় প্রদান করেন না। সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নূতন জন্মলাভ হইল। তখন হইতে গুরুপ্রদত্ত নামই তাঁহাদের নাম, গুরুই তাঁহাদের পিতা। তখন বংশাবলীর পরিচয় দিতে হইলে গুরুপরম্পরা ক্রমে গুরু, পরম গুরু প্রভৃতিরই নামোল্লেখ করিতে হইবে।" (যোগীরাজ গম্ভীরনাথ প্রসঙ্গ—৭০ পৃঃ)। আধুনিক যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাথসিদ্ধা, কুম্ভ মেলার মণ্ডলেশ্বর বাবা গম্ভীরনাথ কাশ্মীরের জম্মু প্রদেশের কোনও ধনীর সন্তান ছিলেন বলিয়া অনেকেই জানিতেন—কিন্তু এই সম্পর্কে তাঁহাকে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও তিনি গম্ভীর ভাবে শুধু উত্তর দিতেন—"প্রপঞ্চসে ক্যা হোগা।" এমতাবস্থায় প্রাচীন যুগের নাথসিদ্ধা মৎস্যেন্দ্রনাথ যে নিজহস্তে গ্রন্থ-মধ্যে নিজের পূর্ব্বাশ্রমের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া যাইবেন ইহা কল্পনা করাও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

পুরাণোক্ত কাহিনী ও যোগসিদ্ধিলাভের প্রবাদ হইতেই তিব্বতী ও নেওয়ারী চিত্র চিত্রকরের তুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। মহিষের উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত মহিষাসুরের এক পদ ছিন্নমুণ্ড মহিষের পেটের মধ্যে রাখিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক দুর্গার কাঠামে বিন্যস্ত করা মূর্ত্তিকারের কল্পনার স্বাভাবিক স্বরূপ। প্রবাদোক্ত রাঘব-মৎস্যের উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত মৎস্যেন্দ্রনাথের চিত্রে তাঁহার এক বা উভয় পদ মৎস্যের পেটের মধ্যে বিন্যস্ত করাও সেইরূপ ভাবে চিত্র-শিল্পীর কল্পনা। সাগরে মৎস্যের উদরে বাসকালীন মৎস্যসমভিব্যাহারে থাকার কল্পনাকে চিত্রে রূপ দিবার সময় আশে পাশে আরও কয়েকটি মৎস্য আঁকিয়া দেওয়াও চিত্রকরের তুলিকার স্বাভাবিক গতির বেগ।

"পাদ" শব্দ সম্মানসূচক অর্থে মহাপুরুষ বা গুরুস্থানীয় ব্যক্তির নামের সহিত যুক্ত করা হইয়া থাকে। মৎস্যান্ত্রাদপাদ অর্থে মৎস্যের অন্ত্র বা নাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত প্রভুপাদ বা গুরুদেব—এই অর্থই সমীচীন। ইহাতে কাঁচা বা পাকা নাড়ী বা নাড়ীর তরকারি খাইবার কল্পনা করা নিছক যুক্তিহীন ও অবান্তর।

লুইপাদকে লোহিত পাদ, রোহিত পাদও বলা হইয়াছে এবং তিব্বতী গ্রন্থানুসারে নাকি লুই, লোহিত, রোহিত শব্দের অর্থ মৎস্যরাজ বা মৎস্যেন্দ্র—king of Fishes (কৌলজ্ঞান নির্ণয়—প্রবোধ বাগ্চী—ভূমিকা—২৪ পৃঃ)। কিন্তু মৎস্যেন্দ্রনাথের সহিত রাঘব-মৎস্য বা "বোয়ালসুন্দরের" অর্থাৎ বোয়াল মাছের প্রবাদ জড়িত। বোয়ালের মুখবিবরই বৃহদায়তন; ঐ মুখেই নরশিশু প্রবেশ করা সম্ভব।

প্রাচীন কামরূপ রাজ্যে বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্র নদের নাম ছিল লোহিত। ইহা কামরূপের প্রাচীনতম অধিবাসী অষ্ট্রিক জাতির "লাও-তু" (বৃহৎ জলরাশি) হইতে উৎপন্ন। বর্ত্তমান কালেও ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন একটি স্মৃতির নাম লোহিত নদী। সাধারণ গ্রাম্য লোকে এখনও ব্রহ্মপুত্রকে লুইত বা লুই বলে। মহাভারতে কামরূপ রাজ্যকে লৌহিত্যদেশ বলা হইয়াছে। ঐ যুগে এই নামই বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। (বনপর্ব্ব—তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়—৮৫ অধ্যায়। সেই দেশের লৌহিত্য তীর্থেরও উল্লেখ আছে। সুতরাং এই লোহিত নদীবিধৌত লৌহিত্য দেশের গুরুদেবকে লোহিতপাদ, রোহিতপাদ (ল এর স্থানে

র), লুইতপাদ, লুইপাদ বলিয়া অভিহিত করা অযৌক্তিক নহে। ইহা হইতে এইটুকু মাত্র আভাস পাওয়া যাইতে পারে যে, তিনি কামরূপ হইতে তিব্বত গিয়াছিলেন।

আভিধানিক অর্থ বিচার করিয়া সাধারণতঃ কেহই নাম করণ করে না; সুতরাং শব্দার্থ ধরিয়া নামের সহিত জাতি-কুলের তথ্য জড়িত থাকা কখনও সম্ভবপর নয়। এরূপ করিতে গেলে অনেক সময় বিপদের সম্ভাবনা আছে। পুরাণোক্ত রূপসী মৎস্যগন্ধার দেহ হইতে এখনও মাছের আঁশটে গন্ধ ভুর ভুর করিয়া নির্গত হইতেছে। গোরক্ষনাথ উত্তর-ভারতে গরুর রাখালী করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

এই বিপদ আশঙ্কা করিয়া ময়নামতীর গানের রচয়িতা সিদ্ধা 'হাড়িপা'কে রক্ষা করিবার জন্য দুই হাত তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন—"হাড়ি নহে—হাড়ি নহে—হাড়িপা জালন্ধর।" কিন্তু বলিলে কি হইবে? পরবর্ত্তী লেখক ও আধুনিক গবেষকেরা বেচারাকে ময়নামতীর ঘরে ঝাড়ুবরদারী করাইয়া ছাড়িয়াছেন। সিদ্ধপুরুষ সম্ভবতঃ প্রথম সাধনার সময় সদাসর্ব্বদা সঙ্গে একটি মাটির হাঁড়ি রাখিতেন—কমণ্ডলু বা খর্পর লইতেন না। সেইজন্য হয়ত গুরু হাড়িপা নাম দিয়াছিলেন।

আর্য্য শাস্ত্রের প্রতিটি তন্ত্রের ভাষা ত্রিভাবাত্মক। প্রথম —একটি সরল আভিধানিক বা সাহিত্যিক বা লৌকিক ভাষা। ইহা নিম্ন অধিকারীর জন্য। দ্বিতীয়—ভক্তিভাবযুক্ত পরকীয় বা পৌরাণিক ভাষা অথবা উপাসনার অনুকূল দৈবী লক্ষ্যযুক্ত সূক্ষ্ম বা তাৎপর্য্যবোধক ভাষা। ইহা মধ্য অধিকারীর জন্য। তৃতীয়—উন্নত অধিকারীর পক্ষে সেই শাস্ত্র বাক্যেরই গভীরতম জ্ঞানাত্মক আধ্যাত্মিক লক্ষ্যযুক্ত সূক্ষ্মতর সমাধি-ভাষা। ইহাকে ধ্যান ভাষা বা সন্ধ্যা ভাষাও বলে। অন্য ভাবে এই ভাষাত্রয়কে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভাষাও বলা যাইতে পারে। চর্য্যাপদ, কৌলজ্ঞান নির্ণয় এবং নাথ-সাহিত্যের অধিকাংশ গ্রন্থ সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত। সুতরাং সন্ধ্যা বা সমাধির সহিত বিচার না করিয়া শুধু লৌকিক বা আভিধানিক ভাষার সাহায্যে এই সব গ্রন্থোক্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিলে সিদ্ধ পুরুষদের প্রতি অবিচারই করা হইবে।

শাস্ত্রী মহাশয় যখন "কৌলজ্ঞান বিনির্ণয়" গ্রন্থের উল্লেখ করেন তখন উহা নেপালের রাজদরবারের পুস্তকাগারে শুধু তিনিই দেখিয়াছিলেন ও পড়িয়াছিলেন। অন্য কাহারও এই সম্বন্ধে কিছুই জানিবার ও বলিবার সুযোগ-সুবিধা ছিল না। ১৯৩৪ সালে ডক্টর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী ঐ গ্রন্থখানা নেপাল হইতে আনিয়া সম্পাদনান্তর প্রকাশ করিয়াছেন। (*Calcutta Sanskrit Series* No. III)। এখন উহা পাঠ করিবার ও বিচার করিবার সুযোগ সকলেরই হইয়াছে।

গ্রন্থখানার নাম "কৌলজ্ঞান নির্ণয়" ইহা মৎস্যেন্দ্র, মচ্ছেন্দ্র বা মচ্ছঘ্ন পাদাবতারিত। অর্থাৎ গ্রন্থখানা মৎস্যেন্দ্র-নাথের রচিত নহে, তাঁহারই মতবাদ ও ধর্ম্মাচরণ বিধান পর-বর্ত্তীকালে অন্য কেহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাগ্‌চী মহাশয় কৌলজ্ঞান নির্ণয়ের সহিত আরও অনুরূপ কয়েকটি খণ্ড গ্রন্থ সংযোজিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঐগুলিও মৎস্যেন্দ্র পাদাবতারিত হইলেও "অকুলবীর তন্ত্রে" "মীননাথেন ভাষিতং" (৯২ পৃঃ) "সিদ্ধনাথ প্রসাদতঃ (১০৬ পৃঃ) বলিয়া লিখিত আছে।

রচনার ভাষা বা ব্যাকরণগত শুদ্ধাশুদ্ধি দেখিয়া রচয়িতার জাতি নির্ণয় করা এক অভিনব পন্থা সন্দেহ নাই। প্রাচীন-কালে একটি কৈবর্ত্তের ছেলের পক্ষে সংস্কৃত কেন,—যে-কোনও ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ লেখাও ত পরম দুঃসাহসের কর্ম্ম ছিল। শুধু কৌলজ্ঞান নির্ণয় কেন, মৎস্যেন্দ্রনাথের নামগন্ধহীন "সাধনমালা" আদি বহু গ্রন্থও ঐরূপ ভুল সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল।

কৌলজ্ঞান নির্ণয় গ্রন্থখানা সাধনা ও পূজাপদ্ধতির বিধানের গ্রন্থ। ইহার প্রতিটি তত্ত্বই সন্ধ্যাভাষায় বোধ্য। লৌকিক ভাষায় ইহার ব্যাখ্যা করিতে গেলে প্রমাদে পড়িতে হইবে। ইহা কাহারও জীবনীমূলক গ্রন্থ নহে, এবং ইহাতে মৎস্যেন্দ্র-নাথের আত্মজীবনীর নামগন্ধ থাকিতে পারে না। লৌকিক দৃষ্টিতে যেগুলি আত্মজীবনী বলিয়া প্রতিভাত হয় সেইগুলি প্রকৃতপক্ষে সাধনার চরম তত্ত্বের বিশ্লেষণ মাত্র। ইহা পরে ব্যাখ্যা করিতেছি।

লৌকিক ভাষায় মৎস্যেন্দ্রনাথের জন্মবৃত্তান্ত অতি সহজ-বোধ্য। পৌরাণিক ভাষায় ব্রাহ্মণের পুত্র নদীতে খুব সম্ভব ভেলায় ভাসমান হইয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোনও ধীবররাজ কর্ত্তৃক লালিতপালিত হইয়াছিল। এইরূপ কাহিনীর নজির ইতি-হাসেও পাওয়া যায়। খনা-বরাহ-মিহিরের কাহিনী সকলেই জানেন। ১৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আসামের আহোম্ রাজ ত্যাও-খামৃতির গর্ভবতী রাণী গৃহবিবাদের ফলে লোহিত নদীতে ভেলায় নির্ব্বাসিতা হইয়া নদীর উত্তর-তীরস্থ এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয়লাভ করেন। ঐ ব্রাহ্মণের গৃহে যথাসময়ে জাত-পুত্র কালে আসামের সিংহাসনের অধীশ্বর হইলেও অদ্যাবধি ইতিহাসে "বামনী কোঁবর" বা ব্রাহ্মণকুমার বলিয়া পরিচিত। (*Back-ground of Assamese Culture*—R. M. Nath, pp. 91, 129.)

সন্ধ্যাভাষায় মৎস্য শব্দের অর্থ ঈড়া-পিঙ্গলা (গঙ্গা-যমুনা) নাড়ীর মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস রূপে সতত সঞ্চরমাণ প্রাণবায়ু; এবং যিনি যোগবলে এই প্রাণবায়ুকে সংরুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই মৎস্যবধকারী বা মৎস্যজয়ী বীর বা মৎস্যেন্দ্রনাথ।—

"গঙ্গা যমুনায়োর্মধ্যে মৎস্যৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েৎ যস্তু স ভবেন্মৎস্য সাধকঃ॥

প্রাণবায়ু আবার পাঁচটি—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান ; ইহাদের সহিত মন যুক্ত হইয়া ছয়টি হয়। যোগপন্থী সাধক এই ছয়টিকে কুম্ভক আদি প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ স্ববশে আনিতে চেষ্টা করেন। তিব্বতী ও নেওয়ারী চিত্রে মৎস্যেন্দ্রনাথের আশেপাশে এইরূপ পাঁচটি বা ছয়টি মৎস্যের চিত্র থাকাই স্বাভাবিক।

ঈড়া-পিঙ্গলাবাহী প্রাণবায়ুরূপ মৎস্যগুলিকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে সাধকের মূলাধারস্থ শক্তিস্বরূপিনী কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হইয়া সুষুম্না-পথে উর্দ্ধে গমন করেন, এবং স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ চক্রভেদ করিয়া আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করেন। এই আজ্ঞাচক্রের অন্তর্গত আরও দুইটি গুপ্তচক্র আছে। পশ্চাৎ দিকে মনশ্চক্র ও সম্মুখদিকে সোমচক্র। মনশ্চক্রের ছয়টি দলে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও তাহাদের সমষ্টীভূত প্রতিবিম্বরূপ স্বপ্নের স্থান। এই

মনশ্চক্র

ছয়টি বৈষয়িক ভাবপূর্ণ উপকেন্দ্র লইয়া মনের কেন্দ্রে ছয়টি দল গঠিত হইয়াছে। এই মনশ্চক্রেই জীবের সমস্ত ভাবনা-চিন্তার রেখা গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত অঙ্কিত হইয়া থাকে। সাধনার প্রারম্ভে সাধক পঞ্চপ্রাণ ও মন এই ছয়টির সহিত প্রবল সংগ্রামে রত হন। তাহারা যমুখের মত বলশালী হইয়া বা ষট্পদের মত ঝাঁক বাঁধিয়া সাধককে বিব্রত করে। কিন্তু সাধনার জালে মৎস্যগুলিকে রুদ্ধ করিয়া সাধক যখন কুণ্ডলিনীকে আজ্ঞাচক্রে উত্থিত করেন, তখন আবার মনশ্চক্রের ষট্দলস্থিত ষট্পদগণ সবলে দংশন করিতে থাকে।

আজ্ঞাচক্রে ঈড়া-পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মিলনস্থান। এখানে একটি ত্রিকোণ ক্ষেত্র সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাকে ত্রিবেণী, যুক্ত ত্রিবেণী, ত্রিকূট, হলক, অকথাদি ক্ষেত্রও বলা হয়। এই স্থানেই সাধক জ্যোতি: দর্শন করেন ও অনাহত নাদ শ্রবণ করেন।

আজ্ঞাচক্রস্থ ত্রিকোণ পীঠ সাধকদিগের সাধনার পক্ষে একটি চরমস্থান। সাধারণভাবে বলা হয় "এ বড় বিষম ঠাঁই, গুরু শিষ্যে ভেদ নাই।" ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া ষট্চক্রের এক এক চক্রে ত্রিভয় অর্থাৎ কেশগুচ্ছ জাত বেণীর ন্যায় সংবদ্ধ হইয়া এই আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই আজ্ঞাচক্র মধ্যে কূটস্থ প্রদেশে সাধকেরা শ্রীগুরুর পাদপীঠ কল্পনা করিয়া তাঁহারই জ্যোতির্ময় স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। সুষুম্নাপথে জীবনী বা কুণ্ডলিনী শক্তি অনাহত-স্থিত জীবাত্মা সহযোগে এই আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত কুণ্ডলিনী রূপে আসিতে পারেন। আজ্ঞাচক্রের কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ ঈড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার ছেদবিন্দুতেই প্রাণবায়ুর ক্রিয়া শেষ হইয়াছে। ইহার উপরে আর শ্বাসপ্রশ্বাস চলে না। ইহার পর নিরালম্ব-পুরী বা শূন্যাত্মক নাদানুভবের স্থান—নাথ যোগীদের সাধনার চরম লক্ষ্য নাদবিন্দুর স্থান। তাহারই উপরে সহস্রার।

আজ্ঞাচক্রে আসিয়া কুণ্ডলিনী পরম শিবের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হইয়া যথার্থ নাদানুভূতি-রূপ শূন্যাত্মক হইয়া যান—পার্ব্বতী শিবের কোলে নিদ্রাভিভূতা থাকিয়া আত্মাহারা হইয়া যান। ইহাই সাধকের দেহপিণ্ডরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সাযুজ্য মুক্তিলাভ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আজ্ঞাচক্রস্থ ত্রিকোণ ক্ষেত্রের হলক বিন্দু হইতে তিনটি জ্যোতি:শিখা সমুত্থিত হইয়া পিরামিডাকারে উক্ত ত্রিকোণ চূড়ের শৃঙ্গদেশে অন্তিমবিন্দু ব্রহ্ম বিন্দুতে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই অন্তিম বিন্দুতেই অখণ্ড কেন্দ্ররূপ বিন্দু ও অনাহত নাদের অন্তর-স্বরূপ ওঁকার বা প্রণবের শেষ অঙ্গ। 'ওঁ'কার রূপ

পর্য্যঙ্কের উপর "৺" নাদরূপা দেবী এবং তদুপরি "˙" বিন্দুরূপ অর্থাৎ পরব্রহ্মকেন্দ্র মিলিত হইয়া কামকলা-স্বরূপ "৺" চন্দ্রবিন্দু-সদৃশ আকারযুক্ত হইয়া শিবশক্তি বা প্রতিলোমভাবে প্রকৃতি পুরুষের নিত্য সহযোগে যোগিগণের যোগ-প্রতিপাদ্য এই পরমধন "ওঁ" প্রণবের নির্দ্দেশ হইয়াছে। ইহার অবস্থিতি

নিরালম্বপুরীতে বায়ুক্রিয়ার বাহিরে। কুণ্ডলিনী শক্তিসহ জীবাত্মা এই নিরালম্বপুরীতে উপস্থিত হইতে পারিলে অর্থাৎ সাধক মৎস্যের পেট ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইয়া আসিতে পারিলে প্রকৃত নির্ব্বাণ মুক্তি বা নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। যোগশাস্ত্র বলিতেছেন :—

"শির: কপাল বিবরে ধ্যায়েৎ দুগ্ধমহোদধিম্।
অত্র স্থিত্বা সহস্রারে পদ্মে চন্দ্রং বিচিন্তয়েৎ ॥
শির: কপাল বিবরে দ্বিরষ্ট কলয়া যুত:।
পীযূষভানুং হংসাখ্যং ভাবয়েত্তং নিরঞ্জনং ॥
নিরন্তর কৃতাভ্যাসাৎ ত্রিদিনে পশ্যতি ধ্রুবং।
দৃষ্টি মাত্রেন পাপৌঘং দহত্যেব স সাধক: ॥

ব্রহ্মকপাল-বিবরে বা ব্রহ্মরন্ধ্র-মধ্যে প্রথমত: দুগ্ধ মহাসমুদ্র চিন্তা করিতে হইবে। পরে সেই স্থানে থাকিয়া অর্থাৎ লয় যোগানুষ্ঠানের দ্বারা সেই স্থানেই জীবাত্মাকে স্থিরতর করিয়া সহস্রদল কমলের অধ:স্থিত চন্দ্রমণ্ডল স্মরণ করিতে হইবে। ব্রহ্মরন্ধ্র মধ্যে ষোড়শকলাযুক্ত সুধারশ্মি বিশিষ্ট বা অমৃতবর্ষী যে চন্দ্র আছে, তাহা হং-স: নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই নিরঞ্জন হংসের সদা ধ্যান করিতে হইবে। সর্ব্বদা এই ধ্যানযোগ অভ্যাস করিলে, দিবসত্রয়ের মধ্যেই সেই নিরঞ্জনের সাক্ষাৎলাভ হয়,—ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহার দর্শনেই সাধকের সকল পাপ বিদূরিত হইয়া তিনি মুক্ত হইতে পারেন। হং-স: পরিবর্ত্তিত হইলে সো-হং হইয়া থাকে। অনন্তর উঁহাদের স্থুল স্বরূপ স ও হ-এর লোপ হইলে ওং বা ওঁ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। 'হ' পুরুষ বা পরম শিব, 'স' প্রকৃতি বা পরমাপ্রকৃতি; ইঁহারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া শিবশক্তি স্বরূপে প্রতিভাত হইয়া জীবের প্রাণে শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে সদাই স্থূলভাবে বিরাজ করিতেছেন এই হংসযুগলের স্বরূপ শ্বাসপ্রশ্বাসাত্মক শ্রীগুরু পাদুকাপীঠ বা মণিপীঠ বা সোমতীর্থ নির্ম্মল চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্রোজ্জ্বল, সুধাসরোবরে প্রস্ফুটিত সুদর্শন কমলসদৃশ। ইহা হইতে অবিরত সুধাধারা প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানেই পরমানন্দপ্রদ ক্ষীরোদ-সাগর, চন্দ্রদ্বীপ বা মণিদ্বীপ ও টঙ্গী-ঘর বিদ্যমান আছে। এই স্থানেই সাধকের পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদুকাপীঠ। সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ এই স্থানেই—

"—আম্‌হে সামে দিঠা।
ধমন-চমন-বেনি পিণ্ডি বইঠা।—চর্য্যাপদ ১।

এই বিন্দুই শুভ্র স্ফটিকবর্ণ জ্ঞানসূর্য্যরূপ পরমাত্মা—নাথ-যোগীদের পরম আরাধ্য বস্তু। যোগ-সমাধির ফলে সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হয়। ইনিই ব্রহ্মস্বরূপ পরম শিব বা ব্রহ্ম-বিন্দুস্বরূপ। তাঁহারই অন্তরে সকল সুধার আধার অমাকলা বা আনন্দ ভৈরবী ব্রহ্মশক্তি অবস্থিতা আছেন।

বিন্দুস্থান বা মণিপীঠ নিরালম্বপুরীতে ;—এক প্রকার আজ্ঞাচক্রের বহির্দ্দেশে অবস্থিত। ইহার উপরে সহস্রার বা সহস্রদল কমল ব্রহ্মরন্ধ্রে কেন্দ্রস্থ হইয়া অধোমুখ ছত্রাকারে অবস্থিত আছে। বিন্দুপীঠ ঠিক সহস্রারের অন্তর্গত নহে, অথচ ইহার কুক্ষিগত হইয়া নিম্নভাগে গাত্রসংলগ্ন হইয়া আছে।—

"ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীরুহোদরে, নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতং"।

গুরুপাদুকাপীঠও এই হিসাবে সহস্রারের অন্তর্গত এবং অন্তিম মোক্ষপ্রদ এই শ্রীপাদুকাতীর্থকে সোমতীর্থও বলা হয়। সহস্রার একটি সহস্রদলবিশিষ্ট শ্বেতগর্ভ সপ্তবর্ণযুক্ত বিচিত্র কমল। ইহাকে ক্ষীরোদসাগরও বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা মূলাধারাদি ষট্‌চক্রের বা গুপ্তচক্র লইয়া নবচক্রের বাহিরে অর্থাৎ দেহনগরের বাহিরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ হিসাবে অবস্থিত। কুণ্ডলিনী শক্তি ব্রহ্মনাড়ী আশ্রয় করিয়া ইহার মধ্যে উত্থিতা হন।—

"নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িআ"—চর্য্যাপদ—১০।

তখন সাধকের যে কি অবস্থা হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না।

সুতরাং সহস্রার ক্ষীরোদ সমুদ্র এবং তাহারই কুক্ষিগর্ভে সোমতীর্থ, চন্দ্রদ্বীপ, এবং আজ্ঞাচক্রস্থিত ত্রিকোণক্ষেত্রে পিরামিডাকৃতি টঙ্গীঘর অবস্থিত। এই টঙ্গীঘরের টঙ্গে বা তুঙ্গদেশে শিবশক্তি হরপার্ব্বতী নাদবিন্দুরূপে অবস্থিত আছেন। এই টঙ্গীর নিম্নদেশে ইড়া-পিঙ্গলার মধ্যে মৎস্যরূপী প্রাণবায়ু আজ্ঞাচক্রের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এবং তাহার উদরে জীবাত্মা মৎস্যেন্দ্রনাথ বিরাজিত। শিবশক্তির অনুগ্রহে মৎস্যের উদর ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মনাড়ী পথে তাহাকে টঙ্গীঘরে উঠাইয়া আনা হয়, এবং কুলকুণ্ডলিনী তাহাকে সযত্নে মন্দার পর্ব্বতে লইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সমাহিত করেন।

এই কাহিনী নাথসিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথের সংসারাশ্রমের জীবনী নহে, ইহা প্রত্যেক যোগাবলম্বী সাধকের যৌগিক ক্রিয়াসাধনের সত্য বিবরণ।

এখন ধীবরত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। ইড়া-পিঙ্গলায় সঞ্চরমাণ প্রাণবায়ুই মৎস্য। ইহাদিগকে যিনি সংযত ও সংরুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন তিনিই ধীবর। ইড়া-পিঙ্গলা ও সুষুম্নার ক্রিয়া হইতে মুক্ত করিয়া যিনি চিত্তকে নিরালম্বপুরীতে স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তিনি মৎস্যঘাতী ও মৎস্যের উদর-ছিন্নকারী ধীবর—তিনিই মচ্ছন্দনাথ বা মৎস্যান্নাদপাদ।

পঞ্চ প্রাণ ত সাধারণ মৎস্য। মায়া নামক আর একটি মহা মৎস্য আছে। নিরালম্বপুরীতে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিলেও তাহার ক্রিয়া চলে। ব্রহ্ম মায়ার সাহায্যেই সৃষ্টি করেন। মায়া ও ব্রহ্মের সমশক্তি সম্পন্ন, দেবতারাও ইহার নিকট পরাজিত। ইহা শুধু ইড়া-পিঙ্গলাতে বাস করে না—ইহা দেহস্থ সপ্ত ধাতু রূপ সপ্ত সমুদ্র জুড়িয়া বিরাজ করে। রুদ্রযামল গ্রন্থে দেহস্থিত প্রতি চক্রে এক একটি সরোবর বা তীর্থ কল্পনা

করা হইয়াছে। মায়া-মৎস্য এই সপ্ত সমুদ্র জুড়িয়া বিরাজ করে। ব্রহ্মত্ব লাভ করিলেও ইহাকে দমন করা যায় না। সুতরাং ব্রহ্মত্ব ত্যাগ করিয়া সহস্রারে উঠিতে পারিলেই তাহাকে বধ করা যায়। সুতরাং এই মহামৎস্য বধকারী ধীবর বা কৈবর্ত্ত ব্রহ্মজ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ।

দীঘনিকায় ব্রহ্মজাল সুত্তে বুদ্ধদেব বলিতেছেন—"হে ভিক্ষুগণ! যেমন কোন এক কৈবর্ত্ত বা কৈবর্ত্ত-শিষ্য (কেবট্টো বা কেবট্টোন্তেবাসি) স্বল্পজল হ্রদে সূক্ষ্মজাল নিক্ষেপ করিলে তাহার মনে এই ভাবের উদয় হয়—এই স্বল্পজল হ্রদে যত বড় বড় রকমের মাছ আছে, তাহাদের সমস্তকেই আমার জালে পুরিয়াছি, জালের মধ্যে থাকিয়াই তাহারা উল্লম্ফন করিতেছে। তেমনিভাবে—হে ভিক্ষুগণ! আত্মতত্ত্ব বিষয়ে অদূরদর্শী ও মনন-শীল যে-কোনও শ্রমণ কিম্বা ব্রাহ্মণ নানাভাবে মতবাদ প্রচার করেন, উহাদের সমস্তই আমার এই সূত্রে বাষট্টি মতবাদের মধ্যে পাইবে। এই মতবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইয়াই জালবদ্ধ মৎস্যের ন্যায় লাফালাফি করিবে।"

"আনন্দ! এই কারণে আমার এই ধর্ম্মোপদেশকে অর্থ-জাল, ধর্ম্মজাল, ব্রহ্মজাল, দৃষ্টিজাল বা অনুত্তর সংগ্রাম বিজয় নামে গ্রহণ করিবে।"

আসামে "রাতিখোয়া" নামক একটি গুহ্য সাধক-সম্প্রদায় আছেন। তাহাদের একটি গীতে আছে—

"ছুনিয়া এদিনে ছুনিয়া দুদিনে
ছুনিয়া ফুলনি বাড়ী।
কিবা ছল বল কর তই ছুনিয়া
ধরিব খেওয়ালি মারি॥
খেওয়ালি জালতে গোন্ধা বার কুড়ি
পাশর লেখ জোখ নাই।
টিকনিত ধরিয়া চৌচনি মারিলে
সবাকে এক ঠাঁই নাই॥"

অর্থাৎ—দুই এক দিনের ফুলবাগিচার মত এই সংসার কিসের ছলনা করিতেছে? জাল ফেলিয়া তাকে তৎক্ষণাৎ বদ্ধ করিয়া ফেলিব। আমার হাতে যে উড়া জাল আছে তাহার প্রান্তদেশে বার কুড়ি লোহার গুটি বাঁধা আছে, জালে অসংখ্য পাশা বা তন্তুও আছে। জালের শীর্ষপ্রান্তে ধরিয়া টানিয়া আনিলেই সংসারের ছোট বড় সকলকেই একত্র পাইব —ঠিক যেমন ধীবর রুই, কাতলা, পুঁটি আদি সকল মাছকে একত্রে জালবদ্ধ করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে সকল মহাপুরুষ নিজ নিজ ধর্ম্ম-মতবাদের দ্বারা জগতের ছোট বড় সকলকে এক ছত্রের নিচে সমবেত করিতে পারেন তাঁহারা সকলেই প্রকারান্তরে ধীবরের বৃত্তিই অবলম্বন করিয়াছেন। বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, নানক, কবীর, দাদূ ইঁহারা সকলেই ধীবরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন—এই দিক দিয়া বিচার করিলে মৎস্যেন্দ্রনাথও একজন ধীবর ছিলেন।

এখন কৌলজ্ঞান নির্ণয়ের ষোড়শ পটলে মৎস্যেন্দ্রনাথের তথাকথিত জীবনীমূলক পদগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

ভৈরব বলিতেছেন :—

যদাবতারিতং জ্ঞানং কামরূপী ত্বয়া ময়া।
তদাবতারিত তুভ্যং তত্ত্বন্তু ষণ্মুখস্য চ॥
তেন কৌলাগমে দেবি! বিজ্ঞানং প্রণবপ্রিয়ে।
অব্যক্তেন তু রূপেন চন্দ্রদ্বীপে অহং প্রিয়ে॥
অব্যক্তং গোচরং তেন কুলজ্ঞাতং মম প্রিয়ে॥ ২১-২২

দেবী—কিমর্থং চন্দ্রদ্বীপন্তু অহকৈব গত প্রভো।
কিমর্থং প্রেসিতা প্রাজ্ঞা আদি ষণ্মুখস্য চ॥

ভৈরব—অহংচৈব ত্বয়া সার্দ্ধং চন্দ্রদ্বীপং গত যদা।
তদা বটুক রূপেন কার্ত্তিকেয়ঃ সমাগতঃ॥
অজ্ঞান ভাবমাস্থায় তদা শাস্ত্রং হি মূষিতম্।
শাসিতোঽহং মহাদেবী ষণ্মুখা মূষকাত্মকম্॥
গতোঽহং সাগরে তস্মে জ্ঞান দৃষ্ট্যাবলোকনম্।
মচ্ছমাকর্ষয়িত্বা তু স্ফোটিতং চোদরং প্রিয়ে॥
গৃহীত্বা মৎস্যোদরস্থ আনীতন্তু গৃহী পুনঃ।
স্থাপয়িত্বা জ্ঞান পট্টং মম গুহ্যং তু রক্ষিতম্॥
পুনঃ ক্রুদ্ধমনেনৈব মূষকেন সুরেশ্বরী।
গার্ত্তং কৃত্বা সুরুঙ্গায় পুনঃক্ষিপ্তং হি সাগরে॥
দশকোটি প্রমাণেন মহামাংসং (মৎস্যং ?) হি ভক্ষিতম্।
মম ক্রোধো সমুৎপন্নং শক্তিজালো ময়াকৃতঃ।
আকর্ষিতো মৎস্য সপ্তানাং সাগর হ্রদাৎ।
নাগতোঽসৌ মহামৎস্য মমতুল্য বলঃ প্রিয়ে॥
জ্ঞানতেজেন সংভূতো দুর্জ্জয়স্ত্রিদশৈরপি।
ব্রহ্মত্বং হি তদা ত্যক্তং চিত্তবী (চিত্তধী ?) ধীবরাত্মকম্।
অহং সো ধীবরো দেবি! কৈবর্ত্তত্বং ময়া কৃতঃ।
আকৃষ্য তু তদা মৎস্যং শক্তিজাল সমীকৃতঃ॥
মৎস্যোদরস্থ তৎক্ষোট্য গৃহীতঞ্চ কুলাগমে।
বদন্তি বিদিতা লোকে পশবো জ্ঞানবর্জ্জিতাঃ॥

দেবী—ব্রাহ্মণোঽসি মহাপুণ্যে কৈবর্ত্তত্বং ময়া কৃতঃ।
মৎস্যাভিঘাতিভিনৈবিপ্রা মৎস্যঘ্নমেতি বিশ্রুতাঃ॥
কৈবর্ত্তত্বং কৃতং যস্মাৎ কৈবর্ত্তো বিপ্রমারকঃ॥

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই হেঁয়ালিপূর্ণ শ্লোকগুলির লৌকিক ব্যাখ্যায় যে ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন (কৌলজ্ঞান নির্ণয়—ভূমিকা ৮-৯ পৃষ্ঠা) তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ :

ভৈরব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—তিনিই কামরূপে ষণ্মুখ কার্ত্তিকেয়ের গুপ্ত তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। এই জ্ঞানই কুলা-গমের সারতত্ত্ব এবং চন্দ্রদ্বীপে তিনিই ইঁহার অধিকারী ছিলেন। তারপর তিনি বলিতেছেন—আমি যখন তোমার

সহিত চন্দ্রদ্বীপে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন শিষ্যরূপে কার্ত্তিক আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অজ্ঞানতা-বশতঃ গুহ্যতত্ত্বের গ্রন্থখানা হরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। আমি সাগরে গমন করিয়া সেই নিক্ষিপ্ত শাস্ত্র ভক্ষণকারী মৎস্যকে ধরিয়া তাহার উদর দীর্ণ করিলাম ও পবিত্র জ্ঞান উদ্ধার করিলাম। সেই চোর কিন্তু ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ভূমিগর্ভে একটি সুড়ঙ্গ খনন করিল এবং পুনরায় সেই গ্রন্থ চুরি করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। এইবার আরও বৃহদা-কার এক মৎস্য ইহা ভক্ষণ করিল। আমিও ইহাতে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলাম এবং আমার শক্তি-প্রভাবে এক জাল প্রস্তুত করিয়া সেই মৎস্যকে জালবদ্ধ করিয়া তীরে তুলিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সেই মহামৎস্য আমারই মত বলশালী বিধায় তাহাকে তীরে তুলিতে পারিলাম না। সেই মৎস্যেরও দারুণ দৈবশক্তি ছিল এবং দেবতাগণও তাহাকে ভয় করেন। তখন সেই মৎস্যের সঙ্গে সমুচিতভাবে সংগ্রাম করিবার জন্য আমি আমার ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করিয়া ধীবরত্ব গ্রহণ করিলাম। হে দেবি! আমিই ধীবর বৃত্তিধারী কৈবর্ত্ত; আমিই দৈবশক্তির জালের দ্বারা সেই মৎস্যকে ধরিয়া তীরে উঠাইলাম এবং কুলাগম শাস্ত্র উদ্ধার করিলাম। আমি যদিও ব্রাহ্মণ, এখন ধীবর সাজিয়াছি। কৈবর্ত্তরূপে মৎস্য বধ করার কারণে ব্রাহ্মণেশ্বর আমি মৎস্যঘ্ন কৈবর্ত্ত হইয়াছি।

দেবী বলিলেন—তুমি মহাপুণ্যবান ব্রাহ্মণ। আমিই তোমাকে কৈবর্ত্তরূপে পরিণত করিয়াছি। মৎস্যঘাতী বিপ্র-সকল মৎস্যঘ্ন নামে বিশ্রুত হইবে; এবং আমিই যখন কৈবর্ত্তত্বে পরিণত করিয়াছি, তখন কৈবর্ত্তরাই বিপ্রনায়ক বলিয়া গণিত হইবে।

ইহা হইতে বাগচী মহাশয় মোটামুটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—কুলাগম শাস্ত্র প্রথমে কামরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। মৎস্যেন্দ্র-নাথ প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিবার জন্য নিজের জাতি ত্যাগ করিয়া কৈবর্ত্ত হইয়া গিয়াছিলেন।

এখন সন্ধ্যাভাষায় শ্লোকগুলির অর্থ হইল নিম্নলিখিত রূপ :—

মূলাধার কামরূপে শিবশক্তি থাকেন। সেখান হইতে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া আজ্ঞাচক্রস্থিত প্রণবস্থান চন্দ্রদ্বীপে উত্থিত করিতে হইলে প্রথমে আদি ষণ্মুখ অর্থাৎ পঞ্চ প্রাণ মনের তত্ত্ব জানিতে হইয়াছিল। এই তত্ত্বই কুলাগম শাস্ত্রের আদি গূঢ়তত্ত্ব।

তারপর আজ্ঞাচক্রস্থ ত্রিকোণের ঊর্দ্ধদেশে প্রণবস্থান চন্দ্রদ্বীপ বা মণিদ্বীপে যাইবার সময় ষটদল কমলবিশিষ্ট মনশ্চক্রে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধস্বপ্ন এই ষণ্মুখ আবার অজ্ঞান-তার জাল বিস্তারপূর্ব্বক পূর্ব্বজ্ঞান হরণ করিয়া চিত্ত তথা কুণ্ডলিনীকে অনুলোম গতিতে নীচে নামাইয়া আনিল এবং ঈড়া পিঙ্গলার মধ্যে মৎস্যরূপী প্রাণবায়ুর স্বাভাবিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিল। তখন জ্ঞানচক্রের মধ্যে চিত্ত নিবেশিত করিয়া ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অধিকার হইতে ঊর্দ্ধে জ্ঞানপট্ট নিরালম্বপুরীতে স্থাপন করা হইল। কিন্তু এখান হইতেও বিভূতি, সিদ্ধি আদির প্রাবল্যে চিত্ত আবার নিম্নগামী হইয়া মায়াতে নিবদ্ধ হইল। এই মহামৎস্যরূপী মায়া দেহস্থ সপ্ত-ধাতুর সমুদ্র জুড়িয়া ব্যাপ্ত হইল। মায়া ব্রহ্মের সমশক্তিসম্পন্ন, দেবতারাও তাহার নিকট পরাজিত। সুতরাং ব্রহ্মভাবের অতীত হইয়া তাহাকে বধ করা হইল এবং মহালয়যোগে নির্ব্বিকল্প সমাধি হইল। ("মাঅ মারিআ কাহ্ন ভৈলা কবালী"—১১চর্য্যা)। ইহাই ধীবরবৃত্তি এবং ইহাই ব্রহ্মত্ব-লাভের অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্য-লাভের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বা উন্নততর অবস্থা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, গোরক্ষবিজয়, স্কন্দ পুরাণ বা কৌলজ্ঞান নির্ণয়োক্ত কাহিনীগুলিতে নাথসিদ্ধা মৎস্যেন্দ্রনাথের সংসারাশ্রমের জাতিকুল বিচারের ইতিহাস নাই,—আছে শুধু নাথসিদ্ধার ধর্ম্মমতানুযায়ী যোগসিদ্ধিলাভের গুহ্য আচরণের ইঙ্গিত।

দেশ-বিদেশের কথা

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, বাঁকুড়া

১৯৪৯ সালের কার্য্য-বিবরণী

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ১৯৪৯ সালেও মঠে পূজা অর্চনা এবং ধর্ম্মালোচনা যথারীতি হইয়াছে। বিভিন্ন পুজানুষ্ঠানাদিতে বেলুড় মঠ এবং মিশনের অন্যান্য শাখাকেন্দ্র হইতে সন্ন্যাসী-গণ এখানকার মঠে সমাগত হইয়া ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা করেন। গত বৎসর সাধারণ পাঠাগারের এবং পুস্তকাগারেও বিশেষ উন্নতিসাধন করা হইয়াছে। পুস্তকাগারে মোট পুস্তক-সংখ্যা ১৬৭৯ খানি।

বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয়ে ১৯৪৯ সালে মোট ৮ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে ১ জন সর্ব্ব-শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সারদানন্দ ছাত্রাবাসে ১৪ জন ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে ৩ জন বিগত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। গরীব ছাত্রদের সাময়িক সাহায্য-দানের ব্যবস্থা করাও হইয়াছিল।

রামহরিপুর মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের কার্য্যও সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে উক্ত বিদ্যালয়ে মোট ১৭৯ জন শিক্ষার্থী ছিল, তাহাদের মধ্যে ৫ জন বালিকা। এতদ্ব্যতীত রুগ্ন ব্যক্তিদের ঔষধ প্রদান এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া মিশন স্থানীয় জনসাধারণের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন।

শ্রীরেবতীমোহন লাহিড়ী

জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক শ্রীরেবতীমোহন লাহিড়ী এম-এ, বি-এল "ইংরেজ

ডক্টর শ্রীরেবতীমোহন লাহিড়ী

কর্ত্তৃক আসাম বিজয়" (Annexation of Assam) শীর্ষক মৌলিক সন্দর্ভ প্রণয়ন করিয়া সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি, ফিল উপাধিলাভ করিয়াছেন। ইহা আসামের একটি ঘটনাবহুল অথচ অর্দ্ধবিস্মৃত যুগের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছে। আসামের খামিয়া জাতি একদা অসমীয়াদের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হইতে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ-শক্তিকে উৎখাত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারই এক কাহিনী উপযুক্ত তথ্য প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত হইয়া এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের এক অংশ সর্ব্বপ্রথম ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় বাহির হইয়া আসামের ইতি-হাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়ের প্রতি বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। নয়াদিল্লীস্থ ভারত-সরকারের মহাফেজ-খানায় (National Archives of India) সংরক্ষিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দলিল এবং অহম্ বুরঞ্জীর (অহম্ রাজাদের আমলে হস্তলিখিত ইতিহাস) উপর ভিত্তি করিয়া এই সন্দর্ভটি রচিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই গ্রন্থ প্রকাশে অধ্যাপক লাহিড়ীকে এক সহস্র মুদ্রা সাহায্যস্বরূপ প্রদান করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

খিদিরপুর একাডেমির ছাত্রদের ক্রীড়াকৌশল

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও বৈশাখ মাসে বিপুল সমা-রোহের সহিত খিদিরপুর একাডেমির নববর্ষোৎসব উদ্‌যাপিত

খিদিরপুর একাডেমির নববর্ষোৎসবে পতাকা উত্তোলন

বিষয়-সূচী—আষাঢ়, ১৩৫৭

বিবিধ প্রসঙ্গ— ... ১৯৩—২

সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালী কায়স্থের দান—
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ২

বাঙ্গালীর কবি (কবিতা)—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ ... ২

কৈফিয়ৎ—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দীশর্ম্মা) ... ২

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা—শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব ... ২

কবি (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ... ২

ভারতীয় সেচ-বিদ্যায় বাংলার স্থান—
শ্রীকনকভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, ... ২

প্রাচ্যের প্রাচীন শিল্পকলা (সচিত্র)—
শ্রীগোপীনাথ সেন ... ২

কাজের জন্য দুগ্ধবতী গাভীর ব্যবহার (সচিত্র)—
শ্রীহলধর ... ২

জাদু ঘর (নাটক)—শ্রীকুমারলাল দাসগুপ্ত ... ২

বিষয়-সূচী—আষাঢ়, ১৩৫৭

বামাহিতৈষিণী সভা ও ভারতাশ্রম—
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ... ২৬৯

মৎস্যেন্দ্রনাথের জন্মরহস্য (সচিত্র)—
শ্রীরাজমোহন নাথ ... ২৭৫

দেশ-বিদেশের কথা (সচিত্র)— ... ২৮১

পুস্তক-পরিচয়— ... ২৮৭

সদানন্দের বৈঠক— ... ২৮৮

রঙীন ছবি

সুপ্ত গ্রাম—দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

-আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি অমূল্য পুস্তক--

দি গ্লোব নার্শরী

প্রদর্শণী গৃহ-কলেজষ্ট্রীট মার্কেট (টাওয়ার ব্লক)

—গ্লোব নার্শরীর উৎকৃষ্ট বীজ—

—সবে মাত্র আমদানী হইয়াছে—

নাম	আউন্স
বাঁধাকপি	
গ্লোব গ্লোরী	২॥০
মাউণ্টেন হেড	২॥০
নবিকেলি	২॥০
ফুলকপি	
গ্লোব ডোয়ার্ট	৯৲
গ্লোবল আর্লি	৯৲
গ্লোব বেটাব	৪৲
প্রাইজবুইন	৩৲
ওয়ালচিবাণ	৩৲
কাশীব জলদি ও নাবি	২৲
ওলকপি	
লাল ও সাদা	১॥০
বীট	
লাল গোল	১।০
ইজিপ সিয়ান	১॥০
[illegible]	১।০
গাজর	
[illegible]	১৵০
[illegible]	১৵০
বক্সুসে	৵০
শালগম	
সাদা	১৲
লাল	১৲
বাঙ্কুসে	১৲
লেটুস	
বিগ বোষ্টন	১॥৵০
মেথাম্ব	১॥৵০
বারমেসে	১॥৵০
লঙ্কা	
চাইনিজ জায়েণ্ট	২৲
পাটনাই	॥০
সূর্য্যমণি	২৲
কামরাঙ্গা	১৲

নাম	আউন্স
মূলা	
বোম্বাই ১নং (সের ১২৲)	॥০
কাঁথির (সের ১০৲)	॥০
লাল লম্বা, সাদা লম্বা	॥০
লাল গোল	১৲
চাইনিজ রোজ	৸০
বাঙ্কুসে (জাপান)	১॥০
নেপালের	॥০
বার্নজিৎ	॥০
মংবী	॥০
বেগুন	
মুক্তকেশী	১৲
কুলি	১৲
বারমেসে	১৲
মাকড়া	১৲
বামনগাছি	২৲
[illegible]	৩৲
[illegible]	২৲
পেঁয়াজ	
বক্সুসে	১॥০
ম্যানিবেড	১॥০
বোম্বাই (সের ২০৲)	৸০
পাটনাই (সের ২০৲)	৸০
মটর	
ওলন্দা (সের ৩৲)	৵০
দার্জ্জিলিং („ ৩৲)	৵০
আমেরিকান („ ৩৲)	৵০
বীন ফ্রেঞ্চ	
লাল (সের ৩৲)	৵০
সাদা („ ৩৲)	৵০
হলদে („ ৩৲)	৵০
সয়াবীন	
পুষ্টিকর (সের ৩৲)	৵০

নাম	আউন্স
টম্যাটো এক্সিলেণ্ট	২৸০
ঐ ম্যাচলেশ	৸৵০
ঐ লার্জ্জরেড	৷৷৵০
ঐ পারফেকসন	২৸০
খরমুজা লক্ষ্ণৌ	॥০
ঐ বাঙ্কুসে	১॥০
ঐ সন্দা	১॥০
খেঁড়ো বীরভূমের	১৲
তামাক হিংলী	১৲
ঐ মতিহারী	১৲
ঐ আমেরিকান	২৲
তরমুজ বাঙ্কুসে	১
ঐ [illegible]	১
ঐ [illegible]	০
ঐ ভাগলপুর	।০
পামকিন বাঙ্কুসে	০
ঐ ক্রুকনেক	১৲
ঐ ম্যামথ কিং	।০
রাই চাইনিজ	॥০
পেঁপে রাঁচি	৪৲
ঐ লঙ্কাদ্বীপ	৮৲
ঐ সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্গালোর	৭৲
ঐ বোম্বাই	১৲
ঐ আফ্রিকান ওয়াণ্ডার	৮৲
স্কোয়াস বাঙ্কুসে	২৲
ঐ ম্যারো	১৲
ঐ বুস	২৲
সিলেরী সাদা, লাল	১৲০
সীম আলতাপাটী	॥০
ঐ সবুজ	।০
ঐ সাদা	॥০
ঐ হাতিকান	॥০

নাম	আউন্স
উচ্ছে	॥০
করলা দেশী বড়	১৲
কাঁকুড়	।০
কাঁকড়ি	২৲
কুমড় মিষ্টি	।০
খেঁড়ে	১৲
গুড়াম (কাচরা)	।০
চিচিঙ্গা	১॥০
চালকুমড়া	।০
ঝিঙ্গা পালা	॥০
টেপারা	২৲
ঢেঁড়স	।৵০
ধুন্দুল	॥০
ফুটি	।০
বরবটি	॥০
লাউ লম্বা	॥০
লাউ গোল	॥০
শশা পালা	১৲
[illegible]	১৲
ঐ আমেরিকান	২৲
শাঁক আলু	॥০
শাক পালম (সের ৩)	৵০
ঐ ঝাড় পালম	৵০
ঐ টক পালম	১৲
ঐ কাটোয়ার ডাঁটা	১৲
ঐ চাঁপানটে	৸০
ঐ পদ্মনটে	॥০
ঐ লাল শাক	॥০
ঐ কনকানটে	॥০
ঐ পুঁইশাক	॥০
দূর্ব্বা ঘাস	পাউণ্ড ৫॥০
বেড়ার বীজ	পাউণ্ড ৩৲

আলু ও পটল মূলের জন্য আবেদন করুন।

মরশুমী ফুলবীজ ১২ রকম ১২ প্যাকেট—৫৲ টাকা মাত্র

দি ষ্টোর নার্শারী

প্রদর্শনী গৃহ-কলেজষ্ট্রীট মার্কেট (টাওয়ার ব্লক)

সুবিখ্যাত চারা ও কলম

গাছের অর্ডারে সঙ্গে নিকটবর্ত্তী রেল বা ষ্টীমার ষ্টেশনের নাম ও অর্দ্ধেক মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হয়।

নাম — প্রত্যেক

আম

আলফান্সো ২৲
বোম্বাই ভূতো ২৲
বারমেসে (তেফলা) ১৷৷০
দোফলা ১৷৷০
লতানে ১৲
গোলাপখাস ১৷৷০
গোপালভোগ ১৷০
ক্ষীরসাগর ২
ল্যাংড়া (লক্ষ্ণৌ) ২৷০
বাঁচ মিঠে ১৷৷০
ল্যাংড়া কাশীর ২৲
সফেদা (লক্ষ্ণৌ) ২৷৷০
সিপিয়া ১৷৷০
মালদহ ১৲
তোতাপুরী ৩৲
কোহিতোভোগ ২৲

আতা ৷৷০

আঙ্গুর লম্বা বা গোল ৷৷০

আনারস

দেশী
কুইন
বাম্বুস ৸০
সিঙ্গাপুর ১৲

আপেল ১৲

আমড়া বিলাতী ৷৷০

কমলালেবু

দার্জ্জিলিং ১৲
নাগপুর ১৲
শ্রীহট্ট ১৲
কাশীর ১৲

কলা বীটজবা ১৲
" দুধসাগর ১৲
" বোম্বাই ১৲
" কাবুলী ৸০
" কানাইবাঁশী ১৷৷০
" মর্ত্তমান ৸০

কাঁঠাল

খাজা ৷৵০
নেও (গিলা) ৷৵০

কালজাম বড় ৵০

করমচা চীনের ১৲

কামরাঙ্গা

চীনের ১৲

কুল নারিকেলী ১৲
ঐ কাশীর ১৲
ঐ বোম্বাই ১৲

খর্জ্জুর

আরব বা কলসে ৸০

গোলাপজাম বড় ৷৷০

চালতা চারা
ঐ লতানে

জামরুল সাদা ৷৷০
ঐ লাল ৸০

জলপাই বড় ৵০

ডালিম পাটনাই ৷৷০

নারিকেল

দেশী ১০° (শত ১০০৲)
সিঙ্গাপুর সিংহল

ন্যাশপাতি

পেশোয়ারী ৸০

নোনা দেশী ৷০
ঐ বিলাতী ৷৷৵০

পীচ আগ্রাই ১৲

পেয়ারা কাশীর ৸০
ঐ এলাহাবাদ ৸০

ফিগ

বড়পাতা ১৲
ছোটপাতা ৸০

বাদাম

কাজু বা হিজলী ৷৷০
চেবাপাতা ৷৵০

বাতাবীলেবু

লাল ৸০
সাদা ৸০
চীনের ৸০
কলমে ১৲

বেদানা পেশোয়ারী ৸০

বেল রংপুর

লকেট আগ্রাই

লিচু

মজঃফরপুর ১নং ১৷৷০
বেদানা ২৲
বোম্বাই ৸০
গ্রীণ ২৲

লেবু

কাগজী দেশী (শত ৫৬৲) ৸০
" চীনের
" বারমেসে
পাতি (শত ৩৫৲) ৷৷০
" বারমেসে ১৲
শরবতী ৸০
এলাচি ৸০

সপেটা বড় জাতী ১৲

সুপারী

নারকেলী (শত ৩০৲) ৷৵০

মসলার গাছ

এলাচ ছোট বা বড় ৷৷০
কর্পূর ৸০
কাবাবচিনি ৷৷০
খদির ৷৷০
গোলমরিচ ৸০
তেজপাতা ১৲
দারুচিনি ৸০
লবঙ্গ ১৲
হিং ৷৷০
পিপুল (কাটিং ২০৲ মণ) ৷০
চন্দন শ্বেত ১৷৷০
ইউক্যালিপটাস ৸০

বিবিধ ফুল গাছ

অশোক ৷৷০
কলকে সাদা ও লাল ৷৷০
গন্ধরাজ ডবল ৷৵০
টগর ৷০
বকফুল সাদা পদ্ম
বকফুল লাল পদ্ম ৷৷০
স্থলপদ্ম ৷৷০
চামেলী
নবমল্লিকা ৷৷০
জেসমিন ৷০
যুঁই স্বর্ণ ৷৷০
যুঁই ডবল ৷৵০
বেল রাই ৷৵০
বেল মতিয়া ৷০

ম্যাগ্নোলিয়া

গ্র্যাণ্ডি ফ্লোরা ৫৲

চাঁপা

স্বর্ণ
শ্বেত (চীনের)

জবা

সাদা ডবল
নীল ডবল
পাচকিলা ৷৷০
সপ্তমুখী ৷৷০
তম্বুরে ৷৷০
হলদে ৷৷০

করবী

সাদা ডবল ৷০
লাল পদ্ম ৷০

রঙ্গন

এ্যালবা (সাদা) ৷৷০
কলিরাই (হলদে) ৷৷০
রোজিয়া (গোলাপী) ৷৷০

☞ **আমেরিকান সব্জী বীজ** ১২ রকম ১২ প্যাকেট—৩৷০ টাকা মাত্র

বি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ

"গিনি হাউস"

ভারতের অন্যতম অলঙ্কার নির্ম্মাতা।

গিনি সোনার গহনার

= একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান =

হেড অফিস :—১৩১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ :—হজরৎগঞ্জ, লক্ষ্ণৌ।
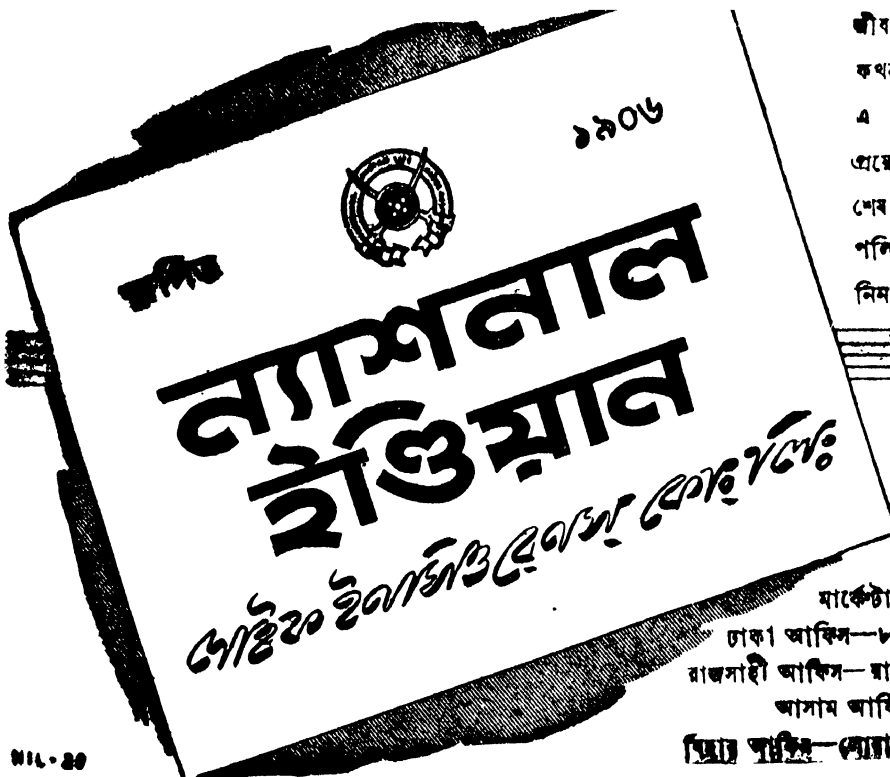
জীবন যেন পদ্মপত্রে নীর— কখন আছে, কখন নেই। এ অবস্থায় জীবন-বীমার প্রয়োজন যে কতো তা বলে শেষ করা যায় না। বিভিন্ন পলিসির জন্ত আজই সন্ধান নিন।

প্রস্পেক্টাস্ ও এজেন্সীর সর্ত্তাবলীর জন্ত লিখুন

ম্যানেজার

৯ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, মার্কেণ্টাইল বিল্ডিং, কলিকাতা

ঢাকা আফিস—৮ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

রাজসাহী আফিস—রাণীবাজার পোঃ ঘোড়ামারা

আসাম আফিস—শিলং রোড, গৌহাটী

বিহার আফিস—লোয়ার রোড, বাঁকিপুর, পাটনা

সুশোভন পারিপাট্যে

শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা গেঞ্জী

ফ্যান্সি নীট * লেডী-ভেষ্ট * হিমানী * গ্রে-সার্ট * সিল্কট

ডি.এন.বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী

ফ্যাক্টরী-৩৬-১এ সরকার লেন, কলিকাতা

ভালো চা তৈরির
১
টাটকা জল একবার মাত্র ফুটিয়ে ব্যবহার করবেন।
২
চা ভেজাবার আগে পট্‌টা গরম করে নেবেন।
৩
মাথা-পিছু এক চামচ আর ঐ সঙ্গে আর এক চামচ বেশি চা নেবেন।
৪
চা-টা তিন থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত ভিজতে দেবেন।
৫
কাপে চা ঢালার পর দুধ চিনি মেশাবেন।
চেয়ারম্যান, সেণ্ট্রাল টী বোর্ড, পোষ্ট বক্স ২১৭২, কলিকাতা-১ :
এই ঠিকানায় লিখলেই বিনামূল্যে আমাদের "চা তৈরির খুঁটিনাটি" পুস্তিকাটি আপনাকে পাঠানো হবে।
পাঁচটি সহজ নিয়ম
সেণ্ট্রাল টী বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত
©
CTBX 33

ভারতের সুপ্রসিদ্ধ জুয়েলার্স

নূতন ক্যাটালগ

বাহির হইয়াছে

মহাত্মা গান্ধী :—"আমি স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরীর নানা প্রকার শিল্পকার্য্য দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বড়ই সুখের বিষয় যে দেশীয় শিল্পের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ৺ভগবানের নিকট আমি ইহাদের সর্ব্বোন্নতি কামনা করি।" খাঁটি গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

হজমের ব্যতিক্রম হইলে পাকস্থলীকে বেশী কাজ করান উচিত নহে। যাহাতে পাকস্থলী কিছু বিশ্রাম পায় সেরূপ কার্য্যই করা উচিত। ডায়াপেপসিন খাদ্যের সারাংশ শরীরে গ্রহণ করিতে সাহায্য করিবে। ডায়াপেপসিন ঠিক ঔষধ নহে, দুর্ব্বল পাকস্থলীর একটি প্রধান সহায় মাত্র।

পাকস্থলীর অভ্যন্তর হইতে জারক রস নিঃসৃত হয়, এই রস খাদ্যের সহিত মিশিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা খাদ্য পরিপাক করে। ডায়াপেপসিন সেই রসেরই অনুরূপ। ডায়াপেপসিন অতি সহজেই খাদ্য হজম করাইয়া দিবে ও শরীরে বল আসিলেই আপনা হইতেই হজম করিবার শক্তি ফিরিয়া আসিবে।

ডায়াস্‌টেস্ ও পেপসিন্ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংমিশ্রণ করিয়া ডায়াপেপসিন্ প্রস্তুত করা হইয়াছে। খাদ্য জীর্ণ করিতে ডায়াস্‌টেস্ ও পেপসিন্ দুইটি প্রধান এবং অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। খাদ্যের সহিত চা-চামচের এক চামচ খাইলে পাকস্থলীর কার্য্য অনেক লঘু হইয়া যায় এবং খাদ্যের সবটুকু সারাংশই শরীর গ্রহণ করে।

ইউনিয়ন ড্রাগ—কলিকাতা

বরবুদুর। যবদ্বীপ—পণ্ডিত নেহরুর বার শত বৎসর পূর্ব্বে

নীচে— ভারতীয়দিগের সমুদ্রপথে যবদ্বীপ যাত্রা ও শোভাযাত্রা
উপরে— ললিতবিস্তারের কাহিনী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫০শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৫৭

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী

ঝড়-বাদলের তাণ্ডবের মধ্যে বজ্রভেরী বাজাইয়া "আষাঢ় আসিল দ্বারে।"

কালিদাসের যুগে দেশে সুখী লোক ছিল তাই "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" মেঘালোক দেখিলে তাহার কেবলমাত্র "অন্যথা-বৃত্তি চেতঃ" হইত, এখন হয় অনাবৃষ্টির আতঙ্ক, নহিলে হয় অতিবৃষ্টির প্রলয় তাণ্ডব। আজিকার দিনে চতুর্দ্দিক হইতে যে অসম্পূর্ণ সংবাদ আসিতেছে তাহাতে মনে হয় অভাগা পশ্চিমবঙ্গের বুঝিবা আবার কপাল পুড়িল। মেদিনীপুর, বীরভূম, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং এই চারিটি জেলায় তো ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত ও প্লাবনের ফলে দেশ বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছে, অথচ কোথায় কি হইয়াছে তাহার খবর এখনও জানা যায় নাই। খবর জানিবারও উপায় নাই, কেননা পশ্চিমবঙ্গের হতভাগ্য লোকদের খবরাখবর রাখেই বা কে, করেই বা কে। দৈনিক সংবাদপত্রে পশ্চিমবঙ্গ বলিতে বুঝায় কলিকাতা বা তাহার উপকণ্ঠ। আজ পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তহারার আগমনের ফলে রাণাঘাট, বনগাঁ, মুর্শিদাবাদও কিছু উল্লেখ পাইতেছে। নহিলে হুগলী-ভাগীরথীর ওপারে একমাত্র হাওড়া জনপদ আছে তাহার পর অজানা দেশ। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরখণ্ডের সম্পর্কে ত সকলেই উদাসীন; একমাত্র সংবাদপত্র অপিসে চা পানের সময় দার্জ্জিলিঙের কথা হয়ত কেহ কেহ অকস্মাৎ স্মরণ করেন।

বস্তুতঃ পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব দৈনিক সংবাদপত্র একটিও নাই। যদি পাঠকগণ বিশ্বাস না করেন তো কোন দৈনিক সংবাদপত্র খুলিয়া দেখুন। তিনি দেখিবেন যেদিন বিজ্ঞাপন কম থাকে সেদিন হয়ত দু-চারিটি পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বলের কথায় কলম বোঝাই হইয়াছে। নচেৎ পূর্ব্ববঙ্গ আছে, দিল্লী আছে, তিব্বত-চীন-জাপান আছে, সম্প্রতি পণ্ডিত নেহরুর দৌলতে জাভা-বালিও স্থান পাইয়াছে, নাই কেবল পশ্চিমবঙ্গ। এরূপ দারুণ দৈববিপর্য্যয়ের পরে পশ্চিমবঙ্গের সংবাদ দেখি এইমাত্র: প্রধানমন্ত্রী বীরভূমে প্লাবনের ফলে ময়ূরাক্ষী বাঁধ দর্শন করিতে পারেন নাই, মেদিনীপুরের উপরের আকাশে শ্রীমান নিকুঞ্জ মাইতি উড্ডীয়মান হইয়াছেন এবং দার্জ্জিলিঙে মহামান্য কাটজু মহাশয় আটকা পড়িয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের পরম সৌভাগ্য যে এই তিন জন মহাশয় ব্যক্তি এ দুর্ভাগা দেশে আছেন, না হইলে এই ঘূর্ণাবর্ত্ত ও প্লাবনের সংবাদটাই খবরের কাগজের আসরে উল্লেখই পাইত না।

বাস্তবিকই সারা ভারতবর্ষে যদি "গত গৌরব হৃত আসন", দিশাহারা, বাস্তহারা কেহ থাকে তবে সে নির্ব্বোধ, নির্ব্বাক, অসহায় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী—বিশেষতঃ যদি সে দামোদর-রূপনারায়ণের ওপারের হয়। বাংলা দৈনিকের আপিসে টাঙানো বাংলার মানচিত্রে হুগলী-ভাগীরথীর ওপারে শুধু হুগলী-বর্দ্ধমান কিছু কিছু দেখা যায়-তাও শ্রীমান্ প্রফুল্ল সেনের দৌলতে—দামোদর-রূপনারায়ণের ওপার তো সুদূর অজানা দেশ। এখন একমাত্র উপায় যদি পণ্ডিত নেহরু ইন্দোনেশিয়া আবিষ্কারের পর পশ্চিমবঙ্গ আবিষ্কারের অভিযান করেন! না হইলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী আর কিছুদিন পরে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবেই।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী, তুমি কবে বুঝিবে যে মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পরের "কংগ্রেস", পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের স্বর্গারোহণের পর "হিন্দু মহাসভা" ও লেনিনের মৃত্যুর পর "কম্যুনিজম" ঐগুলি রাষ্ট্রনৈতিক পেটেণ্ট ঔষধের মোড়ক মাত্র হইয়া গিয়াছে। আর "সোস্যালিজম"! সে তো কয়েকটি বিকৃতমস্তিষ্ক নেতার কৃপায় "পাগলা কালীর মহাপ্রসাদ" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদেশের পরিত্রাণের একমাত্র আশা যদি দেশের লোক বুঝে যে "ইয়ে সব ঝুটা হ্যায়" এবং নূতনভাবে নিজেদের জন্মগত অধিকারের দাবিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়ায়। সরকারী-বেসরকারী চাকুরী তো কতিপয় সরকারী বিশ্বাসঘাতকের চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর কপালে আর বিশ বৎসরে একটিও জুটিবে না। অথচ সকল দিকেও তাহাকে বঞ্চিত করার চেষ্টা পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। এইতো অবস্থা!

ডাঃ মাথাইয়ের পদত্যাগ

পণ্ডিত নেহরু যাঁহাকে অল্পদিন আগেও ভারত গবর্ন্মেণ্টের শক্তির স্তম্ভ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন সেই ডা: মাথাই পর্য্যন্ত মন্ত্রিসভায় কেন টিকিতে পারিলেন না ইহা লইয়া দেশে আলোচনা চলিতেছিল। ইতিপূর্ব্বে ডা: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীও প্রধানমন্ত্রীর সহিত মতভেদের জন্য পদত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং ডা: মাথাই কেন পদত্যাগ করিলেন তাহা সকলে জানিতে চাহিবে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনিও শ্রীক্ষিতীশ নিয়োগীর ন্যায় এক প্রকার চুপ করিয়াই গিয়াছিলেন, শুধু এইটুকু বলিয়াছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর সহিত তাঁহার মূলনীতি লইয়া মতভেদ ঘটিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী উত্তরে বলেন যে, তাঁহার সহিত ডা: মাথাইয়ের মতভেদের একমাত্র কারণ প্ল্যানিং কমিশন। এইবার ডা: মাথাই দীর্ঘ বিবৃতি দিয়া দেশবাসীকে সমস্ত বিষয়টি জানিবার সুযোগ দিলেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মন্ত্রীদের পদত্যাগের কারণ নিছক ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রের কোন গোপন ব্যাপার সম্পর্কিত না হইলে তাহা জানিবার অধিকার প্রত্যেকের আছে, পদত্যাগকারী মন্ত্রীদের উচিত তাহা জানাইয়া দেওয়া। তিনি তাহা করিয়া উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন।

ডা: মাথাইয়ের বিবৃতিতে প্রকাশ, নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য প্রধানমন্ত্রীর সহিত তাঁহার মতভেদ ঘটিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—(১) প্ল্যানিং কমিশনকে মন্ত্রীসভার ঊর্দ্ধে স্থান দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে অর্থসচিবের ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে; (২) ভারত-পাকিস্থান চুক্তিতে তাঁহার মত ছিল না; (৩) কোন কোন বিদেশী স্বার্থের খাতিরে টাকার মূল্য পুনর্ব্বিবেচনার ব্যবস্থা হইতেছিল; (৪) বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রীরা অর্থসচিবকে ডিঙাইয়া প্রধানমন্ত্রীর নিকট হইতে টাকার বরাদ্দ বাহির করিয়া লইতেন; (৫) প্ল্যানিং পরিকল্পনাগুলিতে কোন শৃঙ্খলা ছিল না, প্রায় ৩০০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা তৈরি হইয়াছে কিন্তু কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে কার্য্যে পরিণত হইবে তাহা ঠিক করা হয় নাই; (৬) বিভাগীয় অপচয় নিবারণ অসম্ভব হইতেছিল এবং এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব বিভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী।

ইহাদের কোনটিকেই সামান্য মতভেদ বলা যায় না।

ডা: মাথাইয়ের এই বিবৃতি যখন প্রকাশিত হয় প্রধানমন্ত্রী তখন ইন্দোনেশিয়ার পথে, জাহাজে। মৌলানা আজাদ ইহার জবাব দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ভারত-পাকিস্থান চুক্তিতে ডা: মাথাইয়ের আপত্তি ছিল একথা তিনি এই প্রথম শুনিলেন। মৌলানা আজাদ ডা: মাথাইয়ের সমকক্ষ মন্ত্রী, তাঁর পক্ষে এইরূপ জবাব দেওয়া অত্যন্ত অসমীচীন হইয়াছে। অত:পর ডা: মাথাইকে সমর্থন করিয়া অপর কোন মন্ত্রী বিবৃতি দিলে বলিবার কিছু থাকিবে না অথচ এইরূপ চলিতে থাকিলে মন্ত্রীসভার শৃঙ্খলা রসাতলে যাইবে। এইরূপ বিবৃতির উত্তর দানের একমাত্র অধিকারী প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, ডা: মাথাইয়ের সহিত তাঁহার মতভেদের একমাত্র কারণ প্ল্যানিং কমিশন। ডা: মাথাই গত ডিসেম্বর মাসে প্রথম পদত্যাগ করিয়াছিলেন, পরে প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে তিনি উহা প্রত্যাহার করেন। ফেব্রুয়ারী মাসে তিনিই পার্লামেণ্টে প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যদের নাম প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনিই বলিতেছেন যে কমিশনের সদস্যদের বেতন এবং পদমর্য্যাদা লইয়া তাঁহার সহিত প্রধান মন্ত্রীর মতভেদ হইয়াছে; কমিশনের সদস্যগণকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সমান বেতন ও মর্য্যাদা দিতে তাঁহার আপত্তি ছিল, অর্থসচিবকে কার্য্যত: উহার অধীনস্থ করিয়া দিতে ঘোর আপত্তি ছিল। এই ব্যাপার অবশ্যই ফেব্রুয়ারীর পর ঘটিয়াছে। 'ভিজিল' লিখিয়াছেন যে, ডিসেম্বরে ডা: মাথাইয়ের পদত্যাগ প্রত্যাহারের সময়ই প্ল্যানিং কমিশন গঠিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং উহা পদত্যাগের প্রধান কারণ হইতে পারে না, ইহার পর একমাত্র ভারত-পাকিস্থান চুক্তি ও বাণিজ্য চুক্তি ভিন্ন আর কোন বড় ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু ডা: মাথাই প্ল্যানিং কমিশন সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহার সবগুলিই ফেব্রুয়ারীর পরের ঘটনা। সুতরাং তাঁর পদত্যাগের মূল কারণ-স্বরূপ তিনটিকেই ধরা উচিত। বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন সেক্রেটারীরা, বিভাগীয় মন্ত্রীদের ডিঙাইয়া তাঁহারা কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী এবং ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন। অর্থ এবং বাণিজ্য সচিবেরা ইহা অসম্মানজনক মনে করিতে বাধ্য।

প্ল্যানিং কমিশনের কাজ সম্বন্ধে ডা: মাথাই বলিয়াছেন যে তাঁহারা এক একটা জিনিষ তৈরি করিয়া আনিতেন এবং ক্যাবিনেটের অনুমোদন চাহিতেন। ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মধ্যে যে ব্যাপার লইয়া পরামর্শ হইল সেই সব জিনিষ এই ভাবে চোখ বুজিয়া অনুমোদন করার অর্থ প্ল্যানিং কমিশনকেই ক্যাবিনেট বলিয়া স্বীকার করা। কমিশন এবং ক্যাবিনেটের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র প্রধানমন্ত্রী। এইরূপে পার্লামেণ্টের প্রতি দায়িত্বশীল ক্যাবিনেটের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া পার্লামেণ্টের প্রতি দায়িত্বহীন এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতি দায়িত্বশীল কমিশনের ক্ষমতা বাড়িতে দেওয়ার একমাত্র তাৎপর্য্য প্রধানমন্ত্রীর ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা। এই ধারা প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছু দিন যাবৎ আরম্ভ করিয়াছেন। কথায় কথায় উদ্ভট "হাই পাওয়ার কমিটি" গঠন করিয়া বিভাগীয় মন্ত্রীদের ক্ষমতা খর্ব্ব করা এবং ঐ সব কমিটিতে অযোগ্য স্তাবকদের স্থান দেওয়া তিনি প্রায় রেওয়াজ করিয়া তুলিয়াছেন। খাদ্য বিভাগে এবং পুনর্ব্বসতি বিভাগে এরূপ হইয়াছে, প্ল্যানিং কমিশনেও তাহাই ঘটিয়াছে। প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যেরা পুরানো বুরোক্রাট

আমলের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অথবা ব্যবসাদার; দেশের আপামর সাধারণের বা কংগ্রেসের আদর্শের সহিত তাঁহাদের যোগ কস্মিনকালেও ছিল না বরং তার বিরুদ্ধাচরণ করাই তাঁদের কাজ ছিল। কংগ্রেস পণ্ডিত নেহরুরই সভাপতিত্বে যে প্ল্যানিং কমিটি গঠন করিয়াছিল এবং যে কমিটি তাহাদের কাজ যোগাতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিল সেই কমিটি ভাঙিয়া দিয়া একেবারে বিরুদ্ধ ধরণের লোক লইয়া প্ল্যানিং কমিশন গঠন দেশবাসী ভাল চোখে দেখে নাই। ইঁহারা তুলার দাম নির্দ্ধারণে পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করায় ডাঃ মাথাইয়ের অসহ্য হয়। জনসাধারণের প্রতি দায়িত্বশীল ক্যাবিনেটকে ডিঙাইয়া প্রধানমন্ত্রীকর্ত্তৃক নিযুক্ত এবং একমাত্র তাঁহার প্রতি দায়িত্বশীল হাই পাওয়ার কমিটি বা কমিশন গঠন গণতন্ত্রের পথ নহে, ডিক্টেটরশিপের লক্ষণ। প্ল্যানিং কমিশন লইয়া প্রধান মন্ত্রীর সহিত ডাঃ মাথাইয়ের মতভেদের কারণ অত্যন্ত গভীর; প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করিয়া যে পথে পা দিয়াছেন তাহা ধ্বংসের পথ বলিয়া ডাঃ মাথাই উঁহার সহিত তাঁহার পা মিলাইতে পারেন নাই। ভারত-পাকিস্থান চুক্তিতে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ এবং পাট-চুক্তিতে শ্রীক্ষিতীশ নিয়োগীর পদত্যাগেও এই মূল প্রশ্নই উঠিয়াছে যে প্রধানমন্ত্রী তাঁহার মতটাকেই একমাত্র গ্রাহ্য বলিয়া মনে করিবেন, না সমগ্র ক্যাবিনেটের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যাবিনেটের সহিত পরামর্শক্রমে প্রধানমন্ত্রী যে মত ও পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাই ছিল গণতন্ত্রসম্মত, সমগ্র দেশবাসী তাহা সমর্থন করিয়াছিল। মার্চ হইতে তিনি ক্যাবিনেটের মত বদলাইবার জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা গণতন্ত্রসম্মত হয় নাই এবং এইজন্যই ক্যাবিনেটের তিন জন মন্ত্রী এবং বিবেকবান মিনিষ্টার অফ ষ্টেট শ্রীমোহনলাল শকসেনাকে সরিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে।

উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস বিদ্রোহ

উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসে যে ভাঙ্গন দেখা দিয়াছিল তাহা এবার চরমে উঠিয়াছে, বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইয়াছে। বিদ্রোহী কংগ্রেসীরা লক্ষ্ণৌতে কনভেনসন করিয়া নূতন দল গঠন করিয়াছেন। নাম দিয়াছেন পিপ্‌লস কংগ্রেস। কনভেনসনে উত্তর প্রদেশ ব্যবস্থাপরিষদের ২১জন সদস্য, এ-আই-সি-সির ১৮ জন সদস্য এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের ৬০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। প্রদেশের ৫২টি জেলার মধ্যে ৩৭টি হইতে ৩৩০ জন প্রতিনিধি কনভেনসনে যোগ দিয়াছিলেন। সভাপতিত্ব করেন উত্তর প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণদত্ত পালিওয়াল। নবগঠিত পার্টির সভাপতি তাঁহাকেই করা হইয়াছে, জেনারেল সেক্রেটারী হইয়াছেন শ্রীযুক্ত ত্রিলোকী সিং।

কনভেনসনের পর নূতন পার্টির ২১ জন সদস্য পরিষদের স্বতন্ত্র আসন দাবী করিয়া স্পীকারকে চিঠি দিয়াছেন। ইহাই উত্তর প্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদে সর্ব্ববৃহৎ বিরোধী দল হইবে। শ্রীত্রিলোকী সিং এই দলের নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পিপ্‌লস কংগ্রেস তাঁহাদের কনভেনসনে কোন নূতন প্রোগ্রাম প্রস্তুত করেন নাই, কংগ্রেসের প্রোগ্রামই তাঁহাদেরও কর্ম্মসূচী এই কথাই তাঁহারা বলিয়াছেন। তাঁহাদের দাবি এই যে কংগ্রেসে এখন যাহারা সংখ্যায় বেশী হইয়া আপিস দখল করিয়া আছে তাঁহাদের চেয়ে বিরোধী সদস্যেরা কংগ্রেস প্রোগ্রাম কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত।

উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসী দলের নেতৃত্ব করিতেছেন স্বাস্থ্য ও সরবরাহ সচিব শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্ত। তিনি শ্রীত্রিলোকী সিংহকে বলিয়াছেন যে বিদ্রোহী সদস্যদের পক্ষে পদত্যাগ করিয়া নূতন নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত ও সম্মানজনক পন্থা। শ্রীত্রিলোকী সিংহ জবাব দিয়াছেন যে তাঁহাদের পদত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না। সরকারী দল কংগ্রেসের প্রোগ্রাম মানিয়া চলিতেছেন না ইহাদের বিরুদ্ধে ইহাই তাঁহাদের অভিযোগ, সুতরাং পদত্যাগ তাঁহাদেরই করা উচিত।

উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের এই বিদ্রোহ নিবারণের জন্য পণ্ডিত নেহরু খুব চেষ্টা করিয়াছেন, কয়েকবার তিনি লক্ষ্ণৌ গিয়া সদস্যদের বুঝাইয়া বিরোধ আপোষে মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত ব্যবস্থা পরিষদের ২১ জন সদস্যকে ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস হইতে বহিষ্কারের আদেশ দেন। বিরোধ ইহাতে একেবারে খোলাখুলি হইয়া যায়। ইহারই পর আসে কনভেনসন এবং পিপ্‌লস কংগ্রেস।

উত্তর প্রদেশের এই ঘটনার গুরুত্ব খুব বেশী, স্বাধীনতার পর ইহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া মনে করা যায়। "কংগ্রেস স্বাধীনতার আগে যে ভাবে কাজ করিয়াছে, এখন আর সে ভাবে চলিবার প্রয়োজন নাই, কংগ্রেস অতঃপর লোকসেবক সঙ্ঘে পরিণত হওয়া উচিত," মহাত্মা গান্ধী একথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্যশাসন ক্ষমতায় কংগ্রেসী নেতারা এমনই মাতিয়া উঠিয়াছিলেন যে গান্ধীজীর এই সৎপরামর্শে তাঁহারা কর্ণপাত করেন নাই। ফলে একটি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পরিষদের ভিতরে এবং বাহিরে সর্ব্বপ্রকার সমালোচনার কণ্ঠরোধ করিয়া শাসনকার্য্য যেভাবে চালানো আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে সাধারণ লোকের মন তিক্ত হইয়া উঠিতেছে। কংগ্রেসেরও অনেক লোক অন্তর হইতে ইহাতে সায় দিতে পারিতেছেন না। ইহার উপর আছে ক্ষমতালোভীদের চক্রান্ত; বাংলায়, মাদ্রাজে, পঞ্জাবে এবং উত্তর প্রদেশে এই বিদ্রোহ ধূমায়িত হইতেছিল। এতদিনে উত্তর প্রদেশে তাহা প্রকাশ্য রূপ ধারণ করিয়াছে। লক্ষ্ণৌ কনভেনসনের বক্তৃতা এবং যোগদানকারীদের নাম হইতে অসন্তোষের

গভীরতা অনুমান করা যায়। বিনা কারণে অথবা কেবলমাত্র গদীর লড়াই লইয়া এত বড় অসন্তোষ সৃষ্টি হইতে পারে না। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, যানবাহন কোন সমস্যারই সমাধান তিন বৎসরে কংগ্রেস গবর্মেণ্ট করিতে পারে নাই। জনসমাজে ইহা কংগ্রেসের অযোগ্যতার পরিচয়রূপে ধিকৃত হইতেছে ; ইহার উপর নিত্য নানাভাবে দুর্নীতি ও কংগ্রেস নেতাদের অসাধুতার পরিচয় অবস্থা আরও ঘোলাটে করিয়া তুলিতেছে। আমরা গণতন্ত্র গঠন করিয়াছি, গণতন্ত্রে এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায় শক্তিশালী বিরোধী দল গঠন। বিরোধী দলের সদাজাগ্রত চক্ষু গবর্মেণ্টের উপর থাকিলে অযোগ্যতা এবং দুর্নীতি উভয়ই কমিতে বাধ্য। পণ্ডিত নেহরুর নিজ প্রদেশের এই বিদ্রোহ স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় যোগ করিয়াছে।

উত্তর প্রদেশের বিদ্রোহীর দল যে সোস্যালিষ্ট পার্টির ন্যায় পদত্যাগ করিয়া বনবাসে গমন করেন নাই ইহা তাঁহাদের সুবুদ্ধির পরিচায়ক। বস্তুতঃ সোস্যালিষ্ট পার্টির ঐরূপ প্রব্রজ্যা গ্রহণ দেশের পক্ষে অতিশয় অনিষ্টকর ব্যাপার হইয়াছে।

কংগ্রেসে স্বেচ্ছাচার

কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বেচ্ছাচারের কি বিষময় ফল ফলিবে তাহার পূর্ব্বাভাষ অনেক দিকেই দেখা যাইতেছে। একটি সামান্য উদাহরণ মানভূম খাদিদলের মুখপত্র "মুক্তি" ২২শে জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় দিয়াছেন, প্রবন্ধের নাম "শোচনীয় পরিণাম"। ইংরেজীতে প্রবাদবাক্য আছে, "উড়ন্ত খড় ঝড়ের নিদর্শন"। সেইমত উক্ত প্রবন্ধের সারাংশ নীচে দেওয়া হইল :

"মানভূমের বরাবাজার-পটমদা হইতে নির্ব্বাচিত জিলা বোর্ডের কংগ্রেসী সদস্য পদত্যাগ করাতে উক্ত নির্বাচনক্ষেত্রে একটি উপনির্বাচন হয়। এই উপনির্বাচনে শ্রীসুর্চাদ সিং কংগ্রেস প্রার্থীরূপে এবং শ্রীগঙ্গাধর সিং স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীগঙ্গাধর সিং কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া সদস্য নির্বাচিত হন।

"বর্ত্তমান সময়ে সাধারণভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাহার প্রতিষ্ঠা জনগণের নিকট হারাইয়াছে। ক্ষমতা লাভের পরে যে নৈতিক অধোগতি ইহাকে গ্রাস করিয়াছে তাহার জন্য যে বা যাহারাই দায়ী হোক না কেন দেশবাসীর নিকট ইহাকে অতি শোচনীয়ভাবে অশ্রদ্ধেয় করিয়া তোলা হইয়াছে। কিন্তু মানভূমের ক্ষেত্রে ইহা ছাড়াও আরও অন্যান্য যে সমস্ত বিশেষ কারণ রহিয়াছে তাহা মানভূম ছাড়া অন্য কোথাও নাই বলিলেই চলে।

"ভাষার সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সমর্থন ও কার্য্যকরী করিবার জন্য, বাংলাভাষী মানভূম জিলাকে বাংলাভাষী নহে এবং প্রধানতঃ হিন্দীভাষী ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য গত কয়েক বৎসর হইতে বিহার গবর্মেণ্ট, বিহার কংগ্রেস এবং তৎসংশ্লিষ্ট নেতৃবর্গ ও ব্যক্তিবর্গ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। মানভূমের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যে সমস্ত বর্ব্বরোচিত নীতি ও ব্যবস্থা গৃহীত ও কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে তাহার সহিত দেশবাসী সুপরিচিত ও জিলাবাসী ভুক্তভোগী। কিন্তু বিহারে ও বিহার প্রদেশের বাহিরে যাহারা এই জিলার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাহাদের নিকট, বিশেষ করিয়া শাসন ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট, মানভূম জিলা সম্বন্ধে সত্যকে নিরন্তর মিথ্যা প্রচারের দ্বারা যে ভাবে তাঁহারা বিকৃত করিয়া রাখিয়াছেন তাহার ইতিহাস দেশবাসী হয়ত সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহেন।

"বিহারের বর্ত্তমান কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষ করিয়া মানভূমের বর্ত্তমান জিলা কংগ্রেস কমিটি সম্পূর্ণভাবে এই নীতির সমর্থক ও পোষক। বস্তুতঃ বর্ত্তমান জিলা কংগ্রেস কমিটির সম্বন্ধে এই কথাই বলা যাইতে পারে যে, ইহা এই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র এই ভাষায় সাম্রাজ্যবাদের নীতিকে সফল করিয়া তুলিবার জন্যই ইহার বর্ত্তমান অস্তিত্ব। মানভূম জিলায় বর্ত্তমানে কংগ্রেসের কার্য্য ও নীতি বলিয়া যাহা বলা যাইতে পারে তাহা এই মিথ্যা ও অন্যায় হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের নীতি।

"বরাবাজার-পটমদার উপনির্ব্বাচনে আর একটি দিক যাহা জনসাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হইল তাহার জন্য প্রত্যেক দেশবাসীই লজ্জিত হইবেন। কংগ্রেস-প্রার্থীর সমর্থনে কোন রূপ হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া সরকারী কর্ম্মচারীরা প্রকাশ্যভাবে কাজ করিয়াছেন। সরকারী কর্ম্মচারীগণ প্রকাশ্যেই জয়লাভের জন্য এমন কোন উপায় বা পন্থা নাই যাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হইয়াছেন। কংগ্রেসের প্রচারক ও সমর্থক হিসাবে এসিষ্টেণ্ট পাবলিক প্রসিকিউটারগণ মোকদ্দমা মুলতুবী রাখিয়া ছুটিয়াছেন। এইরূপ জনৈক ব্যক্তি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই যে, বাক্স ভাঙিয়াও আমরা জয়লাভ করিব।

"ইহার উপরে সর্ব্বাধিক শোচনীয় ব্যাপার এই যে, কংগ্রেসের প্রচারকগণ অকুণ্ঠিতচিত্তে ভোটারদের মদ খাওয়াইয়া ভোটদানে প্রলুব্ধ করিয়াছে। মদের প্রলোভনে এবং খাওয়াইয়া নিজেদের পক্ষে ভোট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মাতালদের নিযুক্ত করিয়াছে। এই সমস্ত উপায়ে যে বীভৎস ঘটনা ও অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছিল তাহার বর্ণনাও লজ্জার বিষয়।

"জনসাধারণের মনোভাব এ বিষয়ে বাস্তবিকই লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল। কুমীর গ্রামে ভোটারদের ভোট দিবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে টাকা দিবার প্রস্তাব করা হয়। তাহারা প্রথমে অবাক হয়, পরে তাহা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান

করে। অথচ এই সব অঞ্চলে এক দিন একমাত্র কংগ্রেসেরই অপ্রতিহত প্রভাব ছিল।

"স্বতন্ত্র প্রার্থী একটি ২৫।২৬ বৎসরের যুবক। সবেমাত্র কলেজ হইতে বাহির হইয়াছেন। সমস্ত কংগ্রেস শক্তি, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং সরকারী শক্তি সর্ব্বপ্রকার ন্যায় অন্যায় জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু জনসাধারণ যেন দুর্ভেদ্য দেওয়ালের মত ইহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ কংগ্রেসের এই নির্ব্বাচনে স্বতঃই প্রশ্ন আসিতেছে—ইহা কেন? কেন এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইল? এবং এই মহান্ প্রতিষ্ঠানকে এরূপ শোচনীয় অবস্থায় যাহারা আনিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের অপেক্ষা দেশের বৃহত্তর শত্রু আর কেহ আছে কিনা তাহাই আজ বিবেচনার বিষয়।"

গণতন্ত্র ও কংগ্রেসী শাসননীতি

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ প্রায়ই দুঃখ করিয়া বলেন যে দেশের লোকের মন তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের প্রভাব হইতে সরিয়া যাইতেছে। তাঁহাদের মুখে কিন্তু এই কার্য্য-কারণের কোন ব্যাখ্যা কখন শুনি নাই। সম্প্রতি ভারতরাষ্ট্রের নানা রাজ্যে পল্লী স্বায়ত্তশাসন বিধান অনুযায়ী নির্ব্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। আসাম ও বোম্বাইয়ে—এই দুই রাষ্ট্রে এই নির্ব্বাচনের ফল আশাপ্রদ নয়। তাহার জন্য আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোপীনাথ বরদলৈ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই কংগ্রেসী বিফলতার কারণ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। কংগ্রেসী শাসননীতির ফলে, শ্রীগোপীনাথ বরদলৈর শাসননীতির ফলে, দেশের লোকের মনে কি বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায় করিমগঞ্জের "যুগশক্তি" পত্রিকার ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের সম্পাদকীয় মন্তব্যে :

"গণতান্ত্রিকতার সমাধি রচনার আরও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই অভিশপ্ত কাছাড় জেলায়ই রহিয়াছে। জেলার সব কয়জন কংগ্রেসী এম-এল-এ এবং সকল কংগ্রেস কমিটি ও সংবাদ-পত্র একযোগে জনৈক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনয়নক্রমে মন্ত্রিসভা হইতে অবিলম্বে তাহার অপসারণ দাবি করেন। কিন্তু 'গণতান্ত্রিক' আসাম রাজ্যের পরিচালকগণ এরূপ সর্ব্বসম্মত দাবি মানিয়া লওয়া দূরে থাকুক, ইহার উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয় না।

"কাছাড় জেলার বর্ত্তমান পুলিস সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেবের অবাঞ্ছিত কার্য্যকলাপে অতিষ্ঠ হইয়া কাছাড়ের জনপ্রতিনিধি-স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও বহু প্রতিষ্ঠান এবং সাংবাদিকগণ অনতি-বিলম্বে তাঁহার স্থানান্তরের ব্যবস্থা করিতে কর্ত্তৃপক্ষকে এক-বাক্যে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই। ফলে উক্ত কর্ম্মচারী প্রশ্রয় পাইয়া বেপরোয়া হইয়া স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন; প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের অহেতুক শাস্তিদানের চেষ্টা অথবা লঘুপাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন।

"এই অবস্থায় কাছাড়ের কংগ্রেসী এম্-এল-এ.-গণকে পদত্যাগের জন্য বিভিন্ন মহল হইতে বলা হইতেছে। জনস্বার্থ ও আত্মসম্মান রক্ষার্থ তাঁহাদের পদত্যাগ অবশ্য অপরিহার্য্য হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কেবল তাঁহারাই নহেন, তিন মহকুমার জেলা কংগ্রেস কর্ম্মকর্ত্তাদেরও একই কারণে পদত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। অতঃপর কি কর্ত্তব্য—সকলে মিলিয়া তাহাও এখনই স্থির করিতে হইবে। কংগ্রেস সরকার যদি গণতান্ত্রিক নীতি বর্জ্জন করাই স্থির করিয়া থাকেন এবং তাহার কোন প্রতিকার করাই সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে এককালে যে কংগ্রেস জনসাধারণের অতি প্রিয় প্রতিষ্ঠান ছিল, দেশের ও দশের কল্যাণের নিমিত্ত তাহা আজ ত্যাগ করিয়া···সেইরূপ একটি গণতান্ত্রিক দলগঠনের উদ্দেশ্যে সর্ব্বত্র দেশসেবকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সক্রিয় হইতে হইবে।"

পাট, পাকিস্থান ও ভারতবর্ষ

ভারত-পাকিস্থান পাটচুক্তিতে লাভ কাহার হইয়াছে এতদিনে তার খতিয়ানের সময় আসিয়াছে। যেটুকু হিসাব-নিকাশ হইয়াছে তাহাতে ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে অল্প কয়েকটি ইংরেজ ও মাড়োয়ারী ম্যানেজিং এজেন্টের পকেটে সমস্ত লাভের টাকা চলিয়া যাইতেছে, ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে ভারতীয় পাটচাষী এবং ভারত-সরকার। পাটচুক্তি পাকি-স্থানকে এক পরম সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছে এবং গুটি চারেক লোকের বিশেষ লাভের কারণ হইয়াছে।

গত অক্টোবর মাসে চট ও থলিয়ার অত্যধিক উচ্চমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য কন্ট্রোল বসানো হয়। পাটজাত দ্রব্যের উচ্চতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হয়, একজন পাট কন্ট্রোলার নিয়োগের ব্যবস্থা হয় এবং রপ্তানীকারকদের কমিশন শতকরা পাঁচ টাকা ধার্য্য হয়। উচ্চতম মূল্য বাঁধার ফল হইল এই সরকারী দাম চেকে এবং বাকিটা নগদ টাকায় দাখিল করা সুরু হইল। ওয়াকার সাহেব জুট কন্ট্রোলার নিযুক্ত হইলেন। পাট স্বার্থের সঙ্গে পাটচাষী, শ্রমিক, পাটব্যবসায়ী, মিল বিদেশ হইতে ষ্টোর আমদানী এবং দেশে ষ্টোর উৎপাদনকারী ও গবর্ন্মেণ্টের স্বার্থ জড়িত। ইহার মধ্যে আবার দেশী ও বিদেশী স্বার্থের সংঘাত রহিয়াছে। মিলের স্বার্থের সঙ্গে অপর অনেকের স্বার্থেরও বিরোধিতা আছে। এই অবস্থায় কেবলমাত্র মিলের প্রতিনিধিকে পাট সম্পর্কিত সমগ্র স্বার্থের উর্দ্ধে স্থান দেওয়া জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হইতে পারে না।

উপরোক্ত সমস্ত স্বার্থের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত পাট-বোর্ডের হাতে পাটের স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া উচিত ছিল। কাজেই 'জুট কণ্ট্রোলা'র নিয়োগেও গলদ রহিয়া গেল। তৃতীয়ত:, রপ্তানীকারকদের কমিশন শতকরা পাঁচ টাকা দৃশ্যত: কম হইলেও উহা অত্যন্ত বেশী। সাধারণত: ইহারা শতকরা আট আনা হইতে এক টাকা কমিশন পাইলেই ভাগ্য বলিয়া মনে করে। তৎস্থলে পাঁচ টাকা কমিশন ধার্য্য হওয়ায় বহু ম্যানেজিং এজেণ্ট রপ্তানী ব্যবসা খুলিয়া বসিয়াছে। ইহারা এই বাড়তি টাকাটা আত্মসাৎ করিতেছে। কেহ কেহ বেনামীতে এরূপ কারবার আরম্ভ করিতেছে। এই ভাবে ম্যানেজিং এজেণ্টরা মাসিক প্রায় ৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত লাভ করিতেছে। পাটজাত দ্রব্য এখনও সরকারী নির্দ্দিষ্ট দামে বিকায় না। অতিরিক্ত দাম পকেটস্থ করিবার জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টরা এ ক্ষেত্রেও বেনামী প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছে। ইহাতে এক দিকে মিলের অংশীদারদের যেমন ক্ষতি হইতেছে অপর দিকে রাষ্ট্রও প্রাপ্য ট্যাক্স আদায়ে বঞ্চিত হইতেছে।

ভারতীয় পাটচাষীদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়াছে। অধিক পাট ফলাইবার জন্য গবর্ন্মেণ্ট তাহাদের উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন কিন্তু পাটচুক্তির পর তাহাদেরও কপাল পুড়িয়াছে, পাকিস্থানের পাট আমদানীর ভয় দেখাইয়া ভারতীয় পাটের দাম দাবাইয়া রাখিবার প্রবল চেষ্টা হইতেছে। পাকিস্থান হইতে হাবিজাবি ছাঁটাই পাট কেনার চুক্তি যে দামে হইয়াছে, ভারতীয় পাটচাষী তাহা পাইলে খুশী হইত।

পাট চুক্তির পর পাকিস্থানে পাটের দাম ৮ টাকারও বেশী চড়িয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে চালাকী করিয়া সাজানো খবর প্রকাশ করিয়া পাটের বাজার চড়া রাখিবার ব্যবস্থাও চলিতেছে। পাকিস্থান চুক্তিবদ্ধ পাট নির্দ্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করিতে পারে নাই। পাটের অভাব এই অক্ষমতার কারণ নহে, পাটের সহিত সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ লোকেরা মনে করেন যে, পাট ক্রয়ের উপযুক্ত নগদ টাকার অভাব ইহার প্রধান কারণ। গত ফসলের পর ৫৫ লক্ষ গাঁইট পাট পাকিস্থানের হাতে ছিল, তন্মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া রপ্তানী এবং কলিকাতায় আমদানী পাটের পরিমাণ প্রায় ৪০ লক্ষ গাঁইট হইবে। মরশুম শেষ হইয়াছে, নূতন পাট আর মাস দেড়েকের মধ্যেই উঠিবে। এবার ফসল এত ভাল হইয়াছে যে, গত ১০ বৎসরের মধ্যে এরূপ দেখা যায় নাই। কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন যে এবার ৭০ লক্ষ গাঁইট পাট উঠিবে, ৬৫ লক্ষের কম হইবে এ কথা কেহ বলেন না। সুতরাং গত ফসলের উদ্বৃত্ত ১৫ লক্ষ এবং এবারকার ৬৫ লক্ষ মোট ৮০ লক্ষ গাঁইট এবার পাকিস্থানের হাতে থাকিবে। এই বিপুল ষ্টকের চাপে পাটের দাম কমিতে বাধ্য। ইহা জানিয়া শুনিয়াও বছর শেষে চড়া দরে পাটের দাম ঠিক করা এবং ডেলিভারির তারিখ কেবলই পিছাইতে দেওয়ার একমাত্র অর্থ এই হইতে পারে যে, মিলগুলি পাকিস্থান জুট-বোর্ডকে আগামী ফসলের পাট অসম্ভব সস্তায় কিনিয়া পুরানো চুক্তির চড়া দরে ভারতের ঘাড়ে চাপাইবার সুযোগ দান করিতেছে। কমিশন হয়ত ভাগাভাগি হইবে। চুক্তিতে পাট ডেলিভারি দেওয়ার যে তারিখ ছিল সেই তারিখে পাট না দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চুক্তি বাতিল করিয়া দিলে ভারতের বদনাম হইত না, অনেকগুলি টাকার অনাবশ্যক লোকসানও বাঁচিত। তাহা না করিয়া বার বার সময় দেওয়া হইতেছে, ইহা নিঃসন্দেহ প্রতারকের দলের কারসাজী, এবং এই ঠকদের দলে সরকারী অধিকারী দলও আছেন সন্দেহ হয়।

পাটের ব্যাপারটা নূতন করিয়া দেখা দরকার। অবস্থা যেভাবে চলিতেছে সেইভাবে চলিতে দিলে পাকিস্থানী পাটের দড়ি গলায় বাঁধিয়া আমাদের বঙ্গোপসাগরে ডুবিতে হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

সততার পুরস্কার (?)

চৈত্র মাসের প্রবাসীতে আমরা একটি বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে সেল্‌স ট্যাক্স আদায়ে একজন অফিসারের উপরওয়ালাদের নিকট হইতে বাধা পাওয়ার কথা লিখিয়াছিলাম। এই বিভাগের একজন এসিষ্টাণ্ট কমিশনার ঐ ব্যবসায়ীর নিকট হইতে প্রায় এক কোটি টাকা পাওনা হয় এই হিসাব দিয়াছিলেন ; কমিশনার তাঁহাকে ট্যাক্স আদায়ে নিরস্ত হইতে আদেশ দেন। ইহা লইয়া অনেক দিন টানা-হেঁচড়া চলিবার পর উক্ত এসিষ্টাণ্ট কমিশনারকে মফস্বলে বদলী করিয়া দেওয়া হয়। সম্প্রতি জানা গেল যে, তাঁহাকে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে কিন্তু মাসাধিক কাল সাসপেন্সনে থাকা সত্ত্বেও উহার কোন কারণ দেখানো হয় নাই। ব্যাপারটা খুব বেশী রকম জানাজানি হইয়াছে এবং এই বিনা কারণে সাসপেন্সনে সমগ্র বিভাগের মরাল অত্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। সেলস ট্যাক্স বিভাগ সম্বন্ধে আমরা অনেকবার সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি, কারণ ইহা এক দিকে যেমন গবর্ন্মেণ্টের অর্থাগমের একটি বৃহৎ উপায় তেমনি উহার সহিত প্রতিটি লোকের দৈনন্দিন জীবন জড়িত। গত মাসে আমরা এই বিভাগের কার্য্যকলাপ তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছিলাম, আমরা উহার পুনরুক্তি করিতেছি। উপরোক্ত অফিসার বিনা বিচারে সাসপেন্সনে থাকিলে লোকে মনে করিবে যে তাঁহার সততা ও দক্ষতার প্রতিদান মিলিয়াছে। এরূপ ঘটনা রাষ্ট্রের পক্ষে খুব ক্ষতিকর।

রেলে সাবোটাজ

গত মাসে মশিদির নিকট পঞ্জাব মেলের দুর্ঘটনা সম্পর্কে আমরা বলিয়াছিলাম যে আমরা যেরূপ ফটোগ্রাফ দেখিয়াছি তাহাতে আমাদের মনে সন্দেহ নাই যে এই দুর্ঘটনা ইচ্ছাকৃত সাবোটাজ। এই মাসে আমরা ঐ তিনখানি চিত্র অন্যত্র দিলাম। ফটোগুলি আনন্দবাজার পত্রিকার ফটোগ্রাফার দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই অকুস্থলে যাইয়া নিজে তুলেন। সুতরাং ওগুলি "সাজান ছবি" বলা কোন মতেই চলে না। প্রথম যে দুটি ছবি এক পাতায় দেওয়া হইয়াছে তাহা রেলের একই স্থলের দুই পাশে তোলা ফোটো।

ছবিতে স্পষ্ট দেখা যায় যে দুর্বৃত্তেরা ফিশবোল্ট ও নাট খুব স্পষ্ট ভাবে খুলিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় তাহারা এ কাজ বুঝে এবং যন্ত্রপাতিও ঠিকমত ছিল। বাইরের কোচস্ক্রুগুলি ঢিলা করিয়া রেলের ফ্ল্যাঞ্জ মুক্ত করিয়া ও ভিতরের কোচস্ক্রু সম্পূর্ণ খুলিয়া ইহারা সমস্ত রেলটি ছাড়াইয়া ও সরাইয়া রাখিয়াছে তাহা ছবিতে স্পষ্ট দেখা যায়। রেলের গায়ের বোল্ট পরাইবার বিঁধগুলি পরিষ্কার অক্ষত দেখা যায় এবং রেল ও স্লিপারগুলিও একেবারেই জখম হয় নাই। রেলপথও (track) বিশেষ কিছু চোট পায় নাই। যদি ভারী ইঞ্জিনের দ্রুতগতিবেগের প্রচণ্ড আঘাতে ফিশবোল্ট-নাট ও ফিশপ্লেট ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া আলাদা হইয়া যাইবার ফলে ট্রেন লাইনচ্যুত হইত তাহা হইলে রেল ও স্লিপার ভীষণ জখম হইয়া বাঁকা-চোরা ও থেঁৎলান অবস্থায় দেখা যাইত। কোচবোল্ট ঢিলা ও অক্ষত অবস্থায় থাকিত না এবং রেলের বিঁধগুলির মুখ ভেঙাকাটা হইত।

ইঞ্জিনের প্রচণ্ড আঘাতে রেলপথের অবস্থা কি হয় তাহা বড় ছবিটিতে দেখা যায়। লাইনচ্যুত হইবার পর যেখানে ইঞ্জিন রেলপথ ছাড়িয়া নীচে গড়াইয়াছে সেখানের রেল, স্লিপার ইত্যাদির অবস্থার সঙ্গে যেখানে সাবোটাজ হইয়াছে সেখানকার ছবি মিলাইয়া দেখিলেই প্রভেদ বুঝা যাইবে। কোচবোল্ট স্বাভাবিক ভাবে কি রকম থাকে তাহাও বড় ছবিতে দেখা যায়। উহার ক্যাপ স্লিপারের গায়ে প্রায় সমানভাবে লাগিয়া রেলের ফ্ল্যাঞ্জ চাপিয়া ধরিয়া থাকার কথা। ক্যাপ ঢিলা করিলে পরে রেল মুক্ত হয়।

সাবোটাজ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। প্রশ্ন এই যে করিল কাহারা। ঘরের শত্রু তো আছেই যাহারা দিবারাত্র বিদেশীর দালালী করিয়া দেশে অশান্তি ও ধ্বংসলীলা ছড়াইবার চেষ্টায় লাগিয়াই আছে। সম্প্রতি প্রকাশিত পুরণচন্দ যোশীর পুস্তিকায় এ বিষয়ে স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে। এদের দলের বহুলোক রেল-বিভাগে আছে। এ ছাড়া আরও এক দল লোক আছে যাহারা দেহমন আমাদের এক বিশেষ শত্রুপক্ষকে নিবেদন করিয়াছে। তাহারা অন্নের সংস্থানের অজুহাতে এখানে আসিয়া ভারত-রাষ্ট্রের অনিষ্ট চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। বহিরাগত এই দল ও পূর্ব্বোক্ত দল দুই-ই ফন্দিও পায় অর্থ-সাহায্যও পায়। আমরা শেষের দলের কথা ভাবিয়াও ভাবি না, এই হইয়াছে আমাদের মূর্খতা।

এখন কথা এই, কি করিয়া এই সব দুর্বৃত্তদের দমন করিয়া রাখা সম্ভব হয়। সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন দেশের লোকের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের যোগসাধন। মাদ্রাজী মন্ত্রী মহাশয়দ্বয়ের এ বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞানের লেশমাত্রও নাই। অন্য সকল দিকেও বুদ্ধির কোনও পরিচয় আমরা পাই না। রেল-বিভাগের পুলিশ ও ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড এই দুই-ই প্রায় অকর্ম্মণ্য। এগুলি ঢালিয়া সাজিয়া নূতন অধ্যক্ষ, কর্ম্মচারী এবং কর্ম্মী দিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবস্থা না করিলে উপায় নাই।

এরূপ দুর্বৃত্তদিগকে ধরিলে বা ধরাইয়া দিলে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে ইহাও জানান দরকার। সরকারী বিজ্ঞপ্তি বিভাগেও তো বুদ্ধিমান লোক নাই। সুতরাং উপায় কি হইবে বলা দুষ্কর।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

ময়ূরাক্ষী বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও জল-সেচনের উপর পশ্চিম-বঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের কৃষির ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে। সম্প্রতি কলিকাতার সাংবাদিক-বৃন্দের এক প্রতিনিধিদল এই পরিকল্পনার কাজ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। বীরভূম জেলার সিউড়ী শহরের সন্নিকট-বর্ত্তী তিলপাড়ায় ও ২০ মাইল দূরে সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মেসাঞ্জোরে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীরামপুরের "নির্ণয়" পত্রিকার ৬ই জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় তার একটা মোটামুটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে:

"বিহারের সাঁওতাল পরগণার পাহাড় হইতে উদ্গত ১৫০ মাইল দীর্ঘ ময়ূরাক্ষী নদী হইতে উক্ত পরিকল্পনার অধিকাংশ প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করা হইবে। উৎপত্তি স্থল হইতে ৬০ মাইল দূরে মেসাঞ্জোর নামক স্থানে একটা ২৩৪৫ ফুট দীর্ঘ এবং নদীর গভীরতম অংশ হইতে ১১৭ ফুট উচ্চ বাঁধ নির্ম্মিত হইবে। উহার আয়তন হইবে ২৪ বর্গমাইল এবং ইহাতে জল মজুদ থাকিবে। মেসাঞ্জোর বাঁধের প্রায় ২০ মাইল নীচে সিউড়ী শহরের নিকটে প্রায় ১৬টি স্লুইস গেট সমন্বিত ১০১৩ ফুট দীর্ঘ তিলপাড়া বাঁধ নির্ম্মিত হইতেছে। বিভিন্ন দিকে বহু খাল কাটিয়া এই জল সেচের জন্য বাহিত করান হইবে। এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ ৯ শত মাইল খাল কাটা হইবে। তিলপাড়া বাঁধের এলাকায় ৩ লক্ষ বিঘা সেচের উপ-যোগী খাল কাটার শতকরা ৫০ ভাগ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং অবশিষ্ট আগামী বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে। খাল কাটার সমগ্র পরিকল্পনার হিসাবে শতকরা ১০ ভাগ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ

সরকারকে আর্থিক দিক হইতে কিঞ্চিৎ অসুবিধায় পড়িতে হইতেছে। অবশ্য ৩ লক্ষ বিঘা জমিতে সেচের ব্যবস্থা করাই কর্তৃপক্ষের যে আশু লক্ষ্য, তাহা ব্যাহত হইবে না। এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের নিকট ২ কোটি টাকা প্রদানের আবেদন জানাইয়াছিলেন, মাত্র ১ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে। ভারত সরকারের ব্যয়-সঙ্কোচ অভিযানের ফলেই অর্থের পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে। পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করিতে মোট ব্যয় পড়িবে ১৫।১৬ কোটি টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের নিকট হইতে ঋণের ভিত্তিতে অর্থ সাহায্য পাইবেন, এইরূপই ব্যবস্থা। ভারত সরকার উক্ত পরিকল্পনার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ দিতে পূর্ব্বের ন্যায়ই সম্মত আছেন, তবে এককালে ইতিপূর্ব্বে যে পরিমাণ অর্থ দিতেন, এখন তাহা হইতে কম দিবেন, এই মাত্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্থিক অনটন থাকা সত্ত্বেও পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য চালাইয়া যাইতে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ।"

এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিরূপ আশার সৃষ্টি হইতেছে তাহা "নির্ণয়" পত্রিকার ভাষায় প্রকাশ করিতেছি :

"পরিকল্পনার ফল আমরা আগামী বৎসর হইতেই ভোগ করিব। বীরভূমের তিলপাড়া অঞ্চলের বাঁধ নির্ম্মাণকার্য্য ১৯৫১ সালে বর্ষা সমাগমের পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইবে এবং তখন হইতেই ৩ লক্ষ বিঘা জমি জলসেচের আওতায় আনা সম্ভব হইবে। অপর যে বাঁধ মেসাঞ্জোর বাঁধ, তাহার নির্ম্মাণ কার্য্য আগামী শীতের সময় হইতেই আরম্ভ হইবে এবং নির্মাণ কার্য্য যত অগ্রসর হইবে, বৎসরের পর বৎসর সেচের জমিও তত বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৫৪ সালে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী হইলে মোট ১৮ লক্ষ বিঘা জমিতে জলসেচ করা যাইবে। মোট ১৮ লক্ষ বিঘার মধ্যে বীরভূম শতকরা ৬০, মুর্শিদাবাদ শতকরা ৩৫ ও বর্দ্ধমানের শতকরা ৫ অংশ সেচ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবে। অনুমান, এই জেলাগুলির উক্ত অঞ্চলের কৃষি সম্পদ শতকরা একশত গুণ বৃদ্ধি পাইবে। বৈদ্যুতিক শক্তিও যথেষ্ট উৎপন্ন হইবে, পরিকল্পনার পরোক্ষ ফল হিসাবে প্রায় ৪০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইবে।" স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়নের পক্ষে এই পরিকল্পনা অত্যধিক সহায়তা করিবে। বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ খাদ্যবস্তু উৎপাদনে এখনই উদ্বৃত্ত অঞ্চল। জলসেচের সুব্যবস্থা হইলে আরো অধিক খাদ্যসম্ভার মিলিবে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার পরিচালনায় মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় বিশেষ ভাবে উদ্যোগী। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, এই পরিকল্পনার জন্য বাঙালী শ্রমিকের সন্ধান পাওয়া কঠিন; সেই অভিযোগের পুনরুক্তি কলিকাতার সাংবাদিকবৃন্দের নিকট কর্তৃপক্ষীয়গণও করিয়াছেন। অথচ আমরা জানি যে এই পরিকল্পনার কর্তৃপক্ষ দৈনিক দেড় টাকা হারে মজুরী দিয়া রাজমিস্ত্রীর কার্য্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন; তবুও বাঙালী বেকারশ্রেণী সমাজের একটি অত্যাবশক কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে না। জীবনের বৃহত্তম শিক্ষা এই—পরিশ্রম না করিলে বাঁচিয়া থাকা যায় না, বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারও জন্মায় না। এই শিক্ষা কলমপেশা বাঙালীকে নূতন করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

উপরোক্ত নিরাশার মধ্যে আশার আলোও দেখা যায়। "গণরাজ" পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিবরণটি সেই আলোর একটি কণামাত্র :

"ফরকা থানায় সম্প্রতি ৮ ফুট চওড়া ২ মাইল লম্বা এক পয়ঃপ্রণালী খনন গ্রামবাসীগণের স্বেচ্ছাশ্রমে এবং বিনা অর্থব্যয়ে সম্পন্ন হইয়াছে। অধিক ফসল ফলাইবার কাজে এ অঞ্চলের গ্রামবাসীগণ ক্রমশঃই বৃহত্তর কাজে হাত দিতেছেন। এই সব গ্রামের লোকেরা গত বৎসর এই থানায় আঙ্গুয়া পুরাণ চণ্ডীপুর খাল খনন করিয়াছিলেন। যাহার ফলে ১৬০০ বিঘা অজন্মা জমি আবাদযোগ্য হইয়াছে। জঙ্গল-খাল খনন করার ফলে ফরকা থানার বিস্তৃত জলাভূমির বদ্ধজল গঙ্গায় যাইয়া পড়িবে এবং নিয়ন্ত্রিত জল নিকাশের ফলে ৩০০০ বিঘা জমি আবাদযোগ্য হইবে।

মানভূমে উচ্চশিক্ষায় বাধা

মানভূম জেলার সদর মহকুমায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য কোন প্রথম শ্রেণীর কলেজ ছিল না। কিছুদিন যাবৎ পুরুলিয়ায় একটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু নানাবিধ বাধা আসায় কলেজটির কাজ ব্যাহত হইতেছে এবং কলেজটি দাঁড়াইয়া উঠিবার আগেই উহা নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, যাহাদের নিকট হইতে কলেজটির সবচেয়ে বেশী সাহায্য পাওয়ার কথা, সেই দুই জন অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেই বেশী বাধা আসিতেছে। কয়েক দিন আগে পুরুলিয়ায় কলেজ পরিচালনা সম্বন্ধে জনসাধারণের একটি সভা হইয়াছে এবং উহাতে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত ২৮ জন সদস্য লইয়া কলেজ স্থাপনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় এবং মানভূম জেলার ডেপুটি কমিশনার উহাতে সভাপতিত্ব করেন। ইহার পর কলেজের গভর্ণিং বডি গঠনের জন্য যে সভা হয় ডেপুটি কমিশনার আর উহাতে উপস্থিত হন না। তাঁহার উপস্থিতি প্রয়োজন মনে করিয়া পর পর তিন বার তাঁহার উপস্থিতির জন্য সভা স্থগিত রাখা হইয়াছিল, সভার দিনও তাঁহারই নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য করা হইয়াছিল। ডেপুটি কমিশনার কিছুতেই সভায় উপস্থিত না হওয়ায় অগত্যা তাঁহার অনুপস্থিতিতে গভর্ণিং বডি গঠিত হয় কলেজের কাজও আরম্ভ হয়। ডেপুটি কমিশনার এইবার কলেজের গভর্ণিং বডির বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট নানা

রূপ অভিযোগ আরম্ভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় তদন্তের জন্য দুই জন ইন্সপেক্টর পাঠান। ডেপুটি কমিশনারের অভিযোগসমূহ তদন্তে ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হয়। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত গভর্ণিং বডির পরিবর্ত্তে ডেপুটি কমিশনারের সভাপতিত্বে এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নূতন গভর্ণিং বডি গঠনের সুপারিশ করিয়া রিপোর্ট দেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমোক্ত গভর্ণিং বডিকে ইন্সপেক্টরদের সুপারিশানুযায়ী গঠিত গভর্ণিং বডির হাতে কলেজের দায়িত্ব হস্তান্তরিত করিতে নির্দ্দেশ দেন। প্রথম গভর্ণিং বডি জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হইয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ অসঙ্গত নির্দ্দেশ প্রত্যাহারের জন্য স্থানীয় জনসাধারণ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন কথা শুনিলেন না। পুরাতন গভর্ণিং বডি কলেজের স্বার্থের খাতিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অসঙ্গত নির্দ্দেশই মানিয়া লইলেন এবং ডেপুটি কমিশনারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশ অনুযায়ী গভর্ণিং বডি গঠন করিতে বলিলেন ও পুরানো গভর্ণিং বডির সেক্রেটারীকে বলিলেন যে তিনি যেন নূতন বডি গঠিত হইবামাত্র উহাকে কার্য্যভার বুঝাইয়া দেন। অতঃপর ডেপুটি কমিশনারের সভাপতিত্বে নূতন গভর্ণিং বডি গঠিত হয়।

এই গভর্ণিং বডির পরিচালনায় কলেজ দ্রুত অবনতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। অধ্যাপক ও কর্ম্মচারীরা নিয়মিত বেতন পান না, অর্থাভাবে কলেজের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। কলেজটিকে এই অবস্থায় আনিয়া দাঁড় করাইয়া এই গভর্ণিং বডি অতঃপর একটি জনসভা আহ্বান করে এবং কি করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে পরামর্শ চায়। সদর মানভূমে ইহাই একমাত্র কলেজ; উহার অর্দ্ধেকেরও অধিক মাহাতো এবং আদিবাসী ছাত্রের অন্যত্র গিয়া পড়া সম্ভব নহে। স্থানীয় লোকেরা কলেজটি চালাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণ্মেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় উহাতে বাধা দিয়াছেন। ডেপুটি কমিশনারকে লইয়া গভর্ণিং বডি গঠিত হইয়াছে; ঐ কমিটি টাকা তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন না। বিহার সরকার শিক্ষার জন্য বহু টাকা ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু এই কলেজকে কোন টাকা দিতেছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ও অর্থসাহায্য করিবেন না, কিন্তু যে কমিটি কলেজের ভার লইতে অগ্রসর হইয়াছিল তাহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে আগাইয়া আসিয়াছেন। উপরোক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, "এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে নির্ব্বাচিত গভর্ণিং বডির দ্বারা যে কলেজটি গড়িয়া উঠিতেছিল এবং যাহার ফলে মানভূমের অনুন্নত সম্প্রদায়ের এবং মাহাতো শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সুযোগ আসিয়াছিল, সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় ডেপুটি কমিশনার তথা বিহার সরকার ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় জনসাধারণের নির্ব্বাচিত গভর্ণিং বডিকে বিতাড়িত করিয়া নূতন কমিটি গঠন করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান গভর্ণিং বডি কলেজটিকে ধ্বংসের মুখে উপস্থিত করিয়া নিজেদের মুখরক্ষার জন্য এই সভা আহ্বান করিয়াছে।"

এই কমিটি কর্ত্তৃক আহূত সভাতেই উপরোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীক্ষুদিরাম মাহাতো, এম-পি, এবং তিনি বাধা দেওয়া সত্ত্বেও প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। প্রস্তাবটির শেষে বলা হয়: "এতৎসত্ত্বেও জনসাধারণ এই কমিটির নিকট হইতে কলেজ-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে পারিত, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে গভর্ণিং বডি গঠনের অধিকার জনসাধারণের নাই। অধিকন্তু ডেপুটি কমিশনারের কার্য্যকলাপ হইতে জনসাধারণের সুস্পষ্ট ধারণা হইয়াছে যে জনসাধারণ কর্ত্তৃক এই জেলায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারের যে কোন চেষ্টাই হউক না কেন, ডেপুটি কমিশনার তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেনই।"

ডেপুটি কমিশনারের বিরুদ্ধাচরণের অর্থ বিহার গবর্ণ্মেণ্টের বিরূপতা, লোকে ইহা মনে করিতে বাধ্য। মানভূমের উন্নতির জন্য বিহার গবর্ণ্মেণ্ট বা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় কিছুমাত্র চেষ্টা নিজেরা করেন না, স্থানীয় লোকেরা কিছু করিতে গেলে তাহাতে বাধা দেন ইহা গুরুতর কথা। মানভূম তাঁহারা বাংলাকে ফিরাইয়াও দিবেন না, অথচ নিজেরাও তার জন্য কোন কিছু করিবেন না ইহা শুধু বিহার গবর্ণ্মেণ্ট নয় সমগ্র বিহার প্রদেশের পক্ষে গভীর কলঙ্কের কথা। কলেজের ঘটনাটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নহে।

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতির মানভূম সফর

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীপ্রজাপতি মিশ্র গত ১০ই মার্চ্চ হইতে ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত মানভূম জেলার নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। তাঁর কয়েকটি স্থানের ভ্রমণের বিবরণ পুরুলিয়ার 'মুক্তি' পত্রিকায় (১লা মে) প্রকাশিত হইয়াছে। বিলম্ব হইলেও বিবরণগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে, কারণ উহা হইতে বিহার কংগ্রেসের মতিগতি এবং তাহাদের মানভূম-নীতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এখানে দুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত তুলিয়া দিলাম:

"লক্ষ্মণপুর—হুড়া থানার লক্ষ্মণপুর গ্রামে গত ১০ই মার্চ্চ প্রায় সোয়া বারোটার সময় পঃ প্রজাপতি মিশ্র আদিবাসী ছাত্রাবাসে গমন করেন। তাঁহার বেলা ৯টার সময় তথায় পৌঁছিবার কথা ছিল। সভাস্থলে আদিবাসী ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ, স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ও থানা কংগ্রেস কমিটির কতিপয় কর্ম্মী উপস্থিত ছিলেন। জনসাধারণ বিশেষ কেহ সভায় যোগদান করেন নাই।

সভায় অভিনন্দন পাঠের পর মানভূম জিলা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণ হয়। তৎপরে পণ্ডিত মিশ্র বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পরে বিখ্যাত দস্যু দলপতি শ্রীহৃষীবর ব্যানার্জি

তাঁহাকে একটি টাকার তোড়া উপহার দেন। আদিবাসী হোষ্টেলের ভারপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্যানার্জি সভাপতির নিকট তাঁহার পরিচয় দিয়া বলেন যে, শ্রীযষ্টিধর ব্যানার্জি মানভূমে একজন খ্যাতনামা ডাকাত হিসাবেই পরিচিত। দুই মাস পূর্বেও ইনি জেলে ছিলেন। এখন কংগ্রেসের কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছেন। আমরা তাঁকে কংগ্রেসের কাজে লাগিয়েছি। আজ ১০।১৫ দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে যষ্টিধর কংগ্রেসের জন্য এই টাকা-পয়সা সংগ্রহ করেছেন।

ইহার পরে গত ১২ই মার্চ তারিখে যষ্টিধর ডাকাতির চেষ্টার সন্দেহে গ্রেপ্তার হন এবং পুনরায় ৪।৫ দিন পরে ছাড়া পান।

ইহার আরও কিছুদিন পূর্বে জেল হইতে বাহিরে আসিবার পরে ইনি স্থানীয় সোশ্যালিষ্ট পার্টির কর্মী হিসাবে কাজে নামিয়াছিলেন। বহুদিন হইতেই ইনি একজন পেশাদার ডাকাত।

মানবাজার—গত ১০ই মার্চ পঃ মিশ্র অপরাহ্নের দিকে মানবাজার স্কুল প্রাঙ্গণে সভা করেন। রাজা হিকিম, ডাক্তার অন্নদাবাবু প্রভৃতি সভার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সভার কিছুদিন পূর্বে জিলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীহরিপদ সিং জন-সাধারণের নিকট বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের অভিযোগাদি সম্বন্ধে জানিতেই পণ্ডিত মিশ্র মানবাজারে আসিতেছেন। সভায় রাজার তরফ হইতে, ছাত্রদের পক্ষ হইতে এবং জন-সাধারণের পক্ষ হইতে অভিযোগাদি জানাইয়া ৩টি মানপত্র দেওয়া হয়। মানপত্র দেওয়ার পর পণ্ডিত মিশ্র তাহার উত্তর দেন। কোন মানপত্রে বিহার গবমেণ্টের 'হিন্দি সাম্রাজ্য-বাদে'র উল্লেখ ছিল। তাহার উত্তর দিতে গিয়া পণ্ডিত মিশ্র প্রথমে বলেন যে, তোমাদের ভাষা বাংলা, আমার হিন্দি ভাষা বুঝিতে পারিবে না ; কিন্তু আমাকে হিন্দি ভাষাতেই বলিতে হইবে। তিনি বলেন যে, হিন্দি রাষ্ট্রভাষা, প্রত্যেককেই হিন্দি শিখিতে হইবে, বিহার সরকারের ভাষা হিন্দি সেজন্য তাহারা হিন্দি প্রচার করিবেই। তোমরা বাংলার নিকটে আছ, তোমাদের ভাষা বাংলা, মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত হিন্দি বাংলার ঝগড়া হইবেই। অতুলবাবু সত্যাগ্রহ করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। স্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে কেহ অন্যায় করিতে পারিবে না। ভোটের দ্বারা সেই সরকারকে পরিবর্তন করিতে হইবে। অতুলবাবুর সত্যাগ্রহ বিচার করিবার জন্য বোর্ডকে ভার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অতুল বাবু সত্যাগ্রহ করিব না এ কথা না বলিলে বোর্ড বিচার করিবে না। অতঃপর তিনি বর্তমান রাষ্ট্র-পরিস্থিতি ও কমিউনিষ্টদের সম্বন্ধে বলেন। তাঁহার বক্তৃতার পর মানবাজার থানার কংগ্রেসকর্মী মেটালার শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাত এবং চেপুয়ার শ্রীদিবাকর মাহাত কিছু বলিবার জন্য অনুমতি চাহিলে তিনি অনুমতি দিয়া প্রশ্ন করিতে বলেন। শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত বলেন, "স্বাধীন ভারতেও গবর্মেণ্ট অন্যায় করিলে তাহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিবার অধিকার আছে বলিয়া গান্ধীজী বলিয়াছেন।"

পঃ মিশ্র—গান্ধিজী মুখে বলিয়াছেন কিন্তু করেন নাই। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনশন করিয়াছেন।

শ্রীগিরিশ—গান্ধিজী দুটি পথই দেখাইয়াছেন।

পঃ মিশ্র—গান্ধিজীর সত্যাগ্রহের নীতিতে ভুল আছে বলিয়া মনে হয়।

অতঃপর দিবাকর মাহাত প্রশ্ন করেন—পাঁচ বৎসর অন্তর ভোট হয়। যদি কোন সরকার জনসাধারণের উপর অন্যায় করে তবে জনসাধারণ কি করিবে ?

পঃ মিশ্র—সরকারের যে কোন অন্যায় পাঁচ বৎসর পর্যন্ত জনসাধারণকে মানিয়া লইতে হইবে। পরে ভোট দ্বারা পরি-বর্তন করিতে পারে।

এই সময় জিলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীহরিপদ সিং বলেন যে, অতুলবাবুর সত্যাগ্রহ করিবার কোন শক্তি নাই, সব শক্তি নষ্ট হইয়াছে।

পঃ মিশ্র ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, তোমার এ কথা বলা উচিত হয় নাই।

পঃ মিশ্র মানপত্রগুলির সম্বন্ধে বলেন—এগুলি নিজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারা লিখ নাই, অন্য লোকসাজস লিখিয়া পাঠাই-য়াছে। পরিশেষে তিনি বলেন—আমি মনে করিয়া-ছিলাম যে তোমরা খুব অভ্যর্থনা ইত্যাদি করিয়া পাঠাইবে। কিন্তু যে মানপত্র দিয়াছ তাহার উত্তর দিতেই সমস্ত সময় গেল। জনসাধারণ তাঁহার বক্তৃতা বাংলায় বুঝাইয়া দিতে বলেন। সভাপতি মহাশয় কোন উত্তর না দিয়াই সভা হইতে উঠিয়া যান। ব্যবস্থাপকগণ তাহার জন্য চা, জলখাবার প্রভৃতির আয়োজন করেন, তাঁহাকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়াই চলিয়া যান। পূর্বে কংগ্রেস হইতে জনসভা বা এইরূপ অনুষ্ঠানে থানা কংগ্রেস কমিটিকে সংবাদ দেওয়া হইত এবং তাঁহারাই সমস্ত ব্যবস্থা করিত। কিন্তু এই ব্যাপারে থানা কংগ্রেসকে কোন সংবাদই দেওয়া হয় নাই।"

এই অভিনব সফরের পর পাটনার 'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রিকায় ২০শে মার্চ নিম্নলিখিত মর্মের বিবৃতিটি প্রকাশিত হয় :

"মানভূমের পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হইয়াছে। দৃশ্যত: এই জেলায় এখন বিরোধ ঘটিত কোন ক্ষোভ আছে বলিয়া মনে হয় না। এই জেলার লোকসেবক সঙ্ঘের সত্যাগ্রহেরও সুযোগ নাই। আমি যেখানেই গিয়াছি সেখানেই বাঙালীরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকের সহিত উৎসাহ সহকারে আমার অভ্যর্থনায় যোগ দিয়াছে। পুরাতন বাঙালী কংগ্রেস কর্মীগণ

জেলা কংগ্রেস কমিটি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর উহার যে অবনতি ঘটিয়াছিল বর্ত্তমান জেলা কংগ্রেস তাহা বহুলাংশে পুনরুদ্ধার করিয়াছে।"

কুচবিহারে পাকিস্থানী ষড়যন্ত্র

কুচবিহারে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির পর হইতে ঐ রাজ্যের সমস্যা নানা দিক দিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। কুচবিহারের জনসাধারণ যে সময় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ঐ রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি দাবী করিয়া প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিল সেই সময়ে তথাকার একদল মুসলমান কুচবিহারকে পূর্ব্ব পাকিস্থানের কুক্ষিগত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। ভারত বিভাগের পর হইতেই কুচবিহার রাজ্য এবং ত্রিপুরা মণিপুরসহ সমগ্র আসাম প্রদেশ পাকিস্থানের কুক্ষিগত করিবার ষড়যন্ত্র চলাইয়া আসিতেছে। এ কাজ সম্ভব ইহা তাহারা এখনও বিশ্বাস করে। আসামে এইরূপ ষড়যন্ত্রের অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, সম্প্রতি কুচবিহার সম্বন্ধেও কিছু তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। মুসলিম লীগ পন্থীরা কুচবিহারের এক বাঙালী বিদ্বেষী প্রধানমন্ত্রীর সহায়তায় 'কুচবিহার হিতসাধিনী সভা' নামে একটি সঙ্ঘ গড়িয়া তোলে এবং উহাতে কিছু-সংখ্যক তপশীলী হিন্দুর সমর্থন লাভ করে। কুচবিহারকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করিবার জন্য ইহারা রংপুর ও ময়মনসিংহ হইতে ভূমিহীন কৃষক আনাইতে থাকে। কুচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইহাদের এই চেষ্টা আপাততঃ ব্যর্থ হইয়াছে। হিতসাধিনী সভার নেতা আসাদুল্লা সিরাজীকে পাকিস্থানী চর হিসাবে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। আর কতকগুলি মুসলমানকে রাষ্ট্র-বিরোধী কার্য্যের জন্য রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। এই বহিষ্কারে তাহারা নিরস্ত হয় নাই। তাহাদের কার্য্যতৎপরতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রংপুরে সদর ঘাঁটি স্থাপন করিয়া ইহারা কুচবিহারের গ্রামে গ্রামে হিন্দু উদ্বাস্তুদের আর্থিক সংকট করিবার জন্য প্রচারকার্য্য চালাইতেছে। ইহাদের প্রচারকার্য্যের ফলে সম্প্রতি দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা ও তুফানগঞ্জ মহকুমায় কয়েকটি গ্রামে গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন হাঙ্গামা এত দূর গড়াইয়াছে যে, পুলিসকে গুলিবর্ষণ করিতে হইয়াছে। বহিষ্কৃত পাকিস্থানীদের চরেরা অশিক্ষিত চাষীদের শস্য উৎপাদন করিতে নিষেধ করিতেছে; দুর্ভিক্ষ আনয়নের দ্বারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ইহাদের উদ্দেশ্য। গবর্ন্মেণ্টের ধান সংগ্রহে ইহারা প্রবল ভাবে বাধা দিতেছে এবং গ্রামবাসীদিগকে ধান দিতে নিষেধ করিতেছে। কয়েকদিন হইল এই সম্পর্কে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহারা স্বীকার করিয়াছে যে; রংপুর ঘাঁটি হইতে তাহারা এই সমস্ত কাজ করিবার নির্দ্দেশ পাইয়া আসিতেছে।

'যুগান্তরে' ৯ই জুন তারিখে এই সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের আন্তঃডোমিনিয়ন চুক্তি এবং গত এপ্রিল মাসের নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি দুইটিতেই বলা হইয়াছে যে, ভারত বা পাকিস্থান একে অপরের বিরুদ্ধে বা পুনর্ম্মিলনের জন্য কোন প্রচারকার্য্য করিবে না। ভারতের সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে পাকিস্থান গোলযোগ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দ্বারা যদি প্রচারকার্য্যের চেয়েও অনেক বড় অপরাধ করে তবে তাহাতে চুক্তিভঙ্গ হয় কিনা এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোযোগ দেওয়া উচিত। উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, কুচবিহারের শাসন-কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাইয়াছেন; এই সমস্ত তথ্য ও প্রমাণ ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরকে তাঁহাদের দেওয়া উচিত।

আসামে উদ্বাস্তু বসতির সমস্যা

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীহট্টের একজন জমিদার ও চা-বাগানের মালিক। ১৯৪৬ সালের নির্ব্বাচনের পর যখন আসামে শ্রীগোপীনাথ বরদলৈর নেতৃত্বে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তখন তাঁহাকে অর্থসচিবপদে নিয়োগ করা হয়। সেই সময় হইতে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তিনি অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া এই মন্ত্রিমণ্ডলীকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাহার পর যদিও তিনি ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক পদ বরণ করিয়া লইয়াছিলেন তবুও গোপীনাথ বরদলৈর মন্ত্রিসভায় তাঁহার স্থান হয় নাই। বর্ত্তমানে তিনি আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভ্য আছেন। গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে দৈনিক সংবাদপত্রে তাঁহার এক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে কাছাড় জেলায় উদ্বাস্তু সমস্যার বর্ত্তমান ব্যবস্থাদির সমালোচনা আছে। তার কিয়দংশ নিম্নে তুলিয়া দিলাম:

"গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সাহায্য সংক্রান্ত কার্য্যে যেন কাহারও কোন দায়িত্ব নাই বলিয়া মনে হইতেছে। আমরা জানি যে, কাছাড় জেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে সাহায্য ও পুনর্বসতি সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম চলিতেছে। কিন্তু উদ্বাস্তুগণ জানে না সাহায্যের জন্য কাহার নিকট যাইতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার যেসব অফিসার নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রস্তুতের কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন বলিয়া মনে হয়। যে সাহায্য-কার্য্যের জন্য তাঁহাদের নিয়োগ করা হইয়াছে, তাঁহারা কিন্তু সরাসরি সাহায্যদান সংক্রান্ত কোন কার্য্যই করেন না। মহকুমার সাহায্য ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত অফিসার রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কোন কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয় নাই। তাঁহার কার্য্যের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থও মঞ্জুর করা হয় নাই। অতএব তথায় নামেমাত্র অফিসার রহিয়াছেন। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, এই শোচনীয়

অবস্থার জন্য দায়ী কে এবং এই অবস্থা সৃষ্টির পিছনে উদ্দেশ্যই বা কি ?

এই সব তথ্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিগোচরে আনিয়াছিলাম। ১৩ই মে তারিখে আমি করিমগঞ্জ হইতে শ্রীযুত শকসেনার নিকট এক তার প্রেরণ করি এবং উহার নকল প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করি। কিন্তু এ সম্পর্কে আমি কোন উত্তর পাই নাই।

এই সব কপর্দ্দকহীন উদ্বাস্তুর খাদ্য ও বস্ত্রের কোনরূপ ব্যবস্থা না করিয়া খয়রাতি সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় ও অমানুষোচিত হইয়াছে। তাহারা কাজ করিতে চাহেন, কিন্তু তাহাদের কাজ করিবার কোন সুবিধা নাই। কয়েক মাসের মধ্যেই বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা যে কঠিন, তাহা আমরা বুঝি। পুনর্ব্বসতির কার্য্যের জন্য ন্যায়সঙ্গত কারণে বিলম্ব হইলে কেহ সরকারের উপর দোষারোপ করিতে পারিবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে সকলে ইহাও আশা করে যে, সরকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকেদের খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করিবেন।

সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা সম্পর্কে দিল্লী চুক্তির পর নেহরুজী মনে করিয়াছিলেন যে, চুক্তি কার্যকরী হইবে এবং উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হইবে।...

চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্বের সমান মর্য্যাদা দেওয়া হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু আসল ব্যাপার হইল যে, পাকিস্থান ধর্ম্মের ভিত্তিতে ঐসলামিক রাষ্ট্রগঠনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং এখনও করিতেছেন।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুগণ মনে অনেক আশা লইয়া ভারতে আসে এবং গোড়ার দিকে সত্যসত্যই তাহারা আমাদের নিকট হইতে সদ্ব্যবহার পাইয়াছিল। ইতিমধ্যে পাকিস্থানের শোষণ চলিতে থাকে এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাহারা কপর্দ্দকশূন্য হইয়া এখানে চলিয়া আসে। দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্ব্ব-পাকিস্থানে এখনও যে অবস্থা আছে, তাহাতে এই সব উদ্বাস্তুর মনে কোনরূপ আস্থার ভাব ফিরিয়া আসিতেছে না। পূর্ব্ব-পাকিস্থান এখন বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসামে উদ্বাস্তু বসতির যে অব্যবস্থার বিবরণ দিয়াছেন তাহার কারণ সাময়িক নয়। আসামের বর্ত্তমান শাসকশ্রেণীর মনোভাবই তাহার প্রকৃত কারণ। এই শ্রেণী আসামের বাঙালী নাগরিকদের মনে করেন তাঁহাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। বাঙালীদের সংখ্যা কমাইতে পারিলে তাঁহাদের শ্রেণীর স্বার্থ নিরঙ্কুশ হইবে এই দুরাশার প্রেরণায় তাঁহারা শ্রীহট্টের গণভোটের সময় নানা চালাকি খেলিয়াছিলেন ; তাহার পরেও পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা আসামে বসতি করিলে বাঙালীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে এই আশঙ্কায় উদ্বাস্তু ব্যবস্থায় নানাপ্রকারে বাধার সৃষ্টি করিতেছেন।

সম্প্রতি আসামের নানাস্থানে বাঙালী বিদ্বেষী যেসব কার্য্যকলাপের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পশ্চাতে এই বাঙালী বিদ্বেষী মনোভাবই কার্য্য করিতেছে। শত চেষ্টা করিয়াও অসমীয়াগণ আসামে সংখ্যাগুরু হইতে পারিতেছেন না। আসামের জনসংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ—তন্মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা ২০।২২ লক্ষ ; অসমীয়ার সংখ্যা ২৫।২৭ লক্ষ ; অন্যান্য জাতি মণিপুরী, খাসিয়া, লুসাই, নাগা, মিকির ইত্যাদির সংখ্যা অসমীয়াদের প্রায় সমান।

এই সংখ্যা-বিচারে অসমীয়াদের দাবি টিকে না। রাষ্ট্রের ক্ষমতা সাময়িক ভাবে তাঁহাদের হাতে আসিয়াছে বলিয়া, তাঁহারা এইরূপ অত্যাচার ও অনাচার চালাইতে পারেন। সেই জন্যই শ্রীঅম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর মত লোকে গর্জ্জন করিয়া যাইতে পারিতেছেন। দৈনিক সংবাদপত্রে শ্রীমধুসূদন গোস্বামী (শিলং) একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তার একাংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি ; অসমীয়া মনোভাবের পরিচয় তাহাতে পাওয়া যাইবে :

"আসামের কুখ্যাত প্রাদেশিকতাবাদী শ্রীঅম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী নাকি নওগাঁয় এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে হুমকি দিয়েছেন যে আসামবাসী বাঙালীরা যদি আজও তাদের বাঙালীত্ব বজায় রাখতে চায়, আজও যদি তারা তাদের নিজেদের ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিসর্জ্জন দিয়ে অসমীয়া ভাষা, অসমীয়া কৃষ্টি ও অসমীয়া সংস্কৃতি গ্রহণ না করে তবে তিনি এই 'শেষবারের মত' স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিতে চান যে তা হলে অসমীয়া জাতি কিছুতেই ইহা সহ্য করিবে না। তাহারা ইহার প্রতিবিধানে আজ বদ্ধপরিকর।'

শ্রীরায় চৌধুরীর সুরে সুর মিলিয়ে আর একজন বক্তা (নলিন বরা) নাকি এই হুমকিও দিয়েছেন যে যদি তিন মাসের মধ্যে বাঙালী স্কুল উঠিয়ে না দেওয়া হয়, যদি বাঙালীরা অসমীয়া ভাষা গ্রহণ না করে, যদি বাঙালী মেয়েরা শাড়ী ছেড়ে 'মেখলা' পরিধান না করে, তবে যে বিদ্রোহানল জ্বলে উঠবে তা প্রাদেশিক সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারও দমন করতে পারবেন না।"

সম্প্রতি জোড়হাটে যে আসাম প্রাদেশিক রাজনীতিক সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতেও এইরূপ দাবির কথা শোনা যায় এবং কোন কোন বক্তার বক্তৃতায় এই বিদ্রোহের ধ্বনিও ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীদেবেশ্বর শর্ম্মা এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় মোলায়েম ভাষায় অম্বিকাগিরি রায়ের কথারই প্রতিধ্বনি করা হইয়াছিল।

বিদ্রোহের কথা যে শোনা যায়, তার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট ; বিশেষ করিয়া সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীবল্লভভাই প্যাটেল।

তিনি বরদলৈ মন্ত্রিসভার সমস্ত বাঙালী বিদ্বেষী কার্য্যকলাপের কথা জানেন। যে কোন কারণের জন্যই হোক্ তাহা দমন করিবার বা সংযত করিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। প্রশ্রয় পাইয়া বরদলৈ মন্ত্রিসভা বাঙালী উদ্বাস্তু সমস্যা লইয়া রাজনৈতিক খেলা খেলিতেছেন। তার বিপদ শ্রীনলিন বরার মুখে ফুটিয়াছে। এই শ্রেণীর অসমীয়া নেতৃবৃন্দের কার্য্য ও কথার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইলে সেই বিপদও সর্দ্দার প্যাটেলের দায়িত্বভার বৃদ্ধি করিবে।

উদ্বাস্তু সমস্যার গ্লানি

সামাজিক বিপর্য্যয়ের সময়, রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় মানব-প্রকৃতির সৎ ও অসৎ গুণাবলী প্রকাশ পাইবার সুযোগ পায়। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু বসতির সম্পর্কে এই কথার প্রমাণ পদে পদে পাইতেছি। অনিল বিশ্বাস ও কান্তিকুমার রায় আত্মভোলা হইয়া উদ্বাস্তু সেবা ও রক্ষার সময়ে "পাকিস্থানী" গুলিতে নিহত হইয়াছেন। অনিলকুমার সম্বন্ধে গত মাসের 'প্রবাসী'তে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি—আজ কান্তিকুমারের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং তার পরিবার-পরিজনের প্রতি সহানুভূতি নিবেদন করি।

গত ফাল্গুন মাসে শান্তাহারে আসাম-যাত্রী মেল ট্রেনের উপর "পাকিস্থানী" আক্রমণ চলে। কান্তিকুমার তাঁর দুই ভগিনীর সম্মানরক্ষার্থে অগ্রসর হন; "পাকিস্থানী" গুলিতে আহত হইয়া প্রায় দুই মাসকাল নওগাঁ হাসপাতালে চিকিৎসার পর অব্যবস্থা ও কুব্যবস্থার ফলে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

নেহরু-লিয়াকৎ আলী চুক্তির আর এক দিক

নেহরু-লিয়াকৎ আলী চুক্তি সম্পর্কে বিতর্কের অবসর সব সময়েই থাকিয়া যাইবে। আজ সেই চুক্তির পরীক্ষা চলিতেছে এবং চল্লিশ কোটি নর-নারীর শান্তি ও স্বস্তি তার ফলাফলের উপর নির্ভর করিতেছে। চুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক বলিবার আছে। সে সবের উল্লেখ এইখানে করিব না। পাকিস্থানের গণ-মন এই চুক্তি কিভাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহা উল্লেখ করিব। মুর্শিদাবাদের "গণরাজ" পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে :

"অনেক সময় নৌকা পারাপার বন্ধ করার জন্য প্রেমতলী-ঘাট (গোদাগাড়ী) হইতে সহজে কেহ পার হইয়া লালগোলায় আসিতে পারিতেছে না। অনেক সাঁওতালের তীর-ধনুক, টাকাকড়ি কাড়িয়া লইয়া তাহাদের পার হইতে দিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

গত ৪ঠা মে কয়েকজন সাঁওতাল গোদাগাড়ী থানার কমলপুর গ্রামে স্বগৃহে ফিরিয়া গেলে, তাহাদের চোর বলিয়া মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহাদের সঙ্গের টাকাকড়িও পাক-পুলিশ ও আনসারে কাড়িয়া লয়। রাজসাহী-মুর্শিদাবাদ সীমান্তের পাক-পুলিশ ও আনসারেরা বলে যে নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি পঃ নেহরু ও লিয়াকতের মধ্যেই হইয়াছে, তথাকার পুলিশ বা আনসারের সহিত চুক্তি হয় নাই।..."

ইহাই হইতেছে গণ-মনের অন্ততঃ একাংশের কথা। ভারত-রাষ্ট্রের উদারনৈতিক দল (Liberal Party) এই চুক্তি সম্বন্ধে কি বলেন তাহাও জানিয়া রাখা ভাল। এই চুক্তি গ্রহণের পর তাঁহাদের কাউন্সিল এক প্রস্তাবে বলিয়াছেন :

"এই চুক্তি দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের নীতি স্বীকার এবং ইহা কার্য্যকরী করার জন্য উভয়বঙ্গে কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা করায় ভারতীয় রিপাবলিকের শাসনতন্ত্রের মূলনীতির ও ইহার ধর্ম্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে।"

এইরূপ আশঙ্কা কেবল উদারনৈতিক দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ঘটা করিয়া ভারতরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভায় মুসলিম মন্ত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা—যদিও সংখ্যালঘু শ্রেণীর সন্তুষ্টির নামে তাহা করা হইয়াছে—১৯৪৭ ইং ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বের অবস্থায় আমাদের লইয়া গিয়াছে। তার ফলে ভারত বিভাগ হইয়াছিল। নেহরু-লিয়াকৎ আলী চুক্তির ফলে কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা ভাবিয়া ভারতরাষ্ট্রের অনেকেই চিন্তান্বিত হইয়াছেন।

কলিকাতার জাহাজ-ঘাটায় "মাঝি-মাল্লা"

কলিকাতার পোর্টকমিশনারদের বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ আছে—তাদের অধীনে ভারতীয় নাগরিকবৃন্দ "মাঝি-মাল্লা"র কাজে নিযুক্ত হইবার সুযোগ পায় না। পররাষ্ট্র পাকিস্তানের মুসলিম নাগরিকবৃন্দ এই 'মাঝি-মাল্লাদের' কাজ প্রায় একচেটিয়া ভাবে অধিকার করিয়া আছে; ইহা তাহাদের পরিশ্রমের কল্যাণে অর্জ্জিত এবং পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকবৃন্দের আলস্য ও শ্রমবিমুখতার ফল। সুতরাং আমরা কলিকাতার পোর্ট ট্রাষ্টকে এখন আর বেশী দোষ দিতে পারি না। পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকবৃন্দ তাদের শ্রমবিমুখতার অভ্যাস না ছাড়িলে কলিকাতার জাহাজ-ঘাটার অত্যাবশ্যক কর্ম্মপ্রবাহ বন্ধ করিতে পারা যায় না। পররাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের সাহায্যেও তাহা চালাইতে হইবে।

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে পোর্টকমিশনারদের চেয়ারম্যান শ্রী এন্. এম্. আয়ার সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় মাঝি-মাল্লা নিয়োগের সুবিধা ও অসুবিধার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া যে বিবৃতি দান করেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা এই কথাই বুঝিয়াছি এবং পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকবৃন্দকে আবার সাবধান করিয়া দিতেছি।

গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এই সাংবাদিক সম্মেলনের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কলিকাতার জাহাজ-ঘাটায় মাঝি-মাল্লার সমস্যা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। সেইজন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :

ভারতের স্বাধীনতা লাভের তারিখে বিগত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট কলিকাতা পোর্টকমিশনারগণের অধীনে মাঝি-মাল্লারা সকলেই ছিল অভারতীয় ও পাকিস্থানী এবং উহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫০০। কিন্তু এক্ষণে ঐ সংখ্যার মধ্যে ভারতীয়গণের মোটামুটি সংখ্যা হইবে প্রায় ৫০০।...

স্বাধীনতা লাভের তারিখ হইতে মাঝি-মাল্লা ও অন্যান্য চাকুরীতে অভারতীয় নাগরিক নিয়োগ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে উচ্চাঙ্গের কারিগরী দক্ষতার দিক হইতে পোর্টকমিশনারগণের অধীনে অভারতীয় নাগরিক নিযুক্ত করা যাইতে পারে ; কিন্তু ইহাতে ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমতি লওয়া আবশ্যক। এই ক্ষেত্রেও ঐরূপ ব্যক্তিকে স্বল্প-কালের মেয়াদে নিযুক্ত করা হয়।

পোর্টকমিশনারগণের ছোট-বড় প্রায় ১৩০খানি জাহাজ আছে। গত ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসেও জাহাজের ইঞ্জিন ঘরগুলির সমুদয় মাঝি-মাল্লাই ছিল পাকিস্থানী। কিন্তু গত পাঁচ মাসে ঐ সংখ্যার মধ্যে শতকরা ১৪ জন ভারতীয় নাগরিককে কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। টহলদার জাহাজ, ড্রেজার, বড় বড় মালের জাহাজ ও ছোট জলযানসমূহের ডেকের খালাসীরা ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে সকলেই পাকিস্থানী ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকদের সংখ্যা হইতেছে শতকরা ৬৭ জন। যে সকল মাঝি-মাল্লাকে নদীর উপকূলে কাজ করিতে হয় তাহাদের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা হইতেছে শতকরা ৪৫ জন। মুরিং মাষ্টারের মাঝি-মাল্লার মধ্যে ভারতীয়ের সংখ্যা হইতেছে শতকরা ২৫ জন। পাইলট জাহাজের মাঝি-মাল্লার মধ্যে ভারতীয় নাগরিকগণের সংখ্যা হইতেছে শতকরা ৬২ জন। ইঞ্জিনের ঘরে কাজ করিবার লোকের অবশ্য বিশেষ অভাব আছে এবং ঐরূপ লোকজনও সহজে পাওয়া যায় না।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশ বিভাগের পরে পোর্ট-কমিশনারগণের কর্ম্মচারীদিগকে ভারত অথবা পাকিস্থানে কর্ম্ম বাছিয়া লইবার কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই—কেননা পোর্টকমিশনার্সের ন্যায় কোন অনুরূপ সংস্থা পাকিস্থানে ছিল না। সেই সময়ে কর্ম্মচারীবৃন্দকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, পাকিস্থানী কর্ম্মচারীদিগকে চাকুরীর পূর্ণ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া অবধি কার্য্যে নিযুক্ত রাখা হইবে ; যাহারা পদত্যাগ-পত্র দাখিল করে তাহাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত পদে ভারতীয় নাগরিককে নিয়োগ করা হয় ; সকল মাঝি-মাল্লা ছুটি লইয়া অন্যত্র গিয়াছে, তাহারা যদি ফিরিয়া আসে তাহা হইলে তাহাদিগকে চাকুরীতে গ্রহণ করা হইবে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর কোন ইউরোপীয়কে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় নাই।

বিগত হাঙ্গামাকালে অনুমান তিন শত মাঝি-মাল্লা কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যায় এবং ২২০ জন মারাঠি মাঝি-মাল্লাকে বোম্বাইয়ের কল্যাণ আশ্রয় শিবির হইতে পোর্টকমিশনার-গণের কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। ইহারা সিন্ধু প্রদেশে করাচী বন্দরে কার্য্য করিত এবং সেখান হইতে বরখাস্ত হইয়া উদ্বাস্তু হিসাবে উক্ত আশ্রয়শিবিরে বাস করিতেছিল। যেদিন তাহাদিগকে কল্যাণ আশ্রয়শিবির হইতে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, সেইদিন হইতেই তাহাদের বেতন প্রাপ্য হয় এবং বহু ব্যয়ে তাহাদিগকে কলিকাতায় আনয়ন করা হয়। তাহাদের সহিত কার্য্যের ও কার্য্য-সম্পর্কিত বিষয়ে এইরূপ সর্ত্ত স্থির করা হয় :—তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে কার্য্য করিতে হইবে। জাহাজের একমাত্র রন্ধনশালায় নিজেদের পৃথক বাসনকোসনের সাহায্যে তাহাদিগকে রন্ধনকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। তাহাদিগকে ক্ষুদ্র জাহাজে সমুদ্রে যাইতে হইবে এবং সেই সময়ে তাহাদের রন্ধনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নিযুক্ত একজন পাচক থাকিবে, এবং তাহাদিগকে মুসলমান মাঝি-মাল্লার সহিত কার্য্য করিতে হইবে।

ঐ সকল ব্যক্তিকে রেশনের সহিত গো-মাংস দেওয়া হইয়াছিল কি না—এইরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুত আয়ার বলেন যে, একখানি সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অলীক। রেশনের সহিত মাঝি-মাল্লাদিগকে মাংস দেওয়া হয় না। হিন্দু ও মুসলমান সকল মাঝি-মাল্লাই মাংসের দরুণ কিছু অর্থ পাইয়া থাকে এবং তাহা দিয়া তাহারা মাছ বা যে-কোন প্রকার মাংস ক্রয় করিতে পারে।

উক্ত ২২০ জন মারাঠি মাঝি-মাল্লার মধ্যে এক্ষণে ১৯০ জন কার্য্য করিতেছে। অবশিষ্ট ৩০ জন কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ঐ সকল মারাঠি মাঝি-মাল্লাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া দেখা যায় যে, যে সকল কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে আনয়ন করা হইয়াছে, তাহাদের অনেকেই ঐরূপ কার্য্য ইতিপূর্ব্বে করে নাই। এই কারণে কর্ত্তৃপক্ষ অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করেন। যে সকল লোক চলিয়া গিয়াছে, তাহারা সম্ভবত: তাহাদের কার্য্যের সর্ত্ত পছন্দ করিতে পারে নাই বলিয়াই কাজ ছাড়িয়া গিয়াছে।

বাঁকুড়া শহরের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা

বাঁকুড়া শহরের ইলেকট্রিক্ কোম্পানীর বিরুদ্ধে বাঁকুড়ার প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে অনুযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই

অভিযোগের খুঁটিনাটি সত্যাসত্যের বিচার করিবার তথ্য আমাদের কাছে নাই।

গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের "হিন্দুবাণী" পত্রিকায় "শ্রীদুর্মুখ" লিখিত—"ঘরের কথা" স্তম্ভে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়ে একটু মনোযোগ দিলে ভাল হয়:

"ভোল্টেজ এখন আইন অনুযায়ী যতটা বজায় রাখা উচিত তার থেকে যথেষ্ট কম। ১৯০।২০০ এর বেশী সন্ধ্যাবেলায় কোন দিন থাকে না। দিনের অন্যান্য সময়েও অবস্থা প্রায় এক; ফ্লাকচুয়েট করা সমানে চলেছে।...শহরে যখন এই অবস্থা তখন বিদ্যুৎ সংযোগের দূরতম প্রান্তে কি হয়, তা সহজেই অনুমেয়। এই একটি কারণই কোম্পানীর লাইসেন্স বাতিলের পক্ষে যথেষ্ট। সম্প্রতি আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনৈক ইলেকট্রিক্ ইন্সপেক্টর এসেছিলেন। যথারীতি পাওয়ার হাউসে অবস্থান করে কোম্পানীর আতিথ্য গ্রহণ করে চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দ্বারা পরিতুষ্ট হয়ে ফিরে গেছেন। ভদ্রলোক নাকি একটু 'নজ্জা' করে বলে গেছেন যে, 'কাগজে বড্ড লেখা-লেখি হচ্ছে, এরপর থেকে আর আপনাদের এখানে উঠবো না।' এই ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক এসে ভোল্টেজের নৈরাশ্যজনক অবস্থা নিশ্চয়ই পরিদর্শন করে গেছেন। কিন্তু রিপোর্টে পূর্ব্ববৎ 'হোয়াইটওয়াশ' আমরা দেখতে পাবো আশা করি। রাস্তার বৈদ্যুতিক আলোর নৈরাশ্যজনক অবস্থা শহরবাসীর প্রভূত অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। কোন কোন অঞ্চলের রাস্তাগুলি বা কোন কোন আলোর পয়েণ্ট অন্ধকার রয়েছে দেখা যায়। ঝড়বৃষ্টি হলে সেদিন এই দুর্ভোগ বেড়ে উঠে বেশী করে। পৌরসভা কর্ত্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানালে তার উত্তর দেন যে এই সকল বিষয়ের আশু প্রতিকার চেয়ে চেয়ে তাঁদের মুখ ভোঁতা হয়ে গেছে। কোম্পানীর কর্ত্তারা কোন বিষয়েই কান দেন না। আরো জানা গেছে যে, আলোগুলি না জ্বললেও মিটার না থাকার জন্য ঘণ্টা-ওয়াটের হিসাব অনুযায়ী বিদ্যুতের মূল্য তাঁদের যথারীতি দিতে হয়। বছরের পর বছর পৌরসভা থেকে মিটার বসানোর দাবি জানালেও কোম্পানীর কর্ত্তারা তাতে কর্ণপাত করে নি। সুতরাং এক রকম জোচ্চুরি ও প্রতারণার দ্বারা করদাতাদের অর্থ পকেটস্থ করা হচ্ছে বললে ভুল হবে কি? পৌরসভারই বা এই অসহায় অবস্থার কারণ কি?"

পণ্ডিত নেহরুর ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ

ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডক্টর সুয়েকর্ণের আমন্ত্রণে ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্ত্তায় গমন করিয়াছেন। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি ডক্টর সুয়েকর্ণ ও প্রধানমন্ত্রী ডক্টর হাত্তা অনেকবার দিল্লীতে পদার্পণ করিয়াছেন; কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতাদান করিয়াছেন। পণ্ডিত জবাহরলালের ইন্দোনেশিয়া গমন আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

এই উপলক্ষ্যে তিনি যেসব বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন তাহার মধ্যে কোন রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য নাই; তার কোনও রাজনৈতিক গুরুত্বও নাই। ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র প্রায় দুই হাজার দ্বীপপুঞ্জের সমষ্টি। একসময়ে তাহারা ভারতবর্ষের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। আজিও বলী দ্বীপে হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠান বিদ্যমান এবং সমগ্র ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের আচার-আচরণেও এই প্রাচীন সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইন্দোনেশিয়ার লোকসমষ্টির সংখ্যা প্রায় ৭ কোটি, তন্মধ্যে প্রায় ৬॥ কোটি লোক ইসলামপন্থী। যদিও ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রনায়কগণ দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে তাঁহাদের রাষ্ট্র "ঐস্লামিক" নহে, তবুও ঐস্লামিক জগতে যে নূতন মনোভাবের আবির্ভাব হইয়াছে তাহার প্রভাব হইতে কত দিন এই রাষ্ট্র মুক্ত থাকিতে পারিবে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে। পাকিস্থানের রাষ্ট্রনায়কগণ এইরূপ ঐস্লামিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সংগঠন করিবার জন্য সতত সচেষ্ট। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা ইহার ফলাফল দেখিতে পাইব। পণ্ডিত নেহরুর বর্ত্তমান পরিভ্রমণ এইরূপ দুষ্ট পরিণতির পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করিতে পারিলে আমরা সুখী হইব।

"শ্বেত-অশ্বেতে"র বিরোধ

দক্ষিণ আফ্রিকার "শ্বেত" রাষ্ট্রনায়কগণ শ্বেত ও অশ্বেতের বিরোধকে বিষাক্ত না করিয়া ছাড়িবে না।

গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠের দৈনিক সংবাদপত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী কেপটাউন হইতে প্রেরিত যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ ব্যবস্থাপক সভা (Senate) বর্ণানুযায়ী অঞ্চল বিভাগ বিলটি চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছে। এই বিল অনুসারে ইউরোপীয়ান, নেটিভ ও অশ্বেতকায়-ভেদে সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীকে তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হইবে।

গত ফাল্গুন মাসে কেপটাউনে ভারতরাষ্ট্র পাকিস্থান ও দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রের প্রতিনিধির মধ্যে এক আলোচনা সভা বসে; তাহাতে স্থির হয় যে ভবিষ্যতে একটি "গোলটেবিল" বৈঠক আহ্বান করিয়া ভারতবাসীগণ ও তাহার বংশধরগণের বিরুদ্ধে যে অবিচার ও অনাচার করা হয় তাহার চূড়ান্ত মীমাংসায় আসিবার চেষ্টা করা হইবে।

এইরূপ স্বীকৃতির উদ্দেশ্য লঙ্ঘন করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবস্থাপক সভা উপরোক্ত বিলটি আইনে পরিণত করিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট নাকি প্রস্তাবিত "গোলটেবিল" বৈঠক বর্জ্জন করিবার

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অবশ্য এখনও চিঠিপত্র ও তার বিনিময় ইত্যাদি চালাইয়া এই সঙ্কট এড়াইবার চেষ্টা হইতেছে। তাহা সফল হইবে বলিয়া আমাদের কিন্তু বিশ্বাস নাই। কারণ ইংরেজী ভাষাভাষী শ্বেতাঙ্গ জাতির বর্ণবিদ্বেষ একটা রোগে দাঁড়াইয়াছে; তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে যে চিকিৎসার প্রয়োজন তাহা প্রয়োগ করিবার সাধ্য এই জাতিগুলির আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুঁয়ার

বাংলাদেশের জমিদার পরিবারবর্গের ও ভারতবর্ষের রাজন্ম পরিবারবর্গের পারিবারিক ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া এই বাঙালী সাহিত্যিক আপনার স্মৃতির ব্যবস্থা নিজেই করিয়া গিয়াছেন। এই সংগ্রহ ও সঙ্কলন কার্য্যে তাঁহাকে বহু বৎসরব্যাপী যে পরিশ্রম ও সাধনা করিতে হইয়াছে তাহাই জ্ঞানেন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের পরিচয়। তিনি প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে ৭৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

লর্ড ওয়েভেল

স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে ব্রিটিশ লাট-বেলাটের কার্য্যকলাপ লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু লাট ওয়েভেলের কর্ম্মকথার আলোচনা করিতে হয়। কারণ তিনি ১৯৪৩ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন। তাঁহার কর্ম্ম-নীতির ফলে ভারতবর্ষ দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে।

তাঁহার প্রভাবের চাপে পড়িয়া পণ্ডিত নেহরু ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে মুসলিম লীগের প্রতিনিধি পাঁচ জনকে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টে স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং মুসলিম লীগের এই প্রতিনিধিবর্গ কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে বিভক্ত করিয়া দেয়—এক দিকে থাকেন পাঁচ জন মুসলিম মন্ত্রী, অন্য দিকে থাকেন নয় জন কংগ্রেসী মন্ত্রী। ইহার অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হয় নোয়াখালি, ত্রিপুরায় মুসলিম তাণ্ডব, বিহারে হিন্দু তাণ্ডব এবং পঞ্জাবে মুসলিম তাণ্ডব। তাহার ফলেই ভারতবর্ষের বিভাগ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।

ইহাই হইল ভারতবর্ষ সম্পর্কে লর্ড ওয়েভেলের পরিচয়। সম্প্রতি তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে; ইনি এখন নিন্দা-প্রশংসার অতীতে গিয়াছেন।

মণীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে এই বাঙালী সাংবাদিক ও সাহিত্যিক দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমরা শোক প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার পরিবার-পরিজনের উদ্দেশ্যে সমবেদনা নিবেদন করিতেছি।

মণীন্দ্রনাথ পাটনার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথের পুত্র। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তার প্রেরণায়ই তিনি "বিহার হেরাল্ড" (সাপ্তাহিক) পত্রের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং "প্রভাতী" নামক মাসিক পত্রিকার পরিচালনভার লন।

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে গুরুপ্রসাদ সেন "বিহার হেরাল্ড" প্রতিষ্ঠা করেন; তিনি সেই যুগের এক জন কংগ্রেস-নেতা ছিলেন। বিহার তখনও বাংলা ও উড়িষ্যার সহিত এক জন লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণরের অধীন ছিল। গুরুপ্রসাদ সেন পাটনায় আইন ব্যবসা করিয়া বিহারের জমিদারবর্গের উপদেষ্টারূপে কৃতিত্ব লাভ করেন। বিহারের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথপ্রদর্শকরূপে তিনি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পূর্ণেন্দু-নারায়ণ সিংহ, মথুরানাথ সিংহ প্রভৃতি বাঙালী প্রধানগণ গুরুপ্রসাদের কর্ম্মধারা অব্যাহত রাখেন। যুবক মণীন্দ্রনাথ সেই ঐতিহ্যের উত্তরসাধক ছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রকৃত পরিচয়।

দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

ঝাড়গ্রাম রাজের পরিচালক ও ঝাড়গ্রাম রাজ-পরিবারের বর্ত্তমান প্রধান শ্রীনরসিংহমল্ল দেব মহাশয়ের পরামর্শদাতা দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তাঁহার পরলোকগমনে মেদিনীপুর জেলার সকলপ্রকার গঠনমূলক কার্য্যের সহায়কগণের মধ্যে প্রধান এক জন চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্থান পূরণ করা সহজ হইবে না।

তাঁহার পরামর্শে ঝাড়গ্রামরাজ নারী শিক্ষা সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন বিধবাশ্রমকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-কলেজকে এক লক্ষ টাকা ও কয়েকশত বিঘা জমি দান করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় তাঁহারই সাহায্যে।

সতীশচন্দ্র দত্ত

শ্রীহট্ট আইন-ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রধান এক জন সম্প্রতি ৭৬ বৎসরে পরলোকগমন করিয়াছেন। আইন-ব্যবসায়ে কৃতিত্ব অর্জ্জনই সতীশচন্দ্রের একমাত্র পরিচয় নহে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে শ্রীহট্টের "উইকলি ক্রনিকল্" পত্রিকার বিশিষ্ট লেখক রূপে তিনি দেশের সেবা আরম্ভ করেন; ১৯৩৫ হইতে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। কংগ্রেসের সমুদয় নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া সতীশচন্দ্র ১৯৩৭ সালের নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের মনোনয়ন লাভ করিতে পারেন নাই।

শেষ জীবনে তিনি নানা সংবাদপত্রে ভারতবর্ষের রাজনীতিক সমস্যাবলীর আলোচনা করিয়াছেন। সেই সব প্রবন্ধের মধ্যে তাঁহার দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালী কায়স্থের দান

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

যে মানবসমাজে প্রতিভার অবাধ স্ফূর্ত্তি হয় না তাহার জীবনীশক্তি পঙ্গু হইয়া বিনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ সজীব থাকিয়া প্রজাসাধারণের কল্যাণ সাধনে সমর্থ ছিল, সামাজিক ইতিহাস সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিলে এই-রূপ প্রতিপন্ন হইবে। সেকালের আদর্শ সমাজের চিত্র নিম্নলিখিত শ্লোকে অঙ্কিত পাওয়া যায়:

ধনিকঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যশ্চ পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ ॥

শ্লোকটি জাতিবর্ণবিভাজক নহে, দেশের প্রধান সামাজিক অঙ্গ নির্দ্দেশক। পাঁচটি অঙ্গ হইল যথাক্রমে—Banking, Education, Administration, Transport and Health. তন্মধ্যে বাঙ্গলার সম্ভ্রান্ত কায়স্থসমাজ প্রধানতঃ "রাজ"-তন্ত্রের অন্তর্ভূত থাকিয়া গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিভার প্রেরণায় অন্যান্য তন্ত্রেও বাঙ্গালী কায়স্থের কৃতিত্ব বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান সংগ্রহ করিতে গিয়া আমরা বহু কায়স্থ গ্রন্থকারের নাম পাইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের বিবরণ এই প্রবন্ধে সঙ্কলিত হইল।

১। মহামহোপাধ্যায় কামদেব ঘোষ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় ভট্টিকাব্যের পূর্ব্বার্দ্ধের একটি উৎকৃষ্ট টীকা রক্ষিত আছে (৭৯৬ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি)। ইহা প্রাচীন টীকা হইতে সঙ্কলিত বলিয়া প্রারম্ভ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে:

নত্বা সীতাপতিং সীতাং রামং রামস্য কামিনীং।
কুর্ব্বেহং সুলভাং টীকাং দৃষ্ট্বা প্রাচীনসংগ্রহম্ ॥

টীকামধ্যে জয়মঙ্গলা, রামতর্কবাগীশ (৭।১ পত্র), দিবাকর, টীকাসংগ্রহ প্রভৃতির ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত হইলেও কামদেবের ব্যাখ্যাই অধিকস্থলে গৃহীত হইয়াছে। সপ্তম সর্গের শেষে পুষ্পিকা আছে—"ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীশ্রীকামদেবকৃতাদিব্যাখ্যা।" এক স্থলে (২২ পত্রে) "ইতি কামদেবাঃ বর্ণ্যাঃ" বলিয়া সশ্রদ্ধ উদ্ধৃতি আছে। এই কামদেব কে ছিলেন? সৌভাগ্যবশতঃ এই প্রশ্নের যৎকিঞ্চিৎ উত্তর এখন দেওয়া সম্ভব। কামদেব-রচিত ভট্টিকাব্যের "পদকৌমুদী" নামক টীকার একটি খণ্ডিত তাড়িপত্রে লিখিত সুপ্রাচীন প্রতিলিপি উক্ত পুথিশালায় রক্ষিত আছে (৩৯৮ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি—পত্রসংখ্যা ২৪০, ভট্টির একাদশ সর্গের ৪৬ শ্লোক পর্য্যন্ত)। প্রথম সর্গের শেষে (১৩।২ পত্রে) পুষ্পিকা আছে—"ইতি মহোপাধ্যায় শ্রীকামদেব-ঘোষকৃতায়াং পদকৌমুদ্যাং·····।" ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয়, কামদেব কায়স্থকুলতিলক "ঘোষ"-বংশীয় ছিলেন এবং তাঁহার "মহোপাধ্যায়" উপাধি হইতে অধ্যাপনাবৃত্তি সূচিত হয়। প্রারম্ভের শ্লোক দুইটি ত্রুটিত, প্রথম শ্লোকের শেষার্দ্ধ এই:

রামং সত্যাভিরামং বিবুধগণসখং চারু নত্বাবিরামং
সশ্রীকঃ কামদে (বঃ কি) মপি বিতনুতে ভট্টিকাব্যস্য টীকাং ॥

কামদেবের এই টীকা অতি সমীচীন এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বটে। তিনি কাতন্ত্রমতে একজন প্রধান বৈয়াকরণ ছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার মতে ভর্ত্তৃহরিই ভট্টিকাব্যের রচয়িতা। বর্দ্ধমান (২ পত্র), ভাষাবৃত্তিকার পুরুষোত্তম (৩।১, ৬৯।২, ৭৭।১ পত্র), পূর্ণচন্দ্র (২৪।২), সুভূতি (৬৪।১, ১৩০।১) প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারের সন্দর্ভ ব্যতীত কামদেব দিবাকর (১৪।২) ও বিশ্বেশ্বর (৯২।১) নামক অপ্রসিদ্ধ দুই জন টীকাকারের ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভট্টিকাব্যের বাঙ্গালী টীকাকারদের মধ্যে কাতন্ত্রপ্রদীপকার মহাপণ্ডিত "পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই বিদ্যাসাগরের "কলাপদীপিকা" টীকাই পরবর্ত্তী বিখ্যাত টীকাকার ভরত মল্লিকের প্রধান উপজীব্য ছিল (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৭, পৃ. ১৫২-৩)। অদ্বৈত-প্রকাশের এক নিতান্ত অপ্রামাণিক উক্তি অবলম্বন করিয়া এখনও কেহ কেহ মনে করেন যে কলাপের "বিদ্যাসাগরী"-টীকা স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের রচনা, যদিও তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।[১] কাম-

১। বিদ্যাসাগর-রচিত কলাপটীকা কাতন্ত্রপ্রদীপ, পরিশিষ্টটীকা ও ভট্টিটীকা কলাপদীপিকার অংশ বহুকাল পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছে এবং পুথিও পাওয়া যায়। ইহাদের গ্রন্থকার যে পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর, অপর কেহ নহেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। পুণ্ডরীকাক্ষের প্রামাণিক বিবরণ আমরা অন্যত্র লিখিয়াছি (সা-প-প, ১৩৪৭, পৃ. ১৪৯-৫৮; ১৩৫০, পৃ. ১৪-৫)। শ্রীহরিদাস দাস-রচিত "শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য" নামক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থে (পৃ ৩৬ পাদটীকা) বিদ্যাসাগরী টিপ্পনীর সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, "নবদ্বীপবাসী গোপীনাথ তর্কাচার্য্য পরিশিষ্টগ্রন্থের টীকায় দুর্গসিংহের মত খণ্ডন করিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহার গর্ব-খর্ব করিবার জন্য এই টিপ্পনী রচনা করেন (বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ৬ষ্ঠ বর্ষ); আদিম শ্লোক—"বিকশতু নখকুসুমালী" ইত্যাদি। এই উক্তি সর্ব্বাংশে ভ্রমাত্মক—পরিশিষ্টের অতি প্রসিদ্ধ টীকাকার গোপীনাথ নবদ্বীপবাসী ছিলেন না। তাঁহার বংশ অদ্যাপি ঢাকা জিলায় বিদ্যমান আছে। তিনি বিদ্যাসাগরের পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। "বিকশতু" শ্লোকটি পুণ্ডরীকাক্ষরচিত কাতন্ত্রপ্রদীপের ধাতুসূত্রের ব্যাখ্যার প্রারম্ভে বহুদিন যাবৎ মুদ্রিত হইয়াছে (গুরুনাথ, প্রসন্নশাস্ত্রী প্রভৃতির কলাপব্যাকরণের বিভিন্ন সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চনার জন্য এইরূপ আকাশকুসুমরচনা নিতান্ত কলঙ্কজনক।

দেব নামোল্লেখ না করিয়া এই বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্যের ন্যায় তৎকালীন মহাপণ্ডিতেরও প্রমাদবচন তীব্রভাষায় খণ্ডন করিয়া পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন (ঐ, ঐ, পৃ. ১৫৬ দ্রষ্টব্য)। বৈয়াকরণের পাণ্ডিত্যপ্রকাশের একটা স্থল হইল কাব্যাদিতে উপলভ্যমান দুর্ঘট প্রয়োগসমূহের সঙ্গতিবিচার। মৈত্রেয়রক্ষিত ও পুরুষোত্তমের পৃথক্ "দুর্ঘট" গ্রন্থ ছিল। অধুনা শরণদেবের "দুর্ঘটবৃত্তি" এ বিষয়ে পরম প্রমাণ গ্রন্থ (প্রথম ১০৯৫ শকে রচিত ও পরে বর্ত্তমানাকারে সংক্ষিপ্ত)। ইঁহারা সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। কামদেব "কাতন্ত্রদুর্ঘটপ্রবোধ" নামে এ জাতীয় গ্রন্থ লিখিয়া পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন—ভট্টিটীকার বহুস্থলে (৬৯।২, ৮১।১, ৮৭।১, ৯৭।২, ১০৮।২ ও ১১৪।২ পত্রে) কামদেব স্বরচিত অধুনালুপ্ত এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কামদেব এতদ্ভিন্ন অন্যান্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় আমরা তদ্রচিত "শব্দরত্নাকর" গ্রন্থ দেখিয়াছি (৫১২ গ সংখ্যক পুথি, ৭৫ পত্র, ১৬৫৭ শকের অনুলিপি)। পুষ্পিকা এই :—"ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীকামদেবঘোষকৃতঃ রত্নাকরঃ সমাপ্তঃ শ্রীবলরামশর্ম্মণঃ পুস্তিকেয়ং লিপিশ্চেতি।" (৭৫।১ পত্র) শব্দরূপবিষয়ক এই গ্রন্থও পাণ্ডিত্যপূর্ণ—এই গ্রন্থেও দিবাকর (৭।২ পত্র), নারায়ণ ভট্ট (৮।২), 'অষ্টবৃত্তৌ' (১৬।২), স্বভূতি (২১।১, ২৫।১), রত্নমতি (২১।১), তত্ত্বপ্রদীপে রক্ষিতেন (ঐ) প্রভৃতি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের বচন উদ্ধৃত করিয়া কামদেব স্বকীয় প্রাচীনতা সূচিত করিয়াছেন।

কামদেবের অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করা কঠিন নহে। তিনি পুণ্ডরীকাক্ষের পরবর্ত্তী, আর পুণ্ডরীকাক্ষ ছিলেন বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতৃব্যপুত্র ও সমকালীন। সুতরাং ধরা যায় কামদেব ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন না। পক্ষান্তরে কলাপের সুপ্রসিদ্ধ "কবিরাজ"-টীকার এক স্থলে (সন্ধি ৭০ সূত্র) সুষেণ বিদ্যাভূষণাচার্য্য "কামঘোষস্তু" বলিয়া কামদেবের ব্যাখ্যা (বোধ হয় কাতন্ত্রদুর্ঘটপ্রবোধ হইতে) উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। সুষেণ খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক এবং কামদেব ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্ত্তী নহেন, ধরা যায়। ভট্টিটীকার প্রারম্ভে ২য় শ্লোকে কামদেব স্বকীয় গুরু "সুদর্শনে"র বন্দনা করিয়াছেন—যিনি পত্নীর সহিত কাশীপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সুদর্শন সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের অন্যতম শিক্ষাগুরু সুদর্শন পণ্ডিত। তাহা হইলে কামদেব শ্রীচৈতন্যের সহাধ্যায়ী ও সমকালীন ছিলেন এবং তাঁহার অভ্যুদয়কাল হয় খ্রীঃ ১৫০০-৫০ মধ্যে।

২। মহামহোপাধ্যায় পুরুষোত্তম দেব

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় অতিজীর্ণ একটি চণ্ডীটীকা রক্ষিত আছে (১০৬৫ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি, পত্রসংখ্যা ৩৪)। আরম্ভাংশ ত্রুটিত, শেষ পুষ্পিকাটি উদ্ধৃত হইল :—

যদত্র চণ্ডিকাপাঠে ন্যূনাতিরিক্তং জাতং তদ্দেবীপ্রসাদাৎ সাঙ্গমস্তু ইতি হারাবলীয়ং সমাপ্তেতি। ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীপুরুষোত্তম-দেববিরচিতায়াং সপ্তশতিকাটীকা সমাপ্তা শ্রীপদ্মাপতিশর্ম্মণঃ স্বা (ক্ষরং) শাকে ১৫৮১ ॥

"হারাবলী" নামক এই টীকা সুপ্রাচীন ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাবচন হইতে অনুমান হয় গ্রন্থকার শূদ্রবংশীয় ছিলেন :—(১৮-৯ পত্র)

অধুনাতনপদপ্রচারাদুচ্চৈঃশ্রবঃসঙ্গমিতি (চণ্ডী ৫।৬১) ভবিতুং যুক্তং। কিন্তু পারাশরিপদতাৎপর্য্যং কো বেত্তি। তথা চোক্তং,

অষ্টাধ্যায়ী মৃগী বালা তৃণারণ্যকৃতা (শ্রমা)।
ব্যাসভাষামহারণ্যং নাবগাহিতুমীশ্বরী।

ব্যাসভাষার্থং বেত্তি মূলং ন না (?)। ক্বচিৎ পাঠশুদ্ধিঃ পরা কাষ্ঠা হি যদি "শূদ্রাণাং" দৃশ্যতে তথাপি যথাবোধং ব্যুৎপত্তিশ্চ ক্রিয়তে—উচ্চৈঃ শৃণোতীতি সরতীতি অচ-প্রত্যয়ঃ·····সংজ্ঞয়া নাম্না চেতনয়া বা বর্ত্ততে ইতি সসংজ্ঞঃ···। (অনেক পরবর্ত্তী শান্তনবী টীকায় এই বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি দৃষ্ট হয়)। সুতরাং "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিক এই শূদ্র পণ্ডিতের রচনা বিশেষভাবে আলোচনীয়। টীকায় মেদিনিকোষ ভিন্ন অপর কোন আধুনিক প্রমাণবচন উদ্ধৃত হয় নাই (৫।২ পত্র, পশুশব্দঃ পশ্বার্থেঽব্যয়ং তথা চ···ইতি মেদিনিঃ)। পুরুষোত্তম পাঠানযুগের কিম্বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রায় ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের লোক হইতে পারেন। পাণিনিতন্ত্রানুযায়ী এই টীকা বর্ত্তমানে প্রচলিত টীকাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হওয়া সম্ভব। পাণ্ডিত্যের নিদর্শনস্বরূপ একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইল :—প্রধানেন মহামাত্রেণ সহ বর্ত্ততে, "মাহুত" ইতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ (চণ্ডী ১।১২)। অথবা ধানং লুডস্তং, প্রকৃষ্টং ধানং পোষণং যস্য, তুল্যযোগ ইতি সমাসঃ, প্রকৃষ্ট-পোষণমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ প্রধানশব্দো বাক্যলিঙ্গোপি দৃশ্যতে। তথা চ কাব্যং—"যে প্রধানাঃ প্রবঙ্গমাইতি। যদ্বা প্রধানবান্ প্রধানঃ অর্শ আদিত্বাদচ॥ (৩·৪ পত্র)

৩। কবি রামচন্দ্র গুহ-মজুমদার

তাঞ্জোরের সরস্বতীমহাল পুথিশালায় রামচন্দ্র কবিরচিত যযাতি-চরিত্রবিষয়ক "ঐন্দবানন্দ" নামক নাটকের প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। প্রস্তাবনায় কবির পরিচয় হইতে জানা যায় তিনি "গুহ"-বংশীয় গৌড়েন্দ্রমহামাত্য "কবিপণ্ডিত" শ্রীহর্ষ বিশ্বাসখানের পুত্র ছিলেন (*Tanjore Cat.*,

p. 3355)। রামচন্দ্র নামক এক রাজচক্রবর্ত্তীর সম্যগানন্দের জন্য ইহা রচিত হইয়াছিল। এই রামচন্দ্র উৎকলাধিপতি গজপতি মুকুন্দদেবের (১৫৫২-৬৮ খ্রী.) পুত্র রামচন্দ্র বলিয়া অনুমিত হইয়াছে (*Indian Culture*, VI, pp. 480-1)। তাহা হইলে নাটকটীর রচনাকাল হয় ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পরে। বঙ্গজকায়স্থের কুলজীতে গুহবংশে এই রামচন্দ্র মজুমদারের নাম যথাযথ পাওয়া গিয়াছে—তিনি রাজা প্রতাপাদিত্যের (১৫৮৪-১৬১১ খ্রীঃ) পিতামহ পর্য্যায়ের জ্ঞাতি ছিলেন। তদ্দ্বারাও উক্ত রচনাকাল সমর্থিত হয়। কবির পিতা শ্রীহর্ষের "কবিপণ্ডিত" উপাধি হইতে এই বংশধারায় পূর্ব্ব হইতেই সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি প্রমাণিত হয়।

"রসেন্দ্রচিন্তামণি" নামক আয়ুর্ব্বেদের রসশাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বহুকাল মুদ্রিত হইয়াছে (জীবানন্দের ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। গ্রন্থকার "গুহকুলসম্ভব-শ্রীরামচন্দ্রাহ্বয়ঃ" কবি রামচন্দ্র হইতে অভিন্ন হইতে পারেন। কিন্তু এই গ্রন্থের মনোহর মঙ্গলাচরণ শ্লোক—

অথ প্রকাশকাসারবিমর্ষাম্বুজিনীময়ম্।
সচ্চিদানন্দবিভবং শিবয়োর্ব্বপুরাশ্রয়ে॥

গ্রন্থকারের তান্ত্রিক সাধনা সূচনা করে এবং উক্ত নাটকের নান্দীশ্লোকের সহিত ভাবগত পার্থক্য পরিস্ফুট হয়। সুতরাং উভয় গ্রন্থকার একবংশীয় এবং একনামধারী হইলেও পৃথক্ ছিলেন মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। প্রতাপাদিত্যের প্রপিতামহের নামও ছিল রামচন্দ্র গুহ—তিনিই রসেন্দ্রচিন্তামণি-কার কি না বিবেচ্য। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্য গ্রন্থকার ভরত মল্লীক "চন্দ্রপ্রভা"-নামক বৈদ্যকুলপঞ্জীর এক স্থলে "গুহ"-উপাধি বৈদ্যবংশের উল্লেখ করিয়াছেন :— (পৃ. ২১৩।২)

ধর্ম্মসেনসুতৌ খ্যাতৌ রাঘবোঽথ গুণাকরঃ।
"গুহপদ্ধতিবৈদ্যস্য" তনয়াগর্ভসম্ভবৌ॥

তাহা হইলে রসেন্দ্রচিন্তামণিকার কায়স্থবংশীয় নাও হইতে পারেন। বৈদ্য গুহ-বংশ এখনও বিদ্যমান আছে কি না অনুসন্ধানযোগ্য।

৪। কায়স্থ হরিদাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় "জাতকচন্দ্রিকা" নামক জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় গ্রন্থের প্রথমাংশের একটী প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। গ্রন্থারম্ভ যথা, (৬৪৭ সংখ্যক পুথি)

প্রণম্য গোবিন্দপদারবিন্দং বিধীয়তে জাতকচন্দ্রিকেয়ং।
নভোনভোবাণশশাঙ্কহীনঃ শাকেন্দ্রকালো নিজহায়নঃ স্যাৎ॥
শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত ... ... (ত্রুটিত) ... ... স্য হানিঃ।
শ্রীমল্লভূবল্লভদেশমধ্যে তথাবিধং পুস্তকমাতনোমি॥

এতদনুসারে ১৫০০ শকাব্দে (১৫৭৮-৯ খ্রীঃ) এই গ্রন্থ "মল্লরাজে"র অধীনে রচিত হইয়াছিল। মল্লরাজ সম্ভবতঃ কোচবিহারের রাজা "মল্লদেব" নরনারায়ণ (১৫৫৫-৮৭ খ্রীঃ)। কিম্বা মল্লরাজদেশ বলিতে বর্দ্ধমান প্রভৃতি রাঢ়দেশের অংশ-বিশেষকেও বুঝাইতে পারে। বর্ত্তমান বর্দ্ধমান রাজগোষ্ঠীর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে পাঠান আমলে বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল "মল্লাবনীনাথে"র অধিকারভুক্ত ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশও তৎকালে প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রন্থকারের নাম পুষ্পিকায় প্রদত্ত হইয়াছে :—"ইতি 'কায়স্থ'-শ্রীহরিদাসবিরচিতায়াং জাতকচন্দ্রিকায়াং মধ্যবিবরণং নাম প্রথমোধিকারঃ" (১১।২ পত্র)। এই পুথির ৭।২ পত্রে একটী পত্র লিপিবদ্ধ আছে—শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মা কর্ত্তৃক "রামচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কারে"র নিকট লিখিত।

৫। হরিবল্লভ বসু

ঢাকার পুথিশালায় অপর একটী জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় গ্রন্থের খণ্ডিত তালপত্রে লিখিত প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম (১৮৭১ক সংখ্যক পুথি)। মনোহর মঙ্গল শ্লোকটী উদ্ধৃত হইল :—

একং গুণাতীতমজং নিরীক্ষং নিরাকৃতিং
নির্ব্বিষয়ং নিরীহং।
ব্যাপ্তাখিলং যং নিগদন্তি বেদা-স্তস্মৈ নমঃ শ্রীপুরুষোত্তমায়॥

তৃতীয় শ্লোকে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় যথা,

দৃষ্ট্বা বরাহাদিমতং মুদে বিদাং হিতায় দৈবজ্ঞগণস্য কামদং।
"আয়ুঃপ্রকাশং" হরিবল্লভো বসু-স্তনোতি
ধীরঃ কবিরাজখানজঃ॥

কুলীন বসু-বংশীয় এই গ্রন্থকারের পিতাও সুপণ্ডিত ছিলেন, "কবিরাজখান" উপাধি হইতে তাহা বুঝা যায়। গ্রন্থকারের নাম কুলপঞ্জীতে গবেষণীয়। জ্যোতিগ্রন্থে রচনাকাল প্রায় সর্ব্বত্র লিপিবদ্ধ থাকে—আলোচ্য গ্রন্থেও পাওয়া যায় :—"রামেন্দুতিথিভির্হীনঃ শাকঃ শাস্ত্রাব্দপিণ্ডকঃ" (২।২ পত্র)। অর্থাৎ ১৫১৩ শকাব্দে (১৫৯১-২ খ্রীঃ) ইহা রচিত হইয়াছিল। সুতরাং গ্রন্থকার সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ রাঘবানন্দের সমকালীন ছিলেন।

৬। রামেশ্বর মিত্র তত্ত্বানন্দ

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়ক "প্রবোধমিহিরোদয়" নামক একটী উৎকৃষ্ট তান্ত্রিক নিবন্ধের প্রতিলিপি রক্ষিত ছিল (পত্রসংখ্যা ২০৫)। গ্রন্থটি আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। মুদ্রিত পুথিবিবরণী হইতে (তন্ত্র-ভাগ পৃ. ৪৭-৯) ইহার বিবরণ সঙ্কলিত হইল। গ্রন্থারম্ভে গুরু-বন্দনাশ্লোক যথা,

সঙ্কিংকমলসঙ্কারিহংসপীঠকৃতাসনং ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাকারং শ্রীগুরুং সততং ভজে ॥

আট "অবকাশে" সম্পূর্ণ এই গ্রন্থের বিষয়সূচি যথা, (১) ভ্রমজ্ঞাননিবারণ, (২) কার্য্য-কারণ-কর্তৃবিবেচন, (৩) পরমেশ্বরনির্ণয়, (৪) ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিলয়নির্ণয়, (৫) জীবতত্ত্ব, (৬) ব্রহ্মবিদ্যা, (৭) পূজাবিধি এবং (৮) ভাবাচারনির্ণয়। তন্ত্রমতে এ জাতীয় দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ বিচারবহুল গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ। ইহা "সকলশাস্ত্রতাৎপর্য্যসাধারণ সংগ্রহ" রূপে রচিত হইয়াছিল এবং বহু তন্ত্রগ্রন্থ ব্যতীত গীতা, উত্তরগীতা, বিষ্ণুপুরাণ, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতির সন্দর্ভ ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার দুই শ্লোকে গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন :—

সংসারে বিষয়াগারে লোভাদিকণ্টকাবৃতে ।
অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্নে কথং ন স্যাদমার্গগঃ ॥
অতঃ প্রবুধ্যতে শাস্ত্রাৎ প্রবোধমিহিরোদয়ঃ ।
যস্য প্রকাশমাত্রেণ সন্মার্গদর্শনং ভবেৎ ॥

এতদ্দ্বারা বুঝা যায় তন্ত্রমতে সাধনা করিয়া গ্রন্থকার শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুযায়ী পরম জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন। গ্রন্থশেষে রচনাকাল ও রচয়িতার পরিচয় লিখিত আছে :—

ঈশে নাগাঙ্কবাণেন্দুশকে (১৫৯৭) বিংশতিবাসরে ।
সাধকানাং হিতার্থেন সংগ্রহঃ পূর্ণতাং গতঃ ॥
কামদেবো মহানাসীৎ কুলীনঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ।
তৎপুত্রো নন্দনঃ শ্রীমান্ কুলতন্ত্রবিশারদঃ ॥
রাজেন্দ্র-রঘুনাথাখ্যৌ তৎসুতৌ পুণ্যভাজনৌ ।
রঘুনাথসুতঃ শ্রীমান্ মিত্রো রামেশ্বরঃ স্বয়ং ॥

* * *

সারমাকৃষ্য শাস্ত্রাণামকরোৎ কৃপয়া ভুবি ॥

অর্থাৎ ১৫৯৭ শকাব্দের ২০ আশ্বিন (১৬৭৫ খ্রীঃ) "সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ" কুলীন কামদেবের প্রপৌত্র "কুলতন্ত্রবিশারদ" নন্দনের পৌত্র এবং "পুণ্যভাজন" রঘুনাথের পুত্র রামেশ্বর মিত্র ইহা রচনা করিয়াছিলেন। পিতামহের বিশেষণপদ হইতে অনুমান হয় এই সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী "কৌল"মার্গী তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। কুলীন মিত্রবংশের কুলবিবরণ হইতে এই সাধক পরিবারের সম্যক্ পরিচয় উদ্ধার করা আবশ্যক। গ্রন্থের পুষ্পিকাটী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল—তন্মধ্যে গ্রন্থকারের গুরুর নাম ও বাসস্থানের উল্লেখ আছে :—"ইতি তত্ত্বানন্দপ্রকটীকৃতে প্রবোধমিহিরোদয়ে আচারবিবরণং নামাষ্টমাবকাশঃ। ইতি "বিন্ধ্যপুর"-বাস্তব্য-সর্ব্ববিদ্যা-মহামহোপাধ্যায়-শ্রীমত্তর্কবাগীশভট্টাচার্য্যচরণাম্বুজ-[illegible]-কায়স্থমিত্ররামেশ্বরাখ্য-তত্ত্বানন্দেন প্রকটিতং সকলশাস্ত্রতাৎপর্য্যসাধারণীসংগ্রহং তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়কং প্রবোধমিহিরোদয়ং সমাপ্তম্ ॥"

"বিন্ধ্যপুরে"র অবস্থান আমরা নির্ণয় করিতে অসমর্থ। একটা অনুমান লিখিত হইল। বিখ্যাত তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধ সর্ব্বানন্দনাথের বংশধরগণ অদ্যাপি "সর্ব্ববিদ্যা" ঠাকুর নামে পরিচিত। ইঁহারা প্রসিদ্ধ গুরুগোষ্ঠী এবং পূর্ব্বাপর বীরাচারী তান্ত্রিক ছিলেন। একটী বংশধারা বহুকাল যাবৎ যশোহর জেলার "বেন্দা" গ্রামে অধিষ্ঠিত আছে—পুষ্পিকায় উল্লিখিত "সর্ব্ববিদ্যা" শব্দের উক্ত পারিভাষিক অর্থ স্বীকার করিলে বেন্দাই সংস্কৃত হইয়া বিন্ধ্যপুরে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বেন্দার সর্ব্ববিদ্যাগোষ্ঠীতে তর্কবাগীশ কেহ ছিলেন কিনা এবং তাঁহাদের শিষ্যমধ্যে মিত্রবংশীয় কেহ ছিলেন কিনা অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

৭। হরিনারায়ণ মিত্র

আমাদের নিকট শঙ্করাচার্য্য রচিত সুপ্রসিদ্ধ শক্তিস্তব "আনন্দলহরী"র এক বিস্ময়জনক ব্যাখ্যাগ্রন্থের অনুলিপি রক্ষিত আছে—পত্রসংখ্যা ১১৭। ইহাতে শক্তিপক্ষে বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর প্রত্যেক শ্লোকের "বিষ্ণুপক্ষে" ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। এই পাণ্ডিত্য-পূর্ণ টীকার রচয়িতা ছিলেন মিত্রবংশীয় সুবিখ্যাত "বঙ্গাধিকারী" হরিনারায়ণ রায়। গ্রন্থারম্ভ যথা,

হরিনারায়ণঃ শ্রীমান্ বিশ্বামিত্র কুলোদ্ভবঃ ।
তনোত্যানন্দলহরী-হরিভক্তিসুধোদয়ং ॥

নিদর্শনস্বরূপ প্রথম শ্লোকের বিষ্ণুপক্ষে ব্যাখ্যাংশ উদ্ধৃত হইল :—"বিষ্ণুপক্ষে তু শিবো গোপালাষ্টাদশাক্ষরঃ, শক্ত্যা পঞ্চদশ্যা, অষ্টাদশাক্ষরপ্রত্যেকপদাদৌ পঞ্চদশীমন্ত্রস্য ক্রমেণৈকৈককূটদানেন মন্ত্রে সুন্দরীগোপালমন্ত্রোদ্ধারাদিত্যর্থঃ।

কদাচিদাদ্যা ললিতা পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা।
বেণুনাদসমারম্ভাদকরোদ্বিবশং জগৎ ॥

ইতি তন্ত্ররাজোক্তেঃ

স্ত্রীণাং ত্রৈলোক্যজাতানাং কামোন্মাদৈকহেতবে।
বংশীধরং কৃষ্ণদেহং চকার দ্বাপরে যুগে ॥

ইতি মহাকালসংহিতাবচনাচ্চ

কৃষ্ণস্যাপি কাত্যায়নীরূপতয়া তৎপরতয়া এব ব্যাখ্যানেনাভেদো নিরাবাধ এব ইতি" (৫ পত্রে)। গ্রন্থশেষে শিক্ষাগুরুর নাম ও গ্রন্থকারের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে—উভয়ই অজ্ঞাতপূর্ব মূল্যবান্ তথ্য।

তর্কালঙ্কারধীরেণ শ্রীরামকৃষ্ণশর্ম্মণা।
শঙ্করাচার্য্যভাবো মে বিচার্য্যৈথং প্রকাশিতঃ ॥
আনন্দকন্দ-"সানন্দমিত্র"-নন্দননন্দনঃ।
চকারানন্দলহরী-হরিভক্তিসুধোদয়ং ॥

(পুথিটীর লেখক নীলকণ্ঠ, লিপিকাল "রবীন্দুক্ষৌণীধর-

পৃথ্বিমানে শাকে" অর্থাৎ ১৭১১ শকাব্দে)। সুতরাং হরিনারায়ণ সানন্দমিত্রের পৌত্র ছিলেন—প্রচলিত বংশাবলী-সমূহে যে তাঁহাকে অমোঘের পৌত্ররূপে ধরা হইয়াছে তাহা ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইল (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ খণ্ড, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩-৫৪ দ্রষ্টব্য)। সম্রাট্ আরঙ্গজেবের সনন্দানুসারে (ঐ, পৃ. ৪৪) হরিনারায়ণ বঙ্গবিনোদের ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ ভগবান রায়ের পুত্র ছিলেন।

হরিনারায়ণের কার্য্যকাল ১৬৭৮-১৭০০ খ্রীঃ। ঐ সময়ের শেষাংশে এই টীকা রচিত হইয়াছিল অনুমান করা যায়। কারণ শিক্ষাগুরু রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার আগমতত্ত্ববিলাসকার সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ তর্কবাগীশের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। রঘুনাথ ১৬০৯ শকের চৈত্র মাসে (১৬৮৮ খ্রী.) সুবৃহৎ তন্ত্রনিবন্ধ সম্পূর্ণ করেন এবং তাহার সারসঙ্কলন করিয়া রামকৃষ্ণ 'মুনিবেদনৃপে' (১৬৪৭) শকে "আগম চন্দ্রিকা" রচনা করেন (L 269)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রামকৃষ্ণ রচিত মহিম্নস্তোত্রের টীকা রক্ষিত ছিল, তাহাও হরিনারায়ণের আদেশে রচিত। তদ্ভিন্ন "বঙ্গেশ্বর-শ্রীহরি-নারায়ণ রায়ে"র আদেশে রামনারায়ণ মিত্রদাস (সম্ভবতঃ হরিনারায়ণের আত্মীয়) "সভাকৌস্তুভ" নামে গ্রন্থ (১০৭৭ বঙ্গাব্দে) রচনা করিয়াছিলেন (H. P. Shastri: *Notices*, II 240)।

আমরা দিগ্‌দর্শনস্বরূপ পাঠান-মুঘল যুগের ৭ জন মাত্র কায়স্থপণ্ডিতের বিবরণ এই প্রবন্ধে সঙ্কলন করিয়া দিলাম। এতদ্ভিন্ন বহু কায়স্থ রচিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং নানা স্থানের পুঁথিশালা পরীক্ষা করিলে অনেক গ্রন্থ নূতন আবিষ্কৃত হইবে সন্দেহ নাই। বাংলার সারস্বত ইতিহাসের এই অন্ধকারময় অধ্যায়টী কষ্টসাধ্য গবেষণাদ্বারা আলোকিত করুন, শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের নিকট আমাদের এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গালীর কবি

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

বাঙ্গালীর কবি, কোথা ভৈরবী
অভয় রাগিণী তব ?
বিশ্ব বিপুলে নিঃশেষ আশা,
অনন্ত স্রোতে ক্লান্তিতে ভাসা,
অসহায় ডুবে যায় যত তৃণ
তাহারে শোনাও নব
জীবনের গাথা, শোধ তার ঋণ,
দূর করো পরাভব।

নিঃস্ব নিশীথে নিষ্ফলা গীতে
ভরায়ো না কবিতারে ;
লক্ষ বুকের মুখর বক্ষে,
অশ্রুশুকানো স্তিমিত চক্ষে
যে ভাষা জাগিছে আশ্বাসহীন
বাণী দাও আজি তারে ;
দূরে উদাসীন ধ্যানে সমাসীন
থেকো না অন্ধকারে।

রুক্ষ আলোকে রুদ্রের লোকে
জেগে ওঠো তুমি কবি।
ত্যজ প্রেমগাথা কল্পনাকথা,
মৃত্যুঞ্জয়-জীবন-বারতা
গাহ যাহা শুনি' চিত্ত লভিবে
সত্য শিবের ছবি,
দুখ দুস্তরে সুখ সন্ধানি' নিবে
তুলে ভয় শোক সবি।

পূর্ব্বদেশের কীর্ত্তিনাশার ডাকে
সর্বদা হেসে যারা
বন্যার মাঝে দৈন্যের রাতে
মগ্ন না হয়ে নগ্ন দু'হাতে
যুঝে যায়, আজ কাতারে কাতারে
পথ প্রান্তেতে হারা,
রচ নব নভ তাহাদের তরে
তব গীতে তোল সাড়া।

আজি যারা ভয়ে বিপুল প্রলয়ে
উন্মাদ কালো জলে
ঝাঁপায়ে পড়িয়া দু'হাতে লড়িয়
ভাগ্যের সাথে পরাণ ভরিয়া
পায় নি আত্ম-নির্ভর সুর
অভয় মন্ত্রবলে,
হে কবি, তাদের যন্ত্রণা করো দূর
দুঃখ নিরাশা দলে।

আনো দুর্বার প্রেরণা তোমার
অপার উন্মাদনা,
হ'নো ঝঞ্ঝার বাণীসম্ভার,
উড়াইয়া দাও ভীরু অঙ্গার,
তব ভৈরবী সুরেতে, হে কবি,
জাগাও অমৃত প্রাণ,—
মেঘমুক্তিতে শক্তি লভুক রবি,
আনো পথ-সন্ধান।

কৈফিয়ৎ

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দীশর্ম্মা)

নন্দী বেলগাছে উঠিয়া বিল্বপত্র সংগ্রহ করিতে করিতে দেখিল, আকাশে কি একটা সাঁ সাঁ করিয়া চলিয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই কার্ত্তিকের কাছে এয়ারোপ্লেন হইতে বোমা-বৃষ্টির কথা শুনিয়াছিল। ভয়ে মাথায় হাত দিয়া, সোজাসুজি এক লাফ দিয়া ভূতলে পতন, কারণ শোনা ছিল straight line is the shortest distance—পরে ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে, একটা কয়লা কুড়াইয়া কপালে ৭৪॥ লিখিয়া, গুঁড়ি মারিয়া গোয়ালঘরে প্রবেশ ও দুর্গানাম জপ।

এমন সময় ঢেঁকিস্কন্ধ নারদের অবতরণ ও বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রবেশ এবং কিছুক্ষণ পরে বাহির হইয়া অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দিরে গমন।

বিশ্বনাথ নন্দীকে ডাকিয়া বলিলেন—পাজি ব্যাটা মরেচ ?

নন্দী। তবে প্রণাম হই, পায়ের ধুলো দিন, মার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না। গাঁজার ঝুলি ত্রিশূলের আগায় ঝোলানো আছে, আর কোল্‌কেটা ধুনির ধারে পাবেন। আমি এই সময় পায় পায় এগুই, এখনও চলতে পারচি—

বিশ্বনাথ। কোথায় ?

নন্দী। মণিকর্ণিকায়।

বিশ্বনাথ। কেন—

নন্দী। আজ্ঞে—মারা যখন গিচি, এর পর বইবে কে ?

বিশ্বনাথ। গাঁজার থলি সাবাড় করেচিস্ বুঝি ? মরিচিস কে বললে ?

নন্দী। আজ্ঞে এই ত বললেন—

বিশ্বনাথ। ওঃ তাই বল্, বেটা এখুনি নেশা ছুটিয়ে দিছলি। আমায় না মেরে কি আর তুই মরবি ? তার জোগাড়ও ত করেচিস—বুড়ো বয়সে নাকি সাহিত্যচর্চ্চায় মন দিয়েচিস্ ? তাই ত বলি, ছিলিমের নম্বর কমচে কেন। ও রোগটি বড় সোজা নয়, মেয়েটা ঐতে গোল্লায় গেছে, ছত্রিশ জাতের ঘরে ঢুকে রয়েচে, গণশা ব্যাসের মুহুরি হয়ে আমার মাথা হেঁট করিয়েচে, এই কাগজের কসানের দিনে বাংলাদেশ উচ্ছন্ন যেতে বসেচে, আর তুমি বেটা কিনা তার ওপরে সাতা ক্রপ্ করে ভিড় বাড়াতে গেছ ? আজ সাত দিন সাঁপি নেই, হাতে শেষটান্ মেরে ফোস্কা পড়ে গেল, —সে দিকে দৃষ্টি পর্য্যন্ত নেই।

নন্দী। আজ্ঞে, সেদিন যে মোক্ষম্ টান্ দিলেন—ছেঁদা হাউয়ের মত কোল্‌কের নীচে পর্য্যন্ত হল্‌কা এসে সাঁপি পর্য্যন্ত পুড়িয়ে দিলে। আপনার ত ন্যাংটা দরবার, বাঘছালে ত আর সাঁপি হবে না। হয়েচে—দেখি এখনো আছে কিনা।

এই বলিয়া নন্দী বাহিরে আসিয়া নারদের ঝুলিটার তলা সাবাড় করিয়া, সাঁপি করতঃ, ভাল করিয়া এক ছিলিম ঘাড়োয়ালী গপ্পা সাজিয়া দেওয়ায়, বিশ্বনাথ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"বেটা আমার সঙ্গে সহমরণে যাস, তা না ত মলেও বাঁচবো না। কিন্তু খবরদার—ফের যেন সাহিত্যের দায়িত্ব ঘাড়ে করে- মুখ্যুমির খাঁটিত্ব (সতীত্ব) মাটি করিস নি।"

নন্দী বাহিরে আসিয়া দেখে নারদ মা'র বাড়ী হইতে ফিরিয়া ঢেঁকিতে জিন কসিতেছেন, নন্দীকে দেখিয়া বলিলেন—"মা ডেকেছেন, কি জরুরী কাজ আছে, শিগ্‌গীর যাও!"—এই বলিয়া হুস্ করিয়া ঢেঁকি ছাড়িয়া দিলেন, ঝোলা হইতে মালা, গোপীচন্দন প্রভৃতি ঝুপঝাপ পড়িতে লাগিল, তিনি টেরও পাইলেন না। নন্দী হাসিতে হাসিতে প্রণাম করিল।

মায়ের মন্দিরে গিয়া প্রণাম করিতেই অন্নপূর্ণা বলিলেন—"তুই নাকি সাহিত্যিক হয়েচিস্ ? লেখাপড়া শিখলি কবে ?"

ন। মা—গো সেবা করলে কি না হয়, তোমাদের সংসারে গরু নিয়েই থাকি, সাধুসঙ্গে সবই সম্ভব—তাই কিছু কিছু এসে থাকবে।

অ। কিন্তু এমন নেমকহারাম হলি কি করে ?

ন। কই মা, এ সংসারে ত নুনের কারবার নেই! বাবা গাঁজা খেয়েই থাকেন, তুমি রাবড়ী পেঁড়া পরমান্নেই জীবন ধারণ কোরচো, ষাঁড় আর গরুগুলো ফুল বিল্বিপত্র খেয়েই আছে। বিরাটরাজা বাবার গর্ভেই বোধ হয় তাঁর গোধনগুলি ঝেড়ে দিয়ে স্বর্গলাভ করেন। ঘাস কিনে খাওয়াতে হলে কুবেরকে আর বেশীদিন চাকরী রাখতে হোতো না—এ শহরে ছ' আনায় এক মোট ঘাস। তারা ত আর নন্দী নয় যে সেরেফ কলা খেয়ে জন্মটা কাটাবে; কাজেই মুখ বদলাবার জন্যে হাটে বাজারে দোকানে দিনে ডাকাতি করে বেড়াচ্চে। সেয়ানা কত—কিছুতে হাত দেয় না, কেবল মুখ দেয়। আর একবার যা মুখে নেয়—তার আর চিহ্নমাত্র রাখে না। বামাল পেলে কি রক্ষে

ছিল, আদালতে আর অন্য মামলা নিতে হোতো না। অনেকে অনেক চেষ্টা করেচে, কিন্তু এরা উদরস্থ করে বামালগুলিকে এমন আকার আর রঙ বদলে বার করে দেয়, বড় বড় বৈজ্ঞানিকে দু' হাতে ঘেঁটেও মালের হদিস পায় না। একেই বলে প্রতিভা। ঘাটে একজন সাধু কয়েকখানা পুঁথি মাথায় দিয়ে ঘুমুচ্ছিল একটি ষাঁড় ধীরে ধীরে এসে সেইগুলো টেনে নিয়ে কণ্ঠস্থ করতে আরম্ভ করলে। গিয়ে দেখি—গীতাখানির কর্ম্মযোগের বেবাক মর্ম্ম তখন উদরস্থ করে পাণিনির কর্ত্তা হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়াটি সমাপ্ত করতে ব্যস্ত। 'অব্যয়ের' অপব্যয় ও 'প্রত্যয়ের' ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী ভেবে, সাধুকে তুলে দিলাম। ষণ্ড মহোদয় মন্থরগতিতে কার্য্যান্তরে চলে গেলেন—শব্দমাত্র হ'ল না, যেন আধুনিক রবার টায়ার দিয়ে খুরগুলি বাঁধানো! সাধু অবশিষ্ট ছিন্নপত্রগুলো সংগ্রহ করে দেখলেন—শুদ্ধিপত্র ও কয়েকটি পারাবাৰ্জ্জিত অমূল্য ঔষধের ও দাদের মলমের বিজ্ঞাপন মাত্র হাতে এলো। আর সব বেকাম হয়ে গেছে। তখন শুদ্ধিপত্রটি ফেলে দিয়ে বাকিগুলি সযত্নে পোঁটলায় পুরলেন। ইত্যবসরে একটি সহানুভূতিশীল জনতা জমে গিয়েছিল। একজন সহমর্মী পণ্ডিত বললেন —"একেই বলে পূর্ব্ব সংস্কার নচেৎ পাণিনিতে এতটা স্পৃহা গোজাতির সম্ভবে না।" জনৈক নৈয়ায়িক প্রমাণের দাবি উপস্থিত করায়, পূর্ব্ববক্তা বললেন—"প্রহ্লাদের বিদ্যা-শিক্ষায় হিরণ্যকশিপু ষণ্ডকেই যে আচার্য্য নিযুক্ত করে-ছিলেন, এ ত আমাদের চতুষ্পাঠীর তরুণী শ্যামা ঝি পর্য্যন্ত জানে।" চোস্ত অলষ্টার গায়ে একগাছি ছিপ্‌ছিপে বাবু বললেন—"এর উপর আর কথা চলতে পারে না—আমাদের গৌহাটির মধ্য ইংরাজি ইস্কুলের গোবরধন মাষ্টার যদিও লোকসমাজে মানুষ বলে চলে গিয়েছিলেন—কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালকেরা তাঁর মুখ নাক চোখ এবং কণ্ঠস্বরে তাঁতে ষণ্ডেরই সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছিল। যদিও তাঁর শিং ছিল না, কিন্তু অন্তর্নিহিত স্বভাবের তাড়নায়, তর্জ্জনী দুটি সোজা করে বালকদের ঘুঁতানই তাঁর অন্যতম শাসন-প্রণালী ছিল। তদ্ভিন্ন কারও বাগানের বেড়া ভেঙে শাক-সব্জী বা ফল অদৃশ্য হলে, তা যে গোবরধন মাষ্টারের কাজ সে বিষয়ে গৌহাটীতে কখনও দ্বিমত শোনা যায় নি। ফল কথা এই, সামান্য সামান্য পূর্ব্বসংস্কারগুলি উত্তরাধিকার-স্বত্বে লাভ করে মানুষ যদি এতটা উন্নত হতে পারে এবং আমাদের জ্যোতিষ-শাস্ত্র থেকে latest পি-এম বাকচীর পঞ্জিকা পর্য্যন্ত যখন মানুষের বৃষরাশি সম্বন্ধে একমত, কেবল তাই নয়, বরং বৃষরাশিস্থ স্ত্রীপুরুষ মাত্রই বিদ্যা-বুদ্ধি ও সৌভাগ্যে উচ্চতর বলে প্রমাণিত—তখন সেই জাতির উন্নতিকল্পে আমাদের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? এই সর্ব্ব-বিষয়িণী সভাসমিতির শিলা-বৃষ্টির দিনে, এই ধোপোন্নতি, হাড়্‌ড়োন্নতির প্রচেষ্টার দিনে, ষণ্ডোন্নতির জন্য কেউ কি একটি অনড্‌বান University বা বৃষ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব পেশ করে বৃষভ-বাহন বিশ্বনাথের আশীষ অর্জ্জন করবেন না? যে জাতির যৎসামান্য গুণলাভ করে আমরা অমানুষ বা অতিমানুষ হয়ে পড়ছি সামান্য চেষ্টায় তারা যে অচিরে ভারতের মুখোজ্জ্বল করতে পারবে কোন্ মূর্খ এ কথার প্রতিবাদ করতে পারে? বারাণসীর ন্যায় বলদবহুল স্থান হতেই এ প্রস্তাব হওয়া সর্ব্বাংশে সমীচীন।"

সকলে সাধু সাধু করে উঠলেন। একজন মারোয়াড়ী সাগ্রহে নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করায় বাবু অতি বিনয়ের সহিত বললেন—বৃষধ্বজ বাগচী, নিবাস গোবরডাঙ্গা, গোরক্ষপুরে বিদ্যা সমাপ্ত করে গাইবাবায় দিনকতক খোঁড়রক্ষকের কাজ করেছিলেন এখন গোকর্ণপুরে মোক্তারী করছেন এবং মোক্তার বলেই কংগ্রেসে বা সাহিত্য সম্মিলনে যেতে পারেন নি, কাশীতেই লেগে পড়েছেন। আগামী বছরে ওকালতী পাস করে সে খেদ মেটাবেন। মারোয়াড়ীটি একটি বিড়ি উপহার দিলেন। বৃষধ্বজ বাবু ধরিয়ে অগ্নি-বাণের মত সোজা, শিবালয়ের দিকে চলে গেলেন। সাধুটি আর গীতার দুর্গতি এবং পাণিনির প্রাণান্তজনিত শোক-প্রকাশের অবকাশ মাত্র পেলেন না। বলদ-বিশ্লেষণ তথা বৃষ-মহিমা কীর্ত্তন শুনেই তাঁকে খুশি হতে হ'ল, ইত্যবসরে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য অপকারী জীবটি সাফ সরে পড়ে অন্যত্র বিদ্যা-চর্চ্চার চেষ্টায় মনোনিবেশ করলে।

আরো দেখ—বিনায়ক, বৃহস্পতি, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, বঙ্কিম এমন কি ব্যারিষ্টার প্রভৃতি বাণীর বাছা-বাছা পুত্রগুলি বেবাক ব'কারেই আরম্ভ, অতএব বৃষ বা বলদ বা বলীবর্দ্দ কোন প্রকারেই সে দাবি থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। চিরকালটা সেই সৎসঙ্গেই কাটচে—এ ছাড়া ত আমার সাহিত্যিক হবার অন্য কোন দাবি দেখি না।

অ—কি রে নন্দী তুই এখনো বকে যাচ্ছিস্? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তুই যে মোক্তারের চেয়েও বক্তার হলি! তোর সাহিত্যিক হবার মতি গজিয়েছে দেখে খুশি হয়েছি, পাপটা বেশী দিন বাড়তে পাবে না, বোঝাটাও কম হবে—ভাষার, ভাবের আর ভারতের বেশী অনিষ্ট করবার সময় কুলুবে না। সে যা হোক, তুই কিন্তু বড় বেইমান ছেলে—শুনলুম তুই নাকি একখানা বই লিখে একা তোর বাবাকেই সেখানা উৎসর্গ করেছিস? সেই নিয়ে নারদ আমাকে খুব লজ্জা দিয়ে গেল, সে এখুনি গিয়ে গঙ্গার কাছে, শচীর কাছে আমার মুখ হেঁট করবে—

ন—মা, আমার ত কোন পুরুষে কেউ কখন বই লেখেনি, আমিই গ্রহদোষে স্বকৃতভঙ্গ হয়ে পড়েছি। উৎসর্গ-পত্রটাই যে ওর প্রধান 'আর্ট' সেটা বুঝতে পারি নি। পুরুষ-দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করতে হয়, আর মেয়ে-দেবতাদের কাছে উচ্ছুগ্গু করতে হয়, তাই মা, আমার খুবই ভরসা ছিল, বইখানা বস্তুতঃ তুমিই পাবে; কারণ, আমার এ পিঁজরাপোলের পইটেয় বসে লেখা বইখানি, আমি লোক-দেখানো হিসাবে বাবার নামে উৎসর্গ করলেও সমালোচক মহাশয়েরা যে তোমার কাছেই উচ্ছুগ্গু করে দেবেন, এ বিশ্বাস আমার সতেরো আনাই ছিল। এখন দেখছি—আমার সমালোচকগুলো পরম বৈষ্ণব—এঁরা পাতা খাওয়ান, কোপ্ মারেন না, আবার শিঙে সিঁদুর দিয়ে ছেড়ে দেন! এমনটা যে হবে তা জানতাম না।

অ—তা যা হোক বাছা—আমার কিন্তু তোর ব্যাপার দেখে বড় দুঃখু হয়েছে—

ন—তোমাদের মা একটুতেই দুঃখু হয়, আর হলেও তা সহ্য হয় না। আমাদের কিন্তু ঐটেই সম্বল্ ঐটে আছে বলেই বেঁচে আছি। তা না ত যে কি নিয়ে থাকতুম তা হাতড়ে পাই না। তাড়ির মালিশ, তাড়ির দাওয়াই, তাড়ির সেবা করতে করতেই দুঃখের লম্বা দিনগুলো ঝাঁ কোরে কেটে যায়। একবার গালে হাত দে বসেছি কি—দেড় ঘণ্টা কাবার। এক একটা দীর্ঘনিশ্বাসে ৫.৭ মিনিট ফর্সা করে দি। বাবা বলেন—"বেটা কেবল গাঁজা পোড়াচ্ছে!" গাঁজা পোড়াচ্ছি, কি দুঃখু ওড়াচ্ছি সেটা মা বাপের একজনও ভাবেন না। এসব হিকমৎ না অভ্যাস থাকলে, যে কিসমৎ নিয়ে ঘর করি, তাতে কি আর একদিন বাঁচোয়া ছিল! এই সেদিন বুকের ওপর দে যে পাহাড়ে পেন্‌সন্‌টা গেল, সেটা কি সইতে পারতুম! কই, খোঁজ নিছলে কি মা?

অ—কি রে—কি হয়েছিল আবার?

ন—ঐ যে তোমার বুটে কাণ্ডটা;—অন্নের আড়ত—মেঠাইয়ের মৈনাক, পেঁড়ার পিরামিড, প্রণামীর পাহাড়—টাকার ট্যাঁকশাল! কেবল অর্থহীন গরীবদের ক্ষুধাতুর গর্ত্তে প্রবেশ নিষেধ। বিদেশী ফ্যাশানের বিজ্ঞাপনের জোরে—বড়লোক ধরে তুমি ত মা ব্যবসাটা বেশ ফ্যালাও করে অন্নকুটের লিমিটেড কোম্পানী ফেঁদে নিলে, চিত্রকুটের পাট্টা বাঁদরে নিয়ে বসে আছে, বিলাতী বালকদের মুখের বিস্কুট ব্রাহ্মণেরা কেড়ে নিয়েছেন, গরীবদের কোন এক বিশেষ রোগের মহৌষধি ছিল তাম্রকুট, কপিপাতা শুকনো সিগারেট আর বিড়ি—তারে পাত্তাড়ি গুটোবার পরোয়ানা দিয়েছে। শেষে আশা ভরসা ছিল অসহায়ের সহায়, নিরুপায়ের উপায়, জীবনমৃতের বন্ধু কালকুট, বাবা সেটুকু চেঁচে-পুঁছে সাবাড় করে বসে আছেন! আর গণেশদাদার ঘটার বে'তে যে ভুটানী গামছাখানা পেয়েছিলুম—সেই-খানি চিরকুট নাম ধারণ করে ক্রোড়পত্র হিসাবে শর্ম্মার দোছোট হয়ে এতকাল বিরাজ করছিল; লাভের মধ্যে তোমার অন্নকুটের মহিলা মেলায় স্বাধীন জেনানার মান রাখতে সেখানি খুইয়ে এসেচি।

অ—কেন—কি হয়েছিল?

ন—কেবল ভূতেই বিরাজ মা, মানুষের খোঁজ রাখলে বা বর্ত্তমানে বিরাজ করলে, নারী-নিগ্রহটা দেখে চমকে যেতে। সেদিন দশ-বিশ হাজার সালঙ্কারা রাজকন্যে বন্যের মত অন্নকুটের কাঠগড়ায়, হাজার হাজার পুরুষের পাশা-পাশি, ঘেঁষাঘেঁষি, ঠাসাঠাসির ঘূর্ণিপাকে পোড়ে, লজ্জা, মান সম্ভ্রম খুইয়ে তোমার পোষ্যপুত্রদের কৃপায় কি লাঞ্ছনাই না ভোগ করেছিল। গয়নায় ত আর লজ্জা নিবারণ হয় না, তখন গরীবের গামছাখানি আর আরও দু'একটি বাবুর চাদর, তাদের রক্ষা করে। মা—নিজের জাত বলেও কি তাদের দিকে একটু চাইতে নেই, পয়সাও খেলে ভরাও ডুবুলে! এই দেখে প্রসাদের পিত্তেস উড়ে গেল, গামছা গচ্চা দিয়েই সরে পড়লুম।

তাই বলছিলুম মা—আমরা যদি দুঃখুর ফন্দি ফাঁদি—তা হলে দুনিয়া ভরাট হয়ে যায়—

অ—তাই ত বাবা—তোর দুঃখু শুনে যে বড় কষ্ট হচ্চে, আহা তোর গামছাখানিও গেছে! তা আমার ত নিজের কিছু নেই বাবা—এ ঘুনির ভেতর যা এসে পড়ে সেটা সেতো আর সেবায়েতের। কেউ একখানা খাট দিলে, তার ছারপোকাটি পর্য্যন্ত ভাগ করে নেয়। এ যা দেখচিস—এ ত আমার যাত্রার সাজ, থিয়েটারের মা সেজে বসে আছি। আজ যদি দেশে নিরাকারের উপাসনা জারি হয়, তা হলে আমাকে গভীর রাত্রে নগ্নবেশে গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে হবে। তবে একেবারে যে কিছুই আমি পাই না তা বললে বেইমানী হয়—ঘড়া, ঘটি, গেলাস, অনন্ত, বালা এসব ফাঁপা জিনিস এলে তাদের ফাঁপ্‌টা আমারই থাকে, তখন ঐ ফাঁকটা আমিই পাই, নিরেটের মধ্যে তুমি আর তোমার বাবা ছাড়া আমার বলতে ত কিছু দেখি না। তা এক কাজ কর্…মধ্যে আমার সব বড় বড় লক্ষপতি ভক্ত আছে, তাদের ঘরেই আমার প্রগাঢ় পসার-প্রতিপত্তি; কিন্তু তারা লাভ না খতিয়ে কাজ করে না, দু'পাঁচ হাজার পাবার অকাট্য আশা থাকলে দু'পাঁচ টাকা বার করতেও পারে। কিন্তু এখন সব ইংরিজী পড়েচে, স্বপ্নে কি বিশ্বাস করবে?

ন—কেন মা, এইত সব স্বপ্নাদ্য মাদুলী, ঔষধ বেশ চলচে, বিশ্বাস না করলে কি লোকে কেনে—

অ—সে কোন্ জাত কেনেরে পাগল! সে দরিদ্র ব্রাহ্মণ জাতই কেনে আর সরল স্বভাবের মূর্খ পাড়াগেঁয়েরাই কেনে। আমার ঐ সব ভক্ত জাতেরাই ত ঐ স্বপ্নগুলো পায়। যা হোক, আমি আমার এক ভক্তকে স্বপ্নে কিছু কবুল করাচ্ছি, তুই তার কাছে যা দেখি, বোধ হয় গামছার বদলে শাল পেতেও পারিস।

ন—তোমায় অত কষ্ট করতে হবে না মা, বড়-লোকের কাছে গরীবরা চিরকালই ওটা না চেয়েই পায়। ওটা আমার কোন পুরুষে অভ্যেস নেই—সহ্যও হবে না। এইবার নারদ এলে তার নামাবলী থেকে খানিকটে পাচার করে নেব, তা হলেই আমার চলে যাবে।

অ। আর যা করিস তা করিস, কিন্তু অমন কাজটি করিস নি, শেষে যেন মার্কামারা মহাপুরুষ সাজিস নি। ওটা এখন দেখচি মেয়েরাও সুরু করেচে।

ন। তবে মা, আমার কিছুই কাজ নেই, আমি বেশ আছি, তোমাকে আর ভাবতে হবে না। এখন আমাকে কেন ডেকেচ তা বল; বাবার দু' ছিলিমের ওক্তো উথড়ে গেল, দেরি হয়ে যাচ্চে—

অ। ঐ দেরি করবার উপায়ই ত আমি খুঁজচি। তোর সাহিত্যচর্চ্চার কথা শুনে আমি বড় খুশি হয়েচি; শুনেছি এ নেশা ধরলে পরিবারও পর হয়ে যায়। আর কিছুতে জ্ঞান থাকে না। জ্ঞান যে ছিল যদিও এমন বদনাম তোর কখনও শুনিনি; তবে তোর বাবাকে সময়মত গাঁজা খাওয়ানোয় কখন ভুল হতে দেখি নি, ঐটুকু ফরসা হয়ে গেলে—কতকটা ভরসা হয়। কোন দিন কি দম আটকে গে—আমার মাথাটা খাবে।

ন। তুমি মিছে ভয় করচ মা, বাবা ত মৃত্যুঞ্জয়—

অ। তা ত জানি—তাই ত এত চিন্তা; এখন বয়েস হয়েচে—যদি পথ আট্‌কে গে, না ইদিক না উদিক হয়ে কাট হয়ে থাকেন, সে কি বিভ্রাট্ বল দিকি! তার চেয়ে যে—

ন। ওঃ ব্বাবা,—উঃ সে কি বিটকেল ব্যাপার। ফ্যালাও দায়, ঘরে রাখাও দায়। ও অবস্থায় শাস্ত্রেও কোন ব্যবস্থা নেই, না আছে মন্ত্র না আছে শ্রাদ্ধ—

অ। বল্ দিকি বাবা—তুই ত এখন পণ্ডিত হয়েছিস, সবই জানিস বুঝিস। তাই বলছিলুম—তুই সাহিত্যচর্চ্চা বজায় রাখলে, ব্যাধিটা ক্রমে কমে আসবে; তোর আর ঘন ঘন যোগান দেবার সময় হবে না।

ন। কিন্তু মা—আমার যা কিঞ্চিৎ ছিল তা ত ফুরিয়ে ফেলেচি।

অ। সে কথা আমি শুনচি না; গঙ্গা যে গাল কাত করে হাসবে, শচী মুখ টিপে টিপে ঠোকর মারবে, সে আমার বড় লাগবে, তোকে একটা কিছু লিখে আমার নামে উৎসর্গ করতেই হবে। তাতে তোর বাপ-মা দু'জনেরই উপকার আছে।

ন। তোমার ত উপকার আছে, ঐ সঙ্গে আমারও ত দেনদার হওয়া আছে। কাগজের দর এখন অন্নের পাঁচ গুণ, তার উপর ছাপাই আছে। আর হাল ফ্যাশানের মলাটের হাটে আমার মত মাতব্বরকে চাট খেয়েই ফিরে আসতে হয়।

অ। সে জন্যে ভাবিস নি।

ন। তোমার ত মা—স্বপ্নই পুঁজি।

অ। তুই তখন দেখিস্ না।

ন। সেটা আমাকেই যেন দিয়ে বসো না।

অ। তুই আমাকে বিশ্বাস করেই দেখ্ না—

নন্দী ভাবিল—এ প্রমাণের যুগে বিশ্বাসের কথা যে শিক্ষিত সমাজে উপহাসের কথা, আমার সেকেলে মা'র তা খেয়ালই নেই। কিন্তু আর কথা চলিল না, নন্দীকে নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, মনে মনে নারদের মুণ্ডপাত করিতে করিতে চলিয়া আসিতে হইল।

২২—১—১৯১৭

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুরের অর্থে পরিচালিত ইসলাম সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা-কার্য্য পরিচালনা করিবার একটা ব্যবস্থা আছে। বিশ্বভারতী সেই নিধির (Trust Fund) রক্ষক ও পরিচালক। প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে ইহার পক্ষ হইতে কাজী আবদুল ওদুদকে বক্তৃতাদান করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। কাজী সাহেব তাঁহার বক্তৃতার বিষয় নির্ব্বাচন করেন 'হিন্দু-মুসলমান বিরোধ'। অনেক দিন পূর্ব্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত এই বক্তৃতা পাঠ করিবার সুযোগ হইয়াছিল; সেই বিরোধ যখন জটিল সমস্যায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়াও যখন সেই বিরোধের অবসান হইল না, তখন নূতন করিয়া সেই বইখানি আবার পাঠ করিলাম এবং তাহার একটা কথা আমার মনে গাঁথিয়া আছে।

ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজের প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ তাঁহাদের প্রতিবেশীর ভাব-চিন্তার, আশা-আকাঙ্ক্ষার গতি-পরিণতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবর রাখেন না। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত হিন্দুর সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সত্য, রূঢ় সত্য। দেড় শত দুই শত বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষিত হিন্দু এই বিষয়ে এতটা অজ্ঞ ছিলেন না; তাঁহাদের সমাজপতিগণ ইসলাম সংস্কৃতি, সভ্যতা, সাধনা সম্বন্ধে "মৌলবী"—পণ্ডিত—ছিলেন অনেকেই।

বর্ত্তমানে যে অজ্ঞতা দেখা যাইতেছে তাহার কারণ আছে। যেদিন হইতে এদেশে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বাহন হইল সেই দিন হইতে ফার্সী ভাষা শিখিবার প্রয়োজন শেষ হইয়া গেল; শিক্ষিত হিন্দুর মনে এই ভাষা শিখিবার জন্য কোন আগ্রহ রহিল না। ফলে প্রতিবেশী সমাজ দুইটির মনের মাঝখানে একটি কপাট পড়িয়া গেল, পাশাপাশি বাস করিয়াও আমরা পরস্পরের অপরিচিত রহিয়া গেলাম, হিন্দু মুসলমানের মনের ভাষা বুঝে না; মুসলমান হিন্দুর মনের ভাষা বুঝে না যদিও বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের মুখের ভাষা এক। একটি হিসাবে দেখিয়াছি যে, হিন্দু ও মুসলমান বাঙালী যে ভাষায় সাধারণতঃ কথা বলেন তার শতকরা ৮৫টি শব্দ এক—তাহা সংস্কৃত বা আরবী ফার্সী হইতে উৎপন্ন হইলেও। তবুও তারা পরস্পরকে আত্মীয় বলিয়া মনে করে না।

কাজী আবদুল ওদুদ এই বিষয়ে একটা উদাহরণ দিয়াছেন। ওহাবী আন্দোলনের কথা আমরা শুনিয়াছি। শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু তিতুমীরের কথা শুনিয়াছেন। তাহার "গুলি খা ডালা" এই মিথ্যা স্পর্দ্ধায় উপহাস করেন। ১৮৭০ সালের "অমৃত বাজার পত্রিকা"য় ওহাবী বিদ্রোহের ও ষড়যন্ত্রের কিছু কিছু বিবরণ আছে। কিন্তু এই উন্মাদনার দূর-প্রসারী ফলাফল বুঝিবার চেষ্টা ১৯১০ সালের পূর্ব্বে কেহ করেন নাই। সেই আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি, তাহার প্রকৃতি কি এবং তাহার পরিণতি কি, তৎসম্বন্ধে হিন্দুর মনে কোন কৌতূহল নাই; সেই আন্দোলন যে ভারতীয় মুসলিম গণমনকে প্রতিবেশী হিন্দুর নিকট হইতে দূরে লইয়া গিয়াছে এবং এই দূরত্বই যে পাকিস্থানের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আমরা বুঝি না। ওহাবী আন্দোলনের প্রবর্ত্তক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরবদেশের মরুভূমিতে আবির্ভূত হন। মুসলমান সমাজের মধ্যে ইসলামবিরোধী ভাব-চিন্তা ও রীতি-নীতি প্রবেশ করিয়া তাহাকে পৌত্তলিক সমাজের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। এই অনুভূতি ও বিশ্বাস হইতে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব তাঁহার সংস্কার-প্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। দরগায় বাতি জ্বালিয়া পীর-দরবেশের পূজা করা, মসজিদে অনুষ্ঠানের বাহুল্য, বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে ধার-করা মালা-জপ প্রভৃতি আচার ইসলাম ধর্ম্মের অনুমোদিত নয়। এই নববিধান অনুসারে বাংলাদেশে "সত্যপীরে"র বিবর্ত্তন ইসলামের ভাব ও আদর্শের বিরোধী, পৌত্তলিকতার পরিপোষক। মধ্যযুগে এই দুইটির সমন্বয়ের যে চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন ওহাবী আন্দোলন তাহা ব্যর্থ করিয়া দেয়।

এই বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান চিন্তানায়কগণের দুই-চারখানি বই পড়িয়াছি। ডক্টর বেণীপ্রসাদ ও ডক্টর সৈয়দ মামুদের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে চাই। তাঁহারা বলেন যে, এই সমন্বয় চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা ঠিক নয়, এবং ব্যর্থ হইলেও তাহা সাময়িক। কিন্তু এই কথায় ত আমরা সান্ত্বনা পাই না, যখন দেখি "পাকিস্থান" (পবিত্র স্থান) হইতে ঝাঁটাইয়া হিন্দু-শিখকে বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে, এবং ভারতেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে। পরস্পর এই রেষারেষির একটা কারণ আছে। সেই কারণটি খুঁজিয়া না পাইলে ভারত-রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে বাধা উপস্থিত হইবে। উপরোক্ত দুই জন পণ্ডিতের প্রতিপক্ষ পণ্ডিতও আছেন। তাঁহাদের মতে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের কার্য্যের ফলে। এই বিষয়ে একজন

মুসলমান পণ্ডিতের মত এই তথ্যের সমর্থন করে। শ্রীহট্ট শহরে একটি কেন্দ্রীয় "তমদ্দুন মজলিস" আছে, গত ১৯৪৯ সনের ২৬শে জুন তাহার বার্ষিক অধিবেশনে জনাব মোহাম্মদ আজরফ এম্‌-এ একটি অভিভাষণ পাঠ করেন। এই অভিভাষণের প্রথমেই দেখিতে পাই "তমদ্দুন" শব্দের ব্যাখ্যা :

"তমদ্দুন শব্দের অভিধানগত অর্থ নাগরিকতা। 'মদন' বা শহর শব্দ হইতেই তমদ্দুনের উৎপত্তি। শহরকে কেন্দ্র করিয়া যে কালচার গড়িয়া উঠে, তমদ্দুন বলিতে প্রধানতঃ তাহাকেই মনে করা হয়। সকল যুগেই, সকল দেশের সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক বলিয়া প্রাচীন গ্রামীণ সভ্যতা অপাংক্তেয় শ্রেণীর পর্য্যায়ে পরিণত হইয়াছে। আমাদের তমদ্দুন মজলিসে ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম্য সভ্যতারও পুনর্জীবনের সুযোগ থাকিবে বলিয়া তমদ্দুনকে আমরা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিব, এবং তমদ্দুন বলিতে নাগরিক ও গ্রাম্য সভ্যতা উভয়কেই স্বীকার করিব।"

এই অভিভাষণের মধ্যে আমরা যখন নিম্নোদ্ধৃত বাক্য-গুলি পাঠ করি, তখন কি করিয়া ডক্টর বেণীপ্রসাদ ও ডক্টর সৈয়দ মামুদের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা যায় তাহা বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ যখন মুসলিম সংস্কৃতির নামে ভারতবর্ষকে দু' ভাগ করা হইয়াছে এবং হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক সংস্কৃতির ধারক এই তত্ত্ব মুসলিম গণ-মনে দৃঢ় হইয়া আছে। জনাব মোহাম্মদ আজরফ এই পার্থক্য লইয়া কোন তর্ক তুলেন নাই বা কোনরূপ হা-হুতাশ করেন নাই। তিনি ইহা ইতিহাসের বিবর্ত্তনের একটি ফল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। "পাকিস্থান" প্রতিষ্ঠার পর তাহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। জনাব আজরফ বলিতেছেন :

"ভারতীয় ও মুসলিম সভ্যতার এই সংমিশ্রণে এক নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হইয়াছিল, এবং এই নব্য সংস্কৃতির পুরোহিতরূপে সম্রাট আকবর দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনার এই ধারাকে তাঁহার প্রপৌত্র দারাশেকো অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেবের নিকট শোচনীয় পরাজয়ে তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।"

"ভারত ইতিহাসে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সাফল্য সংস্কৃতির দিক দিয়া এক অভিনব বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে, তখন হইতেই ভারতীয় হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। আওরঙ্গজেব ইসলামের বিশুদ্ধ রূপ এদেশীয় মুসলমানের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তেমন সফলকাম না হইলেও পরবর্ত্তীকালে ওহাবী বিদ্রোহের সময় তাঁহার সেই সাধনা বিশেষভাবে সিদ্ধিলাভ করে। প্রকৃতপক্ষে আওরঙ্গজেবের সময় হইতেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুই-জাতি তত্ত্বে ভারত বিভক্ত হইয়া পড়ে।"

এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস বিচার করিলে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের একটা অর্থ করা যায়; এবং অন্ততঃ আড়াই শত বৎসর মুসলিম জনগণের মনে যে বীজ রোপিত ছিল তার সন্ধান পাওয়া যায়। ইংরেজ আমলে তাহা বিষ-বৃক্ষরূপে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায়। এই পর্য্যন্ত ইংরেজের দোষ। ভেদনীতি একটা রাষ্ট্রধর্ম্ম; ইংরেজ তাহা আবিষ্কার করে নাই। তবুও একজন বিদেশী, ফরাসী নাগরিকের চক্ষে এই নীতির উৎপত্তির ইতিহাস কি ভাবে ধরা দিয়াছিল, তাহা জানিয়া রাখা ভাল। পিরিউ তাঁর নাম। তিনি ১৯০০ সালের লাহোর কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন, এবং ভারতবর্ষের নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি আমাদের বর্ত্তমান বিবর্ত্তনের একটা ইতিহাস লেখেন; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই নিবন্ধের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইংরেজ ও মুসলমানের মিতালি সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যার সাহায্যে গত ৫০ বৎসরের ইতিহাস নূতনভাবে বুঝিতে পারা যায়। সেই নিবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

"আজকাল ভারতবর্ষে মুসলমান সমস্যাই একটি প্রধান সমস্যা। জন-সংখ্যার পঞ্চমাংশ লোক কংগ্রেসের প্রতিকূল কেন, তার কারণ স্পষ্টই রহিয়াছে। মুসলমানেরা এখনও হিন্দুদিগকে বিজিত প্রজার জাতি বলিয়া মনে করে। মুসলমানেরা দেখিতেছে যে, হিন্দুরা অন্যপ্রকার যুদ্ধক্ষেত্রে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাজারে, সরকারী চাকুরীতে জয়লাভ করিয়া তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইয়াছে।...এই বিপদ নিবারণের একমাত্র উপায় মুসলমানদের অপরিসীম অজ্ঞতাকে একেবারে ধ্বংস করা। বিপদ দেখিয়া সর্ব্বপ্রথমে যিনি চীৎকার করিয়া নিজের জাত-ভাইকে সাবধান করিয়া দিলেন তাঁর নাম সৈয়দ (অর্থাৎ মহম্মদের উত্তরাধিকারী) আহম্মদ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আলিগড়ে তিনি একটি কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। কলেজটি বেশ উন্নতিলাভ করিতেছিল। এমন সময় খবর আসিল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দুরা কেমন অগ্রসর হইতেছে। যাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছে তাহাদের পক্ষে সমূহ বিপদ। সৈয়দ এক লাফে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মুসলমানেরা অনেকেই তাঁহার অনুগামী হইলেন।

"ইংরেজ ভাল খেলোয়াড়, টপ করিয়া গোলাটা ধরিয়া ফেলিল। বিবাদ উস্‌কাইয়া দিবার এমন সুযোগ তাহারা কি ছাড়িতে পারে?...যদি অভিজ্ঞতা হইতে ইংরেজ না জানিয়া থাকে যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রচণ্ড দাবানল এখন সুধু ছাইচাপা আছে মাত্র, তাহা হইলে তাহারা প্রচণ্ড ধর্ম্মোন্মত্ততা জাগাইয়া তুলিবার ঝুঁকি স্বীকার করিয়াও এইরূপ বিবাদ বাঁধাইবার চেষ্টা করিবে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।...আলিগড় কলেজে ইংরেজ মুসলমানের মধ্যে একটা বুঝা-পড়া হইল।"

"আমি যদি ঠিক বুঝিয়া থাকি, জাতি, ধর্ম্ম, অহঙ্কার, ঈর্ষা, বিশেষতঃ ক্ষণিক স্বার্থ-বিরোধ এই সব কারণেই উঁহারা (মুসলমানেরা) কংগ্রেসে যোগ দিতে বিরত হইয়াছে।"

এই ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সত্য হইলেও ইহা বাহ্য। বর্ত্তমানে যে অঞ্চল উত্তর প্রদেশ বলিয়া পরিচিত সেখানে ভারত বিভাগের পূর্ব্বে সরকারী কোন কোন বিভাগে মুসলমানেরা সংখ্যার অতিরিক্ত পদসমূহ অধিকার করিত। তাহারা ছিল লোকসমষ্টির শতকরা ১৪ ভাগ মাত্র। কিন্তু পুলিস বিভাগে ও রেজিষ্ট্রি বিভাগে তাহারা শতকরা ৪'০২ ভাগের অধিকারী ছিল। "ক্ষণিক স্বার্থ বিরোধ" ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কারণ নয়। প্রকৃত কারণ সংস্কৃতির সংঘর্ষ। সাত শত বৎসরের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায় ভারতকে স্বকীয় করিতে পারিল না। বাঙালী মুসলমান কবি বুলবুল,

গোলাপ, উট সম্বন্ধে কবিতা লেখেন। বাঙালী আলেম প্রধানগণ মনে করেন যে, নবাবদের আমলেও বাংলাদেশে ইসলামের আদর্শ আচরিত হয় নাই; সেইরূপ ভাবাবেশেই সুপ্রসিদ্ধ উর্দ্দু কবি আলতাফ হোসেন হালি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা ভারতবর্ষে স্থিতিলাভ করিতে পারিল না, কারণ তাহাদের প্রতিবেশী সমাজ মনে করে যে তাহারা অতিথিরূপে আসিয়া অনেক দিন রহিয়া গিয়াছে। বাঙালী মৌলানা আক্রাম খাঁ প্রায় তের বৎসর পূর্ব্বে মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি রূপে বলিয়াছিলেন—নবাবদের আমলে তাঁহাদের বাংলা ভাষার প্রতি প্রীতি ইসলামের মর্ম্মার্থ প্রচারে সাহায্য করে নাই; ফলে, বাঙালী মুসলিম সম্প্রদায় প্রায় পৌত্তলিক-মনোভাবাপন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুরের শরিয়ৎ-উল্লা ও বেরেলীর সৈয়দ আহাম্মদের কল্যাণে সেই বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ আউল-বাউল, পীর-ফকিরের চেষ্টায় হিন্দু-মুসলিমের যে সমন্বয় চেষ্টা চলিয়াছিল তাহা ইসলাম-বিরোধী।

আমি এই প্রবন্ধে রাজনীতির তর্ক-বিতর্ক এড়াইয়া গিয়াছি। কারণ আমি বিশ্বাস করি ইহা বাহ্য। অন্তরের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলে, তাহা প্রকাশ প্রায় আমাদের কথা-বার্ত্তায়, আচার-আচরণে। হিন্দু-মুসলিম সমস্যা রাজনৈতিক ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রশ্ন নয়। তাহা হইলে "পাকিস্থান" প্রতিষ্ঠার পরে এই সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইত। পশ্চিম পাকিস্থান হিন্দু-শিখ-শূন্য হইয়াছে; পাকিস্থান রাষ্ট্রের সেই অংশ মানসিক ও সাংস্কৃতিক স্থৈর্য্যলাভ করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছে; পূর্ব্ব পাকিস্থানের হিন্দুদের উৎসাদিত করিতে পারিলে সেই অঞ্চলও মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিবে—যাহা সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের নবাবী আমলে হয় নাই। এরূপ আত্মকেন্দ্রিক সংগঠনের চেষ্টা সকল সমাজকেই করিতে হয়। সূতা আশ্রয় করিয়া যেমন মিশ্রি দানা বাঁধিয়া উঠে, সেইরূপ একটা বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া সমাজ গড়িয়া উঠে। ভাল হউক, মন্দ হউক, পাকিস্থান ইসলামকে অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। ভারতরাষ্ট্র কোন্ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে তাহা তার প্রজাপুঞ্জের বোধগম্য বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ ভারতরাষ্ট্র পাকিস্থানের পাশে, উগ্রপন্থী "ধার্ম্মিক" রাষ্ট্রের পাশে, শান্তিতে থাকিতে পারিবে না—যেমন পারিতেছে না সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কম্যুনিষ্ট সোভিয়েট রাষ্ট্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পার্শ্বে স্বস্তিতে বাস করিতে। এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণ কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থান রাষ্ট্রের বিরোধ জ্ঞাতি-বিরোধের মত অপরিহার্য্য। উভয় রাষ্ট্রই এই আশঙ্কার তাড়নায় সমর-সজ্জায় নিজেদের নিঃশেষ করিবে, ইহাই ভবিতব্য।

কবি

শ্রীকালিদাস রায়

"তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী"

গভীর রাতে কবির সাথে দেখা,
অন্যমনা ঘুরছে কবি একা
নদীর ধারে ধারে হেরি।
হয়ে গেছে ফিরতে দেরী
গ্রামান্তরে ছিল আমার ঠেকা।

শুধাই তায় "একলা এত রাতে
ঘুরছ কেন হেথায় নিরালাতে?"
চমকে উঠে বললে কবি,
"এইত সময়, স্তব্ধ সবি
বিশ্ব এখন কয় কথা মোর সাথে।

দিনের বেলায় সবই মায়া ফাঁকি,
রাতের বেলায় ফোটে আমার আঁখি,
কাজ তোমাদের সাজ যখন
আমার কাজের সুরু তখন
সবাই ঘুমায় তখন জেগে থাকি।"

অন্যমনা ঘুরছে কবি একা,
পড়েছি ত কবির সবই লেখা,
চিনি নি তায় কাব্য প'ড়ে
আজকে চিনি যেমন ক'রে,
আসল রূপটি আজকে হ'ল দেখা।

ভারতীয় সেচ-বিদ্যায় বাংলার স্থান

শ্রীকনকভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, এ-এম-আই-ই

অনেকেই হয়ত একথা জানেন না যে, ভারতবর্ষ সেচ-বিদ্যায় সমগ্র জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। শুধু সেচের জমির পরিমাণ দেখিলেই তাহা অনেকটা বুঝা যাইবে। এই বিষয়ে ভারতবর্ষের পরেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। আয়তনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষের প্রায় দ্বিগুণ, কিন্তু ভারতীয় সেচের জমি যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় তিন গুণ। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর কমবেশী সাত কোটি একর জমিতে জলসেচ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র বাদ দিলে, ভারতবর্ষের সেচের জমির পরিমাণ পৃথিবীর অপর যে-কোনও প্রগতিশীল দশটি দেশের সমষ্টিগত সেচের জমির তুলনায় বেশী হইবে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর অগ্রগামী দেশগুলির তুলনায় নানা দিক দিয়া পশ্চাৎপদ হইলেও, সেচ-বিষয়ে কেমন করিয়া এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে—প্রয়োজনের তাগিদ, বহু বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনা, সরকারী সাহায্য, ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের কৃতিত্ব ও অধ্যবসায়, বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনায় সাহসিকতার সহিত মূলধন বিনিয়োগ ও অতীতের পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতা—এই সকল একত্রে মিলিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে সেচ-বিষয়ে এইরূপ উৎকর্ষলাভ সম্ভব হইয়াছে।

যাহা হউক, ভারতবর্ষের সেচন বিষয়ের বিশদ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের এই প্রগতিমূলক অভিযানে বাংলাদেশের স্থান কোথায় তাহাই আমার আলোচ্য।

নিম্নের তালিকা হইতে দেখা যাইবে, ভারতবর্ষে যে পরিমাণ জমিতে জল সেচন করা হয়, তন্মধ্যে বাংলাদেশের স্থান অতি নগণ্য,—

প্রদেশের নাম	প্রদেশের আয়তন (১০ লক্ষ একর)	বাৎসরিক আবাদী জমির পরিমাণ (১০ লক্ষ একর)	মোট জমির তুলনায় আবাদী জমির পরিমাণ (শতাংশে)	বাৎসরিক সেচের জমির পরিমাণ (১০ লক্ষ একর)	আবাদী জমির তুলনায় সেচ-জমির পরিমাণ (শতাংশে)	মোট জমির তুলনায় সেচ-জমির পরিমাণ (শতাংশে)
সিন্ধু	৩০	৬	২০	৬	১০০	২০
পঞ্জাব	৬১	৩২	৫২	১৯	৬০	৩১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২৩	৩	১৩	১	৪৩	৫
যুক্তপ্রদেশ	৬৮	৪৫	৬৭	১২	২৭	১৮
মাদ্রাজ	৮০	৩৭	৪৬	১০	২৬	১২
উড়িষ্যা	২২	৭	৩৪	২	২২	৬
বিহার	৪৪	২৪	৫২	৫	২২	১২
মহীশূর	১৯	৭	৩৫	১	১৬	৬
বাংলাদেশ (অবিভক্ত)	৪৯	৩০	৬০	২	৬	৪

এই তালিকা হইতে দেখা যাইবে, অবিভক্ত বাংলায় মোট জমির প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ আবাদ হইত। একমাত্র যুক্তপ্রদেশ ব্যতীত অন্য কোনও প্রদেশে মোট জমির তুলনায় আবাদী জমির পরিমাণ এত বেশী নহে। অথচ মোট জমির তুলনায় সেচের জমির পরিমাণ বাংলাদেশে মাত্র শতকরা ৪ ভাগ এবং মোট আবাদী জমির তুলনায় সেচের জমির আয়তন মাত্র শতকরা ৬ ভাগ। উক্ত তালিকার অন্যান্য প্রদেশগুলি এই বিষয়ে বাংলাদেশের অপেক্ষা অনেকখানি প্রগতিশীল। এখানে একটি বিষয় জানিয়া রাখা দরকার যে, উল্লিখিত তালিকায় বাংলাদেশে যে বাৎসরিক ২০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে সকল প্রকার সেচের জমিই ধরা হইয়াছে; অর্থাৎ পুষ্করিণী, কূপ, নদী, নালা, খাল সরকারী ব্যবস্থাধীনে এবং বেসরকারী প্রচেষ্টার সকল প্রকার জমিই এই হিসাবের অন্তর্গত। শুধু যদি সরকারী প্রচেষ্টার কথা বলা হইত তাহা হইলে সেচের জমির পরিমাণ অনেকটা কমিয়া যাইত। অবিভক্ত বাংলায় সরকারী প্রচেষ্টায় যে সকল জমিতে সেচ-প্রথা বিদ্যমান ছিল, তাহার সবটাই ছিল পশ্চিম বাংলায়। বর্ত্তমানে পশ্চিম বাংলার মোট জমি, আবাদী জমি ও সরকারী সেচ-ব্যবস্থাধীন জমির পরিমাণ তুলনা করিলে দেখা যাইবে—যদিও অবিভক্ত বাংলার সরকারী প্রচেষ্টার অন্তর্গত সকল সেচের জমিই ছিল পশ্চিম বাংলায়, তথাপি মোট জমি অথবা মোট আবাদী জমির তুলনায় তাহার পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম :

প্রদেশের নাম	মোট জমির পরিমাণ (১০ লক্ষ একর)	মোট আবাদী জমির পরিমাণ (১০ লক্ষ একর)	মোট জমির তুলনায় আবাদী জমির শতকরা পরিমাণ	সরকারী ব্যবস্থাধীন সেচের জমির পরিমাণ (১০ লক্ষ একর)	আবাদী জমির তুলনায় সরকারী ব্যবস্থাধীন সেচের জমির শতাংশ	মোট জমির তুলনায় উক্ত সেচের জমির শতকরা পরিমাণ
পশ্চিম বাংলা	১৮	১৩	৭২	০·২	১·৬	১·১

সিন্ধু ও পঞ্জাবের সেচের জমির সবটুকুই সরকারী প্রচেষ্টার ফল, অর্থাৎ ঐ দুইটি প্রদেশে যথাক্রমে মোট আবাদী জমির শতকরা ১০০ ভাগ ও ৬০ ভাগ জমিতে সরকারী প্রচেষ্টার ফলে সেচ সম্ভবপর হইতেছে। আর পশ্চিম বাংলায় অনুরূপ ক্ষেত্রে মাত্র শতকরা ১'৬ ভাগ জমি সরকারী তত্ত্বাবধান লাভ করিতেছে। অতএব দেখা যায় যে, যে সরকারী সমর্থন ও প্রচেষ্টার ফলে ভারতবর্ষ সামগ্রিক ভাবে বিশ্বের দরবারে সেচ-বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে, বাংলাদেশে সেই সাহায্য, সমর্থন ও অর্থবিনিয়োগ যথোপযুক্ত প্রসারলাভ করে নাই। বৃহৎ রেলওয়ে ও রাস্তার মত বৃহদাকার সেচ-পরিকল্পনাও সরকারী প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে। সেচ-পরিকল্পনার সহিত নদনদীর গতিবিধি, সাধারণ জল নিকাশ-ব্যবস্থা প্রভৃতি এমন কতকগুলি সমস্যা জড়িত, যাহার কোনও স্থানীয় সমাধান বাঞ্ছনীয় নহে। বেসরকারী প্রচেষ্টায় কোনও স্থানীয় সেচ-ব্যবস্থা করিতে গেলে হয়ত পরে দেখা যাইবে, তাহা অপর কোনও স্থানীয় পরিকল্পনার পরিপূরক না হইয়া প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক স্থানের সমাধান হয়ত অপর স্থানে সমস্যা সৃষ্টি করিবে। এই সকল কারণেই সেচ-পরিকল্পনায় সরকারী সমর্থন এবং সামগ্রিক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিগত ছোটখাটো সেচ-ব্যবস্থা অবশ্য বাংলাদেশে বরাবরই চলিয়া আসিয়াছে এবং আসিতেছে,—যেমন পুষ্করিণী, ডোবা প্রভৃতি হইতে জল তুলিয়া রবিশস্যে সেচন অথবা ছোট ছোট নালায় বাঁধ দিয়া জল সঞ্চয় করিয়া বোরো অথবা হৈমন্তিক ধান্যে জলের যোগান দেওয়া ইত্যাদি। পুষ্করিণীতে জল সংরক্ষণ করিয়া মহাকর্ষের সাহায্যে চতুষ্পার্শ্বস্থ ধান্যের জমিতে অথবা রবিশস্যের ক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে এককালে বহুলপ্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে সংস্কারের অভাবে ঐ সকল পুষ্করিণী প্রায় বুজিয়া আসিয়াছে এবং ফলে এখন উহাদের ব্যবহারও কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু উক্ত অঞ্চলের মাঠে, ঘাটে অসংখ্য পুষ্করিণীর জরাজীর্ণ অস্তিত্ব দেখিয়াই বুঝা যায় যে, কোন কালে ঐ সকল অঞ্চলে পুষ্করিণীর সাহায্যে জলসেচের প্রচুর আয়োজন ছিল। এখন উপযুক্ত জলসেচন-ব্যবস্থার অভাবে বীরভূম, বাঁকুড়া অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। বাৎসরিক বারিপাত অপ্রচুর নহে, কিন্তু জমির পৃষ্ঠদেশ উঁচুনীচু হওয়ায় জলসংরক্ষণের স্বাভাবিক সুযোগের অভাব। এইজন্য বৃষ্টির জল বিনা বাধায় নীচু জমিতে, নদী-নালায় বহিয়া যায়; শস্যোৎপাদনের কোন সাহায্যই করে না। এককালে এতগুলি পুষ্করিণী সংস্কার সরকারী সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা,—পুষ্করিণী সংস্কারের জন্য পূর্বতন ইংরেজ সরকারের আমলে "পুষ্করিণী উন্নয়নে"র জন্য একটা আইন পাস হইয়াছিল এবং তাহার সাহায্যে ঐ সকল অঞ্চলের কতকগুলি পুষ্করিণীর সংস্কারও হইয়াছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। যে উদ্যম, আন্তরিকতা এবং অর্থব্যয় সিন্ধু, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের সেচব্যবস্থাকে সমগ্র জগতে শ্রেষ্ঠ আসনে উন্নীত করিয়াছে, বাংলাদেশের পূর্বেকার গবর্ণমেণ্টের আমলে সেই ধরণের আগ্রহ, দরদ ও অকুণ্ঠ অর্থব্যয় কোনকালেই দেখা যায় নাই।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সিন্ধু পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাভাবিক বারিপাত এতই কম যে সেখানে নদীর জলের সাহায্যে সেচব্যবস্থা না করিলে আশানুরূপ ফসল হইত না। প্রয়োজনের তাগিদই ঐ সকল অঞ্চলে সেচব্যবস্থার প্রেরণা যোগাইয়াছে। কিন্তু বাংলা দেশের বারিপাত, আবহাওয়া, অবস্থান প্রভৃতি অনেকটা অনুকূল বলিয়াই এখানে সেচের প্রয়োজন তেমন অনুভূত হয় নাই এবং এই কারণেই বাংলাদেশের সেচ-ব্যবস্থার স্থান ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সর্বনিম্নে অথবা অতি নিম্নে। এই ধরণের প্রশ্ন ও মীমাংসা আপাতত সমীচীন মনে হইলেও শেষ পর্যন্ত ইহা যুক্তিসহ নহে।

জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং বাদ দিলে পশ্চিম বাংলার স্বাভাবিক বারিপাত বাৎসরিক ৫০ ইঞ্চি হইতে ৭০ ইঞ্চির মধ্যে। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার বারিপাত যথাক্রমে ১৪২ ইঞ্চি এবং ১২২ ইঞ্চি। কিন্তু এই বারিবর্ষণ এতই অনিয়মিত যে প্রায় প্রতি বৎসরই কোন-না-কোন অঞ্চলে অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি লাগিয়াই আছে।

১৯৪০ সালের বঙ্গীয় রাজস্ব কমিশনের (ফ্লাউড কমিশন) রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ প্রায় ২,৬১১ বর্গমাইল। অতএব পতিত জমির আয়তন মোট আবাদযোগ্য জমির প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ। এই আবাদযোগ্য পতিত জমিতে চাষ করিতে পারিলে যে ধান্য উৎপাদন হইতে পারে, তাহার বাৎসরিক মূল্য বর্তমান বাজারে কম করিয়া ধরিলেও প্রায় ২৫ কোটি টাকা। অথচ এই বিরাট সম্ভাবনা সত্ত্বেও এত আবাদযোগ্য জমি পতিত রহিয়াছে কেন? এই প্রশ্নের সদুত্তর পাইতে হইলে অনেকগুলি আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। ১৯৪১ সনের লোকগণনা অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ছিল ৭৫৬ জন। বর্তমানে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের আগমনে ঐ জনসংখ্যা বাড়িয়া প্রতি বর্গমাইলে প্রায় নয় শতের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। যে দেশে জনবসতি এত ঘন সেখানে কেমন

করিয়া এত জমি পতিত ফেলিয়া রাখা হয়। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে পশ্চিম বাংলার গড়পড়তা লোকসংখ্যা এত অধিক হওয়া সত্ত্বেও এখানে কৃষি-মজুরের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান এমন কি হুগলী জেলাতেও অনেক ক্ষেত্রে ধান্য রোপণ ও ফসল কাটার সময় বহিরাগত সাঁওতাল-মজুরদের উপর বিশেষ রূপে নির্ভর করিতে হয়। কৃষি-মজুরের অভাব এবং স্থানীয় চাষীদের শ্রমবিমুখতা অথবা তাহাদের ম্যালেরিয়া-জর্জর দেহের অক্ষমতা—কিছু জমি পতিত অবস্থায় থাকার একটা কারণ ত বটেই; তবে ইহা গৌণ কারণ। মুখ্য কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে, এই পতিত জমির অধিকাংশই হয় অতিরিক্ত জলের চাপে ডুবিয়া যায়; অথবা কোনও কোনও পতিত জমির নৈসর্গিক অবস্থানই এমন যেখানে জলের অভাবে চাষ-আবাদ সম্ভব হইতেছে না। ইহা ব্যতীত যে সকল জমি নিয়মিত আবাদ হইতেছে সেখানেও জল-সরবরাহ ও জল-নিষ্কাশনের সুব্যবস্থার অভাবে ষোল আনা ফসল প্রায়ই হইতেছে না। কোথায়ও ছয় আনা, কোথায়ও আট আনাতেই চাষীকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

জল-সেচ ও জল-নিকাশ বাংলার চাষ-আবাদের ক্ষেত্রে কত প্রয়োজনীয় তাহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্তও তেমন ব্যাপক ভাবে অনুভূত হয় নাই। এই শতাব্দীর শেষ পর্যায়েই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকার বন্দনা-গীতি গাহিয়াছিলেন:

··সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্···

সেই যুগে দেশের জনসংখ্যা ছিল কম। নদনদীগুলির, বিশেষতঃ ভাগীরথী-অববাহিকার নদীনালাগুলির অবস্থাও ছিল বর্তমান অপেক্ষা অনেক উন্নততর। মাথাপিছু চাষের জমির পরিমাণও ছিল বেশী। কাজেই পতিত জমি থাকিলেও, অথবা সেচের অভাব কিম্বা জলের চাপ থাকিলেও তাহা দেশের খাদ্যসংস্থান অথবা আয়ব্যয়ের দিক দিয়া আজকার মত এমন জটিল সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় নাই। 'বন্দেমাতরম্' রচিত হওয়ার পরে প্রায় সত্তর বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিল। ইহার মধ্যে দেশের নদীনালাগুলির আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। ভাগীরথী অববাহিকায় যে স্বাভাবিক জল সেচ হইত, নদীনালাগুলি পলি পড়িয়া বুজিয়া যাওয়ায় সেখানে এখন সেচ-সমস্যা ও জল-নিকাশ দুই-ই মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। আগেকার যুগের জাতীয় প্রয়োজন অপেক্ষা বর্তমান যুগের প্রয়োজনের তাগিদ বাড়িয়াছে অনেক বেশী। অথচ সেই প্রয়োজন মিটাইবার সুযোগ পশ্চিম বাংলায় পূর্বেকার তুলনায় কমিয়া যাইতেছে। যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেচ, জলনিকাশ, বন্যা-নিরোধ, জলপথ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই অধিকতর অনুভূত হইতেছে। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের পূর্বতন গবর্ণমেণ্টের সেচ-সম্বন্ধে অব্যবস্থা অথবা ভুল ব্যবস্থা, অমনোযোগিতা, অবহেলা, অর্থ-বিনিয়োগে কার্পণ্য ইত্যাদি ত্রুটিগুলি সাধারণের সমালোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ বাংলাদেশে সেচ ও জল-নিষ্কাশনের যে সকল সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার কারণ অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে অনেক ক্ষেত্রেই এই সকল সমস্যা স্বতঃস্ফুরিত নহে, কোন প্রাকৃতিক সংঘাতেও সৃষ্ট হয় নাই। মানুষেই ভুল করিয়া শিব গড়িতে বানর গড়িয়াছে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সুব্যবস্থা করিতে গিয়া অব্যবস্থা করিয়াছে, এক সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া অপর জটিলতর সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। আজ সমস্ত পশ্চিমবাংলা সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।

একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। ১৮৫৭ সনে সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা। ঐ ঘটনা হইতে তদানীন্তন ইংরেজ সরকার বুঝিতে পারেন যে, এই দেশে রাজত্ব করিতে হইলে সর্বাগ্রে তাহাদিগকে দেশের অভ্যন্তরে দ্রুত সৈন্যচলাচলের উপযোগী রাস্তাঘাট নির্মাণ করিতে হইবে এবং যে সকল রাস্তাঘাট রহিয়াছে, সেগুলির আমূল সংস্কার ও যাবতীয় ত্রুটির সংশোধন করিতে হইবে। এদিকে প্রায় ১৮৫১ সন হইতেই ভারতবর্ষে রেলওয়ের প্রবর্তন সুরু হইয়াছিল। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম তখন ছিল ইংরেজ সরকারের সৈন্যসংরক্ষণের প্রধান ঘাঁটি এবং সামরিক আয়োজনের প্রাণকেন্দ্র। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইন ছিল কলিকাতা এবং ভারতের অন্যান্য কেন্দ্রের যোগাযোগের একটি প্রধান ব্যবস্থা। কিন্তু ১৮২৩ এবং ১৮৫৫ সনের দামোদর-বন্যার অভিজ্ঞতা হইতে ইংরেজ সরকার বুঝিতে পারেন যে, কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইন, এবং গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দামোদর বন্যার স্রোতে তৃণ-খণ্ডের মত ভাসিয়া যাইতে পারে। এই অভিজ্ঞতা হইতে তদানীন্তন রাজ-পুরুষদের একান্ত চিন্তনীয় হইয়া দাঁড়াইল কেমন করিয়া দামোদরের বন্যা হইতে তাহাদের কায়েমী স্বার্থের ধ্বজা রেলওয়ে লাইন, জি. টি. রোড ও কলিকাতার দুর্গ-প্রাকার রক্ষা করা যায়। কমিশন বসিল, সামরিক ইঞ্জিনীয়ারদের ডাকা হইল, সলা-পরামর্শ চলিল। বর্দ্ধমানের মহারাজার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া স্থির হইল, দামোদর-বন্যার জল যাহাতে ভবিষ্যতে কোন অবস্থায় আর বর্ধমান,

হাওড়া ও হুগলী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে দামোদরের বাম তীর দিয়া প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য বরাবর দৃঢ় বাঁধ নির্মাণ করিতে হইবে। যেই কথা সেই কার্য্য। ১৮৬২ সালের মধ্যেই অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া প্রায় শত মাইল দীর্ঘ দামোদর-বাঁধ তৈরি করা হইল। এই বিশালকায় সুদীর্ঘ বাঁধকে বাংলাদেশের চীনের প্রাচীর বলা চলে। কিন্তু এই যে বিপুল প্রচেষ্টা, অর্থব্যয়, পরিশ্রম, এই সব করা হইল কার জন্য? খতিয়ান করিলে দেখা যাইবে, দামোদর বাঁধ পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের যত অনিষ্ট-সাধন করিয়াছে আর কোনও একক পরিকল্পনাই এতটা ক্ষতি করিতে পারে নাই।

একথা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, দামোদর-বন্যা দেশে একটা বিভীষিকার মত আসিয়া বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিত। কিন্তু ঐ জাতীয় অনিষ্টকর বৃহৎ বন্যা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল না। দশ-বিশ বৎসরে এক-আধবার মারাত্মক বন্যা আসিয়া দেশের কোন কোন অঞ্চল বিধ্বস্ত করিয়া দিত। তবে সেই অনিষ্টের পরিমাণ বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক কম ছিল; কারণ তখন বরাবর সুদৃঢ় বাঁধ না থাকায় বন্যার জল নদীর তীরে বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িত এবং ফলে জলের গতিবেগ ও গভীরতা বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক কম হইত। কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে বাঁধ একবার ভাঙিলে, যে রাস্তায় তীব্র জলস্রোত এক-বার চলার পথ করিয়া লয়, সেই পথে অথবা আশে-পাশে কিছু আর থাকে না। ঘর, বাড়ী, মাঠ, ঘাট, শস্যক্ষেত্র, রেলওয়ে লাইন—সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই জাতীয় অনিষ্টকর বন্যা যাহা কালেভদ্রে এক-আধবার আসিত, তাহা বাদ দিলে, প্রতি বৎসরেই দামোদর নদে ছোট ছোট বান ডাকিত। এই বানের জলের উপর নির্ভর করিয়া দেশের ধানচাষ হইত। জমিতে পলি পড়িত, পুষ্করিণী খাল বিল ভর্ত্তি হইয়া অসময়ে পানীয় জল সরবরাহ করিত এবং রবিশস্যের সেচের ব্যবস্থা বজায় রাখিত। ইহা ছাড়া বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় প্রবাহিত কতক-গুলি স্বাভাবিক নদী—যেমন বাঁকা, গাঙ্গুর, বেহুলা, ধুসী, ইল্‌সুরা, ঘীয়া, কুন্তী, জুলকীয়া, কানানদী, কানাদামোদর, কৌশকী প্রভৃতি দামোদরের বন্যাজলে সঞ্জীবিত হইয়া দেশের সঞ্চিত আবর্জ্জনা ধুইয়া মুছিয়া লইয়া যাইত। এই নদীগুলি দামোদরের বন্যাজল বহিয়া শেষপ্রান্তে ভাগীরথীতে ঢালিয়া দিত। ইহার ফলে ভাগীরথীর পলি কাটিয়া যাইত এবং ভাগীরথী ও যমুনা, সরস্বতী ইত্যাদি তাহার শাখা-প্রশাখা নদীগুলি নবজীবন লাভ করিত।

এই স্বাভাবিক সুযোগের অধিকারী ছিল বলিয়াই, বর্দ্ধমান জেলা তখন স্বাস্থ্য ও সম্পদে বাংলাদেশে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল। ক্রমবর্দ্ধমান ঐশ্বর্যের প্রতীক বলিয়া জেলার প্রধান শহরের নাম হইয়াছিল বর্দ্ধমান।

কিন্তু এই সহজ সম্পদ, স্বাস্থ্য সকলই বৃথা হইয়া গেল কূটবুদ্ধি ইংরেজ সরকারের স্বার্থের প্ররোচনায়। তাহারা দামোদর-বন্যার সমূহ ক্ষতিটাই লোককে বুঝাইয়া দিল, লাভটার দিকে নজর দিয়া কেউ দেখিয়াও দেখিল না বা দেখাইল না। তখনও দেশে জনমত তেমন গড়িয়া উঠে নাই। মূক জনসাধারণ দামোদরের প্রস্তাবিত বাঁধ ভাল কি মন্দ হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিবারও অবসর পাইল না। বিশেষ করিয়া তখন কোনও সরকারী পরিকল্পনা সম্বন্ধে সাধারণের মতামত গ্রহণের রেওয়াজ ছিল না। যাহারা সরকারী ভাঁওতায় ভুলিল, তাহারা বুঝিল 'ভালই হ'ল, বন্যার উৎপাত থেকে বাঁচা গেল। নিশ্চিন্তে ঘর-দোর নিয়ে থাকা যাবে।' যে আসল কথা বুঝিল, সে রাজরোষের ভয়ে প্রতিবাদ করিল না। এই গেল মানুষের বুঝাবুঝির কথা—যেখানে রাজরোষের ও লোকনিন্দার ভয় আছে, আরও অনেক কিছু চিন্তা-ভাবনার অবসর আছে। কিন্তু প্রকৃতির দরবারে ত এই সকল লৌকিক বাধা-বিপত্তির, দ্বিধা-সঙ্কোচের, ভুল-ভ্রান্তির স্থান নাই। সেখানে কোন ভুলের, কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষমা নাই। সামরিক ইঞ্জিনীয়ারের পরামর্শে ইংরেজ সরকার দেশবাসীর বুকের উপর বাঁধের যে জগদ্দল পাষাণ চাপাইয়া দিল, প্রকৃতি সুদে আসলে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। বাঁধ নির্ম্মাণ শেষ হইয়া তখনও দশ বৎসর অতিক্রান্ত হয় নাই। ইতিমধ্যেই দামোদরের বাঁধের সংরক্ষিত এলাকায় হাহাকার উঠিল। ম্যালেরিয়া রোগ মহামারীর আকারে দেখা দিয়া সমগ্র বর্দ্ধমান বিভাগে প্রচুর লোকক্ষয় করিতে লাগিল। দশ বৎসরের মধ্যে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এই মারাত্মক ব্যাধিতে প্রাণত্যাগ করিল। দামোদর-বাঁধের পূর্বে ম্যালেরিয়া কি জিনিষ তাহা কেহ জানিত না। বর্দ্ধমান বিভাগে ইহা প্রথম প্রকাশ পায় বলিয়া এই জ্বরকে তখন 'বর্দ্ধমান জ্বর' (Burdwan Fever) বলিত। এদিকে দামো-দরের বন্যাজলের অভাবে চাষ-আবাদ নষ্ট হইল, স্বাভাবিক পলিসারের অভাবে জমির উর্বরাশক্তি কমিয়া গেল। পানীয় জলের অভাব অতি তীব্র আকারে দেখা দিল। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে, খাদ্য-সংস্থানের অভাবে, পানীয় জলের অভাবে বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামগুলি একে একে জন-শূন্য হইয়া শ্মশানে পরিণত হইতে লাগিল। যাহারা ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া রহিল, তাহাদের মধ্যে অবস্থাপন্ন লোকেরা শহর অঞ্চলে চলিয়া আত্মরক্ষা করিল। আর

যাহাদের সেই সুযোগ-সংস্থান ছিল না, তাহারা কঙ্কালসার দেহ লইয়া পৈতৃক ভিটা-মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল।

এদিকে রাজসরকারের অবস্থাও হইয়া উঠিল অতীব শোচনীয়। জন-মজুর অভাবে, পলি-সার ও সেচের জলের অভাবে বিস্তীর্ণ এলাকা অনাবাদী পড়িয়া থাকায়, খাদ্য-সংস্থান—রাজস্বের যোগান সকল দিক দিয়াই সরকারী রাজকোষ শূন্য হইতে চলিল। অবস্থা-বিপর্যয় দেখিয়া আবার কমিশন ডাকা হইল; কমিটি বসিল—কেমন করিয়া এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কমিশন একবাক্যে রায় দিলেন, যত অনর্থের মূল দামোদরের বাঁধ; পুনরায় যদি দামোদরের জল দেশের বুকের উপর দিয়া প্রবাহিত করা যায় তবেই দেশ এই সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইতে পারে। রোগনির্ণয় হইল ঠিকই, কিন্তু ঔষধের ব্যবস্থা করিবে কে! সামরিক প্রয়োজনের তাগিদ—দামোদরের বাঁধ রাখিতেই হইবে। অথচ রাজস্বের খাতিরে এবং কতকটা জনমতের মুখ চাহিয়া দামোদরের জলও দেশের উপর দিয়া বহাইতে হইবে। এখন "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি"।

ব্যবস্থা করা হইল—বর্ধমান শহর হইতে প্রায় ১৫ মাইল পশ্চিমে জুজুটী ও ঝাঁপুর নামক গ্রাম দুইটির নিকট দামোদর-বাঁধের তলা দিয়া দুইটি কপাট-কল বসাইয়া কিছু বন্যার জল দেশের অভ্যন্তর-ভাগে প্রবেশ করাইয়া যতটা সম্ভব জনমতকে শান্ত রাখিতে হইবে। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু পর্ব্বত মূষিক প্রসব করিল। দামোদরের স্বাভাবিক বাৎসরিক বন্যার জলের পরিমাণ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২,৫০,০০০ হইতে ৩,০০,০০০ ঘনফুট। বন্যা-জলের সাহায্যে হুগলী ও বর্ধমান অঞ্চলের প্রায় ৬,০০,০০০ লক্ষ একর জমি স্বাভাবিক সেচ পাইত। কিন্তু এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থার ফলে যে জল পাওয়া যাইবে, তাহার পরিমাণ হইল প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র ৫০০ ঘনফুট এবং সেচের জমির পরিমাণ মোট ২৫,০০০ একর। তদানীন্তন ছোটলাট স্যর এস্‌লী ইডেনের নামে ১৮৮২ সনে ইডেন কেনেল নাম দিয়া একটি ২৭ মাইল দীর্ঘ খাল ও উক্ত কপাট-কল দুইটি নির্মাণ করিয়া এই প্রহসনের যবনিকাপাত হয়। দামোদরের বাঁধ হইতে বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলী জেলার স্বাস্থ্য ও সম্পদের যে ক্ষয়ের খতিয়ান সুরু হইয়াছে আজও তাহার শেষ হয় নাই। কোনও কালে শেষ হইবে কিনা তাহা ভবিতব্যই বলিতে পারেন।

আজ যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, দামোদর-বাঁধই যদি সকল অনর্থের মূল হয়, তবে আজ এই স্বাধীন সরকারের আমলে, এই বাঁধটাকে তুলিয়া দিলেই ত সকল মুশকিলের আসান হইয়া যায়। কিন্তু তাহা আর হয় না। পলিবাহী নদীর তীরে একবার বাঁধ দিলে, পলি জমাট বাঁধিয়া নদী-তলদেশ ক্রমেই উঁচু হইতে থাকে। জলের সমতলও তদনুসারে উঁচু হইতে থাকে; অথচ সংরক্ষিত অঞ্চল পলির অভাবে পূর্বের সমতলেই থাকিয়া যায়। ইহার ফলে যতই দিন যায় ক্রমেই সংরক্ষিত অঞ্চল হইতে বন্যাজলের সমতল উঁচু হইতে উচ্চতর হইতে থাকে। ইহার ফলে আজ হইতে ৯০ বৎসর পূর্বে দামোদরে বাঁধ না থাকিলে যে লাভ হইত আজ সেই বাঁধ সহসা উঠাইয়া দিলে ক্ষতির পরিমাণ হইবে লাভের তুলনায় অনেক বেশী। অবস্থা এখন এমন এক পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেখানে এই অনিষ্টকর বাঁধ রাখাও বিপজ্জনক অথচ তুলিয়া দেওয়াও সহজ কথা নহে। এই বাঁধ দেওয়ার নীতি লইয়া তখনকার যুগের সামরিক ইঞ্জিনীয়ারদের অপরিণামদর্শিতা ও রাজশক্তির নীতি এক-যোগে যে অনিষ্টসাধন করিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়াই মিশরের বিশ্ববিশ্রুত সেচ-ইঞ্জিনীয়ার (অধুনা পরলোকগত) স্যর উইলিয়ম উইলকক্স ১৯২৮ সনে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সেচ-সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতাকালীন এই বাঁধ-গুলিকে "শয়তানের বাঁধ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

মানুষ যখন না বুঝিয়া ভুল করে এবং ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহা শুধরাইতে অগ্রসর হয়, তখন ভুলের সংশোধন হয় সহজ। কিন্তু ভুল যেখানে স্বেচ্ছাকৃত এবং স্বার্থবুদ্ধিদুষ্ট সেখানে ভুল সংশোধন না করিয়া, একটির পর একটি ভুল করিয়া পূর্বকৃত ভুলগুলিকে চাপা দিবার প্রয়াস চলিতে থাকে। বাংলাদেশের সেচ-ব্যবস্থা এমনই এক ভুলের ধারাবাহিক ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও জনস্বার্থ বাংলাদেশে সর্বক্ষেত্রে একসূত্রে ধরিয়াই চলে নাই। যে যে ক্ষেত্রে এই বিপরীতমুখী স্বার্থের সংঘাত বাধিয়াছে, সেখানেই সরকার-পক্ষ হইতে দেখা গিয়াছে গোঁজামিল দিয়া ত্রুটি সংশোধনের একটা বাহ্য প্রয়াস।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার চালু হয়, তখন হইতে সেচ-বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন হইতে প্রাদেশিক সরকারের অধীনে আসে। ইহার ফলে অন্যান্য প্রদেশে সেচ-বিভাগে দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা প্রায় "যথাপূর্বং তথা পরম্" চলিতে থাকে। প্রাদেশিক সরকারের অধীন হইলেও সরকার সেচ-বিভাগটিকে বিশ্বাস করিয়া, প্রাদেশিক আইন-সভার নিকট দায়ী জনপ্রিয় মন্ত্রীদিগের অধীনে না দিয়া সংরক্ষিত বিভাগ হিসাবে ছোটলাটের খাস-কামরায় চাবিবন্ধ করিয়া রাখিলেন। যাহা হোক, প্রাদেশিক

সরকারের আওতায় আসার ফলে এই বাংলাদেশেও সেচ-সমস্যা লইয়া প্রাদেশিক আইন-পরিষদে এবং ব্যবস্থাপক সভায় বেশ আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হয়। ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কারের পর হইতে সেচ-বিভাগটিকে সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রীদের কর্তৃত্বাধীনে আনা হয় এবং উত্তরোত্তর সেচ সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ সৃষ্টি হইতে থাকে।

অতএব দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে যখন পঞ্জাব, সিন্ধু, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে সেচ-ব্যবস্থার জন্য সরকার মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিয়া সকলপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিয়া আসিতেছিলেন তখন হইতেই বাংলা-সরকারের অপরিণামদর্শিতার ফলে ভুলের পর ভুল করিয়া বাংলার সুন্দর, সুস্থ জনপদগুলি, ধান্যে ভরা মাঠগুলি হতশ্রী করিয়া দিবার উদ্যোগপর্ব সুরু হইয়াছিল। অতীতের অজস্র ভুল-ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সেচ-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সহজসাধ্য নহে। এখন জোড়াতালি দিয়াই আরও কিছুদিন অগ্রসর হইতে হইবে এবং ধীরে ধীরে সকল ভুলের সংশোধন করিয়া যে দিন বাংলাদেশের সেচ-ব্যবস্থায় নূতন অধ্যায় সুরু হইবে তখন হয়ত ভারতবর্ষ তথা সমগ্র পৃথিবীতে বাংলাদেশ যোগ্য স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারিবে।

বাংলাদেশে সেচের প্রয়োজন যথেষ্ট রহিয়াছে, এই বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদ সত্ত্বেও বাংলাদেশের তদানীন্তন সরকার কখনও সেচের প্রয়োজনে অকুণ্ঠ ব্যয় করিতে অগ্রসর হন নাই। তাঁহাদের দ্বিধা-সঙ্কোচপূর্ণ নীতি, একনিষ্ঠ কর্মীর অভাব, মূলধন বিনিয়োগে ঔদাসিন্য এই সকল মিলিয়া এতদিন বাংলা-দেশের সেচ-ব্যবস্থার অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আজ হাওয়া ফিরিয়াছে, সু-বাতাস বহিতেছে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা আসিয়াছে, জনসাধারণ তাহাদের নিজেদের নীতি নির্ধারণে অধিকার লাভ করিয়াছে। এদিকে বঙ্গ-বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে, অতএব খাদ্য-সংস্থানের প্রয়োজনও অনুরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে। যে অর্থে ঋষি বঙ্কিম 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে বাংলাদেশকে "শস্য-শ্যামলা" বলিয়াছিলেন, আজ সত্তর বৎসর পরে বাংলাদেশের সেই গৌরব আর নাই। মানুষের ভুলে বাংলাদেশ শ্রীহীন হইয়াছে, মানুষের চাপে বাংলাদেশের প্রয়োজন বাড়িয়াছে। কাজেই স্বাধীন বাংলার কর্মনীতির অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দায়িত্বও বাড়িয়াছে বহুগুণ। বর্তমান সরকারের নীতি জনস্বার্থের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। কাজেই নীতির দিক দিয়া কোনও জড়তা, দ্বিধা, সঙ্কোচ এখন আর বাংলার অগ্রগতিতে বাধা দিবে না আশা করা যায়।

প্রাচ্যের প্রাচীন শিল্পকলা

শ্রীগোপীনাথ সেন

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ যে কেবল বাসোপযোগী ঘর তৈরি করতে শিখল তা নয়, সে নিজের সৌন্দর্যবোধকেও নানাভাবে জাগিয়ে তুলতে লাগল। সেই সুদূর অতীতে শিল্পশাস্ত্র বলে কিছু ছিল না, কিন্তু তখনকার যুগে অশিক্ষিত শিল্পীগণ নিজেদের শিল্পরচনার মাধ্যমে যে কলাকুশলতার পরিচয় দিয়েছিল তার সৌন্দর্য ও মাধুর্য কম নয়। তাদের শিল্পের মধ্যে দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন এবং অঙ্কনের বৈশিষ্ট্যগুলি যদিও খুব স্পষ্ট হয়নি, তা হলেও তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবির মধ্যে আদিম কৃষ্টির বিভিন্ন দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। আদিম জাতিসমূহের শিল্পকলার নিদর্শন কিছুদিন পূর্বে অষ্ট্রেলিয়া, নিউগিনি, সেপিক, বামু, আফ্রিকা এবং এশিয়া ও ইউরোপের নানা স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সকল চিত্রকলা থেকে আদিবাসীদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রস্তর-যুগের আদিবাসীদের সভ্যতা সকল দেশেই একই রকমের, কিন্তু পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে তা বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ধরণে গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন মনুষ্যগোষ্ঠীর শিল্পকলা যেন একই সূত্রে গাঁথা। প্রত্যেক দেশের শিল্পকলার মধ্যে সে দেশের মানুষ, প্রকৃতি, জীবজন্তু, আহারবিহার ও জীবনের নানা দিককার পরিচয় পাওয়া যায়। এক হিসাবে শিল্পই জাতির সবচেয়ে বড় ইতিহাস।

কালচক্রের আবর্তনে পৃথিবীতে মনুষ্যজাতির মধ্যে নানা প্রকার শিল্পকলার উদ্ভব হয়েছে। আদিম জাতির আঁকা ছবির মধ্যে বিশেষ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যারা যে রকম প্রাকৃতিক পরিবেশে লালিতপালিত ও বর্দ্ধিত

কৃষ্ণ কর্তৃক কেশী-বধ (পাহাড়পুর)

নর্ত্তকী (পাহাড়পুর)

হয়েছে তাদের মধ্যে তদনুযায়ী দৃষ্টিভঙ্গীই গড়ে উঠেছিল। বিচিত্র বেশভূষা দ্বারা তারা নিজেদের দেহের শোভা বর্দ্ধন করত। তারা যে সকল অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করত সেগুলির কারুকার্য্যও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। তাদের উৎসব ও ধর্ম্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে সকল চিত্র আঁকা হয়েছে তন্মধ্যে শিল্পকুশলতা যেন স্বতঃস্ফূর্ত্ত। শান্ত ও নিঝুম পর্ব্বত এবং জঙ্গলময় পল্লী অঞ্চলে আদিম চিত্রকলার জন্ম। যদিও বর্তমান যুগে আদিম সভ্যতার অনেক নিদর্শন লোপ পেতে বসেছে, তা হলেও পৃথিবীর কোন কোন স্থানে এখনও আদিম চিত্রকলার সন্ধান মেলে। ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার আদিম চিত্রকলা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এই চিত্রসমূহ উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করলে মনে হয়, অনার্য্যেরা তাদের স্বাধীন মুক্ত কল্পনাশক্তির সাহায্যে নিজেদের অন্তরের ভাবকে রূপ দিয়েছে।

আর্য্য এবং আর্য্যেতর জাতি উভয়েই বহু দেবতার উপাসনা করতেন— সূর্য্য অগ্নি জল মেঘ নদনদী বনস্পতি কত কি যে দেবতা তার আর অন্ত নেই। ভাষার দিক দিয়ে দেখতে গেলে আর্য্য এবং আর্য্যেতরে বড় একটা মেলে না, কিন্তু দেবতার নামে এবং তাঁদের ক্রিয়াকলাপে আশ্চর্য্য একটা মিল পরিলক্ষিত হয়।

নিউজিল্যাণ্ডের মাওরী জাতির একজন বজ্রদেবতা আছেন, তাঁকে বলে Waitari বা দৈত্যারি। বহু দেবতার নামের সঙ্গে তাদের পূজার উপচার এবং বিধি আর্য্যগণ যে আর্য্যেতরগণের কাছ থেকে পান নি, তাই বা কে বলবে। বেদীনির্ম্মাণ, অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসে গান ও সোমরস পান, পূজানুষ্ঠানে যূপকাষ্ঠে পশুবলি সবকিছুই প্রমাণ করছে আর্য্য এবং আর্য্যেতরের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের কথা। লিওনহার্ড এডামও বলেছেন—'To the primitive mind the mythical world is a reality.'

আদিম চিত্রকলার ন্যায় আদিম জাতির ব্যবহারিক

মোহেন-জো দড়োতে প্রাপ্ত বিবিধ দ্রব্য

পোড়া মাটির স্ত্রী-মূর্ত্তি, মোহেন্-জো-দড়ো

শিল্পও আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কাঠের জিনিষপত্র, কাপড়, মাছধরার জাল, কাঁচকাঠির মালা প্রভৃতিতে তাদের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল শিল্পের মধ্যে তাদের বাস্তব জ্ঞান এবং সৌন্দর্য্য-বোধ দুয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি তাদের তৈরি কুঁড়েঘর দেখলেও চোখ জুড়ায়।

আদিম চিত্রকলার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আদি-বাসীরাও স্বপ্ন দেখতে জানত—তাদের চিত্রকলা সেই স্বপ্নেরই প্রকাশ। এর মধ্যে তাদের জাতির ঐতিহ্য লুকিয়ে আছে। তাদের এই স্বপ্ন ও কল্পনার সৃষ্টি থেকে তাদের শিল্প, ব্যবসা, বৃত্তি ও জীবনযাত্রার হদিস পাওয়া যায়। আদিম সংস্কৃতিকে তারা কাঠের তৈরি জীবজন্তু, মানুষের মুখোশ ও নানা প্রকার চিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত করেছে।

এশিয়ার আদিম চিত্রকলার বিশদ আলোচনা করা কঠিন ব্যাপার। এই বিরাট মহাদেশে যে কত বিচিত্র আদিম শিল্প-কলা বিদ্যমান তার অন্ত নেই। যবদ্বীপের ape man সম্ভবতঃ এশিয়ার আদিমতম মানুষ। সেখানে এশিয়ার আদিম মানবের জীবনধারার নিদর্শন ফসিল ইত্যাদির মধ্যে দেখা যায়।

চীনদেশের পিপিংএর কাছে চউ কউ তিয়েন নামে চুনের গুহায় পাথরের নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে সেখানকার আদিম অধিবাসীদের শিল্পকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। চীনদেশে যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্ক্রিয়া ও খনন-কার্য্য হয়েছে তা সকল ক্ষেত্রে ঠিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হয় নি। রাস্তা ও রেলপথ তৈরির সময় প্রাচীন শিল্পনিদর্শন কিছু কিছু আবিষ্কার হয়েছে। উত্তর চীনা ও মাঞ্চুরিয়াতে খনন-কার্য্য যথারীতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হয়েছিল। এর আবিষ্কার করেছিলেন সুইডেনের বৈজ্ঞানিক ও ভূতত্ত্ববিদ্ জে. জি. এণ্ডারসন।

সাইবেরিয়ায় প্রস্তর যুগের কৃষ্টির কিছু কিছু নিদর্শন আছে। সেখানকার পাথরের গায়ে আঁকা ছবিগুলি দেখলে নব (Neo) প্রস্তর যুগের বলে মনে হয়। মিনুসিনসক জেলায় আবামসক নামে একটি স্থানের নিকটে প্রস্তরে অঙ্কিত একখানা ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি তীরধনুক হাতে একজন শিকারীর ছবি। ব্রোঞ্জযুগের পূর্ব্বেকার ছবিগুলিতে দেখি সাইবেরিয়ার লোকেরা তখন লম্বা জামা পরত। রুশিয়ার প্রত্নদ্রব্য অনুসন্ধানীরা সাইবেরিয়ায় বহু আদিম

চিত্র আবিষ্কার করেছেন। সম্প্রতি পূর্ব্ব-সাইবেরিয়ায় যকুৎসক এবং উজবেকিস্থানে (আফগানিস্থানের উত্তরে) বহু প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

অধ্যাপক ওকলাডনিকভ মধ্য এবং উচ্চ লেনা উপত্যকায় আশিটি প্রাগৈতিহাসিক স্থান এবং বহু প্রস্তরশিল্পের নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। এই সমস্ত আদিম চিত্র ব্রোঞ্জ ও লৌহ যুগের এবং প্রাচীন প্রস্তর-যুগ থেকে নব প্রস্তর-যুগ পর্য্যন্ত বিভিন্ন যুগের সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। মিস টাটিয়ানা পাসেক লেনা নদীতীরবর্তী অঞ্চলকে আদিম চিত্রকলার যাদুঘর বলে বর্ণনা করেছেন। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিকহেল ডোয়েভোডস্কি বলেছেন, 'মধ্য এশিয়া আদিম

অষ্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্ত, গাছের ছালে আঁকা চিত্রকলার নিদর্শন। ডানদিকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি কুঠার অঙ্কিত

শিল্পকলার কেন্দ্র।' মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কৃত কোন কোন চিত্রের নীচে আরবীয় লিপি উৎকীর্ণ আছে—তা একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী কালের বলে মনে হয়। উজবেকিস্থানের জারাউৎসয়া গিরিপথের অন্যান্য গুহায় বহু চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

সাইবেরিয়ায় ব্রোঞ্জ যুগে সিথিয়ান চিত্রকলার বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। সিথিয়ান চিত্রকলা অতীত যুগের স্মৃতি বহন করে নিয়ে আসে। এই চিত্রকলা সম্বন্ধে জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেছেন,—

"The scythian style may be described as a combination of primitive vision and technical perfection, a strange mixture of decorative stylization with naturalism. In almost every instance the artists show

বোর্ণিওতে প্রাপ্ত কাঠের মূর্ত্তি

an admirable observation of nature, but they adopted the designs with perfect freedom to the shape of the decorative field."

কাঠের পিকদানী—হাওয়াই

ভারতবর্ষেও প্রাচীন চিত্রকলার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে রবার্ট ব্রুস ফুট মাদ্রাজের নিকটবর্ত্তী

কোনো এক স্থান থেকে চিত্রখোদিত পাথর আবিষ্কার করেন। ১৮৮০ সালে আর্চিবল্ড কারলাইল এবং ঞে ককবার্ণ প্রথম পাহাড়ের গায়ে আঁকা ছবির দিকে শিল্পানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই বিবরণ ১৮৮৩

দক্ষিণ-ভারতের নীলগিরি পর্ব্বতে প্রাচীন সমাধি প্রাপ্ত মৃৎশিল্পের নিদর্শন

খ্রীষ্টাব্দে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে ছাপা হয়। এই ছবিটির বিষয়বস্তু গণ্ডার-শিকার, ছয় জন লোক কয়টি গণ্ডারকে আক্রমণ করছে, তন্মধ্যে কয়েকজন টুপি পরিহিত। তারপরে বহু পাহাড়ের গায়ে ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে। এণ্ডারসন কতকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র রায়গড় জেলায় সিংহলপুরের নিকটে আবিষ্কার করেন। এগুলি ঈষৎ লাল, বেগুনি এবং হলদে রং দিয়ে আঁকা—তন্মধ্যে মানুষ, পাখী এবং নানা জীবজন্তু ইত্যাদি হরেকরকমের ছবি আছে। মধ্যভারতে প্রাচীরগাত্রে আদিম যন্ত্রপাতি, সাজপোশাক প্রভৃতি আঁকা আছে। এ সমস্ত ছবি দেখলে বোঝা যায় সারা এশিয়া মহাদেশে যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র এবং বেশভূষা ইত্যাদি সুপ্রাচীনকাল থেকে যে ভাবে চলে আসছে তার সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের ঐ সমস্ত দ্রব্যাদির কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। এ সকল চিত্রকলার কাল সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কয়েকজন প্রত্নতত্ত্ববিদ এগুলিকে খ্রীষ্টের জন্মের এক হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার বলে মত প্রকাশ করেছেন। বর্ত্তমান যুগে আদিম চিত্রকলার যে নিদর্শন মোহেন-জো-দাড়ো এবং হরপ্পা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে তার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকলা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হলে মোহেন্-জো-দাড়ো এবং হরপ্পার প্লাসটিক চিত্রকলার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। এই প্লাসটিকের সঙ্গে তামা এবং ষ্টিয়েটাইট নামে আর একটি পদার্থের ব্যবহারে নানা রকমের জিনিষপত্র তৈরি হ'ত। আদিম চিত্রকলার ক্রমবিকাশ, এ তিনটি পদার্থের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন যুগের পরিচয় দেয়। প্রথম যুগে মাটি দিয়ে সাধারণ ও সহজ ভঙ্গিমায় নানা মূর্ত্তি তৈরি হয়েছিল। যখন শিল্পকলা উন্নতির পথে অগ্রসর হতে আরম্ভ করল সেই সময়ে তামা দিয়ে মানুষ ও জন্তুজানোয়ারের মূর্ত্তি গড়ার রেওয়াজ হ'ল।

ভারতীয় আদিম চিত্রকলা ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। মোহেন্ জো-দাড়োর প্রাচীন মাটির মূর্ত্তিগুলির সঙ্গে মেক্সিকোতে প্রাপ্ত মৃন্মূর্ত্তির হুবহু মিল দেখতে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন দ্রাবিড় সভ্যতা সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া, পূর্ব্ব ও মধ্য এশিয়ার নানা স্থানে বিস্তারলাভ করেছিল।

এখনও ভারতবর্ষ থেকে আদিম চিত্রকলা লোপ পেয়ে যায় নি। এখানে আড়াই কোটি আদিম জাতির লোকের

নিউজীল্যাণ্ডের মাওরিদের মৃতের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত স্মৃতি-স্তম্ভ

বাস। তাদের লোকশিল্প বর্ত্তমান কালেও বেশ সমাদৃত হয়েছে। ভারতের আদিবাসীদের চিত্রকলা সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণও প্রচুর গবেষণা করছেন। আসামের নাগাদের বস্ত্রশিল্পেও নৈপুণ্য আছে। দক্ষিণ মহীশূরের নীলগিরি পর্ব্বতের টোডা জাতির মাটির শিল্প বাস্তবিকই চমৎকার। গঞ্জামে বেলুগুনটা

নামে একটি স্থানে আদিবাসীদের বিবাহে চীনামাটির তৈরি নানা রকম জিনিষপত্র ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এ সকল শিল্প বরকে উপহার দেওয়া হয়।

সিংহলে দৈত্যের মুখোস আদিম চিত্রকলার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কাঠ কুঁদে তার ওপর তেল-রঙ দিয়ে বিকটাকৃতি মূর্তি আঁকা হয়। এখানকার অন্যান্য আদিম চিত্রকলা ঠিক ভারতীয় আদিম চিত্রকলার মত। সুমাত্রা, নিয়াস, বোর্ণিও, ফিলিপাইন এবং অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জে কাঠের তৈরি জীবজন্তু এবং নিছক কল্পনার সৃষ্ট ছবিগুলিতেও স্থানীয় প্রতিবেশের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বোর্ণিওর কেনিয়া-কয়ান জাতিদের Decorative art বা মণ্ডন-শিল্পে দক্ষতা আছে এবং তা একেবারে তাদের নিজস্ব।

মধ্য-পূর্ব্ব-এশিয়া অর্থাৎ সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া এবং লুরিস্থান এই তিনটি স্থানের আদিম চিত্রকলা বিশেষ উৎকর্ষ-লাভ করেছিল। ১৯৩৮ সালে এম. ই. এ. মালোয়ান সিরিয়ার টেশ ব্রাক নামে একটি স্থানে বহু আদিম ভাস্কর্য্যের নিদর্শন উদ্ধার করেছেন। এইগুলিকে ৩১০০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বের মধ্যে ধরা হয়। মেসোপটেমিয়া থেকে চীনামাটির একটি বিরাট মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। ডা: মার্ক্স ব্যারনডন ওপেনহিম ১৯১১-১৩ এবং ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বহু প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন আবিষ্কার করেন। মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন উর সভ্যতার নিদর্শনগুলি এইচ. আর. হল এবং স্যার লিওনার্ড উলি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। এই সকল স্থানের বেশীর ভাগ শিল্পকলা পেন্‌সিলভেনিয়া ও ব্রিটিশ যাদুঘরে রক্ষিত আছে। পশ্চিম ইরাণের একটি প্রদেশ লুরিস্থান কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে প্রত্নতত্ত্ববিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ. গডাবড, আর. ডব্লিউ. হাচিনসন প্রভৃতি অনুসন্ধিৎসুগণ কর্ত্তৃক লুরিস্থানে আবিষ্কৃত শিল্পকলা ইতিহাসের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায় উদ্ঘাটিত করেছে।

কাজের জন্য দুগ্ধবতী গাভীর ব্যবহার

শ্রীহলধর

১৯৫১ সনের মধ্যে খাদ্য সম্বন্ধে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে হইবে—ইহাই ভারত গবর্ণমেন্টের দৃঢ় সঙ্কল্প; এই সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহারা নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং কাজে (ও অকাজে ?) অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন। 'কমিটি' ও কর্ম্মচারীর সংখ্যা বহুলপরিমাণে বাড়িয়াছে এবং এখনও বাড়িতেছে। যাহা হউক, এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের জনসাধারণ সুখী ও সন্তুষ্ট হইবে, কেন না 'কন্ট্রোলের' তখন কোন প্রয়োজন থাকিবে না এবং "কন্ট্রোল-জনিত" নানাবিধ অসুবিধা জনসাধারণকে আর ভোগ করিতে হইবে না।

কিন্তু দেশকে খাদ্য সম্বন্ধে আত্মনির্ভর-শীল করিবার পথে বহু বাধাবিঘ্ন বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি সহজে দৃষ্টিগোচর হয়, এবং কতকগুলি হয় না। গবর্ণমেন্টের পক্ষে সকল বাধাবিঘ্ন সহজে ও শীঘ্র অতিক্রম করা খুবই কঠিন। তবে জনসাধারণের—বিশেষত: পল্লী অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের পূর্ণ সহযোগিতা থাকিলে এ সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে সফল হওয়া সম্ভব।

সিন্ধী গাভী হাল্‌কা গাড়ী টানিতেছে

যে সকল বাধা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের বলদের কার্য্যশক্তির অল্পতা অন্যতম। বলদের কার্য্যশক্তির উন্নতি ও বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রধানত: উন্নত উপায়ে প্রজনন ও উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক; প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এ সম্বন্ধে চেষ্টা, গবেষণা ও পরীক্ষা চলিতেছে এবং এ বিষয়ে জন-

সাধারণকে অবহিত করিবার জন্য প্রচারকার্য্যও চলিতেছে। কিন্তু কবে ইহার ফল দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে বলা যায় না।

সিন্ধী গাভী দ্বারা জমি চাষ করানো হইতেছে

যুদ্ধের সময় হইতে বলদ সম্বন্ধে আর একটি অন্তরায় দেখা দিয়াছে। যুদ্ধকালীন ব্যবস্থায় শহরের যানবাহনের জন্য বলদ, মহিষ প্রভৃতি অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার ফলে পল্লী অঞ্চলে ইহাদের তীব্র অভাব ঘটিয়াছিল। সেই অভাব অদ্যাপি চলিতেছে এবং ইহা খুব শীঘ্র পূরণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই অবস্থার উপর আর এক অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। সেই অন্তরায় হইতেছে গরু, বলদের খাদ্য—ঘাসের (fodder) "দুর্ভিক্ষ"। সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, কচ্ছ প্রদেশে এই 'দুর্ভিক্ষ' তীব্রভাবে চলিতেছে। অন্যান্য অঞ্চলেও গরু-বলদের খাদ্য—ঘাসের অভাব যথেষ্ট আছে। এই "দুর্ভিক্ষের" ফলে সৌরাষ্ট্র, গুজরাট ও কচ্ছ প্রদেশে বহুসংখ্যক বলদ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং যাহারা জীবিত আছে খাদ্যাভাবে তাহাদের অবস্থাও জীর্ণ ও ক্লিষ্ট; উপযুক্ত পরিমাণ কাজ করিবার শক্তিও তাহাদের নাই। অথচ স্বাভাবিক কৃষিকার্য্যের জন্য এই সকল অঞ্চলে হাজার হাজার বলদের প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমানে অপর কোন অঞ্চলেই এমন বাড়তি বলদ নাই যাহাদের আমদানী করিয়া এই সকল অঞ্চলের অভাব মিটানো যায়। সাধারণতঃ পূর্ব্ব-পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ এবং রাজস্থান বলদ সম্বন্ধে বাড়তি অঞ্চল বলিয়াই গণ্য হইত। বর্ত্তমানে এই সকল স্থানেও বলদের অভাব অনুভূত হইতেছে।

বহু ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় ভূমি-সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য যন্ত্রের ব্যবহার করা হইবে বটে, কিন্তু ইহার ফলে বলদের প্রয়োজন কম হইবে না, বরং বাড়িবে; কারণ পরে সেই সকল অতিরিক্ত পরিমাণ জমি প্রধানতঃ বলদের সাহায্যেই চাষ করিতে হইবে। বলদের অভাব-জনিত অসুবিধা অতিক্রম করিবার একটি উপায় হইতেছে কৃষিকার্য্যে ব্যাপকভাবে যন্ত্রের প্রচলন; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় এই উপায় গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব নহে। প্রথমতঃ শীঘ্র এবং সহজে উপযুক্ত যন্ত্রাদি বিদেশ হইতে আমদানী করা যাইবে না; দ্বিতীয়তঃ সাধারণ কৃষক তাহার বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবে না। তাহার পক্ষে ইহা মোটেই লাভজনক নহে। ইহা ব্যতীত যন্ত্রের প্রচলনের বিরুদ্ধে অনেক মতবাদ আছে।

সুতরাং বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই অসুবিধা ও অন্তরায় কি উপায়ে অতিক্রম করা যায় তাহাই আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে। একটি উপায় হইতেছে—দুগ্ধবতী গরুকে লাঙ্গল ও গাড়ী চালানোর কাজে ব্যবহার করা। এই প্রস্তাবটি প্রথমেই আমাদের সংস্কারে তীব্র আঘাত দিবে এবং অনেকেই এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত ও যুক্তি প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু অবস্থা ও পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বহু রকমের সংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছি, করিতেছি এবং আমাদিগকে ভবিষ্যতে করিতেও হইবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে আমাদের সংস্কার ত্যাগ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মত গ্রহণ করা হইয়াছিল। তিনি এই প্রস্তাবকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার মতে ইহার ফলে কৃষকের অর্থনৈতিক সুবিধা ত হইবেই, পরন্তু অপ্রত্যক্ষ ভাবে দুগ্ধবতী গাভীরও উপকার হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতীয় গোজাতির 'বাহন-শক্তি' (draught quality) খুবই অধিক এবং দুগ্ধবতী গাভীকে 'বাহনের' কাজে নিযুক্ত না করার কোন কারণ নাই। এই সম্পর্কে আমাদের ইহাও মনে রাখা দরকার যে, ভারতবর্ষে দুগ্ধবতী গরুকে লাঙ্গল, গাড়ী প্রভৃতি টানার কাজে নিযুক্ত করা মোটেই নূতন কথা নহে; এইরূপ কার্য্যে পূর্ব্বকালে দুগ্ধবতী গরু নিযুক্ত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে মহীশূর ও কুর্গে এই প্রথা প্রচলিত আছে। পশ্চিম পঞ্জাবে 'ধানী' গরুও এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইত। বাংলাদেশে খুলনা জেলায়, বিশেষতঃ বাগেরহাট মহকুমায় দুগ্ধবতী গরুর সাহায্যে চাষের কাজ হইয়া থাকে। পৃথিবীর অন্যত্রও এই প্রথা

প্রচলিত আছে। ভারতীয় কৃষি-গবেষণা সংসদের সহকারী সভাপতি স্যার দাতার সিং মিশর ভ্রমণের সময় দেখিয়াছেন যে, সেখানে দুগ্ধবতী গাভীকে লাঙ্গল ও গাড়ী টানার কাজে নিযুক্ত করা অতি সাধারণ প্রথা। এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার দরুণ গরুর দুগ্ধদায়িনী শক্তি মোটেই হ্রাস পায় না। তাহাদের স্বাস্থ্যেরও কোন অবনতি ঘটে না। এই প্রথার ফলে তথাকার কৃষকগণ গরুর খাদ্যের খরচ অনেক পরিমাণে কম করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ভারতরাষ্ট্রে গরুর সংখ্যা প্রায় সাড়ে একুশ কোটি; এই অঙ্ক পৃথিবীর গরুর মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, সাড়ে একুশ কোটি গরুর মধ্যে প্রায় ১২ কোটি গরু অকেজো (uneconomic and unproductive)। এই ১২ কোটি গরুর প্রত্যেকের দৈনিক আট আনা হিসাবে খরচ ধরিলে প্রত্যেক দিনের খরচ ৬ কোটি টাকা, প্রত্যেক মাসের খরচ প্রায় ১৮০ কোটি টাকা এবং প্রত্যেক বৎসরের খরচ প্রায় ২১০০ কোটি টাকা। কি বিরাট অপচয়? এই সকল অকেজো গরুকে ভালভাবে তত্ত্বাবধান করিয়া ও খাওয়াইয়া লাঙ্গল ও গাড়ী টানার কাজে নিযুক্ত করিতে পারিলে এই অপচয় কতকটা নিবারণ করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া দুগ্ধবতী গাভী দুগ্ধপ্রদান বন্ধ করিয়া দিলে অর্থাৎ উহার 'শুষ্ক কালে' (dry period) উহা অকেজো হইয়া পড়ে এবং এই কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গরু 'শুষ্ক' (dry) হইলে উহাকে বিক্রয় করিয়া দিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। এইরূপ বিক্রয়ের ফলে কত ভাল জাতীয় গরুর বংশ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহাও প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। প্রতিরোধ করিতে হইলে 'শুষ্ক কালে' দুগ্ধবতী গরুকে কাজে লাগাইতে হইবে।

দুগ্ধদায়িনী গরুকে বাহনের কাজে লাগাইতে হইলে প্রথমে তাহাকে এ কাজের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে এবং প্রস্তুতির সময়টা তাহার পক্ষে কঠোর হইবে, কারণ এই সময়ে তাহার শক্তি অতিরিক্তভাবে ব্যয়িত হইবে। কিন্তু কিছু দিন পরেই এই কাজে গরু অভ্যস্ত হইয়া যাইবে। যখন কোন দুগ্ধদায়িনী গরু বা বকনাকে এইরূপ কাজে নিযুক্ত করা দরকার হইবে তখন প্রথমে উহাকে আর একটি দুগ্ধদায়িনী গরুর সহিত যুগ্ম করিয়া (pair) দেওয়া দরকার। প্রথমে জোড়াটিকে কৃষিক্ষেত্রে গাড়ী টানার কিম্বা কর্ষণোপযোগী জমিচাষের কাজে নিযুক্ত করাই ভাল; দৈনিক ছয় ঘণ্টার বেশী কাজ করানো উচিত নয়। দুগ্ধদায়িনী গাভীর প্রসবের দুই মাস পূর্ব্ব হইতে প্রসবের এক মাস পর পর্য্যন্ত এইরূপ কাজে তাহাকে নিযুক্ত করা উচিত হইবে না।

দুগ্ধবতী গরুকে এইরূপ কাজে নিযুক্ত করিতে হইলে তাহাকে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য দিতে হইবে। তাহাকে এইরূপ খাদ্য দিতে হইবে যাহাতে সে উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ দিতেও পারে, কাজও করিতে পারে। সাধারণতঃ সাত-আট মণ ওজনের গরুর জন্য সাড়ে সাত সের শুষ্ক পদার্থের (dry matter) প্রয়োজন হয়। ইহার জন্য প্রত্যেক গরুর প্রতি দিনের প্রয়োজন হইবে—দশ সের ঘাস এবং পাঁচ সের 'ঘনীভূত খাদ্য' (concentrates); এইরূপ খাদ্যে গরু শরীর রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে, দৈনিক ছয় ঘণ্টা কাজ করিতে পারিবে এবং তাহার পাঁচ সের দুগ্ধ দিবার শক্তি থাকিবে। ঘাসের মূল্য মণ প্রতি আড়াই টাকা এবং 'ঘনীভূত খাদ্য' মণ প্রতি দশ টাকা ধরিলে দৈনিক খাদ্যের খরচ এক টাকা চৌদ্দ আনা অর্থাৎ দুই টাকা পড়ে; ইহার মধ্যে কাজের জন্য সিকি অর্থাৎ আট আনা খরচ হইবে। কেবল কাজের জন্য পৃথকভাবে একটি পশুকে পোষণ করিতে যে খরচ হয় তাহার তুলনায় দৈনিক আট আনা অতিরিক্ত খরচ খুবই কম।

এই প্রথা প্রচলিত হইলে কেবল যে বহুলাংশে বলদের অভাব পূরণ করা যাইবে তাহা নহে, ঘাসের অভাবও কতকাংশে দূর করা সম্ভব হইবে; কারণ অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক গরুর দ্বারা 'বাহনের' কাজ সম্পন্ন করা যাইবে। এই সম্পর্কে ইহাও বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বর্ত্তমানে আমাদের দেশের গোধন আমাদের ঘাড়ে বোঝাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ ইহাদের নিকট হইতে আমরা খরচের অনুপাতে উপযুক্ত পরিমাণ কার্য্য বা দুগ্ধ প্রাপ্ত হই না। গোজাতি ও গোপালন সম্বন্ধে আমাদের পুরাতন বহু সংস্কার, বহু রীতি, নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে; ইহা যদি করিতে পারি, তবেই পুনরায় আমাদের দেশের গোজাতি আমাদের "সম্পদে" পরিণত হইবে, দেশের কৃষিরও প্রভূত উন্নতি হইবে।

এই সম্বন্ধে ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংসদের তত্ত্বাবধানে চারিটি কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় গরু লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে। বাঙ্গালোরে ভারতীয় ডেয়ারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে "সিন্ধি" গরু এবং মহীশূরে সরকারী পশুক্ষেত্রে 'অমৃত মহল' ও "হালিকর" জাতীয় গাভী লইয়া এই পরীক্ষা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের হরিণঘাটা গো-উন্নয়ন ক্ষেত্রে এইরূপ পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।*

* ১৯৪৯ সালের জুলাই সংখ্যা *Indian Farming* পত্রিকায় প্রকাশিত "The use of cows for work" প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত। ছবিগুলিও সেই প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

(একাঙ্ক নাটিকা)

শ্রীকুমারলাল দাসগুপ্ত

জাদুঘরের অভ্যন্তর, একটা মস্ত বড় ঘর, তার দেয়ালে সাজান মৌর্যযুগের গুপ্তযুগের, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত যুগের বহু ভাস্কর্য্য ; কোনটাতে সুন্দরী নর্ত্তকী নৃত্য করছে, তাকে ঘিরে বাদকের দল কেউ মৃদঙ্গ, কেউ করতাল, কেউ বাঁশী বাজাচ্ছে, কোনটাতে পদ্মবনে কলহংস লীলা করছে, কোনটাতে রাজসভা বসেছে।

রাত বারটা বাজে ঢং ঢং, অন্ধকার ঘর ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে ওঠে, চারদিকে একটা অস্ফুট আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়, ক্রমে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—হঠাৎ ঘর আলোয় ভরে যায়।

ঘরের মধ্যে দুটি মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথম মানুষ—তুমি কে ?

দ্বিতীয় মানুষ—তুমি কে ?

(দু'জনেই হেসে ওঠে)

প্রথম—আমি হচ্ছি দৌবারিক—দ্বারপাল।

দ্বিতীয়—আমি হচ্ছি অমাত্য।

দৌবারিক—বোধ হয় মহাপাপ করেছিলাম তাই পাথর হয়ে ঠায় দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।

অমাত্য—আমারও সেই দশা, রাজসভায় বসে আছি তো বসেই আছি, (হাঁটুতে হাত বুলিয়ে) হাঁটু দুটো ধরে গেছে।

দৌবারিক—দারোয়ানী আর পোষাবে না, রাখালী করব তাও স্বীকার কিন্তু দারোয়ানী আর করব না।

অমাত্য—ঠিক ঐ কথা আমিও ভাবছিলাম, সভায় বসবার আর সখ নেই, কিছুদিন পথে পথে ভবঘুরের মত ঘুরতে ইচ্ছে হচ্ছে।

(এক ঝাঁক কলহংস ঘরের মধ্য দিয়ে পাখা ঝটপট করে উড়ে যায়—থালায় অর্ঘ্য সাজিয়ে পূজারিণীগণ প্রবেশ করে।)

প্রথম পূজারিণী—স্তূপ কোনদিকে বলতে পার ?

দৌবারিক—দেশটার সঙ্গে এখনও পরিচয় হয় নি।

অমাত্য—মন্দির না খুঁজে বৌদ্ধস্তূপ খুঁজতে বেরিয়েছ কেন ?

দ্বিতীয় পূজারিণী—আমরা যে ভগবান বুদ্ধের দাসী।

অমাত্য—তোমরা বৌদ্ধ। বল কি গো ? কোন্ দেশে বাড়ী ? পোশাক-পরিচ্ছদ আর গহনাপত্র দেখে এদেশের ব... মনে হচ্ছে না।

পূজারিণী—এ দেশেই আমাদের বাড়ী, মহারাজ কণিষ্কের জয় হোক।

অমাত্য—(হো হো করে হেসে) মহারাজ কণিষ্ক। শুনতে পাওয়া যায় প্রায় চার শ বছর আগে কণিষ্ক নামে এক বুনো রাজা রাজত্ব করতেন। এটা বিক্রমাদিত্যের যুগ—সভ্যতার যুগ।

দৌবারিক—(অবাক হয়ে) বিক্রমাদিত্য। মহাকবি কালিদাসের যুগ বল। সে কি আজকের কথা, পাঁচ শ বছর আগেকার কথা। এখন রাজচক্রবর্ত্তী মহীপাল রাজত্ব করছেন, বুঝলে বন্ধু, এটাই চরম সভ্যতার যুগ।

অমাত্য—তুমি নিতান্তই শিশু হে, নিতান্তই শিশু, তোমার চেয়ে আমি পাঁচ শ বছরের বড়। (পূজারিণীকে সম্বোধন করে) তা হলে তোমাদের বয়স কত হবে—কম করেও চার শ বছর, তাই না?

(প্রথম ও দ্বিতীয় পূজারিণী লজ্জিত ভাবে এ ওর দিকে তাকায়।)

দৌবারিক—(আঙুলে গুনে) উঁহু—চার শ বছর নয়, প্রায় ন'শ বছর—তা বয়স কিছু হয়েছে বৈকি। দেখে কিন্তু বোঝবার জো নাই।

অমাত্য—মেয়েদের চেহারা দেখে বয়স আঁচ করতে পারবে না বন্ধু। লোধ ফুলের রেণু দিয়ে মুখ মার্জনা করলে, তাম্বুলরাগে ঠোঁট দুটি আরক্ত করলে, আঁখিতে অঞ্জন পরলে আর কাঁচুলি এঁটে বাঁধলে সামান্য দু-চার শ বছরের তফাৎ চোখে পড়বে না।

প্রথম পূজারিণী—তুমি নাকি সত্যযুগের লোক, অথচ কথা শুনে বিশেষ সভ্য বলে তো মনে হচ্ছে না।

দৌবারিক—কালিদাসের কালের লোক কিনা তাই উনি স্ত্রীচরিত্রে বিশেষজ্ঞ।

অমাত্য—(হেসে) নিসর্গনিপুণাঃ স্ত্রিয়ঃ—বুঝলে বন্ধু।

(পূজারিণীগণ দ্রুত প্রস্থান করে, এক ঝাঁক হাঁস উড়ে চলে যায়; নেপথ্যে বাঘের ডাক ও হাতীর বৃংহিত শুনতে পাওয়া যায়।)

দৌবারিক—যেমন এখানে আমরা জেগে উঠেছি তেমনি এদিকে-ওদিকে অনেকেই জেগে উঠেছে দেখছি। ডাক শুনছ?

অমাত্য—বাঘ ডাকছে না?

দৌবারিক—আরো অনেক জানোয়ার ডাকছে।

অমাত্য—(সভয়ে) এদিকে আসবে না ত?

দৌবারিক—(তলোয়ার বার করে) এলে মন্দ হয় না।

অমাত্য—তলোয়ারখানা মরচেধরা নয় ত?

(যক্ষের প্রবেশ)

অমাত্য—স্বাগত!

দৌবারিক—তুমি কে?

যক্ষ—আমি যক্ষ

অমাত্য—(সানন্দে) কশ্চিৎকান্তা বিরহগুরুণা স্বাধিকার-প্রমত্তঃ—তা বিরহী বলেই মনে হচ্ছে।

(যক্ষের প্রস্থানোদ্যোগ)

দৌবারিক—আহা চললে যে, একটু দাঁড়িয়ে দু-চারটে কথা বলেই যাও।

যক্ষ—আমার যক্ষিণীকে দেখেছ?

দৌবারিক—(হেসে) এরই মধ্যে হারিয়ে গেল?

যক্ষ—খুঁজে পাচ্ছি না।

অমাত্য—দেখতে কেমন?

যক্ষ—(বিরক্ত ভাবে) কেমন আবার, যেমন হয়ে থাকে তেমন।

অমাত্য—দাড়িম্ববীজের মত দশন, অধরোষ্ঠ পক্ব বিম্বের মত লাল, কটিদেশ ক্ষীণ, চোখ দুটি হরিণীর মত চঞ্চল, দেহযষ্টি কুচভারে কিঞ্চিৎ আনত আর গতি শ্রোণীভারে মন্দ মন্দ—

যক্ষ—(সন্দিগ্ধভাবে) দেখেছ নাকি?

অমাত্য—না গো না, তোমার যক্ষিণী এ পথে আসেন নি, তুমি উল্টো পথ ধরেছ।

দৌবারিক—হয় তো তুমি একটু দ্রুতপদে এগিয়ে এসেছ, হয় তো তিনি পেছনে পড়ে আছেন।

অমাত্য—ঐ যে কে এদিকে আসছে, তোমার যক্ষিণীই আসছেন বোধ হয়।

(যক্ষের দ্রুত প্রস্থানোদ্যোগ)

অমাত্য—(যক্ষের হাত চেপে ধরে) আরে ওকি, তুমি পালাচ্ছ যে?

দৌবারিক—তা হলে যক্ষিণী পলাতকা নন, পলাতক যক্ষ-মশাই নিজে।

যক্ষ—হাত ছাড়, আমার অবস্থা তোমার হলে তুমিও পালাতে।

অমাত্য—(হাত ছেড়ে দিয়ে) বলো কি বন্ধু, অমন যার পরমাসুন্দরী স্ত্রী, তার অবস্থা কল্পনা করতেও যে আমার পুলক হচ্ছে; দুটি কুরঙ্গনয়নের দৃষ্টি, দুটি মৃণালবাহুর নিবিড় বন্ধন—

যক্ষ—হাজার বছর ধরে, দু'চার দিন নয়, দু'চার বছর নয়, হাজার বছর ধরে, হা-জা-র বছর ধরে—কল্পনা করো, পুলক হচ্ছে কি?

অমাত্য—পুলকের পরের অবস্থা—স্বেদ হচ্ছে।

(রাজ-নর্তকী, মুরজ-বাদিকা, মুরলীবাদিকার প্রবেশ)

অমাত্য—(যক্ষকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে) তোমরা কি কারো সন্ধানে ফিরছ?

মুরজবাদিকা—না, আমরা ইতস্তত ভ্রমণ করছি।

মুরলীবাদিকা—আমরা কারো সন্ধানে ফিরি না, সবাই আমাদের সন্ধানে ফেরে।

দৌবারিক—বেশ বলেছে।

অমাত্য—(বাধা দিয়ে) তুমি থাম, ভদ্রভাবে কথাটাও বলতে জান না (মুরলীবাদিকাকে সম্বোধন করে) অয়ি ইন্দু-বদনে, তুমি যথার্থই বলেছ, কমল কি কখনও অলির সন্ধানে ফেরে, অলিকুলই ঝাঁকে ঝাঁকে কমলের কাছে ছুটে আসে। তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

রাজ-নর্তকী—আমি রাজ-নর্তকী আর এরা হচ্ছে আমার সঙ্গিনী—মুরজবাদিকা এবং মুরলীবাদিকা।

অমাত্য—তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হলে এ আমাদের পরম সৌভাগ্য।

রাজ-নর্ত্তকী—এটা রাজপ্রাসাদের কোন কক্ষ ?

অমাত্য—আর যে কক্ষই হোক না কেন, প্রমোদ-কক্ষ নয়।

দৌবারিক—হয় তো বা মন্ত্রণা-কক্ষ।

অমাত্য—অথবা কারাকক্ষ।

দৌবারিক—প্রমোদ-কক্ষে তো বহু কাল কাটিয়েছ, আবার প্রমোদ-কক্ষের সন্ধান কেন ?

যক্ষ—সোনার খাঁচার পাখী এরা, খাঁচা খুলে উড়িয়ে দাও, পালাবে না ; ঘুরে ফিরে আবার খাঁচায় এসে ঢুকবে।

মুরজবাদিকা—আমরা সোনার খাঁচা ভালবাসি।

অমাত্য—সোনার খাঁচা না হলে তোমাদের মানাবেই বা কেন ?

মুরলীবাদিকা—তা হলে দয়া করে মহারাজ অনঙ্গভীমের প্রাসাদটা আমাদের দেখিয়ে দাও।

অমাত্য—তোমাদের মহারাজার যে নামই শুনি নি !

মুরজবাদিকা—উৎকলের প্রবল প্রতাপ মহারাজ অনঙ্গ-ভীমের নাম শোনো নি—বলো কি ?

অমাত্য—পাঁচ শ বছর আগে, না—পাঁচ শ বছর পরে ?

দৌবারিক—থাক্—বয়সের হিসেবে আর দরকার নাই।

অমাত্য—এ বড় মজার দেশ, এখানে স্থান কাল আর পাত্র সব এলোমেলো, উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের অমাত্য আর উৎকলের অনঙ্গভীমের নর্ত্তকী বিশ্রম্ভালাপ করছে ! (উচ্চহাস্য)

মুরজবাদিকা—ব্যাপারটা আমাদের মোটেই হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে না, সখী, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

রাজ-নর্ত্তকী—কিন্তু যাব কোথায়, রাজা নেই, রাজপ্রাসাদ নেই।

যক্ষ—চাটুবাক্য নেই, মনরাখা হাসি নেই, মিথ্যা প্রেমের অভিনয় নেই—সমস্যা বটে !

অমাত্য—চাটুবাক্যের অভাব এখানেও হবে না।

মুরজবাদিকা—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল কথা শুনবার ধৈর্য্য আমাদের নেই।

দৌবারিক—বুঝেছি, বুঝেছি—সমস্যা আরও গুরুতর, ভারী একটা মৃদঙ্গ বয়ে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় ; তা, আমি বলি তোমার মুরজটি রেখে এখানে একটু বোসো।

অমাত্য—(সোৎসাহে) এ অতি যুক্তিযুক্ত পরামর্শ, এখানে আজ সভা বসান যাক।

দৌবারিক—যেখানে রাজ-নর্ত্তকী সেখানেই রাজসভা।

অমাত্য—ঠিক কথা, ঐ কুরঙ্গনয়না, গজগামিনী, ক্ষীণমধ্যা, মৃণালবাহু, বিম্বাধরা রাজ-নর্ত্তকী যদি দয়া করে একটি নৃত্য সুরু করেন এবং এই চটুলা, সুহাসিনী, সুনিপুণা মুরজবাদিকা আর মুরলীবাদিকা যদি সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গত করেন, তা হলে আমরা কৃতার্থ হই।

রাজ-নর্ত্তকী—(সলজ্জভাবে) আমি এত প্রশংসার উপযুক্ত নই।

যক্ষ—সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তোমার দেহের গঠন অপূর্ব— দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দুকান্তি বদনং ইত্যাদি, অর্থাৎ নর্ত্তকীর চোখ দুটি দীর্ঘ হবে, মুখ শরতের চাঁদের মত সুন্দর হবে, বাহু দুটি স্কন্ধদেশে নম্রভাবাপন্ন হবে, হৃৎপ্রদেশ উন্নত কুচদ্বয়ের সন্নিবেশে অপ্রশস্ত হবে, মধ্যপ্রদেশ পাণিমাত্র দ্বারা পরিমাপ করা যাবে, জঘনদ্বয় বিশাল হবে, পায়ের আঙুলগুলো কুটিলভাবযুক্ত হবে—এ সব লক্ষণ তোমাতে বর্ত্তমান।

রাজ-নর্ত্তকী—(যক্ষের দিকে অনুরাগসহকারে তাকিয়ে) আপনার পরিচয় পেলে ধন্য হই।

যক্ষ—আমি নৃত্যগীত-অনুরাগী এক সামান্য যক্ষ।

রাজ-নর্ত্তকী—(বিনীতভাবে) নটরাজ, আপনাকে চিনতে পারি নি। আমাদের বাচালতা মার্জ্জনা করবেন।

যক্ষ—তোমাদের বাক-চাতুরী আমি উপভোগ করছিলাম।

রাজ-নর্ত্তকী—এই নতুন দেশে আপনার দেখা পেয়ে আমরা আশ্বস্ত হলাম।

অমাত্য—কিন্তু আশ্বাসবাণী প্রথমে আমিই বলেছি, আমার কথায় দয়া করে একবার কর্ণপাত কর।

রাজ-নর্ত্তকী—(অমাত্যকে উপেক্ষা করে, যক্ষের প্রতি কটাক্ষপাত করে) আপনার সামনে নাচতে আমার ভয় হচ্ছে।

যক্ষ—তুমি নাচলে আমি আনন্দিত হব।

রাজ-নর্ত্তকী—সখী, নটরাজের ইচ্ছে হয়েছে আমরা এখানে একটু নাচ-গান করি।

মুরলীবাদিকা—কিন্তু তার আয়োজন কোথায় ?

দৌবারিক—আয়োজন এখখুনি হচ্ছে। (মাথার প্রকাণ্ড পাগড়িটা খুলে বিছিয়ে দিতে দিতে) যেখানে যেমন সেখানে তেমন আয়োজন।

অমাত্য—(দৌবারিকের পিঠ চাপড়ে) বন্ধুর উপস্থিত বুদ্ধি আছে।

(মুরজবাদিকা, মুরলীবাদিকা, রাজ-নর্ত্তকী, অমাত্য, দৌবারিক ও যক্ষ বসে পড়ে, মুরজবাদিকা ও মুরলী-বাদিকা সঙ্গত সুরু করে, রাজ-নর্ত্তকী গীত আরম্ভ করে দেয়—গ্রীক সৈনিক ও আরও কয়েকজন নরনারী একে একে প্রবেশ করে এবং আশেপাশে উপবেশন করে—একটু পরে রাজ-নর্ত্তকী উঠে দাঁড়িয়ে নৃত্য সুরু করে।)

অমাত্য—অহো, কি সুন্দর, কি অপূর্ব।

(নেপথ্যে শোনা যায় 'রাজচক্রবর্তী কাশীরাজের জয়' এবং একটু পরে কতিপয় পারিষদ সঙ্গে কাশীরাজের প্রবেশ—মাথায় তাঁর রাজছত্র; নাচ-গান বন্ধ হয়, সকলে উঠে দাঁড়ায়।)

পারিষদ—রাজচক্রবর্তী কাশীরাজের জয়।

অমাত্য—(কৃতাঞ্জলিপুটে) অহো, কি ভাগ্য মহারাজের দর্শন পেলাম।

(অন্যান্য সকলে নতমস্তকে অভিবাদন করে)

কাশীরাজ—(মৃদু হাস্য করে) কি হচ্ছে এখানে?

অমাত্য—প্রভু, এখানে একটু নাচ-গান হচ্ছে।

কাশীরাজ—(রাজ-নর্তকীকে দেখে) এ সুন্দরী কে?

যক্ষ—ইনি কোন এক গুণীরাজার সভানর্তকী।

অমাত্য—অহো, নিশ্চয় গুণী, এমন রত্ন যাঁর সভা আলো করত তিনি মহাগুণী।

কাশীরাজ—আমার সভাতে একে দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।

গ্রীক সৈনিক—রাজসভাও বহু, রাজ-নর্তকীও বহু।

কাশীরাজ—এদেশে একটিমাত্র রাজসভা এবং সে সভা আমার।

অমাত্য—আজ্ঞে মহারাজ, এটা ঠিক কাশীরাজ্য নয়, এখানে স্থান ও কালের বড় গোলমাল।

যক্ষ—স্থান পৃথিবী এবং কাল বর্তমান, এ বিষয়ে তো সন্দেহ নেই।

অমাত্য—মহারাজ যখন উপস্থিত আছেন তখন রাজ্য আর রাজসভা কাশীরই মনে করা যাক। এখন মহারাজ দয়া করে মাঝখানে আসন গ্রহণ করলে আর কোন ত্রুটি থাকে না।

পারিষদ—তুমি তো অত্যন্ত বেয়াদপ, সিংহাসন না হলে মহারাজ বসবেন কেমন করে?

গ্রীক সৈনিক—মহারাজের তা হলে এদেশে বসাই হবে না।

যক্ষ—আমি বলি মহারাজ তো ধরণীর ঈশ্বর, ধরণীতে বসলে তাঁর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না।

(বহু কণ্ঠ)—ঠিক, ঠিক, মহারাজ উপবেশন করুন।

(কাশীরাজের আসন গ্রহণ এবং অন্য সকলের উপবেশন)

অমাত্য—মহারাজের আদেশ হলে আবার নৃত্যগীত সুরু হতে পারে।

কাশীরাজ—সুন্দরী, তুমি নৃত্য সুরু কর, নৃত্যগীতে আমার অরুচি নেই।

(আবার নৃত্যগীত সুরু হয়, কিছুক্ষণ পরে নেপথ্যে ধ্বনি ওঠে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি', সভায় সকলে চঞ্চল হয়, ধ্বনি আরো কাছে আসে, দুই তিন জন পীতপরিচ্ছদধারী শ্রমণ প্রবেশ করে।)

শ্রমণগণ—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—প্রভু বুদ্ধ আসছেন।

কাশীরাজ—(ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে) ভগবান তথাগত আসছেন। বন্ধ কর নৃত্য, বন্ধ কর গীতবাদ্য, প্রভুর চরণ দর্শন করে আজ কৃতার্থ হব।

(সকলে উঠে দাঁড়ায়, ভগবান বুদ্ধ প্রবেশ করেন, ধীরে ধীরে এগিয়ে যান, ঘর অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সকলে হাত জোড় করে দাঁড়ায়—বুদ্ধদেব মৃদুপদবিক্ষেপে অপর দিক দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান, জনতা কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থাকে।)

কাশীরাজ—আজ আমি ধন্য হলাম।

পারিষদ—আজ আমরা ধন্য হলাম।

পারিষদ—ধরণী নিষ্পাপ হ'ল।

কাশীরাজ—মনের যত গ্লানি মুছে গেল।

গ্রীক সৈনিক—কতক্ষণের জন্য?

অমাত্য—মহারাজ, আসন গ্রহণ করুন।

কাশীরাজ—(বসে) এর পরে আর নাচগান ভাল লাগবে না, মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল।

অমাত্য—দোলায়মান চিত্ত ভাল নয় মহারাজ, যেদিকে হোক একদিকে ঝুঁকে পড়ুন।

কাশীরাজ—তোমাদের সমবেত ঝোঁকটা যে আমার ঘাড়ে ফেলে দিলে।

অমাত্য—মহারাজ, তা হলে ঘাড় নাড়ুন আবার নাচগান সুরু হোক।

কাশীরাজ—তা হলে আবার নাচ সুরু হোক।

(আবার নৃত্যগীত সুরু হয় এবং কিছুক্ষণ পরে শেষ হয়।)

কাশীরাজ—(সোৎসাহে) ওহে অমাত্য—নাচ কেমন দেখলে বলো?

অমাত্য—মহারাজ, আপনিই বলুন—পত্তনেসত্তি কিং গ্রামে রত্নপরীক্ষা!

কাশীরাজ—সুন্দর, অতি সুন্দর।

গ্রীক সৈনিক—অতুলনীয়।

কাশীরাজ—(নিজের গলার মণিহার খুলে) এই নাও সুন্দরী পুরস্কার; যেমন তোমার রূপ, তেমনি তোমার গুণ।

(নর্তকী এগিয়ে এসে হার গ্রহণ করে)

কাশীরাজ—তুমি ক্লান্ত হয়েছ—এইখানে বসো।

রাজ-নর্তকী—(বসে) মহারাজের অনুগ্রহ অশেষ।

কাশীরাজ—নর্তকী, তোমার নাম কি?

রাজ-নর্তকী—দাসীর নাম মদনমঞ্জরী।

অমাত্য—তিলোত্তমা বা উর্বশী হলেও বেমানান হ'ত না।

কাশীরাজ—আজকে থেকে তোমাকে রাজ-নর্ত্তকী নিযুক্ত করলাম।

গ্রীক সৈনিক—রাজ্য কিন্তু এখনও আবিষ্কার হয় নাই।

কাশীরাজ—ক্ষত্রিয়ের হাতে তলোয়ার থাকলে রাজ্য গড়ে তুলতে কতক্ষণ?

যক্ষ—আবার তা ভেঙে পড়তেই বা কতক্ষণ?

কাশীরাজ—ওদিকটা ভেবে দেখবার মত প্রচুর অবসর আমার হয় নি।

যক্ষ—পাঁচ শ, হাজার বছরেও চিন্তা করবার অবসর হ'ল না?

কাশীরাজ—চিন্তা অনেক করেছি, কিন্তু সে সৃষ্টি আর স্থিতির দিকটাই; প্রলয়ের দিকটা ভাবতে ভালও লাগে না, ভাবিও নি।

যক্ষ—অর্থাৎ বয়স হয়েছে হাজার বছর, কিন্তু বুদ্ধিতে এখনও ছেলেমানুষ!

পারিষদ—মহাশয়ের কথাবার্ত্তা যথেষ্ট স্বাভাবিক নয়।

যক্ষ—আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এতগুলো লোকের মধ্যে একমাত্র আমিই স্বাভাবিক; আমার বয়স ও বুদ্ধি একসঙ্গে বেড়েছে।

কাশীরাজ—তুমি স্বাভাবিক বলতে কি বোঝ?

যক্ষ—যা সমঞ্জস তাই স্বাভাবিক।

কাশীরাজ—না, বেশীর ভাগ লোকের যে অবস্থা সেইটেই স্বাভাবিক, বেশীর ভাগ লোক যদি পাগল হয়, পাগলামিই স্বাভাবিক।

যক্ষ—(ভীতভাবে চারদিকে তাকিয়ে) মহারাজের কথাটা সত্য বলেই মনে হচ্ছে, অন্তত এখানে।

(হঠাৎ একদল ভীত হরিণ ছুটে এসে ঢোকে, জনতার মধ্য দিয়ে লাফালাফি করে পালিয়ে যায়, নেপথ্যে বাঘের ডাক ও হস্তীর বৃংহিত শুনতে পাওয়া যায়।)

অমাত্য—বাঘ ডাকছে না? এদিকে আসবে না তো?

গ্রীক সৈনিক—এদিকে আসছে বলেই মনে হচ্ছে, হরিণগুলোকে তাড়া করেছে।

কাশীরাজ—(সোৎসাহে) হাতের কাছে এত শিকার, খুবই আনন্দের বিষয়! চল, চল শিকার করা যাকগে, শরীরের পেশীগুলো আবার তাজা হয়ে উঠুক।

(তলোয়ার খুলে কাশীরাজ ও পারিষদগণ এক দিক দিয়ে প্রস্থান করে, আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে যায় অমাত্য, মুরজবাদিকা, মুরলীবাদিকা, গ্রীক সৈনিক, প্রস্থানোদ্যত রাজ-নর্ত্তকীকে বাধা দেয়।)

গ্রীক সৈনিক—একটু দাঁড়াও রাজনর্ত্তকী, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।

রাজ-নর্ত্তকী—না না, আমি দাঁড়াতে পারব না, সঙ্গিনীরা চলে গেল, আমার ভয় করছে, আমাকে যেতে দাও।

গ্রীক সৈনিক—আমি কাছে থাকতে তোমার কোন ভয় নেই, অনেক সিংহ ব্যাঘ্র আমার বর্শার আঘাতে প্রাণ দিয়েছে, ডাক শুনেই আমি পালাই না।

রাজ-নর্ত্তকী—কি বলবে তাড়াতাড়ি বল।

গ্রীক সৈনিক—রাজ-নর্ত্তকী, তুমি সুন্দরীশ্রেষ্ঠা।

রাজ-নর্ত্তকী—(হেসে) এই কথা! এই সামান্য কথাটা বলবার জন্য এত ব্যগ্রতা?

গ্রীক সৈনিক—সামান্য! আমি বলি অসামান্য।

রাজ-নর্ত্তকী—এখন আমাকে যেতে দাও, সৌন্দর্য্য আলোচনা পরে হবে।

গ্রীক সৈনিক—না, অপেক্ষা করবার মত ধৈর্য্য আমার নেই, রাজ-নর্ত্তকী, আমি তোমাকে ভালবাসি।

রাজ-নর্ত্তকী—(হেসে) এটা অভিনয় করবার সময় নয়।

গ্রীক সৈনিক—আমি অভিনয় করছি নে, আমি সত্যিই তোমাকে ভালবাসি।

রাজ-নর্ত্তকী—আমি ভীরু নর্ত্তকী, তোমার মত বীরের ভালবাসা পাবার উপযুক্ত আমি নই।

গ্রীক সৈনিক—কে বলে তুমি উপযুক্ত নও, তুমি সম্রাটের প্রেম পাবার উপযুক্ত।

রাজ-নর্ত্তকী—আমি সামান্য নর্ত্তকী মাত্র।

গ্রীক সৈনিক—আমি তোমাকে আমার হৃদয়-মন্দিরের দেবী করব।

রাজ-নর্ত্তকী—তুমি তো দেখছি বিদেশী, তোমাদের দেশেও কি মেয়েদের কাছে মিথ্যে কথা বলবার রীতি আছে?

গ্রীক সৈনিক—আমি তোমাকে মিছে কথা একটিও বলিনি, আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি, গ্রীকেরা ভালবাসা নিয়ে খেলা করে না।

রাজ-নর্ত্তকী—বেশী অভ্যাস হয়ে গেলে আর খেলা বলে মনে হয় না।

গ্রীক সৈনিক—ওগো ভেনাস, আমাকে তুমি কৃপা কর, আমিও তোমার জন্যে রাজ্য জয় করব।

রাজ-নর্ত্তকী—এখন আমাকে যেতে দাও, রাজ্য জয় করে এস, তখন তোমার কথা শুনব।

(দ্রুত চলে যায়)

গ্রীক সৈনিক—তুমি হরিণীর মত চঞ্চল।

(পিছনে পিছনে যায়)

(খালি ঘরের ভিতর দিয়ে আবার এক দল হরিণ ছুটে চলে যায়, উপর দিয়ে এক ঝাঁক হাঁস উড়ে যায়, বিপরীত দিক থেকে যক্ষ প্রবেশ করে।)

যক্ষ—পৃথিবীটা হঠাৎ এত ছোট হয়ে গেছে যে কোথাও

একটু নির্জন স্থান নেই যেখানে এক মুহূর্ত একা থাকতে পারি।

(অন্য দিক থেকে আবার রাজ-নর্ত্তকী প্রবেশ করে)

যক্ষ—(হেসে) এই দেখ, দু' পা যেতে না যেতেই আবার তোমার সঙ্গে দেখা। তা, তুমি যে নিতান্ত একা!

রাজ-নর্ত্তকী—এখন আর একা নেই।

যক্ষ—আমাকে গণনার মধ্যে এনো না, আমি নগণ্য।

রাজ-নর্ত্তকী—আপনি গণনার বাইরে।

যক্ষ—চাও ত আমি এখখুনি বিদায় হই।

রাজ-নর্ত্তকী—আমি যে আপনাকেই খুঁজছিলাম।

যক্ষ—(আশ্চর্য্য হয়ে) কেন বল ত?

রাজ-নর্ত্তকী—(নীরব হয়ে থাকে)

যক্ষ—নিঃসঙ্কোচে বল।

রাজ-নর্ত্তকী—(অনুরাগপূর্ণ কটাক্ষপাত করে) কিছু না, আপনার সান্নিধ্য চাচ্ছিলাম।

যক্ষ—(সন্দিগ্ধভাবে) আমার সান্নিধ্য কি প্রীতিকর বলে মনে হয়!

রাজ-নর্ত্তকী—(মাথা নীচু করে) খুব।

যক্ষ—তাই নাকি, আচ্ছা বল ত, আমার দূরত্বটা কি সেই অনুপাতে কষ্টকর বলে মনে হয়?

রাজ-নর্ত্তকী—(মাথা নীচু করে) খুব।

যক্ষ—আর আমার কণ্ঠস্বর শুনলে হর্ষ—

রাজ-নর্ত্তকী—(ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়)

যক্ষ—এবং চোখে চোখ পড়লে পুলক উপস্থিত হয়?

রাজ-নর্ত্তকী—(সম্মতি জানায়)

যক্ষ—(চিন্তিতভাবে) মানুষের কি হলে যেন এই সব বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়?

রাজ-নর্ত্তকী—(কটাক্ষপাত করে) ভালবাসলে।

যক্ষ—ভালবাসলে! তুমি তা হলে আমাকে ভালবেসেছ?

রাজ-নর্ত্তকী—আপনার চরণে আমার জীবন যৌবন সমর্পণ করেছি।

যক্ষ—(দুঃখিত ভাবে) এই সময় আমার গলায় এক গাছা মুক্তামালা নেই যা তোমাকে উপহার দিতে পারি।

রাজ-নর্ত্তকী—কিন্তু আপনার হৃদয় ত আছে।

যক্ষ—কেবল হৃদয়ের বিনিময়ে কি এ খেলা জমে রাজ-নর্ত্তকী?

রাজ-নর্ত্তকী—এ ত হৃদয়েরই খেলা।

যক্ষ—তুমি রাজ-নর্ত্তকী, তোমার মুখে এমন কথা শুনব আশা করি নি।

রাজ-নর্ত্তকী—রাজ-নর্ত্তকীও ভালবাসতে পারে।

যক্ষ—নিশ্চয় পারে, ভালবাসলে কিছুক্ষণ সময় কাটে বেশ!

রাজ-নর্ত্তকী—আমার এ ভালবাসা কিছুক্ষণের নয়, চির-জীবনের।

যক্ষ—এই ত বেশ কথাটা খেলাচ্ছলে বলছিলে, আবার এর মধ্যে গাম্ভীর্য্য টেনে আনলে কেন?

রাজ-নর্ত্তকী—যেখানে অনুভূতি গভীর সেখানে গাম্ভীর্য্য আসবেই।

যক্ষ—একটা কথা বলতে পার, ভালবাসা কি মিথ্যার অলঙ্কার না হলে শোভা পায় না?

রাজ-নর্ত্তকী—এ প্রশ্ন কেন?

যক্ষ—(হেসে) বল তো আজ পর্যন্ত কতজনকে এই চির-জীবনের স্বীকৃতি দিয়েছ?

রাজ-নর্ত্তকী—(মাথা নীচু করে থাকে)

যক্ষ—আজ পর্যন্ত কত জনকে ভালবেসেছ, আর কত দিন সেই সব গভীর, অক্ষয়, অমর ভালবাসা টিঁকেছে?

রাজ-নর্ত্তকী—হৃদয় ভালবাসে একবারই।

যক্ষ—হাজার, দেড় হাজার বছর ধরে মানুষের চরিত্র দেখেও ও কথা বলতে পারলে? যারা একবার ভালবাসে তারা মানুষ নয়, তুমি আমি মানুষমাত্র।

রাজ-নর্ত্তকী—হয় ত তাই, কিন্তু প্রথম যখন ভালবাসি তখন তা চিরজীবনের বলে মনে হয় কেন?

যক্ষ—সেটা সাময়িক।

রাজ-নর্ত্তকী—হোক সাময়িক, তবু তা সত্য; সাময়িক সত্য বলে কি কিছু হতে পারে না?

যক্ষ—(চিন্তিত ভাবে) সাময়িক সত্য! কথাটা বেশ,—তা বোধ হয় হতে পারে; প্রথম যখন ভালবাসি তখন তা যে চিরজীবনের বলে মনে হয় একথা আমিও অস্বীকার করতে পারছি না।

রাজ-নর্ত্তকী—সাময়িক সত্য যে চিরজীবনের সত্য হবে না তা কে বলতে পারে?

যক্ষ—কেউ বলতে পারে না, কেননা ভগবান মানুষকে ত্রিকালজ্ঞ করেন নি, সেইখানেই মুশকিল।

রাজ-নর্ত্তকী—না, সেইখানেই মঙ্গল।

যক্ষ—এক হিসেবে কথাটা ঠিক, জীবনের পথে আলো-অন্ধকার আছে বলেই খেলাটা চলে ভাল।

(গ্রীক সৈনিকের প্রবেশ)

গ্রীক সৈনিক—এই যে, তুমি এইখানে এসে লুকিয়েছ আর তোমাকে আমি চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

যক্ষ—এত খোঁজাখুঁজি কেন?

গ্রীক সৈনিক—(বিরক্তভাবে) ভুল বুঝেছ, তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি না।

যক্ষ—(হেসে) তাই নাকি—তা হলে আমি চলি।

রাজ-নর্ত্তকী—না না, আমাকে একা ফেলে আপনি যাবেন না।

গ্রীক সৈনিক—ওগো বিদেশিনী, তুমি আমাকে এমনভাবে উপেক্ষা করো না।

রাজ-নর্ত্তকী—বিদেশী, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

গ্রীক সৈনিক—সুন্দরী, তোমার কি হৃদয় নেই ?

যক্ষ—অনুমান ঠিকই করেছ বন্ধু, ইদানীং ওঁর হৃদয় যথাস্থানে নেই।

(অমাত্যের প্রবেশ)

অমাত্য—অহো কি সৌভাগ্য, মদনমঞ্জরী যে এখানে বিরাজ করছে।

যক্ষ—মৌমাছিরা একে একে আবার জুটতে সুরু করল।

গ্রীক সৈনিক—এক আধটা মৌমাছি তাড়াতে আমার বেশীক্ষণ লাগবে না (তলোয়ার বার করে)

অমাত্য—আহা কর কি, তলোয়ার রাখ—তুমি লোকটা একেবারে বর্বর। এস বাগ্‌যুদ্ধে অগ্রসর হও, তবে না বুঝব তুমি প্রেমিক।

যক্ষ—এ প্রস্তাব মন্দ নয়, আমি বলি তোমরা দু'জনে নর্ত্তকীর রূপ বর্ণনা করে দুটি শ্লোক রচনা কর।

অমাত্য—চমৎকার, চমৎকার, তুমি হবে বিচারক—যার শ্লোক উৎকৃষ্ট হবে, জয় তার।

যক্ষ—এবং রাজ-নর্ত্তকীও তার।

অমাত্য—আমি প্রস্তুত।

যক্ষ—একটু অপেক্ষা কর, ঐ দেখ আরো অনেকে এদিকে আসছে, হয়তো ওরাও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগদান করতে পারে।

অমাত্য—(ব্যস্তভাবে) সপারিষদ মহারাজ আসছেন যে !

রাজ-নর্ত্তকী—এখানে থাকা আমার পক্ষে আর রুচিকর হবে না। (সে প্রস্থান করে, গ্রীক সৈনিক তাকে অনুসরণ করে।)

(প্রথমে মুরজবাদিকা, মুরলীবাদিকা, পরে সপারিষদ কাশীরাজের প্রবেশ)

মুরজবাদিকা—তোমরা আমাদের প্রিয়সখী মদনমঞ্জরীকে দেখেছ ?

অমাত্য—দেখেছি বৈ কি, আহা সুন্দরী মদনমঞ্জরী !

মুরলীবাদিকা—কেন কি হয়েছে আমাদের সখীর !

অমাত্য—এতক্ষণ যে কি হয়েছে তা ঠিক বলতে পারি নে।

কাশীরাজ—সভানর্ত্তকীর কি কোন বিপদ ঘটেছে ?

অমাত্য—সমূহ বিপদ মহারাজ, একটা মত্ত হস্তী তাকে তাড়া করেছে।

কাশীরাজ—(সভয়ে) মত্ত হস্তী !

অমাত্য—হ্যাঁ মহারাজ, চেহারাটা মানুষের মত, কিন্তু রসবোধ একেবারে মত্ত হস্তীর মত।

(সকলে হেসে ওঠে)

মুরজবাদিকা—ওমা, সে আবার কে ?

অমাত্য—সে আমাদের বিদেশী সৈনিক পুরুষটি, রাজ-নর্ত্তকীকে প্রেম নিবেদন করে বেড়াচ্ছে।

মুরজবাদিকা—তোমাদের মধ্যে তারই রসবোধ দেখছি আছে।

কাশীরাজ—(সরোষে) একটা সামান্য সৈনিকের এতখানি স্পর্দ্ধা ! যাও তো তোমরা, সেই দুঃসাহী বিদেশীকে ধরে নিয়ে এসো আর আমার সভানর্ত্তকীকেও সঙ্গে এনো।

দৌবারিক—রাজাই অবলার বল।

অমাত্য—এতক্ষণে সত্যিকার রাজসভা বলে মনে হচ্ছে।

দৌবারিক—এতক্ষণে বেঁচে আছি বলে মনে হচ্ছে।

যক্ষ—জীবন যথেষ্ট জটিল না হলে জমে না দেখছি।

অমাত্য—যেখানে মানুষ সেখানেই জটিলতা।

যক্ষ—বন্ধু এতক্ষণে একটা দামী কথা বলেছে, এই যে অপরিসর স্থান, স্বল্পকাল, আর গুটিকয়েক পাত্র, এ নিয়েই কেমন রসসৃষ্টি সুরু হয়ে গেছে।

(পারিষদগণ, গ্রীক সৈনিক ও রাজ-নর্ত্তকীর প্রবেশ)

অমাত্য—এসো বীরবর।

গ্রীক—এই যে বাগ্‌যোদ্ধা।

পারিষদ—মহারাজ, অপরাধীকে উপস্থিত করেছি ?

কাশীরাজ—বিদেশী সৈনিক, তুমি যে অপরাধ করেছ তার দণ্ড কি জান ?

অমাত্য—প্রাণদণ্ড মহারাজ।

গ্রীক সৈনিক—বাক্যবাণে ?

যক্ষ—ও অপরাধের যদি প্রাণদণ্ড হয় তা হলে মহারাজ, আমাদের প্রত্যেকের একাধিক বার মরা উচিত।

কাশীরাজ—চুপ কর তোমরা, শোনো সৈনিক, তোমার প্রাণদণ্ড, আর সে দণ্ড দেব আমি স্বহস্তে।

অমাত্য—রাজোচিত।

(কাশীরাজা তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন, এমন সময় নেপথ্যে ঢং ঢং করে চারটা বাজে, হঠাৎ আলো স্তিমিত হয়ে যায়, একটা ব্যস্ততা, ছুটোছুটি সুরু হয়, এক ঝাঁক কলহংস উড়ে আসে, একদল হরিণ ছুটে চলে যায়, তার পরে হয় সব চুপ, আলো আরো কমে আসে)

কন্যাদের বিবাহ হবে না ?

(৩)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

নরনারীর বিবাহ-ইচ্ছা স্বাভাবিক ধর্ম। এত কাল আমাদের দেশে কোনও কন্যা অবিবাহিত থাকত না। প্রায় কোন পুত্রও থাকত না। কদাচিৎ কোনও কোনও পুরুষকে কন্যার অভাবে কিম্বা অন্য কারণে আইবুড়া থাকতে হ'ত, কিন্তু কোনও কন্যাকে থাকতে দেখা যেত না। রুগ্ন বা বিকলাঙ্গ কন্যার বিবাহ হ'ত না।

কিন্তু গত ৮।১০ বৎসর হ'তে কোন কোন সুস্থ কন্যারও বিবাহ হচ্ছে না। এত দিন কেবল যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাবার জন্য কলেজে পড়ছিল। ডিগ্রি না পেলে চাকরি পাবে না, আর চাকরি না পেলে খেতে পাবে না। এই দারুণ দুশ্চিন্তায় তারা পঠদ্দশা শেষ করছিল। এখন কন্যাদের বিবাহের বয়স বেড়ে গেছে। তারা দেখছে, শুনছে, তাদের বিবাহ অনিশ্চিত, তাদের বিবাহ হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে। বিবাহ না হ'লে তাদের কি দশা হবে, এই দারুণ চিন্তায় তারাও কাতর হয়ে পড়েছে। যাদের সুযোগ আছে, তারা কলেজে ঢুকছে। তারাও ভাবছে, পরে কি হবে।

শ্রীমতী দীপ্তি কলেজে পড়ে। মুখে, চোখে, কথায় দীপ্তিই বটে। কিন্তু যখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কথা উঠে, তখনই তার দীপ্তি ম্লান হয়। সে বলে, "পাস হ'তেই হবে, একটা আশ্রয় করে' রাখতে হবে।"

শ্রীমতী কান্তি বি এ পড়ে। সে স্বভাবতঃ গম্ভীর। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি তোমার নিজের ইচ্ছায় পড়ছ, না বাবার ইচ্ছায় ?"

"বাবা কিছু বলেন নাই। আমি নিজের ইচ্ছায় পড়ছি।"

"কেন ইচ্ছা হ'ল ?"

"একটা ত কিছু করতে হবে।"

অর্থাৎ, পরে কি হবে, কে জানে।

শ্রীমতী দীপ্তি ও কান্তির রূপ আছে, রূপেয়াও আছে, তথাপি ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কেহ কেহ ধরে' নিয়েছে, চাকরি করতেই হবে। শ্রীমতী চিত্রাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি বি-এ পড়ছ কেন ?"

"বিদ্বান্ হ'তে হবে।"

"তার পর ?"

"ভবিতব্যে যা আছে, হবে।"

অর্থাৎ, পরে সে শিক্ষিকা হ'তে পারবে।

অল্পকাল পূর্বেও কুমারীরা শিব-পূজা করত। এখনও কেহ কেহ করে। তারা চায় মহেশ্বরের তুল্য ঐশ্বর্যশালী স্বামী, আর উমার তুল্য স্বামী-সৌভাগ্য। এইরূপে উমা-মহেশ্বর প্রতিমা কল্পিত হয়েছিল। এখন সব অনিশ্চিত।

কোন কোন কন্যা নিজের বিবাহের পথ নিজেই পরিষ্কার করে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এক কন্যা কলেজে চতুর্থ বর্ষে পড়ত। মাঝে মাঝে আমার কাছে আসত, এটা ওটা জিজ্ঞাসা করত। বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেল। সে একদিন ভাগবত পুরাণের বঙ্গানুবাদ নিয়ে গেল। মাস দুই পরে এসে বলছে—"দাদু, আমি পুরাণ-পরীক্ষায় পাস হয়েছি, 'ভারতী' উপাধি পেয়েছি।"

"বেশ, এখন তোমার নাম লেখ, শ্রীমতী কাদম্বিনী ভারতী।"

"আমার লজ্জা করে।"

"তবে উপাধির লোভ কেন ?"

"একটা রইল।"

সে বি-এ পাস হ'ল। দু-এক দিন যেতে না যেতে এসে বলছে, "দাদু, আমরা একটা মাসিক-পত্র বার করব। আপনি একটা নাম বলে' দিন।"

"তোমরা কারা ?"

"আমাদের কমিটি আছে, তারা মহিলা, আপনি চিনবেন না। আমি সম্পাদিকা হব।"

"তোমায় এ বায়ু রোগে কেন ধরল ? রোগটি দুশ্চিকিৎস্য। এই রোগে ধরলে রোগী মনে করে, সে অতিশয় বিদ্বান্ ও বিজ্ঞ, তার লেখকদের রচনা বিচার করবার ক্ষমতা আছে, তার নাম ও প্রতিপত্তি আছে। উত্তম লেখকেরা তার কাগজে লিখবে, আর শত শত পাঠক উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়বে। তুমি সম্পাদিকা, তোমার এ সব আছে কি ? এই বাঁকুড়ায় কত কাগজ এল, গেল। তুমি মনে করছ, তোমার কাগজের সে দশা হবে না ?"

"জলে না নামলে সাঁতার শিখব কেমন করে' ?"

"দেখছি, রোগটি পেকে দাঁড়িয়েছে। আমি নাম টাম বলতে পারব না।"

"আপনি না পারলে কে পারবে ?"

"আমি কি জানি ?"

"আপনি না জানলে কে জানবে ?"

শ্রীমতী কাদম্বিনীর এই অসামান্য যুক্তিজাল ছিঁড়তে

পারলাম না। তার জলবিম্ব কাগজের নাম দিতে হ'ল। আর প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য দুটি ছোট ছোট প্রবন্ধও লিখতে হ'ল।

তৃতীয় মা া আর এল না। তার জলবিম্ব মিলিয়ে গেল। শুনলাম, এম্-এ পড়তে কলিকাতা গেছে। দু-বৎসর পরে এম্-এ পরীক্ষা দিয়েই এসেছে। কাঁদ. কাঁদ. স্বরে বলছে, "দাদু, আমি ভাল লিখতে পারি নি। যদি ফেল হই, কি হবে?"

"সর্বনাশ! করেছ কি? পৃথিবীর ঘূর্ণন রুদ্ধ হবে, দিবারাত্রির বিচ্ছেদ থাকবে না।"

"আমার কি হবে?"

"তুমি আবার পড়বে। না পার, দাদার কাছে থাকবে। দাদার বড় চাকরি, তিনি তোমায় ভালবাসেন, তোমার বউদিদিও যত্ন করেন।"

"আমি দু-তিন মাসের বেশী থাকতে পারব না।"

"তুমি কি স্বাতন্ত্র্য চাও?"

চুপ করে' রইল। আমি তখন বুঝলাম, কোথাকার জল কোন্ দিকে গড়াচ্ছে। মাস দুই পরে শুনলাম সে এম্-এ পাস হয়েছে।

অনেক দিন পূর্বে একটা হিন্দী বচন শুনেছিলাম—

পহেলে দর্শন ধারী। পিছে গুণ বিচারী॥

আমরা প্রথমে লোকের দর্শন অর্থাৎ আকৃতি বা চেহারা দেখি, পরে তার গুণ বিচার করি। কিন্তু বিধাতা সকলকে সুদর্শন করেন না। পুরাণ-ভারতী হউক, আর মাসিক পত্রের সম্পাদিকা হউক, আর এম্-এ পাসই হউক, বিনা দর্শনে কোন গুণেই ফল হয় না। বিবাহ-ক্ষেত্রে মোটেই না।

এর ৮।৯ মাস পরে দৈবাৎ এক দিন পথে কাদুকে দেখতে পেলাম। এক গা গয়না ঝক্ ঝক্ করছে। প্রথমে আমি তাকে চিনতে পারি নি।

"আমি কাদু।"

"তুমি একেবারে বদলে গেছ।"

সে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে, "আশীর্বাদ করুন, আশীর্বাদ করুন।" উঠে দাঁড়িয়ে "আমি সাত মাস কলিকাতায় ছিলাম, আমার বিয়ে হয়ে গেছে।"

"তুমি চিরায়তি হও।"

আবার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে, "আশীর্বাদ করুন, আশীর্বাদ করুন।"

সকল শ্রীহীনা কুমারীর এইরূপ অধ্যবসায় থাকে না, সুযোগও হয় না, তাদের বিবাহও হয় না।

বিবাহেচ্ছার কাল আছে। নারীর পনর হ'তে কুড়ি বৎসর, নরের কুড়ি হ'তে পঁচিশ বৎসর বলা যেতে পারে। এই এই বয়সেই তাদের চিত্তে বসন্তের হিল্লোল বইতে থাকে। তখন যা দেখে, সব সুন্দর। যদি সন্ন্যাসী হয়, ত এই সময়। আর, যদি প্রাণ দিতে হয়, তা-ও এই সময়। কারও এই বয়স এগিয়ে যায়, কারও পেছিয়ে পড়ে। কেহ অকাল-পক্ব হয়, কেহ কালাপক্ব থাকে।

এখন সকল কন্যার বিবাহ হচ্ছে না, সমাজের এক নূতন দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়েছে। কোন কোন কন্যাও বিবাহ করতে চায় না। কিন্তু যখনই এ কথা শুনি, তখনই বুঝি সে প্রকৃতিস্থ নয়।

আমরা মানব জাতিকে নর ও নারী, এই দুই ভাগ করি। কিন্তু অনেক নর নারীভাবাপন্ন, তারা কা-নর। তারা যৌবনেও বিবাহের জন্য ব্যগ্র হয় না। তেমনই, কোন কোন নারী নরভাবাপন্ন, তারা কা-নারী। তারা সাহসী হয়, পুরুষোচিত কাজ করতে ধাবিত হয়। কখনও উত্তেজনা-বশে স্বাভাবিক নারী-প্রকৃতির বিপরীত কাজ করে, এরা বিবাহ করতে চায় না।

আর, কোন কোন কুমারী নৈরাশ্যে, দুঃখে কিম্বা ভয়ে বিবাহ হ'তে দূরে থাকতে চায়। এই অনিচ্ছা সাময়িক বলতে পারা যায়। পরে নারী-প্রকৃতির জয় হয়, সুবিধা হ'লেই তারা বিবাহ করে।

নৈরাশ্যের দুই কারণ আছে। (১) কুমারী যাকে চায়, তাকে পাবার সম্ভাবনা নাই। (২) যেমন ঘরের যেমন বর চায়, তেমন পাবার সম্ভাবনা নাই।

দুঃখের দুই কারণ। (১) কন্যার মা নাই, ছোট ভাই-বোন আছে। পিতাকে তাদের দেখাশুনার কষ্ট দিতে চায় না। নিজে বিয়ে না করে' তা'দিকে পালন করতে চায়। (২) কন্যা বিবাহের খরচ দেখছে; শুনছে, কোন কোন পিতা সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। সে পিতাকে সে দশায় ফেলতে চায় না।

ভয়ের নানাবিধ কারণ আছে। (১) কুমারী দেখেছে, তার পরিচিত এক নারীর স্বামী কু-সঙ্গে পড়ে' দুশ্চরিত্র হয়েছে, তাকে যন্ত্রণা দেয়। তখন সে ভাবে, "না বাপু, বিয়েতে কাজ নাই, আমি বেশ আছি।" (২) কখনও দেখে, তার পরিচিত এক অল্পবয়সী কন্যা বিবাহের কিছুদিন পরেই বিধবা হয়েছে। সে বিধবার দুঃখ দেখে, নিজে অনুভব করে। সে দশা তারও হ'তে পারে, সে অনিশ্চিতে ঝাঁপ দিতে ডরায়। (৩) দেখেছে বিবাহের পরেই কন্যা কোনও গুরুতর শোক পেয়েছে। বিবাহের সঙ্গে শোকের কারণ জড়িয়ে রাখে, বিয়ে করতে ভয় পায়। আমি দুটি উদাহরণ দিচ্ছি—

১। এগার বৎসর হ'ল শ্রীমতী প্রীতি এখানকার কলেজে

পড়ত। সে একটা সূত্র ধরে' আমাকে 'দাদু'-পদে প্রতিষ্ঠিত করলে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি তার সঙ্গিনীদেরও দাদু হয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে তিন-চারিজন আসত, একথা সেকথা হ'ত, চলে' যেত। কুমারীদের বয়স যতই হউক, আমি কারও সাথে বিবাহ-প্রসঙ্গ করি না।

একদিন তারা বললে, তারা এক তরুণী-সঙ্ঘ করেছে। শনিবারে শনিবারে তাদের সঙ্ঘ বসে। নানা বিষয় আলোচনা করে, গান-বাজনাও করে। সেখানে পুরুষ-প্রবেশ নিষিদ্ধ।

তাদের মধ্যে চারিজন কলেজে পড়ত। একজন বোধ হয়, এম-এ পাস। আমি তাকে দেখিনি। অপর সভ্যারা অল্প-স্বল্প ইংরেজী জানত, আর বাংলা গল্প উপন্যাসের শ্রাদ্ধ করত। সঙ্ঘের প্রতিজ্ঞা, বিয়ে করবে না। তাদের মধ্যে দু তিন জন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। দেশে এত দুঃখ-দুর্দশা দেখতে পাচ্ছে, আর তারা বিয়ে করে' ঘরের বউ হয়ে থাকবে?

সেই সময়ে (১৯৪৩?) জাপানীরা কলিকাতায় বোমা ফেলছিল। কলিকাতাবাসী সন্ত্রস্ত হয়ে যে যেখানে পারে পালিয়ে যাচ্ছিল। জাপানীরা এল বলে। লাটসাহেবের হুকুমে নোয়াখালির শত শত নৌকা জলে ডুবল, চাউলের হাজার হাজার বস্তা নদীগর্ভে ফেলা হ'ল। জাপানীরা এলে যাতায়াতের নৌকা পাবে না, খেতেও পাবে না। দেশময় সন্ত্রাস। আমরা বাঁকুড়ায় ভাবতাম; জাপানীরা রাণীগঞ্জের লোহার কারখানা দখল করবে, আর নিশ্চয় এই পথ দিয়ে জামসেদপুর যাবে। জাপানী সৈন্যেরা নৃশংস, দুরাচার। পথে যে-কেহ, যুবতীর কথাই নাই, বৃদ্ধ বা শিশু পড়বে, তাদের হাতে কারও রক্ষা হবে না। এক দিন প্রীতি ও তার তিন-চারিজন মিতিন এসে বললে, "দাদু, শুনছেন দেশের অবস্থা? পুরুষেরা যে যেখানে পারে পালাবে, কে আমাদিকে রক্ষা করবে? আপনারা আসবেন না, নিশ্চয়। আমরা নিজেরা নিজদিকে রক্ষা করবার উপায় ভাবছি। ছোরা-খেলা শিখছি। তীর-ধনুক শেখাবার লোক পাচ্ছি না।" আমি নিস্তব্ধ, নিরুত্তর। কিন্তু তাদের এই সঙ্কল্প শুনে মনে মনে তাদের প্রশংসা করতে লাগলাম। বোধ হয় সে সময়ে কলিকাতায় ও অপর স্থানে "মহিলা-আত্মরক্ষা-সমিতি" হয়েছিল। তরুণীসঙ্ঘও সেইরূপ সমিতি করেছিল। এখন মহিলা-আত্মরক্ষা-সমিতির দুর্নাম হয়েছে, তারা কম্যুনিষ্ট, কিন্তু আরম্ভে এ ভাব ছিল না।

এক দিন প্রীতি ও তার মিতিনরা এসে একখানা মাসিকপত্র দিয়ে বললে, "দাদু, আশীর্বাদ করুন।"

ছাপাখানা হ'তে কাগজটা ছাপা হয়ে এসেছে। তারপর আর যা কিছু কাজ, তারা নিজেরাই করেছে। আমি আদ্যোপান্ত পড়লাম। আর আশ্চর্য হয়ে গেলাম, কাগজে একটি ভুল নাই। অর্থনীতির আলোচনা হয়েছে, দেশের দুঃখ-দুর্দশাও সুন্দর ভাষায় লেখা হয়েছে। একটা উপন্যাস আরম্ভ হয়েছে, সুন্দর কবিতাও আছে। কলেজে তিনজন অর্থনীতির বই পড়ত, তাদের পত্রে তারই কাঁচা আলোচনা থাকত। একজন লিখেছে, "আমাদের অন্যের ভরসা করা চলবে না, নিজেদিকে দেখে শুনে নিতে হবে।" উপন্যাসে দেখলাম, এক ধনীর দুলালী এক দেশ-সেবক দরিদ্র যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সব রচনাই নারীর। এখানেও পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

তরুণ-তরুণীরা কবিতা ও গল্পে আপনাদিকে প্রকাশ করে। তারা যা চায়, সেটা বেরিয়ে পড়ে। আমি বুঝলাম এদের এত আস্ফালন, সেটা সাময়িক। যৌবনের চাঞ্চল্য, কিছু করতে চায়।

আর এক দিন তারা চারিজন এসেছে। তাদের মধ্যে যে 'দেখে শুনে নিতে' চায়, সে আসে নাই।

"সে তেজস্বিনী আজ আসে নাই?"

"তার বিয়ে হয়ে গেছে।"

"বাঁচা গেল। এখন দিন-রাত দেখে-শুনে নিক।"

তারা হেসে উঠল।

কিছুদিন পরে এক দিন সন্ধ্যাবেলা এক চাকর-সঙ্গে তাদের একজন এল। সে কলেজে চতুর্থ বর্ষে পড়ত। সে কবি, 'তৃষিত হাসনা-হানার গন্ধে' লিখত। আমি বাইরে একটা বেঞ্চিতে বসেছিলাম। সে পাশে বসে' বললে, "দাদু, আমি শুনেছি, আপনি জ্যোতিষ জানেন, আমার হাতটা দেখুন।"

হাত বাড়িয়ে দিলে। আমি বুঝলাম, সে কি জানতে চায়। সে বিষয় নিয়ে হাসি-খেলা উচিত নয়।

"হাত-গণা, কোষ্ঠী-গণায় তোমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে? যদি থাকে, তাহ'লে এও বিশ্বাস করতে হবে, তোমার জন্মকালেই তোমার যাবজ্জীবনের দশা নিরূপিত হয়ে গেছে। কারও সাধ্য নাই, তার অন্যথা করে। যদি সুখ থাকে, সুখ আসবেই। যদি দুঃখ থাকে, দুঃখ আসবেই। যখন দুঃখের প্রতিকার নাই, তখন আগে হ'তে সেটা জেনে দুঃখ বাড়িয়ে ফল কি?"

সে বিষণ্ণ-মুখে চলে' গেল।

কিছুদিন পরে তার বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেল। সে অন্য স্থানে চলে' গেল। সে পাস হ'ল। আর শুনলাম তার বিয়েও হয়ে গেছে।

তরুণী-সঙ্ঘের দুটি খসল। এম-এ পাস মেয়েটির অভিভাবক বদলি হয়ে গেলেন, সেও গেল। এক বৎসর

পরে তার বিবাহে নিমন্ত্রণ-পত্র পেলাম। যে তাদের কাগজে উপন্যাস লিখছিল সে ধনীর দুলালী, নিকটের এক যুবকের সহিত বিবাহপাশে বদ্ধ হ'ল। সে একেই চেয়েছিল।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সঙ্ঘ ভেঙ্গে গেল। তাদের মাসিকপত্রও তিন সংখ্যার পর অদৃশ্য হ'ল। দু'জন অচল-অটল। দেখতে সুশ্রী, অক্লেশে বিয়ে হতে পারত। কিন্তু তারা দেশসেবা ছাড়তে পারবে না। আর যে কিছু করত না, তাও নয়। সে বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় এখানে তিন-চারি জায়গায় অন্নসত্র খোলা হয়েছিল। তারা এক সত্র চালাবার ভার নিয়েছিল। তাদের কড়া নজরে একটি দানাও চুরি হয় নাই। আর একবার জল-ঝড়ে অনেক দরিদ্র লোকের চাল উড়ে গেছল। ছেলেপিলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে, স্থান ছিল না। কেউ দেখে না। এরা এক দিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যেয়ে তাদের দুঃখের কথা জানিয়ে প্রায় হাজার দুই টাকা মঞ্জুর করিয়ে আনলে। এই রকম কাজ করত, আর কাজের অভাব হ'লেই ছট্‌ফট্ করত। আমি সব জানতাম না, তারা আমার কাছে আসত না।

এক দিন কি উপলক্ষ্যে শ্রীমতী প্রীতি সকালবেলা আমার কাছে এসেছিল। একটা খবরের কাগজ পড়তে লাগল। আমি একটু দূরে কি কাজ করছিলাম। পড়তে পড়তে সে বললে, "দাদু, Love marriage is never happy." (প্রেম-বিবাহ কখনও সুখের হয় না)।

"তোমার সে চিন্তা কেন ?"

"না দাদু, আমি পাঁচ-ছ'টা কেস (case) জানি। প্রথম প্রথম বেশ ছিল, তারপর খিটিমিটি। তারপর এমন দাঁড়িয়েছে, কেউ কারও মুখ দেখে না।"

তার কথায় বুঝলাম, সে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু ঠিক করতে পারছে না। ইতিমধ্যে অপরটি খসে' ছিল। আরও মাস কতক পরে শ্রীমতী প্রীতিও খসল। বোধ হয়, ভয় বিবাহে দ্বেষ-ভাবের গূঢ় কারণ, উত্তেজনা একটা কাল্পনিক আবরণ। তারা সময়ে বিয়ে করে'ও দেশসেবা করতে পারত।

২। কন্যাটি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে এম-এ পাস, এক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। বয়স হয়েছে, বিবাহ হয় নাই। শুনলাম সে মাতা আনন্দময়ীর শিষ্যা হয়েছে, সন্ন্যাসিনীর মত দিন কাটাচ্ছে। এক দিন যেয়ে দেখলাম, সরু নরুনপেড়ে ধুতী পরে আছে। মাথার চুল রুক্ষ, পিঠে এলিয়ে পড়েছে। মুখ নিষ্প্রভ। সে 'রাঙ্গাবাস' পরলে তাকে যোগিনী মনে হ'ত। আমি একবার তাকে হাসাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেছল। কন্যার রূপ ছিল না, বরং মনে হ'ত পুরুষের মুখ। এক দিন শুনলাম, গোপনে তার বিয়ে হয়ে গেছে। বর ও কন্যার পিতামাতা এ সংবাদ শুনে মর্মাহত হ'লেন। প্রেম-বিবাহে যোগ্যাযোগ্য বিচারের ধৈর্য থাকে না, উত্তমের সহিত অধমের মিলন প্রায়ই ঘটে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। বিবাহের বৎসর দেড়েক পরে আমি তাকে দেখতে গেছলাম। তখন সে রঙ্গিন শাড়ী ও হাতে দু-একখানা গয়না পরেছিল। আমি গেলে তার মুখে হাসিও ফুটে উঠেছিল।

"দেখ, তুমি প্রত্নতত্ত্বান্বেষণে এত রত ছিলে, সে প্রবৃত্তি কোথায় গেল ?"

নিকটে একটি ছোট খাটে এক শিশু শুয়ে ছিল। সে তাকে দেখিয়ে দিলে। সে পুনঃ পুনঃ শিশুর প্রতি অনিমেষ দৃষ্টিতে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, উত্তর দিলে না।

বিবাহের সময় তার বয়স ৩৬ বৎসর। তার পিতা নির্ধন ছিলেন না, অনেকবার জেদ করেছিলেন, কিন্তু কন্যা বিবাহে সম্মত হয় নাই। বোধ হয়, সে যেমন বর ইচ্ছা করেছিল, তেমন পাবার আশা ছিল না ভেবে সন্ন্যাসিনী হ'তে গেছল। দু-তিন বৎসর হ'ল সে পরলোকে গেছে।

গান্ধর্ব-বিবাহ ও প্রেম-বিবাহ এক নয়। গান্ধর্ব-বিবাহে গুরুজনেরা বর-কন্যা বাছেন না, তারা নিজেরাই বাছে। অন্য বিষয়ে অপর বিবাহের তুল্য। সবর্ণে বিবাহ, কদাচিৎ অনুলোম বিবাহ হ'ত। বর অবশ্য দেখে কন্যা তার পিতার সাত পুরুষের ও মাতার পাঁচ পুরুষের মধ্যে না হয়। ইহা বৈজ্ঞানিক বিধি। প্রায় ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এই বিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রেম-বিবাহে জাতিকুলের বিচার থাকে না।

এই রকম আরও শুনেছি। দুটি উচ্চশিক্ষিতার কথা মনে পড়ছে। দু-জনেই দেশপ্রেমী, দু-জনেই দেশহিতব্রত গ্রহণ করেছিল, নিজেদের সুখ চিন্তা করে নাই। কিন্তু ৩৬।৩৭ বৎসর বয়সে বিবাহ করে' ঘরকন্না করছে।

কোন কারণে বিবাহ না হলে সকল কন্যারই শূন্য হৃদয় হাহাকার করতে থাকে। বালবিধবাদেরও সেই দুঃখ, যে দুঃখ দেখে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় কেঁদে উঠেছিল। কেহ কেহ মনে করেন, প্রেম-বিবাহ প্রচলিত হলে বিবাহ-সমস্যার পূরণ হবে। তাঁরা ভ্রান্ত। পশ্চিমদেশে প্রেম-বিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু অসংখ্য বৃদ্ধা কুমারীও আছে।

শিক্ষিত বংশের ও নগরবাসীর কন্যাদের বিবাহ-চিন্তা করছি। তাদেরই বিবাহ এক সমস্যার মধ্যে দাঁড়িয়েছে।

অশিক্ষিত কিম্বা গ্রামবাসীদের মধ্যে এ সমস্যা নাই। মেয়ে গোরা কি কালো, সে চিন্তাও তত প্রবল নয়। কন্যাদের বিবাহ কেন দুর্ঘট হয়েছে? এর তিন কারণ দেখতে পাওয়া যায়। ১। যুবকদের মনোভাবের পরিবর্তন। তারা আত্মম্ভরি হয়েছে।

২। ভয়। "যাকে বিয়ে করব, সে কেমন হবে, কে জানে?"

৩। দেশের দারিদ্র্য। যুবকদের বিবাহের একটা বয়স আছে। সে বয়স পেরিয়ে গেলে সে বিবাহের জমা-খরচ কষতে বসে। ভাবে, একটি পরের মেয়ের অশন-বসন-ভূষণ-প্রসাধন যোগাতে পারলেও তাকেই তার পুত্রকন্যাদের লালন-পালন করতে হবে। আজ ভুতোর জ্বর, কাল ছেনীর কাসি, ডাক্তারের বাড়ী ছুটাছুটি। সে যে কি খরচ আর কি উদ্‌বেগ! বাবা! আমি একা মানুষ, এত পেরে উঠব কি করে'? বেশ আছি। সকালে চা খাই, খবরের কাগজ পড়ি, দশটার সময় হোটেলে খাই, আপিসে যাই, ৪টার সময় ফিরি, বন্ধুরা আসে, চা পান করি, সকলে মিলে সিনেমা দেখতে যাই। আবার হোটেলে খেয়ে বাড়ী ফিরি। আর, সিনেমা-নক্ষত্রদের রূপ ধ্যান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ি। বেশ আছি, নির্ঝঞ্ঝাট। ছুটি পেলে যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে' যাচ্ছি, কেউ পেছু ডাকে না। এই তো স্বাধীনতা।

কিন্তু বছর দশ পরে এই নিঃসঙ্গ-দশা ভাল লাগে না। তখন সে এক সঙ্গিনী খোজে। আপিস হ'তে ফিরে এসে সে এমন একজনের অভাব বোধ করে, যাকে নিয়ে তার শূন্য গৃহ পূর্ণ করতে পারে। ৩৫।৩৬ বৎসর বয়স হ'লে বিয়ে না করে' থাকতে পারে না। যেমনই হউক, নিজের একটি বাসায় কপোত-কপোতীর ন্যায় সুখে-শান্তিতে কাল কাটাতে চায়।

২। কেহ কেহ দেখে, বিবাহ করা আর অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া একই কথা। তিনি যে কেমন হবেন, কিছুই জানা নাই। সকল নারীই সুশীলা নয়, সকল নারীই পতি-গতপ্রাণা নয়। সংস্কৃতে একটা বচন আছে, "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।" স্ত্রীর চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্য, দেবতারা জানেন না, মানুষের কথা কি। এই দেখ না মিহিরের কি দশা হয়েছে। স্ত্রীটি রত্নই বটে, দিন রাত মানেই বসে' থাকেন। বুঝতে হবে, তিনি কি চান। মিহির বেচারী কতই বা মান ভাঙ্গাবে? তার দশা দেখে কান্না পায়। আমি বিহঙ্গম, উড়ে বেড়াই, আর, সে পিঞ্জরের পাখী। আরও দেখছি, কত পরিবারে খিটিমিটি লেগেই আছে। যেখানে এত অনিশ্চিত, সেখানে কেন যাই?

সত্য বটে, বিবাহরূপ ব্যাপারে অনেক অনিশ্চিত থাকে। তথাপি লোকে বিবাহ করে, অধিকাংশ লোক সুখে-শান্তিতে জীবন কাটায়। আমাদের জীবনের পদে পদেই অনিশ্চিত। কাল কি ঘটবে, কেউ জানে না। কিন্তু সর্বদা কি ঘটে, সেই দেখেই আমরা জীব-যাত্রা নির্বাহ করি। ভবিষ্যতে কি ঘটবে, তা জানবার জন্য পূর্বকালে লোকে ব্যাকুল হ'ত, এখনও হয়। এই কারণেই লোকে বরকন্যার কোষ্ঠী নিয়ে দৈবজ্ঞের বাড়ী যায়। কিন্তু গণনার ফল মেলে না, এই কারণেই বিবাহের পূর্বে বর-কন্যা বাছাই করে। প্রেম-বিবাহের দোষই এই, সেখানে বাছাই নাই, সমস্তই অন্ধকার। অতি অল্প লোকে, যারা দুর্বল-দেহ ও দুর্বল-চিত্ত, তারাই ভবিষ্যতের ভয় করে। যৌবনে সাহস বাড়ে। ভবিষ্যতের ভয় সাময়িক দুর্বলতা। সুবিধা হ'লেই তারা বিবাহ করে।

৩। দেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যই কন্যাদের বিবাহের প্রধান অন্তরায় হয়েছে। যে আপনাকে ভরণ-পোষণ করতে পারে না, সে আর একটির ভার কেমনে নিবে? যারা ধনবান, তাদের কন্যাদের বিবাহ আটকাচ্ছে না। আর, যারা কায়িক পরিশ্রম করে' জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তাদেরও বিবাহ-আটকাচ্ছে না। যে মধ্য-শ্রেণী সমাজের মেরুদণ্ড হয়েছিল, তাদের দুর্দশার সীমা নাই। আর, তাদেরই কন্যাদের বিবাহ দুর্ঘট হয়ে পড়েছে। সেইরূপ, মধ্য শ্রেণীর যুবকেরাও অন্নবস্ত্রের চিন্তায় কাতর হয়েছে, বিবাহ-চিন্তা করতে পারে না।

যাদের সঙ্গে যে মেশে, তারাই তার সমাজ। প্রত্যেকের সমাজের জীবনোপায়ের মানদণ্ড পৃথক্। কেহ সে মান-দণ্ডের বাইরে যেতে পারে না। আমরা প্রাণের চেয়ে মানের মূল্য বেশী ধরি। তার সাক্ষী, প্রসিদ্ধ ডাক্তার যা উপার্জন করেন, উকীল, ব্যারিষ্টার তার বহু গুণ অধিক করেন। সে অর্থনীতিবিদ্ অতিশয় নিষ্ঠুর, যিনি বলেন, তুমি রিক্শা টান, প্রত্যহ ছ-সাত টাকা পাবে। তিনি টাকাই দেখেন, মানুষের মন নামে যে একটা পদার্থ আছে, তা তাঁর স্মরণ হয় না। তাঁরা হিসাব করেন, আমাদের দেশে এত লোক মেলেরিয়াতে ভুগে, তারা এত দিন কর্ম করতে পারে না, দেশে বৎসরে বৎসরে এত টাকা লোকসান হচ্ছে। তাঁদের কাছে শারীরিক ও মানসিক দুঃখভোগ কিছু নয়, টাকার হিসাবই বড়। তাঁরাই বলবেন, "বাপু, তুমি বিবাহ করো না।" কিন্তু যদি যুবকেরা বিবাহ না করে, কন্যারা কোথায় যাবে? সমাজ কেমনে টিকবে?

অধিকাংশ যুবক নিজের সামাজিক মানদণ্ড অতিশয় দীর্ঘ করে। কলিকাতায় একখানি বাড়ী, পাঁচ হাজার টাকার একটা মোটর, আর মাসিক বাঁধা আয় পাঁচ-শ টাকা না থাকলে ভদ্রলোকের মত থাকতে পারা যায় না, বিবাহও করতে পারা যায় না। এই অতিরিক্ত সুখ-ভোগ-স্পৃহা আমাদের দেশের অকল্যাণের মূল হয়েছে। এ স্পৃহা কমাও, আর দেখবে, অনেক যুবক বিবাহ করে' তাদের উপস্থিত আয় দ্বারাই স্বচ্ছন্দে সংসার চালাতে পারছে।

যে রাজ্যে প্রজারা সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে না, সে রাজ্য টিকে না। সে রাজ্যে অন্তঃকোপ হবেই হবে। বিপ্লব তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। বিবাহ একটা দৃঢ় বন্ধন, মানুষকে স্থির রাখে। সমুদ্রে তুফান উঠেছে, তরী টলমল করছে, নাবিক নোঙ্গর ফেলে দেয়, তরী স্থির হয়। নরের নোঙ্গর নারী, নারীর নোঙ্গর নর। নোঙ্গরের রজ্জু উভয়ের প্রেম। প্রেম যত গাঢ় হয়, রজ্জুও তত দৃঢ় হয়, তুফানে ছিঁড়ে না। যাতে নরনারী পরস্পর প্রেমে বদ্ধ থাকে, উদ্‌ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে না বেড়ায়, সেজন্যই বিবাহ মানব জীবনের একটা বড় সংস্কার বলে' গণ্য হয়েছে। সকলেই জানেন, যে গ্রামে দু-পাঁচটি আইবুড়া ষণ্ডা থাকে, সে গ্রামের গৃহস্থেরা বউ-ঝি নিয়ে সর্বদা সন্ত্রস্থ থাকে। এই উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারেরা আদেশ করেছেন, "তুমি বিবাহ করে' গৃহস্থ হবে, পুত্র উৎপাদন করবে। না করলে তোমার পূর্বপুরুষেরা চিরকাল নরকে পচতে থাকবেন।" ইহার অপেক্ষা গুরুতর শপথ তাঁরা কল্পনা করতে পারেন নাই। পূর্বকালের লোকেরা পিতৃ-পুরুষকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করত। আর যে পিতৃ-পুরুষকে অস্বীকার করে, সে ত পশু।

অতএব, কন্যাদের বিবাহ-চিন্তা মাত্র একটা সামাজিক প্রশ্ন নয়, ইহা রাজনীতির প্রধান সমস্যা। অন্নচিন্তার পর বিবাহচিন্তা, আহার ও বিহার—এই দুই কর্ম জীবকুল বাঁচিয়ে রেখেছে। এই দুই সমস্যা অবহেলা করাতেই দেশে চার্বাকী অর্থাৎ কম্যুনিষ্টের উৎপত্তি হয়েছে। যুবক-যুবতী দেখছে, সম্মুখে অন্ধকার, পশ্চাতে অন্ধকার, চারি পাশেই অন্ধকার। আলো নাই, কি করবে, কোন্ পথে যাবে, ভেবে পাচ্ছে না। "ভোজনং যত্র কুত্রাপি শয়নং হট্টমন্দিরে।" যেখানে পায় সেখানে খায়; যেখানে পায় সেখানেই শোয়। বন্ধন নাই।

যুবকেরা ও বালিকারা ইস্কুল-কলেজে এমন শিক্ষা পায় না, যাতে তারা কল্যাণ-পথ দেখতে পায়। এমন বই পড়ে না যাতে তাদের চিত্তের সাম্য আসতে পারত। পড়ে সংবাদ-পত্র আর গল্প। সংবাদ-পত্রে যা পড়ে, তা হাওয়ায় উড়ে যায়, গল্পে যা পড়ে, তা' মনে দাগ বসায়। গল্প পড়ে' পড়ে' তারা 'কল্পলোকে' বিচরণ করে, যে লোক নিছক মিথ্যা। 'ট্রেনে এক রাত্রি' যেতে যেতে হঠাৎ 'থির বিজুরী' দেখে তারা মনে করে, পৃথিবীতে কেবল বিদ্যুল্লতাই আছে, বজ্র নাই। পুরীর সমুদ্রতটে সৈকত-পুলিনে সাত দিন সকালে সন্ধ্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু 'সাগরিকা'র সন্ধান পায় না।

কুমারী রাত্রে ছাতে শুয়ে আছে, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে' রাজপুত্র এসে তাকে সুবর্ণপুরীতে নিয়ে গেল। সেখানে সূর্যের প্রকাশ দরকার হয় না। হীরা-মাণিকের অগণ্য গাছ আছে, তাতে অজস্র মুক্তা ফলে। এত ফলে যে সকালে দাসীরা ঝেঁটিয়ে সরাতে পারে না। কখনও দেখে, তেপান্তর মাঠ দিয়ে চলেছে, সমুখে, পেছুতে, পাশে লোকালয় নাই। অকস্মাৎ কোথা হ'তে এক মীস কালো দুষমন এসে তার পথ আগলেছে। এমন সময় রাজপুত্র এসে অসি তুলে তাকে ধরাশায়ী করলে। কিন্তু, হায়! রাজপুত্র দূরে থাক, কোটাল-পুত্রেরও দেখা নাই। এই রকমেই তাদের শিক্ষা চলতে থাকে।

উপন্যাস-লেখক বলছেন, আমরা আনন্দ-রস বিতরণ করি, হিতোপদেশ করি না। সে রস গরল কি অমৃত, সে চিন্তা আমাদের নয়।

কারও চিন্তা নয়। কিন্তু আকাশে শোনা যাচ্ছে—"যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে?"

যুবকেরা বলছে, "আমরা রোধিব। চলে' এস, আমরা সব সেঙ্গাৎ, আমাদের দলে ভিড়ে যাও, আমাদের সেঙ্গাৎনী হও।" তখন সব সেঙ্গাৎ ও সেঙ্গাৎনী মিলে সমাজ-দ্রোহী ও রাষ্ট্র-দ্রোহী হয়ে পড়ে। তারা বলে. "যা কিছু আছে, সব ভেঙ্গে ফেল। ভেঙ্গে ফেললেই দেখবে, নন্দন কানন গজিয়ে উঠেছে। সেখানে গাছে গাছে রসাল অমৃত-ফল ধরেছে, গন্ধর্বে গান গায়, অপ্সরা নৃত্য করে।"

সেই কারণেই বলছি, কন্যাদের বিবাহ-সমস্যা কেবল সামাজিক সমস্যা নয়, রাষ্ট্রীয় সমস্যাও বটে। কিন্তু বর্তমান ভারতরাষ্ট্র বলছেন, "আমরা নর-নারীকে সমান মনে করি। সকলকেই শিক্ষা-দীক্ষায় ও রাজকার্যে সমান অধিকার দিয়েছি। তোমরা নিজের নিজের পথ বেছে নাও। কিন্তু বিবাহিতা নারীকে রাজকার্যে নিব না।" শিক্ষিতা নারীকে অন্ন-চিন্তা করতে হচ্ছে। সে রাজসেবা চায়। রাষ্ট্র বল-ছেন, তুমি বিবাহ না করলে রাজসেবার উপযুক্ত হবে। অর্থাৎ, পাকে-প্রকারে রাষ্ট্র কুমারীদের বিবাহের বিরোধী হয়েছেন। অভাগা দেশে কন্যারা দাসী হচ্ছে, পুত্রদের প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে। পুত্রেরাই খেতে পরতে পায় না, কন্যারা

চাকরিতে ভাগ বসাচ্ছে। নর-নারীর কর্মভেদ উঠে যাচ্ছে। হে দেশ-চিন্তক, আপনি কি ইহাই চান?

কিন্তু অন্ন-চিন্তাই একমাত্র চিন্তা নয়। কে সংসার-সমুদ্রে কন্যাদের নোঙ্গর হবে? যে অফুরন্ত প্রেম নিয়ে নারীর জন্ম হয়, যার সন্তান-স্নেহের তুলনা নাই, বিবাহ না হ'লে কেমনে এ সব চরিতার্থ হবে? অতএব বিবাহের অন্তরায় দূর করতে হবে।

১। (১) কন্যাকে এমন শিক্ষা দাও, যাতে সে কাচ ও কাঞ্চনের মূল্য বুঝতে পারে, বিবিয়ানা শিখবে না, বসন ভূষণের প্রতি আসক্ত হবে না। (২) কন্যাকে ধর্ম-শিক্ষা দাও, যে ধর্ম সদাচার। (৩) কন্যাকে শিক্ষিকা হবার যোগ্য কর। নানা প্রকার শিক্ষিকার প্রয়োজন আছে। যথা —বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করাবে। গীত শিক্ষিকা বালিকাদিকে গান গাইতে শেখাবে। সূচি-কর্ম শিক্ষিকা নানাবিধ সূচিকর্ম শেখাবে। ভোজ্য-শিক্ষিকা আমাদের আবশ্যক ভোজ্য প্রস্তুত করতে শেখাবে, যেমন— ডাইলের বড়ী দেওয়া, নানাবিধ ফলের আচার করা, মোরব্বা করা, মুড়ি ভাজা, মুড়কি করা, অন্ন-ব্যঞ্জন পাক করা, ইত্যাদি। আমি বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠ্য গৃহস্থালী ও রন্ধন-শিক্ষার বই দেখেছি। কিন্তু সে সব ধনবান্ পশ্চিম দেশের। আমাদের দেশে কয়জন পাকা ঘরে থাকে? অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজ্য প্রস্তুত করবার উপদেশে দেখি, রন্ধনের যুক্তি আছে, অর্থাৎ কি কি উপকরণ কি কি পরিমাণে চাই। কিন্তু এর মধ্যে যে বিজ্ঞান আছে, তার কিছু মাত্র উল্লেখ থাকে না। কন্যা মাটির ঘরে থাকবে, তাকে ঘর নিকাতে হবে। কেন মাটির সঙ্গে গোবর মেশান চাই, তার কোন উল্লেখ থাকে না। কেমন করে' সুদৃশ্য উনান পাততে হয়, যাতে কাঠের অপচয় হবে না, কন্যারা সে শিক্ষা কোথায় পাবে? কেমন করে' সন্তান-পালন করতে হয় ও মুষ্টিযোগ দ্বারা সামান্য সামান্য রোগের চিকিৎসা করতে হয়, কন্যাকে সে জ্ঞান দিতে হবে।

কন্যারা এইরূপে শিক্ষিতা হ'লে অল্প আয়ের যুবকেরাও অসঙ্কোচে তা'দিকে বিবাহ করতে চাইবে। কালো মেয়ের বিবাহ হয় না, এমন নয়। শীলবতী ও গুণবতী কন্যা চির-কুমারী হয়ে থাকে না। এমন যুবকও আছে, যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী কন্যা কালো হ'লেও পছন্দ করে। প্রয়োজন হ'লে স্ত্রীও অর্থ উপার্জন করতে পারবে। আর, যে সকল কন্যার বিবাহ হবে না, তারাও তাদের ভাই-এর সংসারে বাস করে' নিজের ভরণ-পোষণের উপায় করতে পারবে।

২। আইন দ্বারা বরপণ ও কন্যাপণ নিষিদ্ধ করতে হবে। এই দুই পণ বরের ও কন্যার পিতা খরচ করেন, কন্যা পায় না। এই সেদিন বিহার রাজ্যে বরপণ নিষিদ্ধ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই বা হবে না কেন? বরপণের একটা গুণ আছে, মেয়ে যেমনই হউক, অর্থশালী কন্যার পিতা অক্লেশে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে পারেন। কিন্তু কয়টি কন্যার পিতা অর্থশালী? আইনে বরপণ ও কন্যা-পণ নিষিদ্ধ হ'লেও গোপনে কিম্বা অন্য প্রকারে বর ও কন্যার পিতা টাকা আদায় করতে পারেন। তথাপি সাধারণের পক্ষে এই নিষেধের ফল ভালই হবে।

৩। বিবাহে ব্যয়বাহুল্য কমাতে হবে। ইহা আইনের কর্ম নয়। সমাজ-হিতৈষী মাত্রেরই চিন্তা করা উচিত যে সমাজের প্রতি তাঁরও কর্তব্য আছে, তিনি সৎ-দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন।

৪। বঙ্গদেশে অসংখ্য জাতির উৎপত্তি হয়েছে। এক ব্রাহ্মণদের মধ্যেই কত জাতি আছে—রাঢ়ী, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্ত্য বৈদিক, দাক্ষিণাত্য বৈদিক, সপ্তশতী, কনৌজ, মধ্যশ্রেণী, উৎকলশ্রেণী, অগ্রদানী, বর্ণ-ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। রাম ও শ্যামের কন্যার আদান-প্রদান হ'তে পারলে তারা এক জাতি, অন্যথা নয়। এক্ষণে আহারে জাতিভেদ উঠে যাচ্ছে, কিন্তু বিবাহে জাতিভেদ এখনও অটুট আছে। পূর্ব কালের মত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, এই চারি বর্ণে বর্তমান হিন্দু সমাজকে বিভক্ত করলে কোনও দোষ হয় না। হিন্দু শাস্ত্র বলেন, সবর্ণে বিবাহ ভাল। কিন্তু বলেন না, এক এক বর্ণের অসংখ্য জাতি ও উপজাতির মধ্যে বিবাহ অকল্যাণ-কর। আর, দেখাও যাচ্ছে, বিবাহে উপজাতিভেদ ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে আসছে। কন্যার পিতার একটু সাহস হ'লেই তিনি অনেক যোগ্য বর খুঁজে পাবেন।

শাস্ত্রকার সবর্ণে বিবাহ কেন শ্রেষ্ঠ বলেছেন, একটু অনু-ধাবন করলেই বুঝতে পারা যায়। এক এক বর্ণের বিশেষ বিশেষ গুণ ও কর্ম লক্ষ্য হয়েছিল। এখন দেখা যায়, সকল বর্ণের গুণ ও কর্ম এক হয়ে গেছে। আকারে, বর্ণে, আচারে ও শিক্ষায়, চতুর্বর্ণ পৃথক করতে পারা যায় না। এরূপ স্থলে পূর্বকালের বর্ণভেদের সার্থকতাও নাই। অবশ্য সামাজিক ব্যবধান চিরকাল থাকবে। মুসলমানদের মধ্যে জাতি-ভেদ নাই। কিন্তু বিবাহে সামাজিক ভেদ আছে। পশ্চিম দেশেও এই ভেদ আছে। মোট কথা, সমান ঘর ও যোগ্য বর পেলেই কন্যার বিবাহ চলতে পারবে এবং আজ না চলুক, দু-দিন পরে চলবেই চলবে। (যিনি আমাদের বিবাহের মূল তত্ত্ব জানতে চান, তিনি পড়তে পারেন, *"The Eugenics of Hindu Marriage"* in *Ancient Indian Life* by J. C. Ray. Sen, Ray & Co, College Square, Calcutta.)

৫। কখনও কখনও দেখা যায় কন্যার পিতার কিম্বা ভ্রাতার অবহেলা বা অবিবেচনাহেতু তার বিবাহ হয় না। আমি দুটি উদাহরণ দিচ্ছি।

(১) কন্যা রূপবতী, শীলবতী, এম-এ, বি-টি পাস। কুলীন বংশ, পিতামাতা নাই। ভাইরা কুলরক্ষার নিমিত্ত অযোগ্য পাত্রের সহিত তার বিবাহ-সম্বন্ধ করছে। কন্যা তেমন পাত্র কিছুতেই চায় না। মৌলিক কুলে যোগ্য পাত্র পাওয়া যেত, কন্যার আপত্তি হ'ত না। কিন্তু ভাইদের অবিবেচনাহেতু কন্যা তার অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিয়ে মর্মান্তিক দুঃখ ভোগ করছে। আমি তার এক মিতিনের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনেছি। কন্যাটি কায়স্থ।

(২) কন্যা এম-এ পাস। কায়স্থ। তেমন রূপ নাই বটে, কিন্তু কুশ্রী নয়। মা নাই, পিতা ধনাঢ্য। তিনি কন্যার বিবাহে উদাসীন ছিলেন। তিনি মারা গেছেন, ভাইরাও উদাসীন। অল্পদিন হ'ল এক রেল-ষ্টেশনের বিশ্রাম-গৃহে তার এক মিতিনের ছোট বোন কথায় কথায় বলে' ফেলছিল, "তোমার এখনও বিয়ে হয় নাই?" আর, সেই অনূঢ়া ধৈর্য ধরতে পারে নাই। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আধ ঘণ্টা কেঁদেছিল। সেই ছোট বোনের ভগ্নীপতির মুখে আমি এ কথা শুনেছি।

এই দুজনের মা থাকলে তাদের এ দশা হ'ত না। মা মেয়ের দুঃখ বুঝতে পারেন। ২০।২৫ বৎসরের আইবুড়া মেয়ে থাকলে মায়ের মুখে অন্ন রুচত না। এই রকম আরও কত মেয়ে আছে। ২০।২৫ বৎসরেরও বেশী বয়স হয়েছে, বিবাহ হয় নাই। কন্যাদের এই দুরবস্থা দূর করতে হবে। মনু আদেশ করেছেন, এরূপ কন্যা নিজে 'সদৃশ' বর গ্রহণ করবে। আইনেও প্রাপ্তবয়স্কা নারী নিজের ইচ্ছামত বিবাহ করতে পারে। মনুর আজ্ঞা বর্তমান লোকাচার-বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু যে সময়ে এই লোকাচারের উৎপত্তি, সে সময়ে কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ হ'ত। আর, সকল কন্যারই হ'ত। তিনি কন্যার ১৫ বৎসর বয়স হ'লে তাকে এই স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আমরা সে স্থলে ২০ বৎসর করতে পারি।

হিন্দু-কোড-বিল।

কয়েক বৎসর হ'ল, ভারত-পরিষদে হিন্দু-কোড-বিল নামে এক আইনের প্রস্তাব হয়েছে। আর সমগ্র হিন্দু সমাজ, আকুমারিকা হিমাচল বিশাল ভারতের অসংখ্য সামাজিক স্তরের চব্বিশ কোটি নরনারী বিক্ষুব্ধ ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। প্রস্তাবের শোধন, সংশোধন ও পরিশোধন হয়েছে, তথাপি তারা এ প্রস্তাব সমাজ-বিপ্লবী মনে করছে। অসংখ্য সভাসমিতি 'ত্রাহি ত্রাহি' করেছে, কিন্তু প্রস্তাব-কর্তারা অটল অচল। অর্থাৎ তাঁরা যেমন জ্ঞানী, ভবিষ্যদ্দর্শী সমাজ-হিতৈষী, তেমন অপর কেহ নয়। কে তারা, যারা এইরূপ আইন চায়? তারা কি হিন্দু? তারা কি পরলোকে বিশ্বাস করে? তারা কি হিন্দুর সংস্কৃতির সমাদর করে?

পতি সৌভাগ্যবতী নারী এই আইন চাইবেন না। যে অভাগী নারী সে সুখে বঞ্চিত, সে-ই এই আইন চাইবে। কিন্তু তার জীবন তিক্ত হয়ে গেছে, সে প্রকৃতিস্থ নাই। হিন্দু-কোড্-বিলের আরম্ভে বলা হয়েছে, The Progressive Elements of the Hindu Society এইরূপ আইন চায়। এই Progressive শব্দটা শুনলেই আমার ভয় হয়। কারণ, এ পর্যন্ত আমি এই শব্দটার বিশদব্যাখ্যা শুনতে পাই নাই। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়েছে, "What is progress, my friend? বন্ধু, আপনি কাকে অগ্রগতি বলেন?" 'প্রগতি' শব্দ পুনঃ পুনঃ শুনতে পাই, কিন্তু কেহ তার অর্থ বুঝিয়ে দেন নাই। "হে প্রগতি-বাদী বন্ধু, আপনার গন্তব্য কি? পথ কি? কোনও দৃষ্টান্ত দিতে পারেন?" উত্তর নাই। কিন্তু বুঝি, তাঁরা পশ্চিম-দেশের অনুকরণ-প্রয়াসী। পশ্চিমদেশ ধনে, মানে, বিদ্যায়, বিজ্ঞানে, রাজনীতি-যুদ্ধনীতি, এই সকল বিষয়ে ভারত অপেক্ষা বড়, কিন্তু সে দেশের নরনারী কি সুখে ও শান্তিতে কালযাপন করছে? বিজ্ঞান তাদের সুখের অসংখ্য উপকরণ জুগিয়েছে, কিন্তু তারা সুখে আছে কি?

এখানে আমি হিন্দু-কোড-বিলের মাত্র তিনটি ধারা সম্বন্ধে কিছু লিখছি।

১। কন্যাকে পুত্র-তুল্য জ্ঞান করে' পিতার সম্পত্তির ভাগ দিবার প্রস্তাব হয়েছে। পণ্ডিতেরা কেমন করে' এ প্রস্তাব করলেন, আমি ভেবে পাই না। এর অন্য কু ফল দূরে থাক, কোনও ভাই আর তার ভগ্নীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা করবে না। কারণ, বিবাহ দিলেই পৈতৃক সম্পত্তির অংশ অন্য কুলে চলে' যাবে। আর, সে সম্পত্তি নিয়ে ভাই-এর সঙ্গে ভগ্নীর মনান্তর ও বিবাদ চলতে থাকবে। একে কন্যাদের বিবাহ দুর্ঘট হয়েছে, তার উপর এই বিধি হ'লে অধিকাংশ কন্যার বিবাহ হবে না। হে বন্ধু, আপনি কি কন্যাদের বিবাহ চান না?

এর পরিবর্তে, যদি এই বিধি হয় যে, অবিবাহিতা ভগ্নী ভ্রাতার সমান ভাগ পাবে, তা হ'লে সে ভগ্নী নিজের অধিকারে পিতৃগৃহে বাস করতে পারবে, কোনও ভ্রাতার অনুগ্রহপ্রার্থী হবে না। কিন্তু তার বিবাহ হয়ে গেলে সে আর সে সম্পত্তি পাবে না, তার স্বামীই তাকে ভরণ-পোষণ করতে থাকবে। স্বামী-স্ত্রীর একই স্বার্থ। স্বামী তার পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করবে, স্ত্রীও করবে।

সাবোটাজ। যাশদির নিকট পাঞ্জাব মেল ধ্বংস

চিত্রে কোচ স্ক্রু ঢিলা করা, ফিসবোল্ট খোলা এবং সরানো রেলের অক্ষত অবস্থা লক্ষণীয়

ঐ লাইনের রেলের বোল্টের বিঁধ অক্ষত। রেল ও স্লিপার অক্ষত

(আনন্দবাজারের সৌজন্যে)

সাবোটাজ। রেললাইনে স্লিপারে ও রেলপথে লাইনচ্যুত করা ইঞ্জিনের আঘাতের ফল। নীচে ইঞ্জিন

(আনন্দবাজারের সৌজন্যে)

উভয়ের সংসার এক। স্বামী ও স্ত্রী স্বতন্ত্র নয়। স্ত্রীর পৃথক সম্পত্তির কোনও প্রয়োজন নাই। সে একেবারে নিঃস্বও নয়, সে বিবাহের সময় যৌতুক পায়, উৎসবে ও পর্বে প্রীতি-উপহার পায়। স্ত্রীকে স্বামীর সম্পত্তির কিছু অংশ দিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু স্বামী বর্তমানে সে ধর্মান্তর ও স্বামী-বিয়োগে ধর্মান্তর কিম্বা পত্যন্তর গ্রহণ করলে শ্বশুর-গৃহের সম্পত্তি হ'তে বঞ্চিত হবে।

২। বিবাহ-বিচ্ছেদ কথাটা শুনলেই প্রকৃত হিন্দু কানে আঙুল দিবেন। বেদের কাল হ'তে অদ্যাবধি কেহ কল্পনাও করে নাই, স্ত্রী স্বামী ত্যাগ করতে পারে। কোন্ কোন্ অবস্থায় স্ত্রী পত্যন্তর গ্রহণ করতে পারে, পরাশর তার বিধি দিয়ে গেছেন। ইহাই যথেষ্ট, দম্পতীর বনিবনাও না হ'লে বর্তমান আইনেই তার প্রতিকার আছে। যে নারী বিবাহ-বিচ্ছেদ খুঁজছে, সে বুঝছে না, সমাজের চক্ষে সে হীন বিবেচিত হবে। কে সে নারীকে বিবাহ করবে? যদি কেহ করে, তখনই সন্দেহ হবে, তাকে পাবার জন্যই সে বিবাহ-বিচ্ছেদ করেছে। বিধবাদের পুনর্বিবাহ হ'তে পারে। কিন্তু কয়জন বিধবার বিবাহ হচ্ছে? পশ্চিম-দেশেও পতিবিচ্ছিন্না নারী ভদ্রসমাজে বাহিরে না হউক, মনে মনে হীন বিবেচিত হয়। আমেরিকায় তিনটি বিবাহের একটি ভঙ্গ হয়।

৩। প্রস্তাব হয়েছে, এক পত্নী থাকতে কেহ দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করতে পারবে না। এই বিধি অনাবশ্যক। পূর্বকালেও অতি অল্প লোকের বহু পত্নী থাকত। এখন দেখতে পাওয়া যায় না। অতিশয় ধনবান্ ও বিলাসীরাও দ্বিতীয় দার গ্রহণ করতে ডরায়। এমনও দেখা গেছে, স্ত্রী বন্ধ্যা কিম্বা চিররুগ্না, সে স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করতে জেদ করেছে। সুতরাং এক পত্নী সত্ত্বেও দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণের পথ রোধ করবার আইনের কোনও প্রয়োজন নাই।

হিন্দু-কোড্-বিলের এই তিন ধারাই হিন্দু-সমাজকে ব্যাকুল করে' তুলেছে। কত মহিলা-সমিতি বিরোধী হয়েছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের জজেরা বিরোধী। তথাপি, যদি কেহ চান, তাঁরা প্রগতিসমাজ নাম নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ুন, আমাদের ধীরগতিদের কোনও আপত্তি নাই। ত্রিশ কোটি হিন্দুর দুই-তিন শত চলে' গেলে হিন্দু সমাজের অনিষ্ট হবে না।

কোন কোন ভারতীয় ইয়োরোপীয়দের তুল্য জীবন-যাপন করছে, তারা এক পৃথক সমাজ গড়ে' তুলছে। কেহ কেহ ইয়োরোপ আমেরিকার মেম বিয়ে করে' আনছে। কিন্তু মেমদিকে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী পাঠাতে হচ্ছে। আর পতিবিয়োগে মেমেরা 'ইতঃ নষ্ট স্ততঃ ভ্রষ্টঃ' হয়ে জীবন কাটাচ্ছে। প্রগতিসমাজ এই রকম হবে।

এই ভারতখণ্ডে অসংখ্য জাতি, অসংখ্য আচার, অসংখ্য সামাজিক ব্যবস্থা আছে। এই বহুত্ব হেতু রাষ্ট্রের কি ক্ষতি হয়েছে? আমাদের ধর্ম-ব্যবস্থাপকেরা কাল অনন্ত মনে করতেন। স্বাভাবিকক্রমে ধীরে ধীরে পরিবর্তনে সকলকে উন্নতির পথে যেতে দিতেন। বলপূর্বক অনার্যকে আর্য করতে চান নাই। এই কারণেই হিন্দু-সংস্কৃতি এত দিন টিকে আছে। খ্রীষ্টান মিশনারী আমাদের দেশের কত নিম্ন শ্রেণীর নরনারীকে খ্রীষ্টধর্ম দিয়ে সভ্য' করে তুলছেন। ফলে এই নূতন আলোকে তাদের চরিত্রের অধোগতি হচ্ছে, সভ্যতার যত পাপকর্ম শিখে ফেলছে। কিন্তু

চোরা না শুনয়ে কভু ধর্মের কাহিনী।

যে গতিক দেখা যাচ্ছে, মনে হয়, কালে মনুষ্য-সমাজ মধুমক্ষিকা-সমাজে পরিণত হবে। যে সকল নারীর বিবাহ হবে না, কিম্বা যারা কা-নারী, তারা সমাজের দাসী হয়ে থাকবে। তারা পরের সন্তান পালন করবে, পরের সেবা করবে। কদাচিৎ তাদের পদ-স্খলন হবে। এইরূপে কয়েক পুরুষ যেতে যেতে তাদের বিবাহ-ইচ্ছাই থাকবে না। এইরূপ বহু নরেরও বিবাহ-ইচ্ছা থাকবে না। তখন মনুষ্য-সমাজে পুং-স্ত্রী ব্যতীত নপুংসকের সংখ্যা বেড়ে উঠবে। মনুষ্য জাতি শীঘ্র বিলুপ্ত হবে না। নপুংসকের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রচুর সময় আছে এবং নপুংসকেরা সমাজের দাসরূপে জীবনযাপন করবে। নরনারীর কর্মভেদ অস্বীকার করলেই নপুংসকের সংখ্যাবৃদ্ধির পথ পরিষ্কার হবে।

অজ্ঞাত বিভীষিকা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

জগৎ ভরিয়া আজ ধূমায়িত দারুণ সংশয়,
জমে পুঞ্জীভূত মেঘ মানুষের মনের আকাশে,
সন্দেহ-আকুল চিত্তে সমুজ্জ্বল সূর্য্য নাহি হাসে,
সন্ত্রাসে শিহরে পৃথ্বী—চারি দিকে অজানার ভয়।
সৃষ্টি কি সার্থক হবে? অথবা সে ঘটিবে প্রলয়?
বদ্ধ-পাত্রে কি অনর্থ জালুকের জালে উঠে আসে,
আবরণ-মুক্ত হয়ে কোন্ দৈত্য এল তার পাশে?
ধূম নিল রূপ এ কি ভয়ঙ্কর, দারুণ, দুর্জ্জয়!

বিক্ষুব্ধ অন্তরে কবে প্রশান্তি সে ফিরিবে আবার?
শারদ আকাশ সম মন হবে প্রসন্ন নির্ম্মল,
অজ্ঞাত আশঙ্কা আর রচিবে না ছায়া-অন্ধকার,
মুছে যাবে, ঘুচে যাবে পরস্পর সন্দেহ প্রবল,
মানব করিবে রুদ্ধ দানবের কারাগার-দ্বার,
প্রেমে ও বিশ্বাসে হবে এ জীবন সুন্দর সবল।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-বিভাগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ

"খাদ্য নিয়ন্ত্রণ" বলবৎ রাখার পক্ষে যেমন জনমত আছে ইহার বিপক্ষেও তেমন আছে। দুই পক্ষই নিজেদের মতের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেক পক্ষের যুক্তিই চিন্তাপ্রসূত এবং বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার "খাদ্য নিয়ন্ত্রণের" পক্ষেই যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন যে, খাদ্য সম্বন্ধে দেশ (ভারতবর্ষ) সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত "খাদ্য নিয়ন্ত্রণ" চালু রাখা হইবে। "খাদ্য নিয়ন্ত্রণের" পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও খাদ্য সচিব মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় প্রধানত: নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেন :

(১) ১৯৪৮ সালে আসাম, উত্তর প্রদেশ, পূর্ব্ব পঞ্জাব, বোম্বাই এবং অন্যান্য স্থানে "খাদ্য নিয়ন্ত্রণ" তুলিয়া দিবার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আমাদের সর্ব্বাগ্রে মনে রাখিতে হইবে।

(২) দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে না; এই সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য; প্রতি বৎসর পশ্চিমবঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার প্রায় তিন লক্ষ; ইহা ব্যতীত গত আড়াই বৎসরে ১৪ লক্ষ লোক পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন। সম্প্রতি পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে লোকের আগমন বহুল পরিমাণে বাড়িতেছে।

(৩) বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিবার জন্য ভারত-সরকারের প্রতি বৎসর প্রায় ১৩০ কোটি টাকা খরচ হয়; এই খরচ নিবারণার্থে ভারত-সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৫১ সালের মধ্যে বিদেশ হইতে খাদ্যের আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে হইবে। সুতরাং দেশের (ভারতের) মধ্যে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয় তাহা সুষ্ঠু ভাবে বণ্টিত না হইলে দেশের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিবে। অথচ উৎপন্ন খাদ্যের সুষ্ঠ বণ্টন একটি জটিল ব্যাপার। কিন্তু সমস্যা যতই জটিল হউক না কেন জনকল্যাণের জন্য আমাদিগকে এ সমস্যার সমাধান করিতেই হইবে।

(৪) সর্ব্ববিধ শরীররক্ষাকারী খাদ্য সম্বন্ধেই আমাদের দেশ পরনির্ভরশীল; পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অধিকতর মন্দ। বিবিধ খাদ্য সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের ঘাটতির পরিমাণ এইরূপ :

(ক)	ডাল শস্য	—৩১১০০০	টন
(খ)	চিনি ও গুড়	—৩৩৪০০০	,,
(গ)	আলু	—১৬৫০০০	,,
(ঘ)	ফল	—২৬৬০০০	,,
(ঙ)	দুধ	—১৭৭৬০০০	,,
(চ)	মাংস, মাছ	—৫৮২০০০	,,
(ছ)	ডিম	—সাড়ে সাত কোটি	
(জ)	ঘি, মাখন, সরিষার তৈল	—৪০৯০০০	টন

বিশেষজ্ঞগণের মতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য প্রতি দিন ১৪ আউন্স (মোটামুটি ৭ ছটাক) তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন; কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, অন্যান্য খাদ্যের উপযুক্ত পরিমাণ জোগান হইলেই ১৪ আউন্স চাউলও উপযুক্ত পরিমাণ হইবে। কিন্তু উপরের তালিকা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে ঘাট্‌তি বশত: আমরা অন্যান্য খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারি না; সুতরাং আমাদের অধিকতর পরিমাণ তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হয়। সেই হেতু বিশেষজ্ঞগণের মতে বর্ত্তমান অবস্থায় প্রতি দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জন্য অন্তত: ১৫ আউন্সের কিছু অধিক পরিমাণ তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যের দরকার। এই হিসাব অনুসারে পশ্চিম বাংলায় বার্ষিক তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন ৩৮ লক্ষ টন—আড়াই কোটি লোকের জন্য। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় স্বাভাবিক তণ্ডুল জাতীয় শস্যের বার্ষিক উৎপাদন ৩৭ লক্ষ টন; ইহার মধ্যে বীজ, অপচয় ও ক্ষতি প্রভৃতির জন্য ৩ লক্ষ টন বাদ দেওয়া দরকার। সুতরাং কেবল খাদ্যের জন্য পাওয়া যায় ৩৪ লক্ষ টন। অর্থাৎ ঘাট্‌তির পরিমাণ ৪ লক্ষ টন। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মাথা পিছু প্রতি দিন ১৪ আউন্স হিসাবে সাড়ে বত্রিশ লক্ষ টনের প্রয়োজন হয়; সুতরাং এই হিসাবে বাড়তির পরিমাণ দাঁড়ায় দেড় লক্ষ টন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই হিসাব ভুল হইবে।

(৫) দেশে তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যের অভাব আছে—এই মত যাহারা সমর্থন করেন তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, উৎপন্ন খাদ্য যদি সুষ্ঠু ও সমান ভাবে বণ্টন করা না হয় তাহা হইলে জনসাধারণের অধিকাংশের দুঃখ-দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। এই সম্পর্কে ইহাও আমাদের বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার যে, আমাদের দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর ব্যক্তিগণের সমান ক্রয়শক্তি নাই। ১৯৪৩ সালের অবস্থা কি হইয়াছিল তাহা মনে করিলেই বিষয়টি সম্যক্ ভাবে বুঝা যাইবে। কলিকাতার ধনী ব্যক্তিগণ এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠান সমুদয়ের অত্যধিক ক্রয়শক্তির বলেই ১৯৪৩ সালে চাউলের মূল্য অসম্ভব রূপে বাড়িয়া গিয়াছিল এবং পল্লী অঞ্চলের

অধিকাংশ লোকের সেই মূল্যে চাউল ক্রয় করিবার শক্তি ছিল না; ইহার ফলে প্রধানত: পল্লী অঞ্চলের লোকেরাই খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

(৬) যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতার অধিকাংশ লোক একই সময়ে তাঁহাদের এক মাসের উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য ক্রয় করিয়া রাখিতেন; এমন কি অনেকেই একেবারে তিন মাসের, ছয় মাসের, এমন কি এক বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করিতেন। ইহার ফলে পল্লী অঞ্চলের বাজারসমূহে চাউলের টান পড়িত। কিন্তু বর্ত্তমানে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে 'রেশনিং' চালু থাকার জন্য যে সকল অঞ্চলে 'রেশনিং' নাই সেই সকল অঞ্চলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণ খাদ্যশস্য পাওয়া যাইতেছে।

(৭) খাদ্য নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে ইহাও বলা যায় যে, ইহার দ্বারা "গণতান্ত্রিক শিক্ষার" সুযোগ ঘটে; ছোট বড় সকলকেই একই রকমের এবং একই পরিমাণে খাদ্য ক্রয় করিতে হয়।

ধান-চাউল সংগ্রহ

ধান-চাউলের সংগ্রহ নীতি প্রধানত: স্বেচ্ছাধীন। যে সকল অঞ্চলে বড় বড় কৃষকদিগের নিকট বহু পরিমাণ বাড়তি ধান-চাউল থাকে এবং যে সকল বড় বড় কৃষক নিজেদের ব্যক্তিগত লাভের আশায় বহুল পরিমাণে ধান-চাউল মজুত করিয়া রাখেন কেবল সেই সকল অঞ্চল হইতে এবং এইরূপ মজুতকারী বড় বড় কৃষকদিগের নিকট হইতে বাধ্যতামূলক হিসাবে ধান-চাউল সংগ্রহ করা হয়; বাড়তি অঞ্চলসমূহ হইতেই ধান-চাউল বিনা অনুমতিতে রপ্তানী করা আইন-বিরুদ্ধ। অর্থাৎ এই সকল অঞ্চলে ধান-চাউল 'আটক' রাখা হয়। ইহার ফলে বাড়তি অঞ্চলসমূহ হইতে ন্যায্য মূল্যে সরকারের পক্ষে ধান-চাউল সংগ্রহ করা সম্ভব হয় এবং এইরূপ সংগৃহীত খাদ্য দ্বারাই অসংখ্য বুভুক্ষুর আহার জোগানো হয়।

পল্লী অঞ্চলের সহিত যাঁহাদের যোগাযোগ আছে তাঁহারা সকলেই জানেন যে, ১৯৪৪ সালের পূর্ব্বে বড় বড় কৃষকগণ সাধারণত: দুই-তিন বৎসরের প্রয়োজনীয় ধান মজুত করিয়া রাখিতেন; কিন্তু বর্ত্তমানে সরকারী সংগ্রহ-নীতির ফলে তাঁহারা এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং সাধারণত: এক বৎসরের প্রয়োজন মত ধান মজুত করিয়া রাখিতেছেন। সুতরাং ইহার ফলে বাজারে অধিকতর পরিমাণ ধান-চাউল আমদানী হইতেছে এবং ভক্ষণকারিগণ অধিকতর পরিমাণে ধান-চাউল পাইতেছেন। অবশ্য সকল বড় বড় কৃষকই যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাদের বাড়তি ধান সম্পূর্ণরূপে বাজারে আনিতেছেন, তাহা নহে; তবে বাড়তি ধান সরকার আইনত: সংগ্রহ করিতে পারেন এই ধারণার বশে অনেকেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাদের অতিরিক্ত পরিমাণ ধান বিক্রয় করিয়া ফেলেন।

বাড়তি অঞ্চল হইতে ঘাটতি অঞ্চলে বিনা অনুমতিতে ধান-চাউল রপ্তানী না করিতে পারার জন্য বাড়তি অঞ্চলের কৃষকদের এবং ঘাটতি অঞ্চলের অধিবাসিগণের মধ্যেও বিক্ষোভ দেখা যায়। বাড়তি অঞ্চলের উৎপাদনকারিগণ মনে করেন যে, ধান-চাউল অবাধে রপ্তানী করিতে পারিলে তাঁহারা ধান-চাউলের বর্ত্তমান মূল্য অপেক্ষা অধিকতর মূল্য পাইতেন; আবার ঘাটতি অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ মনে করেন যে, চাউলের এইরূপ "আটক-প্রথা" উঠাইয়া দিলে তাঁহারা বর্ত্তমান মূল্য অপেক্ষা নিম্নতর মূল্যে ধান-চাউল ক্রয় করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু উভয় পক্ষের বিক্ষোভই ভিত্তিহীন। বর্দ্ধমান জেলার সদর, কাটোয়া এবং কালনা মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানের বড় বড় কৃষকগণের মাসিক খরচের হিসাব গ্রহণের ফলে জানা গিয়াছে যে, বর্ত্তমানে তাঁহারা ১৯৩৯ সাল অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিতেছেন এবং অধিকতর পরিমাণে বস্ত্র ব্যবহার করিতেছেন। নিম্নের হিসাবে ইহা বুঝা যাইবে।

	মাসিক ব্যবহার (সের)	
	১৯৩৯	১৯৪৮
চাউল	২৩·০৯	২৪·১৪
আটা	০·৮১	০·৬৯
ডাল	১·৩৮	১·৩৪
চিনি	০·৫৬	০·৪৬
গুড়	২·৫৬	২·৫৯
সরিষার তৈল	০·৬২	০·৬২
লবণ	০·৮১	০·৯৭
বস্ত্র	১·৭৯ গজ	১·৮৫ গজ

সুতরাং ধান-চাউল "আটক-প্রথার" জন্য বাড়তি অঞ্চলের ধান্য-উৎপাদনকারিগণের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় নহে, বরং উন্নত।

বাড়তি অঞ্চলের ধান চাউলের আটক-নীতি পরিত্যক্ত হইলে বর্ত্তমানে সরকার ধান-চাউলের যে মূল্য দিতেছেন তাহা বাড়াইতে বাধ্য হইবেন এবং 'রেশন' এলাকায় বর্ত্তমানে যে মূল্যে চাউল সরবরাহ করা হইতেছে তাহাও বাড়াইতে হইবে। ইহার ফলে জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যাইবে এবং দেশে এক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। কারণ মূল খাদ্যের মূল্যের উপরেই অন্যান্য জিনিষের মূল্য প্রধানত: নির্ভর করে।

বর্ত্তমানে সরকার যে মূল্যে ধান বা চাউল ক্রয় করিতেছেন সে সম্বন্ধে অনেকেই তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে সকলেরই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার।

(১) আমাদের জীবন-যাত্রার জন্য মোট যে পরিমাণ খরচ হয় তাহার শতকরা ৭০ ভাগ খাদ্য বাবদে যায়; এবং প্রধান

প্রধান খাদ্যসামগ্রীর মূল্যই সাধারণতঃ অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করে।

(২) বিশেষভাবে অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, যে সকল কৃষকের ৪ একরের অধিক পরিমাণ ধান-জমি আছে কেবল তাঁহাদেরই বিক্রয়ের জন্য উদ্বৃত্ত ধান থাকে ; কিন্তু এইরূপ কৃষকের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ৪০ লক্ষ ; এবং অবশিষ্ট দুই কোটি ১০ লক্ষ লোকের মোটেই উদ্বৃত্ত ধান থাকে না। সুতরাং ধানের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে তাঁহাদের কোনই উপকার হইবে না, বরং অধিকাংশেরই ক্ষতি হইবে, কেননা তাঁহাদের ধান কিনিয়া খাইতে হইবে।

(৩) যুদ্ধের পূর্ব্বে কৃষকদিগের জীবনযাত্রার ব্যয়ের যে মান ছিল বর্ত্তমানে তাহা শতকরা ২০০ ভাগ বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই হিসাবে ধানের দাম শতকরা ৪৫০ হইতে ৫০০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ইহার ফলেও ধানের উৎপাদন তেমন বাড়ে নাই।

(৪) বিভিন্ন অঞ্চলে ধানের চাষের খরচের হিসাব গ্রহণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত মণ প্রতি সাড়ে সাত টাকা মূল্যেও ধানের চাষে লোকসান ত হয় না, বরং লাভ হয় ; এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন অবস্থার উপর এবং ধানের চাষে সার প্রয়োগ ও অন্যান্য পরিচর্য্যার উপর লাভের পরিমাণ নির্ভর করে। অনুসন্ধানে ইহাও জানা গিয়াছে যে "কম্পোষ্ট" সার প্রয়োগ করিয়া কৃষকেরা বিঘা প্রতি ৫০৲ টাকা লাভ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের গত 'বাজেট' বক্তৃতায় বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। "প্রবাসী", "জ্ঞান-বিজ্ঞান" ও "খাদ্য-উৎপাদনে" লেখকের সংগৃহীত কয়েকটি হিসাবও প্রকাশিত হইয়াছে।

ধান-চাউল সংগ্রহের ও সরবরাহের মূল্য

ধান-চাউল সংগ্রহ করিতে সরকারের কি পরিমাণ খরচ হয় তাহা নিম্নের হিসাবে বুঝা যাইবে ; ইহা এই প্রদেশের মধ্যে সংগ্রহের হিসাব।

	চাউল	ধান
(১) ক্রয় মূল্য	১২৸০	১১।০
(২) ডি, পি এজেন্টের কমিশন	⁄০ (ক)	৶০
(৩) মজুতকারী এজেন্টের কমিশন	৶০	।১০
(৪) বস্তা	৸০	৸০
(৫) সংগ্রহের স্থান হইতে বিতরণের স্থান পর্য্যন্ত আনার খরচ	১৸৶০	১৸৶০
(৬) ধান ভাঙ্গার খরচ		১।০
(৭) রাস্তায় এবং গুদামে ক্ষতি (শতকরা ৩ ভাগ)	।৶০	।৶০
মোট—	১৬৶০	১৬/১০

(ক) গড়-পড়তা ; মণ প্রতি ৶০ কমিশন ; মিল হইতে সংগৃহীত চাউলের জন্য কোন কমিশন দেওয়া হয় না।

উপরের হিসাবে দেখা যাইবে যে এক মণ চাউলের জন্য গড়পড়তা ১৬৶০ খরচ হয়। কলিকাতার সরকারী গুদাম হইতে পাইকারী ১৬৶০ মূল্যেই চাউল সরবরাহ করা হইয়া থাকে। চাউলের ক্রেতাগণকে মণ প্রতি ১৬৸৶০ দিতে হয়, কারণ খুচরা বিক্রেতাগণকে মণ প্রতি ৸০ আনা লাভ দেওয়া হইয়া থাকে। বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্ব্বে খুচরা বিক্রেতাগণকে মণ প্রতি ১।০ লাভ দেওয়া হইত ; পরে উহা কমাইয়া ১৲ টাকা করা হইয়াছিল ; ১৯৫০ সালের প্রথম হইতে ৸০ দেওয়া হইতেছে। কলিকাতার বাহিরে অন্যান্য 'রেশন এলাকায়' পাইকারী ও খুচরা চাউল বিক্রেতা আছেন, এবং সেই সকল অঞ্চলে মণ প্রতি ১৬৶০ অপেক্ষা কম মূল্যে চাউল সরবরাহ করা হয় ; সাধারণতঃ ১৫৸৶০ হইতে ১৬/০ মূল্য। যে সকল অঞ্চলে 'রেশনিং' নাই, সেই সকল অঞ্চলে মণপ্রতি ১৬৲ টাকা দরে গবর্ণমেণ্ট চাউল সরবরাহ করিয়া থাকেন এবং ১৬৸৶০ মূল্যে ইহা খুচরা বিক্রেতাগণ কর্ত্তৃক বিক্রীত হয়। মোট কথা, এক মণ চাউল সংগ্রহ, মজুত ইত্যাদি বাবদে সরকারের ১৬৶০ আনা খরচ হয়, কিন্তু গড়ে ইহা অপেক্ষা কম মূল্যে উহা সরবরাহ করা হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার যে, খাদ্য বিভাগ পরিচালনার জন্য বাৎসরিক আড়াই কোটি টাকা খরচ হয় ; এবং এই খরচ চাউলের মূল্যে যোগ করা হয় না।

ভারতের বাহির হইতে চাউল সংগ্রহ ব্যাপারে মণপ্রতি ২২৲ টাকা (খিদিরপুর ডক পর্য্যন্ত) খরচ পড়ে, এবং ভারতের মধ্যে অন্যান্য প্রদেশ হইতে চাউল আমদানী করিতে মণপ্রতি ১৬৲ টাকা হইতে ১৮৲ টাকা খরচ হয়। ১৯৪৯ সালে ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টন চাউল এই প্রদেশের মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং বাহির হইতে ৯৮ হাজার টন আমদানী করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে এই প্রদেশের বাহির হইতে ১০ হাজার টন আমদানী করা হইবে।

পূর্ব্বে গমজাত দ্রব্য আমদানী ও বিক্রয় ব্যবস্থায় সরকারের বার্ষিক তিন কোটি টাকা ক্ষতি হইত ; এই ক্ষতিপূরণের জন্য ভারত-সরকার দুই কোটি টাকা দিতেন ; সুতরাং এই প্রদেশের ক্ষতির পরিমাণ ছিল এক কোটি টাকা। কিন্তু বর্ত্তমানে এই ব্যবস্থায় কোন ক্ষতি বা কোন লাভ নাই।

ইহাও দেখা গিয়াছে যে, পূর্ব্বে যে পরিমাণ চাউল বা ধান

সংগৃহীত হইত—তাহার প্রায় শতকরা ৫ ভাগ নষ্ট বা ক্ষতি হইত; বর্ত্তমানে ইহার পরিমাণ শতকরা তিন ভাগ। চাউল সংগ্রহ, চালান, মজুত প্রভৃতি সর্ব্ব অবস্থায় খরচ কমাইবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমানে সকল জিনিষের মূল্যস্ফীতির জন্য ইহার অধিক কমান সম্ভব হইতেছে না।

বর্ত্তমান বৎসরে আভ্যন্তরিক সংগ্রহের পরিমাণ

১৯৪৯ সালের প্রথমে এই রাষ্ট্রে রেশন এলাকায় মাথা-পিছু সপ্তাহে ২ সের চাউল দেওয়া হইত; উক্ত সালের ১৮ই জুলাই হইতে ২ সের ১০ ছটাক দেওয়া হইতেছে; বর্ত্তমান বৎসরে এই হারই রাখা হইবে। সুতরাং ১৯৪৯ সাল অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে অধিকতর পরিমাণ তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হইবে। ভারত-সরকার এই প্রদেশকে আড়াই লক্ষ টন তণ্ডুল জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করিবেন—ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; ইহার মধ্যে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টন গম এবং ১০ হাজার টন চাউল। গত বৎসরে ভারত-সরকারের সরবরাহের পরিমাণ ছিল—৩ লক্ষ ১৪ হাজার টন গম এবং ৯৮ হাজার টন চাউল—মোট ৪ লক্ষ ১২ হাজার টন।

১৯৫০ সালে বর্দ্ধিত পরিমাণ খাদ্য সরবরাহের এবং ভারত-সরকারের পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কম সরবরাহের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই প্রদেশ হইতেই অধিকতর পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করিতে হইবে; গত বৎসর তাঁহারা এই প্রদেশ হইতে ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টন সংগ্রহ করিয়াছিলেন; বর্ত্তমান বৎসরে তাঁহারা ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন সংগ্রহ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে ধানের ফলন অধিক হইয়াছে; সুতরাং সর্ব্বশ্রেণীর সহযোগিতা থাকিলে বর্ত্তমান বৎসরে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টন চাউল সংগ্রহ করা কঠিন নহে। এই সম্পর্কে আমাদের পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে আগত শরণার্থীদিগের কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে এবং ইঁহাদের জন্য সংগ্রহের পরিমাণ বাড়াইতেই হইবে।

গত বৎসর "বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায়" ৫৫ লক্ষ লোককে খাদ্য সরবরাহ করা হইয়াছিল; ইহা ছাড়া বড় বড় প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত ৮ লক্ষ লোক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্য পাইয়াছিলেন। ১২ লক্ষ লোক modified rationing-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আমাদের বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫১ সালের পর ভারতের বাহির হইতে খাদ্য আমদানী একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন; সুতরাং আমাদের পশ্চিম বাংলা বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে যে পরিমাণ খাদ্য পাইতেছেন তাহা ক্রমশঃ কম হইয়া যাইবে। এ ক্ষেত্রে আমাদিগকে আভ্যন্তরিক সংগ্রহ বাড়াইতেই হইবে। প্রদেশের বাহির হইতেও আমদানী বন্ধ করা খুবই বাঞ্ছনীয়; কারণ বাহির হইতে আমদানী খুবই ব্যয়বহুল ব্যাপার; ভারতের বাহির হইতে আমদানী করিতে ১৯৪৯ সালে মণ প্রতি ২৩৲ টাকা খরচ পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাস হইতে কেন্দ্রীয় সরকার ২২৲ টাকা মূল্যে সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ১৯৪৯-৫০ সালে যুক্ত প্রদেশ হইতে চাউল আমদানী করিতে মণপ্রতি ২৫৲ টাকা খরচ লাগিয়াছিল। এ ক্ষেত্রে ইহাও মনে রাখা দরকার যে, প্রদেশের মধ্যে সংগ্রহ করিলে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার হইতে মণ প্রতি ৷৷০ আনা "বোনাস্" পাইয়া থাকি। এই অর্থের শতকরা ৭৫ এবং ২৫ ভাগ আমরা যথাক্রমে অধিকতর খাদ্য উৎপাদনে এবং সংগ্রহের উন্নতিমূলক ব্যবস্থায় ব্যয় করিতে পারি। কিন্তু বাহির হইতে সংগ্রহ করিলে আমাদের কোন আয় হয় না। অপর পক্ষে যে সকল প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা হয় তাহারা 'বোনাস' পায়—এবং আমাদেরই সেই "বোনাস" বহন করিতে হয়।

গম সম্বন্ধে আমরা কবে যে আত্মনির্ভরশীল হইব তাহা বলা খুবই কঠিন। সুতরাং গম আমাদের বাহির হইতে আমদানী করিতেই হইবে। গমের বার্ষিক প্রয়োজন ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টন; আমাদের উৎপাদনের পরিমাণ ২৫ হাজার টন। এই সম্পর্কে আমাদের ক্ষতি বহন করিতেই হইবে; কিন্তু চাউলের সংগ্রহ বাড়াইয়া এই ক্ষতি আমরা অনেকটা নিবারণ করিতে পারি।

দেশের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন ও সংগ্রহ যাহাতে বাড়ে সে বিষয়ে সকলেরই, বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া দরকার এবং এই সম্বন্ধে সরকারের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করা আবশ্যক।

বাঁধ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

৫

লিলি বিস্মিত দৃষ্টিতে খানিক মৃন্ময়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মৃন্ময় আর কোন দিন ফিরিয়া আসিবে না বলিয়াই সে ধরিয়া লইয়াছিল। আজ দীর্ঘ ছয় মাস যাবৎ প্রতিদিনই লিলি তাহার ফিরিয়া আসার অপেক্ষায় দিন গুনিয়াছে। লিলি খুশী হইয়া উঠিল। হাত বাড়াইয়া মৃন্ময়ের নিকট হইতে সুটকেসটি টানিয়া লইয়া গভীর কণ্ঠে বলিল, দাঁড়িয়ে আছ কেন···চল···

মৃন্ময় নিঃশব্দে তাহাকে অনুসরণ করিল। চলিতে চলিতে লিলি পুনরায় কহিল, তুমি তা'হলে সত্যিই শেষ পর্য্যন্ত ফিরে এলে মিনু-দা!

মৃন্ময় শান্ত মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল, তোমার বুঝি সন্দেহ ছিল লিলি?

লিলি বলিল, সেটা কি অন্যায় মিনুদা? তা ছাড়া ভেবেছিলাম, হয়ত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এত দিন পরে ফিরে গিয়ে আমাদের কথা ভুলেই গেছ!

আত্মীয়স্বজন···মৃন্ময় একটুখানি হাসিল। এ হাসির সহিত লিলির পরিচয় আছে। সে চমকাইয়া উঠিল। বিস্ময়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া পুনরায় নিঃশব্দে চলিতে লাগিল। অল্পক্ষণেই যে ঘরে মৃন্ময় পূর্ব্বে থাকিত সেইখানে আসিয়া দুজনে উপস্থিত হইল। মৃন্ময়ের চোখে মুখে খানিকটা বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল। ঘরখানি চমৎকার ভাবে সাজানো-গোছানো রহিয়াছে।

লিলি কতকটা কৈফিয়ৎ দিবার ভঙ্গীতে বলিল, হাতে কাজ না থাকলে যা হয় মিনুদা। কোনকিছু নিয়ে সময় কাটাতে হবে ত? কিন্তু সেকথা এখন থাক। যতদূর মনে হচ্ছে সারাদিনে তোমার কিছু খাওয়া হয় নি। বাথরুমে জল তোলাই আছে। একটু বিশ্রাম করে স্নানটা সেরে ফেল, আমি ততক্ষণে তোমার কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করে আসি।

মৃদু হাসিয়া মৃন্ময় বলিল, তার জন্য তুমি ব্যস্ত হয়ো না লিলি—

কি যে তুমি বল মিনুদা—লিলি বাধা দিয়া কহিল, আমি ব্যস্ত না হলে আর কে হবে বল দেখি।···লিলি আর অপেক্ষা করিল না, দ্রুত প্রস্থান করিল। মৃন্ময় সেই দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। এমনি করিয়া ইতিপূর্ব্বেও আর একটি মেয়ে তাকে একই কথা বলিত। শুধু বলিতই না—সব দিক দিয়া তাহাকে সেবায় যত্নে, ভালবাসায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। প্রাণ ভরিয়া সে সেই সেবার মাধুর্য্য উপভোগ করিয়াছে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত সে কত স্বপ্নই না দেখিয়াছে। কিন্তু তার পর···কোথায় গেল সে স্বপ্নমাধুর্য্য?···দেখা দিল প্রচণ্ড ঝড়। তার দাপটে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। সেই তুমুল ঝটিকা মৃন্ময়ের স্বপ্নসৌধকে কোথায় উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। আজ সে উন্মুক্ত প্রান্তরে একাকী দাঁড়াইয়া। সঙ্গী নাই, সাথী নাই—শুধু অন্ধের ন্যায় সে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। নীড়-রচনার সাধ তাহার মিটিয়াছে—আজ সে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির কাঙাল।

লিলি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। মৃন্ময়ের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করিয়া সে কহিল, এখনও চুপ করে বসে আছ? ওঠো এবারে।

মৃন্ময় উঠিবার নামও করিল না। বলিল, তুমি ভেবেছিলে আমি আর ফিরব না—আর আমি কি ভাবছিলাম জান—মৃন্ময় সহসা থামিল। একটি নিঃশ্বাস চাপিয়া গিয়া বলিল, আর হয়তো কোন দিন এখান থেকে যাব না। জান লিলি সে এক প্রকাণ্ড ইতিহাস।

লিলি বলিল, জানি মিনুদা জানি, অন্তত: আন্দাজ করে নিতে আমি ভুল করি নি, কিন্তু দোহাই তোমার সে ইতিহাসের কথা শোনাবার ঢের সময় তুমি পাবে। শুধু নিজের কথাটাই তুমি ভাবছ—একবার চেয়ে দেখতো আমার পানে···

মৃন্ময় একটু বিস্মিত হইল, কহিল, আমার সম্বন্ধে কোন কথা ত তোমায় বলি নি লিলি?

লিলি মৃদু কণ্ঠে বলিল, সব কথা বলবার দরকার হয় না মিনু দা। কিন্তু সে থাক, তুমি সত্যিই আর দেরি করো না। চায়ের জল এতক্ষণে ফুটেছে। লিলি পুনরায় চলিয়া গেল।

···চায়ের জল ফুটিয়াছে···এই বারে চা আসিবে। চায়ের সে ভক্ত—বহুদিন হইতেই। অভ্যাসটা আজও সে ত্যাগ করিতে পারে নাই। মঞ্জুষা চা খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। বেশী ভালবাসিত বলিয়া।

মৃন্ময় উঠিয়া দাঁড়াইল। এখনি হয়ত লিলি আসিয়া উপস্থিত হইবে, আবার হয়ত প্রশ্ন করিবে, কিন্তু তাহাকে সে এড়াইয়া যাইতেই চায়।

আজ দুই দিন পরে মৃন্ময় প্রাণ ভরিয়া স্নান করিল। শরীর ও মনের অনেকখানি গ্লানি দূর হইয়াছে।

লিলির পুনরায় সাড়া পাওয়া গেল। সে বলিতেছিল, অত জল ঢেল না মিনুদা, সহ্য হবে না। কথাটা মৃন্ময়ের কানে পৌছাইল না। লিলি পুনশ্চ কহিল, তোমার চা নিয়ে এসেছি মিনু-দা।

মৃন্ময় সাড়া দিল এবং তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া সোজা গিয়া চায়ের টেবিলে বসিল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই লিলি আয়োজন নিতান্ত মন্দ করে নাই। মৃন্ময় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল। সোনালী চায়ের মধ্যে যেন ভাসিয়া উঠিল আর একখানি মুখ। মৃন্ময় চমকাইয়া উঠিল। খানিকটা চা ছলকাইয়া পড়িল।

লিলি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল ?···

একটু অন্যমনস্ক ভাবেই মৃন্ময় জবাব দিল, বেশী ভালবাসি বলেই ত্যাগ করতে হবে এ আবার একটা যুক্তি হ'ল নাকি !···

লিলি বলিল, এ সব তুমি কি বলছ মিনুদা ?···কি তুমি বেশী ভালবাস ? কে আবার তোমাকে ত্যাগ করতে বলেছে ? ···

মৃন্ময়ের মুখে একটুখানি হাসি দেখা দিল। সে বলিল, আমাকে আবার ত্যাগ করতে বলবে কে ? আর বললেই বা শুনছে কে। কথাটা আমার নয়—

মৃন্ময় থামিল। লিলি চাহিয়া আছে। দৃষ্টিতে তার নীরব প্রশ্ন। মৃন্ময় পুনশ্চ বলিতে লাগিল, মঞ্জুষা চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে—সেই সঙ্গে সিঙ্গাড়াও। ওগুলো সে অত্যন্ত বেশী পছন্দ করত বলে। কি ছেলেমানুষী বলতো।···

মৃন্ময় হাসিয়া উঠিল। বলিল, এমনি পাগলামি মেয়েরাই করতে পারে···

লিলি এ হাসিতে যোগ দিতে পারিল না। বরং তার মুখখানি বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

লিলির এই আকস্মিক ভাব-পরিবর্তন মৃন্ময়ের দৃষ্টি এড়াইল না। সে মৃদু কণ্ঠে বলিল, কিন্তু তুমি অমন চুপ করে আছ কেন লিলি।···

একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া লিলি বলিল, চুপ করে না থেকে কি করি মিনুদা। তা ছাড়া কথাটা ত আর তুমি একেবারে মিথ্যে বলো নি। মেয়েদের এই পাগলামির জন্যে কি তারা কম দুঃখ পায়···কিন্তু তবুও দেখ তারা দুঃখটাকে জেনে শুনে মেনে নেয়।

লিলির কথা শুনিতে শুনিতে সে আর এক বার চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল। লিলির মনে হইল সে যেন বিষ গলাধঃকরণ করিতেছে।

লিলি কিন্তু থামিতে পারিল না, সে বলিতে লাগিল, এই দুঃখের মধ্যেও মেয়েরা একটা সান্ত্বনা খুঁজে পায়, কিন্তু যারা জেনে শুনে আত্মপ্রবঞ্চনা করে তারা নিজেকেও ঠকায়, অপরের সম্বন্ধেও ভুল করে।···কথার মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া সে অন্য প্রসঙ্গে আসিল,- ও কি ডিম যে একেবারেই ছুঁলে না। ওটা তুলে নাও মিনু দা। না না, কোন কথা তোমার আমি শুনতে চাই না।

মৃন্ময় হাসিল। বলিল, এই অসময়ে আর বেশী খেতে ইচ্ছে নেই, আবার রাত্রেও এমনি জুলুম করবে ত তুমি।

লিলি সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। শান্ত কণ্ঠে বলিল, তোমাকে অকারণে ব্যথা দিতে আমি চাই না মিনু-দা। কোথাও যে নূতন করে গোল বেধেছে সে ত দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু তা বলে নিজের উপর এক তিল অত্যাচার করতেও তোমায় আমি দেব না —কিছুতেই নয়।

লিলি থামিল, একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিল, একবার আমার কথাটা ভাবতো। সত্যিই কি দুঃখ করবার মত আমার কিছুই নেই ? না আমাকে তোমরা পাথরে গড়া মনে করো।··· সে আর দাঁড়াইল না—দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তার চোখে জল দেখা দিয়াছিল।

মৃন্ময় একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়া জাগিয়া উঠিল। হয়তো তার খানিকটা বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছিল, লিলি সেই কথাটাই তাহাকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়া গেল। লিলি একথা বলিতে পারে বটে। মৃন্ময় উঠিয়া গিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। চোখে পড়িল লিলির ফুলের বাগান—তার পরেই ছোট একটি লন। ঐ লনে লিলির ছেলের সঙ্গে কত দিন সে খেলা করিয়াছে। ঐ বাগানে প্রত্যহ দেখা যাইত নানা জাতীয় ফুলের সমারোহ। ছেলের সহিত লিলি রোজই যাইত ঐ বাগানে—নিজের হাতে সে প্রত্যেকটি গাছের সেবা যত্ন করিত। আজ যে লিলির আর সে যত্ন নাই··· বাগানের দুরবস্থা দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।···

মৃন্ময় পুনরায় চায়ের টেবিলে ফিরিয়া আসিল। বাকী চাটুকু এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া সে অনুচ্চ কণ্ঠে লিলিকে ডাক দিল, কিন্তু লিলির পরিবর্তে দেখা দিল মহীপাল। ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে সে মৃন্ময়কে অভিবাদন জানাইল। বলিল, খবরটা পেয়েই ছুটে এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে। এমন করে কি ভুলে থাকতে হয়।

প্রত্যুত্তরে মৃন্ময় একটু হাসিল—কোন জবাব দিল না। মহীপাল পুনরায় বলিল, এতদিন কোথায় ছিলেন আপনি ? এদিকে আপনি নেই আর কতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কিন্তু দিদিমণিকে সত্যিই ধন্যবাদ দিতে হয়। এত বড় আঘাতটাকে তিনি আশ্চর্য্য ধৈর্য্যের সঙ্গে সামলে নিয়েছেন। এক দিনের জন্যও ভেঙে পড়েন নি।

মৃন্ময় মৃদুকণ্ঠে বলিল, ভেঙে পড়বার উপায় ছিল না যে ভাই।

মহীপাল বলিল, একথা বলছেন কেন মৃন্ময়বাবু।

মৃন্ময় বলিল, আমি মিথ্যে বলি নি।

মহীপাল অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হইল। বলিল, আপনাকে আমরা অনেক আগেই আশা করেছিলাম।

মৃন্ময় মৃদু কণ্ঠে কহিল, আপনাদের আশা সফল করা

ছিল আমার কর্ত্তব্য, কিন্তু নানা দুর্দ্দৈবের জন্য তা সম্ভবপর হয় নি। তবে আমার ভরসা ছিল যে, লিলি আপনাদের কাছে আছে, কিন্তু এ সব কথা এখন থাক—লিলি হয়তো শুনে ফেলতে পারে।

মহীপাল লজ্জিত হইল। বলিল, আমার এতক্ষণ এটা বোঝা উচিত ছিল, অতটা তলিয়ে আমি দেখি নি। এখন ত আছেন নিশ্চয় কিছুদিন।

মৃন্ময় জবাব দিল, সেই ইচ্ছে নিয়েই ত এসেছি।

মহীপাল উঠিয়া পড়িল। বলিল, আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না—আপনি বরং একটু বিশ্রাম করুন। কাল সকালে আবার দেখা হবে।

মৃন্ময় হাসিমুখে বলিল, আমার এখন বিশ্রামের কোন প্রয়োজন নেই। আপনি এখন না গেলেই বরং আমি খুশী হতাম।

মহীপাল হাসিল, বলিল, আপনি অবশ্য একথা বলতে পারেন। কিন্তু জানেন কি, বাবা বলেন যে, আমি এখন সাবালক হয়েছি। সে যা হোক আমি এখন আসি—বলিয়া সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু লিলির কি হইল। এতক্ষণে একবারও সে আসে নাই। মহীপাল আসিয়াছিল, এতক্ষণ বসিয়া গল্প করিয়া গেল—ইহা নিশ্চয় লিলির অজ্ঞাত নয় অথচ ভদ্রতার খাতিরেও একবার আসিয়া দেখা করিল না—ইহাতে মৃন্ময় যার পর নাই বিস্মিত হইল। সে ধীরে ধীরে আসিয়া পাশের ঘরে উপস্থিত হইল। লিলি খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কোন দিকে তার খেয়াল নাই। মৃন্ময় লিলির এই তন্ময়তা ভাঙ্গিতে চাহিল না। কিন্তু এ কি চেহারা হইয়াছে লিলির ঘরের। শ্রীহীন ঘরটির সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা। শুধুমাত্র টেবিলটা সযত্নে সাজানো। টেবিলের উপর লিলির মৃত পুত্রের একখানি ফটো রক্ষিত। তার পাশে পঙ্কজের ব্যবহৃত দু'জোড়া জুতা, একটি ছোট ফুটবল, দুধ খাইবার কাপ—তাহাতে দুধ রাখিতেও ভুল হয় নাই। ফুলদানিতে রহিয়াছে একরাশ ফুল। টেবিলের পাশে আছে একটি পেরামবুলেটর, একটি ট্রাইসাইকেল, এমন কি পঙ্কজের খরগোসের খাঁচাটিও সেখানে স্থানলাভ করিয়াছে। মৃত পুত্রের স্মৃতির মাঝে লিলি হয়তো একেবারে ডুবিয়া আছে। তাহার নিদর্শন এই কক্ষটিতে বিদ্যমান। অথচ তার কিছুক্ষণ পূর্ব্বের ব্যবহারে একথাটা বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। মৃন্ময় বিস্মিত হইল, ব্যথিত হইল, কিন্তু মুখে তাহার একটি সান্ত্বনার বাক্য যোগাইল না। সে শুধু একদৃষ্টে লিলির নিশ্চল মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মৃন্ময় মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, লিলি—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটুখানি হাসিল, বলিল, মহীপাল চলে গেল বুঝি? বড় ভাল ছেলে। রোজ দু'বেলা খোঁজ নিয়ে গেছে। কিন্তু তুমি আবার উঠে এলে কেন, আমায় একবার ডাকলেই ত পারতে।

মৃন্ময় একথা বলিল না যে, ইতিপূর্ব্বে বহুবার ডাকিয়া সাড়া না পাইয়াই সে উঠিয়া আসিয়াছে। বরং কথাটা এক-প্রকার মানিয়া লইয়াই সে বলিল, ভাবলাম যে দেখে আসি তুমি এতক্ষণ ধরে কি করছ, তাই আর ডাকি নি। তা ছাড়া একলা চুপচাপ বসে থাকতেও আর ভাল লাগছিল না।

লিলি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, আমার কিন্তু বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে।

মৃন্ময় নীরব। লিলি তার নির্ব্বাক মুখের পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ বলিল, তোমায় মিথ্যে বলছি না মিনু-দা—অবশ্য এক এক সময় তোমার উপর রাগ হ'ত। আচ্ছা এর কি সত্যিই কোন মানে হয়। কেন তুমি ফিরে এলে না—কিসের জন্য এত দেরি হচ্ছে এ নিয়ে কম দুশ্চিন্তা ভোগ করিনি আমি। অথচ তুমি একটা খবর দেওয়াও আবশ্যক বোধ কর নি। তোমাকে মিথ্যে বলব না মিনু-দা—তোমার এই ব্যবহার আমায় কম দুঃখ দেয় নি।

মৃন্ময় তথাপি নিরুত্তর। সব কথা ঠিক তার বোধগম্য না হইলেও একথা মৃন্ময় বুঝিল যে, যাহা লিলি প্রকাশ করিল এইখানেই তার শেষ নয়, তার মধ্যে আরও কিছু গোপন রহিয়াছে।

লিলি থামিতে পারিল না। বলিয়া চলিল, নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হ'ত। একটা-কিছুকে আপন করে আঁকড়ে ধরে রাখবার জন্য মনটা আকুল হয়ে উঠত। পঙ্কজ আমায় সবদিক থেকেই রিক্ত করে গেছে। লিলি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, মনটা ভেঙে-চুরে এমন হয়েছে যে, এখন তাকে না পারছি নূতন করে গড়ে তুলতে, না সম্ভব হচ্ছে পুরাতন অবস্থার মধ্যে ফিরে যাওয়া। অথচ দশজনার মত হেঁটে চলেও বেড়াচ্ছি—দরকারমত হেসে কথাও বলছি। লিলি একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল।

মৃন্ময় যে এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই সহসা লিলির সে খেয়াল হইল। সে একটু লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল, ঐ দেখ! পোড়া মন একটু সুযোগ পেয়েছে কি অমনি কাঁদুনি গাইতে সুরু করেছে। আর তুমিও তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছ মিনু-দা!...

মৃন্ময় গভীর স্নেহে ডাকিল, লিলি—

লিলি সাড়া দিল, কিছু বলবে মিনু-দা?

একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃন্ময় কহিল, না—আজ থাক। চল ঘরে যাই।

লিলি পুনরায় একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ভাবছ বুঝি লিলি দুঃখ পাবে। একটুও নয় মিনুদা...একটুও না।...

মৃন্ময় ইহার কোন জবাব দিতে পারিল না, তার চোখের সম্মুখে তখন উজ্জ্বল হইয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে পঙ্কজের ছবি। ঘরের ভিতরকার বহুবিধ স্মৃতিচিহ্ন দুঃখটাকেই নিরন্তর মনে করাইয়া দেয়। অথচ ইহাকেই গোপন করিবার জন্য তার কি প্রাণপণ চেষ্টা। কিন্তু ইহা কি শুধুই আত্মগোপন করিবার আকাঙ্ক্ষা? মৃন্ময় একটু চিন্তিত হইল। এই শ্রেণীর মানুষকে লইয়াই বিপদ বেশী। যাহারা চিৎকার করিয়া আত্মপ্রকাশ করে তাহাদের জন্য ভাবনা হয় না, কিন্তু দৃষ্টির আড়ালে দুঃখের আগুন যাহার মনে মনে ধিকিধিকি জ্বলিতে থাকে ধ্বংসের মারাত্মক আক্রমণের হাত হইতে তাহাকে বাঁচান শক্ত। লিলিকে তার আজ একান্ত প্রয়োজন। তার নিজের জন্যও বটে, লিলির জন্যও বটে।···

মৃন্ময় এই মুহূর্তে নিজের কথা ভুলিয়া গেল।

লিলি কিয়ৎক্ষণ মৃন্ময়ের চিন্তাকুল মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, তুমি হঠাৎ একেবারে চুপ করে গেলে কেন মিনু-দা?···

মৃন্ময় কহিল, না, চুপ করে যাব কেন!

লিলি বলিল, তা ছাড়া আবার একে কি বলব! কতদিন পরে এসেছ, কোথায় তোমার কাছ থেকে কত গল্প শুনব, না তুমি সেই থেকেই মুখ বন্ধ করে আছ।

মৃন্ময় বলিল, কিসের গল্প আবার তুমি শুনবে?

লিলি হাসিয়া ফেলিল, বলিল, বেশ যা হোক—গল্প আবার কিসের হয়! যেখানে গিয়েছিলে সেখানকার।

লিলি একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, কত দিন যে আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের চোখে দেখি নি। তাই তো মাঝে মাঝে ভাবি কেন এমন হয়। যাদের কাছ থেকে চিরদিনের জন্য চলে এসেছি, কোন দিন কোন ছলেও আর যাদের মাঝে ফিরে যাব না তাদের জন্যেও মন এমন করে কাঁদে কেন?··· একটা খবর জানবার জন্য এমন ব্যাকুলতা কেন?

মৃন্ময় বলিল, বিদেশে অনাত্মীয়ের মধ্যে থাকতে গেলে সকলেরই এই অবস্থা হয় লিলি।—

লিলি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, হয়তো তাই ঠিক, তবে সকলের সঙ্গে আমাকে এক মাপকাঠিতে বিচার করতে বসো না মিনুদা।···কিন্তু কি কাণ্ড দেখ ত, সন্ধ্যে হয়ে গেল অথচ ঝিয়ের এখনও দেখা নেই। অন্তত দু'ঘণ্টা হ'ল তাকে বাজারে পাঠিয়েছি।

মৃন্ময় বিস্মিত হইয়া বলিল, এ সময় আবার বাজারে কেন লিলি।

লিলি গম্ভীর হইয়া উঠিল। কহিল, আজকের রাতটাও উপোস করে কাটাতে চাও নাকি তুমি? না না হাসি নয় মিনু-দা, আমার কাছে যে ক'টা দিন থাকবে তোমাকে নিয়ম মেনে চলতে হবে, নইলে আমি অনর্থ বাধাব—একথা তোমায় আগেই জানিয়ে রাখছি।

আলোচনাটা একটা সহজ পথে ফিরিয়া আসায় মৃন্ময় খুশী হইল। সে হাসিমুখে জবাব দিল, নিয়ম না মেনে চললে বরং পত্রপাঠ বিদেয় করে দিও লিলি।

লিলি হাসিল, কহিল, ঠাট্টা নয় মিনু-দা। আয়নায় নিজের মুখ দেখাও বোধ হয় ছেড়ে দিয়েছ, নইলে একথা বলতে তোমার আটকাত।

লিলি আর দাঁড়াইল না। দ্রুত রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

৬

দিন কয়েক পরে—

লিলি বলিল, তারপর মিনুদা?

মৃন্ময় একাগ্রচিত্তে একখানি বই পড়িতেছিল। লিলির এই আকস্মিক প্রশ্নে মুখ তুলিয়া স্মিতহাস্যে কহিল, কিসের পর লিলি?···

লিলি বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, এরই মধ্যে ভুলে গেছ!

মৃন্ময় একটু নড়িয়া-চড়িয়া স্থির হইয়া বসিল। কোন-প্রকার ভূমিকা না করিয়া বলিল, কিন্তু আজকের এই পরিণতির জন্য আমি মঞ্জুকে একতিল অনুযোগ দিতে পারি না। নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়েই সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে—এ ছাড়া আর কোন পথ তার ছিল না লিলি।

লিলি বলিল, ছিল বৈকি মিনুদা কিন্তু বোকা মেয়েটার মিথ্যা আত্মসম্মানজ্ঞান এবং আত্মপ্রবঞ্চনাই সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে উঠল।

মৃন্ময় তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, অন্যায় ভাবে অবিচার করো না লিলি। তার সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করবার আগে আমার কথাটা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। যেদিন সব কয়টা দরজা আমার কাছে খোলা ছিল আমি কেন তখন সেখানে অসঙ্কোচে প্রবেশ করতে পারি নি। সত্যকে মেনে নিতে দেখা দিয়েছিল দ্বিধা—না লিলি তোমার কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারব না। যা সত্য তা মানতেই হবে।

লিলি শান্ত কণ্ঠে বলিল, ভুল তুমি কর নি, একথা কেউ বলছে না মিনুদা। কিন্তু সেই ভুলের সংশোধন আর পাঁচটা ভুল দিয়ে ত করা যায় না। এ যেন একটা প্রকাণ্ড লড়াই হয়ে গেছে।

বাধা দিয়া মৃন্ময় বলিল, লড়াই সে করে নি লিলি, শুধু নিঃশব্দে আমার পথ থেকে সরে গেছে।

লিলি কহিল, ও একই কথা হ'ল মিনুদা। কিন্তু আমি ভাবছিলাম এতে মঞ্জু কতখানি সুখী হবে!

'সেটা আমার বিচার করে দেখবার নয়।' মৃন্ময় বলিল, তবে আমার মনে হয় তার এই ব্যবহার একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। অনেক দিনের অনেক চিন্তার ফল এটা। কিন্তু মঞ্জুর কথা এখন থাক লিলি। ওকে এখন আমাদের চিন্তা-ভাবনার বাইরে রাখাই উচিত।

মঞ্জুষা সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলেই মৃন্ময় সযত্নে তাহা এড়াইয়া যাইতে চায়, কিন্তু কি জানি কেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই লিলির আগ্রহ ইদানীং মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে।

লিলি বলিল, বাইরে রাখব বললেই ত সব সময় তা পারা যায় না মিনুদা। এ কথাটা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন?

মৃন্ময় বলিল, ভুলে আমি কোনকিছুই যাই নি লিলি, কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্যই আজ এ কথা আমাকে বলতে হচ্ছে।

লিলি কহিল, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্ত্তন ঘটা সম্ভব হলে অবশ্য কোন গোল থাকত না।

মৃন্ময় বলিল, খুব সত্য কথা। আর সেইজন্যেই উন্মুক্ত দ্বার-পথে খোলা মনে প্রবেশ করতে অত ভয় পেয়েছিলাম—নিজেকে ভাল করে বুঝে দেখবার প্রয়োজনটা বড় হয়ে উঠেছিল। ভিতরের তাগিদটা মনের পরিবর্ত্তন না সাময়িক উত্তেজনার প্রকাশ এই কথাটা বিচার করতে বসেছিলাম।

লিলি কহিল, কথাটা খোলাখুলি মঞ্জুকে তুমি জানালে না কেন?

মৃন্ময় মৃদু কণ্ঠে বলিল, কি কারণে কোন্ কাজটা করি নি তা এখন তোমায় বোঝাতে পারব না, তবে একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, মন তখনও আমার পরিষ্কার ছিল না। সংস্কারের বেড়াজাল থেকে সে মুক্ত ছিল না। মঞ্জু হয়ত কথাটা বুঝতে পেরেছিল—

লিলির ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, এ তোমার বাড়িয়ে বলা। মঞ্জুর কথা ভেবে আমার দুঃখও হয় রাগও হয়। মিথ্যা দম্ভকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে সে এ কি করলে!

মৃন্ময়ের মুখ প্রশান্ত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে ধীর কণ্ঠে বলিল, তুমি অকারণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছ লিলি। মঞ্জুর জন্য দুঃখ আমারও হয়, কিন্তু সে অন্য কারণে। আর দম্ভের কথা যদি বল—ওটা তার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। মনে প্রাণে যেটা সে বিশ্বাস করেছে কোনকিছুর প্রলোভনেই তা ত্যাগ করতে পারে নি। এতে বরং তার উপর আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেছে।

একটু থামিয়া সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, দুঃখের ভিতর দিয়েই সে দুঃখকে জয় করবার চেষ্টা করছে। সে সফল হোক —জয়যুক্ত হোক। আমার নিজের কথা আর আমি ভাবি না। হিসেব করে আর বিচার করে করে ত অনেক দিনই চলে দেখেছি, তাতে জীবনের সত্যরূপ দেখা আজও ভাগ্যে ঘটল না—এবারে না হয় অদৃষ্টের হাতেই নিজেকে ছেড়ে দিয়ে দেখি কোথায় সে টেনে নিয়ে যায়। দুঃখকে আর আমি ভয় করি না। সুখের অনুভূতি দুঃখের মধ্যেই একদিন জন্মলাভ করবে। একলা এর কোনটাই সত্য নয়।

লিলি বিস্ময়ভরা চোখে মৃন্ময়ের মুখের পানে এতক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। সে থামিতেই লিলি বলিয়া উঠিল, এ সব তুমি কি বলছ মিনুদা—

মৃন্ময় বড় অদ্ভুত ভাবে হাসিতে লাগিল। মাথা নাড়িতে নাড়িতে জবাব দিল, স্রেফ পাগলামি লিলি, কিন্তু চটপট একটু চা খাওয়াতে পার। এখুনি একবার বেরুতে হবে।

এই আকস্মিক প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তনে লিলি রীতিমত বিস্মিত হইল, কিন্তু মুখে কোন কথা না বলিয়া সে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, এইমাত্র উনুন ধরান হয়েছে, চা পেতে দেরি হবে।

মৃন্ময় কহিল, তা হোক দেরি তুমি বসো—

লিলি হাসিয়া ফেলিল, বলিল, এই যে বললে তোমাকে বেরুতে হবে।...

মৃন্ময় নির্ব্বিকার কণ্ঠে কহিল, বলেছিলাম বটে, কিন্তু বাইরের রোদের পানে চোখ পড়তে আমাকে মত বদলাতে হয়েছে।

লিলি বুঝিল মৃন্ময় মঞ্জুষাকে লইয়া কোনপ্রকার আলোচনা করিতে চায় না, কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও সে বারে বারে তারই প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতে থাকে। তাহাকে যেন কেমন নেশায় পাইয়াছে। মঞ্জুষাকে লইয়া আলোচনা করিতে করিতে সে মৃন্ময়কে লক্ষ্য করে। তার মুখের উপর যে গভীর ভালবাসার প্রকাশ দেখা যায় লিলি তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ রাখিয়া তাহা অনুভব করে। কোনকিছু সে অনুসন্ধান করে, কিন্তু তাহাতে ওর শূন্য মুঠি ভরিয়া উঠে না—বরং শূন্যতাটাই আরও বড় হইয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

মৃন্ময় চলিয়া যাইতে সে ক্ষুন্ন হইয়াছিল। তারই পরিত্যক্ত ঘরের পাশ দিয়া চলিতে গেলেই একটা বিচিত্র অনুভূতি মুহূর্ত্তের জন্য তাহার গতিবেগ রুদ্ধ করিত, কিন্তু পঙ্কজের পানে চোখ পড়িলেই তার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা একস্থানে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইত। ফলে বাহিরের কোন কিছুই তার মনকে তেমন করিয়া দোলা দিতে পারে নাই। কিন্তু পঙ্কজের মৃত্যুর পরে সে নিজেকে নূতনভাবে আবিষ্কার করিল। এই আবিষ্কার তাহাকে শঙ্কিত ও চিন্তিত করিয়া তুলিল। যাহার ফলে পুত্রের স্মৃতিকে ঘিরিয়া...

মৃন্ময় পুনরায় কথা বলিয়া উঠিতে লিলির চিন্তাধারায় বাধা পড়িল। মৃন্ময় বলিল, ভালবাসায় দ্বিধা থাকলে তা কোনদিন

সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না লিলি। সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হলেই সুন্দরের আবির্ভাব ঘটে। আসল কথা দোষ মঞ্জুষার নয়, আমার নিজের।

লিলি বলিল, তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মিনুদা। খামোকা নিজেদের এ ভাবে বিপন্ন করবার দুর্মতি তোমাদের কেন হয়? তা ছাড়া এ কথাটাও আমি বুঝে উঠতে পারছি না, কথাগুলি তুমি কাকে লক্ষ্য করে বলছ? আমার যতদূর মনে হয় তোমার নিজেকে নয়।

এই প্রশ্নে মৃন্ময় চমকাইয়া উঠিল। তার এতক্ষণের কথাগুলি একবার মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিল, কিন্তু লিলির উক্তির সমর্থনে কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাইল না। প্রকাশ্যে সে কহিল, তুমি ভুল করেছ লিলি, কথাটা আমি নিজেকে লক্ষ্য করেই বলেছি। তুমি ত জান আমার অকারণ দ্বিধাই আবার নূতন করে মঞ্জুষাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিতে পারি নি।

লিলি বলিল, তুমি ত হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলে মিনু-দা। সে হাতে হাত রাখতে মঞ্জু পারলে কোথায়?...

মৃন্ময় বাধা দিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, এটা ঠিক কথা হ'ল না লিলি। তোমার শুধু একটা দিকই চোখে পড়েছে, নইলে নাক্সুর দেওয়া দায়িত্বকে এড়াবার জন্য আমার চোরের মত পালিয়ে যাওয়াটাও তোমার চোখে পড়ত এবং হয়তো তার জন্য তুমি আমায় তিরস্কার করতে। আসলে কোন প্রকারেই আমি একটা সামঞ্জস্য করে নিতে পারি নি।

লিলি বলিল, তুমি দুঃখ পাবে জানলে আমি এসব কথা তুলতাম না মিনুদা! কিন্তু সংসারে ভুল না করে কে—তাই বলে তাকে সংশোধন করে নেওয়া চলবে না কেন! ভুলটাকে চিরদিন ভুল হয়েই বেঁচে থাকতে হবে এ একটা কথাই নয়।

মৃন্ময়ের মুখে বড় চমৎকার একটুখানি হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, কি জানি হয়তো তোমার কথাই ঠিক।

লিলি কহিল, হয়তো নয়, সেইটেই সত্য কথা।

মৃন্ময় হাসিমুখে কহিল, বেশ ত না হয় তাই হ'ল—তাতেই বা দোষ কি।

লিলি বলিল, দোষ-গুণের কথা নয়, মোট কথা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়াও অন্যায় মিনুদা।

মৃন্ময় প্রত্যুত্তরে বলিল, সত্য কথাই তুমি বলেছ লিলি, কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের হিসাব ত সকলে এক পথ ধরে করে না। মঞ্জু যে পথ বেছে নিয়েছে সেটা তার বুদ্ধি-বিবেচনায় সঙ্গত মনে হয়েছে বলেই সে তাকে গ্রহণ করেছে। তার পথে সে পূর্ণ হয়ে উঠুক—আমার মতের সঙ্গে তার মতের মিল হয় নি বলে, কিংবা আমার পথকে তার নিজের পথ বলে সে গ্রহণ করে নি বলেই সে ভুল করেছে এমন কথা আমি বিশ্বাস করি না।

একটা জবাব দিবার জন্যই হয়তো লিলি মুখ তুলিয়াছিল, কিন্তু সহসা ঝিয়ের উপস্থিতিতে সে থামিল এবং ঝিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, তোমার চুলো ধরলো?

ঝি জানাইল যে, চুলা বহুক্ষণ ধরিয়াছে এবং চায়ের জলও এতক্ষণে ফুটিতে সুরু করিয়াছে।—লিলি প্রস্থান করিল।

ঝি মৃন্ময়ের ঘর পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। হাতের সঙ্গে তাহার মুখও সমানে চলিতে লাগিল। সব কথাই সে লিলিকে উপলক্ষ করিয়া বলিতেছিল। পঙ্কজের মৃত্যুর পর সে নাকি অসম্ভবরকম বাতিকগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পান হইতে চুণ খসিবার উপায় ছিল না। অকারণে চেচামেচি করিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিত। চুপ করিয়া থাকিত শুধু পূজা-অর্চনার এবং মৃন্ময়ের ঘরের জিনিষপত্র গোছগাছ করিবার সময়। একটা তরকারি রান্না করিতে গিয়া পঞ্চাশ বার তাহাতে হাত ধুইতে দেখা যাইত। পঞ্চ ব্যঞ্জনে ভোগ সাজাইয়া রোজই সে তার মৃত পুত্রের ফটোর কাছে ধরিয়া দিত। নিজে সে দিনান্তে কোনদিন বা একবার আহার করিত, কোনদিন একেবারে উপবাস করিয়া কাটাইয়া দিত। বারণ করিলে গ্রাহ্য করিত না। শুধু হাসিয়া উড়াইয়া দিত, কিন্তু মৃন্ময়ের উপস্থিতি নাকি দৈব-শক্তির মত কাজ করিয়াছে। উপসংহারে সে একথা জানাইতেও ভুলিল না যে মৃন্ময় যেন এখন কিছুদিন এখানে থাকিয়া যায়। নতুবা আবার হয়ত তেমনি...কথাটা ঝি সমাপ্ত করিতে পারিল না। লিলি এদিকেই আসিতেছে। দূর হইতে সে ঝিয়ের হাত-পা নাড়া লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, কাছে আসিয়া হাসিয়া বলিল, হাত-মুখ নেড়ে এত কি বলছিলে লছমিয়া?

যেন মস্তবড় একটা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে এমনি মুখের ভাব করিয়া সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু জবাব দিল মৃন্ময়, লছমিয়ার বুঝি গল্প করবার কিছু থাকতে নেই?

লিলি বলিল, থাকবে না কেন। আর সেই কথাই ওকে আমি জিজ্ঞেস করেছি মিনুদা।

মৃন্ময় হাসিয়া বলিল, কথাটা সকলের সামনে বলবার হলে তোমার সামনেই বলতো। ওটা গোপন কথা। ব্যক্তিগত।

লিলি হাসিতে লাগিল। লছমিয়া এক পা দুই পা করিয়া সরিয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

সেকালের বেথুন কলেজ ও স্কুল

শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী

আমার মা লীলাবতী মিত্র (রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের চতুর্থ কন্যা ও সঞ্জীবনী-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের পত্নী) ১৮৭৯ সালে বেথুন স্কুলে পড়তেন। তিনি তখনকার স্কুলের কথা নিজের ডায়েরীতে যা লিখে রেখে গিয়েছিলেন তা পূর্ব্বে থেকে এখানে কিছু বলছি। বেথুন স্কুলটি মাইনর স্কুলের মত ছিল। মা এই স্কুলের প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ে ১৮৭৯ সালে পূজার বন্ধের সময় তাঁর পিতার সঙ্গে দেওঘরে চলে যান। ১৫ বৎসর বয়সেই তাঁর ঐ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হয়।

বেথুন স্কুলে তখন শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শ্রীমতী প্রতিভা দেবী (পরে সার আশুতোষ চৌধুরীর পত্নী হয়েছিলেন), শ্রীমতী জ্ঞানদা মজুমদার, হরনাথ বসু মহাশয়ের কন্যা হেমলতা রায় (পরে কালীনাথ রায়ের পত্নী হয়েছিলেন), দীনবন্ধু মিত্র (সুবিখ্যাত সাহিত্যিক) মহাশয়ের কন্যা তমালিনী মার সঙ্গে পড়তেন। তিনি এই সহপাঠিনীদের কথা প্রীতি ও স্নেহের সঙ্গে স্মরণ করতেন। মা অতিশয় শান্ত-প্রকৃতির ছিলেন, এজন্য স্কুলের কি ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রী, কি বাঙালী পণ্ডিতেরা সকলেই তাঁকে খুব স্নেহ করতেন।

সেকালে ইংরেজ-মহিলারা স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হতেন। তাঁরা শিক্ষাদানে তেমন নিপুণা ছিলেন না, শিক্ষার ব্যবস্থাও আশানুরূপ উৎকৃষ্ট ছিল না। তাঁরা বিলাতী সুরে বাংলা গান শেখাতেন।

একবার গবর্ণর-জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের কন্যা মিস্ ব্যারিং স্কুলে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে এসেছিলেন। তাঁর অভ্যর্থনার জন্য একটি বাংলা গান রচিত হয়েছিল—সেই গানের কয়েকটি পদ এই রকম ছিল—

নমস্কার, নমস্কার সুমতি মিস্ ব্যারিং
এখন আমরা হর্ষিত হই,
কারণ আপনার দর্শন পাই
নমস্কার, নমস্কার !
দয়া কর এই বিদ্যালয়ের প্রতি,
নমস্কার নমস্কার।

ছাত্রীরা যখন স্কুলে গোলমাল করত, তখন তাদের গোলমাল থামাবার জন্য একটি গান রচিত হয়েছিল। কোন শ্রেণীতে গোলমাল হলেই শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীদের সেই গান গাইতে বলতেন—গানটি এইরূপ :—

চুপ, চুপ, একেবারে চুপ,
কারণ শিক্ষক বলেন চুপ,
চুপ, চুপ, চুপ,

ছাত্রীরা স্কুলের কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে নীচের গানটি গাইত—

আইস আমরা পাঠশালে যাই,
ছোট মেয়ে, ছোট মেয়ে
পাঠশাল মাঝে শিষ্ট রয়, শান্ত রয়।

ছাত্রীরা স্কুলের ছুটির পর যখন স্কুলের গাড়ীতে বাড়ী ফিরত, তখন খুশীমনে সমস্বরে গাইত—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।

মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে যখন গাড়ী উপস্থিত হ'ত, তখন ছাত্রীরা উচ্চৈঃস্বরে গাইত—

মেডিকেল কলেজ
Have no knowledge
বড় বড় থাম
কুছ নাই কাম।

সেকালের স্কুলের উচ্চশ্রেণীতে *Royal Reader IV*, নবনারী, সীতার বনবাস, রোমের ইতিহাস প্রভৃতি বই পড়া হ'ত।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে, ১৯০১ সালে, আমি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় হতে এণ্টান্স (বর্ত্তমান ম্যাট্রিক) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেথুন কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই। তখনকার দিনে ঘোড়ায় টানা লম্বা বড় 'বাস'-গাড়ীতে ছাত্রীদের কলেজে যাতায়াত করতে হ'ত। বলা বাহুল্য, মোটর বাসের তখন চলন হয় নাই। এই বাসে চড়ে মাঝে মাঝে বড়ই বিপদে পড়তে হ'ত।

কোন দিন চলতে চলতে হঠাৎ ঘোড়া ক্ষেপে যেত, গাড়ীতে লাথি মারতে থাকত আবার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়ে গাড়ী নিয়ে পাগলের মত ছুটত। কোচম্যান প্রাণপণে ঘোড়া দুটিকে সংযত করতে চেষ্টা করত, কিন্তু সব সময়ে তা সম্ভবপর হয়ে উঠত না। বাসসহ ঘোড়া ফুটপাতের উপর উঠে গিয়ে ল্যাম্পপোষ্টের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থেমে যেত। কোন দিন ঘোড়াগুলি ছুটতে ছুটতে সোজা রাস্তা ছেড়ে পাশের রাস্তায় ঢুকে বাস-গাড়ীকে অনেক দূর পর্য্যন্ত নিয়ে যেত। মাঝে মাঝে কোচম্যানের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে দাঁড়াত। ঘোড়া পিছনের পা তুলে জোরে জোরে গাড়ীতে লাথি মারত, কোচম্যান স্থির ভাবে লাগাম ধরে থাকতে পারত না—সে গাড়ী থেকে পড়ে

যেত আর ঘোড়া বেদম ছুট দিত—কোচম্যানও ঘোড়া ধরবার জন্তে চাবুক হাতে বাসের পিছনে পিছনে দৌড়াত আর মেয়েরা গাড়ীর মধ্যে চেঁচাতে থাকত। এই হাঙ্গামায় বাড়ীতে পৌঁছাতে আমাদের রাত্রি হয়ে যেত—মা বাবা কত ভাবতেন আর খোঁজখবর নেবার জন্ত কলেজে লোক পাঠাতেন।

আমি যখন বেথুন কলেজে ভর্ত্তি হই তখন চন্দ্রমুখী বসু প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। প্রথম দিনই তিনি আমাকে কাছে ডেকে আদর করলেন, আমি তাঁর আদরে মুগ্ধ হয়ে ভাবলাম, আমার কি সৌভাগ্য যে, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আমাকে স্নেহ-ভরে কাছে ডেকেছেন। কয়েক মাস পরেই তিনি কলেজের কাজ হতে অবসর নিলেন। তাঁর বিদায়ের দিনে ছাত্রীরা সকলে মিলে চাঁদা তুলে জড়োয়ার ব্রেসলেট উপহার দিয়ে-ছিল।

তিনি চলে যাবার পরে কুমুদিনী দাস বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি বেশ মিষ্টি সুরে গান গাইতেন আর বেশ ভাল বীণা বাজাতে পারতেন। তিনি বি-এ ক্লাসে আমাদের শেক্সপীয়ার পড়াতেন। তখনকার দিনে অন্যান্য যাঁরা অধ্যাপনা করতেন তাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করছি :

সুরবালা ঘোষ (এম্-এ ক্লাসে ইংরেজী) পরেশনাথ সেন (বি-এ ক্লাসের ইংরেজী), আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় (লজিক ও ফিলজফি, এফ-এ ও বি-এ ক্লাসের) হেমপ্রভা বসু (বোটানি—এফ-এ ক্লাসে), বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায় (বি-এ ক্লাসের ইংরেজী), হেমচন্দ্র দে (বি-এ ক্লাসের ফিলজফি), কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত (ম্যাথেমেটিকস্ বি এ ক্লাস) আদিত্যনাথ চট্টোপাধ্যায় (ম্যাথেমেটিক্স্, এফ-এ ক্লাস) এঁরা সকলেই অতি যত্নের সঙ্গে আমাদের পড়াতেন। তাঁদের আজ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি।

তখন বেথুন কলেজে বিজ্ঞান পড়ান হ'ত না। কাজেই কোন গবেষণাগার ও যন্ত্রপাতি ছিল না। বি-এ ক্লাসে যখন Astronomy (জ্যোতির্বিজ্ঞান) পড়তাম, তখন একটি মাত্র পুরানো গ্লোব বা গোলক ছিল, আর কোন সরঞ্জাম ছিল না। অধ্যাপক এক হাতের মুঠাকে সূর্য্য বানাতেন ও আর এক হাতের মুঠাকে পৃথিবী ধরে নিয়ে, পৃথিবীর গতির ব্যাখ্যা করতেন।

আমি যখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে (ফার্ষ্ট আর্টস—এখনকার আই-এ) পড়ি তখন আমাদের ক্লাসে মোট ১৫ জন ছাত্রী ছিল। তার মধ্যে এক জন ইংরেজ (মার্গারেট নেলসন), দুই জন এংলো-ইণ্ডিয়ান (ডলি ও রোজি) আর একটি নিগ্রো (গার্ট্রুড কক্স) ছিল—বাদবাকী কয়েকটি বাঙালী মেয়ে।

তখন স্কুলগৃহের বড় হল-ঘরে বেথুন স্কুল বসত। উঠানের দক্ষিণদিকের হলে কলেজের ছাত্রীরা পড়ত।

আমরা যখন ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে পড়তাম তখন খালি পায়ে, সেমিজ, ব্লাউজ ও শাড়ী পরে স্কুলে যেতাম। টিফিনের ছুটির সময় উঠানে স্কিপ করতাম, চোর চোর ও হা ডু ডু খেলতাম। কিন্তু বেথুন কলেজে ভর্ত্তি হবার সময় আমাদের বেশভূষার একটু পরিবর্ত্তন হ'ল। আমরা তখন সেমিজ, ব্লাউজ, শাড়ীর সঙ্গে পেটিকোট ও জুতা পরতে লাগলাম। কলেজের টিফিনের সময় আমাদের খেলাধুলাও ছাড়তে হ'ল। তখন শান্তশিষ্ট হয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে দল বেঁধে বারান্দায় বেড়াতাম, না হয় কমন রুমে বসে বই পড়তাম।

তখনকার দিনেও স্কুল ও কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভা হ'ত। ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত থেকে আবৃত্তি ও সঙ্গীত হ'ত। একবার টেনিসনের "ইন মেমোরিয়ম" থেকে ও সংস্কৃতে শকুন্তলা থেকে আবৃত্তি করেছিলাম।

১৯০৬ সালে আমি বি-এ পাস করি। সে বছর আমরা তিনটি মাত্র মেয়ে বি-এ পাস করেছিলাম। আমি বেথুন কলেজের মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান—আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলাম। সেজন্ত বাইশ টাকার পুরস্কার পাই। সেবার বড়লাট লর্ড মিণ্টো পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কারের বইগুলি সংখ্যায় বেশী ও অনেক ভারী হওয়াতে বড়লাট বলেছিলেন, "এতগুলি বই তুমি কি একবারে নিয়ে যেতে পারবে ?" আমি দু'বার এসে বইগুলি নিয়ে যাই।

যাদের সঙ্গে কলেজে পড়েছি তাদের সঙ্গে দেখা হলে এখনও কত আনন্দ হয়। আর সে সব পুরানো দিনের কথা মনে হয়।

বেথুন কলেজের নিকট আমরা ঋণী—কারণ এ কলেজটি স্থাপিত না হলে আমরা তখনকার দিনে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারতাম না—যেটুকু জ্ঞানের আলোর আমাদের মনের অন্ধকার খানিকটা অপগত হয়েছে তা থেকে বঞ্চিত থাকতাম। আজ বিশ্ববিধাতার চরণে কৃতজ্ঞতা জানাই আর প্রার্থনা করি আমাদের এই প্রিয় কলেজটি অক্ষয় পরমায়ু লাভ করুক।*

* বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী উৎসবে পঠিত।

কমলাকান্তের কিঞ্চিৎ

অধ্যাপক শ্রীপুলিনবিহারী পাল

কমলাকান্তের প্রথম দেখা মিলে 'বঙ্গদর্শনে', বাংলা ১২৭৯ সালে। ইংরেজীর গন্ধ না থাকিলে যাহারা গ্রাস মুখে লইয়াও হাই তুলিতে থাকেন, গিলিতে পারেন না, তাঁহাদের লইয়া আর কি করা যায়? তাহাদের মুখ চাহিয়া গাণিতিকের উপর বরাত দেওয়া রহিল, সন তারিখ গুণাইয়া তিনি ইংরেজী সালটা বাহির করিয়া দিবেন। মনে হয় আজকাল আর কেহ 'বঙ্গদর্শন' লইয়া গোলে পড়িবেন না। কমলাকান্ত নিজে সেই ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইবার পথ বাতলাইয়া দিয়াছে। 'বঙ্গদর্শন' 'বঙ্গদেশ দর্শন' নয় বা 'বাংলার দাঁত'ও নয়, এমন কি 'A Guide to East Bengal'ও নয়। উহা একটি মাসিক পত্রিকা, তাহাতে কমলাকান্ত শর্ম্মার মাসিক পিণ্ডদান হইত। যাহাই হউক, কেমন করিয়া যে তাহার শৈশব এবং বাল্যকাল কাটিয়াছিল তাহার এতটুকু ইঙ্গিত গ্রন্থের মধ্যে কোথাও নাই। বোধ হয় গ্রন্থকারের সে ইচ্ছাই ছিল না।

কমলাকান্ত জাতিতে বামুন—উপাধি চক্রবর্ত্তী, রাজচক্রবর্ত্তী ভাবিয়া অঞ্জলি পাতিলে কাহারও রাজপ্রসাদ লইয়া ফিরিবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই। জনশ্রুতি—কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয়তম পুত্র, তা মানসপুত্রই হোক বা পোষ্যপুত্রই হোক। কিন্তু গোল বাধিয়া যায়, চাটুজ্জে-তনয় কেমন করিয়া চক্রবর্ত্তী হইয়া উঠিল। শোনা যায় আজকাল নাকি পৈতৃক খেতাব বরখাস্ত করিয়া নয়া খেতাব কুড়াইবার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে—এ যেন সেই 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়...' হয়ত বা কমলাকান্ত সেই দলে ভিড়িয়া তাহাদের খাতায় নাম লিখাইয়া থাকিবে।

কমলাকান্ত কিছু লেখাপড়া জানিত, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে বিদ্বান্ বলা চলে না। কেননা যে বিদ্যায় তালুক-মুলুক হইল না তাহা বিদ্যাই নয়। একবার তাহার একটা চাকুরী জুটিয়াছিল, তাহার ইংরেজী শুনিয়া কোন সাহেব খুশি হইয়া করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু সে তাহা পাইয়াও রাখিতে পারিল না। বোধ হয় চাকুরী করা তাহার ধাতে সহিত না। 'ন শ্বৃত্ত্যা কদাচন' মনুর এই বচন স্মরণ করিয়াই যে সে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়াছিল তাহা নহে। আপিসের খাতাপত্রে কেবলই কবিতার আবির্ভাব হইতে থাকিলে তাহার জন্য অন্য যে-কোন ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয় হোক সওদাগরী আপিসের চাকুরী নিশ্চয়ই নয়। অর্থে তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই 'যেন তেন প্রকারেণ' অর্থ-সংগ্রহের জন্য তাহার মাথায় একেবারে খুন চাপিয়া বসে নাই। সামান্য কিছু জুটিয়া গেলে যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না—সে গোশালাই হোক বা সরকারী অতিথিশালাই হোক, অর্থাৎ 'যত্র তত্র ভোজনঞ্চ শয়নং হট্ট মন্দিরে' ইহাই সে জীবনের সার করিয়াছিল। সংসারে সবকিছুর মায়া কাটাইয়া উঠিলেও একটি বস্তুর নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। ইহার অভাব হইলে তাহার মগজের ভিতর যতকিছু বুদ্ধির আস্ফালন 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ'র মতই তলাইয়া যাইত।

সেই দ্রব্যগুণেই তাহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে বিস্তর ফসল ফলিয়াছিল। তাই জীবনের সব কিছু খোয়াইয়াও সে সম্বল করিয়াছিল—সাত রাজার ধন মাণিক নয়, আফিঙের ডেলা—মোটেই সরিষা ভোর নহে, একেবারে এক আধ ভরি। এই আফিঙের মাত্রা চড়াইয়াই সে আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছে তাহার অমূল্য দপ্তর। ইহার অভাবে কমলাকান্তের কেরামতি বিলকুল বানচাল হইয়া যাইত, সব কিছু তালগোল পাকাইয়া উঠিত। না বসিত 'বড়বাজার', না হইত 'ফুলের বিবাহ,' না ডাকিত 'বসন্তের কোকিল'। 'দুর্গোৎসবের' বোধন-বেলায় বাজিয়া উঠিত বিসর্জ্জনের বাজনা, 'বিড়াল' হইতে মায় 'ঢেঁকি' পর্য্যন্ত সব কিছু ভোজবাজির ভেল্কির মত একেবারে উধাও হইয়া যাইত।

অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত। শেক্সপীয়ার লিখিয়া গিয়াছেন--

> 'The lover, the lunatic and the poet
> Are of imagination all compact.'

অর্থাৎ প্রেমিক, পাগল এবং কবি ইহারা সকলেই এক-গোত্রের মানুষ। হয়ত পাগলামি তাহার কতকটা ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার মধ্যে কবিত্বের ছিটেফোঁটাও যেটুকু ছিল তাহাও পাগলামির দাপটে বাষ্প হইয়া উবিয়া গিয়াছিল ইহা মানিয়া লইতে মন নিতান্তই নারাজ। বরং উভয়ই কখনো কখনো উগ্ররূপে ফুটিয়া উঠিত, বড় বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিত নতুবা তাহার চাকুরীর ক্ষেত্রটা কবিতার আখড়া হইয়া উঠিত না, আপিসের খাতাপত্রগুলা হিসাব-নিকাশের বালাই ঘুচাইয়া দিয়া কাব্যবধূর সোহাগে মাতামাতি দাপাদাপি করিত না। তবে কাব্যরসের কিঞ্চিৎ তাহার মধ্যে স্থান পাইলেও তাহা যে অত্যন্ত মোটা রকমের ইহা বলাই বাহুল্য। না হইলে আমাদের সাধের সংসারটা হরকিসিমের নাচ-গানের আসর না হইয়া তাহার চোখে ঢেঁকিশাল বলিয়া ঠেকিবে কেন? ইংরেজী সাহিত্যে পাই—'প্রেম অন্ধ', আমাদের সাহিত্যে প্রেমের অন্ধত্ব ঘুচিয়া একটু একটু করিয়া চোখ ফুটিতেছে না কি?

সকলেই জানেন যে, কমলাকান্ত বিবাহের ফাঁসিকাষ্ঠে গলা বাড়াইয়া দিয়া 'দুর্গা' বলিয়া ঝুলিয়া পড়িতে রাজী ছিল না, ও বিষয়ে তাহার উৎকট অরুচি এবং দস্তুরমত অনিচ্ছা ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া প্রেমের মজলিসে সে নিতান্তই আনাড়ী—চোখ বুজিয়া কেহই এ যুক্তি মানিয়া লইবে না। ইহা জানা কথা যে, অনেকে বিবাহের বোঝা ঘাড়ে না লইয়াও মধুকরের ন্যায় ফুল হইতে ফুলে উড়িয়া মধুসংগ্রহে ব্যস্ত—তাঁহারা কি প্রেমিক নহেন? প্রেম নামক পদার্থটি একেবারেই নাকি বিশ্বজোড়া, ইহার তড়িৎ-প্রবাহ সবকিছুই নাড়া দিয়া যায়। ইহার ছোঁয়া লাগিলে মৃত অস্থিতেও নাকি প্রাণ নাচিয়া উঠে। ইহাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আটক রাখিলে ইহা একেবারে অতলে তলাইয়া যাইবে। এই ভরাডুবির হাত হইতে ইহাকে বাঁচাইতে হইলে ইহার রাশ টানিয়া ধরিলে চলিবে না, আল্‌গা করিয়া দিতে হইবে। প্রেমের এই বহুৎ রকমের কসরত দেখাইয়াই ত উপন্যাসের যা কিছু রুজিরোজগার। না হইলে উপন্যাস বাঁচে কি করিয়া? ইহার অভাবে হয় আরব্যোপন্যাস, না হয় বড়জোর ঠাকুরদাদার ঝোলা বা ঠাকুরমার ঝুলিতে দেশটা ছাইয়া ফেলিত, আর আসল উপন্যাস-সাহিত্য গা ঢাকা দিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িত।

সংসারে কমলাকান্তের বড় কেহ আপনার ছিল না। ভীষ্মদেব খোসনবীস, নসীরামবাবু এবং প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল। নসীরামবাবুর বাড়ীতে কমলাকান্ত একটা আশ্রমও বসাইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে আশ্রম তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে তাহার সম্পর্কটা ছিল বেশ কাছাকাছি এবং পাকাপাকি গোছের, কিন্তু উভয়ের মাঝখানে ছিল মঙ্গলা গাই। কাজেই তাহাদের সম্পর্কটা বরাবরই কেমন গব্যরসাত্মক হইয়া রহিল, কখনো কাব্যরসাত্মক হইয়া উঠিতে পাইল না। কাব্যরস আর গব্যরসের বিনিময়ে গোড়া হইতেই ওখানে দাঁড়ি পড়িয়া গেল, কিছুতেই দুই রসে মিলিয়া মিশিয়া গলাগলি ঢলাঢলি হইয়া উঠিল না। না হইবারই কথা। অধুনা যে হালচাল দেখা যাইতেছে তাহাতে গব্যরস, খাদ্যরস যে পরিমাণে কমিয়া আসিতেছে, ওবিষয়ে বক্তৃতার বহর সেই পরিমাণে জোরালো হইয়া নির্জ্জলা কাব্য-রস পরিবেশন করিতেছে। সেইজন্যই বোধ হয়, চারিদিকেই একটা কাব্যিক পরিবেশ কায়েম করিবার ওঠবোস আরম্ভ হইয়াছে। তাই এক একবার বলিতে ইচ্ছা করে, 'হায় মঙ্গলা এক দিন তোমার অক্ষয়বাঁট হইতে নির্জ্জলা দুধ দিয়া কমলাকান্তের দপ্তর রচনা করিয়াছিলে, আজ কিন্তু ভারত-মাতার বাঁট হইতে দুধের বদলে বক্তৃতার পর শুধু বক্তৃতা ঝরিতেছে আর নেপথ্যে ভাবী মহাভারত-রচনার মহড়া চলিতেছে। বোধ হয় অদ্ভুত রসের ফোড়নে উহাই হইবে ঐ মহাকাব্যের একমাত্র কাব্যরস।'

বঙ্কিমচন্দ্রের না ছিল কি? প্রসন্ন গোয়ালিনী, মঙ্গলা গাই, ভীষ্মদেব খোসনবীস, নসীরামবাবু, স্বয়ং কমলাকান্ত, তাহার আফিঙের ডেলা, তাহার প্রসাদে দিব্যদৃষ্টি, সর্ব্বোপরি কল্পনার রঙীন চশমা। তা ছাড়া চাতক-চকোর, দিবাকর-নিশাকর, কূজন-গুঞ্জন দখিনা পবন কিছুরই অভাব হইত না। তবু তাহারা সকলেই কেমন যেন আল্‌গা আল্‌গা রহিয়া গেল, বেশ আঁটসাট হইয়া জমাট বাঁধিয়া উঠিল না। মনচুরির ব্যাপার লইয়া কমলাকান্ত মাত্র একটু রসিকতা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহা বঙ্কিমবাবুর মোটেই পছন্দসই হইল না, অমনি তর্জ্জন-গর্জ্জনে তাহাকে বিদায় করিলেন—সামান্য একটু অছিলায়ও রতিপতি এমুখো না হন, কোন অজুহাতে কোথায়ও ঢুকিয়া না পড়েন সেই দিকে তাঁহার কড়া নজর ছিল। চারিদিকেই কাঁটার বেড়া খাড়া করিয়া ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন সাইনবোর্ড, বড় বড় হরফে রং করা 'প্রবেশ নিষিদ্ধ'। মতলবটা অনধিকারপ্রবেশ করিলেই যেন ভস্ম করিয়া ছাড়িবেন। তাই ক্ষেত্রই প্রস্তুত হইয়া রহিল, কিন্তু তাহাতে প্রেমের বীজ পড়িয়া অঙ্কুর গজাইয়া উঠিল না। কোন দিন পথ ভুলিয়া আসিয়াও দখিনা হাওয়া ভিতরের পর্দ্দাখানি একটু সরাইয়া দিয়া চারিচোখের চোরা চাহনির পথটা খুলিয়া দিল না। এমন হইবারই কথা। নিতান্ত একটা ভবঘুরে, গুণের মধ্যে সে আফিংখোর, জীবনে যার এক পয়সার সম্বল নাই, মাথা গুঁজিবার মত ত্রিভুবনে যার এতটুকু ঠাঁই নাই তাহাকে লইয়া উপন্যাসের কৌলীন্য বজায় থাকে কেমন করিয়া? 'যস্য ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ' উপন্যাসের বাজারে তাহার দর যাচাই করিতে যাওয়া নিছক বিড়ম্বনা। তবে যে মুচিরাম গুড় আসর জাঁকাইয়া বসিল তা শিশুকাল হইতেই সে বাবাকে শালা বলিতে শিখিয়াছিল বলিয়া নয়। সে রহস্যের চাবিকাঠি অন্য কোথাও আছে। রজতচক্রের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক ছিল কি না ইচ্ছা করিলে গবেষকেরা সেই বিষয়ে গবেষণা চালাইতে পারেন। তারপর কেহ কেহ হাতে পায়ে ধরিয়া কোনমতে উপন্যাসের আসরে আসিবার অনুমতি পাইলেও কোনরূপ মর্য্যাদাই তাহাদের কপালে জুটিল না। না হইলে চন্দ্রশেখরের মত লোকের কপাল পুড়িবে কেন? পাইয়াও তিনি শৈবলিনীকে রাখিতে পারিলেন না কেন? যৌবনের ভরা জোয়ারে শৈবলিনীর প্রতি অঙ্গের উপর দিয়া যে লাবণ্যের বান ডাকিয়া গেল, তাহাতে প্রতাপ ডুবিল, শৈবলিনী নিজে ভাসিয়া গেল, চন্দ্রশেখর তখন পুঁথির ভিতর মাথা গুঁজিয়া তত্ত্বের অথৈ জলে একেবারে বেহুঁস হইয়া আছেন। বনবাসে কোন রকমে বাঘের গ্রাস এড়াইয়া আসিলেও নবকুমার

কাপালিকের কাছে করালী চামুণ্ডার বলি হইয়াই রহিল। কপালকুণ্ডলা অনেকটা ঝুঁকি ঘাড়ে লইয়াই তাহাকে মৃত্যুর মুখ হইতে টানিয়া আনিল, কিন্তু সে-ই আবার তাহাকে সর্ব্বনাশের মুখে ঠেলিয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। স্বামিগৃহকে নরককুণ্ড জানিয়া সূর্য্যমুখী মরিতে গিয়াও মরিতে পারিল না, আবার ফিরিয়া আসিয়া তাহারই মধ্যে তাহাকে ঘরকন্না ফাঁদিয়া বসিতে হইল। ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, সে ত জমিদার নগেন্দ্রনাথের তিনমহলা চকমিলান আর চোপ-ধাঁধান ইমারত।

তা ছাড়া কথায় বলে একহাতে তালি বাজে না। পুরুষ মহাপুরুষ হইলেও শুধু তাহাকে লইয়া ঘরসংসার চলে না। এইজন্যই সৃষ্টির মূলে প্রকৃতি-পুরুষের কল্পনা—অর্দ্ধনারীশ্বরে তার রূপায়ণ। বাইবেলে আদমের হাড়পাঁজরা হইতে ইভের জন্ম, তাই অর্দ্ধাঙ্গিনী আমাদের আদরের সোহাগিনী। তাই শুধু কমলাকান্তকে দিয়া আর কি হইবে? সন্ধ্যদোষের রাহুগ্রাস হইতে ছাড়া পাইলেও শুধু তাহাকে লইয়া আর যাহাই চলুক না কেন, অন্ততঃ উপন্যাসের বাজার বসানো চলে না। কথা উঠিতে পারে, প্রসন্নও ত ছিল, তাহাকে লইয়াও নায়িকার কাজটা চলিতে পারিত। হাঁ, প্রসন্ন ছিল বটে এবং সতীসাধ্বী পতিব্রতা বলিয়া তাহার কিছু সুনামও ছিল। কমলাকান্ত যে বলিয়াছিল—একপোয়া দুধে তিন পোয়া জল দেখিলেই চিনিতে পারা যায় প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ, এজন্য তাহাকে অসতী বলা যায় না, কেন না ইহা নিছক রসিকতা। তবে সাধু ঘোষের স্ত্রী বলিয়া সাধ্বী এবং বিধবা হইয়াও পতিছাড়া নহে এজন্য পতিব্রতা—ইহা বদলোকের বদমেজাজী দুস্কার, মোটেই গ্রাহ্য করিবার মত নয়।

আসল কথা প্রসন্ন জাতিতে গয়লানী, তাহার উপর আবার বিধবা। ঘরে নাই কানাকড়ির পুঁজি, কাজের মধ্যে দুধ দই মাথায় করিয়া পাড়ায় পাড়ায় বিক্রী করা। এইরূপে কোন রকমে হাড়মাস জোড়া দিয়া তাহার দিন গুজরান হয়। কিসের গরজে এবং কোন্ খেয়াল-খুশীতে বিধাতা ইহাদের মত জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহারা সংসারের কি কাজে লাগিবে তা জানার প্রয়োজন না থাকিলেও এটুকু জানা উচিত যে, উপন্যাসের ভোজসভায় ইহারা ছিল অপাংক্তেয়। কখনো যেন এইসব অনাহূত রবাহূতের দল কোন ছুতায় ঢুকিয়া না পড়ে সেইজন্য দেউড়িতে দারোয়ানের ব্যবস্থা করিতেই হয়। শুধু তাই নয়, 'বন্ধ দুয়ার দেখ্‌লি বলে, অমনি কি তুই আস্‌বি চলে'—এই জিগির তুলিয়া, সকল রকম বিধি-নিষেধের আগল ভাঙিয়া, যাহারা একরকম জোর করিয়াই উপন্যাসের অন্দরমহলে ঢুকিয়া পড়িল, তাহাদের জন্য অনধিকার-প্রবেশের অভিযোগে পুলিস ডাকিতে হয় নাই বা হাজত-বাসের হুকুম হয় নাই সত্য, কিন্তু মনে হয় তাদের প্রবেশাধিকার না দিলেই ছিল ভাল। বিধবার কন্যা অনাথা কুন্দ, তাহাকে আপন কুটিরেই মানাইত ভাল। ঠেলাধাক্কা খাইয়া গড়াইতে গড়াইতে কোন রকমে হয়ত তাহার দিন কাটিয়া যাইত, কিন্তু কিসে তাহাকে পাইয়া বসিল। সর্ব্ব-নাশের পাখা মেলিয়া সে উড়িয়া আসিয়া বসিল কুটীর হইতে একেবারে জমিদার নগেন্দ্রনাথের অন্তঃপুরে। এই অপরাধেই কি এই বিরাট সংসারে তাহার জন্য শুধু মরণের পথটাই খোলা রহিল। যে কাননে কত ফুল ফুটিল, সৌরভ ছুটিল, সেখানে 'অকালে কুন্দকুসুম শুকাইল' কেন? পরের বাড়ী হাঁড়িকুড়ি ঠেলিয়া হেঁসেলের মধ্যেই বিধবা রোহিণী তাহার দুনিয়াদারী লইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু সে যখন ধাক্কা খাইয়া বাহিরে আসিয়া 'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ'র মতই হরলালের দিকে হাত বাড়াইল, তখন অলক্ষ্যে বসিয়া বিধাতা-পুরুষ বোধ করি একটু মুচ্‌কি হাসিয়া লইলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাহার কপালে না জুটিল হরলাল, না টিকিয়া গেল গোবিন্দ-লাল। তাহার জন্য বাছিয়া বাছিয়া বরাদ্দ হইয়া রহিল পিস্তলের গুলি এবং বোধ হয় পাথেয়-স্বরূপ একরাশ গায়ে-পড়া বহুমূল্য উপদেশ। তবে যে রজনী অন্ধ হইয়াও অচল হইয়া রহিল না, তাহার কারণ সে রাজকন্যা। রাজকন্যা অন্ধ হইলেও চোখ ফুটিতে কতক্ষণ?

যাহা হউক, এক দিন কমলাকান্ত সকলের মায়া কাটাইয়া উধাও হইয়া গেল। যাইবার বেলায় লোকহিতৈষণা প্রবৃত্তি তাহার কিছু প্রবল হওয়ায় সে দপ্তরটি বকশিস করিয়া গেল; উহা নাকি অনিদ্রা-রোগে ধন্বন্তরি বিশেষ। যাহারা কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমায় এই দাওয়াইটি তাহাদের কোন কাজে লাগে কিনা জানা যায় নাই। এই দেশে ঐরূপ একটি দাওয়াইয়ের বিশেষ প্রয়োজন। বর্ত্তমানের কাজ অনিদ্রা তাড়ানো নয় সুনিদ্রা ভাঙান। কেননা আমরা সকলেই প্রায় এক একটি আস্ত কুম্ভকর্ণ-বিশেষ।

সেই যে কমলাকান্ত চলিয়া গেল বঙ্কিমচন্দ্র আর তাহার কোন হদিস পান নাই। কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা ডুবিল' বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে হাল ছাড়েন, দামোদর সেই হাল ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া লন।

নিরুদ্দিষ্ট কমলাকান্ত সম্বন্ধে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাদের মনে হয় এই নেশাপ্রিয় ব্রাহ্মণ তনয় বঙ্কিমচন্দ্রকে ছাড়িয়া শরৎ চন্দ্রের আশ্রয় লইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আধ আলোতে যে কুঁড়ি ফুট ফুট করিয়াও ফুটিতে পায় নাই তাহাই শরৎ চন্দ্রের পূর্ণ আলোতে পাপ্‌ড়ি মেলিয়াছে তবে 'কমলাকান্ত' 'শ্রীকান্ত' হইয়াছে এই যা তফাৎ। শ্রীকান্ত যে কমলাকান্তেরই চেহারা বদল তাহা সহজেই মালুম হইবে। প্রথমেই দেখুন নামটা। 'কমলা' যে 'শ্রী' ছাড়া আর কেহ নয় অভিধানেই তাহার অকাট্য প্রমাণ মিলিবে

পাতা খুলিলেই সেখানে চোখে পড়িবে 'লক্ষ্মীঃ পদ্মালয়া পদ্মা কমলা শ্রীহরিপ্রিয়া'। 'কমলা' 'শ্রী' হইয়াছে বিশ্রী ত হয় নাই। হইবে না কেন? হালের রেওয়াজ দাঁড়াইয়াছে তাই।

এখন যে কুমুদিনী সৌদামিনী সরোজিনী পঙ্কজিনী মাতঙ্গিনী ইন্দুনিভাননীকে সরিয়া গিয়া যুঁই বেলা কৃষ্ণা শিপ্রা রেবা রেখার দলের জন্য পথ করিয়া দিতে হইয়াছে। ইহাতে বর্ণে যেটুকু ফিকা হইয়াছে, লাবণ্যে সেটুকু ফুটিয়াছে; বর্ণবাহুল্য যেটুকু গিয়াছে গড়নপেটনে সেটুকু পুরিয়াছে। কমলা যেন কতকটা শিথিল, কেমন যেন আল্‌গা আল্‌গা ঢিলাঢিলা; শ্রী বেশ গোলগাল, আঁটসাঁট, একেবারে যেন ঠাসবুনানি।

শ্রীকান্ত যে বামুন বিনা আপত্তিতে ইহা মানিয়া লওয়াই ভাল। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে হয়ত রাগিয়া বলিয়া বসিবে 'দেখছ না গলায় আমার দুলছে কেমন পৈতে, আমি যে কুলীন বামুন একথা কি আর কইতে।' পাড়েজী যে বলিয়াছিল, বামুন বলিয়াই সে যাত্রা শ্রীকান্ত শ্মশান হইতে প্রাণটা লইয়া আসিয়াছিল তাহা মোটেই মিছা কথা নহে। বামুন বলিয়া এক জন ত রেঙ্গুনের রাস্তার উপরই তাহার পায়ের উপর ঢিপ করিয়া পড়িল। আজিকার দিনে যেখানে হিন্দু কোড বিলের বিধানে বামুন কায়েত শূদ্রের ব্যবধানটাই লোপ পাইতে বসিয়াছে সেখানে শ্রীকান্ত চক্রবর্তী কি চাটুজ্জে তাহা লইয়া কাহারও বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার কথা নয়।

শ্রীকান্তও কিছু লেখাপড়া জানিত, কিন্তু তাহার দৌড় কি পর্য্যন্ত এখানে ওখানে হাতড়াইয়াও তাহার কোন ঠিকঠিকানা মিলে না। তবে স্কুলের অনেকগুলি সিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া সে যে একেবারে ডগায় চড়িয়া বসিয়াছিল অর্থাৎ এন্‌ট্রান্স ক্লাসের পড়ুয়া হইতে পারিয়াছিল তাহার নজির হাজির রহিয়াছে। স্কুলের সীমা-সহরদ্দ ছাড়াইয়া অনেকটা দূরে সরিয়া যাইবার পর পুঁথিপত্রের সঙ্গে মাঝে মাঝে মোলাকাৎ হইলেও বিদ্যাটা তাহার ঠিক কেতাবদুরস্ত হইয়া উঠে নাই। বলা বাহুল্য, এ বিদ্যাও তালুকমুলুক করিবার মত নহে। অন্ততঃ তাহার বেলায় তালুকমুলুক করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। কেহ তাহাকে ডাকিয়া লইয়া চাকুরী করিয়া দেয় নাই, রেঙ্গুনের কথায় তাহার মায়ের 'গঙ্গাজল' যে বলিয়াছিল জাহাজ হইতে নামিতে না নামিতে সাহেবেরা বাঙালীদের কাঁধে তুলিয়া লইয়া গিয়া চাকুরী দেয় ইহা নিতান্তই শিকার পাকড়াও করিবার ছেঁদো কথা। রেঙ্গুনের পথে পথে ঘুরিয়া, অনেক কাঠখড় পোড়াইয়া এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তাহাকে চাকুরী জুটাইতে হইয়াছিল—আপনি আসিয়া জুটে নাই। বোধ হয় ইংরেজী পড়নেওয়ালা এবং বুঝনেওয়ালারা দলে এত ভারী হইয়া উঠিয়াছিল যে কে কাহাকে ডাকিয়া চাকুরী দেয়। তা ছাড়া ফন্দি-ফিকির, তদ্বির-তদারক, সই-সুপারিশ, ঘুষঘাষ বলিয়াও ত কতকগুলা কথা আছে। না হইলে করিয়া খাইবার জন্য তাহাকে সাগর পাড়ি দিয়া সুদূর বর্ম্মামুলুকে ছুটিতে হইবে কেন? তবে চাকুরীর মসনদে বসিয়া কখনো তাহাকে কাব্যচর্চ্চায় মাতিয়া উঠিতে দেখা যায় নাই, আপিসের খাতাপত্রে আপিসের হিসাবপত্র ছাড়া কখনো কবিতায় মহামারী লাগিয়া যায় নাই। বরং কাব্যরসের বদলে যাহাতে চাকুরীটা বজায় থাকিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ গব্যরসের সংস্থান হইতে পারে সেই দিকেই তাহার মন পড়িয়া থাকিত। সুতরাং চাকুরীতে তাহার জবাব হওয়া ত দূরের কথা সে 'হাত বাহির করা টেবিল ছাড়িয়া একেবারে সবুজ বনাতমোড়া টেবিলের' মালিকানায় বহাল হইয়া গেল এবং মাহিয়ানার অঙ্কটাও ফুলিয়া ফাঁপিয়া আড়াই গুণ হইয়া উঠিতে একটুও টালবাহানা করিল না।

শ্রীকান্তের বাল্যকালটা কাটিয়াছিল অদ্ভুত রকমে, ঠিক আর পাঁচটা ছেলের মত নয়। নিতান্ত সুবোধ ছেলের মত খানকতক কেতাব কায়দা করিতে করিতে একজামিনের পর একজামিন পাশ করিয়া দশ জনের বাহবা কুড়াইবার জন্য তাহার কোনই মাথাব্যথা ছিল না। বরং দৌড়াইয়া ছুটিয়া, লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া গাছে উঠিয়া, নৌকা চড়িয়া, ছিপ ফেলিয়া, দেয়াল ডিঙ্গাইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি, ঠেলাঠেলি, করিবার দিকেই তাহার মাথা খেলিত বেশী। ইহার উপর সাথী জুটিল ইন্দ্রনাথ—ঠিক যেন 'মুড়ির সঙ্গে কড়াই ভাজা, মদের সঙ্গে হরিনাম।' ইন্দ্রনাথ ছিল আরও অদ্ভুত। সে যে ঠিক কেমন বলা শক্ত, তবে তাহার প্রকৃতি বুঝাইতে 'ধিঙ্গি ছেলে', 'দস্যি ছেলে', 'ডাকাত ছেলে' এবং আরও ঐ গোছের নাকসিটকানো এবং মুখ-ভেঙচানো বিশেষণগুলিই চলিত ছিল। সে ছিল দাঙ্গাহাঙ্গামায় পাকা, ভয়ডর বলিয়া কোনকিছু তাহার ছিল না। হাত দুখানি ছিল 'হাত-তিনেক করিয়া লম্বা', বুকখানা বোধ হয় পাথর দিয়া তৈরি, কিন্তু ঐ পাথরের মধ্যেই আবার স্নেহ-কারুণ্যের ঝরণাধারা বহিত। স্কুলে সে ঢুকিয়াছিল কিন্তু বীণা-পাণির সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায় এবং মাষ্টারমশায়ের জবরদস্তির জন্য সে কলম ফেলিয়া নৌকার হাল ধরিল। শ্রীকান্ত তাহার সাগরেদি করিয়া হাত পাকাইল এবং রাত-বেরাতে নদী নালা, বনবাদাড়, শ্মশান-মশানে ঘুরিয়া গুরুর যোগ্য চেলা হইয়া উঠিল।

অর্থে শ্রীকান্তের কোন প্রয়োজন ছিল না বলিতে পারিলে হয়ত শুনাইত ভাল। যাঁহারা অর্থই সকল অনর্থের মূল বলিয়া গলাবাজি আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহারাও খুশী হইতেন, কিন্তু তাহাতে সত্য কথাটা চাপা পড়িয়া যাইত। তাহার নিজের জন্য তেমন না হোক অন্ততঃ পরের জন্যও তাহার কিছু কিছু অর্থের প্রয়োজন হইত। না হইলে আজ পর্য্যন্তও বোধ হয় তাহার মায়ের 'গঙ্গাজল'-দুহিতা এবং পুটুর আইবুড়ো নাম

ঘুচিত না। ধূমপানে শ্রীকান্তের অভ্যাস থাকিলেও তাহাকে 'খোর' বলা চলে না। চুরুটের ধোঁয়া ফুঁকিয়া ফুঁকিয়া তাহার হাতে খড়ি হইলেও সে বহাল হইয়াছিল গুড়গুড়িতে। আফিং গাঁজায় মজিয়াছিল তেমন প্রমাণ নাই। এমন কি সিদ্ধিতেও তাহার সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া উঠে নাই।

গুড়গুড়ির অভাবে তাহার কি হাল হইত বুঝিয়া উঠা দায়, কিন্তু তাহার ধোঁয়ায় তাহার মাথা খুলিয়া যাইত ইহারও প্রমাণাভাব। কেহ তাহাকে পাগল বলিত এমন শোনা যায় নাই, তবে তাহার স্বভাবটা ছিল ভবঘুরেগোছের। কোথাও দু'দিন স্থির হইয়া বসা তাহার কুষ্ঠিতে ছিল না। সুতরাং তাহার ছিল 'ছি-ছি' মার্কামারা একটানা একটা হতচ্ছাড়ার জীবন। তাহার মধ্যেকার এই ভবঘুরেটাই তাহার ছন্নছাড়া জীবনের ছিন্নসূত্রগুলি কোনরূপে জোড়াতালি দিয়া ভ্রমণ-কাহিনীর ভিতর দিয়া আমাদের সামনে হাজির হইয়াছে। তাহার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও ছিল না বলিয়া সে তাহার পোড়া দু'টা চোখে যাহা দেখিয়াছে তাহাকে ঠিক তাহাই দেখিয়াছে, জলকে জল এবং আকাশকে আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখে নাই। আকাশের দিকে চাহিয়া ঘাড়ে ব্যথা হইয়া গিয়াছে কিন্তু কাহারও নিবিড় এলোকেশের রাশি ত চুলোয় যাক্‌ একগাছা চুলও চোখে পড়ে নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গেলেও কাহারও মুখচন্দ্রমা তাহার নজরে পড়ে নাই। কাজেই তাহাকে সত্য কথাটাই সোজা করিয়া বলিতে হইয়াছে। কোনরূপ রং ফলাইয়া, পালিশ লাগাইয়া খরিদ্দার হাত করিবার বুজরুকি করিতে হয় নাই। বোধ হয় ইংরেজীতে ইহাকেই বলে—'To call a spade a spade.' মোট কথা রাখিয়া ঢাকিয়া বলা অর্থাৎ ঢাকঢাক গুড়গুড় ভাব তাহার মনে কখনো ঠাঁই পায় নাই।

পাগলামি এবং কবিত্ব তাহার কাছ ঘেঁষিতে না পারিলেও প্রেমের হাটে সে বড় করিয়াই চালা বাঁধিয়াছিল এবং দামী জিনিষেই দোকান সাজাইয়াছিল। বিবাহের দিকে তাহার তেমন টান না থাকিলেও নিতান্ত চাপিয়া বসিলে বিবাহের বোঝা ঘাড়ে করিতে সে মোটেই পিছ-পা ছিল না। পুটু ত পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া ঝুলিয়া পড়িবার জন্য একরকম প্রস্তুত হইয়াই ছিল, শেষ পর্যন্ত রাজলক্ষ্মী বাঁকিয়া বসিয়াই সব মাটি করিয়া দিল।

সংসারে শ্রীকান্তের আপনার জন বলিতে বড় কেহ ছিল না, কিন্তু এমন একটাকিছু তাহার মধ্যে ছিল যাহাতে সে পরকে আপন করিয়া লইতে পারিত। কত দেশ-দেশান্তরের মাটিই না সে দুপায়ে মাড়াইয়াছে, বনে গিয়াছে, শ্মশানে ঘুরিয়াছে, মোসাহেবি করিয়াছে, গেরুয়া ধরিয়াছে, রোগীর পাশে বসিয়াছে, মড়া ঘাড়ে করিয়াছে—এমন কি আপিসের বড়বাবু পর্যন্ত হইয়াছে। এই জীবনে দয়ামায়া স্নেহ হিংসাদ্বেষ প্রেম-প্রীতি কলহ-ঈর্ষার জটিল-কুটিল আবর্তের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়াছে এবং কত রকম-বেরকম মানুষের সঙ্গেই না তাহার পরিচয় হইয়াছে! কিন্তু সকলের সঙ্গেই নিজের সম্পর্কটাকে যথাসম্ভব মধুর ও মোলায়েম করিয়া লইতে সে ত্রুটি করে নাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটাকে সে সত্যদৃষ্টি দিয়া যাচাই করিয়াছে এবং তাহার উচিত মূল্য দিতে কখনো কসুর করে নাই। নারীকে বিচার করিতে গিয়া সে কখনো নারীত্বের অবমাননা করিয়া বসে নাই। জীবনের রঙ্গমঞ্চে সে নিজেও অভিনয়ে নামিয়াছে, দর্শকের গ্যালারিতে বসিয়া দূর হইতে হাততালি দেয় নাই।

তাহার জীবনের ভারকেন্দ্রটা নানা দিকে হেলিয়া দুলিয়া শেষে একটা জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সবাই তাহাকে জানিয়া রাখিল পাটনার বিখ্যাত পিয়ারী বাঈজী বলিয়া। তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই উন্মত্ত গ্রহের মত জীবনের পথে সে অবিরত ঘুরিয়াছে, কখনো কক্ষচ্যুত হইয়া পড়ে নাই। কোন্ শৈশবে রাজলক্ষ্মী বৈঁচির মালা গাঁথিয়া সাগ্রহে তাহার গলায় পরাইয়া দিত, তাহার পর পিয়ারী বাঈজীর বিড়ম্বিত জীবনের বন্ধুর পথেও সে নিজেকে হারাইয়া ফেলে নাই, তাহার আসল সত্তা শুধু আত্মগোপন করিয়াছিল। তাই এক দুর্যোগের রাত্রিতে পিয়ারী বাঈজীকে জীর্ণবাসের মত পরিত্যাগ করিয়া তাহার ভিতর হইতে ধ্রুবজ্যোতির দিগ্‌দর্শনী লইয়া বাহির হইয়া আসিল রাজলক্ষ্মী। সেইদিন শিকার-পার্টির আসরে পিয়ারী বাঈজী মরিয়া রাজলক্ষ্মীকে চিরদিনের জন্য বাঁচাইয়া দিল।

শ্রীকান্তের জীবনের গ্রন্থিগুলা এই নারীর জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়া পাক খাইতে খাইতে অম্লান প্রণয়ের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রচনা করিয়াছে; তাহার অনেকগুলি অধ্যায় জুড়িয়া রহিয়াছে তিনটি নারী, নারীত্বের সমস্ত স্থৈর্য্য ধৈর্য্য ও মাধুর্য্য লইয়া—তাহারা অন্নদাদিদি, অভয়া ও কমললতা। জানি, সতী সাবিত্রী বলিয়া তাহাদের পায়ে মাথা ঠেকাইবার জন্য কেহ বসিয়া নাই, কিন্তু যথার্থ প্রেমের যদি কিছুমাত্র মূল্য থাকে তবে ইহাদিগকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হইবে কেবল গায়ের জোরেই শুধু হাতে বিদায় করা চলিবে না।

দুনিয়ার যত হতভাগা ও হতভাগিনীদের লইয়াই শ্রীকান্তের জীবনের যাহা-কিছু সঞ্চয়; ভাল যাহারা তাহারা হয়ত ভালই, কিন্তু মন্দের ভিতরে ভালটুকু দেখিয়া লইবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা তাহার ছিল। সে জানিয়াছিল প্রেমপ্রীতি এমন জিনিষ নয় যে শুধু দর চড়াইয়া তাহার সেরা জিনিষটুকু ধরে তোলা যায়। ও জিনিষ ওজনদরে বিক্রী হয় না, বহর মাপিয়াও কেহ উহা কিনিতে যায় না, এমন কি পেটেন্ট আপিসের ছাপ মারিয়াও উহা বাজারে চালু করা যায় না।

প্রেমপ্রীতি ভালবাসা—এক কথায় মানুষের হৃদয় লইয়া যদি সাহিত্যের কারবারে নামিতে হয় তবে শুধু ক্লাইভ স্ট্রীটের

দিকে চাহিয়া থাকিলে লোকসানের অঙ্কটাই ব্যাঙের মত লাফাইয়া চলিতে থাকিবে এবং লাভের দিকটায় কেবল শূন্যের পর শূন্যের জঞ্জাল জমিয়া উঠিবে। তাই শরৎ চন্দ্রকে উপন্যাসের উপকরণ কুড়াইতে গিয়া নামিয়া আসিতে হইয়াছে পথঘাট, হাটবাজার, গলিঘুঁজির মধ্যে। সমাজের যাহারা 'কেউকেটা' নয়, তাহাদেরই ডাকিয়া আনিতে হইয়াছে, 'কেষ্টবিষ্টু'দের ধার ঘেঁষিয়া যাইতেও তাহার দ্বিধা-সঙ্কোচের অবধি ছিল না। তাই সেকালের 'কমলাকান্ত' তাহার হাতে পড়িয়া হইল একালের 'শ্রীকান্ত।'

আফিং ছিল কমলাকান্তের হাতিয়ার, খোলা চোগা ছুটা শ্রীকান্তের এক্তিয়ার। উভয়েরই চাকুরী হইয়াছিল—একজন রাখিতে পারিল না, আর একজন থাকিতে চাহিল না। একজনের আশ্রয় চারিপায়া, আর একজনের দুই হাত দুই পা। একজন আশ্রম গড়িয়াছে, আর একজন ভাঙিয়াছে। কমলাকান্ত আকাশে উড়িয়াছে, শ্রীকান্ত মাটিতে গড়াইয়াছে। কমলাকান্ত কল্পনার ছায়া, শ্রীকান্ত বাস্তবের কায়া। কমলাকান্ত বুঝাইয়াছে প্রেমের তত্ত্ব, শ্রীকান্ত ঘাঁটিয়াছে প্রেমের তথ্য। কমলাকান্ত প্রসন্নকে দূরে সরাইয়াছে, শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে কাছে টানিয়াছে। কমলাকান্তের লক্ষ্য পরলোক, শ্রীকান্তের ইহলোক। কমলাকান্ত অতীত, শ্রীকান্ত বর্ত্তমান। এক কথায় কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীকান্ত শরৎ চন্দ্র।

আলোচনা

"প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব"

শ্রীস্বাতী রায়

গত বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীপরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত "প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব" প্রবন্ধে ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের মুদ্রা সম্বন্ধে নানাকথা আলোচনা করেছেন।

এক জায়গায় তিনি লিখছেন, "কাশ্মীরের কবিশ্রেষ্ঠ কল্‌হনের রাজতরঙ্গিণী, বিশাখদত্তের দেবীচন্দ্র গুপ্ত এবং একটি প্রাচীন অনুশাসন থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই সম্রাট্ (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) উজ্জয়িনীর শেষ শক সম্রাট্ তৃতীয় রুদ্র-সিংহকে যুদ্ধে পরাজিত করেন ও কৌশলে নিজ হস্তে তাঁর প্রাণনাশ করেন।"

সমগ্র রাজতরঙ্গিণীতে গুপ্তবংশের কোনও নৃপতির উল্লেখ মাত্র নেই। তৃতীয় রুদ্রসিংহ দূরের কথা, সুদীর্ঘ অষ্টম তরঙ্গ ব্যাপী এই গ্রন্থে কোন শক সম্রাটের নাম এমন কি শক কথাটি পর্য্যন্ত অনুল্লিখিত। এ অবস্থায় রাজতরঙ্গিণী কেমন করে যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের হস্তে তৃতীয় রুদ্রসিংহের পরাজয় ও মৃত্যু সপ্রমাণ করতে পারে—তা বোঝা দুষ্কর।

রাজতরঙ্গিণীর কথা ছেড়ে দিলেও অন্য এমন কোনো উপাদান কি বর্ত্তমান আছে যা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও তৃতীয় রুদ্র-সিংহের সংঘর্ষ ও গুপ্তরাজের নিকট শকরাজের পরাজয় ও প্রাণ-নাশের কথা প্রমাণিত করে? দাসগুপ্ত মহাশয় বিশাখদত্তের দেবী-চন্দ্রগুপ্তের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। 'দেবী চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের মাত্র কয়েকটি খণ্ডিত অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেখানে ধ্রুবদেবীর স্বামী চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক জনৈক শকরাজাকে হত্যার কথা লিখিত হয়েছে বটে, কিন্তু সে শকরাজা যে তৃতীয় রুদ্রসিংহ তার কি প্রমাণ আছে? গুপ্তযুগে শকরা শুধু পশ্চিম ভারতেই নয়, সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশাঞ্চলেও বাস করতেন। তা ছাড়া, বিশাখদত্ত কর্ত্তৃক উল্লিখিত ঘটনার মধ্যে কতটা যে সত্য ও কতটা কবিকল্পনা তাও তো জানা যাচ্ছে না। তৃতীয়তঃ যে একটি প্রাচীন অনুশাসনের কথা লেখক বলছেন তা সঞ্জান অথবা ক্যাম্বেতে প্রাপ্ত রাষ্ট্রকূট তাম্রশাসন, কারণ এই দুইটি শাসনেই জনৈক গুপ্তান্বয়ের উল্লেখ আছে যিনি তাঁর ভ্রাতাকে হত্যা করে ভ্রাতার রাজ্য ও পত্নী অধিকার করেন। অসম্ভব নয় যে এই 'গুপ্তান্বয়' দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁর ভ্রাতা দেবীচন্দ্রগুপ্ত উল্লিখিত রামগুপ্ত আর ভাতৃজায়া ধ্রুবদেবী। কিন্তু লেখক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক শকরাজা তৃতীয় রুদ্রসিংহকে পরাস্ত করার ও কৌশলে নিজ হস্তে তাঁর প্রাণনাশ করার কাহিনী কোন্ অনুশাসনে পেলেন তা জানবার জন্য স্বতঃই ঔৎসুক্য বোধ করি।

গুপ্তরাজবংশের পতনের পর তাঁদের মুদ্রার অনুকরণে উত্তর-ভারতে যে সকল মুদ্রা নির্ম্মিত হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দাসগুপ্ত গৌড়ের সম্রাট শশাঙ্কদেবের "শিব, বৃষ এবং চন্দ্রযুক্ত মুদ্রা" এবং "রাজলীলা" যুক্ত মুদ্রার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু "রাজলীলা" যুক্ত মুদ্রা শশাঙ্ক তৈরি করেন নি, করেছিলেন শশাঙ্কের প্রায় সমসাময়িক বাংলাদেশের অন্য একজন নৃপতি, যাঁর নাম সমাচারদেব

গুপ্ত সম্রাটগণের মধ্যে কোন্ জন কয়প্রকারের মুদ্রা নির্ম্মাণ করেছিলেন তার একটি হিসাব লেখক দিয়েছেন। তাঁর হিসাবে দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কোন প্রকার তাম্রমুদ্রা নির্ম্মাণ করেন নি। কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই প্রথম গুপ্ত সম্রাট্ যিনি স্বীয় নামাঙ্কিত তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন। জন এল্যান তাঁর ব্রিটিশ মিউজিয়মের মুদ্রার তালিকায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের তাম্রমুদ্রার কথা উল্লেখ করেছেন। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মেও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের তাম্রমুদ্রা রক্ষিত আছে।

দাসগুপ্ত মহাশয় গুপ্তসম্রাটগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বিভিন্ন রীতিচ্

সুবর্ণ মুদ্রার যে হিসাব দিয়েছেন তাও সম্পূর্ণ নয়। তাঁর হিসাব মত বিভিন্ন রীতির (?) স্বর্ণমুদ্রা ব্যতীত নূতন নূতন আরও বহু রীতির সুবর্ণ মুদ্রার প্রচলন গুপ্তসম্রাটগণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে *Journal of the Numismatic Society*তে বৎসরাধিক কাল হতে অধ্যাপক আলটেকার বায়োনায় প্রাপ্ত গুপ্ত মুদ্রার যে তালিকা প্রকাশ করছেন—তার প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রকাশাদিত্যের মূর্তিযুক্ত মুদ্রা বিশেষ ভাবে অঙ্কিত করে মুদ্রিত করা হয়েছে অথচ সমগ্র প্রবন্ধে প্রকাশাদিত্যের উল্লেখ পর্য্যন্ত নেই কেন, তা হৃদয়ঙ্গম হ'ল না।

জাগ্রত ভারত

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

স্বর্গ হইতে চ্যুত ভূখণ্ড—
হের এ ভারত ভূমি,
হীনতা এবং পরাধীনতার
গ্লানি ভুলে যাও তুমি।
হের জ্ঞানার্ত্তি ধীর নির্ভীক জাতি—
সত্যধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া খ্যাতি,
জীবন যাদের সুদীর্ঘ এক
বসন্ত পঞ্চমী।

আকাশ—দেবের আঁখিতারা ভরা
দেখ উর্দ্ধেতে চাহি,
বায়ু রাজসূয় অশ্বমেধের
যজ্ঞ-গন্ধবাহী।
ভূতল ভূষিত মহতের পদরজে,
শান্তির বারি ছিটাইছে দিক্‌গজে,
সব করুণার পবিত্র নীরে
উঠ তুমি অবগাহি।

জন্ম মুনি ও ঋষির গোত্রে—
অপাপবিদ্ধ, সৎ,
গৌরবময় অতীত তোমার,
উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।
ভক্ত তুমি যে, তুমি কল্যাণকৃৎ,
যুগে যুগে কর ধরাকে অকুৎসিত,
শুভ সুন্দর মঙ্গলময়
তোমার যাত্রাপথ।

সিদ্ধ শুদ্ধ এই মৃত্তিকা
বিবিধ জমাট স্নেহ,
উহার বিকার করিতে পারে না
দস্যু কি দানবেও।
মানুষ হয়েছ সতীর স্তন্য পিয়ে,
দেশ যে তোমার ঘেরা মহাপীঠ দিয়ে
কবর রচিয়া কলুষিত তারে
করিতে পারে না কেহ

হাজার বছর ব্যাপী দুর্গতি,—
দারুণ বিড়ম্বন,
মহাকাল দেহে মসীর বিন্দু
রহিবে কতক্ষণ ?
গত-গর্ব্বের গলিত মেধের স্তূপ
ভাসে, গঙ্গার বদলাতে নারে রূপ,
বুকে আঁকা যার মহালক্ষ্মীর
শুভ্র আলিম্পন।

পুণ্য প্রাচীন এই ভারতের
প্রোজ্জ্বল ইতিহাস,
মানব জাতিরে ছোট-করা নয়,
বড়-করা তার আশ।
রাজরাজাদের খেয়াল খাতা সে নয়।
দেয় না দম্ভী দুষ্টের পরিচয়,
মানব-মনের ক্রমোন্নতিই
হয় তাহে পরকাশ।

সে জানায় প্রতি অণুকণিকায়
হরির অধিষ্ঠান,
জ্যোতির্ম্ময়ের আলোক-প্রপাতে
করে এ ভুবন স্নান।
সব প্রাণময়, পরমাত্মার দেশ,
মৃত্যুতে হেথা কিছুই হয় না শেষ,
সকল প্রাণীই করিতেছে এক
অমৃতের সন্ধান।

ভুলিয়া যেয়ো না নর-নারায়ণ
অধ্যুষিত এ ধাম,
শ্যাম ও শ্যামার আদরে শ্যামল
তরুলতা অভিরাম।
তোমার ফুলের গন্ধ তাঁহার প্রিয়,
তব ফল জল জেনো তাঁর গ্রহণীয়,
মধুর এ দেশ সব চেয়ে মধু
তব মুখে তাঁর নাম।

বামাহিতৈষিণী সভা ও ভারতাশ্রম

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

"স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনে কেশবচন্দ্র সেন" প্রবন্ধে প্রসঙ্গত: "বামাহিতৈষিণী সভা" ও "ভারতাশ্রমে"র কথা উল্লেখ করিয়াছি। কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত সমাজ-কল্যাণপ্রচেষ্টাসমূহ সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করিতে হইলে এই দুইটি সম্পর্কেও আমাদের কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ কারণ ইহাদের কথাও এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অনুপ্রাণনায় ১৮৬৫ সনে কলিকাতায় ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় সমসময়ে ভাগলপুরে ও বরিশালে অনুরূপ সভা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ সভা ছিল নিছক ধর্মসম্পর্কিত। নারীজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনোদ্দেশ্যে ধর্মের ভিত্তিতে বামা-হিতৈষিণী সভা নামক সর্বপ্রথম মহিলা সমাজ বা সমিতি ১৮৭১ সনের ২৮শে এপ্রিল কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহায়তায় শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের বয়স্থা ছাত্রীগণ স্থাপন করেন। পরবর্তী-কালে বহু ছাত্র-ছাত্রী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক হিসাবে ইহাকে তাহারও আদি বলা যাইতে পারে।

ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ইহার প্রায় এক বৎসর পরে ১৮৭২ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। একদল দেশহিতব্রতী ত্যাগী কর্মী গঠনে এই আশ্রম কতখানি সহায় হইয়াছিল তাহা এতৎসম্পর্কিত আলোচনা হইতে জানা যাইবে। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় তথা বামাহিতৈষিণী সভাও পরে এই আশ্রমের অঙ্গীভূত হইয়া যায়।

১। বামাহিতৈষিণী সভা

বামাহিতৈষিণী সভা নারীজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে ১৮৭১ সনের ২৮শে এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়াছি। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' এই সভার উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা এবং ইহার প্রথম দুইটি অধিবেশনের বিষয় বৈশাখ ১২৭৮ (মে ১৮৭২) সংখ্যায় এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন :

"গত আশ্বিন মাসের বামাবোধিনীতে একটি স্ত্রীসমাজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করা যায়, তদনুসারে কলিকাতায় কয়েক-বার স্ত্রীলোকদিগের একটি সভা হয় এবং কুমারী পিগট তাহার অধ্যক্ষতা করেন। আমরা পাঠকগণের অবগত করিয়াছি, এই সভা পরে ভারত সংস্কার সভার অধীনে বিদ্যালয় আকারে পরিণত হয় এবং তাহা হইতে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রস্তুত হইয়াছে।...একণে যারপর নাই মহোল্লাসের বিষয় বলিতে হইবে, সেই শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় হইতে আবার নারী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের কার্য্য যেমন চলিতেছে চলিবে, অথচ স্বতন্ত্র একটি সভাদ্বারা স্ত্রীজাতির সর্ব্ববিধায় উন্নতিসাধনের উপায় অবলম্বিত হইবে ইহা অপেক্ষা সুসংবাদ আর কি আছে ?

"ভারত সংস্কারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে এবং শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের উৎসাহে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার নাম বামাহিতৈষিণী সভা। বামাগণের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা ইহার উদ্দেশ্য। ইহার অধিবেশন পক্ষান্তে শুক্রবার অর্থাৎ মাসে দুই বার হইবে। সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মাক্রান্ত মহিলাগণ এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন, শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পুরুষ শিক্ষকগণও সভ্য শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। সভাস্থলে স্ত্রীজাতির হিতজনক রচনা পাঠ বক্তৃতা ও কথোপকথন হইবে। এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রায় ৩০ জন ভদ্র হিন্দু মহিলা উপস্থিত হন এবং মহামান্য জজ ফিয়ার সাহেবের স্ত্রী বিবি ফিয়ার দর্শক হইয়া আইসেন। সভাপতি বাবু কেশবচন্দ্র সেন সভাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। প্রথমত: বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। এবং তাহাতে তাহাদের শরীর মন ও আত্মা এই তিন বিষয়ক উন্নতি অর্থাৎ সুস্থতা, বিদ্যা ও ধর্ম্ম সাধন না হইলে পূর্ণ উন্নতিসাধন হইবে না সুন্দর রূপে প্রদর্শন করেন। পরে তাঁহার চারিটি ছাত্রী সেই বিষয়ে রচনা পাঠ করিলেন। কেশববাবু বিবি ফিয়ারকে এই সকল বিষয় ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিলে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সভ্য শ্রেণী মধ্যে তাঁহার নাম সংযুক্ত করিতে বলিলেন। কুমারী পিগট, ব্যারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ, বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু দুর্গামোহন দাসের পত্নীগণ ও উপস্থিত অন্যান্য মহিলাগণ সভার সভ্য হইলেন।"

বামাহিতৈষিণী সভার সভাপতি হইলেন কেশবচন্দ্র সেন এবং সম্পাদক শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী রাধারাণী লাহিড়ী। প্রথম বৎসরে প্রতিপক্ষান্তে অন্যূন ষোলটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। একটি অধিবেশনে নারীর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হয়। রাজলক্ষ্মী সেন এবং সৌদামিনী খাস্তগিরি এই বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং এই দুইটিই ১২৭৮, ভাদ্র সংখ্যা 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাঙালী মহিলার কিরূপ পরিচ্ছদ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রের সিংহগড় হইতে জনৈকা বঙ্গনারীর একখানি পত্র পরবর্তী কার্ত্তিক সংখ্যা বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইল। ইনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।

রাণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড়গাছিস্থ উদ্যানে ১৮৭২ সনের ২৬শে এপ্রিল এই সভার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব হয়। স্থায়ী সভাপতি

কেশবচন্দ্র সেনের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হয়। সম্পাদক রাধারাণী লাহিড়ী বৎসরের কার্য্যাবলীর একটি বিবরণ পাঠ করেন। সূচনাতেই তিনি বলেন,—

"অদ্য কি শুভদিন! অদ্য আমাদের বামাহিতৈষিণী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন! ১২৭৮ সালের ১৭ই* বৈশাখ শুক্রবার এই সভা সংস্থাপিত হয়। স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির নিমিত্ত ভক্তিভাজন বামাহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন এবং স্ত্রীনর্ম্যাল ও বয়স্থা বিদ্যালয়ের অন্যতর শিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়দ্বয় ইহা স্থাপন করেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছা ছিল যে এই সভার তাবৎ কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা সমস্ত ভার গ্রহণে অসমর্থ হওয়াতে ইহাতে তাঁহাদিগকে কোন কোন অংশে সাহায্য করিতে হইয়াছিল। এই সভার স্থাপন অবধি এই পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত কেশব বাবু ইহার সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিতেছেন। নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্রীগণ লইয়াই প্রথমতঃ সভা সংগঠিত হয়, তাঁহারাই ইহার সভ্য শ্রেণীরূপে পরিগণিত হয়েন। ১৩।১৪ জন হইতে ক্রমে ক্রমে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে ২৪।২৫ জনে পরিণত হইয়াছে।"

সভার পাক্ষিক অধিবেশনগুলিতে যে যে বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল তাহা এই,—১ প্রকৃত শিক্ষা, ২ প্রকৃত স্বাধীনতা, ৩ স্ত্রীলোকদিগের নিরুদ্যম ও উৎসাহহীনতা, ৪ লজ্জা, ৫ বিনয়, ৬ অভ্যর্থনা, ৭ সভ্যতা, ৮ পরিচ্ছদ, ৯ নম্রতা, ১০ অহঙ্কার, ১১ ক্রোধ, ১২ গৃহকার্য্য, ১৩ পরস্পরের প্রতি ব্যবহার, ১৪ হিংসা, ১৫ ভগ্নীভাব, ১৬ দয়া। বলা বাহুল্য, কেশবচন্দ্রের সভাপতিত্বে ছাত্রীগণ আলোচনায় যোগদান করিতেন এবং এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের প্রবন্ধাবলীও পঠিত হইত। সভার নিয়মিত সভ্য ছিলেন রাজলক্ষ্মী সেন, সৌদামিনী খাস্তগিরি, সৌদামিনী মজুমদার, যোগমায়া গোস্বামী, সারদাসুন্দরী ঘোষ, বিধুমুখী মুখোপাধ্যায়, সরলাসুন্দরী দাস, সুশীলাসুন্দরী দাস, জগত্তারিণী বসু, ভবতারিণী বসু, কৃষ্ণবিনোদিনী বসু, জগন্মোহিনী রায়, কৈলাসকামিনী দত্ত, অন্নদামিনী সরকার, কৃষ্ণকামিনী দেব এবং মহামায়া বসু। ইহা ভিন্ন সময়ে সময়ে ইংরেজ ও বাঙালী মহিলারাও সভায় যোগদান করিতেন।

প্রথম সাম্বৎসরিক সভায় রাধারাণী লাহিড়ী, সৌদামিনী মজুমদার প্রমুখ মহিলা ছাত্রীরা নারীজাতির উন্নতিমূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি কেশবচন্দ্র স্ত্রীজাতির শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করিলেন। ইহা হইতে স্ত্রীশিক্ষার ধারা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত—যাহা পরে ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে সম্যক্ পরিস্ফুট হয়, সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা করিয়া লওয়া যায়। তিনি বলেন,—

"স্ত্রী ও পুরুষ বিভিন্ন প্রকৃতি। উভয়ের স্বভাব ভিন্ন এবং অধিকারও ভিন্ন। দুই জনেরই উন্নতির পথে চলিবার অধিকার এবং উভয়েরই তদুপযোগী স্বভাব আছে। কিন্তু এ অধিকার ভিন্ন; যদিও পরিমাণে সমান। অধিকার প্রকৃতি ও স্বভাব অনুসারে। সাহস ও বলসাপেক্ষ কার্য্য পুরুষজাতির অধিকার; দয়া মমতার কার্য্য স্ত্রী জাতির কোমল প্রকৃতির উপযোগী। যখন স্ত্রী পুরুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, তখন তাঁহাদের উন্নতিসাধনের চেষ্টাও এ দেশে বিভিন্ন হওয়া উচিত। স্ত্রী জাতির উন্নতিসাধন তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ বিদ্যাশিক্ষা; ২ গৃহের সুনিয়ম সংস্থাপন; ৩ জনসমাজে স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার।

"দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয়, ভারতবর্ষের কোন স্থানে স্ত্রীশিক্ষার বিশুদ্ধ প্রণালী সংস্থাপিত হয় নাই। কেবল ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল প্রভৃতির আলোচনাতে স্ত্রীজাতির উন্নতি হয় এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। স্ত্রীজাতিকে স্ত্রীজাতীয় সদ্‌গুণে উন্নত করিতে হইবে, পুরুষজাতীয় গুণে তাহাদিগকে উন্নত করিলে উন্নতি না হইয়া অবনতিই করা হইবে। স্ত্রী জাতির যথার্থ উন্নতি করিতে হইলে হৃদয়ে স্বাভাবিক কোমলতা ও মধুরতা রক্ষা করিতে হইবে। কাঁঠালকে আম্র বা আমড়াকে নিম করিলে তাহাকে উন্নতি বলা যায় না। প্রকৃতি বিনাশ উন্নতি নহে। প্রকৃতি রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দেখা উচিত যে প্রকৃতিসঙ্গত শিক্ষা হইতেছে কি না? গৃহকার্য্য সম্পাদন, পিতামাতার সেবা, সন্তানপালন, পুরুষগণসহ সমুচিত ব্যবহার এ সকল বিশেষরূপে শিক্ষা করা উচিত ইতিহাস অঙ্ক ন্যায় প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিত হওয়া যায়, দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে সম্ভ্রান্ত লোকের বাটিতে বিদায় লাভ করা যায়, এক একজন স্ত্রী জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় বিখ্যাত হইতে পারেন; কিন্তু ইহা স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। বিশুদ্ধ স্ত্রী, বিশুদ্ধ মাতা, বিশুদ্ধ কন্যা, বিশুদ্ধ ভগ্নী হওয়া স্ত্রীজাতির জ্ঞানলাভের এই লক্ষ্য। স্বামী, কন্যা, মাতা ও ভ্রাতার প্রতি কর্ত্তব্য না জানা নারীদিগের পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয় মূর্খতা। কেবল ইতিহাস, ভূগোল পড়িলে তোমরা কৃতবিদ্য বলিয়া প্রশংসিত হইতে পারিবে না। ব্যাকরণে সন্ধি শিখিয়াছ বটে, কিন্তু আপনার পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে এখনও সন্ধি স্থাপন করিতে পারিলে না। যেখানে গৃহকার্য্যের সুশৃঙ্খলা নাই, বস্ত্র মলিন, শয্যা মলিন, শরীর অপরিষ্কৃত, বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব, যেখানে পিতামাতা পুত্র কন্যা ইহাদিগের মধ্যে অসদ্ভাব, স্বামী স্ত্রীতে অপ্রণয় ও অসম্মিলন, সেখানে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা নাই। যাহাতে পরস্পরের প্রতি বিশেষ অনুরাগ জন্মে, সংসার ধর্ম্ম পালনে তাচ্ছিল্য ভাব দূর হইয়া তৎপ্রতি অনুরাগ হয় এরূপ জ্ঞান শিক্ষা অত্যাবশ্যক।"*

বামাহিতৈষিণী সভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশনের

* ইহা ভুল। ১৬ই বৈশাখ হইবে।

* বামাবোধিনী পত্রিকা—বৈশাখ ১২৭৯ (মে ১৮৭২)

একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণও পাওয়া যাইতেছে। ১৮৭৩ সনের ২১শে জুন বেলঘরিয়ায় এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এবারেও কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদিকা রাধারাণী লাহিড়ী বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করিলেন। ইহা হইতে জানা যায়:

"প্রতি পক্ষে শুক্রবার বেলা চারি ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় নানা কারণ বশতঃ প্রথম বৎসরের ন্যায় দ্বিতীয় বর্ষে ইহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় নাই। গত বৎসরে ক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ কয়েকটি পঠিত হয় ও তদ্বিষয় লইয়া সভাপতি মহাশয় সভ্যগণের সহিত আলোচনা করেন। আলোচনার পর সভাপতি মহাশয় মীমাংসা স্থির করিলে সভা ভঙ্গ হয়।"

বিভিন্ন অধিবেশনে যে কয়টি বিষয় আলোচিত হয় তাহা যথাক্রমে—(১) পুরাকালের হিন্দু ও বর্তমানকালের সুসভ্য ইংরেজ রমণীদিগের কি কি গুণ অনুকরণীয়, (২) সন্তান পালন, (৩) দয়া, (৪) আদর্শ রমণী, (৫) বঙ্গীয় রমণীদিগের বর্তমান অবস্থা এবং তাঁহাদিগের প্রতি ইংলণ্ডীয় নারীগণের কর্তব্য, (৬) নারীগণের ধর্ম্মহীন শিক্ষা অনুচিত কিনা, কি প্রকার শিক্ষা দিলে নারীগণের সমগ্র উন্নতি হইতে পারে, (৭) নারীজীবনের উদ্দেশ্য। যে সব সভ্য সভায় নিয়মিত উপস্থিত হন তাঁহাদেরও নাম এইরূপ পাইতেছি, যথা—রাজলক্ষ্মী সেন, অন্নদায়িনী সরকার, মহামায়া বসু, মহালক্ষ্মী ঘোষ, মতিমালা দেবী, মালতীমালা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলাসুন্দরী দাস, বরদাসুন্দরী চট্টোপাধ্যায়, নিস্তারিণী রায়, কৃষ্ণবিনোদিনী বসু, কুমারী সিংহ, কৈলাসকামিনী দত্ত, রাধারাণী লাহিড়ী। পূর্ব্ব বৎসরের মত এবারকার অধিবেশনগুলিতেও সময়ে সময়ে ইংরেজ ও বাঙালী মহিলারা উপস্থিত হইতেন।

আলোচ্য বার্ষিক অধিবেশনে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ এবং কলিকাতার ভদ্রপরিবারস্থ বহু মহিলা উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন নূতন সভ্য মনোনয়নের পর 'বিজ্ঞান পাঠের আনন্দ ও উপকারিতা' এবং 'শিক্ষিতা রমণীগণের কর্তব্য' বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা পঠিত হয়। গৌরগোবিন্দ রায় (উপাধ্যায়), উমানাথ গুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিগণ সময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহার পর সভাপতি মহাশয় একটি সুদীর্ঘ, সরল ও মনোহর বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত সকলকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

বামাহিতৈষিণী সভার আর কোন বিবরণ এতাবৎ পাওয়া যায় নাই। কিছুকাল চলিবার পর এই সভাটির কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ "প্রচারকগণের সভায় নির্দ্ধারণ" নামক পুস্তকে (পৃ. ৬৪) ২৯ মাঘ ১৮০০ সালের সভায় এই নির্দ্ধারণটি পরিদৃষ্ট হয়,—'ব্রাহ্মিকা সমাজ এবং বামাহিতৈষিণী সভা পুনরুদ্দীপনের কথা হইল।' ইহার পর সভা যে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাইতেছি। 'পরিচারিকা' আশ্বিন ১২৮৬ (১৮৭৯) সংখ্যায় "লণ্ডন" শীর্ষক একটি বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পাদটীকায় আছে, "বামাহিতৈষিণী সভার সভাপতি কর্ত্তৃক বিবৃত।" এই সময় 'আর্য্যনারী সমাজ' (মে, ১৮৭৯) ও 'বঙ্গমহিলা সমাজ' (আগষ্ট, ১৮৭৯) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজের, বিশেষ করিয়া স্ত্রীজাতির উন্নতিমূলক কার্য্যে ইঁহারা ক্রমে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু এ বিষয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে বামাহিতৈষিণী সভাই প্রথম বলা চলে। ভারত সংস্কার সভার (Indian Reform Association) অধীনস্থ স্ত্রীজাতির উন্নতি বিভাগের সম্পাদকরূপে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত এবং বামাহিতৈষিণী সভার সম্পাদক শিক্ষয়িত্রী ও বয়স্থা বিদ্যালয়ের ছাত্রী রাধারাণী লাহিড়ীর কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া কেশবচন্দ্রের ইংরেজী জীবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"The steadiness and perseverance with which this gentleman (Umesh Chandra Datta, Principal, City College, Calcutta), a veteran in the cause of female education, has laboured in this department of the work of the Brahmo Somaj, deserves the highest praise. Miss Radharani Lahiri (Teacher, Bethune School, Calcutta) was the Secretary of the *Bama Hitaishini Sava* as long as the Society was alive. Her example and acquirements, the devoted self-sacrifice with which she has given the best years of her life to the improvement of her sex, have won the admiration of the whole Brahmo Community. This gentleman and lady were of great service to Keshub's cause at this time."*

২। ভারতাশ্রম

গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকেই কেশবচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এক দল যুবক গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। ক্রমে তাঁহারা নিজ নিজ পরিবার-পরিজনকেও লইয়া আসিতে বাধ্য হন। তাঁহাদের আশ্রয় বা আবাসস্থলের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে লাগিল। প্রথমে অনেকে একক ভাবে পরস্পরকে সাহায্য করিতেন। কিন্তু ক্রমশঃ পরিবার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে তাঁহারা কেহ কেহ একত্রে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। কেশবচন্দ্র এই সকল ব্রাহ্মকে একটি আদর্শ সুখী পরিবারে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৭২ সনের প্রারম্ভে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইলেন। এই বৎসর ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বেলঘরিয়ায় জয়গোপাল সেনের উদ্যানবাটিতে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল।† কেশবচন্দ্র ইহার নাম দিলেন ভারতাশ্রম। আষাঢ় ১২৭৯ সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র

The Life and Teachings of Keshub Chandra Sen By P. C. Mozoomdar, third edition, p. 156.

† আচার্য্য কেশবচন্দ্র ২য় খণ্ড—উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, পৃ. ৯২৭।

ভারতাশ্রম সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ বাহির হয়। ভারতাশ্রমের উদ্দেশ্য তাহাতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"যখন পুরাতন হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সংস্কার এদেশে প্রবল ছিল, তখন নর-নারীর একই ভাব ও রীতি ছিল। সুতরাং তাহারা এক প্রকার সদ্ভাবে ও কুশলে থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু এক্ষণে ইংরাজি শিক্ষা প্রভাবে হিন্দু সমাজের পত্তন ভূমি বিকম্পিত হইয়াছে এবং রীতি পদ্ধতি আচার ব্যবহার, এমন কি মনের সংস্কার ও রুচি পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইয়াছে। এ অবস্থায় ভগ্ন হিন্দু সমাজকে পবিত্র ধর্ম্ম ও উন্নত জ্ঞান অনুসারে পুনরায় গঠন করা আবশ্যক।

"এই উদ্দেশ্যেই ভারতাশ্রম খোলা হইয়াছে। কয়েকটি পরিবার নিয়মিত উপাসনা, বিদ্যাশিক্ষা ও স্বাস্থ্য সাধন দ্বারা বালক যুবা বৃদ্ধ সকলকে উন্নত করা সংস্থাপকদিগের লক্ষ্য। তাঁহাদের এই অভিপ্রায়, যে কিরূপে স্বীয় মন ও আত্মাকে রক্ষা করিতে হয়; পরস্পরকে ভাই ভগিনী বলিয়া ভালবাসিতে হয়; কিরূপে পিতামাতার সেবা ও সন্তান পালন করিতে হয়; ও কিরূপে ধর্ম্মের অনুগত হইয়া সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য সমাধা করিতে হয়, তাহা সকলে শিক্ষা করেন।"

ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠা তখন যুবক-মনে কিরূপ উন্মাদনার উদ্রেক করিয়াছিল, কেশবের অনুরক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর নিম্নলিখিত কবিতাংশটি তাহার প্রমাণ,—

"ভারতাশ্রম বাসিদিগের প্রতি।

কোথাকার যাত্রি তোরা ভাই রে।
বাঁধ ভেঙ্গে আসে ঢেউ, এবার বাঁচবে না কেউ
প্রেম সাগরে লেগেছে তুফান।
ঘন ঘন ঢেউ উঠে, ব্রহ্মাণ্ড বা যায় ফুটে
উত্তরেতে ডাকিতেছে বাণ।
ওই ডেকে আসে বাণ, সামাল আমার প্রাণ
ঢেউ খা রে নির্ভয় অন্তরে;
ও ঢেউ লাগিলে গায়, মহাপাপী স্বর্গে যায়,
দুঃখীদের দুঃখ শোক হরে।
ব্রহ্মনাম হৃদে ধরে, ব্রহ্মেতে নির্ভর করে,
ক্ষণ কাল এই কিনারায়
সাবধানে বসে থাক্, আগে বান ডেকে যাক্
পরে পাড়ি দিবি পুনরায়।
ওই দেখ সারি গেয়ে, আনন্দে আসিছে ধেয়ে
ছোট বড় কতগুলি তরি;
বোধ হয় যাবে পারে, দেখ যেন ভুল না রে
কাছে এলে যাস্ সঙ্গ ধরি।

কোথাকার যাত্রি তোরা ভাই রে।
সারি গেয়ে উচ্চ স্বরে, মহা কোলাহল করে,
কোথা যাস্ একা আমি যেতে যে ডরাই রে!
বসে শুধু ভাবিতেছি তাই রে।..."*

আশ্রমের বসবাস ও প্রাত্যহিক কার্য্য উক্ত নিবন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"আশ্রম মধ্যে ভিন্ন লোক ও ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের জন্য স্বতন্ত্র ঘর আছে। আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ঘরে তাঁহারা বাস করেন। উপাসনা বিদ্যাশিক্ষা ও আহার সাধারণ স্থানে নির্ব্বাহিত হয়। বায়ু সেবনের জন্যও নির্দ্দিষ্ট ছাদ আছে। ধর্ম্ম জ্ঞান সংসার সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা :—

৬টা	হইতে	৭	পর্য্যন্ত	পাঠ
৭টা	...	৮	...	স্নান
৮টা	...	৯॥০	...	উপাসনা
৯॥০	...	১০	...	গৃহকার্য্য
১০টা	...	১০॥০	...	স্ত্রীলোকদিগের আহার
১০॥০	...	১১	...	পুরুষদিগের আহার
১১	...	১২	...	গৃহকার্য্য
১২	...	৫	...	বিদ্যালয়
৫	...	৬	..	গৃহকার্য্য
৬	...	৭	...	বায়ু সেবন
৭	...	৮	...	পাঠ
৮	...	৯	...	উপাসনা
৯	...	৯॥০	...	স্ত্রীলোকদিগের আহার
৯॥০	...	১০	...	পুরুষদিগের আহার
১০	...	১১	...	পাঠ
১১	...	৫	...	নিদ্রা

ভারতাশ্রমের সঙ্গে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ও বামাহিতৈষিণী সভা যুক্ত হইল। একটি পুস্তকালয়ও স্থাপিত হইল। প্রতিষ্ঠাবধি প্রথম দুই মাস বেলঘরিয়ায় থাকিয়া এপ্রিল মাসে আশ্রমটি রাণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড়গাছিস্থ উদ্যানবাটিতে স্থানান্তরিত হয় এবং এখানে এক মাস অবস্থান করে। তৎপর ইহা কলিকাতায় ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসে। আশ্রম পরিচালনা অর্থসাপেক্ষ। এ বিষয়ে উক্ত নিবন্ধে আছে,—

"আহার বিভাগের তত্ত্বাবধানের জন্য এক জন অধ্যক্ষ আছেন, তাঁহার এক জন বৈতনিক সহকারী আছেন। অধ্যক্ষ মহাশয় আহারের সমস্ত ব্যবস্থা করেন এবং যাহার যাহা প্রয়োজন তাহার বিধান করেন। সাধারণের জন্য অন্ন এবং

* ধর্ম্মতত্ত্ব—১ ফাল্গুন ১৭৯৩ শক। শিবনাথ শাস্ত্রী 'আত্মচরিতে' লিখিয়াছেন,—

"আমি কেশব বাবুর আশ্রমোৎসাহের মধ্যে প্রাণমন ঢালিয়া দিলাম। সে সময়ে আশ্রমের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখি, তাহা বোধ হয় ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।" ২য় সং, পৃষ্ঠা ১৮৩।

রুটির বরাদ্দ আছে। রোগ বা অস্বাস্থ্য হেতু বিশেষ পথ্যের প্রয়োজন হইলে চিকিৎসকের বিধানানুসারে তাহা দেওয়া হয়।"

আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রত্যেককে মাসে মাসে এইরূপ টাকা দেওয়ার বিষয় ধার্য্য হয়—পূর্ণবয়স্ক ৬৲ টাকা, ১০ বৎসরের ন্যূন বালকবালিকা ৩৸০ আনা, দুগ্ধপোষ্য ১৷৷০ আনা, ভৃত্য ৪৷০ আনা। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধ, জলখাবার ইত্যাদির ব্যয় এবং ঘর-ভাড়া প্রত্যেকের স্বতন্ত্র দিতে হইত। এক জন অধ্যক্ষের হস্তে 'উপাসনার ও ধর্ম্মশাসনের' ভার অর্পিত ছিল।

সে যুগের নব্যবাংলার সামাজিক জীবন সংগঠনে ভারতাশ্রমের কৃতিত্ব অনন্যতুল্য। ভারত-সংস্কার সভার বিবিধ বিভাগের কার্য্য সম্পাদনের জন্য এক দল নির্ভীক সাংসারিক চিন্তা-বিমুক্ত ত্যাগী কর্ম্মীর প্রয়োজন ছিল। ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠাবধি এরূপ কর্ম্মীদলের অভাব বিদূরিত হইল, তাঁহারা বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনা করিতে সক্ষম হইলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত (২য় সং পৃ. ১৮১-৯৭) পাঠে ভারতাশ্রম সম্পর্কে অনেক কথা আমরা জানিতে পারি। আশ্রমবাসীদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান ছিল এবং কোন কোন বিষয়ে দ্বন্দ্ব, কলহ ভীষণাকার ধারণ করে। সংবাদপত্রেও নানারূপ সমালোচনা হইতে থাকে। কেশবচন্দ্র একবার একখানি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে বিচারাদালতের শরণ লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভারতাশ্রমের সার্থকতা স্বতঃই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। ভারতাশ্রমের শিক্ষয়িত্রী ও বয়স্থা বিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্রী সুদক্ষিণা গঙ্গোপাধ্যায় (পরে, সেন) ১৮৭৩ সনের ৮ই নবেম্বর এখানে আসিয়া যোগদান করেন। তখন আশ্রম ও বিদ্যালয় কলিকাতা ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। আশ্রমের লোকসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার অল্পকাল পরেই বর্ত্তমান ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশনের বিপরীত দিকে আপার সারকুলার রোডের পূর্ব্ব পারে ব্রজনাথ ধরের বাগান ও পুকুরসহ একটি বৃহৎ বাটিতে স্থানান্তরিত হয়। সুদক্ষিণা স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে ভারতাশ্রমের আভ্যন্তরিক ব্যাপারাদি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"প্রচারক উমানাথ গুপ্ত মহাশয় ভারতাশ্রমের আহারের ভার লইয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি ছিলেন ম্যানেজার। প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া বাজার করিতে যাইতেন। প্রতিদিনই ঝুড়ী ঝুড়ী মাছ তরকারী ও কলাপাতা ক্রয় করিয়া আনিতেন—প্রতিদিনই ভোজ। এতগুলি লোকের দুই বেলা আহারের আয়োজন করা সহজ ব্যাপার ছিল না। রান্না বাড়ীটি একটু দূরে পৃথক ছিল। সেটিও নিতান্ত ছোট নহে। দুই বেলাই আহারের জন্য ঘণ্টা পড়িত। ঘণ্টা শ্রবণ মাত্র আমরা নিজ নিজ গ্লাসে করিয়া এক গ্লাস জল লইয়া রান্নাবাটী অভিমুখে ছুটিতাম। দুই তিন জন ব্রাহ্মণ রন্ধন করিত, ও দুই তিন জনে পরিবেশন করিত। কলাপাতা ও আসন বিছান থাকিত।...

"আশ্রমের কথাই বলি। আমাদের ভারতাশ্রমের নিয়ম ছিল প্রত্যেক মেয়ে একদিন করিয়া একটি তরকারী রন্ধন করিবেন। আমি এক দিবস একটি ব্যঞ্জন রন্ধন করিব বলিয়া ভাণ্ডার হইতে আলু, নারিকেল, কিছু ছোলা ও তদুপযোগী তেল, ঘি, মসলা ইত্যাদি জোগাড় করিয়া লইলাম।...

"আমরা কখন কখন পুষ্করিণীতে সাঁতার দিতাম। ভারতাশ্রমের অনেক মেয়েরাই সাঁতার জানিতেন না। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে; বাল্যকালেই সাঁতার দিতে শিখিয়াছিলাম। কার্য্যতঃ আমিই সর্ব্বাপেক্ষা সন্তরণপটু ছিলাম। এক দিন আশ্রমের পুষ্করিণীটি আমি সাত বার সাঁতার দিয়া পার হইয়াছিলাম। সেই সব আনন্দের দিন আর ফিরিয়া আসিবে না! স্মৃতির পটেই তাহাদের অনুলিপি সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

"আমাদের ভারতাশ্রমের ডাক্তার ছিলেন দুকড়ি ঘোষ মহাশয়। তিনি প্রত্যহ সকলের ঘরে যাইয়া কে কেমন আছে সংবাদ লইতেন। কাহাকেও অসুস্থ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। তাঁহার সুচিকিৎসায় আমাদের অসুখ পড়িলেও কখনও চিন্তিত হইতে হয় নাই।

"সর্ব্বাপেক্ষা প্রচারক কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় সকলকে স্নেহ করিতেন, তজ্জন্য সকলে তাঁহাকে 'মা' আখ্যা দিয়াছিলেন। কি ছেলে কি মেয়ে সকলকেই ইনি মায়ের মতন ভালবাসিতেন। প্রচারক মহাশয়ের বধূরাও ইঁহাকে শ্বশ্রূমাতার স্থানে পাইয়াছিলেন।"*

কেশবচন্দ্রের আদর্শ ছিল অতি উচ্চ। সেই আদর্শে পৌঁছিতে না পারিলে তিনি কিছুতেই মনে সোয়াস্তি পাইতেন না। এইজন্য যখন শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল তাহার মধ্যেও তিনি একবার ছাত্রীদের শিক্ষা সম্বন্ধে স্বীয় অসন্তোষ ব্যক্ত করিতে ক্ষান্ত হন নাই। ১৮৭৪ সনে তিনি ভারতাশ্রম হইতে ঐ একই কারণে বেলঘরিয়ায় স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন।† ভারতাশ্রম ইহার পরও চারি বৎসরাধিককাল স্থায়ী ছিল। পরিশেষে কেশবচন্দ্রের সহকর্ম্মী প্রচারকদের জন্য ১৮৭৯ সনের ২১শে জানুয়ারী আপার সারকুলার রোডে স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মিত হইলে আশ্রমটি উঠিয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে বঙ্গদেশে যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নিষ্ঠাবান, স্বধর্ম্মপরায়ণ, আদর্শ মানুষ ও পরিবার সমূহের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার মূল পাই এই আশ্রমটির মধ্যে।

---

* জীবন স্মৃতি—সুদক্ষিণা সেন, পৃ. ৯০-১, ৯৩।

† কেশবচন্দ্রের "সুখী পরিবার" পুস্তিকা দ্রষ্টব্য। (আচার্য্য কেশবচন্দ্র, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৯৭)

মৎস্যেন্দ্রনাথের জন্মরহস্য

শ্রীরাজমোহন নাথ

নাথ-সিদ্ধা মৎস্যেন্দ্রনাথের জন্ম ও জীবন-কাহিনী নানারূপ রহস্যজালের মধ্যে বিজড়িত। স্কন্দপুরাণ নাগরকাণ্ড (২৬৩ অধ্যায়), হাড়মালা, গোরক্ষবিজয়, কৌলজ্ঞান নির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থে একই কথার সামান্য অদল-বদল করিয়া পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে, এবং এই কাহিনীগুলিই নাথ-সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণাকারী পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রধান উপজীব্য।

গণ্ডযোগে ভৃগুবংশীয় এক ব্রাহ্মণের একটি পুত্র জাত হয়। জ্যোতিষের বিচারে এই অপবিত্র যোগে জাত বালক বংশের সর্ব্বনাশসাধক এবং মাতৃহন্তা ("গণ্ডযোগে জনমিলে সে হয় মা-খেকো ছেলে"—রামপ্রসাদী সঙ্গীত) বলিয়া নবজাত শিশুটিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র-মধ্যস্থ এক বৃহদাকার রাঘব-মৎস্য শিশুটিকে উদরসাৎ করিয়া ফেলে, মৎস্যের উদরে থাকিয়া শিশুটি ক্রমশ: বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

মহাদেবের নিকট হইতে জন্মমৃত্যুর পাশ-ছিন্নকারী যোগ-শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বমূলক "মহাজ্ঞান" জানিবার জন্য পার্ব্বতীর সাধ হইল। হরপার্ব্বতী ক্ষীরোদসাগর মধ্যস্থ চন্দ্রদ্বীপের নিভৃত টঙ্গী-ঘরে বসিয়া মহাজ্ঞান আলোচনা আরম্ভ করিলেন। পার্ব্বতী তন্ময় হইয়া শিবের কোলে নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িলেন। শিব পার্ব্বতীর অবস্থা লক্ষ্য না করিয়া আপন মনে নিজ বক্তব্য বলিয়া যাইতেছেন। টঙ্গীর নীচে জলমধ্যস্থ রাঘবের উদরে ব্রাহ্মণ বালক শিব-মুখনি:সৃত তত্ত্বকথা শুনিতেছে এবং পদে পদে "হুঁ" "হুঁ" করিয়া উপলব্ধির সাড়া দিতেছে। পার্ব্বতীর নিদ্রাভঙ্গের পর মহাযোগী মহেশ্বর প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন, এবং রাঘব-মৎস্যের উদর ছিন্ন করিয়া নরশিশুটিকে উদ্ধার করিলেন। পার্ব্বতী সস্নেহে শিশুটিকে মন্দার পর্ব্বতে লইয়া গিয়া লালন-পালন করিলেন। এই শিশুই কালে মহাযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ নামে জগতে খ্যাতিলাভ করেন।

বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে মৎস্য বা হাঙ্গর ভক্ষিত কোনও প্রাণী উদরাভ্যন্তরে কতক সময় প্রায় অক্ষত অবস্থায় থাকিলেও তাহার মধ্যে প্রাণের লেশমাত্রও থাকা সম্ভবপর নয়। কিন্তু পুরাণাদিতে এরূপ অবৈজ্ঞানিক ঘটনাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ভাগবত পুরাণ দশম স্কন্ধ ৫৫শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের নবজাত পুত্র প্রদ্যুম্নকে শম্বরাসুর হরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবামাত্র এক বৃহদাকার মৎস্য শিশুটিকে উদরসাৎ করে—পরে ধীবরেরা ঐ মৎস্যটিকে জালে ধৃত করিয়া শম্বরাসুরকেই প্রদান করে। পাচকেরা মৎস্যটিকে কর্ত্তন করিবার সময় তাহার উদরস্থ শিশুটিকে প্রাপ্ত হয় এবং মায়া নাম্নী পাচিকা এই শিশুটিকে লালনপালন করে। শিশু বয়:প্রাপ্ত হইলে পালিকা মায়াই তাহাকে স্বামিত্বে বরণ করে; এবং শম্বরাসুরকে বধ করিয়া প্রদ্যুম্ন পত্নী সমভিব্যাহারে দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক পিতামাতার চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

এই ভাগবতেই (৮ম স্কন্ধ ২৪-অধ্যায়) দ্রবিড় দেশের সত্যব্রত রাজার অঞ্জলিস্থ জলের মধ্যে প্রবিষ্ট শফরী মৎস্য কর্তৃক বেদ উদ্ধারের কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে।

বঙ্গদেশে মৎস্যেন্দ্রনাথকে ঐতিহাসিক আলোচনার গণ্ডীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে স্থান দিয়াছেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। নেপাল হইতে আনীত হাজার বৎসরের প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন "চর্য্যাপদ"কে "বৌদ্ধ গান ও দোহা" নাম দিয়া ১৩২৩ বাংলায় প্রকাশ করিবার সময় ঐ গ্রন্থের মুখবন্ধে (১৬ পৃ:) তিনি লিখিয়া-ছেন—"নেপালীরা মৎস্যেন্দ্রনাথকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করে। মৎস্যেন্দ্রনাথের পূর্ব্বনাম মচ্ছঘ্ননাথ, অর্থাৎ তিনি মাছ মারিতেন। বৌদ্ধদিগের স্মৃতিগ্রন্থে লেখা আছে যে, যাহারা নিরন্তর প্রাণী হত্যা করে, সে সকল জাতিকে অর্থাৎ জেলে মালা কৈবর্ত্তদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবে না। সুতরাং মচ্ছঘ্ননাথ বৌদ্ধ হইতে পারেন না। কৌলদিগের সম্বন্ধে তাঁহার এক গ্রন্থ আছে; তাহা পড়িয়া বোধ হয় না যে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন; তিনি নাথপন্থীদিগের একজন গুরু ছিলেন, অথচ তিনি নেপালী বৌদ্ধদিগের উপাস্য দেবতা হইয়াছেন।" সমস্যা থাকিয়াই গেল—মৎস্যঘাতী কৈবর্ত্ত বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার অধিকারী না হইয়াও কিরূপে বৌদ্ধদিগের উপাস্য দেবতার স্থান অধিকার করিলেন? বিষয়টি হেঁয়ালিপূর্ণ সন্দেহ নাই।

১৩২৯ সালের ১১ আষাঢ় সাহিত্য-পরিষদের সভা-পতির অভিভাষণে শাস্ত্রী মহাশয় মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রকৃত স্বরূপের আলোচনায় এক নূতন অধ্যায়ের অবতারণা করিয়া-ছেন। তিব্বতী ও নেওয়ারী চিত্রে লুইপাদের এক ছবিতে অঙ্কিত আছে—"তিনি একটি বড় মাছের পেট চিরিয়া তাহাতে একটি পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। * * * * তাহার পাশে অনেকগুলি বড় বড় রুই মাছ পড়িয়া আছে। উহার একটির পেট চিরিয়া তিনি কাঁচা নাড়ী খাইতেছেন। * * * লুইপাদের আর একটি নাম মৎস্যান্ত্রাদ পাদ। সুতরাং মাছের পোটায় পা দেওয়া হইয়াছে, অথবা পা দিয়া মাছের পোটা খাইতেছেন। নেওয়ারীরা

মৎস্যান্ত্রাদের অর্থ করিয়াছে—মাছের আঁতরী কাঁচা খায়। দুটি দেশই (তিব্বত ও নেপাল) পাহাড়ের উপরে ; মাছের সঙ্গে লোকের বড় সম্পর্ক নাই, মাছ কেমন করিয়া খাইতে হয় জানে না। নামের ব্যাখ্যায় এক অদ্ভুত চিত্র তৈয়ার করিয়াছে। আমরা মাছ খাই, আমাদের দেশে মাছ অনেক আছে। আমরা মৎস্যান্ত্রাদের অর্থ করিয়াছি—মাছের পোটায় তৈরি তরকারি খাইতে ভালবাসিতেন।"

"মহাকৌলজ্ঞান বিনির্ণয়" নামক একখানি বই আছে। বইখানি মৎস্যেন্দ্রপাদাবতারিত। * * * মৎস্যেন্দ্রনাথের আর একটা নাম মচ্ছঘ্ননাথ। আমি ভাবিলাম—তবে কি তিনি কৈবর্ত্ত ? শেষে পড়িতে পড়িতে দেখি তিনি সত্য সত্যই কৈবর্ত্ত ছিলেন ; তাঁহাকে অনেক স্থলে কেওট পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে—ধীবরও বলা হইয়াছে। পার্ব্বতী একবার মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কেওটের বাড়ী গেলে কেন ? বইখানি পড়িতে পড়িতে আমার মনে হইল—কোনও ব্রাহ্মণের ছেলে যত বড়ই মূর্খ হউক, এরূপ সংস্কৃত লিখিবে না। শেষে দাঁড়াইল যে উহা কেওটের লেখা। তার পর আবার দেখি মৎস্যেন্দ্রনাথের বাড়ী ছিল চন্দ্রদ্বীপে। * * *"

ইটালী দেশীয় পণ্ডিত Guissep Tucci মনে করেন—মীননাথ জাতিতে কামরূপদেশীয় একজন কৈবর্ত্ত ও তদ্দেশীয় রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। সংসারাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল সামন্ত শোভা (*Early History of Kamrupa by K. L. Barua, page 158*)। ডক্টর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী তিব্বতদেশীয় লামা তারানাথের বৃপাগ্ বৃশাম্ বৃজোন্ ব্জান্ গ্রন্থের নজির দেখাইয়া লুইপাদকে কৈবর্ত্তজাতীয় লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন (কৌলজ্ঞান নির্ণয়, ভূমিকা, ২২-২৩ পৃঃ)

প্রথম প্রশ্ন হইল—যে সব মহাপুরুষ অখ্যাত ও অজ্ঞাত অবস্থায় সংগোপনে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক বিজন বনে বা পর্ব্বতগুহায় সাধনে নিমজ্জিত হন এবং বহুদিন পরে জন্মভূমি হইতে বহু দূরে নূতন নামে ও নূতন ভাবে পরিচিত হইয়া লোক-সমাজে আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁহাদের সংসারাশ্রমের জাতিকুলের তথ্য কে জানিতে পারে এবং কেই বা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে ? ইহা সন্ন্যাসীদের শুধু রীতিবিরুদ্ধ নহে—মহা পাপ। "সন্ন্যাসীদের সাধারণ রীতি এই যে তাঁহারা নিজমুখে পূর্ব্বাশ্রমের কোন পরিচয় প্রদান করেন না। সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নূতন জন্মলাভ হইল। তখন হইতে গুরুপ্রদত্ত নামই তাঁহাদের নাম, গুরুই তাঁহাদের পিতা। তখন বংশাবলীর পরিচয় দিতে হইলে গুরুপরম্পরা ক্রমে গুরু, পরম গুরু প্রভৃতিরই নামোল্লেখ করিতে হইবে।" (যোগীরাজ গম্ভীরনাথ প্রসঙ্গ—৭০ পৃঃ)। আধুনিক যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাথসিদ্ধা, কুম্ভ মেলায় মণ্ডলেশ্বর বাবা গম্ভীরনাথ কাশ্মীরের জম্মু প্রদেশের কোনও ধনীর সন্তান ছিলেন বলিয়া অনেকেই জানিতেন—কিন্তু এই সম্পর্কে তাঁহাকে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও তিনি গম্ভীর ভাবে শুধু উত্তর দিতেন—"প্রপঞ্চসে ক্যা হোগা।" এমতাবস্থায় প্রাচীন যুগের নাথসিদ্ধা মৎস্যেন্দ্রনাথ যে নিজহস্তে গ্রন্থ-মধ্যে নিজের পূর্ব্বাশ্রমের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া যাইবেন ইহা কল্পনা করাও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

পুরাণোক্ত কাহিনী ও যোগসিদ্ধিলাভের প্রবাদ হইতেই তিব্বতী ও নেওয়ারী চিত্র চিত্রকরের তুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। মহিষের উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত মহিষাসুরের এক পদ ছিন্নমুণ্ড মহিষের পেটের মধ্যে রাখিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক দুর্গার কাঠামে বিন্যস্ত করা মূর্ত্তিকারের কল্পনার স্বাভাবিক স্বরূপ। প্রবাদোক্ত রাঘব-মৎস্যের উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত মৎস্যেন্দ্রনাথের চিত্রে তাঁহার এক বা উভয় পদ মৎস্যের পেটের মধ্যে বিন্যস্ত করাও সেইরূপ ভাবে চিত্র-শিল্পীর কল্পনা। সাগরে মৎস্যের উদরে বাসকালীন মৎস্যসমভিব্যাহারে থাকার কল্পনাকে চিত্রে রূপ দিবার সময় আশে পাশে আরও কয়েকটি মৎস্য আঁকিয়া দেওয়াও চিত্রকরের তুলিকার স্বাভাবিক গতির বেগ।

"পাদ" শব্দ সম্মানসূচক অর্থে মহাপুরুষ বা গুরুস্থানীয় ব্যক্তির নামের সহিত যুক্ত করা হইয়া থাকে। মৎস্যান্ত্রাদপাদ অর্থে মৎস্যের অন্ত্র বা নাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত প্রভুপাদ বা গুরুদেব—এই অর্থই সমীচীন। ইহাতে কাঁচা বা পাকা নাড়ী বা নাড়ীর তরকারি খাইবার কল্পনা করা নিছক যুক্তিহীন ও অবান্তর।

লুইপাদকে লোহিত পাদ, রোহিত পাদও বলা হইয়াছে এবং তিব্বতী গ্রন্থানুসারে নাকি লুই, লোহিত, রোহিত শব্দের অর্থ মৎস্যরাজ বা মৎস্যেন্দ্র—king of Fishes (কৌলজ্ঞান নির্ণয়—প্রবোধ বাগ্‌চী—ভূমিকা—২৪ পৃঃ)। কিন্তু মৎস্যেন্দ্রনাথের সহিত রাঘব-মৎস্য বা "বোগালসুন্দরের" অর্থাৎ বোয়াল মাছের প্রবাদ জড়িত। বোয়ালের মুখবিবরই বৃহদায়তন ; ঐ মুখেই নরশিশু প্রবেশ করা সম্ভব।

প্রাচীন কামরূপ রাজ্যে বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্র নদের নাম ছিল লোহিত। ইহা কামরূপের প্রাচীনতম অধিবাসী অষ্ট্রিক জাতির "লাও-তু" (বৃহৎ জলরাশি) হইতে উৎপন্ন। বর্ত্তমান কালেও ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন একটি স্মৃতির নাম লোহিত নদী। সাধারণ গ্রাম্য লোকে এখনও ব্রহ্মপুত্রকে লুইত বা লুই বলে। মহাভারতে কামরূপ রাজ্যকে লৌহিত্যদেশ বলা হইয়াছে। ঐ যুগে এই নামই বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। (বনপর্ব্ব—তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়—৮৫ অধ্যায়। সেই দেশের লৌহিত্য তীর্থেরও উল্লেখ আছে। সুতরাং এই লোহিত নদীবিধৌত লৌহিত্য দেশের গুরুদেবকে লোহিতপাদ, রোহিতপাদ (ল এর স্থানে

র), লুইতপাদ, লুইপাদ বলিয়া অভিহিত করা অযৌক্তিক নহে। ইহা হইতে এইটুকু মাত্র আভাস পাওয়া যাইতে পারে যে, তিনি কামরূপ হইতে তিব্বত গিয়াছিলেন।

আভিধানিক অর্থ বিচার করিয়া সাধারণতঃ কেহই নাম করণ করে না; সুতরাং শব্দার্থ ধরিয়া নামের সহিত জাতি-কুলের তথ্য জড়িত থাকা কখনও সম্ভবপর নয়। এরূপ করিতে গেলে অনেক সময় বিপদের সম্ভাবনা আছে। পুরাণোক্ত রূপসী মৎস্যগন্ধার দেহ হইতে এখনও মাছের আঁশটে গন্ধ ভুর ভুর করিয়া নির্গত হইতেছে। গোরক্ষনাথ উত্তর-ভারতে গরুর রাখালী করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

এই বিপদ আশঙ্কা করিয়া ময়নামতীর গানের রচয়িতা সিদ্ধা 'হাড়িপা'কে রক্ষা করিবার জন্য দুই হাত তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন—"হাড়ি নহে—ডাড়ি নহে—হাড়িপা জালন্ধর।" কিন্তু বলিলে কি হইবে? পরবর্ত্তী লেখক ও আধুনিক গবেষকেরা বেচারাকে ময়নামতীর ঘরে ঝাড়ুবরদারী করাইয়া ছাড়িয়াছেন। সিদ্ধপুরুষ সম্ভবতঃ প্রথম সাধনার সময় সদাসর্ব্বদা সঙ্গে একটি মাটির হাঁড়ি রাখিতেন—কমণ্ডলু বা খর্পর লইতেন না। সেইজন্য হয়ত গুরু হাড়িপা নাম দিয়াছিলেন।

আর্য্য শাস্ত্রের প্রতিটি তত্ত্বের ভাষা ত্রিভাবাত্মক। প্রথম—একটি সরল আভিধানিক বা সাহিত্যিক বা লৌকিক ভাষা। ইহা নিম্ন অধিকারীর জন্য। দ্বিতীয়—ভক্তিভাবযুক্ত পরকীয় বা পৌরাণিক ভাষা অথবা উপাসনার অনুকূল দৈবী লক্ষ্যযুক্ত সূক্ষ্ম বা তাৎপর্য্যবোধক ভাষা। ইহা মধ্য অধিকারীর জন্য। তৃতীয়—উন্নত অধিকারীর পক্ষে সেই শাস্ত্র বাক্যেরই গভীরতম জ্ঞানাত্মক আধ্যাত্মিক লক্ষ্যযুক্ত সূক্ষ্মতর সমাধি-ভাষা। ইহাকে ধ্যান ভাষা বা সন্ধ্যা ভাষাও বলে। অন্য ভাবে এই ভাষাত্রয়কে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভাষাও বলা যাইতে পারে। চর্য্যাপদ, কৌলজ্ঞান নির্ণয় এবং নাথ-সাহিত্যের অধিকাংশ গ্রন্থ সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত। সুতরাং সন্ধ্যা বা সমাধির সহিত বিচার না করিয়া শুধু লৌকিক বা আভিধানিক ভাষার সাহায্যে এই সব গ্রন্থোক্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিলে সিদ্ধ পুরুষদের প্রতি অবিচারই করা হইবে।

শাস্ত্রী মহাশয় যখন "কৌলজ্ঞান বিনির্ণয়" গ্রন্থের উল্লেখ করেন তখন উহা নেপালের রাজদরবারের পুস্তকাগারে শুধু তিনিই দেখিয়াছিলেন ও পড়িয়াছিলেন। অন্য কাহারও এই সম্বন্ধে কিছুই জানিবার ও বলিবার সুযোগ-সুবিধা ছিল না। ১৯৩৪ সালে ডক্টর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী ঐ গ্রন্থখানা নেপাল হইতে আনিয়া সম্পাদনান্তর প্রকাশ করিয়াছেন। (*Calcutta Sanskrit Series* No. III)। এখন উহা পাঠ করিবার ও বিচার করিবার সুযোগ সকলেরই হইয়াছে।

গ্রন্থখানার নাম "কৌলজ্ঞান নির্ণয়" ইহা মৎস্যেন্দ্র, মচ্ছেন্দ্র বা মচ্ছঘ্ন পাদাবতারিত। অর্থাৎ গ্রন্থখানা মৎস্যেন্দ্র-নাথের রচিত নহে, তাঁহারই মতবাদ ও ধর্ম্মাচরণ বিধান পর-বর্ত্তীকালে অন্য কেহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাগ্‌চী মহাশয় কৌলজ্ঞান নির্ণয়ের সহিত আরও অনুরূপ কয়েকটি খণ্ড গ্রন্থ সংযোজিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঐগুলিও মৎস্যেন্দ্র পাদাবতারিত হইলেও "অকুলবীর তন্ত্রে" "মীননাথেন ভাষিতং" (৯২ পৃঃ) "সিদ্ধনাথ প্রসাদতঃ (১০৬ পৃঃ) বলিয়া লিখিত আছে।

রচনার ভাষা বা ব্যাকরণগত শুদ্ধাশুদ্ধি দেখিয়া রচয়িতার জাতি নির্ণয় করা এক অভিনব পন্থা সন্দেহ নাই। প্রাচীন-কালে একটি কৈবর্ত্তের ছেলের পক্ষে সংস্কৃত কেন,—যে-কোনও ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ লেখাও ত পরম দুঃসাহসের কর্ম্ম ছিল। শুধু কৌলজ্ঞান নির্ণয় কেন, মৎস্যেন্দ্রনাথের নামগন্ধহীন "সাধনমালা" আদি বহু গ্রন্থও ঐরূপ ভুল সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল।

কৌলজ্ঞান নির্ণয় গ্রন্থখানা সাধনা ও পূজাপদ্ধতির বিধানের গ্রন্থ। ইহার প্রতিটি তত্ত্বই সন্ধ্যাভাষায় বোধ্য। লৌকিক ভাষায় ইহার ব্যাখ্যা করিতে গেলে প্রমাদে পড়িতে হইবে। ইহা কাহারও জীবনীমূলক গ্রন্থ নহে, এবং ইহাতে মৎস্যেন্দ্র-নাথের আত্মজীবনীর নামগন্ধ থাকিতে পারে না। লৌকিক দৃষ্টিতে যেগুলি আত্মজীবনী বলিয়া প্রতিভাত হয় সেইগুলি প্রকৃতপক্ষে সাধনার চরম তত্ত্বের বিশ্লেষণ মাত্র। ইহা পরে ব্যাখ্যা করিতেছি।

লৌকিক ভাষায় মৎস্যেন্দ্রনাথের জন্মবৃত্তান্ত অতি সহজ-বোধ্য। পৌরাণিক ভাষায় ব্রাহ্মণের পুত্র নদীতে খুব সম্ভব ভেলায় ভাসমান হইয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোনও ধীবররাজ কর্ত্তৃক লালিতপালিত হইয়াছিল। এইরূপ কাহিনীর নজির ইতি-হাসেও পাওয়া যায়। খনা-বরাহ-মিহিরের কাহিনী সকলেই জানেন। ১৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আসামের আহোম্ রাজ ত্যাও-খাম্‌তির গর্ভবতী রাণী গৃহবিবাদের ফলে লোহিত নদীতে ভেলায় নির্ব্বাসিতা হইয়া নদীর উত্তর-তীরস্থ এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয়লাভ করেন। ঐ ব্রাহ্মণের গৃহে যথাসময়ে জাত-পুত্র কালে আসামের সিংহাসনের অধীশ্বর হইলেও অদ্যাবধি ইতিহাসে "বামনী কোঁবর" বা ব্রাহ্মণকুমার বলিয়া পরিচিত। (*Back-ground of Assamese Culture*—R. M. Nath, pp. 91, 129.)

সন্ধ্যাভাষায় মৎস্য শব্দের অর্থ ঈড়া-পিঙ্গলা (গঙ্গা-যমুনা) নাড়ীর মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস রূপে সতত সঞ্চরমাণ প্রাণবায়ু; এবং যিনি যোগবলে এই প্রাণবায়ুকে সংরুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই মৎস্যবধকারী বা মৎস্যজয়ী বীর বা মৎস্যেন্দ্রনাথ।—

"গঙ্গা যমুনায়োর্মধ্যে মৎস্যৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েৎ যস্তু স ভবেন্মৎস্য সাধকঃ॥

প্রাণবায়ু আবার পাঁচটি—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান ; ইহাদের সহিত মন যুক্ত হইয়া ছয়টি হয়। যোগপন্থী সাধক এই ছয়টিকে কুম্ভক আদি প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ স্ববশে আনিতে চেষ্টা করেন। তিব্বতী ও নেওয়ারী চিত্রে মৎস্যেন্দ্রনাথের আশেপাশে এইরূপ পাঁচটি বা ছয়টি মৎস্যের চিত্র থাকাই স্বাভাবিক।

ঈড়া-পিঙ্গলাবাহী প্রাণবায়ুরূপ মৎস্যগুলিকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে সাধকের মূলাধারস্থ শক্তিস্বরূপিনী কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হইয়া সুষুম্না-পথে ঊর্দ্ধে গমন করেন, এবং স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ চক্রভেদ করিয়া আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করেন। এই আজ্ঞাচক্রের অন্তর্গত আরও দুইটি গুপ্তচক্র আছে। পশ্চাৎ দিকে মনশ্চক্র ও সম্মুখদিকে সোমচক্র। মনশ্চক্রের ছয়টি দলে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও তাহাদের সমষ্টীভূত প্রতিবিম্বরূপ স্বপ্নের স্থান। এই

মনশ্চক্র

ছয়টি বৈষয়িক ভাবপূর্ণ উপকেন্দ্র লইয়া মনের কেন্দ্রে ছয়টি দল গঠিত হইয়াছে। এই মনশ্চক্রেই জীবের সমস্ত ভাবনা-চিন্তার রেখা গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত অঙ্কিত হইয়া থাকে। সাধনার প্রারম্ভে সাধক পঞ্চপ্রাণ ও মন এই ছয়টির সহিত প্রবল সংগ্রামে রত হন। তাহারা যমুখের মত বলশালী হইয়া বা ষট্‌পদের মত ঝাঁক বাঁধিয়া সাধককে বিব্রত করে। কিন্তু সাধনার জালে মৎস্যগুলিকে রুদ্ধ করিয়া সাধক যখন কুণ্ডলিনীকে আজ্ঞাচক্রে উত্থিত করেন, তখন আবার মনশ্চক্রের ষট্‌দলস্থিত ষট্‌পদগণ সবলে দংশন করিতে থাকে।

আজ্ঞাচক্রে ঈড়া-পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মিলনস্থান। এখানে একটি ত্রিকোণ ক্ষেত্র সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাকে ত্রিবেণী, যুক্ত ত্রিবেণী, ত্রিকূট, হলক, অকথাদি ক্ষেত্রও বলা হয়। এই স্থানেই সাধক জ্যোতিঃ দর্শন করেন ও অনাহত নাদ শ্রবণ করেন।

আজ্ঞাচক্রস্থ ত্রিকোণ পীঠ সাধকদিগের সাধনার পক্ষে একটি চরমস্থান। সাধারণভাবে বলা হয় "এ বড় বিষম ঠাঁই, গুরু শিষ্যে ভেদ নাই।" ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া ষট্‌চক্রের এক এক চক্রে ত্রিতয় অর্থাৎ কেশগুচ্ছ জাত বেণীর ন্যায় সংবদ্ধ হইয়া এই আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই আজ্ঞাচক্র মধ্যে কূটস্থ প্রদেশে সাধকেরা শ্রীগুরুর পাদপীঠ কল্পনা করিয়া তাঁহারই জ্যোতির্ময় স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। সুষুম্নাপথে জীবনী বা কুণ্ডলিনী শক্তি অনাহত-স্থিত জীবাত্মা সহযোগে এই আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত কুণ্ডলিনী রূপে আসিতে পারেন। আজ্ঞাচক্রের কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ ঈড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার ছেদবিন্দুতেই প্রাণবায়ুর ক্রিয়া শেষ হইয়াছে। ইহার উপরে আর শ্বাসপ্রশ্বাস চলে না। ইহার পর নিরালম্ব-পুরী বা শূন্যাত্মক নাদানুভবের স্থান—নাথ যোগীদের সাধনায় চরম লক্ষ্য নাদবিন্দুর স্থান। তাহারই উপরে সহস্রার।

আজ্ঞাচক্রে আসিয়া কুণ্ডলিনী পরম শিবের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হইয়া যথার্থ নাদানুভূতি-রূপ শূন্যাত্মক হইয়া যান—পার্ব্বতী শিবের কোলে নিদ্রাভিভূতা থাকিয়া আত্মহারা হইয়া যান। ইহাই সাধকের দেহপিণ্ডরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সাযুজ্য মুক্তিলাভ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আজ্ঞাচক্রস্থ ত্রিকোণ ক্ষেত্রের হলক বিন্দু হইতে তিনটি জ্যোতিঃশিখা সমুত্থিত হইয়া পিরামিডাকারে উক্ত ত্রিকোণ চূড়ের শৃঙ্গদেশে অন্তিমবিন্দু ব্রহ্ম বিন্দুতে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই অন্তিম বিন্দুতেই অখণ্ড কেন্দ্ররূপ বিন্দু ও অনাহত নাদের অন্তর-স্বরূপ ওঁকার বা প্রণবের শেষ অঙ্গ। 'ওঁ'কার রূপ

পর্য্যঙ্কের উপর "৺" নাদরূপা দেবী এবং তদুপরি "·" বিন্দুরূপ অর্থাৎ পরব্রহ্মকেন্দ্র মিলিত হইয়া কামকলা-স্বরূপ "৺" চন্দ্রবিন্দু-সদৃশ আকারযুক্ত হইয়া শিবশক্তি বা প্রতিলোমভাবে প্রকৃতি পুরুষের নিত্য সহযোগে যোগিগণের যোগ-প্রতিপাদ্য এই পরমধন "ওঁ" প্রণবের নির্দ্দেশ হইয়াছে। ইহার অবস্থিতি

নিরালম্বপুরীতে বায়ুক্রিয়ার বাহিরে। কুণ্ডলিনী শক্তিসহ জীবাত্মা এই নিরালম্বপুরীতে উপস্থিত হইতে পারিলে অর্থাৎ সাধক মৎস্যের পেট ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইয়া আসিতে পারিলে প্রকৃত নির্ব্বাণ মুক্তি বা নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। যোগশাস্ত্র বলিতেছেন :—

"শিরঃ কপাল বিবরে ধ্যায়েৎ দুগ্ধমহোদধিম্।
অত্র স্থিত্বা সহস্রারে পদ্মে চন্দ্রং বিচিন্তয়েৎ॥
শিরঃ কপাল বিবরে দ্বিরষ্ট কলয়া যুতঃ।
পীযূষভানুং হংসাখ্যং ভাবয়েত্তং নিরঞ্জনং॥
নিরন্তর কৃতাভ্যাসাৎ ত্রিদিনে পশ্যতি ধ্রুবং।
দৃষ্টি মাত্রেণ পাপৌঘং দহত্যেব স সাধকঃ॥

ব্রহ্মকপাল-বিবরে বা ব্রহ্মরন্ধ্র-মধ্যে প্রথমতঃ দুগ্ধ মহা-সমুদ্র চিন্তা করিতে হইবে। পরে সেই স্থানে থাকিয়া অর্থাৎ লয় যোগানুষ্ঠানের দ্বারা সেই স্থানেই জীবাত্মাকে স্থিরতর করিয়া সহস্রদল কমলের অধঃস্থিত চন্দ্রমণ্ডল স্মরণ করিতে হইবে। ব্রহ্মরন্ধ্র মধ্যে ষোড়শকলাযুক্ত সুধারশ্মি বিশিষ্ট বা অমৃতবর্ষী যে চন্দ্র আছে, তাহা হং-সঃ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই নিরঞ্জন হংসের সদা ধ্যান করিতে হইবে। সর্ব্বদা এই ধ্যানযোগ অভ্যাস করিলে, দিবসত্রয়ের মধ্যেই সেই নিরঞ্জনের সাক্ষাৎলাভ হয়,—ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহার দর্শনেই সাধকের সকল পাপ বিদূরিত হইয়া তিনি মুক্ত হইতে পারেন। হং-সঃ পরিবর্ত্তিত হইলে সো-হং হইয়া থাকে। অনন্তর উঁহাদের স্থূল স্বরূপ স ও হ-এর লোপ হইলে ওং বা ওঁ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। 'হ' পুরুষ বা পরম শিব, 'স' প্রকৃতি বা পরমাপ্রকৃতি ; ইঁহারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া শিবশক্তি স্বরূপে প্রতিভাত হইয়া জীবের প্রাণে শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে সদাই স্থূলভাবে বিরাজ করিতেছেন এই হংসযুগলের স্বরূপ শ্বাসপ্রশ্বাসাত্মক শ্রীগুরু পাদুকাপীঠ বা মণিপীঠ বা সোমতীর্থ নির্ম্মল চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্রোজ্জ্বল, সুধাসরোবরে প্রস্ফুটিত সুদর্শন কমলসদৃশ। ইহা হইতে অবিরত সুধাধারা প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানেই পরমানন্দপ্রদ ক্ষীরোদ-সাগর, চন্দ্রদ্বীপ বা মণিদ্বীপ ও টঙ্গী-ঘর বিদ্যমান আছে। এই স্থানেই সাধকের পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদুকাপীঠ। সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ এই স্থানেই—

"—আমহে সানে দিঠা।
ধমন-চমন-বেনি পিণ্ডি বইঠা।—চর্য্যাপদ ১।

এই বিন্দুই শুভ্র স্ফটিকবর্ণ জ্ঞানসূর্য্যরূপ পরমাত্মা—নাথ-যোগীদের পরম আরাধ্য বস্তু। যোগ-সমাধির ফলে সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হয়। ইনিই ব্রহ্মস্বরূপ পরম শিব বা ব্রহ্ম-বিন্দুস্বরূপ। তাঁহারই অন্তরে সকল সুধার আধার অমাকলা বা আনন্দ ভৈরবী ব্রহ্মশক্তি অবস্থিতা আছেন।

বিন্দুস্থান বা মণিপীঠ নিরালম্বপুরীতে ;—এক প্রকার আজ্ঞা-চক্রের বহির্দ্দেশে অবস্থিত। ইহার উপরে সহস্রার বা সহস্রদল কমল ব্রহ্মরন্ধ্রে কেন্দ্রস্থ হইয়া অধোমুখ ছত্রাকারে অবস্থিত আছে। বিন্দুপীঠ ঠিক সহস্রারের অন্তর্গত নহে, অথচ ইহার কুক্ষিগত হইয়া নিম্নভাগে গাত্রসংলগ্ন হইয়া আছে।—

"ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীরুহোদরে, নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতং"।

গুরুপাদুকাপীঠও এই হিসাবে সহস্রারের অন্তর্গত এবং অন্তিম মোক্ষপ্রদ এই শ্রীপাদুকাতীর্থকে সোমতীর্থও বলা হয়। সহস্রার একটি সহস্রদলবিশিষ্ট শ্বেতগর্ভ সপ্তবর্ণযুক্ত বিচিত্র কমল। ইহাকে ক্ষীরোদসাগরও বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা মূলাধারাদি ষট্‌চক্রের বা গুপ্তচক্র লইয়া নবচক্রের বাহিরে অর্থাৎ দেহনগরের বাহিরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ হিসাবে অবস্থিত। কুণ্ডলিনী শক্তি ব্রহ্মনাড়ী আশ্রয় করিয়া ইহার মধ্যে উত্থিতা হন।—

"নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িআ"—চর্য্যাপদ—১০।

তখন সাধকের যে কি অবস্থা হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না।

সুতরাং সহস্রার ক্ষীরোদ সমুদ্র এবং তাহারই কুক্ষিগর্ভে সোমতীর্থ, চন্দ্রদ্বীপ, এবং আজ্ঞাচক্রস্থিত ত্রিকোণক্ষেত্রে পিরা-মিডাকৃতি টঙ্গীঘর অবস্থিত। এই টঙ্গীঘরের টঙ্গে বা তুঙ্গদেশে শিবশক্তি হরপার্ব্বতী নাদবিন্দুরূপে অবস্থিত আছেন। এই টঙ্গীর নিম্নদেশে ঈড়া-পিঙ্গলার মধ্যে মৎস্যরূপী প্রাণবায়ু আজ্ঞাচক্রের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এবং তাহার উদরে জীবাত্মা মৎস্যেন্দ্রনাথ বিরাজিত। শিবশক্তির অনুগ্রহে মৎস্যের উদর ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মনাড়ী পথে তাহাকে টঙ্গীঘরে উঠাইয়া আনা হয়, এবং কুলকুণ্ডলিনী তাহাকে সযত্নে মন্দার পর্ব্বতে লইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সমাহিত করেন।

এই কাহিনী নাথসিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথের সংসারাশ্রমের জীবনী নহে, ইহা প্রত্যেক যোগাবলম্বী সাধকের যৌগিক ক্রিয়াসাধনের সত্য বিবরণ।

এখন ধীবরত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। ঈড়া-পিঙ্গলায় সঞ্চরমাণ প্রাণবায়ুই মৎস্য। ইহাদিগকে যিনি সংযত ও সংরুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন তিনিই ধীবর। ঈড়া-পিঙ্গলা ও সুষুম্নার ক্রিয়া হইতে মুক্ত করিয়া যিনি চিত্তকে নিরালম্ব-পুরীতে স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তিনি মৎস্যঘাতী ও মৎস্যের উদর-ছিন্নকারী ধীবর—তিনিই মচ্ছঘ্ননাথ বা মৎস্যান্ত্রাদপাদ।

পঞ্চ প্রাণ ত সাধারণ মৎস্য। মায়া নামক আর একটি মহা মৎস্য আছে। নিরালম্বপুরীতে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিলেও তাহার ক্রিয়া চলে। ব্রহ্ম মায়ার সাহায্যেই সৃষ্টি করেন। মায়া ও ব্রহ্মের সমশক্তি সম্পন্ন, দেবতারাও ইহার নিকট পরাজিত। ইহা শুধু ঈড়া-পিঙ্গলাতে বাস করে না—ইহা দেহস্থ সপ্ত ধাতু রূপ সপ্ত সমুদ্র জুড়িয়া বিরাজ করে। রুদ্রযামল গ্রন্থে দেহস্থিত প্রতি চক্রে এক একটি সরোবর বা তীর্থ কল্পনা

করা হইয়াছে। মায়া-মৎস্য এই সপ্ত সমুদ্রে ডুবিয়া বিরাজ করে। ব্রহ্মত্ব লাভ করিলেও ইহাকে দমন করা যায় না। সুতরাং ব্রহ্মত্ব ত্যাগ করিয়া সহস্রারে উঠিতে পারিলেই তাহাকে বধ করা যায়। সুতরাং এই মহামৎস্য বধকারী ধীবর বা কৈবর্ত্ত ব্রহ্মজ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ।

দীঘনিকায় ব্রহ্মজাল সুত্তে বুদ্ধদেব বলিতেছেন—"হে ভিক্ষুগণ! যেমন কোন এক কৈবর্ত্ত বা কৈবর্ত্ত-শিষ্য (কেবট্টো বা কেবট্টোন্তেবাসি) স্বল্পজল হ্রদে সূক্ষ্মজাল নিক্ষেপ করিলে তাহার মনে এই ভাবের উদয় হয়—এই স্বল্পজল হ্রদে যত বড় বড় রকমের মাছ আছে, তাহাদের সমস্তকেই আমার জালে পুরিয়াছি, জালের মধ্যে থাকিয়াই তাহারা উল্লম্ফন করিতেছে। তেমনিভাবে—হে ভিক্ষুগণ! আন্তম্ভ বিষয়ে অনুদর্শী ও মনন-শীল যে-কোনও শ্রমণ কিম্বা ব্রাহ্মণ নানাভাবে মতবাদ প্রচার করেন, উহাদের সমস্তই আমার এই সূত্রে বাষট্টি মতবাদের মধ্যে পাইবে। এই মতবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইয়াই জালবদ্ধ মৎস্যের ন্যায় লাফালাফি করিবে।"

"আনন্দ! এই কারণে আমার এই ধর্ম্মোপদেশকে অর্থ-জাল, ধর্ম্মজাল, ব্রহ্মজাল, দৃষ্টিজাল বা অনুত্তর সংগ্রাম বিজয় নামে গ্রহণ করিবে।"

আসামে "রাতিখোয়া" নামক একটি গুহ্য সাধক-সম্প্রদায় আছেন। তাহাদের একটি গীতে আছে—

"ছুনিয়া এদিনে ছুনিয়া ছুদিনে
ছুনিয়া ফুলনি বাড়ী।
কিস্থ ছল বল কর তই ছুনিয়া
ধরিব খেওয়ালি মারি॥
খেওয়ালি জালতে গোড়া বার কুড়ি
পাশর লেখ জোখ নাই।
টিকমিত ধরিয়া চোঁচনি মারিলে
সবাকে এক ঠাঁই নাই॥"

অর্থাৎ—দুই এক দিনের ফুলবাগিচায় মত এই সংসার কিসের ছলনা করিতেছে? জাল ফেলিয়া তাকে তৎক্ষণাৎ বদ্ধ করিয়া ফেলিব। আমার হাতে যে উড়া জাল আছে তাহার প্রান্তদেশে বার কুড়ি লোহার গুটি বাঁধা আছে, জালে অসংখ্য পাশা বা তন্তুও আছে। জালের শীর্ষপ্রান্তে ধরিয়া টানিয়া আনিলেই সংসারের ছোট বড় সকলকেই একত্র পাইব —ঠিক যেমন ধীবর রুই, কাতলা, পুঁটি আদি সকল মাছকে একত্রে জালবদ্ধ করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে সকল মহাপুরুষ নিজ নিজ ধর্ম্ম-মতবাদের দ্বারা জগতের ছোট বড় সকলকে এক ছত্রের নিম্নে সমবেত করিতে পারেন তাঁহারা সকলেই প্রকারান্তরে ধীবরের বৃত্তিই অবলম্বন করিয়াছেন। বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, নানক, কবীর, দাদূ ইঁহারা সকলেই ধীবরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন—এই দিক দিয়া বিচার করিলে মৎস্যেন্দ্রনাথও একজন ধীবর ছিলেন।

এখন কৌলজ্ঞান নির্ণয়ের ষোড়শ পটলে মৎস্যেন্দ্রনাথের তথাকথিত জীবনীমূলক পদগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

ভৈরব বলিতেছেন:—

যদাবতারিতং জ্ঞানং কামরূপী ত্বয়া ময়া।
তদাবতারিত ত্বত্যং তত্বস্তু ষন্মুখস্য চ॥
তেন কৌলাগমে দেবি! বিজ্ঞানং প্রণবপ্রিয়ে।
অব্যক্তেন তু রূপেন চন্দ্রদ্বীপে অহং প্রিয়ে॥
অব্যক্তং গোচরং তেন কুলজ্ঞাতং মম প্রিয়ে॥ ২১-২২

দেবী—কিমর্থং চন্দ্রদ্বীপস্তু অহকৈব গত প্রভো।
কিমর্থং প্রসিতা প্রোক্তা আদি ষন্মুখস্য চ॥

ভৈরব—অহংচৈব ত্বয়া সার্দ্ধং চন্দ্রদ্বীপং গত যদা।
তদা বটুক রূপেন কার্ত্তিকেয়ঃ সমাগতঃ॥
অজ্ঞান ভাবমাস্থায় তদা শাস্ত্রং হি মুষিতম্।
শাসিতোঽহং মহাদেবী ষন্মুখা মুষকাত্বকম্॥
গতোঽহং সাগরে ভদ্রে জ্ঞান দৃষ্ট্যাবলোকনম্।
মচ্ছমাকর্ষয়িত্বা তু স্ফোটিতং চোদরং প্রিয়ে॥
গৃহীত্বা মৎস্যোদরস্ত আনীতস্ত গৃহী পুনঃ।
স্থাপয়িত্বা জ্ঞান পটং মম গুহ্যং তু রক্ষিতম্॥
পুনঃ ক্রুদ্ধমনেনৈব মুষকেন সুরেশ্বরী।
গার্ত্তং কৃত্বা সুরুঙ্গায় পুনঃক্ষিপ্তং হি সাগরে॥
দশকোটি প্রমানেন মহামাংসং (মৎস্যং?) হি ভক্ষিতম্।
মম ক্রোধো সমুৎপন্নং শক্তিজালো ময়াকৃতঃ।
আকর্ষিতো মৎস্য সপ্তানাং সাগর হ্রদাৎ।
নাগতোঽসৌ মহামৎস্য মমতুল্য বলঃ প্রিয়ে॥
জ্ঞানতেজেন সংভূতো দুর্জ্জয়স্ত্রিদশৈরপি।
ব্রহ্মত্বং হি তদা ত্যক্তং চিত্তবী (চিত্তধী?) ধীবরাত্মকম্।
অহং সো ধীবরো দেবি! কৈবর্ত্তত্বং ময়া কৃতঃ।
আকৃষ্য তু তদা মৎস্যং শক্তিজাল সমীকৃতঃ॥
মৎস্যোদরস্ত তৎস্ফোট্য গৃহীতঞ্চ কুলাগমে।
বদন্তি বিদিতা লোকে পশবো জ্ঞানবর্জ্জিতাঃ॥

দেবী—ব্রাহ্মণোঽসি মহাপুণ্যে কৈবর্ত্তত্বং ময়া কৃতঃ।
মৎস্যাভিঘাতিনৈর্বিপ্রা মৎস্যঘ্নমেতি বিশ্রুতাঃ॥
কৈবর্ত্তত্বং কৃতং যস্মাৎ কৈবর্ত্তো বিপ্রনায়কঃ॥

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই হেঁয়ালিপূর্ণ শ্লোকগুলির লৌকিক ব্যাখ্যায় যে ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন (কৌলজ্ঞান নির্ণয়—ভূমিকা ৮-৯ পৃষ্ঠা) তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ:

ভৈরব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—তিনিই কামরূপে ষন্মুখ কার্ত্তিকেয়ের গুপ্ত তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। এই জ্ঞানই কুলা-গমের সারতত্ত্ব এবং চন্দ্রদ্বীপে তিনিই ইঁহার অধিকারী ছিলেন। তারপর তিনি বলিতেছেন—আমি যখন তোমার

সহিত চন্দ্রদ্বীপে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন শিষ্যরূপে কার্ত্তিক আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অজ্ঞানতা-বশতঃ গুহ্যতত্ত্বের গ্রন্থখানা হরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। আমি সাগরে গমন করিয়া সেই নিক্ষিপ্ত শাস্ত্র ভক্ষণকারী মৎস্যকে ধরিয়া তাহার উদর দীর্ণ করিলাম ও পবিত্র জ্ঞান উদ্ধার করিলাম। সেই চোর কিন্তু ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ভূমিগর্ভে একটি সুড়ঙ্গ খনন করিল এবং পুনরায় সেই গ্রন্থ চুরি করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। এইবার আরও বৃহদাকার এক মৎস্য ইহা ভক্ষণ করিল। আমিও ইহাতে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলাম এবং আমার শক্তি-প্রভাবে এক জাল প্রস্তুত করিয়া সেই মৎস্যকে জালবদ্ধ করিয়া তীরে তুলিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সেই মহামৎস্য আমারই মত বলশালী বিধায় তাহাকে তীরে তুলিতে পারিলাম না। সেই মৎস্যেরও দারুণ দৈবশক্তি ছিল এবং দেবতাগণও তাহাকে ভয় করেন। তখন সেই মৎস্যের সঙ্গে সমুচিতভাবে সংগ্রাম করিবার জন্য আমি আমার ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করিয়া ধীবরত্ব গ্রহণ করিলাম। হে দেবি! আমিই ধীবর বৃত্তিধারী কৈবর্ত্ত; আমিই দৈবশক্তির জালের দ্বারা সেই মৎস্যকে ধরিয়া তীরে উঠাইলাম এবং কুলাগম শাস্ত্র উদ্ধার করিলাম। আমি যদিও ব্রাহ্মণ, এখন ধীবর সাজিয়াছি। কৈবর্ত্তরূপে মৎস্য বধ করার কারণে ব্রাহ্মণেশ্বর আমি মৎস্যঘ্ন কৈবর্ত্ত হইয়াছি।

দেবী বলিলেন—তুমি মহাপুণ্যবান ব্রাহ্মণ। আমিই তোমাকে কৈবর্ত্তরূপে পরিণত করিয়াছি। মৎস্যঘাতী বিপ্রসকল মৎস্যঘ্ন নামে বিশ্রুত হইবে; এবং আমিই যখন কৈবর্ত্তত্বে পরিণত করিয়াছি, তখন কৈবর্ত্তরাই বিপ্রনায়ক বলিয়া গণিত হইবে।

ইহা হইতে বাগচী মহাশয় মোটামুটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—কুলাগাম শাস্ত্র প্রথমে কামরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিবার জন্য নিজের জাতি ত্যাগ করিয়া কৈবর্ত্ত হইয়া গিয়াছিলেন।

এখন সন্ধ্যাভাষায় শ্লোকগুলির অর্থ হইল নিম্নলিখিত রূপ :—

মূলাধার কামরূপে শিবশক্তি থাকেন। সেখান হইতে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া আজ্ঞাচক্রস্থিত প্রণবস্থান চন্দ্রদ্বীপে উত্থিত করিতে হইলে প্রথমে আদি ষণ্মুখ অর্থাৎ পঞ্চ প্রাণ মনের তত্ত্ব জানিতে হইয়াছিল। এই তত্ত্বই কুলাগম শাস্ত্রের আদি গূঢ়তত্ত্ব।

তারপর আজ্ঞাচক্রস্থ ত্রিকোণের ঊর্দ্ধদেশে প্রণবস্থান চন্দ্রদ্বীপ বা মণিদ্বীপে যাইবার সময় ষটদল কমলবিশিষ্ট মনশ্চক্রে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধস্বপ্ন এই ষণ্মুখ আবার অজ্ঞানতার জাল বিস্তারপূর্ব্বক পূর্ব্বজ্ঞান হরণ করিয়া চিত্ত তথা কুণ্ডলিনীকে অনুলোম গতিতে নীচে নামাইয়া আনিল এবং ঈড়া পিঙ্গলার মধ্যে মৎস্যরূপী প্রাণবায়ুর স্বাভাবিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিল। তখন জ্ঞানচক্রের মধ্যে চিত্ত নিবেশিত করিয়া ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অধিকার হইতে ঊর্দ্ধে জ্ঞানপট্ট নিরালম্বপুরীতে স্থাপন করা হইল। কিন্তু এখান হইতেও বিভূতি, সিদ্ধি আদির প্রাবল্যে চিত্ত আবার নিম্নগামী হইয়া মায়াতে নিবদ্ধ হইল। এই মহামৎস্যরূপী মায়া দেহস্থ সপ্তধাতুর সমুদ্র জুড়িয়া ব্যাপ্ত হইল। মায়া ব্রহ্মের সমশক্তিসম্পন্ন, দেবতারাও তাহার নিকট পরাজিত। সুতরাং ব্রহ্মভাবের অতীত হইয়া তাহাকে বধ করা হইল এবং মহালয়যোগে নির্ব্বিকল্প সমাধি হইল। ("মাঅ মারিআ কাহ্ন ভৈলা কবালী"—১১চর্য্যা)। ইহাই ধীবরবৃত্তি এবং ইহাই ব্রহ্মত্ব-লাভের অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্য-লাভের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বা উন্নততর অবস্থা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, গোরক্ষবিজয়, স্কন্দ পুরাণ বা কৌলজ্ঞান নির্ণয়োক্ত কাহিনীগুলিতে নাথসিদ্ধা মৎস্যেন্দ্রনাথের সংসারাশ্রমের জাতিকুল বিচারের ইতিহাস নাই,—আছে শুধু নাথসিদ্ধার ধর্ম্মমতানুযায়ী যোগসিদ্ধিলাভের গুহ্য আচরণের ইঙ্গিত।

দেশ-বিদেশের কথা

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, বাঁকুড়া

১৯৪৯ সালের কার্য্য-বিবরণী

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ১৯৪৯ সালেও মঠে পূজা অর্চনা এবং ধর্ম্মালোচনা যথারীতি হইয়াছে। বিভিন্ন পূজানুষ্ঠানাদিতে বেলুড় মঠ এবং মিশনের অন্যান্য শাখাকেন্দ্র হইতে সন্ন্যাসীগণ এখানকার মঠে সমাগত হইয়া ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা করেন। গত বৎসর সাধারণ পাঠাগারের এবং পুস্তকাগারেও বিশেষ উন্নতিসাধন করা হইয়াছে। পুস্তকাগারে মোট পুস্তক-সংখ্যা ১৬৭৯ খানি।

বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয়ে ১৯৪৯ সালে মোট ৮ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে ১ জন সর্ব্বশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সারদানন্দ ছাত্রাবাসে ১৪ জন ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে ৩ জন বিগত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। গরীব ছাত্রদের সাময়িক সাহায্য-দানের ব্যবস্থা করাও হইয়াছিল।

রামহরিপুর মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের কার্য্যও সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে উক্ত বিদ্যালয়ে মোট ১৭৯ জন শিক্ষার্থী ছিল, তাহাদের মধ্যে ৫ জন বালিকা। এতদ্ব্যতীত রুগ্ন ব্যক্তিদের ঔষধ প্রদান এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া মিশন স্থানীয় জনসাধারণের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন।

শ্রীরেবতীমোহন লাহিড়ী

জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক শ্রীরেবতীমোহন লাহিড়ী এম-এ, বি-এল "ইংরেজ

ডক্টর শ্রীরেবতীমোহন লাহিড়ী

কর্ত্তৃক আসাম বিজয়" (Annexation of Assam) শীর্ষক মৌলিক সন্দর্ভ প্রণয়ন করিয়া সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি, ফিল উপাধিলাভ করিয়াছেন। ইহা আসামের একটি ঘটনাবহুল অথচ অর্দ্ধবিস্মৃত যুগের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছে। আসামের খাসিয়া জাতি একদা অসমীয়াদের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হইতে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ-শক্তিকে উৎখাত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারই এক কাহিনী উপযুক্ত তথ্য প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত হইয়া এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের এক অংশ সর্ব্বপ্রথম ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় বাহির হইয়া আসামের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়ের প্রতি বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। নয়াদিল্লীস্থ ভারত-সরকারের মহাফেজখানায় (National Archives of India) সংরক্ষিত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দলিল এবং অহম্ বুরঞ্জীর (অহম্ রাজাদের আমলে হস্তলিখিত ইতিহাস) উপর ভিত্তি করিয়া এই সন্দর্ভটি রচিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই গ্রন্থ প্রকাশে অধ্যাপক লাহিড়ীকে এক সহস্র মুদ্রা সাহায্যস্বরূপ প্রদান করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

খিদিরপুর একাডেমির ছাত্রদের ক্রীড়াকৌশল

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও বৈশাখ মাসে বিপুল সমারোহের সহিত খিদিরপুর একাডেমির নববর্ষোৎসব উদ্‌যাপিত

খিদিরপুর একাডেমির নববর্ষোৎসবে পতাকা উত্তোলন

ক্রীড়াকৌতুকে যোগদানকারী ছাত্রদের ছোলা ও গুড় বিতরণ

সমবেত কুচকাওয়াজের এক অংশ

হইয়া গিয়াছে। ২৫ পল্লী কংগ্রেসের সহ সভাপতি শ্রীচন্দ্রশেখর আঢ্য পতাকা উত্তোলন করিলে পর ছাত্রদের ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন আরম্ভ হয়। এবার-কার অনুষ্ঠানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। খিদিরপুর একাডেমির ছাত্রগণ ব্যতীত খিদিরপুরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, নানা প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, ব্রতী-বালকবাহিনী, ব্যায়াম সমিতি, মণিমেলা ইত্যাদির সভ্যগণ ইহাতে যোগদান করিয়া বিবিধ ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শনপূর্ব্বক দর্শকমণ্ডলীর চিত্তবিনোদন করিয়াছিল। খিদিরপুর একাডেমির নেশন্তাল কেডেট কোর ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বালক-বালিকাদের কুচকাওয়াজ ছিল এবারকার অনুষ্ঠানের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ। খিদির-পুর একাডেমির কর্ত্তৃপক্ষ খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া ছাত্রদের নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং শৃঙ্খলা শিক্ষা দিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়।

এই বিবরণের সঙ্গে প্রকাশিত ছবি-গুলি শ্রীঅনিলবরণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত।

প্রয়াগে বাঙালী কবি-সম্মেলন

গত ১৬ই বৈশাখ প্রয়াগে 'বিচিত্রা' কৃষ্টি সঙ্ঘের উদ্যোগে স্থানীয় বাঙালী কবিদের এক সম্মেলন হয়। প্রবাসে এই প্রকার সম্মেলন ইহাই প্রথম। অমৃত-বাজার পত্রিকা'র বার্ত্তাসম্পাদক শ্রীপ্রমোদ-কুমার সেন এই সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। প্রায় চৌদ্দ জন কবি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়া স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। ইঁহাদের মধ্যে কতিপয় মহিলাও ছিলেন।

সভার প্রারম্ভে 'বিচিত্রা'র কর্ম্মসচিব শ্রীসুশোভন গুহ কবিদের স্বাগতম্ জানাইয়া এই প্রকার সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেন। 'প্রয়াগ বঙ্গ সাহিত্য সভা'র সহ-সম্পাদক শ্রীঅবনীনাথ রায় জন-সাধারণের পক্ষ হইতে এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কবিতা-পাঠের পর সমবেত সুধীবৃন্দের

আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় তরুণ কবিদের উৎসাহ প্রদান করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, কাব্যের মধ্য দিয়া মানব-হৃদয়ের সুন্দর অনুভূতি ও সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতা ফরমাস দিয়া তৈয়ারী হয় না। অন্তরের চাহিদা ও তাগিদে কাব্যের সৃষ্টি। সৃষ্টির একটা আনন্দ আছে। কবিদের দেখিতে হইবে তাঁহারা ইহাতে আনন্দ পাইতেছেন কি না। স্রষ্টার নিকট ইহাই যথেষ্ট। যাহা অন্তরের ভিতর আছে তাহাকে আন্তরিকতার সহিত প্রকাশ করাতেই স্রষ্টার রচনার সার্থকতা।

সরোজিনী দত্ত

সরোজিনী দত্ত গত ৩১শে বৈশাখ রবিবার পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি জেলা ২৪ পরগণার আড়িয়াদহ গ্রামের হেমন্ত মিত্রের কন্যা ও পানিহাটি নিবাসী হাটখোলা দত্ত বংশোদ্ভব নারায়ণচন্দ্র দত্তের পত্নী ছিলেন। যখন মেয়েদের

সরোজিনী দত্ত

মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না, তখন তিনি লেখাপড়া শিখেন। সরোজিনী নানাবিধ শিল্পকার্য্য, সূচীর কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিনী ও একজন সুগৃহিণী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল।

আসামের অরণ্যচারী (সচিত্র)—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র। ভারতী বুক ষ্টল, ৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

বইখানি শেষ করে শ্রীনলিনী ভদ্র তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর নূতনত্ব প্রকাশ করেছেন। 'বিচিত্র মণিপুর' থেকে সুরু করে 'আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী' 'পাহাড়িয়া কাহিনী' প্রভৃতি রচনায় তিনি ব্রহ্মসীমান্ত থেকে বাংলাসীমান্তের গারো পাহাড় পর্য্যন্ত ভূভাগের অধিবাসীদের বিশেষ বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান ভাব ও নীতির পরিচয় দিয়ে গেছেন। সেজন্য বাংলার সাহিত্যিকগণ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ভাস্কর-বর্ম্মার (৭ম শতাব্দী) সময় থেকে বাংলা ও আসাম পূর্ব্ব ভারতের ইতিহাসে সহকর্ম্মীরূপে একটি বিশিষ্ট লিপি ভাষা ও সাহিত্য গড়ে তুলেছে। তারই ফলে অহমিয়া সাধক শঙ্করদেব শ্রীচৈতন্যের যুগে-তাঁরই মত-ভক্তির প্লাবনে অহমিয়া জাতির প্রাণ উর্ব্বর করেছিলেন এবং সেই বঙ্গ-অহমিয়া সংস্কৃতির প্রবাহ অনার্য্য ইন্দোমোঙ্গোলীয় পার্ব্বত্য জাতিদের জীবনকেও গভীর ভাবে ও নূতন করেই গড়েছে। আসামের অরণ্যচারী মানুষ রক্তে, ভাষায় ও আচারে অনার্য্য হলেও ভারতীয় ভাব-ধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছে। ভারত-রাষ্ট্রের পূর্ব্ব প্রান্তে দেখি দুটি ভাষার প্রসার। বাংলা ও অহমিয়া—মূলত একই এবং লিপিগত ঐক্যেও সুসংবদ্ধ। এই ঐতিহাসিক সত্যটি মনে রেখে অহমিয়া ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালীদের সংযোগ রাখতে হবে এবং সেই সঙ্গে আর্য্যেতর পাহাড়ী ও অরণ্যচারীদের 'অলিখিত' সাহিত্যকেও সাহিত্যিক রূপ দিতে হবে। এই কাজটি বহু দিন ধরে নলিনীবাবু নীরবে করে চলেছেন বহু সংগ্রামের মধ্যে। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি প্রায় একক; তাঁর এই 'বঙ্গ-অহমিয়া মিলনব্রতে বহু নূতন লেখকের যোগদান করা উচিত। দুটি প্রতিবেশী প্রদেশ ও সাহিত্য আন্তরিক সহযোগিতার ভিতর দিয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠুক ইহাই প্রার্থনীয়। বাংলার প্রকাশকদেরও এ বিষয়ে সজাগ করাতে চাই যে, অহমিয়া সাহিত্য, সমাজ-জীবন, শিল্পাদির গ্রন্থেরও প্রকাশ বাংলা-ভাষায় যাতে বেশী করে হতে পারে সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়। সম্প্রতি শ্রীরাজমোহন নাথ তত্ত্বভূষণ আসামের প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্পাদির উপর একখানি উপাদেয় প্রামাণ্য গ্রন্থ ইংরেজীতে লিখেছেন বহু শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে, সেটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা উচিত।

আসামের আদিম জাতিদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য পরিবেশনে নলিনীবাবুও অদম্য উৎসাহী সাহিত্যিক। তাঁকে এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে পথিকৃৎ বলা যেতে পারে, তাঁর সাধনা সার্থক হোক্। আসামের অরণ্যচারীদের শুধু বর্ত্তমান সমস্যাই নয়, অতীতের ইতিহাসও গ্রন্থকার এই পুস্তকে উদ্ঘাটিত করেছেন। জাতীয় সংগ্রামে পাহাড়িয়ারা আহোম রাজাদের পক্ষে অকাতরে রক্তদান করেছে, সুতরাং স্বাধীন ভারতের দায়িত্ব এদের সম্বন্ধে কি হওয়া উচিত সে বিষয়েও আলোচনা করে গ্রন্থকার তাঁর রচনাটিকে কালোপযোগী করে তুলেছেন। এরূপ সময়োপযোগী সুলিখিত পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীকালিদাস নাগ

মহিলা—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

রবীন্দ্র-পূর্ব্ব যুগের যে দুই জন কবি বাংলার গীতিকাব্যে আপনাদের শক্তি, স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁহাদের অন্যতম। আর একজন বিহারীলাল। একদা সুধীজনসমাজে 'মহিলা' বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল।

"যাঁর প্রেম-সিন্ধু পরে মায়ার তরঙ্গভরে
বিশ্ব-বিম্ব বিহরে লীলায়!
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায়!"

অথবা

"হে প্রেম—হে সুধাময় প্রবাহ আত্মার!
অবিচিন্ত্য অবিতর্ক্য মহিমা তোমার!"

অথবা

"সুন্দর মুখের আজ্ঞা কে লঙ্ঘিতে পারে!"

অথবা

"গাবো গীত খুলি হৃদি-দ্বার,
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার!"—

এইরূপ কবি-বাক্য সেদিনের কাব্যরসিকের আনন্দ বিধান করিত। আজ লোকে 'মহিলা'র কবিকে ভুলিতে বসিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এই সময় 'মহিলা'র এই সংস্করণখানি বাহির করিয়া কাব্যামোদীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। 'ভূমিকা'টি মূল্যবান। ইহাতে সংক্ষিপ্ত জীবন-

সারদা-মঙ্গল—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় লিখিয়াছিলেন, "সাধারণের পরিচিত কণ্ঠস্বর শত সহস্র রচনা যখন বিনষ্ট ও বিস্মৃত হইয়া যাইবে সারদামঙ্গল তখন লোকস্মৃতিতে প্রত্যহ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে।" কবির সে ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে, "বিহারিলাল বঙ্গসাহিত্যের অমরগণের সহিত একাসনে বাস করিতেছেন।"

"কি জানি কি ঘুমঘোরে,
কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর!
নয়ন-অমৃত-রাশি প্রেয়সী আমার!"

সেদিন যেমন আজও তেমনি পাঠকের মনে অপূর্ব্ব অনুভূতি আনিয়া দেয়। সারদা-মঙ্গলের এই সুষ্ঠু সংস্করণখানি সকলের আদরের বস্তু হইবে। ভূমিকায় সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং গ্রন্থতালিকা কবিকে বুঝিতে সাহায্য করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ সাহা

অসাধারণ—আইভান টুর্গেনিভ। অনুবাদক—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।
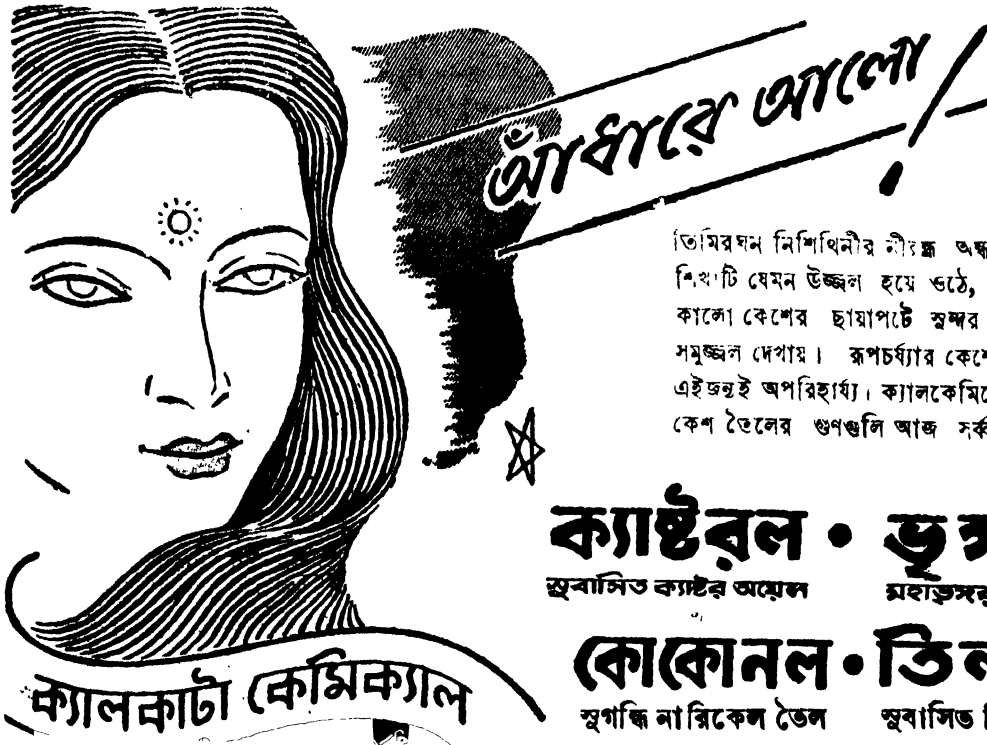
অসাধারণ—আইভান টুর্গেনিভের 'কুইয়্যার পিপল'-এ গ্রথিত 'ইয়াকভ পাশিন কভ' ও 'আন্দ্রে কলোশভ' এই দুটি বিখ্যাত গল্পের অনুবাদ। বলা বাহুল্য, বিখ্যাত সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহনের সাবলীল ভঙ্গী ও স্বচ্ছন্দ ভাষায় অনুবাদ সার্থক হইয়াছে।

রুশ-সাহিত্যে টুর্গেনিভ এক জন দিক্‌পাল। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া তদানীন্তন জনমনের আলেখ্য-চিত্রণে মনোনিবেশ করেন। তখন রুশসমাজের তটে সবেমাত্র ভাঙ্গনের ঢেউ আসিয়া আঘাত করিতেছে, পুরাতন জীবনধারার সঙ্গে নূতনের সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে, এই বিচিত্র সন্ধিক্ষণের আভাস টুর্গেনিভের রচনায় পাওয়া যায়। 'কুইয়্যার পিপল'-এর গল্প দুটিতে অবশ্য এ ভাঙ্গনের ইঙ্গিত নাই, তথাপি প্রেমের বিচিত্র প্রকাশে ইহার সকরুণ সুর মনের কোণে আঘাত করে এবং আঘাত দিয়াই অনুভূতির ক্ষেত্রটিকে রাগবিস্তারের মত রসে ও মাধুর্য্যে অভিষিক্ত করিয়া দেয়। পাশিন কভ, যাবরিচ, কলোশভ, সোফিয়া, ভারিয়া প্রভৃতি চরিত্র দেশকাল-পাত্রাতীত মহিমায় উদ্ভাসিত। জাতিধর্ম্মের গণ্ডীমুক্ত এই সব চরিত্র টুর্গেনিভের শিল্পসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কংগ্রেসের ইতিবৃত্ত—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য ২৲, পৃষ্ঠা ১৫৩।

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দান অপরিসীম। লেখক ২৬টি অধ্যায়ে এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে কংগ্রেসের কর্ম্মপ্রচেষ্টার কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই আলোচনায় কংগ্রেস-পূর্ব্ব রাজনৈতিক আন্দোলনেরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) প্রথম বিশ বৎসর পর্য্যন্ত কংগ্রেসের প্রভাব মধ্যবিত্ত তথা শিক্ষিতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার "স্বদেশী আন্দোলনের" (১৯০৫) পর হইতে কংগ্রেসে গণসংযোগ আরম্ভ হয়। গান্ধীজীর হাতে পড়িয়া ইহা এক নূতন পথে চালিত হয়। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট অর্থাৎ স্বাধীনতালাভ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের ইতিহাস

মহাত্মাজীর বিরাট নেতৃত্বের ইতিহাস। খুব সংক্ষিপ্ত হইলেও মোটামুটি কোন বিষয়ই লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নাই। এজন্য পুস্তকখানি নির্ভরযোগ্য হইয়াছে। পুস্তকের শেষের দুই অধ্যায়ে 'জাতীয় পতাকা' ও 'জাতীয় সঙ্গীতে'র ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষে কংগ্রেসের ৫৪টি সাধারণ ও বিশেষ অধিবেশনের সভাপতিগণের নাম, স্থান ও তারিখ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ল্যালেগ্রো ও এল্ পেন্সারসো—শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৩, দর্জ্জিপাড়া বাই লেন। কলিকাতা—৬। মূল্য ৷৷০।

বিদেশী কাব্যের ভাবগ্রহণে সহায়তার জন্য অনুবাদের প্রয়োজন আছে। আলোচ্য অনুবাদ-কাব্যের ভাষা মোটের উপর মন্দ নহে, কিন্তু স্থানে স্থানে বড়ই আড়ষ্ট। "ললাটকুঞ্চনলিপ্সী চিন্তা বাঙ্গ করি" অথবা "তীব্র উপাসনাকারী স্পষ্টধর্ম্ম গীতালাপী" প্রায় অর্থহীন। ছাপা ভাল নয়। পৌত্রসহ গ্রন্থকারের ছবিখানি, না দিলেই ভালো হইত।

ডিঙি—এনামুল হক। তিলুটিয়া, বাহিরী, বীরভূম। মূল্য ২৷০।

লেখকের অনুভূতিশীল সরস হৃদয়ের পরিচয় পাইলাম। বাহিরের সাম্প্রদায়িক গণ্ডী কবি-মনকে বাঁধিতে পারে না, তাহাও দেখিলাম। শ্যাম ও শ্যামা বাঙ্গালীর কল্পনাকে কতকাল ধরিয়া অধিকার করিয়া আছে। সে প্রভাবকে অস্বীকার করা, বস্তুতঃ, জাতীয় রস-সম্পদ্ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করা। গ্রন্থকার তাহা করেন নাই। কবিতাগুলি মনোরম।

ইক্‌বাল—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। রেনেসাঁস পাব্লিকেশন্স। ঢাকা। মূল্য ১৷০।

দেশের কৃতী ব্যক্তিদের পরিচয় মাতৃভাষার মধ্য দিয়া যত পাই ততই মঙ্গল। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আজ চলিতেছে কেবল দলাদলির পালা, ভাবরাজ্যে হয়তো মানুষের মিলন-পথের সন্ধান মিলিতে পারে। ইক্‌বাল ভারতের অন্যতম প্রধান কবি। তাঁহার মূল উর্দ্দু রচনা পড়িবার সুযোগ অনেকেরই নাই। ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র ন্যায় পণ্ডিত লোকের কাছে এমন একজন শক্তিমান্ কবির কথা শুনিতে অনেকেই আগ্রহবোধ করিবেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ—অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৮। পৃ. ২৬৬। মূল্য ৭৲।

অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে "গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেক্‌চারার" রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন, দীর্ঘ সাত বৎসর পরে তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই পুস্তকখানির চতুর্থ অধ্যায় হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে কালের ও ঘটনাপরম্পরার ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে, তাহা লইয়া আরও কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহার উপকরণও সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম তিনটি অধ্যায়, অর্থাৎ "নাটকের উৎপত্তি—প্রাক্-আর্য্যযুগ ও আর্য্যযুগ," "বাংলা নাটকের প্রাচীন-ইতিহাস উদ্ধারের উপায়" এবং "বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশ মধ্যযুগ" বসু মহাশয়ের সম্পূর্ণ নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ফল। তিনি এই তিন অধ্যায়ে বাংলা নাটক সম্বন্ধে যে থিওরী বা তত্ত্ব খাড়া করিয়াছেন, গ্রন্থের শেষ অংশ তদনুরূপ রচিত। এই তত্ত্ব যাঁহারা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিবেন না, তাঁহারাও অধ্যাপক বসুর বিশ্লেষণ ও সমীকরণ প্রচেষ্টার প্রশংসা করিবেন। বইখানি বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ্য। এই গ্রন্থ প্রবীণ লেখকের সারা জীবনের ব্যক্তিগত সাধনা ও অনুসন্ধানের ফল।

ব.

সদানন্দের বৈঠক

পেট্রলের কুপন তো ১লা জুলাই থেকে লাগবে না—অন্ততঃ পক্ষে কলিকাতার এলাকায় সেই ব্যবস্থা। তরুণ-মহলে এরই মধ্যেই বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছে। রাঁচি-হাজারীবাগ, চিটপালুঘাট, হুড়্‌, গয়া, বেনারস থেকে কাংড়া, জম্মু, শ্রীনগর পর্য্যন্ত কল্পনার দৌড় চলেছে, কিন্তু ওদিকে "মূলে হাবাত" হয়ে আছে গাড়ী টায়ারের অবস্থায়। কালোবাজারের কালাচাঁদের দলের অবিশ্যি ভাবনা নেই, তাঁদের চোরাই টাকায় তো এমনিতেই ছাতা ধরেছে—এক যা ভয় ইন্‌কাম-ট্যাক্সের পেয়াদার কাছে। তা সেল্‌স ট্যাক্সের ব্যবস্থা যেভাবে হয়েছে সেইমত যদি ওটারও হয় তবে এবার পুজোয় তাদের মোটর-'টুর' আটকায় কে?

এদিকে অন্য পাঁচ জনের জল্পনা-কল্পনা শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় আকাশকুসুমের মত বাতাসেই মিলিয়ে যাবে। আমদানী কণ্ট্রোল ডলার এক্সচেঞ্জের ঠেলায় নতুন গাড়ীর দাম এমনিতেই আগুন, তার উপর আবার ব্ল্যাক-মার্কেটের দালালী আছে, কাজেই নতুন গাড়ীর কথা ভাবাই চলে না। পুরোণো গাড়ীর টায়ার চাই—সেখানেই তো মস্ত ফাড়া, চারটে টায়ারের দামেই তো-চক্ষুস্থির। তার ওপর আছে গাড়ীর মেরামতি এবং ওভারহল, সেখানে তে ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রী! কাজ যা হোক বা না হোক, বিলটা হাজার দু' হাজার হবেই। সব জড়িয়ে আগেকার দিনের একটা ছোট গাড়ীর দাম বরাবর খরচ। তাতেও ভরসা নেই, কেন না মোটর কারখানাগুলির অধিকাংশেই এখন যত লম্বা বিল হয় কাজ হয় তত কম।

সত্যিই যেন এই মোটরের কারখানাগুলি হয়েছে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ। টাকা ফেলো, গাড়ী দাও, যদি কপালে থাকে আস্ত গাড়ী ফেরত পাবে। নইলে খোঁড়া গাড়ী কানা হয়ে ফিরবে, তার ছোট বড় পার্টগুলি চুরি-বদলী হয়ে, পুরাণো দোষের বদলে নতুন রোগ নিয়ে আসবে। যদি বল কেন এমন হ'ল তবে আবার পেসারতের অঙ্কই বেড়ে চলবে। এই তো হ'ল অবস্থা।

কাজেই ন' মণ তেল পোড়াবার যদিই বা ব্যবস্থা হয়েছে রাধা তাতেও নাচবে না—অর্থাৎ গাড়ী তাতেও চলবে না।

* * *

রবীন্দ্র-সঙ্গীত এখন প্রায় দশকর্ম্মের অংশ হয়ে এসেছে। জাতীয় সঙ্গীত থেকে শ্রাদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত, বৈঠকে-আসরে সভায়-মজলিশে, মাঠে-ঘাটে, তারে-বেতারে, সুরে-বেসুরে দিবারাত্র রবীন্দ্র-সঙ্গীত সকল দিকে শোনা যায়।

আপনারা বলবেন, "এ তো আনন্দের কথা, এত দিনে দেশের লোক কবিসম্রাটের অমর প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান দিচ্ছে।" সেটা নেহাৎ ভুল নয়, কিন্তু এর আরও একটা দিক আছে যেটা ভুলে গেলে চলবে না। সকল কাজের মধ্যেই যেমন একটা শৈলী সংযমের ধারা আছে, রীতিপদ্ধতি আছে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতেও ঠিক তাই। বরঞ্চ বেশী।

আজ এক দিকে ভাবের তোড়ে কেউ রবীন্দ্রনাথের গানের ছন্দ-তান-লয় ভেঙে ভাসিয়ে বেতারে ঢেউ খেলাচ্ছেন, কেউ বা নিজের কারিগরি দেখাতে গিয়ে সুরে বেখাপ্পা জট পাকিয়ে নিজে বেসামাল হচ্ছেন এবং সমঝদারকে ক্ষুন্ন করছেন। কচিৎ কয়েকজন রবীন্দ্র-সঙ্গীত শ্রদ্ধার সঙ্গে শিখে সংযতভাবে গেয়ে কবিগুরুর স্মৃতির সম্মান অক্ষুন্ন রাখছেন।

যাঁরা আমাদের মত শৈশবকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে এসেছেন, তাঁরা জানেন রবীন্দ্রনাথ গানের কথা ও ছন্দের ওপর কতটা জোর দিতেন। কবির পরম আত্মীয় ও প্রিয় শিষ্য—আমাদের দিনুদাদা—স্বর্গত দিনেন্দ্রনাথ কথায় কথায়, গানের প্রত্যেক পদে, এই নিয়ে অতি নিখুঁত ভাবে শিখিয়ে ছাড়তেন। আজ কটা গানের কথা বোঝা যায়, যদি না কেউ গানের আরম্ভের আগে বলে দেয় যে কি গান গাওয়া হবে?

তবে রক্ষে এই যে এখনও দেখি এমন কয়েকজন আছেন যাঁরা কবিগুরুর মর্য্যাদা রক্ষার চেষ্টা করছেন। তাঁদের গান শুনলে মনে এখনও আনন্দ পাই। সম্প্রতি গ্রামোফোনে যে সব রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড হয়েছে তার মধ্যে (N. 31201) একটিতে সত্য চৌধুরীর গাওয়া দুটি গান, "তোমার হল শুরু" এবং "নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জ ছায়ায়" সেই রকম একটি। গায়কের স্বর সুর ও কথার উচ্চারণ সবই সুন্দর। আমরা এঁর গান শুনে যথার্থ আনন্দ পেয়েছি।

আর আধুনিক গান? কি বলব, তরুণ হলে হয়ত মন উচ্ছ্বাসে ভরে যেত। এইমাত্র বলতে পারি যে আমরা ও রসে বঞ্চিত। তবে কচিৎ কদাচিৎ শচীন দেববর্ম্মণের মত দুই এক জন সুর-স্বরের ইন্দ্রজালে আমাদের মোহিত করে দেন। গ্রামোফোনে কুমার শচীন্দ্রের নূতন রেকর্ডে (P. 11908) আমরা অনেক দিন পরে আবার আনন্দ পেয়েছি।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

বিষয়-সূচী—শ্রাবণ, ১৩৫৭

বিবিধ প্রসঙ্গ— ২৮৯—৩০

মুদ্রারাক্ষস ও মগধের রাষ্ট্রবিপ্লব—
ডক্টর শ্রীসুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত
এম-এ, পিএইচ্-ডি ... ৩০

বাঁধ (উপন্যাস)—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত ... ৩১

সত্যপীরের কথা—
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দীশর্ম্মা) ৩১

বাংলার পট (সচিত্র)—শ্রীঅমূল্যগোপাল সেন ... ৩২

গুজরাটের প্রাচীন জৈন-গ্রন্থাগার (সচিত্র)—
শ্রীবিমলকুমার দত্ত, এম-এ ... ৩২

চীন দেশের কৃষক (সচিত্র)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র ... ৩২

কাশ্মীর-রাজসভায় বাঙ্গালী পণ্ডিত—
অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ... ৩২

অপর্ণা (গল্প)—শ্রীননীমাধব চৌধুরী ... ৩৩

পূর্ব্বে

এত বেশী

আর হয় নাই **এত অল্পে**

দিনের পর দিন অনেক মাস অবধি কামায় আনন্দ পাবেন এই সাবানে। অন্য যে কোন-টির ও সহিত তুলনায় ইহা শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে... বিশুদ্ধতম ও আরামপ্রদ ভেষজ তেল থেকে তৈরী. এতে পাবেন স্থায়ী মাখনের মত ফেনা ... বিশুদ্ধতম নির্ম্মল, তৃপ্তিদায়ক সুগন্ধ।

আপনি নিজেই দাড়ি কামাতে গোদরেজ সাবান ব্যবহার ক'রে সন্দেহ দূর করুন। গোদরেজই সর্ব্বপ্রথম ভেষজ তেলের সাবান তৈরী করে।

দ্রুত

ও আরামপ্রদ

কামানর জন্য
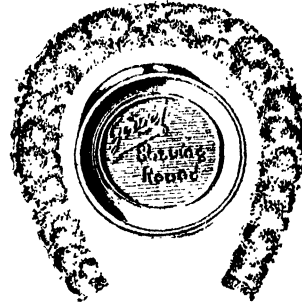
ভারতে ও বিদেশে অসংখ্য সেলুনের প্রিয় এই "রাউণ্ড" এতেই লক্ষ লক্ষ খরিদার নিশ্চিন্ত তুষ্ট হন।

• টাকায় এক ডজন

গোদরেজের তৈরী অন্যান্য সামগ্রী
প্রসাধন সাবান—গ্লিসারিন—কেশতৈল
ইউ ডি কোলন্।

শতকরা ১০০ ভাগ জান্তব চর্ব্বি বর্জ্জিত বলিয়া গ্যারান্টী দেওয়া

গোদরেজ সোপস, লিঃ—কলিকাতা: ২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড;
বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এবং পূর্ব্ব পাকিস্থানের অফিস।

বিষয়-সূচী—আষাঢ়, ১৩৫৭

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়—স্বদেশে ও বিদেশে—
শ্রীকালিপ্রসাদ ঠাকুর ...

চিত্তরঞ্জন কারখানা (সচিত্র)—শ্রীনীলিমা মজুমদার

প্রাচীন যুগে পশ্চিম সুন্দরবন—শ্রীকালীদাস দত্ত ...

সাত লক্ষ গ্রাম—শ্রীরেণু দাসগুপ্তা, এম-এ ...

জাগর (কবিতা)—শ্রীঅরুণা দেবী ...

প্রাচীন বাংলা-কাব্যে কুটিরশিল্প—
শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ...

তবু (কবিতা)—শ্রীঅধীর দাস ...

আকাশ ও নীড় (কবিতা)—শ্রীকরুণাময় বসু ...

বিহারী সরকার (গল্প)—শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...

তখন আসিও তুমি (কবিতা)—শ্রীঅমলেন্দু দত্ত ...

তাজমহল (কবিতা)—শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় ...

হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় ও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় (সচিত্র)—
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ...

প্রবাসী

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য :—

দেশী সডাক বার্ষিক মূল্য ৭।০ ; ঐ যাণ্মাসিক ৩৸০ ; ঐ প্রতি সংখ্যা ।৶০। বিদেশী সডাক বার্ষিক মূল্য ১৩।০ বা ২১ শিলিং; ঐ যাণ্মাসিক ৬৸০ বা ১০। শিলিং, ঐ প্রতি সংখ্যা ১ শিলিং নয় পেনী মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসর বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। টাকা মনিঅর্ডারে অগ্রিম পাঠানোই ভাল, বাহিরের ব্যাঙ্কের চেকের সঙ্গে অতিরিক্ত ।৶০ ব্যাঙ্ক কমিশনও দেয়। প্রবাসী বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। যথাসময়ে প্রবাসী না পৌঁছিলে ১৫ তারিখের ভিতর স্থানীয় ডাকঘরের রিপোর্ট ও নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ, তাঁহাদের চাঁদা যে সংখ্যার সহিত নিঃশেষ হইবে, সেই সংখ্যা পাইবার পর ২০ দিনের ভিতর পুনর্ব্বার চাঁদা বা প্রবাসী লইতে অনিচ্ছাজ্ঞাপক পত্র না পাঠাইলে, তাঁহারা পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃতে লইয়া চাঁদা দিতে ইচ্ছুক এই বিশ্বাসে ভিঃ পিঃ প্রেরণ করা হয়। চিঠিপত্র বা টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ না করিলে কার্য্যসাধনে গোলমাল অবশ্যম্ভাবী।

বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য :—

মাসিক মূল্য—সাধারণ পূর্ণ একপৃষ্ঠা (৮ইঃ × ৬ইঃ) ৬০৲

„ „ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা (৪ইঃ × ৬ইঃ)
বা এক কলম (৮ইঃ × ৩ইঃ) ৩২৲

„ „ সিকি পৃষ্ঠা (২ইঃ × ৬ইঃ)
বা অর্দ্ধ কলম (৪ইঃ × ৩ইঃ) ১৮৲

„ „ অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা (১ইঃ × ৬ইঃ)
বা সিকি কলম (২ইঃ × ৩ইঃ) ১০৲

বিশেষ বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের মূল্য পত্রে জ্ঞাতব্য

প্রবাসী প্রকাশিত হইবার অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে 'বিজ্ঞাপন' অগ্রিম মূল্যসহ কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। মূল্যসহ বিজ্ঞাপন প্রবাসী প্রকাশিত হইবার অন্ততঃ ১০।১৫ দিন পূর্ব্বে কার্য্যালয়ে পৌঁছিলে প্রুফ দেখাইবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রুফ দেখার দোষে যদি কোন ভুল থাকে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি। যাঁহারা বিজ্ঞাপনের প্রুফ দেখার ভার আমাদের উপর দিবেন, তাঁহারা সামান্য ভুল-ত্রুটির জন্য অভিযোগ করিলে গ্রাহ্য হইবে না। এক বৎসরের জন্য কণ্ট্র্যাক্ট করিলে এবং বৎসরের সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম জমা দিলে টাকায় ৵০ হিসাবে বাদ দেওয়া হয়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—প্রবাসী কার্য্যালয়

Lipton's
Flowery Orange
Pekoe
LIPTON'S
HIMALAYAN BLEND
CHOICE
DARJEELING
TEA
লিপটন
মানে
ভালো চা
LTX-180

গোরস্থান

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বাংলার পট

দুর্গা পট। বাঁকুড়াতে প্রাপ্ত

কৃষ্ণলীলা পট। বীরভূমের পটুয়ার অঙ্কিত

সংগ্রহ—আশুতোষ মিউজিয়ম

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫০শ ভাগ
১ম খণ্ড } শ্রাবণ, ১৩৫৭ { ৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কোরিয়ায় যুদ্ধ

লোকজগৎ অতি ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধ ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে। অন্য দিকে কম্যুনিষ্ট চীনও চঞ্চল হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে এবং দক্ষিণ-ইউরোপে বুলগেরিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে সংঘর্ষের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। এখন যে কোন মুহূর্ত্তে তৃতীয় মহাসমরের বাড়বানল জ্বলিয়া উঠিতে পারে। যদি তাহা জ্বলে তবে এইবার সভ্যতা ও কৃষ্টির লেশমাত্র পৃথিবীতে থাকিবে কিনা সন্দেহ।

বহির্জগৎ সম্পর্কে যে কূপমণ্ডুক বৃত্তির প্রভাবে আমরা পাঁচ শত বর্ষাধিক কাল দাসত্ব ভোগ করিয়াছিলাম, আজ স্বাধীনতা ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারই পুনরাবির্ভাব এদেশের লোকসাধারণের মধ্যে দেখা দিয়াছে। বোধ হয় স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা অর্জ্জনের পূর্ব্বেই স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্তির ফলে ইহা হইয়াছে। দেশে দুঃখদৈন্য কষ্ট সবই আছে ইহা সত্য, কিন্তু তৃতীয় মহাসমরের ভীষণ বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যের কারণ নিদারুণ অজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না।

এই বিষম প্রলয়ের সন্ধিক্ষণে পণ্ডিত নেহরুর শান্তি-প্রচেষ্টা একমাত্র ক্ষীণ আলোকরশ্মি। তাঁহার উদ্যোগের পিছনে সমস্ত দেশবাসীর সমষ্টিগত শুভেচ্ছা থাকা এখন একান্তই প্রয়োজন।

যখন জাপানী সম্রাট্ হিরোহিতো গত বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করিতে নির্দ্দেশ করেন তখন কোরিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত জাপানী সৈন্যদের দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় তাহাদের আত্মসমর্পণ গ্রহণের ব্যবস্থার সুবিধার জন্য। ৩৮ অক্ষাংশের উত্তরে অবস্থিত জাপানী সৈন্য সোভিয়েট সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করে; ইহার দক্ষিণে অবস্থিত সৈন্য করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট। কি কুক্ষণে এই ভাবে কোরিয়া দেশকে ভাগ করা হইয়াছিল! শান্তির পাঁচ বৎসরের মধ্যেও সেই কৃত্রিম ভাগ-রেখা মুছিতে পারা গেল না। এই দেশ বিভক্ত করার পরে এই কয় বৎসরের মধ্যে উত্তর কোরিয়া সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট আদর্শে এবং দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিনী গণতন্ত্রের আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছে।

দুই প্রবল শক্তিপুঞ্জের বিরোধ ও প্রতিযোগিতার জাঁতা-কলের মধ্যে পড়িয়া এই ক্ষুদ্র দেশের আড়াই কোটি নরনারী শান্তি ও স্বস্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এত দিনে অর্থ দিয়া সৈন্যবাহিনীর সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া এবং সৈন্যদল, যন্ত্রাস্ত্র ও বিমানবাহিনী পাঠাইয়া সক্রিয়ভাবে দক্ষিণ কোরিয়া সাধারণতন্ত্রকে সাহায্য করিতেছে; সোভিয়েট রাষ্ট্র কি করিতেছে তাহা কেহ জানে না; প্রসিদ্ধ "লৌহ যবনিকার" অন্তরালে নিশ্চয়ই ইতিপূর্ব্বেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ও আপনার মনের মত করিয়া প্রায় এক কোটি নরনারীকে সংগঠিত করিয়াছে। একটা মার্কিনী হিসাবে দেখিলাম যে দক্ষিণ কোরিয়া গণতন্ত্রের অধীনে প্রায় ৫০।৬০ হাজার সৈন্যসামন্ত আছে; তাহাদের যুদ্ধের সাজসজ্জা অতি সামান্য।

কোরিয়ার এই যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকবর্গের কৌতূহল হওয়ার স্বাভাবিক কারণ ত আছেই, উপরন্তু এই যুদ্ধ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় মহাযুদ্ধে পরিণত হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা তৎসম্বন্ধে বিশ্বব্যাপী আশঙ্কায় ভারতবাসীও চিন্তাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর মন্ত্রিসভা উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী রাষ্ট্র বলিয়া ধিক্কার দিয়াছেন; সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দুইটি প্রস্তাবই গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবে স্বস্তি-পরিষদ বলিয়াছেন যে, এই আক্রমণকারীকে ঠেকাইতে হইবে; পণ্ডিত নেহরুর মন্ত্রিমণ্ডলী ইহাতেও সায় দিয়াছেন, তবে এই সায় দেওয়ার অর্থ সক্রিয়ভাবে সমরাঙ্গনে অগ্রধারণ কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠায় ভারত সরকার বলিয়াছেন যে বর্ত্তমানে তাঁহারা শান্তির পথই খুঁজিবেন।

কিন্তু আমরা যত দূর বুঝিতে পারি তাহাতে ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক এই ব্যাপারে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। তাহার একটা কারণ আছে। তাহারা ভাবিতেছে যে, সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে দুই-তিন দিনও বিলম্ব করিল না, আর কাশ্মীরের ব্যাপারে গড়িমসি করিয়া আড়াই বৎসর কাটাইয়া দিল! পাকিস্থানের স্বীকৃতি সত্ত্বেও এই রাষ্ট্রকে "আক্রমণকারী" বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিল না। এই পার্থক্যের কারণ আমরা জানি। সেই তিক্ত আলোচনা

গ্রহণ করিব না। এরূপ অভিজ্ঞতাই মানুষের মনে উচ্চ আদর্শের প্রতি অবিশ্বাস জন্মায়।

কোরিয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে মার্কিন সরকারের প্রচার-বিভাগ কর্তৃক যে সংবাদাদি পরিবেশিত হইয়াছে তাহা এই :

২৫শে রবিবার ভোর ৪টায় উত্তর কোরিয়ার সুসজ্জিত বাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ার সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রের উপরে আক্রমণ আরম্ভ করে। অংজীন, কায়সুং ও চুনিসং এই তিনটি জায়গায় স্থল সৈন্যদল ৩৮শ সমান্তরাল সীমানা অতিক্রম করিয়া আক্রমণ চালায়। জাগমুন্ধে সন্নিকটবর্ত্তী সমুদ্রতীরে তাহাদের জল ও স্থল বাহিনী অবতরণ করে এবং রাজধানী সিউলের সমীপবর্ত্তী বিমান-ঘাঁটি কিম্পোর উপরে উত্তর কোরিয়ার হানাদার বিমান আসিয়া হামলা করে। এই সংবাদ দিয়াছেন স্বস্তি-পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রতিনিধি আর্ণেষ্ট গ্রোস ২৭শে জুন তারিখে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিন একিসন ২রা জুলাই বলিতেছেন,

"বর্ত্তমান ঘটনাবলীর সুরু হয় মাত্র ৪।৫ দিন পূর্ব্বে ; গত শনিবার শেষরাত্রে (কোরিয়ার সময়) কোন প্রকার সংবাদ না দিয়া এবং কোন প্রকার কারণ না থাকা সত্ত্বেও কোরিয়ার উত্তরাঞ্চলের কম্যুনিষ্ট বাহিনী দক্ষিণ কোরিয়া গণতন্ত্রের উপর সংঘবদ্ধভাবে পুরাদস্তর সামরিক অভিযান আরম্ভ করে। কামান হইতে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের পর কম্যুনিষ্ট পদাতিক বাহিনী তিন স্থানে অষ্টত্রিংশ সমান্তরালবর্ত্তী সীমারেখা অতিক্রম করিতে আরম্ভ করে। অন্য দিকে প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণে পূর্ব্ব উপকূলের কয়েক স্থানে উভচর-যান কম্যুনিষ্ট সৈন্য নামাইয়া দিতে থাকে।

"সীমান্ত হইতে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল মাত্র ৩৮ মাইল দূর।

"রাষ্ট্রদূত মিশিওর টেলিগ্রাম যখন মার্কিন-রাষ্ট্র বিভাগের 'কেবল রুমে' পৌছিল তখন শনিবার রাত্রি ৯—২৬ [মার্কিন সময়]। উহার মাত্র কয়েক মিনিট পূর্ব্বে মার্কিন রাষ্ট্র-বিভাগ এ সম্বন্ধে সিউলে একটি সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান, মার্কিন সংবাদপত্রে সশস্ত্র আক্রমণ সম্বন্ধে যে প্রথম সংবাদ প্রেরণ করা হয় তাহার উপর নির্ভর করিয়াই রাষ্ট্র-বিভাগ প্রকৃত সংবাদ জানিতে চাহিয়া তার করেন।"

কোরিয়া যুদ্ধে এখনও পর্য্যন্ত উত্তর কোরিয়ান সৈন্যেরা অগ্রসর হইতেছে, মার্কিন সৈন্য পিছু হটিতেছে। তবে মার্কিন বোমারু বিমানের ক্রমাগত বোমাবর্ষণের জন্য উত্তর কোরিয়ার অভিযান যতটা দ্রুত হওয়ার কথা ততটা হইতে পারিতেছে না। উত্তর কোরিয়ার প্রায় এক লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য সম্মুখ যুদ্ধে নামিয়াছে ; প্রায় দুই শত ৪০ টন এবং ৬০ টন ট্যাঙ্ক তাহারা নামাইয়াছে। ছোট ট্যাঙ্কের গতি মার্কিন সৈন্যেরা প্রতিহত করিতে পারিতেছে, কিন্তু বড় ট্যাঙ্ক আটকাইবার উপযুক্ত সরঞ্জাম তাহাদের হাতে এখনও পৌছায় নাই ইহা বুঝা যায়। বর্ত্তমানে আমেরিকার সৈন্য ও ট্যাঙ্ক সংখ্যা উত্তর কোরিয়ানদের এক-চতুর্থাংশ মাত্র। অবশ্য উপযু[ক্ত] সংখ্যক সৈন্য এবং ট্যাঙ্ক রণাঙ্গনে নামাইতে আমেরিকার বে[শী] অসুবিধা হইবে না এবং সময়ও খুব বেশী লাগিবে না। সুতর[াং] এই যুদ্ধ যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা বলা খুব কঠিন।

ইউ-এন-ও উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী বলি[য়া] অভিহিত করিয়াছে এবং তদনুসারে আমেরিকা ইউ-এন-[ও-র] পতাকাতলে পুলিস 'অ্যাকশনে' অবতীর্ণ হইয়াছে। এ[খন] প্রশ্ন, ইহার মীমাংসা কোথায় হইবে? আক্রমণকারী উ[ত্তর] কোরিয়া সৈন্যবাহিনীকে ৩৮ অক্ষাংশের অপর পারে তাহ[াদের] নিজের এলাকায় ঠেলিয়া দিলেই কি কর্ত্তব্য শেষ হইবে[?] আক্রমণকারীকে তাহার নিজের ঘরে ঢুকিয়া ঠেঙাই[য়া] আসিবার অধিকার ইউ-এন-ও হয়ত দাবি করিতে পা[রে] কিন্তু তাহা সমীচীন হইবে কি না বিবেচ্য। যুদ্ধের প্র[থম] কয়েকদিনের মধ্যেই দক্ষিণ কোরিয়ান সৈন্যবাহিনী প্র[ায়] একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে, এখন আমেরিকান ছাড়া অ[ন্য] কেহই রণাঙ্গনে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই অবস্থ[ায়] ইউ-এন-ওর পক্ষে হইলেও আমেরিকা যদি ৩৮ অক্ষাংশে[র] উত্তরে গিয়া আক্রমণকারীকে শাস্তি দিতে চায় তবে তাহা ই[উ-] এন-ওর অন্য সদস্যেরা সমর্থন করিবে কি না বলা কঠিন।

কোরিয়ার যুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীন প্রত্যক্ষভা[বে] এখনও একেবারে নীরব রহিয়াছে। টাস এজেন্সী মার[ফৎ] উত্তর কোরিয়ানদের বিজয়বার্ত্তা ও মার্কিন পরাজয় ঘো[ষণা] এবং উত্তর কোরিয়ান ইস্তাহার সবিস্তারে মস্কো রেডিও[য়] পাঠ ইত্যাদি ছাড়া রাশিয়া নিজে এবিষয়ে এখনও কিছু ব[লে] নাই। চীনও রহস্যজনকভাবে চুপ করিয়া আছে য[দি] কোরিয়া যুদ্ধকে চীনে তৃতীয় মহাসমরের প্রথম অঙ্ক বলি[য়া] মনে করিবার কারণ রহিয়াছে। কোরিয়ার রণক্ষেত্রে যুদ্ধ চলিয়াছে তার চেয়ে ঢের বেশী যুদ্ধ চলিয়াছে কূটনী[তি] ক্ষেত্রে। উভয় পক্ষে কে কি ভাবে দাঁড়াইতেছে তাহা স[ঠিক] বুঝিয়া উঠিবার মত তথ্য এখনও পাওয়া যায় নাই।

কংগ্রেসে দলাদলি

কংগ্রেসের দলাদলি এত দিনে একেবারে চরমে উঠিয়াছে[।] অন্ধ্র এবং পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস কমিটির নির্ব্বাচন উপলক্ষে[] হাইকোর্ট এবং জেলাকোর্ট প্রভৃতিতে মামলা সুরু হইয়াছে[।] কংগ্রেসের ইতিহাসে এই বস্তু নূতন। কংগ্রেস এত দিন রা[জ]নৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত ছিল, কিন্তু জাতীয় ন্যায় ধর্ম্ম[,] সংস্কৃতি এবং সুনীতির উপর তাহার বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত [ছিল] বলিয়া সমগ্র দেশের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সম[র্থ] হইয়াছিল। যত দিন কংগ্রেস লোককে কোন লাভের অ[াশা] দিতে পারে নাই, নিছক দুঃখ এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারি[ক] সর্ব্বনাশ ব্যতীত আর কোন প্রতিদানের কথা সম্মুখে তুলি[য়া] ধরিতে পারে নাই, তত দিন কংগ্রেসের স্থান ছিল দেশবা[সীর]

অন্তরের অন্তরতম স্থলে, তাহার হৃদয়ের মণিকোঠায়। সেদিন কংগ্রেসে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা জানিয়া বুঝিয়াই আসিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসে যোগদানের একমাত্র অর্থ ও তাৎপর্য্য সমগ্র ব্যক্তিগত জীবনের পরম ব্যর্থতা। এই ভাবে দুঃখ, লাঞ্ছনা ও ক্ষতির কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারাই ছিলেন কংগ্রেসের প্রাণ, কংগ্রেসকে তাঁহারাই বুকের রক্ত ঢালিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন, কোন পার্থিব প্রতিদানের আশা তাঁহারা রাখেন নাই। দেশবাসী কংগ্রেস বলিতে আজও ইঁহাদেরই বুঝে, তাই আজকালকার কংগ্রেসওয়ালাদের মধ্যে ইঁহাদের ছায়া না দেখিয়া চমকিয়া উঠে, অসন্তুষ্ট হয়, ক্রুদ্ধ হয়।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান দুর্গতির তারিখ ১৯২৩ সাল ধরিতে পারা যায়। ঐ সময় কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা, কাউন্সিল প্রবেশ লইয়া নো-চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্জারের দ্বন্দ্ব। এই সময়েই প্রথম কংগ্রেস স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানে ঢুকিয়া চাকুরি, কণ্ট্রাক্ট ও পৃষ্ঠপোষকতার মধুর স্বাদ পাইল। দাশ সাহেব এই সময়েই কংগ্রেসকে লাভের পথে পরিচালিত করিলেন, রাজনীতিতে পথের এবং পদ্ধতির মলিনতা বর্ত্তব্য নহে—এই নূতন শিক্ষার তিনি আমদানী করিলেন বিদেশ হইতে। এতদিন কংগ্রেসের প্রধান সার্থকতা ছিল এইখানে যে রাজনীতিক্ষেত্রেও পথের ও উপায়ের মধ্যে মলিনতা আনা চলিবে না, ন্যায় ও সুনীতির পথ কোন কারণে, কোন উপায়ের জন্য বর্জ্জন করা ত দূরের কথা উহা এড়াইয়া যাওয়াও চলিবে না। পাশ্চাত্ত্য রাজনীতির শিক্ষা—Nothing is unfair in love and war; পরে war-এর স্থলে politics বসিয়াছে এবং বিশ্ব-জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কংগ্রেস ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত এই কুশিক্ষা হইতে দূরে থাকিয়াছে। কংগ্রেস সম্বন্ধে বিদেশীদের, বিশেষতঃ পাশ্চাত্ত্য জগতের শ্রদ্ধার একটি প্রধান কারণ ছিল উপায় সম্বন্ধে কংগ্রেসের ন্যায়নিষ্ঠা—Purity of means। কংগ্রেসের এই মূলদেশে প্রথম আঘাত হানিল স্বরাজপার্টি এবং কাউন্সিল প্রবেশ ও কর্পোরেশন দখলের রাজনৈতিক বিজ্ঞদল। এই সময় হইতেই কংগ্রেসে ব্যক্তিগত ও দলগত সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের আবির্ভাব। এই যে ক্ষুদকুঁড়ার লড়াই সুরু হইয়াছে, যাহাকে ইংরেজীতে বলে fight for loaves and fishes, তাহাই দ্রুতগতিতে কংগ্রেসকে অধঃ-পতনের পথে টানিয়া আনিয়াছে। ৩৮ বৎসরে কংগ্রেসের যে ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল পরবর্ত্তী ২৭ বৎসরে তাহা একেবারে ধ্বংস হইয়াছে। আগে কংগ্রেসের লোক শুনিলে লোকে শ্রদ্ধায় মাথা নত করিত, আজ কংগ্রেসী দেখিলে চোর বলে, ঘৃণায় সরিয়া বসে। কংগ্রেসে আজ যাঁহারা মোড়লী করিতেছেন তাঁহাদের অধিকাংশই ১৯২৩-এর পরের আমদানী, তাই দেশের আজ এই দুর্দ্দশা।

কংগ্রেস নির্ব্বাচন বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটি

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র এবং রাজস্থান তিন প্রদেশ সম্বন্ধেই তীব্র মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং আদেশ দিয়াছেন যে, অন্ধ্র এবং পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত কংগ্রেসকর্ম্মী হাইকোর্টে মামলা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এক সপ্তাহের মধ্যে মামলা তুলিয়া লইতে হইবে নচেৎ তাঁহাদের কংগ্রেসের সভ্যপদ কাটা যাইবে। ভবিষ্যতে যাঁহারা কংগ্রেস নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আদালতে মামলা করিতে যাইবেন, মামলা রুজু করিবামাত্র তাঁহাদেরও সভ্যপদ বাতিল হইয়া যাইবে। এই তিরস্কারের প্রয়োজন ছিল এবং ইহা অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে। কংগ্রেস যত দিন সুনীতির সুদৃঢ় পথে অগ্রসর হইয়াছে তত দিন তাহাকে আদালতকে গ্রাহ্য করিয়া চলিতে হয় নাই, আজ কংগ্রেসকর্ম্মীরা আদর্শভ্রষ্ট ও নীতিভ্রষ্ট হইয়াছেন বলিয়া নিজেদের বিরোধকে আদালতের মামলার বিষয়বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা বন্ধ হওয়া একান্ত দরকার এবং এ বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটি উপযুক্ত দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে দলাদলির একজন প্রধান নায়ক ওয়ার্কিং কমিটিকে বলিয়াছিলেন যে, বিচারাধীন মামলা সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গেলে তাঁহারা আদালত অবমাননার দায়ে অপরাধী হইবেন। ওয়ার্কিং কমিটি এই ধৃষ্ট উক্তি যথোচিত তাচ্ছিল্যের সহিত উপেক্ষা করিয়া তাহার সমুচিত জবাব দিয়াছেন। কংগ্রেস নির্ব্বাচনী বিরোধে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, আদালতে কোন স্থান উহাতে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। ওয়ার্কিং কমিটিও তাহাই বলিয়া দিয়াছেন। আমরা বিদেশের রাজনৈতিক দলাদলির ইতরামি পূর্ণরূপেই শিক্ষা করিয়াছি, কিন্তু সেখানের Party disciplineরূপ দলমধ্যস্থ কঠোর সংযম একেবারেই বর্জ্জন করিয়াছি। বিদেশে এইরূপ ব্যাপারে আদালতে যাওয়ার কোনও দৃষ্টান্ত আমরা কখনো পাইয়াছি মনে হয় না।

কংগ্রেস পরিত্যাগ

কংগ্রেসের দলাদলিতে কোনদিকে ঠাঁই না পাইয়া এখন একদল লোক কংগ্রেস হইতে পদত্যাগ করিয়া সস্তা বাহাদুরী কিনিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। পদত্যাগকারীদের অবস্থা এক কথায় বর্ণনা করিয়া বলা যায় যে, জাহাজ যখন ডোবে তখন ইঁদুর সকলের আগে জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, ভাবে জাহাজ ছাড়িলেই বুঝি বাঁচিবে। পদত্যাগকারীদের অবস্থা হইয়াছে সেইরূপ। কংগ্রেসে ইঁহারা ঠাঁই পান নাই, অনেক চেষ্টা করিয়াও ক্ষুদকুঁড়া পাতে টানিতে পারেন নাই। নির্ব্বাচন আসন্ন, কংগ্রেস বদনামের ভারে ডুবিতেছে, ইহা দেখিয়া আগেভাগে সরিয়া পড়া বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিয়া ইঁহারা হয়ত আশা করিতেছেন যে, কংগ্রেস পরিত্যাগটাই

বুঝিবা আগামী নির্ব্বাচনে ইঁহাদের সর্ব্বপ্রধান পাথেয় হইবে। নিজের চামড়া বাঁচানো এবং ভবিষ্যতে রুটির টুকরা প্রাপ্তির মনোবৃত্তি ছাড়া ইঁহাদের কংগ্রেস পরিত্যাগে আমরা কোনরূপ নীতিজ্ঞান দেখিতেছি না। এই সঙ্গে উত্তর প্রদেশের কথা মনে পড়ে, সেখানকার বিদ্রোহী কংগ্রেসকর্ম্মীরা পদত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা নিজেদেরই খাঁটি কংগ্রেস কর্ম্মী বলিয়া দাবি করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে তাঁহারাই কংগ্রেসের প্রকৃত সেবক, কংগ্রেসের কর্ম্মসূচী তাঁহারাই অনুসরণ করিতেছেন, কংগ্রেসের ভিতরে যে পাপ ঢুকিয়াছে তাহা তাঁহারা ঝাঁটাইয়া বিদায় করিবেন, তাঁহারাই আবার প্রকৃত কংগ্রেস গড়িয়া তুলিবেন। কৈ, বাংলার কংগ্রেস হইতে যাঁহারা পদত্যাগ করিতেছেন তাঁহারা তো একথা বলিলেন না। তাঁহারা যদি একজোট হইয়া ভিতর হইতে কংগ্রেসকে সংশোধন করিতেন, নির্ভীক চিত্তে এই প্রতিষ্ঠানের দোষ-ত্রুটি সংশোধনে অগ্রণী হইতেন, আদর্শভ্রষ্ট-স্বার্থপর লোকদের দূর করিয়া দিয়া আবার কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতেন তবেই আমরা বুঝিতাম দেশপ্রেম তাঁহাদের মনে জাগ্রত আছে, সত্যই তাঁহারা দেশকে ভালবাসেন। স্বার্থচিন্তা ও স্বার্থের লোভ যেখানে না থাকে সেখানেই এই ধরণের চেষ্টা সম্ভব। দেশের সম্মুখে, কংগ্রেসের প্রকৃত সেবকদের সম্মুখে আমাদের প্রশ্ন—এমন লোক কি নাই যাহারা একত্র হইয়া কংগ্রেস হইতে দলাদলিপ্রিয় স্বার্থসর্ব্বস্ব শকুনির দলকে দূর করিয়া দিয়া কংগ্রেসকে আবার পুরানো নৈতিক বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন?

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি

কোরিয়া যুদ্ধের সংবাদ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি ব্যবসাকেন্দ্রে আবার যুদ্ধের সময়ের ন্যায় কোন কোন জিনিষের দারুণ ব্ল্যাকমার্কেট আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার বাজারে অনেকগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের দাম অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। সাগু শিশু ও রোগীর প্রধান খাদ্য, দশ দিনের মধ্যে উহার দাম চড়িয়া দেড় টাকা হইতে ৩৸০ আনা সের হইয়াছে। বার্লির দামও প্রায় দেড় গুণ বাড়িয়াছে। রবিনসন বার্লি কলিকাতায় তৈরি হয়, তথাপি তার দাম ১৪ দিনের মধ্যে ১৸০ হইতে ২৷৵০ আনা পাউণ্ড হইয়াছে। মশলার দাম অসম্ভব বাড়িয়াছে। লবঙ্গ, দারুচিনি, বড় এলাচের দর প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া হইতে যে সমস্ত জিনিষ আসে তাহাদের দরই বেশী চড়িয়াছে। কিন্তু তার বাহিরে অন্যান্য জিনিষও মূল্য বৃদ্ধি হইতে বাদ যায় নাই। ডালের দাম মণকরা ৫৲ টাকা বাড়িয়াছে। কাপড় কাচা সোডা, ধুনা, কর্পূর প্রভৃতিও বাড়িয়াছে। কর্পূরের দাম প্রায় তিন গুণ হইয়াছে। বাজারে এইভাবে একটা হঠাৎ চড়তি ভাব আসায় তরিতরকারীর দাম পর্য্যন্ত বাড়িতে সুরু করিয়াছে।

কলিকাতায় একটি বিরাট এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ আছে, উহার কর্ম্মচারী সংখ্যা প্রায় দেড় শত হইবে। এক জন আই-সি-এস্ স্পেশাল অফিসার এবং পুলিসের এক জন ডেপুটি কমিশনার ইহার কর্ত্তা। সাগু, মশলা প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া হইতে আসে, কাহারা আমদানী করে তাহাদের নাম এবং আমদানীর পরিমাণ কাষ্টমসের দৈনিক তালিকায় পাওয়া যায়। ঐ তালিকানুসারে লোক অনুসন্ধান করিলে এবারকার ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের ছাঁকিয়া বাহির করিতে এক সপ্তাহ সময় যথেষ্ট হওয়া উচিত। অথচ পুলিস যথারীতি নির্ব্বিকার বসিয়া আছে। জনসাধারণের এত বড় অসুবিধা যাহারা ঘটাইতেছে তাহাদিগকে ধরিবার এবং শাস্তি দিবার কোন ব্যবস্থা কি করা সম্ভব নয়? এই তিন বৎসরের মধ্যে ডজনে ডজনে আইন পাস হইল, কিন্তু ব্ল্যাকমার্কেট দমনের জন্য একটা আইন কিছুতেই পাস করানো গেল না ইহারই বা রহস্য কি?

একদল অর্থপিশাচ এইভাবে দেশের লোকের রক্ত শোষণ করিবে এবং সরকার নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবেন, এরূপ অবস্থায় দেশে অশান্তির আগুন এক দিন জ্বলিবেই—একথা আমরা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতেছি। আইন যাহাই হউক এবং হাইকোর্টের বিদগ্ধ চূড়ামণিগণ চুলচেরা বিচারে দেশে "হবুচন্দ্রের রাজ্য" স্থাপন যেভাবেই করুন, দেশের লোকের কষ্ট ও অসহায় ভাব আমাদের মনে বিষ ঢালিতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ভারতরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু গত মে মাসে তাঁহার মাসিক সংবাদপত্রসেবী সম্মেলনে বলিয়াছিলেন যে, নেহরু-লিয়াকৎ আলী চুক্তি করিবার জন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্র কোন প্রকার চাপ দেয় নাই। অথচ "নিউইয়র্ক টাইম্‌সের" বিশেষ সংবাদদাতা সি. এল. সুলজবার্গার করাচী হইতে একটি সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, যার সারমর্ম্ম ভারতীয় কোন কোন দৈনিক সংবাদপত্রে গত ১৩ই চৈত্র এইরূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল:

"যবনিকার অন্তরালে কোন কৌশলপূর্ণ কূটনীতির ফলে এবং লিয়াকৎ আলী খাঁ ও জবাহরলাল নেহরুর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার দ্বারা ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের মধ্যে এক পরিপূর্ণ যুদ্ধের সম্ভাবনাকে খুব অল্পের মধ্যে এড়াইতে পারা গিয়াছে। এই যুদ্ধ বাধিলে তাহা সম্ভবতঃ একটি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে পরিণত হইত।"

কিন্তু এই প্রশ্ন এখনও থাকিয়া যাইতেছে যে, এই চুক্তির ফলে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্রের সম্বন্ধ মধুরতর, ঘনিষ্ঠতর হইতেছে কি? জনাব লিয়াকৎ আলী যেরূপভাবে আমেরিকায় গিয়া ভারতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, কথাবার্ত্তায়, আকারে ইঙ্গিতে ভারতরাষ্ট্রকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সেই কৌশল লক্ষ্য করিয়া এই বিষয়ে ভরসা করা সহজ নয়। এবং এবম্বিধ প্রচারে বিশ্বাস স্থাপন না করিলে সুলজবার্গার কখনই বলিতে পারিতেন না:

"পাকিস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে দুই শতটি আধুনিক ধরণের শেরমান ট্যাঙ্ক ক্রয় করিতে এবং ভারতীয় বিমান বহরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পাকিস্থানী বিমান বহরের উন্নতি সাধন করিতে উদ্‌গ্রীব রহিয়াছে।"

সুলজবার্গের এই উক্তির পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক-বর্গের একাংশের সমর্থন আছে মনে করিলে অন্যায় হইবে না। সুতরাং ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দকে এখন হইতে সাবধান না হইলে পরে, অত্যন্ত পরে, অনুতাপ করিতে হইবে।

একটা কথা না বলিয়া পারিতেছি না। ভারতরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে দেশের লোকমতকে সত্য কথা বলিয়া শিক্ষিত করা হইতেছে না। ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী আন্তর্জাতিকতার প্রচার করেন সময়ে-অসময়ে। কিন্তু এই রাষ্ট্রের জনমতকে শিক্ষিত করিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই।

এই নীরবতা ও নিশ্চলতার সুযোগ লইতেছে সকলে—শত্রু-মিত্র সকলে। এই অবস্থার প্রতিকারের কোন চেষ্টা দেখিতেছি না। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর বন্ধুবর্গের মধ্যে সকলেই বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে জ্ঞানবিস্তারে একেবারে নিশ্চেষ্ট। অন্যান্য স্বাধীন দেশে কিন্তু সরকারের সাহায্যে নিরপেক্ষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এইরূপে জ্ঞানবিস্তারে অগ্রণী দেখা যায়। বৈদেশিক দপ্তরের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের নিকট আকারে ইঙ্গিতে অনেক কথা বলিয়া থাকেন নিজেদের নীতির সপক্ষে বলিবার জন্য; এই সব অভিজ্ঞ ব্যক্তি মন্ত্রগুপ্তি রাখিতে পারেন। আমাদের রাষ্ট্রে কি এরূপ লোকের এতই অভাব যে বিদেশী সংবাদপত্রের কল্যাণে আমাদের আন্তর্জাতিক বড়ের চাল সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতে হয়। ইহার ফলে আমাদের দেশ এই বিষয়ে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় আছে। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর বহুবার বিঘোষিত নিরপেক্ষ নীতির কল্যাণে আমরা ধোপার গাধার অবস্থায় পরিণত হইয়াছি।

সময় থাকিতে জনমতকে এই বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতী-পোষা প্রচার বিভাগ একটা আছে, দিল্লী হইতে প্রকাশিত একখানি মাসিক পত্র মাঝে মাঝে দেখিতে পাই; পররাষ্ট্র সম্বন্ধে তাহাতে আলোচনা পড়িতে হয় আমাদের; পত্রিকাখানির নাম *Foreign Affairs*; গালভরা নাম কিন্তু দেশী-বিদেশী রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে সমালোচনা অত্যন্ত কম থাকে; যাহা থাকে তাহা ভাসা-ভাসা। এই জন্য নেহরু গবর্ণমেণ্টের বিরোধী দলসমূহ এমন সব সমালোচনা করিয়া থাকে। এক দিকে পণ্ডিত নেহরুর অহমিকা, অন্যদিকে এরূপ সমালোচনার মধ্যে পড়িয়া জনমত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এই ভাবের মধ্যে বিপদের বীজ নিহিত আছে বলিয়া আমরা এত কথা লিখিলাম। ইহার প্রতিকার আবশ্যক। দেশবাসীকে সেইজন্য তৎপর হইতে হইবে।

কম্যুনিষ্ট বিশ্ব-বিপ্লব

"কম্যুনিজম্ রপ্তানীর দ্রব্য নয়", ইহাই ছিল নাকি লেনিনের মত, কোন দেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে ভাঙন ধরিলে প্রাক্-মার্কস জগতে কম্যুনিজমই সর্ব্বরোগহর হইতে পারে। এই কথা হয়ত লেনিনের সময় সত্য ছিল, কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারিগণ তাঁর মতানুসারে চলিতে পারিতেছেন না। সেইজন্যই আবার বিশ্বজয়ের কথা কম্যুনিষ্টদের মুখে ধ্বনিত হইতেছে এবং প্রত্যেক দেশের অর্থনীতিক সঙ্কটের সুযোগ লইয়া কম্যুনিষ্টরা ও তাহাদের সতীর্থেরা দেশে দেশে বিপর্যায় সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। গোপনে ও প্রকাশ্যে আয়োজন-উদ্যোগ করিতেছে।

এই সব চেষ্টার কেন্দ্রস্থল মস্কো নগরী, সোভিয়েট রাষ্ট্রের রাজধানী। সেই স্থান হইতে দিকে দিকে কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সম্প্রতি দিল্লীর "নিউজ ক্রনিকল" পত্রিকান্তম্ভে কম্যুনিষ্টদের বিশ্বব্যাপী কর্ম্মের একটা ছক্ কাটিয়া অবস্থার গুরুত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাই যে, "কমিনফর্ম্ম" নামে একটি সংস্থা রুমেনিয়ার রাজধানী বুখারেষ্টে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রচারকার্য্যের জন্য "পিপলস্ পাব্লিশিং হাউস" নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। "কমিনফর্ম্ম" কর্তৃক "চির-শান্তি" (For a Lasting Peace) নামে একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। "ওয়ার্লড্ ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস্", "পার্টিজেনস্ অফ পিস্", "ওয়ার্লড্স পিস্ কংগ্রেস", "ওয়ার্লড ফেডারেশন অব ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ", "ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জর্নালিষ্টস্", "উইমেন্স ডেমোক্রেটিক ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন", মনে হয়, এই "কমিনফর্ম্মের" অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হাত-পা।

এশিয়া মহাদেশে বুখারেষ্ট ও মস্কো উভয় নগরী হইতে নির্দ্দেশ আসে। "টাস্" সংবাদবাহী প্রতিষ্ঠান, "ট্রুড", "নিউ-টাইমস," "রেড ফ্লিট", "প্রাভদা" প্রভৃতি দৈনিক ও সাপ্তাহিক কম্যুনিষ্ট প্রচার যন্ত্রের অঙ্গ। ভারতরাষ্ট্রে প্রকাশ্য ও বর্ণচোরা যে সব প্রতিষ্ঠান বা সংবাদপত্র আছে তাহা জানিয়া রাখা ভাল। এই সম্পর্কে বোম্বাই নগরীতে চেকোশ্লোভাকিয়ার "ট্রেড মিশন" একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে বলিয়া মনে হয়; দিল্লীতে আছে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের দফতর, তার অঙ্গরূপে আছে—"টাস দিল্লী", "সোভিয়েট ফিল্ম" (বোম্বাই), ইহার অঙ্গ 'ফ্রেণ্ডস অব সোভিয়েট ইউনিয়ন', দিল্লী টাসের তাঁবে আছে "ইণ্ডো-সোভিয়েট জর্নাল" (পাক্ষিক), "ক্রশ রোডস" (সাপ্তাহিক, বোম্বাই), পিপলস পাব্লিশিং হাউস, বোম্বাই ও ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় আপিস। 'চায়না ডাইজেষ্ট'

নামে একখানি পত্রিকার সঙ্গে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের 'কারেণ্ট বুক হাউস' নামে প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধ আছে।

এ ছাড়া 'অল্ ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস', 'অল্ ইণ্ডিয়া পিস কন্‌ফারেন্স,' 'অল্ ইণ্ডিয়া ষ্টুডেণ্টস ফেডারেশন', 'প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েসন', 'ইণ্ডিয়ান্ পিপলস থিয়েটার', 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' (Women's Self-Defence League, Calcutta) পরস্পর গ্রথিত। বুখারেষ্ট হইতে প্রেরণা লাভ করে ইহারা। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্যুনিষ্ট কেন্দ্র (Cell) আছে, দিল্লী সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের দফ্‌তরের মাধ্যমে মস্কোর সঙ্গে এই শেষোক্ত কেন্দ্রসমূহের কোনরূপ একটা সম্বন্ধ আছে; এইসব কেন্দ্র আবার নানাবিধ প্রচার-কার্য্যের বার্ত্তাবহ রূপে (transmission belt) কাজ করে, সোভিয়েট কূটনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ভাসাইয়া দেয় কম্যুনিষ্ট সাহিত্যবন্যায়। "টাস-সংবাদ-বার্ত্তী" প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ীরূপে, পুস্তক-বিক্রেতা রূপে "সোভিয়েট সংগঠন" (U. S. S. R. in construction), "সোভিয়েট-ভূমি" (Soviet land), নিউ টাইম্‌স প্রভৃতি সোভিয়েট প্রচারপত্রাদি সরবরাহ করে। কম্যুনিষ্ট বিশ্ব বিজয়ের পরিকল্পনার মধ্যে এই সব প্রতিষ্ঠানের স্থান আছে। তৎসম্বন্ধে সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে।

কৃষক ও রাষ্ট্র

আমাদের মধ্যে অনেকেই কল্পনা করিতে পারি না কি করিয়া চীন দেশের লোকের মত প্রাচীন সংস্কারে আবদ্ধ একটি জাতি কম্যুনিষ্টপন্থী হইয়া গেল। এই কথা বলিলে চলিবে না যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাহায্য পাইয়াই চীনদেশের একটি দল রাষ্ট্রের ক্ষমতা করায়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং এই কথাও ভুলিলে চলিবে না যে, চীনের অধিকাংশ লোক কৃষক শ্রেণীভুক্ত ও কৃষক শ্রেণী হইতে উদ্ভূত। এই লোকসমষ্টির উপর যুগ-যুগান্ত ধরিয়া যে অবিচার চলিয়াছে; এবং সেইজন্য গণ-মনে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মধ্যেই চীনের বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি মাও-সে-তুঙের চেষ্টায় কম্যুনিষ্ট বিজয়ের গুহ্য রহস্য নিহিত আছে।

এই কৃষক বিদ্রোহ চীনদেশের জাতীয় জীবনে যখন-তখন দেখা দিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে তৈইপিং বিদ্রোহ ও বক্সার বিদ্রোহ তার সাক্ষ্য দেয়। কৃষকদের এই বিদ্রোহী মনোভাব কম্যুনিষ্ট দলকে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দিয়াছে কিন্তু চীন রাষ্ট্রের বর্ত্তমান নেতার কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি কৃষকের উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন; রাশিয়ার মত শ্রমিক শ্রেণীর সাহায্যে কৃষককে পিটিয়া শায়েস্তা করিবার চেষ্টা এখন পর্য্যন্ত করেন নাই। চীনা কৃষক শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় চীনের জাতীয় সঙ্গীতের একটি কলিতে। "বন্দনা" নামক সঙ্গীত সঙ্কলনে তাহা আছে; তার ইংরেজী রূপ এইপ্রকার:

"When the sun rises I toil,
When the sun sets I rest,
I dig wells for water
I till field for food
What has the Emperor's powers
to do with me ?

ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ:

"সূর্য্য উঠিলে আমি খাটিতে সুরু করি, সূর্য্য অস্ত গেলে আমি করি বিশ্রাম, জলের জন্য আমি খনন করি কূপ। খাদ্যের জন্য কর্ষণ করি ভূমি—সম্রাটের ক্ষমতার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক আছে?"

সামরিক বিজ্ঞান-পরিষদ

বরোদা নগরীতে একটি সামরিক বিজ্ঞান-পরিষদ আছে, তাহার নিয়ামক শ্রী জি. এম. যাদব। সামরিক বিষয়ে আলোচনা করা, দেশরক্ষার প্রয়োজনে যে-সব সমস্যার উদয় হয় সাধারণত: তৎসম্বন্ধে জনমতকে শিক্ষিত করা, এবং সামরিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা—এই প্রকার কর্ত্তব্যসাধন এই সমিতির কাম্য। আজ কয়েক বৎসর হইতে এই ভদ্রলোক অনন্যমনা হইয়া ভারতবর্ষে সামরিক বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান বিস্তার ব্রতরূপে গ্রহণ করেন।

সম্প্রতি তিনি একটি পরিকল্পনাকে রূপদান করিবার চেষ্টা করিতেছেন—ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের মধ্যে সামরিক বিজ্ঞানের আলোচনা করিবার জন্য একটি পরিষদ গঠন করিবেন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহার আলোচনা ও প্রয়োগবিধির জ্ঞান বিস্তার করিবেন। এই বিষয়ে তিনি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়, বিলাতের সামরিক বিজ্ঞানী ক্যাপ্‌টেন লিডেল হার্ট এই পরিষদের সহকারী সভাপতি হইতে স্বীকার করিয়াছেন, একখানি পত্রে তিনি বলিয়াছেন: এরূপ পরিষদের বিশেষ প্রয়োজন আছে, অন্যান্য বিজ্ঞানে যেরূপ গবেষণা হইতেছে সামরিক বিজ্ঞানে তাহা হয় নাই; শান্তির আকাঙ্ক্ষা থাকিলে যুদ্ধ-বিদ্যাকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

এই পরিষদের নিয়ামক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্ত্তৃপক্ষ ও অসংখ্য কলেজসমূহের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে সহযোগিতার জন্য পত্রালাপ করিতেছেন। বিষয়টির গুরুত্ব এত বেশী যে, আমরা এই বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা দেখিতে চাই। সরকারী দেশরক্ষা বিভাগ এরূপ গবেষণা ও আলোচনা করিয়া থাকেন গোপনে, দেশের লোকের সঙ্গে তাহার কোন যোগসূত্র আজিও দেখিতে পাইলাম না। সৈন্যবাহিনী,

নৌবাহিনী, আকাশবাহিনীতে যোগদান করিবার বিজ্ঞাপন অনেক সময় দেখিতে পাই। সামরিক বাহিনীর পার্শ্বচররূপে আঞ্চলিক বাহিনী গঠনে চেষ্টা চলিতেছে, তাহাও বুঝিতে পারি। কিন্তু এই শেষোক্ত বিষয়ে জনচিত্তের আগ্রহ দেখিলাম না। গত বৎসর এই সৈন্যবাহিনী গঠনে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট প্রায় ৫৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন, কিন্তু মাত্র ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পারিলেন না।

পশ্চিমবঙ্গের অনাগ্রহের কথা বুঝিতে পারি। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে এরূপ নিশ্চেষ্টতার কারণ কি তাহা প্রকাশ্যে আলোচনা না করিলে জনমত জাগ্রত ও গঠিত হইবে কি করিয়া আমরা বুঝি না। পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকবৃন্দের একাংশ অনেক সময় বলিষ্ঠ সামরিক নীতির সমর্থন করেন। কিন্তু তাঁহাদের সামরিক শিক্ষা গ্রহণে অনাসক্তির কথা জানিয়া মনে করি যে এ-ও একটা হুজুগ। এরূপ লজ্জাজনক মনোভাবে ধিক্কার দিতেও আমরা কুণ্ঠা বোধ করি। কিন্তু কর্ত্তব্যের খাতিরে তাহা করিতেছি। বাঙালী ভারতরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না, যতদিন এই মনোভাব তাহাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। এখনও সময় আছে। আগামী দশ বৎসরের মধ্যে এই বিষয়ে তাহাদের ভাগ্য সুস্থির হইবে।

আসামের রাজনীতি

শ্রীগোপীনাথ বড়দলৈ অত্যন্ত "ভাল মানুষ"; আসামের মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন থাকিয়া তিনি রাজনীতির ঝামেলা হাড়ে-হাড়ে বুঝিতেছেন। "ভাল মানুষ" পাইয়া সকলেই তাঁহাকে ধমকাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার একটা নমুনা কলিকাতার "যুগবাণী"তে (সাপ্তাহিক) দেখা গিয়াছিল। ইহা আসাম কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীদেবেশ্বর শর্ম্মার একখানি পত্র, গত ২রা মার্চ্চ, নেহরু পার্ক-রোড, জোড়হাট হইতে লিখিত। পত্রখানির প্রথমেই "প্রিয় বড়দলই"র উপর অভিমান প্রকাশ পাইয়াছে: "গত তিন মাসে আমি অন্তত: তিনখানি পত্র আপনাকে লিখিয়াছি, কিন্তু একখানি পত্রেরও প্রাপ্তি-স্বীকার আপনি করেন নাই।" পত্রে "আমাদের এই সীমান্তবর্ত্তী ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে পাকিস্থানীদের অবাধ প্রবেশের জন্য পার্লামেণ্টে, ওয়ার্কিং কমিটিতে···আসাম সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা হইয়াছে।···অবাঞ্ছিত বহিষ্কার আইন পাশ হওয়ায় আমাদের উপর গুরুদায়িত্ব পড়িয়াছে।··· আমরা যদি অন্তত: সাধারণ যোগ্যতার সহিতও এই আইন কার্য্যকরী করিতে না পারি তাহা হইলে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট তথা সমগ্র ভারতের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইতে দিবেন না।" এই সম্বন্ধে একটা অবান্তর কথা আমরা আলোচনা করিতে চাই। শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার পার্লামেণ্টে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট এই আইন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। নেহরু-লিয়াকৎ আলী চুক্তির পর তাহা চোতা কাগজে পরিণত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে যে দুই-তিন লক্ষ পাকিস্থানী মুসলিম আসামে গিয়া ভিড় করিয়াছিল, তাহারা ফিরিতেছে একা নয়, নূতন জেহাদিদের লইয়া যাইতেছে এই চুক্তির কল্যাণে। শ্রীদেবেশ্বর শর্ম্মার পত্রের নিম্নলিখিত অংশ পাঠ করিলে আসামের রাজনীতির লীলাখেলা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইতে হয়। বড়পেটার কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী নেতৃবর্গ তিন জন মুসলিমের—রৌফ, কুদ্দুল খাঁ ও কাজিমুদ্দিন উকীল—বিরুদ্ধে ভারতরাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যের কথা শ্রীদেবেশ্বর শর্ম্মাকে বলেন। অন্যান্য অঞ্চলের কথাও তদনুরূপ:

"বড়পেটা হইতে ফিরিবার পথে ২৬শে তারিখ রাত্রে আমি তিহুতে অবস্থান করি এবং সেখানকার কংগ্রেসকর্ম্মীদের সহিত আলাপ-আলোচনা করি। এক বৎসর পূর্ব্বে যে ১৫।২০ জন সমাজবিরোধী লোকের নাম আপনাকে ও মি: মেধীকে দেওয়া হইয়াছিল, ছয় মাস পূর্ব্বে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত গবর্মেণ্ট তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন নাই। এই কারণে কংগ্রেস কর্ম্মীদের মন একেবারে তিক্তবিরক্ত হইয়া আছে। তাঁহারা মনে করেন আপনার গবর্মেণ্ট সময়মত বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তিহুর সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা ঘটিতে পারিত না। তাঁহারা বলেন—ঘোষণা করা হউক যে আসামে কোন গবর্মেণ্ট নাই, তাহা হইলে আমরা নিজেরা সমাজরক্ষার যথাবিহিত ব্যবস্থা করিব। শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরীও আমার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আপনি পছন্দ করিবেন কিনা জানি না, কিন্তু অতি দুঃখের সহিত আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমাদের প্রবীণ কংগ্রেস এম-এল-এ সহ সকলে এ বিষয়ে একমত যে আসামের গবর্মেণ্ট এত দুর্ব্বল যে তাহার অস্তিত্ব আছে বলিয়া অনুভব করা যায় না। পুলিস বিভাগের এই অবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।"

শর্ম্মা মহাশয় এই পত্রের উত্তর পাইয়াছেন কিনা জানি না। শ্রীগোপীনাথ বড়দলৈ "বোবার শত্রু নাই" এই নীতির অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। তাহা না করিয়া উপায় নাই। আসামের অহমদের "বংগাল-খেদা" আন্দোলনে নীরব সম্মতি দিয়া অনেক আসামী রাজনীতিক রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন; হিন্দু বাঙালী না হয় তাঁহাদের শত্রু; মুসলিম বাঙালীর সঙ্গে মিতালী করিতে তাঁহারা ব্যগ্র। আগামী আদমসুমারীর সময় তাঁহাদের চোখ খুলিবে, এই আশায় ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট দিন গুণিতেছেন। অর্থাৎ আসামী ভাষাভাষী এক-তৃতীয়াংশের জন্য আর ৫০।৫৫ লক্ষ নর-নারীকে বিপদের মুখে পড়িতে দেওয়া হইতেছে।

মফঃস্বল কলেজ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতদিনে মফঃস্বল বঙ্গের উপযোগিতা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইহা শুভ লক্ষণ। মফঃস্বলের স্কুল কলেজগুলিকে তাঁহারা এতদিন অবহেলা ত করিয়াছেনই, মেডিকেল স্কুলগুলিকে ভাঙিয়া দিয়া কেবলমাত্র কলিকাতা শহরে মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলিকাতা শহর ২০ লক্ষ লোকের উপযোগী করিয়া গঠিত হইয়াছিল। উহার পথঘাট, পয়ঃপ্রণালী, জলসরবরাহ প্রভৃতি সবকিছুই ঐ আন্দাজে তৈরি হইয়াছে, শহরের লোক তিন গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সকলেরই দুর্দশার চরম হইয়াছে। ওদিকে মফঃস্বল অবহেলিত হওয়ায় লোকে গ্রামে তো দূরের কথা, মফঃস্বল শহরে পর্য্যন্ত থাকিতে চায় না। এই অবস্থায় ষোল কলা পূর্ণ হইত টিউবরেল তৈরি হইলে। কিন্তু সুখের বিষয় দুষ্ট ছেলেদের বাস পোড়ানো কাজে লাগিয়াছে, গবর্মেণ্ট এই ধাক্কায় গ্রামমুখীন হইয়াছেন।

গবর্মেণ্টের এই মতি পরিবর্ত্তনে এখনও কিন্তু প্রচুর গলদ রহিয়াছে। তাঁহারা মফঃস্বলের কলেজগুলিতে কেবলমাত্র টাকা দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিতে চাহিতেছেন। কলিকাতা হইতে ছাত্র সরাইতে হইলে সাধারণ লোকও সরাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ কলিকাতায় চাকরী করিয়া মফঃস্বল কলেজে হোষ্টেলে ছেলে রাখিবার ব্যবস্থা অনেক অভিভাবকের পক্ষেই সম্ভব হইবে না। কাজেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি বিভাগ জেলা শহরগুলিতে সরাইয়া দিলে এই উদ্দেশ্য অনেকটা সাধিত হইবার পথ হইবে।

মফঃস্বলে ছেলেদের পাঠানো সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রধান কথা, তাহাদিগকে ঠেলিয়া পাঠানো যাইবে না, মফঃস্বল কলেজগুলিকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে হইবে। কলিকাতার উপর ছাত্রদের টানের অনেক কারণ আছে। এখানকার কলেজে তাহারা শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকদের নিকট পড়িতে পায়। এখানে ভাল লাইব্রেরি আছে, কলেজ ল্যাবরেটরি ভাল। বাহির হইতে আগত ভাল ভাল লোকের বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ এখানে আছে। সাধারণ ছেলেদের পক্ষে খেলা এবং সিনেমা প্রবল আকর্ষণ। দরিদ্র ছাত্রদের পক্ষে কলিকাতার একটা বড় আকর্ষণ এই যে, এখানে টিউশনি প্রভৃতি করিয়া কিছু টাকা উপার্জ্জনের দ্বারা শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলানের সুবিধা রহিয়াছে। এই সমস্ত আকর্ষণের চেয়ে বেশী টান যদি মফঃস্বল কলেজে করা না যায় তবে গবর্মেণ্টের পরিকল্পনা সফল হওয়া কঠিন হইবে।

এই কাজ অসম্ভব নহে। আমাদের মনে হয় মফঃস্বলে দুই তিনটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তুলিবার পূর্ণ সুযোগ এখন রহিয়াছে। এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বৎসরে ২০ লক্ষ টাকা খরচ করিলেও তিনটিতে ৬০ লক্ষের বেশী হয় না এবং এই টাকা দেওয়ার ক্ষমতা বাংলা-সরকারের আছে। ইহার চেয়ে ঢের বেশী টাকা তাঁহারা শুধু অপচয় করিয়া থাকেন। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় একটা নির্দ্দিষ্ট এলাকার স্কুল কলেজ সমস্ত দিয়া দিলে ঐ অঞ্চলের উন্নতি হইতে বাধ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখন কেবল পরীক্ষা লওয়ার যন্ত্রমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, লেখাপড়া একরূপ জাহান্নামে গিয়াছে। পরীক্ষার্থীর চাপ কলিকাতার উপর কেন্দ্রীভূত না রাখিয়া উহা যদি তিনটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে যাহারা শিক্ষালাভ করিবে তাহারা এবং সমগ্র দেশ উপকৃত হইবে। এইরূপ কার্য্যের দ্বারাই পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের পরবশ্যতা—ডাল

পশ্চিমবঙ্গের পরবশ্যতা আজ সুস্পষ্ট হইয়াছে; কলিকাতার ঐশ্বর্য্য-প্রদীপের নীচে কি বিরাট অন্ধকার তাহা উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে। ভাত-কাপড়ের জন্য আমরা অন্য দেশের দিকে চাহিয়া থাকি; শিল্পের কাঁচা মালের জন্য আমরা পর-প্রত্যাশী; দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যাপারেও সেই অবস্থা। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও আমাদের এই পরবশ্যতা পীড়াদায়ক; এবং যাঁহারা আমাদের এই অভাবের যোগান দেন তাঁহারা আকারে ইঙ্গিতে, ব্যবহারে তৎসম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ।

পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই পরবশ্যতার কথা আমাদের যখন-তখন শুনাইতেছেন। সম্প্রতি একটি বেতারবক্তৃতা উপলক্ষে বাঙালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় একটি খাদ্যবস্তুর—ডালের জন্য পরের দুয়ারে হাত পাতিবার অভ্যাস সম্বন্ধে আবার নূতন করিয়া আমাদের সাবধান করিয়াছেন:

"এদেশের লোকেরা প্রায় রোজই ডাল খেয়ে থাকেন এবং ইহা গবাদির খাদ্য হিসাবেও প্রয়োজন, কিন্তু ইহার চাষ খুবই কম হয়।

"আমাদের বাৎসরিক ডালের চাহিদা হচ্ছে ৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯শ' টন; কিন্তু পশ্চিমবাংলা উৎপন্ন করে ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮শ' টন ডাল। কাজেই বাকী ডালটা আমদানী করতে হয় অন্য প্রদেশ থেকে। কমপক্ষে ডালের মণকরা দর যদি ২০৲ টাকাও ধরা যায়, তা হলে দেখা যায় প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা এর জন্য অন্য দেশে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চাষীরা একটু উৎসাহী হয়ে যদি এর চাষবাসে একটু মন দেন, তা হলে দেশের টাকা যে দেশেই থেকে যায় তা বলাই বাহুল্য। আর কিছু না থাকে, আমদানী করবার ঝামেলা থেকেও তো রেহাই পেতে পারি। বিশেষজ্ঞদের মতে স্বাস্থ্য অটুট রাখতে হলে খাদ্যশস্য ও ডালের সম্বন্ধ হচ্ছে ১৪ : ৩। কিন্তু চাষআবাদের তালিকা থেকে দেখা যায় যে, পশ্চিমবাংলায় ধান

বা সমজাতীয় শস্যের চাষ হচ্ছে সাধারণত: ৯৫ লক্ষ একর জমিতে ; আর ডাল চাষ হয় সেখানে মাত্র ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬শ' একর জমিতে। অর্থাৎ cereals to pulse ratio হচ্ছে ১৫ : ১। এতে যে আমাদের স্বাস্থ্য এবং অর্থ দুই ই নষ্ট হচ্ছে তা তো পরিষ্কার বুঝা যায়। এইরূপ অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির অবসান যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। বিশেষজ্ঞদের মতে আরও জানা যায় যে, যে জমিতে ডালশস্য উৎপাদন হয় সে সব জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ডালশস্যের গাছ ও পাতা শুকিয়ে গেলেও গরুর পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ডালশস্য চাষে যে শুধু প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করা যায় তাহা নয়, এর চাষ দ্বারা আমরা জমির উর্ব্বরতাও বৃদ্ধি করতে পারি।

"পশ্চিম বাংলার আবহাওয়া ডাল চাষের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ জেলার ও ২৪ পরগণার বনগ্রাম মহকুমার ডাল চাষের জন্য বিশেষ খ্যাতি আছে। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া, মেদিনীপুরের ঘাটাল ও তমলুক অঞ্চলে এবং বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর অঞ্চলেও প্রচুর ডাল জন্মে—বিশেষত: বিউলি ও ঠিকরি কলাই। এ থেকে বুঝা যায়, পশ্চিমবাংলার প্রায় সব স্থানেই উন্নত প্রণালীর চাষবাস দ্বারা ডালের উৎপাদন বাড়ানো যায়।"

পাট চাষ সম্পর্কে দাতার সিংহের মন্তব্য

কেন্দ্রীয় কৃষিদপ্তরের অতিরিক্ত সেক্রেটারী সর্দ্দার দাতার সিং কটকে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন যে, আগামী বৎসর হইতে ভারতবর্ষ পাট সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল হইবে। তিনি আরও বলেন, আর দুই বৎসরের মধ্যে তুলা সম্বন্ধেও ভারতবর্ষ আত্মনির্ভরশীল হইবে। সর্দ্দার দাতার সিং হিসাব দেন যে, দেশ বিভাগের সময় ভারতের পাটের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িলেও বর্ত্তমানে অনেক উন্নতি হইয়াছে। ভারত বিভাগের পর ভারতে মাত্র ১৬ লক্ষ একর পাটের জমি পড়িয়াছিল। ১৯৪৯ সালে ইহা ৪০ লক্ষ একরে দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার মতে ১৯৫১-৫২ সালের মধ্যে পাট সম্বন্ধে ভারত আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে, কারণ এই সময়ের মধ্যে পাটের জমির পরিমাণ বাড়িয়া ৫০ লক্ষ একর হইবে।

পাকিস্তানের সহিত পাট ক্রয় চুক্তিতে ভারত-সরকার দেশী পাটের প্রতি যে বিরাগ দেখাইয়াছেন তাহার ফল ভাল হইবে কি না সে বিষয়ে আমরা আগেই সন্দেহ করিয়াছি। ঐ চুক্তির পর ভারতের পাটের বাজার অনেক নামিয়া গিয়াছিল। এখন পাকিস্তানী পাট না আসায় বাজার আবার ভাল যাইতেছে। এইরূপ অনিশ্চয়তা পাট চাষের পক্ষে অতিশয় অনিষ্টকর। দাতার সিং এ দিকে মন দিয়াছেন কি না এবং তার সম্বন্ধে কোন সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে কি না সে বিষয়ে কোন . . . কথাটাই তাঁহার সর্ব্বাগ্রে পরিষ্কার ন নাই। অথচ এই

সবশেষে বক্তব্য এই যে, পশ্চিমবঙ্গে শ উচিত ছিল। গবেষণামূলক কার্য্যে উৎসাহদানে শ্রীযুক্ত উন্নয়ন সম্বন্ধে কার্পণ্য দূর না হইলে তাঁহার সকল উক্তিই অ। সিংহের স্মুমে পরিণত হইবে।

হুগলী জেলায় পল্লী-সংগঠন

"অজয়" পত্রিকা নামে "পল্লীসমাজের মুখপত্র" একখানি সাপ্তাহিক আছে, যদিও তাহা কলিকাতা ৭৮-এ বিবেকানন্দ রোড হইতে প্রকাশিত এবং পরিচালক ও সম্পাদকমণ্ডলী কলিকাতার সাংবাদিক। তার একটি সংখ্যায় হুগলী জেলায় গঠনমূলক কার্য্যের বিবরণী পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। পল্লী-জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন রিক্ততার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া লেখক বলিতেছেন:

"হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত মলয়পুরও ভারতের শতসহস্র ভাষাহীন দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট ও ব্যাধি-প্রপীড়িত গ্রামগুলির মধ্যে অন্যতম। গত শ্রাবণ মাসে গ্রামের কয়েক-জন যুবকর্ম্মীর অনুপ্রেরণা ও চেষ্টায় মলয়পুর ইউনিয়ন কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রবীণ, নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীজগৎ তারণ সামন্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে উন্নয়ন সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর আদর্শবাদের উপর ভিত্তি করিয়া গ্রামে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পল্লীসমাজ গড়িয়া তোলার সঙ্কল্প লইয়া উন্নয়ন সংঘের কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। গ্রামে সমবায় কৃষি প্রবর্ত্তন, কুটীরশিল্প স্থাপন, অশিক্ষা দূরীকরণ, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, শরীরচর্চ্চা, পাঠাগার স্থাপন ইত্যাদি গঠন-মূলক কর্ম্মপন্থা লইয়া সংঘ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে।"

অল্প কয়েক মাসের মধ্যে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রসার হইয়াছে। "হরিজন" বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তার ছাত্র-সংখ্যা ২৯ জন। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রসংখ্যা ৪০ জন। পুঁথিঘর, ব্যায়ামাগার, দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র, ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র প্রভৃতি সমাজসেবা প্রচেষ্টা চলিতেছে। একটি সাবানের কারখানা চলিতেছে। একটি কৃষিকেন্দ্রের জন্য ৩০।৪০ বিঘা জমি লইয়া একটা পরীক্ষামূলক কার্য্যের উদ্যোগ চলিতেছে। এই সংঘের ১০ জন কর্ম্মী ওয়াই-এম-সি-এর সৌজন্যে নিম্ন-লিখিত বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতেছেন: (১) চামড়ার কাজ (২) বেতের কাজ ও হিন্দি শিক্ষা; (৩) বাংলায় বয়স্কশিক্ষা; (৪) প্রাথমিক চিকিৎসা ও গার্হস্থ্য শুশ্রূষা।

চন্দননগরের ভারতভুক্তি

১৩৫৭ সালের ১৬ বৈশাখ চন্দননগরের শাসনভার ভারত-রাষ্ট্রের প্রতিনিধির হস্তে সমর্পণ করিয়া ফরাসী শাসনকর্ত্তা বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার মাহাত্ম্য

কীর্ত্তন করিয়া প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল "নবসঙ্ঘ" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি এই সাপ্তাহিকের ২৫শে বৈশাখ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগের পাঠকবর্গের তাহা জানিয়া রাখা প্রয়োজন। সেইজন্য আমরা প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম:

চন্দননগরের দীর্ঘ ইতিহাস। সে কথা ঐতিহাসিকেরা আলোচনা করিবেন। ২৫০ বৎসরের চন্দননগর বর্ত্তমান যে অবস্থায়, সেই অবস্থার যেটুকু দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেই কথাই বলিব। খলিসানী, বোড়ো ও কৃষ্ণপুর লইয়া চন্দননগর। ফরাসীর অধিকারকালে বোড়ো ও কৃষ্ণপুরে বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রের আশেপাশে কয়েকটি পর্ণকুটীর মাত্র ছিল। ক্রমে কলিকাতা মহানগরী গড়িয়া উঠার বহু পূর্ব্বে ফরাসীদের অধিকারে চন্দননগর প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। ঘটির ঘাটের ইতিহাস আজিও সুস্পষ্ট। সারি সারি বাণিজ্য-পোত এইখানে আসিয়াই দ্রব্যাদি দেশময় সরবরাহ করিত। কৃষ্ণপুর নাম মুছিয়াছে। শ্রীমন্ত সওদাগরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺বোড়াইচণ্ডীর প্রসাদে বোড়ো নাম এখনও বর্ত্তমান। কৃষ্ণপুর ভাঙ্গিয়া পালপাড়া, লালবাগান ও গোন্দলপাড়া নামে আখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু কবিকঙ্কনের ভণিতা—"বোড়োতে বোড়াইচণ্ডী করিলা স্থাপন" আজিও রহিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই বোড়োর নাম চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। সেই কথাই বলিতেছি।

কথাটা অনেকখানি ব্যক্তিগত। কিন্তু ইতিহাস রক্ষার খাতিরে ইহা গোপন রাখার বিনয় শ্রেয়ঃ মনে করি না।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে যে সৎপথবালম্বী সম্প্রদায় বোড়াইচণ্ডীতলায় সৃষ্টি হয়, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞের এক অধ্যায়ের আরম্ভ।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ হইলে ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি হয়। এই আন্দোলনের প্রথম দিন সৎ-পথাবলম্বী সম্প্রদায় "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই" বলিয়া গানের মূর্চ্ছনায় পল্লীপ্রাণ মুখরিত করে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বোড়োতেই ৺কানাইলাল তাঁহার বাড়ীতে যুবকদের সমবেত করেন ব্যায়ামের অছিলায়।

তারপর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরের বৈপ্লবিক প্রথম পুরোহিত ৺চারুচন্দ্র রায় আলিপুর বোমার মামলা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বিপ্লবের কর্ম্ম হইতে দূরে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, বোড়াইচণ্ডীতলায় নূতন বিপ্লব-কেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ৺কানাইলাল এই কেন্দ্র হইতেই শেষ বিদায় গ্রহণ করেন। এই বিপ্লবকেন্দ্রই বিশ্বাসঘাতক ৺নরেন্দ্রনাথকে হত্যা করার অভাবনীয় আয়োজন সুসম্পন্ন করে। তারপর ৺রাসবিহারী বসু এই বোড়ো কেন্দ্র হইতে দীক্ষালাভ করিয়াই সারা ভারতে বিপ্লবকেন্দ্র স্থাপন করেন। দিল্লীনগরে প্রবেশ কালে বোড়োর বোমাই লর্ড হার্ডিঞ্জের হাতীতে নিক্ষিপ্ত হয়। অখণ্ড বাংলার বিপ্লবকেন্দ্র এই বোড়োতে স্থাপন করিয়া সারা ভারতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হয়; সে দীর্ঘ ইতিহাস প্রচারের ক্ষেত্র ইহা নহে।

স্বাধীনতার প্রধান পুরোহিত শ্রীঅরবিন্দ এই বোড়াই-চণ্ডীতলার ঘাটেই প্রথম শুভাগমন করেন। পণ্ডীচারী যাওয়ার ব্যবস্থা এই বোড়োর বিপ্লবকেন্দ্র হইতেই সুনিয়ন্ত্রিত হয়। বোড়াইচণ্ডীতলার ঘাটেই তাঁহাকে বিদায়াভিনন্দন দিতে হয়। তারপর ভারতের বিপ্লবিগণ সুদূর মহারাষ্ট্র পঞ্চনদ হইতে এইখানেই আগমন করেন। ৺রাসবিহারীকে জাপানে প্রেরণের ব্যবস্থাও এইখান হইতেই করিতে হয়। ভারতমুক্তির তীর্থভূমি এই বোড়ো; চন্দননগরেরই ইহা অন্তর্গত। ভারত-স্বাধীনতায় চন্দননগরের বিশিষ্ট দান আছে।

৺চারুচন্দ্র রায়ের ইংরেজ পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হওয়ার পর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইহার পরবর্ত্তী শাসকবর্গ যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহার প্রতিদান স্মরণমাত্রে পর্য্যবসিত হইলে চলিবে না। ভারতের বিপ্লবিগণ চন্দননগরে ফরাসী শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণের সে দিন যদি সহায়তা না পাইত, চন্দন-নগরের ভারত-স্বাধীনতার কেন্দ্রতীর্থরূপে পরিণত হওয়া সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। এইজন্য আজ ফরাসী জাতির অধিকার চ্যুতির পরও তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষায় আমরা উদাসীন হইব না।

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এই চন্দননগর। চন্দননগরের অপর নাম চন্দ্রনগর। বোড়ো, কৃষ্ণপুর কোন দিন চন্দন-বনে সমাকীর্ণ ছিল না। চন্দনকাঠের ব্যবসায়ে চন্দননগর কোনদিন প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই।

বাঁকুড়া জেলার সমস্যাবলী

বাঁকুড়া জেলার "প্রচার" পত্রিকার ২২শে জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

"পশ্চিমবঙ্গ যেমন ভারতের একটি সমস্যাবহুল প্রদেশ, সে-রূপ বাঁকুড়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের একটি সমস্যাবহুল জেলা। জেলার দুইটি মহকুমার 'জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ' গোছের অবস্থা। বিষ্ণুপুর মহকুমা ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, গ্রামগুলির সে শ্রী-সম্পদ নাই, সে স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য নাই। সদর মহকুমায় কুষ্ঠ রোগের ব্যাপকতা এরূপ দ্রুত হই-তেছে যে, আশঙ্কা হইতেছে—এই কুৎসিত রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে অল্প কাল মধ্যে ইহা জেলার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে।

বিষ্ণুপুরে স্বাধীন মল্লরাজাদের রাজত্বকালে যে কয়েকজন বিদেশী পর্য্যটক মল্লরাজ্যে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে তৎকালে মল্লরাজ্যে যে পরিমাণ সুখশান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যমান ছিল—তাহা অমরাবতীকেও হার

মানাইয়া দিত। কেহ কেহ মুক্তকণ্ঠে ইহাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, মল্লরাজ্যে কাহারও কোন অভাব ছিল না. সেই হেতু কোন চোর ডাকাতেরও ভয় ছিল না, সকলেই ঘরের দরজা-জানালা সব সময়েই খুলিয়া রাখিত ; কালচক্রের গতি-পথে সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় বিষ্ণুপুর মহকুমার গ্রামগুলি বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে। বহু গ্রাম উজাড় হইয়া গিয়াছে, মানুষের ভিটায় আজ ঘুঘু চরিতেছে। সরকারী জন্মমৃত্যুর খতিয়ান হইতে জানা যায় যে, মহকুমার প্রতি থানার জন্ম হইতে মৃত্যুর সংখ্যা বেশী এবং এই মৃত্যুর কারণ একমাত্র ম্যালেরিয়া। এই ম্যালেরিয়া দমন করিতে না পারিলে আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বিষ্ণুপুর মহকুমার গ্রামগুলি জনশূন্য হইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

সদর মহকুমার সিমলাপাল, বড়জোড়া, গঙ্গাজলঘাটী, ওন্দা প্রভৃতি থানাতেও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে, তদুপরি আছে, 'গোদের উপর বিষ ফোড়'—কুষ্ঠ। সদর মহকুমায় কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব বেশী, সরকারী হিসাবে জেলায় প্রায় ৬৫ হাজারের বেশী কুষ্ঠরোগী আছে। ইহা সত্য হইলে জেলার জনসংখ্যার শতকরা ৫ জন কুষ্ঠরোগী। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের অভিমত, জেলায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা আরও বেশী। কুষ্ঠরোগীর ঠিক ভাবে গণনা করা হইলে রোগাক্রান্তের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। অনেক ভদ্র ঘরের রোগীরা রোগ গোপন করিয়া রাখে, এবং রোগ লইয়া অবাধে সকলের সঙ্গে মেলামেশা, আহারবিহার করে। খাতড়া ও বড়জোড়া থানার এমন কয়েকটি ভদ্র গৃহস্থ পরিবার আমাদের জানা আছে যাঁহাদের ঘরের প্রত্যেকটি লোক রোগাক্রান্ত। কুষ্ঠরোগ লইয়া এই অবাধ মেলামেশা ও আহারবিহার করার ফলে রোগবীজাণু ছড়াইয়া পড়িতেছে ; ফলে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে।...

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ রোধ করা সহজসাধ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এ সম্পর্কে আন্তরিকতার কোন অভাব আছে ইহা আমরা মনে করি না। বিষ্ণুপুর মহকুমার প্রতি ইউনিয়নে স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলিবার সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহুদিন আগেই করিয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণুপুর মহকুমায় মাত্র দুইটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। কোতুলপুরে থানা কেন্দ্রে কার্য্য অল্প দিনমাত্র আরম্ভ হইয়াছে—আর একটি মির্জ্জাপুরে বৎসরাধিক কাল হইল খোলা হইয়াছে। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ কেবল কুইনিন বিতরণ ও রোগের চিকিৎসা করাই নহে, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যাহাতে বন্ধ হয় তাহার চেষ্টা করাই প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু ঔষধ বিতরণ ও রোগের চিকিৎসা করা ছাড়া রোগ আক্রমণের প্রতিষেধক কোন ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। এই সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে কোন প্রচার কার্য্যও সরকার হইতে করা হয় নাই।..."

বাঁকুড়া জেলার এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ অবনতির কারণ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কোন আলোচনা দেখিলাম না। দু' তিন শত বৎসরের মধ্যে এমন কিছু ঘটিয়াছে যাহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া আলোচনার প্রয়োজন। আমরা আমাদের বাঁকুড়ার সহযোগীর নিকট তাহাই আশা করিব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্বন্ধেও আমাদের অভিযোগ আছে যে, এতদিনেও এ বিষয়ে কোনও প্রতিকারের চেষ্টা দেখা গেল না।

বর্দ্ধমান শহরে বিজলী কোম্পানীর অব্যবস্থা

গত মাসে আমরা বাঁকুড়া শহরের বিজলী কোম্পানীর কর্ত্তব্যচ্যুতির পরিচয় দিয়াছিলাম ; এই মাসে বর্দ্ধমান শহরের নাগরিকবর্গের দুর্দ্দশার কথা বলিতেছি। বর্দ্ধমানের "আর্য্য" পত্রিকার ৩২শে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় তাহার যে একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

"পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় নগরী বর্দ্ধমান বিজলী কোম্পানীর মালিকের দয়ার উপর যেন নির্ভরশীল। যখন তখন বিজলী বাতি নিবিয়া সমগ্র নগরীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলে। এখন আলো নিবিয়া যাওয়া একটা প্রাত্যহিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রাহকগণ উচ্চহারে ইউনিট দিয়া থাকেন, পশ্চিমবঙ্গের কোথাও এত উচ্চ ইউনিট নাই। প্রকাশ, নির্দ্ধারিত দিনে কোম্পানীর প্রাপ্য না দিলে নাকি ফাইন দিতে হয়। কোম্পানীর আয় প্রচুর। কোম্পানীকে প্রতিষ্ঠানটির সংস্কার করিতে বলিলে তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মতামতের অজুহাত দেখাইয়া থাকেন। যে নূতন মেশিনটি আনা হইয়াছে তাহাও নাকি অকেজো। সরকার নাগরিক জীবনের এই অপরিহার্য্য অঙ্গটি সংস্কারের আদেশ দিবেন কিনা নাগরিকগণ তাহা জানিতে চাহেন। জনসাধারণ ইহাও দাবি করেন যে, উহার সংস্কারের মূলে কি বাধা আছে তাহা সরকার জানাইয়া দিন অথবা সরকার উহার পরিচালনা ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া নাগরিক জীবনকে বিপন্মুক্ত করুন। নাগরিক জীবনকে প্রত্যহ এই ভাবে বিপর্য্যস্ত করিবার অধিকার কোম্পানীর আদৌ আছে কিনা এবং যদি না থাকে তবে অবিলম্বে তাহার প্রতিবিধান করা হউক। কোম্পানীর আয় কত এবং কোন অজুহাতে কোম্পানী খরচ লইয়াও এই প্রকার খামখেয়ালী করিতে সাহস পায় তাহার প্রকাশ্য তদন্ত হউক। ইতিপূর্ব্বে কোম্পানী যাহাদের হাতে ছিল সেই আমলে প্রত্যহ লাইট ফেল করিত না অথচ এখনই বা কেন করে? নূতন কানেকশন চাহিলে কোম্পানী বলেন নূতন সংযোগ দিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেন। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে নূতন সংযোগ নাকি দেওয়া হইয়াছে। উহা আদৌ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত সংযোগ কিনা তাহারও তদন্ত প্রয়োজন। লাইটের অভাবে নাগরিক জীবন বিপর্য্যস্ত, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কোম্পানীর ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলে সহরের প্রভূত উন্নতি সম্ভব বলিয়া নাগরিকদের বিশ্বাস।"

পশ্চিমবঙ্গে "বন-মহোৎসব"

"মহাপুরুষেরা সত্যকে আর পাঁচ জনের চেয়ে আগে দেখতে পান। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমে এই বৃক্ষ-রোপণ উৎসব প্রবর্ত্তন করে গেছেন আজ থেকে পঁচিশ বৎসর আগে।" পশ্চিমবঙ্গের প্রচার বিভাগ ভারতরাষ্ট্রব্যাপী বন-মহোৎসব উপলক্ষে যে মনোরম চিত্র-শোভিত পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই কথাগুলি আছে। ভারতরাষ্ট্রে খাদ্যাভাব আজ উৎকটভাবে দেখা দিয়াছে, গত তিন বৎসর হইতে প্রতি বৎসর ১০০।১৫০ কোটি টাকা বাবে বিদেশ হইতে খাদ্য ক্রয় করিয়া ভারতরাষ্ট্রের ভাগ্য নিয়ামকগণ তাঁহাদের নাগরিকবৃন্দকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। আগামী ১৮ মাসের মধ্যে আমাদের খাদ্যে স্বাবলম্বী হইতে হইবে, এই সংকল্প ঘোষিত হইয়াছে। তাহারই পরিপূরকরূপে এই বন-মহোৎসব।

কিন্তু খাদ্যশস্য উৎপন্ন ও পুষ্টির জন্য জলের প্রয়োজন, সেই জল আকাশ হইতে পড়িয়া আসুক বা মাটির নিম্নভাগ হইতে আসুক। সেই জলের জন্য গাছপালার উপর অনেকাংশে নির্ভর করিতে হয়। এই গাছপালা আকাশ হইতে মেঘ টানিয়া আনে; জল-স্রোতের দাপট সংযত করে, বৃষ্টির জলকে শিকড়ে আবদ্ধ রাখে। কিন্তু আমাদের দেশ ক্রমশঃ গাছপালা শূন্য হইয়া যাইতেছে; তার অন্যতম কারণ লোকবৃদ্ধি, লোকের অজ্ঞতাও অন্য কারণ। সেই কথাই ১৩৩৫ সালে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন; তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে এই পুস্তিকায়। বৃক্ষ-রোপণ, "বন-মহোৎসবের" প্রয়োজন এই কথার মধ্যে আছে। যে পরিবেশের মধ্যে শান্তিনিকেতন স্থাপিত তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া কবিগুরু বলিয়াছিলেন:

"আজকে ভারতবর্ষের উত্তর অংশ তরু-বিরল হওয়াতে সে অঞ্চলে গ্রীষ্মের উৎপাত অসহ্য হয়েছে। অথচ পুরাণপাঠক মাত্রেই জানেন যে, এক কালে এই অঞ্চল ঋষিদের অধ্যুষিত মহারণ্যে পূর্ণ ছিল, উত্তর-ভারতের এই অংশ এক সময় ছায়া-শীতল সুরম্য স্থান ছিল। মানুষ গৃধ্নুভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে, প্রকৃতির সহজ দানে তার কুলোয় নি, তাই সে নির্ম্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ করেছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই যে বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে—এক সময়ে এমন দশা ছিল না; এখানে ছিল অরণ্য, সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফল-মূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বন-লক্ষ্মীকে, আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন্ তাঁর ফল, দিন্ তাঁর ছায়া।"

বাস্তুহারা সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বাস্তুহারা হইয়া আসিয়াছেন; তাঁহাদের পুনর্বসতি একটা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয়-সরকার এই সমস্যার সমাধানে যাহা করিয়াছেন বা করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে; ইহাতে যোগদান করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল-সমিতির সম্পাদক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র এই বিষয়ে একটা ব্যাপক পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাহা বিবেচনা করিতেছেন। পল্লীমঙ্গল সমিতি নিজের চেষ্টায় হুগলী জেলার জাঙ্গিপুর থানার আঁটপুর প্রভৃতি গ্রামে এই পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এই গঠনমূলক ভাব লইয়া আরও অনেকে চিন্তা করিতেছেন। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত "নির্ণয়" সাপ্তাহিক পত্রিকার গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে যে পদ্ধতিতে বাস্তুহারা সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হইতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া আমাদের সহযোগী বলিতেছেন:

"বর্ত্তমানে যত দূর জানা গিয়াছে শরণার্থীগণ বিভিন্ন স্থানে যেভাবেই হউক জমি সংগ্রহ করিয়া 'কলোনী' গঠন করিতেছেন। আমরা পূর্ব্ববর্তী এক সংখ্যায় বলিয়াছিলাম যে, সমস্যার সমাধান হিসাবে গ্রহণীয় হইলেও নানা কারণে স্থায়ী ব্যবস্থা হওয়া হিসাবে ইহা সমর্থনযোগ্য নহে। প্রথমতঃ এইভাবে সকল লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে, দ্বিতীয়তঃ আশ্রয়প্রার্থীদের এইরূপ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-জীবনের পক্ষেও শুভফলদায়ক হইবে না। সেইজন্য আমরা বলিয়াছিলাম যে, এইরূপ স্বতন্ত্র 'কলোনীর' পরিবর্ত্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি গ্রামবাসীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু কিছু সমাগতের বসবাসের ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে এইরূপ অবাঞ্ছনীয় কিছু ঘটিবার আর আশঙ্কা থাকে না। কয়েকটি কারণে এইরূপ ব্যবস্থা সত্বর অবলম্বন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ অন্যান্য বিরাট পরিকল্পনার ন্যায় ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য নহে, দ্বিতীয়তঃ এই ব্যবস্থায় গ্রামবাসীদের সক্রিয় সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত কম সময়ে সকলের সহযোগে ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারে, তৃতীয়তঃ পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-জীবনের পক্ষে এইরূপ ব্যবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর।"

বর্ত্তমানে এইরূপ কলোনী যেভাবে হইতেছে তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগের স্বার্থহানি বিশেষভাবে হইতেছে

এবং উহার ফলে বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি অচিরেই হইবে। ইহাই লক্ষ্য করিয়া "নির্ণয়" "অবাঞ্ছনীয়" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী অব্যবস্থা

বারাসত, বসিরহাট, বনগাঁও মহকুমার মুখপত্র "সংগঠনী" পত্রিকার ১৬ই আষাঢ় সংখ্যায় নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় সমালোচনাটি প্রকাশিত হইয়াছে :

'টাকায় টাকা লাভ

"বিগত সংখ্যা সংগঠনীতে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, বসিরহাট মহকুমার চাতরা চণ্ডীপুর ইউনিয়নে প্রায় ১,২৫০ উদ্বাস্তু পরিবারের জন্য দুই কামরা যুক্ত যে ৬৫০ শত টিনের চাল ও বাঁশের বেড়ার একচালা গৃহ নির্ম্মাণ হইতেছে তাহাতে সরকারের গৃহপিছু ব্যয় হইতেছে ৫০০্ টাকা। যে সমস্ত কন্‌ট্রাক্টর ঐ সমস্ত গৃহ নির্ম্মাণের ভার লইয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে তাহাদের এক একটি গৃহ নির্ম্মাণ সম্পন্ন করিতে ২৫০্ টাকার অধিক ব্যয় হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে ২৫০্ টাকা ব্যয় করিয়া ৫০০্ টাকা পাওয়া যাইতেছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি গৃহ বাবদ লাভ হইয়াছে ২৫০্ টাকা। ইহাকেই বলে টাকায় টাকা লাভ।

আর আমরা ইতিপূর্ব্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম অল্প ঝড়বৃষ্টিতেই ঘরের মধ্যে জল প্রবেশ করিবে—ঘরের চাল উড়িয়া যাইবে। আমাদের সে সন্দেহ কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, সামান্য ঝড়বৃষ্টিতে কয়েকটি ঘরের চাল উড়িয়া গিয়াছে, বহু ঘর হেলিয়া গিয়াছে এবং জলের ছাটের সময় ঘরের মধ্যে এত জল প্রবেশ করে যে, ঘরের মধ্যে বাস করা অসম্ভব হয়।"

তুরস্কদেশে বাদশাদের আমলে একটা বাক্য প্রচলিত ছিল —"বাদশার ভাণ্ডার সমুদ্রের মত অফুরন্ত, তাতে হাত ডুবাইয়া যে জল না তুলে সে শূকর পর্য্যায়ের লোক।" ভারতরাষ্ট্রেও সেই বাক্যের প্রচলন দেখিতে পাই।

বোম্বাইয়ের বাৎসরিক আয়ব্যয়

অর্থনীতি ও সংখ্যা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্ত বোম্বাই রাজ্যে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। তাঁহারা একটি হিসাবে দেখাইয়াছেন যে, ১৯৪৮-৪৯ সালে বোম্বাই রাজ্যের জনসমষ্টির বাৎসরিক আয় ছিল ৫৭৬ কোটী টাকার কিঞ্চিদধিক—৫৭৬'১০ কোটি টাকা। কোন্ কোন্ খাতে কত টাকা উপার্জ্জিত হইয়াছে, তাহারও একটা হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

২০৭'৩৬ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে কৃষি বনজাত দ্রব্যাদি হইতে, অর্থাৎ সমগ্র আয়ের শতকরা ৩৬ ভাগ ; ২১৬'৬৯ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে শিল্প ও শিল্পে নিযুক্ত কর্ম্মচারী, মজুরদের আয় বাবদে, এবং সম্পত্তির আয় হইতে, অর্থাৎ আয়ের শতকরা ৩৭'৬ ভাগ, ১৫২'০৫ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে বিক্রয় ব্যবসায়, ব্যাঙ্ক ইন্সিওর কোম্পানীর আয় ও সরকারী চাকুরীর আয় হইতে, অর্থাৎ সমগ্র আয়ের শতকরা ২৬ ভাগ।

আরও নানা খুঁটিনাটি তথ্য আছে। সরকারী চাকুরীয়ার সংখ্যা ১৯৪৬-৪৭ সালে ছিল ১০৮,১২৮ জন, ১৯৪৭-৪৮ সালে ছিল ১০৯,৩৩৫ জন এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে ছিল ১২২,৭২৬ জন। এই তিন বৎসরের প্রথম বৎসরে প্রত্যেক সরকারী কর্ম্মচারীর গড়ে আয় ছিল এক শত টাকার কম।

১৯৪১ সাল হইতে ১৯৪৯ সালে পর্য্যন্ত ভূমির রাজস্বে বেশী তারতম্য হয় নাই, ৩'১৪ কোটি টাকা হইতে ৪'০৩ টাকায় মাত্র বাড়িয়াছে। সকল প্রকার বেতনভোগীর আয় ছিল ১৯৩৯ সালে প্রায় ১৫ কোটি টাকা, ১৯৪৮ সালে তাহা বাড়িয়া যায় ৭৮ কোটি টাকায়, প্রাদেশিক সরকারী কর্ম্মচারীর আয় ছিল ১৫'১৯ কোটি টাকা ; কেন্দ্রীয় সরকারের বোম্বাই-স্থিত কর্ম্মচারীর আয় ৩৩'৪০ কোটি টাকা ছিল। সমস্ত স্বায়ত্ত-শাসনাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীবৃন্দের আয় ৫'৮০ কোটি টাকা।

এই হিসাবে দেখা যায় শহর অধিবাসী ৬০ লক্ষ লোকের আয় ছিল ৩৬২'৭২ কোটি টাকা, গড়ে প্রত্যেকের আয় ছিল ৬০৩'৫ শত টাকা ; ১ কোটি ৭০ লক্ষ গ্রামীণের আয় ২১৩'৩২ কোটি টাকা, গড়ে প্রত্যেকের আয় ছিল ১২৭'৭ শত টাকা। শহর ও গ্রামের উপার্জ্জনের এই পার্থক্য লক্ষণীয়।

কোশী নদীর নিয়ন্ত্রণ

বিহারের কোশী নদী বন্যার তোড়ে উত্তর-বিহারের জীবন প্রায় প্রতি বৎসর বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়, যেমন পশ্চিমবঙ্গে করে দামোদর নদ। এই নদীকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি পরিকল্পনা করা হইয়াছে। উত্তর-বিহারের লোকের কাছে বর্ষার সময় এই নদী একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করে ; তাই এই নদীর নাম— "দুঃখের নদী"। যখন দেখিতে পাই যে, এই নদীর আক্রোশে প্রায় ৩৫ বর্গমাইল পরিমিত অঞ্চলের সমাজ-জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে, প্রায় ২০ লক্ষ লোকের ১৮ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য নষ্ট হয় তখন এই নামের অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না।

প্রায় ১০।১২ বৎসর লাগিবে এই পরিকল্পনার সম্পূর্ণ রূপ-দান করিতে। শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইবে এবং সেই সময় প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে, পরিকল্পনার এই অংশে। পূর্ব্ব-কোশী খালের উপর প্রথম অংশে ২০,০০০ হাজার অশ্বশক্তি সামর্থ্যবান একটি বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কোশী নদীর উৎপত্তি-স্থান নেপাল রাষ্ট্রে। এই নদীর নিয়ন্ত্রণ উপলক্ষে নেপালের সঙ্গে বিহার প্রদেশের একটা বোঝাপড়া করিতে হইয়াছে, যেমন হইয়াছে ময়ূরাক্ষী নদীর নিয়ন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সঙ্গে, কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট এই বিষয়ে মধ্যস্থতা করিয়াছেন। কারণ কেন্দ্রের আনুকূল্য ও আর্থিক সাহায্য না পাইলে এরূপ বিরাট পরিকল্পনায় হাত দেওয়া সম্ভব নয়।

রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষা

একখানি সাময়িক পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে :

"উনবিংশ শতকের যুগন্ধর পুরুষ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির তিন বৎসরের প্রচেষ্টায় সম্প্রতি হুগলী জেলার আরামবাগ শহরে রামমোহন স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে গত ২৮শে মে তারিখে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুত কালা ভেঙ্কটরাও এই স্মৃতিসৌধের উদ্বোধন করিয়াছেন। অপরাহ্ন দুই ঘটিকায় স্মৃতিসৌধের পার্শ্ববর্তী প্রশস্ত ময়দানে নির্ম্মিত একটি মণ্ডপে অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হয়।

সৌধের উদ্বোধন-প্রসঙ্গে শ্রীযুত কালা ভেঙ্কটরাও বলেন, রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের সঙ্গে যে যুগের সূচনা হয় এবং জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের সঙ্গে যে যুগের অবসান ঘটে, রাজা রামমোহন সেই যুগের একজন বিশিষ্ট রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ছিলেন।

এই স্মৃতিসৌধটির আয়তন ৭৫ × ২৫ ফুট। ইহার উভয় পার্শে দুইটি সুপরিসর কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে। হলটি নির্ম্মাণ করিতে আটচল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার সহিত সংলগ্ন একটি গ্রন্থাগার ও একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতিমধ্যেই দশ হাজার টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিবার জন্য আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রয়োজন হইবে। হল-সংলগ্ন জমিতে একটি ব্যায়ামাগার ও একটি পার্ক নির্ম্মিত হইবে। স্থানীয় জনসাধারণের সুবিধার্থে পানীয় জল সরবরাহের জন্য দুইটি পুষ্করিণীও খনন করা হইবে।"

স্মৃতিরক্ষার এই ব্যবস্থায় আমরা আনন্দিত। কিন্তু আরামবাগ শহর ও রামমোহন রায়ের জন্মভূমি যেরূপ দুরধিগম্য হইয়া রহিয়াছে, তার জন্য ব্রাহ্মসমাজ রাধানগরে যে স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন ও আরামবাগে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন; তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যাইবে। হুগলী জেলাবোর্ড এই বিষয়ে তৎপর হইবেন আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি।

শ্রীঅতুলা ঘোষ রামমোহন যে আদর্শের "উপাসক" ছিলেন তাঁহার প্রচারের কথা বলিয়াছেন; রাধানগর ও আরামবাগ যাতায়াতের সুগম করিয়া দিলে রামমোহন রায়ের জন্মভূমি আন্তর্জাতিক তীর্থে পরিণত হইবে।

মুর্শিদাবাদ জেলার সংবাদপত্র

মুর্শিদাবাদ জেলায় "মুর্শিদাবাদ সমাচার" নামীয় একখানি "নির্দলীয়" সাপ্তাহিকের প্রথম সংখ্যায় (৫ই আষাঢ়, ১৩৫৭ সাল) ঐ জেলার সংবাদপত্র প্রকাশের একটি ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে :

"১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে কাসিমবাজারের স্বর্গত: রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বর্গীয় গুরুদয়াল চৌধুরীর সম্পাদনায় মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী নামে যে সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়, মফঃস্বল বাংলার তাহাই প্রথম সংবাদপত্র। বহরমপুরের বানজেটিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন যিনি দেখিয়াছিলেন, বিদ্যোৎসাহী সেই রাজা কৃষ্ণনাথের নাম মুর্শিদাবাদের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্রের সহিত জড়িত। তাহার পর এই শতাধিক বৎসরে বহু সংবাদপত্র যে মুর্শিদাবাদে জন্মিয়াছে ও মরিয়াছে, তাহা নয়। এ যাবৎ যতগুলি সংবাদপত্র জেলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হাতে গণিয়া বলা যাইতে পারে। জমিদার-প্রধান মুর্শিদাবাদ জেলা যে পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে পশ্চাৎপদ ছিল; তাহার কারণ উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের অভাব নয়, তাহার কারণ ধনিকদের নিশ্চেষ্টতা এবং জেলাবাসীর চেষ্টার অভাব।

সংবাদপত্র হিসাবে যে কয়খানি পত্রিকা এ যাবৎ মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বেশীর ভাগ সাপ্তাহিক। কয়েকখানি পাক্ষিক পত্রিকাও প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এখানে সাহিত্য পত্রিকার উল্লেখ করিব না। মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রীর পর "ভারতরঞ্জন", "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" ও "সম্বাদ রসরাজ" মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত হয় এবং অল্পদিন চলিয়াই বন্ধ হইয়া যায়। তাহার পর "মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি" ও "মুর্শিদাবাদ হিতৈষী" (১৩০০) প্রকাশিত হইতে থাকে। তন্মধ্যে হিতৈষী পত্রিকাখানি যেভাবেই হউক আজও টিকিয়া আছে। ইহা ব্যতীত নসীপুর হইতে "উন্নতি সোপান" ও বহরমপুর হইতে "প্রতিকার" প্রকাশিত হইত। বর্ত্তমানে তাহাদের কোনোটিই টিকিয়া নাই। কান্দী হইতে "কান্দী বান্ধব" (১৩৩০) এবং রঘুনাথগঞ্জ হইতে "জঙ্গীপুর সংবাদ" (১৩২১) অদ্যাবধি যথারীতি প্রকাশিত হইতেছে। পাক্ষিক সংবাদপত্রের মধ্যে "কান্দী পত্রিকা", "বিদূষক" ও "শাশ্বতী" কিছুকাল চলিয়া পরে প্রকাশ বন্ধ করে। ইংরেজ শাসনকালে মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে প্রকাশিত এই সংবাদপত্রগুলির মধ্যে মাত্র তিনখানি আজও চলিতেছে। কিন্তু তাহাদের কোনটিরই প্রচার সংখ্যা অধিক নয়।

বর্ত্তমানকালে মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে সংবাদপত্র হিসাবে

পাক্ষিক 'গণরাজ' (১৩৫৫), 'পদাতিক' (১৩৫৫) ও 'আগামী কাল' (১৩৫৬) নামে তিনখানি নূতন পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।"

পশ্চিমবঙ্গের খাদিবোর্ড

পশ্চিমবঙ্গের খাদিবোর্ডের ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত একটি কার্য্য-বিবরণী দেখিলাম। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :

১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদেশে খাদি শিল্প প্রসারকল্পে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। গ্রামবাসিগণকে চরকার মাধ্যমে বস্ত্র বিষয়ে স্বাবলম্বী করা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল।

গত দুই বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৭টি জেলায় ১৪টি গ্রাম্য খাদিকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। নিখিল-ভারত চরকাসঙ্ঘের নিয়ম অনুযায়ী এই সকল কেন্দ্রে সর্ব্বমোট ২০৫ জন শিক্ষার্থীকে খাদিশিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। শিক্ষা সমাপনান্তে খাদি কর্ম্মিগণ গ্রামে বসেন। এই সকল কর্ম্মীদের মধ্যে ১৬৫ জন কর্ম্মী গ্রামবাসীদের চরকা প্রচলনের দ্বারা বস্ত্র বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য ঐ সকল কেন্দ্রে থাকিয়া কাজ করিতে থাকেন। খাদিবোর্ডের কর্ম্মকেন্দ্র মোট ৪৬২টি গ্রাম তথা ৪৫ হাজার পরিবার লইয়া। গত দুই বৎসরের মধ্যে কর্ম্মিগণ ৯০১১ জন গ্রামবাসীকে তুলা ধুনাই ও সুতা কাটা শিক্ষা দিয়াছে এবং ঐ সকল পরিবার ৭৬৩৫টি চরকা এবং স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ৫০৫৮টি তকলীর প্রবর্ত্তন করিয়াছে। স্বেচ্ছা কাটুনীরা মোট ৩২৪ মণ সুতা উৎপাদন করিয়াছে। কাপড়ের হিসাবে ইহা ১ লক্ষ বর্গগজ কাপড় হয়। এই ৩২৪ মণ সুতার মধ্যে মাত্র ২২১ মণ সুতা বোনা হইয়াছে। অর্থাৎ উহাতে ৬৪,৭৭৪ বর্গগজ কাপড় তৈয়ারী হইয়াছে। উপরোক্ত হিসাব হইতে ইহা ধরিয়া লওয়া যায় যে, ৪৫ হাজার পরিবারের মধ্যে ১০ হাজার পরিবার সুতাকাটা গ্রহণ করিয়াছে ও গত দুই বৎসরে মাথাপিছু ১০ বর্গগজ কাপড় প্রস্তুত করিয়াছে। এই কাপড় তাহারা নিজেরা ব্যবহার করিয়াছে।

খাদির কাজ ব্যতীত কর্ম্মীরা গ্রামের উন্নতিমূলক অন্যান্য কর্ম্ম করিয়াছেন, যেমন পুকুর পরিষ্কার, জঙ্গলকাটা, রাস্তা তৈয়ারী ও মেরামত, পায়খানা প্রস্তুত, পচাইসার তৈয়ারী, বয়স্ক শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি। চরকার নূতন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে গ্রামবাসীদের মধ্যে সুতাকাটার মনোভাব জাগ্রত করিবার জন্য ১০০ কাটাই মণ্ডল গঠন করা হইয়াছে।

ঐ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৮ মণ তুলা বীজ বিতরণ করা হইয়াছে।

ভারতে সংঘর্ষের আশঙ্কা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার ভারতীয় চরকা-সঙ্ঘের সভাপতি ; আযৌবন গান্ধীজী প্রদর্শিত গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া বর্ত্তমানে তিনি এই পদে মনোনীত হইয়াছেন। রাজস্থান গঠন কর্ম্মী-সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা প্রেরণ করেন, তাহাতে দেখা যায় ভারতরাষ্ট্রের মধ্যে দুইটি বিরোধী ভাবশক্তি যে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছে তৎ সম্বন্ধে একটা আশঙ্কার প্রকাশ। একজন গঠনকর্ম্মী শ্রেষ্ঠের চক্ষে ভারতের এই অন্তর্বিপ্লবের চিত্র কি ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার বক্তৃতায় তাহার আভাষ পাওয়া যায়। আমরা বক্তৃতার একাংশ তুলিয়া দিলাম। নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস মত বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায়ও তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন :

যদি আমরা গান্ধী প্রদর্শিত পথে আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান না করতে পারি তা হলে আর্থিক সমস্যারূপী দরজা সোনার বাহনে চড়ে আমেরিকার প্রভাব আমাদের দেশে পৌঁছে দেবে আর সামাজিক সমস্যার দরজা দিয়ে শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্য দূর করার অজুহাতে রাশিয়ার প্রভাব ভারতের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে।

আবার ভারতের রঙ্গভূমিতে আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রভাবের ভীষণ সঙ্ঘর্ষ সুরু হবে এবং ভারতের লোকেরা তখন অর্দ্ধেক এদিকে ও অর্দ্ধেক ওদিকে হয়ে ঐ তাণ্ডবের মধ্যে যোগদান করবে। এই রকম সঙ্ঘর্ষের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে দেশের জনগণ দেড়শ' বছর আগে যেরকম ইংরেজ এবং ফ্রান্সের শক্তির মধ্যে যাদের ধ্বনি অধিক শুনতে ভাল লেগেছিল এবং যাদের অধিক শক্তি দেখেছিল তাদের "ঈশ্বরীয় বিধান" বলে বরণ করে নিয়েছিল সেই রকম আজকের দিনে বড় বড় নেতা রুশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে যার ধ্বনি বেশী আকর্ষক হবে এবং যার শক্তি বেশী মনে করবেন তাকেই বুকে তুলে বলবেন "ইহা ঐতিহাসিক প্রয়োজন।"

ভারতরাষ্ট্রে নাবিক বৃত্তি

"আনন্দবাজার পত্রিকা"র ২৩শে আষাঢ় কলিকাতা সংস্করণে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রে উল্লিখিত অভিযোগ পোর্টট্রাষ্ট কমিশনের সভাপতি মহাশয়ের বিরতির প্রতিবাদ বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। সেইজন্য ইহা উদ্ধৃত করিলাম :

"মহাশয়,—হেষ্টিংস্থিত মেরিণ হাউস হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে যে সব জাহাজী শ্রমিক লওয়া হয় তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯জন পাকিস্থানী মুসলমান। নেহরু লিয়াকৎ চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর এই সব বিদেশী দলে দলে আসিতেছে। ইহারা যে বিশ্বস্ত মনোভাব লইয়া আসে তাহা নয়। সুতরাং ইহাদের মত বিদেশীদের উপর জাহাজী শ্রমিকের প্রায় সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া কি ভবিষ্যতের অমঙ্গল-সূচক নয় ? এমন দেখিয়াছি যে, পূর্ব্ববঙ্গীয় হিন্দু যুবকদের মধ্যে যাহারা ৪।৫ বৎসর নৌ-বিভাগে কাজ করিয়াছে,

তাহাদেরও লওয়া হয় না। কেন, এখানে তো আর ট্রেনিং-এর প্রশ্ন উঠে না, তবে কেন লওয়া হয় না? ইহা ছাড়াও দেখা গিয়াছে যে, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুরের যে সব মুসলমান আট হইতে ত্রিশ বৎসর যাবৎ জাহাজে কাজ করিয়াছে, তাহারাও সুযোগ পায় না। একজন বর্দ্ধমানের মুসলমানকে দেখিয়াছি, সে ১৯২০ সাল হইতে লস্করের কাজ করিতেছে, অথচ আজ তিন বৎসর যাবৎ মেরিণ হাউসে চাকুরীর জন্য ঘোরাঘুরি করিয়াও সে চাকুরী পাইতেছে না (নলী নং ০৭০৩৩৩, মণিরুদ্দীন)। অথচ চোখের সামনে প্রতিদিন পাকিস্থানীয় বিদেশী শ্রমিকদের লওয়া হইতেছে। ইহার সুস্পষ্ট কারণ জানিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, শিপিং মাষ্টার, পোর্ট কমিশনারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এইরূপ পক্ষপাতমূলক আচরণের ভিতর কি রহস্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা জানিবার দাবি জনসাধারণের আছে।

তাহাদের পরিচয়পত্র (নলী) ('ব্রিটিশ প্রজা') বলিয়া আজও নতুন নলীতে লেখা থাকে। দেশ স্বাধীন হইবার তিন বৎসর পরও আমরা কি ভাবে ব্রিটিশ প্রজা রহিয়া গেলাম তাহার পরিষ্কার উত্তরের জন্য পোর্ট কমিশনারদের ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ইতি—জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী।"

পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি ছোট শহর

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে যে যে স্থানে ১৬টি ছোট শহর নির্ম্মাণের পরিকল্পনা হইয়াছে, তাহার নাম এবং বর্ত্তমান বৎসরের গৃহ নির্ম্মাণের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

	স্থান	গৃহের সংখ্যা
(১)	নৈহাটি	১,১২০
(২)	কুলটি	২০০
(৩)	সলিপুর-সুদ্ধিপুর	২৫০
(৪)	জয়তারা	৮৮৪
(৫)	হালিসহর-মাল্লিকের বাগ	৭৫০
(৬)	বেরিজ-কুইপুকুর	৯০
(৭)	বেণুয়াডহরি	২০০
(৮)	বনগাঁও	৩০০
(৯)	চম্পাবাড়ী	২৫৪
(১০)	বলটিকরী	৬০০
(১১)	দেবগ্রাম	৮০০
(১২)	শিলিগুড়ী (২য় বাজার)	১,২০০
(১৩)	মুষাডাঙ্গা	৩৮
(১৪)	গড়িয়া	৩,৬০০
(১৫)	বল্লিনি	১০০
(১৬)	হাবড়া-বৈগাছি	১৪,০০০
	মোট	২৩,৫৮৬

কোন্ শ্রেণী বা পর্য্যায়ের লোকের ব্যবহারের জন্য এই সব শহর ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করা হইতেছে, এই হিসাবের সঙ্গে যদি তাহার একটা বিবরণ থাকিত তবে এই পরিকল্পনার মূল্য ধার্য্য করা সহজ হইত। গৃহের যেমন প্রয়োজন বৃত্তিরও তেমনি প্রয়োজন; বিত্তহারা লোকের গৃহ টিকিয়া থাকে না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নিয়ামকেরা তাঁহাদের পরিকল্পিত গৃহের অধিকারীবর্গের জন্য অধিকসংখ্যক বৃত্তির কি ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা আমাদের জানাইলে এই নূতন শহর নির্ম্মাণের পরিকল্পনার সুষ্ঠু আলোচনা হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-বিভাগ এই বিষয়ে একটু তৎপর হইলে সুখী হইব।

হিন্দু সমাজে সঙ্কীর্ণতা

গত আষাঢ় মাসের "দামোদর" (বর্দ্ধমান) পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান সদর থানার বণ্ডুল ইউনিয়নের মুল্যো গ্রামের শ্রীপঞ্চানন গুহের উপর উক্ত গ্রামের কয়েকটি গোঁড়া উগ্রক্ষত্রিয় নানাবিধ সামাজিক অত্যাচার করিতেছে। কৈবর্ত্তের শবদাহ করিবার জন্য পঞ্চানন ও আরও কয়েকজনকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য করা হয়। পঞ্চানন ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তাহার দেবসেবা বন্ধ করা হইয়াছে এবং তাহার খামার বাড়ীর রাস্তা বন্ধ করা হইয়াছে। গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ ঐ গ্রামের শ্রীঅবিনাশ সামন্তের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে পঞ্চাননের নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া তাহাকে 'একঘরে' করা হইয়াছে।

এই সঙ্কীর্ণতার অত্যাচারে ভারতবর্ষ যুগে যুগে বিপন্ন হইয়াছে; হিন্দু-সমাজ শতধা বিভক্ত হইয়া দেশের স্বাধীনতা হারাইয়াছে—এই তিক্ত অভিজ্ঞতায় আজও আমাদের চৈতন্য হয় নাই দেখিতেছি। দেশের কবি, দেশের চিন্তা-নায়কগণ আমাদের সমাজকে সাবধান করিয়াছেন। গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য তাঁহার প্রাণপণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভেদ-বিচ্ছেদের কথা বলিয়া এই সঙ্কীর্ণতার রাজনীতিক ও সমাজনীতিক কুফল সম্বন্ধে আমাদের জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজ শাসনের পেষণে হাড়ে হাড়ে আমাদের তাহা বুঝা উচিত ছিল। এই কথাই রবীন্দ্রনাথ বার বার আমাদের বলিয়াছিলেন বিশ্ব-বিধানের অলঙ্ঘ্য সত্যরূপে :

"মানুষের সম্মান থেকে যাদের নির্ব্বাসিত করে দিলুম তাদের আমরা হারালুম। আমাদের দুর্বলতা ঘটল সেইখানেই, সেইখানেই শনির রন্ধ্র। এই রন্ধ্র দিয়েই ভারতবর্ষের পরাভব তাকে বারে বারে নত করে দিয়েছে।...যেখানেই এক দলের অসম্মানের উপর আর এক দলের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেইখানেই ভারসামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে বিপদ ঘটে। এর থেকেই বোঝা যায়, সাম্যই মানুষের মূলগত ধর্ম্ম।"

"যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে
বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে ফেলিছ যারে সে তোমারে
পশ্চাতে টানিছে।"

মুদ্রারাক্ষস ও মগধের রাষ্ট্রবিপ্লব

ডক্টর শ্রীসুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত এম-এ, পিএইচ্‌-ডি

১

নন্দবংশ ধ্বংসের অন্তে মগধের রাজসিংহাসনে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। বিষ্ণু, ভাগবত, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্যপুরাণে ঘটনাটির উল্লেখ রহিয়াছে। ঘটনাটি ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সন-তারিখ নির্ণয়ের পক্ষেও খুব কাজে লাগিয়াছে। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত ও গ্রীক আলেক্‌জান্ডার সমসাময়িক। চন্দ্রগুপ্তের কথা গ্রীকদের বিবরণীতে বর্ণিত আছে। সুতরাং এই প্রথম মৌর্য্যরাজার সিংহাসনপ্রাপ্তির সময় একরূপ নির্দ্ধারিত। এই নির্দ্ধারিত সময় হইতে গণনা করিয়া চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীকালের ইতিহাসকে অনেকটা সন-তারিখের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলা সম্ভব হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের সময় নির্ণয় করার পূর্ব্বে ইহা কষ্টসাধ্য ছিল।

চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে যতকিছু ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করা গিয়াছে তার একটি বিশিষ্ট অংশ "মুদ্রারাক্ষস" নামক সংস্কৃত নাটকখানি হইতে প্রাপ্ত। মৌর্য্য রাজসভায় দূতরূপে আসিয়া গ্রীক মেগাস্থিনিস নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহা এখন অপ্রাপ্য। পরবর্ত্তী গ্রীক ও রোমান লেখকদের গ্রন্থে মেগাস্থিনিস হইতে উদ্ধৃত যে সমস্ত উক্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায় তাহারই সঙ্কলনকে বর্ত্তমানে মেগাস্থিনিসের "ভারত-বিবরণ" এই আখ্যা দেওয়া হইতেছে। এই বিবরণ মৌর্য্য-রাজ্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রামাণিক গ্রন্থ। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে দাক্ষিণাত্যে আর একটি অমূল্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, পণ্ডিত সামশাস্ত্রী কর্ত্তৃক কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্রের আবিষ্কারে। ভিন্টেরনীৎস প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বিরুদ্ধ মত থাকাসত্ত্বেও অধিকাংশ ভারতীয় ঐতিহাসিকই গ্রন্থখানিকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্যের নিজের রচনা বলিয়া মনে করেন। মৌর্য্যরাজ্যের পরিচালনা ও গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে এই অর্থ-শাস্ত্রের প্রামাণিকতা সর্ব্বোপরি।

কিন্তু মগধের রাষ্ট্রবিপ্লবে ঘটনার স্রোত কিভাবে বহিয়াছিল সে সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ হইতেই আমরা ততটা প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি না যতটা পারি "মুদ্রারাক্ষস" নাটকখানি হইতে। সিংহলী ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রন্থের ইতিহাস মহাবংশের টীকাতেও আমরা চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত কাহিনীর আভাস পাই। এই টীকার কিয়দংশ মোক্ষমুলার তাঁহার "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" নামক ইংরেজী পুস্তকে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। এই কিম্বদন্তীগুলিও 'মুদ্রারাক্ষসে' বর্ণিত বিষয়টিকে বুঝিতে সাহায্য করে। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম গ্রন্থাদিতে মৌর্য্যদিগের সম্বন্ধে কিছু কিছু উক্তি প্রকীর্ণ রহিয়াছে। এ সমস্তই ঐতিহাসিক প্রমাণ-রূপে ব্যবহার করা সম্ভব। আর চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের অনুশাসনগুলির ত কথাই নাই। গান্ধারের সাহাবাজগড়ী হইতে পূর্ব্ব উপবির প্রান্তে উড়িষ্যার ধৌলিশহর পর্য্যন্ত গিরিগাত্রে ও স্তম্ভে স্তম্ভে এই অনুশাসনগুলি উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

এই অনুশাসনগুলিরও আবিষ্কার হইয়াছে খুব বেশী দিন আগে নহে। মুদ্রারাক্ষস গ্রন্থখানি কিন্তু বহুদিন ধরিয়া ভারতের পণ্ডিতসমাজে আদৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার পঠনপাঠন সর্ব্বত্র প্রচলিত। অনেক বিদ্বান ব্যক্তি মুদ্রা-রাক্ষসের সন-তারিখ ও ইহার ঐতিহাসিক বর্ণনা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও লেখা পরবর্ত্তী কালের তথ্যাবিষ্কারে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, কাহারও লেখা সন্ধান করিয়া বাহির করা বর্ত্তমানে দুঃসাধ্য, এবং অনেকেই মুদ্রারাক্ষসকে শুধু মৌর্য্য রাজত্বকাল সম্বন্ধে অন্যতর প্রমাণ-রূপে ব্যবহার করিবার জন্য যতটুকু আলো-চনার আবশ্যক তাহার বেশী আলোচনা করিতে প্রয়াসী হন নাই। এই সমস্ত কারণেই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পুস্তকখানির আরও বিস্তৃত আলোচনা করার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

মুদ্রারাক্ষস হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিবার সময়ে দুইটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ গ্রন্থকারের নিজ-সময়, অর্থাৎ তিনি বর্ণিত ঘটনাবলীর কাল হইতে কত দূর ব্যবধানে; দ্বিতীয়তঃ নাট্যের বর্ণনায় তাঁহার হাতে প্রকৃত ইতিহাসের রূপান্তরিত হইবার সম্ভাবনা কতখানি। বিষয় দুইটি সম্যক্ বিবেচনা করার পরও মুদ্রারাক্ষস হইতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

২

গ্রন্থকার কে ও তাঁহার সময় কখন? বইখানি যে বিশাখ দত্তের রচনা তাহার প্রমাণ গ্রন্থের প্রথমে ও শেষে দেওয়া রহিয়াছে। শেষের উল্লেখ কিন্তু মামুলীমাত্র—ইতি বিশাখদত্তবিরচিতং মুদ্রারাক্ষসনাটকং সমাপ্তম্।

গ্রন্থকার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকাসত্ত্বেও পরবর্ত্তীকালে কোন লিপিকার এরূপ লিখিয়া রাখিতে পারে। কিন্তু নাট্যের প্রারম্ভে যখন সূত্রধার নান্দীপাঠ অন্তে ভণিতা করিতেছে যে, বিশাখদত্তকৃত নূতন নাটক মুদ্রারাক্ষস অভিনয় করিতে সে পরিষৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছে তখন আর এই নাটকের প্রণেতা কে তৎসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না, বিশেষতঃ যখন তাঁহার নামধাম এবং পিতৃপুরুষের পরিচয়ও এই ভণিতার মধ্যেই পাওয়া যাইতেছে।

বিশাখ দত্তের সময় লইয়া কিন্তু বাদানুবাদ চলিয়াছে বিস্তর। কীথ্ সাহেব (Sir A. B. Kieth) তাঁহার সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বলিয়াছেন যে, বইখানিকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফেলা হয় বটে তবে ইহা খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর লেখা হওয়াও বিচিত্র নয়। শুধু ভাষাগত বিচারেও কথাটা অগ্রাহ্য। উইল্সন বা কানিংহাম বইখানিকে একাদশ শতাব্দীতে ফেলিলেও তাঁহাদের এরূপ উক্তি অমার্জ্জনীয় নয়, কারণ তাঁহাদের সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস কেবল আলোচিত হইতে সুরু করিয়াছে। কিন্তু কীথ ও তাঁহার গুরু ম্যাক্ডোনেলের উক্তি নিতান্তই দায়িত্বহীন ও অতিশয় খেলো। বিশাখ দত্তকে চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগের গুপ্ত সম্রাটদিগের সময়ের লোক বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। সূত্রধার তাঁহার পরিচয়ে বলেন যে, এই বিশাখ দত্ত সামন্ত বটেশ্বর দত্তের পুত্র ও মহারাজপদ্ভাক্ পৃথুর পুত্র। উপাধি দুইটির প্রয়োগ গুপ্তযুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বিশাখ দত্তের নিজের নামও সেই সময়ের পরিচায়ক যখন দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় ভারতবর্ষে বিশাখ নামে বিশেষ পূজা পাইতেন। চন্দ্রগুপ্তের সহোত্থায়ীদিগের নাম করিতে গিয়াও বিশাখ দত্ত কতকগুলি নাম ও পদবীর উল্লেখ করিতেছেন—গজাধ্যক্ষ ভদ্রভট, অশ্বাধ্যক্ষ পুরুষদত্ত, মহাপ্রতীহার চন্দ্রভানুর ভাগিনেয় ডিঙ্গরাত, চন্দ্রগুপ্তের স্বজন-স্বন্ধী মহারাজ বলদেব গুপ্ত, কুমারসেবক রাজসেন, সেনাপতি সিংহবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাগুরায়ণ, মালব রাজপুত্র লোহিতাক্ষ ও ক্ষত্রগণমুখ্য বিজয়বর্ম্মা। যাঁহারা গুপ্তযুগের অনুশাসনগুলির সহিত পরিচিত (*Fleet* দ্রষ্টব্য) তাঁহাদের নিকট এই নাম এবং পদগুলি খুবই পরিচিত বলিয়া মনে হইবে। বিশাখ দত্ত যিনিই হউন তিনি মানুষের নাম ও পদবীর উল্লেখ করিতে গিয়া গুপ্তকালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

বিশাখ দত্তের সময়ে ভারতবর্ষে ধর্ম্ম লইয়া কোন বিরোধ ছিল না। হর এবং হরি পাশাপাশি পূজা পাইতেন। তৃতীয় অঙ্কে বৈতালিকের শ্লোকে আমরা দেখি শরৎকালের বর্ণনায় হরি ও হরের সমান পূজা। গ্রন্থের নান্দীতে শিবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনসূচক দুইটি শ্লোক রহিয়াছে এবং শেষের দিকে দেখি সিদ্ধার্থক গাহিতেছে বিষ্ণুর জয়গান —"জয়তি জলদনীলঃ কেশবঃকেশিঘাতী" বলিয়া। বিষ্ণু বরাহ অবতারে সম্যক্ পূজা পাইতেন, নাটকের শেষ শ্লোকে আমরা তার নিদর্শন পাই। মধ্যভারতের ঐরাণ প্রভৃতি স্থানের মন্দিরাদিতেও আমরা বরাহমূর্ত্তির বিগ্রহ দেখিতে পাই। মন্দির ও মূর্ত্তিগুলি গুপ্তযুগের।

এই সময়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মের পরস্পরের প্রতি কোন বিদ্বেষ-ভাব ছিল না। বুদ্ধদেব ও প্রাক্তন বুদ্ধদের সম্বন্ধে হিন্দুদিগের মনোভাব ছিল অতিশয় শ্রদ্ধাপূর্ণ। চন্দনদাসের মহান্ আত্মত্যাগের প্রশংসা করিতে গিয়া কবি বলিতেছেন, বুদ্ধানামপি চেষ্টিতং সুচরিতৈঃ ক্লিষ্টং বিশুদ্ধাত্মনা। এই বিশুদ্ধাত্মা চরিত্রমাহাত্ম্যে বুদ্ধদিগের কীর্ত্তিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। জৈনধর্ম্মের প্রতিও লোকের শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। ভদন্ত, অর্হত, শ্রাবক প্রভৃতি বিশিষ্ট জৈন কথাগুলি লোকে যে-কোন সময়েই ব্যবহার করিত। দিন-ক্ষণ দেখিতে জৈন সন্ন্যাসীর খোঁজ পড়িত। বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রতি এই শ্রদ্ধা সপ্তম শতাব্দী হইতেই বিদ্বেষে ও ঘৃণায় পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছিল। হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যকালে সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্রাহ্মণের দল যে বৌদ্ধ-মন্দির পোড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল, ইউয়াঙ্চাঙ-এর (Hiuentsiang) ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তাহার বর্ণনা আছে। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমাংশে ভবভূতি তাঁহার মালতীমাধব নাটকে বৌদ্ধমঠাদির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা মঠবাসীদের চরিত্রগত অসংযমে পূর্ণ। অষ্টম শতাব্দীর পর ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রভাবে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল।

আর একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। চাণক্যের প্রতি বিশাখ দত্তের মনোভাব অতিশয় শ্রদ্ধাপূর্ণ। চাণক্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং প্রাণের উদারতায় মহান্। শত্রুপক্ষীয় অমাত্য রাক্ষসের প্রতি তাঁহার সম্মানপ্রদর্শন অতীব হৃদয়স্পর্শী। রাক্ষসও তাঁহাকে বলিয়াছেন, "আকরঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং রত্নানামিব সাগরঃ"। বাণভট্টের সময়ে কিন্তু লোকে চাণক্যকে ক্রূর ধর্ম্মহীন কূটনীতি-বিশারদ বলিয়া গালাগালি দিতে ত্রুটি করে নাই ("হর্ষচরিত" দ্রষ্টব্য)। সুতরাং বিশাখ দত্তকে বাণভট্টের বেশ কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই গ্রহণ করা সঙ্গত।

মুদ্রারাক্ষস নাটকের শেষে ভরতবাক্যের শ্লোকটি গ্রন্থের রচনাকাল বেশ স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দেয়। শ্লোকটিতে আছে—

বারাহীমাত্মযোনে স্তনুমবনবিধা বাস্থিতস্যানুরূপাং
যস্য প্রাগ্ দন্তকোটিং প্রলয়পরিগতা শিশ্রিয়ে ভূতধাত্রী।
ম্লেচ্ছৈ রুদ্বিজ্যমানা ভুজযুগমধুনা সংশ্রিতা রাজমূর্ত্তেঃ
স শ্রীমদ্বন্ধুভৃত্য শ্চিরমবতু মহীং পার্থিব শ্চন্দ্রগুপ্তঃ।

ম্লেচ্ছগণকর্ত্তৃক বিপন্ন হইয়া ভূতধাত্রী বসুন্ধরা যে রাজ-মূর্ত্তির বাহুযুগ সম্প্রতি আশ্রয় করিয়াছেন বন্ধুগণের পালক সেই পৃথিবীশ্বর চন্দ্রগুপ্ত চিরকাল এই মহীতল শাসন করুন —শ্লোকের শেষ অর্দ্ধের ইহাই অর্থ। এই পার্থিবশ্চন্দ্রগুপ্তঃ গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছাড়া আর কেহই নহেন। তিনিই ম্লেচ্ছ হূণদিগের হাত হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ম্লেচ্ছ কথাটি সংস্কৃত ভাষায় অতি প্রাচীন এবং মুসলমান ধর্ম্মের উদ্ভবের অনেক পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। পার্থিবশ্চন্দ্রগুপ্তঃ স্থলে পার্থিবোঽবন্তিবর্ম্মা বা পার্থিবোরন্তিবর্মা বলিয়া যে পাঠান্তর কোন কোন হস্ত-লিপিতে দেখা যায় তা নিতান্তই অগ্রাহ্য। কারণ ভরতবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন ব্রাহ্মণ রাক্ষস, তাহার বেশ পরিবর্ত্তন না করিয়াই। এই আশীর্বাদে এমন কোন রাজার নাম উচ্চারিত হওয়া সম্ভব নয় যে নামের সদৃশ নাম নাট্যের কোন বিশিষ্ট চরিত্রের নহে। সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ছিল ৩৮০ হইতে ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ইঁহারই রাজত্বকালে মুদ্রারাক্ষস প্রণীত হয়। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সহিত নামের সাদৃশ্য থাকাতে ভরত-বাক্যে ইহার প্রশস্তি সম্ভব হইয়াছে।

মুদ্রারাক্ষসে জ্যোতিঃশাস্ত্রকে বলা হইয়াছে চতুঃ-ষষ্ঠ্যঙ্গ। ২৪ অঙ্গ ও ৪০ উপাঙ্গে রচিত জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিভাগ-বর্ণনা রহিয়াছে প্রাচীন গর্গ সংহিতায়। পঞ্চম শতাব্দীতে পাটলীপুত্র নিবাসী আর্য্যভট্ট ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জয়িনী নিবাসী বরাহ-মিহির যে সংহিতাদ্বয় প্রণয়ন করেন তাহার অঙ্গযোজনা অন্যপ্রকার। মুদ্রারাক্ষস ইহাদের পূর্ব্বে রচিত হইয়া থাকিবে। নাটকের প্রথম অঙ্কে আমরা দেখিতে পাই যে, ক্রূরগ্রহ কেতু চন্দ্রকে সম্পূর্ণমণ্ডল পাইয়াও গ্রাস করিতে পারিতেছে না যেহেতু বুধ যোগ রহিয়াছে। বুধ যোগহেতু গ্রহণের ব্যতীপাত কতকাল ধরিয়া ভারতবর্ষে জ্ঞাত ছিল তাহা হয় ত বিশাখ দত্তের সময়ের কিছু পরিচয় দিবে। তর্কশাস্ত্র হইতে নিম্নোদ্ধৃত যে উপমা নাটকের পঞ্চমাঙ্কে দেখিতে পাওয়া যায়—

সাধ্যে নিশ্চিতমন্বয়েন ঘটিতং বিভ্রৎ স্বপক্ষে স্থিতিং
ব্যাবৃত্তং চ বিপক্ষতো ভবতি যৎ তৎ সাধনং সিদ্ধয়ে।
যৎসাধ্যং স্বয়মেব তুল্যমুভয়োঃ পক্ষে বিরুদ্ধং চ যৎ
তস্যাঙ্গীকরণেন বাদিন ইব স্যাৎ স্বামিনো নিগ্রহঃ। (দশম শ্লোক)

তাহারও নির্ভরস্থল কোন্ বিশেষ গ্রন্থ জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাহা বলিয়া দিলে মুদ্রারাক্ষসের সময়নির্দ্দেশের কার্য্য আরও সহজ হইতে পারে। নিজের ব্যবসায় হইতে নাট্যকার যে সমস্ত উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা কিন্তু কোন আধুনিক অলঙ্কার-গ্রন্থের শ্লোককে মনে করাইয়া দেয় না। ষষ্ঠ অঙ্কের প্রারম্ভে রহিয়াছে, "তৎ কিং নিমিত্তং কুকবিকৃতনাটকস্য ইব অণ্যন্ মুখে, অণ্যন্ নির্ব্বহনে।" চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় শ্লোকে উপমাটি আরও অনেককিছু প্রকাশ করিতেছে—

কার্যোপক্ষেপমাদৌ তনুমপি রচয়ং স্তস্য বিস্তারমিচ্ছন্
বীজানাং গর্ভিতানাং ফলমতিগহনং গূঢ়মুদ্ভেদয়ংশ্চ।
কুর্ব্বন্ বুদ্ধ্যা বিমর্শং প্রসৃতমপি পুনঃ সংহরন কার্যজাতং
কর্ত্তা বা নাটকানা মিমমনুভবতি ক্লেশমস্মদ্বিধো বা।

দেখা যাইতেছে যে, এ সময়ে নাটকের রচনা-প্রণালী লইয়া ভারতবর্ষে আলোচনা যথেষ্টই প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত আলোচনা পরবর্ত্তীকালের অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থগুলিতে কি ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধানও মুদ্রা-রাক্ষসের সময়নির্দ্দেশে সহায়তা করিবে।

বিশাখদত্ত কিন্তু কালিদাসের পরবর্ত্তী। অনেকগুলি কারণে ইহা অনুমান করা স্বাভাবিক। ভাষাগত ঐক্য ও ছন্দোগত আনুগত্য মুদ্রারাক্ষসকে কালিদাসের 'শকুন্তলা'র কাছে ঋণী বলিয়া প্রমাণ করে। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দের অত্যধিক প্রয়োগদর্শনে বিশাখ দত্তকে কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত পৌরাণিক কাহিনীগুলি মুদ্রারাক্ষসে শকুন্তলা হইতে অধিকতর পরিপুষ্ট। প্রথম শ্লোকের "কথয়তু বিজয়া" এবং ষষ্ঠ অঙ্কের "জয়তি জলদ-নীলঃ কেশব কেশিঘাতী" ইহার পরিচায়ক।

মগধের রাষ্ট্রবিপ্লবের যে আভাস মুদ্রারাক্ষসে পাওয়া যায় তাহার অনেকটাই কতকগুলি বিচ্ছিন্ন উক্তি হইতে। উক্তিগুলিতে বিগত ঘটনা সম্বন্ধে অনেকখানি জ্ঞান শ্রোতৃ-বৃন্দের মনে সম্পূর্ণ বিদ্যমান বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং এমন বহু ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে যেগুলি সম্বন্ধে লোকের মন পূর্ব্ব হইতে কিছুমাত্র প্রস্তুত নয়। এই সমস্ত সহজ উক্তি হইতেই ধারণা হয় যে, বিশাখ দত্তের সময় লোকে মৌর্য্যরাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেককিছু জানিত। বিশাখদত্তের এতাদৃশ উক্তিগুলি তাঁহার গ্রন্থকে ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইবার বিশেষ সুযোগ দিতেছে।

পাঁচ-ছয়খানি পুরাণে লিখিত আছে যে, নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বসাইবেন। মুদ্রা-রাক্ষসের সর্ব্বত্র আমরা এই কথারই প্রতিধ্বনি পাইতেছি। কিন্তু নন্দগণ কাহারা ও চন্দ্রগুপ্ত কে এ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে নানা পরস্পরবিরোধী উক্তির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল বলেন যে, "নব নন্দান্" কথার অর্থ নূতন নন্দবংশীয়েরা। নন্দিবর্দ্ধন ও মহানন্দী ছিলেন পূর্ব্ব নন্দ। মহানন্দীর পুত্র নন্দমহাপদ্ম ও তৎপুত্র-

গণ ছিলেন এই নূতন নন্দপর্য্যায়ের। কথাটার সমর্থন কিন্তু পুরাণগুলিতে নাই। মহাপদ্ম ও তাঁহার আট জন পুত্রকে লইয়াই নবনন্দের সমষ্টি। মুদ্রারাক্ষস লিখিতেছেন "সমুৎখাতাঃ নন্দা নব" এবং "উৎখাত্য নন্দান্ নব"; "নব" যদি নূতন এই অর্থে ব্যবহৃত হইত তবে বাক্য দুইটির অন্তে আমরা নবাঃ ও নবান্ পাইতাম। মুদ্রারাক্ষসকার স্পষ্টতঃই "নব" কথাটিকে "নবন্" শব্দের বহুবচন রূপে ব্যবহার করিয়াছেন, অকারান্ত নব শব্দের নহে।

নন্দ মহাপদ্মের নামই কি মহাপদ্ম ছিল, না মহাপদ্ম শব্দটি খ্যাতিবাচক বিশেষণ মাত্র? বায়ুপুরাণ বলেন, "মহানন্দিসুতশ্চাপি শূদ্রায়াং কলিকাংশজঃ। উৎপৎস্যতে মহাপদ্মঃ সর্ব্বক্ষত্রান্তকো নৃপঃ।" এখানে মহাপদ্ম ব্যক্তি-বিশেষের নাম বলিয়া মনে করা যায়। কিন্তু ভাগবতে রহিয়াছে, "মহানন্দিসুতো রাজন্ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো বলী। মহাপদ্মপতিঃ কশ্চিন্ নন্দঃ ক্ষত্রবিনাশকৃৎ। নন্দরাজকে মহাপদ্মপতি বলিলে মহাপদ্ম শব্দটি বিশেষণাত্মক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। মুদ্রারাক্ষসও এই কথারই সমর্থন করে। চাণক্য নন্দদিগের বর্ণনায় বলিয়াছেন "নবনবতিশত-দ্রব্য কোটীশ্বরস্য।" নন্দদিগের অর্থগৃধ্নুতার উল্লেখও মুদ্রা-রাক্ষসে পাই। সুতরাং মহাপদ্ম কথাটি লোকের দেওয়া খেতাব বলিয়াই মনে হয়।

মুদ্রারাক্ষসের টীকাকার ঢুণ্ডিরাজ তাঁহার কথোপো-দ্ঘাতে নন্দমহাপদ্মের নাম সর্ব্বার্থসিদ্ধি বলিয়া একটা মস্ত ভুল করিয়াছেন। সর্ব্বার্থসিদ্ধি নব নন্দের কেহ নহেন, তিনি নন্দবংশীয় মাত্র। নবনন্দের বিনাশের পর অমাত্য রাক্ষস সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। তস্মিন্‌কালে সর্ব্বার্থসিদ্ধিং রাজানম্ ইচ্ছতো রাক্ষসস্য (৫ম অঙ্ক), এ কথা মুদ্রারাক্ষসেই আছে। চাণক্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে বলিয়াছেন "তপস্বী (বেচারা) নন্দবংশীয়ঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ।" সুতরাং এই সর্ব্বার্থসিদ্ধি যে কি করিয়া নব নন্দের প্রধান নন্দ হইতে পারেন তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ঢুণ্ডিরাজ পরবর্ত্তীকালের গোঁজামিল দেওয়া লোকপ্রবাদ এবং আজগুবি ব্যাপারে পূর্ণ কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি গল্পাদির উপর অযথা বেশী নির্ভর করিয়াছেন।

নন্দমহাপদ্ম জাতিতে কি ছিলেন? পুরাণগুলিতে তাঁহাকে একবাক্যে শূদ্রার পুত্র বলা হইয়াছে। তিনি ক্ষত্রিয় রাজা মহানন্দীর পুত্র, কিন্তু "শূদ্রায়াং কলিকাংশজঃ," "শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো বলী" বলিয়া পুরাণে উল্লিখিত। মুদ্রা-রাক্ষসের উক্তিগুলি কিন্তু এই শূদ্রত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। রাক্ষস নন্দবংশকে বরাবর বিপুল আভিজাত্যের অধিকারী বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। এই মহান্ নন্দবংশকে রাক্ষস বলিয়াছেন বৃষ্ণীনামিব শান্তদ্বিষাং নন্দানাং বিপুলে কুলে।" নন্দকে রাক্ষস সর্ব্বদাই উল্লেখ করিয়াছেন "দেব" বা "দেবপাদাঃ" বলিয়া, এবং তাহার তুলনায় চন্দ্রগুপ্তকে বলিয়াছেন কুলহীন, মৌর্য্য, মৌর্য্যপুত্র, বৃষল, মৌর্য্যবৃষল। নন্দ পৃথিবী-বাসব, দেবতাস্বরূপ, "উচ্চৈ অভিজনম্"। এত সব বিশেষণ শূদ্রাপুত্রের প্রতি প্রয়োগ করা খুবই অসংলগ্ন হইত। রাক্ষস কোনক্রমেই নন্দমহাপদ্মকে শূদ্রা-সন্তান মনে করেন নাই। ক্ষত্রিয়ের শূদ্রাস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান পিতার ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে পারিত না, সুতরাং নন্দের মাতা যে শূদ্রা ছিলেন সে কথা মুদ্রারাক্ষসে স্পষ্টতঃই অস্বীকৃত হইয়াছে। মনে হয় পুরাণকারের উক্তি নন্দের ক্ষত্রান্তক ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছে, এবং হয়ত নন্দ মহাপদ্মের পুত্রগণ ক্ষত্রিয়ত্বের সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন না। গ্রীক্ লেখকেরা বলেন যে, নন্দরাজ Agram-mes নীচবংশোদ্ভব ছিলেন। তাঁহার পিতা ছিলেন জাতিতে নাপিত (McCrindle—*Invasion of India by Alexander the Great* পুস্তক দ্রষ্টব্য)। অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী অনুমান করেন যে, এই Agrammes নামটি ভারতীয় শব্দ "উগ্রসেন" কথাটির গ্রীক্ রূপান্তর। উগ্রসেন হয়ত নন্দমহাপদ্মের কোন পুত্রের নাম হইবে। গ্রীক্ লেখকেরা বলেন যে, বৃদ্ধ নন্দরাজার নাপিত-মন্ত্রী যুবতী রাজমহিষীর গর্ভে ক্রমে ক্রমে আট জন সন্তান উৎপাদন করেন। নন্দবংশের শূদ্রত্বের মূলে এই লোকাপ-বাদের সম্পর্ক থাকা আশ্চর্য্য নহে। তা ছাড়া মহাপদ্ম ছিলেন "সর্ব্বক্ষত্রান্তকো নৃপঃ," "সর্ব্বক্ষত্রবিনাশকৃৎ," "অখিল ক্ষত্রান্তকারী"। তাঁহার ক্ষত্রধ্বংসী কার্য্যকলাপ তৎপরবর্ত্তী শাসকদের শূদ্রত্বকে আরও দৃঢ়ীভূত করিয়াছে। "ততঃ প্রভৃতি রাজানো ভবিষ্যাঃ শূদ্রযোনয়ঃ" ইহাও পুরাণেরই কথা। হয়ত ততঃ প্রভৃতি কথাটি নন্দকে বাদ দিয়া তাঁহার পরবর্ত্তী রাজাদের প্রতিই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। নন্দের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ঐল ঐক্ষ্বাকু প্রভৃতি প্রাচীন ক্ষত্ররাজকুলের ধ্বংসসাধন করিয়া। এই ভাবেই "একরাট্ স মহাপদ্ম একচ্ছত্রো ভবিষ্যতি" বলিয়া বায়ুপুরাণে বর্ণিত আছে। কিন্তু তিনি ছিলেন মহাকুলীন ক্ষত্রিয়-সন্তান, তাঁহার সন্তানেরা বংশে যাহাই হউন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য এই নন্দবংশের সহিত সম্পর্কিত। এই সম্পর্কের প্রকৃত রূপ যে কি সে সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে মতভেদ স্পষ্ট। পরবর্ত্তীকালের সংস্কৃত সাহিত্য হইতে লোকের মনে এই ধারণা দৃঢ়মূল হইয়াছে যে চন্দ্র-গুপ্ত মুরার পুত্র বলিয়া মৌর্য্য, এবং এই মুরা ছিলেন নন্দ মহাপদ্মের শূদ্রা স্ত্রী। ঢুণ্ডিরাজ তাঁহার টীকার উপোদ্ঘাতে

বলেন যে মহাপদ্মের প্রধানা মহিষীর নাম ছিল সুনন্দা। তাঁহার অন্য একটি স্ত্রী ছিল বৃষলকন্যা মুরা—"মুরাখ্যা সা প্রিয়া ভর্ত্তুঃ শীললাবণ্য সম্পদা।" এই মুরার পুত্র ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত,—মুরা প্রাসূত তনয়ং মৌর্য্যাখ্যং গুণবত্তরম্।" পুরাণগুলির কোথাও কিন্তু মুরার নামগন্ধ পাওয়া যায় না, মুদ্রারাক্ষসেও নয়। অধিকন্তু মুদ্রারাক্ষসে চন্দ্রগুপ্তকে বলা হইতেছে "মৌর্য্যপুত্র"। রাজলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া রাক্ষস বলিতেছেন—"আনন্দহেতুমপি দেবমপাস্য নন্দং সক্তাসি কিং কথয় বৈরিণি মৌর্য্যপুত্রে।" মৌর্য্য যদি জাতিবাচক বা কুলবাচক আখ্যামাত্র হয় তবে সেই মৌর্য্য আখ্যাধারী ব্যক্তিকে মৌর্য্যপুত্র বলিয়া উল্লেখ করা যায়। কিন্তু যাহা হইতে মৌর্য্য কথার উৎপত্তি, যিনি প্রথম মৌর্য্য, মুরার পুত্র, তাঁহাকে মৌর্য্য না বলিয়া মৌর্য্যপুত্র বলা ব্যবহার-বহির্ভূত। দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে কখনও পার্থপুত্র বলিয়া গালাগালি দিতে পারিতেন না কারণ অর্জ্জুন ছিলেন স্বয়ং পার্থ, পৃথার পুত্র। যুধিষ্ঠিরও পার্থমাত্র, পার্থপুত্র নহেন। বস্তুতঃ মুরা নামটির সৃষ্টি বোধ হয়, হইয়াছে মৌর্য্য শব্দ হইতে মূল অনুমান করিয়া, back-formation প্রণালীতে।

মুরাকে বাদ দিয়া মৌর্য্য নামটির অস্তিত্ব সম্ভব কিনা? এ সম্বন্ধে প্রমাণ স্পষ্ট। বৌদ্ধ ত্রিপিটকের মধ্যে মহাপারিনির্ব্বাণ সূত্র একখানি অতিপ্রাচীন গ্রন্থ। রীজ ডেভিড্‌স্‌ও ইহাকে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৫০ অব্দের পরে ফেলেন নাই। এই গ্রন্থে পিপ্পলীবনের মৌর্য্যকুলের উল্লেখ আছে। মৌর্য্যেরা ভগবান বুদ্ধের দেহভস্মের এক অংশ পাইবার দাবি করেন। সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত যে আদি মৌর্য্য নহেন, তাহা হইতে বহু পূর্ব্বে যে মৌর্য্যবংশের অস্তিত্ব ছিল সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

মহাবংশের সিংহলী টীকায় চন্দ্রগুপ্তের যে কাহিনী আছে তাহাতে দেখা যায় যে, তাঁহার পিতা ছিলেন পিপ্পলীবনের মৌর্য্যরাজপুত্র। আটবিকদিগের আক্রমণে তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হয়, এবং রাজ্য রক্ষা করিতে গিয়া তিনি নিজেও বিনষ্ট হন। তাঁহার স্ত্রী পাটলিপুত্রে আসিয়া নন্দরাজের আশ্রয়ে বাস করেন। পরবর্ত্তী কাহিনীগুলিতে বিবরণ আরও কিছু বিস্তৃত। চন্দ্রগুপ্তের মাতা ছিলেন নন্দের বৈমাত্রেয় ভগিনী, সম্ভবতঃ মহানন্দীর অসবর্ণ পত্নীর গর্ভজাত সন্তান। পিতৃবংশের নেতা রাজা মহাপদ্মের নিকট আশ্রয়ের জন্য চলিয়া আসা এই বৈমাত্রেয় ভগ্নীর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

বর্ত্তমান ভারতের সমাজপদ্ধতিও এই কথার সমর্থন করে। কুলীন রাজপুত রাজারা হিমালয় প্রদেশীয় তথাকথিত ক্ষত্রিয় রাজাদের ঘরে কন্যার বিবাহ দিতে রাজী হন না; কিন্তু অনেক সময় রাজপুত রাজাদের অবরা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান এই সমস্ত পাহাড়ী রাজাদের কুলে বিবাহিতা হন। মুদ্রারাক্ষসে দেখিতে পাই চাণক্য সর্ব্বদাই চন্দ্রগুপ্তকে "বৃষল" বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। বৃষল কথাটি শূদ্রাত্মক হইলেও অভিধানে শব্দটির আরও একটি অর্থ দেওয়া হয়—নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয় বা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। মুদ্রারাক্ষসের একই শ্লোকে এই দুইটি অর্থই স্পষ্ট—

> পতিং ত্যক্তা দেবং ভুবনপতি মুচ্চৈরভিজনং
> গতা ছিদ্রেণ শ্রীর্বৃষলমবিনীতেব বৃষলী। (৬ ৬)

এখানে রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকে বলিতেছেন কুলহীন ক্ষত্রিয় অর্থে বৃষল, এবং রাজলক্ষ্মীকে বলিতেছেন বৃষলী বা ছোটজাত, শূদ্রা।

চন্দ্রগুপ্ত যে নন্দের নিজের সন্তান নয় পুত্রস্নেহে পালিত মাত্র সে সম্বন্ধে মুদ্রারাক্ষসের উক্তি খুবই স্পষ্ট। রাক্ষস চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে বলিতেছেন—ইষ্টাত্মজঃ সপদি সান্বয় এবদেবঃ শার্দ্দূলপোতমিব যং পরিপোষ্য নষ্টঃ। এই শার্দ্দূল পোতক বা হিংস্র বাঘের বাচ্চা নিজের সন্তান নয়, অন্যের সন্তান, যাহাকে আশ্রয় দিয়া নন্দমহাপদ্ম সংবংশে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করিলে রাক্ষস দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "গোত্রান্তরে শ্রীর্গতা" (৬।৫)। চন্দ্রগুপ্ত যে নন্দ হইতে ভিন্নগোত্রীয় সে কথা বিশাখ দত্ত স্পষ্টই বলিয়াছেন।

ভিন্নগোত্রীয় হইলেও নিঃসম্পর্কিত নয়। চন্দ্রগুপ্তকে বলা হইয়াছে নন্দান্বয়াবস্থী, অর্থাৎ নন্দের আপন পুত্র না হইলেও আত্মীয় ত বটেই। শুধু আত্মীয় নয়, পুত্রভাবে গৃহীত ও নন্দকুলে বর্দ্ধিত। নন্দের বাড়ী তাঁহার পিত্রালয়তুল্য। ষষ্ঠ অঙ্কে রাক্ষস মলয়কেতুকে চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে বলিতেছেন, "নন্দকুলমনেন পিতৃভূতং ঘাতিতম্।" নন্দ তাঁহাকে নিজের পুত্র-ভাবেই লালন করিয়াছিলেন। এই পালিত পুত্রকে রাজ্যের সমস্ত লোকই নন্দের পুত্রগণ হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিত। পালিত পুত্রের এই পুত্রত্বের দাবিই মুদ্রারাক্ষসের কতকগুলি আপাতবৈষম্যপূর্ণ উক্তির মূলে রহিয়াছে। নতুবা চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে বলা সম্ভব হইত না যে, "নন্দান্বয় এবায়মিতি"। চন্দ্রগুপ্তও রাক্ষসকে "পিতৃপর্য্যায়গত" মন্ত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না।

এই পালিত পুত্র যে নন্দের নিজ পুত্রগণ হইতে রাজোচিত গুণাদিতে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন বিশাখ দত্ত তাহা জানিতে সুযোগ দিয়াছেন। রাক্ষস তাঁহার সম্বন্ধে উক্তি করিয়াছেন—

> বাল এব হি লোকেঽস্মিন্ সম্ভাবিতমহোদয়ঃ।
> ক্রমেণারূঢ়বান্ রাজ্যং যূথৈশ্বর্য্যমিব দ্বিপঃ।

নন্দের পুত্রগণ খলস্বভাব অর্থগৃধ্নু ও লোকের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং প্রজাগণ হয়ত এই চন্দ্রগুপ্তকেই তাহাদের আশার স্থল বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছিল। ধর্ম্মবুদ্ধিহীন নন্দপুত্রগণের উচ্ছেদের জন্য প্রতিহিংসাপরায়ণ চাণক্য এই চন্দ্রগুপ্তকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন।

চাণক্যের প্রতিহিংসা অপমানজনিত। এই অপমান কি ধরণের সে সম্বন্ধে কথাসরিৎসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের "চন্দ্রগুপ্ত" পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থেই একই ভাবে কাহিনীটি প্রচলিত। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ চাণক্য যখন বিদ্বৎ-সভায় অগ্রাসনে উপবিষ্ট ছিলেন তখন তাঁহাকে জোর করিয়া সে স্থান হইতে তুলিয়া দেওয়া হয়। অপমানে চাণক্য নিজের শিখা মুক্ত করিয়া নন্দবংশের উচ্ছেদ প্রতিজ্ঞা করেন এবং পরে এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া আবার শিখাবন্ধন করেন। এই অপমানের দৃশ্য চাণক্য নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন —

> শোচন্তো হবনতৈ নরাধিপভয়াদ্ ধিক্-শব্দগর্ভৈ মুখৈঃ
> মামগ্রাসনতো হবকৃষ্টমবশং যে দৃষ্টবন্তঃ পুরা। (১।১২)

রাক্ষসও চাণক্যের এই অপমানকে বলিয়াছেন—স্বাগ্রাসনাপ্নিকৃতিঃ। চাণক্য এই অপমান সহ্য করেন নাই। কৃতাসাঃ কৌটিল্য নগর হইতে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় চলিয়া গিয়াছিলেন, নন্দবংশের সমূহ ধ্বংস প্রতিজ্ঞা করিয়া।

এই প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের সাহায্য গ্রহণ করেন। চন্দ্রগুপ্তের প্রতি মহাপদ্মের পুত্রগণ আগে হইতেই বিদ্বেষ পোষণ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু প্রজাপুঞ্জ তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিত এবং উচ্চপদস্থ অনেকেই তাঁহার পক্ষাবলম্বী ছিলেন। গ্রীক্ ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাবে আলেক্‌জান্দারের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে মগধ আক্রমণের পরামর্শ দান করেন। কিন্তু মগধ আক্রান্ত হইয়াছিল আলেক্‌জান্দারের ভারত পরিত্যাগের পরে। আলেক্‌জান্দার ভারতে অনেক গ্রীক সৈন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত এই যবন বা গ্রীক্ সৈন্যের সাহায্য পাইয়াছিলেন; বিশেষ করিয়া সাহায্য পাইয়াছিলেন অভিসার দেশের অধিপতি পর্ব্বতকের। পর্ব্বতক কিন্তু কাহারও নাম নয়, বর্ণনা মাত্র। ইহাকে মুদ্রারাক্ষসের অনেক স্থলে পর্ব্বতেশ্বরও বলা হইয়াছে। পর্ব্বতক এক সময়ে চাণক্যের শিষ্য ছিলেন বলিয়া পরবর্ত্তী কালে মগধে কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। এই কিংবদন্তী কিম্ভূতকিমাকারে কথাসরিৎসাগরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কথাটা মিথ্যা না হইতেও পারে। কারণ বৌদ্ধ সাহিত্যে চাণক্যকে বলা হয় তক্ষশিলাবাসী। পর্ব্বতক ছিলেন বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্ত্তী উত্তর পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিপতি। ইতিহাসবর্ণিত পোরাসও (Porus) কিন্তু এই দেশেরই রাজা ছিলেন। Porus কি পুরুরাজ বা পৌরব কথার গ্রীক্ রূপ, না এই পর্ব্বতক নামেরই গ্রীক্ অপভ্রংশ তাহা বিচার্য্য বিষয়। গ্রীক্ লেখকগণ আরও বলেন, আলেকজান্দারের ভারতত্যাগের কিছু পরেই এই পোরাসকে হত্যা করা হয়। পর্ব্বতকের মৃত্যুর কাল ও আকস্মিকতা এই বর্ণনার অবিরোধী। পর্ব্বতকের পুত্র মলয়কেতুও মলয়দেশের রাজা ছিলেন, কারণ মলয়দেশের রাজার নাম দেওয়া ছিল "সিংহনাদ" বলিয়া।

পর্ব্বতেশ্বরের সহায়তায় চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে শক-যবন কিরাত কম্বোজ-পারসীক-বাহ্লীক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় বহু সৈন্যের সমাবেশ করিতে সক্ষম হইলেন। এই বিপুল বাহিনীসহ চন্দ্রগুপ্ত পর্ব্বতককে লইয়া মগধ আক্রমণ করিতে চলিলেন। মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র পর্য্যন্ত পৌঁছানোর পূর্ব্বেই, বোধ হয় নন্দরাজের সহিত ইহাদের সংঘর্ষ বাধে। হয়ত মহাপদ্ম ধৃষ্টদিগের শাসনের জন্য অসহিষ্ণু হইয়া সদলবলে রাজধানীর বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিলেন। ঠিক কি ঘটিয়াছিল তাহা বলা শক্ত। কিন্তু একথা সত্য যে, নন্দদিগের বিনাশের পরেও বহুদিন ধরিয়া রাজধানীর দুর্গভাগ অবরুদ্ধ ছিল। পাটলীপুত্র বিস্তৃত শহর। ইহার দুর্গভাগের নাম ছিল কুসুমপুর, যদিও পরবর্ত্তী কালে দুইটি নাম সমানার্থবোধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে রাজগৃহের রাজা অজাতশত্রু বৈশালীর বৃজি-দিগের প্রতিরোধার্থ গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থলে এই দুর্গের প্রাকার তোলেন। মহাপরিনির্ব্বাণ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, অজাতশত্রুর মন্ত্রিদ্বয় সুনীথ ও বর্ষকার এই দুর্গের পত্তনে নিযুক্ত ছিলেন। এই দুর্গ সহজে পর্ব্বতক-চন্দ্রগুপ্তের করায়ত্ত হয় নাই। নন্দের বিনাশের পরেও ইহা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তির পথে বহু দিবস ধরিয়া বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

পরবর্ত্তী কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে যে চাণক্যের "কৃত্যা" বা অভিচার দ্বারা নন্দবংশের মূলসংহার করার বিবরণ আছে ইতিহাসের সাক্ষ্য তাহার বিপরীত। মহাবংশের টীকায় রহিয়াছে, চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত প্রথমেই পাটলিপুত্র অধিকারের চেষ্টায় বিফল হন, তাই পর্ব্বতেশ্বরের সহায়তায় তাহারা হয়তো মগধ সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত-প্রদেশগুলি হস্তগত করিয়া ক্রমে ক্রমে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। হয়ত চাণক্যের প্রখর বুদ্ধির বলে পর্ব্বতক ও চন্দ্রগুপ্ত নন্দের সৈন্যবাহিনীকে কোনও উন্মুক্ত প্রান্তরে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিতে পারিয়াছিল।

অতপর একটির পর একটি করিয়া নন্দের পুত্রদিগকে বন্দী করিয়া যজ্ঞের পশুর ন্যায় বলি দেওয়া হয়। নন্দাঃ পর্য্যায়-ভূতাঃ পশব ইব হতাঃ পশ্যতো রাক্ষসস্য (৩।২৭)—বলিয়া এই হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডে হয়ত অভিচারের মন্ত্রাদি সাহায্য করিয়াছিল। তবে মুদ্রারাক্ষসে এই অভিচারের উল্লেখ থাকিলেও তাহার উপর কিছুমাত্র গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। মাত্র একটি শ্লোকের তৃতীয় চরণে এই কৃত্যার উল্লেখ আছে। "কৌটিল্যঃ কোপনোঽপি স্বয়মভিচারণ-জ্ঞাত-দুঃখ প্রতিজ্ঞঃ" (৪।১২)।

নন্দসৈন্যের পরাভব ও ধ্বংস ঘটিলে চাণক্য সমস্ত সৈন্যবল লইয়া পাটলীপুত্র অবরোধ করেন। রাজধানীর প্রাচীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া নন্দের মন্ত্রী রাক্ষস বিজেতা চন্দ্রগুপ্তকে বাধা দিতেছিলেন। নন্দবংশীয় যে-কোন একজনকে রাজা-রূপে দাঁড় করাইয়া চাণক্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার চেষ্টা রাক্ষস শেষ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। চাণক্যও তাই নন্দকুলের যেখানে যে কেহ ছিল তাহাকেই নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা করেন। নন্দবংশীয় সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে সিংহাসনে বসাইয়া কুসুমপুরের দুর্গ রক্ষার জন্য রাক্ষস একবার শেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ অবরোধের ফলে পুর-বাসীদের নিরবধি দুঃখ দর্শন করিয়া সর্ব্বার্থসিদ্ধি রাজত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া তপোবনে গিয়া তাপসব্রত অবলম্বন করিলে রাক্ষসও আর চন্দ্রগুপ্তকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। নগরে প্রবেশ করিয়া চাণক্য নন্দবংশের প্ররোহগুলি পর্য্যন্ত যেখানে যা-কিছু পাইয়াছিলেন তাহার সমূলে বিনাশসাধন করেন। তপোবন গত সর্ব্বার্থসিদ্ধিও নিস্তার পান নাই। তাঁহাকেও হত্যা করানো হয়। সর্ব্বার্থসিদ্ধি সুড়ঙ্গ-পথে অবরুদ্ধ দুর্গের বাহিরে চলিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সুরুঙ্গা বা সুড়ঙ্গ কথাটি গ্রীক Syringe শব্দ হইতে আসিয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের আমলে গ্রীসের সহিত ভারতের বিশিষ্ট সংশ্রবের ইহা পরিচায়ক।

সর্ব্বার্থসিদ্ধির সিংহাসন ত্যাগের পরেও রাক্ষস কিছু-কাল পাটলিপুত্রে থাকিয়া নানা ভাবে চাণক্যের কার্য্যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যখন অভ্যন্তর হইতে ক্ষীণ বাধা সৃষ্টি করিয়া আর বিশেষ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা নাই বোধ করিলেন তখনই বিদেশের সাহায্যে পাটলিপুত্র আক্রমণের চেষ্টায় তিনি উদ্‌যোগী হন। তাঁহার এই চেষ্টায় প্রধান সহায় হইয়াছিলেন পর্ব্বতেশ্বরের পুত্র মলয়কেতু।

মলয়কেতু কোন ব্যক্তির নাম, দেশগত উপাধি নয়। তিনি মলয় দেশের অধিপতি ছিলেন না। কারণ তাঁহার সহায়ক নৃপতিবৃন্দের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই—

কৌলূত শ্চিত্রবর্ম্মা মলয়নরপতিঃ সিংহনাদো নৃসিংহঃ।

পিতার গুপ্ত হত্যায় ক্ষিপ্ত হইয়া মলয়কেতু চন্দ্রগুপ্ত-চাণক্যের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হন।

চাণক্য পর্ব্বতককে অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দ্বারা মগধ আক্রমণে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের বিনাশের নিমিত্ত বিষকন্যা প্রেরণ করিলে—চাণক্য তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক পর্ব্বতকের উপর প্রয়োগ করিয়া শুধু রাক্ষসকেই নিরস্ত করিলেন না, অর্দ্ধরাজ্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। বিষকন্যা প্রয়োগের কথা মুদ্রারাক্ষসে যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে এ সম্বন্ধে জনশ্রুতি যে খুবই প্রবল ছিল তাহাতে সন্দেহ করা যায় না। পর্ব্বতকের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মলয়কেতু ভয়ে পাটলিপুত্র ত্যাগ করিয়া নিজ রাজ্যে চলিয়া আসিয়াছিলেন। রাক্ষস তাহাকে প্রধান অবলম্বন-স্বরূপ গ্রহণ করিলেন।

রাক্ষস পাটলিপুত্র ছাড়িয়া আসার পরও তাঁহার দলের লোক তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পন্থানুসারে পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের জয়োল্লাসে যথাসম্ভব বাধা সৃষ্টি করিতেছিল। জয় ঘোষণা ইহাদের চেষ্টাতেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। চন্দ্রগুপ্তের রাজ-প্রাসাদে প্রথম প্রবেশও ইহাদের চেষ্টাতেই বিলম্বিত হয়, যদিও বৈরোচনের রাজ্যাড়ম্বর ও বিনাশ হয়ত সম্পূর্ণই কাল্পনিক। নন্দের রাজপ্রাসাদের নামটি নাটকের দুই স্থলে যে ভাবে অবতারণা করা হইয়াছে তাহাতে দর্শকগণ এই নামের সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। সুগাঙ্গ প্রাসাদ নিশ্চয়ই গঙ্গার উপরে তৈয়ারী করা হইয়া-ছিল। এই প্রাসাদে প্রবেশের পরও চন্দ্রগুপ্তের দেহ নষ্ট করার নানা প্রয়াস রাক্ষসের অনুচরগণ করিয়াছিল, কিন্তু কোনটাতেই তাহারা সফল হয় নাই। এই হেতুই রাজার শরীর রক্ষার নিমিত্ত এত পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দ্দেশ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বিবৃত রহিয়াছে। পাটলিপুত্রস্থিত গ্রীক রাজদূতও এই সমস্ত সতর্কতামূলক পরিপাটি বন্দোবস্তের আলোচনা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

রাক্ষসমতিপরিগৃহীত মলয়কেতুর পাটলিপুত্র অভিযান কি ভাবে ব্যর্থ হয় মুদ্রারাক্ষসে তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই বর্ণনার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য খুব বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে মলয়কেতুর সৈন্যদলে ছিল শক যবন গান্ধার চীন হূন-দিগের ছড়াছড়ি এবং সহায়ক নৃপতিরূপে ছিলেন কৌলূত মলয়, পারস্য, কাশ্মীর ও সিন্ধুদেশের অধিপতিগণ। এত-

ব্যতীত খস ও মগধগণেরও উল্লেখ আছে—ইহারা বোধ হয় রাক্ষসের নিজ-দেশের অনুচরবৃন্দ। একটি কথা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই অভিযানে পাটলিপুত্রের নারীদিগকে ভাগুরায়ণ গৌড়ী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং বিশাখ দত্তের সময়েও গৌড়ের বিস্তার ছিল মগধকে পক্ষপুটে করিয়া। হয়ত পাটলিপুত্র তখন ছিল পঞ্চগৌড়ের রাজধানী। সুতরাং অশোককে বাংলার সন্তান বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ভুল করেন নাই। এই গৌড় এবং গৌড়ীয়দের কীর্ত্তি দিয়াই চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকবর্দ্ধন সমগ্র ভারত ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন—"অশোক যাহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধি শেষ"—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সাহাবাজগড়ী হইতে পূর্ব্বসাগরের তীরোপান্তে ধৌলি পর্য্যন্ত।

চাণক্যের মন্ত্রিত্বত্যাগের যে ব্যাখ্যা মুদ্রারাক্ষসে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথও সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি চাণক্যের বনগমনের কিংবদন্তীকে অগ্রাহ্য করেন নাই। হয়ত মগধের সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠা নিরঙ্কুশ হইয়া যাওয়ার পর চাণক্য তপোবনকেই শেষ-জীবনের কাম্য বলিয়া মনে করিয়া থাকিবেন। তাঁহার পার্থিব কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছিল। অর্থশাস্ত্র প্রণয়নই সম্ভবতঃ তাঁহার শেষ কীর্ত্তি।

> "যেন শাস্ত্রং চ শস্ত্রং চ নন্দরাজগতাচ ভূঃ
> নিখিলেন সমুদ্ধারি তেন শাস্ত্র মিদং কৃতম্।"

বলিয়া নিজের গর্ব্ব প্রকাশের অধিকার যদি চাণক্যেরও না থাকে তবে আর কাহার থাকিবে।*

* সাহিত্য সেবক সমিতিতে পঠিত।

বাঁধ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

৭

সূর্য্য পাহাড়ের আড়ালে হেলিয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যা হইতে আর বেশী দেরি নাই। মৃন্ময় চা পান করিতেছিল। লিলি জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রে কি খাবে তুমি।

মৃন্ময় পেয়ালা হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, ওটা তুমিই ঠিক করে দিও।

লিলি বলিল, সে তো রোজই দিয়ে থাকি—

মৃন্ময় কহিল, তা হলে আর মিথ্যে জিজ্ঞেস করছ কেন! হ্যাঁ ভাল কথা, আজ আমার ফিরতে অনেক দেরি হতে পারে লিলি। আমার জন্যে অনর্থক দেরী করো না। মহীপাল হয় তো এখুনি এসে পড়বে। কি এক জরুরী কাজে নাকি আমাদের হাত দিতে হবে আর তারই জন্যে একটা সলা-পরামর্শ করা দরকার তার বাবার দৃষ্টি এড়িয়ে, কিন্তু এই লুকোচুরির প্রয়োজনটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি।

লিলি খানিকক্ষণ মৃন্ময়ের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, এখানকার অন্ন না উঠলে বাচি। যতদূর মনে হচ্ছে, না বোঝার কথাটা নিছক তোমার ভান মিনু-দা। তুমি এদের ভেজালহীন রাজরক্তে বিষ সঞ্চার করবার চেষ্টা করছ। এটা সব দিক দিয়ে শুভ হয়ত নাও হতে পারে।

মৃন্ময় হাসিমুখে জবাব দিল, আগে থেকেই একটা মনগড়া ধারণা করে নিচ্ছ কেন লিলি? এমনও হতে পারে যে তাদের রাজরক্ত আরও অনুগ্র হয়ে উঠবে।...

লিলি কহিল, তুমি হাসালে মিনু-দা। রাজরক্ত রাজরক্তই।

মৃন্ময় কথাটা কানে তুলিল না, বলিতে লাগিল—এতদিন যে বড় বড় স্বপ্ন দেখেছি তারই ছোট একটি পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করা হবে। সে চেষ্টায় মহীপাল আমায় সাহায্য করবে। এতে ভয় পাবার কিছুই নেই, আর যদি থাকেও এবং সে সর্ব্বনাশকে যদি রোধ করতে না পারি তবে একলাই তলিয়ে যাব।

লিলি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, তুমি আমায় কি ভাব বল তো মিনু-দা।

প্রশান্ত হাসিতে মৃন্ময়ের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, তুমি যা—ঠিক তাই। ভুল তোমাকে আমি কোন দিন করি নি। অন্তত ভুল করেও কোন দিন তোমায় আমি ছোট করে দেখি নি। আমার এ কথাটা তুমি বিশ্বাস করো লিলি। কিন্তু সত্যি সত্যি আমরা ভয়ানক-কিছু করতে যাচ্ছি না। দিন দিন তুমি আমায় যে ভাবে অকর্ম্মণ্য করে তুলেছ তারই হাত থেকে আত্মরক্ষার একটা সহজ উপায় খুঁজে পেয়েছি। তা ছাড়া আমাকে কিছু করতে হবে তো। একা মহীপালকে নিয়ে কিছুতেই মন ভরে উঠছে না লিলি। বলিয়াই হো হো করিয়া মৃন্ময় হাসিয়া উঠিল।

লিলি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, তোমার এই হাসিই সবচেয়ে মারাত্মক মিনু-দা। তুমি গম্ভীর হয়ে থাক—দিন-রাত বই নিয়ে ডুবে থাক—এর একটা সহজ অর্থ আমি খুঁজে পাই।

মৃন্ময় উঠিয়া দাঁড়াইল। সহাস্যে কহিল, তুমি পাগল লিলি—একেবারে পাগল।...

লিলি কিন্তু থাকিতে পারিল না, সে আকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিল, আমায় তুমি এমনি করে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করো না মিনু-দা। তোমার ঐ রাজরক্ত আর আদর্শের গোড়ার কথাটা আমায় শুনতেই হবে।

মৃন্ময় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। স্নিগ্ধ সুরে বলিল, আমি যদি তোমায় না বলি অথবা মিথ্যে বোঝাই, তা হলে কি করবে বল দেখি? তুমি ত নিছক একটা কাল্পনিক ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছ।

লিলি বলিল, সব কথা তোমায় আমি বোঝাতে পারব না মিনু-দা, কিন্তু এ বিশ্বাস আমার আছে যে, তুমি আমায় মিথ্যে বলবে না। বলিতে বলিতে লিলির চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহা মৃন্ময়ের দৃষ্টি এড়াইল না। তাহার মুখে স্নিগ্ধ হাসি দেখা দিল। লিলি বলিতে লাগিল, তোমার ভিতরকার আসল মানুষটিকে আমি দেখেছি। আমার এই দেখায় কোনও ভুল হয় নি মিনু-দা।

মৃন্ময় এতক্ষণে জবাব দিল, এ তোমার অতিশয়োক্তি, কিন্তু তোষামোদে দেবতাও তুষ্ট হন আমি ত নিতান্ত সামান্য মানুষ।

লিলি বলিল, তোমার আর কিছু বলবার আছে?

মৃন্ময় বলিল, তুমি রেহাই দিলে সত্যিই আমার কিছু বলবার নেই। ঠাট্টা নয় লিলি, বাস্তবিকই আমার ধারণা ছিল তুমি আমার সত্যিকার ব্যথা কোথায় তা বুঝবে এবং তোমার সাহায্য আমি সকল সময় পাব। আমার অতীত এবং বর্ত্তমানের কোন কথাই তোমার অজানা নয়। আজ কোথাও আমার আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, কিন্তু যে প্রাণশক্তিকে এক দিন আমি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিলাম তা যেন ধীরে ধীরে আবার ফিরে পাচ্ছি। এই পরমক্ষণে তুমি আমার কোন কাজে অন্তরায় হয়ো না।

লিলি মৃন্ময়ের এই প্রকার সামঞ্জস্যহীন উক্তিতে রীতিমত বিস্মিত হইল। বলিল, তুমি ক্রমশঃই দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়ছ মিনু-দা।

মৃন্ময় ক্ষণকাল চিন্তামগ্ন থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, মানুষ একটা জায়গায় নিজেকে প্রকাশ করতে না পারলে বাঁচতে পারে না। আত্মীয় বল, বন্ধু বল এক তুমি ছাড়া আজ আর কে আমার আছে। বলতে তোমাকে এক দিন হ'তই—দু'দিন আগে কিংবা দু'দিন পরে।

লিলির চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে একাগ্র দৃষ্টিতে মৃন্ময়ের ভাবলেশহীন মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মৃন্ময় তেমনি স্বাভাবিক সুরেই বলিতে লাগিল, জানত অন্যায় কোন দিন আমি করি নি, করবও না। তবে একথাও ঠিক যে, আপাতদৃষ্টিতে যতটুকু চোখে পড়বে সেইটুকুই সব নয়। ভুল বুঝবার এবং ভুল করবার আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে।

লিলি ডাকিল, মিনুদা—

মৃন্ময় বলিল, বলছি লিলি, একে একে সব কথাই তোমায় বলছি। মৃন্ময় থামিল এবং সহসা সে লিলিকেই পাল্টা প্রশ্ন করিয়া বসিল, বলতে পার লিলি আমাদের দেশে স্বাধীনতা শব্দটার আসল মানে ক'জন বোঝে? অথচ শুনতে পাই আমরা নাকি স্বাধীন হয়েছি।

লিলি বলিল, এ বিষয়ে তোমার কোন সন্দেহ আছে নাকি?

মৃন্ময় গম্ভীরতাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, একটু নয় পুরোপুরি লিলি। স্বাধীনতা মানে চারদিকে যা দেখছি তা নয়, এই কথাটা বুঝবার মত শিক্ষার আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। অজ্ঞানতার অন্ধকারে দেশটা একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। দেশের প্রত্যেক আনাচে-কানাচে আজ আলো জ্বেলে দেবার প্রয়োজন—চোখ চেয়ে যেন আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপটা দেখতে পাই।

লিলি বলিল, তার জন্যে রয়েছে দেশের গবর্মেণ্ট—

মৃন্ময় বাধা দিয়া বলিল, তা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদেরও যে একটা দায়িত্ব আছে এ কথা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না। সরকার বাহাদুর সব করে দেবেন ভেবে সবাই নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থেকে শুধু গবর্মেণ্টের বিরূপ সমালোচনা করলে কোন কাজই হবে না, বরং স্বাধীনতা নামক যে বস্তুটি মিলেছে তা পরাধীনতার চেয়েও ঢের বেশী ভয়াবহ রূপ নিয়ে দেখা দেবে। আমাদের দূরদৃষ্টিও নেই, সংগঠন-শক্তিরও একান্ত অভাব, তাই পদে পদেই ঘটছে নিদারুণ পরাজয়।...

মৃন্ময় একটু থামিয়া কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল, তারপর পুনরায় বলিতে লাগিল, খুব সামান্য একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আপাতদৃষ্টিতে একে তুচ্ছ বলেই মনে হবে, কিন্তু এটাকে সামান্য ভেবে অবহেলা করে আজ আমরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অনেক বড় ক্ষতিকেই ডেকে এনেছি লিলি।

লিলি হাসিল। মৃদু কণ্ঠে বলিল, এ যেন ধান ভানতে গিয়ে শিবের গীত শোনানো হচ্ছে।

মৃন্ময় কিন্তু এই হাসিতে যোগ দিতে পারিল না। বলিল, তোমার যা খুশি বলতে পার লিলি, আমি এই অশিক্ষিত পাহাড়িয়া জাতিটার কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। এরা অশিক্ষিত, কিন্তু এইটেই এদের সবচেয়ে বড় পরিচয় নয়। এদের মন সবল এবং সুস্থ। এদের আত্মীয়ের মত, বন্ধুর মত কাছে টেনে নিয়ে এদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বেলে দিলে দেশে বহু কল্যাণকর্ম্ম এদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া যাবে।

লিলি বলিল, কাজটা কি তুমি খুবই সহজ মনে করো ?

মৃন্ময় বলিল, সহজ না হতে পারে, কিন্তু অসাধ্য যে নয় তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে এবং সে প্রমাণ দেখিয়েছে সাত-সমুদ্র তের-নদীর পার থেকে আগত পাদ্রীর দল। নিজেদের প্রয়োজনে এরা তাদের একটা অংশকে ধর্ম্মান্তরিত করেছে। আমাদের কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে এদের কল্যাণব্রতে আত্মনিয়োগ করতে হবে, সর্ব্বাগ্রে এদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করতে হবে।

লিলি নিঃশব্দে শুনিতেছিল। মৃন্ময় বলিতে লাগিল, আমার কথাগুলো হয়ত কতকটা বক্তৃতার মত শোনাচ্ছে। তা হোক তবুও তোমাকে আমার বলতেই হবে। আমি এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আর মহীপাল হবে আমার প্রধান সহায়। ছেলেটি শুধু আদর্শের নীরব পূজারী নয়—ওর মধ্যে আছে প্রচণ্ড গতিবেগ। সেই বেগকে নিয়ন্ত্রিত করে চালনা করতে হবে।

লিলি শান্ত কণ্ঠে বলিল, মহীপালের বাবা তোমাদের এই কাজকে ভাল চোখে দেখবেন বলে আমার মনে হয় না মিনু দা।

মৃন্ময় বলিল, কথাটা আমিও ভেবে দেখেছি লিলি এবং এখাও জানি আমি যে, আসলে তিনি আজও অতীত যুগের ধারাবাহী এক রাজা যার মধ্যে রয়েছে তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষের রাজরক্ত। হয়তো তিনি বাধা দেবেন তবুও দেখি কত দূর কি হয়।

লিলি বলিল, খবরটা আগেই আমি পেয়েছি অথচ আজও তোমরা কাজে নাম নি সেইজন্যেই আমার এত ভয় মিনু-দা। শুধু আমার নিজের কথা ভেবে এ কথা তোমায় বলছি না।

বাধা দিয়া মৃন্ময় বলিল, এতটা অপদার্থ তুমি আমায় মনে করো না যে তোমায় আমি অকারণে ভুল বুঝব, কিন্তু দায় এবং দায়িত্ব সব কাজেই আছে লিলি। তা ছাড়া বাধা যদি আসেই তাতে ভয় পাবার কি আছে!

লিলি নীরব। মৃন্ময় বলিতে লাগিল, আমার মনে হয় একটা বিষয়ে তোমার ভুল হয়েছে। আমাদের কোন কাজেই গোপনতা নেই। মহীপাল অবশ্য তার বাবার দৃষ্টি এড়িয়ে চলবার পক্ষপাতী, কিন্তু আমি তাতে সায় দিতে পারি নি; বরং তার বাবাকে ওয়াকিবহাল হবার সব রকম সুযোগ করে দিয়েছি। তিনি খুশী হন নি, কিন্তু প্রকাশ্যে বাধাও দেন নি। আর যাই হোক তিনি জ্ঞানী ব্যক্তি।

বাধা দিয়া লিলি বলিল, সেইখানেই আমার আরও ভয় মিনু-দা। ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত যদি ঘাড়ের উপর এসে পড়ে তাতে সব সময় জীবনসংশয় হয় না, কিন্তু যে অস্ত্রে ধার এবং তার দুই আছে তা দু'টুকরো করে ক্ষান্ত হয়। বাধা তোমায় আমি দিচ্ছি না, আর দিলেও তোমরা তা শুনবে কেন, তবে অন্ধকার-পথে চলবার ইচ্ছে যেন কোন দিন না হয় মিনু-দা—এ আমার একান্ত অনুরোধ।

লিলি একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, কিন্তু জিজ্ঞেস করি আরম্ভটা তোমাদের কোন্ পথ ধরে সুরু হবে।

লিলির কথার ধরনে মৃন্ময় কৌতুক বোধ করিল, কিন্তু মুখে সে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া বলিল, মঞ্চের উপর বক্তৃতা আমরা দেব না। পরিকল্পনার ফাঁকা ফানুস আমরা আকাশে ওড়াতে চাইব না। শুধু গোড়া থেকে আরম্ভ করা হবে আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ। ওদের আত্মানুসন্ধিৎসা জাগানোই হবে মূল লক্ষ্য। ওদের জানতে দিতে হবে যে দেশের কল্যাণসাধনে ওদের প্রয়োজন কম নয়।

লিলি শঙ্কিত হইয়া উঠিল, বলিল, এর ফলে যদি একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তাকে প্রতিরোধ করবে তোমরা কোন্ শক্তিতে মিনু-দা।

মৃন্ময় তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, তোমার এ ভয় অমূলক। আমাদের পথ ধ্বংসের পথ নয়, সৃষ্টিকে সুন্দর এবং সার্থক করে তুলবার পথ।

লিলি চিন্তিত ভাবে বলিল, শুনতে খুবই ভাল লাগছে, কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে গিয়েই যত সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

মৃন্ময় বলিল, এই সংশয় আমাদের আরও সতর্ক করে তুলবে। আসল কথা কি জান লিলি? আমাদের কাজে দল-উপদলের স্বার্থসিদ্ধির দুরভিসন্ধি থাকবে না, তাই প্রচারের নামে অপপ্রচার ঘটবে না এবং ওদের সংস্কারের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলবে আমাদের শিক্ষার আদর্শ। ভাল মন্দর দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে যে মুহূর্ত্তে ওরা সচেতন হয়ে উঠবে, ওদের সবল হাত থেকে তখনই দেশ পাবে কল্যাণের অফুরন্ত সম্পদ।

লিলি কেমন এক প্রকার অদ্ভুত ভঙ্গীতে একটুখানি হাসিল। মৃদু কণ্ঠে বলিল, বড় পরিকল্পনা থাকা ভাল মিনু-দা, কিন্তু নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের কথা ভেবে দেখেছ তো?

মৃন্ময় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, পরিকল্পনা যত বড়ই হোক, আরম্ভটা কিন্তু খুব ছোট থেকেই হয়ে থাকে। তা ছাড়া কি জান এই পরিকল্পনাকে আংশিকভাবেও যদি সফল করে তুলতে পারি তা হলেও নিজের জীবনকে সার্থক মনে করব। অন্ততঃ এই আশা করতে পারব যে, আমাদের ভাবী বংশধরেরা আর আমাদের মত না বুঝে ভুল করবে না।

মৃন্ময় ক্ষণকাল নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া থাকিয়া যখন মুখ তুলিল তখন তাহার চোখেমুখে এক বিচিত্র ভাবধারা খেলা করিয়া ফিরিতে লাগিল। লিলির সহিত চোখোচোখি হইতেই সে হাসিয়া ফেলিল। লিলি বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মৃন্ময়কে আজ যেন সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না। মৃন্ময় তেমনি হাসিমুখে বলিতে লাগিল, অবাক হয়ে দেখছ কি লিলি?

লিলি বলিল, দেখছিলাম তোমাকে। আর—

বাধা দিয়া মৃন্ময় বলিল, আর ভাবছিলে তোমার মিতভাষী মিনুদার আজ হ'ল কি—তাই না? জান লিলি এতক্ষণ ধরে যত বক্তৃতা দিয়েছি সব মিথ্যে, শুধু হেসে ওঠাটাই সত্যি। নইলে করতে যাচ্ছি একটা ছোট্ট পাঠশালা আর তা নিয়ে কত লম্বা লেকচার ঝেড়ে ফেললাম।

লিলি কতক শুনিতেছিল, কতক তার কানেও যাইতেছিল না। সে তখন ভাবিতেছিল যে, প্রশান্ত মহাসাগরে কিছু পূর্ব্বেও যে ঢেউয়ের নৃত্য সে দেখিয়াছে তা কি নিতান্তই অলীক।

মৃন্ময় সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, সত্য কথাটা কি জান? একা মহীপালকে নিয়ে আর মন উঠছে না। পড়া-শুনো করতেও যেন আর উৎসাহ পাই না। কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো।

সহসা কথার মাঝখানে থামিয়া মৃন্ময় অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হইল। বলিল, দেখ ত লিলি মনে হচ্ছে যেন ডাক-পিয়ন আমাদের বাসায় ঢুকেছে।

লিলি তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, সম্ভবতঃ ভুল করেছে। আমাদের আবার চিঠি আসবে কোথা থেকে।—লিলি অগ্রসর হইয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই একখানা চিঠি হাতে ফিরিয়া আসিল। মৃন্ময়ের চিঠি। লিখিয়াছে নাঙ্কু। মৃন্ময় সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া চিঠিখানি গ্রহণ করিল।

৮

লিলির হাত হইতে চিঠিখানি লইয়া মৃন্ময় তাহা একবার উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া লইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। পড়িয়া দেখিবার কোন আগ্রহ তাহার মধ্যে দেখা গেল না। লিলি একবার মৃন্ময়ের মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই সে তাহাকে ডাকিল। বলিল, কোথায় যাচ্ছ লিলি?

লিলি জবাব দিল, একবার রান্নাঘরে না গেলে যে চলছে না মিনু-দা।

মৃন্ময় বলে, কেন তোমার রাঁধুনী—

লিলি একটুখানি হাসিয়া প্রত্যুত্তর করিল, সব সময় তার উপর নির্ভর করলে চলে না। লিলি আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।

মৃন্ময় চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল।...

ভাই মিনু—

দিনকয়েক পূর্ব্বে তোমার চিঠি পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দিতে বসে মনে হয়েছে যে কথা তুমি জানতে চেয়েছ তার যথাযোগ্য উত্তর দেওয়া সেই মুহূর্ত্তে আমার পক্ষে সহজসাধ্য নয়। তাই তখনকার মত আমায় নিরস্ত হতে হয়েছিল। তোমার আমার পথ যখন সম্পূর্ণ ভিন্ন তখন মিথ্যা পণ্ডশ্রম করতে আমার মন চায় নি। এর জন্যে তুমি দুঃখিত হলেও আমি নিরুপায়। যেখানে ঘটনাটির শেষ করে দিয়েছি সেইখানেই যেন তার চির অবসান হয়। নইলে তার জের টানতে গেলে এ জীবনেও মুক্তি পাব না, শুধু পথহারার মত ঘুরে মরতে হবে। কিন্তু একটা কথা আজও আমি বুঝে উঠতে পারছি না যে, এ তুমি করলে কি! ভালবাসার এত বড় অপমানের কথা আমি কোন দিন কল্পনাও করতে পারি নি। যা তুমি করেছ তা আমি ভুল করেও অবিশ্বাস করতে পারছি না। পারলে অবশ্যই খুশী হতাম, কিন্তু তোমার সত্যভাষণের উপর আমার আস্থা আছে।

প্রথমে যে ভুলের জন্য তোমরা একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলে তা আমার অজ্ঞাতই ছিল, কিন্তু আজ আমার দুঃখ এবং বেদনা রাখবার ঠাঁই খুঁজে পাচ্ছি না এই ভেবে যে, তোমাদের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল আমাকে কেন্দ্র করে। তবুও এই দুঃখের মধ্যেও একথা ভেবে আনন্দ পাচ্ছি যে,আমার ভাগ্য আমাকে নিদারুণ লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। এর জন্যে রাধু বোষ্টমকে আমি আমৃত্যু মনে রাখব এবং সেই সঙ্গে একথাটাও আমি ভুলতে পারব না যে, যে হৃদয়বৃত্তি রাধুর মত একজন প্রায় নিরক্ষর মানুষকে শিখিয়েছে ক্ষমা করতে, শক্তি জুগিয়েছে তার গৃহত্যাগিনী স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করতে; হৃদয়ের সেই সুকুমার বৃত্তি তোমার মধ্যে এমন ভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল কি করে। অথচ তোমার রয়েছে উচ্চশিক্ষা, উন্নত আদর্শবাদ।

যে ভুল মানুষ না জেনে করে তার দায়িত্ব না হয় অদৃষ্টের উপর চাপিয়ে দেওয়া গেল, কিন্তু যা তুমি জেনেশুনে করলে তার কি জবাব দেবার আছে মিনু?

মঞ্জুষাকে আমি দোষ দিতে পারি না। আমার বিশ্বাস এ উক্তিকে তুমিও সমর্থন করবে। অন্যায় সে করে নি—একটি মুহূর্ত্তের জন্য তাকে প্রশ্রয়ও দেয় নি। রাধুর চিঠিতে প্রথমে সে জানতে পারলে যে একটা মারাত্মক রকম ভুলই তোমাদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টির কারণ। তার পরে আর এক পা সে অগ্রসর হয় নি। সে দৃশ্য আজও আমার মনে পড়ে মিনু। মঞ্জুষা যেন পাষাণ হয়ে গিয়েছিল। সে পাষাণে প্রাণদান করতে একমাত্র তুমিই পারতে, কিন্তু তুমি পিছিয়ে গেলে।

আজ যা একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হয়ে তোমার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে, তার সাক্ষাৎ হয়তো কোন দিনই তুমি পেতে না, কিন্তু একটা মিথ্যা লৌকিক অনুষ্ঠানের কথা তুমি কিছুতেই ভুলতে পারলে না যার জন্যে আমার এত বড় বিশ্বাসের করলে অমর্য্যাদা। মঞ্জুষার আসল সত্তাকে মারতে গেলে টুঁটি টিপে। কিন্তু আমি জানি সে মরবে না—মরতে সে পারে না। তার মধ্যে আমি দেখেছি অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্য্য, কোমল এবং কঠোরের অপূর্ব্ব সমন্বয়।

তবে তোমার অবিবেচনার ফলে তার অন্তরের একটা দিক হয়তো কোন দিন ফুটে উঠতে পারবে না—তার কাজের মধ্যে মমতার স্নিগ্ধ স্পর্শের অভাব দেখা দেবে। তাই সে তোমার মুখের উপর অমন করে দরজা বন্ধ করে দিতে পেরেছে। কিন্তু এসব কথা এখন থাক। এ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে মনকে যেন অনাবশ্যক পীড়ন করা হয়।

লিখেছ আমার অসমাপ্ত কাজ যেন আমিই আবার সমাপ্ত করি। একথা তুমি ভাবতে পারলে কেমন করে তা আমি আজও বুঝে উঠতে পারি না। এত ছেলেমানুষ ত তুমি নও মিনু। আর আমি চাইলেই তা পাওয়া যাবে এ কথাই বা তুমি বলছ কোন যুক্তিতে? আজ আমার কি মনে হয় জান? মঞ্জুকে তুমি চিনবার চেষ্টা এক দিনের জন্যেও কর নি। শুধু স্বপ্নই দেখেই আর রঙিন কল্পনা করেই এতকাল কাটিয়েছ—ভাল তাকে হয়তো এক মুহূর্তের জন্যেও বাস নি।

তুমি হয়তো ভাবছ আমার মত একটা ভবঘুরের মুখে এসব কথা কেন? কথাটা আমারও একবার মনে হয়েছে। ঘোরতর সংসারীর নাকি এইটেই আসল রূপ।

মঞ্জুষার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কিন্তু ভাবতে বসে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করি যে, আমার যা কিছু দুশ্চিন্তা তা তোমাকে নিয়েই—মঞ্জুষা নিতান্তই উপলক্ষ্য। সুতরাং একথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, আমার চলার পথে মঞ্জুষার আবির্ভাবটা একটা সাময়িক ঘটনা মাত্র।

তোমার চিঠিতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, মঞ্জুষা সম্বন্ধে তোমার ধারণাটা পালটে গেছে। খেয়ালমত তাকে নিয়ে দাবার চাল দেওয়া চলবে না। তার ব্যক্তিত্ব এবং আত্ম-চেতনা অত্যন্ত সজাগ।

আবার বলছি তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়, কিন্তু এত মেয়ে মঞ্জু—এই ত চাই। নইলে আমাদের চৈতন্য যে আর সারাজীবনেও হবে না।...

আজ আর বেশী লিখব না। বেশ বুঝতে পারছি তুমি ক্রমে ক্রমে চটে যাচ্ছ, কিন্তু কি করব বল। তোমাদের কথা যে সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের মত পথের মানুষ তোমরা নও—সংসারী তোমাদের অনেককিছু দিতে চায় এবং প্রতিদানে পেতেও চায়।...

আমার কথা জানতে চেয়েছ। ভালই আছি। কিন্তু বর্তমানে যেখানে আছি সেখানে বেশী দিন পোষাবে না। লীলা রাও ঢের বদলে গেছে, এত বদলে গেছে যে, অনেক চেষ্টা করেও ঠিক যেন খাপ খাওয়াতে পারছি না। লীলা বলে ওসব আমার মনের ভুল। কিন্তু ভুলই হোক আর সত্যই হোক, তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। কখন কোথায় থাকি তুমি জানতে পারবে। আমার আন্তরিক ভালবাসা নাও।

ইতি মানু—

পড়া শেষ হইতেই মৃন্ময় চিঠিখানি টেবিলের উপর রাখিল। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। এখনও আলো জ্বালানো হয় নাই। লিলির সম্ভবতঃ হুঁশ নাই। মৃন্ময় ভাবিল, আলো দিয়া গেলে চিঠিখানি আর একবার পড়িয়া দেখিতে হইবে।

সহসা সে উঠিয়া আবছা অন্ধকারে ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে লাগিল। মনটা আবার নূতন করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। নান্তুর মত সে একবারও ভাবিতে পারিতেছে না যে, যেখানে একবার শেষ করিয়া দিয়াছে সেখানেই যেন সব-কিছুর শেষ হইয়া যায়। নান্তুর মন যে কোন্ ধাতুতে গড়া মৃন্ময় তাহা আজও বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। পারিলে হয়ত তার জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনায় এমনি করিয়া বিপর্য্যয় দেখা দিত না, অন্ততঃ একটা সহজ পথ সে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইত।

মহীপাল এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। ইহার পরে আজ আর বাহির হওয়া চলিবে না। মৃন্ময় ঘর হইতে বাহির হইয়া বাগানে আসিয়া বসিল। এই মুহূর্তে তার কোনকিছুই ভাল লাগিতেছিল না।

লিলি সেই যে গিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়াছে এখনও তার দেখা নাই। লছমিয়া একবার আলো-হাতে ঘরের দরজার পাশ হইতে উঁকি মারিয়া কি জানি কেন প্রবেশ না করিয়া নিঃশব্দে সরিয়া গেল। মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে গুন্ গুন্ করিয়া সুর ভাঁজিতেছিল। লছমিয়া চলিয়া যাইতে তার হুঁশ হইল, কিন্তু তাহাকে ডাকিবার পূর্ব্বেই সে অদৃশ্য হইয়া গেল। বাগানে বসিয়া বসিয়া মৃন্ময় ক্লান্তিবোধ করিতেছিল, নিঃসঙ্গতা তাহাকে পীড়া দিতেছিল।

লিলিকে দেখা গেল আলো-হাতে তার ঘরের পানে আসিতে। মৃন্ময় দ্রুত বাগান হইতে ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল, লিলির সহিত দোরগোড়ায় তাহার সাক্ষাৎ হইল। লিলি কোন কথা বলিল না, ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া আলোটি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, একটু হাসিয়া বলিল, বাগানে ছিলে বুঝি? তবে যে লছমিয়া বলছিল তোমার মন ভাল নেই।...

মৃন্ময় বিস্মিত হইল। বলিল, এ খবর লছমিয়াকে কে দিলে লিলি?

লিলি গম্ভীর হইতে গিয়াও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই কি করে জানলি লছমিয়া'? কি জবাব দিলে জান? লিলি পুনরায় হাসিয়া, কহিল, বললে, 'দাদাবাবু গান গাইছে'—

মৃন্ময় গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, তাকে রীতিমত ধমকে দেওয়া উচিত ছিল তোমার।

লিলি শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, প্রয়োজন বোধ করি নি

মিনু-দা। কিন্তু চিঠিতে কোন খারাপ খবর নেই তো? কে লিখেছে চিঠি?

মৃন্ময় বলিল, নান্টুদা লিখেছে।

লিলি বলিল, কিন্তু আমার সব কথার জবাব ত এখনও দেওয়া হয়নি মিনু-দা।

মৃন্ময় যেন নিজের উপর নিজে চটিয়া গিয়াছে এমনি ভাবে বলিতে লাগিল, কি আর লিখবে সেই একই কথা। শুধু একটানা ছি ছি আর রাশি রাশি অনুযোগ। এটা হলে ভাল হ'ত, সেটা হলে ভাল হ'ত। যা হয়নি তা হয়নি, এখন কি হতে পারে বলো। না ধন্ত মেয়ে মঞ্জু।

লিলি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, দেখছি লছমিয়াও তোমাকে চিনে ফেলেছে। কিন্তু এত রাগ তোমার কার উপর?

মৃন্ময় নিজের এই আকস্মিক উত্তেজনায় ঈষৎ লজ্জিত হইল। বলিল, না রাগ আবার কার উপর করতে যাব। বলিয়া টেবিলের উপর হইতে চিঠিখানি তুলিয়া আনিয়া লিলির হাতে দিল, বলিল, পড়ে দেখ।

চিঠিখানি মৃন্ময়কে ফিরাইয়া দিয়া লিলি কহিল, রেখে দাও—তোমার মুখ থেকেই এক সময় শোনা যাবে। তার চেয়ে চলো বাগানে বসি গিয়ে। ভারি চমৎকার চাঁদের আলো বাইরে।

মৃন্ময় নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর উভয়ে সম্মুখের বাগানে আসিয়া বসিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া লিলিই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করিল। সে কহিল। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় নূতন করে তুমি ফিরে না এলেই বুঝি ভাল করতে। তোমার নিজেরও তাতে মঙ্গল হ'ত, আমাকে হয়ত নূতন নূতন দুর্ভাবনার সম্মুখীন হতে হ'ত না।

মৃন্ময় ডাকিল, লিলি।

লিলি সাড়া দিল, কি বলছ মিনু-দা—

মৃন্ময় বলিল, আমাকে নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়েছ বোধ হয়?

লিলি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, অস্বীকার করতে পারলেই ভাল হ'ত, কিন্তু কথাটা তুমি একেবারে মিথ্যে বলো নি। তোমাকে নিয়ে না হলেও নিজেকে নিয়ে সত্যিই আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

লিলি থামিল। একবার আকাশের পানে চাহিল। পাহাড়ের চূড়ায়, গাছের মাথায় মাথায় চাঁদের আলোর অজস্র প্লাবন বহু দিনের হারানো স্মৃতিকে জাগাইয়া তোলে। সেদিনের সে মন আজ আর নাই বটে, কিন্তু তবু কি যেন এক অনুভূতি মনকে আকুল করিয়া দেয়—একটা মৃদু পুলক-শিহরণ জাগে সারা দেহ-মনে। মন আজও মরিয়া যায় নাই। লিলির চোখ দুইটি নিজের অজ্ঞাতেই বুজিয়া আসে।

মৃন্ময় খানিক তার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, ঠিক বুঝতে পারছি না হঠাৎ তোমার মুখে আজ এ সব কথা কেন লিলি? কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন তা জানবার আমার দরকার নেই, তবে আমি কথা দিচ্ছি খুব শিগ্‌গীরই তোমাকে এই দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই দেব।

লিলি সহসা অতিমাত্রায় চমকাইয়া উঠিল। ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, সব কথা তোমায় আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না মিনু-দা। কিন্তু একটা অনুরোধ, না বুঝে আমার উপর অবিচার করো না। আমাকে মুক্তি দেবে বলছ, কিন্তু তা যেন শেষ পর্য্যন্ত আমার কাছে শাস্তিস্বরূপ না হয়ে ওঠে।

মৃন্ময়ের মুখে বিস্ময়ের ভাব দেখা দিল। সে কহিল, তোমরা কখন যে কি ধরণের কথা বল তা সত্যিই আমার বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু ভুল যদি কখন করে বসি নিঃসঙ্কোচে তা দেখিয়ে দিয়ো। কিছু না পারি অন্ততঃ সাবধান হতে পারব। একটু থামিয়া মৃন্ময় পুনরায় বলিতে লাগিল, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আধুনিক কালের উপযুক্ত আমি নই, সময়ের গতির সঙ্গে পা ফেলে হিসেব রেখে চলতে পারি না। পদে পদে হোঁচট খাই। ন্যায়-অন্যায়ের চুলচেরা হিসেব করতে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত দেখি যে, আমার মূলধন নিয়েও টানাটানি পড়ে গিয়েছে। ফাঁকি অবশ্য ধরা পড়ে, কিন্তু তা এত দেরিতে যে তখন ফাঁক বুজোতে গিয়ে একেবারে দেউলে হয়ে যাই।...

লিলি নীরব। মৃন্ময় বলিয়া চলিল, লোকে বলে আমি পুরাতনপন্থী। নূতন-পুরাতনের প্রশ্ন এটা নয়। আমি না বুঝে, না জেনে অন্ধের মত এগিয়ে চলি কেমন করে। আজন্মের সংস্কারকে এক কথায় অস্বীকার করতে যে পারে তাকে দুঃসাহসী বলা গেলেও সুবিবেচক বলা চলে না। মঞ্জুধাকে খুব বেশী ভালবাসি বলেই আমায় এত সাবধান হতে হয়েছিল। কোন দিক দিয়ে এতটুকু ছোট যেন তাকে না হতে হয় সেই চিন্তাটাই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল।...কিন্তু নান্টু বলে, ভালবাসার এত বড় অপমান ঘটতে ইতিপূর্ব্বে সে নাকি আর দেখে নি।

লিলি এতক্ষণে মুখ খুলিল। শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল, একটা কথা বলছি তুমি রাগ করো না মিনু-দা। মনে করো না আমি মঞ্জুর হয়ে ওকালতী করছি। আচ্ছা সত্য করে বল তো তোমার এত সতর্কতা কি শুধু তার কথা ভেবেই।

মৃন্ময় বলিল, অন্ততঃ তাই তো আমি মনে করি লিলি।

লিলি তেমনি ধীরে ধীরে বলিয়া চলিল, আমার মনে হয় অন্য কথা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস মঞ্জুধাও আমারই পথ ধরে ভেবে দেখেছে।

মৃন্ময় বলিল, এত ভূমিকা করো না লিলি।

লিলি দৃঢ়তাব্যঞ্জক সুরে কহিল, মঞ্জু নিছক উপলক্ষ্য,

আসলে তুমি ভেবেছ শুধু নিজের কথা এবং সেইটে সব-কিছুকে ছাপিয়ে এত বড় হয়ে উঠেছে যে…

মধ্যপথে বাধা দিয়া মৃন্ময় প্রতিবাদ জানাইল, না না, লিলি এ তোমাদের মিথ্যা ধারণা—অসঙ্গত কল্পনা।

লিলি গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে বলিল, একটুও মিথ্যে নয়, একটুও অতিরঞ্জিত নয় মিনু-দা। তোমার ভালবাসায় ত্যাগের অভাব ছিল বলেই গ্রহণ করতে গিয়েও ইতস্ততঃ করেছ, কিন্তু মঞ্জুর প্রেম খাঁটি প্রেম তাই সে তোমায় দোরগোড়া থেকে বিদায় দিতে পেরেছে। মনে করো না এটা খুব সহজে সে পেরেছে, কিন্তু তোমার জন্যেই তাকে এতটা শক্ত হতে হয়েছে।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে মৃন্ময় কহিল, আমার জন্য!

লিলি বলিল, ঠিক তাই। ভক্ত তার দেবতাকে ছোট করে দেখবার পূর্ব্বে নিজের মৃত্যুকে কামনা করে। মঞ্জু বেছে নিয়েছে মরণের পথকেই—

মৃন্ময় বলিল, তোমার কথা এখনও আমি বুঝতে পারছি না লিলি।

প্রত্যুত্তরে লিলি বলিল, তুমি যদি কিছুতেই না বুঝতে চাও সে আলাদা কথা।

মৃন্ময় কহিল, তুমিও কি তা হলে এই কথাই বলতে চাও যে, ভালবাসার অপমান আমি করেছি? শুধু নিজের কথাটাই আমি বড় করে দেখেছি?

লিলি জবাব দিল, ঠিক তাই মিনু-দা। মঞ্জুষার কথাই যদি তোমার কাছে মুখ্য হ'ত তা হলে তোমার মধ্যে এত দ্বিধা অথবা সঙ্কোচ দেখা দিত না, তোমার মনে এত বিশ্লেষণ করবার প্রবৃত্তিও জাগত না।

মৃন্ময় বলিল, যদি তাই হয় তা হলেই বা আমার অন্যায়টা তুমি কোথায় দেখলে!

লিলি বলিল, ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন আমি তুলি নি। একটু ইতস্ততঃ করিয়া পুনরায় কহিল, আমার একটা কথার সত্য জবাব দেবে মিনু-দা!

মৃন্ময় কহিল, তুমি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেস করতে পার লিলি।

লিলি বলিল, কিসের জন্য তুমি আবার মঞ্জুর কাছে ফিরে গিয়েছিলে? সে কি শুধু তাকে গ্রহণ করে কৃতার্থ করতে? না তোমার নিজের প্রয়োজনের তাগিদে মিনু-দা? মঞ্জুষা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল, তাই সে তোমাকে বিদায় দিতে পেরেছে। কিন্তু এর জন্যে তোমার বন্ধু তোমাকে অনুযোগ দিলেও আমি দেব না।

মৃন্ময় একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আমার হয়ে জবাবটাও যখন তুমি দিয়ে দিলে তখন প্রশ্ন করবার কোন প্রয়োজন ছিল না লিলি, কিন্তু জিজ্ঞেস করি আর দশ জনের মত তুমিই বা আমায় অনুযোগ দিতে পারছ না কেন?

লিলি কহিল, কারণ পুরুষের এই অহঙ্কারকে মেনে নিতে না পারলে সংসার চলে না। শুধু তাল ঠুকে লড়াই করেই দিন চলে যাবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না।

মৃন্ময় কোন জবাব দিল না, নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। নান্টুর চিঠি, লিলির যুক্তি সবকিছু একসঙ্গে তার মাথার মধ্যে পাক খাইতেছে। একবার দূরে পাহাড়ের উপরে গোলাকার চাঁদের পানে তার দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু আজ চাঁদের যেন কোন রূপ নাই…নাই কোন আকর্ষণ।…মৃন্ময় পুনরায় দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। উহারা সকলেই হয়ত একেবারে মিথ্যা বলিতেছে না। নিজের মত করিয়া ওরা ভাবিয়া দেখিতেছে। তার মনের খবর কেমন করিয়া পাইবে।…এই মুহূর্তে মৃন্ময়ের নিজেকে বড় অসহায়, বড় দুর্ব্বল মনে হইল।

লিলি কিছুক্ষণ তার চিন্তাকুল মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, নিজের মনের কাছেও তুমি সত্যকে স্বীকার করতে পারছ না। তুমি এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ মিনু-দা। নিজের উপরও তোমার সে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আজ আর অবশিষ্ট নেই। নইলে নান্টুবাবুর চিঠি পেয়ে তুমি রাগ করতে না, আমার কথায়ও ক্ষুন্ন হতে না।

মৃন্ময় ব্যথিত দৃষ্টিতে লিলির পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, অনেক কথাই নান্টু লিখেছে, তুমিও কিছু কম করে বললে না। এর জবাব আজ আমি দেব না, কিন্তু একদিন হয়ত নিজের থেকেই পাবে। তুমি ভেব না নিজের ত্রুটিকে ঢাকবার জন্য আমি একথা বলছি। একটু থামিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল, তুমি বলতে চাও যে এ হ'ল পুরুষের দম্ভের আর এক ধরণের প্রকাশ—

বাধা দিয়া লিলি বলিল, ঠিক তাই অথচ সবচেয়ে মজা এই যে, কথাটা তোমরা বোঝ না—এটা এমনি প্রচ্ছন্নভাবে তোমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

মৃন্ময়ের মুখে একটুখানি হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, যাদের মনে এর অবস্থিতি তারা বোঝে না আর তোমরা এর খবর রাখ। এত বড় বিস্ময়ের কথা আর শুনি নি লিলি।…

লিলি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, তাও সম্ভব মিনু-দা। কেমন করে, সে প্রশ্ন করো না—আমি জবাব দিতে পারব না। তা বলে কথাটা আমার হেসে উড়িয়ে দিও না কিন্তু। আর নয়, এ নিয়ে ঢের সময় কাটানো হয়েছে। চল ঘরে যাই—লছমিয়ার যাবার সময় হয়েছে। তা ছাড়া—

লিলি সহসা কথার মাঝখানে থামিয়া অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হইল—ঐ যে তোমার মহীপাল দেখা দিয়েছেন, কিন্তু আজ আমার একটা কথা তোমায় রাখতেই হবে মিনু-দা।

মৃন্ময় মৃদুকণ্ঠে বলিল, মহীপালের সঙ্গে যেতে নিষেধ করবে তো?

লিলি হাসিল, কহিল, ঠিকই আন্দাজ করেছ তুমি।

মৃন্ময় বলিল, কিন্তু ব্যবস্থা যে আমাদের আগে থেকে পাকা হয়ে আছে। ওকে জবাব দেব কি?

লিলি কহিল, সে ভার আমাকে দাও। আমি শুধু তোমার কথা চাই মিনু-দা। ওর কণ্ঠস্বর আবেগে ভিজিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইল। মৃন্ময় বিস্মিত হইলেও কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না। ততক্ষণে মহীপাল তাহাদের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। লিলি তাহাকে কলকণ্ঠে আহ্বান জানাইল। ক্রমশঃ

সত্যপীরের কথা

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দীশর্ম্মা)

অথ কথারম্ভ

কলিযুগে সত্য সত্য সত্যপীর কথা
যে শোনে যেমন মনে না হয় অন্যথা।
শামী বামী পাঁচী খেন্তী যত বিদ্যাধরী
এই কথা শুনি সবে গেল স্বর্গপুরী।
শৌনকাদি ঋষিবৃন্দ একত্র হইয়া
চিৎ হ'য়ে উর্দ্ধমুখে গিয়াছে লিখিয়া।
একদা বণিক এক, অতিক্ষুণ্ণ মন,
নারদের সন্নিধানে করে নিবেদন।
অতিকষ্টে দিন যায়, না জোটে বসন—
দুশ্চিন্তায় কাটে দিন, সদা অনশন।
করুন যা বিধি হয় আমার কল্যাণে
নতুবা সাক্ষাতে প্রাণ ত্যজিব এখানে।

শুনিয়া নারদ ঋষি দয়াতে ভিজিল,
কি কি ধর্ম্ম করিয়াছে, তারে জিজ্ঞাসিল।
কহিল বণিক, আমি পূজা হোম যাগ
ব্রতধর্ম্ম দান-ধ্যান নিজ স্বার্থত্যাগ;
সকলি করেছি প্রভু করি প্রাণপণ
এবে ঘোর কষ্টে তব লয়েছি শরণ।
কহেন নারদ ঋষি, ভাল যদি চাও,
এখনি ওসব ব্যাধি দূর করি দাও।
কর অবধান যাহা কহি হে তোমায়,
অবশ্য হইবে পীর তোমারে সদয়।
ধর্ম্ম কর্ম্ম দান ধ্যান ব্যাধি আছে যত,
এই দণ্ডে ত্যাগ কর, হও অবগত।

টাকা ধর্ম্ম টাকা কর্ম্ম টাকাই দেবতা,
আর যে যা বলে তাহা ডাহা মিথ্যা কথা।
টাকা তরে কর চুরি—গলাতে লাগাও ছুরি—
দ্বিধা নহি কর—
তার তরে মার গরু, অনায়াসে ব্যাচ জরু,
পরদ্রব্য হর—।
চুরি জপ, চুরি তপ, চুরি আরাধনা—
মাল লোট, জাল কর নাহি তাহে মানা।
যোল আনা ছাপাইয়ে মিথ্যা কথা কবে—
বকের নিকট সদা ধর্ম্মশিক্ষা লবে।
বিড়ালতপস্বী হয়ে দাগাবাজী করি—
লুটিবে অন্যের ধন বলি হরি হরি।

সুদীর্ঘ রাখিবে টিকি, ভালে দীর্ঘ ফোঁটা—
কার সাধ্য মাথা খুঁড়ে, চিনে কোন্ ব্যাটা!
ফোঁটা হবে ঢাল তব, টিকি সুদর্শন—
হাতে মালা, মুখে হরি, লবে সর্ব্বক্ষণ।
মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে আর ফাঁসাইবে ব্যাওয়া—
ঘরে বসি স্বর্গ পাবে, খাবে দিব্য ম্যাওয়া।
কিন্তু কভু নিজ ব্যয়ে না পোয়ো, না খেয়ো—
অপরের মুণ্ডে সদা কাঁটাল ভাঙ্গিও।
সদাই কহিবে মুখে ধর্ম্মের কাহিনী
ঘাট দিব পথ দিব, রক্ষিব দুঃখিনী।
কিন্তু কভু স্বপনেও সেদিকে না যেয়ো—
সম্মুখে আসিলে কিন্তু ঘাড় ভেঙ্গে খেয়ো।

মায়েরে না খেতে দিও, ভায়েরে না অংশ,
রাঘব-বোয়াল হয়ে উজ্জ্বল হে বংশ।
এখন ঘরেতে যাও বণিক-কুমার—
এ করিলে কোন দুঃখ না রবে তোমার।
এই পুণ্য কথা যেবা করিবে শ্রবণ
সর্ব্বদুঃখ দূর হবে ঋষির বচন।

উদ্যান ও অট্টালিকা ধন ধান্য আদি—
যে দিবে একথা তার না রবে অবধি।
এই কথা দ্বাপরেতে দেয় হনুমান
(তাই) নিশ্চিন্তে চারি যুগ থাচ্ছে মর্ত্তমান।
বাঁদরেতে শুনেছিল হয়ে বড় খুশি
(তাই) বেপরোয়া ছোলা খায় বৃন্দাবনে বসি।

জাম্ববান কথা দিয়ে কলিরাজ হ'ল,
প্রজাগণ প্রাণ লয়ে ব্যাকুল হইল।
দক্ষিণা না দিয়ে যেই শোনে আগাগোড়া,
সেও চিরদিন সুখে খায় কচুপোড়া।
এমন সুদিব্য কথা নারদ শুনায়
হৃষ্ট হয়ে বণিক আনন্দে ঘরে যায়।
সেই মত করে যাহা কয়ে দিলা ঋষি
মায়েরে খেদায় আগে পরে পদী পিসী।
চুরি করে জাল করে ফাঁকি দেয় লোকে—
মিষ্ট কথা কয় আর ধুলো দেয় চোখে।

এইমতে বহুধন সংগ্রহ করয়—
সিকি পয়সা কিন্তু কভু উদরে না দেয়।

ছেঁড়া জুতো ছেঁড়া ন্যাতা ট্যানা পোরে থাকে
কতই রহস্য কথা বলে কত লোকে।
কেবা শোনে কার কথা কারে বা শোনাই
কোন কালে নাহি থাকে বেহায়ার বালাই।
এইরূপে বহু অর্থ সঞ্চয় করিল
না খেয়ে না পোরে বাছা পটল তুলিল।
অধিক শুনাতে গেলে পুঁথি যায় বেড়ে
এইখানে সাঙ্গ কোরে দাও আজ ছেড়ে।
এতক্ষণে ধন্য পুণ্য কথা সাঙ্গ হোলো—
(একবার) বদর বদর বুলি সকলেতে বল ॥

ইতি বিট্‌কেল পুরাণান্তর্গত সত্যপীরের কথা সমাপ্ত।

বাংলার পট

শ্রীঅমূল্যগোপাল সেন

যেদিন মানুষের মনে জিজ্ঞাসা জাগল, সেইদিন থেকে মানুষ হয়ে উঠল জগতের সেরা জীব। মানুষ—মানুষ হ'ল, সভ্যতার দিকে এগিয়ে গেল—সন্ধান পেলে কত নূতন সত্যের। সৃষ্ট হ'ল ধর্ম্ম, দর্শন, শিল্প, আরও কত কি! পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের প্রয়োজন হয়ে পড়ল আরও বেশী। তার জন্য ভাষার সৃষ্টি হ'ল। মানুষ যুগ যুগ ধরে কত কষ্টই না স্বীকার করেছে, উপলব্ধ সত্য—যা আনন্দস্বরূপ, তাকে অন্যের কাছে পৌছে দেবার জন্য। কথার পর কথা সাজিয়ে মানুষ সৃষ্টি করল সাহিত্য; সুরে, ছন্দে, তালে তৈরি হ'ল সঙ্গীত, আবার রঙে রেখায় রচিত হ'ল চিত্র—বাংলায় যার নাম পট।

যদিও পট কথাটার অর্থ ছবি তথাপি বাংলার পট বলতে আমাদের মনে পড়ে এক বিশেষ রকমের শিল্পের কথা যার কল্পনা এবং রচনা বাংলার গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর শিল্পী-গোষ্ঠীর মনে ও তুলিতে; এর প্রচারও ঠিক তদনুরূপ অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত, সরল, ধর্ম্মপ্রাণ, গ্রামবাসী জনসাধারণের মধ্যে। আজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুশিল্প-বিভাগের জাদুঘরে বা অন্য কোন বিশিষ্ট শিল্পসংগ্রাহকের কাছে যেতে হয় যদি বাংলার সত্যকার শিল্পীগোষ্ঠীর হাতের কোন ছবি দেখার ইচ্ছা হয়। বর্ত্তমান যুগের খ্যাতনামা শিল্পীরা প্রায় সকলেই বাংলার অতীত যুগের পটুয়াদের আঁকা ছবির প্রশংসা করে থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এত বড় একটা শিল্পীগোষ্ঠী, যারা পুরুষানুক্রমে দেশের শিল্পভাণ্ডারকে অমূল্য শিল্পসম্পদে পূর্ণ করে তুলছিলেন—তাঁদের আজ চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। বর্ত্তমান বাংলার যাঁরা শহরে চিত্রশিল্পী তাঁদের সঙ্গে অতীতের চিত্র-শিল্পী বা পটুয়াদের কোন জায়গায় মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন।

খুব বেশী দিন আগের কথা নয়—যখন পল্লী-বাংলার জনসাধারণ মনের এবং প্রাণের খোরাক সংগ্রহ করত—কথকতা, যাত্রাগান, পাঁচালিগান, পট ইত্যাদি থেকে। পটুয়ার দল পুরুষানুক্রমে ছবি আঁকত এবং বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঐ সব ছবি দেখিয়ে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পৌরাণিক উপাখ্যানের আদর্শ ধর্ম্মপ্রাণ গ্রামবাসীদের সামনে তুলে ধরত। অন্য দিকে আবার ঐ কাজে অর্থোপার্জ্জনও হ'ত বলে একদল লোক চিত্রাঙ্কনবিদ্যাকে পেশাহিসাবে গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত মনে সারাজীবন ঐ বিদ্যার অনুশীলন করেও যেতে পারত। তখনকার দিনে অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষের মত পালপার্ব্বণে পট কেনার একটা প্রথাও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

শ্রীরামের দুর্গাপূজা, বীরভূমের পটুয়ার আঁকা। সংগ্রহ—আশুতোষ মিউজিয়ম

পট বলতে পটুয়ার আঁকা গুটানো ছবির কথা প্রথমে মনে আসে। ঐসব ছবি আঁকা হ'ত স্বল্প ব্যয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করে। ছেঁড়া, পুরানো কাপড়ের উপর অতি সাধারণ পাতলা কাগজ এঁটে নিয়ে ছবির জন্য জমি তৈরি করার রীতি ছিল। কোন কোন পট খবরের কাগজের উপরও আঁকা হয়েছে দেখা যায়। সাধারণতঃ পটুয়ারা ছবি আঁকত জমির যেদিকে কাগজ লাগানো সেই দিকটাতে, কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রমও যে ছিল না, তা নয়। কাগজের অথবা কাপড়ের যে দিকটা শিল্পীর পছন্দ, সেই দিকটাতে একটা খড়িমাটির আস্তর বা প্রলেপ দেওয়ার প্রচলন ছিল। প্রয়োজন-বোধে সেই আস্তর কখনও বা পাতলা আবার কখনও-বা ঘন করা হ'ত। যেমন কাগজের দিকে ছবি আঁকতে হলে যে রকম পাতলা আস্তর চলে ঠিক সেই রকমটি কাপড়ের দিকটাতে চলে না কাপড়ের দিকে অনুরূপ পাতলা আস্তর দিয়ে ছবি আঁকতে গেলে রং রেখার বাইরে ছড়িয়ে গিয়ে ছবি নষ্ট হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। অতঃপর তৈরি জমি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে পরে বর্ণপ্রয়োগ এবং সর্ব্বশেষে রেখার কাজ করে ছবি সম্পূর্ণ করা হ'ত।

আজকাল যেমন শিল্পীদের (গ্রাম্যই হোক আর শহুরেই হোক) বিলাতী রকম-বেরকম রং, তুলি এবং মাধ্যমিকের উপর ঝোঁক দেখা যায় সে সব বালাই তখনকার দিনের পটুয়াদের ছিল না। রং, তুলি, মাধ্যমিক, বার্নিশ সবই শিল্পীরা নিজেদের প্রয়োজনানুরূপ ঘরে তৈরি করে নিতে পারত। এলামাটি, গিরিমাটি, খড়িমাটি, হরিতাল, দেশী নীল, মেটেসিন্দুর ইত্যাদি রং খুব সস্তাদরে যেখানে সেখানে মুদির দোকানে বিক্রী হ'ত। প্রদীপের শিখার উপর একটা সরা উপুড় করে ঝুলিয়ে রেখে তার থেকে কাল রং পাওয়া যেত। এই সব রং খুব ভাল করে পিষে নিয়ে কাজের উপযোগী করে তৈরি করে নেওয়া কঠিন বলে শিল্পীরা মনে করত না। তুলি বেশীর ভাগ ছাগলের লোম দিয়ে নিজেরা তৈরী করে নিত। কিন্তু তা ছাড়াও বিড়ালের লোম এবং কাঠ-বিড়ালীর লোমের তুলির প্রচলনও পটুয়াদের মধ্যে যথেষ্ট ছিল। প্রাচীন বাংলার কোন কোন পটুয়ার হাতে টানা রেখা আজও দেশবিদেশের শিল্পীদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে আছে। মাধ্যমিক হিসাবে যদিও তেঁতুলবিচি-সিদ্ধ আঠার প্রচলন অধিক ছিল তথাপি কোন কোন পটুয়া বেলের আঠা এবং বাবলার আঠাও ছবিতে ব্যবহার করেছেন। ছবিতে রঙের সঙ্গে ডিমের ব্যবহার তখনকার দিনে বাংলার পটুয়াদের কাছে অজানা ছিল না। বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রশিল্পীদের মত রঙে ধুইয়ে ছবির কোমলত্ব বাড়িয়ে নেওয়ার প্রয়াস পটুয়াদের কাজের মধ্যে একেবারে দেখা যায় না। পটের বর্ণপ্রয়োগনীতি সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতির বলা যায়; কারণ প্রাচীন মুঘল, রাজপুত ইত্যাদি শিল্পীদের মতই পটুয়ারা ছবিতে প্রত্যেক রঙের সঙ্গে সাদা রং মাধ্যমিক হিসাবে ব্যবহার করত। পটে, পাটায়, পিঁড়িতে, হাঁড়িতে পটুয়ার বর্ণপ্রয়োগরীতি সর্ব্বত্র একরূপ।

পট আবার ছোট, বড় দু'রকমের হয়। বড় পট—যে-গুলোকে গুটানো পট বলা হয়—লম্বায় দশ-বার হাত এবং চওড়ায় এক হাতের বেশী বড় একটা দেখা যায় না। পুরাণের উপাখ্যান, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীচৈতন্যলীলা ইত্যাদির ছবি গুটানো পটের সাধারণ বিষয়বস্তু ছিল। পৌরাণিক উপাখ্যান এবং দেবদেবীর উপর কতখানি বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে পটুয়ারা ছবি এঁকে যেত, পটের ছবি দেখলেই তা সহজেই বোঝা যায়। পাশ্চাত্ত্য রীতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত রবিবর্ম্মা প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীরা যেমন রামায়ণের ছবি আঁকতে গিয়ে জনকনন্দিনী সীতাকে বড়লোকের শিক্ষিতা কন্যা এবং রাক্ষসগোষ্ঠীকে আদিম অধিবাসী ছাড়া অন্য কিছু কল্পনা করতে সাহস করেন নি এবং ফলে ছবির রস অনেকটা ক্ষুণ্ণ করে ফেলেছেন, কোন পটুয়ার আঁকা অনুরূপ ছবিতে ঐ ধরণের রসভঙ্গ হয়েছে বলে জানি না। রাক্ষসরাজ রাবণের ঘাড়ের উপর দশ মুণ্ড বসাতে ওদের একটুও ইতস্ততঃ করতে হয় নি, অথবা একটা পাখীর (জটায়ু) ঠোঁটের ভিতর রাবণের মত

শিব ও অন্নপূর্ণা। কালীঘাটের পট। সংগ্রহ—আশুতোষ মিউজিয়ম

বীরপুরুষকে রথশুদ্ধ ঢুকিয়ে দিতে ওদের একবারের জন্যও মনে হয়নি—"এও কি সম্ভব ?" কারণ তারা যে ঐ সব ঘটনা মনে প্রাণে বিশ্বাস করত। চিত্র যদি শিল্পীর মনের প্রতিলিপি হয় তা হলে পটকে নিশ্চয় সার্থক চিত্র বলব। পট বাংলার পল্লী-জনসাধারণের সত্যিকার চিত্র।

ওস্তাদির দিক থেকে পটুয়ার আঁকা পট সবই যে খুব উঁচুদরের এমন কথা বলা যায় না। খুব কাঁচা হাতের কাজ, খেলো বর্ণবিন্যাস, রচনাভঙ্গীর ত্রুটি বহু পটেই রয়েছে—তবে পটের তাতে খুব রসভঙ্গ হয় নি ; কারণ পটের প্রাণই হচ্ছে সরলতা—ভাবের, রচনাভঙ্গীর, বর্ণ-বিন্যাসের, কল্পনার সরলতা। পটের আসল রসই সেখানে। একটা বিরাট্ মনুষ্য সমাজ—যারা বাস করে পল্লীর শান্ত পরিবেশের মধ্যে, বিশ্বাস করে অসংখ্য দেবদেবীতে, জীবনের আদর্শের সন্ধান নেয় পৌরাণিক গল্প, উপাখ্যানের মধ্যে, উচ্চ রাজনীতির মর্ম্ম যারা বোঝে না তাদের কথা, তাদের বিশ্বাস, তাদের ধর্ম্ম, তাদের আদর্শ, তাদের সমাজ-জীবন সবকিছুরই নিখুঁত চিত্র আঁকা আছে পটের মধ্যে। সঙ্গীতে যেমন বাউল, ভাটিয়ালী, রামপ্রসাদী, চিত্রশিল্পেও তেমনি পট পাটা, হাঁড়ি পিঁড়ি।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন প্রথম ছবি আঁকতে আরম্ভ করে তখন তারা যেমন—আলোছায়া, পারিপ্রেক্ষিক, অস্থি-সংস্থান (anatomy) ইত্যাদির কোন ধার ধারে না—নিজেদের সরল মনে পারিপার্শ্বিকের যা ছাপ লাগে কোন রকম করে শুধু তারই বর্ণনাটুকু লিখে দিয়েই খুশী—পটুয়ার আঁকা ছবিতে ঠিক সেই ধরণের সরলতার ছাপ দেখা যায়। পটুয়া ত ছবি আঁকে না—আঁকে ঘটনা। এমন সব ঘটনা যা তারা সত্য বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে।

পটুয়াদের মধ্যে হিন্দুও ছিল আবার মুসলমানও ছিল। সেই জন্য পটের বিষয়বস্তুর মধ্যে মুসলমানী বিষয়বস্তুও পাওয়া যায়। যেমন—গাজীর পট, সত্যপীর, মাণিকপীরের পট ইত্যাদি। কিন্তু মুসলমান পটুয়াদের আঁকা অনেক হিন্দু পৌরাণিক গল্পের পটও পাওয়া যায়। বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, যশোহর ইত্যাদি অঞ্চলে পটুয়াদের বাস ছিল খুব বেশী। পূর্ব্ববঙ্গের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গে গুটানো পটের প্রচলন অধিক ছিল। কুমিল্লা অঞ্চলের মুসলমান পটুয়ার আঁকা একখানা গুটানো পট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। যে সমস্ত পটুয়ার পেশা ছিল—বাড়ী বাড়ী পটের ছবি দেখানো তারা নিজেদের আঁকা ছবির বিষয়বস্তুর ছড়া রচনা করে নিত। ছড়াগুলো পুরুষানুক্রমে প্রায় একই রকম থেকে যেত। দু'তিন জন পটুয়া মিলে পটের এক দিক থেকে পর পর ছবিগুলো খুলে দেখাতে দেখাতে সঙ্গে সঙ্গে সুর করে ছড়া আবৃত্তি করে যেত। আর গ্রাম্য জনসাধারণ চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছবি দেখে আনন্দ উপভোগ করত।

কলিকাতা কালীঘাট অঞ্চলের কালীবাড়ীকে কেন্দ্র করে বহুদিন পূর্ব্বে একটা ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী বাংলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে কালী-ঘাটে দেবীদর্শনে আসত। পরে ফেরবার পথে এখানকার নানা জিনিষ—শাঁখা, সিঁদুর, তামা পিতলের বাসন-কোসন, পাথরের জিনিষ, পট, পুতুল ইত্যাদি কিনে নিয়ে যেত। এ সমস্ত জিনিষ কালীঘাট থেকে নেওয়া যেন সেকালে পুণ্যসঞ্চয়ের একটা বিশিষ্ট অঙ্গরূপে পরিগণিত হ'ত। সেই কারণেই সম্ভবতঃ কালীমন্দিরের কাছেই অন্যান্য কারিগরগোষ্ঠীর মত এক দল চিত্রশিল্পীও এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে। একই পাড়াতে প্রায় সকলেই পটুয়া ছিল বলে ঐ পাড়াকে পটুয়াপাড়া বলা হয়। কালীঘাটের পটুয়ারা চিত্রাঙ্কন ছাড়াও দেবদেবীর মৃন্ময় প্রতিমা, প্রতিমার সাজ, পুতুল ইত্যাদি তৈরি করত। আবার হাঁড়ি, পিঁড়ি ইত্যাদি চিত্রণের কাজও তারা নিজেদের পেশার মধ্যেই ধরে

নিয়েছিল। কালীঘাটের পটুয়াদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের পটুয়াদের কাজে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। চিত্রের ভাবের দিকেই হোক, বা রচনার দিকেই হোক, অথবা ওস্তাদির দিকেই হোক, এরা যেন সব দিকেই সম্পূর্ণ আলাদা এক গোষ্ঠী। কালীঘাটের পটুয়ারা সবই প্রায় এঁকেছে ছোট ছোট ছবি—ঘরসাজাবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত রাধা-কৃষ্ণ, শিব-দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি। ওরা সাধারণত: অতি প্রচলিত দেবদেবীর ছবি আঁকত। ব্যঙ্গাত্মক ছবি এবং সমাজের দুর্নীতির উপর তীব্র কশাঘাত করেও ছবি আঁকা হয়েছে প্রচুর। সাধারণ নারীপুরুষও অনেক ওদের ছবির বিষয়বস্তু।

কালীঘাটের পটে পটুয়ার ওস্তাদি হাতের ছাপ খুব সুস্পষ্ট। আলোছায়ার সমাবেশ এবং রেখাঙ্কনের কায়দাকানুন সবই অজন্তার বিখ্যাত বৌদ্ধ প্রাচীর-চিত্রাবলীর অনুরূপ। আজকাল এক দল প্রগতিশীল শিল্পীর ছবিতে নরনারীর দেহাবয়বকে অত্যধিক রূপে স্থূল করার দিকে ঝোঁক দেখা

চৈতন্যলীলা পট। সংগ্রহ—আশুতোষ মিউজিয়ম

লক্ষ্মী সরা—বরিশালের পটুয়ার আঁকা। সংগ্রাহক—শ্রীধীরেন্দ্র ব্রহ্ম
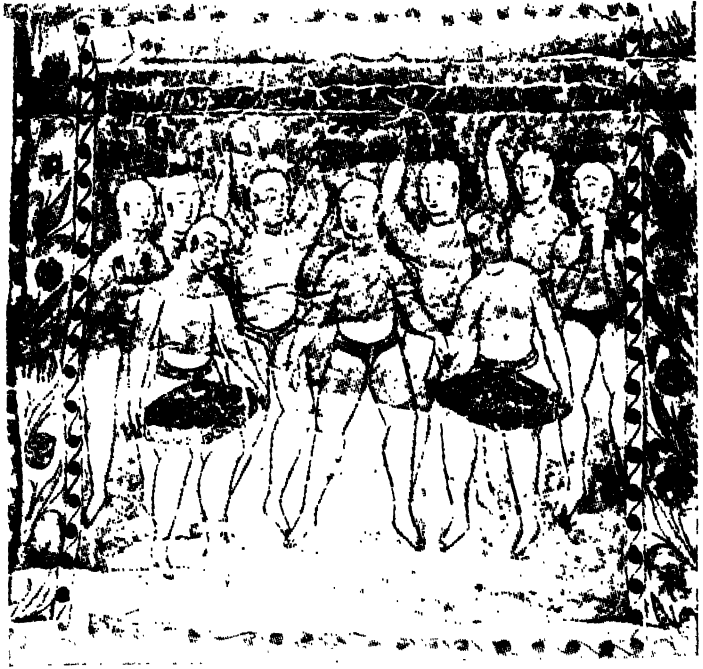
যায়। আশ্চর্য্য, ঠিক ঐ জিনিষই কালীঘাটের পটের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। অবশ্য কালীঘাটের পটে আঁকা নরনারীর দেহাবয়বের স্থূলত্বের মধ্যে সর্ব্বদেহের একটা সামঞ্জস্য আছে। উপরোক্ত প্রগতিশীল শিল্পীদের কাহারও কাহারও ছবিতে সেইরূপ সামঞ্জস্য দেখা যায় না। আজকাল অনেকে বলে থাকেন,—"ভারতীয় শিল্পী শিল্পকলায় নূতন রূপ আনতে না পেরে শুধু পুরানো পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ করে চলেছে।" তাঁরা একথাও জোরগলায় বলে থাকেন যে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য প্রগতিশীল শিল্পীরা শিল্প-জগতে এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেছেন। এ বিষয়ে আমার মনে হয়—তথাকথিত প্রগতি-শীল শিল্পীদের এ ধরণের শিল্পসৃষ্টি পাশ্চাত্ত্যে নূতন জিনিষ বটে, কিন্তু এদেশের লোকের কাছে বোধ হয় তা অতি প্রাচীন।

কালীঘাটের পট সবই প্রায় কাগজের উপর আঁকা। শুধু কালো রেখাতে আঁকা পটও বহু আছে। কালীঘাটের পটের দেবদেবীর, শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীর ধ্যানের সঙ্গে যতটা মিল, তার চেয়ে ঢের বেশী মিল বাংলার জনসাধারণের নিজস্বভাবে কল্পিত দেবদেবীর রূপের সঙ্গে। পটের শিব—শাস্ত্রোক্ত দেব-শ্রেষ্ঠ শিব নন—অথবা কুমারসম্ভবের মদনভস্মকারী, জিতেন্দ্রিয়, মহাযোগী শঙ্কর নন। তিনি ভারতচন্দ্রবর্ণিত মহাদেব—গিরিরাজের আদুরে কন্যা উমার নিত্যসহচর। দেবী পার্ব্বতী যতখানি উমা তার চেয়ে ঢের বেশী বাঙালী পিতার আদুরে কন্যা।

আজকাল কলের যুগ, তাই জনসাধারণের রুচি এবং পছন্দ-মত ছবি দেশবিদেশের কারখানায় ছাপিয়ে সস্তা করে যেখানে-সেখানে বিক্রী হয়। পটুয়ারা হাতে আঁকা ছবি ছাপানো

ছবির চেয়েও সস্তাদরে লোকের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করেছিল। এক একখানা ছবির দাম সাধারণতঃ এক পয়সা দু' পয়সা থেকে আরম্ভ করে বড় জোর সাত-আট আনা পর্য্যন্ত হ'ত। তথাপি পটুয়া-গোষ্ঠীর পটশিল্প বাঁচতে পারল না—কারণ অশিক্ষিত জনসাধারণ মুগ্ধ হ'ল বিলাতী ছাপানো ছবির বাহারে রঙের মোহে, আর যাঁরা শিক্ষিত, যাঁরা পয়সাওয়ালা তাঁরা হাত পাতলেন বিদেশীয় ব্যবসায়ী-মহলের দরজায় বিলাতী ছবির সস্তা নকল সংগ্রহ করবার জন্য। লোকের একটা ধারণা জন্মে গেল—এ দেশে শিল্পসৃষ্টি হয় না। তাই পালপার্ব্বণে লোকে আর পট কেনে না—পটুয়ার ছবি পটুয়ার ঘরেই পড়ে থাকে। কলিকাতা সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছে এ-বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে শুনেছিলাম—১৯২৯ সন পর্য্যন্ত নাকি কালীঘাটের শেষ দু'জন পটুয়া দেশের লোকের অনাদর সহ্য করে এবং আধুনিক কলওয়ালাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রায় ৯০ বৎসর বেঁচে থেকে পটুয়াপাড়ার কুঁড়ে ঘরে বসে ছবি এঁকে গিয়েছে। দেশের এত বড় একটা সম্পদ যা নষ্ট হয়ে গেল অনাদরে আমাদের অজ্ঞতার জন্য, তার কোন সন্ধানই হয়ত দেশবিদেশের শিল্পীসমাজ আজও পেত না যদি না গুরুসদয় দত্ত মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করে এদিকে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতেন। আমি যতটা জানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘর (আশুতোষ মিউজিয়ম) ভারতের একমাত্র যাদুঘর যেখানে আমরা আজও বাংলার পটের কিছু কিছু সংগ্রহ দেখার সুযোগ পাই।

গুজরাটের প্রাচীন জৈন-গ্রন্থাগার

শ্রীবিমলকুমার দত্ত, এম-এ

প্রাচীন ভারতের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার আন্দোলনে বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় জৈনধর্ম্মের দানও অবিসম্বাদিত। জৈনধর্ম্মের প্রধান ও প্রাচীন কেন্দ্র হিসাবে গুজরাট বিশেষ খ্যাত। ৭৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বনরাজ নামক জনৈক নৃপতি গুজরাটের প্রাচীন রাজধানী পত্তন বা আনিহল পত্তনের প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমান আক্রমণে বার বার বিধ্বস্ত হয়েও সেই প্রাচীন কাল থেকে পত্তননগরী তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দে রাজা কুমারপাল ও সচিব বাস্তুপালের পৃষ্ঠপোষকতা ইহার অন্যতম প্রধান কারণ।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে পত্তনের নাম চিরপ্রসিদ্ধ। পত্তনের জৈন-গ্রন্থাগারগুলি জৈন-ভাণ্ডার নামে খ্যাত। রাজা কুমারপালের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্ম্ম ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। সে সময় জৈন-আচার্য্যদের পঠন-পাঠনের জন্য পুঁথি দান করা বিশেষ পুণ্যকার্য্য বলে গণ্য হ'ত। সাধারণ লোক এরূপ দানের জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ে জৈন পুঁথি নকল করাতেন। জানা যায় যে, কুমারপালের রাজত্বকালে ২১টি ও মন্ত্রী বাস্তুপালের আমলে তিনটি গ্রন্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ২৪টি গ্রন্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠায় ব্যয় হয়েছিল ১৮ কোটি টাকা।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, রাজা কুমারপালের আদেশে যে সকল জৈন পুঁথি রচিত হয় আজ তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তাঁর পরবর্ত্তী সম্রাট্ অজয়পালের দ্বারা উক্ত পুঁথিপত্র বিনষ্ট হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জৈনবিদ্বেষী। অজয়পালের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর মন্ত্রী উদয়ন কিছু কিছু পুঁথি জয়সলমীরে স্থানান্তরিত করেন। বাস্তুপালের সমসাময়িক পুঁথিগুলি মুসলমানদের দ্বারা ভস্মীভূত হয়। হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বহু লেখক ও শিল্পী জয়সলমীরে আত্মগোপন করেন। ঐ সকল স্থানে প্রাপ্ত পুঁথিপত্রই পত্তনের অবশিষ্টাংশ।

প্রায় ১০০ বছর আগে কর্ণেল টড তাঁর *Annals of Rajasthan* নামক বিখ্যাত পুস্তকে এই সকল জৈন-ভাণ্ডারের কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর ডাঃ বুলার, ডাঃ ভাণ্ডারকর ও অধ্যাপক পিটারসন প্রমুখ মনীষিগণ উক্ত লুপ্ত ভাণ্ডার থেকে জ্ঞানরত্ন উদ্ধারকার্য্যে ব্রতী হন। বরোদা সরকার উক্ত কার্য্য সমাপ্ত করবার জন্য শ্রীমণিলাল দ্বিবেদী মহাশয়কে নিয়োগ করেন। দ্বিবেদী মহাশয় নিম্নলিখিত বারটি ভাণ্ডারের সন্ধান দিয়েছেন।

১। পোফালিয়া ভাদোর ভাণ্ডার : ১নং
২। ঐ : ২নং
৩। ঐ : ৩নং

৪। ক্ষেত্তরসির ভাণ্ডার, ৫। ভবন পাদোর ভাণ্ডার, ৬। নিলেম্বিদা পাদোর ভাণ্ডার, ৭। ভাদি পার্শ্বনাথের ভাণ্ডার, ৮। সালি ভাদোর ভাণ্ডার, ৯। ধনদের ভাদোর ভাণ্ডার, ১০। লুক উপাশ্রয়ের ভাণ্ডার, ১১। রঙ্গদা ভরদ্বাজের ভাণ্ডার ১২। মণিশঙ্কর দেশাইয়ের ভাণ্ডার।

উক্ত বারটি ভাণ্ডার ব্যতীত আরও একটি ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে ১১ ও ১২ নং ভাণ্ডার দুটি হিন্দুধর্ম্ম সংক্রান্ত পুঁথির। উক্ত তালিকার ১, ২ ও ৪ নং ভাণ্ডার ব্যতীত অন্য ভাণ্ডারগুলির পুঁথিসকল কাগজে লিখিত; কেবলমাত্র ১২ ও ৪ নং ভাণ্ডারের পুথিগুলি তালপাতার। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়ে অধ্যাপক পিটারসন কাজ আরম্ভ করেন: তিনি দ্বিবেদী মহাশয়ের সমসাময়িক। কিছু দিন হ'ল উক্ত জৈন-ভাণ্ডারগুলির একটি ধারাবাহিক তালিকা জৈন সম্মেলন কর্ত্তৃক প্রণয়নের ব্যবস্থা হয়েছে। উক্ত জৈন ভাণ্ডারগুলির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে অধ্যাপক পিটারসনের নিম্নলিখিত মত উল্লেখযোগ্য,—

"I know of no other town in India and a few in the world, that can boast of so great a store of documents of such venerable antiquity. They would be the pride and jealously guarded treasure—of any University Library in Europe."

বর্ত্তমান সময়ের চীনের একখানি নোট। ইহাতে 'ট্রাকটরের' একখানি ছবি দেখা যাইতেছে।
ইহা কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে বর্ত্তমানে চীনে যন্ত্রের প্রচলন সূচিত করে।

চীন দেশের কৃষক

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

অনেকের ধারণা যে, পৃথিবীর মধ্যে চীনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘনবসতিপূর্ণ দেশ; কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। নিম্নলিখিত দেশগুলির সমুদয় আয়তনকে সমগ্র অধিবাসীদিগের মধ্যে মাথাপিছু ভাগ করিয়া দিলে প্রত্যেক দেশের প্রতি বর্গমাইলে অধিবাসীর সংখ্যা এইরূপ দাঁড়ায়: বেলজিয়ম—৬৩৭, গ্রেট্ ব্রিটেন—৫৩০, জাপান—৪০০, ভারতবর্ষ—২৫০, পর্ত্তুগাল—২০০, চীন—২০০।

চীন দেশের অধিকাংশ অঞ্চল পাহাড়-পর্ব্বতে পূর্ণ; এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলের উপরিভাগের অধিকাংশ মাটি জলে ধৌত হইয়া উপত্যকায় চলিয়া যায়; এই কারণেই চীন দেশের প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার গড় এত অল্প। বাস্তবিকপক্ষে চীন দেশের সভ্যতাকে "নদনদী ও উপত্যকার সভ্যতা" বলা যাইতে পারে। প্রধানতঃ নদনদীর তীরে এবং উপত্যকাসমূহেই চীন দেশের জনসংখ্যা অধিক। উদাহরণস্বরূপ কিয়াংসু প্রদেশের কথা বলা যায়; এই প্রদেশে সাংহাই অবস্থিত; এবং এই প্রদেশের মধ্য দিয়া ইয়াংসী নদী প্রবাহিত হইতেছে; এই প্রদেশে প্রতি বর্গমাইলের জনসংখ্যা ৮৮০; গড়ে প্রতি বর্গমাইল আবাদী জমি ১৫০০ লোককে প্রতিপালন করে। পৃথিবীর সকল দেশের মোট নৌকার সংখ্যা অপেক্ষা চীন দেশের নৌকার সংখ্যা অধিক।

চীন প্রধানতঃ কৃষি-প্রধান দেশ; প্রায় শতকরা ৯০ জন লোক কোন না কোন প্রকারের কৃষি-সম্পর্কীয় কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের (United States) সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, চীনের অধিবাসীরা বড় বড় ক্ষেত-খামারের কৃষক নহে; উহাদের উদ্যানপালক (gardeners) বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ, চীনের কৃষকেরা যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকদের ন্যায় বিস্তীর্ণ ক্ষেত চাষ করে না; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি চাষ করে। চীন দেশের শতকরা ৬০ ভাগ কৃষিক্ষেত্রের আয়তন দুই একরেরও কম এবং তথাকার কৃষকদের কেবলমাত্র শতকরা পাঁচ জনের কৃষি-ক্ষেত্রের আয়তন ৮ একরের অধিক।

চীন দেশে মোটামুটি এক একর জমি হইতে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয় পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে তাহা হয় না। অধিকাংশ জমি হইতেই বৎসরে দুই-তিনটি ফসল উৎপাদিত হয়। প্রতি একরের উৎপন্ন শস্যে আড়াই জন লোক প্রতিপালিত হয়। ইহা ব্যতীত 'বাড়তি' শস্য শহরের অধিবাসীদের খাদ্য জোগায়; কোন কোন শস্য রপ্তানীও হয়। চীনের কৃষক তাহার অল্প পরিমাণ জমিতে কত বেশী পরিশ্রম করে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অনেক সময়েই তাহাকে অতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সেচের জন্য নিজের স্কন্ধে জল বহন করিয়া আনিতে হয়।

ধানের জমিতে মাছের চাষ চীন দেশের কৃষকদের একটি বিশেষত্ব; অর্থাৎ একই জমি হইতে তাহারা 'ভাত ও মাছ' উৎপাদন করে। এই সকল জমিতে আবার এক রকমের ছোট ছোট কীট জন্মায়। বৎসরের এক সময়ে মাটি হইতে এই সকল কীট বাহির করিয়া উহাদিগকে বিক্রয় করা হয়; ইহারা খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শুনা যায় এই সকল কীটে ঔষধের গুণও আছে।

প্রধানতঃ 'হাতের' দ্বারাই চীন দেশের কৃষিকার্য্য সম্পাদিত হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে বলদ ও মহিষ নিযুক্ত করা হয়;

চীনের ধানক্ষেতের অভিমুখে চীনা পুরুষ এবং শিশু-সন্তানসহ সাদা কামিজপরা একজন স্ত্রীলোক

চীনের উত্তরাঞ্চলে বাস করে; এই অঞ্চলের আবহাওয়া এত বেশী ঠাণ্ডা যে, এখানে ধানের চাষ হয় না। স্থানীয় অধিবাসীরা রাই, মিলেট (জোয়ার জাতীয় শস্য), জই, গম প্রভৃতি ভক্ষণ করে। এই সকল খাদ্য গ্রহণের ফলে এবং শীতার্ত্ত আবহাওয়ার জন্য উত্তর-চীনের অধিবাসীরা দক্ষিণ ও মধ্য চীনের চাউল ভক্ষণকারী অধিবাসীদিগের অপেক্ষা আকৃতিতে লম্বা।

কেহ কেহ বলেন যে, চীন দেশের কৃষকেরা নিম্নশ্রেণীর কৃষক, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর সার প্রস্তুত ও প্রয়োগকারী, অর্থাৎ তাহারা কৃষি-কার্য্যের সকল বিষয়ে সমান পটু নহে, কিন্তু জমিতে সার প্রয়োগ সম্বন্ধে তাহাদের মত পটুত্ব খুবই বিরল। এ কথা ঠিক যে, চীনের কৃষকেরা কোন আবর্জ্জনাকেই 'আবর্জ্জনা' মনে করে না; সকল প্রকারের আবর্জ্জনাই তাহাদের নিকট সার হিসাবে মূল্যবান। বর্ত্তমানে সেখানে রাসায়নিক সারের প্রচলন ক্রমশঃ বাড়িতেছে; কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, ইহার ফলে একর প্রতি উৎপাদন বাড়িতে পারে, কিন্তু শস্যে 'ভিটামিনের' পরিমাণ কম হইয়া যাইবার খুবই সম্ভাবনা আছে। তাঁহাদের মতে বর্ত্তমানে চীনের কৃষকেরা যে "কম্পোষ্ট" সার প্রস্তুত করে তাহার স্থান কোন রাসায়নিক সারই অধিকার করিতে পারিবে না।

স্থানে স্থানে অশ্ব ও গর্দ্দভ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অধিকাংশ কৃষিক্ষেত্র হস্তচালিত যন্ত্রের দ্বারাই কর্ষিত হইয়া থাকে এবং এই সকল যন্ত্রাদিও অতি প্রাচীন ধরণের; প্রকৃতপক্ষে তথায় তেমন কোন উন্নত যন্ত্রের প্রচলন এখনও হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য দেশের পরিশ্রম-লাঘবকারী উন্নত যন্ত্রাদি চীন দেশের কৃষিকার্য্যে প্রচলিত হইলে সেখানকার অন্ততঃ ৫০,০০০,০০০ লোককে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য অন্য পেশা অবলম্বন করিতে হইবে এবং ইহাও সত্য যে, চীন দেশের কৃষিতে যদি আধুনিক যন্ত্রাদি প্রচলন করা যায় তাহা হইলে সেখানকার জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ নানাবিধ শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে; এবং এই ক্ষেত্রেই চীনের বল ও দুর্ব্বলতা! কারণ শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক চীনে শিল্পের প্রবর্ত্তন হইবেই হইবে; এবং তথাকার কৃষক সম্প্রদায়ের একটি বিপুল সংখ্যা "যান্ত্রিক বা শিল্প সম্পর্কীয় সভ্যতার" দিকে কি ভাবে ধাবিত হয় তাহার উপরেই চীনের ভবিষ্যৎ 'বিরাটত্ব' নির্ভর করিবে।

অনেকের ধারণা যে, চীন দেশের কৃষকেরা ধান ব্যতীত আর কোন শস্যের চাষ করে না; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা চীন দেশেই অধিকতর রকমের ফুল, গাছপালা, শাকসব্জী প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ইহা অবিসম্বাদী সত্য যে, পৃথিবীর বহু রকমের গাছপালা, ফুল, ফল প্রভৃতির প্রথম উৎপত্তিস্থান চীন দেশ। চীন দেশ হইতেই বহু রকমের গাছপালা আমেরিকায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহার পরিবর্ত্তে আমেরিকা চীনকে দিয়াছে উন্নত শ্রেণীর চীনাবাদাম। ধান সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, চীন দেশের অন্ততঃ দশ কোটি লোক ধানের সহিত মোটেই পরিচিত নহে। এই সকল লোক

চীনে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, ৪৬৫০ বৎসর পূর্ব্বে এক অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন কৃষক সিন্নুং কর্ত্তৃক সেখানে কৃষির প্রথম প্রবর্ত্তন হয়; কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই সেখানকার অধিবাসীদের কৃষিই প্রধান পেশা ছিল।

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সেচপ্রণালী চীন দেশের সেচুয়ান (Szeschuan) প্রদেশে এখনও কার্য্যকরী অবস্থায় আছে। যে পূর্ত্তবিদ্যা-বিশারদ এই সেচপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তিনি যে কতদূর দূরদর্শী ও জ্ঞানী ছিলেন তাহা ধারণা করা যায় না; তিনি জলসেচনের জন্য যে সকল খাল, নালা প্রভৃতি খনন করিয়াছিলেন তাহাদের তলদেশে ধাতুনির্ম্মিত ছোট ছোট ফলক স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং এই আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন যে বৎসরে অন্ততঃ একবার মাটি খুঁড়িয়া ফলকগুলিকে রৌদ্রে অনাবৃত না রাখিলে শস্য উৎপন্ন হইবে না। এই আদেশ বা প্রবাদ অনুযায়ী উক্ত প্রদেশের কৃষকগণ প্রত্যেক বৎসর মাটি খুঁড়িয়া ধাতু ফলকগুলিকে অনাবৃত করে

এবং ইহার ফলে সেচের নালা, খানা প্রভৃতি বুজিয়া যায় না, এবং খুঁড়িলে যে পলি মাটি পাওয়া যায় তাহা সার রূপে জমিতে প্রয়োগ করা হয়।

চীন দেশে যে কোন আগন্তুক অতি সহজে লক্ষ্য করিতে পারিবেন যে, সেখানে গোচারণ-ভূমির খুবই অভাব। বাস্তবিক সেখানকার আবাদযোগ্য জমিতে এত রকম শস্যের চাষ হয় যে, সেখানে চারণ ভূমি পৃথক ভাবে রাখা ক্ষতিকর বলিয়া মনেহয়।

লাঙ্গল দ্বারা ধানজমি কর্ষণরত একজন চীনা চাষী

ইতিহাসের প্রথম যুগ হইতে চীন দেশের কৃষককে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র বলিয়া গণ্য করা হয়। রাজকর্ম্মচারী বা সুধী ব্যক্তির পরেই কৃষকের স্থান। সৈনিকের তুলনায় সমাজে তাহার স্থান অতি উচ্চে। আর ভারতে—কৃষকের স্থান কোথায়? পূর্ব্বকালে প্রতি বসন্ত ঋতুতে সম্রাট্ অল্প পরিমাণ জমি নিজ হস্তে কর্ষণ করিতেন, যাহাতে তাঁহার রাজ্য "শস্যশ্যামলা" হয়। কৃষক হওয়াই সম্রাটের প্রধান গর্ব্ব ছিল। চীন দেশের অধিকাংশ বিগ্রহের পূজা কৃষিকার্য্যের সহিত জড়িত।

চীনের কৃষকদিগের নিকট হইতে আমাদের দেশের কৃষক-গণ অনেক বিষয়—বিশেষত: প্রায় সকল প্রকার আবর্জ্জনা দ্বারা "কম্পোষ্ট" প্রস্তুতপ্রণালী এবং 'কম্পোষ্টে'র উপকারিতা শিক্ষা করিতে পারে। কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে তথাকার কৃষকদের দূরদর্শিতা কত অধিক তাহাও বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। কেবল একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। একটি গ্রামের একজন কৃষক অতি উৎকৃষ্ট শস্য উৎপাদন করিত; এবং প্রতি বৎসরই সে তাহার শস্যের জন্য সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করিত; পরে জানা গেল যে, এই কৃষকটি তাহার উৎকৃষ্ট শস্যের বীজ প্রচুর পরিমাণে তাহার প্রতিবেশীগণের মধ্যে বিতরণ করিত। সে এই ভাবে কেন বীজ বিতরণ করে, এই প্রশ্ন তাহাকে করা হইলে সে উত্তর দিয়াছিল, "আমি নিজের রক্ষা ও স্বার্থের জন্যই ইহা করি; আমার প্রতিবেশীগণের শস্য যদি নিকৃষ্ট হয়; উহাদের ফুলের পরাগরেণু বাতাসে উড়িয়া আসিয়া আমার শস্যের ফুলের উপর পড়িবে, ফলে আমার শস্য নিকৃষ্ট হইবে; আমার উৎকৃষ্ট বীজ প্রতিবেশীগণকে দিলে আমি নিশ্চিন্ত থাকিব যে, তাহাদের নিকৃষ্ট শস্য দ্বারা আমার উৎকৃষ্ট শস্যের কোন ক্ষতি হইবে না।" কৃষিকার্য্যে এই নীতি যে কত মূল্যবান তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশের কৃষকদের মধ্যে এই নীতি প্রচার করিলে কৃষির প্রভূত উন্নতি হইবে। কিন্তু করে কে?

চীনা কৃষকেরা বড় বড় টুপী মাথায় পরিয়া জলা জমি হইতে ধানের চারা তুলিয়া আঁটি বাঁধিতেছে

আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী যূথিকা দাস, বি-এ, সাংহাইয়ে দেড় বৎসরের অধিককাল অবস্থানের পর গত ১০ই জুন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়াছে। তাহার নিকট সাংহাইয়ে অধুনা প্রচলিত ৫০০ ডলারের একখানি জে-এম্-পি (জিং, মিং, পাও) দেখিলাম, উহার উপর একটি 'ট্রাক্টরের' ছবি মুদ্রিত আছে; ইহা হইতেই বুঝা যাইবে তথায় বর্ত্তমানে 'অধিকতর খাদ্য উৎপাদনের' জন্য ট্রাকটরের প্রচলন হইয়াছে এবং ইহার জন্য কিরূপ ভাবে প্রচারকার্য্য চলিতেছে সে সম্বন্ধেও ধারণা জন্মিবে।*

* ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসের *The China Monthly*তে প্রকাশিত 'The Chinese Farmer' নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

কাশ্মীর-রাজসভায় বাঙ্গালী পণ্ডিত

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

সুদূর প্রাচীনকাল হইতে কাশ্মীরের সহিত গৌড়দেশের সুমধুর সারস্বত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ-যোগ্য দুই একটি নিদর্শন প্রদর্শিত হইল। ন্যায়মঞ্জরীকার "জরন্নৈয়ায়িক" সুপ্রসিদ্ধ জয়ন্তভট্ট কাশ্মীরাধিপতি শঙ্কর-বর্ম্মার রাজত্বকালে (৮৮৩-৯০২ খ্রীঃ) গ্রন্থ রচনা করেন (ন্যায়মঞ্জরী, পৃ. ২৭১ ও ৩৯৪)। তঁহার প্রপিতামহ শক্তিস্বামী সম্বন্ধে লিখিত আছে, "শক্তির্নামাভবদ্ গৌড়ো ভারদ্বাজকুলে দ্বিজঃ।" অর্থাৎ তিনি মূলতঃ গৌড়দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরে কাশ্মীরে যাইয়া কর্কোটবংশীয় কাশ্মীরাধিপতি মুক্তাপীড়ের (৭৩০-৭৬৬ খ্রীঃ) মন্ত্রী হইয়া-ছিলেন। একথা জয়ন্তভট্টের পুত্র অভিনন্দ স্বরচিত কাদম্বরী-কথাসার নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন:—

> স শক্তিস্বামিনং পুত্রমবাপ শ্রুতশালিনম্।
> রাজ্ঞঃ কর্কোটবংশস্য মুক্তাপীড়স্য মন্ত্রিণম্। (৭ম শ্লোক)

নৈষধচরিতকার "কবিপণ্ডিত" শ্রীহর্ষ তাঁহার সময়ে পূর্ব্বভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি গৌড়াধি-পতি বিজয় সেন (১০৯৬ ১১৫৮ খ্রীঃ) ও কান্যকুব্জাধিপতি গোবিন্দচন্দ্রের (১১০৪-৫৫ খ্রীঃ) সভা অলঙ্কৃত করিয়া-ছিলেন। শ্রীহর্ষ গৌড়দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় (*I.H.Q.* xxii, pp. 144-46)। নৈষধচরিতের ষোড়শ সর্গের শেষে শ্রীহর্ষ স্বয়ং লিখিয়াছেন তাঁহার এই মহাকাব্য চতুর্দ্দশবিদ্যাভিজ্ঞ কাশ্মীর পণ্ডিতগণ দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছিল:—

> কাশ্মীরৈর্মহিতে চতুর্দ্দশতয়ীং বিদ্যাং বিদদ্ভির্মহা-
> কাব্যে তদ্ভুবি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽগমৎ ষোড়শঃ।

পাণিনিব্যাকরণের কাশিকাবৃত্তির উপটীকা "কাশিকা-বিবরণপঞ্জিকা" অবলম্বন করিয়া গৌড়দেশে হাজার বৎসর ধরিয়া ব্যাকরণের এক পৃথক্ সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, অধুনা ইহা সুবিদিত। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বুলার সাহেব কাশ্মীরীদের নিকট শুনিয়াছিলেন, কাশিকাবিবরণপঞ্জিকার (অর্থাৎ, ন্যাসের) রচয়িতা "বোধিসত্ত্বদেশীয়াচার্য্য" জিনেন্দ্র-বুদ্ধি কাশ্মীরের অন্তর্গত বরাহমূল-হুষ্কপুরের অধিবাসী ছিলেন। কাশ্মীরের সহিত গৌড়ীয় পণ্ডিতদের সংযোগ প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে এজাতীয় বহুতর নিদর্শনদ্বারা প্রমাণিত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার সম্যক্ বিবৃতি আমাদের অভিপ্রেত নহে। খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীতেও এই সংযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। তাহারই প্রমাণস্বরূপ তিন জন বাঙ্গালী পণ্ডিতের বিবরণ এস্থলে সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিলাম। বাঙ্গালীর আত্মবিস্মৃতির ফলে ইহঁাদের নাম পর্য্যন্ত এখন বিস্মৃত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

১। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ

পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাঁহার সভায় এই বাঙ্গালী মহাপণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন। তাঁহার সম্যক্ পরিচয়াদি বিবৃত হইল। ফরিদ-পুর জেলার অন্তর্গত ইদিলপুর পরগণায় "মূলগ্রাম" নামক পল্লী পাশ্চাত্ত্য বৈদিক শ্রেণীর একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের আবাসস্থল বলিয়া খ্যাতিলাভ করে। তত্রত্য সামবেদী কৃষ্ণাত্রেয়বংশে চন্দ্রমণি খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার উর্দ্ধতন পুরুষদের নাম যতদূর পাওয়া যায় লিখিত হইল। আদিপুরুষ শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, তৎপুত্র গঙ্গাধর বাচস্পতি, তৎপুত্র মহেশ্বর ন্যায়বাগীশ (তার্কিক), তৎপুত্র রাজেন্দ্র, তৎপুত্র রামগোপাল পঞ্চানন চন্দ্রমণির জনক।[১] চন্দ্রমণি অল্পবয়সেই দেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। একবার পণ্ডিতগণের পোষ্টৃবর সুসঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজসিংহ (রাজত্বকাল ১৭৮৪-১৮২২ খ্রীঃ) তাঁহাকে কোন ব্যাপার উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি একটি চাটুশ্লোক রচনা করিয়া রাজার নিকট একটি উৎকৃষ্ট হস্তী উপহার পাইয়াছিলেন। শ্লোকটি এই:—

১। চন্দ্রমণির জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাধাকান্তের প্রপৌত্র ৺অন্নদাচরণ তর্কবাগীশ (১৩১৮ সনে?) ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাবপ্রকরণের জাগদীশী "প্রভা" টিপ্পনীসহ মুদ্রিত করেন। প্রভার প্রারম্ভে (পৃ. ৮-৯) বংশপরিচয় দ্রষ্টব্য।

ইত্যুচে চক্রবাকং বচনমসুদিনং দুঃখভাক্ চক্রবাকী
অস্ত্যেষ কাপি দেশো ন ভবতি রজনী যত্র বৈ প্রাণনাথ।
কান্তে চিন্তাং ত্যজ ত্বং দিনকর-কিরণাচ্ছাদকস্ত্যাগ মেরোঃ
মূলে দস্থাস্তি হস্তো বিবিধকৃতিমুদে রাজসিংহঃ প্রদাতা।

অর্থাৎ, রাত্রিতে বিরহিণী চক্রবাকীকে আশ্বস্ত করিয়া চক্রবাক বলিতেছে, রাজা রাজসিংহের সুবর্ণদানে শীঘ্রই মেরুপর্ব্বত নির্মূল হইয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিতে পারিবে না এবং রাত্রিও আর হইবে না।[২] প্রবাদ অনুসারে চন্দ্রমণি কোনও বিচারসভায় বিদেশীয় কোন পণ্ডিতের নিকট পাণিনি পড়া না থাকায় পরাজিত হন এবং তৎক্ষণাৎ পাণিনি অধ্যয়নের জন্য কাশীধামে চলিয়া যান। তৎকালে কাশীর সংস্কৃত কলেজে নব্যন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন বাঙ্গালী মহাপণ্ডিত চন্দ্রমণির জ্ঞাতিসম্পর্কিত চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন (অধ্যাপনাকাল ১৮১৩-৩৩ খ্রী.)। চন্দ্রনারায়ণের সংস্পর্শে আসিয়া চন্দ্রমণি অনধীতপূর্ব বহু গ্রন্থে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং কাশী হইতেই তিনি রণজিৎসিংহের রাজ্যে যাইয়া বহু বর্ষ ধরিয়া নানা দেশীয় বহু ছাত্রের অধ্যাপনা করিয়া অপূর্ব্ব কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধর অন্নদাচরণ তর্কবাগীশ প্রভা-গ্রন্থে তাঁহার বিদ্যা ও কীর্ত্তির পরিসর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

তর্ক-ব্যাকরণাঙ্গ-বেদকবিতাবেদান্ত-সাংখ্যাবলী
মীমাংসাচয়সংহিতাভিরভিতঃ শাস্ত্রৈশ্চ যুক্ত্যাদিভিঃ।
ধ্বস্তব্রহ্মনিরূপণাহতমনঃপাষণ্ডগন্ধাবলিঃ
"লাহোরেশ্বর" মন্দিরে শিবমনাঃ দৈবীঞ্চ শক্তিং গতঃ।
ন্যায়ভূষণোপনামা চন্দ্রমণিস্তদাত্মজঃ।
ভারতে সুযশো যস্য রবেরংশুরিবাভবৎ।

অর্থাৎ তর্কাদি নানা শাস্ত্রে দৈবী শক্তি লাভ করিয়া সমগ্র ভারতে তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার বিদ্যা-প্রতিষ্ঠার মূল উৎস ছিল তর্কশাস্ত্র এবং তদ্বিষয়ে বাঙ্গালী পণ্ডিতদের অসাধারণ প্রতিভা ১০০।১২৫ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের সর্ব্বত্র গৌরবোজ্জ্বল বহুমান আকর্ষণ করিতে সমর্থ ছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর চন্দ্রমণি স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত শাস্ত্রাধ্যাপনায় রত ছিলেন। তাঁহার সহিত মহারাষ্ট্রী, দ্রাবিড়ী প্রভৃতি যে সকল বিদেশীয় ছাত্র আসিয়াছিলেন তাঁহাদের ক্ষীণস্মৃতি এবং বিস্ময়জনক আচারনিষ্ঠার কথা প্রাচীনদের মুখে কচিৎ এখনও শুনা যায়। আমরা শুনিয়াছি, চন্দ্রমণি দেশস্থ কোন যজ্ঞসভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এক "সাগ্নিক" বিদেশী ছাত্র উক্ত যজ্ঞে অগ্নি-উৎপাদনের ব্যবস্থা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং সকলের বিশেষ অনুরোধে যজ্ঞের "ব্রহ্মা"-রূপে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক স্বয়ং মুখ হইতেই অগ্নি উৎপাদন করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণের শক্তি দেখাইয়া সভাস্থ সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন।[৩] এক শত বৎসর পূর্ব্বেও এইরূপ শক্তিশালী ব্রাহ্মণ দেশে বিদ্যমান ছিল।

চন্দ্রমণি একজন গ্রন্থকার ছিলেন। কাশীর সরস্বতী ভবনে তদ্রচিত মুক্তাবলীর টীকা মহাপ্রভার খণ্ডিতাংশ আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম। মুক্তাবলীর উপর বাঙ্গালী রচিত টীকা দুর্ল্লভ। আমরা দুইটি দেখিয়াছি—রুদ্রতর্কবাগীশরচিত রৌদ্রী ও চন্দ্রমণিরচিত মহাপ্রভা। দুঃখের বিষয় একটিও মুদ্রিত হয় নাই। মহাপ্রভার প্রারম্ভাংশ উদ্ধৃত হইল :—

ভাগ্যোদ্ধৈতৈকহূতীনসুদিনমনোভাবিতস্বাববোধান
স্বস্যান্তে স্থাপয়ন্ যঃ প্রভুরনুভবনং স্বস্য বিশ্বস্য কুর্ব্বন্।
বিশ্বব্যাপিপ্রভাবান্ বিচরতি সততং স্বক্রিয়ামাত্রনিঘ্নং
শ্রীলো নীলো মণির্নঃ স্ফুরতু স হৃদয়ে ধ্বান্তবিধ্বংসহংসঃ।১
শ্রীশারাধনসাধনেন বহুধা কৃত্বা বিনিঃসারিতা
দুর্ব্যাখ্যাবৃতিবিচ্ছিদাং সুকৃতিনাং প্রাচামিয়ং রাজতাং।
বিক্ষোর্বক্ষসি বিশ্বনাথনিহিতা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী
তস্যাস্তস্য মহাপ্রভা প্রপদগা ত্রৈলোচনী রোচণী।২
আন্বীক্ষিকি! প্রজহতা কিল লোকবৃত্তমত্যন্তমুগ্ধমনসা মম সেবিতাসি
নস্বার্থয়ামাহমিদং ভবতীমিদানীমন্তেপ্সিতে সচিবতাং স্বহিতাং বিধেহি।৩
বিদ্যাদানপ্রবৃত্তনিজিতসুরাচার্য্যাদিরাজর্ষিকং
প্রাচ্যো যাচামপূর্ব্বসর্ব্ববিভবৈর্ভূপৈরপীষ্টার্থদম্।
কৃষ্ণাত্রেয়কুলং সমস্তি জনতামান্যং পরং বৈদিকং
রামাদির্জয়তি স্ম তত্রবতনুর্গোপালপঞ্চাননঃ।৪
ততো জাতঃ সুমহতঃ শ্রীলচন্দ্রমণির্দ্বিজঃ।
তেনে কাব্যতনুং কাঞ্চি"বাণীকল্পলতা"ভিধাম্।৫
স দৈবাদ্যগুরোপজ্ঞং মধ্যমাদৌ ত্রিলোচনঃ।
প্রসিদ্ধো রচয়ত্যেনাং মুক্তাবল্যা মহাপ্রভাম্।৬

ষষ্ঠ শ্লোক হইতে বুঝা যায় চন্দ্রমণিরই অপর নাম ছিল ত্রিলোচন। চতুর্থশ্লোকে 'প্রাচ্যৈ' শব্দের প্রয়োগ হইতে অনুমান করা যায় এই টীকা রণজিৎ সিংহের সভায়, সম্ভবতঃ লাহোরে অবস্থান কালে, লিখিত হইয়াছিল এবং তন্নিমিত্ত ইহা বঙ্গদেশে প্রচারিত হয় নাই। মাদ্রাজ অঞ্চলে ইহার প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু

২। ৺পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর জনৈক পণ্ডিতের নিকট জানিয়া উদ্ভট-শ্লোকমালায় (পৃ. ২১৪-৬) শ্লোকটি সানুবাদ মুদ্রিত করেন। বস্তুতঃ শ্লোকটি রাজসিংহের স্তুতিবাচক কিম্বা চন্দ্রমণি রচিত নহে। নবদ্বীপ হইতে সংগৃহীত জীর্ণপত্রে লিখিত কতিপয় চাটুশ্লোকের মধ্যে ঠিক এই শ্লোকই আমরা পাইয়াছি, শেষ পংক্তির পাঠ হইল—"মূলে দত্তোঽস্তি হস্তো বিবিধকবিমুদে 'সাস্তাখানেন' ধাত্রা"। অর্থাৎ ইহা নবাব শায়েস্তা খাঁর স্তুতি এবং সম্ভবতঃ কোন বাঙ্গালী কবির রচিত। শায়েস্তা খাঁ বিদ্বৎপ্রিয় ও দাতা ছিলেন, এরূপ বহু প্রমাণ আছে।

৩। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইদিলপুর পরগণার "ধীপুর" নিবাসী বৈয়াকরণ তারানাথ শিরোমণি মহাশয়ের প্রমুখাৎ ইহা শ্রুত। শিরোমণির পিতা স্বয়ং এক সাগ্নিক ছাত্রের বিস্ময়কর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বালকপুত্রকে কঠিন রোগ হইতে চিরমুক্ত করিয়াছিলেন।

Hultzsch সাহেব যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা ভ্রমাত্মক (Rep. on Sanskrit mss. in Southern India, No. II, p. xv)—টীকার নাম "লোচনী" নহে, পরন্তু ত্রৈলোচনী (অর্থাৎ ত্রিলোচন-কৃতা) এবং মধুসূদন গোস্বামী রচিত অপর প্রাচীনতর "মহাপ্রভা" টীকার কথা অলীক। মধুসূদনের পুত্র লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ রাধানাথ গোস্বামী (মৃত্যু ১৮৭৫ খ্রীঃ) সংস্কৃত গ্রন্থ রক্ষা বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থালয়ে "ত্রিলোচন ভট্টাচার্য" কৃত দুইটি গ্রন্থ ছিল—"ব্যাকরণকোটিপত্রং" এবং "ন্যায়-সংকেতঃ" (তদীয় পুস্তক সূচির পৃ. ৯, ১৩ দ্রষ্টব্য)। এই ত্রিলোচন নিঃসন্দেহ চন্দ্রমণির নামান্তর এবং রাধানাথ নিশ্চয়ই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। চন্দ্রমণি-রচিত। "বাণীকল্পলতা" নামক কাব্যগ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

উক্ত মহাপ্রভা টীকা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং মুদ্রিত হওয়া উচিত। শশধরাচার্য (৬১ পত্রে), বৌদ্ধাধিকারদীধিতি, ত্রিসূত্রীতত্ত্ববোধ, প্রগল্‌ভাচার্য (৩১।২) প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়া চন্দ্রমণি প্রমাণ করিয়াছেন যে বস্তুতই তিনি "অত্যন্তসুস্থমনে" আন্বীক্ষিকীর সমগ্রাংশই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কেবল অনুমান খণ্ড নহে এবং চন্দ্র-নারায়ণের সাহচর্যে কাশীতে বসিয়াই তাহা হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কারণ তৎকালে ঐ সকল গ্রন্থের পঠন-পাঠন নবদ্বীপাদিস্থানে প্রচারিত ছিল না।

২। মহামহোপাধ্যায় রাসমোহন সার্বভৌম

বিগত শতাব্দীর শেষভাগে বিক্রমপুর পণ্ডিত সমাজের অন্যতম রত্নস্থানীয় এই নৈয়ায়িক কতিপয় বৎসর ধরিয়া কাশ্মীরাধিপতির রাজপণ্ডিত পদে জম্মুনগরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার কথাও অদ্য বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছে। বিক্রম-পুরের "রুষদি" গ্রামে সম্ভ্রান্ত রাঢ়ীয় শ্রেণীর শ্রোত্রিয় বংশে (শাণ্ডিল্য গোত্র, মাশচারক গাঁঞি) শতাব্দীর চতুর্থ দশকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিক্রমপুর, ইছাপুরার ভট্টাচার্য বংশীয় সমাজের অন্যতম প্রধান নৈয়ায়িক সারস্বত সমাজের দ্বিতীয় সভাপতি সুকবি ও বাগ্মী কাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চাননের (১২১৭-১২৮৮ সন) নিকট তিনি নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি বৰ্দ্ধমান রাজচতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ বাংলার নৈয়ায়িক সমাজের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত ব্রজকুমার বিদ্যারত্নের নিকট পাঠ সমাপন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি নবদ্বীপে পড়েন নাই। পাঠ সমাপ্তির পর তিনি কিছুকাল বৰ্দ্ধমানের উক্ত চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তিনি নিরব-চ্ছিন্ন নৈয়ায়িক ছিলেন এবং সাধারণ কথাবার্তায়ও ন্যায়ের ভাষা ব্যবহার করিতেন। তৎসম্বন্ধে বহু কৌতুকজনক প্রসঙ্গ বৃদ্ধমুখে শ্রুত হওয়া যায়। বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্রে শেষ পরিণতি হইয়াছিল অতিদুরূহ "অনুগম" প্রণালীতে এবং ছাত্রদের প্রতিভার পরাকাষ্ঠা তাহা আয়ত্ত করিয়াই সূচিত হইত। আমরা প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি, রাস-মোহন "প্রকার-মুদ্রা" ও "সম্বন্ধ-মুদ্রা" অনুগমে বিশেষ পার-দর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গলার নৈয়ায়িক সমাজে তজ্জন্য তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি পরিণত বয়সে কাশ্মীরের সম্মানিত পদ ও উচ্চ বেতন (প্রবাদ অনুসারে মাসিক ৪০০৲) পরিত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং জীবনের শেষভাগে প্রায় ২৫ বৎসর নানা দেশীয় বহু ছাত্রকে কৃতবিদ্য করিয়া গিয়াছেন। ১৩০৭ সনে (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন—বিক্রমপুর সমাজের তিনিই প্রথম "মহামহোপাধ্যায়"। আমরা শুনিয়াছি তৎপূর্বে বিক্রমপুরের প্রধান পণ্ডিত কেহ কেহ বিদেশী রাজতন্ত্রের প্রদত্ত ঐ উপাধি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। ১৩০৯ সনের ২১শে শ্রাবণ তিনি পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের "সভাপতি" নির্বাচিত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, ঐ সনের চৈত্র মাসে (১৯০৩ খ্রীঃ) আহারের দোষে তিনি পরলোকগমন করিয়াছিলেন। বজ্রযোগিনীর বিখ্যাত নৈয়ায়িক প্রসন্নকুমার তর্করত্নের মৃত্যুর পর ১৩০০ সন হইতে ১০ বৎসর তিনি বিক্রমপুরের "প্রধান" নৈয়ায়িকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার বহু ছাত্রের মধ্যে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ন্যায়ের অধ্যাপক স্বর্গত যামিনী তর্কবাগীশ এবং মহামহোপাধ্যায় কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত (১২৮১-১৩৪৩ সন) অন্যতম।

৩। লক্ষ্মণচন্দ্র তর্কন্যায়তীর্থ (১২৭৪-১৩০৮)

যশোহর জেলার বারইখালী গ্রামে পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর শুনকগোত্রীয় বিখ্যাত কুলীন বংশে শশধর তর্করত্নের পুত্র কাশ্মীর রাজপণ্ডিত লক্ষ্মণচন্দ্র ১২৭৪ সনের আশ্বিন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। মহেশ ন্যায়রত্নের চেষ্টায় ১২৮৫ সন হইতে সংস্কৃত পরীক্ষার সৃষ্টি হইলে যে কতিপয় প্রতিভাশালী ছাত্র পরীক্ষায় বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন লক্ষ্মণচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার প্রতিভার স্ফূর্তি হইয়াছিল। দেশে উজীরপুর নিবাসী কৈলাস ন্যায়রত্নের (মৃত্যু ২০শে চৈত্র ১৩১৩) নিকট ব্যাপ্তিবাদ পর্য্যন্ত পড়িয়া লক্ষ্মণ নবদ্বীপের পাকাটোলে সুবিখ্যাত হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্তের নিকট অধ্যয়ন করেন এবং ১২৯৬ সনে তর্কসিদ্ধান্তের মৃত্যুর পর পাকাটোলের পরবর্তী অধ্যাপক বিক্রমপুরনিবাসী দুর্গা-প্রসাদ তর্কালঙ্কারের নিকট অধ্যয়ন করেন। তর্কালঙ্কার

নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিলে তিনি কোন্নগর নিবাসী মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের (মৃত্যু ২৬শে আশ্বিন ১৩০২) ছাত্র হইয়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ন্যায়ের পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া "তর্কতীর্থ" উপাধি লাভ করেন। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ তর্কতীর্থের সংখ্যা অদ্যাপি মুষ্টিমেয়। তৎপর কাশীধামে যাইয়া সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির (১২৩৭-১৩১৫) নিকট প্রাচীন ন্যায় পড়িয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে একাকী "ন্যায়তীর্থ" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপর ২ বৎসর কাশীতেই মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী ও বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৩০২ সনের মাঘ মাসে (১৮৯৬ খ্রী:) কাশ্মীরাধিপতির রাজপণ্ডিত পদে বৃত হইয়া তিনি জম্মুনগরে অধিষ্ঠিত হন। দুঃখের বিষয়, মাত্র ছয় বৎসর সেখানে অধ্যাপনা করিয়া ১৩০৮ সনের ১০ই ফাল্গুন মাঘী পূর্ণিমায় (১৯০২ খ্রী:) জম্মুতেই তিনি মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। বঙ্গের বাহিরে লক্ষ্মণের ন্যায় প্রতিভাশালী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অনেকেই উজ্জ্বল কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া বাঙালীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের স্মৃতি বিলুপ্ত হইতে দেওয়া বাংলার পক্ষে অকল্যাণকর হইবে।

অপর্ণা

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

আর্মি ইঞ্জিনীয়ার কর্ণেল বর্ধন কালিম্পং হইতে চুম্বি উপত্যকা পর্যন্ত লম্বা 'টুর' করিয়া চার দিন হইল ফিরিয়াছেন। এই চারিটি দিন তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে, অপর্ণার কাছে, দুর্গম পথে শীতের মধ্যে এই হিমালয় অভিযানের গল্প করিবার সময় পান নাই। অপর্ণাকে তিনি শুধু বলিয়াছিলেন, ডার্লিং, আই হ্যাভ সাম গুড নিউজ ফর ইউ (তোমার জন্যে কিছু সুখবর আছে)।

সুখবরটা কি হইতে পারে তাহা লইয়া অপর্ণা মাথা ঘামায় নাই, কোন কৌতুহল প্রকাশ করে নাই। অফিসারদের ক্লাব হইতে মাঝে মাঝে কর্ণেল বর্ধন সুখবর আনিতেন। সে সব খবর নিজের পেটে রাখিলেই ভাল হইত—অপর্ণা মাঝে মাঝে ভাবিত। সাত দিন হেড কোয়ার্টার্সে বসিয়া থাকিবার উপায় নাই, অনবরত 'টুর' করিতে হয়। তাঁহার প্রচুর অবসরকালে অপর্ণা তাঁহার জন্য কোন সুখবর সংগ্রহ করিয়া রাখে কিনা কর্ণেল সাহেব কোন দিন জিজ্ঞাসা করেন না, হয়ত রাখিতে পারে সন্দেহ করেন না। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি দীর্ঘ দেহের উপর কম্বেৎ বেলের মত মাথাটা এক অপূর্ব জিনিষ, ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার বাহিরে কোন সূক্ষ্ম চিন্তা বা ভাবের প্রবেশ নাই সে মাথায়। অপর্ণা এ কথা জানে। তাই কর্ণেল সাহেবের কোন বক্তব্য সম্বন্ধে তাহার চিন্তা নাই, কৌতূহলও নাই। তাঁহার সুখবর মানে সৈনিক জীবনের কেলেঙ্কারীর কেচ্ছা।

রাত্রে খাইবার টেবিলে কর্ণেল সাহেব টুরের গল্প আরম্ভ করিলেন। চুম্বি ভ্যালী হইতে কালিম্পং ফিরিয়া তাঁহাকে আবার গ্যাংটক যাইতে হইয়াছিল। গ্যাংটক হইতে থাংগু, থাংগু হইতে আরও কয়েক মাইল দূরে তিব্বতের সীমানায় গিয়াছিলেন। অনেক অর্কিড সংগ্রহ করিয়াছিলেন বাস্কেট বোঝাই করিয়া। সে সব অর্কিড অনেকে চোখেও দেখে নাই। বাস্কেটে দশ-বারো রকমের রোডোডেনড্রন ফুলও ছিল। একটা কাচের জারে রং-বেরঙের প্রজাপতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন গ্যাংটকে। তিনি বলিলেন, অর্কিড একজন মেয়ে নিয়েছে। শুধু প্রজাপতিগুলো তোমার জন্যে এনেছি ডার্লিং।

অপর্ণা বলিল, অর্কিড নিলে কে?

কর্ণেল সাহেব দুই চোখ নাচাইয়া হাসিলেন। অর্কিড সংগ্রহ তাঁহার একটা বাতিক ছিল। বলিলেন, সে একটা ভয়ানক ইন্টারেষ্টিং গল্প।

অপর্ণা কোন কথা না বলিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া তাঁহার দিকে চাহিল।

কর্ণেল সাহেব গল্প সুরু করিলেন। দার্জিলিঙে একটা কটেজ আছে। পাহাড়ের মাথায় একটা নিরালা কটেজ। ভারি কাব্যি-কাব্যি নাম, হনিমুন কটেজ। আই মাষ্ট সে এন আইডিয়াল প্লেস টু মেক লাভ (প্রেম করবার পক্ষে আদর্শ স্থান বলতে হবে)। তোমাকে একবার নিয়ে যাব বাড়ীটায়। বাট ইউ সি (কিন্তু দেখ), গুলিয়ে ফেলছি গল্পটাকে। বাড়ীটা তুমি চেন ডার্লিং, নয় কি? এবার শোন দার্জিলিঙে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে। এক সঙ্গে কিছুদিন কলেজে পড়েছিলাম। তুমি তাকে চেন, ডা: পরমেশ, ডোণ্ট ইউ (নয় কি) ডার্লিং? সে ধরে নিয়ে গেল তার বাড়ীতে,—ঐ হনিমুন কটেজে। বললে বাড়ীটা সে কিনেছে। এখানে সে বটানী নিয়ে রিসার্চ করে। একটা ছোট মেয়ে আর বুড়ী এক আণ্টকে নিয়ে সে বাড়ীটাতে থাকে। নূতন নূতন অর্কিড যোগাড় করেছি শুনে সে

অর্কিডের বাস্কেটটা নিয়ে নিলে। আর দিলে,—সেকথা পরে বলছি। পরমেশ আমাকে জিজ্ঞেস করলে কোথায় বিয়ে করেছি। আই টোল্ড হিম অল এবাউট ইউ মাই ডার্লিং (আমি তাকে তোমার সম্বন্ধে সব কথা বললাম)। শুনে ওর মুখের চেহারা কেমনতর হয়ে গেল। পরদিন দার্জিলিং ছাড়বার আগে একটা নোংরা রুমালে বাঁধা কতকগুলো কাগজ দিয়ে বললে, এই বাড়ীর পুরোনো চৌকিদার বছর কয়েক আগে এটা আমার হাতে দিয়েছিল। কোথায় পেয়েছে জিজ্ঞেস করায় বললে, অনেক দিন আগে একটা লেপ্‌চা দোকানী দিয়েছিল। সে ভুলে গিয়েছিল এটার কথা। ঘরে যাবার সময় বাক্সের মধ্যে এটা দেখে সাহেবকে দেবার কথা মনে হ'ল।

তারপর বললে, এটা একটা চিঠি। আমি পড়েছি। বোধ হয় তোমার স্ত্রীর কাছে লেখা। যে লিখেছিল সে সিকিম বেড়াতে গিয়েছিল জানি।

আমি বললাম, দি ব্ল্যাকগার্ড! তারপর?

পরমেশ বলল, তারপর ঠিক জানি নে। কেউ বলে সে সেখানে লামার ভেক নিয়ে কোনও মঠে যোগ দিয়েছে, কেউ বলে লেপচা মেয়ে বিয়ে করে সিকিমের কোথাও বাস করছে, কেউ বলে মরে গেছে। কেউ জানে না বাস্তবিক ব্যাপার কি।

আমি বললেম, সার্ভড হিম রাইট (ঠিক হয়েছে)।

কর্ণেল সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর চোখ নাচাইয়া বলিলেন, দি ওল্ড চ্যাপ লুক্‌ড্ ফানি (ওর দিকে চেয়ে হাসি পাচ্ছিল)। হয় নিজেই কিছু লিখেছে টু হিজ ওল্ড ফ্লেম (তার পুরোনো প্রণয়িনীকে), অন্য নামে চালিয়ে দিতে চায়। ইউ উড লাভ টু রিড ইট, ডার্লিং (তোমার পড়তে খুব ভাল লাগবে) নয় কি? মেয়েরা পুরোনো প্রেমের—কি যেন কথাটা—রোমন্থন করতে ভালবাসে। দাঁড়াও দেখি, মূল্যবান দলিলটা হারিয়ে গেল কি না।

কর্ণেল সাহেব উঠিয়া পাশের কামরায় গেলেন। দুই-তিনটা সুটকেস ঘাটাঘাঁটি করিয়া জিনিষটি পাইলেন। টেবিলের উপর সেটা রাখিয়া তিনি বলিলেন, আমার হাতে কাজ আছে। পরশু আবার বেরুতে হবে। তুমি নিরিবিলিতে পড়। ইট মাষ্ট বি অফুলি ইন্টারেষ্টিং টু ইউ (তোমার খুব ভাল লাগবে)।

তিনি ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় অপর্ণার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন।

অপর্ণা দেখিল ময়লা রুমালে বাঁধা কি একটা জিনিস। রুমাল খুলিতে বাহির হইল কতকগুলি কাগজ। হাতের লেখা দেখিয়া চিনিতে পারিল না, স্বামীর মুখে পরমেশের গল্প শুনিয়া অনুমান করিল কাহার লেখা।...

এক যুগ আগেকার প্রথম যৌবনের এক মিডসামার নাইটস্ ড্রিম (নিদাঘ রাতের স্বপ্ন)। এখন ভাবিলে হাসি পায়। তখন সে প্রেম করিয়া বেড়াইতে ভালবাসিত। মানে প্রেমের খেলা খেলিত তরুণদের সঙ্গে। তাহারা প্রত্যেকে ভাবিত অপর্ণা তাহার প্রেমে হাবুডুবু খাইতেছে। ইহাদের মধ্যে নৃপেন ছিল কিছু বেয়াড়া প্রকৃতির। বাইসেপস, কবিত্ব ও চাষাড়ে একগুঁয়েমির খিচুড়ি—প্রায় দুষ্পাচ্য। অপর্ণা একটু ভয় করিত নৃপেনকে, ভাবিত কখন কি করিয়া বসে। পরমেশ ছিল নৃপেনের ঠিক বিপরীত স্বভাবের,—মোলায়েম, অনুগত নির্ভরযোগ্য ছেলে। নৃপেন ও পরমেশ দুই বন্ধু। নৃপেনের বাড়াবাড়ি বন্ধ করিবার জন্য পরমেশকে কাজে লাগাইতে হইল। তারপর পরমেশ করিল এক কাণ্ড! সে অপর্ণার নিকট বিয়ের প্রস্তাব করিল। দু শ' টাকার চাকুরী মাত্র যার সম্বল সে অপর্ণাকে ঘরে বন্দিনী করিবার সাহস রাখে! ওটা যে সত্যই এত নির্বোধ তাহা কে ভাবিয়াছিল? শেষ পর্য্যন্ত দুই বন্ধু ভাগিল। এক যুগ কাটিয়া গিয়াছে তার-পর। সে কবে সে সব কথা ভুলিয়া গিয়াছে।

সেই অতীতের হনিমুন কটেজী অধ্যায়ের কথা এতদিন পরে মনে পড়িতে অপর্ণার হাসি পাইল। হঠাৎ কি মনে হইতে ভ্রূ কুঁচকাইয়া কাগজগুলি হাতে লইয়া সে শয়নঘরে গেল। জানালার পাশে ছোট টেবিল ও চেয়ার—তাহার চিঠিপত্র লিখিবার জায়গা। টেবিল-ল্যাম্প জ্বালিয়া সে জানালার পরদা সরাইয়া দিল। তারপর আল্‌গা কাগজগুলি ক্লিপে আঁটিয়া খানিকটা তাচ্ছিল্য, খানিকটা কৌতূহল লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল:

অপর্ণা, তোমার রোডোডেনড্রন ফুলের শ্রেণীবিভাগ করিবার কাজ শেষ হইল কি? ত্রিশ রকমের রোডোডেনড্রন ফুলগাছের মধ্যে কত রকমের গাছ পাইলে? পাতাশূন্য গাছে তারার মত দেখিতে ম্যাগ্‌নোলিয়া গ্লোবসার সৌন্দর্য বেশী, না রোডোডেনড্রনের সৌন্দর্য বেশী, এ প্রশ্নের মীমাংসা হইল কি? রকমারি রোডোডেনড্রন গাছ দেখিবার জন্য আমাকে লুকাইয়া পরমেশের সঙ্গে তিন হাজার ফুট নীচে নামিয়াছিলে তোমাদের হনিমুন কটেজ হইতে? অসংখ্য গিঁটে কণ্টকিত কাণ্ড হইতে শত অষ্টাবক্র শাখা-প্রশাখা মেলিয়া বিরাট মহীরুহগুলি গায়ে গায়ে দাঁড়াইয়া আকাশে মাথা তুলিয়া দক্ষিণে মেঘে ঢাকা সমতলভূমির দিকে চাহিয়া আছে। ঘন শৈবাল-আচ্ছাদনে আবৃত গাছের কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা হইতে গুচ্ছ গুচ্ছ শৈবাল দাড়ির মত ঝুলিতেছে। বড় বড় পাতা ঝুলাইয়া, রাক্ষুসে লতা গাছকে পাকে পাকে জড়াইয়া, এক গাছ হইতে অন্য গাছে ছড়াইয়া জঙ্গলে সূর্যের আলোর প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিয়াছে। শাখায় শাখায় জড়াইয়া আছে অর্কিড, বিচিত্র পুষ্প-শোভা লইয়া।

শত শত বৃক্ষ ভেক পাতার আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া অবিশ্রান্ত ডাকিতেছে কর্কশ শব্দে। কাঁটা-লতা, গুল্ম, বড় বড় ঘাস চারদিকে। ঘাসের বনে কিলবিল করিতেছে রক্তপায়ী জোঁক। বটানির ডাক্তার হইয়া এইখানে আসিয়াছিলে তুমি রোডোডেনড্রনের খোঁজে? এ কপটতার কি প্রয়োজন ছিল?

পরদিন হনিমুন কটেজে গেলাম তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ চুকাইয়া বিদায় লইবার জন্য। এতদিন মনে করিয়াছিলাম পরমেশকে লইয়া তুমি আমার সঙ্গে খেলিতেছ। আমার বন্ধু নির্বোধ-পণ্ডিত বটানিষ্ট পরমেশকে আমি জানি। আমার হাত হইতে তোমাকে কাড়িয়া লইতে পারে এত শক্তিমান বলিয়া তাহাকে মনে করি নাই। আমার ভুল হইয়াছিল, পরমেশের সম্বন্ধে নয়, তোমার সম্বন্ধে। সেদিন দেখিলাম সারমেয়ের মত লুব্ধ, তৈলাক্ত দৃষ্টি দিয়া সে তোমাকে লেহন করিতেছে, আর পরম আরামে তুমি সে দৃষ্টির লালাক্ষরণ উপভোগ করিতেছ। আমার হাসি পাইল। ভাবিলাম চিতা ও সারমেয়ের মধ্যে প্রভেদ যে মেয়ের চোখে ধরা পড়ে না তাহাকে আমার প্রয়োজন নাই। তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলিয়া আমি বাহিরে আসিতে তোমার মা তোমাকে ডাকিলেন। আমি যখন হনিমুন কটেজের ফটকে, তুমি আমাকে ডাকিলে পিছন হইতে।

অপর্ণা, তোমার জলভরা চোখের মিনতি এখনও চোখের সম্মুখে ফুটিয়া আছে। দেখিলাম তোমার দুই চোখে বিস্ময় ও হতাশা। সে কি তোমার ছলনা? লঘুপক্ষ রঙিন প্রজাপতির মত তোমার সে চটুল রূপ কোথায় গেল? আমি ভাবিলাম, এ তোমার এক নূতন খেলা। বোধ হয় আমি হাসিয়াছিলাম। একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া তুমি ফিরিয়া গেলে ধীরে ধীরে। মনের জ্বালায় অস্থির হইয়া আমি দার্জিলিং ছাড়িলাম পরদিন, সিকিমের মুখে রওনা হইলাম। প্রতিজ্ঞা করিলাম আর সভ্যসমাজে ফিরিব না।

রঙ্গিত নদীর এপারে শালের বন, ঘন লতাগুল্মের বন, রাক্ষুসে বাঁশের ঝোপ, বিস্তৃত কলাগাছের বন, পাহাড়ের গায়ে স্যালভিয়া, হিবিস্কাস, আরও কত রঙিন ফুলের অপরূপ সুন্দর আস্তরণ পিছনে পড়িয়া আছে। স্নিগ্ধ, সবুজ বনে ঢাকা পার্ব্বত্য পথে চলিতে চলিতে, তিস্তার এপারে খাড়া পাহাড়ের পাশ দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া যে পথ বনের মধ্য দিয়া রামটেক মঠে পৌঁছিয়াছে, রোঙনী নদী অতিক্রম করিয়া গ্যাংটক পিছনে ফেলিয়া সেই পথে আরও অগ্রসর হইয়া চলিলাম।

মনের উত্তাপ কমিয়া গভীর ঔদাসীন্যে অন্তর পূর্ণ হইতে লাগিল। ভাবিলাম, তোমার জলভরা চোখের দৃষ্টিতে মনের কথাই বোধ হয়, প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলে, অপর্ণা! বড় বিলম্বে। হেলায়, খেয়ালের খেলায় যাহা হারাইয়াছ আর বোধ হয় তাহা ফিরিবে না। নিষ্ঠুর খেলায় আমার মন ভাঙ্গিয়া দিয়াছ তুমি, তাই হিমালয়ের শান্ত বক্ষে আশ্রয়লাভের জন্য আসিয়াছি।

চুংথাঙে লাচুং নদীর জল লাচেনের জলের সঙ্গে মিশিয়াছে। নদীর নাম হইয়াছে তিস্তা। লাচেনের খাদের মাথায় দুইটি উইলো গাছ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া। কাছেই তিনটি বড় বড় ছরটেন, আগাগোড়া ঘন, সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা। মনে হইল উইলো গাছের তলায় বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া তুমি দাঁড়াইয়া আছ। হে প্রজাপতি, তোমার রঙিন পক্ষ-দ্বয়ের উল্লসিত স্পন্দন আজ কোথায় গেল? কিসের শব্দে চমকিয়া উঠিলাম, মনের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল।

গভীর খাদের মধ্য দিয়া উন্মত্ত তিস্তা প্রচণ্ড গর্জ্জন করিয়া ছুটিতেছে। খাদের উপর বেতের ঝুলানো সেতু। ভাবিলাম, ঐ ঝুলানো সেতু পার হইতে গিয়া তিস্তার পাতাল-ছোঁয়া খাদের মধ্যে পড়িয়া গেলে কেমন হয়? স্বেদাক্ত, উষ্ণ বাষ্পতাপে শিথিল, সমতলভূমির এক কোণ হইতে প্রসারিত হইয়া উর্ণনাভের সূক্ষ্ম তন্তুর মত তোমার যে পীড়াদায়ক চিন্তা বৃষ্টির ধারা, বিদ্যুতের চমক, ঝটিকার আস্ফালন ও পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের বাধা অতিক্রম করিয়া নগধিরাজের এই উন্নত শীর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে তাহা টুটিয়া যাইত এক নিমেষে। আমি উদাসীন হইতে চাহি, কিন্তু হইতে পারিতেছি না। তাই এই দুর্গম পথে নিঃসঙ্গ চলিতে চলিতে মৃত্যুর কথা মনে আসে।

আমি তোমাকে ঘৃণা করি অপর্ণা। তোমার যে চোখের জল উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি, আমার চলার পথে তাহা যে এত বড় বাধা হইবে ভাবিতে পারি নাই। আমাকে লাচেন গোম্ফায় পৌঁছিতে হইবে। তাড়াতাড়ি, আরও তাড়াতাড়ি। কুয়াশায় চারদিক ছাইয়া ফেলিতেছে। লাচেন গোম্ফার সিদ্ধ অর্হতের কথা শুনিয়াছি। সিদ্ধ অর্হতের কাছে আমার অশান্ত মনকে শান্ত করিবার মন্ত্র লইব।

গম্ফচেন লামা, লাচেনের গোম্ফার সম্মুখে তোমাকে দেখিয়া অভিভূত হইলাম। অবনত দৃষ্টি একটু তুলিয়া আবার নামাইলে তুমি। মনে হইল হাসির অস্পষ্ট রেখা ফুটিতে না ফুটিতে মিলাইয়া গেল তোমার ভাবলেশ-শূন্য মুখে। তোমার হাতের স্ফটিকের জপের মালা তেমনি ঘুরিতে লাগিল; লাচেন নদীর স্রোতের বেগে বিরাট প্রার্থনা-চক্র তেমনি আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—পাহাড় আর পাহাড়। সপ্ত সাগরের মিলিত জলরাশির ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ, উন্মত্ত তরঙ্গ কোন মায়াবী যেন মন্ত্রবলে পাথরে পরিণত করিয়াছে। তিব্বতের সুউচ্চ মালভূমির শুষ্ক বায়ু দংশিয়া গিরিপথ দিয়া ঝড়ের বেগে বহিতেছে অবিশ্রান্ত।

গম্ফচেন লামা, গুরু রিংপোচের নামে তোমাকে অনুরোধ করি, একবার আমাকে তোমার ঐ পরমশীতল ঔদাসীন্যের স্পর্শ দাও। সমতলের অস্থির রক্তস্রোত সে স্পর্শে চোমোহ্লারীর

বরফস্তূপের মত জমিয়া যাক। গেসিঙে এক বৃদ্ধ লামার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। এক হাতে মালা অন্য হাতে ধর্মচক্র ঘুরাইতে ঘুরাইতে গণিয়া গণিয়া সে পদক্ষেপ করিতেছিল মেনডাঙের সম্মুখে। শতছিন্ন পোশাক, লোল চর্ম, ক্ষীণ দৃষ্টি। কাঁপিতে কাঁপিতে সে মেনডাঙের এপ্রান্ত হইতে ওপ্রান্তে যাইতেছে, আবার ঘুরিয়া ওদিক হইতে এদিকে আসিতেছে। কুণ্ডলায়িত মেঘরাশি আসিয়া এক একবার তাহাকে আবৃত করিতেছে, মেনডাঙের উপরে খোদিত মহামন্ত্র "ওম্ মণিপদ্মে হুম" ঢাকিয়া দিতেছে। নির্বিকার, উদাসীন, বৃদ্ধ লামার পদক্ষেপের বিরাম নাই। সেই বৃদ্ধ লামা আমাকে লাচেন গোম্ফার সিদ্ধ অর্হতের কথা বলিয়াছিল। গম্ফচেন লামা, আমি বড় আশা করিয়া তোমার কাছে আসিয়াছি। তোমার নির্বিকার, উদাসীন মুখে অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল কেন গম্ফচেন লামা ?

আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইতে চাহি অপর্ণা। একটা ঘটনার কথা তাই অকপটে লিখিতেছি। গম্ফচেন লামার হাসিতে বুঝি শনির দৃষ্টি ছিল। দিন দুই পরের কথা। পথের পাশে বিশ্রাম করিতে করিতে দেখিলাম একটি মেয়েকে। শৈবাল-আচ্ছন্ন ছরটেনের পাশে পুরাতন কুটিরের দ্বারে তাহাকে দেখিলাম এক স্তবক রোডোডেনড্রন ও ম্যাগনোলিয়া গ্লোবসার মত। চমক লাগিল দেখিয়া। তাহার দেহে সংহত হইয়াছে বর্ষার প্লাবনের উদ্দামতা। প্লাবনের কলকল, ছলছল গান যেন কানে শুনিতে পাইলাম। হাসিয়া নিজের বুকে হাত রাখিয়া সে বলিল, ৎসারিং, ৎসারিং! অর্থাৎ তাহার নাম ৎসারিং।

সম্মুখের পাহাড়ের দেহে দেখিলাম সেই উদ্দামতার আর এক রূপ। পাহাড়ের ঢালু গায়ে অসংখ্য বিরাট আয়তনের প্রস্তরখণ্ড ইতস্তত: ছড়ানো। দেখিয়া মনে হয় কোন অকল্পনীয় শক্তিশালী হস্ত সেগুলি ছড়াইবার সময় জ্যামিতিক রেখাচিত্রের কথা মনে রাখিয়াছিল। প্রস্তরখণ্ডের উপরে উঠিয়াছে লতার আবরণ। মনে হয় নানারকম লতার অপরিসর আঁচল টানিয়া কেহ যেন উন্নতবক্ষ আচ্ছাদিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। বিচিত্র বর্ণের অজস্র ফুলের কাজ সে লতার আঁচলে। শৈবাল ও লতা আলিঙ্গন করিয়াছে বিরাট ওক ও ফার্ণ গাছগুলিকে। ঘাস, লতা, শৈবাল, লিকেন, ফার্ণ, বিশাল বৃক্ষ, বাঁশের ঝোপ ঠেলাঠেলি করিতেছে পাহাড়ের গায়ে দাঁড়াইবার একটু স্থান পাইবার জন্য, আলোর উত্তপ্ত স্পর্শ পাইবার নিমিত্ত। যতদূর চোখ যায় সম্মুখে, পিছনে, উপরে, নীচে এই ঠেলাঠেলি উদ্ভিদ-জগতের সকল শ্রেণীর গাছপালা লতাগুল্মের। কি উদ্দাম আবেগ তাহাদের, কি রঙীন, পুষ্পিত উচ্ছ্বাস সে আবেগের!

পাহাড়ের ঢালু গা বাহিয়া মেঘ উঠিতেছে; দূরে উপত্যকার উপর দিয়া মেঘ ছুটিতেছে; ঘন, কালো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ পিছনে কাহার ত্রাসে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে; চারি দিক অন্ধকার করিয়া মেঘ গড়াইয়া আসিতেছে। ডংখিয়ার গিরিপথ দিয়া তিব্বতের সু-উচ্চ মালভূমির দমকা বাতাস বহিতেছে। ফার, জুনিপার, লার্চ ও স্প্রুস গাছ মাথা ঝাপটাইয়া সন্‌সন্ শব্দ করিতে লাগিল। কাংচেন ঝৌ ও চোমিওমো শৃঙ্গের গলিত বরফের স্পর্শ লাগিতেছে মুখে। বৃষ্টি নামিল মুষলধারে। পিছনে ফিরিয়া আশ্রয়ের জন্য ছুটিলাম। চমকিয়া উঠিলাম কাহার স্পর্শে। দেখিলাম সে ৎসারিং। হাত ধরিয়া সে টানিয়া লইয়া চলিল সেই শৈবালাচ্ছন্ন ছরটনের পাশে শৈবালে ঢাকা পুরাতন কুটিরের দিকে। পাত্রপূর্ণ ছ্যাং দিয়া অভ্যর্থনা করিল। আকণ্ঠ পান করিলাম।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। কাংচেন ঝৌর বরফস্তূপ গলিয়াছে বুঝি? ঝমঝম, ঝিমঝিম শব্দ বৃষ্টির। দৃষ্টি বেশীদূর চলে না, আবছা দেখিতেছি ছরটনের পাশের জুনিপার গাছ দুইটি দমকা বাতাসে দুলিতেছে। চমকিয়া উঠিলাম আবার। অতর্কিতে কে জড়াইয়া ধরিল। পাহাড়িয়া পাইথনের ক্ষুধিত আক্রোশে জড়াইয়া ধরিল। পাকের পর পাক দিয়া জড়াইয়া ধরিল।

ৎসারিং, রোডোডেনড্রন ও ম্যাগনোলিয়া গ্লোবসার স্তবকের মত তোমার স্পর্শ, থাংগুর নেড়া প্রস্তরস্তূপের ফাঁকে ফাঁকে জন্মিয়াছে বিষাক্ত ডুগ-সিং। ডুগ-সিংয়ের মত বিষাক্ত, জ্বালাময় তোমার নিঃশ্বাস।

তার পরের দিন। ডুগসিংয়ের বিষাক্ত নিঃশ্বাস হইতে বাঁচিবার জন্য প্রাণপণে ছুটিলাম—উপরে, আরও উপরে। পিছনে, নীচে পড়িয়া রহিল লাচেন।

কত উঁচুতে উঠিয়াছি জানি না। চলিতে চলিতে দেখিলাম পাহাড়ের গায়ে ঘন আচ্ছাদন পাতলা হইতেছে। আলোর জন্য গাছ, গুল্ম, লতা ও ফার্ণের প্রতিযোগিতা শেষ হইয়াছে। সিলভারফার, স্প্রুস, লার্চ ও জুনিপার ফাঁকে ফাঁকে দাঁড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে দুই-একটা রোডোডেনড্রনের ঝোপ। ফার গাছের গায়ে মাটির রঙের লিকেন বাতাসে দুলিতেছে। এখানে-ওখানে কাঁটা ঝোপ, মাথায় বিচিত্র ফুলের শোভা।

কতটি দিন কতটি রাত্রি কাটিয়া গেল মনে নাই। দিনের পর দিন চলিতেছি। চাহিয়া দেখি বনরেখা পিছনে পড়িয়াছে। সম্মুখে আর ম্যাপল, জুনিপার, ওক গাছ নাই। সিলভারফারের বন পাতলা হইয়াছে। এখানে-ওখানে বেঁটে রোডোডেনড্রনের ঝোপ।

এবার ঐ বিরাট, নেড়া, ঢালু পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিতে হইবে। পেমিংওচির লামারা পূজা দিতে আসিয়াছে গুচাক

লা গিরিসঙ্কটে। বছরে একবার করিয়া তাহারা আসে চূড়ার উপরকার ঐ গোম্ফায়।

প্রাইগ-চু নদী পার হইয়া দেখিলাম সম্মুখে বিরাট তুষার-হ্রদ, হ্রদের পরে বিস্তৃত গ্রাবরেখা। অসংখ্য, বিরাট, নেড়া প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে চারদিকে। দুর্নিবার চাপে তুষার-স্রোত এগুলি উপড়াইয়া আনিয়াছে পাহাড়ের পাঁজর ভাঙিয়া। সন্ধ্যা হইতে অবিশ্রান্ত তুষারপাত হইতে লাগিল। অটুট, অথৈ নিস্তব্ধতা চারদিকে। বরফে আবৃত পাথরের স্তূপের উপর দিয়া সন্তর্পণে উঠিতে হইবে পাণ্ডিম শৃঙ্গের বাহুর উপরে অবস্থিত গুচাক্ লা গিরিপথে।

গুচাক্ লা গিরিপথ। চোখ মেলিতে অর্ধবৃত্তাকারে অবস্থিত হিমাচলের আকাশচুম্বী, বরফে আবৃত সবগুলি শিখর দৃষ্টির সম্মুখে একসঙ্গে উদ্ঘাটিত হইল। রূপ-রস-শব্দস্পর্শ-গন্ধের জগতের ঊর্ধ্বে শুভ্র, গম্ভীর, শুভ্র মহিমা বিকীর্ণ করিয়া ধ্যানমগ্ন বৃদ্ধ ঋষি হিমালয়কে প্রত্যক্ষ করিলাম। রক্তমাংসে গড়া, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানুষের হৃদয়ের সকল অস্থিরতা, সকল চাঞ্চল্য, উদ্বেগ এক মুহূর্তে শান্ত হইয়া গেল।

পেমিংওচির লামাদের পূজা দেওয়া শেষ হইয়াছে, এবার তাহারা ফিরিবে। ভাবিলাম এখানে রহিয়া যাইব। নীচে জোংরির পাহাড়ের গায়ে জুনিপার গাছের নীচে পাথরের কুটির দেখিয়াছি। দুই জন ইয়াকের রাখাল বাস করে সেখানে। তাহাদের সঙ্গে অবস্থান করিব। নগাধিরাজ হিমালয় আমার অশান্তির গ্লানি মুছাইয়া দিবেন।

পেমিংওচির লামারা ফিরিয়া গিয়াছে। তিনটি দিন কাটিল। মনে হইল ঔদাসীন্যের যে কঠিন প্রাচীর রচনা করিয়াছিলাম নিজের অশান্ত মনের চারিদিকে তাহাতে যেন ফাটল ধরিয়াছে। নিজের এই অবস্থা দেখিয়া একটা কথা মনে পড়িল, অর্পণা। সেই কথাটা তোমাকে বলিতেছি।

অনেক দিন আগে আমার বন্ধু পরমেশের কাছে শুনিয়াছিলাম এক সময়ে পৃথিবী অন্তর্দাহে উন্মত্ত হইয়াছিল। কঠিন বাসাল্টের প্রাকার ক্রমে স্ফীত হইয়া চারিদিক হইতে তাহাকে চাপিয়া ধরিতেছিল। ক্রমে অসাড় হইয়া আসিতেছিল তাহার সকল অঙ্গ। তীব্র, উন্মত্ত আক্রোশে সে আঘাত করিতে লাগিল বাসাল্টের প্রাকারের গায়ে। প্রাকার দুলিয়া উঠিল পৃথিবীর অন্তর্দাহের প্রচণ্ড আক্ষেপে। অর্ধপৃথিবীব্যাপী সাগরের জায়গায় ভূপৃষ্ঠ ফুলিয়া, কাঁপিয়া, দুমড়াইয়া, মোচড়াইয়া জাগিয়া উঠিল হিমালয় হইতে আল্পস পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বত-বলয়। বন্ধনজর্জর পৃথিবীর ক্রোধ ও হতাশার পাষাণময় প্রকাশ সম্মুখের ঐ শিখরগুলি।

তার পরের ইতিহাস তোমাকে বলিতেছি, শোন। বন্দী পৃথিবীর অন্তর্দাহ শান্ত হইল না। গাছপালা, জীবজন্তু সকলের শেষে জন্মিল মানুষ পৃথিবীর ক্রোড়ে। মানুষের অস্থিতে, রক্তে, মাংসে, মেদমজ্জায়, স্নায়ুতে, তাহার প্রতি অণু-পরমাণুতে পৃথিবী নিষ্ঠুর উল্লাসে লাগাইল নিজের অন্তর্দাহের স্পর্শ। তাহার বাসাল্ট আবেষ্টনীর মধ্যে বন্দী পৃথিবীর আত্মা কাঁদিতেছে আর রক্তমাংসের আবেষ্টনীর মধ্যে বন্দী মানুষের আত্মা গুমরাইতেছে।

চারিদিকের তুষারাচ্ছন্ন নিস্তব্ধতার মধ্যে আপনার আত্মার করুণ ক্রন্দন শুনিতে পাইলাম। সম্মুখের ঐ তুষারধবল পাষাণস্তূপের স্পন্দনহীন ঔদাসীন্য আজ পীড়া দিতেছে আমাকে। আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম আমার উৎপত্তির ইতিহাস। বৃদ্ধপিতামহ হিমালয় আজ আমার নিঃসঙ্গতা ও ঔদাসীন্যের সাধনাকে পরিহাস করিতেছেন। উত্তুরে বায়ুতে তাঁহার বরফস্তূপের দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু যেন নড়িতেছে হাসির বেগে। দূরে, বহু দূরে, কুয়াশার আবরণের অন্তরালে বনভূমির অস্পষ্ট রেখা প্রবল ভাবে আকর্ষণ করিতেছে আমার মনকে।

অর্পণা, তোমার জলভরা চোখের মিনতি কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র শিখরকে রামধনুর বিচিত্র ছটায় রাঙিয়া দিতেছে; কত আকুতি, কত মৌন আবেদন সে চোখের জলে। অর্পণা, নিষ্ঠুর মাতা পৃথিবী নির্বোধ আক্রোশে যে আগুন জ্বালাইয়াছে মানুষের অন্তরে, তাহার দাহ শান্ত করিবার শক্তি দেখিতেছে তোমার দুই কালো চোখের জলে। বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিবে। তোমার ঐ চোখের জল মুছাইয়া দিব। আর কয়েকটা দিন অর্পণা, আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর।

আবার লাচেন গোম্ফা। লা সোল-লো, লা সিয়াল-লো! বোধিসত্ত্বকে প্রণাম, তাঁহার জয় হোক! গম্ফচেন লামা, সশ্রদ্ধ নমস্কার তোমাকে। তোমার হাসির মর্ম আজ বুঝিয়াছি। দূরে ঐ সমতলভূমি আমাকে ডাকিতেছে গম্ফচেন লামা, তোমার কাছে বসিবার সময় নাই আর···

* * *

কাহিনী হঠাৎ শেষ হইয়াছে। অর্পণা দুই চোখ বুজিয়া চেয়ারে ঠেস দিল। একটা দমকা হাওয়া আসিয়া কাগজগুলি টেবিলের উপর হইতে উড়াইয়া মেঝেতে ফেলিয়া দিল, অর্পণার অঞ্চল খসিয়া মাটিতে লুটাইতে লাগিল।

চোখ বুজিয়া অর্পণা কতকটা অজ্ঞাতসারে মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল—"কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর, অর্পণা, কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর"। নিজের মনকে সে অজ্ঞাতসারেই প্রশ্ন করিল, অপেক্ষা কি সে করিতে পারিত না? কি সম্পদ পাইয়া সে অপেক্ষা করে নাই? আজকার দিনে লাভের চাইতে লোকসানের পরিমাণই কি তাহার জীবনে বেশী নহে? তাহার হঠাৎ মনে হইল সে যেন একেবারে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে।···

কর্ণেল সাহেবের পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঘরে প্রবেশ

করিয়া তিনি অপর্ণার দিকে চাহিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ, ভারী গলায় বলিলেন, কেপ্ট ইউ ওয়েটিং (তোমাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি) ডার্লিং?

এক যুগ পরে আজ হঠাৎ অপর্ণা কাঁপিয়া উঠিল।*

গোম্ফা—মঠ
গম্ফচেন—মহৎ
মেনডাং—পবিত্র দেউল
ছরটেন—তিব্বতী স্তূপ বা চৈত্য
ডুগসিং—একোনাইট
গুরু রিংপোচ—বৌদ্ধধর্মে তিব্বতের দীক্ষাদাতা পদ্মসম্ভবের তিব্বতী নাম
ইয়াক—তিব্বতী গরু
ছ্যাং—দেশী মদ

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়—স্বদেশে ও বিদেশে

শ্রীকালীপ্রসাদ ঠাকুর

আর্থিক সমৃদ্ধি ও জাতীয় জীবনের মান উন্নত করিবার জন্য শিল্পকলা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ যেমন দরকার, তেমনি প্রয়োজন ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত কাজকর্ম্মের উন্নতি বিধান। অধিকতর উৎপাদনের নিমিত্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি, সুদক্ষ কারিগরের সহযোগিতা শিল্পকলার পক্ষে যেমন অপরিহার্য্য, ইহার জন্য তেমনি আবশ্যক অর্থের অনবিচ্ছিন্ন সচ্ছলতা।

এখানে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, তাহার জন্য আবার ভাবনা কিসের? অর্থের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির মূলধনই ত আছে। কথাটা আপাতদৃষ্টিতে সত্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অধিকাংশ সময় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রাথমিক আয়োজন মিটাইতে গিয়া মূলধনের বৃহত্তর অংশ ব্যয়িত হইয়া যায়। তারপর আবার যখন টাকা-পয়সার অভাব-অনটন দেখা দেয় তখন তাহা দূর করিবার জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্যের কাছে হাত পাতিতে হয়। আর এইখানেই দেখা দেয় ব্যাঙ্কের কার্য্যকারিতা। কাঁচা বা প্রস্তুত মাল গচ্ছিত রাখিয়া, যন্ত্রপাতি কলকারখানা বাঁধা রাখিয়া, কখনও কখনও আবার কিছুমাত্র জমা না রাখিয়া ব্যাঙ্ক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে চালু রাখে—উৎপাদন ইহাদেরই জন্য থাকে অব্যাহত। ইহা ছাড়া স্থানান্তরে মালপত্র চালান দেওয়ার ব্যাপারে, আমদানী রপ্তানী কার্য্যে, টাকা পয়সা লেনদেন, কাজ কারবার প্রভৃতিতে ব্যাঙ্ক নানাভাবে অলক্ষ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়টি বিলাতী পদ্ধতিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের পর নিজেদের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য ইংরেজ বণিকেরা স্বদেশীয় প্রথায় এদেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন করেন। ইংরেজ প্রভুদের প্রয়োজনেই বড় বড় শহর বন্দরে, ব্যবসায়-কেন্দ্রে ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি জায়গায় জায়গায় শাখা-প্রশাখা স্থাপন করিয়া ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায়ের কাজকর্ম্মে সহায়তা করিত। দেশীয় শিল্প বা দেশীয় ব্যবসায়ীর জন্য ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের দ্বার ছিল রুদ্ধ। পরবর্ত্তী কালে যদিও ভারতীয় প্রচেষ্টায় দুই-একটি ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল, তথাপি তাহারা বিলাতী প্রতিষ্ঠানগুলির গতানুগতিক ব্যবসায়-প্রণালী অবলম্বন বা অনুকরণ করিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার দায়িত্ব হইতে নিজেদের দূরে রাখিল।

অপরপক্ষে সমসাময়িক কালে পৃথিবীর অন্যান্য অংশে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশীয় শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকিতে দেখা যাইত। এই বিষয়ে যুদ্ধপূর্ব্ববর্ত্তী জার্ম্মানীর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোনও নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইলে উদ্যোক্তাগণ তাঁহাদের খসড়া ব্যাঙ্কের নিকট পেশ করিতেন। প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তাগণ প্রস্তাবিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত মূলধন যোগাড় করিয়া দিতেন। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-মণ্ডলীর মধ্যে ব্যাঙ্কের দুই একজন প্রতিনিধি থাকিতেন। শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়া উঠিলে ব্যাঙ্ক তাহার অংশ সাধারণের নিকট বিক্রয় করিয়া দিত। তখন তাঁহারা আবার অন্য কোনও নূতন শিল্প গড়িয়া তোলার কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে যখন বৃহত্তর মূলধনের প্রয়োজন দেখা দিত, তখন একাধিক ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান একত্র হইয়া একযোগে সেই কার্য্য সমাধা করিত। এই ভাবে ব্যাঙ্কের আনুকূল্যে জার্ম্মানীতে কারু শিল্পকলা দ্রুত প্রসার লাভ করে। জাপানের বিষয় আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, সেখানেও সরকারী ও বেসরকারী ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডেও এই বিষয়ে জার্ম্মানীতে অনুসৃত প্রণালীর প্রভাব অনুভূত হয়।

জার্ম্মানী, জাপান ও সুইজারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনে বিরল। শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠনকার্য্যে সেখানে যৌথ ব্যাঙ্কগুলি তেমন সক্রিয় অংশ কোন দিনও গ্রহণ করে নাই, আজও করে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে এই অভাব পূরণ করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার যৌথ ব্যাঙ্ক-

প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানীর সহযোগে দুইটি দাদনী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। শিল্প গঠনকার্য্যে যে অল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন হইবে তাহার চাহিদা এই দুইটি প্রতিষ্ঠান মিটাইবে। ভারতীয় শিল্পগঠনমূলক কার্য্যে আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য ভারত-সরকার ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইনান্স করপোরেশন নামে ৫ কোটি টাকা আদায়ী মূলধন সমেত যৌথ ও সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান এবং বীমা কোম্পানী প্রভৃতির সহযোগে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। প্রথম বৎসরে এই প্রতিষ্ঠানটি পশম ও বয়ন শিল্প, রসায়ন-শিল্প, সিমেন্ট, কাঁচ, বিজলী, খনিজ, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতির বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে ৩ কোটি ৪২ লক্ষ মুদ্রা ঋণদান করিয়াছে। আশা করা যায়, এই প্রতিষ্ঠানটির সহযোগিতায় ভবিষ্যতে ভারতীয় কারু শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে।

শিল্পগঠনকার্য্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা ছাড়াও ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলির নানাবিধ করণীয় কার্য্য আছে। বিলাতী প্রথায় প্রভাবান্বিত হইয়া আমরা যেমন একদিকে কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি শহর বন্দরে একাধিক অনাবশ্যক ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন করিয়াছি, অন্য দিকে তেমনি আমরা ভারতের অগণিত গ্রামাঞ্চলকে অবহেলা করিয়াছি। ইংলণ্ড ক্ষুদ্র দেশ—তাহার আয়তন ৯৪,২৭৯ বর্গমাইল। অবিভক্ত ভারতের ১৬ ভাগের এক ভাগের চেয়েও কম। তবুও সেখানে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় কত ব্যাপকভাবে পরিচালিত। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বের হিসাবে দেখা যায় যে, ইংলণ্ড ও ওয়েলসে প্রতি পাঁচ বর্গমাইলের ভিতর একটি করিয়া ব্যাঙ্কের শাখা রহিয়াছে। প্রতি ৩৯০০ ব্যক্তির মাথাপিছু একটি ব্যাঙ্কের আপিস আছে। আর আমাদের দেশে ঐ সময়ে ১৩৯২ বর্গমাইল ও ২,৭৬,০০০ জনের মাথাপিছু মাত্র একটি ব্যাঙ্কের শাখা ছিল। যুদ্ধশেষেও ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের তেমন আশানুরূপ প্রসার আমাদের দেশে হয় নাই। বিগত আগষ্ট মাসের হিসাবে দেখা যায়, গোটা ভারতবর্ষে সিডিউল্ড ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা মাত্র ৩৫৬০টি আর ইংলণ্ডে এক মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কেরই নিজস্ব ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শাখার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে বর্ত্তমানে ২৪৫০টির উপর। মিডল্যাণ্ডের সঙ্গে বারক্লেজ লয়েডস্ ব্যাঙ্কের শাখাগুলি যোগ করিলে সেগুলির কাছে ভারতের তালিকাভুক্ত সমুদয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য বলিয়া মনে হইবে।

কেবলমাত্র অধিকতর শাখা-প্রশাখা স্থাপন করিয়াই ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীরা ক্ষান্ত হন নাই; জনসাধারণের প্রয়োজন যাহাতে আরও বেশী করিয়া মিটানো যায় তাহার উপরেও ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। ইংলণ্ডে এমন কোন জায়গা আজ আর নাই যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ব্যাঙ্কের সহযোগিতা পাওয়া না যায়। সহর, বন্দর, বাণিজ্যকেন্দ্র, পোতাশ্রয়, ক্রয়ডন্, হিথরো প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিমানঘাটি, এমনকি কুইনমেরী, এলিজাবেথ মায়োয়ার, টানিয়া প্রভৃতি বড় বড় জাহাজে মিডল্যাণ্ড প্রভৃতি ব্যাঙ্কের শাখা দেখিতে পাওয়া যায়।

এই ধরণের শাখা স্থাপন করিয়া বিলাতী ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের মুনাফার অঙ্ক কতটা বাড়াইতে পারিয়াছে তাহা সঠিক বলা কঠিন—কেননা ইহার কোন হিসাব বিলাতী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রকাশ করে না, তবে বিজ্ঞাপনের দিক দিয়া যে ইহার গুরুত্ব আছে তাহা নিঃসন্দেহ। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে গ্রেট ব্রিটেনে শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানবহুল এমন কোন রাস্তা ছিল না যাহাতে কোন না কোন ব্যাঙ্কের শাখা না ছিল। এমন উন্নত ধরণের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বিলাতী ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী যুদ্ধশেষে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিলেন না। জনসাধারণের সেবায় ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীরা যাহাতে আরও বেশী উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে তাহার জন্য নূতন ধরণের শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইল। এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রে ব্যাঙ্কের ধরাবাঁধা কর্ম্মপদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও সামাজিক আচার ব্যবহারেও ব্যাঙ্ককর্ম্মচারীকে কেতাদুরস্ত করিয়া তোলার ব্যবস্থা করা হইল। শিল্পাদি সম্বন্ধে যাহাতে উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিতে পারে তাহার জন্য শিক্ষানবিশদিগকে খেতখামারে, কাপড় ও কাগজের কলে, জাহাজ তৈরির কারখানায় লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইল।

যুদ্ধোত্তর কালে ব্রিটেনের আর একটি অভিনব প্রচেষ্টা ভ্রাম্যমাণ ব্যাঙ্কের প্রবর্ত্তন। আমাদের দেশের মত ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলি শুধুমাত্র নির্দ্দিষ্ট দপ্তর হইতেই কাজ করে না। বড় বড় মেলায়, গো-মহিষ বিক্রয়-কেন্দ্রে, হাট-বাজারে, কৃষি-প্রদর্শনীতে বিলাতী ব্যাঙ্কগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাময়িক শাখা স্থাপন করিয়া প্রদর্শনীতে যোগদানকারীদের সাহায্য করে। টাকা-পয়সা বিনিময়-কার্য্য যাহাতে গ্রামাঞ্চলেও চালু থাকে, তার জন্য চলন্ত ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা হইল। যে সকল নিভৃত পল্লীতে অর্থ-বিনিময়ের কোনই সুবিধা পূর্ব্বে ছিল না এমন সব স্থানেও এখন হইতে চলন্ত ব্যাঙ্কের শাখা নিয়মিত হাজিরা দিতে লাগিল। পল্লীবাসীরা বিনা কষ্টে শহরের ব্যাঙ্কের সুবিধা গ্রামে বসিয়া উপভোগ করিতে লাগিল। স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত লুইস দ্বীপে আজও কোন ডাকঘর নাই, তথাপি নর্থ অব স্কটল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের ভ্রাম্যমাণ শাখার সেবা হইতে দ্বীপবাসীরা বঞ্চিত হয় নাই।

স্বাধীনতালাভ করিবার পর হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, ব্যাঙ্কগুলি কেবলমাত্র মুনাফা আহরণকারী প্রতিষ্ঠান নয়, এগুলি জনসেবারও অঙ্গ। আর সে জনসেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে কেবল বিদেশের অনুকরণে ব্যাঙ্কগুলিকে মুষ্টিমেয় শহর বন্দরে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না, গ্রামাঞ্চলেও যাহাতে ব্যাঙ্কের সাহায্য পাওয়া যায় অচিরে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

মেসিন-সপ, চিত্তরঞ্জন
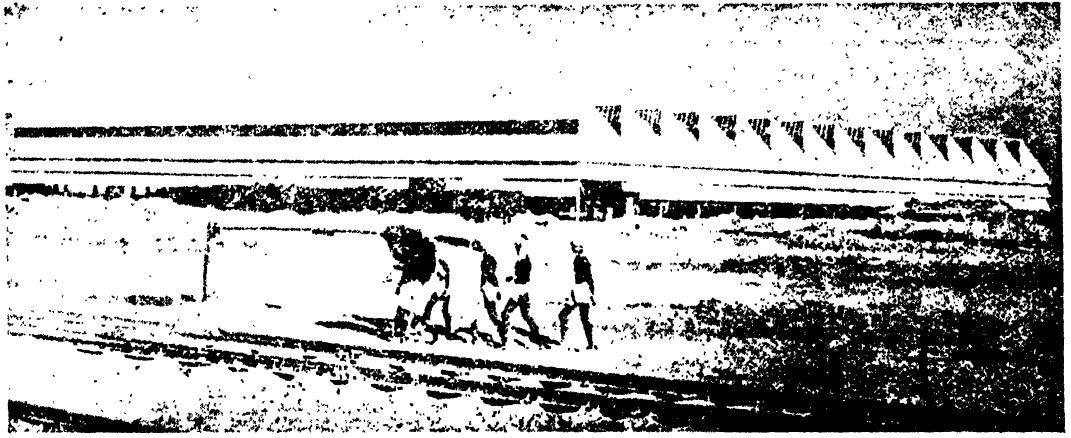
চিত্তরঞ্জন কারখানা

শ্রীনীলিমা মজুমদার

বহুকাল হইতেই ভারতবর্ষে রেলওয়ে ইঞ্জিন (locomotive) নির্ম্মাণের জন্য নিজস্ব কারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বোধ হইতেছিল। কাঁচড়াপাড়ার তৎকালীন রেলওয়ে ওয়ার্কসপকে এই প্রকার কারখানায় পরিণত করার জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইয়া যাওয়ায় আর তাহা সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। ভারতবর্ষে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের কারখানার যে কতখানি প্রয়োজন তাহা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আরও প্রকৃষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সিংভূম কারখানাটিকে ভারত-সরকার ১৯৪৫ সনে টাটা কোম্পানীর নিকট এই সর্ত্তে বিক্রয় করিলেন যে, তাঁহারা যত শীঘ্র সম্ভব ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করিতে যত্নবান হইবেন এবং ভারত-সরকার ঐগুলি ক্রয় করিবেন। এই ভাবেই বর্ত্তমান "টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড লোকোমোটিভ কোম্পানী"র (T.E.L.C.O.) সূত্রপাত হয়। যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গেই সরকার পুনরায় এই বিষয়ে মনোযোগ দিলেন। কাঁচড়াপাড়ার নিকট চাঁদমারী বলিয়া একটি স্থানকে তাঁহারা কারখানা নির্ম্মাণের উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন। এই সম্পর্কে প্রাথমিক সকল কাজকর্ম্ম পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে দেশ বিভক্ত হইয়া গেল। চাঁদমারী পশ্চিমবঙ্গের একেবারে সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া সরকার এখানে কারখানা নির্ম্মাণ না করাই সিদ্ধান্ত করিলেন। ১৯৪৭ সনের শেষাশেষি আসানসোল হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে মিহিজাম রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট একটি জায়গা কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল। ইহা বাংলা-বিহার সীমান্তে এবং ভারতবর্ষের ইস্পাতের কারখানা ও কয়লাখনিসমূহের নিকটে অবস্থিত। দামোদর ভ্যালী পরিকল্পনার অন্তর্গত বরাকর নদীর উপর মাইথন বাঁধ ইহা হইতে মাত্র ছয় মাইল দূরে। ভবিষ্যতে প্রয়োজনমত বৈদ্যুতিক শক্তি ও জল এখান হইতে সরবরাহ করা যাইবে। কিছুদিন হইল সরকার "ভারতীয় কেব্‌ল্ ফ্যাক্টরী" নির্ম্মাণের স্থানও ইহার অতি নিকটেই নির্ব্বাচন করিয়াছেন। প্রয়োজনীয়তার দিক ব্যতীতও নির্ব্বাচিত স্থানটি অতি রমণীয় পরিবেশে অবস্থিত। চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়, অসমতল ভূমি, অজয় নদীর সান্নিধ্য এবং প্রান্তিক পল্লীর সবুজ বনানী স্থানটিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বহুকাল হইতেই মিহিজাম স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে স্থান নির্ব্বাচন যে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের নামে এই নির্ব্বাচিত স্থানটিকে "চিত্তরঞ্জন" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কারখানাটি "লোকোমোটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কস, চিত্তরঞ্জন" বলিয়া পরিচিত। ইহার নাম "চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস" হইলে আরও সুষ্ঠু হইত বলিয়া মনে হয়। গত ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবসে' বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে দেশবন্ধুর সহধর্ম্মিণী শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী কারখানার উদ্বোধন করেন।

এই পরিকল্পনার জন্য সরকার কিঞ্চিদধিক ১৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। তন্মধ্যে আট কোটির উপর কারখানা নির্ম্মাণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের জন্য ব্যয় করা হইবে। বাকী পাঁচ কোটির উপর টাকা উপনিবেশে (colony) কর্ম্মচারীদের বাসস্থান, জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট এবং স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাদির জন্য ব্যয়িত হইবে। সমগ্র পরিকল্পনার নিমিত্ত প্রায় চার হাজার একর জমি লওয়া হইয়াছে। কারখানার জন্য ৬০০ একর জমি পৃথক রাখিয়া বাকি জমি কর্ম্মচারীদের উপনিবেশ ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমানে ২০০ একর জমির উপর কারখানা নির্ম্মিত হইতেছে, বাকী ৪০০ একর জমি ভবিষ্যৎ কার্য্য

সম্প্রসারণের জন্য সংরক্ষিত। কারখানাটি সাতটি 'সপে' বিভক্ত, যথা : লাইট মেসিন সপ (Light Machine Shop) ; হেভি মেসিন সপ (Heavy Machine Shop) ; ফাউণ্ড্রী, স্মিথি ইত্যাদি। কেবলমাত্র কারখানা নির্ম্মাণের জন্যই দশ হাজার টনের উপর ইস্পাতের প্রয়োজন। এক হাজারের উপর মেসিন কারখানায় স্থাপিত হইবে। প্রতি বৎসর ১২০টি ইঞ্জিন এবং ৫০টি বয়লার ইহাতে নির্ম্মিত হইবে। এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ইংলণ্ডের লোকোমোটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর (L. M. Co.) সহিত ভারত-সরকার পাঁচ বৎসরের জন্য এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই চুক্তি অনুযায়ী এল. এম. কোম্পানী তাঁহাদের বিশেষজ্ঞদিগকে চিত্তরঞ্জন কারখানায় পাঠাইবেন এবং এখানকার কারিগর-দিগকেও তাঁহাদের কারখানায় শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করিবেন। চিত্তরঞ্জন কারখানা যাহাতে চুক্তিকাল-মধ্যে স্বাবলম্বী হইতে পারে এল. এম. কোম্পানী তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

ভারতীয় কর্ম্মচারী দ্বারা এই বিরাট পরিকল্পনাটি রূপায়িত হইতেছে। কর্ম্মচারীদিগকে ভারতের বিভিন্ন রেলওয়ে হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, বিভিন্ন প্রদেশের লোক এখানে আছেন। বর্ত্তমানে শ্রীযুত পি. সি. মুখার্জ্জি ইহার জেনারেল ম্যানেজার, শ্রীযুত বি. বেঙ্কটরমণ চীফ মিকানিকেল ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীযুত এম. গণপতি চীফ ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীযুত পি. সি. ঘোষ কণ্ট্রোলার অব ষ্টোরস এবং শ্রীযুত এন. এন. মজুমদার ফাইনানসিয়াল এড্ভাইজার। সকল বিভাগে এখন সাধ্যমত পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের কার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে, তাঁহাদের দাবি গুণানুসারে বিবেচিত হয়। তাঁহাদের নিয়োগে উদ্বাস্ত সমস্যার যে আংশিক সমাধান হইবে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উপনিবেশটি যাহাতে সকল দিক দিয়া আদর্শস্থানীয় হয় সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। প্রায় ছয় হাজার কর্ম্মচারীর বসবাসের জন্য আবাসস্থল নির্ম্মিত হইতেছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ গৃহনির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উপনিবেশটি প্রধানতঃ তিনটি বিভাগে বিভক্ত, সুন্দর পাহাড়ী, আমলাদহী ও ফতেপুর। প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই বিদ্যালয়, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, ঔষধালয়, বাজার, পার্ক, খেলাধুলার মাঠ এবং আমোদ-প্রমোদের জন্য ক্লাব ও ইন্‌ষ্টিটিউট আছে। একটি সমবায় ভাণ্ডারও খোলা হইয়াছে। প্রত্যেক বাড়ী বিদ্যুৎ, পরিস্রুত জল এবং স্যানিটারী পায়খানাযুক্ত। নিম্নতন কর্ম্মচারীও উল্লিখিত ব্যবস্থাদিসহ নিজস্ব আলাদা বাড়ী পাইবে। প্রায় ৬০ মাইল রাস্তা ও ১০০ মাইল 'সিউয়েজ' বা ময়লা নিষ্কাশন-প্রণালী কলোনীতে নির্ম্মিত হইবে। ইতিমধ্যে দুইটি উচ্চবিদ্যালয় ও দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। উচ্চবিদ্যালয় দুইটি 'দেশবন্ধু বিদ্যালয়" বলিয়া অভিহিত। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী আরও শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। বর্ত্তমানে পানীয় জল অজয় নদী হইতে সরবরাহ হইতেছে। আরও অধিক জল সরবরাহের জন্য প্রায় দেড় হাজার ফুট লম্বা ও চল্লিশ ফুট উঁচু একটি বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ইহা একটি প্রকাণ্ড সরোবরে পরিণত হইবে। ইহাতে প্রায় ৩৫ কোটি গ্যালন জলের ব্যবস্থা থাকিবে। জলসরবরাহ ব্যতীত এই সরোবরটি অদূর ভবিষ্যতে পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য একটি অতি রমণীয় দ্রষ্টব্য স্থানে পরিণত হইবে।

ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতন কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই পরিকল্পনাটির সাফল্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। এখানে বাঙালী, মাদ্রাজী, পঞ্জাবীর দলাদলি, কিংবা ঊর্দ্ধতন এবং অধস্তন কর্ম্মচারী ও ধনিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্ব নাই। সকলের সঙ্গে সকলের পরিপূর্ণ সহযোগিতা বিদ্যমান। এক শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে পরিকল্পনার কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। আশা করা যায় অচিরেই বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত ভারতীয় ইঞ্জিন চিত্তরঞ্জন কারখানায় নির্ম্মিত হইবে এবং আমাদের দীর্ঘকালের অভাব দূর করিবে।

ক্লাব-ভবন, চিত্তরঞ্জন

প্রাচীন যুগে পশ্চিম সুন্দরবন

শ্রীকালিদাস দত্ত

বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশ পশ্চিম সুন্দরবন নামে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন কালে এই প্রদেশ বঙ্গোপসাগর-তীরবর্ত্তী সমগ্র নিম্নবঙ্গ ব্যাপী সুন্দরবন নামক বিস্তীর্ণ বনময় ভূভাগের পশ্চিমাংশ ছিল বলিয়া ঐরূপ নামে অভিহিত হয়।

অধুনা ইহা আয়তনে ২৯৪১ বর্গমাইল এবং পূর্ব্বে কালিন্দী নদী, উত্তরে চব্বিশ-পরগণা জেলার দশসালা বন্দোবস্তী বিভাগ, পশ্চিমে হুগলী নদী ও দক্ষিণে বঙ্গোপ-সাগর এই চতুঃসীমার অন্তর্গত। পূর্ব্বে বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত সাতক্ষীরা মহকুমা চব্বিশ-পরগণা জেলার অধীন থাকায় পূর্ব্বদিকে ইহার বিস্তার আরও অধিক ছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন যশোহরের কিয়দংশ ও উক্ত সাতক্ষীরা মহকুমা লইয়া, খুলনা জেলা গঠিত হইলে কালিন্দী নদী পর্য্যন্ত ইহার উল্লিখিত পূর্ব্বসীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নিম্নবঙ্গের এই অংশ কি কারণে বনময় হয় তাহা অজ্ঞাত। পুরাতন কাগজপত্রে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশ ইংরেজ শাসনাধীনে আসিবার পর হইতে ক্রমশঃ এখানে বন হাসিল হইয়া মনুষ্যাবাস হইতেছে। কিন্তু এই সুদীর্ঘকাল হাসিলকার্য্য চলিলেও ইহার দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে অনেকখানি ভূভাগ বনময় হইয়া আছে। ইদানীং ইহার যে সকল অংশ আবাদ হইয়াছে ও হইতেছে তাহা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে 'লট' ও 'প্লট' নামে আখ্যাত এবং ডায়মণ্ডহারবার, আলিপুর ও বসিরহাট মহকুমার অধিকারভুক্ত সাগর, কাকদ্বীপ, মথুরাপুর, জয়নগর, সাতলা, হাড়োয়া, বসিরহাট ও সন্দেশখালি এই আটটি থানার অধীন। উক্ত লট নামক বিভাগগুলি ইহার উত্তরাংশে ও প্লট নামক বিভাগগুলি দক্ষিণাংশে অবস্থিত এবং লটগুলি ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা ও প্লটগুলি ইংরেজী বর্ণমালার অক্ষরসমূহের দ্বারা অভিহিত। বর্ত্তমান সময় ইহার অন্তর্গত ঐরূপ ১ হইতে ১৬৯ সংখ্যক লট ও A হইতে L পর্য্যন্ত বারটি প্লট আছে।

গঙ্গা বা ভাগীরথী নদীর শেষাংশে অবস্থিত থাকায় এ প্রদেশ উহার বহু নদীর দ্বারা খণ্ডিত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাকারে বিভক্ত।১ পূর্ব্বে ঐ নদীগুলি প্রশস্ত থাকায় ঐ সকল দ্বীপের ব্যবধান অধিক ছিল, কিন্তু কালক্রমে ঐগুলি মজিয়া আসায় ঐরূপ ব্যবধান ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। রেনেল, স্মীথ ও এলিসন প্রভৃতি সুন্দরবন জরিপকারী প্রসিদ্ধ সাহেবদের মানচিত্রগুলি দেখিলে বুঝা যায় যে, ঐ প্রকারে এতদ্দেশে বহু নদী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে ঐ সকল নদীর সংখ্যা আরও বেশী ছিল। মহাভারতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী নিম্নবঙ্গে, সাগরসঙ্গম প্রদেশে, উহাদের আনুমানিক সংখ্যা পাঁচ শত লিখিত আছে।২ উপরোক্ত কারণেই, সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীকালে ঐ সকল নদী শতমুখী গঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই নামে উহাদের উল্লেখ, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত কৃত্তিবাসের রামায়ণে৩ ও উহার পরবর্ত্তী শতকে রচিত চৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়।৪

১। ঐ সকল শাখানদীর অধিকাংশের নামের সহিত বর্ত্তমান সময়ে "গাঙ্গ" শব্দ সংযুক্ত আছে। গঙ্গা হইতে উদ্ভূত বলিয়া সম্ভবতঃ উহাদের নামের সহিত উক্ত শব্দ যুক্ত হইয়াছে। উহা বোধ হয় সংস্কৃত গাঙ্গম্ শব্দের অপভ্রংশ। শব্দকল্পদ্রুমে গাঙ্গম্ শব্দের অর্থেও গঙ্গাসম্ভূতম্ বলা হইয়াছে।

২। "ততঃ প্রয়াতঃ কৌশিক্যাঃ পাণ্ডবো জনমেজয়।
আনুপূর্ব্বেণ সর্ব্বাণি জগামায়তনান্যথ।
স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃসঙ্গমে নৃপ।
নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম।
ততঃ সমুদ্রতীরেন জগাম বসুধাধিপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতোবীর কলিঙ্গান প্রতিভারতঃ।"
(মহাভারত, বনপর্ব্ব।)

৩। "সপ্তগ্রাম তীর্থ স্নান প্রয়াগ সমান।
সেখান হইতে গঙ্গা করেন প্রয়াণ।
আকণা মাহেশ গঙ্গা দক্ষিণে করিয়া।
বিহরোদের ঘাটে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া।
গঙ্গা বলিলেন বাপু শুন ভগীরথ।
কতদূরে তোমার দেশের আছে পথ।
ভ্রমিতেছি একবর্ষ তোমার সংহতি।
কোথা আছে ভস্মময় সাগর সন্ততি।
ভগীরথ বলেন মা এই পড়ে মনে।
পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিক তার মধ্যখানে।
যেখানে আছিল কপিল মহামুনি।
সেইখানে মম বংশ মাতৃমুখে শুনি।
এই কথা যেখানে গঙ্গারে রাজা বলে।
হইলেন শতমুখী গঙ্গা সেই স্থলে।"
(কৃত্তিবাসের রামায়ণ, আদিকাণ্ড)

৪। এই মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগে মহা কুতূহলে।
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হইয়া শতমুখী।
বহিতে আছয়ে সর্ব্বলোকে করে সুখী।
*　　*　　*
ছত্রভোগে গেলা প্রভু অম্বুলিঙ্গ ঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে।"
(চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ২য় অধ্যায়)

ঐ সকল নদীর অধিকাংশের এখন যে সমস্ত নাম আছে তাহা প্রাচীন নহে। নিম্নবঙ্গের এই অংশ বহুদিন দুর্গম বনমধ্যে থাকায় উহাদের প্রাচীন নাম অজ্ঞাত হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে রচিত চব্বিশ-পরগণা জেলা ...র্গত নিমতা গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্য পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে ঐ সকল শাখানদীর মধ্যে একটি গঙ্গানদী নামে অভিহিত হইত এবং লোকে ঐ নদীতে গঙ্গাস্নান করিত।৫ উহাই সম্ভবতঃ পশ্চিম সুন্দরবনে ভাগীরথী নদীর মূল প্রবাহের শেষাংশ ছিল। কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী ভাগীরথী নদীর সহিত উহার যোগ কালক্রমে পশ্চিম সুন্দরবনের উত্তরে কলিকাতার সান্নিধ্য পর্য্যন্ত উহার প্রাচীন প্রবাহ লুপ্ত হওয়ায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত ভন্‌ডেন্ ব্রুক-এর বঙ্গদেশের মানচিত্রে পশ্চিম-সুন্দরবনের উত্তরে ভাগীরথীর উক্ত লুপ্ত অংশের একটি চিত্র আছে। কিন্তু ঐ মানচিত্রখানি প্রকৃত জরিপকার্য্য দ্বারা প্রস্তুত নহে বলিয়া উহাতে তাহা যথাযথরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। বৈদেশিকগণের প্রাচীন মানচিত্রগুলির মধ্যে রেনেলের খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মানচিত্রখানিই সর্ব্বপ্রথম জরিপকার্য্য দ্বারা প্রস্তুত হয়।৬ উহাতেও অধুনালুপ্ত ভাগীরথী-প্রবাহের উক্ত প্রাচীন পথ বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়াম নামক দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক হইতে একটি বিচ্ছিন্ন খালের আকারে কালীঘাট, বারুইপুর ও বিষ্ণুপুর প্রভৃতি গ্রামের উপর দিয়া পশ্চিম-সুন্দরবনের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত নালুয়া ও ছত্র-ভোগ গ্রামের সান্নিধ্য পর্য্যন্ত প্রদর্শিত আছে।৭

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত হইতে পূর্ব্বে লোকের ধারণা হয় যে, সৃষ্টিকাল হইতে বঙ্গদেশের এই অংশ বনময় হইয়া ছিল এবং ইংরেজ রাজত্বকালেই সর্ব্বপ্রথম এখানে বন হাসিল হইয়া মনুষ্যাবাস হইতেছে। কিন্তু বন-হাসিলের পর পশ্চিম সুন্দরবন এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে গুপ্ত, পাল ও সেন রাজগণের শাসনকালের ভগ্ন মন্দির, গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ, গড়, প্রস্তর, ধাতব ও মৃন্ময়মূর্ত্তি, তাম্রপট্টলিপি প্রভৃতি প্রাচীন মনুষ্যাবাসের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় লোকের উক্ত ভুল ধারণা নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, অতীতকালে সমগ্র পশ্চিম সুন্দরবন ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ বহু গ্রাম নগরাদিতে সমৃদ্ধ ছিল। ঐ সকল লোকালয় ধ্বংস হইয়া বহুদিন দুর্গম বনমধ্যে গুপ্ত ছিল বলিয়া এ অঞ্চলের প্রাচীন স্থান এবং জনপদাদির নামও নদীসমূহের নামের ন্যায় অজ্ঞাত হইয়া গিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অঙ্কিত টলেমীর বিখ্যাত অন্তর্গাঙ্গেয় প্রদেশের মানচিত্রে এ প্রদেশের মেগা ও কামবিসন নদীদ্বয়ের মধ্যে পলউরা নামে একটি বহু প্রাচীন নগরের নাম দেখা যায়।৮ কিছুদিন পূর্ব্বে ২২ নম্বর লট ও "ই" প্লটে মহারাজা লক্ষ্মণসেনের ও ডোম্মনপালদেব নামক খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ জনৈক স্বাধীন নরপতির যে দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতেও এ প্রদেশে, গঙ্গানদীর পূর্ব্ব দিকে, মণ্ডলগ্রাম নামে একটি গ্রামের, দ্বারহাটক নামে একটি নগরের ও দাসহিটা নামক অন্য আর একটি গ্রামের নাম পাওয়া গিয়াছে।৯ এখানকার এই সকল ও অন্যান্য প্রাচীন লোকালয়ের ধ্বংসাবশেষগুলি এতদিন এ প্রদেশের বিভিন্ন অংশে স্থানে স্থানে বিস্তৃত ভূমি অধিকার করিয়া বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বন-হাসিলের পর নূতন মনুষ্য বসতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল নিদর্শন ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতেছে। বহু ইষ্টক-স্তূপ খনিত হইয়া ইষ্টক ও তন্মধ্যস্থ পুরাবস্তুসমূহ স্থানান্তরিত হইয়াছে। দুইখানি তাম্রপট্ট-লিপিও ঐরূপে নিখোঁজ হইয়াছে। এ অঞ্চল দুর্গম বলিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্ম্মচারিগণের এখানকার পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানে ও ঐ সকল পুরাকীর্ত্তি সংরক্ষণে কোনরূপ চেষ্টা নাই। ঐ সকল পুরাকীর্ত্তির কতকগুলির সচিত্র বিবরণ আমি ইতি-পূর্ব্বে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির তিনটি মনোগ্রাফে (monograph) ও কয়েকটি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি।১০ ঐগুলি দেখিলে এ অঞ্চলে প্রাচীনকালে কিরূপ সমৃদ্ধ জনপদাদি ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। এখনও এখানে মধ্যে মধ্যে ভূগর্ভ খননকালে নানারূপ পুরা-

---

৫। গাঠের গাবর যত, বাহিতে বড়ই রত, ছাড়াইল দুর্জ্জয় মগরা।
গোজানা বাহিয়া চলে, কর্ণধার কুতূহলে, ধামাই বেতাই কৈল পাছে।
সারি গাহি জুড়ি জুড়ি, কাকদ্বীপ গঙ্গঘড়ী, ছাড়াইল বণিকের রাজে।
টিয়াখোল পাছু আন, গঙ্গাধারায় করি স্নান, উপনীত হইল ছত্রভোগ।"
(রায়মঙ্গল)

6 *The Surveys of Bengal by Major James Rennel (1764-1777)*. By F. C. Hirst (1917)'

7 Rennel's *Atlas*, Plate 52, Parts 1 and 2.

8 *The Early History of Bengal.* By F. J. Monahan. Map of Ptolemy.

9 *The Inscriptions of Bengal, Part III*, N. G. Mazumdar. Page 170.

The Indian Historical Quarterly, Vol. X. No. 2. (June, 1934). Page 324.

10 Varendra Research Society's *Monographs*, No. 3. *The Antiquities of Khari.*

No. 4. *The Antiquities of the North-West Sundarbans.*

No. 5. *The Antiquities of the Sundarbans.*

Journal of the Indian Society of Oriental Art, Vol. IX. Page 142.

বস্তু পাওয়া যাইতেছে। সেগুলির মধ্যে মৌর্য্য ও কুশান-যুগের নিদর্শনসমূহও আছে।১১

এ অঞ্চলে আবিষ্কৃত ঐ সকল পুরাকীর্ত্তির সঠিক বিবরণ প্রকাশিত না হওয়ায় ও টলেমীর মানচিত্রাদি লক্ষ্য না করায় এতদিন লোকে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের আনুমানিক সিদ্ধান্ত হইতে এ অঞ্চলের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত রূপ ভুল ধারণা পোষণ করিতেন। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এদেশকে নবীন বলিয়াছেন বলিয়াও ঐ প্রকার ধারণা লোকের মনে আরও সুদৃঢ় হইয়াছিল। অনেকে বিশ্বাস করিতেন যে, অতি প্রাচীনকালে এদেশের অস্তিত্ব ছিল না এবং বঙ্গোপসাগরে দ্বীপসমূহ গঠিত হইয়া কিছুকাল পূর্ব্বে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিবার সময় লক্ষ্য করেন নাই যে, (ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধান হইতে আবার ইহাও জানা যায়) অতীতকালে প্রাচীন ভূখণ্ডের অবনমন হইয়া সুন্দরবনের এই অংশের একাধিকবার উত্থান-পতন হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিষয়ক অনুসন্ধানে ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খননে এ প্রদেশের নানাস্থানে, বর্ত্তমান ভূ-পৃষ্ঠের নিম্নদেশে, ২০ ফুট হইতে ৩০ ফুটের মধ্যে, প্রচুর পরিমাণে সুন্দরী বৃক্ষের শিকড়সহ মৃত্তিকাস্তর পাওয়া গিয়াছে। সুন্দরী বৃক্ষগুলি এতদ্দেশের যে সকল ভূমি নিম্ন অর্থাৎ নদীর জোয়ারের জলে ডুবিয়া যায়, তাহার উপরিভাগেই জন্মিয়া থাকে। সেকারণ ভূ-পৃষ্ঠের ঐরূপ নিম্নদেশে প্রচুর পরিমাণে উক্ত বৃক্ষমূলসহ মৃত্তিকাস্তরের আবিষ্কার হইতে বুঝা যায় যে, ভূগর্ভে বহু সুন্দরী বৃক্ষমূলের পতন কোন সময় এ অঞ্চলে ভূমি অবনমনের ফলেই সংঘটিত হয়।১২

ঐরূপ শিকড়-সংযুক্ত মৃত্তিকাস্তর ব্যতীত সুন্দরী বৃক্ষের শুষ্ক দেহের নিম্নাংশ ও মূলসহ এখানকার ভূগর্ভে নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে খুলনা জেলায় কোন সুন্দরবন লটের সন্নিকটে ঐ প্রকার একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের বিবরণ বাখরগঞ্জের রেভিনিউ সার্ভে রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে দেখা যায় যে, সেখানে একটি জলাশয় খননকালে ১৮ ফুট নিম্নে সুন্দরীবৃক্ষের অরণ্যের একটি ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় এবং যেরূপ অবস্থায় বৃক্ষগুলি তথাকার ভূ পৃষ্ঠে দেখা যাইত ঠিক সেইরূপ অবস্থাতেই উহাদের নিম্নাংশ ও মূল ঐ স্থানের ভূগর্ভের নিম্নদেশে অবস্থিত ছিল।৩ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্যানিং বা মাতলা শহরে ঐ প্রকার আর একটি আবিষ্কার হয়। সেখানেও একটি জলাশয় খননকালে প্রায় ৬০ গজ স্থানে চল্লিশটি শুষ্ক সমূল সুন্দরীবৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধভাবে ভূগর্ভমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখা যায়।১৪

ভূগর্ভে এইরূপ সুন্দরীবৃক্ষসমূহের আবিষ্কার ব্যতীত এ প্রদেশের বিভিন্ন অংশে বর্ত্তমান ভূ পৃষ্ঠের ৪২০ ফুট নিম্নে বহুসংখ্যক প্রস্তরখণ্ডও পাওয়া গিয়াছে এবং তদ্দ্বারা এখানকার প্রাচীন ভূমি-নিমজ্জনের প্রমাণকে আরও সুদৃঢ় করিয়াছে। ভূগর্ভের ঐরূপ নিম্নদেশে উক্ত প্রকার প্রচুর প্রস্তরখণ্ডের আবিষ্কার হইতে পূর্ব্বে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের কাহারও কাহারও মনে এ ধারণাও হয় যে, সম্ভবতঃ সুদূর অতীতকালে এ অঞ্চলে ছোট ছোট প্রস্তরের পাহাড় ছিল যাহা ঐ প্রকার ভূমি-নিমজ্জনে বসিয়া গিয়া ও তদুপরি পলি পড়িয়া বর্ত্তমান ভূখণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। এ অঞ্চলের

১১। মৌর্য্যযুগের পুরাবস্তুগুলির মধ্যে চন্দ্রকেতুর গড়ে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি উল্লেখযোগ্য।

Vide *catalogue of sculptures and coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parisat,* R. D. Banerjee. Pages 16, 40.

কুশান যুগের নিদর্শনসমূহের মধ্যে ১১৬ নম্বর লটে প্রাপ্ত কতকগুলি তাম্রমুদ্রা ও সাগরদ্বীপে আবিষ্কৃত মৃন্ময় মূর্ত্তিগুলি প্রসিদ্ধ। উক্ত কুশান মুদ্রার বিবরণ বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ১৯২৮২৯ খৃষ্টাব্দের কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। পৃষ্ঠা ২১।২২ সাগরদ্বীপের মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটি মৃন্ময়মূর্ত্তির মস্তক আশুতোষ মিউজিয়মে আছে। উহার বিবরণ এখনও কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

12 "The peat-bed is found in all excavations round Calcutta at a depth varying from about twenty to about thirty feet and the same stratum appears to extend over a large area in the neighbouring country. A peaty layer has been noticed at Port-Canning thirty-five miles to the south-east and at Khulna, eighty miles east by north, always at such a depth below the present surface as to be some feet beneath the present mean tide level. In many of the cases noticed, roots of the Sundri trees were found in the peaty stratum. This tree grows a little above high water-mark in grounds liable to flooding, so that in many instances roots occurring below the mean tide level, there is conclusive evidence of depression." *Manual of Geology of India* (1892). R. D. Oldham.

13 "What maximum height the Sundarbans may have formerly attained is utterly unknown......But that a general subsidence has operated over the whole of the Sundarbans, if not of the entire delta, is I think quite clear from the result of the examinations of cuttings or sections made in various parts where tanks were being excavated. At Khulna, about 12 miles to the nearest Sundarban lot, at a depth from eighteen feet below the present surface of the ground and parallel to it, remains of an old forest were found consisting entirely of Sundri trees of various sizes with their roots and lower portions of the trunk exactly as they must have been existed in former days, when all was fresh and green above them."

Revenue Survey Report. Faridpur, Jessore and Buckergunge. C. Gastrell.

14 "That forest now lies under the Sundarbans we have seen with our own eyes. In excavating a tank at the new town of Canning, at the head of Matla, large Sundri trees were found standing as they grew, no portion of their stems appearing above ground. Their numbers may be imagined when we state that in a small tank only thirty yards across, about forty trees were exhumed.

The Calcutta Review, 1859. "The Gangetic Delta," by Major Sherwell.

ভূগর্ভে, ঐরূপ নিম্নাংশে যে পরিমাণে অসংস্কৃত (Course) প্রস্তরখণ্ড ও বালি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই তাঁহারা ঐ প্রকার অনুমান করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে, বদ্বীপ গঠনে নদীগর্ভের নিম্নদেশে কোথাও ঐরূপ প্রস্তররাশি ও বালি থাকে না। এ কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস যে, অতীতকালে একদা কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান প্রাচীন পয়বস্তী ভূ-খণ্ডের সীমার সান্নিধ্যে ছিল এবং উহার দক্ষিণাংশ প্রদেশ, বর্ত্তমান বঙ্গোপসাগরের কিয়দংশসহ, খুব সম্ভবতঃ বিভিন্ন ভূখণ্ডাকারে অবস্থিত ছিল।১৫

সুতরাং ভূতত্ত্বানুসন্ধানে লব্ধ এই সকল প্রমাণ বিবেচনা না করিয়া কেবলমাত্র ভূতত্ত্ববিদ্গণ এদেশকে নবীন বলিয়াছেন বলিয়া প্রাচীনকালে ইহার অস্তিত্ব ছিল না এরূপ স্থির করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। ভূতত্ত্ববিদ্গণ লক্ষ লক্ষ বৎসরের কথা বলেন। কারণ তাঁহাদের অনুসন্ধান ঐতিহাসিকদিগের অনুসন্ধানের ন্যায় পাঁচ-সাত হাজার বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট যে দেশ নবীন ঐতিহাসিকদিগের নিকট তাহা বহু প্রাচীন।

উপরোক্ত অনুসন্ধান হইতে স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়, অতীতকালে কলিকাতার দক্ষিণে প্রাচীন ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ছিল। কোন সময় কি কারণে উহার ঐরূপ অবনমন হয় তাহা অজ্ঞাত। কেহ কেহ ভূমিকম্পকে উহার কারণ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।১৬ ঐ প্রকার ভূমিনিমজ্জনের জন্যই সম্ভবতঃ এ প্রদেশের ভূপৃষ্ঠ অন্যান্য নদীমাতৃক বদ্বীপের শেষাংশের ন্যায় সর্ব্বত্র সমান নহে এবং উহার পশ্চিমাংশ অপেক্ষা পূর্ব্বাংশ নিম্ন।১৭

কিছুদিন পূর্ব্বে, ২৬ নম্বর লট, কঙ্কণদীঘিতে আমি এ অঞ্চলের প্রাচীন ভূমি-নিমজ্জনের পূর্ব্বোল্লিখিত প্রমাণসমূহ হইতে ভিন্ন রকমের প্রমাণও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত লটের পশ্চিম দিকে রায়দীঘি গাঙ্গ প্রবাহিত। এই নদীর পূর্ব্বতীরে ৭।৮ ফুট মাটির নিম্নে একটি বহুপ্রাচীন জনপদের গৃহাদির ভিত্তি শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রোথিত আছে। ঐ সকল ভিত্তির ইষ্টকের আকার দেখিলে উক্ত ধ্বংসাবশেষ গুপ্তযুগের বলিয়া মনে হয়। কঙ্কণদীঘির পশ্চিমাংশ রায়দীঘি গাঙ্গে ধ্বসিয়া যাওয়ায় ঐ সমস্ত বহু প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ ঐরূপে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভাঁটার সময় রায়দীঘি গাঙ্গের জল নামিয়া গেলে, নদীবক্ষস্থিত নৌকা হইতে এখন ভূগর্ভস্থ উক্ত ধ্বংসাবশেষ বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই লটের পূর্ব্ব দিকে ১১৬ নম্বর লটে পালযুগের বিখ্যাত মন্দির জটার দেউল অবস্থিত। ২৬ নম্বর লটের উপরিভাগেও জটার দেউলের ইষ্টকের অনুরূপ ইষ্টকযুক্ত পালযুগের একটি জনপদের ধ্বংসাবশেষ আছে।১৮

এই সকল স্থানের ভূপৃষ্ঠে ঐ সমস্ত পালযুগের নিদর্শন ও তন্নিম্নে গুপ্তযুগের উক্ত মনুষ্যাবাসের ধ্বংসাবশেষগুলি দেখিলে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বোল্লিখিত রূপ ভূমি অবনমনে এদেশের প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শনও ভূগর্ভে নিহিত হইয়া গিয়াছে।

২৬ নম্বর লটের ভূগর্ভস্থ ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত সাগরদ্বীপ ও জি প্লট বুড়ারতটের ভূগর্ভেও ঐরূপ বহু প্রাচীন মনুষ্যাবাসের নিদর্শন নিহিত আছে। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় দেহাবসানের কিছুদিন পূর্ব্বে সাগরদ্বীপের ভূগর্ভস্থ উক্ত ধ্বংসাবশেষ হইতে কয়েকটি অতি প্রাচীন দ্রব্য প্রাপ্ত হন।১৯ তথায় মন্দিরতলা প্রভৃতি গ্রামের পশ্চিমাংশ হুগলী নদীর স্রোতের তোড়ে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ঐ ভূগর্ভস্থ ধ্বংসাবশেষ উক্ত নদীতীরে এখন স্থানে স্থানে প্রায় ক্রোশব্যাপী ভূখণ্ডে দেখা যাইতেছে ও তন্মধ্য হইতে বহু প্রাচীন দ্রব্য আবিষ্কৃত হইতেছে। মন্দিরতলা গ্রামের উপরিভাগে পাল ও সেনরাজগণের শাসনকালের পদ্ধতিতে গঠিত প্রস্তরমূর্ত্তি ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন

---

15 "The evidence (of depression) is confirmed by the occurrence of pebbles, for it is extremely impossible that coarse gravels should have been deposited in water eighty fathoms deep and large fragments could not have been brought to their position unless the streams which now traverse the country had a greater fall or unless which is more probable rocky hills existed which have been covered up by alluvial deposits. The coarse gravel and sands which form so considerable proportion of the beds traversed can scarcely be deltaic accumulation, and it is therefore probable, that when they were formed, the present site of Calcutta was near the margin of the alluvial plain, and it is quite possible that a portion of Bay of Bengal was dry land."

Manual of Geology of India (1892), R. D. Oldham.

16 Hunter's *Statistical Account of Bengal*, Vol. I. Pages 292-293.

17 "The lands near the banks of the two great rivers, the Hugli and Meghna, that is to say, in the 24-Parganas and Bakargunj Districts lie comparatively high, with the ground sloping downwards towards the middle portion, comprising the whole of the Jessore (now Jessore Khulna) and eastern part of the 24-Parganas portion of the Sundarbans. This middle tract is low and swampy and at no very distant period was doubtless one great marsh."

Hunter's *Statistical Account of Bengal*, Vol. I. Pages 287-288.

18 "The bricks of Jatar Deul are of the same size and mould as those found near Kankandighi and probably the ruins and the Jatar Deul are contemporary buildings." *List of Monuments in the Presidency Division*. Page 2.

19 "A few years before his death Mr. Dutt (Gurusadaya Dutt) discovered a two-mile long ruins of a city at the seacoast in the Sagore island and unearthed very rare antiquities of historic and pre-historic times which are now under the inspection of the Archaeological Department." *The Modern Review*, 1940 : **"G. S. Dutt and the Indigenous Arts of Bengal."**

নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মনোগ্রাফে উহাদের কতকগুলির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি।[২০] ক্রি প্রট বুড়ারতটের পশ্চিমাংশও শতমুখী নদীদ্বারা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তথাকার ভূগর্ভস্থ প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ এখন স্থানে স্থানে দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

এই সকল এবং পূর্ব্বোক্ত ভূগর্ভে সুন্দরী বৃক্ষের অরণ্যের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শনাদি হইতে প্রমাণিত হয় যে, ভূমি অবনমনে সুন্দরবনের এই অংশের ভূসংস্থানের বহু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সে কারণ এ অঞ্চলের প্রাচীন অবস্থা এখন নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ভূমি নিমজ্জনে এখানে অল্পকাল মধ্যে ভূভাগের কিরূপ বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় সাগরদ্বীপের পুরাতন মানচিত্রগুলির সহিত উহার বর্ত্তমান সময়ের মানচিত্রখানি মিলাইলে। রেনেলের ও ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত এলিসনের সুন্দরবনের মানচিত্র দুইখানিতে দেখা যায় যে, পূর্ব্বে সুন্দরবন আকারে বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা বৃহৎ ছিল এবং তখন উহার মধ্য দিয়া ভাগীরথী নদী অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হইত। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ঐ সকল শাখানদীর অনেকগুলি লুপ্ত হইয়া যায়। ঐ সময় উহার উত্তরাংশ ভাঙ্গিয়া বর্ত্তমান লোহাচোরা গাঙ্গ ও লোহাচোরা ও ঘোড়ামারা দ্বীপ দুইটিরও সৃষ্টি হয় এবং দক্ষিণাংশে কয়েক মাইল স্থান বঙ্গোপসাগর গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায়। তৎপূর্ব্বে উহার ঐ নিমজ্জিত অংশেই গঙ্গাসাগর সঙ্গম-ক্ষেত্র ছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের উল্লিখিত ভূমিকম্পের পর ঐ স্থানটি বঙ্গোপসাগর গর্ভে অদৃশ্য হইলে, উহার উত্তরাংশ গঙ্গাসাগর সঙ্গমক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পুরাতন ঐ সঙ্গমস্থানটি এই অঞ্চলের বহু বৃদ্ধ ব্যক্তি দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ডায়মণ্ড-হারবারের নিকটবর্ত্তী উস্তী গ্রাম নিবাসী, অধুনা স্বর্গত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উক্ত বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :

"এক বৃদ্ধ বহু বৎসর ধরিয়া এই মেলায় (গঙ্গাসাগর মেলা) উপস্থিত হইতেছেন। ইনি বলেন পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে স্থানে মেলা হইত তাহা এখন বহুদূরে সমুদ্রের ভিতর। তাঁহার অনুমান ইহা কয়েক মাইল দক্ষিণে হইবে।...উক্ত বৃদ্ধ যে স্থানে কপিলমুনি দর্শন করেন, সেই স্থানে মন্দির, বাঁধাঘাট সমেত পুষ্করিণী ও নারিকেলের বাগান ছিল।... এই সকল বিবরণ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। ইনি উক্ত (১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের) ভূমিকম্পের পূর্ব্ব হইতে স্থানটি মেলার উপযোগী করিবার ভার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান (১৯১৪ খৃষ্টাব্দ) মেলাস্থানের দক্ষিণে, সমুদ্রের মধ্যে একটি বিস্তৃত চর কয়েক বৎসর ধরিয়া দেখা যাইতেছে। আমি এ চর দেখিয়াছি। ইহা প্রায় ১৪।১৫ বৎসর ধরিয়া ভালরূপে লক্ষিত হইতেছে। প্রতি বৎসর বালি, বৃক্ষাংশ ও ঝিনুকের খোলা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে এই জলমগ্ন চরের উপর সঞ্চিত হইতেছে তথাপি ইহা জলের নিম্নেই আছে। ভাঁটার সময় এই চরের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এই নিমজ্জিত চর পূর্ব্বোক্ত সাগর দ্বীপের অংশ।"[২১]

উক্ত ভূমিকম্পের পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত উইলসন সাহেবের হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তকেও তৎকালীন গঙ্গাসাগর সঙ্গমক্ষেত্রের ঐ সমস্ত প্রাচীন নিদর্শনের বিবরণ আছে। আমি এইখানে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"After ablution the pilgrims repair to the temple dedicated to the divine sage Kapilmuni........In front of the temple was a banian tree beneath which were images of Rama, Hanumana, and an image of Kapilmuni, nearly the size of life within the temple."

উক্ত প্রাকৃতিক বিপ্লবে সাগরদ্বীপের ভূভাগের পরিবর্ত্তনের সহিত তথাকার প্রাচীন মনুষ্যবাসের ঐরূপ বহু নিদর্শন অদৃশ্য হইয়াছে। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঐ দ্বীপ প্রথম হাসিলকালে উহার বিভিন্ন অংশে ঐ সকল প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল।[২৩] তৎপূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত হেজেস সাহেবের ডায়েরীতে দেখা যায় যে, ঐ সময়ও তথায় কতকগুলি প্রাচীন মন্দির দেখা যাইত।[২৪] স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে যে, সাগরসঙ্গমক্ষেত্রে দ্রাক্ষারামেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ শিবের একটি লিঙ্গমূর্ত্তি ছিল। উক্ত পুরাণে কাশীতে বিশ্বেশ্বর, প্রয়াগে ললিতেশ্বর, সৌরাষ্ট্রে সোমেশ্বর (সোমনাথ) প্রভৃতি ভারতবিখ্যাত লিঙ্গমূর্ত্তিগুলির সহিত উহার নাম ঘোষিত আছে।[২৫]

এই সকল কারণে আমার বিশ্বাস, সুন্দরবনের এ অঞ্চলে আবিষ্কৃত পুরাকীর্ত্তিসমূহের বিশদ বিবরণ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইলে ও এ অঞ্চলের দুই-চারিটি প্রাচীন স্থান

R. Society's *Monographs No. 3*. Pages 13-15.

২১। বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। বঙ্গীয় ৮ম সাহিত্য সম্মিলনের বিজ্ঞান শাখায় পঠিত প্রবন্ধ।

22 Wilson's *Essays on Hindu Religion* (1862), Vol. II. Pages 164-169.

23 "In the island of Sagore which lies upon the extreme edge of the Deltaic basin consequently lying higher than the centre of the delta, the remains of tanks, temples and roads are still to be seen, showing that it was once densely populated." *The Calcutta Review*, 1859 : "The Gangetic Delta."

24 "We went in our Budgaros to see ye Pagodas at Sagar." Hedge's *Diary*, 1688.

২৫। "কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরং দেব প্রয়াগে ললিতেশ্বরং।
ত্রিয়মকাং ব্রহ্মগিরৌ কলৌ ভদ্রেশ্বরং তথা।
দ্রাক্ষারামেশ্বরং লিঙ্গং গঙ্গাসাগর সঙ্গমে।
সৌরাষ্ট্রে চ তথা লিঙ্গং সোমেশ্বরমিতি স্মৃতম।"

স্কন্দপুরাণ, মহেশ্বর খণ্ডে কেদার খণ্ড, ৭ম অধ্যায়।

চিত্তরঞ্জনে বাঁধ-নির্ম্মাণ-কার্য্য

উপনিবেশের একটি অংশ

উত্তর কোরিয়ার পার্ব্বত্য অঞ্চলে একটি গণ্ডগ্রাম

উত্তর কোরিয়ার নোজিদোতে গৃহ-প্রাঙ্গণে কর্ম্মরত, সু-উচ্চ টুপী পরিহিত জনৈক কৃষক। পার্শ্বে একটি শিকারীর দল এই স্থান ত্যাগের উদ্যোগ করিতেছে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খনিত হইলে, ভূতত্ত্ববিদগণের উক্তি হইতে যাঁহারা এ প্রদেশের প্রাচীনত্বে সন্দেহ করেন তাঁহাদের ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্ব্বচক্রের অধ্যক্ষ ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় বর্ত্তমান লেখকের সহিত পশ্চিম সুন্দরবনের কয়েকটি প্রাচীন স্থান ও এতদঞ্চলে আবিষ্কৃত কতকগুলি পুরাবস্তু পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পাটনায় বঙ্গীয় প্রবাসী সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনের ইতিহাস শাখার সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাহাতে সুন্দরবনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই,

"বাঙ্গলার প্রাচীনতম যুগের ইতিহাস অন্বেষণ করিতে হইলে বাঙ্গলার সমতলভূমিকেও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত সুন্দরবনের বহুস্থানে যে সকল পুরাকীর্ত্তি চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার ফলে দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা জিলার দক্ষিণাংশেও গুপ্ত ও পালযুগের বহু গ্রাম নগর বিদ্যমান ছিল। এ অঞ্চলে রীতিমত অনুসন্ধান করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে বাঙ্গলার সমতলভূমিকে আমরা যতটা নবীন বলিয়া মনে করিতেছি উহা ততটা নবীন নহে এবং ভূতত্ত্ববিদগণের মতে নবীন বলিয়া পরিগণিত হইলেও ঐতিহাসিকগণ তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না।"[২৬]

এ পর্য্যন্ত এ প্রদেশের কোন প্রাচীন স্থান খনিত না হইলেও এখানে পূর্ব্বোক্ত পুরাবস্তুসমূহের আবিষ্কার ও পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ ভূমি অবনমনের প্রমাণসমূহ হইতে বুঝা যায় যে, পশ্চিম সুন্দরবন ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ বাস্তবিকই নবীন নহে এবং এই সকল স্থানেও বহু প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব আছে। এ পর্যন্ত এ অঞ্চলে যে সকল পুরাবস্তু পাওয়া গিয়াছে সেগুলি সমস্ত chance finds অর্থাৎ হঠাৎ পাওয়া জিনিষ। উহাদের কিয়দংশ ভূপৃষ্ঠে ও কিয়দংশ খানা ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খননকালে সময় সময় বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে কারণ প্রাচীন স্থানগুলিতে রীতিমত খননকার্য্য না হইলে ভূগর্ভের নিম্নস্তরে যে সমস্ত অধিকতর প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আছে তাহা পাওয়া যাইবে না। সময় সময় গভীর জলাশয় ও শুষ্ক নদীগর্ভের নিম্নদেশ খননকালে এখানে, বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি খুব প্রাচীন দ্রব্যও পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল পুরাবস্তুর মধ্যে কতকগুলি আদিম শিল্পরীতিতে ও কতকগুলি মৌর্য্য ও মৌর্য্যোত্তর যুগের শিল্পরীতিতে গঠিত।

২৬। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ পৌষ, রবিবার, সন ১৩৪৪ সাল।

সাত লক্ষ গ্রাম

শ্রীরেণু দাসগুপ্তা, এম-এ

ভারতবর্ষে গ্রামের সংখ্যা সাত লক্ষ। ভারতের প্রতিটি গ্রামে গড়পড়তা ৫০০ হইতে ১০০০ জন লোকের বসতি। মোটামুটি হিসাবে এদেশের শতকরা প্রায় ৯৪ জন লোক গ্রামেই বাস করে; শহরে বাস করে ৬ জন। ভারতের গ্রামসমূহই যে ভারতের প্রাণকেন্দ্র একথা দেশের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তথাপি একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ঐ গ্রামসমূহ নিদারুণ ভাবে উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত। সহরের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে নিঃশেষিতসম্পদ গ্রামসমূহ ব্রিটিশ সরকারের শাসনকালে অবজ্ঞাত ও নিষ্পেষিত হইলেও স্বাধীন ভারতের অধিবাসীদের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি ও মনোযোগ আজ ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। এ দেশের গ্রামগুলিকে সমৃদ্ধ করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারিলে, গ্রামসমূহের সৌষ্ঠব ও সম্পদ বৃদ্ধি করিতে না পারিলে স্বাধীন ভারতের অগ্রগতি ব্যাহত হইবে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিবার কথা নহে।

বর্ত্তমান যে-সকল গ্রামোন্নয়ন-পরিকল্পনা জাতীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন সেগুলি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, গ্রামগুলিকে পুনর্গঠন করিয়া প্রাচীন ভারতে গ্রামসমূহে প্রচলিত স্বায়ত্তশাসনমূলক ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্ত্তন করা তাঁহাদের অভিপ্রায়। সেইজন্ত এক একটি প্রদেশে তদন্তর্গত গ্রামসমূহের সংখ্যা অনুযায়ী পঞ্চায়েতরাজ বা গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই উপায়ে সমগ্র ভারতরাষ্ট্রের সাত লক্ষ গ্রামকে আশি হাজার পঞ্চায়েতে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং অনধিক পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই আশি হাজার পঞ্চায়েতকে এক লক্ষ গ্রাম্য পঞ্চায়েতে পরিণত করার পরিকল্পনাও গৃহীত হইয়াছে।

প্রদেশ হিসাবে গ্রামও পঞ্চায়েত-সমূহের সংখ্যা (পূর্ব্ব-পঞ্জাব ও উড়িষ্যা ব্যতিরেকে) নিম্নে প্রদত্ত হইল :

প্রদেশ	গ্রামের সংখ্যা	ইউনিয়ান বোর্ড	পঞ্চায়েত
পশ্চিমবঙ্গ	৩৪৩৭৩	২২০০	×
যুক্তপ্রদেশ	১১০০০০	×	৩৫০০০
বিহার	৬৮০০০	×	১৩৭৫
আসাম	২২০০০	×	১২৩
মাদ্রাজ	৩৫০০০	×	৭২০০
বোম্বাই	২২০০০	×	১৫০০
মধ্যভারত	২৬০০০	×	৮০০৩
বরোদা রাজ্য	২৯৬০	×	২৪৭৯
মহীশূর	১৭০২৯	×	১২২৪৯
হায়দ্রাবাদ	২২০০০	×	২৭৪
সৌরাষ্ট্র	৪৫০০	×	২৩৫

এই স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন অন্যান্য প্রদেশের পঞ্চায়েতের দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয় বাংলায় ইউনিয়ান বোর্ডের দ্বারা সেগুলি পরিচালিত হইয়া থাকে।

গ্রাম্য পঞ্চায়েত-সমূহের কার্য্য-পদ্ধতি, দায়িত্ব এবং করণীয় কার্য্যাবলীর কথাও বিশদরূপে বিবৃত করা প্রয়োজন। গ্রামস্থ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটদ্বারা অথবা সম্মিলিত কয়েকটি গ্রামের ভোট দ্বারা পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন করা হইয়া থাকে। ইহার বিচার-বিভাগ একটি স্বতন্ত্র বিভাগ। বিচার ভিন্ন গ্রাম্য পঞ্চায়েতের হস্তে অর্পিত কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব নিম্নলিখিতরূপ :—

(১) গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা (২) চিকিৎসা-ব্যবস্থা, (৩) জল সরবরাহ, (৪) সরকারের সহায়তাকল্পে, শস্য এবং গৃহপালিত পশু ইত্যাদির হিসাব সংরক্ষণ, (৫) সংক্রামক ব্যাধি-নিরোধের ব্যবস্থা, (৬) রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণ ও সংরক্ষণ, (৭) অগ্নিকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ ও চোর-ডাকাতের উপদ্রব নিবারণ-ব্যবস্থা, (৮) গোচারণ-ভূমি, শ্মশান, কবরখানা তদারক, (৯) গ্রামোন্নয়ন-প্রচেষ্টা, (১০) সেচ ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, (১১) আলোকের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

ইউনিয়ান বোর্ডসমূহের করণীয় কাজ এবং ক্ষমতাও প্রায় অনুরূপ। সেগুলির কর্ত্তব্য :—(১) বিচার বিভাগসহ চৌকিদার, দফাদারদিগের কাজ তদারক (২) ইউনিয়ানের অন্তর্গত মেলা ইত্যাদিতে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা (৩) জন্মমৃত্যুর হিসাবরক্ষা (৪) স্থানীয় জনহিতকর কার্য্যের ব্যবস্থা।

এই সকল গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানের হস্তে যে সকল গুরু দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ন্যস্ত হইয়াছে তাহা আপাতদৃষ্টিতে উন্নয়নমূলক ও গঠনমূলক ব্যবস্থা হইলেও মনে প্রশ্ন জাগে যে, বাস্তবিকই এই সকল পরিকল্পনার সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্যলাভের আশা আছে কিনা; এগুলির সহায়তায়, ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের পক্ষে উন্নততর এবং সমৃদ্ধতর হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা। ব্রিটিশ শাসনের আমলে মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও বাংলার গ্রামের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা দেখাইবার জন্য "বাংলার কথা" নামক পত্রিকার একটি লেখার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি।

"পরীক্ষার পর দীর্ঘ অবসর সময়ে একবার গ্রামের দিকে তাকাও।

১। বাংলাদেশে—৮৯৫২৫টি গ্রাম। শহরের সংখ্যা ১৩৫টি।

২। বাংলাদেশে শতকরা ৯৪ জন গ্রামে থাকে। ৬ জন মাত্র শহরে।

৩। বাংলাদেশে প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ শিশু মারা যায়; তার মধ্যে শহরে মাত্র ১৮ হাজার, আর গ্রামে ২ লক্ষ ৮২ হাজার।

৪। বাংলাদেশে গ্রামে গড়ে শিক্ষিতের হার শতকরা ৪ জন শহরে ৫ জন।

৫। প্রতি বৎসর বাংলার গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়ায় মারা যায় ৭ লক্ষ—কলেরায় ১২ হাজার—বসন্তে ৬০ হাজার।

৬। বাংলার বুকে ৯৫৭টি ডাক্তারখানা আছে। তার মধ্যে বেসরকারী ৮৭৩টি, সরকারী সাধারণের জন্য ৩২টি, বিশেষ ৫৫টি। প্রায় ৯০ হাজার গ্রামের জন্য একটিও সরকারী ডাক্তারখানা নাই।

৭। বিগত ২০ বৎসরে বাংলার ৯০ হাজার গ্রামের মধ্যে ৭৫ হাজার গ্রামেই গড়ে লোকসংখ্যা হাজারকরা ১১ জন কমছে।

৮। চৈত্র-বৈশাখ মাসে বাংলার অধিকাংশ গ্রামেই অত্যধিক জলকষ্ট দেখা দেয়। জীবজন্তু পানীয় জলের অভাবে ছটফট করে। মানুষ বর্ণনাতীত কষ্টে কালাতিপাত করে। খবর রাখ কি?"

ইহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বেকার ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত বাংলার একটি সত্য চিত্র। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের গ্রামগুলির চিত্র ইহা অপেক্ষা মনোরম তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ নাই। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দুই বৎসরের মধ্যে গ্রামের চেহারা বিলকুল বদলাইয়া গিয়াছে তাহাও মনে করিবার হেতু নাই। ইউনিয়ান বোর্ড বা পঞ্চায়েত তখনও ছিল, এখনও আছে। গ্রামগুলির অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিবার পূর্ব্বে দেশের বহুবিধ রাজনৈতিক তথা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া গ্রাম্যজীবনের ও সমাজের উপর কি প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে তাহাও চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন। এই সকলের অপরিহার্য্য প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইহাই দেখা যাইতেছে যে, গ্রামবাসিগণের শহরমুখো হইবার প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ফলে শুধু যে গ্রাম্য জীবন ও গ্রাম্য সমাজ ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে তাহা নয়, নাগরিক জীবনেও বহুবিধ জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে। তাই আজ গ্রামসম্বন্ধে দেশবাসীর গভীরভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। বাংলার ইউনিয়ান বোর্ড ও অন্যান্য প্রদেশের পঞ্চায়েত প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যপরিচালনা যেভাবে হইয়া থাকে তাহা আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সরকারী অথবা বেসরকারী, যে-কোন প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃত্বলাভান্তে কি ভাবে আমরা দেশসেবা ও জনসেবার নামে ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া থাকি তাহা সকলেরই জানা আছে। আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই ত্রুটির দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য—

"No sooner do we start a little joint stock company than we try to cheat each other, and the whole thing comes down with a crash. You talk of imitating the English, and building up as big a nation as they are. But where are the foundations? Ours are only sand, and therefore

the building comes down with a crash in no time."

আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্য আমরা যত্নবান হই নাই বলিয়া আমাদের দুর্গতিরও অবসান হইতেছে না। সাত লক্ষ গ্রামের পঞ্চায়েত অথবা ইউনিয়ান বোর্ডসমূহ দ্বারা অতীতে আশানুরূপ কাজ হয় নাই এবং ইহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সময় সময় মনে নৈরাশ্যের উদ্রেক হয়।

যাহা হোক তৎসত্ত্বেও বিহার ও যুক্তপ্রদেশে, বিশেষ করিয়া যুক্তপ্রদেশে সরকারের উদ্যোগে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দ্বিবার্ষিক অনুষ্ঠানের দিবস হইতে গ্রামসমূহে পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠার যে আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবস্থা হইয়াছে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার সাফল্য কামনা করি। গ্রামোন্নয়ন, গ্রাম পুনর্গঠন, গ্রাম সংগঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা বহু ব্যয়সাপেক্ষ মূল্যবান পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ লোকেরাও ফলপ্রসূ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে সক্ষম নহেন এমত মনে করিবার কারণ নাই। সকল দিক বিবেচনা করিলে ইহাই মনে হয়, বর্ত্তমান প্রগতিশীল যুগের সহিত সমান তালে চলিতে হইলে গ্রামোন্নয়ন সম্বন্ধে দেশবাসীর কতকগুলি মামুলি ও পুরাতন ধারণার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। গ্রামসংগঠনে দেশের যুবক সম্প্রদায়কেই অগ্রণী হইতে হইবে। দেশের যুবশক্তিকে সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া গ্রামোন্নয়ন কার্য্যে নিয়োজিত করিবার প্রয়োজন আজ অত্যধিক। নেতারা যদি দেশ ও জাতিগঠনকার্য্যে এই যুবশক্তির সক্রিয় ও পরিপূর্ণ সহযোগিতা লাভ করিতে চান তাহা হইলে উহাদের সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ইহাদের শ্রম ও উদ্যমের স্বার্থত্যাগ এবং কর্ম্মব্রতের উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে। গ্রামোন্নয়ন-কার্য্যে ব্রতী যুবকদের উপযুক্ত জীবিকার সংস্থান করিতে হইবে। জাতিগঠন-কার্য্যে যুবশক্তির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন :—

"* * * We shall have to work to bring this about. Now for that I want young men 'It is the young, the strong and healthy, of sharp intellect, that will reach the Lord—' say the Vedas. This is the time to decide your future while you possess the energy of youth, not when you are worn out and jaded but in the freshness and vigour of youth. Work; this is the time."

ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের উৎস ভারতের সাত লক্ষ গ্রাম। এগুলিই সমগ্র দেশের প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু ভারতের গ্রাম আজ নির্জ্জীব, পল্লীসমূহের হৃৎস্পন্দন যেন থামিয়া গিয়াছে। গ্রামোন্নয়ন-পরিকল্পনার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ হওয়া কর্ত্তব্য গ্রামকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার জন্য গ্রামের চেহারার আমূল পরিবর্ত্তন। গ্রামকে কেবলমাত্র "গ্রাম" করিয়া রাখিলেই চলিবে কিনা ইহাও প্রশ্ন। যুগধর্ম্মকে ও বাস্তবকে অস্বীকার এবং উপেক্ষা করা সমীচীন নহে। গ্রাম আজ কেবল "গ্রামই" থাকিতে পারে না। "গ্রামে ফিরিয়া যাও"—অথবা "গ্রামে গিয়া দেশের প্রকৃত কাজ কর" শুধুমাত্র এই উপদেশ নিরর্থক। আসল কথা এই যে, গ্রামগুলিকে যুগোপযোগী করিয়া গড়িতে হইবে এবং আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন লোক যাহাতে এখানে মানসিক খোরাক পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ ধরণের পরিকল্পনাকেই প্রকৃত বাস্তবপন্থী পরিকল্পনা বলা যাইতে পারে। অন্যথায় গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে। কি ভাবে কাজ করিতে হইবে তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের সংখ্যা ৩৪৩৭৩ ও ইউনিয়ান বোর্ডের সংখ্যা ২২০০—অর্থাৎ প্রতি ইউনিয়ানের অন্তর্গত গ্রামের সংখ্যা ১৫.৬। প্রতি গ্রামে গড়ে এক হাজার জন লোকের বসতি ধরিলে পশ্চিমবঙ্গের এক একটি ইউনিয়ানের জনসংখ্যা প্রায় ১৫০০০। এই পনর হাজার লোকের জন্য এক একটি ইউনিয়ান ধরিয়া অথবা ইহার তিন চার গুণ লোকসংখ্যার জন্য তিন-চারিটি অথবা ততোধিক ইউনিয়ান বোর্ড একত্রিত ভাবে ধরিয়া বার্ষিক বরাদ্দ হিসাবে সরকার হইতে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া কয়েক বৎসরের জন্য গ্রাম-পুনর্গঠনমূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টার জন্য উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। এইরূপে এক একটি প্রদেশের অন্তর্গত সমুদয় গ্রামের জন্য সরকার মোটামুটি ভাবে অন্ততঃ এক কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিতে পারেন। যে ভারতের বার্ষিক আয় তিন শত কোটি টাকারও অধিক সেই বিরাট ও প্রগতিশীল দেশের পক্ষে জাতিগঠনমূলক কার্য্যে এই পরিমাণ অর্থব্যয় অপচয় কিংবা অমিত ব্যয় একথা মনে করিবার কারণ নাই।

এইরূপে পশ্চিমবঙ্গের ২২০০ ইউনিয়ান বোর্ডের ন্যূনাধিক ৩৪ হাজার গ্রামের জন্য সরকারী অর্থব্যয়ে, সরকারী প্রচেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় অন্ততঃ কয়েক শত হাসপাতাল ও প্রসূতি-ভবন, মাধ্যমিক-শিক্ষা বিদ্যালয়, অল্প সংখ্যক কলেজ, উন্নত ধরণের বাস-গৃহ, বৈদ্যুতিক আলোক-সরবরাহ, উত্তম যানবাহন, বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য লাইট রেলওয়ে, বাঁধানো পথঘাট, জল সরবরাহ ও ব্যাঙ্কিং ইত্যাদির ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা ভিন্ন ব্যাপক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত কৃষিব্যবস্থা প্রভৃতির কথা বলাই বাহুল্য। কেবলমাত্র ইউনিয়ান বোর্ড তথা পঞ্চায়েতের উপর নির্ভর করিয়াই এই সকল জাতিগঠনমূলক কার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভব কিনা তাহাও বিচার্য্য। কেবল পশ্চিমবঙ্গে নহে,

ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের জন্য সরকারী অর্থব্যয়ে যাহাতে জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া উঠে রাষ্ট্রনায়কদের আজ সে বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে।

উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামগুলিকে শ্রীসম্পন্ন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য লক্ষ লক্ষ কর্ম্মীর প্রয়োজন। ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে হইলে যে সকল কর্ম্মীর শ্রম, উদ্যম, অধ্যবসায় ও উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজন হইবে তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকই থাকিবে এবং এই জাতিগঠনমূলক কর্ম্মকে উপলক্ষ্য করিয়া সকলেরই অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে বেকার-সমস্যা, তথা অর্থনৈতিক সমস্যা দেশের যাবতীয় অসন্তোষ ও অশান্তির মূল কারণ, যাহা দিন দিন জটিলতর হইয়া উঠিতেছে, এই উপায়ে তাহার সুষ্ঠ সমাধান হইবে। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, বাস্তবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং যুগধর্ম্মকে উপযুক্ত মর্য্যাদাদান করিয়া পল্লীসংস্কারের কণ্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হওয়াই প্রশস্ত পন্থা। বিরাট দেশ ভারতবর্ষ। অপরাজেয় তাহার প্রাণশক্তি। ভারতের এই প্রাণশক্তি নিহিত আছে সাত লক্ষ গ্রামে। সহস্র ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও ভারত যে তাহার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে এতদিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার কারণ তাহার গ্রামগুলি ভারতের সনাতন আদর্শকে আজও আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। ভারতের সেই প্রাণশক্তি নিহিত আছে তার আধ্যাত্মিকতার মধ্যে আর সেই আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠাভূমি ভারতের সাত লক্ষ গ্রাম।

ভারতের সেই প্রাণ-শক্তির কথা বলিতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

It is the same India which has withstood the shocks of centuries, of hundreds of foreign invasions, of hundreds of upheavals of manners and customs. It is the same land which stands firmer than any rock in the world, with its undying vigour, indestructible life. Its life is of same nature as the soul without beginning and without end, immortal and we are children of such a country."

উপসংহারে এ কথাই বলিতে চাই যে, ভারতের এই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য রক্ষা পাইয়াছিল গ্রাম-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহার ভবিষ্যৎও উজ্জ্বলতর হইবে গ্রামসংগঠনের সাফল্যে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আজকের দিনে গ্রামকে যান্ত্রিক সভ্যতার ছোঁয়াচ হইতে মুক্ত রাখা সম্ভব নহে। তাই ভারতের জাতীয় আদর্শকে ভিত্তি করিয়া যান্ত্রিক সভ্যতার সমন্বয়ে ভারতের সাত লক্ষ গ্রামকে নূতন ভাবে যুগোপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। যুগধর্ম্মকে অস্বীকার করিয়া, বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া, আজ আর দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হইতে পারে না। ভারতের সাত লক্ষ গ্রামকে প্রাণবন্ত, আনন্দময়, কর্ম্মময় ও আকর্ষণীয় করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন সরকারী প্রচেষ্টা এবং সরকারী তত্ত্বাবধানের সহিত দেশের যুবক সম্প্রদায়ের কর্ম্মশক্তির সমন্বয়।

জাগর

শ্রীঅরুণা দেবী

নীলগগনে সঞ্চরিতে প্রাণ-মরাল যে জাগল,
ইন্দ্রধনুবর্ণশোভা-স্বপ্ন চোখে লাগল!
শৃঙ্খল তার পড়ল টুটে,
ধরল সে রং পর্ণপুটে,
মর্ম্মে তাহার স্বর্ণরবি 'মুক্তিছবি' আঁকল।

সোনার অলির গুঞ্জরণে কমল-হিয়া দুলল!
'জাগর' গেয়ে দ্বার খোলে দল আনন্দে উৎফুল্ল!
সুপ্ত প্রাণে জাগল এষা,
লাগল বিকাশনের নেশা,
পঙ্ক ছেড়ে পঙ্কজিনী আলোয় নয়ন তুলল।

অন্ধকারের অন্তরে যে শঙ্কা জেগে উঠল!
পাষাণপুরে রাজদুলালীর তন্দ্রা বুঝি টুটল?
কোন আলোকের পেয়ে সাড়া
বন্দীরা সব ভাঙ্গে কারা,
ছিঁড়ল বাঁধন, খুলল আগল, দীপ্ত প্রাণে ছুটল!

বজ্রপাণি আপনি যে আজ দিগ্বিজয়ে নামল,
পাষাণ-হৃদি চূর্ণ-করা বজ্র অমোঘ হানল!
পথ জুড়ে আর দাঁড়াবে তার
শক্তি এমন আছেরে কার?
মরাতঙ্ক আর মুক্ত কৃপাণ দু'ই সে হাতে আমল!

প্রাচীন বাংলা-কাব্যে কুটীরশিল্প

শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

বাংলার এমন এক দিন ছিল যখন এই দেশ কৃষিশিল্প ও বাণিজ্যে উৎকর্ষলাভ করিয়া সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বাংলার প্রাচীন কাব্যগুলি আলোচনা করিলে এখানকার বহু কুটীরশিল্পের সন্ধান আমরা পাই। এই সকল শিল্পদ্রব্যের কোন কোনটি হয়ত বা একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কোন কোনটি হয়ত যন্ত্রশিল্পের প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যেও কোন রকমে টিকিয়া আছে। প্রাচীন বাংলায় যে সকল কুটীরজাত শিল্পসামগ্রী বিশেষ আদরের বস্তু ছিল আজ তাহাদের সবগুলি বাংলার আধুনিক রুচিসম্পন্ন নরনারীর মনোরঞ্জন না-ও করিতে পারে, কিন্তু বাংলার প্রাচীন কাব্যগুলির মধ্যে তৎকালপ্রচলিত যে সকল শিল্পদ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাহাতে সেই যুগের নরনারীর রুচির পরিচয় আমরা মোটামুটি পাইয়া থাকি।

আজিকার এই দুর্দ্দিনেও আমাদের কৃষিশিল্পজাত পণ্যের পরিমাণ বড় কম নহে। কিন্তু বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় কুটীরশিল্প লুপ্তপ্রায়। জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাওয়ায় কৃষির উন্নতিও বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে।

মোগলসম্রাট্ আকবরের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যে জমির উৎপাদিকা-শক্তি কি পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে তাহা আইন-ই-আকবরীতে লিখিত তথ্যের সহিত বর্ত্তমান কালের তথ্যের তুলনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি। তখনকার দিনে বিঘাপ্রতি ১০ মণ ধান্য জন্মিত। ১৮৭০ সনে উহা ৮।৯ মণে দাঁড়ায়। সরকারী সংবাদ হইতে জানা যায়, বর্ত্তমানে উহা ৫।৬ মণে দাঁড়াইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দী হইতে আমাদের শিল্পবাণিজ্যের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এমন এক দিন ছিল যখন বাংলার কুটীরশিল্প পুরুষানুক্রমে জাতি বা শ্রেণীবিশেষের দ্বারা কুটীরেই পরিচালিত হইত। যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার শক্তি তাহার ছিল না। তা ছাড়া বিদেশী শিল্পের প্রসারের জন্যও প্রবল চেষ্টা চলিয়াছিল। আমাদের নিজস্ব প্রাচীন শিল্প এরূপ প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারিল না।

গত ৩০।৪০ বৎসরে আমাদের দেশে বিভিন্ন শিল্পের যে উন্নতি ও প্রসার হইয়াছে তাহা অনেকটা আশাপ্রদ। বর্ত্তমানে শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে আমাদের মন সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি বহু লোক এখনও শুধু গতানুগতিক অভ্যাসবশেই বিদেশী পণ্য কিনিয়া থাকেন। বর্ত্তমান যুগে বাংলার কুটীরশিল্প আমাদের সর্ব্ববিধ দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইবে না বটে, কিন্তু যন্ত্রশিল্প কুটীরশিল্পের বিকাশের পরিপন্থী বলিয়া মনে হয় না। পাশাপাশি উভয় শিল্পেরই উন্নতি সাধিত হওয়া আবশ্যক। প্রাচীন বাংলার কুটীরশিল্পের মোটামুটি যেটুকু পরিচয় এখানে দেওয়া যাইতেছে তাহাতে জনসাধারণের মনে দেশীয় শিল্প ও পণ্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিবে বলিয়া আশা করি। প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী-কৃত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য হইতে তৎকালীন বাংলার কুটীরশিল্পের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল :—

চাঁদোয়া—প্রাচীন বাংলায় চাঁদোয়ার বহুল প্রচলন ছিল, এখনও আছে। চণ্ডীকাব্যে কবিকঙ্কণ হরগৌরীর বিবাহ-প্রসঙ্গে এই চাঁদোয়ার উল্লেখ করিয়াছেন—

"মণিমুকুতার ছান্দা উপরে টাঙায় 'চান্দা'
চৌদিকেতে দীপমালা।"

দোলা—প্রাচীন বাংলায় মেয়েদের যাতায়াতের জন্য দোলাই প্রধান যান ছিল। আজকাল পল্লী অঞ্চলে এখনও কিছু কিছু দোলার প্রচলন দেখা যায়। বাউরীসম্প্রদায়ের লোকেরাই এই দোলা নির্ম্মাণ-কার্য্যে সুপটু ছিল। বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে বরকন্যার দোলায় গমন ছিল তখনকার দিনের প্রথা। পঞ্জিকায় দেখিতে পাই দুর্গাদেবীও কোন কোন বৎসর দোলায় আগমন করেন এবং দোলায় চড়িয়াই চলিয়া যান। কবিকঙ্কণ কালকেতুর বিবাহ-উপলক্ষে এই দোলার উল্লেখ করিয়াছেন—

"গমনের শুভ বেলা বাউরী জোগায় দোলা
তথি বীর কৈলা আরোহণ।"

পাটের শাড়ী—কবিকঙ্কণের যুগে পাটের শাড়ীর যথেষ্ট সমাদর দেখা যায়। বর্ত্তমান কালে বাংলাদেশ-জাত পাট হইতে জাপানী ব্যবসায়ীরা যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর কাপড় তৈরি করিয়া থাকে তাহা অপেক্ষা প্রাচীন বাংলার পাটের শাড়ীর বয়নদৈপুণ্য ও শোভা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল এবং তাহা অনেক বেশী টেকসই হইত। অভয়া ও কালকেতুর কথোপকথন-প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ পাটের শাড়ীর কথা যেরূপ উল্লেখ করিতেছেন তাহা এই—

"হুকারে ছিঁড়িয়া দড়ি পরিয়া পাটের শাড়ী
ষোল বৎসরের হইল রামা।"

কাঁচলী—প্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থে বহু স্থলে কঞ্চুলির (কাঁচলীর) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলেও কাঁচলীর বর্ণনা আছে। ভগবতীর কাঁচলী পরিধান-প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ বলেন—

"পরি নানা আভরণে অবশেষে পড়ে মনে
হৃদয়ে কাঁচলী আচ্ছাদন।
মনে করি ভগবতী কাঁচলী নির্ম্মাণে মতি
কৈল বিশ্বকর্ম্মার স্মরণ॥"

কেশজাল—চুল আচ্ছাদনের আবরণী-বিশেষ। প্রাচীন বাংলায় নারীদের মধ্যে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার ছিল, এখনও শহরে এবং পল্লীতেও ইহার প্রচলন কিছু কিছু পরিদৃষ্ট হয়। ইহা বিলাসিনী রমণীকুলের বিশেষ প্রিয় মস্তকাবরণ।

ফুল্লরার বেশভূষা-প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন—

"বিধি কুতূহলী সুস্থির বিজলী
আনিলেক কেশজালে।"

মেটে পাথর—প্রাচীন বাংলায় ইহার খুব প্রচলন ছিল। বর্ত্তমানে কাঁচ, এনামেল, এলুমিনিয়াম্, চীনামাটি প্রভৃতি বাসনপত্রাদির সহিত প্রতিযোগিতায় বঙ্গের মৃৎশিল্প ও কাংস্য-শিল্প হটিয়া যাইতেছে। অধিকাংশ লোহার জিনিষ যন্ত্রে তৈরি হইয়া সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয় বলিয়া কর্ম্মকারগণ কর্ম্ম-হীন হইতে বসিয়াছে। প্রাচীন বাংলার মেটে পাথর সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ খুল্লনার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

"কত বা ভুগিব আমি নিজ কর্ম্মফল।
মাটিয়া পাথর ভিন্ন ছিল না সম্বল॥
অনল সমান পোড়ে চইতের খরা।
চালু সেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা॥"

চুবড়ি, পাটী—বর্ত্তমানে আমাদের দেশে জাপান ও সিঙ্গাপুর হইতে পাটী প্রভূত পরিমাণে আমদানী হইতেছে। খেজুর-পাতা ও তালপাতার পাটীরও বিশেষ প্রচলন আছে। শীতলপাটীর প্রয়োজনীয়তা গ্রীষ্মকালেই অধিক অনুভূত হইয়া থাকে। প্রাচীন বাংলার পাটীর প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ বলেন—

"পসরা চুবড়ি পাটী লইল ফুল্লরা।
চলিলেন গোলাহাটে তুলিয়া পসরা॥"

সিন্দুক—ইহা কাঠ অথবা লোহা দ্বারা তৈরি হয়। সেকালে অনেক গৃহস্থঘরে ইহা বিরাজ করিত। বর্ত্তমানে সাধারণতঃ অবস্থাপন্ন লোকের ঘরেই ইহা দেখা যায়। টিন, ষ্টীল (ইস্পাত) প্রভৃতির প্রচলনে কাঠের আদর কমিয়া গিয়াছে। কবিকঙ্কণ বলিতেছেন—

"সিন্দুক হইতে বেণে গুণে দেয় টাকা।
অকপটে দিল ধন না হইল বাঁকা॥"

ছালা—শণ ও পাটের থলিয়াকে ছালা বলে। এখনও পল্লী-অঞ্চলে এই শিল্প অব্যাহত রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই শিল্পে এখন ধীরে ধীরে অবাঙালীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বাংলায় ছালার প্রচলন সম্পর্কে কবি বলিতেছেন—

"সত্বরে পৌছিল সবে বণিকের বাড়ি।
ছালায় ভরিল সবে উমানিয়া আড়ি॥"

গো-শকট—ইহা প্রাচীন বাংলার একটি নিজস্ব যান। গোযান-নির্ম্মাণে তিন শ্রেণীর লোক লাভবান হইত। প্রথমতঃ কাঠের মালিক, দ্বিতীয়তঃ মিস্ত্রী, তৃতীয়তঃ কর্ম্মকার। গো-যান সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন—

"বলদ শকটে বহি আইল নিকেতন।"

ইট বা ইষ্টক—এদেশের বহু লোক এই ইষ্টক-শিল্পের দৌলতে জীবিকা অর্জ্জন করে। অবশ্য টালি, লোহার সরঞ্জাম প্রভৃতির ব্যবসাদিও বিদেশীর হাতে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইট তৈরির কাজে দেশীয় মজুরেরা ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যায় নিয়োজিত হইতেছে। প্রাচীন বাংলার ইষ্টকনির্ম্মাণ-প্রসঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকার বলিতেছেন—

"কাষ্ঠ আনে ভার বোঝা কুম্ভারে পোড়ায় পাঁজা
তাহে ইট করয়ে নির্ম্মাণ।"

কম্বল—প্রাচীন বাংলার অধিবাসীদের কম্বলের জন্য বিদেশীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আছে—

"ভাঁড় কম্বলে বসি মুখে মন্দ মন্দ হাসি
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া।"

অধুনা বাঁকুড়ার কম্বল বাংলার গৌরবের বস্তু।

ঢেঁকি, কুলা—ইহা বাংলার সম্পূর্ণ নিজস্ব শিল্প-বিশেষ। বহু অনাথা বিধবা ও নিরন্ন শ্রমিক ঢেঁকিতে ধান ভাঙিয়া ও কুলা তৈরি করিয়া দিন গুজরান করে। এ সম্বন্ধে কবি বলেন—

"হাল বলদ দিবা খুড়া দিবা হে বিছন পুড়া
ভাণ্ডা খাইতে ঢেঁকি কুলা দিবা।"

টুপী ও ইজার—মুসলমান-রাজত্বকালে বাংলায় টুপী ও ইজারের বহুল প্রচলন হইয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এগুলির কথা নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনায় পাওয়া যায়—

"না ছাড়ে আপন পথে দশরেখা টুপী মাথে
ইজার পরল দৃঢ় করি।"

টোপর—বর্ত্তমানে বাংলাদেশে এই শিল্প দেশী লোকের হাতেই রহিয়াছে। জলজ উদ্ভিদ সোলা হইতেই ইহা তৈরি হয়। বাংলায় সোলা হইতে টোপর ছাড়া টুপী, চাঁদমালা, পাখা, ফুল ইত্যাদি কয়েকটি মাত্র জিনিষ তৈরি হইতেছে। কিন্তু ইহা দ্বারা আরও নানাবিধ জিনিষ তৈরি হইতে পারে। টোপর হিন্দুদের বিবাহ, পূজা, অন্নপ্রাশন ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম্মে ব্যবহৃত হয়। এ প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ বলেন—

"আপনি টোপর নিয়া বসিলা গাঁয়ের মিঞা।"

প্রাচীন যুগে বাংলায় সাধারণতঃ জোলা মুসলমানরাই এই টোপর নির্ম্মাণে পটু ছিল।

কাগজ ও পট—এই দুইটি জিনিষ প্রাচীন বাংলার বিশিষ্ট শিল্প। 'কাগজী'-সম্প্রদায়ই ইহা নির্ম্মাণের প্রায় একচেটিয়া অধিকারী ছিল। কবিকঙ্কণের কাব্যে পাওয়া যায়—

"পট বেচিয়া কেহ ফিরয়ে নগরে
কাগজ কুটিয়া নাম ধরাল্য কাগজী।"

জর্জ্জর (জর্জ্জেট ?) ধুতি—কবিকঙ্কণ এই ধুতির সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"পরিয়া জর্জ্জর ধুতি, কাঁখে করি নানা পুঁথি
গুজরাটে বৈদ্যগণ ফিরে।"

ভুণী ও খাদি ধুতী—মহাত্মা গান্ধী নূতন করিয়া খদ্দর আবিষ্কার ও প্রচলন করেন নাই; তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশে ইহার ব্যবহার ছিল। এই প্রসঙ্গে চণ্ডী-কাব্যে পাওয়া যায়—

"শত শত এক যায় গুজরাটে তন্তুবায়
ভুণী ধুতী খাদি বুনে গড়া।"

চিনি—প্রাচীন যুগে চিনির কারখানা সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ বলেন—

"মোদক প্রধান রাণা করে চিনি কারখানা
খণ্ড লাড়ু করয়ে নির্ম্মাণ।"

কাঁসার বাসন—ইহা প্রাচীন বাংলার গৌরবময় শিল্প-সম্পদ-বিশেষ। যুগধর্ম্মের কল্যাণে বর্ত্তমানে কাঁসার বাসনের কদর কমিয়া গিয়াছে। তাই আজ বাংলার কাঁসারিদের অন্ন জুটিতেছে না। কিন্তু একদা এই শিল্প এদেশে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। গুজরাট নগরের বর্ণনায় এক স্থানে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন—

"কাঁসারি পাতিয়া শাল গড়ে ঝারি খুরী থাল
ঘটি বাটি বড় হাঁড়ি সীপ
সাঁপুরী চুনাতি বাটা নির্ম্মায় ধাগর ঘণ্টা
সিংহাসন গড়ে পঞ্চদীপ।"

ঘানিগাছের তেল—প্রাচীন বাংলার লোকেরা শেয়াল-কাঁটা, সজনে ছাল, লঙ্কামরিচ ইত্যাদি ভেজালমিশ্রিত কলের তেল খাইয়া বেরি-বেরিতে ভুগিয়া স্বাস্থ্য-সম্পদটি চিরকালের মত খোয়াইত না। তখন খাঁটি সরিষার তেল সস্তাদরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। এ সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ বলেন—

"নগরে নগরে কলুরা পাতে ঘানি।"

অন্যান্য কুটীরশিল্পের উল্লেখও চণ্ডীকাব্যে দেখিতে পাই—

"মোজা পাশ আর জিন, নিরমরে অণুদিন
চামার বসিলা একভিতে।
বয়নী চালুনী ঝাঁটা ডোম গড়ে টোকা ছাতা
জীবিকার হেতু একচিতে।"

এই সমস্ত শিল্পসম্পদের উপর আগেকার দিনে যেরূপ লৌকিক বা জাতিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল যদি তাহা বজায় থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় বর্ত্তমান বেকার-সমস্যা এত উৎকট আকার ধারণ করিত না।

শাঁখার চুড়ি—শাঁখা পরা হিন্দুরমণীর এয়োতির লক্ষণ। প্রাচীন বাংলায় নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত সুচিক্কণ শাঁখা শঙ্খ-শিল্পীদের গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছিল। তন্মধ্যে ঢাকাই-শাঁখা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও শ্রেষ্ঠস্থানীয়। অদ্যাবধি দেশের শাঁখারীদের হাতে এই শিল্পের সুনাম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইন্দ্রের নর্ত্তকী রত্নমালার প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন—

"পরি দিব্য পাটশাড়ী রতনখচিত চুড়ি
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।"

খুল্লনার রূপবর্ণনায়ও কবি বলিতেছেন—

"গলে শতেশ্বরী হার শোভে নানা অলঙ্কার
করে শঙ্খ শোভে তাড়বালা।"

পাটের দোলা—হিন্দোলা। পাটের দড়িদ্বারা ইহা বয়ন করা হয়। বঙ্গের নানাস্থানে গরীব মজুরেরা হিন্দোলা বুনিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। শিশুদিগকে নিরাপদে রাখিবার ও ঘুম পাড়াইবার পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। কবিকঙ্কণ পাটের দোলা সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"ছাড়িয়া পাটের দোলা একে একে করে খেলা
পড়ে খসি ভূষণ অম্বর।"

পিঞ্জর—লোহার খাঁচা—পক্ষীদিগকে আবদ্ধ রাখিবার আধার-বিশেষ। পাখীর খাঁচা তৈরি করিয়া আজও শিল্পীরা বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়া থাকে। ধনপতি সদাগরের গৌড়রাজ্যে গমন-প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ বলেন—

"পিঞ্জর আনিতে সাধু চলিলা সত্বরে।
প্রথম প্রবাস তার মজলিশপুরে॥"

চিরুণী—ইহা বঙ্গললনাদের কেশ-বিন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য্য উপাদান-বিশেষ। পুরুষেরাও ইহাদ্বারা কেশ-সংস্কার করিয়া থাকেন। ইহা হাড়, গালা ও কাঠের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানে এই শিল্পের প্রতিষ্ঠায় বাঙালীরা বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। বর্ত্তমানে যশোহরের চিরুণীই বিশেষ বিখ্যাত। খুল্লনার প্রসাধন-প্রসঙ্গে পাওয়া যায়—

"করেতে চিরুণী ধরি কুন্তল মার্জ্জন করি
অঙ্গে দেয় ভূষণ চন্দন।"

খাট, মশারি—প্রাচীন বাংলার দারুশিল্প একদা যে মোগল-সম্রাটগণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খাটের চারিধারের বিচিত্র কারুকার্য্য শিল্পীদের শিল্পকুশলতার পরিচায়ক। আজিকার দিনেও খাট তৈরি করিয়া বহু লোক অন্নসংস্থান করিতেছে। দুঃখের বিষয় এই শিল্পও ক্রমশঃ অবাঙালীর হাতে চলিয়া যাইতেছে। মশারির কাপড় তৈরি করিয়া দেশের তাঁতি ও জোলাগণ এখনও জীবিকা নির্ব্বাহ

করিতেছে। কবিকঙ্কণ প্রাচীন বাংলার খাট ও মশারির প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"খট্টায় পরিয়া তুলি টাঙায় মশারি জালি
শয়ন করয়ে শশিকলা ॥"

তসরের শাড়ী—প্রাচীন বাংলায় তসরশিল্পের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। অদ্যাবধি তসরশিল্প বাংলার শিল্পক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। খুল্লনার বেশভূষা-প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ বলেন—

"দোছোটি করিয়া পরে তসরের শাড়ি।"

মেঘডম্বর কাপড়—সেকালের বসনভূষণ ইত্যাদির নামকরণ বেশ কবিত্বপূর্ণ। মেঘডম্বর সুন্দর, সুশোভন, সুচিক্কণ ও সুচিত্রিত বসন-বিশেষ। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আছে—

"বাছিয়া পরিল মেঘডম্বর কাপড়।"

বাটি, গাড়ু, ঘটি ইত্যাদি—কাচ, এনামেল প্রভৃতি জিনিষ আমদানীর ফলে এই শিল্পের চাহিদা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। শয়ন-মন্দিরে দুর্ব্বলার শয্যারচনা-প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ বলেন—

"দুইদিকে থালবাটি জল পুরি গাড়ু ঘটি
দুইদিকে রাখে দুই পাখা।"

বাটা—পাত্রবিশেষ। ইহা কাঠ, তামা, কাঁসা ইত্যাদি দ্বারা তৈরি হয়। প্রাচীন বাংলায় ইহার যথেষ্ট প্রচলন ছিল; অধুনা পল্লীর কোন কোন গৃহেও দৃষ্ট হয়। চণ্ডীকাব্যে পাওয়া যায়—

(খুল্লনার) "হাতে তাম্বুলের বাটা সুবাসিত জল।"

অন্যত্র পাওয়া যায়—"কুঙ্কুম চন্দন চুয়া দেয় বাটা ভরি।"

পট্টবস্ত্র—পূজাপার্ব্বণ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে হিন্দুরা এই বসন পরিয়া থাকেন। পট্টবস্ত্রশিল্প বাংলার শুধু যে গৌরবের জিনিষ তাহা নহে, উহা বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়ও বটে। ঢাকা, ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর প্রভৃতি অঞ্চলের বস্ত্রশিল্পী এবং বস্ত্রব্যবসায়ীরা ইহার কল্যাণে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। পট্টবস্ত্রের প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম বলিতেছেন—

"লোহিত পট্টবাসে পরি পতিপাশে
বসিল সুন্দরী খুল্লনা।"

ঐ কাব্যে অন্যত্র পাওয়া যায়—

"পট্টবস্ত্র পরিধানে রামা হইল শুচি।"

ডিঙা—নৌকাবিশেষ। নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া অধুনা বাংলার বহু শিল্পী অন্নসংস্থান করিতেছে। ইদানীং চীনা মিস্ত্রীরাও নৌকা নির্ম্মাণে অগ্রসর হইয়াছে। নৌকানির্ম্মাণ-শিল্পে প্রাচীন বাংলার শিল্পীদের কৃতিত্বের কথা মুসলমান নৃপতিগণ বহুবার স্বীকার করিয়াছেন। চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর, বিহারী দত্ত প্রভৃতি বণিকের সপ্তডিঙা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। ডিঙা বহুবিধ। ইহাদের নামকরণেও বিশেষত্ব আছে। কবিকঙ্কণে পাওয়া যায়—

"প্রথমে তুলিল ডিঙা নামে মধুকর।
সুবর্ণে নির্ম্মাণ তার ধুর্ব্বকীর ঘর ॥"

আকন্দ-তুলাজাত পোশাক—আকন্দ বনজ উদ্ভিদ। ইহার তুলা হইতে বিবিধ পোশাক তৈরি হয়। প্রাচীন বাংলার আকন্দ-তুলাজাত পোশাকাদি বহুল পরিমাণে বাহিরে রপ্তানী হইত। ধনপতি সদাগরের বাণিজ্য-যাত্রাকালে বিনিময়-দ্রব্যের বর্ণনায় মুকুন্দরাম বলিতেছেন—

"আকন্দ বদলে মাকন্দ পরাব
কাচের বদলে নীলা।"

প্রাচীন বাংলায় কাচশিল্পেরও যে প্রচলন ছিল উপরিউক্ত ছত্রদ্বয় হইতে তাহাও প্রমাণিত হইতেছে।

মোজা—প্রাচীন বাংলায় মোজা তৈরি ও ব্যবহারের বিশেষ রেওয়াজ ছিল। অধুনা বহু শিল্পী ও শিক্ষিত ব্যক্তি এই শিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করিতেছেন। চণ্ডীকাব্যে দেখি সিংহল যাইবার পথে ধনপতি সদাগরের পূর্ব্ববঙ্গীয় নাবিকগণ মোজা পরিধান করিয়াছিল :—

"জুয়ার ভাঁটা বুঝিয়া লোহার বাড় দিল।
পায়ে মোজা দিয়া তারা কড়িবন্দী কৈল ॥"

তাম্বু—ইহা বস্ত্রশিল্পের উৎকর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ধনপতি সদাগরের সিংহল যাওয়ার পর—

"খাটায়া তাম্বুঘর বসিলা সদাগর
পরিসর নদীর কূলে।"

ছাতা—এই শিল্পে প্রাচীন বঙ্গ কোনদিনই অনগ্রসর ছিল না। অদ্যাবধি এই শিল্পটি দেশীয় শিল্পীদের হাতেই রহিয়াছে এবং দেশীয় উপকরণেই এদেশের ছাতা তৈরি হইতেছে। বর্ত্তমানে আমরা বিলাতি ছাতার ফ্যাসান দেখিয়া বিস্মিত হই, কিন্তু প্রাচীন বাংলার কারুকার্য্যখচিত ছত্রসমূহ ছিল নয়নাভিরাম। এই সমস্ত ছত্র বিদেশী রাজাদিগকেও উপহার দেওয়া যাইত। সিংহলের রাজাকে ধনপতি সদাগর যে ভেট দিতেছেন, সেই প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ বলেন—

"আতপত্রে শোভে রাঙা ডাটি।
এক শত পঞ্চাশ ভোট কম্বল গড়াবাস
ময়ূর পাখার গঙ্গাজলি পাটি।"

সাঙলি গামছা—ইহা বস্ত্রশিল্পের অন্তর্গত। ইহাও উপহার দিবার জিনিষ। সুশীলার বার-মাস্যার বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন,

"সাঙলী গামছা দিব সুগন্ধী কস্তুরী।
মশা নিবারিতে দিব পাটের মশারি ॥"

বর্ত্তমানে আমাদের কুটীরশিল্পের উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের রুচির পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। বিদেশীয় দ্রব্যের বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ না হইয়া স্বদেশের দ্রব্য-

গুলিই সর্ব্বাগ্রে ক্রয় করা উচিত, দ্বিতীয়ত: অধিক মূল্য হইলেও স্বদেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে। ইহাতে দেশীয় শিল্পীরা উৎসাহিত হইবে এবং তাহারা শিল্পগুলির উন্নতিবিধানে অধিকতর মনোযোগী হইবে। ইহাতে তাহাদের মধ্যে আবার নবপ্রেরণার সঞ্চার হইবে, ফলে বাংলার বিলুপ্তপ্রায় কুটীর-শিল্পের পুনরুজ্জীবন হইবে।

দেশের ও সমাজের আর্থিক অবস্থার সাম্যবিধান করিতে হইলে কুটীরশিল্পের উন্নতি একান্ত আবশ্যক। যন্ত্রের দৌলতে ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠানবিশেষ ধনী হইয়া উঠে, আর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে নিপীড়িত হইতে থাকে। কিন্তু কুটীরশিল্প অর্থকে এক স্থানে রাশীকৃত না করিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়। উহা সকলের পক্ষেই পরিশ্রমদ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের পথ সুগম করিয়া দেয়।

১৯৪৯ সনের ডিসেম্বরের 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় যুক্তপ্রদেশের কুটীরশিল্প-উন্নয়নের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রবাসীর (পৌষ, ১৩৫৬) বিবিধ প্রসঙ্গেও এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। কুটীরশিল্পের উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা পশ্চাতে পড়িয়া আছে তাহার প্রমাণ বর্ত্তমানে নানা দিক দিয়া পাওয়া যাইতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে, ভারতবর্ষে ২১৬টি কলকারখানা বন্ধ হওয়ায় প্রায় ৭৫০০০ লোক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। যদি ভারত-সরকার ও সমস্ত প্রাদেশিক সরকার একযোগে কুটীরশিল্পের উন্নতিবিধানে মনোযোগী হন তবে তাহা আমাদের দেশে বেকার-সমস্যার সমাধানে বিশেষভাবে সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আকাশ ও নীড়

শ্রীকরুণাময় বসু

আমারে ডেকেছ কেন হৃদয়ের বালুবেলা-তটে,
এখনো রেখেছ বুঝি এতটুকু স্মৃতির সঞ্চয় ;
নারিকেল-কুঞ্জবন বায়ুস্রোতে চমকিয়া ওঠে,
বকুল ফুলের গন্ধ গুঞ্জরিছে শূন্য বনময়।
দিগন্তরে সূর্য অস্ত : দিন গেল, ঝরা পাতাগুলি
উদ্‌ভ্রান্ত স্বপ্নের মতো উড়ে যায় বিস্মৃতির দেশে ;
মৌমাছির নীল পাখা সন্ধ্যালোকে উঠেছে ব্যাকুলি,
চামেলি নিশ্বাসি বলে—'বিদায় নিলাম দিনশেষে'।
কতদিন ভেবেছিনু সত্য তুমি ভালোবাস মোরে ?
অথবা মায়ার খেলা, খেলাশেষে ফেলে যাবে চলে ;
কতদূর দেশান্তরে, অনাদৃত আমি র'বো পড়ে
লজ্জিত বেদনাতুর ; দিন যাবে ম্লান অশ্রুজলে।
আমারে বেঁধ না আর অতি সূক্ষ্ম স্মৃতির সুতায়,
তোমার প্রেমের চেয়ে এ পৃথিবী বৃহৎ উদার ;
অনেক বেদনা আছে, অশ্রু আছে মায়া-মুকুতায়,
সোনালী-স্বপ্নের চেয়ে থাক মোর রৌদ্রের বিস্তার।
নীড়ে-ফেরা পাখী তুমি মোরে কেন খুঁজিছ বৃথায় ?
আকাশের ডাক শুনি, ওগো নীড়, বিদায় বিদায়।

তবু

শ্রীঅধীর দাস

তুমি চলে গেছ সুদূর পথের শেষে
আমার চোখের দৃষ্টি যেথায় লীন।
তুমি আছ সেথা কোন্ অপরূপ বেশে ?
তোমার স্মৃতিরা আমার মনেতে ক্ষীণ।

তবুও তোমার সে সজল দুটি আঁখি
আমার মনের গোপনে রয়েছে আঁকা
তোমাকে হারাতে এখনো অনেক বাকি।
নীলিম নভেতে আধখানি চাঁদ বাঁকা।

তোমার সে চোখ আমার হৃদয়ে জাগে
নীলাকাশে জাগা রূপালি চাঁদের মতো।
তোমার চোখের ভাষায় দোলন লাগে
শয়নে স্বপনে হৃদয়েতে অবিরত।

তবুও তোমার সজল চোখের তারা
জানি না কখন পলকে হইবে হারা।

বিহারী সরকার

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শুনিয়াছি পৈতৃক আমলে আমরা বড় জোতদারই ছিলাম, কিন্তু বর্ত্তমানে জোতের মুনাফা মাত্র হাজার তিনেক টাকা, তৎসহ দেড় শত বিঘা খামার জমি আছে। আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামে আমরা তাই জমিদারের সম্মানই পাইয়া আসিতেছি—সাধারণে আমাদের বাড়ীকে 'বাবুদের বাড়ী'ই বলিত।

যাত্রা, রামায়ণ, ভাসান গান আমাদের মণ্ডপের সম্মুখেই হইত এবং আগেকার আমল হইতে আনুষঙ্গিক গ্রাম্য বিলাস-ব্যসনের ক্ষেত্র ছিল আমাদেরই মণ্ডপ।

আদায় তহশীল এবং খামার তদারক করিবার জন্য একজন সরকার ও একজন মুনসবদার চিরকালই ছিল—সরকার যেটি আসে সেটিই চোর, কেহবা ডাকাত—কাজেই গত তিন বৎসরে তিন জন সরকারকে জবাব দিতে হইয়াছে—এবার বৈশাখ মাস হইতে নূতন সরকার নিযুক্ত করিলাম। নাম তাহার বিহারী সরকার। ক্ষুদ্র পরিশ্রমী দেহ, মাথায় বিজ্ঞজনসুলভ একটা টাক, বয়স ৪৫ বৎসর হইবে কিন্তু দেহটা এখনও বেশ কার্য্যক্ষম। দাড়ি গোঁফ কামানো, একটা ফতুয়া ও উড়ানি তাহার সরকারী মাহাত্ম্য প্রচার করে—চোখ দুটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু অসম্ভব উজ্জ্বল। ফতুয়ার পকেটে বাঁধানো একখানা নোট বই এবং কানে ক্ষুদ্র একটু পেন্সিল, আর হাতে একটা সহস্র তালিযুক্ত ছাতি।

আসিয়াই সে পদধূলি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বলিলাম, বসুন—

—আজ্ঞে "আপনি আজ্ঞে" বললে বড় লজ্জা পাই, আপনার অনুগ্রহে—বিহারী থামিল। একটু ঢোক গিলিয়া কহিল, আপনার নিমক খেয়ে পেটেভাতে থাকতে চাই—

···ও আপনি, সরকারীর জন্যে এসেছেন—

—আজ্ঞে, হাঁ, হুজুর—

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পাশের গ্রামের মজুমদারদিগের বাড়ীতে সে দশ বছর কাজ করিয়াছে এবং দত্তদের বাড়ীতেও প্রায় দশ বৎসর। এত দীর্ঘদিন একই বাড়ীতে সরকারী করাটা কথঞ্চিৎ সততার প্রমাণ। লোকটি চতুর ও বুদ্ধিমান বলিয়া মনে হইল—কহিলাম, কত মাইনে চান—অবশ্য এখানেই খাবেন থাকবেন, বছরে চারখানা কাপড় ও দু'খানা গামছা পাবেন।

বিহারী একগাল হাসিয়া কহিল, হুজুর আপনার হুকুমে খুন হতে পারি, খুন করতে পারি—মাইনেটা আর আমি কি বলবো ?

—তবুও একটা কিছু বলবে ত!

—আজ্ঞে না, এ পাপমুখে হুজুরের কথায় উপর কথা বলতে পারবো না, কাজ করি যা উচিত মনে হয় দেবেন—

—দশ টাকা পাবে—কেমন ?

—আজ্ঞে হাঁ। যা দেবেন—আপনি মা-বাপ, বটবৃক্ষ, আমরা গরু ছাগলের মত তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি।

বিহারী সেইদিন হইতেই কাজে বহাল হইয়া গেল।

•

বেলা প্রহরেকের সময় পাড়ায় ঘুরিতে যাওয়া আমার স্বভাব। এখানে ওখানে রক-বৈঠকে পরনিন্দা পরচর্চ্চা ও গ্রাম্য রাজনীতি করিয়া যখন ফিরিলাম তখন বেলা দ্বিপ্রহর। বাড়ীর দিকে চাহিতেই বুঝিলাম অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সামনের বিরাট উঠানে কঞ্চি, বাঁশের টুকরা, খড় প্রভৃতিতে জঞ্জাল হইয়া ছিল তাহা পরিষ্কার হইয়াছে, বাড়ীটার শ্রী ফিরিয়াছে। বৈঠকখানায় ফরাস খাতাপত্র সুন্দর গোছানো, ভিতরবাড়ীর আঙ্গিনা পরিষ্কার।

বিহারী ভিতরবাড়ীর রকের কোণে বসিয়া মুড়ি নারিকেল খাইতেছে—অনেক পরিশ্রম করিয়াছে তাহা বোঝা যাইতেছে। প্রশ্ন করিলাম, এসব পরিষ্কার করলে কে ?

বিহারী কোন জবাব না দিয়া ঘটি হইতে ঢক্ ঢক্ করিয়া জল পান করিতে লাগিল। জবাব দিলেন গৃহিণী—সরকার মশাই বলাইকে নিয়ে করলেন। বলাইকে বলে বলে ত হয়রাণ হলাম—এক দিনে বাড়ীর চেহারা ফিরে গেছে—

—বিহারী, আমি কিন্তু এ সব করতে তোমাকে বলি নি, সরকারকে দিয়ে এসব করানো আমাদের অভ্যাস নয়—

বিহারী চর্ব্বিত মুড়ী গিলিয়া কহিল, আমি এসব নোংরা দেখতে পারি নে হুজুর—ওটা আমার দোষ। হে হে করিয়া ক্ষণিক হাসিয়া লইয়া কহিল, যেখানে থাকি সেখানটাকেই নিজের বাড়ী মনে করে ফেলি, তা নইলে কি থাকা যায়!

বিহারীর কাজে খুশী হইয়াছিলাম তাই বলিলাম, বেশ সে ভাল, কিন্তু বদনাম দেবে না যেন যে ভদ্রলোকের ছেলেকে দিয়ে এসব করিয়েছি।

বিহারী জিভ কাটিয়া কহিল, হুজুর এ কি বললেন! আমি করেছি, আপনি ত বলেন নি। মা ঠাকরুন একটু তেল দেন, ডুব দিয়ে আসি—

গৃহিণী তেল দিয়া কহিলেন, ওঁর দেরি আছে, তুমি চান করে খেয়ে নাও—

—তাও কি হয় মা! হুজুর না খেলে আমরা খাবো—

—আমার বেলা হবে—

—হোক, আমি ত জলপান খেয়ে নিয়েছি হুজুর।

বিহারী দুপুরেও ঘুমাইল না—খাতাপত্র দেখিয়া কি সব নোট করিল এবং বৈকালে নক্সা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। কহিল, হুজুর, খামার জমিগুলো চিনে আসি—এই নিকট মাঠে, কাল দিগর মাঠে যাব।

বিহারী সত্যই কাজের লোক, দুই-তিন মাসের মধ্যে সম্পত্তির কোথায় কি আছে সব নখদর্পণে করিয়া ফেলিল। এমন কি, এই আষাঢ় মাসেও তাহার আদায় চলিতে লাগিল।

বিহারী কোথায় যেন বাহির হইতেছিল, কহিলাম, কোথায় যাও বিহারী।

বিহারী কহিল, হুজুর বিলমাঠে, আউশ ধান প্রায় হয়ে এল, আর মাঠান্ বললেন, ফেরবার পথে তাই হাট হয়ে আসব—

—টাকা নিয়েছ?

—আজ্ঞে সরকারী তহবিলে ছিল তাই নিয়েই যাচ্ছি আপাততঃ—

—না না, ও টাকা সংসার খরচে দিও না—

—আজ্ঞে না, আপনি ঘুমুচ্ছিলেন তাই।

সন্ধ্যার পর বিহারী হাট হইতে ফিরিয়া ফর্দ দিল। ফর্দমাফিক টাকা দিয়া দিব, কিন্তু মাছের দামটা অত্যন্ত সস্তা মনে হইল। ছ' আনায় ছ'কুড়ি কই মাছ—আষাঢ় মাসে! কহিলাম, মাছের দাম কত বিহারী?

—হুজুর ছ'আনা।

—ভুল করনি ত?

—আজ্ঞে না হুজুর—ভুল হলে কি কাজ করতে পারি হুজুর! ওটার মাঝেও কটি মাছ চুরি করেছি।

—সে কি?

—বিলে জেলেরা আমাদের এক জমিতে বাঁশ পুঁতেছে তাই ধরলুম। আদায় করলুম এককুড়ি আর এককুড়ি ছ' আনায় কিনলুম—আর সরকারী বাবদ আধকুড়ি। সে দশটি ভ্যাবলার হাতে দিয়ে এলাম হাটে—

—ভ্যাবলা কে?

—আজ্ঞে আমারই ছেলে, হাটে এসেছে। পয়সা নেই হাটের, চার আনার তরিতরকারী কিনে ঐ দশটা মাছ চুরি করে দিয়ে এলাম হুজুর!

—দিয়েছ বেশ করেছ। চুরি ত নয়, ও তোমার পাওনা—

বিহারী কথা কহিল না। আপন মনে কাগজপত্র দেখিতে লাগিল। বাহিরে বৃষ্টি হইতেছে, আজ সান্ধ্য আড্ডা জমে নাই। সে মাঝে মাঝে জমি-জমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছিল, আমি ভাবিয়া ভাবিয়া দেখিলাম, লোকটা সম্ভবতঃ বিশ্বাসযোগ্য। আজ সে ইচ্ছা করিলেই কিছু লইতে পারিত, লয় নাই—কিন্তু এ জাতকে বিশ্বাস করা কঠিন। বলিলাম, মজুমদারদের কাজ ছাড়লে কেন বিহারী?

বিহারী কানে কলম গুঁজিয়া কহিল, অনেক কথা হুজুর। বুড়ো কর্ত্তা মারা গেলেন, ছোকরা বাবুরা কর্ত্তা হলেন। জমিদারীর কাজ বোঝেন না, আর বার কর্ত্তা বার রকমের হুকুম। দেখলাম এখানকার অন্ন উঠেছে—আজ হোক কাল হোক চোর বদনাম হবেই—সরকারকে কে আর বিশ্বাস করে! আর যখন তাঁরা বোঝেন না—মোকদ্দমায় খরচাপত্র ঘুষ এ সব ধারণাই নেই তখন চোর হতে কতক্ষণ, তাই ছেড়ে দিলুম—বুড়ো মাঠাকরুন বললেন, কিন্তু আপনাকে বাঁচাতে হবে ত!

আউশ ধানের 'বতর' চলিতেছে—

মাঠেই ধান মাড়াই করিবার 'খোলা' হয়। সমস্ত ধান সেখানে মাড়াই হয়—তাহার পর দুইভাগে ভাগ হইয়া বর্গাদার তাহার অংশ লইয়া যায় এবং মালিকের অংশ ঘোড়ায় বাড়ীতে আসে। প্রকৃতপক্ষে মাসাবধি দিনরাত সেখানেই থাকিতে হয়। বিহারী, মনসবদার, চাকর বলাই সকলেই কর্ম্মব্যস্ত—খাইবার সময় নাই। এইরূপই চিরকাল হয়।

বিহারী সেদিন তৃতীয় প্রহরে আসিয়া তাড়াতাড়ি স্নানাহার শেষ করিয়া আবার ছাতা লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে। বাস্তবিকই লোকটি অমানুষিক পরিশ্রমী। দয়া হইয়াছিল, কহিলাম, একটু জিরিয়ে যাও বিহারী, এখনই চললে—একটু বিশ্রাম কর—

বিহারী কহিল, হুজুর, আমার আর বিশ্রাম। আমাকে বিশ্রাম নিতে হলে আপনাকে আর বিশ্রাম দেওয়া যায় না।

—সে কি?

—আজ্ঞে যদি নির্ভয়ে বলতে অনুমতি দেন—

—বল না—

—আপনি যদি একটু 'খোলা'য় যান তবেই বিশ্রাম করতে পারি? কি যে হয়—কি যে চলছে—

—কেন?

কাউকে বিশ্বাস নেই, যে যেখান থেকে পারছে নিচ্ছে—'মলনে'র তলা থেকে ধান উধাও হচ্ছে—আপনি মাঝে মাঝে—পাপমুখে বলা ঠিক নয়।

—চিরকালই হয়, আমি কি বসে থাকতে পারি ওখানে!

—তবে হুজুর, আমি বিশ্রাম করি কি করে?

বিহারী দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

তিনটি ঘোড়ায় রোজ ধান বহন করিয়া আনে—পর্য্যায়-ক্রমে। সাদা ঘোড়াটি আসে দ্বিতীয় বারে, কিন্তু সেদিন

গোলমাল দেখিয়া, সাদা ঘোড়ার চালককে প্রশ্ন করিলাম—তোমার কয় ক্ষেপ হল ?

—তিন ক্ষেপ—

—না, দু ক্ষেপ।

—এখানে দুটো—আর বিলের ওপারে সরকার মশায়ের বাড়ীতে এককেপ—

—সরকার মশায়ের বাড়ীতে !

—আজ্ঞে হঁ্যা।

ব্যাপারটা সন্দেহজনক—বিহারীর কিছু ধান প্রাপ্য বটে, কিন্তু তাহা ত বাড়ী হইতে সে পায়। বলাই চাকরটি পুরাতন তবে বুদ্ধিটা তাহার তীক্ষ্ণ নয়, সন্ধ্যার সময় সে ফিরিয়া আসিল—মনে হইল কি যেন বলিবে। তাহাকে প্রশ্ন করিতেই সে কহিল, কি আর বলব বাবু, এতদিন যারা সব সরকার ছিল তারা চোর আর আপনার ই বিহারী ডাকাত।

—বল কি ?

—রোজই এক ঘোড়া করে ধান বাড়ী পাঠাচ্ছে, আমরা বারণ করলে গ্রাহ্যই করে না বরং উল্টে তাড়া দেয়। বলে তুই চাকর, যা বলছি কর। বাবুর ধানের খবরদারি করতে হবে না ! কি বলব ?

সে যাহাই হোক, বিহারী রাত্রে ফিরিল। আহারাদির পরে জিজ্ঞাসা করিতেই কহিল, হঁ্যা হুজুর এক ঘোড়া বাড়ীতে পাঠিয়েছি। ভ্যাবলা এসে বললে, বাড়ীতে সব উপোসী, খোলা ছেড়ে নড়তে পারিনে, তাই পাঠালুম। ওটা হিসেবে কাটিয়ে দেব—আমার নামে খরচ লিখেছি হুজুর।

বিহারী নোট বইখানা খুলিয়া দেখাইল—সত্যই তাহার নামে তিন মণ ধান সে লিখিয়া রাখিয়াছে। সন্দেহটা একটু প্রশমিত হইল। প্রশ্ন করিলাম, চিঁড়ের ধান পাঠালে চিঁড়ে ত এল না—

—আসে নি ? কারও কথার ঠিক নেই। কালই যাবো—দেখি কেমন ভারানী সব—

—খোলা ছেড়ে যাবে ?

—ওই ফাঁকে যাবো দেখি—

রাত্রে গৃহিণীকে সব কথা বলিলাম, তিনি কহিলেন, লোকটাকে আমার কিন্তু সন্দেহ হয় না। আর সকলেই ত চোর তবে যদি কম চুরি করে সেই লাভ। বুঝিলাম কথাটা গৃহিণীর মনঃপূত হয় নাই। তিনি পুনরায় বলিলেন, যার অসুবিধে হবে সেই লাগানি, ভাঙানি করবে।

কথাটা যুক্তিযুক্ত, নানা জন নানা স্বার্থে এরূপ বলিয়া থাকে। যাহা হোক মোট হিসাব-নিকাশ করিলেই বুঝা যাইবে।

বলাইকে ভারানী-বাড়ীতে যাইতে বলিয়াছিলাম—সে দ্বিপ্রহরে যে সংবাদ আনিল তাহা সাংঘাতিক—যে ধান দেওয়া হইয়াছিল তাহার চিঁড়া বহু দিন পূর্ব্বে সরকারমশাই বাড়ী লইয়া গিয়াছেন এবং আজ সকালে পুনরায় ধান দিয়াছেন তাহার চিঁড়া পরশু পাওয়া যাইবে।

লোকটা সাংঘাতিক, এত বড় নেমকহারাম এবং অবিশ্বাসী, আমার চিঁড়া নির্ব্বিবাদে বাড়ী লইয়া গিয়াছে অথচ কেমন বলিল, চিঁড়ে আসে নি ?

রাগে আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। মনে হইল তাহার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ সবই সত্য। আজ তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে চুরি করিলে তাহার জবাব হওয়া অনিবার্য্য।

উত্তেজিত হইয়াই ছিলাম। বেলা প্রায় তিনটায় বিহারী শুষ্কমুখে অত্যন্ত ক্লান্ত ভাবে ফিরিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে মনে ঠিক করিলাম, এখন আর কিছু বলিব না, আহারাদি করিয়া সুস্থ হইলে একবার ভাল করিয়াই শুনাইব।

সে সোজা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে প্রশ্ন করিলাম—এত বেলা কেন ? বিহারী প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া আমার পায়ের কাছে মাটিতে বসিয়া কহিল, হুজুর আমি ভয়ানক অপরাধ করেছি, আমার কান মলে দিন—

—কেন ? কান মলবো কেন বিহারী ?

—আগে মলে দিন তার পরে বলব।

—সে কি বলছ ? তুমি বুড়ো মানুষ—

—কান না মললে ভুল সংশোধন হয় না। আপনি আচ্ছা করে টেনে দিন তার পরে বলছি।—সে নিজেই তাহার কান ধরিয়া টানিয়া টানিবার প্রণালীটা দেখাইয়া দিল।

আমিই লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। বলিলাম, কি হয়েছে ?

—হুজুর সে আর কি বলব। ভারানীকে বললুম বাড়ী পাঠিয়ে দিতে, সে আমার বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। এটুকু জ্ঞান হ'ল না, আমরা চার কাঠা ধানের চিঁড়ে একসঙ্গে করেছি কখনও, ছুটে বাড়ীতে গিয়ে দেখি হা'ভাতে ছেলেমেয়েগুলো শালিধানের চিঁড়ে পেয়ে পরমানন্দে খেয়ে বসে আছে—তাইত দেরি হ'ল হুজুর। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—কান মলে দিন হুজুর, আমারই জবানের দোষে—

মনে মনে বুঝিলাম সব বাজে কথা, কিন্তু কি আর বলিব ! বলিলাম, যাও এখন খেয়ে নাও, আর তোমার ছেলেমেয়ে যদি আমার চিঁড়ে ক'টা খেয়েই থাকে, তাতে কি আর বলব। তারাও ত আমারই পোষ্য।

বিহারী একগাল হাসিয়া কহিল, হুজুরেরি ত পোষ্য, আপনার খেয়েই তারা আছে, থাকবে—আপনার জুতো বইতেই ত তাদের জন্ম হুজুর—

—যাও, স্নান আহার কর—

বিহারী হৃষ্টমনে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, একেই বলে

বড়লোক, আমরা হলে চার কাঠা ধানের মাথায় মারামারি করতুম—হুজুর মা-বাপ—

এবার ধান ভালই হইয়াছিল—হিসাব নিকাশ করিয়া দেখা গেল ধান গড়ে অন্যান্য বার হইতে কিছু কমই পাইয়াছি। বিহারী প্রচুর ধান বাড়ীতে পাঠাইয়াছে তাহার প্রমাণও পাইয়াছি, কিন্তু লোকটি চিঁড়ের ব্যাপারের মত এমন এক একটা কাণ্ড করিয়া বসে যে কিছুই বলিতে পারি না—জানি ও ডাকাত, মিথ্যাবাদী, কিন্তু তাহাকে ছাড়াইয়া দিব একথা কিছুতেই মুখ দিয়া বাহির করিতে পারি না। লোকটি যেমন নির্লজ্জ, তেমনি চতুর, তেমনি বেইমান—অথচ তাহাকে কোন শাস্তি দেওয়া যায় না।

অন্দরে সে এমন একটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার যো নাই। গৃহিণী অমনি বলেন—তোমার সন্দেহ বাই।

গৃহিণীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া এবং তাহার পিত্রালয়ের অশেষ কল্পিত খ্যাতির কথা গল্প করিয়া সে একেবারে তাহার আপনজন হইয়া উঠিয়াছে। সময় পাইলেই সে বাড়ীর ভিতরে তাহার নানা ফাই-ফরমাশ খাটিয়া, অন্দরের উঠান পরিষ্কার করিয়া এবং গৃহিণীর রান্নার সুখ্যাতি করিয়া বেশ আসর জমাইয়া বসিয়া গিয়াছে। যে সমস্ত তীক্ষ্ণ বাণ সে ছাড়িয়াছে তাহা অব্যর্থ—আমি জানিয়া-শুনিয়াই বিহারীর নিকট বোকা হইয়া আছি।

কিছুদিন চলিয়া গেল—ঘটনাও কিছু কিছু ঘটিল, কিন্তু সে রকম মারাত্মক কিছু নয়। পূজার পরে দেশে কৃষ্ণযাত্রার একটি দল আসিল—গ্রামের লোকের কাছে এটা একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, আমাদের গ্রামে ছ'পালা দেবার জল্পনা-কল্পনাও হইতে লাগিল—এমন সময় বিহারী এক দিন দ্বিপ্রহরে করজোড়ে কহিল, হুজুর আপনি মা-বাপ। একটা নিবেদন করতে চাই—আব্দার উপরোধ আপনাকে না করলে আর কাকেই বা করব—

—কি ব্যাপার—

—হুজুর গ্রামে কালরাত্রে কেষ্টযাত্রা হবে—আমারই উঠানে। তাই আপনার সামিয়ানাটা যদি দেন তবে—

—দিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু মানুষের নেওয়ার সময় গরজটা যে পরিমাণ থাকে দেওয়ার সময় তেমন থাকে না—ছিঁড়ে টুটে—

বিহারী কহিল—গায়ের রক্ত হুজুর।

—গায়ের রক্ত!

—হ্যাঁ, গায়ের রক্ত দেব হুজুর, কিন্তু একটু সুতো ছিঁড়বে না। আমার বাড়ীতে আমার হেফাজতে থাকবে—পরশু সকালে সঙ্গে করে নিয়ে আসব।

তবে নিয়ে যেও—

বিহারী সামিয়ানা লইয়া গিয়াছে—

দিন পনর বাদে উৎকৃষ্টতর আর একটি কেষ্টযাত্রার দল আসিয়া পড়িল, এবং গ্রামস্থ উৎসাহী ভক্তগণ গানের বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন—দিনস্থিরও হইয়া গেল। কথাটা যেদিন ঠিক হইল সেইদিন সামিয়ানার কথা মনে পড়িল, বিহারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

বিহারী মাথা চুলকাইয়া কহিল, হুজুর সেদিন বাড়ী গেলাম, কিন্তু লোক পাই নি তাই আনতে পারি নি।

—সে জানি, যেদিন নিয়েছিলে সেদিন লোকের অভাব হয় নি—

—আজ্ঞে হ্যাঁ তাই ত হয়। গানের দিনে সতরঞ্চি মাদুর ভূতে জোগায়, পরের দিন দিয়ে আসবার বেলায় একটি লোকও নেই—হুজুর আমি কালই নিয়ে আসব—

—হ্যাঁ গান ত মঙ্গলবার রাত্রে শুনলে--

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

আজ মঙ্গলবার গানের দিন।

বিহারী সকালেই সামিয়ানা আনিতে বাড়ী চলিয়া গেল, অন্যান্য ব্যবস্থা সব সে নিজেই করিয়া গেল। আসরের স্থান, মেয়েদের জায়গা ঘেরা, সতরঞ্চি মাদুর জোগাড়, সামিয়ানার বাঁশ পোঁতা সমস্তই বেলা দশটার মধ্যে শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অপরাহ্ণ—ক্রমে সন্ধ্যা হয়, কিন্তু বিহারীর দেখা নাই। শ্রোতৃবর্গ ইতিমধ্যেই জড়ো হইতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু আচ্ছাদনটি আসিল না! বে-আক্কেল বিহারীর উদ্দেশ্যে গালা-গালি করিতে করিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলাম—পাড়ার লোক এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া ছোট ছোট কয়েকটি চাঁদোয়া সংগ্রহ করিল, যদি বিহারী না আসে তবে ব্যবস্থা করিবে।

বিহারী সত্যই আসিল না—রাত্রি আটটায় কতকগুলি চাঁদোয়া ও পালের কাপড় টানাইয়া গান সুরু হইল। মনটা বিহারীর কথা চিন্তা করিয়া উত্তেজিত হইয়াই ছিল—এত বড় দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক কি থাকে? যেমন নেমকহারাম তেমনি পাজি—

গৃহিণী কহিলেন, শুধু শুধু রাগ করো কেন? একটা বিপদ-আপদ ত হতে পারে। গানের জন্যে লোকে ত প্রাণ দিতে পারে না!

হঠাৎ মনে হইল হইতেও পারে বা! তাহা না হইলে

যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া গেল সে সামিয়ানা আনিল না, এটা সম্ভব নয়।

পরদিন বৈকালে বিহারী আসিল। দ্বিপ্রহরে নিদ্রান্তে বৈঠকখানা ঘরে যাইয়া দেখি বিহারী দরজার পাশে ঘাড়ে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি ফরাসে বসিতেই সে আমার একখানা জুতা তুলিয়া কহিল, হুজুর আমার মাথায় জুতো মারুন—মারুন হুজুর, আমি যা করেছি এক শ' ঘা মারুন হুজুর।

জুতা মারিতে বলিলেই মারা যায় না। আমি বিরক্তির সঙ্গে কহিলাম, এমন কাজ বার বার কর কেন?

বিহারী ঘাড় ফিরাইতে যাইয়া উহুহু করিয়া ঘাড় চাপিয়া ধরিল। ধীরে ধীরে কহিল, হুজুর, লোক না পেয়েই নিজেই মাথায় করে আনছিলাম, দায়-ঠেকা করি কি? কিন্তু ঘাড়ে এমন চোট লাগলো খেয়াঘাটে যে ভিরমী খেয়ে পড়ে গেলাম—তারপর কাড়কুল মালিশ করে আজ কোনমতে এসেছি হুজুর—

বিহারী যে ভাবে ঘাড়ে হাত দিয়া কথাটা কহিল, তাহাতে বিশ্বাস না হইল এমন নয়—ভদ্রলোকের ছেলে এক মণ বোঝা আনিবে কি করিয়া!

—সামিয়ানাটা কোথায়—

—ঘাটের উপর কুণ্ডুদের দোকানে রেখে এসেছি।

—তুমি ঘাড়ে করতে গেলে কেন?

—উপায় কি, এদিকে জাত যাওয়া কাণ্ড হয়—

গৃহিণী শুনিয়া কহিলেন, তোমার ভয়ে ভদ্রলোকের ছেলে বোঝা বইতে পর্য্যন্ত গেছে আহাহা—খুব লেগেছে বিহারী।

—আজ্ঞে লেগেছিল মা, কিন্তু এখন আর তেমন নেই, এই ঘাড় ফেরাতে লাগে।

কয়েকদিন পরে গানের শ্রোতৃবর্গের নিকটা সংবাদ পাইলাম আমার সামিয়ানা গ্রাম গ্রামান্তরে ভাড়া খাটিয়া ফিরিতেছে। বিহারীকে প্রশ্ন করিব ভাবিতেছি এমন সময় আমাদের বহুকালের বর্গাদার তমিজুদ্দি আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল, হুজুর আমার একটা আরজি আছে!

—কি বল?

—সব জমিই যদি ছাড়িয়ে নিলেন তবে আর ও দশ কাঠা রাখলেন কেন? ওটাও ছাড়িয়ে দিন হুজুর, বাপের আমল থেকে সম্পর্ক আপনাদের সঙ্গে, গেছে ত একেবারেই যাক্—

—কে জমি ছাড়ালে?

—আপনার সরকার। মুখের উপরেই বলি, ককিলের কাছে পাঁচ টাকা খেয়ে তাকে বিলের চার বিঘের দাগ উনি দিয়েছেন—

—বিহারী, তমিজের জমি ছাড়িয়েছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—কেন?

—বিহারী অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে কহিল—সঙ্গত মনে করলাম।

—আমার সামনে এমনি উত্তর দিতে বিহারীকে কোনদিন শুনি নাই। বলিলাম, আচ্ছা তমিজ, আমি দেখছি কি ব্যাপার, পরশু এস।

তমিজ চলিয়া গেলে কহিলাম, পাঁচ টাকা খেয়ে জমি ছাড়িয়েছ—পুরাতন বর্গাদার?

—হুজুর, জমি ছাড়ালে সরকারের নামে কে আর বদনাম না দেয়। একদিন চলুন, জমির অবস্থাটা দেখুন—এক হাঁটু ঘাস। ধানের পড়তা কম পড়লে সরকার চোর, জমি হাতবদল হলে সরকার ঘুষ খায়। ককিলের জমিগুলি ঝক্‌মক্ করছে—তার হিসেব দেখুন হুজুর—এই বিঘেতে ১৬ মণ দিয়েছে—

—কিন্তু—

—তা যদি বলেন হুজুর, তবে জমি এক্ষুনি ফিরিয়ে দি—কিন্তু নুন খেয়ে নেমকহারামি করতে পারবো না। আপনি চলুন কাল—জমিটা দেখুন—

কিন্তু তমিজুদ্দি এত বড় মিথ্যাকথা বলিবে তাহাও বিশ্বাস হয় না। ভাবিতেছিলাম—

হঠাৎ একটা লোক বারান্দায় ধপ করিয়া সামিয়ানাটা ফেলিয়া, ট্যাঁক হইতে একটা রোকা ও দুইটি টাকা বাহির করিয়া দিল। রোকাটি পড়িয়া আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল—লেখা আছে, সামিয়ানা পাঠাইলাম, ভাড়া বাবদ দুই টাকা লোকমারফত দিয়া দিয়াছি।

লোকটিকে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলাম, বিহারী আমার সামিয়ানাটা এই এক মাস ভাড়া খাটিয়ে কত পেলে?

—বলেন কি হুজুর! আপনাদের জিনিষ ভাড়া খাটিয়ে আপনাদের এত বড় বংশে কলঙ্ক দেব!

রোকা ও টাকাটা ফেলিয়া দিয়া বলিলাম, এটা কি তবে?

বিহারী রোকা পড়িয়া সহাস্যে কহিল, ঠিকই হুজুর।

—হাঁ, ভাড়া দেওয়াও ঠিক, ঘুষ নিয়ে জমি বর্গা দেওয়াও ঠিক, ধান চুরিও ঠিক—সবই ঠিক! কিন্তু তোমাকে ভাল বলে জানতুম—

বিহারী পুনরায় হাসিয়া কহিল, সরকার জাতটাই ভাল হয় না হুজুর, আমিও নয়, তবে মনিবের খাই না। ওই বোস বাবুদের বাড়ীতে গানের দিনে লোক পাঠালে আমি দেব না সামিয়ানা, তারাও ছাড়বে না। শেষে ভাবলুম ভাড়া চাইলে ফিরে যাবে—তাও ফিরলে না। শেষে দিতেই হ'ল, কিন্তু সত্যিই ভাড়া দেবে ভাবি নি, আচ্ছা টাকা আমি ফিরিয়ে দেব হুজুর।

—হ্যাঁ, তোমার সবই বিশ্বাস করলুম। কল্যাণপুর, শ্রীপুর, মদনপুর ঘুরে সামিয়ানা এসেছে একেবারে বিনা ভাড়ায় ?

বিহারী উঠিয়া আসিয়া আমার পা স্পর্শ করিয়া কহিল, হুজুর আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি পিতৃতুল্য, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি হুজুর। এতে আমার অপরাধ নেই, নিজের কথায় নিজে ঠকে গেছি—আপনি জুতো মারুন হুজুর কিন্তু বদনাম দিয়ে তাড়াবেন না।

আমি রাগতঃ ভাবে কহিলাম, তুমি চুরি কর না, যুধিষ্ঠির ?

—আজ্ঞে না, করি—কিন্তু আপনার নয়। প্রজা খাতক বর্গাদারের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে, এটা ওটা করে দু'পয়সা খাই—

—এর পর থেকে ভাল ভাবে না চললে তোমাকে তাড়াতেই হবে।

—তাড়াবেন হুজুর, কিন্তু পরের কথায় তাড়াবেন না, নিজে চোখে দেখে জুতো মেরে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে, চুণ-কালি মাখিয়ে তাড়িয়ে দেবেন। প্রণাম করে যাব—

আজ লোকটিকে জবাব দিবই ঠিক করিয়াছিলাম, কিন্তু কি যেন দুর্ব্বলতায় পারিলাম না—বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলাম।

মেয়েটি বড় হইয়াছে, পাত্রস্থ করিতে হইবে। কন্যা দেখিবার জন্য বরপক্ষীয় কয়েকজন কুটুম্ব আসিয়াছেন। বিহারীকে টাকা দিয়া হাটে পাঠাইলাম, বলিলাম সকাল সকাল একটু ভাল মাছ নিয়ে এস, ইলিশ হ'লেই ভাল, ওঁরা উত্তর-বঙ্গের লোক।

বিহারী ফর্দ লিখিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, রাত্রিও হইল, বিহারীর দেখা নাই। নূতন কুটুম্বের নিকট একেবারে বেকুব বনিতে হইবে। ঘরে আর এমন কি থাকিতে পারে। গ্রামস্থ একটি লোক কিছু তরকারি দিয়া গেল। প্রশ্নে যাহা জানা গেল তাহা এই যে বিহারী তাহাকে দিয়া এ ক'টি জিনিষ পাঠাইয়া দিয়াছে এবং দুইটি ইলিশ মাছ হাতে করিয়া সে বাড়ীর রাস্তায় গিয়াছে।

আর নয়, এমনি করিয়া আর চলে না। গৃহিণীকে সবই বলিলাম, তিনিও বলিলেন, এমন করে আর পারা যায় না, ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা, নতুন কুটুম্ব কি রাঁধব এখন !

স্থির করিলাম, বিহারীর আর মুখদর্শন করিব না, এবার আসিলেই তাড়াইয়া দিব। কুটুম্বগণ পর দিন চলিয়া গেলেন, কিন্তু বিহারী নিরুদ্দেশ।

তিন দিন পরে বিহারী আসিয়া তাহার পুরাতন প্রথামত পা জড়াইয়া ধরিয়া মাথায় শতেক জুতা মারিতে অনুরোধ করিল। আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, তুমি দূর হও, তোমার মুখদর্শন করতে চাই না। কি লজ্জা, নতুন কুটুমের কাছে! এমন ভুলও হয়—

বিহারী নতমুখে কহিল, ভুল নয় হুজুর—মাথাই খারাপ হয়েছিল।

গৃহিণী দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—সম্ভবতঃ আমার চীৎকারে। তিনি বলিলেন, কিন্তু নতুন কুটুম্বের কাছে এমন বেকুবিও করে মানুষ—

বিহারী নতনেত্রে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আপনি মা, মা কি জিনিষ! চোখ তুলিতেই দেখিলাম বিহারীর চোখে জল—চেহারাটা উস্কখুস্ক।

বিহারী চোখের জল ছাড়িয়া কহিল, হাটের উপর সংবাদ পেলাম, মায়ের কলেরা—দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান হারালুম, মাছ দুটো হাতে আছে জ্ঞান নেই, বাড়ী যেয়ে দেখলুম বেঁচে আছে তাই খেয়াল হ'ল মাছ নিয়ে এসেছি—

গৃহিণী কহিলেন, বেঁচে আছেন ত !

—আপনার আশীর্ব্বাদে মা, তিন দিন যমেমানুষে টানা-টানি—কাল কোনমতে একটু উঠেছেন! হুজুর আমার কলঙ্ক ছিল কপালে তাই—

গৃহিণী কহিলেন, এমন বিপদে মানুষ কি ঠিক থাকে!

আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই, আমি কহিলাম, মাছ দুটোর কথা খেয়ালই হ'ল না—

গৃহিণী রুক্ষস্বরে কহিলেন, তা কি থাকে! সেবার তুমি যে ন্যাংটো হয়ে ছুটেছিলে, ভোলা যেবার জামগাছ থেকে পড়ে গেল। এস বিহারী, বেচারীর মুখ শুকিয়ে গেছে—জল খেয়ে নেবে এস।

মামলা একতরফাই ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল।

তিন দিন পরে বিহারী সকালে কোথায় গিয়াছিল।

একটি বছর পনর বয়সের ছেলে বৈঠকখানায় উকিঝুঁকি মারিতেছে দেখিয়া তাহাকে ডাকিলাম। বিহারীর ছেলে ভ্যাবলা—

তাহাকে নানারূপ জেরা করিয়া জানিলাম, বিহারীর মাতা আজ বিশ বৎসর আগে গত হইয়াছেন, সেদিন রাত্রে দুইটি ইলিশ মৎস্যসহযোগে বিহারী-পরিবার সানন্দে নৈশ-ভোজন শেষ করিয়াছে এবং বিহারী নগদ চারি টাকায় দুইটি ইলিশ মাছ কিনিয়া ভ্যাবলার মায়ের নিকট দম্ভ প্রকাশ করিয়াছে।

ভ্যাবলাকে বিদায় করিয়া গৃহিণীকে সবই জানাইলাম এবং বলিলাম বিহারীকে ধুলাপায়েই বিদায় করিয়া দিবে। অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবেই পাড়ায় বাহির হইয়া গেলাম।

দ্বিপ্রহরে ফিরিয়া বাড়ীর ভিতর সংবাদ লইতে গিয়া পিত্ত

জলিয়া গেল, বিহারী রান্নাঘরের দাওয়ায় ঠ্যাং ঝুলাইয়া বসিয়া মুড়ি নারিকেল গুড় সহযোগে ভোজন করিতেছে।

তীক্ষ্ণস্বরে ডাকিলাম, বিহারী!

গৃহিণী রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া জবাব দিলেন, তুমি কি শুনতে কি শুনেছ গো?

—তুমিও ত শুনেছ।

—যার মা আজ কুড়ি বছর মারা গেছেন তার নামে কেউ মিছে কথা বলতে পারে! সে যত বড় মিথ্যুকই হোক্—

—তবে কলেরাটা হ'ল কার?

—ওর পরিবারের, ভ্যাবলার মার কথাই ত বলেছে ও। ভ্যাবলা ভ্যাবলাই—বদ্ধ পাগল, তার কথা শুনে তুমি তার বাপকে অবিশ্বাস করছ।

—হ্যাঁ বিহারী, যুধিষ্ঠির—সব সত্যি বলেছে বৈ কি?

—পরিবারের অসুখের কথা কি কেউ মনিবের সামনে বলতে পারে? ভ্যাবলার মার কথা বলেছে। ধান শুনতে কান শুনেছ—

—তুমিও ত শুনেছিলে—

—শুনেছিলামই ত! বুড়োকালে পরিবার মরা যে কি তা জানে ওই মুখপোড়া, তুমিও বুঝবে—

আমি নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলাম। গৃহিণী বলিলেন, সে যাই হোক্ এ ব্যাপারে বিহারীর ত কোন দোষ নেই—ওকে কিছু বলতে পাবে না।

আমি চলিয়া আসিলাম। বিহারী উদাসদৃষ্টিতে চাহিয়া পরম নিশ্চিন্তে মুরি নারিকেল চিবাইতেছে—যেন কিছুই হয় নাই—

আশ্চর্য্য! বিহারীকে আজও ছাড়াইতে পারি নাই।

তখন আসিও তুমি

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

গোধূলির শেষে পশ্চিমে যবে মিলাবে আবির-লেপ,
গুটি গুটি এসে তারকা-বধূরা সলাজ ঘোমটা টানি'
নীল-অঙ্গনে করিবে তাদের মধুর চরণ-ক্ষেপ;
মৃদুল পবনে অঙ্গে খসিবে দুকূল বসনখানি—
একেলা তখন যবে নিমগ্ন সে-রূপ ধেয়ানে আমি
হে প্রিয়া আসিও ধীরে অভিসারে—আসিও চিত্তে নামি'।

দ্বিতীয়ার বাঁকা চাঁদখানি যবে উঁকি দিবে তরুশিরে,
বাদুড় ফিরিবে আপন কুলায় আকাশের পথ বাহি,
বুনোহাঁস-ঝাঁক ভাসিবে গাঁথিয়া বলাকার মালাটিরে;
আর সে সন্ধ্যা তারাটি হাসিবে ধরণীর পানে চাহি'—
দিন-শেষ-ক্ষণ মধুর যখন—আনে রাত-মৌসুমী,
তখন আসিও ওগো নিরুপমা, তখন আসিও তুমি!

মল্লিকা-বধূ মালতী-সখীরে জানাবে সম্ভাষণ,
প্রতিটি কথার সুবাস-মদিরা-লহরী তুলিবে ঝড়—
আর তাই লয়ে বক্ষে বিভল বহিবে তো সমীরণ,
রাত্রি নামিবে কৃষ্ণ অলকে ঢাকি' ধরা-অম্বর;—
যবে মোর মন করিবে ভ্রমণ সুদূর কল্পভূমি
তখন অধরা দিও এসে ধরা—তখন আসিও তুমি।

তাজমহল

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

স্মৃতির পসরা নিয়া মর্ম্মরের শুভ্র মর্ম্মমাঝ
শ্যাম যমুনার তীরে অপরূপ স্নিগ্ধ সুষমায়,
চলিয়াছে বিরহীর বাণীরূপ স্বপ্ন-সৌধ তাজ
প্রেমের স্বাক্ষর বহি নিরুত্তর কালের ছায়ায়।

প্রণয়ের অঙ্গীকার রূপ পেল মর্ম্মর-পাষাণে।
লেখা হ'ল ক্রৌঞ্চ-মিথুনের চঞ্চু-পরিচয় ভাষা।
বাসনা তরঙ্গি উঠে আজো শূন্যে ছন্দে, গন্ধে, গানে।
আজো মুকুলিত দু'টি হৃদয়ের মিলন-তিয়াষা

জানি জানি মিলায়েছে সে দিনের সে কলগুঞ্জন।
নীরব নূপুরধ্বনি, নহবৎ বাজে না ত আর।
ফোটে ফুল, ঝরে যায়, ঝিঁ ঝিঁ ছিঁড়ে তিমির গুণ্ঠন।
প্রতিধ্বনি কেঁদে ফিরে মহলে মহলে বার বার।

বিদেশী হরিয়া নেছে কত না স্মারক অঙ্গুরীয়।
অপূর্ব পাষাণ-পুষ্প রিক্ততায় তবু শোভনীয়।

হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণ—মার্চ্চ ১৮৭৫। মধ্যস্থলে কুমারী একরয়েড উপবিষ্টা

হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় ও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

আমরা আজকাল বাংলার স্ত্রীশিক্ষার কথা আলোচনা করি। বঙ্গে ইদানীং নারীর উচ্চশিক্ষার যে আয়োজন চলিতেছে তাহার মূল সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ধারণা থাকা আবশ্যক। কেশবচন্দ্র সেন স্বীয় শিক্ষয়িত্রী ও বয়স্থা বিদ্যালয়ে ইহার গোড়া-পত্তন করেন। বিবাহিতা ও কুমারী নির্ব্বিশেষে নারীজাতির মধ্যে উচ্চশিক্ষার বহুল প্রচলন যে হইতে পারে তাহার উপায় প্রদর্শিত হয় হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় এবং ইহার আত্মজ বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় দ্বারা। আজিকার আলোচনায় এই কথাই বিশেষ করিয়া পরিস্ফুট হইবে।

১। হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়

কেশবচন্দ্র ১৮৭০ সনে কয়েক মাসের জন্য বিলাত গমন করেন। ভারতবর্ষে নারীজাতির শিক্ষাহীনতা এবং ইউরোপীয় মহিলাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি সেখানে একাধিক বক্তৃতা দেন। ব্রিষ্টলে কুমারী মেরী কার্পেণ্টার ভারতীয় নারীকুলের উন্নতির জন্য নেশন্যাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামে যে সভা গঠন করেন, কেশবচন্দ্র তাহার একজন প্রধান সহায়ক ছিলেন, পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে বলিয়াছি। তাঁহার বক্তৃতাদিতে বহু ইংরেজ মহিলা এদেশে আগমনান্তর শিক্ষা-বিস্তারে মনোনিবেশ করিতে অভিলাষী হন। কেশবচন্দ্র বক্তৃতার মধ্যে একটি কথার উপর বিশেষ জোর দিতেন—কেহ যেন ধর্ম্মপ্রচারের ছল করিয়া শিক্ষা প্রচারোদ্দেশে এদেশে না আসেন। তাহা হইলে পূর্ব্বে যেমন হইয়াছে, আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যাইবে। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাবলী অষ্টবিংশতি বর্ষীয়া জনৈকা কুমারী ইংরেজ মহিলার মনে ধরিল। তিনি কেশবচন্দ্রের প্রথম দিককার বক্তৃতা শুনেন নাই। বিলাত-ত্যাগের অল্পকাল পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে এই মহিলার আলাপ-পরিচয় হয়। ১৮৭০ সনের ১২ই সেপ্টেম্বর বিদায়কালীন বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র যখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভারতীয় রূপে ("more Indian than ever") নিজেকে ব্যক্ত করেন তখন এই মহিলার মন তৎপ্রতি অধিকতর শ্রদ্ধান্বিত হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, ভারতবর্ষে গিয়া নারীশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিবেন।১

এই কুমারী মহিলাটির নাম এনেট একরয়েড। কেশবচন্দ্রের বিলাত ত্যাগের পর তিনি আরও কয়েকজন ভারতীয়ের সংস্পর্শে আসেন। মনোমোহন ঘোষ, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ও শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার ক্রমে পরিচয় হইল। একরয়েড বাংলা শিক্ষায় মন দিলেন। এদিকে লণ্ডনের শ্রমজীবী বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যেও তিনি ব্রতী হন। কেশবচন্দ্র স্বদেশে ফিরিয়া ভারত-সংস্কার সভার অধীনে যে শিক্ষয়িত্রী ও বয়স্থা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৭১) তাহাতে পরে কুমারী একরয়েডের যোগদানের কথা ছিল। কিন্তু বিলাত হইতে ১৮৭২ সনের মে মাসের এক

১। *India Called Them.* By Lord Beveridge. p. 85. 1947.

পত্রে তিনি জানান যে এখানকার কার্য্য তিনি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।২ কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প অটুট ছিল। তিনি কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা দলের সঙ্গে যুক্ত না থাকিয়া স্বাধীনভাবে যাহাতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তৎপরে হইতে পারেন তাহাই হইল তাঁহার মনোগত বাসনা। কুমারী একরয়েড ১৮৭২ সনের ২৫শে অক্টোবর বিলাত ত্যাগ করিয়া জাহাজযোগে পরবর্ত্তী ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতায় উপনীত হন। ইহার অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কুমারী মেরী এ্যান কুক নামে এইরূপ আরও একটি মহিলা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তবে উভয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি মূলগত পার্থক্য ছিল। সে যুগে শিক্ষাবিস্তার এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার একই পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। অর্দ্ধশতাব্দী পরে সাধারণ ইংরেজ নরনারীর মন হইতে ধর্ম্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষা অনেকটা তিরোহিত হয়। কুমারী একরয়েড শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করিবার জন্যই এদেশে আগমন করিলেন।

কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া একরয়েড পূর্ব্বপরিচিত ব্যারিষ্টার, স্ত্রীশিক্ষার একান্ত অনুরাগী মনোমোহন ঘোষের ভবনে গমন করিলেন। এইখানেই তিনি এক বৎসর কাল থাকিয়া একটি উন্নত ধরণের বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন করিতে আরম্ভ করেন। কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত প্রমুখ বাঙালী বন্ধুদের সঙ্গেও তাঁহার দেখাসাক্ষাৎ হইল। শিক্ষয়িত্রী ও বয়স্থা বিদ্যালয়ে কর্ম্মগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেও একরয়েডের কলিকাতায় আগমনের পরই স্ত্রীজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকামী কেশবচন্দ্র আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন। উদ্দেশ্যসাম্য হেতু তিনি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিতে অগ্রসর হন। একরয়েড কেশব-প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রম, শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়, বামাহিতৈষিণী সভা প্রভৃতি বিশেষ যত্নের সহিত পরিদর্শন করেন। আবার মিস্ চেম্বারলেন, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে ১৮৭৩, ৮ই জানুয়ারি হইতে চারি দিবসকাল শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পরীক্ষাও লইয়াছিলেন।৩

ইহার পর যাহাতে শীঘ্র একটি মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে কুমারী একরয়েড যত্নশীল হন। এজন্য কয়েকজন ইংরেজ ও বাঙালী প্রধান লইয়া একটি কমিটিও গঠিত হইল। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (ফাল্গুন ১২৭৯) লেখেন :

"আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম কুমারী য়্যাক্রয়েড স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিবার কল্পনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার প্রধান বিচারালয়ের সুযোগ্য বিচারপতি ফিয়ার সাহেব ও তাঁহার বিবি, অন্যতর বিচারপতি বাবু দ্বারকানাথ মিত্র, এবং দুর্গামোহন দাস, বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বাবু মনোমোহন ঘোষ উক্ত সভার সভ্য হইলেন, এবং কুমারী য়্যাক্রয়েড সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন, কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এমন একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে, যাহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষাতে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়া হইবে। দশ বারোটি ছাত্রী হইলেই কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে। আমরা শুনিলাম ২১৫ জন এখনি ছাত্রী শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয়ের জন্য এক সহস্র টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এইটি চাঁদা দ্বারা তুলিতে হইবে। প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিবার জন্য বিলাত হইতে একজন উপযুক্ত বিবিকে আনিবার কথা হইতেছে।"

কিন্তু কমিটি গঠনের অল্পকালের মধ্যেই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে একরয়েডের মতভেদ উপস্থিত হইল। কেশবচন্দ্র কমিটির নিকট ১৮৭৩, মে মাসে পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিলেন। একরয়েডের মতামত লইয়া 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এ বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে লাগিল। এই বিতর্ক ও বাদানুবাদ 'ইংলিশম্যান' কাগজে পর্য্যন্ত গড়াইল। বাখরগঞ্জ জেলার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট হেনরি বিভারিজ স্ত্রীশিক্ষার অনুরাগী ছিলেন। তিনি প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের জন্য এককালীন এক শত টাকা দান করেন। তিনি এই বাদানুবাদের কথা জানিয়া কুমারী একরয়েডকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার ও কেশবের মধ্যে মিটমাটের ব্যবস্থা করিতেও অগ্রসর হন। মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ অতিরিক্ত পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ('anglicised') ব্যক্তি-দের সঙ্গে মিলিয়া কার্য্য করিলে তাহা যে সাধারণগ্রাহ্য না-ও হইতে পারে সে বিষয়েও তিনি তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেন।৪ কিন্তু কুমারী একরয়েড ছিলেন বড়ই জেদী মহিলা। তিনি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কতকগুলি বিষয়ে তিনি যে দৃঢ় মত পোষণ করিতেন এবং তাহা যে সময় সময় উগ্রতার পর্য্যায়ে উঠিত, রাজনারায়ণ বসু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।৫

যাহা হউক, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে আয়োজন চলিতে লাগিল। মনোমোহন ঘোষ, দুর্গামোহন দাস, মহারাণী স্বর্ণময়ী, বিচারপতি ফিয়ার ও তদীয় পত্নী এমিলি ফিয়ার কুমারী একরয়েডের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ রূপে সহায়তা করিতে থাকেন। সাময়িক ও মাসিক অর্থ সংগ্রহেরও ব্যবস্থা হইল।৬

২। *The Englishman*, 31 May, 1873.

৩। বামাবোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১২৭৯

৪। *India Called Them, p. 100*

৫। রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত, পৃ. ১৯৪-৬

৬। কুমারী একরয়েডের প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের জন্য এককালীন দান ও মাসিক দানের একটি তালিকা এই,

এককালীন দান: মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫০০৲, বর্দ্ধমানের মহারাজা ৫০০৲, রাজা প্রাণনাথ রায় ২০০৲, অনারেবল হবহাউস ২০০৲, ও, সি, মল্লিক, ভাগলপুর ১০০৲, হেনরি বিভারিজ ১০০৲, কুমারী একরয়েড ১০০৲, এল,

কেশবচন্দ্র কমিটি ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন বিভাগের মুখপত্র 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় এ বিষয়ে উদ্যোগ-আয়োজনের কথা প্রকাশিত হইতে লাগিল। জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ সংখ্যায় এই পত্রিকা লেখেন :

"মিস্ এক্রয়েডের প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে দুইটি ছাত্রীবৃত্তি দিবার জন্য মিস্ কার্পেন্টার হাজার টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন। বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রীদ্বয় মনোনীত করিবেন।"

আয়োজন অনেকটা অগ্রসর হইলে ২৯শে আগষ্ট ১৮৭৩ তারিখে 'ভারত-সংস্কারক' 'অবলাবান্ধবে'র উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন :

"অবলাবান্ধব লিখিয়াছেন, কুমারী এক্রয়েডের প্রস্তাবিত নারী বিদ্যালয় সম্ভবতঃ নবেম্বর মাসে খোলা হইবে।...বিদ্যালয়ের নাম 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' হইবে।"

প্রতি মাসে যথোপযুক্ত অর্থাগমের ব্যবস্থা হইলে কুমারী এক্রয়েডের তত্ত্বাবধানে ১৮৭৩ সনের ১৮ই নবেম্বর ২২নং বেনিয়াপুকুর লেনে পাঁচটি ছাত্রী লইয়া হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় নামে একটি বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদ দিয়া 'ভারত-সংস্কারক' ১৮৭৩, ২৮শে নবেম্বর লিখিলেন :

"গত বারের পূর্ব্ব মঙ্গলবারে [১৮ নবেম্বর] মিস্ এক্রয়েডের স্কুল খুলিয়াছে। আপাততঃ ৫টি ছাত্রী সংগৃহীত হইয়াছে, শিক্ষকের বন্দোবস্ত শীঘ্র হইবে। আমরা আশা করি বিদ্যালয়টির নাম যখন হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় হইয়াছে, ইহার সকল ব্যবস্থা তদনুযায়ী হইবে, তাহা হইলে ছাত্রীর অভাব অপূর্ণ থাকিবে না।"

বিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে আরম্ভ হইল। প্রতিষ্ঠার অল্প দিন পরে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'ও (অগ্রহায়ণ ১২৮০) লেখেন :

"মিস্ আক্রয়েডের বিদ্যালয়ের কার্য্য সুন্দররূপে আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। অধিক আহ্লাদের বিষয় এই উক্ত গুণবতী রমণী ছাত্রীগণকে গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিত করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। আমরা আশা করি ছাত্রীগণের জ্ঞান চরিত্র এবং কার্য্য দক্ষতা এই তিনের যাহাতে সমঞ্জস উন্নতি হয়, এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।"

হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বার্ত্তা কুমারী এক্রয়েডের নিজ আবাসভূমি ইংলণ্ডের ঈষ্ট ওর্‌ষ্টারশায়ারেও গিয়া পৌছিল, সেখানকার *Brierly Hill Advertiser* নামক সংবাদ-পত্রেও এই বিদ্যালয়ের কথা প্রকাশিত হয়। ইহাতে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই পত্রিকাখানি লিখিলেন :

"Miss Akroyd has formed a school for Hindoo ladies. The general committee is strong in both European and native members of standing. The object of the school "is to give thorough instruction on principles of the strictest theological neutrality. The subjects taught are arithmetic, physical and political geography, the elements of physical science, Bengali and English reading, grammar and writing, history and needlework." Great attention is to be given to the training of the pupils in practical house-work, and to the formation of orderly and industrious hobits."[৭]

অর্থাৎ, হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে বিশেষ কোন ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ। এখানকার অধিতব্য বিষয়—গণিত, ইতিহাস, ভূগোল (প্রাকৃতিক ও সাধারণ), প্রাথমিক বিজ্ঞান, বাংলা, ইংরেজী, ব্যাকরণ, লিখন, এবং সূচীকর্ম্ম। পূর্ব্বে যেমন উক্ত হইয়াছে, গৃহকার্য্যও এখানকার শিক্ষণীয় বিষয় হইল। ছাত্রীগণ নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া শ্রমসাধ্য কার্য্যে যাহাতে অভ্যস্ত হয় সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইত। বিলাতে যেমন বোর্ডিং স্কুল, হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ও এই ধরণের একটি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ছাত্রীগণ শিক্ষালাভের সময় এখানে বসবাস করিয়া প্রকৃত বিদ্যা অর্জ্জন এবং জীবন ও কর্ম্মে তাহা বিনিয়োগ করিবার পূর্ণ সুযোগ লাভ করিত।

প্রথমে কথা ছিল, বিলাত হইতে একজন শিক্ষয়িত্রী আনয়ন করিয়া তাঁহার উপর বিদ্যালয় পরিচালনার ভার অর্পণ করা হইবে। যত দিন না এরূপ শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন, তত দিন কুমারী এক্রয়েড অবেতনে বিদ্যালয় তত্ত্বাবধান করিবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এরূপ অভিপ্রায় পরিত্যক্ত হয়। কুমারী এক্রয়েডই বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ও তত্ত্বাবধায়িকা পদ গ্রহণ করেন। এক্রয়েড বাদে একজন দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী এবং একজন পণ্ডিতও শিক্ষাদান কার্য্যে নিয়োজিত হন। এই পণ্ডিত 'অবলাবান্ধব'-সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারপতি ফিয়ার-পত্নীও এই বিদ্যালয়ে অবেতনে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেন—বিভিন্ন স্থানে এইরূপ বলা হইয়াছে। মনে হয় দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী ফিয়ার-পত্নী এমিলি ফিয়ার। তিনি এই বিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও সম্পাদক বলিয়াও উল্লিখিত হইয়া-

---

সি, বাঁড়ুয্যে-পত্নী ও ৭ জন বন্ধু ৪১৲, ডাঃ শ্যামমাধব রায়, নদীয়া, ২৫৲, বি, বি, ঘোষ, ফরিদপুর ১০৲, এ, এম্ বসু, কেম্ব্রিজ ১০৲, শ্রীনাথ ঘোষ, ১০৲, তারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১০৲, মন্মথ মল্লিক, লণ্ডন ১০৲, কে, জি, গুপ্ত, লণ্ডন ৫৲, পি, কে, রায়, লণ্ডন ৫৲, শ্রীনাথ দত্ত, লণ্ডন ৫৲, ডি, এন, দে, লণ্ডন ৫৲।

মাসিক চাঁদা : বিচারপতি ফিয়ার ৪৫৲, কুমারী এক্রয়েড ৪৫৲, ডাঃ কে, ডি, ঘোষ, রঙ্গপুর ২০৲, মনোমোহন ঘোষ ২০৲, ডাঃ বঙ্কুবিহারী গুপ্ত, বর্দ্ধমান ২০৲, ডব্‌লিউ; এল, হিলী, সি, এস, ১০৲, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, এস, ১০৲, রাখালচন্দ্র রায় ১০৲, পার্ব্বতীচরণ দাস, পুর্ণিয়া, ১০৲, প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদ ২৲, ইত্যাদ।—*The Englishman. May* 20, 1873.

৭। *India Called Them*, p. 72

ছেন।৮ কুমারী একুরয়েডের বিদ্যালয় ত্যাগের পরে তিনি স্বয়ং বিদ্যালয়টি এক বৎসরকাল পরিচালনা করেন।

হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় পরিচালনায় যাঁহারা উপদেশ ও অর্থ দিয়া কুমারী একুরয়েডকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেন তাঁহাদের মধ্যে দুর্গামোহন দাস ও তদীয় পত্নী ব্রহ্মময়ী দেবীর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যালয়ের পণ্ডিত দ্বারকানাথ লিখিয়াছেন :

"কুমারী এক্রেয়েড স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, যেদিন আমি শুনিব ইঁহাদিগের যত্ন শিথিল হইয়াছে, ইঁহার নিজ কন্যা-দিগকে শিক্ষা দানের অন্য উপায় দেখিতেছেন, আমি সে দিনই স্বদেশে প্রতিগমন করিব।"৯

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও এই বিদ্যালয়ের বিশেষ যোগ ছিল। বিলাতে অবস্থানকালে কুমারী একুরয়েড তাঁহার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন। কার্পেণ্টার মহোদয়ার দান ও বৃত্তিলাভের উপযোগী ছাত্রী নির্ব্বাচনের ভার শশিপদের উপর দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াছি। তিনি এই বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য হইয়াছিলেন।১০

হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ পরে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। বিদ্যালয়ের প্রধানা ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন : স্বর্ণপ্রভা বসু (আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভগিনী ও আনন্দমোহন বসুর পত্নী), সরলা দাস (দুর্গামোহন দাসের কন্যা ও ডক্টর পি. কে. রায়ের পত্নী), হরসুন্দরী দত্ত, স্বর্ণময়ী দত্ত, স্বর্ণময়ী চট্টোপাধ্যায় (পরে পার্ব্বতীনাথ দাসগুপ্তের পত্নী), বিনোদমণি বসু (মনোমোহন ঘোষের ভাগিনেয়ী), কাদম্বিনী বসু (মনোমোহন ঘোষের মামাতো ভগিনী এবং পরে দ্বারকা-নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী), গিরিজাকুমারী সেন (শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী) ও অবলা দাস (দুর্গামোহন দাসের কন্যা ও আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের পত্নী)।১১

বিদ্যালয়টি কুমারী একুরয়েডের তত্ত্বাবধানে ১৮৭৫ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। এই সনের ৬ই এপ্রিল তিনি কলিকাতায় বসিয়া ১৮৭২-এর তিন আইন অনুযায়ী বাখরগঞ্জের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হেনরি বিভারিজের সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন।১২ ইহার পরেই তিনি স্বদেশে চলিয়া যান। তখন বিদ্যালয়ের ভার বিচারপতি ফিয়ারের পত্নী এমিলি ফিয়ার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে এক বৎসর চলিবার পর ১৮৭৬ সনের মার্চ্চ মাসে ইহা উঠিয়া যায়।১৩

২। বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়

হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী দুর্গামোহন নিজ কন্যাদ্বয় এবং আশ্রিত মহিলাদের এখানে রাখিয়া শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়টি উঠিয়া যাওয়ায়, তিনি নিশ্চেষ্ট রহিতে পারিলেন না। ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসুর সহিত মিলিত হইয়া তিনি এই বিদ্যালয়টি পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের পণ্ডিত 'অবলাবান্ধব'-সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। ১৮৭৬ সনের ১লা জুন ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে উক্ত বিদ্যালয়টি পুনরুজ্জীবিত হইল। এই সময়ে ইহার নাম দেওয়া হয় 'বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয়'। এটিও বোর্ডিং স্কুল, পূর্ব্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণই এখানকার ছাত্রী হইলেন এবং এখানে বাস করিয়া শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, তিনি সাউথ সুবার্ব্বান স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া ভবানীপুরে বাস করিতেছিলেন। দ্বারকা-নাথের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহার প্রথমা কন্যা হেমলতাকে এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন।১৪

বারটি ছাত্রী লইয়া বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় খোলা হইল। ছয় মাসের মধ্যে ছাত্রী-সংখ্যা বাড়িয়া সতরটিতে দাঁড়ায়। এই ছাত্রীদের মধ্যে অবিবাহিতা ও বিধবা নারী ছিলেন। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার এক মাস পরে, জুলাই মাসে সুবার্বান মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত বালিকা বিদ্যালয়সমূহের একটি বৃত্তি-পরীক্ষা হয়। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় হইতে চতুর্থ পরীক্ষায় ৩, তৃতীয় পরীক্ষায় ৩, দ্বিতীয় পরীক্ষায় ১০ এবং প্রথম পরীক্ষায় ২৭ জন, একুনে ৪৩ জন বালিকা পরীক্ষা দিয়া-ছিলেন। পরীক্ষোত্তীর্ণা তেরটি ছাত্রীর মধ্যে পাঁচটিই বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয়ের, এবং প্রথম তিনটি পরীক্ষায় তাঁহারাই প্রথম স্থানগুলি অধিকার করিয়া যথাক্রমে ৪৲, ৩৲ ও ২৲ মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (শ্রাবণ ১২৮৩) হইতে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নাম ও পরীক্ষার ফলাফল এখানে প্রদত্ত হইল :

পরীক্ষা	বয়:ক্রম	বিদ্যালয়ের নাম	পূর্ণসংখ্যা	প্রাপ্ত সংখ্যা
৪র্থ পরীক্ষা	...	...	২৫০	...
কাদম্বিনী বসু	১৪	বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়	„	১৫১
সরলা দাস	১৪	„	„	১৩৮।

৮। "...becoming in 1873 treasurer and secretary of Miss Akroyd's School."—*India Called Them*, p. 407

৯। জীবনালেখ্য, ২য় সং, পৃ. ৫১

১০। নবযুগের সাধনা—কুলদাচরণ মল্লিক, পৃ. ২০০-১

১১। বাংলার নারী-জাগরণ—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ ৬৫

১২। *India Called Them*, p. 127.

১৩। নববার্ষিকী, ১৮৭৭, পৃ. ১২৫।

১৪। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত, ২য় সং, পৃ. ২১১

তৃতীয় পরীক্ষা

সুবর্ণপ্রভা বসু	১৪	„	„	১২৮॥

২য় পরীক্ষা

অবলা দাস	১১	„	২০০	১০১॥
সরলা মহলানবিশ	১১	„	„	১০৮

উক্ত পত্রিকা বলেন, "চতুর্থ পরীক্ষায় বালিকাগণ যেরূপ ইংরেজী রচনা করিয়াছেন এণ্ট্রান্স শ্রেণীর ছাত্রেরা সেরূপ পারেন কিনা সন্দেহস্থল।" বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরে এই পরীক্ষাগুলি গৃহীত হয়। কাজেই ইহার পূর্ব্ববর্তী হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে এই সকল ছাত্রী কিরূপ উন্নত সুষ্ঠ শিক্ষা পাইয়াছিলেন, এতদ্দ্বারা তাহাও সূচিত হইতেছে।

দুই জন শিক্ষয়িত্রী ও একজন শিক্ষক লইয়া বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বা লেডী সুপারিন্টেডেণ্ট ছিলেন মিসেস্ সেভিল—তাঁহার মাসিক বেতন এক শত টাকা। দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রীর নাম কুমারী ক' (Miss Caw)—বেতন ত্রিশ টাকা। কিছুকাল পরে তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলে তাঁহার স্থলে নিয়োজিত হন কুমারী বিরুনী। বাংলা শিক্ষক ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি প্রতিমাসে চল্লিশ টাকা করিয়া বেতন লইতেন। দ্বারকানাথ সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, শুধু "শিক্ষক কেন, তিনি দিনরাত্রি বিশ্রাম না জানিয়া ঐ স্কুলের উন্নতি সাধনে দেহমন নিয়োগ করিলেন।"১৫

দুর্গামোহন দাসের সহধর্ম্মিণী ব্রহ্মময়ী দেবীরও এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ আগ্রহ ছিল। দাস-দম্পতি বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে নিজ কন্যাগণ ও আশ্রিত স্কুলকন্যাদের শিক্ষার নিমিত্ত প্রতিমাসে শতাধিক টাকা ব্যয় করিতেন। ১৮৭৬ সনের ৫ই নবেম্বর পত্নী ব্রহ্মময়ীর মৃত্যু হইলে দুর্গামোহন তাঁহার স্মরণার্থ এই বিদ্যালয়ে এককালীন পাঁচ শত টাকা দান ও মাসিক দশ দশ টাকার দুইটি ছাত্রীবৃত্তি সংস্থাপন করেন।১৬

আনন্দমোহন বসুও বিদ্যালয়ের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। বস্তুতঃ প্রায় এক বৎসর কাল যাবৎ ছাত্রীবেতন এবং ব্যক্তিগত দানের উপর নির্ভর করিয়াই ইহার কার্য্য চলিয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরে, ১৮৭৭ সনে সুবার্বান মিউনিসিপালিটি এবং বাংলা-সরকার প্রত্যেকের নিকট হইতে প্রতি মাসে পঁচাত্তর টাকা করিয়া সাহায্য পাওয়া যাইতে লাগিল।

উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষায় ও তত্ত্বাবধানে ছাত্রীগণ পাঠে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিলেন। ১৮৭৭ সনে প্রথম শ্রেণীর দুই জন ছাত্রী—কাদম্বিনী বসু ও সরলা দাস প্রবেশিকা এবং অপর তিন জন মাইনর ও মধ্য বাংলা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। এ বৎসর বালিগঞ্জে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহারা প্রত্যেকেই ইহাদ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়েন। তখন তাঁহাদের পক্ষে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তবে এই বৎসরই (১৮৭৭) প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিনী ছাত্রীদ্বয়ের প্রারম্ভিক পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। তাহাতে ইংরেজী সাহিত্যের পরীক্ষক ছিলেন মিঃ পোপ, অঙ্কশাস্ত্রের মিঃ গ্যারেট, ইতিহাস ও ভূগোলের ডক্টর পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলার পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। পরীক্ষকগণ প্রত্যেকেই এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উভয় ছাত্রীই প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্যলাভে সমর্থ হইবেন। ১৮৭৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বড়লাট-পত্নী লেডী লিটন বিদ্যালয়টির পরিচালনা-নৈপুণ্যে এবং ছাত্রীগণের আচার-ব্যবহারে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেন।১৭ শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর ১৮৭৬-৭৭ সনের বার্ষিক বিবরণে (পৃ. ৭৭) এই বিদ্যালয়টির উৎকর্ষ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করেন :

"The Mirzapore school is maintained by Babu Keshub Chunder Sen; it is rather an adult female school than a normal school, its objects being similar to those of the Banga Mahila Vidyalaya, with which it may shortly be amalgamated. The latter is in every sense the most advanced school in Bengal. It was formerly managed in Calcutta by Miss Akroyd, and lately revived by some Bengali gentlemen who desire to see girls appearing at the University-examination at the new college for women at Cambridge. Mr. Garret found the first class consisting of two girls upto the standard of the second class of Zillah schools in Euclid and Algebra; he considers that, as far as these subjects are concerned, there is no reason why they should not go up to the examination at the end of the year. The managers are applying for a large grant, and the school unquestionably deserves encouragement. It is the first attempt to establish a higher English boarding school for girls, such as Mr. C. B. Clarke advocated some years ago."

এই মন্তব্যে পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষকগণের উক্তিই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় এবং কেশবচন্দ্রের শিক্ষয়িত্রী ও বয়স্থা নারী বিদ্যালয় যে একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত, ইহা হইতে তাহাও বুঝা যাইতেছে। তবে এই বিবরণে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়কে বঙ্গদেশে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত নারী বিদ্যালয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানকার শিক্ষাদান প্রণালীও জীবনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া অনুসৃত হইত। এখানে ইংরেজী, বাংলা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সাধারণ বিষয় তো ছাত্রীগণকে শিক্ষা দেওয়া হইতই, এসব বিষয়ের

১৫। ঐ, পৃ. ২১১

১৬। নববার্ষিকী, ১৮৭৭, পৃ. ২২০

১৭। *The Brahmo year Book for 1876*. By Sophia Dobson Collet. London. P. 49

সঙ্গে সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, সূচীকর্ম্ম, বুনন প্রভৃতি বিষয়সমূহও তাঁহারা শিক্ষা করিতেন। ছাত্রীদের পালাক্রমে রন্ধনকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইত। বিদ্যালয়-সংক্রান্ত হিসাবপত্র রক্ষায়ও তাঁহারা তত্ত্বাবধায়িকাকে সাহায্য করিতেন। সঙ্গীত সম্পর্কে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বারকানাথ ছাত্রীদের জন্য তৎকালীন জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতগুলি সঙ্কলন করিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন এবং ইহার নাম দেন "জাতীয় সঙ্গীত" (১৮৭৬)। তিনি ছাত্রীদের উপযোগী পাঠ্য পুস্তক রচনায়ও তৎপর হইয়াছিলেন।

বেথুন স্কুল পরিচালনার জন্য সরকার বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতেন। কিন্তু ইহা তখনও পর্য্যন্ত একটি শিশু-বিদ্যালয় ("nursery school") মাত্র ছিল। স্কুল কমিটির সভাপতি ছিলেন বিচারপতি ফিয়ার। তিনি কুমারী একরয়েড-পরিচালিত বিদ্যালয়টির কথাও বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। তাঁহার পত্নী এমিলি ফিয়ার এই বিদ্যালয়টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত হন এবং কুমারী একরয়েডের বিবাহের পরও এক বৎসর কাল ইহার পরিচালনা করেন বলিয়াছি। বিচারপতি ফিয়ার বেথুন স্কুল কমিটির সভাপতি রূপে ইহার উন্নতির উদ্দেশ্যে ১৮৭৬ সনের মধ্যভাগে বিলাত-যাত্রার প্রাক্কালে শিক্ষা-বিভাগকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া যান। তিনি এই পত্রে বালিগঞ্জের বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের সঙ্গে বেথুন স্কুলের মিলনের প্রস্তাব করেন।১৮ তখন নানারূপ বিঘ্ন থাকায় উভয় বিদ্যালয়ের মিলন সংঘটিত হইতে পারে নাই। শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষও যে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের উন্নততর পঠন-পাঠন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি। ১৮৭৮, ৮ই এপ্রিল বেথুন স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর সার এশলী ইডেন বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়কে একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষায়তন ("excellent institution") বলিয়া উল্লেখ করেন। এই সময়ে উভয় বিদ্যালয়ের মিলনের সম্ভাবনার কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। এই বৎসরই কয়েকটি সর্ত্তসাপেক্ষ ১৮৭৮ সনের ১লা আগষ্ট বেথুন স্কুল ও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় সম্মিলিত হয়।১৯ এ বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর ১৮৭৮-৭৯ সনের বার্ষিক বিবরণে (পৃ: ৮১) এইরূপ লেখেন:

"The amalgamation of the school (Bethune School) with the Ballygunge Banga Mahila Vidyalaya has been effected since the date of the last report. The circumstances of the amalgamation are briefly as follows: In 1873 the last named school, which is described as a 'boarding school upon the advanced principles of education," was established at Ballygunge, chiefly through the exertions of Mr. Justice Phear and of some ladies of Calcutta. In 1875 (?) Mr. Phear, who was the President of the Bethune School Committee, was of opinion that the school would hove a wider scope if the Ballygunge school was amalgamated with it; but as there were difficulties at the time in the way, it was not till the year under report that the plan could be carried out. The house of the Bethune school, formerly occupied by the Lady Superintendent, was rearranged to accommodate the new pupils, and at the date of report there were 15 grown pupils boarding at the school."

বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় যখন বেথুন স্কুলের সহিত যুক্ত হয় তখন ইহার ছাত্রীসংখ্যা ছিল চৌদ্দ জন। ইহাদের মধ্যে এগার জন সম্মিলিত বিদ্যালয়ে রহিয়া গেলেন।২০ সম্মিলিত বেথুন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সভায় বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের পক্ষে দুর্গামোহন দাস ও আনন্দমোহন বসু অধ্যক্ষরূপে গৃহীত হইলেন।২১ এই বিদ্যালয় হইতে ১৮৭৮ সনে প্রবেশিকা ও অন্যান্য পরীক্ষায় যেসব ছাত্রী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাঁহারা সকলেই বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় হইতে আগত। কাজেই তাঁহাদের কৃতিত্বের কথাও সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে এখানে উল্লেখ করিতে হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' (৬ মার্চ্চ, ১৮৭৯) লেখেন:

"রমণীদিগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দান করিতে দিবার স্বত্ব দেওয়ায়, এই বিদ্যালয়ে নবপ্রবিষ্ট ছাত্রী শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণা হইয়াছে। কেবল এক সংখ্যার জন্য প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণা হইতে পারে নাই। মান্যবর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর পরম তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুই বৎসরের কারণ একটি বৃত্তি দান করিয়াছেন, এবং ৫০৲ মূল্যের পুস্তক দান করিয়াছেন। এই উপলক্ষে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আরও ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যে সকল ছাত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণা হইবে, তাহারা মাসিক ১৫৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবে। বেথুন বিদ্যালয়ের অন্যান্য অনেক ছাত্রী যথেষ্ট সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ১৪ বর্ষ বয়স্কা ছাত্রী শ্রীমতী কামিনী সেন মধ্যম শ্রেণীর ইংরেজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। কলিকাতা হইতে ১৬ জন তাঁহাপেক্ষা অধিকবয়স্ক ছাত্র পরীক্ষা দেয়। ইহার মধ্যে কামিনী অনুবাদে সর্ব্বপ্রথম, গণিতে চতুর্থ, এবং সাধারণ্যে চতুর্থ হইয়াছেন। অপর এক ছাত্রী শ্রীমতী অবলা দাসী যিনি ঐ পরীক্ষা দেন, তিনিও দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং শ্রীমতী [সুবর্ণপ্রভা] বসু যিনি বাঙ্গালায় ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন তিনিও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণা হইয়াছেন।"

১৮। *Report of the Director of Public Instruction for 1876-77, p. 74.*

১৯। সংবাদ প্রভাকর, ৬ই মার্চ্চ ১৮৭৯

২০। *The Brahmo year Book for 1878,* pp. 88-9

২১। সংবাদ প্রভাকর, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭৯

ইহার পর বেথুন বিদ্যালয়ের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণা কাদম্বিনী বসু কলেজে পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে একমাত্র তাঁহাকে লইয়া বেথুন স্কুলের সঙ্গে এফ্-এ ক্লাস খোলা হইল। ক্রমে বি-এ শ্রেণীও খোলা হয়। এইরূপে যে উচ্চ আদর্শ লইয়া হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় ও বঙ্গমহিলা মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বেথুন বিদ্যালয়ের (স্কুল ও কলেজ বিভাগ) মধ্যে তাহা পরিণতি লাভ করিল। বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষে মহিলাদের উচ্চশিক্ষা লাভের সকল বাধা বিদূরিত হইয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথ ও 'বলাকা'

শ্রীরাইহরণ চক্রবর্ত্তী

'বলাকা' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য ; কিন্তু শুধু কাব্যিক সৌন্দর্য্যই এর একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। কবি এর ভিতর দিয়ে সকল ভীরুতা, সকল কাপুরুষতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী ঘোষণা করেছেন। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে উদ্ঘোষিত হয়েছে সবল মনুষ্যত্বের আদর্শ।

প্রলয়-তুফানে যখন নদী-সাগর বিক্ষুব্ধ চঞ্চল হয়, ঘূর্ণিপাকে যখন সমস্ত জগৎ কম্পমান হতে থাকে, তখন 'বলাকা'র বলদৃপ্ত মনুষ্যত্বের একান্ত প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন, "বাধা যদি না থাকিত তবে মানুষ বৃহৎ হইতে পারিত না।" বাস্তবিক দুঃখ যদি না থাকত, দুঃখের ভয়ঙ্কর সত্যে যৌবনের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ত না। যৌবন তাই মনুষ্যত্বের সাধনা করে, অজানাকে জেনে, অপ্রাপ্তকে লাভ করে আবার দেশ-কাল-সমাজের অতীত মহাসত্যের দিকে ছুটে চলেছে।

'বলাকা'র প্রার্থনা দুর্ব্বলের বা কাপুরুষের কুণ্ঠিত প্রার্থনা নয়। যাহা সহজে ফোটে, অনায়াসে মেলে এবং সস্তা চাটু-বাক্যে তৃপ্ত হয় সে প্রার্থনা ত 'বলাকা'র প্রার্থনা নয়। তা পরাজয়ে বিজয়ের মাল্যদান করে, প্রতীক্ষাতে প্রাণের জাগরণ স্পন্দিত ও নন্দিত করে, অভাবে ও দারিদ্র্যে অনমনীয় ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে। 'কালস্রোতে জীবন যৌবন ধনমান' যখন 'ভেসে যায়', তখন 'এক বিন্দু নয়নের জল' সেই একনিষ্ঠ প্রেমের শুভ্রসমুজ্জ্বল তাজমহলকে অন্তরে বাহিরে অক্ষয় করে তোলে। প্রবলের উদ্ধত অত্যাচার, লোভীর প্রচণ্ড অন্যায় এবং দুর্বৃত্তের কুশাসন প্রার্থনার মন্দিরে প্রবেশ করবার সুযোগ পায় না। এর মধ্যে সে শান্তিস্বর্গ নেই, যেখানে 'নিশার বক্ষ' বিদীর্ণ হয় না, 'শ্রাবণ ধারাসম বাণ' বক্ষে বাজে না—নিঃশঙ্ক মনে মাথার উপরে মধ্যাদিনের তপ্ত সূর্য্যে অভয়-শঙ্খ বাজিয়ে সন্ধ্যার আরতিদীপ জ্বালানো হয়—আর প্রেমের প্রদীপথালায় লক্ষ লক্ষ অন্তরের হৃদয়সলিতা স্নেহের অফুরন্ত মাধুর্য্যে সিক্তিত হয়।

মানুষের ইহকাল যে পরকালের চেয়ে অনেক উর্দ্ধে, মানুষের সাধনার সামগ্রী যে দেবতার প্রসাদের চেয়েও বরণীয়, সে সত্যের উদাত্ত নির্ঘোষ মনের মন্দিরে নিত্য ঘোষিত হচ্ছে। 'মৃত্যুর গর্জ্জন', 'ক্রন্দনের রোল' 'রক্তের কল্লোল' 'বহ্নিবন্যা-তরঙ্গের বেগ' প্রার্থনার আবেগ বাড়িয়ে দেয়, মনুষ্যত্বের দীপ্ত-বহ্নিকে প্রদীপ্ত করে রাখে।

> বঞ্চনা বাড়িয়ে ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,
> কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি,
> "তুফানের মাঝখানে
> নূতন সমুদ্রতীর পানে
> দিতে হবে পাড়ি।"
> তাড়াতাড়ি
> তাই ঘর ছাড়ি
> চারিদিক হতে ওই দাঁড় হাতে ছুটে আসে দাঁড়ী।

এখানে মানবজীবনের গভীর রহস্য 'প্রার্থনার মন্দিরে' প্রকাশিত হ'ল। কবি সতর্ক করে দিচ্ছেন—তুফানের মাঝখানে তরী নিয়ে যখন পাড়ি দিতে হবে, তখন ঘর ছেড়ে দাঁড়ীকে দাঁড় হাতে ছুটে বের হতে হবে। স্বদেশের বঞ্চনা যেখানে বেড়ে উঠছে, সত্যের সম্বল যেখানে ফুরিয়ে যাচ্ছে, "প্রলয় তুফানের বিষ শ্বাসঝটিকার রক্তকল্লোল ক্রন্দনে"র মাঝে বিলম্ব সহে না ?

'বলাকার সাধনা' চলেছে অজানা সমুদ্রতীরে অজানা দেশে। ঝড়ের গর্জ্জনমাঝে,—বিচ্ছেদের হাহাকার-ভরা নিষ্ঠুরতায়। 'মৃত্যুভেদ করি' চলেছে সাধনার তরী। কোথায় তার নির্দ্দেশ! কেন এই নির্ম্মম আদেশ!

> কালোয় ঢেকেছে আলো, জানে না ত কেউ,
> রাত্রি আছে কি না আছে, দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ
> তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী—
> নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।

কবি যা বলছেন তার তাৎপর্য্য—সাধনাতেই মানুষ বড়

হয়, সিদ্ধিলাভ তো ছোট জিনিষ। সাধনার বাণী থাকে অকথিত, সিদ্ধিতে উহা কথিত; সাধনায় অন্তর ও বাহিরের সম্পদ অপ্রাপ্ত; কিন্তু সিদ্ধির সম্পদ প্রাপ্ত ও সম্পন্ন। যা প্রাপ্ত তা ব্যক্ত, এতে শক্তির অভিব্যক্তি আছে, কিন্তু বিফলতার মাধুর্য্য নেই; বিফলতার মধ্যে যে বীরত্বের সম্মান আছে সে অতুল গৌরব নেই। ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে যখন মরণের গান ধ্বনিত হয়, পৃথিবীর দুঃখপাপতাপ অমঙ্গল হিংসা-হলাহলের সঙ্গে তরঙ্গিত হয়, কানে কানে যখন নিখিলের রিক্ত হাহাকার উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তখনও সাধনার তরী অজানা সমুদ্রের তীরে অজানা দেশে অন্তহীন আশা নিয়ে চলতে থাকে। বিশ্ব জানে, সাধনার তরী ডুবে না—প্রলয়-পারাবার এই তরীই পার হয়ে যায়, তার গতিরোধ করা চলে না।

শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয় পারাবার
নূতন স্বষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।

বলাকার দর্শন বিপ্লবের দর্শন, কিন্তু তা সংহারমূলক দর্শন নয়, সংগঠনমূলক। এ হচ্ছে জীবনবাদ ও গতিবাদের ঐহিক দর্শন। তা পৃথিবীকে চিনেছে, জীবনের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেছে এবং মানুষের 'সৃষ্টি ও ধ্বংসকে' স্বীকার করে নিয়েছে। নদীর বন্যা আছে, উচ্ছ্বাস আছে, আবর্ত্ত ও বিবর্ত্ত আছে, কাজেই তার ভাঙাগড়া থাকবেই। মানুষের ইতিহাসও শুধু শান্তির ইতিহাস নয়, তা বিপ্লব ও বিদ্রোহের ইতিহাসও বটে। 'বলাকা' প্রভাত আলোর দৃষ্টিতে কত দৃশ্য দেখেছে—কত যুগের, কত লোকের। 'নীলিমার অপার সঙ্গীত' একনিষ্ঠ প্রেমের প্রবাহস্রোতে যুগযুগান্তের ধারাবাহিক সত্যকে চিত্তে সঞ্জীবিত করেছে, নিখিল গগনের 'অনাদি মিলনের অনন্ত বিরহ' বহুশত জনমের ব্যাকুলতাকে চোখে চোখে কানে কানে জাগিয়ে দিয়েছে। সেই বিশ্বপ্রেমের দৃষ্টিতে কবির আত্মদর্শন বিশ্বদর্শনের সত্যে রূপায়িত হ'ল। কবির গভীর হৃদয়ে রেখাপাত করলে শূন্য প্রান্তরের ছায়াবট, জনশূন্য বালুচর, বাঁকাপথ, আঁকাবাঁকা পদচিহ্ন, নিভৃতে নির্জ্জনে জলকল্লোল, আলোহাওয়ার অস্ফুট গুঞ্জরণ, ভেসে যাওয়া মেঘের নিঃশব্দ সঞ্চরণ এবং আনন্দ-বেদনার উদাস প্রকাশ। "প্রেমের করুণ কোমলতা সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে ফুটে উঠল। "প্রভাতের অরুণ আভাসে, দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে ভাষাতীত প্রেমের আশাতীত অলক্ষ্যের ছবি" লক্ষ্যে দেখা দিলে। বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন চিরবিরহীর বাণী বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়ে সমাবিস্মৃতির পিঞ্জরদ্বারে মূর্ত্ত হ'ল অক্ষয় কীর্ত্তির অক্ষরে—ভুলি নাই, ভুলি নাই, প্রিয়া।"

'বলাকা' বিরাট ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির বার্ত্তা বহন করে এনেছে। শুধু প্রেমের ও শান্তির রূপ তার 'আত্মদর্শন' ও 'বিশ্বদর্শন' রূপায়িত করে নি। মহাবিপ্লবের রুদ্রভয়ঙ্কর রূপকে সে প্রত্যক্ষ করেছে। বিশ্বকবি প্রত্যক্ষ করেছেন, বিশ্বাসঘাতকগণ যখন কালসর্পের মত হিংসাবিষ উদ্গীরণ করে, লোভীর নিষ্ঠুর লোভ যখন সর্ব্বস্ব শোষণ করেও ক্ষান্ত হয় না, প্রবলের ও বর্ব্বরের উদ্ধত অন্যায় যখন সমাজের বক্ষ বিদীর্ণ করে বিধাতার বক্ষে শেল হানে; অশান্তির ঘূর্ণিবাত্যা যখন জীবনের স্রোতে পলে পলে দেশকে ও সমাজকে ছিন্নমূল করে দেয়, তখন উন্নতশির হয়ে দাঁড়াতে হবে, কাপুরুষের মত জাতির সম্মান অন্যায়কারীর হাতে সঁপে দিলে চলবে না। অন্যায়ের প্রতিকারেই ক্ষমার মাহাত্ম্য, অন্যায়ের প্রশ্রয়দানে নয়; এখানে প্রেমের কোমলতার, পুষ্পের কোমল সৌন্দর্য্যের, পূর্ণিমার উদাস আলোর স্থান নেই। এখানে আছে মনুষ্যত্বের বজ্রের চেয়েও কঠোরতা, ব্যক্তিত্বের অনমনীয়তা, ধর্ম্মের কুসংস্কারবর্জ্জিত রুদ্র ভয়ঙ্কর তেজ। তুফানের মাঝখানে পাড়ি দিতে হলে তরঙ্গের সহিত লড়বার শক্তি থাকা চাই, দাঁড় হাতে দাঁড়ীর কাণ্ডারীর কাজ করা চাই, ঝড়ের মহাগর্জ্জন অকম্পিত বক্ষে উপেক্ষা করা চাই, আরামের শয্যাতল ছেড়ে ঝটিকার প্রচণ্ড আহ্বানে সাড়া দেওয়া চাই। কবি তাই উদাত্ত গম্ভীর স্বরে নববর্ষে আহ্বান জানিয়েছেন:

ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্ব্বাদ
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খ নাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

'আমার তোমার পাপে' বিধাতার বক্ষে তাপ জমেছে। 'আমার তোমার ভীরুতায়' প্রবলের উদ্ধত অন্যায় বেড়েছে, 'আমার তোমার লোভে' লোভীর নিষ্ঠুর লোভ জাতিকে বঞ্চিত করছে—সমস্ত দোষ আমাদেরই, সমস্ত পাপ আমাদেরই, কারণ হয় আমরা পাপকে প্রশ্রয় দিয়ে পাপীর সংখ্যা বাড়াচ্ছি নতুবা পাপীর সঙ্গে মিতালি করে নিষ্পাপকে নির্দ্দোষকে সমান দোষে দোষী বা অপরাধী করছি। বিশ্বকবির আত্মদর্শন আত্ম-সংশোধনের, আত্মসংস্কারের, আত্মজাগরণের সত্যকেই স্বাধীনতার ও মুক্তিসাধনার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলে স্বীকার করেছে। উদারতা দিয়ে আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা দূর করে আত্মসংরক্ষণ হবে, কুসংস্কারের সমস্ত ভুলবোঝা দূর করে আত্মসংস্কার করতে হবে।

আমাদের সমগ্র শক্তি দিয়ে আমরাই নিজেদের বাঁচাতে

পারি। যদি না পারি, তবে মৃত্যু হবে আমাদেরই, পতন হবে আমাদেরই। আমাদের অক্ষমতা আমাদেরই সৃষ্টি, আমাদের সঙ্কীর্ণতা আমাদেরই রচনা, আমাদের নিন্দনীয় প্রবৃত্তিকে আমাদের স্বার্থের এবং লোভের চাতুর্য্যে ও প্রাচুর্য্যে বাঁচিয়ে রেখেছি। "দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে"—চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ জীবন অকালে ধরণীর মায়া কেটে চলল, আমরা সমগ্র শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করি নি কেন? আমরা দান করে অহঙ্কার করছি, সামান্য উদ্বৃত্তের এক অংশ ত্যাগ করে বাহবা কুড়াবার চেষ্টা করছি। কিন্তু এই হীনতা থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে, দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে সত্যকে পেতে হবে, পাপকে অন্যায়কে দূর করতে হবে, মনুষ্যত্ব রক্ষা করে অন্তরকে শক্তিশালী করতে হবে—'বলাকা'র এই সত্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিপ্লবের ও বিদ্রোহের চরম সত্য। বিশ্বের ভাণ্ডারী আমাদের ঋণ শোধবার জন্য তখনই আসবেন যখন আমরা ঋণমুক্ত হয়ে মৃত্যুর অন্তরে অমৃতের সন্ধান পাব—আমাদের মর্য্যাদা আমরা যখন রক্ষা করতে পারব।

"সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখসাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়,
আপনার প্রকাশলজ্জায়
অহঙ্কার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাস রবে।"

ঘোর দুর্দিনে, প্রলয়ঝটিকার প্রচণ্ড গর্জ্জনের মধ্যে 'বলাকা'র প্রতিটি বাণী হৃদয়ে ধ্বনিত হোক্—

নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

ডলার-সমস্যা ও মূল্যহ্রাস

শ্রীসারথিনাথ শেঠ, এম-এ

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ হইতে ব্রিটিশ ষ্টার্লিং ও মার্কিণ ডলারের নির্দিষ্ট অনুপাত পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা ৩০ ভাগ নামিয়া গিয়াছে এবং নূতন হারে প্রতি ডলার ২'৮০ পাউণ্ড ষ্টার্লিঙের সমান স্থির হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ, এশিয়া ও কমনওয়েলথের অন্তর্গত ছোট-বড় দেশগুলির জাতীয় মুদ্রার হার হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখন মার্কিণ-ডলার ৪'৭০ ভারতীয় মুদ্রার সমান। পাকিস্থানী মুদ্রার মূল্যহ্রাস হয় নাই। যাহা হোক, বর্ত্তমানে অর্থনৈতিক সঙ্কট যে পর্য্যায়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপ পৃথিবীর সর্ব্বত্র হাহাকার পড়িয়া যাইতেছে। খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব, বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যের অচল অবস্থার দরুন ইউরোপ ও এশিয়ার সমুদয় রাষ্ট্রের জনসাধারণের জীবনধারণ দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সকল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ অধিকতর শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর সকল স্থানে মোট খাদ্যবস্তু ও শিল্পজাতদ্রব্য কিছুই চাহিদা অনুযায়ী উৎপন্ন হইতেছে না। পশ্চিম ইউরোপের সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে জার্ম্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালী শিল্পের প্রসারে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারিতেছে না। ইউরোপের যে জটিল আর্থিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমাধান কোন্ পথে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিব।

যুদ্ধের পূর্ব্বে সমগ্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশ আমেরিকার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া নিজ নিজ ঘাটতি পূরণ করিত। ইহা লইয়া তখন কোনও সমস্যার সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু ১৯৩৮ সালে ঘাটতির পরিমাণ মার্কিণ মহাদেশের আদায়ী উদ্বৃত্ত (Balance of payments) দাঁড়ায় মোট ১৪৫ কোটি ডলার। ব্রিটেন, জার্ম্মানী এবং ফ্রান্স এই কয়টি দেশ নিজ নিজ উপনিবেশ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়দ্বারা যে পরিমাণ ডলার অর্জ্জন করিত, তাহাতে ঘাটতির মাত্রা পূরণ হইয়া যাইত—বিভিন্নমুখী বাণিজ্য (multilateral trade) দ্বারা ইহা সম্ভব হইত। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। বিদেশী ধনবিনিয়োগ (Foreign Investments) হইতে যে আয় হইত তাহা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সকল প্রকারের ডলার বিল অপূরণীয় থাকিয়া গেল। এই সময় সরবরাহের উৎসগুলি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সমগ্র ইউরোপের অধিকতর আবশ্যক দ্রব্যসমূহের চাহিদা মিটাইতে মার্কিণ দেশের ধনভাণ্ডারের উপর টান পড়িল এবং মূল্য ক্রমে ক্রমে চড়িয়া যাইতে লাগিল। শিল্প ও কারখানায় যুদ্ধজনিত অচল

অবস্থার ফলে ইউরোপের পক্ষে শিল্প ও কৃষি দ্বারা ডলার উপার্জ্জনের সম্ভাবনা রহিল না, জাপানের যুদ্ধেও রবার, টিন এবং ডলার-আয়কারী উপনিবেশজাত দ্রব্যগুলির বিক্রয় বন্ধ হওয়ায়, এতদিন ধরিয়া যে আয় হইতেছিল তাহার পথ রুদ্ধ হইয়া গেল এবং সঞ্চিত মূলধন ব্যয় হইতে লাগিল। এই সমস্ত কারণে ডলার ঘাটতির ফলে ইউরোপ আজ পূর্ব্বের ন্যায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পণ্য বিক্রয় দ্বারা ডলার উপার্জ্জন করিতে পারিতেছে না। কাজেই ডলার ঘাটতি আজ এক অত্যন্ত জটিল সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় মার্কিণ দেশের উদ্বৃত্ত পাওনা ক্রমশঃ যেভাবে বাড়িয়া চলিতেছে, তাহা কোন দেশই মিটাইতে সক্ষম নহে। চলতি হিসাবে ১৯৩৮ সালে উদ্বৃত্ত পাওনা ছিল মাত্র ১২৮ কোটি ডলার, তাহা ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়া ১৯৪৬ সালে ৮১৩'৬ কোটি ডলার এবং ১৯৪৭ সালে ১১২'৭৬ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। ১৯৪৮ সালে উদ্বৃত্ত পাওনা কমিয়া মোট ৬৩.৩৫ কোটি ডলার হয়। আন্তর্জ্জাতিক উদ্বৃত্ত পাওনার নিয়মে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত এই বিরাট ঘাটতির পূরণ করিতে সকল রাষ্ট্রের স্বর্ণ ও মজুত ডলারে ক্রমশঃ টান পড়ে। স্বর্ণ ও ডলার সঞ্চয় ১৯৪৫ সালে মোট ২৩০০ কোটি কমিয়া ১৯৪৬ সালে ২১৭ কোটি থাকে এবং ১৯৪৭ সালে মাত্র ১৭৮ কোটিতে দাঁড়ায়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের কোষাগার ক্রমশঃ শূন্য হইয়া পড়ে। সঞ্চিত সোনা ও ডলার কমিয়া যাওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ও কানাডার নিকট কর্জ্জ করিয়া সকল দেশ ঘাটতি পূরণে অগ্রসর হয়। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক, জাতিসঙ্ঘের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগ এবং আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সঙ্গে প্রচুর ডলার বিনিময় হইলেও বিভিন্ন দেশের ধনভাণ্ডার শূন্য হইয়া পড়ে। ইউরোপের আর্থিক সংগঠনের জন্য ইউরোপীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনা আজ কয়েক বৎসর যাবৎ চলিতেছে।

অর্থনীতিবিদগণ অনেকেই ডলার ঘাটতিকে মিথ্যা ও ভুয়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। মিঃ হ্যারড্ 'ডলার-দুর্ভিক্ষ' একটি অবান্তর প্রশ্ন বলিয়া এড়াইয়া যাইতে চাহেন। অধ্যাপক হাবর্‌লরের মত এই যে, ডলার ঘাটতির সঙ্গে 'আপেক্ষিক ব্যয়' মতবাদের সংযোগ নাই। এই কথা বলা যাইতে পারে না যে, যুক্তরাষ্ট্রের যন্ত্রশিল্পের বিস্ময়কর অগ্রগতি পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশকে পিছাইয়া রাখিবে এবং তৎসমুদয়কে লোকসান দিয়া নিম্নহারে স্ব স্ব পণ্য বিক্রয় করিতে হইবে। প্রাচীন মতবাদের অর্থনীতিক ব্যাখ্যা এই যে, ক্রমবর্দ্ধমান ডলার ঘাটতির পূরণ সম্ভব হয় না। মিঃ স্যামুয়েলসন্ বলেন, যদি মূলধন চালু রাখার সম্ভাবনা স্বীকার করা যায়, তবে দেশের রপ্তানী চিরকাল আমদানী অপেক্ষা বাড়িতে থাকিবে।

ষ্টার্লিং অঞ্চলগুলির ডলার ব্যবসায়ের হিসাব হইতে বুঝা যায় প্রধানতঃ দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ ও যুক্তরাজ্যে ডলার ঘাটতি খুবই রহিয়াছে। ১৯৪৮ সালের ষ্টার্লিং অঞ্চলের কয়েকটি বিশিষ্ট দেশের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের আমদানী-রপ্তানীর হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল :

প্রতি হাজার ডলার

	রপ্তানী	আমদানী	নীট
যুক্তরাজ্য—	২৭৬,৬৫৬	৬৪৪,২৫৯	—৩৬৯,৬০৩
ভারতবর্ষ—	২৬৫,৫৮৭	২৯৮,০৯৩	— ৩২,৫০৬
পাকিস্থান—	৩৭,৪৪০	১৭,০০৮	+ ২০,৪৩২
অষ্ট্রেলিয়া—	১২৯,২৭৫	১১৪,১৩৮	+ ১৫,১৩৭
নিউজিলাণ্ড—	২৯,৬২২	৩৪,০১৫	— ৪,৩৯৩
দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন—	১৩৫,১৭২	৪৯২,১৪৭	—৩৫৬,৯৭৫
ব্রিটিশ পশ্চিম আফ্রিকা—	১০৬,৪০০	১৬,৯৭০	+৮৯,৪৩০

১৯৪৮ সালে বিভিন্ন দেশ যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে পরিমাণ পণ্য আমদানী করে, তাহার শতকরা ১৯'২৭ ভাগ শুধু ষ্টার্লিং অঞ্চলে আমদানী হয়। যুক্তরাজ্য শতকরা ১৯'২ ভাগ, ভারতবর্ষ ১৯'৭ এবং মালয় ১৯'৯ ভাগ—এই কয়টি দেশকে একত্রে শতকরা ৫৮'৮ ভাগ ষ্টার্লিং অঞ্চলের মোট রপ্তানী করিতে হয়। রবার, পাট, পাটজাত দ্রব্য, কাঁচা ও তৈরি পশম, কোকো, কফি, চা, চামড়া, চামড়াজাত দ্রব্য, টিন, তুলা ইত্যাদি যুক্তরাষ্ট্রের মোট আমদানীর শতকরা ৭৫ ভাগ ষ্টার্লিং অঞ্চল হইতে চালান দেওয়া হয়।

যুক্তরাজ্যের ষ্টার্লিং ঘাটতি ইত্যাদি বিষয়ক কিছু তথ্য এখানে দেওয়া যাইতেছে। চলতি হিসাবে যুক্তরাজ্যের পরিশোধনীয় উদ্বৃত্ত ১৯৪৬ সালে মোট ৩৮ কোটি পাউণ্ড, ১৯৪৭ সালে ৬৩ কোটি পাউণ্ড, ১৯৪৮ সালে ১২ কোটি পাউণ্ড যথাক্রমে নীট ঘাটতি হয়, ১৯৩৮ সালে ইহা মাত্র ৭ কোটি পাউণ্ড ছিল। বহিঃ মূলধন বৃদ্ধি এবং উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং ঘাটতি এতদুভয়ে মিলিয়া যুক্তরাজ্যের এবং ষ্টার্লিং অঞ্চলসমূহের মোট ঘাটতি ১৯৪৭ সালে ১০২'৪ কোটি পাউণ্ড, এবং ১৯৪৮ সালে ৪২'৩ কোটি পাউণ্ডে দাঁড়ায়। এই ঘাটতি পূরণ করিতে হয় যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার নিকট কর্জ্জ করিয়া। আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও 'মার্শাল সাহায্য ভাণ্ডার' হইতে ব্যয় নির্ব্বাহ, দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণঋণ প্রাপ্তি এবং সোনা ও ডলার দ্বারা ক্রীত দ্রব্য ব্যবহারের প্রচলন হওয়ায় ১৯৪৭ সালের মধ্যে ১৫'২ কোটি পাউণ্ড এবং ১৯৪৮ সালে ৫'৫ কোটি পাউণ্ড পরিমাণ ঘাটতি পূরণ হয়। পশ্চিম গোলার্দ্ধের নিকট যুক্তরাজ্যের নিজস্ব ডলার ঘাটতি ১৯৪৭ সালে ৬৫'৫ কোটি পাউণ্ড এবং ১৯৪৮ সালে ৩৪ কোটি পাউণ্ডে দাঁড়ায়। ১৯৪৯ সালের প্রথমার্দ্ধেই ডলার অঞ্চলের ঘাটতি মোট ১৩'৫ কোটি পাউণ্ড হয়।

১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি ডলার বাজারের ষ্টার্লিং অঞ্চলের

প্রাথমিক মাল রপ্তানীর মূল্য কমিয়া যায়। ১৯৪৯ সালের মার্চ্চ মাসে রবার, টিন, কোকো, কফি, চা, পশম, হীরা প্রভৃতি হইতে ষ্টার্লিং অঞ্চলের ত্রৈমাসিক আয় ছিল প্রায় ১২ কোটি ডলার, কিন্তু মার্চ্চ ও জুন মাসের মধ্যে উহা অর্দ্ধেক হইয়া যায়। ব্রিটেনে প্রস্তুত রপ্তানী দ্রব্যাদির মধ্যে জামাকাপড়, ধাতু-জাত দ্রব্য, কলকারখানার জন্য যন্ত্রপাতি, গাড়ী ইত্যাদির বিশেষ ক্ষতি হইতে থাকে। ১৯৪৯ সালের প্রথম পাঁচ মাসের মধ্যে এই রপ্তানীর মাসিক গড়পড়তা হার গত বৎসরের শেষ অংশের রপ্তানী হার অপেক্ষা শতকরা ১৪ ভাগ কমিয়া গিয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রে ষ্টার্লিং অঞ্চলের রপ্তানীর বাজার মন্দা হইবার কারণ প্রধানত: দ্বিবিধ :

(১) মন্দার সূচনা দেখা দেওয়াতে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসায়ীদের মধ্যে নূতন নূতন পণ্যদ্রব্য আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হওয়া এবং (২) যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যহারের ক্রমিক হ্রাসপ্রাপ্তি। কৃত্রিম রবার উৎপাদন হওয়ায় মালয়ে রবার এবং কাগজের ব্যাগের ব্যবহারের দরুন ভারতীয় পাটজাতদ্রব্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয় ও অচল অবস্থার উদ্ভব হয়।

এই অবস্থা চলিতে থাকায় ব্রিটেনে ও ষ্টার্লিং অঞ্চলসমূহের সোনা এবং ডলার সঞ্চয় কমিতে থাকে। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ব্রিটিশ মুদ্রামূল্য হ্রাসের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বেতারযোগে জানান যে ১৯৪৯ সালে জুলাই হইতে 'সঞ্চয়' দ্রুতগতিতে নি:শেষিত হইতে শুরু করে এবং 'মার্শাল সাহায্য' দ্বারা ব্রিটেন তাহা পূরণ করিতে পারে নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যদি 'সঞ্চয়'র ক্রমশ: হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতে উহা শূন্যতায় পর্য্যবসিত হইবে। এই সঞ্চয়ের উপর সমগ্র ষ্টার্লিং অঞ্চলের আশা-ভরসা ; শুধু ব্রিটেন নহে—ষ্টার্লিং অঞ্চলের সকল দেশই মার্কিন ও কানাডার স্বর্ণ এবং ডলারের কেন্দ্রীকৃত ভাণ্ডারের অংশীদার হিসাবে প্রয়োজনমত খরচ চালাইতে পারিবে। ১৯৪৭ সালে যখন কেন্দ্রীকৃত সঞ্চয়ে টান পড়ে, তখন এইরূপ নীতি নির্দ্ধারিত হয় যে, সঞ্চয়কে ৫০ কোটি পাউণ্ডের কম নামিতে দেওয়া চলিবে না। সঙ্কট শীঘ্রই দেখা দিল। ১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সঞ্চয় মোট ৪৫'৭ কোটি পাউণ্ডে দাঁড়ায়। ইহার সহিত যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় পুনর্গঠন সাহায্য-ভাণ্ডার হইতে আরও ৯ কোটি পাউণ্ড সাহায্য প্রদত্ত হয় ; ১৯৪৬, ১৯৪৭ সালে এবং ১৯৪৮ সালের প্রথমার্দ্ধে ষ্টার্লিং অঞ্চলের কেন্দ্রীকৃত ভাণ্ডারের নীট হিসাব এইরূপ ছিল :

	১৯৪৬	১৯৪৭	১৯৪
যুক্তরাজ্য	—৩৪২	—৬৫৭	—১৮৬
ষ্টার্লিং অঞ্চলের অবশিষ্ট অংশ	+৪৫	—২০৪	—১৯
সমগ্র ষ্টার্লিং অঞ্চল	+৭১	—১৬৩	—৪৯
মোট	—২২৬	—১০২৪	—২৫৪

কমনওয়েলথের অর্থসচিবদের সম্মিলনীতে ব্রিটেনের ডলার-সঙ্কটের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। ১৯৪৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভেই ওয়াশিংটনে ষ্টার্লিং-ডলার আলোচনার ফলে ব্রিটেন, কানাডা, আমেরিকা সম্মিলিতভাবে একটি কর্ম্মতালিকা প্রণয়ন করেন। ১৯৪৯ সালে ১২ই সেপ্টেম্বর আলোচনার ফলাফল জানাইয়া যে ইস্তাহার প্রকাশিত হয় তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ ছিল :

(১) আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক ও রপ্তানী-আমদানী ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন দেশে আমেরিকার মূলধন বিনিয়োগের প্রসার চাই।

(২) যুক্তরাষ্ট্রের সঞ্চয়বৃদ্ধি ব্যবস্থার পুনর্বিবেচনা এবং আসল রবার বিক্রয় বাড়ানোর প্রয়োজন।

(৩) 'মার্শাল সাহায্য' ডলারের ব্যাপক ব্যবহার চাই।

(৪) বাণিজ্য-চুক্তিদ্বারা যুক্তরাষ্ট্রে আমদানীশুল্ক সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা আবশ্যক।

(৫-৯) 'উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং' সমস্যার আলোচনা, জাহাজী কারবার, পেট্রল ব্যবসার আলোচনা।

(১০) পুন: পুন: আলোচনা চালাইবার নিয়ম প্রবর্ত্তন।

কিন্তু ইস্তাহারে প্রস্তাবিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ব্রিটিশ পাউণ্ড ষ্টার্লিঙের মূল্যহ্রাসকে ডলার-সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া স্থির করেন। ১৯৪৯ সালে ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রে বেতারে উহা বিজ্ঞাপিত হইলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিশেষ চিন্তা ও উদ্বেগের সঞ্চার হয়।

আমরা পাউণ্ডের মূল্যহ্রাসের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। ১৯৪৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণ-কারীদের বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইলে, এ বিষয়ে নি:সংশয় হওয়া গেল যে ষ্টার্লিঙের মূল্যহ্রাস অবশ্যম্ভাবী। উক্ত বিবরণীতে আছে যে সমস্ত দেশে ডলার ঘাট্‌তি বিদ্যমান সেগুলির মুদ্রামূল্যের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। ডলার অঞ্চলের রপ্তানী প্রসারের উপায়-স্বরূপ যথারীতি মূল্য কমানো একমাত্র বিনিময়হারের পরিশোধনে চলিতে পারে। এইজন্য পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৪'০৩ ডলার হইতে ২'৮৪ ডলারে দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে ষ্টার্লিং অঞ্চলের ও বাহিরের ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা সকল দেশেরই মুদ্রার মূল্য হ্রাস হয়। এই প্রসঙ্গে দু দশক আগের সেপ্টেম্বর মাসের একটি দিনের কথা মনে পড়ে। ১৯৩১ সালে ২১ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিও স্বর্ণমান পরিহার করে, ফলে স্বর্ণমান আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অপ্রচলিত হইয়া যায়। কিন্তু এই সময় যে মুদ্রামূল্য হ্রাসের হিড়িক আসিল, তাহা ভিন্ন কারণে। তখন ১৯৩১ সালে পৃথিবীব্যাপী মন্দা ও সঙ্কোচন চলিতেছিল। দুই বৎসর মন্দা থাকার ফলে ১৯৩১ সালে ব্রিটেনে বেকারের সংখ্যা ২৭

লক্ষ ৫০ হাজারে দাঁড়ায়। এখন বেকারের সংখ্যা আড়াই লক্ষেরও কম, মূলধন জমিয়া থাকিতেছে না, কলকারখানা সচল, কাজেই রপ্তানীব্যবসা অন্যান্য যোগান চালু রাখিয়া প্রসারলাভ করিতে পারে এবং এই সম্প্রসারণের ফলও মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে।

ভারতের পরিশোধনীয় উদ্বৃত্ত ডলারও দুষ্প্রাপ্য মুদ্রাঞ্চলে ক্রমশ: যে ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা আমাদের জাতীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাজেট পেশ করিবার সময় অর্থসচিব প্রসঙ্গক্রমে ডলার ঘাটতির শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত ছিল এবং যুদ্ধের কয়েক বৎসরেও উহা বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধজনিত অভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভারতবর্ষেও ডলার ঘাটতি সুরু হইল। দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা অঞ্চলের সহিত ভারতের চলতি কারবারে ১৯৪৬ সালে আয় দাঁড়াইয়াছিল ৪'৮ কোটি টাকা, কিন্তু ১৯৪৭ সালে মোট ৮৫'৮ কোটি টাকা ঘাটতি হইল। ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে এই ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও আশঙ্কা করিবার মত অবস্থার উদ্ভব হয় নাই কারণ তখন ষ্টার্লিং অঞ্চলের সোনা ও ডলার সঞ্চয়ের কেন্দ্রীকৃত ভাণ্ডার হইতে ঘাটতি পূরণ চলিতেছিল। প্রচুর ষ্টার্লিং খরচ করিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকারও ভারতের ছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী হইতে যুক্তরাজ্য বাঁধাধরা নিয়মে ষ্টার্লিং খরচ করিবার অনুরোধ জানায়। বহু আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের পর স্থির হয় যে, কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে মোট ডলার ও দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা ঘাটতির চাহিদার আংশিক যোগান দেওয়া হইবে। ভারতবর্ষ আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে ডলার ক্রয় করিতে থাকে, ফলে ঘাটতির পরিমাণও বাড়িতে থাকে। ১৯৪৮ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষে ভারতবর্ষ মোট ৬'৮ কোটি ডলার ক্রয় করে এবং ১৯৪৯ সালে মার্চ্চ মাসের পৌনঃপুনিক ক্রয়ের দরুন উহা ১০ কোটিতে দাঁড়ায়। ১৯৪৮ সালে ভারতবর্ষের চলতি আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনের ব্যাপারে শুধু যে ডলার ও দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা অঞ্চলের সহিত ঘাটতি হইল তাহা নহে; ষ্টার্লিং এবং অন্যান্য অঞ্চলের সহিত উহা দেখা দিল। প্রথমোক্তের সহিত নীট ঘাটতি ৬৩'৮ কোটি টাকা এবং শেষোক্তের সহিত ১২'১ কোটি টাকা ঘাটতি দাঁড়াইল। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বর্ত্তমানে যেভাবে চলিতেছে তাহাতে ডলার এবং দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা অঞ্চলের সহিত এই দেশের উদ্বৃত্ত দেনাপাওনার ব্যাপার আশাপ্রদ নহে। ১৯৪৯এর প্রথমার্দ্ধে জলপথে রপ্তানী মাল কমিতে থাকিলে পরিশোধনীয় উদ্বৃত্তের অবস্থা শোচনীয় হইল। পূর্ব্ব বৎসরে এই সময়ে ২০৯ কোটি টাকার রপ্তানীদ্রব্যের তুলনায় এই বৎসর মাত্র ১৮৪ কোটি টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল অর্থাৎ ২৫ কোটি টাকার কম পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হয়, তাহা হইতে ১৪ কোটি টাকা দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা অঞ্চলের ঘাটতি হয়। ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ যে কমিতে থাকে তাহা তৈরি ও কাঁচা পাটের অভাবের জন্য। মোট ৭২ কোটি টাকার তৈরি পাট রপ্তানী হইত, তাহা কমিয়া গিয়া ৫৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায় এবং দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা অঞ্চলের ঘাটতি হয় ৩৫ কোটি হইতে ২৫ কোটি টাকা। পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া যাওয়ার প্রধান কারণ—যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা পড়া এবং সস্তা দরের নিকৃষ্ট ও বদলী (substitutes) মালের প্রচলন।

দেশবিভাগের ফলে ভারতে আজ যে কি মারাত্মক আর্থিক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহা বলিয়া বুঝানো যায় না। ইহার দরুন ভারতরাষ্ট্রে বৈদেশিক বাণিজ্যের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। ভারত তাহার স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুবিধা হারাইল; দুনিয়ার রপ্তানী-বাণিজ্যে পাটের একচেটিয়া অধিকার ছিল অবিভক্ত ভারতের। কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে ভারতীয় ইউনিয়নকে আজ কাঁচা পাটের বৃহত্তম আমদানীকারক হইতে হইয়াছে। এখন পাকিস্থান হইতে ভারতের কারখানার জন্য ১০ লক্ষ টন পাট আমদানী হইতেছে, তুলার অবস্থাও একই রকম। অবিভক্ত ভারত হইতে কাঁচা তুলা রপ্তানী হইত, কিন্তু ভারতীয় ইউনিয়নে আজ পাকিস্থান এবং অন্যান্য অঞ্চল হইতে ১০ লক্ষ গাঁট তুলা আমদানী করিতে হয়। অবিভক্ত ভারতের রপ্তানীদ্রব্যের মধ্যে পাট এবং তুলার পরেই ছিল চামড়া এবং চামড়াজাত-দ্রব্যের স্থান। দেশবিভাগের পূর্ব্বে এই চামড়া ছিল ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম অঙ্গ, কিন্তু আজ পাকিস্থান চামড়ার প্রধান উৎপাদন-কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে পাট ও তুলা অপেক্ষা উহা সহজপ্রাপ্য। ভারতীয় ইউনিয়নের পণ্য-দ্রব্য রপ্তানী করা যে দরকার তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। ১৯৪৮ সালে চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানী করিয়া ১৭'৪ কোটি টাকা আয় হয় এবং এই রপ্তানী করা চামড়ার পরিমাণ ছিল ৩২,১২৩ টন। তৈলবীজ ক্ষেত পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তবুও রপ্তানীর পরিমাণ বর্ত্তমানে কমিয়া যাইতেছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে ভারতে ইহার চাহিদা ক্রমশ: বাড়িতেছে। চা এবং তৈরি পাট রপ্তানী-চালান বজায় রাখিতে পারিলে ভারতীয় ইউনিয়নের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

খাদ্যশস্যাদির আমদানীর ফলে আন্তর্জ্জাতিক দিক দিয়া আমদানীর অবস্থার অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে খাদ্যশস্যের আমদানী বৎসরে গড়ে ৫০ লক্ষ টন ছিল, কিন্তু আজ উহা পাঁচ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশ ও শ্যাম পূর্ব্বে আমাদের খাদ্যশস্যের ঘাটতি পূরণ করিত, কিন্তু

নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে—এ কারণ ঐ দেশগুলি আমাদের ঘাটতি পূরণে তেমন ভাবে সহায়ক হইতে পারিতেছে না। আমাদের নিজস্ব উৎপাদন লোকবৃদ্ধির সমানুপাতে বাড়ে নাই বলিয়া আমাদের অভাব প্রচুর, কাজেই আমরা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে, বিশেষতর ডলার অঞ্চল হইতে আনিতে বাধ্য হই। ফলে ভারতে ডলার ঘাটতি ক্রমশ: বাড়িতে থাকে। ১৯৪৮ সালে দুষ্প্রাপ্য অঞ্চল হইতে আমদানীর জন্য আমাদের ১০ কোটি ডলার ব্যয় হয়। এই অঙ্ক আমাদের খাদ্য আমদানীর মোট ব্যয়ের শতকরা ৩৩⅓ এবং দুষ্প্রাপ্য মুদ্রাব্যয়ের শতকরা ৬৬⅔।

দেশবিভাগের পর অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্যে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য দেশে শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় কমিয়া যাওয়ায় দেশীয় শিল্পের বাজার মন্দা হইয়াছে। মূলধন প্রসার ইত্যাদি কিছুই হইতেছে না। চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ার দরুন বিদেশ হইতে, বিশেষত: যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের হিসাবে প্রচলিত মুদ্রা অঞ্চলের দ্রব্য আনিতে বাধ্য হওয়াতে ভারতে ডলার ঘাটতি ঘটিতেছে। ডলার-বাজারে ভারতীয় দ্রব্য এক রকম বিকাইতেছে না বলিলেই চলে। ১৯৪৬-৪৮ সাল অপেক্ষা এই সমস্ত দেশে রপ্তানীর মূল্য বাড়িতেছে বটে, কিন্তু তৈরি পাট, চা এবং খনিজ দ্রব্যের রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে—ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের চড়া দামের জন্য এইরূপ ঘটিতেছে। ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত যে, দুষ্প্রাপ্য অঞ্চল হইতে যে সকল সহজপ্রাপ্য মুদ্রা অঞ্চলে পণ্যদ্রব্য বিকাইতেছে, সে সমস্ত দেশের অতিসম্প্রসার অবস্থাই ভারতীয় মুদ্রার উচ্চমূল্যের জন্য দায়ী। এইজন্য পশ্চিম ইউরোপের স্থানে স্থানে ভারতীয় দ্রব্য যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পণ্যদ্রব্য অপেক্ষা অনায়াসে বিকাইয়া যাইতেছে। ডলার-সমস্যা শুধু ভারতের সম্প্রসার অবস্থা থাকার জন্য ঘটে নাই ; অন্যান্য সহজপ্রাপ্য মুদ্রা অঞ্চলে অধিক পরিমাণে চলতি সম্প্রসার নীতিই ইহার জন্য দায়ী। দুর্মূল্য দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা অঞ্চলে আমাদের দ্রব্য বিকাইতেছে না ইহাই আমাদের আর্থিক সঙ্কটের মুখ্য কারণ এবং ডলার সমস্যা সমাধানের প্রধান অন্তরায়।

আলোচনা

"সেকালের বেথুন কলেজ ও স্কুল"

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উক্ত নামের প্রবন্ধে শ্রীযুক্তা বাসন্তী চক্রবর্ত্তী গত মাসের 'প্রবাসী'তে লিখিয়াছেন : "আমার মা লীলাবতী মিত্র···১৮৭৯ সালে বেথুন স্কুলে পড়তেন। তিনি তখনকার স্কুলের কথা নিজের ডায়েরীতে যা লিখে গিয়েছিলেন তা পূর্ব্ব থেকে এখানে কিছু বলছি।" শ্রীযুক্তা চক্রবর্ত্তী বোধ হয় অবগত নহেন যে, লীলাবতী মিত্র ১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতী'তে "পুরাতন বেথুন স্কুল" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস

ভারতের অতীত ছিল পণ্ডিতের ধ্যান, শিল্পীর সাধনা, জনগণের আনন্দক্ষেত্র। পরাধীন দেশ ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি দেখেছে সেই অতীতে। তবু একান্ত প্রত্যক্ষতা ছিল না সেই অতীতের, আপন বলে তাকে চেনা হয়নি। বিদেশীর হাতে তৈরি ঘষা কাঁচের মধ্য দিয়ে তার অস্পষ্ট মূর্তিমাত্র দেখেছে শিক্ষিত সম্প্রদায়। তার বার্তা কখনো ছড়িয়ে পড়েনি সাধারণের রাজপথে।

আজ ভারতবর্ষের জীবনের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। শুধু অতীত নয়, ভারতবর্ষের সামনে বিপুল বর্তমান, বিপুলতর ভবিষ্যৎ। তাই অতীতকে আজ নিজের চোখে নতুন করে দেখতে হবে, বর্তমানের সঙ্গে মেলাতে হবে তাকে, ভবিষ্যতের পথকে দেখতে হবে তারই আলোকে।

ধর্মে, বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রতত্ত্বে, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ভারত অপ্রতিবীর্য ছিল। সেই ভারতের দীপ্ত ইতিহাসকে সাধারণের জন্য ব্যাপকভাবে মেলে ধরেছেন ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তাই এ বই নিষ্প্রাণ তথ্যের বোঝা নয়, সজীব আলেখ্য। শুধু জানা নয়, সানন্দে জানা। সচিত্র। দাম ৪৲
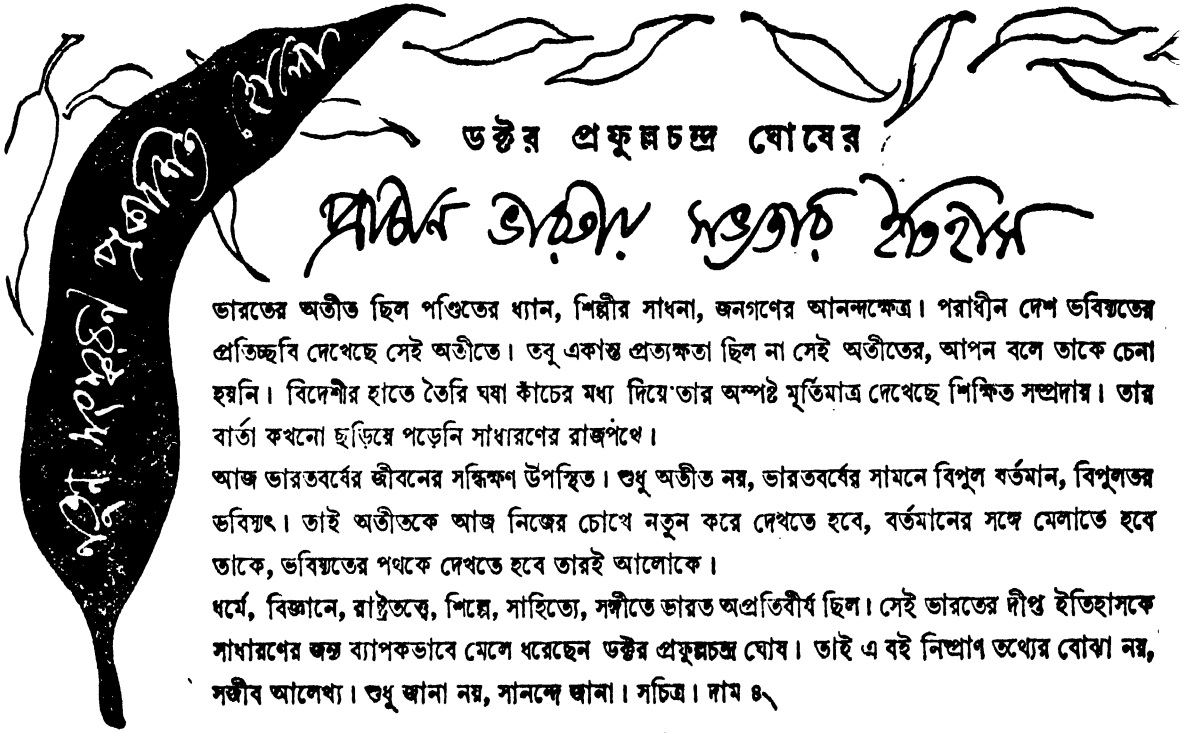
অচিন্ত্যকুমারের

দুখানা বিখ্যাত উপন্যাস

বেদে অচিন্ত্যকুমার চিরকাল নতুন পথের প্রণেতা। সনাতনের ঘেরাটোপ ভেঙে বাংলা সাহিত্যকে যাঁরা জীবনের প্রশস্ত পথে টেনে আনার বিপ্লবসাধন করেছিলেন, অচিন্ত্যকুমার তাঁদের অন্যতম অগ্রনায়ক। সেই সাহিত্যবিপ্লবের প্রথম দিকচিহ্ন 'বেদে'। অম্ল, মধুর, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত যেমন ছয়টি রস, তেমনি ছয়টি নায়িকা। কিন্তু প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন, প্রত্যেকেরই অন্তরে স্বতন্ত্র রহস্যের অন্ধকার। এই বিচিত্র, রহস্যঘন তটরেখা ছুঁয়ে ছুঁয়ে নদীর মত প্রবাহিত যার জীবন, সেই 'বেদে'। সচিত্র। দাম ৩৷৹

জননী জন্মভূমিশ্চ মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারের একটি চিরকালিক সমস্যার আধুনিকতম আলেখ্যলিখন। ভঙ্গপ্রবণ সমাজের প্রধানতম প্রসঙ্গ। পুরনোর সঙ্গে নতুনের সংঘর্ষ, সংস্কারের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যের। একটি ঘরোয়া কাহিনীকে অনুভবের গুণে গভীর বর্ণাঢ্য করে আঁকা হয়েছে। জীবন্ত ভাষা, উজ্জ্বল চরিত্র, বলিষ্ঠ মনোভঙ্গি—যা অচিন্ত্যকুমারের বিশেষত্ব, সবই এই উপন্যাসে পরিস্ফুট। দাম ২৷৹

শচীন্দ্র মজুমদারের

দুখানা অভিনব উপন্যাস

লীলামৃগয়া উপন্যাসের আঙ্গিকে কাব্যের রস পরিবেশন করলে তার আস্বাদ কতো মধুর হতে পারে 'লীলামৃগয়া'য় তার নিঃসংশয় পরিচয় মিলবে। আধুনিক সমাজ ও আধুনিক নর-নারী এই উপন্যাসের উপজীব্য, কিন্তু বিষয় সেই চিরন্তন, সেই পরকীয়া-প্রেম। ইন্দ্রিয়াতীত হয়েও যা ইন্দ্রজালের অতীত নয়। আধুনিক কালের প্রসঙ্গে পরকীয়াপ্রেমের এমন সম্মোহনী কাহিনী বাংলা সাহিত্যে আর লেখা হয়নি। দাম ৩৲

পলাতকা স্থান : এলাহাবাদ। কাল : ১৯৪২। পাত্রী : বহ্নিশিখার মতো বাঙালী এক মেয়ে। এ-মেয়ে বিজ্ঞানের সাধনা করে, পুলিশের গুলির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, প্রয়োজনে পুরুষবেশে পালিয়ে বেড়ায়। কিন্তু ছায়ার মতো অবিরাম তাকে অনুসরণ করে শুধু পুলিশবাহিনীর গোয়েন্দা নয়, লম্পট বিত্তশালী এক পুরুষ। সেই লালসাময় আলিঙ্গন থেকে তার উর্ধশ্বাস পলায়ন। নতুন যুগের নারী, যেন নারীচরিত্র থেকেই পলাতকা। সচিত্র। দাম ৩৲

১০/২ এলগিন রোড, কলিকাতা ২

ভারত-পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০নং বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯২ পৃষ্ঠা, মূল্য আড়াই টাকা।

এই গ্রন্থের লেখক অরবিন্দ বারীন্দ্র প্রবর্ত্তিত বাংলার অগ্নিযুগে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই যুগের উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দাদা শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অরবিন্দ বারীন্দ্র পরিচালিত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার একজন ধারক ছিলেন। বালক উপেন্দ্রনাথ তখন যে অনুপ্রেরণা লাভ করেন, তাহাই জীবনের ঋজু কুটিল পথে তাঁহাকে চালিত করিয়াছে, মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার শক্তিদান করিয়াছে। আজ পরিণত বয়সে সেই স্মৃতি অবলম্বন করিয়া তিনি এই বইখানি লিখিয়াছেন। পড়িয়া মনে হয় এই স্মৃতিই মাত্র তাঁর সম্বল।

সেইজন্য সেই বয়সে যাহা শুনিয়াছিলেন, অনেক সময় হুবহু তাহারই পুনরুক্তি করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ৭০ পৃষ্ঠার "বন্দেমাতরম" দৈনিক পত্রিকার জন্মকথা সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছেন, তাহা ৪৬ বৎসর পরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিপিনচন্দ্র ৫০০৲ টাকার প্রতিদানে তাঁর "নিউ ইণ্ডিয়া" সাপ্তাহিকের রাজনৈতিক আদর্শ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এ ধরণের অশ্রদ্ধেয় উক্তি উপেন্দ্রনাথের নিকট প্রত্যাশা করি নাই। এরূপ পণ্য মূল্যে রাজনীতিক মতামত বিক্রয় করার প্রস্তাব যিনি করেন ও যিনি গ্রহণ করেন, দু'জনের কাহারও মান তাহাতে বৃদ্ধি পায় না।

ইহা ছাড়া ছোটখাটো ভুল কিছু কিছু আছে। কিন্তু অগ্নিযুগের সাধারণ চিত্ররূপে এই বইখানিকে গ্রহণ করা যায়। দ্বিতীয় সংস্করণে ভ্রম-প্রমাদ সংশোধন করা কঠিন নয়। কারণ সেই যুগের দলাদলির উর্দ্ধে থাকিয়া অনেক লেখক সে যুগের যে সকল ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আলোচ্য পুস্তকের অনেক ত্রুটি দূর করিবার উপযোগী তথ্যাবলী পাওয়া যাইবে।

বিভক্ত ভারত—শ্রীবিনয়েন্দ্র চৌধুরী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২নং বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১০২ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা।

আলোচ্য বইখানি বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ" গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থাবলী রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান-বিস্তারের উদগ্র আকাঙ্ক্ষার সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান। তাঁহার দেহত্যাগের পর বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষ দায়স্বরূপ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া বাঙালী গৌরবান্বিত। সমালোচ্য বইয়ের লেখক কলিকাতা নগরীতে কলেজের অধ্যাপক ছিলেন; দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগেও কাজ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি ভারত-রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রচার-বিভাগের কর্ম্মচারী। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় তাঁহার একখানি বই আছে। বর্ত্তমান পুস্তকে তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানের পরিচয় পাইলাম না।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যার উৎপত্তি হইয়াছে যে ভাবের ও চিন্তার তাড়নায়, মুসলিম মনের 'জমিনে' যে পার্থক্য-বোধ সদাজাগ্রত, তার ব্যাপক কোন, আলোচনা—এই মনোভাবের প্রকৃতির, গতি-পরিণতির আলোচনা এই বইয়ে দেখিতে পাইলাম না। অথচ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের দপ্তরেই লেখক এই বিবর্ত্তনের অনেক প্রমাণ পাইতেন, তথ্যের এই ভাণ্ডার বইখানিকে সমৃদ্ধ করিত। লেখক মুসলিম মনের বহিঃপ্রকাশ লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন, গভীরে যাইতে চেষ্টা করেন নাই।

বইয়ের ১৫ পৃঃ ৬ষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে একটা ভুল আছে, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বড়লাটপত্নী লেডী মিণ্টোর নিকট পত্র লিখিয়া উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিলেন, বড়লাটের নিকট নয়।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য আট টাকা, কাপড়ে বাঁধাই দশ টাকা।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান কবি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। মুসলমানী আমলের শেষ এবং ইংরেজী আমলের প্রারম্ভ কাল তিনি আলোকিত করিয়াছিলেন। বাংলা কাব্যের ছন্দে ও শব্দে তিনি এক অপূর্ব্বত্ব আনয়ন করেন। বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে রায়গুণাকর অদ্বিতীয়। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। ইহার অনেকগুলি হস্তলিখিত এবং মুদ্রিত সংস্করণ আছে। চারিখানি পুঁথি ও চারিখানি পুরাতন মুদ্রিত সংস্করণ মিলাইয়া এই গ্রন্থাবলী সম্পাদিত হইয়াছে। প্রধানতঃ বিদ্যাসাগর সংস্করণের পাঠই সম্পাদকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। ফুটনোটে পাঠান্তরগুলি দেওয়া হইয়াছে। প্রারম্ভে একটি মূল্যবান ভূমিকা আছে। বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত। অন্নদামঙ্গল ছাড়া গ্রন্থা-

বলীতে রসমঞ্জরী এবং বিবিধ কবিতা আছে। পরিশিষ্টে দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ ও টিপ্পনী দেওয়া হইয়াছে। আধুনিক পাঠকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। ছাপা পরিষ্কার। পরিষৎ-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ। এই সংস্করণ প্রকাশ করিতে সম্পাদকীয় যত্ন ও পরিশ্রমের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র রায়ের এই সুষ্ঠু, নির্ভুল এবং প্রামাণিক সংস্করণ কাব্যামোদী পাঠকের আনন্দের কারণ হইবে।

উদয়াস্ত—শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। হিন্দুস্থান বুক ডিপো লিঃ, ১২ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৸০।

এখানি ছোট গল্পের বই। বইখানিতে অসাধারণ, স্বপ্নভঙ্গ, বিরহ, অপমৃত্যু, লাল শাড়ী ও শশিনাথের ফাঁসি—এই ছয়টি গল্প আছে। লেখক "প্রবাসী"র পাঠকের নিকট অপরিচিত নহেন। প্রথম দুইটি গল্প "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হয়। 'অসাধারণ' গল্পটিতে লেখক যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বিনোদিনী পাগল। পাগলের চরিত্র অঙ্কনে এবং একটি অতি করুণ রসের সৃষ্টিতে এই গল্পটি সার্থকতা লাভ করিয়াছে। অন্য গল্পগুলিও পাঠকের চিত্তকে নন্দিত করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ভারত কথা—চক্রবর্ত্তী রাজগোপালচারী। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য আট টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে মহাভারতের কাহিনী সহজ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী রাজগোপালাচারী একজন উঁচুদরের রাজনীতিজ্ঞই নহেন, তিনি একজন প্রবীণ সাহিত্যিকও। তাঁহার বক্তৃতা একাধিকবার শোনার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। অতি ক্ষুদ্র বিষয়ের উপরও তিনি সাহিত্যের রং ফলাইতে সুপটু। লেখায় তাঁহার এই সাহিত্যিক গুণপনা সুপরিস্ফুট। মাতৃভাষা তামিলে তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক। "ভারত কথা" মূলতঃ তামিল ভাষায় লিখিত। 'কল্কি' নামক একখানি তামিল সাপ্তাহিকে কাহিনীগুলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া পরে পুস্তকাকারে গ্রথিত হইয়াছে। 'ব্যাসদেবের ভোজ' শিরোনামে তখন এগুলি বাহির হইত।

রামায়ণ মহাভারত ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক ও বাহক। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতভূমিতে কত শত বিপ্লব বিদ্রোহ মাৎস্যন্যায় ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতীয় জীবনের শাশ্বত রূপটি বদলায় নাই, উপরন্তু তাহা ক্রমশঃ নানা ভাবে বিকশিত হইয়াই চলিয়াছে। ইহার কারণ বহুবিধ হইতে পারে, তবে একটি প্রধান কারণ এই মনে হয় যে, আসমুদ্রহিমাচল সর্ব্বত্র এই গ্রন্থ দুইখানি ভারতবাসীর জীবনীশক্তির মূলে যুগ যুগ ধরিয়া রস পরিবেশন করিয়া চলিয়াছে। আমাদের কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইহার মধ্য হইতে যে কতরূপ প্রাণবস্তুর সন্ধান পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। চক্রবর্ত্তী রাজগোপালচারী মহাভারত হইতে এক শত আটটি কাহিনী পর পর এই গ্রন্থখানিতে সাজাইয়াছেন। শাশ্বত বা চিরন্তন বস্তু আমরা তাহাকেই বলি যাহার মধ্যে সর্ব্বকালের ছাপ রহিয়াছে। এই কাহিনীগুলি পাঠ করিলে, আমরা ভুলিয়া যাই আমরা সেকালের কথা শুনিতেছি, মনে হয় আমাদের আধুনিক কালেও তো এইরূপ ঘটিয়া থাকে। রাজসূয় যজ্ঞ কালে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বপ্রথম অর্ঘ্যদানের ফলে কতিপয় নৃপতির সহিত শিশুপালের সভা ত্যাগ আধুনিক কালের আইন-পরিষদ ও সভা-সমিতি হইতে "Walk-out" বা বহির্গমন কথাটিই স্মরণ করাইয়া দেয় না কি?

তামিল ভাষায় লিখিত মূল পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত শেষাদ্রি নামে একজন তামিল ভাষাভাষী। দাক্ষিণী অবাঙালী বাংলা ভাষায় কতখানি ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন আলোচ্য পুস্তকখানি তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পুস্তক পাঠকালে ইহাকে অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। ভাষার গাম্ভীর্য্যে ইহার লালিত্য আদৌ ব্যাহত হয় নাই। পাঠ কালে বরং মনে হয়, আমরা নৈমিষারণ্যে শৌনিক মুনির পার্শ্বে বসিয়া পুরাণ-বক্তা সূত কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ভারত-কথা শ্রবণ করিতেছি। পুস্তকখানি পাঠক সমাজে আদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

ছড়ার ছবি (২)—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক চিত্রিত। শিশু সাহিত্য সংসদ, ৩২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

'ছড়ার ছবি' ১নং আমরা ইতিপূর্ব্বে সমালোচনা করিয়াছি। আলোচ্য-খানিও বহিঃসৌষ্ঠবে প্রথম পুস্তকের মতই হইয়াছে। চিত্রে, ছড়ায়, সজ্জায় এখানিও মনোমুগ্ধকর। আমরা যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত দেশ-সমূহের সঙ্গে সমানে টেক্কা দিয়া চলিতে পারি এই ধরণের শিশু সাহিত্য প্রকাশে তাহাই সূচিত হইতেছে। মলাট সমেত ষোল পৃষ্ঠা, প্রত্যেক পৃষ্ঠাই বহুবর্ণ চিত্রে সুশোভিত। মলাটের বাহিরের দুই পৃষ্ঠা বাদে, চৌদ্দ পৃষ্ঠায় চৌদ্দটি সুপরিচিত ছড়া ও তৎসঙ্গে প্রত্যেকটি ছড়ার বিষয়বস্তু লইয়া অঙ্কিত চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, পুস্তকখানি পাইয়াই পাঁচ বৎসরের [illegible] চিত্রের [illegible] ছড়াগুলিও মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে।... শিশুদের বর্ণপরিচয়ের [illegible] ধরণের রঙীন ছবি দ্বারা সুচিত্রিত হইতে পারে না কি? শিশু-সাহি[illegible]রবেশনে সংসদের প্রয়াস সার্থক হউক, ইহাই কামনা।

বর্ষ দীপিকা ১৩৫৭—শ্রীনেপালশঙ্কর সরকার। "বিশ্ব-সংস্কৃতি প্রকাশনী, ১-[illegible]াইম ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৫। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

ইদানীং বাংলা ভাষায় কয়েকখানি 'ইয়ার-বুক' বা বর্ষলিপি বাহির হইতেছে। আলোচ্য পুস্তকখানি তন্মধ্যে একটি। প্রতি বৎসর আমাদের জ্ঞানের এবং জ্ঞাতব্য বিষয়াদির পরিধি কিরূপ বিস্তৃত হইয়া চলিয়াছে, এক একখানি বর্ষলিপি তাহার এক একটি নিদর্শন। আলোচ্য বর্ষলিপিখানিও ইহার ব্যতিক্রম নহে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক তাহার অনেকগুলিই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আবার এমন কতকগুলি বিষয়ও ইহাতে স্থান পাইয়াছে যাহা আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে আসে না, বটে, তবে সে সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই মোটামুটি একটা ধারণা থাকিলে ভাল হয়। জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতবর্ষের ইতিহাস, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি অধ্যায়গুলি শেষোক্ত পর্য্যায়ে পড়ে। এই সকল গুরুতর বিষয় সঙ্কলন যে কিরূপ শ্রম ও সময়-সাধ্য সে সম্বন্ধে হয়ত অনেকে ওয়াকিবহাল নন। এ সকলের পরিচয় প্রদানের চেষ্টা গ্রন্থ-সম্পাদকের ব্যাপকতর দৃষ্টিই সূচিত করে। গ্রন্থে প্রদত্ত বিষয়সমূহ যাহাতে ভ্রমপ্রমাদশূন্য হয় সে দিকেও অবশ্য তাঁহার নজর

দেওয়া প্রয়োজন। 'বাংলা সাহিত্য' অধ্যায়ে ৬৭৪ পৃষ্ঠায় ১৮৫১ সনে প্রকাশিত 'কীর্ত্তিবিলাস' কি 'যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের'?

গ্রন্থখানিতে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, শাসনতন্ত্র, শাসনের বিভিন্ন অঙ্গ ও তাহাদের কার্য্য, দেশ-বিদেশের খবরাখবর ও মনীষীদের জীবনী প্রভৃতি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী ও সরকারী বিভাগসমূহের অধিকর্ত্তা প্রত্যেকেরই নিত্য-সঙ্গী হওয়া উচিত। ইহা তাঁহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে।

স্বর্গীয় দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ব্ববঙ্গ ১ম ও ২য় খণ্ড—শ্রীঅদিনাথ সেন। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে তিন টাকা ও চারি টাকা।

সম্প্রতি নানা কারণে পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এই সময় এই পুস্তক দুই খণ্ড হাতে পাইয়া মনে কতকটা আশার সঞ্চার হইল। যাহাদের অতীত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত তাহারা বিপদ-আপদ উত্তীর্ণ হইয়া চিরঞ্জীবী হইতে বাধ্য। গত শতাব্দীর বাঙালী সমাজের পুনরুজ্জীবন কল্পে পূর্ব্ববঙ্গের দান সামান্য নহে। আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠে এই কথাই বার বার মনে হইয়াছে। দীননাথ ১৮৪০ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯৮ সনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই দীর্ঘ ষাট বৎসরের মধ্যে বাঙালী জাতি শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে গভীর চিন্তাশীলতা এবং কর্ম্মনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। দীননাথের জীবনীর আলোচনা প্রসঙ্গে এ সকল দিকেও বিশেষ আলোকপাত করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কৃতি ও কীর্ত্তির কথাও যে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বংশপরিচয় ও জীবনকাহিনী, বাল্যজীবন ও ছাত্রাবস্থা, শিক্ষাব্রতী দীননাথ, ইন্সপেক্টর দীননাথ, সমাজ সংস্কারক দীননাথ, বিদ্যোৎসাহী দীননাথ, শিল্পশিক্ষা ও বাণিজ্যে দীননাথ, উদ্ভাবনে ও পরিকল্পনায় দীননাথ, শাসন-সংস্কারক দীননাথ, ব্যক্তিগত জীবনে দীননাথ—এই দশটি অধ্যায়ে দীননাথের জীবনের ও তৎকালীন বঙ্গদেশের বিস্তর তথ্য ও কাহিনী লেখক মনোরম ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

পুস্তকখানির দ্বিতীয় খণ্ড মোটামুটি ইহার পরিশিষ্ট অংশ। প্রথম খণ্ডের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত বিস্তর জ্ঞাতব্য বিষয় এখানিতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। মাণিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট বৈদ্য পরিবার-সমূহের বিবরণ, পঞ্জিকা-সংস্কার বিষয়ক দীননাথের মতামত ও তাঁহাকে লিখিত এ সম্পর্কীয় চিঠিপত্র, তাঁহার সম্বন্ধে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত, দীননাথকে লিখিত বিভিন্ন মনীষীর পত্র, শিল্প বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধীয় দীননাথের পরিকল্পনা, অন্যান্য রচনা ও চিঠিপত্র এই খণ্ডটি সুসমৃদ্ধ করিয়াছে। এখানে একটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ ১৮৭৫ সনের ২৫শে অক্টোবর কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান লীগ নামক যে রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এদেশবাসীদের শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা। এই বিষয় একটি পরিকল্পনা রচনার ভার পড়ে দীননাথের উপর। তদ্রচিত পরিকল্পনাকে ভিত্তি করিয়া ইণ্ডিয়ান্ লীগের তত্ত্বাবধানে 'এলবার্ট টেম্পল অব্ সায়েন্স' নামক একটি শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এদেশে শিল্প কারখানা, বিশেষতঃ বস্ত্রশিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠায় দীননাথ স্বদেশবাসীদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে এই সকল বিষয় সংযোজিত হওয়ায় ইহার মূল্যও যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। গত শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাসের বহু উপাদান এই পুস্তকখানিতে মিলিবে।

সাধিকামালা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।
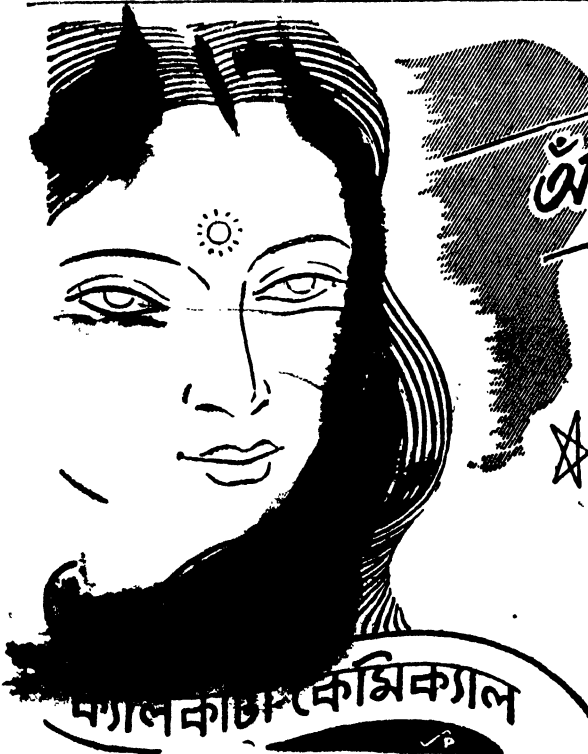
আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার পৌরাণিক যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত দেশ-বিদেশের ষোল জন সাধিকামণির জীবন-কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহারা যথাক্রমে—শবরী, সান্তা ক্লারা, মীরাবাই, থেরেসা নিউমান, অঘোরমণি দেবী, গোলাপসুন্দরী দেবী, এমা কালভে, যোগেন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস, অণ্ডাল, সেন্ট টেরেসা, তাপসী রাবেয়া, সেন্ট ক্যাথারাইন, সন্ন্যাসিনী গৌরীপুরী, ভগ্নী নিবেদিতা, সারদামণি দেবী, সংঘমিত্রা। গ্রন্থকার কাল বা যুগের ধারাবাহিকতা রক্ষা না করিয়া পৃথক্ পৃথক্ নিবন্ধে ইঁহাদের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। কাজেই যদৃচ্ছা পাঠ করিলেও পাঠকের পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না। আধুনিক ছাত্র-ছাত্রীর নিকট এ সকল জীবন-কথার বিশেষ মূল্য আছে। বইখানির ভাষা প্রাঞ্জল এবং বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

সুতোর জন্মকথা—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ঝাঁট লাহাড়ী (বাঁকুড়া) হইতে বিবেকানন্দ শিল্পী সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত; মূল্য এক টাকা মাত্র।

পুস্তিকখানিতে গল্পচ্ছলে অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় মনোজ্ঞ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। কিশোরদের জন্য লেখা হইলেও বয়স্করাও পড়িয়া আনন্দ লাভ করিবেন। লেখকের প্রতিপাদ্য—নিতান্ত আকস্মিকভাবে প্রথমে পশমের সুতা ও পরে তুলার সুতা প্রস্তুতের সূত্রপাত হয়। এই কথার সপক্ষে যে যুক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। বুনিয়াদি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এরূপ পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন আছে; কেবল ছাত্রদের নয়, শিক্ষক মহাশয়দেরও ইহা বিশেষ কাজে আসিবে। পুস্তকে প্রদত্ত ছবিগুলি বিষয়বস্তু বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করে।

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

কপালকুণ্ডলা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৲ টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে ও মৃত্যুর পরে এই উপন্যাসখানি লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে। কোন কোন সমালোচকের মতে কপালকুণ্ডলাই বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। শুধু এই একখানি গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবেই বঙ্কিম বাংলা-সাহিত্যে অমরত্বের দাবি করিতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হওয়ায় এই গ্রন্থ লইয়া আলোচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে। তা ছাড়া বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হওয়ায় ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্ত্যখণ্ডে ইহার রচয়িতারূপে বঙ্কিমের যশ বিস্তৃত হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলার কাহিনী, চরিত্র ও তত্ত্বনিরূপণ চেষ্টায় যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা তত্ত্ব,' গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর 'কপালকুণ্ডলা, বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা ও সমালোচনা' ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা চরিত্র সমালোচনা' প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত আলোচ্য গ্রন্থখানিও এই সব সার্থক তত্ত্ব-নিরূপণের পর্য্যায়ে পড়ে। গ্রন্থের আদিতে আছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী, গ্রন্থ-রচনা ও নামকরণের ইতিহাস, আখ্যায়িকার কালনির্ণয়, ঘটনাস্থলের পরিচয় এবং চরিত্র ও ঘটনা-সংস্থান সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা ও গ্রন্থের পরিশিষ্টে উপন্যাসে ব্যবহৃত বাক্যযোজনা রীতি, অপ্রচলিত ও দুরূহ শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ধৃতি অংশ, টীকাটিপ্পনী সহযোগে বিশ্লেষিত হইয়াছে। মোট কথা, এই সুপরিচিত গ্রন্থ সম্বন্ধে যতখানি জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব তাহা পরিবেশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা সম্পাদক করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা ও শ্রম সার্থক হইয়াছে। প্রত্যেক সাহিত্য-

রসিক, শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষার্থীর পক্ষে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ যে অপরিহার্য্য তাহা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

অনেক দিন—শ্রীপ্রভাত দেব সরকার। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩॥০ টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসটি চিন্তাপ্রধান। যুদ্ধপ্রত্যাগত মধ্যবিত্ত ঘরের এক বাঙালী যুবকের দৃষ্টিতে ও মনে যুদ্ধপূর্ব্ব দিনের সংসারের পরিবর্ত্তনটি বেশী করিয়াই আঘাত করিয়াছে। যুদ্ধোত্তর কালের সমস্যাগুলিও তার চিন্তার দুয়ারে ভিড় জমাইয়াছে। চাকুরীজীবীর ভয়-ভাবনার তালে তালে তার স্নেহ-ভালবাসার সুরটিকেও সে যেন আয়ত্তে আনিতে পারিতেছে না। একদা দানের গৌরব—গ্রহণের অমর্য্যাদায় তাহাকে পীড়িত করিতেছে। সংসারের সুখদুঃখের ভাগীদের সঙ্গে তার সুখদুঃখের কোথায় যেন অমিল হইয়াছে। নানাদিক-প্রসারী চিন্তার জালে সে হইয়াছে দিশাহারা। এই ভাবে চিন্তার জাল বুনিতে বুনিতে যেটুকু ঘটনার অংশ কাহিনীকে আশ্রয় করিয়াছে—তাহা মূলতঃ একটি ছোট গল্পের বিষয়বস্তু। তাই 'অনেক দিনে' চিন্তার ঐশ্বর্য্য যে পরিমাণে ছড়ানো আছে—কাহিনীর আয়োজন সেই অনুপাতে অত্যল্প। কাহিনী আরও গতিশীল ও বিস্তৃত হইলে অখণ্ড একটি প্রবাহে উপন্যাসটি সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত হইতে পারিত। তবু বাস্তব অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর আছে বলিয়াই খণ্ড রূপের মধ্যে চিন্তাপ্রধান মূল চরিত্রটিকে আপন মনের বস্তু বলিয়াই মনে হয়।

লেখকের শক্তি আছে। চিন্তার স্বকীয়তা ও বাস্তবানুগত্য প্রশংসনীয়। মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখ-বেদনা-সঙ্কল্প-আশা স্বপ্নগুলি তাঁর তুলিতে ভালই ফোটে। বিস্তৃত পটভূমিতে সাবলীল একটি কাহিনীর সঙ্গে এইগুলি যুক্ত হইলে তাঁহার উপন্যাস সার্থক সৃষ্টি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় সভ্যতা—ব্রজসুন্দর রায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তকে পাঁচটি প্রবন্ধ আছে। প্রত্যেক প্রবন্ধে ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে কিরূপে আমরা প্রাচীন আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি প্রসঙ্গক্রমে তাহারও আভাস দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে 'আমাদের কৃষ্টির যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা তাহার স্থান যদি আমাদের শিক্ষা ও সাধনায় না থাকে, তাহা হইলে আমাদের সন্তানসন্ততি যে বহুকাল হিন্দু নামে গৌরব বোধ করিবে তাহা মনে হয় না। যে ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা ছিল বলিয়া আমরা আজও দাঁড়াইয়া আছি এবং ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করিতেছি, সেই ভূমি পরিত্যাগ করিলে আমাদের বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর হইবে না' (পৃঃ ৬৬)। 'যদি আমাদের প্রকৃত সমাজপতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একত্র হইয়া অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যশক্তি ও ক্ষাত্রশক্তি একযোগে যুক্ত হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন এবং হিন্দুকে কিরূপে সঙ্ঘবদ্ধ করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহা হইলে ক্রমে শক্তি লাভ হইতে পারে' (পৃঃ ২)।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

রঙরুট—শ্রীবরেন বসু। সাধারণ পাবলিশার্স। প্রাপ্তিস্থান এন. এম্. রায়চৌধুরী কোং লিঃ। ৭২নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩৲ টাকা।

বিগত মহাযুদ্ধের সময়কার সৈন্যসংগ্রহের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের কূট চক্রান্তে সৃষ্ট মন্বন্তরের প্রবল আঘাত যখন মানুষকে দিশাহারা করিয়া ফেলিল—অভাব অনটনে দুর্গতির শেষ সীমায় আসিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য তখনই দলে দলে যুবকগণ পল্টনে যোগ দিতে সুরু করিল। শিক্ষিত অমল ইহাদের এক জন। অভাবের সংসার দিনরাত 'দেহি দেহি' রব তুলিল। সে দাবি মিটাইতে অমল মিলিটারীতে যোগদান করিল, ওখানকার জীবন কিন্তু ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা। একটু এদিক ওদিক হইবার যো নাই এমনি কড়া নিয়মানুবর্ত্তিতা। অথচ এমনি মজা যে, এই কড়া ডিসিপ্লিনের আড়ালেই জীবনের পঙ্কিল ঘৃণাজনক দৃশ্য একের পর এক অভিনীত হইয়া চলিয়াছে। অনেকে কিছুতেই এই অন্যায় অবিচার মানিয়া লইতে পারিতেছিল না—একটা চাপা অসন্তোষ দিনের পর দিন দানা বাঁধিয়াই উঠিতে লাগিল এবং ইহাই এক সময় রুদ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিল। মোটামুটি উপন্যাসখানি এই।

পুস্তকখানিতে মাঝে মাঝে কিছু অসঙ্গতি চোখে পড়িলেও স্থানে স্থানে রসমাধুর্য্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে লেখকের সহজ বর্ণনাভঙ্গী মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

গগনে উদিল রবি—স্বপনবুড়ো। সত্যব্রত লাইব্রেরী, ১৯৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী নৃত্যগীত-সম্বলিত নাট্য। ২৫শে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব-দিবসটি যাহাতে বালক-বালিকাগণের নৃত্যগীত ও অভিনয় অনুষ্ঠানে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে তদুদ্দেশ্যে এই নাটিকাখানি রচিত হইয়াছে। চিরান্ধকারময় গহন অরণ্য সহসা একদিন রক্তিম উষার আগমনে, পাখীর কলগানে, মলয়-সমীর ও নদীর চঞ্চল প্রবাহে, ষড় ঋতুর আবির্ভাবে, পাহাড় ও সাগরের আহ্বানে, আলোকে-উৎসবে ভরিয়া উঠিয়া ২৫শে বৈশাখ 'রবিকবির' জন্মবার্ত্তা ঘোষণা করিল। ভোরের পাখী, উষা, কোকিল, নদী, ছয় ঋতু ও সমবেত কণ্ঠের নৃত্যসম্বলিত গীতগুলি অভিনয়কালে কল্পলোকের সৃষ্টি করিবে। পরিশিষ্টে গানগুলির স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

ইউসুফ মেহের আলী

সমাজতন্ত্রী নেতা ও বোম্বাইয়ের প্রাক্তন মেয়র ইউসুফ মেহের আলী গত ২রা জুলাই সেখানকার একটি নার্সিং হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইউসুফ মেহের আলী ১৯০৬ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বোম্বাইয়ের এলফিনষ্টোন কলেজে এবং গবর্ণমেণ্ট ল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তিনি বিবাহ করেন নাই। তিনি ১৯২৫ সালে বোম্বাইয়ের আন্তঃ-কলেজ বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পান। ১৯২৭ সালে মাদ্রাজে নিখিল-ভারত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার ও সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৯২৮ সালে তিনি বোম্বাই ইউথ লীগের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বোম্বাইয়ে সাইমন কমিশন বর্জ্জন আন্দোলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। হল্যাণ্ডে যে বিশ্ব যুবশান্তি কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, মেহের আলী তাহাতে ভারতীয় যুব প্রতিনিধিদের নেতা নির্ব্বাচিত হন। মেহের আলী বোম্বাই হাইকোর্ট হইতে এডভোকেটের সনদ গ্রহণ করিতে অসম্মত হন; ঐ হাইকোর্টে এই ধরণের ঘটনা আর ঘটে নাই। ১৯২৯ হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি 'ভ্যানগার্ডের' সম্পাদক ছিলেন। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে চারিবার কারাবরণ করেন। ১৯৩১ সালে করাচীতে নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বোম্বাই প্রেসিডেন্সী কংগ্রেস সোসিয়ালিষ্ট গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩৪ সালে বোম্বাইয়ে যে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 'জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং' ছিলেন। তিনি বোম্বাই কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলের জয়েণ্ট সেক্রেটারী ছিলেন।

১৯৪০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে ইউসুফ মেহের আলীকে ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী বোম্বাইয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি পাটনায় নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই বৎসর জানুয়ারী মাসে লাহোরে গমন করিলে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর বহিষ্কারের আদেশ জারী করেন। এই আদেশ অমান্য করায় তিনি নিম্ন আদালতের বিচারে ছয়মাস কারাদণ্ডে এবং পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইলে ২৮শে মার্চ্চ লাহোরের দায়রা জজ মিঃ মেহের আলীর মুক্তির আদেশ দেন।

ইউসুফ মেহের আলী

১৯৪২ সালে লাহোর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভের পাঁচ দিন পরে তিনি বোম্বাইয়ের মেয়র পদে নির্ব্বাচিত হন। ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে তিনি পুনরায় ভারতরক্ষা আইন অনুসারে গ্রেপ্তার হন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান তিনি পরিভ্রমণ করেন। "বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে যুব আন্দোলন", "ভারতের নেতৃবৃন্দ" প্রভৃতি তাঁহার রচিত কয়েকখানি পুস্তকও আছে।

মেহের আলী প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার প্রখর মনীষা, স্বচ্ছ উদার বিচারবুদ্ধি, বলিষ্ঠ আদর্শনিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য এবং সমুজ্জ্বল চরিত্র-শক্তি সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত।

রোহিণী মুদি

একজন নীরব ও অখ্যাত দেশ-সেবকের জীবন-কথা মানভূমের "মুক্তি" পত্রিকার বিগত ২২শে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে:

"গত ৩১শে মে শ্রীরোহিণী মুদি জিতান গ্রামে পরলোক-

গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার প্রায় ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

"শ্রীরোহিণী মুদি স্বর্গীয় ঋষি নিবারণচন্দ্রের সহকর্ম্মী ছিলেন। মানভূম জেলার বান্দোয়াম থানার অন্তর্গত ভালুগ্রামে তাঁহার বাস। তিনি আদিম জাতির অন্তর্ভুক্ত কড়ামুদি ছিলেন। সামান্য কিছু ক্ষেত ও দিনমজুরী তাঁহার জীবিকা ছিল।

শ্রীরোহিণী মুদির জীবন নিরলস কর্ম্মময় ছিল। ১৯২২ সালে যখন তিনি নিবারণচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন তখন হইতেই তিনি গান্ধীজীর আদর্শে জনসেবায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন। তারপর এই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া যে নির্য্যাতন লাঞ্ছনা ও দুঃখ তিনি হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়া চলিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস অপূর্ব্ব।

শ্রীরোহিণী মুদি সামান্য বাঙলা লেখাপড়া জানিতেন। এবং পড়াশুনায় তাঁহার অসীম আগ্রহ ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় রোহিণী মুদি, কিশোরী সিং সর্দ্দার, নিমাই লায়া, চুণারাম শবর, ভরত মুদি, হারাধন কুম্ভকার, শ্রীদাম মাহাত প্রভৃতিই প্রথম মানভূমের গ্রামে গ্রামে স্বরাজের বাণী, গান্ধীজীর বাণী পৌঁছাইয়া জাতিকে সচেতন ও ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে এখন কেবল শ্রীচুনারাম শবর ও শ্রীদাম মাহাত বাঁচিয়া আছেন।

শ্রীরোহিণী মুদি তাঁহার জীবনে কেবল দিয়াই গিয়াছেন, কাহারও কাছে কোন দিন কিছু চান নাই। ১৯৪৭ সালের পরে যখন স্বাধীনতা আসিল তখন শ্রীরোহিণী বাঁচিবার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছিলেন না। কাহারও নিকট কিছু বলেন নাই, কয়লা-খনিতে এই বৃদ্ধ বয়সেও মজুরী খাটিবার জন্য গিয়াছেন—কোন অভিযোগ নাই, কোন নালিশ নাই—সহকর্ম্মীরা তাঁহাকে সাহায্য করিতে চাহিলেও, জোর করিয়া সাহায্য দিলেও তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার

ঢাকা জেলার সাভারের অধিবাসী শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার সম্প্রতি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অফ সায়েন্স ডিগ্রী লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল—"The biochemical and physiological studies of Palm oil cake।" পরীক্ষকগণ তাঁহার এই কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এই গবেষণার জন্য তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী—'Fres Honorable' (highest honours)—প্রাপ্ত হন। ইনি প্যারিসের পাস্তুর ইনষ্টিটিউটে বিখ্যাত অধ্যাপক মরিস লেসোয়ানের সহিত একযোগে পাওয়ার এলকহল সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং প্যারিসের প্রসিদ্ধ "মেল" কারখানাতে ঐ বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করেন।

শ্রীযুক্ত মালাকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। আই-এসসি হইতে এম-এসসি পর্য্যন্ত প্রত্যেক পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এম-এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিক্যাল বিভাগে অধ্যাপক কালীপদ বসুর সহিত পুষ্টি বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা করেন। পাওয়ার এলকহল সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আহরণের জন্যই ভারত সরকার ইঁহাকে বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য বৃত্তি প্রদান করেন।

ডক্টর মালাকার ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ-এর বৃত্তি লইয়া কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চৌধুরী

পূর্ব্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলার বাগবাড়ী গ্রামের শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার চৌধুরী সম্প্রতি ইংলণ্ডের কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএইচ-ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডাঃ চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। ফলিত রসায়নে এম-এসসি পাশ করিয়া তিনি কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা করেন। তাহার পর তিনি দিল্লীতে কেন্দ্রীয় খাদ্য-গবেষণাগারে সিনিয়র কেমিষ্ট হিসাবে প্রসিদ্ধ খাদ্য-বিশারদ ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহের সহিত খাদ্য-সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন। স্বাধীনতালাভের পর ভারত সরকার তাঁহাকে বৃত্তি দিয়া বিদেশে প্রেরণ করেন। সেখানে এই বাঙালী বৈজ্ঞানিক মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে গবেষণা-কার্য্য সম্পূর্ণ করণান্তর 'ডক্টরেট' ডিগ্রি অর্জ্জন করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এই উচ্চ সম্মানলাভ করিবার জন্য তিনি যে থিসিসটি দাখিল করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'Biochemical studies on Nicotinic Acid'—এই মৌলিক গবেষণা বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ আদৃত হইয়াছে।

ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চৌধুরী

ডক্টর চৌধুরীর নানা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ *'Biochemical Journal'*, *'Bulletin de la socite de Chimic Biologigne'*, *'Nature'* প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক

পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিলাতে থাকাকালীন তিনি ১৯৪৮ সালে 'ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব নিউট্রিশন্যাল সায়েন্সেস-এর অধিবেশনে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। ডাঃ চৌধুরী সম্প্রতি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ডক্টর শ্রীবীরেন্দ্রকুমার নন্দী

সম্প্রতি বোম্বাই করপোরেশনে পার্লে-আন্ধেরি অঞ্চল হইতে যে তিন জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ডক্টর বীরেন্দ্র-কুমার নন্দী তাঁহাদের অন্যতম। বোম্বাইয়ের বাঙালীদের মধ্যে ডক্টর নন্দীই প্রথম এই সম্মানলাভ করিলেন। খুবই আশা করা যায় যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তারূপে তিনি বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিবেন।

ডক্টর শ্রীবীরেন্দ্রকুমার নন্দী

পৌর রাজনীতিক্ষেত্রে ডক্টর নন্দী নবাগত। ১৯৪৭ এবং ৪৮-এ ক্রমাগত সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপে নগরীর উপকণ্ঠ-সমূহের অবস্থা যখন শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায় তখনই তিনি পৌর-পরিষদের (Municipal Council) সভ্যপদ প্রার্থী হন এবং বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। বরো মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থার উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়ার মূল কারণ।

ডক্টর নন্দী বাংলার একজন কৃতী বিজ্ঞানী। ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করিয়া কিছুকাল তিনি হাফকিন্‌ ইনষ্টিটিউটে মৌলিক গবেষণাকার্য্য করেন। পরে তিনি একটি ভৈষজ্য প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কর্ম্মশক্তির বলে এই প্রতিষ্ঠানটির এরূপ উন্নতি হইয়াছে যে, ভারতে ইহার সমকক্ষ এ জাতীয় আর দ্বিতীয় কোন প্রতিষ্ঠান নাই।

ডক্টর নন্দীর উদ্যমে শিক্ষাবিস্তার সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি নানাদিক দিয়া বরোর বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আন্ধেরি কেন্দ্রীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা এবং ঐ বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণের জন্য তাঁহার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডবল্যু. টি. সুরেনের নিকট হইতে যে বিপুল অর্থসাহায্য পাওয়া গিয়াছিল তাহার জন্য ডক্টর নন্দীর চেষ্টা কতকটা দায়ী।

ডক্টর নন্দী নিজের বিদ্যাবত্তা এবং কর্ম্মক্ষমতাদ্বারা প্রবাসে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

শ্রীবিমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'এইচ মুখার্জ্জী এণ্ড ব্যানার্জ্জী সার্জ্জিক্যাল লিমিটেড' নামক কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবিমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি বিলাতের বিখ্যাত 'ইনষ্টিটিউট অব ব্রিটিশ সার্জ্জিক্যাল টেক্‌নিসিয়ান্‌স'-এর ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহা একটি শ্রেষ্ঠ সম্মান। বিমলবাবু বড় বড় চিকিৎসকদের পরামর্শমত নানা

শ্রীবিমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকারের নূতন নূতন ডাক্তারী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যুদ্ধের সময় যখন বিদেশ হইতে ডাক্তারী যন্ত্রপাতির আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল বিমলবাবু তখন নিজ হস্তে অনেক কারিগরকে শিক্ষা দিয়া বহু যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিয়া চিকিৎসকদের চাহিদা মিটাইয়াছিলেন। নূতন নূতন ডাক্তারি যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণে এদেশে তাঁহাকে অগ্রণী বলা যাইতে পারে।

সহজানন্দ সরস্বতী

গত ১০ই আষাঢ় কৃষক-আন্দোলনের প্রবর্ত্তক, বিহার প্রদেশের এই জন-নেতা, প্রাথিত লোকে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রাচীন মতে শাস্ত্রাদিতে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন গতানুগতিক ভাবে। কিন্তু দেশের পরাধীনতা তাঁকে রাজনীতিক্ষেত্রে টানিয়া আনিল। গান্ধীযুগে গণ-জাগরণের যে সূত্রপাত হয় তার কল্যাণে গণমনে বান ডাকিল। ভারতের জনসমষ্টির প্রায় ৭৫ ভাগ কৃষকশ্রেণীভুক্ত, তাহাদিগকে দেশের মুক্তি-সংগ্রামে টানিয়া আনিতে হইলে তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের পথনির্দেশ করিতে হইবে, "স্বরাজে"র সঙ্গে তাহাদের জীবনের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে—এই উপলব্ধি সহজানন্দকে নিজের কর্ত্তব্য-পথের সন্ধান দিল, তিনি ভারতে ব্যাপক কৃষক আন্দোলনের নেতা হইলেন, এবং তাহাদের স্বার্থের জন্য গান্ধীপন্থী-গণের সঙ্গে বিরোধ করিতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। ইহাই সহজানন্দের পরিচয় এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহাই তাঁহার স্থান নির্ণয় করিবে।

আমরা এই সন্ন্যাসীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

দেবদত্ত ভাণ্ডারকর

পুণা নগরীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামকৃষ্ণ দেবদত্ত ভাণ্ডারকরের পুত্র ছিলেন দেবদত্ত। পিতার পাণ্ডিত্য উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি লাভ করিয়াছিলেন। সেই পাণ্ডিত্যের বলে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অধ্যাপক পদে বৃত হন এবং আজীবন ইতিহাসের নানা সমস্যার সমাধানে আত্মশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকাদির মধ্যে "অশোক", "ভারতের জনসমষ্টির মধ্যে নানা জাতি, নানা মতের অবস্থান", "ভারতের রাষ্ট্রনীতি", "গুর্জ্জর জাতি" প্রধান। এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত নানা পুস্তকে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে অবস্থানের ফলে তিনি বাঙালীর সঙ্গে প্রায় একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ কয় বৎসর আমাদের মধ্যেই কাটাইয়াছিলেন। তাঁর দেহত্যাগে আমরা আত্মীয়জনের বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। তিনি ৭৫ বৎসর বয়সে মরজগৎ ত্যাগ করিয়াছেন, এই জ্ঞানসেবীর আত্মীয়পরিজনের প্রতি আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

হেরম্বলাল গুপ্ত

বিদেশে মেক্‌সিকো নগরীতে ৬৯ বৎসর বয়সে এই বাঙালী বিপ্লবীর জীবনের অবসান হইয়াছে। তিনি পণ্ডিত উমেশ-চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র। ১৯০৫ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি দেশ-ত্যাগ করেন এবং ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়েন। মার্কিন মুলুকে সেই আন্দোলনের নেতা ছিলেন লালা হরদয়াল, তারকনাথ দাস, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ, গদর দল, দেশত্যাগী পঞ্জাবীগণ ছিলেন এই আন্দোলনের শাণিত অস্ত্রস্বরূপ।

এই আন্দোলনে যোগদান করায় হেরম্বলাল অনেক দিন দেশে ফিরিতে পারেন নাই। বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া তিনি শেষ জীবনে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মেকসিকোর জাতীয় বিশ্ববিদ্যা-লয়ে ইংরেজী ভাষার অধ্যাপকরূপে তিনি বহু বৎসর কাজ করিয়াছেন। মনে হয় একবার মাত্র তিনি দেশে আসিয়াছিলেন।

আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

পাণ্ডুরঙ্গ সদাশিব সানে

অল্প বয়সে এই মহারাষ্ট্রীয় চিন্তানায়কের তিরোধানে ভারতের চিন্তাজগতের বিপুল ক্ষতি হইল। পশ্চিম ভারতে তিনি "গুরুজি" সানে নামে পরিচিত ছিলেন, জনসমাজকর্ত্তৃক প্রদত্ত এই উপাধি তাঁহার সম্যক্ পরিচয় দান করে।

এই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন চিন্তাশীল লোক রাজনীতি সম্বন্ধে অমনোযোগী হইতে পারেন না। পাণ্ডুরঙ্গ রাও-ও পারেন নাই। প্রাক্-গান্ধী যুগের সকল আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, তাহার জন্য তিনি কারাবরণ করিয়াছিলেন।

এই আন্দোলনসমূহের পরিণতি দেখিয়া তিনি গান্ধীনীতি ও কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সন্দিহান হন। অনেক বিবেচনার পর তিনি ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলে যোগদান করেন, তাঁহার পাণ্ডিত্য এই মতবাদকে পশ্চিম-ভারতে বিশেষ জনপ্রিয় করিয়া-ছিল বলিয়া শুনিয়াছি।

তাঁহার অসময়ে দেহত্যাগে আমাদের রাষ্ট্রের ক্ষতি হইল, কারণ "গুরুজি" সানের মতন লোক রাজনীতির তর্কবিতর্কের বহু ঊর্দ্ধে বাস করেন এবং সেই স্থান হইতে লোকের চিন্তা-শক্তি নিয়ন্ত্রিত করেন।

আমরা আকুমার ব্রহ্মচারী এই চিন্তানায়কের আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

বেঙ্গল কেমিক্যালের
কয়েকটি
সুবিখ্যাত গায়ে মাখা সাবান
সিপ্রা
গোল্ডেন স্যাণ্ডালউড
GOLDEN SANDALWOOD B.C.P.W.
নিত্য স্নানের জন্য
উৎকৃষ্ট সাবান
সাবানের মধ্যে
অভিজাত শ্রেণীর
ট্রান্সপেরেণ্ট গ্লিসারিন
GLYCERINE SOAP
যমুনা
কোমল গাত্রচর্মের জন্য
নিরাপদ ও শীত ঋতুতে
বিশেষ উপযোগী
গৃহস্থের ব্যবহারের
জন্য প্রশস্ত

পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই সুন্দরী মহিলারা
শ্রেষ্ঠ প্রসাধন হিসাবে "ওটীন" কেই
বাছিয়া লইয়াছেন। ওটীন ব্যবহারে
আপনি আরও সৌন্দর্য্য লাভ করবেন।
Oatine
Oatine Cream
SNOW AND CREAM FOR YOUR DAILY BEAUTY TREATMENT

ভারতের সুপ্রসিদ্ধ জুয়েলার্স

সুন্দর ক্যাটালগ

বাহির হইয়াছে

মহাত্মা গান্ধী :—"আমি স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরীর নানা প্রকার শিল্পকার্য্য দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বড়ই সুখের বিষয় যে দেশীয় শিল্পের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ৺ভগবানের নিকট আমি ইহাদের সর্ব্বোন্নতি কামনা করি।" খাঁটি গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

ডায়াপেপসিন

হজমের ব্যতিক্রম হইলে পাকস্থলীকে বেশী কাজ করান উচিত নহে। যাহাতে পাকস্থলী কিছু বিশ্রাম পায় সেরূপ কার্য্যই করা উচিত। ডায়া-পেপসিন খাদ্যের সারাংশ শরীরে গ্রহণ করিতে সাহায্য করিবে। ডায়াপেপসিন ঠিক ঔষধ নহে, দুর্বল পাকস্থলীর একটি প্রধান সহায় মাত্র।

পাকস্থলীর অভ্যন্তর হইতে জারক রস নিঃসৃত হয়, এই রস খাদ্যের সহিত মিশিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা খাদ্য পরিপাক করে। ডায়া-পেপসিন সেই রসেরই অনুরূপ। ডায়াপেপসিন অতি সহজেই খাদ্য হজম করাইয়া দিবে ও শরীরে বল আসিলেই আপনা হইতেই হজম করিবার শক্তি ফিরিয়া আসিবে।

ডায়াস্টেস্ ও পেপসিন্ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংমিশ্রণ করিয়া ডায়াপেপ-সিন্ প্রস্তুত করা হইয়াছে। খাদ্য জীর্ণ করিতে ডায়াস্টেস্ ও পেপসিন্ দুইটি প্রধান এবং অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। খাদ্যের সহিত চা-চামচের এক চামচ খাইলে পাকস্থলীর কার্য অনেক লঘু হইয়া যায় এবং খাদ্যের সবটুকু সারাংশই শরীর গ্রহণ করে।

ড্রাগ—কলিকাতা
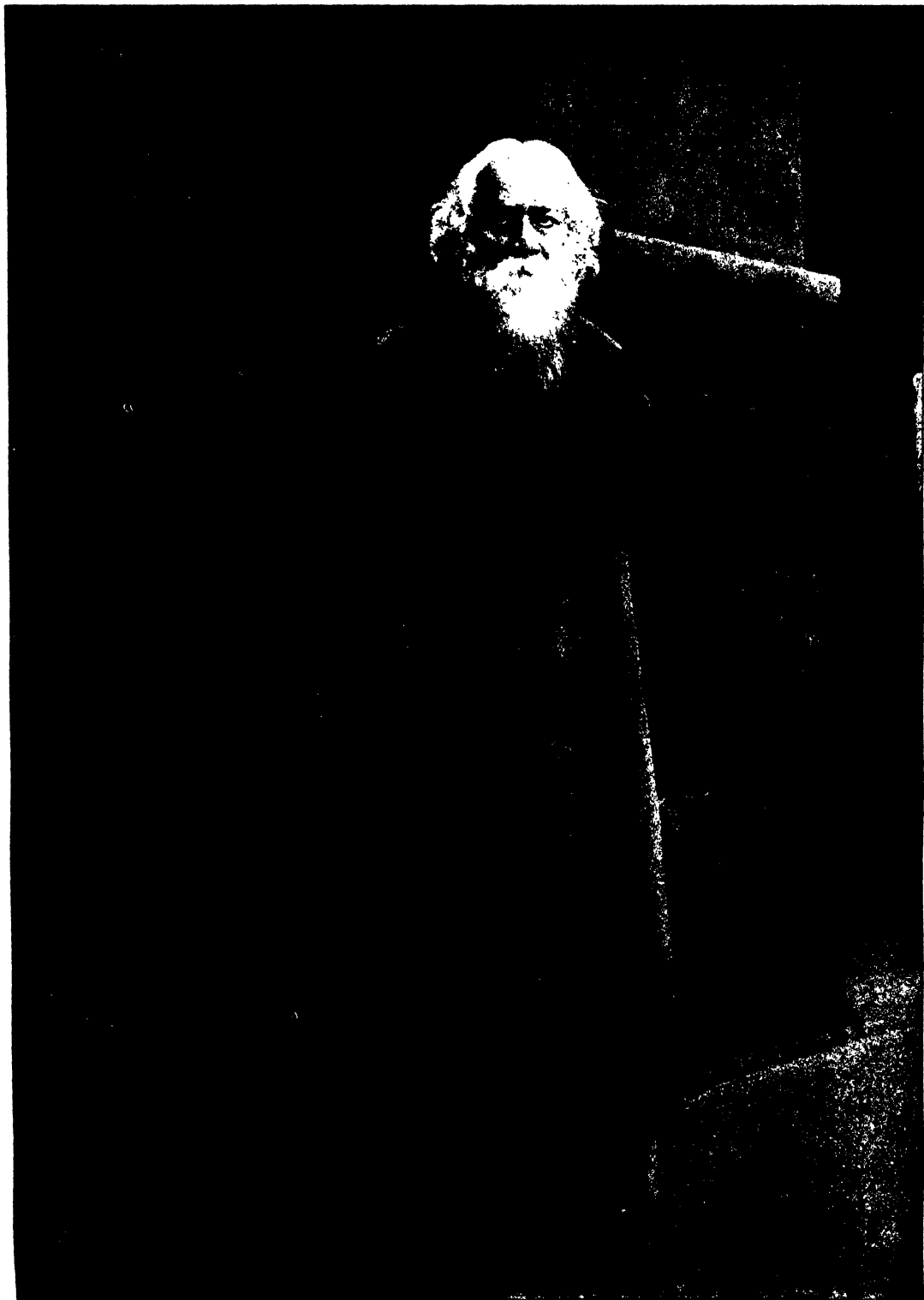
আবির্ভাব : ২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ সাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিরোভাব : ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ সাল,

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫০শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র ১৩৫৭

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

এই স্বাধীনতা !

স্বাধীনতাদিবস পুনরাগত। অজ্ঞ বা বিক্ষিপ্তচিত্ত লোকে যাহাই বলুক, ভাগ্যান্বেষী চতুরের যুক্তি যাহাই হউক, এই স্বাধীনতার জন্ম পশ্চিমবঙ্গ কাহারও নিকট ঋণী নহে। বস্তুতঃ পক্ষে যদি ভারতের কৃষ্টি, স্বাধীনতা বা সমাজসংস্কারের উদ্যম ও প্রয়াসের একটা প্রকৃত হিসাব-নিকাশ হয় তবে ইহা নিশ্চিত দেখা যাইবে যে, ঐ প্রগতি ও স্বাধীনতার অভিযানে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত সন্তানের দান যাহা আছে, দেনা তাহার শতাংশের এক অংশও নাই। পশ্চিমবঙ্গবাসী আজ বিভ্রান্ত, আত্মবিস্মৃত ও ভাবের উচ্ছ্বাসে মগ্নপ্রায় তাই সে সেকথা ভুলিয়াছে।

তিন বৎসর হইল আমরা স্বাধীন হইয়াছি। এখন সময় হইয়াছে ঘরের কথা ও নিজ সন্তানসন্ততির কথা চিন্তা করার। অন্যের দুঃখে বিচলিত হওয়া, শরণার্থীর অভাবমোচনে, সঙ্কট-ত্রাণে, সর্ব্বস্বপণ করিতে অগ্রসর হওয়া, ইহা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু নিজের সন্তানসন্ততির দুঃখ-দারিদ্র্য অভাবের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, তাহাদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বলোপ সম্বন্ধে চিন্তা মাত্র না করিয়া, সাময়িক উচ্ছ্বাসে নাচিয়া, দেশের অবশ্যম্ভাবী সর্ব্বনাশের কথা মনে স্থান মাত্র না দেওয়া, ইহা যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা বা বিচারবিবেচনার বিন্দুমাত্র পরিচয় দেয় না।

এই তিন বৎসরের স্বাধীনতার ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত সন্তানসন্ততি লেশমাত্র উপকৃত হয় নাই। বরঞ্চ আজ তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার পর সর্ব্বনাশের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। এ বিষয়ে এখন অনেকেই চিন্তিত, কিন্তু আমরা বুদ্ধির দোষে ক্ষমতা ও অধিকার প্রধানতঃ অযোগ্য লোকের হস্তে দিয়াছি। নেতৃত্বের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, কেননা আমাদের নেতা বা প্রতিনিধি হিসাবে যাঁহারা গণ্য, তাঁহাদের অধিকাংশই দলগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থকামী "বর্ণচোরা"। পশ্চিমবঙ্গবাসীর দুঃখ অভাব অভিযোগে তাঁহারা চিরদিনই বধির। প্রত্যক্ষভাবে তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গবাসীর ঘোর শত্রু—তাহাকে শোষণ দলনে তাঁহারা চিরদিনই উদ্‌গ্রীব—এবং পরোক্ষভাবে তাঁহারা সমস্ত বাঙালী জাতির শত্রু।

অধিকারীবর্গের মধ্যেও অযোগ্য লোক এত বেশী যে, পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্যের অবসানের আশা অতি ক্ষীণ। এখন ভরসা দেশের সন্তানদের উপর। আজও যদি তাহারা বাস্তবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কুটিলের যুক্তি ও নেতৃবর্গের স্তোক-বাক্যের যথার্থ অর্থ বুঝে, তবেই দেশ রক্ষা পাইবে এবং বাঙালী জাতির ভবিষ্যতে আলোর রেখা দেখা দিবে।

পার্লামেণ্টে বিতর্ক

ভারতীয় পার্লামেণ্টে দিল্লী চুক্তি লইয়া দুই দিন ব্যাপী তুমুল বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। বিতর্কের রিপোর্ট পাঠে আমাদের প্রাচীনকালের ঘটাকাশ ও পটাকাশের তর্কের কথাই মনে পড়িতেছে। এক পক্ষ ধরিয়া লইয়াছেন চুক্তি ব্যর্থ হইয়াছে, অপর পক্ষও স্থিরনিশ্চয় চুক্তি সফল হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু মর‍্যালিটির দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছেন, উহা লইয়া আমরা আগে আলোচনা করিয়াছি, তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তিনটি অনুকল্পের প্রস্তাব করিয়াছেন কিন্তু বাস্তবকে তিনিও এড়াইয়া গিয়াছেন। দিল্লী চুক্তিটা যে একটা ট্রুস বা সাময়িক সন্ধি ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, যুদ্ধের ট্রুসের সঙ্গে ইহার প্রভেদ এই যে এই সময়ের মধ্যে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বসতি বিষয়ে ভারত ও পাকিস্থান কে কতটা কাজ সত্যসত্যই করিতে ইচ্ছুক তাহা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। দিল্লী চুক্তির মূল বিষয় উদ্বাস্তু আগম নির্গমের বাধা অপসারণ এবং যে যার স্বগৃহে ফিরিয়া পুনর্ব্বসতি স্থাপন। যাহারা কিছুতেই ফিরিতে চাহিবে না তাহাদের এখানে থাকিবার ব্যবস্থা যেমন সুপরিকল্পিত ভাবে করিতে হইবে, যাহারা ফিরিতে ইচ্ছুক তাহারাও যাহাতে স্বচ্ছন্দে ফিরিতে এবং নিরাপদে বাস করিতে পারে তাহাও দেখিতে হইবে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার বক্তৃতায় ওজস্বিনী ভাষায় প্রবল যুক্তি দিয়াছেন, কিন্তু কোন প্রোগ্রাম তিনি দিতে পারেন নাই, যাহাতে বর্ত্তমানের পরিবেশে ভারতে ও পাকিস্থানে পুনর্ব্বসতি সম্ভবপর হইতে পারে। পশ্চিম-বঙ্গে কত উদ্বাস্তুর পুনর্ব্বসতি হইতে পারে, কোন্ কোন্ জেলায় কোন্ কোন্ অঞ্চলে হইতে পারে তার বিস্তারিত বিবরণ

সংগ্রহ করিয়া সেইভাবে কাজ যাহাতে হয় তাহা দেখা দরকার। ডাঃ মুখোপাধ্যায় একটি কমিটির সাহায্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তো কিছুই করিলেন না। পুনর্ব্বসতির জন্য টাকা কিছু কম খরচ হইতেছে না, কিন্তু ১০০৲ টাকার মধ্যে ৮০৲ টাকাই প্রকৃত উদ্বাস্তুর হাতে পৌঁছিতেছে না। যাঁহাদের হাতে টাকা দেওয়ার ভার তাঁহারা যৌথ প্রচেষ্টা সমর্থন করিবার পরিবর্তে ব্যক্তিগত ভাবে টাকা দেওয়াই পছন্দ করিতেছেন। কারণ পরিষ্কার, যে টেবিলে হাত সাফাইয়ের খেলা চলে সেখানে বেশী লোক যাওয়া অসুবিধা। যৌথ ভাবে বা সমবায় সমিতির নামে যে সব প্রতিষ্ঠান সুবিধা পাইতেছে তার অধিকাংশই বাস্তুহারাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান নয়, উহা পরের জমি বাড়ী বেদখল বা সরকারী অর্থ আত্মসাতের জন্য বাস্তুঘুঘুদের 'মিউচুয়্যাল কোম্পানী' মাত্র, ইহার বহু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত দুর্নীতি ধরিয়া দেওয়ার এবং পুনর্ব্বসতির প্রকৃত পথ নির্দ্দেশের দায়িত্ব ডাঃ মুখোপাধ্যায় গ্রহণ করিলে উদ্বাস্তুদের এবং দেশের যে উপকার করিতে পারিতেন তার সুযোগ তিনি লইতে চাহিতেছেন না কেন আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। উদ্বাস্তুদের মধ্যে করিৎকর্ম্মা এবং খুঁটার জোর সম্পন্ন একটি দল ছাড়া বাকী লক্ষ লক্ষ পরিবার পুনর্ব্বসতির উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে অতি দ্রুত সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, নৈতিক অধঃপতনের অতল গহ্বরে ডুবিতেছে, স্বাস্থ্য হানি ঘটিতেছে, মৃত্যুহার বাড়িতেছে।

এই গেল পশ্চিমবঙ্গের দিক। পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা ফিরিয়া গেলে সেখানকার গবর্মেণ্ট তাহাদের পুনর্ব্বাসনে সাহায্য করিবেন বলিয়া দিল্লী চুক্তিতে কথা দিয়াছেন। এই কথা তাঁহারা কতটা রাখিতেছেন ব্যাপক ও বেসরকারি ভাবে তার পরীক্ষা হওয়া উচিত ছিল। শ্রীহট্ট জেলার মনোলীর যতীন দেব প্যাক্টের পর বাড়ী ফিরিয়া নিহত হইয়াছেন। ঐ জেলারই একজন ডাক্তার প্যাক্টের পর পাকিস্থান ত্যাগ অনাবশ্যক মনে করিয়া থাকিয়া গিয়াছিলেন, তিনিও নিহত হইয়াছেন। এই সমস্ত রিপোর্ট আসিতেছে সত্য, কিন্তু পাকিস্থান এগুলিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র বলিয়া যদি দাবী করে, আমরা তার কি জবাব দিব? এইজন্য আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এখানে তৈরী করা হউক যাহারা পূর্ব্ববঙ্গের পুনর্ব্বসতিতে সাহায্য করিবে। কিছু লোক ফিরিতেছে এটা ঠিক, কিন্তু তাহারা খাপছাড়া ভাবে যাইতেছে এবং ইহাদের অধিকাংশ নিরক্ষর লোক। ইহাদের সঙ্গে সুপরিকল্পিত ভাবে সাহসী যুবক কয়েকজন করিয়া দিয়া দিলেও হাজার দুই-তিনের বেশী লোক দরকার হয় না। আমাদের বামপন্থী দলগুলি এবং আরও কেহ কেহ যুদ্ধ করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের কথা বলিয়াছেন, আমরা বলি তাঁহারা দশ হাজার লোক সংগ্রহ করুন। এই সমস্ত শিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকেরা পুনর্ব্বসতির কার্য্যে বাধা পাইলে বা পাইতে দেখিলে তাহা একটি কেন্দ্রীয় স্থানে রিপোর্ট করিবেন। গবর্মেণ্টের বাহিরে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ই একমাত্র লোক যিনি এই কাজ করিতে পারেন। এই স্বেচ্ছাসেবকদের ছয় মাসের জন্য পাকিস্থানে রাখা হইলেও পুনর্ব্বসতি ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। ইহার জন্য যে টাকা দরকার তাহা দুই কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট দিতে বাধ্য। অন্যদিকে পাকিস্থান হইতে এদেশের সংখ্যালঘুদের জন্য ঐরূপ সমিতি গঠিত হইলে তাহার সহিত এদিকের সমিতি একযোগে কাজ করিলে ভারত ও পাকিস্থান দুই দেশেরই সংখ্যালঘুদিগের মানসিক ও ঐহিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা অনেক সরল হইত।

এই কাজটি করা হইলে দুই দিক দিয়া আমরা উপকৃত হইব। পাকিস্থান উদ্বাস্তু পুনর্ব্বসতিতে কতটা আগ্রহশীল তাহা হাতে কলমে ধরা পড়িবে এবং এই পরীক্ষা ব্যর্থ হইলে পণ্ডিত নেহরুর পাকিস্থানের সপক্ষে কোন কথা বলিবার মুখ থাকিবে না। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাব—ভারত পাকিস্থান ঐক্য সাধন, জমি প্রত্যর্পণ অথবা লোক বিনিময় মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তরও থাকিবে না। প্যাক্ট ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া ফাঁকা বক্তৃতা করিলে যে ফল হইবে তার চেয়ে ঢের বেশী ফল হইবে এইরূপ পরীক্ষায়। প্যাক্ট ব্যর্থ হইয়াছে এবং হইতে বাধ্য এই ধারণা যাঁহাদের মনে দৃঢ়মূল তাঁহাদের পক্ষে এই পরীক্ষায় অগ্রসর হওয়াই উচিত ছিল।

প্যাক্ট লইয়া তর্কের অবসর অনেক আছে কিন্তু পূর্ব্ব পাকিস্থানের হিন্দু ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান, যে যাহার আদি বাস্তুভিটায় নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে যদি বাস করিতে পারে তবে তাহাতেই তাহাদের মঙ্গল এবং সেই অবস্থাই সকলের কাম্য, আশা করি একথা কেহ অস্বীকার করিবেন না।

বাংলার দুর্নীতি দমন

কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন আসন্ন। আচার্য্য কৃপালনী, বাবু পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন এবং শ্রীশঙ্কররাও দেও প্রতিযোগিতা করিতেছেন। আমরা পশ্চিমবঙ্গের তরফ হইতে এই প্রতিযোগিতায় উৎসাহ বোধ করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। আচার্য্য কৃপালনী যখন কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন তখন যাহাদিগকে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে বসাইয়া দিয়া গিয়াছেন তাহাদের দৌলতে প্রদেশের জীবনযাত্রার সর্ব্বস্তর দুর্নীতির পঙ্কে কলুষিত হইয়াছে, অক্ষমতার ভাঙিয়া পড়িতেছে। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, গৃহের অভাব, চিকিৎসার অভাব বাঙালী জাতিকে ধ্বংসের পথেই টানিয়া লইয়া চলিতেছে। তাহার উপর সুবিচারের অভাবের যে সব দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে তাহা তো আরও মারাত্মক।

একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল। বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত রামনলিনী চক্রবর্ত্তী প্রবীণ কংগ্রেসসেবী। তিনি আমাদের নিম্নলিখিত ঘটনাটি পাঠাইয়াছেন :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ কর্তৃক সরকারী কর্ম্মচারীদের ঘুষ খাওয়া ধরিয়া দেওয়ার জন্য প্রাচীর পত্রাদি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ায় জনসাধারণ বিশেষত: কংগ্রেস কর্ম্মীগণ উৎসাহিত হইয়া দুর্নীতি নিবারণের চেষ্টা করিতে গিয়াছিলেন। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার ফৌজদারী আদালতের এক কর্ম্মচারী পাত্রসায়র গ্রামের বিশিষ্ট কর্ম্মী ডা: মহেন্দ্র সেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ দত্তের নিকট ঘুষ চাহিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা মহকুমা হাকিমের নিকট অভিযোগ করেন। মহকুমা হাকিম অভিযোগকারীদ্বয়েরই নামে ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইবার নোটিশজারী করিয়াছেন।

এই হাকিমটির একটু পরিচয় আমরা চাই। ইহা কি সত্য যে মেদিনীপুরে আগষ্ট বিপ্লবের সময় ইনি তমলুকের বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরাকে গুলি করিবার আদেশ দিয়া ইংরেজ সরকারের হুকুম তামিল করিয়াছিলেন? সে যাহাই হউক, বর্ত্তমানে ইহার ব্যবহারে উকীল মোক্তার ও জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া প্রধানমন্ত্রীর নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন। আমরা প্রধানমন্ত্রী ডা: বিধান রায় এবং চীফ সেক্রেটারী দুই জনকেই অনুরোধ করিতেছি এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্থানীয় অভিযোগের তদন্ত যেন অবিলম্বে করা হয়।

বাস্তুঘুঘুর অভিযান

বঙ্গবিভাগের পর হইতে বাস্তুহারাদের ছদ্ম নামে বাস্তুঘুঘুরা পশ্চিমবঙ্গের ভিটায় চরিতে আরম্ভ করিয়াছেন এ কথা আমরা বহুবার লিখিয়াছি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বর্ত্তমান সমাজের ভিত্তি, সদুপায়ে অর্জ্জিত সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়ার ক্ষমতা কাহারও নাই, থাকা উচিত নয়। গত যুদ্ধে রাষ্ট্রের প্রয়োজনের নামে বিদেশী গবর্মেণ্ট যুদ্ধের ঘাঁটি তৈরির জন্য হাজার হাজার লোককে কয়েক ঘণ্টার নোটিশে ভিটাছাড়া করিয়া তাহাদের সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিল। ভারতরক্ষা আইনের নাগপাশে দেশ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল বলিয়া তার যতটা প্রতিবাদ হওয়া উচিত ছিল তাহা হইতে পারে নাই, তবুও হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজের এই কুদৃষ্টান্ত বর্ত্তমান গবর্মেণ্ট যেরূপ বেপরোয়া ভাবে চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইতেছে। যুদ্ধ এখন নাই, জবরদখল চলিতেছে বাস্তুহারাদের নামে। বাস্তুহারারা কি পাইতেছে জানি না, তবে এটা পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, বাস্তুঘুঘুরা বেশ ভাল ভাবেই গুছাইয়া লইতেছেন। ১৯৪৮ সালে একটি জমি জবরদখল আইন পাস করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং উহার বলে জমি দখল চলিতেছে। আইনের প্রয়োগকর্ত্তাদের সঙ্গে যাহাদের যোগাযোগ আছে, তাহারা পয়ের তৈরি সম্পত্তি দেখাইয়া দিতেছে এবং গবর্মেণ্টের নামে ঐ আইনের বলে তৎক্ষণাৎ জবরদখলের নোটিশ জারী হইতেছে। চিরাচরিত প্রথায় নোটিশ চাপিয়া সম্পত্তির মালিককে দম ফেলিবার অবসর না দিয়া তার মূল্যবান জমি, বাড়ী, বাগান বেদখল করা হইতেছে। বাস্তুঘুঘুদের এই কুকাজ বাস্তুহারাদের নামে হইতেছে বলিয়া বাস্তুহারাদের দুর্নাম রটিতেছে এবং স্থানীয় লোক ও বাস্তুহারাদের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হইতেছে। অন্যদিকে বহু প্রবঞ্চক, যাহাদের মধ্যে সরকারী কর্ম্মচারী এবং অন্য ক্ষমতাপন্ন লোক বহু আছে, তাহারা অসদুপায়ে মূল্যবান সম্পত্তি হস্তগত করিতেছে।

শ্রীযুক্ত সুধী মিত্র কংগ্রেসের একজন প্রাচীন সমর্থক, তাঁর সাধ্যানুসারে তিনি সাহায্য করিয়াছেন। টালিগঞ্জের পূর্ব্ব পুটিয়ারি গ্রামে তাঁহার জমি আছে। উহাতে একটি ইটের পাঁজা আছে, ইট তৈরি তাঁহার অন্যতম প্রধান ব্যবসা। ঐ জমিতেই ইটের কারখানায় প্রায় ৩০০ শ্রমিকের ঘর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। টালির নালার পাশে তাঁহার জমি, নালার পলিমাটিপূর্ণ জল জমিতে আসা ইটখোলার জন্য একান্ত দরকার। এ ছাড়া সেখানে তাঁহার বাগানও আছে। বাগানে ৩৭টি আম গাছ, ৩১টি পেয়ারা গাছ, ১৪টি নারিকেল গাছ, ২৫৮১টি কলা গাছ, ২১টি তাল গাছ, ২১টি খেজুরগাছ, ২৫টি আনারস গাছ, ৩টি লিচু গাছ, ২টি কুল গাছ, ১টি জাম গাছ, ১টি কাঁঠাল গাছ ইত্যাদি আছে। ধান জমিও আছে। এই সমস্তই তাঁহার নিজের কাজে লাগিতেছে। হঠাৎ বাগান ও ধানজমি জবরদখলের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে; হেতু—বাস্তুহারাদের বসতি। এক দিকে আরও ফসল ফলাও এবং "গাছ লাগাও" আন্দোলন চলিতেছে, অপরদিকে ধান জমি নষ্ট করিয়া এবং এতগুলি মূল্যবান গাছ কাটিয়া ফেলিয়া বাড়ী তৈরির ফিকির হইতেছে। কারণ স্থানটি কলিকাতার কাছে, বাসরাস্তার নিকটে। এই জমিগুলি দখল করা হইলে নালার জল আসা বন্ধ হইবে, ইটখোলা আর বেশী দিন চালানো যাইবে না। অর্থাৎ ভদ্রলোককে ধনেপ্রাণে মারিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। পুনর্ম্মিলন সমিতি নামে একটি ভুঁইফোড় সমিতি গজাইয়া উঠিয়াছে এবং ইহারাই এই জমিটি দখল করাইবার জন্য উদ্যোগী। শ্রীযুক্ত সুধী মিত্র রাজস্ব মন্ত্রীর নিকট এক দরখাস্তে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, এই পুনর্ম্মিলন সমিতির অধিকাংশই পুরানো সরকারী কর্ম্মচারী এবং দীর্ঘকাল যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে চাকুরি করিতেছেন। ইঁহাদের অনেকে বেশ উচ্চপদস্থ, কেহ কেহ বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। জমিটি দখল করিয়া নিজেরা ভাগ করিয়া লইবার মতলবেই তাঁহারা গবর্মেণ্টকে দিয়া উহা দখল করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেক অগ্রসর দূর হইয়াছেন।

দ্বিতীয় ঘটনা আরও চমৎকার। শ্রীযুক্ত এন সি সাধুখাঁ এবং শ্রীমতী দেবযানী দেবী প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান মন্ত্রীর নিকট দরখাস্ত করিয়া বলিতেছেন যে টিটাগড় ব্যারাকপুর মিউনিসিপালিটির মধ্যে তাঁহাদের জমি আছে, উহাতে জলের কল, ইলেকট্রিক আলো, পাকা রাস্তা প্রভৃতির সমস্ত সুবিধা আছে। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, সরকারী হাইস্কুল, বাজার, সিনেমা, ষ্টেশন প্রভৃতি সবই খুব কাছে। বাস্তহারা পুনর্ব্বসতির নামে এই জমির উপর নোটিশ জারী হইয়াছে। ইতিমধ্যে বহুলোক ঐ জমির প্লট কিনিয়া বাড়ী করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাস্তহারাও আছেন। জমিতে বাড়ী, বাগান, ধানকলের পাকা চাতাল প্রভৃতি আছে। মোট কথা জমিটির উন্নয়ন চার্য্য আগেই হইয়া গিয়াছে। এই তৈরি জমির উপর বাস্তুঘুঘুদের নজর পড়িয়াছে। ফাঁকা মাঠে নূতন করিয়া একদল লোক জমি গড়িয়া তুলিবে আর একদল আসিয়া আইনের বলে সেই জমি কাড়িয়া লইবে এমন চমৎকার "পাবলিক পারপাস" ভূভারতে কোথাও আছে বলিয়া শুনি নাই। ইঁহারা দরখাস্তে বলিতেছেন যে জমি দখলের নোটিশ তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় নাই এবং স্থানীয় অঞ্চলে প্রকাশ্যে এবং সকলের দৃষ্টি গোচর হইতে পারে এরূপও কোন নোটিশ টাঙানো হয় নাই। ইহাকে নোটিশ চাপিয়া দেওয়ার অভিযোগ অনায়াসে বলা যাইতে পারে। যে বাস্তুঘুঘুদের জন্য এই জমিটি দখল করা হইতেছে তাহাদের পরিচয়ও তাঁহারা দিয়াছেন। ব্যারাকপুর কো-অপারেটিভ কলোনি লিঃ নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে, জমি দখল তাঁহাদের জন্য হইতেছে। দরখাস্তকারীরা পরিষ্কার বলিতেছেন যে ইঁহারা কেহই বাস্তহারা নহেন, ডিরেক্টরেরা এবং সদস্যেরা সকলেই টিটাগড়ের পুরানো অধিবাসী; নিজেদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য তাঁহারা গবর্মেণ্টকে দিয়া তৈরি জমিটি দখল করাইয়া লইতেছেন।

সরকারী ক্ষমতার বলে পরের বসতবাটী তৈরি ভাল জমি বেদখল করিবার আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়েকজন কানুনগো পশ্চিমবঙ্গ কানুনগো এসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্ব্বসতির নামে তাঁহারা উইলিংডন রোড ও নেতাজী সুভাষ রোডের সঙ্গমস্থলে বৈষ্ণব ঘাটায় ৬০ বিঘা জমি দখল করাইবার আয়োজন করিয়াছেন। আবেদনপত্রে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, জমিটা পতিত পড়িয়া আছে, তাঁহারা উহাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবেন। প্রকৃতপক্ষে এই জমিতে বহু লোকের বসতবাটী, ফলের বাগান, সজী বাগান প্রভৃতি রহিয়াছে এবং উহা তৈরি জমি। কাছেই হাইস্কুল, বাজার, থানা, পোষ্টাপিস প্রভৃতি আছে। কাছেই এক দিকে যাদবপুর, অপর দিকে টালিগঞ্জ। পাকা রাস্তার এবং বাস রাস্তার উপরে জমিটি অবস্থিত। এই জমিকে পতিত জমি বলিয়াবর্ণনা করায় স্থানীয় লোকেরা ঘোর আপত্তি করেন এবং বলেন যে, যে সমিতি জমি চাহিতেছে তাহারা রেজিষ্টার্ড সমিতি নয়। ইহাতে প্রথম নোটিশ খারিজ হইয়া যায়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই আবার নোটিশ জারী হয় এই বলিয়া যে, পশ্চিমবঙ্গ কানুনগো এসোসিয়েশন লিমিটেডের জন্য জমিটা দরকার, অর্থাৎ উহা আগে রেজেষ্ট্রি ছিল না, এখন রেজিষ্ট্রি হইয়া আসিয়াছে। স্থানীয় লোকেরা আবার আবেদন করেন এই বলিয়া যে, তাঁহাদের মূল অভিযোগ শোনা হয় নাই। বসতবাড়ী বা বাগান পশ্চিমবঙ্গ ল্যাণ্ড প্ল্যানিং আইনে লওয়া যায় না। তাঁহাদের আপত্তি সরকারী ভূমি দখল বিভাগ দ্বারা সরাসরি অগ্রাহ্য করা হয়। তখন তাঁহারা আলিপুর কোর্টে মামলা করেন। আলিপুরের সাবজজ তাঁহাদিগের পক্ষে absolute injunction জারী করিয়াছেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, পশ্চিমবঙ্গ কানুনগো এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্টের রাজস্ব-বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারীর ভ্রাতা। এই এসোসিয়েশনের সভ্যগণের অধিকাংশ পূর্ব্ববঙ্গজাত, কিন্তু সকলেই অবস্থাপন্ন লোক, একজনও "বাস্তহারা" নহে।

আগষ্ট মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রে আমরা এরূপ একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছি। কয়েকদিন আগে 'যুগান্তরে'ও এরূপ ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তহারাদের নিজেদের চেষ্টায় তৈরি একটি সুন্দর কলোনি ডাক বিভাগের কর্ম্মচারীদের বসতির জন্য জবর-দখলের নোটিশ পড়িয়াছে।

"বাস্তহারা কলোনি" সম্পর্কেও অনেক কিছু বলিবার আছে। কিছু দিন পূর্ব্বে আমরা কয়েকটি কলোনি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাই যে, জমি দখলকারীদিগের অধিকাংশই কলিকাতায় বহুদিন পূর্ব্বে আসিয়াছে, আদৌ বাস্তহারা নহে। এই কথা আলোচনার পরে কয়েকটি কলোনি সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধান করা হয়। ফলে দেখা যায় যে, ঐ সকল কলোনির শতকরা ৬০ জনেরও অধিক লোক বাস্তুঘুঘু শ্রেণীর জুয়াচোর। সম্প্রতি এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে এ বিষয়ে বিশেষ তদন্ত করা হইবে। বলা বাহুল্য, যদি তদন্ত ঐরূপ বাস্তুঘুঘুর দলেরই আত্মীয়স্বজনেরা করে তবে উহা একটা ব্যঙ্গ নাটকীয় ব্যাপার মাত্র হইবে।

ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনে পরের জমি, বাড়ী, বাগান কাড়িয়া লওয়া যায় না কিন্তু সমবায় সমিতির নামে পারা যায়, বিশেষতঃ বাস্তহারাদের দোহাই থাকিলে তো কথাই নাই, ইহাই কি তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জমিদখলনীতি? এক জন চুরি করিলে চোর হয় কিন্তু পাঁচ চোর একত্র হইলে সাধু হয় এবং সরকারের সাহায্য পায় ইহাই কি তাঁহাদের বক্তব্য?

সরকারী অর্থের অপব্যয়

গ্রামাঞ্চলের উন্নতির জন্য গবর্মেণ্ট যে সামান্য টাকা মঞ্জুর

করিয়া থাকেন, সরকারী কর্ম্মচারীদের দোষে তাহাও কিরূপে নষ্ট হয় সম্প্রতি বর্দ্ধমানের "দৃষ্টি" তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বর্দ্ধমান জেলায় চাষের পশু ক্রয়ের জন্য মোট এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৫ হাজার টাকা বর্দ্ধমান সদর সার্কেলে দেওয়ার কথা। "দৃষ্টি" সংবাদ দিতেছেন যে, উক্ত বরাদ্দ অর্থের প্রায় সমস্তই সদর সার্কেল অফিসার মহাশয় নিজের খুসীমত সদরে বসিয়াই বিলি করিয়া দিয়াছেন, অথচ সদর মহকুমা হাকিম গত বৎসর নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে, সদর আপিস হইতে যেন টাকা বিলি করা না হয়। উক্ত টাকা ইউনিয়নওয়ারী বণ্টন করা হয় নাই বলিয়াও পত্রিকাটি অভিযোগ করিয়া বলিতেছেন, "যে সব ভাগ্যবান ব্যক্তি কোন সুযোগে সংবাদ পাইয়া আবেদন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্য হইতেই তদ্বিরের জোরে বিনা তদন্তেই ঋণ দেওয়া হইয়াছে। ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রকৃত প্রার্থী বঞ্চিত হইয়াছেন। বন্যাবিধ্বস্ত খণ্ডঘোষ ও রায়না থানার দুঃস্থ চাষীরাই সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত হইয়াছে। সরকারী নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া ১০ একরের অধিক জমির মালিকগণকেও ঋণের টাকা দেওয়া হইয়াছে। কোন ধনী ব্যবসায়ী ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেণ্টকে সপুত্র সকর্ম্মচারী বরাদ্দ অর্থের প্রায় এক-দশমাংশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।"

কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে মূক গ্রামবাসী রক্ষা পাইবে, সুবিচার পাইবে, শাসনকর্ত্তাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইবে ইহাই তাহাদের অন্তরের আশা ছিল। কিন্তু কার্য্যকালে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই যে, ইংরেজ আমলে যেমন গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারীদের নিকট তাহাদের দুঃখ জানাইতে বা দুঃখের প্রতিকার লাভের জন্য যাওয়ায় বাধা ছিল, বর্ত্তমান আমলেও তাহাই ঘটিতেছে। এই অত্যাচারের প্রতিকার কে করিবে? গবর্ণমেণ্ট উদাসীন, কংগ্রেস দলাদলিতে ব্যস্ত, দেশের লোকের দিকে তাকাইবে কে?

দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি

পশ্চিমবঙ্গে ও মাদ্রাজ, উত্তর-বিহার প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাইতেছে। বিহারে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনতা খাদ্যের গোলা লুঠ করিয়াছে এবং তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট ২২টি গ্রামে পিটুনী কর বসাইয়াছেন। মাদ্রাজেও জনতার বিক্ষোভ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে নদীয়ায় খাদ্য লুঠ হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ এবং মালদহে অবস্থা ক্রমে সঙ্গীন আকার ধারণ করিতেছে। মুর্শিদাবাদে চাউলের মূল্য ৬০৲ মণ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ রটিলে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সচিব শ্রীপ্রফুল্ল সেন বলিয়াছেন যে, ৬০৲ টাকা দর কোনদিনই হয় নাই, তবে সাংবাদিকদের নিকট ২২শে শ্রাবণ তারিখে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলার কোন কোন ঘাটতি এলাকায় চাউলের মূল্য মণপ্রতি ৫০৲ টাকা হইয়াছে।

চাউলের দাম ২০৲ টাকার বেশী হইলে সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্দশার চরম হয়, তাহা ৬০-এর বদলে ৫০৲ টাকায় চড়িলে তফাৎটা কি হইল আমরা তো বুঝিলাম না। অনাহারে মৃত্যুর সংবাদও আসিতেছে।

মুর্শিদাবাদের খাদ্যাভাবের সমাধান দাবি করিয়া পাঁচ হাজার লোকের একটি শোভাযাত্রা বহরমপুরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোর সম্মুখে উপস্থিত হয়। পুলিস তাহাদিগকে লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়াছে এবং কুড়ি জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

খাদ্যের অব্যবস্থার জন্য সরকারী সংগ্রহ-নীতির দোষ এবং চোরাকারবার অনেকখানি দায়ী। মুর্শিদাবাদ ও মালদহ সীমান্তবর্ত্তী জেলা। এক জেলা হইতে পাকিস্থানে ও অপর জেলা হইতে পাকিস্থান ও উত্তর-বিহারে চোরা চালানের সুযোগ রহিয়াছে। চোরাকারবার নিবারণের দিকে গবর্ণমেণ্ট কোন সময়েই বিশেষ মনোযোগ দেন নাই, কারণ এই ব্যবসায়ে যাহারা লিপ্ত রহিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কংগ্রেসীদের অভাব নাই। মুর্শিদাবাদ হইতে গত বৎসরের ফসল সংগ্রহ করিয়া গবর্ণমেণ্ট বাহিরে লইয়া আসিয়াছেন। এখন খাদ্যমন্ত্রী বলিতেছেন, মুর্শিদাবাদ ঘাট্‌তি না বাড়তি জেলা তাহা উদ্বাস্তু আগমনের জন্য সঠিক বলা যায় না। এই জ্ঞানটা সময় থাকিতে হয় নাই কেন? যখন আমাদের এই অভাগা প্রদেশে একদল লোক আছেন যাঁহারা পথে ঘাটে, সংবাদপত্রের কলমে তো ক্রমাগতই জানাইয়াছেন ও জানাইতেছেন যে পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত হিন্দুকে উদ্বাস্তু না করিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হইবেন না, তখন উদ্বাস্তুরা যে আসিবেই, কোন বাধা মানিবে না তাহা তো তিন বৎসর যাবৎ দেখা যাইতেছে। তাহাদের ফিরিয়া পাঠাইবার সকল চেষ্টাও ব্যর্থ হইতেছে। তাহাদের থাকা ভাল কি যাওয়া ভাল, ফেরত পাঠাইতে হইলে কি করা দরকার তাহা পণ্ডিত জবাহরলাল ভাবিতেছেন কিন্তু তাহারা যে ফিরিয়া যাইতে অনিচ্ছুক খাদ্যমন্ত্রী তো এটুকু বুঝিতে পারিতেন। মুর্শিদাবাদ সীমান্তবর্ত্তী জেলা, এখানে উদ্বাস্তুর ভিড় বেশী হইবে ইহাও জানা কথা। এই অবস্থায় মুর্শিদাবাদের চাউলগুলি টানিয়া বাহির করা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই। এইটুকু দূরদৃষ্টি মন্ত্রীদেরও যদি না থাকে, লক্ষ লক্ষ লোকের অন্নবস্ত্রের ব্যাপার লইয়া যদি খামখেয়ালী চলিতে থাকে তবে দেশ বাঁচিবে কিরূপে?

এবার অন্ততঃ একটা লক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, খাদ্যাভাব লোকে নীরবে সহ্য করিবে না, বিক্ষোভ প্রকাশ করিবেই। কাজেই গবর্ণমেণ্ট সময় থাকিতে সতর্ক না হইলে এবারকার ধাক্কা সামলানো তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইবে। সোসালিষ্ট পার্টি মাদ্রাজে এবং আর-এস-পি মুর্শিদাবাদে ভুখা মিছিল বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা সংযমের বাহিরে জনতাকে

যাইতে না দিলেই শুভ ফল পাইবেন। গবর্মেণ্ট খাদ্যবিষয়ে নূতন নূতন পরিকল্পনা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই বা করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাদিগকে পরিকল্পনার ধূম্রলোক হইতে বাস্তব জীবনে টানিয়া নামাইবার জন্য ভুখা মিছিলের প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ শান্ত ও সংযত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কোরিয়ার যুদ্ধ

আজ প্রায় ৫০ দিন হইল উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করিয়াছে এবং আমরা প্রায় ৩০ দিন পর এই যুদ্ধের গতি-পরিণতি সম্পর্কীয় নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাইতেছি। গত মাসের 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় যেভাবে সংবাদ আলোচিত হয় এখনও রণক্ষেত্রে পরিস্থিতিতে তাহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি না। জেনারেল ম্যাকআর্থার কর্তৃক পরিচালিত সৈন্যবাহিনী পিছু হটিতেছে, সমগ্র কোরিয়ার ৪ ভাগের তিন ভাগ প্রায় কম্যুনিষ্টদের দখলে চলিয়া গিয়াছে। গত ২৫শে শ্রাবণের দৈনিক সংবাদপত্রে দেখিয়াছি যে, উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী চিনজু হইতে বিমান আক্রমণের চোটে একটু হটিয়া গিয়াছে। মার্কিনী আক্রমণের গতি কিভাবে অগ্রসর হইতে পারে এই কথা নিশ্চয় করিয়া কেহই কিছু বলিতে পারে না।

সম্প্রতি মার্কিন যুদ্ধ বিভাগের একজন কর্তাব্যক্তি বলিয়াছেন যে, আগামী শরৎ কালের পূর্ব্বেতাহাদের প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ হইবে না, এমন কি শীতকালে আয়োজন-উদ্যোগ শেষ করিয়া আগামী বসন্তে মার্কিনবাহিনী প্রতি-আক্রমণের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে সক্ষম হইবে। বর্ত্তমান রণনীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে মনে করাইয়া দেয়, মার্কিনী সেনাপতি কোরিয়ায় ভূমি বন্ধক রাখিয়া সময় কিনিতেছেন। এই সব যুক্তির সপক্ষে হয়ত অনেক কথা বলিবার আছে। কিন্তু প্রায় দেড় মাসব্যাপী কম্যুনিষ্টদের বিজয়ের পর এশিয়া খণ্ডে মার্কিনী প্রভাব-প্রতিপত্তি অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছে। অনেকে বলিতেছেন যে, কোরিয়া যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। যুদ্ধের গতিতে প্রধান লক্ষ্য করার বিষয় হইল উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাদলের মধ্যে যুদ্ধদানের ক্ষমতা ও ইচ্ছার প্রভেদ। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারেও দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে মার্কিন সরকার তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা সাজসরঞ্জাম সকল বিষয়েই বিশেষ কার্পণ্য ও উপেক্ষা দেখাইয়া পাশ্চাত্য শ্বেতাঙ্গের "বাণিয়া" বৃত্তি সার্থক করিয়াছেন। এখন তাহারই ফলভোগের পালা চলিয়াছে।

অন্যদিকে এই চ্যুতিবিচ্যুতির মধ্যে প্রধান হইল মার্কিনী সৈন্যবাহিনীর শিক্ষাদীক্ষায় আয়াস ও আরামের ব্যবস্থাদি এত বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে যে, সৈন্যাধ্যক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ সৈনিক পর্য্যন্ত সকলেই আরামপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ ও ফরাসী সামরিক 'মল্লিনাথ'বর্গ এই ব্যাপারটা ফলাও করিয়া প্রচার করিতেছেন। জাপানের রাজধানী টোকিও নগরী হইতে ওয়ার্ড প্রাইস নামক একজন ব্রিটিশ সংবাদদাতা গত ১৬ই শ্রাবণের বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, বিজিত দেশ অধিকার করিয়া বেশী দিন থাকিলে জেতার নৈতিক অধঃপতন ঘটে, সৈন্যবাহিনী আরামপ্রিয় হইয়া যায়। বর্ত্তমানে জাপানে মার্কিনী সৈন্যবাহিনীর জীবনযাত্রা যুদ্ধের উপযোগী নয়, তাহারা 'বাবু' বনিয়া যায়; বিজলী বাতি, বিজলী রন্ধনের ব্যবস্থা, খাদ্যসংরক্ষণের নানাবিধ যন্ত্র, খাদ্যের বহর—এই সব আরামের মধ্যে পড়িয়া মার্কিনী সৈন্যবাহিনী 'মোলায়েম' (softened) হইয়া গিয়াছে। মার্কিনী সংবাদপত্রেও এই সব কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

কোরিয়ার এই 'শিক্ষা' মার্কিন সমর বিভাগকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। এ দিকে উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী ছেঁড়া জুতা, ছেঁড়া পোশাক, 'মুড়িমুড়কী' খাইয়া লড়িতেছে একটা বিশ্বাসের জোরে—কম্যুনিষ্ট জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠার জন্য, শ্বেতকায় 'শয়তানে'র হাত হইতে নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে মার্কিনী সাধারণ সৈন্য—ইংরেজীর G. I. (Government Issue) এই দুই অক্ষরে যে পরিচয় লাভ করিয়া থাকে—গবর্মেণ্ট কর্তৃক সমস্ত পোষাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র লাভ করিয়া থাকে সেই মার্কিনী সৈন্য জানে না ৬০০০ হাজার মাইল দূরে, প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে সে কিসের জন্য যুদ্ধ করিতেছে ও প্রাণ দিতেছে। পরদেশে যুদ্ধ করার এই এক বিপদ, শত্রু-মিত্র সকলেই মনে করে যে পরদেশী সহায়ক নিশ্চয়ই কোন স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিতেছে। গত বিশ্বযুদ্ধে ব্রহ্ম, মালয়, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটিশ ও মার্কিন সেনাপতি ও সৈন্যবাহিনী এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধে মার্কিন 'রক্ষাকর্ত্তারা' নূতন করিয়া তাহা লাভ করিতেছেন। বিলাতে 'অবজারভার' নামে একখানি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আছে, তাহার বিশেষ সংবাদদাতা ফিলিপ ডিন দক্ষিণ কোরিয়ার রণাঙ্গন হইতে যুদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এলাহাবাদের 'লিডার' (দৈনিক) পত্রিকার ১১ই শ্রাবণের সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার সাধারণ লোক এই যুদ্ধের গতি-পরিণতি কি ভাবে গ্রহণ করিতেছে, তাহার একটা বর্ণনা আছে। তাহার একাংশের মর্ম্মার্থ অনুবাদ করিয়া দিলাম :

"কম্যুনিষ্টরা দক্ষিণ কোরিয়ার পলাতক জনস্রোতের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, তাহাদের পৃথক করা একেবারে অসম্ভব; সুতরাং সমস্ত বুঝিয়াও আমাদের দিনের বেলায় এদের গতি বন্ধ করিবার উপায় ছিল না, এরাই আবার রাত্রে বন্দুক হাতে ঝোপের আড়াল হইতে আমাদের খুন করিতেছে।

"২৪শ ডিভিসন সৈন্যবাহিনীর সার্জ্জন মেজর ওয়েড হেরিটেজ অগ্রযাত্রী দলে তাঁহার অধীনস্থ স্বাস্থ্য বিভাগীয় লোকেরা কি ভাবে তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতেছে, তাহা দেখিবার সময় আমাকেও সঙ্গে লইলেন এবং শুশ্রূষার সুব্যবস্থাদি আমাকে দেখাইতে লাগিলেন। টেজন হইতে কন্‌জু পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে কুম নদীর তীর বাহিয়া সেই পথে আমরা চলিলাম। তিনি ও তাঁহার গাড়ীর চালক কম্যুনিষ্ট পরিবেশিত গোলাবৃষ্টির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, কিন্তু মেজর হেরিটেজ বিড়বিড় করিতে লাগিলেন: 'আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে এদের প্রত্যেক বোঝার মধ্যে অন্ততঃ একটা পিস্তল আছে, এরূপভাবে এই সব বেজন্মাদের যাইতে দেওয়া আত্মহত্যার সামিল।'

"পথে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলাম যুবক কোরিয়ানরা —সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের উপযোগী যুবকেরা, হাজারে হাজারে পলাতক জনস্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে; তাহারা বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদের সঙ্গে যাইতেছে কিন্তু মাথা উচু করিয়া হাত দুলাইয়া। এই ভীত-সন্ত্রস্ত হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ শিশুর মধ্যে তাহাদের মুখেই কেবল হাসি দেখিলাম। মেজর হেরিটেজ বলিতে লাগিলেন—'এদের, এই কোরিয়ান যুবকদের সকলকে গুলি করা উচিত; এরাই রাত্রিবেলায় আমাদের ছেলেদের পশ্চাৎ দিক হইতে গুলি করে। আমাদের চোখের সামনে এরা চলিয়া যাইতেছে, এবং আজ রাত্রে শুনিব যে, কম্যুনিষ্টরা আমাদের সৈন্যবাহিনীর পৃষ্ঠদেশে অনুপ্রবেশ করিয়াছে।"

কোরিয়ার রণাঙ্গনে মার্কিনী সৈন্যবাহিনীর বিপদের ও অকৃতকার্য্যতার কারণ সম্বন্ধে এই বর্ণনা হইতে একটা ধারণা করা যায়। কোরিয়ার জনগণের এই বিরূপভাব মাথায় পাতিয়াই মার্কিন সৈন্যাধ্যক্ষকে চলিতে হইবে। চীন দেশের বিপদের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩০০।৪০০ কোটি টাকা দিয়া, অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া ঐ দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সাহায্য করিয়াছিল। এই সাহায্যের মাহাত্ম্য চীন দেশের লোক বুঝে নাই, তাহারা কম্যুনিষ্ট বনিয়া গিয়াছে।

কুটীরশিল্প

কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্য ভারত-সরকার একটি বোর্ড গঠন করিয়াছেন। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন সম্পর্কিত খোঁজখবর এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে কুটীরশিল্প বোর্ডের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কুটীরশিল্পে শিক্ষালাভের জন্য যে সকল সুবিধা আছে সমিতি তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বোর্ডের কার্য্যক্রম নিম্নলিখিত ভাবে স্থির হইয়াছে:

(ক) বিভিন্ন প্রদেশকে কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্য যে টাকা মঞ্জুর করা হয় তাহা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

(খ) কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা তদারক করা হইবে।

(গ) কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্য প্রদেশগুলি যেসব পরিকল্পনা করিবে কেন্দ্রীয় সরকার তাহার প্রণয়ন ও প্রয়োগ উভয় সময়েই পরামর্শ দিবেন।

(ঘ) কুটীরশিল্প বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের পরিকল্পনার সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।

কমিটি যে সব বিষয় অগৌণে কার্য্যে পরিণত করিবার সিদ্ধান্ত করিতেছেন, ছোটখাট কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠানে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্পর্কে কর্ম্মীদিগকে শিক্ষাদান তন্মধ্যে অন্যতম।

কমিটি ইহাও স্থির করিয়াছেন যে, বৃহৎ শিল্পের সহিত যেসব কুটীরশিল্পের প্রতিযোগিতা চলে সেগুলিকে অবিলম্বে সাহায্যদান করিতে হইবে। এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে কয়েকটি শিল্পকে সুপারিশ করা হইয়াছে, যথা—বিভিন্ন শ্রেণীর চর্ম্মশিল্প, সুতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন, পশমের সুতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন, পাটের সুতা তৈরি, আহার্য্য তেল উৎপাদন, মৃৎশিল্প, মৌমাছির চাষ, ছোট ছোট যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ, ধাতব তৈজসপত্র নির্ম্মাণ ধান ভানা, নারিকেল দড়ি তৈরি, গুড় তৈরি এবং হাতে তৈরি কাগজ। বর্ত্তমানে যাহারা এই সব কাজ করিতেছে তাহা-দিগকেই এই সব সুবিধা দেওয়া হইবে।

কুটীরশিল্পের উন্নতি ছাড়া ভারতের সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নতি সুদূরপরাহত। জাপান ইহা দ্বারা শিল্পজগতে সাফল্য লাভ করিয়াছে, গত যুদ্ধে ব্রিটেনও ছোট শিল্পের ভিত্তিতে তাহার সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠন করিয়া বেকার সমস্যা দূর করিয়াছে। কুটীরশিল্প এবং বৃহৎ শিল্প পরস্পর বিরোধী নয়, উহারা একে অন্যের পরিপূরক, পরিকল্পনা না থাকিলে উহারা পরিপূরকের পরিবর্ত্তে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের দেশে যাঁহাদের উপর কুটীরশিল্পের উন্নতির ভার দেওয়া হয় তাঁহারা এই দিকটা কিছুতেই দেখিতে চান না। কুটীরশিল্প বিষয়ে সামান্য কিছু শিক্ষাদান, মিউজিয়াম স্থাপন এবং ছিটেফোঁটা ভিক্ষাস্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য—কুটীর-শিল্পের উন্নতি বলিতে ইহাই তাঁহারা বুঝিয়া আসিতেছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অগ্রসর না হইলে এবং জাপান ও ব্রিটেনের শিক্ষা গ্রহণ না করিলে আমাদের কুটীরশিল্পের উন্নতির বিশেষ ভরসা আছে বলিয়া মনে হয় না।

উপেক্ষিত কাছাড়

করিমগঞ্জের "যুগশক্তি" কাছাড়ের অবস্থা সম্বন্ধে ১৯শে শ্রাবণ সংখ্যায় যে মন্তব্য করিয়াছেন তৎপ্রতি ভারত-সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। উহা এই:

"জেলা হিসাবে বিচার করিলে এ বিষয়ে আমাদের এই চির অবহেলিত কাছাড়ের অবস্থা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। কাছাড় জেলার অভ্যন্তরে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াতের যেমন অসুবিধা, বাহিরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা ততোধিক সমস্যাসঙ্কুল। ইদানীং ভারতীয় রেলকর্তৃপক্ষ দেশব্যাপী রেলগাড়ীর সংস্কার ও উন্নতিসাধন ক্রমে রেলভ্রমণ যথাসম্ভব আরামপ্রদ করিতে মনোযোগী হইয়াছেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে (এমন কি আসামেরও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়) রেল-চলাচল-ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই অপেক্ষাকৃত উন্নত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য কাছাড় জেলায় রেলভ্রমণ আজও তেমনি বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ও বিভীষিকাময় রহিয়াছে। এই এলাকায় গাড়ীগুলি সব জীর্ণ, ভগ্ন, দরজা-জানালাহীন; জল ও আলোর ব্যবস্থা প্রায়ই থাকে না। স্থানাভাব বশত: সর্ব্বদাই বহু যাত্রীকে গাড়ীর ছাদে চড়িয়া অথবা পাদানীতে ঝুলিয়া প্রাণ হাতে লইয়া ভ্রমণ করিতে হয়। অনেককে প্রাণ বিসর্জ্জনও দিতে হয়। করিমগঞ্জ-শিলচর ও অন্যান্য শাখা লাইনে প্রায়শ: তৃতীয় শ্রেণী ভিন্ন অন্য কোন উচ্চতর শ্রেণীর কামরাই থাকে না। অথবা কোন দিন থাকিলেও ক্ষুদ্র এক-আধটি প্রকোষ্ঠ দেখা যায়। ফলে অধিক মূল্যে উচ্চ শ্রেণীর টিকেট ক্রয় করিয়াও কেহ কেহ নিম্ন শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হন। ষ্টেশনে বিশ্রামাগারগুলি অনেকস্থলেই মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী নহে। যাত্রীদের পক্ষে নিম্ন শ্রেণীর টিকেট ক্রয় করা এক প্রাণান্তকর ব্যাপার।

"এদিকে পাহাড় লাইনে যাতায়াতকারী বা মাল আনয়নকারীকে আবহমান কাল হইতে যে দ্বিগুণ রেলভাড়া দিতে হইতেছে, বহু আবেদন-নিবেদন ও আন্দোলন সত্ত্বেও তাহা হ্রাস করা হয় নাই। পূর্ব্বপাকিস্থানের মধ্য দিয়া কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে মাল আমদানীর পথ বন্ধ থাকিলে কাছাড়ের অধিবাসীদের কিরূপ সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হয় তাহার অভিজ্ঞতা লাভের পরও কাছাড়ের এই জটিল সমস্যার প্রতি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট মনোযোগ দিতেছেন না বলিয়াই মনে হয়।

"শুধু লোক চলাচল ও মাল আদানপ্রদানের ব্যাপারেই কাছাড়বাসীর দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে এমন নহে। এই অঞ্চলের প্রতি ডাকবিভাগের উপেক্ষা হেতু জনসাধারণের ক্ষতি ও অসুবিধা যাহা হইতেছে, তাহাও সামান্য নহে। ভারত-সরকার কর্ত্তৃক সম্প্রতি বহু প্রত্যাশিত বিমান ডাকের প্রচলন হওয়ায় অত্যল্প সময়ে দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে চিঠিপত্রাদি পৌঁছিতে পারে। ডাক মাশুলও এইজন্য যথেষ্ট বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। কিন্তু হতভাগ্য কাছাড়বাসী এই ব্যবস্থায় বিশেষ উপকৃত হইতে পারে নাই। শিলং, গৌহাটি, কলিকাতা ইত্যাদি স্থানের প্রথম শ্রেণীর ডাক এখানে আসিয়া বিলি হইতে এখনও তিন দিন লাগে। বুক পোষ্ট, মণিঅর্ডার, পার্শেলাদি ৮।১০ দিনে পৌঁছায়। এই ত অবস্থা।

"বিমানযোগে দূরবর্ত্তীস্থানে যাতায়াতের সামর্থ্য অথবা গরজ যাহাদের আছে, তাহারাও ইচ্ছা করিলেই যে সেই সুযোগ পাইবেন এমন নহে। ক্রমাগত কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়াও কলিকাতার টিকেট পাওয়া যায় না দেখা গিয়াছে। যে একটিমাত্র বিমান কোম্পানী কলিকাতা হইতে এতদঞ্চলে নিয়মিত বিমান চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যাতায়াতের ভাড়া সম্প্রতি বহুলাংশে হ্রাস করিয়াছেন। কিন্তু এই দিককার ভাড়া অপরিবর্ত্তিতই রহিয়াছে।

"ভারতীয় পার্লামেন্টে এখন কাছাড়ের কোন প্রতিনিধিই নাই। আসাম মন্ত্রিসভায় কাছাড়বাসী এক জন নামে আছেন বটে, কিন্তু কাছাড়ের জন্য তিনি কি করিয়াছেন, তাহা তিনিই ভাল বলিতে পারেন। আসাম ব্যবস্থা-পরিষদে কাছাড়ের যে সকল প্রতিনিধি রহিয়াছেন, তাঁহাদের কোন কথাই মন্ত্রিমণ্ডলের নিকট গ্রাহ্য হয় না বলিয়া সকলের ধারণা হইয়াছে।"

বাঁকুড়ায় সরবরাহের বিশৃঙ্খলা

পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বিরতি দান করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবেন না, বরং এই বিষয়ে একটু কম অধ্যবসায় দেখাইলে তাঁহার কর্ত্তব্য-পালনে যথেষ্ট অবসর পাইবেন। তাঁহার অধীনস্থ বিভাগের বিরুদ্ধে নানাদিকের জনমত যে ভাবে তৎপর হইয়া উঠিতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সুযোগও তিনি পাইবেন।

কলিকাতার ৭০।৮০ লক্ষ লোকের খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ একভাবে চলিতেছে। কিন্তু মফস্বলে কি হইতেছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় স্থানীয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে। আমরা বাঁকুড়ার আদি সংবাদপত্রের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া কলিকাতার বাহিরের বিশৃঙ্খলার পরিচয় দিতেছি। "বাঁকুড়া-দর্পণ" গত ৩১শে আষাঢ় তারিখে বলিয়াছেন :

"এত বড় একটা অফিস—যাহার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে, অগণিত অফিসার-আমলার ঝামেলা বহন করিতে হইতেছে—তাহার সার্থকতা কোথায়? ইঁহারা করেন-ই বা কি? চাউলের রেশনিং নাই—ময়দা চিনি—তাওতো 'ভুতের বাপের শ্রাদ্ধ'—নামমাত্র বিলির (?)

ব্যবস্থা করিতে হয়; তাহাও দেখা যাইতেছে দুই মাসের উপযুক্ত গমজাত দ্রব্য মজুত থাকা সত্ত্বেও এই মাসে ১০ই এর পূর্বে খুচরা ব্যবসায়ীগণ পারমিট পায় নাই। লোহা, রড, সিমেন্ট, করগেটের পারমিট দেওয়া ছাড়া এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটির অন্য কাজও ত দেখা যায় না। এই পারমিট তাঁহারা কিরূপ "বিদ্যুদ্গতিতে" সরবরাহ করিতেছেন দেখা যাউক:—গত বৎসর জুন মাসে যে রডের জন্য দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছিল, ছয় মাস পরে সে দরখাস্ত "অকেজো" হওয়ায় পুনরায় এই বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে দরখাস্ত করা হইল। সেও প্রায় ছয় মাস হয়-হয়—"অকেজো"—সাবাড়!! অথচ অনুসন্ধানে জানিলাম, প্রায় ৮ মাস পূর্ব্ব হইতে ব্যবসায়ীদের কাছে যে রড পড়িয়া আছে তাহার উপর পারমিট ইস্যু হইতেছে না। ইহাতে দরখাস্তকারী ও দোকানদার উভয়েরই ক্ষতি। গত মার্চ্চ মাসে যে সিমেন্টের জন্য দরখাস্ত করা হইয়াছে আজও তার পারমিট দেওয়া হয় নাই। অথচ পারমিট না দেওয়ায় এই মাসে সহরের কেবল একজন মাত্র সিমেন্ট ব্যবসায়ীরই প্রায় ৯০০ বস্তা সিমেন্ট ফ্রি-সেল হইল। ফলে সরকারের টন প্রতি ১৲ টাকা হিসাবে প্রায় ৪৫৲ টাকা রেভিনিউ লোকসান হইল আর সাধারণও অসুবিধায় পড়িল।"

১৩১ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের জনসংখ্যা

"জেলা বর্দ্ধমান।" আঠার শত তের ও চৌদ্দ সালে শ্রীযুক্ত বেলি সাহেব জেলা বর্দ্ধমানের সকল বিবরণ অনেক উদ্যোগে একত্র করিয়াছেন সে এই। জেলা বর্দ্ধমানের মধ্যে জঙ্গল নাই, সকল স্থানেই বসতি আছে। সেখানে দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার ছয়শত চৌত্রিশ ঘর আছে। তাহার মধ্যে দুই লক্ষ আঠার হাজার আট শত তিপ্পান্ন ঘর হিন্দু। এবং তেতাল্লিশ হাজার সাত শত একাশী ঘর মুসলমান। যদি প্রতি বাটীতে অনুমান সাড়ে পাঁচ জন মানুষ ধরা যায় তবে বর্দ্ধমান জিলার মধ্যে চৌদ্দ লক্ষ চৌয়াল্লিশ হাজার চারি শত সাতাশী জন লোক আছে। সেখানে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু পাঁচ গুণ অধিক। [সংবাদটি ২৩শে জানুয়ারী ১৮১৯, বাংলা ১১ই মাঘ ১২২৫ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।]

বর্দ্ধমানের 'আর্য্য' পত্রিকায় এই বৃত্তান্তটি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। বহুদিন পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছিলাম যে প্রায় এই 'এক শত একত্রিশ বৎসর' পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা খাদ্য-শস্য প্রসবিনী ছিল; তার পর ছিল দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর জেলা। শিয়োক্ত জেলা ইংরেজী আমলের সেচ ব্যবস্থার কল্যাণে শস্য-শ্যামলা আছে। কিন্তু বর্দ্ধমানের অবস্থা কি তাহা নিজ চক্ষে দেখিতেছি। এই অধোগতির ইতিহাস বর্দ্ধমানের সংবাদপত্রসমূহ আমাদের শুনাইতে পারেন। তার মধ্যেই হয় ত প্রতিকারের ইঙ্গিত বা উপায় খুঁজিয়া পাইব।

পাটজাতদ্রব্য রপ্তানিতে চোরাবাজারি

১৭ই শ্রাবণ দিল্লী হইতে শেঠ শ্রীরামকৃষ্ণ ডালমিয়া নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রচার করিয়াছেন এবং পাটজাতদ্রব্যের রপ্তানীমূল্য সংক্রান্ত কেলেঙ্কারী সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য দাবি জানান। নির্দ্ধারিত রপ্তানী মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গোপনে পাটজাতদ্রব্য বিক্রয়ের ফলে ইতিমধ্যে বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থায় ৫০ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি তাহার বিষয় উল্লেখ করেন এবং বলেন:

"যদি ইহা সত্য হয়, তবে তাহাতে এই বুঝায় যে, গবর্ণমেন্টের রাজস্ব হিসাবে প্রায় ২০ কোটি টাকা এবং পাটজাতদ্রব্য প্রস্তুতকারী কোম্পানীসমূহের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশীদারদের লাভের দিক দিয়া প্রায় ৩০ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এই সকল অর্থ বৈদেশিকদের এবং অতিরিক্ত মুনাফাকারী ম্যানেজিং এজেন্টসমূহের হাতে গিয়াছে। এই সকল অর্থ কোথায় গিয়াছে, তাহার সন্ধানের জন্য জনসাধারণের নিকটে গবর্ণমেন্টের একটা দায়িত্ব রহিয়াছে। অবিলম্বে এই গুরুতর কেলেঙ্কারী সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক এবং যতদূর সম্ভব অধিক মূল্যে পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় করিতে দেওয়া উচিত।...

"পার্লামেন্টে বা বাহিরে কোনও শক্তিশালী বিরোধীদল না থাকায় গবর্ণমেন্ট জনমত সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করিতেছেন। এমন কি যে সকল ক্ষেত্রে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে তাঁহারা ভীষণ কেলেঙ্কারীর অপরাধে অপরাধী, সে সকল ক্ষেত্রেও তাঁহারা কেলেঙ্কারী বন্ধ করার জন্য কদাচিৎ কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা এখনও পাটজাতদ্রব্যের রপ্তানীমূল্য সংক্রান্ত কেলেঙ্কারী সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অসম্মত হন, তবে জনসাধারণ সঙ্গতভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে যে, তাঁহারা নিজেরাই এই ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত আছেন। বর্ত্তমানে যখন পার্লামেন্টের অধিবেশন চলিতেছে, তখন পার্লামেন্টের সদস্যদের এই প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়া জাতীয় তহবিল ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশীদারগণকে আরও ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করা উচিত।"

এই বিবৃতির মধ্যে নেহরু গবর্ণমেন্টের উপর রূঢ় আক্রমণ আছে। এই আক্রমণ একেবারে অযৌক্তিক নয়। যেদিন গবর্ণমেন্ট মিঃ ওয়াকারকে পাটশিল্প ও ব্যবসায়ে নিয়ন্ত্রণকারী করিয়াছিলেন, সেইদিনই তাঁহারা গৃহ-শত্রু বিভীষণের হস্তে আমাদের একটি জাতীয় ব্যবসায়কে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা কোন্ বুদ্ধি বা পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইহা করিয়াছেন, তাহা এখনও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। মিঃ ওয়াকার যে বিদেশী শ্রেণীর প্রতিনিধি, তাঁহারা প্রায় সর্ব্বদাই ভারতীয় স্বার্থের হানি করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার

প্রমাণের অন্ত নাই। ইঁহাদের নষ্টামি এখনও শেষ হয় নাই। যখন পাকিস্থান পাট বোর্ডের সঙ্গে মিঃ ওয়াকার চুক্তি করিয়াছিলেন, তখন আমরা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি। এই পাকিস্থানী মনোভাবাপন্ন ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ভারতের স্বার্থহানি করিয়া পাটের মূল্য বাবদ কিছু টাকা পাকিস্থানকে পাওয়াইয়া দিয়াছে, নিজেও পাইয়াছে। পাটকল কোম্পানী-সমূহের পরিচালনা তাহাদের হস্তগত বলিয়া তাহারা এরূপ করিতেছে। কিন্তু এই শিল্পের মূলধন শতকরা ৬৫ ভাগের মালিক ভারতরাষ্ট্রের লোক। এই কোম্পানীগুলির অংশীদারগণ কিন্তু নীরবে এই ক্ষতি সহ্য করিতেছেন, তাঁহাদের আত্মস্বার্থ রক্ষা করিবার শক্তি আছে বলিয়া কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

শুনিয়াছি এই অংশীদারবর্গের একটা সমিতি আছে। সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন করা ছাড়া প্রকাশ্য কোন আন্দোলন তাঁহারা করিতেছেন না। রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার প্রতিবাদও এই পর্য্যায়ে পড়ে। তিনি কোন অজ্ঞাত কারণে নেহরু-প্যাটেলের নিকট পত্রাঘাত করিয়াই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন; কোন ব্যাপক আন্দোলন করিবার চেষ্টা করিতেছেন না। অনেক "কুলের কথা" তিনি বলিতে পারেন। কিন্তু যে নিঃস্বার্থ বুদ্ধি থাকিলে লোকমত সংগঠন করা যায়, তাহা তাঁহার থাকিলে বিবৃতি দান করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার ১৭ই শ্রাবণের বিবৃতির মূল্য তুবড়ির ফুলকির ফোয়ারার বেশী কিছু নয়।

ভারতরাষ্ট্রে লীগদলের ষড়যন্ত্র

কয়েক মাস পূর্ব্বে আসাম ব্যবস্থাপক সভার কাছাড় প্রতিনিধিবর্গ তাহাদের অঞ্চলে পাকিস্থানী ষড়যন্ত্রের প্রতি জেলার আসাম প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাহাতে কোন ফল ফলিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ গত ২৭শে আষাঢ়ের 'জনশক্তি' পত্রিকায় এরূপ একটা অভিযোগের পুনরুক্তি দেখিলাম। কাছাড় জেলা কংগ্রেস কমিটির কয়েকটি শাখার সম্পাদক পত্র লিখিয়া জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মহাশয়ের পদত্যাগের দাবি করিয়াছেন। এই কার্য্যকলাপ ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের জানিয়া রাখা প্রয়োজন বলিয়া এই তথ্যগুলি নিয়ে প্রকাশিত করিলাম:

"...আসামে যখন লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তখন হইতেই কাছাড় জেলায় দ্বি-জাতিতত্ত্বের গোড়াপত্তন হয়। লীগ নেতৃবৃন্দ মনে যে বিষ ছড়াইয়া দিয়াছিল তাহা এমনই ভাবে আজ পর্য্যন্ত ক্রিয়া করিতেছে যে, তাহার অকাট্য প্রমাণ বর্ত্তমান রাষ্ট্রবিরোধী নানা কার্য্যকলাপ হইতেই পাওয়া যাইতেছে। দেশ বিভক্ত হওয়ায় পরও কুশিয়ারা নদীর গতি ও পাথরিয়া রিজার্ভের সীমানা নির্দ্ধারণ সম্পর্কে যে বাগে কমিশন বসিয়াছিল, সেই কমিশনের সম্মুখে তথ্যাদি পেশ করিয়া কাছাড় জেলাকে পাকিস্থানভুক্ত করিবার ষড়যন্ত্র, লীগ-চমুদের নানা কার্য্যাবলী হইতে পরিলক্ষিত হইয়াছিল, এমন কি সরকারী কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত নানা প্রকার ষড়যন্ত্রে যে লিপ্ত ছিলেন, তাহারও প্রমাণ রহিয়াছে। পাকিস্থান হইতে আগত মোল্লা ও মৌলবীগণ ধর্ম্মপ্রচারের অজুহাতে মসজিদে মসজিদে অবাধে সরল-বিশ্বাসী সংখ্যালঘুদের মনে পাকিস্থান-প্রীতি জাগাইয়া তুলে এবং নানা স্থানে পাকিস্থান দাবির সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করা হয় এবং চাঁদাও সংগৃহীত হয়। বাগে কমিশনের রায় প্রকাশিত হইল—পাকিস্থান দাবির বিরুদ্ধে। এই ব্যর্থতা প্রাক্তন লীগপন্থীদের মনে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে। যাহার ফলে, প্রকাশ্য ভাবে গো-হত্যা দ্বারা নানা স্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্ম্মের উপর আঘাত দিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা হয়। এইস্থলে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কাছাড় জেলার আসাম-মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য জনাব আবদুল মতলিব মজুমদারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের পরিপন্থী ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যে সংশ্লিষ্ট আছেন বলিয়া অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল এবং তাহা আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তদন্তে প্রমাণিতও হইয়াছিল।"

সমাজদ্রোহী কার্য্যকলাপ

২৩শে শ্রাবণের দৈনিক সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, মুর্শিদাবাদ জেলার সদর সহর বহরমপুরে একটি মিছিলের উপর কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করিতে হয়, মিছিলটির বিক্ষোভ ছিল খাদ্য-বণ্টন সম্বন্ধে। এই সব মিছিলের সংগঠকবর্গের মধ্যে অনেক সময় সমাজদ্রোহী মনোভাব বিদ্যমান থাকে। ভারতরাষ্ট্রে শান্তি ভঙ্গ করিয়া সর্ব্বপ্রকার গঠনমূলক কার্য্য ভণ্ডুল করিবার প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা হইতে তাহারা এই সব মিছিল বাহির করে। গত ২রা শ্রাবণ তারিখের "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকার ৩য় পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত মন্তব্যটিতে এইরূপ সমাজদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; স্থানীয় সরবরাহ বিভাগের প্রতি লোকের বিরূপ ভাবেরও প্রমাণ পাওয়া যায় এই মন্তব্যে:

"২৪ মণ চাল ছিনিয়ে নিয়েছি, আবার নিব।" এই শ্লোগান দিয়া সেদিন দল বিশেষের জনৈক কর্ম্মীকে একহারা একটি ভুখ-মিছিল পরিচালনা করিতে দেখিয়াছিলাম। এই ভুখ-মিছিলে শতাবধি বালক-বালিকা, ধাঙড় শ্রেণীর স্ত্রীলোক ও কিছু যুবক ছিল। সকলের হাতে শূন্য ঝোলা বা গামছা। কিন্তু ছিনাইয়া লওয়া চাউল দেখিলাম না। কে কাহার চাউল কোথায় ছিনাইয়া লইল? সংবাদ লইয়া জানা গেল, দুইটি রেশনের দোকানের রিজার্ভ ষ্টক বলিয়া চিহ্নিত ১৫/ মণ ও ৯/ মণ চাউল দলবিশেষের কর্ম্মীবৃন্দের দাবী বা অনুরোধে সমবেত ক্রয়ার্থীদের কণ্ট্রোল দরে বিক্রয় করিবার অনুমতি

পাওয়ায় উক্ত রিজার্ভ ষ্টক ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাই শ্লোগান সৃষ্টির কারণ এবং তাহা ফুরাইয়া যাওয়ার জন্যই ভুখ-মিছিলের লোকদের ঝোলা শূন্য। ঘটিয়াছে এক আর শুনিলাম ভিন্ন।

এই ভাবেই রেশনে চাউল দেওয়া চলিতেছে। সমাহর্ত্তা এক আদেশ দিতেছেন, খাদ্য-অধিকর্ত্তা আর এক রকম বলিতেছেন। কংগ্রেস-সম্পাদক এক কথা বলিলেন, কংগ্রেসকর্ম্মী রেশনের দোকানে আর এক নিয়ম চালাইলেন। তদুপরি টেক্কা দিতে আর-এস-পি স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া আর একটি কায়দা দেখাইলেন। নর-নারী 'কিউ' করিয়া রোদে পুড়িল, জলে ভিজিল এবং নানা জনের সরফরাজীর চাপে শেষ পর্য্যন্ত শূন্য হস্তে ঘরে ফিরিল। চাউল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু সরফরাজের দল বাড়িয়াই চলিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ কি এই সরফরাজী কণ্ট্রোল করিতে পারেন না?"

"অধিক খাদ্য-উৎপন্ন" আন্দোলনে নারীর স্থান

দিল্লী হইতে পরিবেশিত ২০শে শ্রাবণের একটি সংবাদে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি নূতন কল্পনার উল্লেখ দেখিলাম। খাদ্য-বিভাগের নূতন মন্ত্রী শ্রীকানাইয়ালাল মুন্সী ভারতরাষ্ট্রের নারী নাগরিকবর্গকে তাঁহার নূতন "অধিক খাদ্য-উৎপন্ন" আন্দোলনের মধ্যে টানিয়া আনিতে চান। তিনি একটি প্রতিষ্ঠান গড়িতে চান; তাহার নাম হইবে ভারতীয় নারী পরিষদ (council), যাহার কর্ত্তব্য হইবে দেশব্যাপী একটা নূতন প্রচেষ্টার (drive) প্রবর্ত্তন করা—শাক-সব্জীর ও অন্যান্য অপ্রধান (subsidiary) খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে।

কেন্দ্রীয় খাদ্য-বিভাগের অধীনে আর একটি প্রতিষ্ঠান ছিল; তার নাম খাদ্য-উৎপাদন কমিটি (Food Production Committee); তাহা বাতিল হইয়া যাইবে এবং নূতন ভারতীয়-নারী পরিষদ তার স্থান অধিকার করিবে। বোম্বাই সরকার নাকি ইতিমধ্যে অনুরূপ একটি নারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন; তাঁহাদের হাতে পরীক্ষামূলক ভাবে জমি দিয়াছেন; অপ্রধান খাদ্য উৎপাদন করিয়া খাদ্য শস্যের ব্যবহার কমাইবার এবং সপ্তাহে এক দিন অন্তত: খাদ্য-শস্য বর্জ্জন করিবার অভ্যাস সৃষ্টির জন্য।

ভারত-সরকারের নারী-পরিষদ তিন বৎসরের জন্য গঠিত হইতেছে। দিল্লী নগরীতে তার কেন্দ্র থাকিবে; অন্যান্য প্রদেশে ইহার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলি কার্য্য করিবে।

আমরা জানি না এই গুরুদায়িত্বের ভার কার—কোন্ কোন্ নেতৃস্থানীয়া মহিলার হস্তে সমর্পিত হইবে। তাঁহাদের নাম কল্পনা করা কঠিন নয়। যাঁহারাই হউন, তাঁহাদের অবগতির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কন্যাগণ কি করিতেছেন, তাহা হইতে "মার্কিন বার্ত্তা" নামক প্রচারপত্রে প্রকাশিত করিলাম:

"হটে যাবে না কোনও কিছুতেই, এই হ'ল মার্কিন কন্যাদের পণ। পড়া-শুনা, খেলা-ধুলা, কেরাণীগিরি থেকে সুরু করে উড়োজাহাজের পাইলট হওয়া পর্য্যন্ত তারা ধাওয়া করেছে পুরুষদের পিছনে। সভা-সমিতি, বক্তৃতা, ভোটযুদ্ধ ইত্যাদিতে তারা পাকা হয়ে গিয়েছে অনেক দিন। ঘর সংসার, গৃহস্থালীর কাজেও তারা কম যায় না। সব দিক দিয়ে নিজেদের চৌকষ করে তুলতে হবে, ঘরে বাইরে সব কিছু সামলাবার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে হবে—এই হ'ল মার্কিন কন্যাদের লক্ষ্য। আনাড়িপনার অসুবিধা অনেক, নানা ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে—অনভিজ্ঞতা এবং অনভ্যাসের জন্যে। শহুরে মেয়েরা গাছ-গাছড়া চেনে না, বাগ-বাগিচার খবর রাখে না; গ্রাম্য জীবনের ধারার সঙ্গে তাদের জীবন একেবারে বিচ্ছিন্ন।

"জীবনযাত্রাকে পূর্ণতর করতে হলে এই দুই বিচ্ছিন্ন ধারাকে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। এই তথ্যটির দিকে দৃষ্টি পড়েছে আজ মার্কিন কন্যাদের। পেনসিলভেনিয়ার মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের ছাত্রীদের জন্যে তাই পল্লীজীবন ও কৃষিকর্ম্মগত শিক্ষাদানের বিশেষ বন্দোবস্ত সেখানে করা হয়েছে।

"গ্রীষ্মের লম্বা ছুটির অবকাশে আমেরিকার ছাত্র-ছাত্রীরা নানা যায়গায় গিয়ে তাঁবু খাটিয়ে আনন্দে কয়েকটা দিন কাটায়। জীবনকে পূর্ণতর করে তোলবার শিক্ষার এটি একটি অঙ্গ—মার্কিনরাষ্ট্র সেটা ভাল করেই বুঝতে পেরেছে।

"কোনও পল্লী অঞ্চলে গিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের তাঁবু ফেলা হ'ল; দেড় মাস ধরে তারা সেখানে পল্লীজীবনের সংসারযাত্রা, চাষবাস, গৃহস্থালী, বাগবাগিচার কাজ ইত্যাদি শিখবে। এইসব ছাত্রীর বয়স ১৪ থেকে ১৮ বৎসর। প্রত্যেককেই এক টুকরো জমি দিয়ে তাতে শাক-সব্জী ফলাবার ভার দেওয়া হয় সেখানে। গাছ-গাছড়ার ডাল-পাতা পচিয়ে জমির সার কি করে তৈরি করতে হয়, ফসল কি করে কাটতে হয়, গোরু-বাছুরের যত্ন কেমন করে করতে হয়—এই সব বিষয়ে ছাত্রীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে।

"এই শিবির জীবন সমাপ্ত হয়ে গেলে ছাত্রীরা সেই পল্লীগ্রামেই একটি গ্রাম্য মেলার আয়োজন করবে। তাদের ক্ষেতের শাক-সব্জী, ফল-ফলারি, পনির, মাখন ইত্যাদি সেই মেলাতে হাজার হাজার লোকের সামনে প্রদর্শিত হবে।

"একটি গো এবং অশ্ব প্রদর্শনীর ভারও ছাত্রীরা নিয়েছে সেই মেলায়।"

বিদ্যাধরী মৎস্য-সমবায় সমিতি

গত ১৩ই শ্রাবণ তারিখের "পদাতিক" (সাপ্তাহিক) পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠ করিয়া একটি গঠনমূলক কর্ম্মের সন্ধান পাইলাম। এরূপ কর্ম্ম-প্রচেষ্টা যত বিস্তৃতি লাভ করে ততই মঙ্গল:

"গত ৪ঠা শ্রাবণ বিদ্যাধরী মৎস্য-সমবায় সমিতির সদস্যেরা পশ্চিমবঙ্গের সমবায়, ঋণ, সাহায্য-ও-পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী ডাঃ রফিউদ্দিন আমেদকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য এক সভার আয়োজন করেন। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে তিনি বলেন যে, সমবায় আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করে জনসাধারণের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ সারা দেশে দলাদলি করিবার প্রবৃত্তি অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার অবসান করিতেই হইবে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের ধনবৃদ্ধির আয়োজন না করিয়া জনসাধারণের অবস্থার উন্নয়ন করিবার জন্য আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে। জাতিধর্ম্ম-নির্বিশেষে এদেশের প্রত্যেকেই যে ভারতের নাগরিক একথা বুঝিতে ও তদনুযায়ী কাজ করিতে তিনি সকল লোককে অনুরোধ জানান। সমিতি যাহাতে দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দোবস্ত পায় তাহার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

"মৎস্যজীবীদের এই সমবায় সমিতিটি স্থাপিত হয় ১৯৩৩ সনে। পূর্ব্বে ইঁহারা পুঁজিবাদী ইজারাদারদের অধীনে শ্রমিকরূপে কার্য করিতেন। তদানীন্তন রেজিষ্ট্রার মহোদয়ের উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় ইহারা সংঘবদ্ধ হইয়া এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সমিতিকে অতিকষ্টে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে চলিতে হইয়াছে। ১৯৪৭ সনে সমিতি সরকারী ঋণ প্রাপ্ত হয় এবং সমিতির কাজ সুশৃঙ্খলায় সহিত চলিতে থাকে। অল্পকালের মধ্যেই সমিতি ঋণ পরিশোধ করিয়া স্বাবলম্বী হইতে সমর্থ হয়।

"এই সমিতির বৈশিষ্ট্য এই যে, স্থানীয় মৎস্যজীবী ছাড়া অপর কেহ ইহার সদস্য হইতে পারিবেন না। সমিতির কাজ সভ্যগণ ও তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র ও পরিজনবর্গই করেন এবং তাহার জন্য সমিতি তাঁহাদিগকে পারিশ্রমিক দিয়া থাকেন।

"সমিতির পরিচালনায় একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমিতিই ইহার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকে। বিদ্যালয়ে যে কেবলমাত্র সদস্যদের পুত্রকন্যা পড়িতে পারে তাহা নহে, নিকটবর্ত্তী গ্রামের যে-কোন শিশুই এখানে বিনাবেতনে পড়িতে পারে। চিকিৎসাকেন্দ্রটিও সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।"

উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত

মেদিনীপুরের রামনগর থানার পশ্চিম সীমান্তে উড়িষ্যা হইতে গবাদি পশু ও খাদ্য-শস্য আমদানী সম্পর্কে যে সমস্ত অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য গত ২১।২।৫০ তারিখে সাঁতরায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। রামনগর থানা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্দ্র মাইতি উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে থানার কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীরাধাগোবিন্দ বিশাল মহাশয় বলেন যে, গত মহাযুদ্ধের সময় হইতে উড়িষ্যা সরকার পশ্চিম বাংলায় বিশেষতঃ মেদিনীপুর জেলায় খাদ্যশস্য ও গবাদি পশু রপ্তানি নিষিদ্ধ করিয়া যে কর্ডন অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহার ফলে রামনগর থানার উড়িষ্যা সীমান্তবর্ত্তী এলাকার জনসাধারণের, বিশেষতঃ উড়িষ্যা প্রদেশে যাহাদের জমিজমা আছে, তাহাদের ভয়ানক অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। উড়িষ্যা সীমার মধ্যে যাঁহাদের জমিজমা আছে তাঁহারা তথা হইতে ধান চাল লইয়া আসিতে পারেন না, বা সীমান্তবর্ত্তী জমি হইতে আবাদ্য খাদ্য আনিবার জন্য প্রত্যেক বৎসর উড়িষ্যা সরকারের নিকট হইতে অনুমতিপত্র আনিতে হয়। এ বৎসর উক্ত অনুমতিপত্র পাইতে বিলম্ব হওয়ায় সীমান্তের কৃষকদের বহু খাদ্য মাঠের জলে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে; ইহা ছাড়া রামনগর সীমান্তে উড়িষ্যা সরকার কর্ত্তৃক গার্ড নিযুক্ত হইয়াছে, তাহারা অবৈধ রপ্তানির সুবিধা দিয়া প্রচুর পরিমাণে ঘুষ লইতেছে, এবং বহু নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও অযথা হয়রানি করিতেছে। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:

(১) এই সভা রামনগর থানার যে সমস্ত লোকের সুবর্ণরেখার পূর্ব্বপারে বালেশ্বর জেলায় জমি-জমা আছে তাহাদিগকে বর্ত্তমান বৎসর অন্নাভাবের কথা বিবেচনা করিয়া খাদ্য আনিবার অনুমতি দিতে উড়িষ্যা সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে।

(২) এই সভা সুবর্ণরেখা নদীর পূর্ব্ব পারে উড়িষ্যা প্রদেশের যে অঞ্চলের সহিত রামনগর থানার অধিবাসীদের বহুকাল হইতে আদান-প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কুটুম্বিতার সূত্র স্থাপিত হইয়াছে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সুবর্ণরেখা নদীর পশ্চিম পার হইতে গার্ড বসাইয়া কর্ডন অডিন্যান্স প্রবর্ত্তন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

(৩) রামনগর-উড়িষ্যা সীমান্তে নিযুক্ত গার্ডগণ যে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া অবৈধ রপ্তানির সুযোগ দিতেছে, তাহার ফলে বহু নির্দ্দোষ ব্যক্তিও অযথা হয়রানি ভোগ করিতেছে, এই সভা তৎপ্রতি উড়িষ্যা-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং জনসাধারণকে দুর্নীতির আশ্রয় লইতে নিষেধ করিতেছে।

(৪) সীমান্ত অঞ্চলে উল্লিখিত দুর্নীতিগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য এই সভা সীমান্তবাসী কৃষকদের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া রামনগর থানা কংগ্রেস কমিটির অধীনে রামনগর সীমান্ত সমস্যা সাবকমিটি গঠনের প্রস্তাব করিতেছে এবং এই সাবকমিটি উড়িষ্যা সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে উক্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য আলোচনা চালাইবার ব্যবস্থা করিবে।

সভার শেষে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, এই সমস্যা সম্পর্কে

অসুবিধাগ্রস্ত জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে।

পরিশেষে স্থির হয় যে, এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি অবিলম্বে মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও মাননীয় উড়িষ্যা সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং অবিলম্বে উভয় প্রাদেশিক সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়দিগকে সীমান্ত সমস্যা অনুধাবন করিবার জন্য মিলিত তদন্তের দাবি জানান হইবে।

এই অতি সামান্য সমস্যা সমাধানের প্রতি উড়িষ্যার নূতন প্রধান মন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আসামের আদিম জাতি

"প্রবাসী" পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় আমরা আসাম প্রদেশের জন-সংস্থানের ও সংখ্যার আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি "অহোমিয়া" ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য যে দাবি-দাওয়া করা হইয়াছে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অনেক তথ্য প্রকাশ পাইতেছে যাহা অহোমদের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন এই প্রদেশ "নৃতত্ত্ববিদ্‌বর্গের ভূ-স্বর্গ।" কত জাতির, কত পরিচয়ের, কত রূপের জন-সমষ্টি এই প্রদেশে বাস করে তার ইয়ত্তা নাই। ভারত বিভাগের পূর্ব্বে আসামের জন-সংখ্যা ছিল প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ; ইহার পর অহোমিয়া চক্রান্তে শ্রীহট্ট জেলার একাংশ পাকিস্থানস্থ পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে; আসামের জন-সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় ৮৫ লক্ষ। আহোম ভাষাভাষীর লোকের সংখ্যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ; বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা তার সমান; নানা আদিম জাতির সংখ্যা অবশিষ্ট। তাহারা আবার অসংখ্য গোষ্ঠীতে বিভক্ত; সর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যালঘিষ্ঠের সংখ্যা নাকি মাত্র ৩৫ জন।

এই অবস্থায় আসাম প্রদেশে আদিম জাতিকে বর্ত্তমান যুগোপযোগী করিয়া তুলিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের পক্ষে একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আসামের বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর "অহোমিয়া" ভাবের দাপটে তাহাদের স্বার্থ বিপন্ন হইতে পারে; যাহারা বাঙালীকে বলিতে পারে ভাষা ও রীতি-নীতি বদলাইতে তাহারা আদিম জাতিবৃন্দকে কি বলিবে, তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়। সেইজন্য আদিম জাতি সম্পর্কে প্রদেশপালের একটা "বিশেষ দায়িত্ব" আছে। সমস্যার জটিলতা সর্ব্বগ্রাহ্য; তাহা সরল করিবার উপায়ও বাহির করিতে হইবে। এই জটিলতার একটা নমুনা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে পাওয়া যায়। লুসাই জাতির মধ্যে নাকি একটা নব-জাগরণ দেখা দিয়াছে; এই জাতিও নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। একটির কথা মাত্র এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে:

লুসাই রিয়াং জনকায়েজের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমুলাধার রিয়াং সম্প্রতি তাঁহার এলাকাস্থ পার্ব্বত্যবাসীদিগের পক্ষ হইতে একটি তথ্য-বহুল অভিযোগ আসামের স্বরাষ্ট্র সচিব প্রভৃতি মহোদয়গণের সমীপে পেশ করিয়াছেন। অভিযোগে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ হাইলাকান্দির কালা পাহাড়, বেতছড়া প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চলের রিয়াং অধিবাসীকে আজ বহু কাল যাবৎ সমতলবাসী হইতে পৃথক রাখা হইতেছে ও তাহাদের সুখসুবিধার প্রতি সরকার এযাবৎ মোটেই চেষ্টিত হন নাই। এমন কি, বর্ত্তমান ভোটার লিষ্টে তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয় নাই, এবং ঘরগুলিতে সরকারী লোক গণনাকারী কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক কোনও নম্বর অদ্যাবধি দেওয়া হয় নাই। বর্ত্তমান ভারতে তাহারাও যাহাতে পূর্ণ নাগরিক অধিকার পাইতে পারে তজ্জন্য অনুরোধ জানাইয়া তাঁহারা উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

"এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, গত ১৯৪৬ সনে লুসাই রিয়াংদের পক্ষে হাইলাকান্দি প্রজা-সভার সম্পাদক শ্রীরসেন্দ্রচন্দ্র শীল ও কোষাধ্যক্ষ শ্রী এম. বালা সিংহ আসাম-সরকারের নিকট পার্ব্বত্যবাসীদের দাবি-দওয়া জানাইবার জন্য একটি ডেপুটেশন লইয়া যান। ঐ সময় হইতে লুসাই রিয়াং সম্প্রদায় আসাম কংগ্রেসের প্রতি বেশ অনুরক্ত হইয়া পড়ে। এখনও তাহাদের সহিত স্থানীয় কংগ্রেস সংযোগসাধন করিয়া চলিলে পার্ব্বত্যবাসীদের দুঃখদুর্গতির অনেকাংশে লাঘব হইবে।

জাতি তত্ত্বের আলোচনা

"এক জাতি অপর জাতি অপেক্ষা বুদ্ধিতে কিংবা অন্যবিধ মানসিক গুণাবলীতে শ্রেষ্ঠতর, এই ধারণার মূলে কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনস্থ "শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-পরিষদ" কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটি বিশেষজ্ঞদল সম্প্রতি পৃথিবীর জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপরোক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে নানাবিধ মতবাদ প্রচলিত আছে, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের নিরিখে বিচার করিয়া এই বিশেষজ্ঞ দলটি যে সকল সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, এইরূপ নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত এ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে আর হয় নাই।

বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট জীব-বিজ্ঞানী, জন্মতত্ত্ববিশারদ, মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতত্ত্ববিদ্‌ ও নৃতত্ত্ববিদ্‌দের লইয়া এই বিশেষজ্ঞ দলটি গঠিত হইয়াছিল। তাঁহাদের নিরূপিত কয়েকটি সিদ্ধান্ত হইল:—

১। জাতিগত ভেদ-বিচার জীব-বিজ্ঞানসম্মত নয়।

২। জাতিহিসাবে মানসিক উৎকর্ষের অধিকারী সকলেই প্রায় সমান, সমান সুযোগ পাইলে সকলেই প্রায় সমান উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে।

৩। জাতিগত মিশ্রণের (বিবাহঘটিত) ফলে বংশগত অধোগতি ঘটিবার সমর্থক কোনও প্রমাণ নাই।

৪। জীব-বিজ্ঞানের স্বাভাবিক পরিণতি-হিসাবে 'জাতি' গড়িয়া উঠে নাই—সামাজিক মানুষই জাতির জন্মদাতা। ধর্ম্ম-গত কিংবা রাষ্ট্রগত যে সকল বৃহৎ মানবগোষ্ঠী বর্ত্তমানে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক বিচারে তাহাদের কোনটিই এক জাতি নয়। এক ভাষাভাষী, এক অঞ্চলনিবাসী অথবা একই সংস্কৃতির অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও সকলেই একই জাতিসম্ভূত কিংবা এক জাতিভুক্ত হইবে এমন কোনও নিয়ম নাই।"

এই সিদ্ধান্তের ফলে পৃথিবীর লোকের মনে ও ব্যবহারে কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলে সকলে সুখী হইবেন।

অস্পৃশ্যতা

চিন্তানায়ক বা সমাজ-জীবনে যুগ-প্রবর্ত্তক, কেহই হিন্দু-সমাজের মধ্যে যে অস্পৃশ্যতা দানা বাঁধিয়াছে, তাহা সমর্থন করেন না। সামাজিক অবিচার ও অনাচার অন্যান্য দেশেও আছে; কিন্তু সেইসব সমাজে প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে; অস্পৃশ্যকে বা নবাগতকে সমাজের ধ্যান-ধারণার উপযোগী শিক্ষা-দীক্ষা দান করিয়া তাহাকে সমাজ-জীবনে পাংক্তেয় করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু হিন্দু-সমাজে তাহা নাই। গান্ধীজী আজীবন এই প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। "সারথি" পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের নিম্নলিখিত মত পাঠ করিয়া আশান্বিত হইলাম :

"আমাদের জীবনের ও সমাজের রীতিনীতিগুলি অবনত ও অপকৃষ্ট হইয়া পড়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও যেগুলি নিজেরাই ভ্রান্ত, সমর্থনের অযোগ্য, আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্ব্বলতাসাধক অথবা আমাদের সভ্যতার পক্ষে লজ্জা ও অপমানের কথা, কোনরূপ বৃথা তর্ক বা কুণ্ঠা না করিয়া সে সব আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের অস্পৃশ্যদের প্রতি আমরা কিরূপ ব্যবহার করিতেছি ইহাই একটি জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। কেহ কেহ ইহার অজুহাত স্বরূপ বলিবেন যে, পুরাকালে এই ব্যবহার অপরিহার্য্য ছিল, এমন কি তখন এইটিই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমাধান; কিন্তু এই শেষের যুক্তিটি খুবই তর্কের বিষয়, আর কোন জিনিষের একটা অজুহাত দেখাইতে পারিলেই যে সেটা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা নহে।

"আবার এমন কেহ কেহ আছেন যাঁহারা ইহার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করিতে চান, এবং যাহা হউক কিছু পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া ইহাকে আমাদের সমাজের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া স্থায়ীভাবেই বজায় রাখিতে চান। যে সমাধান জাতির পঞ্চমাংশকে চিরকাল হীন করিয়া রাখে, তাহা বস্তুতঃ সমাধান নহে, তাহা হইতেছে দুর্ব্বলতাকে মানিয়া লওয়া, সমাজ-শরীরের পক্ষে এবং সমাজের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও নৈতিক কল্যাণের পক্ষে একটি স্থায়ী ক্ষতকে মানিয়া লওয়া। যে সমাজ-ব্যবস্থা স্বদেশবাসীকে হীন অবস্থায় রাখাকেই একটা চিরস্থায়ী বিধান করিয়া তবে বাঁচিতে পারে, তাহার বাঁচিবার অধিকার নাই।"

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যালঘুত্বের মূলে এই অস্পৃশ্যতার প্রভাব, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। পূর্ব্বপুরুষের অন্ধ বিশ্বাসের বিষময় ফল আজ তাহাদের সন্তান সন্ততিকে নাশ করিতেছে। এহেন দৃষ্টান্ত চোখের সামনে যদি কেহ দেখিয়াও না দেখেন তবে তিনি প্রকৃতই অন্ধ।

ভারতের সমাজ

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মুখপত্র "নবসংঘ" সাপ্তাহিকের ১৫ই শ্রাবণের সংখ্যায় একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পত্র-লেখক শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় অবিভক্ত বঙ্গদেশের ভূমি সম্বন্ধীয় দফতর ও জরিপ বিভাগের পরিচালক ছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজের জাতিপ্রথা, বর্ণাশ্রমপ্রথা, বিধিনিষেধের বহু প্রথা মানবসৃষ্টির অতুলনীয় পদ্ধতি বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই "সমাজ-পদ্ধতি তাঁহাকে বহু দুর্ব্বি-পাকেও জীবন্ত রাখিয়াছে" বলিয়া তিনি মনে করেন।

রামমোহন রায়ের সময় হইতে এই বিষয় লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে। প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে কেহই এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না—১২ শত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ কেন দুইবার রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা হারাইল? মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এই প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়া 'সাময়িক মলিনতার' দোহাই দিয়াছেন। ভারত-সমাজের ব্যবস্থায় পরাধীনতার আমলেও 'অতুলনীয় মানবকুসুম সৃষ্টি' হইয়াছে বলিয়া তিনি সন্তুষ্ট। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্ভব তাহার প্রমাণ। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন পরমহংস-দেবের মানস পুত্র, স্বামী, বিবেকানন্দ হিন্দু সমাজে ছুঁৎমার্গ সম্বন্ধে কি মন্তব্য করিয়াছিলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজী 'কুশিক্ষা' আমাদের বর্ত্তমান সমাজ-জীবনের কলঙ্কের জন্য দায়ী বলিয়া মনে করেন, এবং তাঁহার উক্তির সপক্ষে টি. ইলিয়টের (T. Elliot) *Notes on Culture* নামক পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিক বলিয়াছেন—ইংরেজের দ্বারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ক্ষতি তাহাদের অপসারণে ধীরে ধীরে পূরণ হইবে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষতি যাহা হইয়াছে, তাহা কোন কালে পূরণ হইবে কি না, সন্দেহ। এই ইংরেজ সাহিত্যিক তাঁহার একখানি সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসে হিন্দু ও মুসলিম সমাজের যে তুলনামূলক চিত্র অঙ্কিত করিয়া-ছিলেন, তাহা হিন্দু সমাজের সপক্ষে যায় না এবং অনেক সময় আমাদের মনে হয় যে পাশ্চাত্য চিন্তানায়কগণের

মন্তব্যের উল্লেখ করিয়া আমাদের যুক্তিতর্কের ভিত্তি দৃঢ় হয় না। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি যদি এতই অস্পৃশ্য হয়, তবে তাহা আমাদের পক্ষে এড়াইয়া চলাই ভাল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত 'সনাতন' মন লইয়া বর্ত্তমান যুগে চলা খুব সহজ নয়। তিনি নিজেই তাঁহার এই পত্রে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য চিন্তানায়কগণ তাঁহাদের সমাজ-ব্যবস্থার নানারূপ বিভ্রান্তিকর পরিবর্ত্তনে ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে একটা মুক্তিপথের সন্ধান পান বলিয়া আমরা উৎফুল্ল হইতে পারি। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছুঁৎমার্গের মধ্যে তাঁহারা বাস করিতে স্বীকৃত হইবেন কি না, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিলে অন্যায় হইবে না। সাংস্কৃতিক সাংকর্য্য মানব-ইতিহাসের টানা-পোড়েন এই কথা ভুলিলে চলিবে না।

বিবাহের বাজার

মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুদের নিকট শুনিয়াছিলাম যে পুনা নগরী চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠীর কেবল চিন্তা-জগৎ ও কর্ম্ম জগতের মর্ম্মস্থল নয়; "বিবাহের বাজার" বলিয়া তাহা সুপরিচিত। সেইরূপ দেখিতেছি বিহারেও একটা ব্যবস্থা আছে। তাহার বিবরণ ও ইতিহাস জ্ঞাতব্য। বিহাররাজ্যের দ্বারভাঙ্গা জেলার সৌরথ গ্রামে প্রতি বৎসর মৈথিলী ব্রাহ্মণদের বিবাহের বাজার বসে। অভিভাবকেরা বিবাহযোগ্য যুবকদিগকে লইয়া এই বাজারে বিপণি সাজাইয়া বসেন। কন্যাপক্ষের অভিভাবকরা আসিয়া পাত্র মনোনয়ন এবং দরদস্তুর করেন। কথাবার্ত্তা স্থির হইলে 'পঞ্জিকার' মৈথিলী ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন শাখা-উপশাখা সম্বন্ধে বিচার করিয়া প্রস্তাবিত বিবাহ সঙ্গত বলিয়া 'অগ্নিপত্র' প্রদান করেন। অতঃপর কন্যাপক্ষ পাত্রকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করেন। কন্যাকে দেখার কোনও প্রশ্নই মৈথিলী সমাজে নাই। এই না-দেখা না-জানা পাত্রীর জন্য খুব মোটা যৌতুক দিতে হয়। এই বৎসর জুন মাসের প্রথমে সৌরথ সভায় উত্তর বিহারের বিভিন্ন জেলা হইতে ২০ হাজার মৈথিলী ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়াছিলেন। সভায় দুই হাজার বিবাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। বরপক্ষের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী যৌতুকের পরিমাণ একশত টাকা হইতে চল্লিশ হাজার টাকা। ১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন তোগলকের রাজত্বকালে মিথিলার রাজা হরিসিং দেও মৈথিলী ব্রাহ্মণদের বিবাহের জন্য এই সৌরথ সভার প্রবর্ত্তন করেন। তদবধি সৌরথ গ্রামের আম্রকুঞ্জে ছয় শতাধিক বৎসরকাল মৈথিলী ব্রাহ্মণদের এই বিবাহের বাজার বসিয়া আসিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষা

শচীন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও শ্রীমতী অক্রুরাণী মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত মাসিক "সংগঠন" পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের গান্ধী-পন্থীবৃন্দের মুখপত্র। গত জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রচেষ্টা যে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতেছে তাহার একটা পরিচয় পাইলাম:

"বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় গ্রামবাসীর আগ্রহ—জেলা-বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীসুধীরকৃষ্ণ বসু, বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির কোষাধ্যক্ষ শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বর্দ্ধমান সদর মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীগৌরচন্দ্র চৌধুরী বর্দ্ধমানের আদরাহাটি বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে উপস্থিত গ্রামবাসিগণের সহিত বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। উপস্থিত সকলেই ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। গ্রামের জনৈক অধিবাসী শ্রীহারাধন বন্দ্যো-পাধ্যায় বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ৩৫ বিঘা জমি ও চারি হাজার টাকা নগদ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

নূতন বুনিয়াদী শিক্ষয়িত্রী শিক্ষণ কেন্দ্র—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ স্থির করিয়াছেন যে, বর্দ্ধমান জেলার গণপুর গ্রামে বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য ও সাধনা দেবীর পরি-চালনায় আগামী পৌষ মাস হইতে একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মেদিনীপুর সহরে বুনিয়াদী শিক্ষক ট্রেনিং—গত ২৭শে এপ্রিল হইতে মেদিনীপুর গুরুট্রেনিং স্কুলে পুরাতন গুরুট্রেনিং শিক্ষাপ্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষকদের বুনিয়াদী শিক্ষাকার্য্য সম্পর্কে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলায় আরও কুড়িটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত—১লা মে বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডের সভাকক্ষে বর্দ্ধমান জেলা স্কুলবোর্ডের এক সভা হয়। সভায় জেলা-শাসক শ্রীঅধিক্রম মজুমদার মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে বর্দ্ধমান জেলায় আরও কুড়িটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।"

"সংগঠনের" এই সংখ্যায় শ্রীমান সৌরীন বসুর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; সেবা-গ্রামে প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষার প্রভাবে কি করিয়া স্থানীয় লোকের, স্ত্রী-পুরুষের, মনোভাব প্রাচীন নানাবিধ সংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতেছে তাহার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ আছে; তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না:

"একদিন আমি গুরুজীকে প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা গুরুজী শিশুদের সমাজ-বিজ্ঞান কি ভাবে শেখান হয়ে থাকে? গুরুজী বললেন যে এই সব শিশুরাই এখানে সাফাইয়ের কাজ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে করে। নিজেরা যেটি শেখে সেইটি-ই সে আচরণে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এই ধরুন যেমন এদের পিতামাতারাই রাস্তাগুলি এবং বাড়ীর আশপাশ কি ভাবে নোংরা করে রাখত, কিন্তু আজকাল আর সে সব করবার উপায় নেই। শিশুদের পিতামাতারাই এসে আমাদের কাছে বলেছে যে আজকাল যেখানে সেখানে অপরিষ্কার করতে দেখলে তাদের শিশুরা এসে মানা করে বাধা দেয়। গ্রামের মধ্যে এই যে সামূহিক পায়খানা দেখছেন এ সবই শিশুদের প্রভাবে অভিভাবকদের প্রচেষ্টায় হয়েছে। এখন প্রায় সকলেই

ঐ পায়খানা ব্যবহার করে থাকে এবং সুন্দর সারের কাজে ব্যবহৃত হয়—এমন কি তা বিক্রয় পর্য্যন্ত হয়। আর সবই শিশুদের চেষ্টাতে হয়েছে।"

এই ভাবে "সমাজবিজ্ঞানে" প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্যে শিশুরা পটু হইয়া উঠিতেছে। গ্রামের সামাজিক জীবনে তাহাদের অদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষণীয়।

ইন্দোনেশিয়া

ভারতরাষ্ট্রের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরিচালক ডাঃ পি. এন. চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি দিল্লী বেতার কেন্দ্র হইতে ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সঙ্গে তিনি ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় ভারতবর্ষের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন সম্বন্ধের কথা অনেক জানা যায়। তার সারাংশ তুলিয়া দিলাম :

"জাভা দ্বীপটি চিরকালই সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার মানসিক উৎকর্ষ সাধনের কেন্দ্রস্থল ছিল এবং কালে পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপগুলিতে ইহার কৃষ্টি বিস্তার করে।

আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইয়া চীন পর্য্যন্ত যে প্রধান বাণিজ্যপথ ছিল জাভা দ্বীপটি উহারই উপর অবস্থিত এবং প্রায় তিনটি বিভিন্ন কৃষ্টির ধারা ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। উহার মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিল। তাহার পর ভারত ও আরবের ইসলাম ধর্ম্মের প্রভাব দেখা যায়; কিন্তু উহা তত প্রাধান্য লাভ করে নাই। শেষের দিকে পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজদের পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

জাভার নিজস্ব কৃষ্টি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কৃষ্টির কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া এখনও যায়। গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, জাভার সভ্যতা ও ভাষার উৎপত্তি স্থল ভারতবর্ষ। ইহার কৃষ্টির রূপ প্রথম অবস্থায় যাহাই থাকুক না কেন, ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, খ্রীষ্ট শতকের প্রথমার্দ্ধে, যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাষ্ট্র মালাক্কা, সুমাত্রা, জাভা এবং বোর্ণিওতে গড়িয়া উঠিয়াছিল তখন ইহাতেই জাভার কৃষ্টির উপর ভারতীয় প্রভাব সমধিক বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে এই দ্বীপটিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রভাব বিস্তার করে। তখন সেখানে ভারতীয় বর্ণমালা ও সংস্কৃত ভাষার প্রচলন ছিল। এইভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী কৃষ্টির পরিবর্ত্তন দেশের শিল্প ও কলার উপর প্রতিফলিত হয়। বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে শাসকগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট ধর্ম্মটি এই পরিবর্ত্তনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে পশ্চিম জাভায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে মধ্য জাভায় শৈব ধর্ম্মের প্রাধান্য বিস্তার করে। ইহার পর মধ্য জাভায় শৈলেন্দ্র প্রভাব বিস্তারলাভ করায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রায় দেড় শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে; কিন্তু পরে সেখানে আবার শৈব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়।

এই সকল বিভিন্ন ধর্ম্ম জাভার কৃষ্টির উন্নতিসাধনে বিশেষ প্রাধান্য লাভ, এবং অন্যত্র স্থানে সুন্দর কারুকার্য্যখচিত বিহার ও মঠের ধ্বংসাবশেষ বিরাজ করিতেছে। দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কৃষ্টির উৎকর্ষের কেন্দ্র মধ্য জাভা হইতে পূর্ব্ব জাভাতে স্থানান্তরিত হয়।

এইরূপে কালপ্রবাহে জাভার কৃষ্টির উপর হইতে ভারতীয় প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হইতে থাকে এবং উহা ইন্দোনেশীয় কৃষ্টির সহিত একীভূত হইয়া এক নূতন কৃষ্টির সৃষ্টি করে। এই নব-সৃষ্ট কৃষ্টির প্রভাব দেশের স্থপতিবিদ্যা, কলা, ধর্ম্ম, সাহিত্য ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠে।

সারলঙ্গার রাজত্বকালে জাভায় দেশীয় ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন আরম্ভ হয়। ইহা ছাড়া, ঐ সময় জাভাতে মহাভারত এবং সম্ভবতঃ রামায়ণও অনূদিত হয় এবং অর্জ্জুন-বিবাহ ও বিরাট পর্ব্ব নামে দুইটি পুস্তক প্রকাশিত হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে কেদেরীর রাজত্বকালকে জাভার সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। কারণ এই সময়ে ভারত যুদ্ধ এবং হরিবংশ নামে দুইটি বিখ্যাত পুস্তক রচিত হয়। এই সৃষ্টিকার্য্য মাজাপাহিত রাজত্বকাল এবং ঐস্লামিক ধর্ম্মের বিস্তারলাভ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। এই ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন দেশের কৃষ্টির উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; পরন্তু উহা নূতন অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতে থাকে।

এই বলিষ্ঠ পরিবর্ত্তন স্থানীয় সঙ্গীত ও নৃত্যকলার উপরও পরিলক্ষিত হয়। মধ্যজাভার মন্দিরগুলির গাত্রে যে সকল সঙ্গীত যন্ত্র ও নৃত্য কৌশলের চিহ্ন রহিয়াছে সেগুলিতে ভারতীয় প্রভাবের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। কিন্তু পূর্ব্ব জাভার চিত্রগুলি সম্পূর্ণভাবে স্বদেশী। বর্ত্তমানে ছায়ানৃত্যের মধ্যেও সেই সকল প্রভাব দেখা যায়।

ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। ঔপনিবেশিক ভারতীয়-গণ এই দ্বীপটিকে শিল্প ও স্থপতিবিদ্যায় মূল নীতি প্রদান করিয়াছিল। ভারতীয়দের এই নূতন কৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন এবং উন্নততর ছিল বলিয়া জাভার অধিবাসিগণ উহা গ্রহণ করে ও উহাকে জাতীয় আকার দিতে যত্নবান হয়। এইভাবে ক্রমশঃ তাহারা ইহাকে নিজেদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ও জীবন-দর্শনের সহিত সমন্বয় সাধনে সফল হয়। প্রায় দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত এইরূপ সমন্বয়সাধন কার্য্য চলিতে থাকে এবং পরিশেষে ভারতীয় শিল্প ও স্থানীয় শিল্পের এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় প্রভাব স্বভাবতঃই ধীরে ধীরে বাড়িতেছিল। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে পূর্ব্ব জাভার এক যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ইতিমধ্যে ভারতীয় কৃষ্টি ও শিল্প ইন্দোনেশীয়ার কৃষ্টি ও শিল্পের সহিত একীভূত হইয়া যায় এবং জাভাবাসিগণ আপন কৃষ্টি সম্পর্কে ক্রমশঃ অধিক সচেতন হইতে আরম্ভ করে। এই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী চতুর্দ্দিকে আপন প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করে এবং উহা [illegible]

আর্টে বাস্তবতা

অধ্যাপক শ্রীসুধীরকুমার নন্দী, এম-এ

'রিয়্যালিটি' অর্থাৎ বাস্তবতা বললতে আমরা বুঝি আমাদের চার পাশকে। আমাদের চতুর্দিকে যে জগৎ, যার সীমানা নির্দিষ্ট হয়েছে আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে, তাকেই আমরা বলি বাস্তব। যাকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি, যাকে আমারই মত আরও দশ জনে প্রত্যক্ষ করেছে বা যাকে আমিও প্রত্যক্ষ করতে পারি, তাকেও আমরা সাধারণ অর্থে 'বাস্তব' আখ্যা দিয়ে থাকি। শিল্পগত বাস্তব হ'ল ঘটনাধর্মী। যা ঘটেছে বাস্তব তারই প্রতিরূপ। গলির মোড়ের ডাষ্টবিন, মরা কুকুরের অনাদৃত শব, নোংরা গলির কদর্যতা, এ সবই বাস্তব। আবার আকাশের চাঁদ, পাখীর গান, মলয়-হিল্লোল এরাও কম বাস্তব নয়। জীবনের পাতায় এদেরও স্বাক্ষর পড়ে, এরাও সহজ সত্যে অনস্বীকার্য। এদের কেউই আমাদের জীবনের ভোজে অপাংক্তেয় নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এদের স্বচ্ছ অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারি না। এখন প্রশ্ন ওঠে, মানুষের সৃষ্টিতে, তার সাহিত্যে, গানে, শিল্পে এদের স্থান কোথায়? বাড়ীর পাশের নোংরা গলির কাহিনী আর কোন এক গাঁয়ের ধারে ভরা গাঙের ওপারে-ওঠা বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদের কথা কি একই কালিতে, একই ভাষায় লিখিত হবে? শিল্পীর কাছে এদের আবেদন কি সমগ্রাহ্য? শিল্পের বিষয়বস্তু হিসাবে এদের মূল্য বিচার করলে এরা কি সমান মর্যাদার দাবি করতে পারে? আর এই বিপরীতমুখী জীবনধারার ইতিহাস-সৃষ্টি কি আর্টের দরবারে পাশাপাশি বসবে? আধুনিক সাহিত্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে—আধুনিকই বা বলি কেন সর্বকালের আর্টে আমরা দেখেছি যে, বিষয়বস্তু নিয়ে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম চলে না। সেখানে "শুঁড়ির দোকানের মদের আড্ডা" এবং "ইন্দ্রলোকের সুধাপানসভা", উভয়ের দাবি সমানভাবে স্বীকার্য। ইন্দ্রলোকের অবারিত ঐশ্বর্য এবং নরকের বীভৎসতা শিল্পীর প্রেরণাকে সমানভাবে উদ্দীপিত করেছে নব নব সৃষ্টির সার্থকতায়।

দান্তে, বোদেলের, মিল্টন এঁদের হাতে নারকীয় পরিবেশের সৌন্দর্য-সম্পদ নির্বাধ প্রকাশ পেয়েছে কবি-কল্পনার জাদুতে। ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব শিল্পের গতি-প্রকৃতির মূল সূত্রটি সঠিক ভাবে অনুধাবন করেছিল বলেই সেখানে দেখি বীভৎসাদি আটটি রসকে স্বীকার করা হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ এই রস-অষ্টকের উপরে 'শান্ত'কেও রস হিসাবে স্বীকার করেছেন। বস্তু শিল্পকে প্রাণবান করে না, শিল্পকে প্রাণ দেয় শিল্পীর প্রতিভা, তার প্রকাশ-চাতুর্য। সেখানে সুন্দর, কুৎসিত, ভাল অথবা মন্দের প্রশ্ন নেই। আমরা 'ইয়াগো' এবং 'ইমোজেন'কে সমান মর্যাদা দিই, কারণ উভয়েই রসোত্তীর্ণ হয়েছে শেক্ষপীয়রের কবি-প্রতিভায় মোহন স্পর্শে। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী আমাদের চোখে দেখা কোন অপ্সরার অনুগমন করে নি। কবির স্বয়ম্ভু কল্পলোকে নৃত্যপরা উর্বশীর নূপুর-নিক্কণ, যে 'শিমুল সজিনা' কবিকে ঋণে আবদ্ধ করেছে, তাদের চেয়ে কোন অংশেই অসত্য নয়। শিল্পের মৃত্যুহীন লোকে উভয়েই সত্য। উভয়ের রিয়ালিজম্ নির্দিষ্ট হয়েছে শিল্পীর সৃষ্টি-সার্থকতার গুণে, বাইরের জগতে স্থান-কালের সীমানায় আবদ্ধ হওয়ার জন্য নয়। আর্টের সবচেয়ে বড় গুণ বাস্তবধর্মী হওয়া, এ কথা অবশ্যস্বীকার্য বলে আমরা মনে করি না। মিল্টনের বিরাট কল্পনার উদার সঞ্চরণ বাস্তবতাকে লঙ্ঘন করেছে বারে বারে, তবু তাঁর "Paradise Lost" কাব্যগ্রন্থে রসাভাস ঘটে নি কোথাও। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শেক্ষপীয়রের ফল্‌ষ্টাফের দেখা সব সময়ে পাই না বলেই তাকে অস্বীকার করবার স্পর্ধা প্রকাশ না করাই ভাল।

আধুনিক যুগের এক দল সমালোচক ক্রমাগত রব তুলেছেন যে, শিল্পকে বা আর্টকে বস্তু-ধর্মী করে তুলতে হবে। লিখতে হবে হাতুড়ি-কাস্তে আর বস্তির গান। ও সব ফুল আর চাঁদ নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে, আর নয়। ড্রয়িংরুমে বসে আর 'আর্ট করা' চলবে না; কবিকে, শিল্পীকে নেমে আসতে হবে ঐ নোংরা বস্তির পাশে; সেখানে বসে সবহারা মানুষদের গান লিখতে হবে, আঁকতে হবে তাদের ছবি। কিন্তু এঁরা ভুলে যান যে, শিল্পী যা চোখ দিয়ে দেখেন, তার সবটাই শিল্পলোকে প্রবেশের অধিকার পায় না, তিনি যা প্রাণ দিয়ে অনুভব করেন, সেটাই মহত্তর সত্য। তাই তাঁর প্রাণের অনুভূতি শিল্পে বড় হয়ে ওঠে, সেটাই শিল্প হয়ে ওঠে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, যে সৈনিক গত যুদ্ধে বন্দুক হাতে রাশিয়ার মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়েছিল নাৎসী অভিযানের বিরুদ্ধে, তাদের অনেকের চেয়েই রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যুদ্ধটাকে তার নগ্ন বীভৎসতায়। তাই তিনি ভারতের এক নিভৃত নিকেতনে বসেও নিদারুণ বেদনা অনুভব করেছেন তাঁদের জন্য যাঁরা সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি নীরবে স্বীকার করেছেন। কবির

দরদী প্রাণের সঙ্গে সর্বদেশের দুঃখী মানুষের প্রাণের যোগ ছিল, তাই তিনি পরিপূর্ণ রূপে তাদের দুঃখ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। শিল্পীমনের এ বেদনা ব্যক্তিগত স্বার্থ-সম্পর্কের অনেক উর্ধ্বে। এ দুঃখ শিল্পীমনের, যে মনের পরিধি বিশ্বব্যাপ্ত। জাপানীদের হাতে চীনের লাঞ্ছনা রবীন্দ্রনাথের মনকে ব্যথা দিয়েছিল। সে বেদনার মধ্য দিয়ে সত্যিকারের কাব্য সৃষ্টি হয়েছে। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, যে সব শিল্পী বহু দূরে থেকেও এই অভিযানকে শিল্পীমন নিয়ে, সাগ্রহে লক্ষ্য করেছেন, তাঁদের অশ্রুধোয়া তুলি এবং কলমের মুখে সার্থক শিল্পসৃষ্টি জন্মলাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ কথার মালা সাজিয়ে আঁকলেন ছবি: অনন্ত-পুণ্য বুদ্ধদেবের মন্দিরে চলেছে বিজয়ী জাপানী সৈন্যের দল, রক্তমাখা হাতে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবে বলে। অহিংসা ছিল যাঁর ধ্যানমন্ত্র, তাঁরই মন্দিরে হবে নারী আর শিশুঘাতীদের উৎসব। সে ছবি আজ সত্য হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টি এই নারকীয় হিংসার স্বরূপকে সমগ্র ভাবে প্রত্যক্ষ করেছিল, তাই তিনি কাব্যে তাকে রূপ দিতে পেরেছিলেন এত সহজে। এ কাহিনী বাস্তব কি না এ প্রশ্ন আমাদের মনে একবারও জাগে না। শিল্পের অমর-লোকে যারা স্থায়ী আসন লাভ করেছে তাদের সম্পর্কে বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্নটাই অবান্তর। শিল্পলোক বাস্তবের নির্দেশের অপেক্ষা রাখে না। শিল্পীর সৃষ্টি মহত্তর প্রেরণায় বৃহত্তর সত্যের সন্ধান দেয়। বিশ্বের শিল্প দরবারে 'ফ্যান্টাসি' শ্রেণীর কাব্য ও চিত্রের অসদ্ভাব নেই। এরাই নিঃসংশয় করেছে আমাদের যে, শিল্প শুধু ফটোগ্রাফি নয়। কবি কীটস্ বলছেন:

> Beauty is truth, truth beauty—
> that is all
> Ye know on earth and all ye need
> to know.
> —(Ode on a Grecian Urn)

সত্য এবং সুন্দরের সমীকরণ সম্ভব হয়েছে কবির ধ্যান-দৃষ্টিতে। কবির সত্য প্রাকৃত জনের সত্য নয়। সাধারণ অর্থে 'ট্রুথ'কে বুঝলে কবির প্রতি অবিচার করা হবে। দৈনন্দিন জীবনে যা ঘটে তার ফিরিস্তি দিলেই চরম সত্যের কথা বলা হয় না এবং তার মধ্যে সুন্দরেরও আবির্ভাব ঘটে না। তা যদি হ'ত তা হলে ধোপার অথবা মুদির হিসাবের খাতায় সাহিত্যের আনাগোনা চলত পুরোপুরিভাবে। আর্ট যদি বস্তু-জীবনের প্রতিলিপি হ'ত তা হলে ব্যঞ্জনার (Suggestiveness) স্থান শিল্পে থাকত না। একবার দেখলেই, একবার শুনলেই বা একবার পড়লেই ফুরিয়ে যেত আর্টের আয়ু। রাগসঙ্গীত বহুদিন আগেই লোপ পেয়ে যেত। শিল্পের ব্যঞ্জনাশক্তি শিল্পকে পুরাতন হতে দেয় না। যখনই তাকাই 'ম্যাডোনা'র দিকে, মন আনন্দে ভরে ওঠে। র‍্যাফেলের 'ম্যাডোনা', রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' হ'ল শিল্প-লোকের অমর সৃষ্টি। এরা বেঁচে আছে নব নব ভাব-ব্যঞ্জনার প্রসাদে। কীটস্ ট্রুথ বলতে Correspondence with reality বা বস্তু জীবনের প্রতিলিপিকে বোঝাতে চান নি। শুধু যা প্রত্যক্ষ, যা সহজ তার সঙ্গে অসঙ্গত না হলেই Beauty বা সৌন্দর্য সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না।

বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলা আর্টের ক্ষেত্রে অবান্তর। সমালোচক হয়ত বলবেন তবে এই ট্রুথের অর্থ কি? তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের কথায় আমরা বলব যে "কাব্যে এই ট্রুথ রূপের ট্রুথ, তথ্যের নয়।" অর্থাৎ শিল্পসৃষ্টি করতে গিয়ে বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটি কোথায় ক্ষুণ্ণ হ'ল, তা দেখবার অবসর আর্টিষ্টের নেই। তথ্যের ট্রুথ থেকে রূপের ট্রুথে নিরন্তর যাওয়াই হ'ল শিল্পসৃষ্টির মূল কথা। কেমন করে এটা সম্ভব হয় সে কথা আমরা প্রাকৃত জন জানি না। এমন কি শিল্পীরাও সকল ক্ষেত্রে জানেন না। কোন্ পথে কেমন করে র‍্যাফেল 'ম্যাডোনা'র মত চিত্র-সম্পদ সৃষ্টি করলেন, কেমন করে 'পারসিফ্যালে'র রচনা সম্ভব হ'ল, সে কথা কেউই বলতে পারেন না। শিল্পাচার্য নন্দলাল বলছেন—এ যেন পাখীর এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে যাওয়া। বাতাসে পথের কোন চিহ্ন রইল না। 'যাওয়া'টা কেমন করে ঘটল সেটা রইল অজ্ঞাত। কিন্তু তাই বলে 'যাওয়া' ব্যাপারটার মূল্য কমল না। তথ্যের ট্রুথ থেকে রচনার ট্রুথে এই যাওয়াটাই হ'ল শিল্প-সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ বলছেন:

> "বিষয় বাছাই নিয়ে তার রিয়ালিজম্ নয়, তার রিয়ালিজম্ ফুটবে রচনার যাদুতে।...আমার বলবার কথা এই যে লেখনীর যাদুতে কল্পনার পরশমণি স্পর্শে মদের আড্ডাও বাস্তব হয়ে উঠতে পারে সুধাপান সভাও। কিন্তু সেটা হওয়া চাই।" (সাহিত্যের স্বরূপ)

এই 'হওয়া'টাই হল শিল্পের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা। কীটসের ট্রুথ হ'ল রূপের ট্রুথ, দার্শনিকেরা যাকে formএর ট্রুথ বলবেন। মানসলোকের আলোড়ন প্রকাশধর্মী। এই প্রকাশ করবার ভঙ্গীই হ'ল কবির জাদু। শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে যা ছিল একান্ত 'গোপন ধন' শিল্পী তাকে বিশ্বের ভোগের বস্তু করে তোলেন। শিল্পীর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী এক বিশেষ রূপে বাস্তবকে দেখে। এ দেখা মনে আলোড়ন জাগায়। ভাব উদ্বেল হয়ে ওঠে। চোখে দেখা বাস্তব বিচিত্রতর সম্পদে পূর্ণ হয়ে ওঠে শিল্পীর মনোলোকে। সেখানে শিল্পের জন্ম হয়। তার

পরে শিল্পী লেখায় অথবা রেখায়, ছন্দে অথবা সুরে, ক্যানভাসে কিংবা কাগজে তাকে ব্যক্ত করে। এই 'ব্যক্ত করা' শিল্প নয়। এ হ'ল কারিগরী। যখন অনুভূতির লোকে শিল্পী আপনার আনন্দ-বেদনাকে আত্ম-স্বতন্ত্র রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন নূতনতর প্রকাশের মধ্য দিয়ে, তখনই শিল্পের জন্মলাভ ঘটেছে। একে দার্শনিকেরা বলেছেন, "Desubjectification of subjective feelings" অর্থাৎ আত্ম-অনুভূতিকে অপর-অনুভূতিরূপে প্রত্যক্ষ করা। শিল্প-সৃষ্টি হ'ল নৈর্ব্যক্তিক। শিল্পীকে ছাড়িয়ে উঠবে শিল্পের মহিমা। চরিত্রহীন শিল্পী হয়ত সৃষ্টি করবে ভগবান বুদ্ধের অনন্ত পুণ্যের অমর কাহিনী। শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন শিল্পকে স্পর্শ করে না। তাই টি. এস্. ইলিয়ট বলেছেন:

"The more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates."

এখানেও দেখি শিল্পীর বস্তুতন্ত্রী জীবনধারার সঙ্গে শিল্পের প্রাণের যোগ নেই। শিল্পের ভালো মন্দ শিল্পের বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয়। শিল্প বস্তুকে অতিক্রম করে অনির্বচনীয় লোকের সন্ধান দেয়। হয়ত বাস্তব শিল্পের আড়ালে আত্মগোপন করে দ্যুতিমান হয়ে ওঠে শিল্পীমনের স্পর্শ পেয়ে। বাস্তবের রূপান্তর ঘটে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বস্তু ও ঘটনাগুলি যেন রাতের তারা। আর দিনের আলো হ'ল শিল্প মননের প্রকাশ। এই 'প্রকাশে' ডুবে থাকে বস্তু, তার রূপ বদলায়। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি: "রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।" 'বস্তু' ও 'প্রকাশ', ইংরেজীতে যাকে বলে Content এবং form, তাদের যথার্থ সম্পর্ক নির্দেশ বোধ হয় এর চেয়ে স্পষ্ট ভাষায় করা যায় না। সাধারণ মানুষ, আমাদের চার পাশে যারা আছে যাদের আমরা দেখেও দেখি না, তারাই শিল্পলোকে অপরূপ হয়ে দেখা দেয়। কল্পনার স্পর্শ পেয়ে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনা অসাধারণ হয়ে ওঠে। শিল্প সুন্দর হয় তখনই যখন শিল্পের ট্রুথ বহির্জগৎকে ছেড়ে শিল্পীর প্রকাশভঙ্গীকে আশ্রয় করে, তথ্যকে ছেড়ে রূপকে আশ্রয় করে, প্রকাশভঙ্গী যখন রমণীয় হয়ে ওঠে শিল্পীর সহজ লীলায়।

যদি তর্কের খাতিরে আমরা কীটসের 'ট্রুথ'কে রূপের ট্রুথ না বলে তথ্যের ট্রুথ বলি, তা বলে কুৎসিতকে (ugly) নিয়ে আমাদের বিড়ম্বনার অন্ত থাকে না। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অসুন্দর বলে যাকে ঘৃণা করি, যার সান্নিধ্যে সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, ঠিক তারই প্রতিচ্ছবি শিল্পলোকে আমাদের আনন্দ দেবে কেমন করে? যে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত মানুষকে দেখে সমস্ত মন সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে, তাকেই যখন দেখি শিল্পীর চোখ দিয়ে তখন মন কেন সমবেদনায় করুণ হয়ে ওঠে? এ কারুণ্যের অর্থ কি? এর উৎস কোথায়? কেমন করেই বা এর আবেদন সর্বত্রগামী হয়? আমাদের প্রাচীন রসশাস্ত্রে 'ভয়ানক' ও 'বীভৎস'কে রস হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত থেকে মহাকবি কালিদাস পর্যন্ত সকলেই 'বীভৎস'কে রস হিসাবে স্বীকার করেছেন। ক্রোচে প্রমুখ আধুনিক নন্দনতত্ত্ববিদেরাও কুৎসিতকে স্থান দিয়েছেন শিল্পের সীমানার মধ্যে। কীটসের চোখে সুন্দরই যদি একমাত্র সত্য হয়, তা হলে অসুন্দর মিথ্যা হয়ে যায় তর্কশাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম অনুসারেই। কিন্তু অসুন্দর ত অসত্য নয়। কুৎসিতও রূপ পেয়েছে হাজারো সার্থক শিল্পে। নোতরদামের 'হাঞ্চব্যাক' চির দিনই মুগ্ধ করবে পাঠককে। শিল্পলোকে দান্তের 'নরক' অমর হয়ে আছে। কবি-কল্পনা সৃষ্ট নারকীয় পরিবেশের বিরাট সৌন্দর্য-গাম্ভীর্য অতীন্দ্রিয় লোকের সন্ধান দেয়—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব সেখানে আত্ম-স্বীকৃতির দাবি জানাতে সঙ্কোচ বোধ করে। যে নরক আমাদের কাছে চির-অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই অমানবীয় লোকে স্বচ্ছ আঁধারের আবরণ ভেদ করে আমরা "স্যাটানে"র দেখা পাই। সেই সৌন্দর্যলোকের দ্বারপ্রান্তে বসে মুগ্ধ বিস্ময়ে বিজয়ী বিধাতার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী 'স্যাটানে'র প্রতি সহানুভূতি জানাই, স্যাটানের ঐতিহাসিকতার বিচার আমরা করি না। কারণ জানি যে আর্টের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন অবান্তর। রূপের ট্রুথ সেখানে সৌন্দর্যের কুহেলি সৃষ্টি করে মন ভোলায়। আর্টের ক্ষেত্রে সত্য তথ্যধর্মী হয় না, রূপধর্মী হয়। তাই আধুনিক সমালোচকেরা বাস্তব চেতনাকে অস্বীকার করেছেন বারে বারে। দার্শনিকপ্রবর ডক্টর সুশীলকুমার মৈত্র ক্রোচের দার্শনিক মত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন:

"Croce is unquestionably right in denying the consciousness of reality in art. Art, according to him, being distinguished from logic by the absence of reality-consciousness. (*Studies in philosophy and Religion*).

বাস্তব-সচেতনতা আর্টের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক, এই কথাই ক্রোচে জোরগলায় বলেছেন। এ কথা যুক্তিসহ। তিনি তথ্যের ট্রুথকে কোথাও স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে আর্ট তখনই আর্ট পদবাচ্য হয় যখন শিল্পীর শিল্পলোকে রূপের ট্রুথের অর্থাৎ প্রকাশভঙ্গীর রমণীয়তার অসদ্ভাব না ঘটে।

দার্শনিক বললেন, Formই হ'ল আর্টের প্রাণ, আর কবি বললেন ট্রুথই হ'ল শিল্পের প্রাণ। তবে এ ট্রুথ তথ্যের নয়,

রূপের। Form এবং Content—এই দুইয়ে মিলিয়ে আর্টের সৃষ্টি হয়, এ কথা হ'ল নরমপন্থীদের কথা। যাঁদের ধারণার বলিষ্ঠতা নেই, তাঁরাই এ কথা বলবেন। সত্যের চেয়ে অসত্যের বোঝাটাই এখানে ভারী হয়ে ওঠে। কারণ আমরা যে শিল্পকে বাস্তবধর্মী বলব, অর্থাৎ যেখানে Content পাটরাণী হয়ে বসেছে, সেখানে আর্টের অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কারণ প্রকাশই (Intuition-expression) হ'ল আর্টের প্রাণ। মানুষের অন্তর্লোকবাসী চিন্ময় শক্তির উদ্বোধন হয় এই পথে। তাই যেখানে বস্তুর (Content) প্রাধান্য, সেখানে আত্মা (spirit) গৌণ হয়ে পড়ে। তার প্রকাশ ব্যাহত হয়। ক্রোচে বলছেন :

"The aesthetic fact, therefore, is form and nothing but form. The poet or painter who lacks form, lacks everything because he lacks himself; The expression alone i.e. the form makes the poet,"

অর্থাৎ রূপের টুখ হ'ল শিল্পের প্রাণ। রূপ-রচনাভঙ্গী কবিকে ও শিল্পীকে যথার্থ কবি ও শিল্পী করে তোলে। আর্টের বিষয় বাছাই নিয়ে সত্যিকারের আর্টিষ্টকে মোটেই ভাবতে হয় না। ভাঙা পাঁচিলের 'পরে ফোটা নাম-না-জানা ফুল আর সূর্য-সোহাগী সূর্যমুখীর শিল্পের রাজ্যে সমান আদর। শিল্পী-মনের রং লাগে বাইরের জগতে এবং তারই ফলে বাস্তবের রূপান্তর ঘটে কলা-চারুতায়। শিল্পীর জগতে পাশাপাশি বাস করে সম্রাটের প্রেয়সী মমতাজ আর ক্যামেলিয়া কবিতার সাঁওতাল রমণী। বাইরের জগতে ব্যবহারিক জীবনে এদের ব্যবধানটা দুস্তর হলেও শিল্পের জগতে এঁরা প্রতিবেশী। জীবন থেকে শিল্পী যাদের গ্রহণ করেন তাদের তিনি প্রতিভার জারক-রসে জারিত করে অনায়াসে রসলোকে উত্তীর্ণ করে দেন। রসলোকে এই উত্তরণের গুপ্ত মন্ত্রই হ'ল কবির প্রতিভা, শিল্পীর জাদু।

কবি প্রতিভার পরশপাথরের ছোঁয়া লেগে বাক্যের অচল বোঝা সচল হয়ে ওঠে। বাউলের মত উড়ে চলার 'ভাও' জানে কবির কবিতা। প্রাণ এবং গতি জেগে ওঠে অচলায়তনের নাড়ীতে নাড়ীতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের মূল্য' প্রবন্ধে বলেছেন যে এই প্রাণসঞ্চারিণী শক্তিই হ'ল শিল্পীর প্রতিভা। কবি-প্রতিভার স্পর্শপুলকিত কাব্যের উদাহরণ দিয়েছেন তিনি :

"তোমার ঐ মাথার চুড়ায় যে রঙ্ আছে উজ্জ্বলি
সে রঙ্ দিয়ে রাঙাও আমার বুকের কাঁচলি।"

এখানে আমরা জীবনের স্পর্শ পাই, একে অসংশয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। কবির কাব্যোক্তির মধ্যে উচ্ছ্বাস আছে, প্রাণ আছে, সর্বোপরি আছে প্রকাশের আন্তরিকতা—Sincerity; অতি সাধারণ কয়েকটি কথায় কবি অনির্বচনীয় ভাব প্রকাশ করেছেন অনন্ত কৌশলে। এই কৌশলই হ'ল কাব্যের প্রাণ, শিল্পীর সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি, যার স্পর্শে প্রাণ পায় ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যা। এখানে কাব্য সত্য হয়ে উঠেছে রূপকে আশ্রয় করে, তথ্যকে আশ্রয় করে নয়। শিল্পীর প্রকাশভঙ্গী যে রূপ (Form) দিয়েছে তার সৃষ্টিকে, সেই রূপই তাকে আর্ট পদবাচ্য করেছে। শিল্পীর মানসলোকে সৃষ্টির যে অনির্বচনীয় লীলা নিয়ত চলেছে তারই দোলায় দোলায়িত হয়েছে রসজ্ঞ পাঠকের সমগ্র চেতনা। কলারসিকের কাছে আর্টিষ্টের সৃষ্টি বাস্তব জীবনের চেয়ে অনেক বড়। তাই ত অযোধ্যার চেয়েও বৃহত্তর মর্যাদার দাবি জানায় বাল্মীকির মানসলোক। কবির মনোলোকে জন্ম নিয়েছেন যুগ যুগান্তরের মানুষের নিত্য-পূজিত শ্রীরামচন্দ্র। ইতিহাসের রামচন্দ্র আমাদের কাছে আজও অজ্ঞাত। তাঁর ইতিহাসে কালের স্থূল হস্তাবলেপ পতিত হয়েছে; দশরথপুত্র রামচন্দ্রের পরিচয় আজ কলা-রসিকের কাছে অবান্তর। আমাদের মত আরও হাজারো মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন বাল্মীকির মানসপুত্র শ্রীরামচন্দ্র। কেউ কোন দিন তাঁর সত্যতাকে অস্বীকার করে নি, ভবিষ্যতেও করবে না। প্রবাদ আছে যে, রাম না জন্মাতেই রামায়ণ লেখা হয়েছিল। নন্দনতাত্ত্বিকের দৃষ্টি নিয়ে দেখলে আমরা এই প্রবাদটি থেকে নিগূঢ় সত্যের সন্ধান পেতে পারি। কাব্যে বা শিল্পে বাস্তবের প্রয়োজন কতটুকু তা এর থেকে বুঝতে পারি। বাস্তব রামের যখন জন্মই হ'ল না, তখন যদি রামায়ণের মত মহাকাব্য রচিত হতে পারে তবে শিল্পের ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনের প্রয়োজন কতটুকু তা সহজেই অনুমেয়। বাস্তব জীবনে যাকে ঘৃণা করেছি, যাকে মানুষের মর্যাদা দেবার মত দাক্ষিণ্যটুকুও অবশিষ্ট রইল না, তাকেই যখন দেখি সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, তখন তাকে অস্বীকার করবার ক্ষীণ ইচ্ছাটুকুও মনে জাগে না। পাখী হিসাবে কাকের কোন গৌরব নেই। আমরা তাকে অবহেলাই করি। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের 'আকাশপ্রদীপে' বর্ণিত পাখীর ভোজে অনাহূত কাকের দল আমাদের মনকে পীড়া দেয় না। হঠাৎ-দেখা এক মুহূর্তের ঘটনা শিল্পীর অঘটনঘটনপটীয়সী জাদুতে অমর হয়ে ওঠে। অসুন্দর হয় সুন্দর, ক্ষণিক হয় শাশ্বত। তাই বলছিলাম শিল্পীর অন্তরের পরশমণি মহত্তর সত্য-সৃষ্টির উৎস। কাব্য-সত্য বস্তু-সত্যের অনেক ঊর্ধ্বে, বাস্তবের সীমানার বাইরে।

বর্ষা-শরতে ব্যাস-তুলসী

শ্রীমহাদেব রায়

বর্ষা ও শরতের বর্ণনায় মহাকবি বাল্মীকির রচনার সঙ্গে ভক্ত-কবি তুলসীদাসের রচনার সামঞ্জস্য ও পার্থক্য আমরা দেখিয়াছি। তুলসীদাসের রাম-চরিত-মানস একটি শ্রেষ্ঠ ভক্তি-কাব্য—প্রধানতঃ ভক্তি-তত্ত্বের আলোচনায় বাল্মীকির রামায়ণ হইতে ইহার অনেকাংশে পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয়। সে দিক দিয়া ভারতে যে প্রাচীন ভক্তি-কাব্য আছে, তাহার সঙ্গেই রামচরিতমানসের সামঞ্জস্য বেশী। ভারতে ধর্মসাহিত্যই সাহিত্যের প্রধান অংশ জুড়িয়া আছে। বিশেষ করিয়া ভক্তিমূলক কাব্যাদি রচনায় বৈষ্ণব কবিদের তুলনা নাই। আবার, সমগ্র ভক্তি-রস-প্রধান ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবতই আজও সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে আসীন। সেই শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভক্তিরস বর্ণনার সঙ্গে তুলনায় রামচরিতমানসের অনুরূপ বর্ণনা বিস্ময়কর সাদৃশ্যের চিত্র বলিয়াই মনে হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতের রচয়িতা ব্যাসদেবের বর্ণনা কিরূপে তুলসীদাসের ভক্তি-প্রবণ মনে সঞ্চারিত হইয়াছে, বর্ষা-শরতের বর্ণনা-সাদৃশ্যে আমরা তাহার আশ্চর্যকর দৃষ্টান্ত অবলোকন করি। অথচ, অনুকৃতি একটিও নহে, সরল প্রকাশভঙ্গির মনোহর মৌলিকত্বে প্রতিটিই সম্পূর্ণ নূতন—প্রত্যেকটিতেই অভিনব কবিত্ব।

বর্ষা প্রকৃতির কিংবা শরৎ-প্রকৃতির বর্ণনায় ব্যাস যেমন উপমার ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে অপ্রধান করিয়া ব্যক্তিকে—বিশেষ করিয়া সদ্‌ব্যক্তিকে—ভগবৎপরায়ণকে মুখ্য লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তুলসীর চিত্রণেও তাহাই পরিলক্ষিত হয়। এমন কি, ব্যাসদেব যে উপমাটি গ্রহণ করিয়াছেন, তুলসীদাস ঠিক সেইটিকেই অবলম্বন করিয়া একই ভাব-রসকে নূতনরূপে হৃদয়গ্রাহ্য করিয়া তুলিয়াছেন। অথবা অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া নিজ মৌলিকত্বে উহাকে সম্পূর্ণ করিয়া অভিনব-মনোহর করিয়া দেখাইয়াছেন। উভয় কবিরই লক্ষ্য ভক্তি—ভগবানে ভক্তি। তাই দেখি ভক্ত কবিদের অগ্রণী ব্যাসদেবের উপমার সঙ্গতি তুলসীদাসকে যেন অনেকখানি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, এবং একই উপমা—তা পূর্ণরূপেই হোক, আর আংশিকই হোক, নূতন ছন্দে, নূতন ভাষায়, নূতন ভঙ্গিতে অপূর্বমনোহর ভাব-কলেবর ধারণ করিয়াছে।

একটি একটি করিয়া সামঞ্জস্যের চিত্র কিভাবে রূপায়িত হইয়া কাব্যান্তরে শোভা-সৌন্দর্যে অতুলনীয় হইয়া উঠিয়াছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের বর্ষা-শরতের সঙ্গে রামচরিতমানসের বর্ষা-শরতের তুলনা করিয়া আমরা তাহাই দেখিব ভক্ত-কবি তুলসীদাস বর্ষা-চিত্রের প্রথম তুলিকাপাতে দেখাইতেছেন :

> "লছিমন দেখু মোরগন নাচত বারিদ পেখি।
> গৃহী বিরতি-রত হরষ জিমি বিষ্ণু ভগত কহ দেখি।

হে লক্ষ্মণ! দেখ দেখ, মেঘ-দর্শনে ময়ূরগণের নৃত্য দেখ। তুলনাক্রমে দেখাইতেছেন—বিষ্ণু-ভক্তকে দেখিয়া বৈরাগ্যপরায়ণ গৃহী যেমন আনন্দে নাচিয়া উঠে, মেঘ-দর্শনে ময়ূরদের নৃত্যও যেন ঠিক তেমনই। বিষ্ণু-ভক্তের সঙ্গে বৈরাগ্যবান্ গৃহীর যেমন আনন্দের সম্পর্ক (সেখানে বেচা-কেনা, দুনিয়াদারি, তুচ্ছ স্বার্থের কথা এতটুকুও নাই) সেইরূপ আনন্দের সম্পর্ক বর্ষার মেঘের সঙ্গে ময়ূরের। কতকাল পূর্বে শ্রীমদ্‌ভাগবতের রচয়িতা এই উপমাই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

> 'মেঘাগমোৎসবা হৃষ্টাঃ প্রত্যনন্দন্ শিখণ্ডিনঃ।
> গৃহেষু তপ্তনির্বিণ্ণা যথাচ্যুত-জনাগমে।

সংসারানল-সন্তপ্ত জীব যেরূপ ভাগবতজন-সমাগমে সুস্থচিত্ত হয়, সেইরূপ ময়ূরগণও মেঘ-সমাগমের মহোৎসবে আনন্দিত হইয়া হর্ষ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। একই উপমার বস্তু; কিন্তু তুলসীর সরল ভাষায়, মনোহর ভঙ্গিতে আর ছন্দোমাধুর্যে যেন উহা নূতনতর—মধুরতরই হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের বর্ষার রূপে বিদ্যুতের চঞ্চলতা বর্ণনায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে :

> "লোকবন্ধুষু মেঘেষু বিদ্যুতশ্চল সৌহৃদাঃ।
> স্থৈর্যং ন চক্রে কামিনঃ পুরুষেষু গুণিষ্বিব।"

চঞ্চলরতি স্ত্রীলোক যেমন গুণী পুরুষের প্রতি চির অনুরক্ত থাকে না, সেইরূপ চঞ্চলরতি বিদ্যুৎ লোকপ্রিয় মেঘের মধ্যে স্থির হইয়া অবস্থান করিতে পারিতেছে না।

তুলসীদাস বর্ষার বিদ্যুতের উপমাস্থলে "কামিনী"র প্রীতি-চঞ্চলতার কথা পরিহার করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন :

> "দামিনী দমক রহন ঘন মাহী।
> খলকে প্রীতি যথা থির নাহী।

মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ স্থির থাকিতেছে না, খলের ভালবাসা যেমন চঞ্চল, বিদ্যুতের চঞ্চলতাও ঠিক সেইরূপ। প্রকৃতপক্ষে, মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের প্রীতির চঞ্চলতার উপমায় ব্যাসদেবের গুণী পুরুষের প্রতি ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের প্রীতি-চঞ্চলতার সাদৃশ্য যতখানি দ্যোতনা প্রকাশ করে, তাহা কাব্যের রসধর্মে শৃঙ্গারোজ্জ্বল; আর, তুলসীদাসের

সাধুজনের প্রতি (পরোপকারীর প্রতি) খলের প্রীতি-চঞ্চলতার সাদৃশ্য ততোধিক ভাব-ব্যঞ্জকতায় "শিবসুন্দরের" আসরে সহজ-গম্ভীর।

গিরি-পর্বত বর্ষায় যে বারিপাতের আঘাত সহ্য করে, তাহার সঙ্গে ব্যাসদেব তুলনা দিয়াছেন বিষ্ণুভক্তিপরায়ণের বিপদ্-বরণের। বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ বারংবার বিপদে আক্রান্ত হইয়াও যেমন বিচলিত হন না, সেইরূপ পর্বত বর্ষার বারি-ধারায় পুনঃ পুনঃ আহত হইয়াও ব্যথা পাইতেছে না। তুলসীদাস এই একই উপমা সর্বজনগ্রাহ্য, সরল, মনোহর করিয়া দেখাইয়াছেন। দুষ্ট লোকের কথা শুনিয়া সজ্জন যেমন ব্যথা পায় না, বারিপাতের আঘাতে পর্বতেরও তেমনই কোন কষ্টই হইতেছে না। উভয় চিত্রের রেখাপাত তুলনা করিয়া দেখুন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন লিখিলেন :

"গিরয়ো বর্ষধারাভির্হন্যমানা ন বিব্যথুঃ।
অভিভূয়মানা ব্যসনৈ যথাধোক্ষজ চেতসঃ।"

অধোক্ষজ চেতসঃ অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ ব্যসনে (বিপদে) অভিভূত হইয়াও ব্যথা পান না। বর্ষা-ধারায় অভিহত হইয়াও পর্বত সেইরূপ কোন বেদনাই অনুভব করিতেছে না। প্রকৃতপক্ষে, সহনশক্তিতে আমরা চরাচরের মধ্যে গিরিরই শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ করিয়া থাকি। কিন্তু সেই গিরির সঙ্গে উপমাতে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণের সহন-শক্তি যেন অনেক উন্নততর। ভক্তিশাস্ত্রে ভগবানের প্রতি ভক্তিই প্রধান কথা। কাব্য-রচনাতেও তাই ভগবদ্ভক্তের আসন সর্বোচ্চে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তুলসীদাস ভগবদ্-ভক্তকে প্রায়শঃ 'সন্ত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—ভগবদ্ বিমুখকে 'খল' রূপে—'দুষ্ট' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। একই উপমা তিনি নিজ বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত করিয়া দেখাইলেন—

"বুঁদ অঘাত সহহিঁ গিরি কৈসে।
খলকে বচন সন্ত সহ জৈসে।"

দুষ্টের বচনে সজ্জনের যেমন ক্লেশ হয় না, বারির আঘাতে পর্বতেরও তেমনই ক্লেশ নাই। তিনি লিখিলেন :

'ক্ষুদ্র নদীভরি চলী তোরাঈ।
জস থোরেহু ধন খল ইতরাঈ।"

এক্ষেত্রে প্রকৃতির বর্ণনায় স্বভাবোক্তি যেমন মনোহর, ব্যক্তির সঙ্গে উপমায় উপমালঙ্কারও তেমনই—বরং ততোধিক মনোহর। ক্ষুদ্র নদী বর্ষার বন্যায় বেগে প্রবাহিত হইতেছে; সামান্য ধনে ধনী হইয়া ইতর লোক যেমন ইতরামি করিয়া থাকে, তেমনই ক্ষুদ্র নদীরও আজ দম্ভ। এই উপমাই শ্রীমদ্ভাগবতে বহু পূর্বেই রূপান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে :

"আসন্নুৎ পথগামিন্যঃ ক্ষুদ্র নদ্যোঽনুশুষ্যতী।
পুংসো যথা স্বতন্ত্রস্য দেহ দ্রবিণ সম্পদঃ।"

ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুরুষের শরীর এবং ধন যেরূপ উৎপথ-গামী হয়, সেইরূপ গ্রীষ্মশুষ্ক ক্ষুদ্র নদীগণও বর্ষায় উৎপথ-গামী হইল।

তত্ত্ব এক—কিন্তু রূপ স্বতন্ত্র। সরল ভাষা, ছন্দ এবং অতি সাধারণ উপমা সংযোগে তুলসীর রচনা সর্বসাধারণের নিকট মধুর হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষায় পথগুলি শ্যামল তৃণে সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে—পথ দেখাই যায় না। ব্যাসদেব লিখিলেন—অনভ্যাসে যেমন ব্রাহ্মণের কাছে বেদ লুপ্ত হইয়া যায় (বেদ আছে কি নাই সংশয় হয়), সেইরূপ বর্ষার ঘাসে পথের অবলুপ্তি ঘটিয়াছে।

"মার্গা বভূবুঃ সন্দিগ্ধা স্তৃণৈশ্ছন্না হ্যসংস্কৃতাঃ।
নাভ্যস্যমানা শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালেন চাহতাঃ।"

তৃণাচ্ছন্ন এবং সংস্কারবিহীন (অপরিষ্কৃত) হইয়া পড়ায় পথ ছিল কি নাই বোঝাই যায় না। শ্রুতি অভ্যাস না করিলে, ব্রাহ্মণের নিকট যেমন তাহা আহত (বিনষ্ট) বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, এও ঠিক তেমনই। তুলসীদাস লিখিলেন :

"হরিত ভূমি তিন সংকুল সমুঝি পরহিঁ নহি পন্থ।
জিমি পাখণ্ড বাদতেঁ গুপ্ত হোহিঁ সদ্‌গ্রন্থ।"

তিনি প্রকাশভঙ্গির কিঞ্চিৎ পরিবর্তনে আরও সুন্দর করিয়াই যেন দেখাইলেন—পাষণ্ডগণের কুতর্কে সদ্‌গ্রন্থ যেমন লুপ্ত হইয়া যায়, বর্ষার তৃণে পথ সেইরূপ লুপ্তপ্রায়। বেদের অনভ্যাসের দৃষ্টান্ত অপেক্ষা পাষণ্ডগণের কুতর্কের দৃষ্টান্ত যেন ভক্তি-রস-প্রিয় পাঠকের নিকট আরও মর্ম-গ্রাহ্য।

পাষণ্ডবাদের অনুরূপ কথা ভাগবতে অন্য দৃষ্টান্তে উল্লিখিত হইয়াছে :

"জলৌঘৈ র্নিরভিদ্যন্ত সেতবো বর্ষতীশ্বরে।
পাশণ্ডিনাম সদ্‌বাদৈ র্বেদমার্গাঃ কলৌযথা।"

কলিযুগে নাস্তিকগণের কুতর্কে যেমন বেদ-ধর্ম লুপ্ত হয়, সেইরূপ ইন্দ্র বর্ষণ করিতে থাকিলে, সেতুগুলিও বিদীর্ণ হইতে লাগিল। দেখা যাইতেছে—ভাগবতকারের দুইটি উপমা সংযুক্ত হইয়া তুলসীদাসের মানস-রসে একটি অখণ্ড রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

বর্ষায় ভেকের আনন্দ-কলরবের বর্ণনা প্রসঙ্গে বেদপাঠ-নিরত ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীর দৃষ্টান্ত এক তুলসীদাসের রচনায় আর ব্যাসের রচনাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্-ভাগবতের এই বর্ণনার সঙ্গে রামচরিতমানসের অনুরূপ চিত্র রস-সামঞ্জস্যে মনোহর। তুলসীদাস লিখিলেন :

"দাদুর ধুনি চহুঁ দিসা সুহাঈ।
বেদ পঢ়হিঁ জনু বটু সমুদাঈ।"

চারিদিকে ভেকের কলরব—কি সুন্দর! মনে হইতেছে

ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থী বেদপাঠে নিরত। একই রস-ধর্মে সত্যের সঙ্গে সুন্দরের, সুন্দরের সঙ্গে মঙ্গলের সংযোজনায় ব্যাসদেব লিখিয়া গিয়াছেন :

"শ্রুত্বা পর্জন্য-নিনাদং মণ্ডুকা ব্যসৃজন্ গিরঃ।
তূষ্ণীং শয়ানাঃ প্রাগ্ যদ্বদ্ ব্রাহ্মণা নিয়মাত্যয়ে।"

নিত্যকর্মের শেষে মৌনভাবে শয়ান ব্রাহ্মণগণ যেমন গুরুর আহ্বান শুনিলেই বেদপাঠ আরম্ভ করেন, সেইরূপ পূর্বে মৌনাবলম্বী মণ্ডুকগণ মেঘধ্বনি শ্রবণ মাত্রই শব্দ করিতে আরম্ভ করিল।

ব্যাসদেব লিখিলেন—বর্ষার সন্ধ্যায় শুধু খদ্যোতেরই মেলা, গ্রহ-নক্ষত্র দেখিতে পাওয়াই সাধ। কলিযুগে পাষণ্ড ব্যক্তির প্রতাপে যেমন নাস্তিকতারই রাজ্য; এবং বেদের বিলুপ্তি, বর্ষার সন্ধ্যাতেও তেমনই চন্দ্র-তারকার অবলুপ্তি, শুধু খদ্যোতেরই আড়ম্বর-সভা।

"নিশামুখেষু খদ্যোতাস্তমসা ভান্তি ন গ্রহাঃ।
যথা পাপেন পাষণ্ডা ন হি বেদাঃ কলৌ যুগে।"

তুলসীদাস অনুরূপ চিত্রণে লিখিলেন :

'নিসি তম ঘন খদ্যোত বিরাজা।
জনু দম্ভিন কর মিলা সমাজা।'

বর্ষার রাত্রিতে গভীর অন্ধকারে খদ্যোতের সভা বসিয়াছে। মনে হয় দাম্ভিকেরই গোষ্ঠী রচিত হইয়াছে। সেখানে আর সজ্জনের স্থান কোথা?

কোথাও কোথাও ব্যাসদেবের উপমার অংশবিশেষে বিমোহিত হইয়া তুলসীদাস সেই অংশটুকু মাত্রই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাহার উপর স্বকীয় তুলিকায় নূতনতর রেখাঙ্কনে অধিকতর শিব-সুন্দরের সমাবেশ করিয়াছেন। ব্যাসদেব লিখিয়াছেন :

"ক্ষেত্রাণি শস্যসম্পদ্ভিঃ কর্ষকাণাং মুদং দদুঃ।
মানিনামনুতাপং বৈ দৈবাধীনমজানতাম্।"

শস্যক্ষেত্রগুলি শস্যসম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া কৃষকগণের মনে আনন্দ সঞ্চার করিতে লাগিল। কিন্তু যে সব অভিমানী ব্যক্তি কৃষিকর্মকে হেয় জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে বিরত থাকে, তাহারা অনুতাপ করিতে লাগিল। ব্যাস লিখিতেছেন—আনন্দ, অনুতাপ—সবই দৈবের অধীন একথা তাহারা জানে না।

শস্যসম্পন্ন ধরণীতলের বর্ণনায় তুলসীদাসের সরল ভাষা, ছন্দ এবং স্বকীয় উপমার মৌলিকত্ব কি সাধারণ, কি অসাধারণ সর্ববিধ পাঠকের নিকট যেন আরও হৃদয়গ্রাহী।

"সসিসম্পন্ন সোহ মহী কৈসী।
উপকারী কে সম্পতি জৈসী।"

উপকারী ব্যক্তির সম্পদ্ যেরূপ শোভা পায়, শস্যসম্পন্না মহী সেইরূপ শোভা পাইতেছে। অর্থাৎ, ধরণীতল যেন পরোপকারের ভাণ্ডার রচনা করিয়া সুসমৃদ্ধ শোভায় শোভান্বিত।

অন্যত্রও এইরূপ ভাগবতের উপমার বিশিষ্ট অংশের সঙ্গে নিজস্ব মৌলিক চিন্তা যোজনা করিয়া তুলসীদাস অভিনব বর্ষা-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। আমরা আগে বাল্মীকির রচনার সঙ্গেও অনুরূপ সামঞ্জস্য-পার্থক্যের চিত্র বর্ষা-শরতের বর্ণনায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ভক্ত-কবির মুখ্য লক্ষ্য হরিসেবা। ব্যাসদেব বর্ষার নববারিতে জলস্থলের রুচির রূপ দেখিতেছেন—উপমা প্রয়োগে বলিতেছেন—হরির সেবায় জীব যেরূপ উত্তম স্বরূপ লাভ করে, বর্ষার বারিতে স্থাবর জঙ্গমেরও সেইরূপ রুচির কান্তি। আর একটি উপমার প্রয়োগে তিনি বলিয়াছেন—নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া সমুদ্র আজ ক্ষুব্ধ মূর্তি ধারণ করিয়াছে, অপক্ব যোগীর কামাসক্ত বিষয় সংসর্গী চিত্ত যেরূপ ক্ষুব্ধ হয় ঠিক তেমনিই শ্লোক দুইটি পর-পর লিখিত।

"জলস্থ লোকমঃ সর্বে নববারি নিষেবয়া।
অবিভ্রন্ রুচিরং রূপং যথা হরি-নিষেবয়া।"
"সরিদ্ভিঃ সঙ্গতঃ সিন্ধুশ্চ ক্ষোভ শ্বসনোর্মিমান্।
অপক্ব যোগিনশ্চিত্তং কামাক্তং গুণযুগ্ যথা। ১০-১৩, ১৪

তুলসীদাস কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিপরীত প্রয়োগের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বর্ষার বারিপাতে জল-স্থলের সৌন্দর্যের দিকে দৃক্পাত করিবেন কি, তিনি দেখিতেছেন, ভূমির সংস্পর্শে জল ঘোলা হইয়া উঠিতেছে, জীব মায়ায় জড়িত হইলে যেমন হয় তেমনই।

"ভূমি পরত ভা ঢাবর পানী।
জনু জীবহি মায়া লপটানী।"

তিনি নদী-সংস্পর্শে সিন্ধুর ক্ষুব্ধ রূপ না দেখিয়া দেখিতেছেন—নদী সমুদ্রে পৌঁছাইয়া সমস্ত চঞ্চলতা পরিহার করিতেছে। ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইলে জীবের যেমন সকল চঞ্চলতা দূর হয়, ঠিক তেমনই।

"সরিতাজল জলনিধি মহঁ জাঈ।
হোহি অচল জিমি জীব হরি পাঈ।

ভগবৎ প্রাপ্তিতে চঞ্চলতা পরিহারের এ উপমা, ব্যাসদেবের (হরিসেবায় ভক্তের উত্তম স্বরূপ লাভের সহিত উপমিত জলস্থলের রুচির কান্তির) সাদৃশ্য অপেক্ষাও হৃদ্য বলিয়া মনে হয়।

প্রসঙ্গক্রমে অন্ততঃ এইটুকু বলা চলে যে কালিদাসের ভাবে ভাবিত রবীন্দ্রনাথের রচনায় যেমন কালিদাসের কল্পিত রস-সামগ্রী নবরূপে সার্থকতামণ্ডিত হইয়াছে, ভাগবতকারের উপাদানও তেমনই তদ্ভাবে ভাবিত তুলসী-ক্ষেত্রে নূতনতর সার্থকতার শোভনরূপ ধারণ করিয়াছে।

তাহা ছাড়া, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য যেখানে যেভাবে যতটুকু

থাকুক না কেন, তুলসীদাসের সরল ভাষায় প্রাঞ্জলতা সহকারে রচিত অতি গূঢ় তথ্যের সরল রূপ যুগপৎ দার্শনিক পণ্ডিতের এবং সাধারণ পাঠকের মন সমানে মুগ্ধ করিয়াছে। বর্ষা-চিত্রের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শরতের চিত্র দুইটি এখন আমরা পাশাপাশি রাখিয়া অবলোকন করিব। শরদ্ বর্ণনাতেও তুলসীর কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতের যে উপমা-সঙ্গতি আসিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে তিনি অনেক স্থলেই স্বকীয় মৌলিকত্ব মিশাইয়া মধুরতর কাব্য-রস পরিবেশন করিয়াছেন।

"গাধবারিচরাস্তাপমবিন্দন্ শরদর্কজম্।
যথা দরিদ্রঃ কৃপণঃ কুটুম্ব্য বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥"

শরতে অল্পজলে প্রাণিগণ শরৎকালীন তাপে কষ্ট পাইতেছিল। বহু কুটুম্ব লইয়া অজিতেন্দ্রিয় ধনার্জনে ক্লিষ্ট-চিত্ত যেরূপ সংসার-জালায় জলিয়া থাকে, ইহাদেরও সেই দশা। ভাগবতের এই উপমা তুলসীর লেখনীতে রূপ-সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে :

"জল-সংকোচ বিকল ভঈ মীনা।
অবুধ কুটুম্বী-জিমি ধনহীনা॥"

শরতে জল কমিয়া যাওয়ায় মীনেরা বিকল হইয়াছে—বহু কুটুম্ব লইয়া নির্ধন জ্ঞানহীনের যে অবস্থা হয়, ইহাদেরও সেই অবস্থাই হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী উপমায় তুলসীদাস যে অগাধ জলসঞ্চারী মৎস্যের কথা বলিতেছেন, সে সম্পূর্ণ-রূপেই তাঁহার নিজস্ব।

"সুখী মীন যে নীর অগাধা।
জিমি হরি সরণ ন একউ বাধা॥"

সুগভীর জলে মৎস্যেরা সুখে সন্তরণ করিতেছে। যিনি শ্রীভগবানের শরণাগত, তাঁহাকে যেমন কোন বাধাই পীড়া দিতে পারে না, অগাধ-জল-বিহারী মৎস্যকুলেরও তেমনই কোন বাধা-বিঘ্নই নাই, তাহারা সুখে সুগভীর জলে সাঁতার দিতেছে।

ভাগবতকার শরতের জলকে নির্ম্মল করিয়া দেখাইয়াছেন, পদ্মের বিকাশকে জলের ঐ স্বচ্ছতার হেতুরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। জলের আবিলতা-মুক্তির উপমাস্বরূপ ভ্রষ্ট-যোগীর ভক্তিযোগে সমাহিত অবস্থায় যে নির্ম্মলতা তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন।

"শরদা নীরজোৎপত্ত্যা নীরাণি প্রকৃতিং যযুঃ।
ভ্রষ্টানামিব চেতাংসি পুনর্যোগ নিষেবয়া॥"

ভক্তিযোগের আশ্রয়ে ভ্রষ্টযোগীর চিত্ত যেরূপ নির্ম্মল হয়, শরতে পদ্মের উৎপত্তিতে জল সেইরূপ আবিলতা-মুক্ত হইয়া স্বচ্ছ স্বরূপ লাভ করিয়াছে।

তুলসীদাস শরতের জলের স্বচ্ছতার বর্ণনা করিয়াছেন সম্পূর্ণ স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে—স্বচ্ছতার হেতুর কথা তাঁহার মনে ঠাঁই পায় নাই। শুধু নির্ম্মলতার উপমাস্বরূপ ভক্তের হৃদয়ের কথাই নির্দেশ করিয়াছেন।

"সরিতাসর নির্ম্মল জল সোহা।
সন্তহৃদয় জস গত মদমোহা॥"

নদী-সরোবরে নির্ম্মল জল শোভা পাইতেছে। সাধু ব্যক্তির মন হইতে মদ-মোহ চলিয়া গেলে যেরূপ নির্ম্মলতা প্রকাশ পায়, শরতের সলিলের নির্ম্মলতাও তদ্রূপ।

শরতের কমল-বিকাশের যে উপমা তুলসীদাস প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণের নিকটও ব্রহ্মের নির্গুণ, সগুণ অবস্থার রূপ রস-পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

"ফুলে কমল সোহ সর কৈসা।
নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ ভয়ে জৈসা॥"

নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হইলে, অর্থাৎ শরীরাদি ধারণ করিলে যেমন নয়নগোচর অপূর্ব শোভার আধার হইয়া থাকে, সরোবরও তেমনই কমলের শোভায় শোভান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

শরতের স্বল্প বৃষ্টিপাতের বর্ণনায় ব্যাসদেব লিখিলেন :

"গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং কচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা॥"

জ্ঞানিগণ যেরূপ যোগ্য শিষ্যকেই ভগবৎতত্ত্বের জ্ঞানামৃত দান করিয়া থাকেন, পর্বতগণও সেইরূপ স্বল্প স্থানেই বারি-বর্ষণ করিতেছিল—সর্বত্র করে নাই।

তুলসীদাস স্বকীয় সরল ভঙ্গিতে রসিক ভক্ত পাঠকের হৃদয়ে সহজ ভক্তির রসোল্লাস উৎপাদনার্থই যেন লিখিলেন :

"কহুঁ কহুঁ বৃষ্টি সারদী থোরী।
কোউ এক পাব ভগতি জসি মোরী॥"

শরৎকালে কচিৎ কোথাও স্বল্প বৃষ্টি হইতেছে। শ্রীরাম-চন্দ্র বলিতেছেন—খুব অল্প লোকই যেমন আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়, শরৎকালের বারিলাভও তেমনই অতি অল্প ভূভাগের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

শরতের নির্মল আকাশের বর্ণনা করিতে গিয়া দ্বৈপায়ন লিখিলেন :

"খমশোভত নির্ম্মলং শরদ্ বিমলতারকম্।
সত্ত্বযুক্তং যথা চিত্তং শব্দব্রহ্মার্থদর্শনম্॥"

যিনি শব্দব্রহ্মের অর্থ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার সাত্ত্বিক মন যেরূপ নির্ম্মলতা লাভ করে, মেঘমুক্ত নির্ম্মল তারকাশোভিত স্বচ্ছ আকাশ সেইরূপ শোভাধারণ করিয়াছে।

তুলসীদাস একই উপমা আরও সহজ সরল করিয়া দেখাইয়া ভক্তিরসের আকর্ষণে পাঠককে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়া দিলেন :

"বিনু ঘন নির্ম্মল সোহ অকাসা।
হরিজন ইব পরিহরি সব আসা।"

ভগবদ্‌ভক্ত যেমন সমস্ত বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মলতার অধিকারী হয়, আকাশদেশ মেঘমুক্ত হইয়া ঠিক সেইরূপ নির্ম্মলতা ধারণ করিয়াছে। ব্যাসদেব লিখিলেন: ভাগবতজন যেরূপ শরীরাদি অনাত্মা বিষয়ে ক্রমে ক্রমে "অহং—মম" এইভাব পরিত্যাগ করেন, স্থলভাগও সেইরূপ পঙ্কিলতা, এবং লতাদি অপকভাব পরিত্যাগ করিতেছিল।

'শনৈঃ শনৈর্জহুঃ পঙ্কং স্থলান্যামঞ্চ বীরুধঃ।
যথাহং-মমতাং ধীরাঃ শরীরাদিস্বনাত্মসু।'

তুলসীদাস সরিৎ সরোবরের জল শুষ্ক হওয়ার সঙ্গে জ্ঞানীর মমতা পরিহারের উপমা প্রয়োগ করিয়া লিখিলেন:

"রস রস সুখ সরিত সর পাণী।
মমতা ত্যাগ করহিঁ জিমি জ্ঞানী।"

জ্ঞানীব্যক্তি যেরূপ মমতা ত্যাগ করে, নদী ও সরোবরের জল তেমনই ধীরে ধীরে শুষ্ক হইতেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর পুরুষেরা শরতে কিরূপে নিজ নিজ প্রাপ্য বিষয় লাভ করে, তাহার প্রসঙ্গে ব্যাস-তুলসী সমানে ভগবদ্‌ভক্তির তুঙ্গ শিখর প্রদর্শন করিয়াছেন। একজন লিখিতেছেন:

"বণিঙ্‌মুনিনৃপস্নাতা নির্গম্যার্থান্ প্রপেদিরে।
বর্ষরুদ্ধা যথা সিদ্ধাঃ স্বপিণ্ডান্ কাল আগতে।"

সিদ্ধিকাল আসিলে, ভক্তাদি সিদ্ধজন যেরূপ প্রাপ্য পার্ষদাদিদেহ প্রাপ্ত হন, সেইরূপ বর্ষাকালে একত্র অবস্থিত বণিক্, মুনি, নৃপ এবং স্নাতক বিপ্রগণ শরৎকালে নিজ নিজ স্থান হইতে বহির্গত হইয়া বাণিজ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, দিগ্‌বিজয় এবং বিদ্যাদি বিষয় প্রাপ্ত হইলেন। আর একজন লিখিলেন:

"চলে হরষি তজি নগর নৃপ তাপস বণিক ভিখারী।
জিমি হরিভগতি পাই শ্রম তজহিঁ আশ্রম চারী।"

প্রসন্ন হইয়া রাজা, তপস্বী, বৈশ্য ও ভিক্ষুক নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিল। ভগবদ্‌ভক্তি লাভ করিয়া মানুষ যেমন চারি আশ্রমের ক্লেশ আর ভোগ করিতে চায় না, ইহারাও সেই গতি লাভ করিয়াছে। বর্ষার অবরুদ্ধ গতি. শরতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। চতুরাশ্রমবদ্ধ জীবও তেমনই ভগবদ্‌ভক্তির বলেই এইরূপ মুক্ত অবস্থা লাভ করিয়া থাকে।

মা কালীর পট

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দীশর্ম্মা)

ভাবিয়াছ মূর্ত্তি বুঝি শিল্পীর কল্পনা!
নৃত্যপরা উলঙ্গিনী নৃমুণ্ড ভূষণা,
কেনো অট্টহাসে বিশ্ব প্রকম্পিত করি
উল্লাসিনী অসি-করা, নাচে শবোপরি?

প্রতীচ্য বিদ্রূপ করি নানা কথা কয়;
তারা ভিন্ন জাতি—সহজে তা সয়।
তা'দেরি 'প্রসাদপুষ্ট-জ্ঞানের' পূজারী
সমর্থন করি মোরা, নির্লজ্জ ভিখারী।

বলি—"এ অভব্য মূর্ত্তি বর্ব্বরের আঁকা,
এই পট ঘরে রাখি—মা মা বলি ডাকা,
উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত এই প্রগতির মাঝে
এর চেয়ে হাস্যকর আর কিবা আছে।

চক্ষের আড়াল কর', দেখিবে সভ্যেরা,
পোড়াও আগুনে তায়,—লুপ্ত কর ত্বরা।"

* * *

চিত্রে আজ উলঙ্গিনী দেখে লজ্জা পাও।
ওরে অন্ধ—বাঙ্গালার পথে ঘাটে চাও,—
সর্ব্বত্র জীবন্ত মা'র নিবস্ত্র প্রতিমা
সরমে মুদিছে চক্ষু, ক'রে এসো সীমা!

যাঁর স্তন্যসুধা আর লালনে পালনে
উচ্চশিরে ফের' আজ মোহের ছলনে,
ওঁরা সেই মাতা, যাঁর অন্তিম নিঃশ্বাস
পড়েছে তোমায় স্মরি। কর' কি বিশ্বাস?

না পেয়ে, খাওয়ায়ে তারা গেল দেহ ছাড়ি,
এ কীর্ত্তি রাখিল যারা অন্ন লয়ে কাড়ি,—
তারাই ত' সত্য বটে, মিথ্যা কে কহিবে?
সে সত্যের খ্যাতি বিশ্ব আপনি ঘোষিবে।

১৩৪৭—১লা বৈশাখ

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দীশর্ম্মা)

পুরাতন বন্ধু মোর বৈশাখেতে নব হও,
বিতরি আশার মোহ সান্ত্বনার কথা কও।
"শুভদিন সন্নিকট আর তুমি ভাবো কেনো.
সেদিন তো চলে'গেছে, এ নহে সেদিন জেনো"।
এ আশার গতিবেগ সাধ্য কি যে রোধে নর,
দোলা আসে অন্তরেতে "এইবার চেষ্টা কর্"।
তখন সে ঝাঁপ দেয় "যা থাকে কপালে" বলি,
কেহ হাসে, কেহ কাঁদে, তুমি বেশ যাও চলি।
এই চক্রে চিরদিনই দুর্ব্বল মানুষ মোরা
নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট পথে করিতেছি ফেরাঘোরা।
বর্ষে বর্ষে নব তুমি, মোদেরি বার্দ্ধক্য আসে,
এই খেলা চিরদিন, ছুটি পাই দেহ নাশে।
দীর্ঘদিন সঙ্গী তুমি, লহ মোর নমস্কার
বিরাম আছে কি বন্ধু ও পারেতে এ খেলার।

বাঁধ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

১

মঞ্জুষা অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু জীবানন্দের চোখে ঘুম নাই। একটা কাল্পনিক আশঙ্কায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। মৃন্ময় আসিয়াছিল আবার চলিয়া গেল। মঞ্জুষা বলে, সে আর আসিবে না।···কিন্তু কেন···কিসের জন্য! তিনি না হয় উত্তেজিত হইয়া দু'কথা শুনাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু মঞ্জুষা এমন নির্ব্বাক দর্শকের মত থাকিতে পারিল কেমন করিয়া। তার আসল মনের কথাটা কি—এ কি মঞ্জুষার নিছক বৈরাগ্য না বিদ্রোহ!

জীবানন্দ ইহার অধিক ভাবিতে পারেন না। চিন্তা করিবার ক্ষমতাও তিনি যেন হারাইয়া ফেলিয়াছেন। জোর করিয়া নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করিবার শক্তি আজ আর তাঁর নাই—এমনি একটা অসহায় অবস্থায় আসিয়া তিনি উপনীত হইয়াছেন।

অকস্মাৎ তাঁর মনে পড়িল গৃহত্যাগী, ধর্ম্মত্যাগী পুত্রকে—একের পর এক মনে পড়িল আরও বহু ঘটনা। তার কল্পনার সোনার সংসার আজ এ কি হতশ্রী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। দুষ্ট শনি গুপ্ত পথে তাঁর সংসারে প্রবেশ করিয়া সব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁর চোখের সম্মুখেই সবকিছু ঘটিয়াছে—তিনি বাধা দিতে পারেন নাই···পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে গা ভাসাইয়া দিয়া এতখানি পথ চলিয়া আসিয়াছেন। আজিকার এই অদ্ভুত পরিস্থিতির জন্য তিনি নিজেকেই বারে বারে ধিক্কার দেন।

মান্নুর সহিত মঞ্জুষার বিবাহকে তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও সমর্থন করিতে পারেন নাই অথচ মঞ্জুষার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শক্ত হইয়া দাঁড়াইবার শক্তিও তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন যে, নিজের ইচ্ছায় চলিয়া অনেক দুঃখই এ যাবৎ পাইয়াছেন, দেখা যাক মঞ্জুষা যদি জোড়াতালি দিয়া কোন রকমে একটা সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে, ভরাডুবি হইতে যতটুকু বাকী ছিল তাহাও সম্পূর্ণ হইয়াছে।

মানুষ আর কতখানি সহ্য করিতে পারে। জীবানন্দও পারিলেন না। তার স্বভাবের ঘটিল পরিবর্ত্তন। যখন কথা বলা দরকার তখন চুপ করিয়া থাকেন, আবার অকারণে খামোকা চেঁচামেচি করিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তোলেন। ঠিক যে অস্বাভাবিক তা নয়, আবার ইহাকে ঠিক স্বাভাবিকও বলা চলে না। নহিলে মৃন্ময়ের সহিত এইরূপ আচরণের কোন হেতু ছিল না। মৃন্ময় চলিয়া যাইতেই কিন্তু কথাটা জীবানন্দ অনুভব করিলেন—প্রতিকার করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু মঞ্জুষা বাধা দিল।

জীবানন্দ ক্ষণকালের জন্য থামিলেন—কি জানি, না জানিয়া আবার তিনি নূতন করিয়া কাহাকেও ব্যথা দিতে উদ্যত হন নাই ত? মনে মনে তিনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন।···

বৈশাখের শেষ। আকাশে মেঘ জমিয়াছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। কেমন একটা ভাপসা গুমোট ভাব। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। হয়ত এখনি বৃষ্টি আসিবে। জীবানন্দ স্থিরভাবে শয্যার উপর বসিয়া আছেন। বাহিরের ঐ স্তব্ধ প্রকৃতির সহিত তাঁর মনের কোথায় যেন একটা গভীর যোগ আছে।

জীবানন্দ কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। এমনি ভাবে মানুষ বাঁচে কেমন করিয়া। তাঁর এতখানি বয়স হইয়াছে—আর কত দিন বাঁচিবেন। কিন্তু মঞ্জুষা—তার জীবনের এই ত সবে আরম্ভ।···আবার সব যেন কেমন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। দুই চোখ ক্লান্তিতে বুজিয়া আসে, কিন্তু মাথার ভিতরটা দপ দপ করিতে থাকে। কিছু একটা তাঁহাকে করিতেই হইবে।

জীবানন্দ পুনরায় শয়ন করিলেন।

বাবার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মঞ্জুষা আপন শয্যার উপর উপবেশন করিল। একটা সমস্যা মিটিয়া যায়, আর একটা আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়। সে কি নিজেকেও পদে পদে এমনি করিয়া চিনিতে ভুল করিবে।

'যাও'—বলিয়া মৃন্ময়ের মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া মঞ্জুষা ভাবিয়াছিল যে, এইবার হয়ত একটা মস্ত বড় দুর্ভাবনার হাত হইতে সে নিষ্কৃতি পাইবে, কিন্তু যতই দিন যাইতেছে চিন্তাটা ততই যেন আরও গুরুভার হইয়া তার শ্বাসরোধ করিয়া ফেলিতেছে। যুক্তি-বিচার দ্বারা তার কাজের সমর্থন মিলিলেও মন দ্বিধাহীন ভাবে তাহা মানিয়া লইতে পারিতেছে না। বরং সেই একটি চিন্তা আরও সহস্র ধারায় মঞ্জুষার মনের দুকূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই প্লাবনের প্রচণ্ড গতিপথে তার জীবনের কত স্মৃতিই একের পর এক দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল। মঞ্জুষা চমকিত হয়। তার ভবিষ্যৎ কোথায় কোন গভীর অন্ধকারে—তার পৃথিবী কি চিরবন্ধ্যাই থাকিবে? একদিনের জন্যও সেখানে কি ফুল ফুটিবে না—ফল ধরিবে না?

রাত অনেক হইয়াছে। তার বাবার ঘরে এখনও আলো জ্বলিতেছে। এখনও তিনি জাগিয়া আছেন। হয় ত আজিকার ঘটনার কথা ভাবিয়াই তিনি আবার নূতন করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন।

কোথাও জনমানবের সাড়া নাই। মঞ্জুষার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। সেই শব্দে সে নিজেই চমকাইয়া উঠিল।

ভাল করে নাই—সে কাজটা মোটেই ভাল করে নাই। হয়ত বলিবার তার অনেক কথাই ছিল ···কিন্তু তাহা জানিয়া মঞ্জুষার কতখানি লাভ হইত। বরং যাচিয়া নিজে আরও দুঃখ বরণ করিয়া লইত। মৃন্ময় সাগ্রহে দুই হাত বাড়াইয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিবার অধিকার যখন সে হারাইয়াছে তখন ইহা ছাড়া অন্য কোন্ পথে সে চলিতে পারিত!

বাহিরে প্রবল ঝড় উঠিয়াছে। সেই সঙ্গে বৃষ্টি। মঞ্জুষাকে পুনরায় উঠিতে হইল। দ্রুত সে খোলা জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া সোজা তার বাবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। জানালাগুলি তখনও খোলা রহিয়াছে। জীবানন্দের বোধ হয়, একটু তন্দ্রার ভাব দেখা দিয়াছিল। ঠাণ্ডা বাতাসে তাহা টুটিয়া গেলেও তিনি নিঃশব্দে শুইয়াছিলেন। মঞ্জুষা আসিতেই তিনি উঠিয়া বসিলেন। মঞ্জুষা দ্রুত জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া তার বাবার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, আর রাত জেগো না বাবা। শুয়ে পড়ো—আমি আলো নিভিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।···

জীবানন্দ করুণ দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের পানে খানিক চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, তুমিও ত জেগেই ছিলে মঞ্জু।

মঞ্জুষা একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া জবাব দিল, আমার কথা বলো না বাবা। কিন্তু তোমার শরীর যে মোটেই ভাল নেই।

জীবানন্দ আর কথা বাড়াইলেন না। শুইয়া পড়িলেন। মঞ্জুষা তাঁর গায়ের উপর চাদরটা টানিয়া দিয়া পাখার গতি আরও খানিক বাড়াইয়া দিল এবং আলো নিভাইয়া দিয়া নীরবে প্রস্থান করিল। জীবানন্দ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

পরদিন মঞ্জুষার ঘুম ভাঙ্গিতে কিছু বিলম্ব হইল। জীবানন্দের প্রত্যেকটি কাজ সে নিজের হাতে করিয়া থাকে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বহু দিন যাবৎ এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। কাজেই অকস্মাৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রমে তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। চাকর-বাকর সকলকে ডাকিয়া খুব একচোট ধমকাইলেন। এতগুলি অকর্ম্মণ্য চাকরকে অনর্থক তিনি আর পোষণ করিবেন না একথাটাও জানাইয়া দিলেন।

তাঁর খাস চাকর নিতাই আসিয়া মৃদুকণ্ঠে জানাইল যে, তাহাদের তিরস্কার করা বৃথা—

জীবানন্দ পুনরায় উষ্ণ হইয়া উঠিলেন।

নিতাই বলিল, আপনার কোন কাজ আর কারুর করবার হুকুম নেই যে, নইলে—

জীবানন্দ সহসা শান্তকণ্ঠে বলিলেন, বুঝলে নিতাই মেয়েটা একেবারে আস্ত পাগল। আর দু'দিন যদি অসুখেই—কথাটা তিনি শেষ না করিয়াই অন্য প্রসঙ্গে আসিলেন, বলিলেন, তাই ত কথাটা এতক্ষণ আমার ভাবা উচিত ছিল। এতক্ষণ মঞ্জু ত কোন দিন বিছানায় পড়ে থাকে না। বলিয়া শশব্যস্তে উঠিতে গিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িলেন। মঞ্জুষা দেখা দিয়াছে।

সে আসিয়া একবার দেয়াল-ঘড়ির পানে চোখ তুলিয়া চাহিয়াই নিতাইকে মৃদু ভর্ৎসনা করিল, এতখানি বেলা হয়ে গেছে আর আমাকে একবার ডাকবার কথাও তোমাদের কারুর মনে হ'ল না। খামোকা বাবার কত দেরী হয়ে গেল। তোমরা যদি এই বুদ্ধিটুকুও না খরচ করবে তা হলে চলে কি করে।

নিতাই এবং সঙ্গে সঙ্গে আর সকলে একে একে নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল।

জীবানন্দ গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, হতভাগাদের আজই বিদেয় করে দাও মঞ্জু। রোজ রোজ তোমাকেই বা সব কাজ করতে হবে কেন?

মঞ্জু হাসিমুখে জবাব দিল, তার জন্যে ওদের দোষ দিও না বাবা। আমার মানা আছে বলেই তোমার কোন কাজ করতে ওরা ভরসা পায় না।

যুক্তিটা জীবানন্দ এক কথায় মানিয়া লইতে পারিলেন না। তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, তুমি বারণ না করলেও ওরা এগুত না। বলিতে বলিতে সহসা কথার মাঝখানে থামিয়া তিনি প্রসঙ্গান্তরে আসিলেন। উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি অসুখ করেছে মা, না সারারাত ঘুম হয় নি?

হাসিমুখে মঞ্জুষা প্রত্যুত্তর করিল, এ কথা কেন বাবা—আমি ত আজ বরং অনেকটা বেশীই ঘুমিয়ে নিয়েছি।

জীবানন্দ একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, সব দিকে আর তেমন দৃষ্টি রাখতে পারি না বলে তোরা সবাই মিলে আমায় যদি ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিস তা হলে আমি যাই কোথায় বল্ ত মা।

বাধা দিয়া মঞ্জুষা প্রত্যুত্তর করিল, মিথ্যা দুর্ভাবনা করলে আমরাই বা কি করতে পারি বাবা।

জীবানন্দ অদ্ভুত ভঙ্গীতে একটু হাসিয়া বলিলেন, আমি কিছুই বুঝি না—আমি মিথ্যা দুর্ভাবনা করি, কিন্তু আয়নায় একবার নিজের মুখ দেখে এসে আমার কথার জবাব দিও মঞ্জু। আমার সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে আজ তোমার মা বেঁচে নেই।

মঞ্জুষা শান্ত কণ্ঠে বলিল, আর শরীর যদি সত্যিই একটু খারাপ হয়ে থাকে তা নিয়ে হৈ চৈ করবার কি আছে। শরীর কি কারুর খারাপ হতে নেই? কিন্তু আর একটি কথাও নয়। তুমি তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে এস। নিতাই এখুনি তোমার চা নিয়ে আসবে।

আর বাক্যব্যয় না করিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, কই তোমার নিতাই এলো মঞ্জু? সাধে কি আর রাগ করি।

একটু হাসিয়া মঞ্জুষা বলিল, তোমার মেজাজ ভাল নেই বাবা, নইলে নিতাই মোটেই দেরী করে নি। ঐ ত সে এসে পড়েছে।

নিতাই ঘরে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে চায়ের সরঞ্জাম টেবিলের উপর রাখিয়া প্রস্থান করিল।

মঞ্জুষা চা তৈরি করিতে করিতে মৃদু কণ্ঠে বলিতে লাগিল, মা বেঁচে থাকতে কোনদিন বোধ হয় আমাদের কথা নিয়ে তুমি এত চিন্তা কর নি বাবা? এ সব কথা কেন যে তুমি বার বার বল আমি বুঝি না।

মঞ্জুষার কণ্ঠস্বর করুণ মনে হইল। জীবানন্দ বার বার মাথা নাড়িয়া বলিয়া চলিলেন, চিন্তা ভাবনার অংশীদার থাকলে মনটা অনেক হাল্কা হয়ে যায়, কিন্তু তুমি দুঃখ পাবে জানলে এ কথা বলতাম না মা।

মঞ্জুষার মুখে হাসি দেখা দিল। এ হাসির ধরণ আলাদা। মৃদু কণ্ঠে সে প্রতিবাদ জানাইল, আমি কিন্তু উল্টো বুঝি। মা চলে গিয়ে বেঁচে গেছেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুখ এ পর্যন্ত অনেক পেলে কিনা বাবা।

জীবানন্দ গভীর স্নেহে কিয়ৎক্ষণ মঞ্জুষার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, দুঃখকে আমি কোন দিনই ভয় করি নি, কিন্তু আমার জীবনে এই মর্মান্তিক পরাজয়কে কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না মঞ্জু—কথাটা আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছি না। তোর দিকে চোখ পড়লেই নিজেকে আমার সবচেয়ে বড় অপরাধী বলে মনে হয়।

মঞ্জুষা অস্বাভাবিক ভাবে হাসিয়া উঠিল। বলিল, কিন্তু আমি ত বেশ আছি বাবা।

জীবানন্দ চমকাইয়া উঠিলেন। মঞ্জুষা হাসিয়া উঠিল, কিন্তু এ কেমন হাসি! তিনি মাথা নাড়িতে নাড়িতে যেন আত্মগত ভাবেই বলিতে লাগিলেন, ভাল বৈকি খুব ভাল—কিন্তু এ আর আমি চলতে দিতে পারি না—

মঞ্জুষা বাধা দিয়া বলিল, তুমি কি বলছ বাবা?

জীবানন্দ যথাসম্ভব সহজভাবে বলিলেন, আর কারু কথা আমি শুনব না মঞ্জু। কারুর বাধা, কোন বিধানকেই গ্রাহ্য করব না। আমাকে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে মঞ্জু। অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে হবে।

প্রত্যুত্তরে শান্ত কণ্ঠে মঞ্জুষা জবাব দিল, আমার বাবা কোন দিন অন্যায় কাজ করেনও নি, অন্যায়ের প্রশ্রয়ও দেন নি।

জীবানন্দের কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, এমনি করে পদে পদে আমার পথ আগলে দাঁড়াস নে মা, আমাকে আর পাপের ভাগী করিস নে মঞ্জু।

মঞ্জুষা আবেগহীন কণ্ঠে বলিল, পাপ না করেও যদি নিজেকে তুমি পাপী মনে করো তবে কথাটা তোমায় জানিয়ে দেওয়া আমি কর্তব্য মনে করি। কিন্তু কিসের জন্য তুমি আমায় নিয়ে হঠাৎ এমন দুশ্চিন্তায় পড়লে বাবা?

জীবানন্দ নীরব।

মঞ্জুষা বলিতে লাগিল, কাল মিনুদা চলে যাবার পর থেকেই তুমি চঞ্চল হয়ে উঠেছ, কিন্তু তুমি বোধ হয় জান না যে, এ বাড়ীর দরজা আমিই তার মুখের উপর বন্ধ করে দিয়েছি।

জীবানন্দ সহসা এমন ভাবে চমকাইয়া উঠিলেন যে, তাঁহার হাতের ধাক্কায় চায়ের পেয়ালা উল্টাইয়া গেল।

পাশের ঘর হইতে নিতাই ছুটিয়া আসিল। কি হ'ল দিদিমণি?

মঞ্জুষা নীচু হইয়া কাঁচের টুকরাগুলি একস্থানে জড়ো করিতে করিতে মৃদু কণ্ঠে জানাইল, কিছু নয়, হাত থেকে পড়ে গেছে—

নিতাই বলিল, আপনি সরুন আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি।

মঞ্জুষা তেমনি মৃদু কণ্ঠে পুনরায় বলিল, এক কথা তোমায় কতবার বলতে হবে নিতাই।

নিতাই সভয়ে প্রস্থান করিল। ভাঙ্গা পেয়ালার টুকরাগুলি পরিষ্কার করাই মঞ্জুষার আসল উদ্দেশ্য নয়—তার নিজের মধ্যেই চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল এবং পাছে নূতন করিয়া বাবার কাছে ধরা পড়িয়া যায় এই ভয়ে বসিয়া পড়িয়া ভাঙ্গা টুকরাগুলি সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। অকারণে অনেকটা সময় অতিবাহিত করিয়া এক সময় সে পুনরায় স্থির হইয়া বসিল।

জীবানন্দ কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে মঞ্জুষার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি যেন তার বুকের ভিতরে প্রবেশ করিয়া অতি গোপন কথাটিও জানিয়া লইতে চায়। মঞ্জুষা চোখ নামাইল। জীবানন্দের মুখে ঈষৎ অর্থপূর্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, আমার স্নেহান্ধতা আর ভুলের সুযোগ নিয়ে সহজকে তোমরা জটিল করে তুলেছ। আমায় সত্যি করে বল মা যদি কোন পথ খোলা থাকে হয়ত একটা প্রতিকারের উপায় এখনও হতে পারে। আমায় সবাই মিলে পাগল করে তুলো না মঞ্জু।

মঞ্জুষা একটু হাসিল। জীবানন্দ চমকাইয়া উঠিলেন। সে দৃঢ় কণ্ঠে বলিতে লাগিল, তোমার অবাধ্য হবার সুযোগ কোন দিনই তুমি দাও নি—আজও দিও না বাবা। যেখানে আমাদের মর্য্যাদা এবং সম্ভ্রম—

জীবানন্দ কথার মাঝখানে বাধা দিয়া বলিলেন, শুধুই মর্য্যাদা আর সম্ভ্রম মঞ্জু।…

মঞ্জুষা জবাব দিল, হয়তো আরও অনেককিছু বাবা, কিন্তু সব কথা তুমি নাই বা শুনলে। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, তোমার মঞ্জুকে নিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই, সে কোন দিন তোমাকে ছোট করবে না।…

জীবানন্দ নীরব। মঞ্জুষা বলিতে লাগিল, আমি বরং দেখছি বিয়েটা শেষ পর্য্যন্ত না হয়ে ভালই হয়েছে। নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে যেতে পারব।

জীবানন্দ ডাকিলেন, মঞ্জু—

মঞ্জুষা বলিতে লাগিল, তোমায় মিথ্যে বলছি না বাবা। তোমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার এ বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হচ্ছে দিন দিন। কত দুশ্চিন্তা, কত দুর্ভাবনা। একটু শান্তিতে থাকবারও কি যো আছে।

জীবানন্দ পুনঃ পুনঃ মাথা নাড়িতে লাগিলেন, বলিলেন, কথাটা ঠিক হ'ল না মঞ্জু। এই দুর্ভাবনার মধ্যেও মানুষের বেঁচে থাকবার অনেকখানি তাগিদ রয়েছে এ কথা বুঝবার দিন যদি তোর আসত তা হলে বুড়ো বাপের মুখ এমন করে বন্ধ করে দিতে পারতিস নে মা।

মঞ্জুষা মৃদু কণ্ঠে বলিল, তা বলে যে দিন এখনো আসে নি তার জন্য অনর্থক দুঃখ করতেও আমি পারব না কিন্তু, তুমি কি আজ কিছুতেই থামবে না বাবা?

জীবানন্দ বলিলেন, থেমেই ত এতদিন ছিলাম মা, কিন্তু মৃন্ময়ের দেখা পেয়ে আবার যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—

কিছু একটা জবাব দিবার জন্যই মঞ্জুষা মুখ তুলিয়াছিল, কিন্তু বামুনদিদিকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া সে থামিল। বামুনদিদি কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই মঞ্জুষা কহিল, বাবা কি খাবেন এই কথা ত? কাল যা খেয়েছেন আজও তাই খাবেন।

বামুনদিদি কিছু বলিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া মঞ্জুষা পুনরায় কহিল, কখন কি বলেছি তাই মনে করে বসে আছ বুঝি? আজ আমার শরীরটে ভাল নেই, বকতে পারছি না।

বামুনদিদি চলিয়া যাইতে মঞ্জুষা স্থির হইয়া বসিল।

জীবানন্দ পুনরায় কহিয়া উঠিলেন, সবই বুঝি মা, কিন্তু তবুও না ভেবে ত পারছি না। সেই থেকে ক্রমাগতই ভাবছি।

মঞ্জুষা সহসা বলিয়া বসিল, আর সেইজন্যই রাত দুটো পর্য্যন্ত তোমার ঘরে আলো জলতে দেখা যায়—

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু মঞ্জুষা সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ তাহার ঘরে যে সারা রাত আলো জলিয়াছে সে প্রশ্ন উঠিলে কি জবাব…কথাটা মঞ্জুষা শেষ পর্য্যন্ত ভাবিয়া দেখিবারও অবকাশ পাইল না। কথার মাঝখানে থামাইয়া দিয়া জীবানন্দ পালটা প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, তোমার কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু এমনি করে আর কত দিন নিজেকে গোপন করে রাখা যায় মা! শুধু বুড়ো বাপের উপর চোখ রাখবার জন্যই তোমাকেও অত রাত জেগে বসে থাকতে হয়েছিল, এই কথাটাই কি আমাকে বিশ্বাস করতে বল?

একটু থামিয়া তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, নিজের উপর বিশ্বাস আমার শিথিল হয়ে পড়েছিল বলেই চুপ করে ছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি অন্যায় তাতে ক্রমাগত শুধু বেড়েই চলেছে—

মঞ্জুষা জোর করিয়া খানিক হাসিয়া বলিল, জোর করে মরা গাছে ফুল ফোটানো যায় না। নইলে আমার কথা আমার চেয়ে বেশী আর কে বুঝবে বাবা। আমি আজ আর ছেলেমানুষ নই। একটু ভেবে দেখলে এ কথা তুমিও স্বীকার করবে, কিন্তু কত বেলা হ'ল দেখেছ—আমার এখনও ঢের কাজ বাকী। বলিয়া সমস্ত বাগ্‌বিতণ্ডা বন্ধ করিয়া দিয়া মঞ্জুষা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

১০

জোর করিয়া তখনকার মত জীবানন্দের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে বলিয়াই সব সমস্যা মিটিয়া যাইতে পারে না। মঞ্জুষা অনেক কথাই বলিয়া গেল, তথাপি মৃন্ময় সম্বন্ধে তাহার মনের আসল ধারণাটা যেন ঠিক স্পষ্ট ভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই। যতই আশ্বাসবাণী সে শুনাক না কেন, জীবানন্দ অকুণ্ঠ চিত্তে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। মানুষ এমনি করিয়া বাঁচিতে পারে না। তাঁর মত বৃদ্ধেরই এই একঘেয়ে কর্ম্মহীন জীবনযাপনে বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে। আর মঞ্জুষা ত নিতান্তই ছেলেমানুষ। সম্মুখে তার সারাটা জীবন পড়িয়া রহিয়াছে। মঞ্জুষার যে বয়স তার একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম আছে। এই সব কথা তিনি ভুলিয়া যাইতে পারেন না—ভুলিয়া যাওয়া উচিতও নহে। অথচ এমনি দুর্ভাগ্য যে, তিনি নিজের স্থির সিদ্ধান্তেও অবিচল থাকিতে পারেন না। মঞ্জুষা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেই সব কেমন গোলমাল হইয়া যায়। নিজের কোন মতকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না। মঞ্জুষার ইচ্ছার কাছে হার মানিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া অগ্রসর হইয়া চলেন। তাঁর কাছে মঞ্জুষা খানিকটা দুর্বোধ্যই থাকিয়া যায়। কিন্তু এই বাহ্যিক আবরণের অন্তরালে মৃন্ময়ের স্মৃতিকে মঞ্জুষা সযত্নে লালন করিয়া চলিয়াছে। তার প্রতিদিনের চিন্তার সঙ্গে তা অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়াইয়া আছে—মনের কোণে ভাসিয়া ওঠে তার অতীত

জীবনের ছোট বড় অসংখ্য স্মৃতি। একটি কাল্পনিক সংসারের মনোরম একখানি ছবি তার মনে রং ধরাইয়া দেয়। চোখের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া ওঠে তাদের গ্রামের বাড়ী, বাগান, দেউড়ি যেখানে পাহারা দিত চোবে। আর ফ্রকপরা ছোট মেয়ে মঞ্জু নাচিয়া খেলিয়া বাড়ীময় ঘুরিয়া বেড়াইত। মঞ্জুষার একটি নিঃশ্বাস পড়িল।...কত বড় বিরাট পরিবর্ত্তন এই সামান্য কয়টা বৎসরের ব্যবধানে ঘটিয়া গেল।

সেদিনের মঞ্জু পদ্মার জলের ঢেউয়ের তালে তালে নৃত্য করিত, খিল খিল করিয়া হাসিতে পারিত। গাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া ছবির বই দেখিত। মৃন্ময় গাছে চড়িয়া তাহার জন্য পেয়ারা পাড়িত। মঞ্জু তার গায়ের উপর পেয়ারা ছুড়িয়া দিয়া বলিত, দুয়ো—সে ছিল একদিন। তার পর...

মঞ্জুষা সহসা যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। বহুক্ষণ সে কাজের অছিলায় তার বাবার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কাজের মধ্যে এই দীর্ঘ সময় সে শুধু বাজে চিন্তা করিয়াই কাটাইয়া দিয়াছে।...

বাজে চিন্তা—যে চিন্তার ছোঁয়া লাগিলেই আজও তার মনের দুই তীর প্লাবিত হইয়া যায় তার কি সত্যই কোন মূল্য নাই?

মঞ্জুষা নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে। কিন্তু সে দিনে আর আজিকের দিনে কত প্রভেদ।

মনে পড়ে, মৃন্ময়ের সামান্য একটা ইচ্ছাকে পূরণ করিবার নিমিত্ত সে নিজেকেও ভুলিয়া যাইত। নহিলে তার জন্য একটা জলপদ্ম তুলিতে গিয়া সে নিজের জীবনকে বিপন্ন করিতে পারিত না।

অপরিণত বয়সের সে ঘটনার কথা আলোচনা করিতে গিয়া একদিন মৃন্ময় বলিয়াছিল "কত সামান্য কারণে তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলে—আজ কিন্তু সে কথা ভাবতেও ভয় হয়। যুক্তি-বিচার বলে 'ছেলেমানুষী'। এই মুহূর্ত্তে ওর চেয়ে ঢের ঢের বড় কারণেও হয়ত এ কাজ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না।"

সেদিনের এই কথায় প্রকাশ্যে কোন প্রকার প্রতিবাদ না করিলেও মনে মনে মঞ্জুষা বিরক্ত হইয়াছিল এবং তার যুক্তিকে অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়া অন্তরে বেদনা বোধও করিয়াছিল। বহুদিন পরে আজ আবার সেই একটি কথা চিন্তা করিতে গিয়া মনে হইতেছে, যে, মৃন্ময় হয়ত একেবারে মিথ্যা বলে নাই। যুক্তি-বিচারটাই যদি আজ তাদের জীবনে বড় হইয়া না উঠিত তাহা হইলে এই সব চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজনই দেখা দিত না। অথচ সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় যে, সব জানিয়া বুঝিয়াও কোন একটা সহজ পথে সে অগ্রসর হইতে পারিল না। বিশ্লেষণের গোলোকধাঁধাঁয় পড়িয়া শুধু লক্ষ্য-হারার মত ঘুরিয়া মরিতেছে।

তার জীবনের বর্ত্তমান পরিণতির জন্য মঞ্জুষা কাহাকেও এক বিন্দু অনুযোগ দিতে চাহে না। শুধু সে নিজের ভাবে চলিতে পারিলেই সন্তুষ্ট—নূতন পথে কোন কিছু চিন্তা করিতেও আজ আর তার ভাল লাগে না অথচ তার বাবার ইঙ্গিতকেও এক কথায় উড়াইয়া দিতে পারে না।

দেয়াল-ঘড়ির পানে দৃষ্টি পড়িতেই সে চমকাইয়া উঠিল, এগারটা বাজিয়া গিয়াছে—আর এখনও কোন কাজেই সে হাত দেয় নাই। মঞ্জুষা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু নড়িতে চড়িতেও কেমন সে ক্লান্তি বোধ করিতে লাগিল। পুনরায় বসিবার উপক্রম করিতেই বামুনদিদি আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, বড়বাবুর খাওয়ার সময় হ'ল কিন্তু দিদিমণি।

মঞ্জুষা অকারণে একটু লজ্জিত হইল, বলিল, সব কাজেই আজ কেমন দেরী হয়ে যাচ্ছে। শরীরটে মোটেই ভাল নেই বামুনদিদি। কিন্তু তুমি যাও আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।

বামুনদিদি চলিয়া গেল এবং মঞ্জুষাকেও অল্পক্ষণ পরেই স্নানের ঘরে দেখা গেল।

বহুক্ষণ ধরিয়া মাথায় সে জলের ধারা দিল। স্নানান্তে মঞ্জুষা পূর্ব্বের চেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করিল।

কাপড় ছাড়িয়া চুল আঁচড়াইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই আবার ঘরে আসিয়া হাজির হইল, কিন্তু সেখানে দু'জনের খাবার ব্যবস্থা দেখিয়া মঞ্জুষা তার বাবাকে প্রশ্ন করিল, আর কেউ খাবে এ কথা আমায় ত তুমি আগে বল নি বাবা!

জীবানন্দ বেশ খানিকটা হাসিয়া বলিলেন, আর কাউকে বলা হয় নি বলেই তোমায় জানানো হয় নি।

মঞ্জুষা জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে দুটো আসনে কি হবে বাবা?

জীবানন্দ জবাব দিলেন, আজ থেকে তোমাকেও আমার কাছে বসে খেতে হবে মঞ্জু।

মঞ্জুষা মৃদু আপত্তি করিয়া বলিল, এ ব্যবস্থায় তোমার যে বড় কষ্ট হবে বাবা। মাঝখান থেকে তোমারও খাওয়া হবে না, আমারও নয়—

জীবানন্দ প্রতিবাদ জানাইলেন, এই ব্যবস্থাই চিরদিন ছিল যে মঞ্জু। মাঝের কয়েকটা বছর যা কিছু বদলে গিয়েছিল।

বস্তুতঃ মঞ্জুষার মা মারা যাবার পর হইতেই সে পূর্ব্ব ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই সে দেখিয়া আসিয়াছে তার মাকে বাবার খাওয়ার তদারক করিতে। বাপ এবং মেয়ে খাইতে বসিলে মা আসিয়া সেখানে বসিয়া থাকিতেন—এই খাওয়া এবং খাওয়ানোর মধ্যে যে একটি গভীর পরিতৃপ্তির যোগ ছিল একথা মঞ্জুষা বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করিতে শিখিয়াছে। মায়ের মৃত্যুর পরে সেবায় যত্নে সেই অভাবটা যথাসম্ভব পূরণ

করিবার চেষ্টা সে করিয়া আসিতেছে। জীবনন্দ কোন দিন আপত্তি করেন নাই, বরং খুশীমনেই মঞ্জুষার এই ব্যবস্থাকে মানিয়া লইয়াছেন। আজ অকস্মাৎ কেন যে তাঁর মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল ইহা সঠিক অনুমান করিতে না পারিলেও কি জানি কেন মঞ্জুষার মনটা ভরিয়া উঠিল। সে সহাস্যে কহিল, বেশ ত এতেই যদি তুমি খুশী হও না হয় দু'জনেই আমরা দু'জনকে এবার থেকে দেখব।

জীবানন্দ খুশীর সুরে বলিলেন, খুব ভাল কথা মা—অতি উত্তম প্রস্তাব।…

'মঞ্জুষা হাসিয়া কহিল, কথাটা মনে রেখো বাবা—নইলে আমি অনর্থ বাধাব।…

বামুনদিদির সহিত নিতাইকেও খাবার লইয়া আসিতে দেখা গেল।

মঞ্জুষা হাসিয়া বলিল, এবারে খেতে সুরু করো বাবা।

কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দ পুনরায় কহিয়া উঠিলেন, ভাবছিলাম দিনকয়েকের জন্য অন্য কোথাও ঘুরে আসি—তুমি কি বলো মা?

"বেশত বাবা," মঞ্জুষা বলিল, কিন্তু কোথায় যাবে কিছু ঠিক করেছ?

জীবানন্দ বলিলেন, একবার দেশের বাড়ীতে যাব ভাবছিলাম, ম্যানেজারবাবুও বার বার লিখছেন। দিন দিন নাকি গোলমাল শুধু বেড়েই চলেছে আর আমি একবার গিয়ে পড়লে নাকি অবস্থাটা কিছু আয়ত্তে আসবে।

মঞ্জুষা ব'লিল, তুমিও কি তাই বিশ্বাস করো বাবা?

জীবানন্দ বলিলেন, অবস্থাটা যতক্ষণ নিজের চোখে না দেখছি ততক্ষণ বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠে না। তবে আমার মনে হয়…

মঞ্জুষা হাত তুলিয়া বাধা দিল, না আর একটি কথাও নয় তুমি খাওয়া ফেলে শুধু কথাই বলে চলেছ। সে থামিল এবং অদূরে দণ্ডায়মানা বামুনদিদিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, খাসা হয়েছে মোচার ঘণ্টটি, বাবার জন্য আর খানিকটা নিয়ে এসো।

বামুনদিদি হাসিয়া প্রস্থান করিল।

খাওয়া দাওয়ার পরে জীবানন্দ পুনরায় একই প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন।

মঞ্জুষা বলিল, তুমি গেলেও খুব যে বেশী সুবিধে হবে এ আমার মনে হয় না বাবা। দেশ বিভাগের দরুন ব্যক্তিগত ভাবে আমরা অনেককিছু হারালেও আত্মসম্মানটুকু বজায় রাখতে পেরেছি, কিন্তু গ্রামে গেলে সেখান থেকে মানসম্ভ্রম নিয়ে ফিরে আসা বাবা সম্ভব হবে বলে তুমি কি বিশ্বাস করো? তা ছাড়া কিসের মোহে সেখানে ফিরে যাবে বাবা—বাস্তুভিটা আর সামান্য কিছু জমিজমা এই তো?…

একটু থামিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল, সেদিন তুমি আমার উপর রাগ করেই আমাদের সম্পত্তির একটা বড় অংশ বিক্রী করেছিলে। তোমার মত আমিও দুঃখ পেয়েছিলাম, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যে, অনেক বড় দুঃখের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই সেদিনের সে দুঃখটা ভগবান আমাদের দিয়েছিলেন।

জীবানন্দ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, এটা হ'ল যুক্তির কথা,। অস্বীকার করবার উপায় নেই, কিন্তু মন যে সব সময় যুক্তির ধার ধারে না, তাই তো ম্যানেজারের চিঠি পাবার পর থেকেই মনটা ব্যাকুল হয়ে আছে। তা ছাড়া বয়েসটা দিন্ দিন বেড়েই চলেছে কিনা—এর পরে হয় তো চোখে দেখার ইচ্ছেটাও পুর্ণ হবে না—

মঞ্জুষা নীরব।

জীবানন্দ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, মান অপমানের কথা মনেই আসে না মঞ্জু। গ্রামের সঙ্গে যে আমার নাড়ীর সম্বন্ধ মা—তাই থেকে থেকে মনটা কেঁদে ওঠে। এর পরে হয় তো আমার বলে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার অধিকারও আর থাকবে না।…

জীবানন্দের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মঞ্জুষা ঈষৎ চমকাইয়া উঠিল, বাধা দিয়া বলিল, এ সব কথা কেন বাবা? তোমাকে যেতে ত আমি মানা করছি না, শুধু বর্ত্তমান অবস্থার কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, নইলে আমারই কি যেতে ইচ্ছে হয় না মনে করো তুমি?

জীবানন্দ খুশী হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, তবে আমায় এত কথা বলছ কেন মঞ্জু—তা হলে আর দেরী করে কাজ নেই। কি বলো মা?

মঞ্জুষা তার বাবার কথার ধরনে হাসিয়া ফেলিল। বলিল, মনে হচ্ছে তোমার এখুনি রওনা হতেও আপত্তি নেই বাবা।

প্রশান্ত হাসিতে তাঁহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, কথাটা একেবারে মিথ্যে বলো নি তুমি।

মঞ্জুষা ভাবিল, ইহা এক প্রকার মন্দের ভাল হইল। মৃন্ময়কে কেন্দ্র করিয়া তাহার বাবা হঠাৎ যে ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন তাহাতে মঞ্জুষাও যেন মনে মনে অনেকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। অথচ ভবিষ্যতের একটি সহজ এবং সুন্দর পরিণতির কথা সে কল্পনায়ও আনিতে পারিতেছে না। তার চলার পথ নানা জটিলতায় আচ্ছন্ন। এই অন্ধকার পথে সে একলাই চলিতে চাহে, আর কাহাকেও টানিয়া আনিতে পারিবে না—মৃন্ময়কে ত কোনক্রমেই নয়। বাবা বোঝেন না। স্নেহ তাঁহাকে অন্ধ করিয়াছে। তাঁহার কাছে শুধু একটা কথাই আজ বড় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মঞ্জুষার কথা সম্পূর্ণ আলাদা। তার কাছে মৃন্ময় আজ প্রয়োজনের গণ্ডির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সে বাহিরেই থাকুক। কাছে

আসিয়া কোন কারণেও যদি সে অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে না পারে মঞ্জুষা তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্ত সহ্য করিতে পারিবে না। এইখানেই তার সবচেয়ে বড় দ্বিধা—মর্ম্মান্তিক ভয়। পাছে নান্টুর সহিত তাহার বিবাহ-প্রহসনটাই আবার নূতন করিয়া সমস্যার সৃষ্টি করিয়া বসে এইজন্যই মঞ্জুষা এমন সতর্কতার সহিত মৃন্ময়কে দূরে সরাইয়া দিয়াছে। তার অন্তরের কথা অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু এ সব কথা সে বলিবে কাহাকে।

মেয়ের চিন্তাকুল মুখের পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া জীবানন্দ এক সময় কহিয়া উঠিলেন, তোমার যদি কোন আপত্তি থাকে তা হলে না হয় যাওয়া বন্ধ করে দাও মা।

মঞ্জুষা একটু হাসিল। শান্ত কণ্ঠে বলিল, গ্রামে যাবার ইচ্ছে তোমার চেয়ে আমার কিছুমাত্র কম নয়—আমি অন্য কথা ভাবছিলাম, কিন্তু এবারে তুমি একটু বিশ্রাম নাও। বলিয়াই ধীরে ধীরে মঞ্জুষা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

প্রাবৃট্

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

মেঘে মেঘে তব দুন্দুভি বাজে
ঝঞ্ঝায় জয়-রব,
নদ-নদী পেলে উচ্ছল স্রোতে
পূর্ণতা-গৌরব।
এলো বিদ্যুতে বৃষ্টিতে নবঘনে—
নিত্যোৎসব নেত্রে শ্রবণে মনে,
ছুটে দিগন্তে বন-কুসুমের
দুরন্ত সৌরভ।

২

শীর্ণা শোচ্যা দীনা ধরণীর
একি পরিবর্ত্তন ?
কে এঁকেছে হেন আলোছায়া দিয়ে
রজত আলিম্পন ?
সব চঞ্চল উৎসুক উদ্দাম—
শোভন ভুবন নিবিড় সরস শ্যাম,
যত ঝঙ্কার, তত গুঞ্জন
গর্জ্জন নর্ত্তন !

৩

যুগে যুগে যারা নাচিল লইয়া
হেম-কুম্ভের ভার,
'জল-সই'বারে ঝঙ্কৃত হ'ল
যাদের অলঙ্কার,
'ঝুলনে' যাহারা যুগে যুগে খেলে দোল,
ফুল-হিন্দোলে বনভূমি উতরোল,
একসাথে আজ সমাগত যত
তারুণ্য দুর্ব্বার।

৪

অতীতে যাহারা নেচে গেয়ে গেল
মহাকাল-অঙ্গনে,
কেহ বেণু-বীণা, কেহ মৃদঙ্গ
পটহ ডমরু সনে,
নাচিল প্রভাসে গুজরাট গঞ্জামে,
'বঙ্কুবিহারী' প্রাঙ্গণে ব্রজধামে,
তারা যেন আজ করিছে নৃত্য
স্থলে জলে সমীরণে।

৫

মদির মধুর একি সজ্ঞাত
চলিয়াছে অবিরত ?
ভূতল গগন এক সাথে যেন
মধু ভুঞ্জনে রত ;
জীবন-মরণ হইতেছে বিনিময়—
আঘাতের কথা স্মরার যোগ্য নয়,
নবজীবনের সংবাদ দেয়
রসোল্লাসের ক্ষত।

৬

একি আগ্রহ, একি উল্লাস !
একি গো উন্মাদনা ?
লাভ-ক্ষতি আজ খতায় না কেহ
সংখ্যা যায় না গোনা ;
উলট-পালট মন্থন আলোড়ন
অমৃতময় করিতেছে এ ভুবন,
এও তপস্যা—ভয়াল সাধনা
এও এক উপাসনা।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী শিউল

শিউলের একটি রাস্তা। একপাশে স্ত্রীলোকেরা কাপড় ধইতেছে

ব্যাঙ্ককের একটি মন্দিরের দৃশ্য
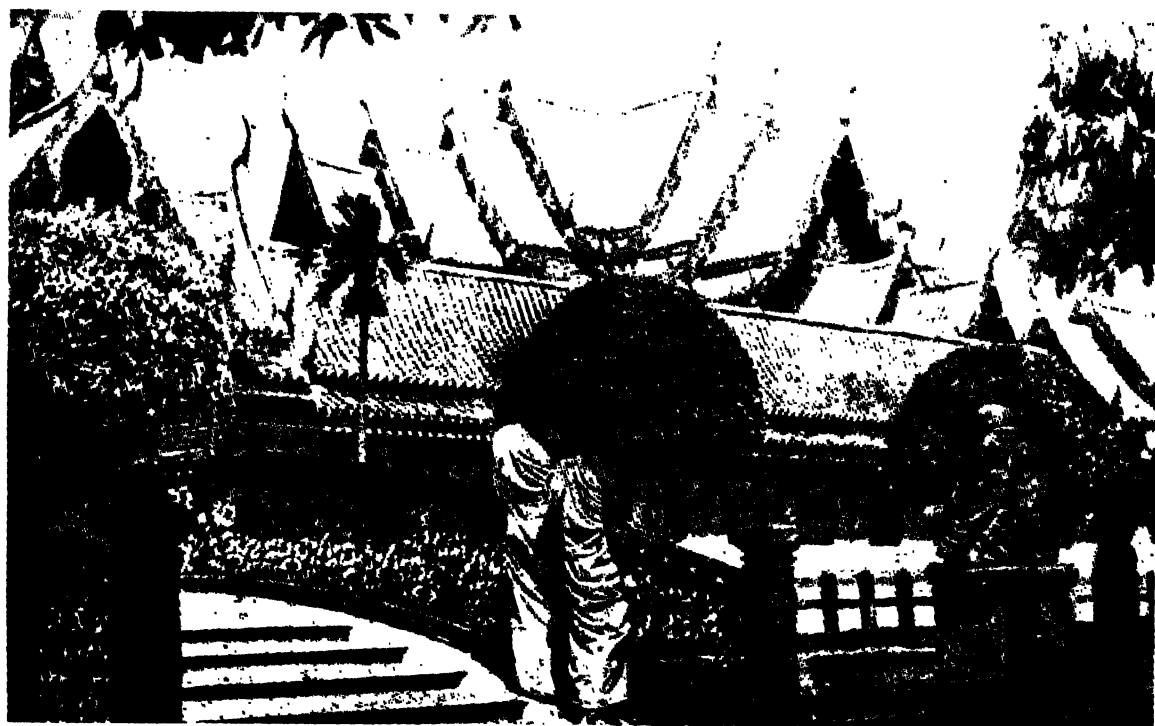
ব্যাঙ্কক-রাজপ্রাসাদের একাংশ

কোরিয়ার সঙ্কট

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ

বিগত ২৫শে জুন খবর পাওয়া গেল যে, উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করিয়াছে। এই আক্রমণ অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক নহে, যুদ্ধোত্তর যুগে উত্তর কোরিয়াকে লইয়া সোভিয়েট সাম্যবাদ এবং মার্কিন অর্থ-নৈতিক সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে টানাহেঁচড়া চলিতেছে। এই দুই বিরোধী আদর্শের সজ্ঘাত যে এক দিন সশস্ত্র শক্তি-পরীক্ষায় আত্মপ্রকাশ করিবে বহু পূর্ব্বেই তাহা বুঝা গিয়াছিল।

এশিয়া মহাদেশের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ এবং ন্যূনাধিক ২০০টি দ্বীপ লইয়া কোরিয়া গঠিত। কোরিয়াবাসী স্বদেশকে সাধারণতঃ 'চোজেন' (Chosen) বা প্রত্যুষের প্রশান্তি আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকে। কোরিয়ার তট-রেখা ১৭৪০ মাইল দীর্ঘ। ইহার আয়তন ৮৬,০০০ বর্গ মাইল। দক্ষিণে টুমেন ও ইয়ালু নদী, পূর্ব্বে জাপান-সাগর; দক্ষিণে কোরিয়া-প্রণালী এবং পশ্চিমে ইয়ালু নদী ও পীত সাগর ইহার সীমা-নির্দ্দেশ করিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে ৬০ বৎসরের মধ্যে কোরিয়াকে কেন্দ্র করিয়া সুদূর প্রাচ্যে দুইটি বড় বড় যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথমটি ১৮৯৪-৯৫ সালে সঙ্ঘটিত চীন-জাপান যুদ্ধ এবং দ্বিতীয়টি ১৯০৪-৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধ। বৎসরের ৯ মাস কাল কোরিয়ার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ। তিন মাস স্থায়ী বর্ষাঋতুতে গ্রীষ্ম এবং আর্দ্রতার আধিক্য অনুভূত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে অল্পবিস্তর ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। শৈত্যাধিক্যের জন্য কোরিয়ার উত্তরাঞ্চল অপেক্ষাকৃত জনবিরল। দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চল তুলনায় অধিকতর সমৃদ্ধ এবং জনবহুল। কৃষিকার্য্য কোরিয়াবাসীর, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা।

কোরিয়ার অধিবাসিগণ সম্ভবতঃ মানবজাতির মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কোরিয়ান ভাষা তুরানীয় ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত। ইহাদিগের ভাষার ২৫টি বর্ণের মধ্যে ১১টি স্বরবর্ণ এবং ১৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ; চীনা বা জাপানীদের মত মুখাকৃতি বিশিষ্ট না হইলেও তাহাদের মতই কোরিয়ানদের কেশদাম ঋজু ও কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু টেরচা এবং গাত্রবর্ণ পীতাভ। ১৯৪২ সালে কোরিয়ার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ২৩,০০০,০০০।

রণ-নীতির দিক হইতে কোরিয়ার গুরুত্ব মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। মাঞ্চুরিয়া এবং জাপানের মধ্যে সংযোগ-সেতুস্বরূপ কোরিয়া যুগে যুগে সুদূর প্রাচ্যের রণাঙ্গনে পরিণত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত পুসান বন্দর জাপান হইতে মাত্র ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত। উত্তর-পশ্চিম উপকূল হইতে ভ্লাডিভোষ্টকের দূরত্ব ১০০ মাইলের অধিক নহে।

কোরিয়ার ইতিহাসের একটি স্বকীয় রূপ আছে। অতীতে বার বার দেখা গিয়াছে যে, ক্ষুদ্র কোরিয়া অল্পদিন স্থায়ী স্বাধীনতার পর শক্তিমান ও বৃহৎ দুইটি রাষ্ট্রের স্বার্থের সজ্ঘাত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে স্বাধীনতা-ভ্রষ্ট হইয়াছে। খ্রীষ্টোত্তর যুগের প্রথম দিকে কোরিয়া কয়েক শতাব্দীকাল চীনের হান বংশীয় সম্রাটদের অধীন ছিল। এই পরাধীনতার ফলে কোরিয়ার মঙ্গলই হইয়াছিল। চীনই কোরিয়াতে প্রথম সভ্যতার বীজ বপন করে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কোরিয়া সুদূর প্রাচ্যে সাহিত্য-চর্চ্চার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। এই যুগেই বৌদ্ধধর্ম্ম, চৈনিক সাহিত্য এবং নীতিশাস্ত্র কোরিয়া হইতে জাপানে প্রচারিত হইয়াছিল। হান সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর কোরিয়া চীনের হস্তচ্যুত হইয়া সাইবেরিয়ার তৃণভূমি অঞ্চল হইতে আগত বর্ব্বর জাতিসমূহের করতলগত হয়। কোরিয়ার আদিম অধিবাসী এবং এই নবাগত জাতিসমূহের সংমিশ্রণে কোরাই জাতির উৎপত্তি হয় এবং কালক্রমে উত্তর কোরিয়া কোরাই দেশ নামে অভিহিত হইতে থাকে। কোরাই জাতির নামানুসারে সমগ্র কোরিয়াই এখন উক্ত নামে পরিচিত হইয়াছে। পূর্ব্ব মাঞ্চুরিয়া এই সময় কোরাই-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। প্রায় এই সময়েই অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোরিয়াতে দুইটি ছোট ছোট রাজ্য স্থাপিত হয়। ৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনের টাং বংশীয় সম্রাটগণ বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের পর কোরাই অধিকার করেন। সুই বংশীয় সম্রাটগণ ইহার পূর্ব্বে বার বার কোরিয়া জয়ের চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। ১০ম শতাব্দীতে টাং রাজবংশের পতনের পর কোরাই রাজ্য স্বাধীনতা লাভ করে। এই সময় পূর্ব্ব মাঞ্চুরিয়া কোরাই হইতে পৃথক হইয়া গেল। ইহার পর কোরিয়া আর কোন দিনই প্রত্যক্ষভাবে চীনের শাসনাধীনে না আসিলেও চীন সাম্রাজ্য যখনই শক্তিশালী হইয়াছে তখনই উহা চীনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া কর প্রদানে বাধ্য হইয়াছে। ইহার পর নূতন আর এক বিপদের আশঙ্কা দেখা দিল। জাপানের লোলুপ দৃষ্টি কোরিয়ার প্রতি আকৃষ্ট

হইল। ১৫৯২ সালে জাপানের রাজপ্রতিনিধি হিডেয়োসির আদেশে কোরিয়া আক্রান্ত হয়। মিং রাজবংশ তখন চীনের ভাগ্যবিধাতা। তখন মিং রাজের সৈন্যবাহিনী কোরিয়ার সাহায্যে অগ্রসর হইল। জাপসৈন্য কোরিয়ার রাজধানী শিউল এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান নগর অধিকার করিয়া লইল। তাহারা কোন কোন নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়া দিল। বহু কোরিয়ান শিল্পসম্ভার জাপানীরা স্বদেশে লইয়া গেল। এই যুদ্ধ ছয় বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে হিডেয়োসির মৃত্যুর পর জাপানে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় জাপ-সৈন্য স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল। মাঞ্চুবংশীয় সম্রাট-গণের শাসনকালে কোরিয়া নিয়মিতভাবে চীনকে কর দিয়াছে। এই যুগে কোরিয়ার শান্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। এই নিরবচ্ছিন্ন শান্তি এবং বহির্জগতের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্কহীনতার জন্যই সর্ব্বপ্রথম যে সমস্ত বিদেশী ভ্রমণকারী কোরিয়াতে আগমন করেন তাঁহারা ইহাকে 'হার্মিট কিংডম' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধে কোরিয়ার সহিত ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। কোরিয়াতে মার্কিন ভাগ্যান্বেষী এবং ফরাসী ধর্ম্মপ্রচারকগণ নিহত হইয়াছেন এই ওজুহাতে ১৮৬৬, ১৮৬৭ এবং ১৮৭১ সালে ফরাসী ও মার্কিন সৈন্য কোরিয়া আক্রমণ করে। যথেষ্ট লোকক্ষয় হইলেও এই সমস্ত অভিযানে কোন স্থায়ী সুফল হয় নাই। এসকল অভিযানের পূর্ব্বে ১৮৬০ সালে চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উসুরি প্রদেশ রাশিয়ার হস্তগত হইয়াছিল। ফলে রুশ সাম্রাজ্য কোরিয়ার উত্তর সীমান্তে ইয়ালু নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহার পর কোরিয়াতে বৈদেশিকগণের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হয়। ১৮৮২ সালে চীন বাণিজ্য ও সীমান্ত সংক্রান্ত বিধান (Frontier and Trade Regulations) ঘোষণা করিল। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৩ সালে জার্ম্মানী, ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৮৮৪ সালে ইটালি ও রাশিয়া, ১৮৮৬ সালে ফ্রান্স এবং ১৮৯২ সালে অষ্ট্রিয়ার সহিত কোরিয়ার বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হইল। এই সময় জাপানের শ্যেনদৃষ্টি পুনরায় কোরিয়ার উপর পতিত হইল। ১৮৯৪-৯৫ সালের চীন-জাপান যুদ্ধের পর কোরিয়া হইতে চৈনিক প্রভাব উৎসাদিত হইয়া গেল। তাহার পর কোরিয়াকে কেন্দ্র করিয়া জাপান এবং রাশিয়ার মধ্যে মনোমালিন্যের সূচনা হয়। এই মনোমালিন্য ক্রমে প্রকাশ্য বিরোধ এবং অবশেষে সশস্ত্র সংগ্রামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ১৯০৪-৫ সালে সংঘটিত রুশ-জাপান যুদ্ধ কোরিয়া লইয়া এই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতি। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাপান জয়লাভ করিয়াছিল। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর কয়েক বৎসরের মধ্যে ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়া গ্রাস করিয়া তাহার ভাগ্যবিধাতার আসনে অধিষ্ঠিত হইল। কোরিয়ার স্বাধীনতা লুপ্ত হইল। কিন্তু কোরিয়াবাসীর হৃদয়ে স্বাধীনতা-স্পৃহার অনির্ব্বাণ অগ্নি-শিখা কোন দিনই নির্ব্বাপিত হয় নাই। ১৯১০ সালের পর স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত কোরিয়ানগণ বার বার বিভিন্ন অধিরাষ্ট্রীয় মহাসম্মেলনে কোরিয়ার স্বাধীনতার প্রস্তাব পেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সর্ব্বত্রই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

জাপ-শাসনের স্মৃতি কোরিয়ার নিকট মোটেই প্রীতিপ্রদ নহে। এইজন্যই কোরিয়াবাসী জাপানকে মোটেই সুনজরে দেখে না। কোরিয়া গ্রাস করিবার পর জাপান জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে কোরিয়ার বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য লোপ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। জাপ-শাসনে কোরিয়ার অর্থনৈতিক জীবন জাপানের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইত। জাপ-ভাষা কোরিয়ার রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হইয়াছিল। কোরিয়ান ভাষা এবং ইতিহাসের অধ্যয়ন অধ্যাপনা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও কোরিয়াতে জাপানের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই যুদ্ধ কোরিয়ার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন সৈন্য চেমুল্ পো বন্দরে অবতরণ করিয়া সমগ্র দক্ষিণ কোরিয়া অধিকার করিল। এদিকে রুশ-সৈন্য উত্তর দিক হইতে অগ্রসর হইয়া ৩৮° অক্ষাংশের উপর অবস্থিত কিন্‌কোতে উপস্থিত হইয়াছিল। এইখানে রুশ এবং মার্কিন সৈন্যের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়। পরে ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই ৩৮° অক্ষাংশ বরাবর কোরিয়াকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। উত্তরাংশ রুশ প্রভাবাধীন এবং দক্ষিণাংশ মার্কিন প্রভুত্বাধীন অঞ্চলে পরিণত হইল। কোরিয়াবাসী কোন দিনই এই কৃত্রিম বিভাগ সমর্থন করে নাই। তাহারা মনে প্রাণে ঐক্য এবং স্বাধীনতা কামনা করে। কিন্তু মার্কিন এবং রুশ নীতি ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব কোরিয়াকে এক হইতে দেয় নাই। যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়া উভয়েই চাহিয়াছে যে কোরিয়ায় একটি মাত্র রাষ্ট্র হোক। কিন্তু প্রত্যেকেরই ইচ্ছা যে এই রাষ্ট্র তাহার মনের মত গড়িয়া উঠুক। এই মনোভাবের জন্য উভয় পক্ষই নিজ নিজ এলাকায় স্ব-স্ব নীতি এবং আদর্শকে রূপায়িত করিতে যত্নবান্ হইয়াছে। ফলে উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সম্পর্ক দিনের পর দিন তিক্ত হইতে তিক্ততর হইয়া উঠিয়াছে।

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোতে মিত্র-শক্তিবর্গের এক সম্মেলনে একটি রুশ-মার্কিন কমিশনকে কোরিয়ার গণতান্ত্রিক দলগুলির সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া সমগ্র কোরিয়ার জন্য একটি গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। কোরিয়ার রাজনৈতিক দল এবং উপদলগুলির মধ্যে কোন্‌টি গণতান্ত্রিক আর কোন্‌টি গণতান্ত্রিক নহে সে সম্বন্ধে কমিশনের মার্কিন এবং রুশ সদস্যবৃন্দ একমত হইতে পারিলেন না। ইহার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র বিষয়টি রাষ্ট্রসঙ্ঘ তথা সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের বিবেচনার জন্য পেশ করিল। সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ্ রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটি কমিশনের তত্ত্বাবধানে সমগ্র কোরিয়ায় সাধারণ নির্ব্বাচনের সুপারিশ করিলেন। রাশিয়া আগাগোড়াই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও ১৯৪৭ সালের নবেম্বর মাসে চীন, ফ্রান্স, ভারত, কানাডা, সিরিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ইউক্রেন প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধি লইয়া কোরিয়া কমিশন গঠিত হইল। ভারতীয় প্রতিনিধি কে, পি, মেনন এই কমিশনের সভাপতি হন। রাশিয়া এই কমিশন বয়কট করিল, উত্তর কোরিয়া সরকার কমিশনকে নিজ এলাকায় প্রবেশ করিতে দিলেন না। ১৯৪৮ সালের মে মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্ব্বাচনে কোরিয়ান গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী দল জয়লাভ করিল। ডাঃ সিংম্যান রী-র নেতৃত্বাধীনে এই দল যে সরকার গঠন করিয়াছে তাহাই রাষ্ট্রসঙ্ঘ-অনুমোদিত কোরিয়া সাধারণতন্ত্র। ডাঃ সিংম্যান রী এই সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি। এই বৎসর ১২ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘ রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া হইতে সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লইতে অনুরোধ করিলেন। এক পক্ষের মধ্যেই রাশিয়া উত্তর কোরিয়া হইতে নিজ সৈন্যদল অপসারণের কথা ঘোষণা করিল। ইহার পূর্ব্বেই উত্তর কোরিয়ায় সোভিয়েট রাষ্ট্র-প্রভাবিত 'পিপল্‌স রিপাবলিক' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে মার্কিন সৈন্য দক্ষিণ কোরিয়া হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু একটি মার্কিন ট্রেনিং মিশন সেখানে থাকিয়া যায়। গত বৎসর রাশিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের (সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের) সাধারণ পরিষদের বৈঠকে কোরিয়া কমিশনকে বাতিল করিয়া দিয়া উত্তর কোরিয়া 'পিপল্‌স রিপাবলিক'কে অনুমোদন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। এই. প্রস্তাব ভোটে টিকে নাই।

উত্তর কোরিয়ার প্রকৃত অবস্থা যে কি সঠিক জানা দুঃসাধ্য। লৌহযবনিকার অন্তরালে সত্যই বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভের সাধনাই চলিতেছে, না নির্ম্মম নিপীড়নের তাণ্ডব সুরু হইয়াছে সব সময় তাহা যথাযথভাবে জানা সম্ভব নহে। তবে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত সংবাদ মিলাইয়া দেখিলে মনে হয়, কোরিয়ার সাধারণ নাগরিকেরা আজ যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগের তুলনায় উন্নতর অবস্থায় আছে।

বিখ্যাত সংবাদিক এণ্ড্রু রথ সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে সংক্ষেপে কোরিয়ার কথা আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, দক্ষিণ কোরিয়া আজ পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী। এই-জন্যই পুঁজিপতি দক্ষিণপন্থীদিগের সহিত বিত্তহীন বাম-পন্থীদিগের সজ্ঘর্ষ চলিতেছে। ডাঃ সিংম্যান রী-র গণ-তান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী দল চীনের ক্যুওমিণ্টাং দলের ন্যায় জমিদারদের স্বার্থরক্ষাকারী। গত বৎসর এই দলই ভূমি-সংক্রান্ত প্রগতিমূলক একটি আইনের প্রস্তাব ভোটের জোরে বাতিল করিয়া দিয়াছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই অতীতে জাপানের তাঁবেদারি করিয়া চরম দেশদ্রোহিতা করিয়াছেন। সেদিন পর্য্যন্তও প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী যুবকের দল শিউলের রাস্তায় মিছিল করিয়া টহল দিয়া বেড়াইত। চীনের ক্যুওমিণ্টাং দলের নীল কোর্ত্তাদের (Blue shirts) সহিত ইহাদিগের তুলনা করা চলে। জার্ম্মানীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং নাৎসী-বাদের উপাসক ডাঃ আন্-হো-স্যাঙ ডাঃ রী-র শিক্ষা-সচিব। তিনি স্বদেশে নাৎসী জার্ম্মানীর অনুরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে ২,০০০ শিক্ষাব্রতী পদচ্যুত হইয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ একটু বামপন্থী দলঘেঁষা ছিলেন এবং কাহারও কাহারও রাজনৈতিক মতবাদ সুনির্দ্দিষ্ট বা সুস্পষ্ট ছিল না। ডাঃ স্যাঙ আদেশ দিয়াছিলেন যে, কোরিয়াতে সরকারবিরোধী কোন সংবাদপত্রের স্থান হইবে না। দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্র এবং সমাজ-জীবন আজ দুর্নীতিতে পঙ্কিল। ডাঃ রী-র পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁহার শ্রম ও বাণিজ্য সচিব মিস্ লুইসা ইম্ কতকগুলি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান হইতে ৫০,০০০,০০০ কোরীয়ান মুদ্রা (প্রায় ৪৫,০০০ ডলার) চাঁদা আদায় করিয়াছিলেন। একটি তদন্ত কমিশনের বিবরণে প্রকাশ যে, নিজের পুন-র্নির্ব্বাচনের ব্যয় বাবদ ইনিই বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বহু অর্থ আদায় করিয়াছেন। দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক দলাদলি দক্ষিণ কোরিয়াকে চরম সঙ্কটের সম্মুখীন করিয়াছে। চণ্ডনীতি প্রয়োগে বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া রী-সরকার নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দক্ষিণ কোরিয়ার ১৪,০০০ নাগরিককে রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর

ইহাদের মধ্যে অনেককে হত্যা করা হইয়াছে। অথচ এই প্রতিক্রিয়াশীল রী-সরকারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দরদের সীমা নাই। গত বৎসর মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিন সরকার দক্ষিণ কোরিয়াকে ১২০,০০০,০০০ ডলার সাহায্য করিয়াছেন। এই বৎসরও দক্ষিণ কোরিয়ার ১০০,০০০, ০০০ ডলার আর্থিক সাহায্য পাওয়ার কথা। এই বৎসর জুন মাস পর্য্যন্ত রী-সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সামরিক সাহায্য বাবদ ১০,০০০,০০০ ডলার পাইয়াছেন। ইহা ব্যতীত, মার্কিন সৈন্য যখন দক্ষিণ কোরিয়া হইতে চলিয়া যায়, তাহাদের পরিত্যক্ত বহু অস্ত্রশস্ত্র এবং নানাবিধ সমরসম্ভার রী-সরকারের হাতে পড়িয়াছিল। কিন্তু সমস্তই দুর্নীতির অতলস্পর্শী গহ্বরে তলাইয়া গিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উত্তর কোরিয়াতে কি ঘটিতেছে সঠিক জানিবার উপায় নাই, তবে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ হইতে বুঝা যায় যে, উত্তর-কোরিয়া সরকার অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া বহুলাংশে সফলতা-লাভ করিয়াছেন। ১৯৪৬ সালে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্ব্বাচনের পর 'নর্থ কোরিয়ান পিপল্‌স রিপাবলিক' প্রতিষ্ঠিত হয়। কিম্ ইর সেন ইহার প্রধান মন্ত্রী। নব-গঠিত কোরিয়া-সরকার প্রথমেই প্রচলিত ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করিয়া কৃষককুলকে জমিদারের কবল হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন। উত্তর কোরিয়ার নূতন ভূমিস্বত্ব বিষয়ক আইনে কৃষককে জমির মালিকানা স্বত্ব দেওয়া হয় নাই। এইখানেই লাল চীনের ভূমিসংক্রান্ত আইনের সহিত উত্তর কোরিয়ার জমিবিষয়ক আইনের মৌলিক তফাৎ। ইহার পর প্রধান প্রধান শ্রম-শিল্প, যান-বাহন ও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা এবং ব্যাঙ্ক-গুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইল। শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য বহু আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। উত্তর কোরিয়ার কোন কারখানা বা আপিসে কর্ম্মীদিগকে দৈনিক ১০ ঘণ্টার বেশী খাটানো হয় না। বিপজ্জনক কর্ম্মে নিযুক্ত শ্রমিকদিগকে দৈনিক ৭ ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে হয় না। ১৪ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক শ্রমিকদিগকে দৈনিক ৫ ঘণ্টার অধিক কাজ করানো নিষিদ্ধ। ১৪ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে বালকবালিকাদিগকে শ্রমিকের কার্য্য করিতে দেওয়া হয় না। উত্তর কোরিয়ার সর্ব্বত্র নারী এবং পুরুষের অধিকারসাম্য স্বীকৃত হইয়াছে। সেখানকার গণ-পঞ্চায়েতগুলিতে মোট ১১,৫০৯ জন এবং জাতীয় মহাপরিষদে ৬৯ জন নারী-প্রতিনিধি আছেন। উত্তর কোরিয়ান সরকার শিক্ষাবিস্তার এবং জীবনযাত্রার সাধারণ মানের উন্নয়নের প্রতিও অবহিত। ইতিমধ্যেই একটি দ্বি-বার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়া বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছে।

উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সজ্ঘর্ষ যে অবশ্যম্ভাবী পূর্ব্বেই তাহা বুঝা গিয়াছিল। ১৯৪৯ সালের ২৬শে জুন সীমান্তে যে সজ্ঘর্ষ হয় কোরিয়া কমিশন তাহাকে উত্তর কোরিয়া কর্ত্তৃক দক্ষিণ কোরিয়ার উপর হামলা বলিয়া বর্ণনা করেন। বর্ত্তমান বৎসরে মার্চ্চ মাসে কমিশন যে বিবরণী দাখিল করেন তাহাতে ১৯৪৯ সালে ৩৯ বার এবং গত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ১৩ বার উত্তর কোরিয়া হইতে সীমান্তে হানা দেওয়ার বিবরণ জানানো হয়। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে কমিশনের এই বিবরণ এবং সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদোষ-দুষ্ট। উক্ত বিবরণীতে সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জকে একথাও জানানো হইয়াছিল যে—যে কোন সময় উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিতে পারে।

কোরিয়া কমিশন ত উত্তর কোরিয়ার ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্তু কোরিয়ায় প্রেরিত মার্কিণ সামরিক সাহায্য মিশনের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ব্রিগে-ডিয়ার জেনারেল রবার্টস্ ১৪ই জুলাই একটি সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করেন যে, দক্ষিণ কোরিয়া উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণের জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল এবং প্রধানতঃ সেই কারণেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তাহাকে জঙ্গী-বিমান, ট্যাঙ্ক এবং গুরুভার দূর পাল্লার কামান দেয় নাই। দক্ষিণ কোরিয়ার তরফ হইতে অবশ্য এই উক্তির প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সংবাদ পাইবামাত্র শক্তিপুঞ্জে নিরা-পত্তা পরিষদ ২৫শে জুনের অধিবেশনে উত্তর কোরিয়াকে অহেতুক আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাহাকে অবিলম্বে দক্ষিণ কোরিয়া হইতে সৈন্য সরাইয়া লইতে নির্দ্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ঘোষণা করিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদ কর্ত্তৃক কোরিয়ায় শান্তি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিবে। জেনারেল ম্যাক্ আর্থারকে অবিলম্বে কোরিয়ায় সামরিক সাহায্য প্রেরণ করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। কিন্তু রুশিয়ার সাহায্যপুষ্ট উত্তর কোরিয়া ইহাতে ভয় পাইল না বা প্রতি-নিবৃত্ত হইল না। দুই দিন পর ২৭শে জুন, নিরাপত্তা পরিষদ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমস্ত সদস্যকে দক্ষিণ কোরিয়াকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়ার সুপারিশ করিলেন।

উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদল রুশীয় সামরিক উপদেষ্টার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র হইতে বন্দুক, দূর-

পাল্লার কামান, ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য সমরসম্ভার পাইয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের জঙ্গী, বোমারু এবং পর্য্যবেক্ষণকারী বিমান, হাল্কা ট্যাঙ্ক এমন কি জাহাজও নাকি উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদলের প্রয়োজনে লাগিতেছে। যতটা জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, উত্তর কোরিয়া এ পর্য্যন্ত ৭০ হাজার সৈন্য যুদ্ধে নামাইয়াছে। তীব্র আক্রমণের মুখে দক্ষিণ কোরিয়ার রক্ষা-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইতে চলিয়াছে, উত্তর কোরিয়ার অগ্রগতি কিছুতেই ব্যাহত হইতেছে না। দক্ষিণ কোরিয়ার অর্দ্ধাংশেরও বেশী উত্তর কোরিয়ার করলিত হইয়াছে। দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল ত প্রথম ধাক্কাতেই হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। স্যুওন এবং টেজনের যুদ্ধকালীন অস্থায়ী রাজধানীও পরিত্যক্ত হইয়াছে। কুম্‌নদীর দক্ষিণ তীরে মার্কিণ রক্ষাব্যূহ ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

২৭শে জুন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ষ্টালিনকে অনুরোধ করেন যে তিনি যেন উত্তর কোরিয়াকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন; উত্তরে ষ্টালিন জানাইয়াছেন যে দক্ষিণ কোরিয়া সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া উত্তর কোরিয়া যুদ্ধে নামিয়াছে। সুতরাং যুদ্ধের জন্য দক্ষিণ কোরিয়াই দায়ী।

অনেকে মনে করেন যে, নিরাপত্তা পরিষদের ২৭শে জুনের প্রস্তাব বে-আইনী। সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ পরিষদের সনদের ২৭শ ধারা অনুযায়ী কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে নিরাপত্তা পরিষদের সমস্ত স্থায়ী সদস্যের অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং চীন ইহাদের প্রত্যেকের সম্মতি প্রয়োজন। কিন্তু রাশিয়া বহু দিন যাবৎ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে যোগদান করিতেছে না। এতদ্ব্যতীত জাতীয়তা-বাদী চীনের প্রতিনিধি প্রকৃত প্রস্তাবে চীনের প্রতিনিধি নহেন। অথচ এ পর্য্যন্ত লাল-চীনকে উক্ত পরিষদে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

এই পরিষদের সদস্যশ্রেণীভুক্ত ৫৯টি রাষ্ট্রই ২৭শে জুনের প্রস্তাব সম্বন্ধে নিজেদের মতামত জানাইয়াছে। রাশিয়া, উক্রেন, বায়েলো-রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, জেকোশ্লোভিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত মাত্র ৭টি রাষ্ট্র—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস্ এবং কুওমিণ্টাং চীন—নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী কোরিয়ার যুদ্ধে সামরিক সাহায্য-প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছে।

কোরিয়ার যুদ্ধ এক দিকে যেমন দুইটি পরস্পরবিরোধী আদর্শ ও মতবাদ এবং তাহাদের সমর্থকদিগের মধ্যে সংঘর্ষ অপর দিকে তেমনই আবার উৎপীড়িত মানবতার বৈদেশিক কর্ত্তৃত্বের নাগপাশ এবং স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পুঁজিপতিদের শোষণের হাত হইতে মুক্তিলাভের প্রয়াসের ফল। উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়া উভয়েই উপলক্ষ্য মাত্র। রাশিয়া এবং আমেরিকাই আসল কর্ত্তা। রাশিয়া আমেরিকাকে কোরিয়া হইতে একেবারে হটাইয়া দিতে চায়। পক্ষান্তরে যে ভাবেই হোক কোরিয়াতে টিকিয়া থাকা আমেরিকার পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই দিক হইতে বিচার করিলে কোরিয়ার যুদ্ধ সোভিয়েটবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সংঘর্ষের নবতম অধ্যায়। কিন্তু এই যুদ্ধের আর একটা দিকও আছে। দক্ষিণ কোরিয়ার জনসাধারণ যে স্বদেশে মার্কিণ কর্ত্তৃত্ব বা মার্কিণের তাঁবেদার সিংম্যান রী-র উপর সন্তুষ্ট নহে, উত্তর কোরিয়া-বাহিনীর অগ্রগতি হইতেই তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। আক্রান্ত দেশের জনগণের নৈতিক সমর্থন এবং অন্ততঃ কোন কোন ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত এরূপ অগ্রগতি সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন, কোরিয়ার যুদ্ধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তৃতীয় মহা-সমরের অগ্রসূচনা কিনা। এ প্রশ্নের উত্তর এখন দেওয়া সম্ভব নহে।

লৌকিক সংস্কৃতে বৈদিক শব্দ

অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য, এম-এ

বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত এক নয়। যিনি রামায়ণ-মহাভারতে পারদর্শী এবং মেঘদূত-শকুন্তলায় সুপ্রবিষ্ট এমন ব্যক্তির পক্ষেও ঋগ্বেদের আপ্রীসূক্ত বা যজুর্বেদের পাশুক মন্ত্র দুর্গম বোধ হইতে পারে। অতি প্রাচীন কালে পাণিনির সময়েই বৈদিক ভাষার বহু শব্দ লৌকিক সংস্কৃতে অচলিত বলিয়া গণ্য হইত। কালক্রমে উভয় ভাষার মধ্যে আরও অধিক ব্যবধান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এরূপ ব্যবধান সত্ত্বেও বেদের সহিত বেদোত্তর সাহিত্যের সূক্ষ্ম সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় নাই। ব্যাস-বাল্মীকি, ভাস-ভারবি, কালিদাস-ভবভূতি প্রভৃতি মহারথগণ নূতন পথের আশ্রয় লইলেও বৈদিক সংস্কৃতির খাত-চিহ্নে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থে নানা প্রসঙ্গে নানারূপ বৈদিক সংজ্ঞার প্রয়োগ পাওয়া যায়। এ সকল সংজ্ঞার সহিত পরিচয় না থাকিলে অনেক স্থলে মহাকবিদের রচনা অবোধ্য হইয়া উঠে। ইহা স্বাভাবিক। যদি কোন মৃদ্‌বিজ্ঞানী পদ্মাগর্ভের মৃত্তিকাবিশ্লেষণে নিযুক্ত হন, তবে তিনি বিজ্ঞানদৃষ্টি দিয়া অনুভব করেন যে, গোমুখীর স্বচ্ছ সলিলধারা হইতে পদ্মানদীর বিশাল জলরাশির দূরত্ব অনেকখানি হইলেও উহাদের প্রবাহ-সম্পর্ক অবিচ্ছেদেই বর্তমান রহিয়াছে। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, অনেক স্থলে নদীখাতের মৃৎপঙ্কের সহিত হিমালয়ের পাষাণ-রেণু ওতপ্রোত হইয়া মিশিয়া আছে। উপলকণার বৈশিষ্ট্য না বুঝিলে যেমন ঐ নদী-মৃত্তিকার প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয় না, তেমনই বৈদিক সংজ্ঞার জ্ঞান না থাকিলে স্থলবিশেষে লৌকিক সংস্কৃতের অর্থবোধ হয় না। উদাহরণস্বরূপ, রামায়ণ ও মহাভারতের অশ্বমেধ প্রসঙ্গ হইতে দুইটি স্থল উল্লেখ করিব।

রামায়ণে বৈদিক যজ্ঞ

নিঃসন্তান দশরথ পুত্রকামনায় পুত্রীয়েষ্টি করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। রামায়ণের বালকাণ্ডে (১২-১৪ সর্গ) এই যজ্ঞের বর্ণনা আছে। বিভিন্ন শ্রৌতসূত্রে অশ্বমেধের বিধান পাওয়া যায়। অশ্বমেধে কেবল অভিষিক্ত রাজারই অধিকার। সম্ভাব্যস্থলে রাজাকে পত্নীগণের সহিত এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইত। পূর্বে রাজাদের মধ্যে বহু বিবাহ চলিত ছিল। কদাচিৎ কোন রাজা রামচন্দ্রের মত এক পত্নীব্রত পালন করিয়াছেন। সেরূপ ক্ষেত্রে যজ্ঞকালে পত্নীসম্পর্কে অনুকল্প ব্যবস্থা চলিত। রামচন্দ্র সীতার প্রতিকৃতি লইয়া অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। অশ্বমেধের অনুষ্ঠানে চারি জন পত্নীর প্রয়োজন হয়। রাজা দশরথের পত্নীরা সংখ্যায় ছিলেন তিন শত পঞ্চাশ (অযোধ্যাকাণ্ড ৩৪, ১৩)।

অশ্বমেধ যজ্ঞে যথাবিধি অশ্বচ্ছেদনের পর চারি জন ঋত্বিক্ রাজার চারি পত্নীকে অশ্বের নিকট লইয়া যান। এই পত্নীগণের পারিভাষিক নাম মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তী ও পালাগলী (চতস্রো জায়া উপকৢপ্তা ভবন্তি মহিষী বাবাতা পরিবৃক্তা পালাগলী—শতপথব্রাহ্মণ ১৩, ৪, ১, ৮)। মহিষী প্রথমপরিণীতা পত্নী; সামাজিক মর্যাদায় ইনি প্রধানা। দ্বিতীয়া পত্নী বাবাতা; ইনি রাজার বল্লভা সুয়োরাণী। পরিবৃক্তী বা পরিবৃক্তা শব্দের ধাতুজ অর্থ পরিবর্জিতা; ইনি রাজার উপেক্ষিতা দুয়োরাণী। অপর পত্নী পালাগলী; ইনি আপন নামের সঙ্গে পিতৃকুলের হীনতার পরিচয় বহন করিয়া থাকেন। পালাগল শব্দের অর্থ দূত; পালাগলীর অর্থ—দূতপুত্রী। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার সঙ্গে দশরথের যেরূপ সম্পর্ক ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে, তাহাতে এই তিন পত্নী সম্বন্ধে যথাক্রমে 'মহিষী' 'বাবাতা' ও 'পরিবৃক্তী'র সংজ্ঞার্থগুলি বেশ খাটে। অবশিষ্ট তিন শত সাতচল্লিশ জন দশরথপত্নীর মধ্যে দুই-চারি জন অবশ্যই 'পালাগলী'র লক্ষণবিশিষ্ট ছিলেন। শাস্ত্রে এই যজ্ঞানুষ্ঠানের সহধর্মিণী রাজপত্নীদের যেরূপ পরিচয়-বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যে, রাজার বিভিন্ন শ্রেণীর পত্নীগণের প্রতিনিধিরূপে এই চারি জন যজ্ঞকর্মে যোগ দিবার অধিকার পাইতেন। এই পত্নীগণ অলঙ্কৃত ও স্বর্ণাভরণে আবৃত হইয়া শত শত অনুচরীর সহিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইতেন (পত্ন্যশ্চায়ন্ত্যলঙ্কৃতা নিষ্ক্রিণ্যো মহিষী বাবাতা পরিবৃক্তা পালাগলী সানুচর্যঃ শতেন শতেন—কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র ২০, ১, ১২)।

রামায়ণে (বালকাণ্ড ১৪, ৩৫) বর্ণনা আছে এইরূপ—মহিষী কৌশল্যা কৃপাণ দ্বারা তিন প্রহারে অশ্বচ্ছেদন করিলেন। অশ্ববধের পর—

> হোতাধ্বর্যুস্তথোদ্‌গাতা হয়েন সমযোজয়ন্।
> মহিষ্যা পরিবৃক্ত্যাথ বাবাতামপরাং তথা।

হোতা, অধ্বর্যু এবং উদ্‌গাতা মহিষী ও পরিবৃক্তীসহ বাবাতা ও অপরাকে অশ্বের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন।

শ্লোকের 'অপরা' শব্দে চতুর্থ পত্নী পালাগলীকে বুঝাইতেছে। কোন কোন টীকাকার পদটির যথার্থ ব্যাখ্যা

দিয়াছেন। তাঁহাদের টীকায় পাঠ আছে 'পালাকলী'। কিন্তু বৈজয়ন্তী অভিধানে উহাই 'ফালাকলী'রূপে পরিণত হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রামায়ণের বিভিন্ন ভাষার অনুবাদগ্রন্থে এই 'অপরা' পদটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে, সে কথা পরে বলিব।

রামায়ণ-শ্লোকে পাঠবিকৃতি

রামায়ণের মুদ্রিত সংস্করণগুলিতে সর্বত্র এই শ্লোকে পাঠ পাওয়া যায় 'পরিবৃত্ত্যা'। বৈদিক গ্রন্থে 'পরিবৃত্তী' নামে এক প্রকার অপুত্রা বা পতিপুত্রবর্জিতা নারীর উল্লেখ আছে তাহা সত্য। কিন্তু অশ্বমেধকালে দশরথের কোন পত্নীই পুত্রবতী ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার যজ্ঞে অপুত্রা পরিবৃত্তীর পৃথক গ্রহণের কোন সার্থকতা থাকে না। তাহা ছাড়া বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থে অশ্বমেধ সম্পর্কে পরিবৃক্তীর নাম আছে। রামায়ণের শ্লোকেও পরিবৃত্ত্যা স্থলে পরিবৃক্ত্যাই শুদ্ধ পাঠ।

এই শ্লোকটিতে আর কিছু পাঠবিকৃতি ঘটিয়াছে কিনা তাহাও বিবেচ্য। অশ্বমেধে ব্রহ্মা উদ্গাতা, হোতা ও অধ্বর্যু এই চারি জন ঋত্বিক্ মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তী ও পালাগলী এই চারি জন রাজপত্নীকে লইয়া নিহত অশ্বের নিকট গমন করেন। আলোচ্য শ্লোকে চারি জন পত্নীরই উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। অথচ ঋত্বিক্‌দের মধ্যে হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্গাতা এই তিন জনের মাত্র নাম আছে। ব্রহ্মার নামও থাকা উচিত ছিল। এই অনুচিত অতিক্রম লক্ষ্য করিয়া রামায়ণের একাধিক টীকাকার অনুমান করেন যে, শ্লোকস্থ 'তথা' শব্দ দ্বারা চতুর্থ ঋত্বিক্ ব্রহ্মা লক্ষিত হইয়াছেন বুঝিতে হইবে (তথাশব্দেন ব্রহ্মা চ—রামায়ণ-শিরোমণি। তথেতি অনুক্তসমুচ্চয়ার্থঃ। ব্রহ্মা চেত্যর্থঃ—রামায়ণভূষণ)। কিন্তু 'তথা' শব্দ দ্বারা ব্রহ্মাকে টানিয়া আনা কষ্টকল্পনা মাত্র। বাল্মীকির মূল পাঠে সব কয়জন ঋত্বিক্ ও রাজপত্নীরই স্পষ্ট উল্লেখ ছিল ইহা অসম্ভব নয়। কিরূপ পাঠে সকলের নামোল্লেখ সম্ভবপর হয় তাহা স্থির করা কঠিন। আরও এক কথা। অশ্বমেধে এক এক জন ঋত্বিকের সঙ্গে এক এক জন রাজপত্নীর কর্মানুষ্ঠান করিতে হইত। শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্রে (১৬, ৪, ১-৪) বিধান আছে যে, যজ্ঞশেষে ব্রহ্মা ও মহিষী, উদ্গাতা ও বাবাতা, হোতা ও পরিবৃক্তী এবং অধ্বর্যু ও পালাগলী এক জন আর এক জনের সহিত বাক্‌কলহ করিবেন। বাজসনেয়ি-সংহিতা (২৩,২২-৩১) এবং কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে ও (২০,১,১৮) ঋত্বিক্ ও রাজপত্নীদের পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তির কথা আছে। এই দুই গ্রন্থে পালাগলীর সহিত বাদপ্রতিবাদে অধ্বর্যু স্থলে ক্ষত্তার নাম পাওয়া যায়। ঋত্বিক্ ও রাজপত্নীদের মধ্যে যাঁহার সঙ্গে যাঁহার কর্মসম্বন্ধ, তাঁহাদের নাম রামায়ণে যথাক্রমে পর পর উল্লিখিত হইয়াছিল কিনা কে জানে? পুরাণ মহাভারতের মত রামায়ণের একখানি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত না হইলে শ্লোকটির প্রকৃত পাঠ নির্ণীত হইবে না।

রামায়ণ-শ্লোকের অনুবাদে ত্রুটি

আলোচ্য শ্লোকের যথাযথ ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ পূর্বে দিয়াছি। এখন রামায়ণের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অনুবাদগ্রন্থ হইতে বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, ঐ সকল গ্রন্থে শ্লোকটি সম্বন্ধে কত রকমের ভুল আছে।

বাংলা অনুবাদ—হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নকৃত (১৯২৬ সংবৎ) ৬৪ পৃষ্ঠা—

"হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্গাতৃগণ মহিষী এবং নৃপতির পরিবৃত্তি স্ত্রীর সহিত বাবাতাকে অশ্বের সহিত যোজনা করিলেন।*

বসুমতী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদও অনুরূপ (১৩১৭ সাল, ১১ পৃঃ)।

হিন্দী অনুবাদ—গোপালশর্মাকৃত (কাশী) ২৬ পৃঃ—

"তদনন্তর হোতা অধ্বর্যু ঔর উদ্গাতা ইন্ লোগোঁ নে রাজা কী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ঔর শূদ্রা ইন্ তীন জাতিকী স্ত্রিয়োঁ কা ঘোড়েসে সংযুক্ত কিয়া।"

ইংরেজী অনুবাদ—

M. N. Dutt (1892), Balakanda, p. 38—

"And the Hotas, and Adhvaryus and the Udgatas joined the King's Vavata along with his Mahishi and Parivriti.*"

*"The Kshatriya wife is called Mahishi the Vaishya wife Vavata and the Shudra wife Parivriti."

সকল অনুবাদেই শ্লোকস্থ 'অপরা' শব্দ বাদ পড়িয়াছে। গ্রিফিথের পদ্যানুবাদ বা কেরী ও মার্শম্যানের গদ্যানুবাদেও 'অপরা'র কোন ইংরেজী প্রতিশব্দ প্রদত্ত হয় নাই। এই 'অপরা' রাজার চতুর্থ পত্নী পালাগলী।

অনুবাদকেরা সকলেই স্থির করিয়াছেন যে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় রাজপত্নীগণ যথাক্রমে মহিষী, বাবাতা ও পরিবৃত্তি (ক্তি) নামে অভিহিত হইতেন। সায়নকৃত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যে ৩, ২২ এইরূপ উক্তি আছে—রাজ্ঞাং হি ত্রিবিধাঃ স্ত্রিয়ঃ। তত্রোত্তমজাতের্মহিষীতি নাম। মধ্যমজাতেবাবাতেতি। অধমজাতেঃ পরিবৃক্তিরিতি। রামায়ণের 'তিলক' টীকাকার সায়ণোক্ত মধ্যম জাতির অর্থ বুঝিয়াছেন বৈশ্য, কিন্তু শ্রৌতসূত্রে যেরূপ অর্থ পাওয়া যায়, তাহা পূর্বে দেখিয়াছি। লাট্যায়নশ্রৌতসূত্রে (৯, ১০, ১—২) স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, পত্নীগণের মধ্যে যিনি প্রিয়তমা সেই রাজকন্যা বাবাতা, আর অনাদৃতা পত্নীর নাম পরিবৃক্তি

* ক্ষত্রিয়া স্ত্রী মহিষী, বৈশ্যা বাবাতা ও শূদ্রা পরিবৃত্তি শব্দে কথিত হইয়া থাকে।

(যা পত্নীনাং প্রিয়তমা সা বাবাতা রাজপুত্রী। অনপচিতা পরিবৃক্তী)। শ্রৌত- সূত্রের উক্তির প্রামাণ্য অধিক।

দেখা যাইতেছে—আলোচিত রামায়ণের একটি শ্লোকে বৈদিক শব্দগুলির পাঠে, ব্যাখ্যায় ও অনুবাদে নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রবেশ করিয়াছে। মহাভারতেও অশ্বমেধ-সম্পর্কিত একটি শ্লোকের এইরূপ দুর্গতি দেখা যায়।

মহাভারতের শ্লোকে সন্দিগ্ধ পাঠ

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধকালে দ্রৌপদী যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে (৮৯, ২) এইরূপ বিবরণ আছে—

ততঃ সংজ্ঞপ্য তুরগং বিধিবদ্‌যাজকাস্তদা।
উপসংবেশয়ন্ রাজংস্ততস্তাং দ্রুপদাত্মজাম্।
কলাভিস্তিসৃভী রাজন্ যথাবিধি মনস্বিনীম্।

অনন্তর ঋত্বিক্‌গণ বিধান মত অশ্ব হনন করিয়া তিন কলাসহ মনস্বিনী দ্রৌপদীকে যথাবিধি অশ্বসমীপে শয়ন করাইলেন।

এ স্থলে শ্লোকস্থ 'কলা' শব্দের অর্থ বুঝা যায় না। শাস্ত্রে আছে অশ্বমেধযজ্ঞে তিন সপত্নীসহ রাজমহিষীকে নিহত (=সংজ্ঞপ্ত) অশ্বের নিকট যাইতে হয়। রামায়ণে দেখিয়াছি—বাবাতা, পরিবৃক্তী ও অপর এক সপত্নীর সহিত মহিষী কৌশল্যা অশ্বের নিকটে গিয়াছিলেন। মহাভারতের এই শ্লোকে মহিষী দ্রৌপদীর অশ্বসমীপে গমনই বর্ণিত হইতেছে। দ্রৌপদীও কি তিন সপত্নীসহ অশ্বের নিকট গিয়াছিলেন? তবে কি 'কলাভিঃ' অর্থ 'সপত্নীভিঃ' কিংবা 'রাজপত্নীভিঃ' হইবে? 'কলা' শব্দের সপত্নী অর্থ অভিধানে পাওয়া যায় না। এমনও হইতে পারে যে, কলার স্থানে পূর্বে অন্য কোন শব্দ ছিল, এখন পাঠবিকৃতি ঘটিয়াছে।

নীলকণ্ঠ-টীকার কল্পিত ব্যাখ্যা

টীকাকার নীলকণ্ঠ কলা শব্দের একপ্রকার অর্থ দিয়াছেন। কিন্তু নীলকণ্ঠের টীকা খুব প্রাচীন নয়, তাঁহার গৃহীত পাঠও সর্বত্র প্রামাণিক নয়। নীলকণ্ঠ এস্থলে টীকা করিয়াছেন—"কলাভিঃ কলনাভিঃ মন্ত্র-দ্রব্য-শ্রদ্ধাখ্যাভিঃ উপেতাং দ্রৌপদীম্।" এই টীকা অনুসারে 'তিন কলা'র অর্থ 'মন্ত্র, দ্রব্য ও শ্রদ্ধা'। কলা শব্দের এইরূপ অর্থ অপ্রসিদ্ধ। মূলে 'উপেতাং' পাঠও নাই, উহা নীলকণ্ঠ কল্পনা করিয়াছেন। নীলকণ্ঠব্যাখ্যার এত ত্রুটি সত্ত্বেও কলা শব্দের কোন যোগ্যতর অর্থ না পাইয়া অনুবাদকেরা ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদে এই ব্যাখ্যা মানিয়া লইয়াছেন।

সম্ভাবিত শুদ্ধ পাঠ

অশ্বমেধের শাস্ত্রীয় বিধান ও রামায়ণের অশ্বমেধবিবরণ আলোচনা করিয়া মনে হয় যে, নীলকণ্ঠের গৃহীত পাঠ, কল্পিত ব্যাখ্যা এবং তদনুযায়ী অনুবাদ সবই অমূলক। এই শ্লোকের প্রকৃত পাঠ কিরূপ ছিল তাহা হস্তলিখিত বিশুদ্ধ পুঁথি ও প্রাচীন টীকা প্রভৃতির সাহায্য ব্যতীত নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা দুঃসাহস মাত্র। তথাপি যেরূপ মনে হইতেছে তাহা প্রকাশ করিব। অনুমান হয়—শ্লোকের 'কলাভিঃ' স্থলে মহাভারতকার অন্য একটি তিন অক্ষরের সমস্বর পদ লিখিয়াছিলেন। সেই পদটির এমন কোন অর্থ ছিল, যাহাতে উহা দ্বারা রাজপত্নী, সপত্নী কিংবা স্ত্রী বুঝাইতে পারিত। অভিধানে একটি শব্দ পাওয়া যাইতেছে 'বশা'। 'বশা'র এক অর্থ স্ত্রী বা বধূ (স্ত্রী যোষিৎ ললনা যোষা বশা সীমন্তিনী বধূঃ —বৈজয়ন্তী)। ইহা অসম্ভব নয় যে, লেখক ও পাঠকের অনবধানতায় 'বশাভিঃ' পাঠ বিকৃত হইয়া 'কলাভিঃ' রূপে পরিণত হইয়াছে। তাহা হইলে মহাভারতের পংক্তিটির মূল পাঠ ছিল :

"বশাভিস্তিসৃভী রাজন্ যথাবিধি মনস্বিনীম্।"

এরূপ পাঠ স্বীকার করিলে শ্লোকটির প্রতিপাদ্য হয় এই যে, শাস্ত্রের বিধান অনুসারে ঋত্বিক্‌গণ মহিষী দ্রৌপদীকে অপর তিন স্ত্রীর সহিত (তিসৃভিঃ বশাভিঃ) অশ্বের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরে দ্রৌপদী ছাড়া আরও তিন জন স্ত্রীর অভাব ছিল না নিশ্চিত।

রামায়ণ ও মহাভারতের আশ্বমেধিক শ্লোকের আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক অনুষ্ঠান ও বৈদিক সংজ্ঞার সহিত পরিচয় না থাকিলে ঐ দুইখানি মহাগ্রন্থের সকল স্থল ব্যাখ্যা করা যায় না।
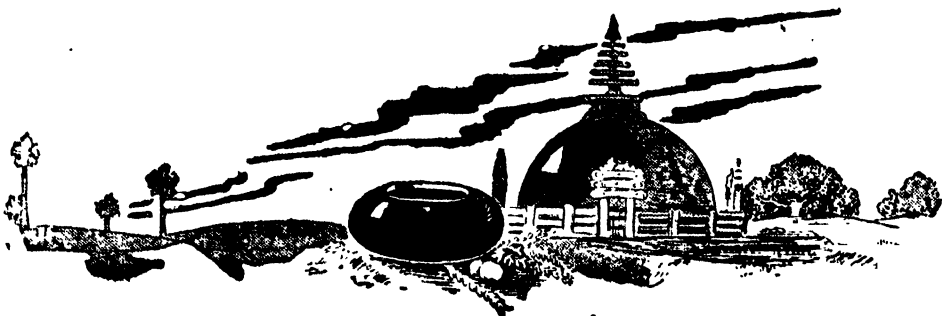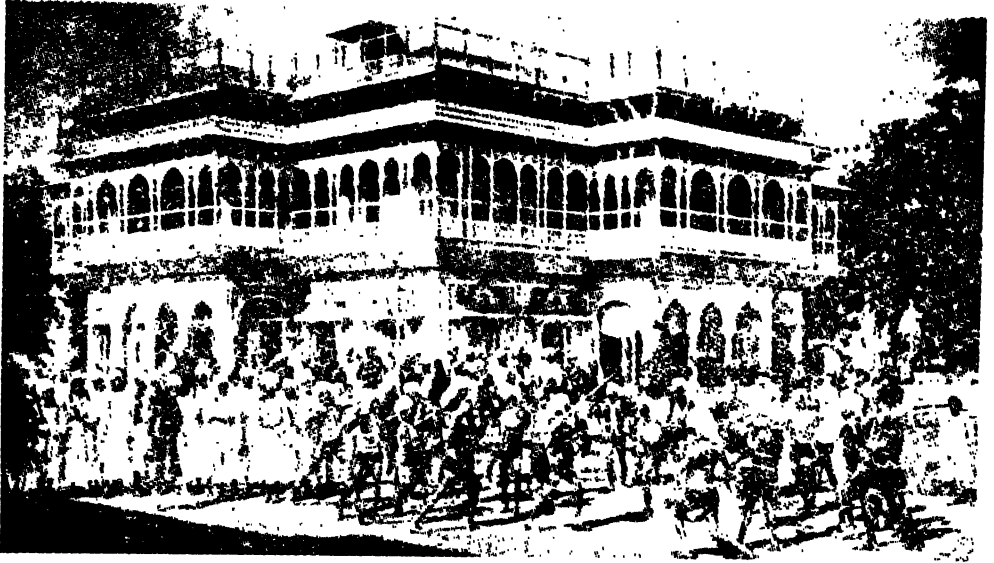
মুবারক মহল, জয়পুর। নাগা সৈন্যদের নৃত্য

গোবিন্দজীর মন্দির, জয়পুর

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

জয়পুরের গোবিনজী বা গোবিন্দজীর মন্দির বিখ্যাত। শৈলেনবাবুর প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, গোবিন্দজীর আরতি দেখিবার বটে। গোবিন্দজীর মন্দির দর্শনে চলিলাম। যেমন সেখানে লোকের ভিড় হয়, তেমনি ভক্তির প্রস্রবণ স্বতঃই নাকি সেখানে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। একটু আগে যাওয়াই ভাল। আমরা সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে (৮ই নবেম্বর ২২শে কার্ত্তিক) গোবিন্দজীর আরতি দর্শনমানসে গোবিন্দজীর মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। বাড়ীর সম্মুখেই 'বাস'। অল্প সময়ের মধ্যেই বাসে চড়িয়া চৌরাস্তার মোড়ে আসিলাম। নগরের বিপণিতে বিপণিতে আলোকোজ্জ্বল বিচিত্র শোভা। কত বিভিন্ন দেশের বিচিত্র পোশাক-পরিহিত ক্রেতা ও বিক্রেতার দল কেনাবেচা করিতেছে, তর্ক করিতেছে, বচসা করিতেছে। পায়ে চলার পথের পাশেও দোকানের সারি। সেখানেও ভিড় বড় কম নয়। মন্দিরে মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিতেছে। বড় বড় সব মন্দির, দেখিতে চমৎকার। রাজপথের বাড়ীগুলি সব লোহিত রঙের, মন্দিরগুলি ও বিরাট এবং বিচিত্র কারুকার্য্য শোভিত। আলোকোদ্ভাসিত পথে আমরা চারিজন চলিয়াছি। রাজপ্রাসাদের ও চৌরাস্তার মিনারচূড়ায় আলো জ্বলিতেছে। শুনিলাম, মহারাজা যখন জয়পুরে থাকেন তখন রাজপ্রাসাদের উচ্চ চূড়ায় প্রখর দীপ্তিমান্ আলো জ্বলে। পথে মাঝে মাঝে ভিখারী ও সন্ন্যাসীদের দেখা পাইতেছিলাম।

রাজপ্রাসাদের ভিতর শ্রীগোবিনজীর মন্দির। বিরাট তোরণ-পথে সেখানে যাইতে হয়। পথে পড়িল হাওয়া-মহল। সুন্দর অতি উচ্চ তলবিশিষ্ট অত্যুন্নত সৌধ যেন নভস্তল হইতে হাওয়াকে আকর্ষণ করিবার জন্য স্তরে স্তরে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মকালে রাণীরা এখানে হাওয়া খাইতে আসেন। অতি রমণীয় এই প্রাসাদ। হাওয়া-মহলের পাশ দিয়া গোবিন্দজীর মন্দিরের দিকে যাইবার তোরণের কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম। লক্ষ্য করিলাম যে, স্বাধীন ভারতে রাজস্থানের শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড এখনও অব্যাহত আছে। ভারতের যে-কোন শহরে বেড়াইতে যাও, দেখিতে পাইবে একই ধরণের সাজসরঞ্জাম, জিনিষপত্র, সেই সিঙ্গারের কল, সেই রেডিও সেট, সেই লাউড স্পীকার, দেশী ও বিদেশী ষ্টেশনারী জিনিষ—শিল্পদ্রব্যাদি, কাপড়-চোপড় আর বাটার জুতার দোকান শহরের পর শহর ছাইয়া ফেলিয়াছে। একই ছাঁচে যেন সবগুলি শহর ঢালা, যা কিছু তফাৎ স্থানীয় লোকজনের কথাবার্ত্তা, চালচলন এবং সামাজিক ক্রিয়া-পদ্ধতি এবং আলাপ-আলোচনায়।

ক্রমে আমরা গোবিন্দজীর তোরণ-দ্বার দিয়া অগ্রসর হইতে

লাগিলাম। বিরাট প্রাঙ্গণ। আশেপাশে নানা দেবমন্দির। তৃতীয় তোরণের পাশে দোকান, দোকানে গোবিন্দজীকে নিবেদন করিবার জন্ত ফুল ও মিষ্টান্ন কিনিতে পারা যায়। শ্রীমতী প্রভা কিছু কিনিলেন। আমরা এক পা দু' পা হাঁটিয়া চলিয়াছি, এমন সময় একজন বাঙালী ভদ্রলোক আসিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ত বাঙালী? আমি বলিলাম—তাত বুঝতেই পাচ্ছেন। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন—কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, বাড়ী ছিল তাঁর নোয়াখালি জেলায়। স্ত্রীপুত্র-পরিবার লইয়া ঘরসংসার করিতেন, ক্ষেত ভরা শস্য, গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, নারিকেল, সুপারি গাছের বাগান ছিল। এক দিন রাত্রিতে দাবানলের মত গ্রামে আগুন জ্বলিল। গৃহ ভস্মীভূত, স্ত্রীপুত্রকন্যা কতক পুড়িয়া মরিল, কতক যে কোথায় গেল—তাহার সন্ধানও মিলিল না। একটু থামিয়া ভদ্রলোক অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "কত খুঁজিলাম, কত কাঁদিলাম, কত পুলিস-দারোগা করিলাম, কিছুই লাভ হইল না। গ্রামের অনেকেরই অবস্থা এইরূপ হইয়াছে—কাহারও সঙ্গে দেখা নাই। তারপর উপান্তর না দেখিয়া লুঙ্গি পরিয়া মুসলমান সাজিয়া বাহির হইলাম, ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে আসিয়াছি। দু'বেলা কেন, চার বেলা প্রসাদ পাই, খাই দাই ঘুমাই হাসি কাঁদি—বেশ আছি মশাই, বেশ আছি। আচ্ছা মশাই, এই কি স্বাধীনতা।" আমি তাঁহাকে তাঁহার নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম—কিন্তু ভদ্রলোক হঠাৎ কোথায় যে অন্তর্দ্ধান হইলেন আধোআলো আধো-অন্ধকারে সেই ভিড়ের মধ্যে তাহার সন্ধান মিলিল না।

রাজবাড়ীর ভিতরকার সুন্দর বাগান ও সুপ্রশস্ত পথ দিয়া চলিয়া ক্রমে ক্রমে গোবিন্দজীর মন্দিরে আসিলাম। একটু দূরে দেখা গেল মুবারক মহল। এখানে উৎসব উপলক্ষ্যে নাগা সৈন্যদের নৃত্য হয়। সে নৃত্য পরম উপভোগ্য। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে মন্দিরে সবে আরতি আরম্ভ হইয়াছে। বিরাট আঙ্গিনা ও বারান্দায় তখনো তেমন জনসমাগম হয় নাই। ক্রমে দলে দলে লোকেরা আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রশস্ত আঙ্গিনা, বারান্দা লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। সকলেরই মুখে একটা প্রশান্ত ভাব। ধীরে ধীরে পর্দ্দা অপসারিত হইল—গোবিন্দজীর মূর্ত্তি আমাদের নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত হইল। দেখিলাম, দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। স্ত্রী ও পুরুষ অনেকে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। মধুর স্বরে কীর্ত্তন হইতেছে। পুরোহিতেরা বাঙালী ব্রাহ্মণ। তাঁহারা আমাদের সহিত, বিশেষ করিয়া শ্রীমতী প্রভার সহিত বেশ আলাপ জমাইয়া লইলেন।

গোবিন্দজীর শ্রীমূর্ত্তির সহিত অনেক অলৌকিক কাহিনী বিজড়িত আছে। একটি কাহিনী এই:—এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পত্নী ও বজ্রমাতা উষা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ করিবার জন্ত একে একে তিনটি মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। প্রথম যে মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইল, তাহা সুঠাম সুন্দর মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি কিন্তু আশানুরূপ হইল না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইহার সামান্যমাত্র সাদৃশ্য ছিল। শিল্পীর গড়া এই মূর্ত্তি মদনমোহন নামে খ্যাত। আবার দ্বিতীয় মূর্ত্তি গঠিত হইল, কিন্তু তাহাও শ্রীকৃষ্ণের আকৃতির অনুরূপ হইল না—বক্ষস্থলে সামান্য আভাসমাত্র ফুটিয়াছিল। এই মূর্ত্তির নাম হইল গোপীনাথ। সর্ব্বশেষে তৃতীয় মূর্ত্তি গঠিত হইল, এবার উষা দেবী মূর্ত্তি দেখিবামাত্র অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিলেন। এই মূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের—(উষাদেবীর শ্বশুরের) মুখের সাদৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল—এই তৃতীয় মূর্ত্তি গোবিন্দজী বা গোবিনজীর মূর্ত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। হিন্দুদের বিশ্বাস—যদি এই তিনটি মূর্ত্তি ভাল করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে গোপীনাথের হৃদয়, গোবিন্দজীর শ্রীমুখমণ্ডল, মদনমোহনের শ্রীচরণ একত্র দর্শন করা হয় এবং এই দর্শনের ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

হিন্দুর দেবতার অদৃষ্টেও লাঞ্ছনা ভোগ বড় কম হয় নাই। গজনীর অধিপতি মামুদ যেদিন ভারতবর্ষে আসিলেন, সেদিন হইতেই আরম্ভ হইল নানা অত্যাচার উৎপীড়ন। বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরের পরিণামও সকলেরই জানা আছে। বহু বৎসর পরে সেইরূপ গোবিন্দজীর মূর্ত্তিরও দুর্দ্দশার সময় উপস্থিত হইলে অন্যান্য মূর্ত্তির ন্যায় এই মূর্ত্তিও যমুনার তীরে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত হইল। ভূগর্ভ হইতে গোবিন্দজীর উদ্ধারকাহিনীও চিত্তাকর্ষক।

কথিত আছে, বাংলার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে তাঁহার অধীনে রূপ ও সনাতন নামে দুই ভাই উচ্চ রাজকার্য্য করিতেন। হোসেন শাহ সনাতনকে দবীরখাস্ (Private secretary) এবং রূপকে সাকরমল্লিক উপাধি দান করেন। রূপ ও সনাতন যশোহর জেলার ফতেহাবাদ নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহারা গৌড়ের নিকট রামকেলী গ্রামে বাস করিতেন। রামকেলীতে রূপ ও সনাতন যে দুইটি সরোবর খনন করিয়া-ছিলেন তাহা এখনও রূপসাগর ও সনাতনসাগর নামে পরিচিত। হোসেন শাহের এই দুই জন বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারী শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। যথা:

শ্রীরূপ সনাতন রামকেলী গ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেল আপন ভবনে।
দুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ রহিল॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ১৯শ পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শনলাভের পর হইতে রূপ ও সনাতনের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। উড়িষ্যা ও কামরূপ অভিযানে হিন্দুজাতির প্রতি অত্যাচারের নিদর্শন দেখিয়া ভ্রাতৃদ্বয় মুসলমান রাজার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজকার্য্যে সনাতনের অবহেলা দেখিয়া হোসেন শাহ তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন। সনাতন কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ প্রদান করিয়া মুক্তিলাভ করেন, পরিশেষে তিনি বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতে থাকেন।

শ্রীরূপ গোঁসাই গোবিন্দজীর মূর্ত্তি পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে জনশ্রুতি এইরূপ যে, শ্রীরূপ গোঁসাই বৃন্দাবনের একপ্রান্তে যমুনা-পুলিনে এক গভীর অরণ্যের পাশে একটি পর্ণকুটিরে বাস করিতেন। রূপ গোঁসাই প্রতিদিন রাত্রিতে দেখিতে পাইতেন একটি গাভী সেই অরণ্যে চলিয়া যায়। শ্রীরূপ স্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া এক দিন গভীর নিশীথে সেই গাভীর অনুসরণ করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন গাভীটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহার বাঁট হইতে অজস্রধারায় দুগ্ধ নিঃসৃত হইয়া নিম্নস্থ মৃত্তিকাকে প্লাবিত করিয়া দিতেছে। ঐ স্থানের ভূমিতলে শ্রীগোবিন্দজী প্রোথিত ছিলেন। রূপ গোঁসাই গোবিন্দজীর মূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি গোবিন্দজীর মূর্ত্তি একটি পর্ণকুটীরে স্থাপন করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাদশাহ কাবুলের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। মানসিংহও সে অভিযানে ছিলেন। কাবুল-সম্রাট্ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কথিত আছে, মহারাজা মানসিংহ কাবুল যুদ্ধে গিয়া সেখানে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। সে সময়ে তিনি মানত করেন, যদি রোগমুক্ত হন তাহা হইলে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রস্তরদ্বারা গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। গোবিন্দজীর কৃপায় মানসিংহ বিজয়ী হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে লোহিত প্রস্তর দিয়া এক বৃহৎ সুন্দর সু-উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহা গোবিন্দজীর নামে উৎসর্গ করেন। এই মন্দির এখনও মানমন্দির নামে বিখ্যাত। এই মন্দির স্থাপত্য-শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। বৃন্দাবনের সেই মন্দির দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে: মানমন্দিরের আকাশস্পর্শী

শ্রীশ্রীগোবিন্দজী, জয়পুর

চূড়ার উপর প্রত্যহ রাত্রিকালে এক অতি বৃহদাকার প্রদীপ জ্বলিত, ঐ প্রদীপটি প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য প্রত্যহ একমণ ঘৃত খরচ হইত। এক দিন আকবর বাদশাহের বেগমসাহেবা বৃন্দাবনের দিকে একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃশিখা দেখিতে পাইয়া বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতিদিন রাত্রিকালে আমি বৃন্দাবনের দিকে একটি স্থির জ্যোতিঃ দেখিতে পাই—নক্ষত্রের ন্যায় ইহার গতিবিধি নাই। কিসের জ্যোতিঃ বলিতে পারেন?"

বাদশাহ উত্তর করিলেন, আমি ত জানি না।"

তখন বেগম তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন: আপনি বিশাল ভারতের অধিপতি, অথচ আপনি রাজধানীর এত কাছে কোথায় ঐ আলোটি জ্বলিতেছে তাহার খবর রাখেন না? আশ্চর্য্য ত!

সেদিন হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, কোথাকার এই আলোকশিখা? চরেরা আসিয়া সংবাদ দিল, বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দিরের উপর এক অতি বৃহদাকার প্রদীপ জ্বলে, তারই দীপ্তি বেগমসাহেবা রাজপ্রাসাদ হইতে দেখিতে পান।

বাদশাহ আদেশ করিলেন : বৃন্দাবনের সমস্ত মন্দিরের চূড়া এবং যে সকল প্রস্তরমূর্ত্তি আছে সব ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেল।

সম্রাটের এই আদেশ শুনিবামাত্র জয়পুর-রাজ, কালবিলম্ব না করিয়া মদনমোহন, গোপীনাথ ও গোবিন্দজীর মূর্ত্তি জয়পুর-রাজ্যে স্থানান্তরিত করিলেন। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দজীর মূর্ত্তি বর্ত্তমান জয়পুর নগর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে "খোরির পাড়া" নামক গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দজীকে অম্বর (আমের ঘাটে) ঘাটে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। মহারাজ জয়সিংহ নিজ নামে জয়পুর নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া গোবিন্দজীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। আজ পর্য্যন্ত জয়পুর-রাজারা জয়পুর সংক্রান্ত কাগজপত্রে গোবিন্দজীর প্রতিনিধিরূপে নাম স্বাক্ষর করেন। প্রকৃতপক্ষে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই গোবিন্দজী মহারাজা জয়সিংহের প্রতিষ্ঠিত জয়পুরে আছেন। বর্ত্তমান গোবিন্দজীর মন্দির রাজপ্রাসাদের এলাকাভুক্ত ভূমির অন্তর্গত। এক সময়ে এই স্থান ছিল অরণ্যসঙ্কুল, রাজাদের মৃগয়া-ভূমি—তখন উহার নাম ছিল রাজমহল।

হিন্দুদের বিশ্বাস যে গোবিন্দজী দর্শনে অশেষ পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় গোবিন্দ নামের উল্লেখ আছে। অর্জ্জুন বলিতেছেন :

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ!
কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা
যেষামর্থে কাংক্ষিতং নো
রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।"

পাণ্ডবগীতায়ও গোবিন্দ নামের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। যথা :

গোবিন্দেতি সদা স্নানং গোবিন্দেতি সদা জপঃ।
গোবিন্দেতি সদা ধ্যানং সদা গোবিন্দ কীর্ত্তনম্॥

বিষ্ণুমূর্ত্তি চতুর্বিংশতি প্রকারের হইয়া থাকে—গোবিন্দ বিষ্ণুমূর্ত্তির অন্যতম নাম।

জয়পুরের মহারাজা প্রতাপ সিংহ (দ্বিতীয় মাধব সিংহজীর বৃদ্ধপ্রপিতামহ) জয়পুরী ভাষায় গোবিন্দজীর রূপ বর্ণনা করিয়া একটি গান রচনা করিয়াছিলেন—আমরা সেই গানটি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম। গানটির শব্দ ও সুরঝঙ্কার অতি চমৎকার :

"আজ মিলো মোহে গোবিন্দ প্যারো,
নেমন ভর রূপ নিহারো।
শ্যামলি সুরত মাধুরী মূরত,
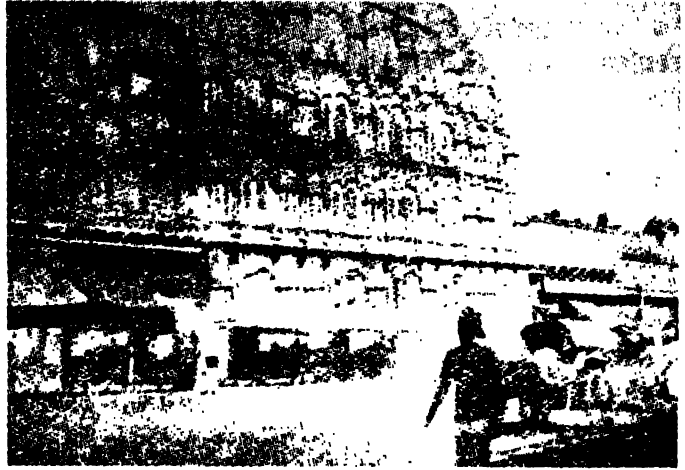
হাওয়া মহল

চঞ্চল উজ্জল জোবন মত বারো॥
আজ মিলো মোহে গোবিন্দ প্যারো।
নাভী গভীর উদর, রোমাবলী,
কুস্তুভ মণি মকবেশর বারো।
মোর মুকুট পীতাম্বর সোহে
শ্রুতিকুণ্ডল মকরাকৃতি বারো।
আজ মিলো মোহে গোবিন্দ প্যারো।
রাজা প্রতাপ সিংহ স্মরণ তিহারো
তন মন ধন চরণ পর বারো।
আজ মিলো মোহে গোবিন্দ প্যারো।

"আজি মিলিল গোবিন্দ রতন,
রূপ নেহারি ভরি ভরি দুনয়ন।
শ্যাম মুখ ভাতি, মধুর মূরতি
চঞ্চল সে অঙ্গে প্রমত্ত যৌবন!
নাভি সুগভীর, রোমরাজি ধীর—
হৃদয়ে কৌস্তভ নাসা আভরণ—
ময়ূর মুকুট, পীতাম্বর খুঁট
শ্রবণে কুণ্ডল মকর আকৃতি।
প্রতাপ ভূপতি স্মরণ সম্প্রতি
তনু মন ধনে চরণে প্রণতি।"

এইচ. এইচ. উইলসন গোবিন্দজীর উপাসনার দৃশ্যটি দেখিয়া লিখিয়াছেন :

"The maid or matron as she throws
Champoe or lotus, bell or rose
Prays for a parents' peace or wealth,
Prays for a child's success or health,

For a fond husband breathes a prayer,
For what of good on earth is given,
To lovely life, or hoped in heaven."

কবিতার ইহার বাংলা তাৎপর্য্য এই :—

"রাজপুত বালা সব হাতে লয়ে ফুল—
পদ্ম, চাঁপা, বেল, যুঁই গোলাপ অতুল
ই গোবিন্দ চরণতলে করি গো অর্পণ
মাগে কেহ মা বাপের শান্তি-সুখ ধন।
কেহ মাগে সন্তানের সম্পদ কুশল ;
কেহ বা স্বামীর তরে হৃদি শতদল—
সঁপি এক মন প্রাণে করিছে পূজন
পার্থিব সম্পদ কেহ অপার্থিব ধন।"*

* পুণ্য—১ম বর্ষ ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা—নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২১৭-১২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিরাট রাজপ্রাসাদের উত্তানমধ্যস্থিত গোবিন্দজীর মন্দিরের অঙ্গনে আমরা দাঁড়াইয়া মধুর অতি মধুর সঙ্গীত লহরীর সঙ্গে গোবিন্দজীর আরতি দর্শন করিতেছিলাম। নৃত্যের সুললিত ছন্দে, সুবাসিত ধূপ ধুনা অগুরুর গন্ধে চারিদিকের আনন্দপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে আপনা হইতেই ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হয়।

বৌমা, শ্রীমতী প্রভা, শৈলেন বাবু, প্রভৃতি পাণ্ডাদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন—আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলাম। জয়পুরের প্রায় সব দেব মন্দিরের পাণ্ডারাই বাঙালী। নানা কথা হইল—তাহার মধ্যে বাংলাদেশের কথাই বেশী। এ প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে হইতেছে যে, এই পাণ্ডাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া এখানে বাংলা ভাষা প্রচারের চেষ্টা করিলে কতকটা কাজ হইতে পারে।

ইঙ্গিত

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

উৎকণ্ঠিত রমাপতিবাবুর উদ্বেগ আর আশঙ্কার যেন অন্ত নেই। গতিশীল জীবন-কিনারায় চল্লিশটি বৎসর তাঁর কিছুদিন অতিক্রম হয়ে গেছে, তবু স্বাস্থ্যের জৌলস এতটুকু কম হয়ে যায় নি। একটু স্থূলকায়, গৌরবর্ণ চেহারা, চোখের উজ্জ্বল মণি দুটি আত্মবিশ্বাসের গরিমায় নিরন্তর ঝক্‌ঝক্ করে।

আত্মবিশ্বাসের গরিমা বই কি—

চা-বাগানের নগণ্য এক কেরাণীর পর্য্যায় থেকে তিনি নিজের কৃতিত্বের দাবিতে আজ বিশিষ্ট ধনপতির মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

ব্যবসায়ী-মহলে তাঁর খ্যাতি আর প্রতিপত্তির তুলনা হয় না। রঙের কারবার, কাঠের গোলা এমনই কত কিছুতে তাঁর ঐশ্বর্য্যের স্বাক্ষর আর প্রাচুর্য্যের সমারোহের পরিচয়। এ ছাড়া কোনও লিমিটেড কোম্পানীর তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কোনও ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, ইন্‌সিওরেন্সের কর্ণধার। মহানগরীতে তাঁর খানদশেক প্রাসাদোপম ভবন।

ঘণ্টা কয়েকের মানসিক উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার দুর্ব্বার প্রতিক্রিয়ায় এ হেন রমাপতিবাবুর মসৃণ চেহারার জৌলস হয়েছে বিশীর্ণ ম্লান—উজ্জ্বল চোখের দ্যুতি নিষ্প্রভ। কুঞ্চিত কপালের চিন্তারেখাগুলি স্ফীত হয়ে উঠেছে।

ঐশ্বর্য্যের একচ্ছত্র অধীশ্বরী কমলার সঙ্গে বুঝি এবার সন্তানের রক্ষয়িত্রী ষষ্ঠীদেবীর সংঘর্ষ বাধল? লক্ষ্মীদেবীর কায়েমী আসন নড়াই কি টলল?

"মাগো, সন্তানের কোন অপরাধ নিস নে মা—"

গতকাল রাত্রি বারোটা থেকে রমাপতিবাবুর শঙ্কিত বুকের সঙ্গোপনে ঝড় উঠেছে তুমুল আলোড়নে—দুশ্চিন্তার আর যেন অন্ত নেই। এবার কি সত্যি তাঁকে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার অর্চনা থেকে বঞ্চিত হতে হবে?

গতকাল রাত্রি বারোটার পর থেকে তাঁর স্ত্রীর প্রসব-বেদনা উঠেছে। অথচ সংসারে তাঁর মনোরমাই একমাত্র স্ত্রীলোক—লক্ষ্মীদেবীর অভ্যর্থনার আয়োজন—সাজসরঞ্জাম এবং অর্ঘ্য রচনার সমস্ত দায়িত্বই তার উপর নির্ভর করছে।

এ মহালয়ে প্রতি গৃহেই ধনের অধীশ্বরীর মহা আহ্বানের মহোৎসব, আত্মীয়-স্বজনকেও আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব হয় না, অথচ এই পরমলগ্নেই কি না—ষষ্ঠীর তরফ থেকে এল মনোরমার নির্মম আহ্বান?

উৎকণ্ঠিত রমাপতিবাবু চকিত চঞ্চল পদক্ষেপে ঘর ও বারান্দায় পায়চারি করতে করতে একবার বড় দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকালেন। "উঃ দশটা বেজে গেল, দিদি কি তবে আসবে না? কোন্ সকালে গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি—"

বড় রাস্তার প্রান্তে মোটরের বাঁশী বাজে, উৎকর্ণ রমাপতি আশায় উদগ্রীব হয়ে উঠেন। কিন্তু সে শব্দ মিলিয়ে যায় দূরে দূরান্তরে, রমাপতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার পায়চারি সুরু করেন।

বারান্দায় একধারে মনোরমার সূতিকাগার, থেকে থেকে

তার প্রসব-যন্ত্রণার একটা আর্ত্তস্বর ভেসে আসছে, গোঙানির শব্দটা রমাপতির সংশয়াকুল মর্ম্মমূলে যেন সুতীক্ষ্ণ শর বিদ্ধ করছে।

একটি নূতন মানুষের জন্মদান করতে পরিশ্রান্ত মনোরমা একটানা দশ ঘণ্টা অক্লান্ত যুদ্ধ করছে।

"উঃ আর পারলুম না—বড্ড কষ্ট—মাগো—"

শঙ্কিত রমাপতি ত্রস্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন পত্নীর রুদ্ধদ্বার আঁতুরঘরের সান্নিধ্যে, কবাটে মুখ রেখে কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—"মনু খুব কি কষ্ট হচ্ছে? ডাক্তারকে খবর দি, কি বলো?" মনোরমা নিরুত্তর। আবার শুনতে পেলেন রমাপতি প্রসব-যন্ত্রণার আর্ত্তরব। এবার ঘরের মধ্যে থেকে ধাত্রী বিমর্ষ মুখে বের হয়ে এল। চিন্তাক্লিষ্ট আবেদনে জানাল—"সাধারণ প্রসব হবার কোনও সম্ভাবনা নেই, অস্ত্রোপচার করতেই হবে।"

"উঃ!" মর্ম্মভেদ যন্ত্রণার একটা অব্যক্ত নিঃশ্বাস ফেলে রমাপতি আপিসঘরে এসে টেলিফোনের গাইড বুকের পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে বললেন—"এবারেও সেই অস্ত্রোপচার—"···

"হ্যালো কে, ডাঃ ভাদুড়ী? আজ্ঞে হাঁ্যা আমি রমাপতি।" রিসিভার কানে তুলে নিয়ে রমাপতি বলতে লাগলেন—"ওয়াইফের ডেলিভারী, পেসেন্টের কন্‌ডিসন্‌ সিরিয়স, নরম্যাল ডেলিভারী সম্ভব নয়, আপনি মিডওয়াইফারী ইন্‌স্‌ট্রমেন্টস্‌ সঙ্গে নিয়ে একটু তাড়াতাড়ি আসুন।"

"কি বললেন? হাঁ্যা এবারেও—"

"হাঁ্যা এবারেও—" রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আত্মগতভাবে আনমনা রমাপতি বললেন—"এবারেও অস্ত্রোপচার—" বুক মথিত করা দীর্ঘনিশ্বাসটা মনের সঙ্গোপনে চেপে নিতে হঠাৎ স্নায়ুতে একটা দুর্ব্বার উন্মাদনা জেগে উঠল। উন্মত্ত উত্তেজনায় গর্জ্জে উঠল তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠস্বর—"উঃ আমি তো একটা মাথা ভেঙেছিলুম, কত মাথা দিয়ে যে সে ঋণ শোধ করতে হবে তা ত জানি না—;"···এবারেও সার্জ্জেন আসবে, রমাপতির সন্তানের মাথাকে ক্রেনিওক্লাষ্টে একেবারে গুঁড়ো করে ফেলবে, টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে বের করবে। একবার নয়, দুইবার নয়, এই নিয়ে চারবার ওকে বীভৎস অধ্যায়ের মর্ম্মন্তুদ পটভূমিতে অবতরণ করতে হবে। কিন্তু—, কিন্তু রমাপতি তো মাত্র একটা মাথা ভেঙেছিল—উন্মত্ত পদক্ষেপে আবার রমাপতি সারা ঘরময় পায়চারি করে ঘুরতে লাগলেন।

এই সময় রমাপতির অগ্রজা সুধারাণী চিন্তাবিবর্ণ মুখে সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে উঠে এলেন।

হঠাৎ যেন মেঘপুঞ্জিত আকাশে চাঁদের উজ্জ্বল সমারোহ জাগল। দিদির পদশব্দে তাঁর দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে রমাপতির ক্লিষ্ট মুখ এমনই আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"যাক, দিদি তুমি এসে গেছ?" উৎফুল্ল রমাপতি দিদির পদধূলি নিয়ে প্রণাম করে মৃদু হেসে বললে—"ভাগ্যে তুমি এ সময়ে কোলকাতা এসেছিলে—তা না হলে আমার ভরাডুবি হ'ত।"

"আহা তাই হয় নাকি রে—" অনুজকে পরম স্নেহে আশীর্ব্বাদ করে দিদি বললেন—"তুই যে লক্ষ্মীর বরপুত্র, তোর বাড়ী লক্ষ্মীপুজো হবে না? সে কখনও কি সম্ভব? তুই বল না মা-লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ না থাকলে কি সামান্য কেরাণী থেকে কোটিপতি হবার সাধ্য কারও আছে?" ভক্তি-আপ্লুত সুধারাণী ধনভাণ্ডারের অধিষ্ঠাত্রীর উদ্দেশ্যে একটি আবেগ-উদ্বেলিত প্রণাম জানিয়ে আপনমনে বললেন, "মা লক্ষ্মী তোকে বাঁচিয়ে রাখুন, আমার বাবার বংশের মুখ আরও উজ্জ্বল কর তুই, আরও তোর গৌরব বৃদ্ধি হোক—"

এই সময়ে বাড়ীর বহুদিনকার পুরাতন ঝি এসে দিদিকে আদর-আপ্যায়ন জানিয়ে একটা কার্পেটের আসন বিছিয়ে দিতে দিতে বললে—"যাক বড়দি এসে গেছ? মাথা থেকে যেন বোঝা নেমে গেল, বউদির কাল থেকে বেদনা উঠেছে।"

"মা লক্ষ্মীই আমাকে টেনে আনলেন রে মালতী—মেয়েটার কপাল পুড়েছে মাসছয়েক হতে চলল—গত কয়েকদিন থেকে সে বায়না ধরেছে—চুপচাপ বসে সময় কাটাতে পারবে না, ম্যাট্রিকটা পাস করে নিয়ে মাষ্টারী করবে—তাই তাকে তার কাকার কাছে রাখতে এসেছিলুম, সন্ধ্যার পর ও কাকার বাড়ী পুজো সেরে এখানে আসবে।" দিদি মালতীকে আসন বিছিয়ে দিতে নিষেধ করে ত্রস্ত কণ্ঠে বললেন, "না রে এখন আর বসবো না, পুজোর জোগাড় করিগে, এগারোটা বাজতে চললো—একে তো দেরি করে ফেললুম—" দিদি একটু থেমে প্রশান্ত ভাবে বললেন—"এমন ভাগ্যি কয়জনের হয় বল্‌? নিজের সহোদর ভাইয়ের মোটর গাড়ীখানা পেয়েছিলুম—ধাঁ করে একবার গঙ্গায় ডুব দিয়ে এলুম। চল তুই আমার সঙ্গে, বউকে একবার দেখে পুজোর ঘরে গিয়ে ঢুকি—কোথায় কি আছে তুই আমাকে দেখিয়ে দিবি—কতদিন পর এলুম জানিস? বছরপাঁচেক তো হবেই।"

রমাপতি ততক্ষণে সিঁড়ির ধারে এগিয়ে গিয়ে বাজার সরকারকে বলছিলেন, "এবারে লক্ষ্মীপূজা হবার কোনই তো আশা ছিল না, তাই আর বাজার হাট করাই নি—ভাগ্যে দিদি কোলকাতা এসেছিল, এবার আপনি দিদির কাছে বসে ফর্দ্দ লিখে নিয়ে বাজার করে আনুন। তালের কোঁপল ঘরে আছে কি না খবর করবেন—তা না হলে কিনে আনবেন—চিঁড়ে, মুড়ি, তালের কোঁপল, নারকোলকোরা মায়ের পরম প্রিয় উপচার কিনা—"

এই সময় গাড়ীবারান্দার নীচে ডাঃ ভাদুড়ীর পরিচিত

গাম্ভীর্য্য বেড়ে উঠল—রমাপতির বিবর্ণ মুখে কালো ছায়া ঘনীভূত হয়ে নামল, বুকের দ্রুত স্পন্দনে গভীর শঙ্কা জাগল। আবার—আবার সেই বিকৃত বীভৎস অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি—একবার নয়, এই নিয়ে চতুর্থবার। ডাক্তার ভাদুড়ী মনোরমার গর্ভের সন্তানকে যন্ত্রের নির্ম্মম পেষণে টুকরো টুকরো করে বের করবে। কিন্তু রমাপতি যে একটা মানুষের মাথা নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙেছিল? আর কত মাথা দিয়ে রমাপতিকে সে ঋণ শোধ করতে হবে—এর উত্তর কি কেউ তাকে দিতে পারবে?

* * * *

রমাপতির পূজা-কক্ষখানি অজস্র সমারোহে শুচিশুভ্র হয়ে উঠেছে। থরে থরে আয়োজন, ফুল বিল্বপত্র পদ্মফুলের প্রাচুর্য্য, অর্ঘ্যরচনার কত উপচার—ঝকঝকে পিতল আর তামার পাত্রে ফল মূল নৈবেদ্যের অপরূপ সজ্জা। সুধারাণী মনোরমার আঁতুড়ঘর থেকে বের হয়ে আর একবার স্নান সেরে ঘণ্টাদুয়েক আগে পূজা-কক্ষে এসে প্রবেশ করেছেন। ধনকুবেরের অধিষ্ঠাত্রী কমলার স্বাগত সম্ভাষণে একদিকে তাঁর উদ্যমী মন কর্ম্মচঞ্চল—আর একদিকে বেদনার প্রবাহে চোখ-দুটি ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু-উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে।

"আহা, বউটার কষ্টের আর সীমা নেই। ভাবতেও আর পারা যায় না—সারা দেহ থরথর করে কেঁপে ওঠে যেন। যন্ত্রপাতি নিয়ে ডাক্তার আর তার সহকারীরা ঘরে ঢুকলো—কি বীভৎস কাণ্ড—পেটের ছেলেটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে বের করবে। এই নিয়ে নাকি এই চারবার এমনই দুর্ঘটনার মুখোমুখি হতে হ'ল বৌকে—"

আল্পনা আঁকছিলেন সুধারাণী নিপুণ হাতে বুকের কম্পনে হাতের সুচারু ছন্দ বেঁকে গেল—উদাস মনটাকে সংযত করে নিয়ে পূজার গোছগাছ করতে একনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

এই সময় উজ্জ্বল হাসিমুখে মালতী এসে বললে—"বড়-দিদি, দাদাবাবু এবার মা-লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে মহারাজা না হয়ে যায় না—আজকের দিনের সাঁইত দেখ না—বাজার-সরকার এই টাকাটা দিল—একেবারে টকটকে রাঙা সিঁদুর মাখানো টাকা। কে জানে কি পাপে কার উপর মার অপ্রসন্ন দৃষ্টি পড়েছে, তার লক্ষ্মীর কৌটোর সিঁদুর-রাঙানো টাকা বের করে দিতে হয়েছে—কিন্তু আমাদের দাদার পয়মন্ত ভাগ্যি যে এবার রাজভাণ্ডার উপচে উঠবে—তা বেশ বোঝা যাচ্ছে—"

বাজারের ফেরত সিঁদুর-রাঙানো রূপালী টাকাটা মুগ্ধ বিস্ময়ের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে সুধারাণী মা-লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে ভক্তিগদগদ প্রাণের একটি প্রণাম জানিয়ে বললে—"আহা, ভাই আমার বেঁচে থাকুক—আরও উন্নতি হোক্—বংশের মুখ উজ্জ্বল হোক—" সুধারাণী সৌভাগ্যের স্বাক্ষর সিঁদুর-রাঙানো রৌপ্যমুদ্রাটি শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তরে কপালে স্পর্শ করালেন।

"দিদি"—

"কে রমা? আয় বোস—সত্যি ভাই তোর যে কত জন্মের তপস্যা ছিল, এই দেখ না আজকের এই পুণ্য লগ্নে কার ঘরের লক্ষ্মীর কৌটোর টাকা আমাদের ঘরে এসেছে, আমি এই টাকাটাই তোর কপালে ছুঁইয়ে মার ঝাঁপিতে রেখে দি—"

নিরুত্তর রমাপতি বিমর্ষ ম্লান মুখে পূজাকক্ষের এক প্রান্তে উপবেশন করলেন—সুধারাণী তাঁর চিন্তাক্লিষ্ট কপালে সিঁদুর রঞ্জিত রৌপ্যমুদ্রাটি ছুঁইয়ে নিয়ে ঝাঁপিতে রাখলেন।

"দিদি—"

"কি ভাই?" সুধারাণী জিজ্ঞেস করলেন—

"ডাক্তারের কাজ কি শেষ হ'ল? মনু কেমন আছে?

"হ্যাঁ দিদি—ডাক্তার তাঁর কাজ শেষ করে ফিরে গেলেন, ছেলের মাথাটা এবারেও একেবারে চুরমার করে ভেঙে ফেললেন—এবারের মত মাতৃত্বের স্বাদ থেকে মনোরমা মুক্তি পেয়েছে—আবার তাকে চোখ মেলে তাকাতে হয়েছে বৈকি—তা না হলে অভিশাপজর্জ্জর মাতৃত্বের নির্ম্মম কশাঘাতের সঙ্গে আবার পরিচিত হবে কে?"

ব্যথাতুর নিশ্বাসটি বুকের সঙ্গোপনে চেপে নিয়ে দিদি বললেন—"শোন্ রমা—বউয়ের গর্ভে কোনও দোষ লেগেছে বোধ হয়, তুই গ্রহ স্বস্ত্যেন কর—শান্তি আসবে—"

"শান্তি আসবে না—আসতে পারে না যে দিদি—" রমাপতি এবার উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বিকৃত কণ্ঠে বললেন—

"এ যে আমার নিজেরই কৃতকর্ম্মেরই পুরস্কার—কিন্তু আমি তো মাত্র একটা মাথা ভেঙেছিলুম—আরও কত, কত মাথা দিয়ে আমাকে সে ঋণ শোধ করতে হবে? কত? কত মাথা?" উত্তেজিত রমাপতির স্নায়ুগুলো থরথর করে কাঁপতে লাগল।

স্তম্ভিত দিদি নির্ব্বাক বিস্ময়ে বিহ্বলের মত কয়েক মুহূর্ত্ত অনুজের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন—চকিত দৃষ্টিতে তাঁর চঞ্চল ব্যাকুলতা ঝকমক করছিল।

"অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলে যে দিদি—" শ্লেষের কণ্ঠে রমাপতি বললেন—"আমার প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মীর এই প্রসন্ন দানের অন্তরালে কি যে পৈশাচিক রহস্য লুকিয়ে আছে সে ইতিহাস তোমাকে আজ শোনাব এইজন্যে যে, পাপের প্রায়শ্চিত্তনা হোক—অন্ততঃ বুকের বোঝা তো খানিকটা লাঘব করতে পারব—"

সুধারাণী চন্দন ঘষছিলেন—স্থগিত রেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অনুজের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

রমাপতির চোখের মণিতে বীভৎস স্মৃতির বিকৃত এক অধ্যায় ঝকমক করছিল।

বিদ্যুতের শিখা যেন ডম্বরুর তালে তালে গর্জ্জে উঠল এবার রমাপতির কণ্ঠনিনাদে—"শোন দিদি তবে—ডুয়ার্সের চা-বাগানে সামান্ত এক কেরাণী হয়ে গেলাম। দিনের পর দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করি আর বেতনের সামান্য টাকা কয়টা গুনে নিই আর তারই সঙ্গে সঙ্গে কেশিয়ারের ক্যাশ-বাক্সের উপর আমার একটা দুরন্ত লোভ জন্মায়। ক্রমে সে দুর্ব্বার লোভে আমি যেন উন্মাদ হয়ে উঠি। নিজেকে আর সংবরণ করতে পারি না। সে দিন দারোয়ানদের কি যেন উৎসব ছিল, সেই সুযোগটা আর ছাড়তে পারলুম না—সন্ধ্যের পর অত্যন্ত সন্তর্পণে ক্যাশ আপিসের মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করে রইলুম। চা-বাগানের ঘন অরণ্যের পটভূমিতে যখন গভীর রাত্রি নামল, সেই সময় আমি চৌকিদারের প্রকাণ্ড লাঠির কয়েকটা আঘাতে কেশিয়ার অমূল্যধন চাটুজ্জ্যের মাথাটা একেবারে গুঁড়ো করে ভেঙে ফেললুম—পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্যাশ···

বিবর্ণ মুখে দিদি বললেন—"চুপ চুপ আর বলিস নে—কে কোথা দিয়ে শুনে ফেলবে—"

"সে দিকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—কোনও আশঙ্কা নেই—সন্দেহের অবকাশ সমূলে বিনাশ করেছি। সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর দিন, অশ্রুসজল কণ্ঠে সাহেবকে জানালুম—"অমূল্য আমার মামাতো ভাই ছিল—তার মৃত্যুতে চা-বাগানে সব চেয়ে ক্ষতি আমার হয়েছে।" সাহেব আমার দুঃখে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করলেন।

দিদির মুখ এবার ঈষৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সান্ত্বনাসূচক কণ্ঠে তিনি বললেন—"পাপ ও পুণ্য দুই-ই মানুষ ঈশ্বরের নির্দ্দেশেই করে। তাই কি ন্যায় বা অন্যায় তা বিচার করবার কারও ক্ষমতা নেই। তবে তুই বউয়ের জন্যে একটা স্বস্ত্যেন করাস্।"

"স্বস্ত্যেন—হাঃ হাঃ হাঃ স্বস্ত্যেন—" "স্বস্ত্যেন কি অমূল্যধন চাটুজ্জ্যের নিষ্পেষিত মাথাটা আবার জোড়া লাগাতে পারবে?" বিকৃত কণ্ঠে একথা বলতে বলতে রমাপতি পূজাকক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

নির্ব্বাক সুধারাণীর শ্রুতিমূলে অনুজের কণ্ঠস্বরটা তীরের ফলার মত বিদ্ধ হতে লাগল—বারান্দার অপর প্রান্তের আঁতুড় ঘরের মধ্যে থেকে মনোরমার ব্যর্থ মাতৃত্বের অব্যক্ত আর্ত্তরবটা তাঁর মর্ম্মমূলে আঘাত হানল সজোরে।

* * * *

আসন্ন সন্ধ্যার গোধূলি লগ্নে ধনে অধিষ্ঠাত্রী কমলার পূজা-অনুষ্ঠান মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়ে গেল। মা-লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য গ্রহণ করতে সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সুধারাণী আর একবার সিঁদুররঞ্জিত রৌপ্য মুদ্রাটি কপালে স্পর্শ করে ভক্তি-উদ্বেলিত প্রাণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন—"সিঁদুর মাখানো টাকা আজকের দিনে ঘরে আসা পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ, আমার ভাইয়ের ধনধান্যের ভাণ্ডার মা-লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে আরও উপচে উঠুক—"

শ্লেষের বিদ্যুৎ যেন ঝলকে উঠল রমাপতির ঠোঁটের বক্র ভঙ্গিমায়—আত্মগত ভাবে তিনি বললেন—"ওই সিঁদুরে টাকা আরও ইঙ্গিত দিয়ে গেল, রমাপতির কৃতকর্ম্মের পুরস্কার এখনও ফুরোয় নি—ভাগ্য-ভাণ্ডারের আর এক দিকে জীবন ব্যর্থতার মর্ম্মন্তুদ অভিশাপে নিরন্তর রাঙা আগুনের শিখায় ঝলসে উঠবে আর ওর কৃতিত্বের গরিমাকে তিলে তিলে দগ্ধ করবে। কোথায় তার অবসান কেউ হয় তো জানে না।

একটি দিনের স্মৃতি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আসে
আজ মোর পাশে
একটি দিনের স্মৃতি বসন্ত সুবাসে!
বনান্তে বিকাশে যেন মেঘভাঙ্গা রৌদ্রকণাসম—
অবসরে ক্ষণ অভিসার শুক্লরাত্রে চেয়েছিল এ কুটিরে মম!
করে গেছে করাঘাত একান্ত আগ্রহে প্রতীক্ষায় প্রস্ফুট যৌবন!
অন্ধকারে চন্দ্রলেখাসম তার অঙ্গ-আভরণ
স্বর্ণ-আবরণে ছিল পরম বিস্ময়,
পরিচয়ে ব্যথার সঞ্চয়
উৎকণ্ঠিত ত্রাসে।

হায়!
দিনগুলি যায়
বিদায়ের দীর্ঘশ্বাসে জীবন-বেলায়
রিক্তরাহীসম দূরে যাত্রা মোর মহাতীর্থলোকে
হৃদয়ের পম্পাতীরে সে যেন শবরী, বল্মীকুঞ্জে অশ্রুক্লান্ত চোখে
আজো তার কল্পনার বৃন্তচ্যুত পুষ্পপুঞ্জ শুষ্কমৌন দৃষ্টিপাতে·
বিহ্বল হতাশে পাণ্ডু বেদনার রুদ্ধ প্রতিঘাতে!
কথা তার ভুলে যেতে আমি যে বিহ্বল
অতীত বেদীর অত্যুজ্জ্বল
ছন্দের লেখায়।

গুণ্ডারাজের প্রোৎসাহন

দাদা ধর্মাধিকারী

সম্প্রতি দেশ জুড়িয়া সর্বত্র কংগ্রেসের প্রাথমিক নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরিক নির্বাচনের সময়ে প্রায়ই ব্যক্তিগত প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা, দলপাকানো ও ঘোঁটবন্দী একান্ত বিশ্রীভাবে প্রকট হইয়া থাকে। যত লোক, যত ঘোঁট, তথা অপর যে কেহই নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় তাহারা সকলেই দেশহিতের তথা লোকসেবার দোহাই দিয়া থাকে। ক্ষমতাই যেন সেবার সাধন বা অবলম্বন এই জ্ঞানে সকলেই ক্ষমতা হস্তগত করিতে চাহে। প্রভুত্ব করার জন্য, অপর লোকের উপর ক্ষমতা পরিচালনা করার জন্য, ক্ষমতা তাহারা চাহে এ কথা কেহই খোলাখুলি বলে না। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই, যেখানে সেবা ত্যাগময় ও তপোময় সেখানে প্রতিযোগিতার, প্রতিদ্বন্দ্বিতার বা প্রভুত্বের ভাব প্রায়ই থাকে না। কিন্তু ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রভুত্বলিপ্সা হামেশা সেবাকাঙ্ক্ষার মায়াবী রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হয়। তাই সেখানে এত বেশী ঈর্ষা, প্রতিযোগিতা ও তিক্ততা দেখা দেয়। ইংরেজ-রাজত্বে আমাদের পক্ষে সর্বময় কর্তৃত্ব ও প্রকৃত ক্ষমতালাভের পথ রুদ্ধ ছিল। ইংরেজ আমলে শাসনক্ষমতা ছিল আমলা-তন্ত্রের হাতে। অতএব আমাদের প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ খুবই কম ছিল। অন্যায়ের প্রতিকারই আমাদের বেশীর ভাগ করিতে হইত। আর সেই প্রতি-কারের জন্য ব্যক্তিগত প্রাধান্যের আকাঙ্ক্ষাকেও তপ ও ত্যাগের শরণ লইতে হইত।

গণতন্ত্রের পক্ষে আশঙ্কা

অবস্থা আজ পুরাপুরি বদলাইয়া গিয়াছে। আমাদের হাতে আজ পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আসিয়াছে। কংগ্রেস পার্টি আজ ক্ষমতারূঢ়। ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য অন্য কোন দল অপেক্ষা এই দলে তাই আভ্যন্তরিক ঘোঁটবন্দী, ও দল পাকানো তথা ব্যক্তিগত প্রাধান্যলাভের আকাঙ্ক্ষা এত বেশী মাত্রায় দেখা দিয়াছে। ফল দাঁড়াইয়াছে এই : ক্ষমতালাভের জন্য যে-কোন সাধনের প্রয়োগ করিতে, প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করার জন্য যে-কোন উপায় অবলম্বন করিতে, ব্যক্তির, গোষ্ঠীর বা দলের বিবেকে আদৌ বাধে না—ন্যায়-অন্যায়ের সীমারেখা তাহারা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। নির্বাচনে সাফল্যলাভ তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। মানুষ যেখানে সফলতার ভিখারী সেখানে সাধন ও উপায়ের শুদ্ধতার দিকে তার আর কোনই লক্ষ্য থাকে না। কংগ্রেসের আভ্যন্তরিক নির্বাচনে অনেক স্থানে ইহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী লোক বা দল প্রতি-পক্ষের উপর ধোঁকাবাজি, গুণ্ডামি ও কুকার্য আরোপ করিতেছে। যখন দুই পক্ষ একে অন্যের উপর দোষারোপ করে তখন উভয় পক্ষই অংশতঃ সত্য আর অংশতঃ মিথ্যা বলে। সত্য কথা এই যে, এই নির্বাচন ব্যাপারে কোথাও কোথাও মিথ্যাচার ও গুণ্ডামির দ্বারা কার্য হাসিল করা হইয়াছে। কংগ্রেসকে যাহারা—প্রত্যক্ষভাবে হইলে ভাল, নয় তো অপ্রত্যক্ষভাবে গান্ধীজীর অহিংস প্রক্রিয়ার বাহক বানাইতে চাহে, তাহাদের মনে এই ব্যাপারে অত্যন্ত গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হইবে। কংগ্রেসের আভ্যন্তরিক নির্বাচনে প্রভুত্বপ্রয়াসী যদি গুণ্ডাগিরির সহায়তা লইতে থাকে তবে এই দেশে গণতন্ত্রের কল্যাণ নাই। নির্বাচন-কালে স্থানে স্থানে মারামারি, হাতাহাতি হইয়াছে। গালাগালি ও চোর-জুয়াচোর ইত্যাদির আরোপের ত অন্তই ছিল না। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিক ভাবনার ও ভয়ের কথা এই যে নির্বাচন-পরিচালকদেরও ভয় দেখানো হইয়াছে, তাহাদের উপরও বলপ্রয়োগ করা হইয়াছে।

শাসন ও অনুশাসন

এই প্রবৃত্তি আমাদের কোথায় লইয়া যাইবে? পরস্পরের প্রতি যাহারা দোষারোপ করিতেছে সেই বাদী-প্রতিবাদীদের কাহার কতটা দোষ তাহা প্রশ্ন নহে। আমাদের পক্ষে যাহা গভীর উদ্বেগের কথা—চিন্তা করিয়া দেখার বিষয়, তাহা এই যে শাসন ও অনুশাসন উভয়ই শিথিল হইয়া পড়িতেছে। যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইহা হইতে গণরাজের বিকাশ হওয়ার বদলে অবাধ গুণ্ডারাজের প্রতিষ্ঠা হওয়ার আশঙ্কাই অধিক। সর্বভারতীয় নেতাদের সতর্কতা ও ন্যায়নিষ্ঠা দ্বারাই মাত্র এই প্রবৃত্তি রোখা যাইবে না। কংগ্রেসের যাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় কর্মী তাহাদের মনে যদি প্রকৃত গণরাজ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা না থাকে, কংগ্রেসের মান-সম্ভ্রম রক্ষার প্রশ্ন যদি তাহাদের অনুক্ষণ ধ্যানের বিষয় না হয় তবে কংগ্রেস এদেশে প্রকৃত গণরাজ প্রতিষ্ঠার বাহন কিরূপে হইবে?

স্বাধীনতা না স্বৈরাচার

স্বাধীনতালাভের পরে দেশে স্বৈরাচার ও যথেচ্ছাচারের প্রবৃত্তি যে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা

যেমনই স্বাভাবিক আবার তেমনই ভয়াবহ। ইংরেজ আমলে শাসনের আধার ছিল ভয়। ইংরেজদের লোকে ভয় করিত। রাজকর্মচারীরা সাহেবের ভয়ে সদা জড়সড় থাকিত। এখন সকলেই স্ব-প্রধান, সকলেই স্বাধীন। কাহারও কাহাকে ভয় করার দরকার নাই, কাহারও কাহাকে ভয় করার কারণ নাই। এখানেই যদি ইহার অন্ত হইত ত হানির কথা ছিল না। পারস্পরিক নির্ভরতা ও এক প্রকারের স্বাস্থ্যপূর্ণ আবহাওয়া দেশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইত। কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে ঠিক বিপরীত। কোথায় শাসনের শক্তি ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইবে, না তার পরিবর্তে অরাজকতা ও গুণ্ডাবৃত্তি প্রশ্রয় পাইতেছে। গুণ্ডামির বাজার গরম, নানা মুখে একথা শুনা যাইতেছে। নেহাৎ ক্ষুদ্র গ্রামের লোকও আজ গুণ্ডার ভয়ে ব্যতিব্যস্ত। তাহারা বলে এ রাজত্ব কংগ্রেসেরও নয়, ভালমানুষেরও নয়। এ রাজত্ব হইতেছে চালবাজদের, ধনিকদের অথবা অলস পুঁজিপতিদের। পয়সার প্রভাবের রূপ কি হইবে সে কথার মীমাংসা 'সর্বোদয়ের' পথে নিত্য হইতেছে, হইতেও থাকিবে; কিন্তু গুণ্ডাগিরির যথার্থ প্রতিকার করিতে হইলে গুণ্ডানামক প্রাণীর উদ্ভব ও গুণ্ডাপনার স্বরূপ জানা একান্ত আবশ্যক।

লাঠিবাদের সন্তান: নিছক গুণ্ডারাজ

কোন গ্রামে গিয়া গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করুন, গুণ্ডা জীবিকানির্বাহের জন্য বস্তুতঃ কি করে? উহার লাঠিই উহার ভাগ্য, প্রায় সর্বক্ষেত্রে আপনি এই উত্তরই শুনিতে পাইবেন। ছোটদের জন্য ইংরেজীতে একটি হাস্যরসের কবিতা আছে। এক গোয়ালিনীর কন্যাকে জ্বালাতন করিবার জন্য পরিহাস করিয়া কোন সুন্দর সুঠামদেহ যুবক জিজ্ঞাসা করিতেছে 'হে সুন্দরী, তোমার সম্পদ কি?' জবাবে মেয়েটি বলিতেছে—'আমার লাবণ্যই আমার দৌলত ও ভাগ্য।' গুণ্ডার দৌলত তাহার লাঠি, গুণ্ডার প্রতিষ্ঠা তাহার লাঠি, গুণ্ডার বেসাতি তাহার লাঠি, আর লাঠিই তাহার ভাগ্য। অপর কোন রোজগার তাহার নাই, তাহার প্রভাবেরও অপর কোন সাধন নাই। লাঠির জোরে গ্রামে সে মানসম্মানে থাকে, এক প্রকার প্রভুত্ব চালায়। ধনবান লোক যেমন বিনা পরিশ্রমে সসম্মানে বাস করে, লাঠিধারীও তেমন পরিশ্রম না করিয়া প্রভাব-প্রতিপত্তিতে জীবনযাপন করে। পুঁজিপতির মতই সে সমান পরোপজীবী ও কর্মবিমুখ। যাহারা নিজেদের সম্মানী লোক বলে তাহারা নিজ নিজ সম্মানরক্ষার ও অপরের সম্মানহরণের জন্য এই দণ্ডধরকে লাগায় বলিয়া সে সসম্মানে থাকিতে পায়। আমাদের সভ্যতা ও ভদ্রতা লাঠির সহায়তা খুঁজিয়া থাকে। সহায়তা যে দেয় তাহার প্রতিষ্ঠা, সহায়তা যে লয় তাহার প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা সব সময়েই বেশী। আশ্রিত অপেক্ষা আশ্রয়দাতা চিরকালই শ্রেষ্ঠ। কি শহরে কি গ্রামে, মানীলোকেরা নিজেদের মান-মর্যাদা ও প্রতিপত্তি রক্ষার নিমিত্ত এই সব লাঠিধারীকে পোষে। অপরের উপর নিজেদের আধিপত্য ও প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য এই সব লাঠিধারীকে ইহারা ব্যবহারও করিয়া থাকে। লাঠিধারীর নিজের কোন মত নাই, নিষ্ঠাও তাহার নাই, আর পক্ষও তাহার নাই। সে আত্মপর ভাবের ঊর্ধ্বে,—উদাসীন ও নির্মম। যে টাকা দেয় তাহার পক্ষেই তাহার লাঠি উদ্যত হয়। ফল হইয়াছে, দণ্ড সমস্ত সভ্যতার অন্তিম ও মূল আধার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লাঠিই ধর্ম, সংস্কৃতি ও শান্তির অন্তিম অবলম্বন এ কথা বলিতেও বহু পুরাতনপন্থী ও জীর্ণমতবাদীর বাধে না। ইহা সত্য হইলে লাঠিই গণতন্ত্রের অন্তিম অবলম্বন থাকিয়া যাইবে।

গুণ্ডারাজের প্রতিকার জনতার হাতে

কিন্তু ভগবানের অশেষ কৃপায় অবস্থা সেরূপ নহে। ধনের প্রভাবের মত লাঠির প্রভাবও অপ্রকৃত ও কৃত্রিম। জনতা একযোগে সংকল্প করিলেই উহার অবসান হইতে পারে। মানী ও সভ্যভব্য লোকেরা নিজ নিজ মান-প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য লাঠির আশ্রয় লওয়া যেদিন বিচার-পূর্বক পরিহার করিবে, সেই দিন আর সেই মুহূর্তেই গুণ্ডা-রাজের অবসান ঘটিবে।

সভ্যতা আত্মরক্ষার নিমিত্ত ও শান্তি সংস্থাপনের জন্য এতাবৎ কাল টাকা ও লাঠির শরণ লইয়া আসিয়াছে। কোন গ্রামে যখন অশান্তি দেখা দেয় তখন রাজকর্মচারীরা তথাকার ভাল লোকেদের সভা আহ্বান করিয়া থাকে। এ স্থানে ভাল মানুষ বলিতে মহাজন ও সাহুকারদেরই বুঝায়। তার কারণ মহাজনী ও সাহুকারীকেই ভাল মানুষের নিদর্শন বলিয়া ধরা হয়। অধিকাংশ স্থলে গ্রামের স্বাস্থ্যসম্পন্ন মল্ল ও পালোয়ান এই সব ভাল মানুষের আশ্রিত লোক। ধনবান লোকেরা নিজেদের কাজের জন্য ইহাদের পালন-পোষণ করে আর ইহাদের সহায়তায় শান্তিরক্ষা করিয়া থাকে। তাই সরকারের লোকেরাও স্বাস্থ্যসম্পন্ন এই সকল বলভদ্রের সাহায্য চাহিয়া থাকে। এই প্রকারে ক্ষমতার আধার রাজকর্মচারীদের সহিত দণ্ডধরদের যোগাযোগ হইয়া যায়। আর তাই সব দিকে, সকলের মুখে অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় যে, পুলিশ গুণ্ডার সহিত হাত মিলাইয়াছে। আসলে তাহারা মিলে নাই; শান্তিসংস্থাপনের জন্য এতাবৎকাল প্রচলিত ও

সুলভ যে উপায়ের আশ্রয় লোকে লইয়া আসিয়াছে, তাহারা তাহাই অবলম্বন করিয়াছে।

গুণ্ডারাজের মূল

এই যে গুণ্ডাগিরি-রূপ ব্যাধি ইহা অত্যন্ত গভীর ও মূলীভূত। উহার কারণ কি কি ও মূল কোথায় তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া দরকার। তবে উহার নিরাকরণ করা সম্ভব। ধনের প্রভুত্ব নিরাকরণের নিমিত্ত আমরা এই উপায় খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি যে, যে লোক কাজ করিবে না, সে খাইতেও পাইবে না। এই সূত্র গুণ্ডাগিরির অবসানের পক্ষেও উপযোগী এবং ফলপ্রদ। যে কাজ না করিবে, খাইতেও সে পাইবে না। কাজ না করিয়া কেবল লাঠির সাহায্যে যাহারা জীবিকা অর্জন করে, এরূপ করিলে তাহাদের আর কোনই স্থান থাকিবে না। মূল ব্যাধির জন্য মূলীভূত উপায়ের দরকার হইয়া থাকে। এই দৃষ্টি হইতে গুণ্ডাগিরির মূল যে কোথায় তাহা নির্ণয়ের যৎসামান্য চেষ্টা এখানে করিয়াছি।

ধন-দাস ধর্মসংস্থা

সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠারক্ষার নিমিত্ত আমরা যেরূপ লাঠির আশ্রয় লইয়া থাকি, ধর্মপ্রতিষ্ঠা ও ধর্মপ্রচারের জন্য তদ্রূপ দণ্ডের সহায়তা লওয়া শিষ্টাচারসম্মত উত্তম উপায় হইয়া গিয়াছে। সম্প্রদায় তথা ধর্ম-সংরক্ষণ ও ধর্ম-প্রচারের জন্য অর্থের আশ্রয় লওয়া ত প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য প্রচলিত নীতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ; ধর্মসংস্থার ও ধর্ম-সংগঠনের কাজ সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য অর্থ-আহরণ ও অর্থসঞ্চয় পর্যন্ত পুণ্যকর্ম বলিয়া পরিগণিত। সঞ্চয়ের অনুমোদন যে সমাজে রহিয়াছে, সেখানে দান শ্রেষ্ঠ ধর্মকার্য আর দাতা শ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা বলিয়া বিবেচিত হয়। অর্থাহরণ যে কি উপায়ে করা হয় তৎসম্বন্ধে বিবেক-বোধ আস্তে আস্তে লোপ পায়। যে-কোন উপায়েই অর্থোপার্জন করিয়া থাকুক, তাহা দানে দিয়া দিলেই, সে লোক ধার্মিক, কেননা সে দাতা। দয়া ধর্মের মূল হইতে পারে, তা হোক, কিন্তু দানকেই ধর্মাচরণের বাহ্য নিদর্শন বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও পীঠের প্রতিষ্ঠা মুখ্যতঃ ধনীর দানবৃত্তি হইতেই হয়। তাই ব্যক্তি-সম্পত্তি ও ব্যক্তি-সঞ্চয়ের উচ্ছেদকামী বিপ্লবীরা ধর্মকে ধনীর প্রভাবাশ্রিত তাঁবেদার মনে করিয়া অহিফেন আখ্যা দিয়াছে। আমাদের ধর্মসংস্থাগুলি আজ দোকানদারি করিতেছে, সুদখোরি করিতেছে, এবং আরও কত কিছুই না করিতেছে! ধর্মরক্ষা ও সম্প্রদায়প্রচারের ধাঁধাঁয় অর্থশুদ্ধির কথা কাহারও মনে একবারও ওঠে কি?

অর্থ ও দণ্ডের মৈত্রী

যে কথা ধন সম্বন্ধে খাটে, বাহুবলের সম্বন্ধেও তাহা খাটে। দুই সম্প্রদায়ে বা দুই ধর্মে যখন ঝগড়া-বিবাদ সুরু হয় তখন উভয় পক্ষের সম্প্রদায়বাদী ও ধর্মধ্বজী লোকেরা সম্প্রদায়ান্ধ হইয়া বিবেক বিসর্জন দিয়া যে-কোন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। সভ্য ও মানী দুই ব্যক্তি নিজ নিজ প্রভুত্ব রক্ষার নিমিত্ত যেরূপ অর্থ ও লাঠির খোলাখুলি ব্যবহার করে, সেইরূপ দুই সম্প্রদায়ও একে অন্যের বিরুদ্ধে বিনা দ্বিধায় দ্রব্য ও দণ্ডের প্রয়োগ করে। দুই ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় অন্তিম বিজয় যেমন লাঠিরই হইয়া থাকে, সাম্প্রদায়িক ও ধার্মিক প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায়ও তেমনই অন্তিম প্রতিষ্ঠা লাঠিরই হয়।

ধর্ম ও সংস্কৃতির অবলম্বন—লাঠি আর কত কাল থাকিবে

ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, সব সম্প্রদায়ের নেতা ত একই কথা বলে, আর উহার রক্ষার দোহাই যাহারা দেয়, নেতাদের সেই সব অনুচরেরা তাহাদের কথার উল্টা কাজ করে, কেননা তাহারা জানে যে দণ্ডের সহায়তা ব্যতীত এই সব নেতার কিছুই নির্বাহ হইবার নহে। পরে ধর্মরক্ষার নামে যথেচ্ছ গুণ্ডামি আরম্ভ হইয়া যায়। রাজ-নৈতিক ঝগড়ায় দণ্ডের ব্যবহার হয় দলের বা ঘোঁটের জন্য। ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ও সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাপনা উগ্র হইয়া উঠে। কোন লোক যখন হিংসার পথে চলে, কুটিল নীতি আশ্রয় করে, লোকে তখন তাহার নিন্দা করে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক হিংসা ও রাজনৈতিক কুটিলতাকে লোকে কর্তব্য বলিয়া মনে করে। ধার্মিক ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে, এইরূপ গুণ্ডাবাজী যাহারা করে তাহাদের ধর্মরক্ষক ও ধর্মবীর ইত্যাদি উপাধিতে বিভূষিত করা হয়, এবং সত্যপরায়ণ ও শান্তিপ্রিয় নাগরিক অপেক্ষা সমাজে ইহারা অধিকতর গৌরবলাভ করিয়া থাকে। ধর্ম ও সংস্কৃতি যত দিন দণ্ডের মুখাপেক্ষী থাকিবে তত দিন এই পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হইবার নহে।*

* "সর্বোদয়" হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ কর্তৃক অনূদিত।

মহাকবি দণ্ডী

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের অমর শিল্পীদের মধ্যে দণ্ডী অন্যতম। দণ্ডী কবি, আলঙ্কারিক ও গদ্যলেখক; একাধারে এরূপ বহুমুখী প্রতিভা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না।

শার্ঙ্গধর পদ্ধতিতে একটি কবিতায় রাজশেখর বলেছেন—(১৭৪নং কবিতা)—

"ত্রয়োঽগ্নয়স্ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো গুণাঃ।

ত্রয়ো দণ্ডিপ্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ॥

অর্থাৎ—তিনটি অগ্নি, তিনটি বেদ, তিনটি দেবতা ও তিনটি গুণ, এবং তিনটি দণ্ডি-প্রবন্ধ, এই ত্রিভুবনে বিখ্যাত। দণ্ডীর এই তিনটি গ্রন্থ কি কি, তা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। দশকুমার-চরিতের লেখক দণ্ডী এবং কাব্যাদর্শ-প্রণেতা দণ্ডী একই ব্যক্তি কিনা—এ নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। উভয় গ্রন্থ একই দণ্ডীকর্তৃক বিরচিত হলেও তৃতীয় গ্রন্থটি কি—এ বিষয়ে সমস্যা থেকেই যায়। কাব্যাদর্শের তৃতীয় পরিচ্ছেদে দণ্ডী বলেছেন—

"ইত্থং কলাচতুঃষষ্টিবিরোধঃ সাধু নীয়তাম্।

তস্যাঃ কলাপরিচ্ছেদে রূপমাবির্ভবিষ্যতি।"

কাব্যাদর্শ ৩-১৭১

এই কলাপরিচ্ছেদ গ্রন্থ সম্বন্ধে অন্য কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না; কবির রচনা থেকে এ পর্যন্ত জানা যায় যে, তিনি ঐ গ্রন্থ প্রণয়নের মানস করেছিলেন, কিন্তু প্রণয়ন করেছিলেন কিনা, তা সঠিক জানার আজ আর কোনও উপায় নাই। কাব্যাদর্শের ১, ১২ কবিতায় উল্লিখিত "ছন্দোবিচিতি" দণ্ডীর রচিত কিনা—ইহাও বিবেচ্য। ফলতঃ দণ্ডীর তৃতীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নাই। তাই আমরা আজ কেবল কাব্যাদর্শ ও দশকুমার-চরিত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

দণ্ডী ও অপর বিশিষ্ট আলঙ্কারিক ভামহের মধ্যে কে অগ্রবর্তী, তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তবে উভয়েই যে খ্রীষ্টীয় ৫০০-৬৫০ সালের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা চলে, এবং উভয়ের মধ্যে দণ্ডীই প্রাচীনতর বলে মনে হয়।

কাব্যাদর্শের বিষয়বস্তু

দণ্ডীর সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থ কাব্যাদর্শ তিন পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ; কোনও কোনও সংস্করণে তৃতীয় পরিচ্ছেদের দোষাধিকরণটিকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে চতুর্থ পরিচ্ছেদ রূপে প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে দণ্ডী কাব্যের সংজ্ঞা, কাব্যের প্রকারভেদ, রীতিবর্ণন, বিশেষতঃ বৈদর্ভী ও গৌড়ীরীতির উৎকর্ষাপকর্ষ বিশ্লেষণ, দশবিধ গুণ প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি স্বভাবোক্তি, উপমা, রূপক, দীপক প্রভৃতি পঁয়ত্রিশ প্রকারের অলঙ্কার সংজ্ঞা ও উদাহরণ ক্রমে নিরূপিত করেছেন। এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে যমক, গোমূত্রিকা, অর্ধভ্রম, সর্বতোভদ্র প্রভৃতি চিত্রবন্ধ, ষোড়শ প্রকার প্রহেলিকা এবং দশপ্রকারের দোষ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

কাব্যাদর্শের সমালোচনা

কাব্যাদর্শের সমালোচনাকালে একথা আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, এই গ্রন্থই আমাদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অলঙ্কারগ্রন্থ এবং ভামহকে যাঁরা দণ্ডীর পূর্ববর্তী মনে করেন, তাঁদের মতেও এ গ্রন্থ দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অলঙ্কারগ্রন্থ। অগ্নিপুরাণের ৩৩৬-৩৪৬ অধ্যায়ে ৩৬২টি কবিতায় অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত বিষয়সমূহের বিস্তৃত আলোচনা আছে; কিন্তু অগ্নিপুরাণের এই অংশসমূহের প্রাচীনত্ববিষয়ে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে, বিশেষতঃ এর ষষ্ঠ, সপ্তম, ষোড়শ, অষ্টাদশ, বিংশতি ও দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে রসশাস্ত্রোক্ত বহু বিষয়ের পর্যালোচনা আছে বটে, কিন্তু তা হলেও এ গ্রন্থ নাট্যশাস্ত্রবিষয়ক, পূর্ণ অলঙ্কার-শাস্ত্রমূলক নয়। যদিও দণ্ডী নিজে এবং টীকাকারেরা পূর্ব পূর্ব আচার্যদের নামোল্লেখ করেছেন—যাঁদের মধ্যে কাশ্যপ, বররুচি, ব্রহ্মদত্ত, নন্দিস্বামী প্রভৃতির নাম হৃদয়ঙ্গমা[১] ও শ্রুতানুপালিনী টীকায় উল্লিখিত হয়েছে—তা হলেও তাঁরা কিরূপ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তা জানা নাই। ভট্টিকাব্যের প্রসন্নকাণ্ডে (১০-১৩ সর্গ) আমরা অলঙ্কারশাস্ত্রের যে পরিচয় পাই তাতে বাস্তবিকই অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রভাব অনুভূত হয়, কিন্তু ভট্টিকাব্য কাব্যগ্রন্থ, অলঙ্কারগ্রন্থ নয়। আমাদের মতানুসারে দণ্ডীর কাব্যাদর্শই সর্বপ্রাচীন অলঙ্কার গ্রন্থ। এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ অলঙ্কারগ্রন্থে কবির যে অপূর্ব মনীষা প্রকটিত হইয়াছে, তা বিস্ময়ের বস্তু।

এই প্রাচীনতম অলঙ্কার গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ মতাবলীর বিরুদ্ধ মত উপস্থাপিত করেছেন পরবর্তী আলঙ্কারিকেরা, বিশেষতঃ ধ্বনিবাদীরা। দণ্ডী নিজে রীতিবাদী এবং অংশতঃ, অলঙ্কারবাদী। তাই ধ্বনিবাদীদের বিরুদ্ধ সমালোচনায় বিস্মিত হবার কিছুই নাই। আমাদের কিন্তু উক্ত অলঙ্কারগ্রন্থ সম্বন্ধে অন্য কয়েকটি বিষয়ে বক্তব্য আছে। অতি সংক্ষেপে তার অবতারণা করছি।

১। ১.২ কবিতার টীকায়—'পূর্বেষাং কাশ্যপ-বররুচি—প্রভৃতীনামাচার্যাণাং লক্ষণশাস্ত্রাণি সংহৃত্য পর্যালোচ্য', ২.৭—'পূর্বসূরিভিঃ কাশ্যপ-বররুচি-প্রভৃতিভিঃ'।

এই গ্রন্থের বিষয়ক্রম সুসমঞ্জস নয়। প্রথম সর্গে গুণ-প্রসঙ্গে অনুপ্রাসের অবতারণা অবান্তর। প্রথম সর্গের অন্তে কবিত্ব-শক্তির মৌলিক উপাদানবিষয়ক আলোচনাও সুসঙ্গত মনে হয় না; তা আলোচনা গ্রন্থের প্রারম্ভে বা অন্তে হলেই শোভন হ'ত। গুণ ও দোষের অধ্যায়ের মধ্যবর্তী অংশে অন্যান্য বিষয়ের অবতারণাও বিসদৃশ মনে হয়।

রীতির প্রসঙ্গে কবি গৌড়ী ও বৈদর্ভী ব্যতীত অন্যান্য রীতির নামও উল্লেখ করলেন না—কেবল "অস্ত্যনেকো গিরাং মার্গঃ" বলেই ক্ষান্ত হলেন (১, ৪০)। সত্যই কি পাঞ্চালী, লাটী বা অন্যান্য রীতি তখনও পুষ্টিলাভ করে নি? অন্য দিকে ভামহের স্তুতিবাদ থেকে সত্যই প্রতীয়মান হয় যে, গৌড়ী-রীতির উৎকর্ষ অবশ্যস্বীকার্য ছিল; পরবর্তী সময়ে বামন এবং রাজশেখরও এর স্তুতিবাদ করেছেন। কিন্তু কাব্যাদর্শের কবি বঙ্গদেশীয় কবিগণের গৌড়ী রীতির উপরে হঠাৎ এত বিরূপ হলেন কেন?

"শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্যং সুকুমারতা।
অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃ কান্তিসমাধয়ঃ॥" ১, ৪১

এই দশটি গুণের মধ্যে প্রতিটি গুণের ব্যভিচারই কেবল তিনি গৌড়ী-রীতিতে খুঁজে পেয়েছেন। তিনি অকুণ্ঠভাবে বলেছেন:

"ইতি বৈদর্ভমার্গস্য প্রাণা দশগুণাঃ স্মৃতাঃ।
এষাং বিপর্যয়ঃ প্রায়ো লক্ষ্যতে গৌড়বর্ত্মনি॥" ১, ৪২

উদাহরণ দেওয়া এখানে বাহুল্যমাত্র। দণ্ডীর মতে পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, এ ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে গৌড়ীয়েরা লিখেন:

"ন্যক্ষেণ ক্ষপিতঃ পক্ষঃ ক্ষত্রিয়াণাং ক্ষণাদিতি"

এতে সুকুমারতা গুণ শব্দের আড়ম্বরে ব্যাহত হয়। তাঁর মতে গৌড়ীয়েরা পদে পদে প্রসাদ-গুণ ব্যাহত করেন; যেমন চন্দ্রের কলঙ্ক চন্দ্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে একথা বোঝাতে গিয়ে গৌড়ীয়েরা বলেন:

"ব্যুৎপন্নমিতি গৌড়ীয়ৈর্নাতিরূঢ়মপীষ্যতে।
যথানত্যর্জুনাব্জন্মসদৃক্ষাঙ্কবলক্ষগুঃ॥" (১, ৪৬)

অথচ এই গৌড়ীয় রীতিসম্পর্কেই প্রায় সমসাময়িক অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক ভামহ প্রশংসাপূর্বক বলেছেন, গৌড়ীয় রীতি অতি উচ্চাঙ্গের হলেও কোনও কোনও আলঙ্কারিক তাঁদের অকারণে যে নিন্দা করেন, তা অসমীচীন (১, ৩১-৩২)।

"বৈদর্ভমন্যদস্তীতি মন্যন্তে সুধিয়োঽপরে।
তদেব চ কিল জ্যায়ঃ সদর্থমপি নাপরম্॥
গৌড়ীয়মিদমেতত্তু বৈদর্ভমিতি কিং পৃথক্।
গতানুগতিকন্যায়ান্নানাখ্যেয়মমেধসাম্॥"

অর্থাৎ—"অন্যান্য সুধীরা (এখানে সুধী শব্দটি ব্যঙ্গাত্মক) অপর গৌড়ী রীতি সদর্থক হলেও, বৈদর্ভী নামক যে রীতি আছে, তাকেই বরণীয় মনে করেন। এটি গৌড়ী, এটি বৈদর্ভী—এই প্রণালীতে কি পার্থক্য নির্ণীত হয়? গতানুগতিক ন্যায়ে দুর্মেধাদের অনাখ্যেয় বা অবক্তব্য কিছুই নাই।" সুতরাং দণ্ডীর পূর্বোক্ত প্রকারের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিন্দনীয়, সন্দেহ নাই। উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারাদির ভেদাদি প্রদর্শনেও কবি অনেক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন। তৎসত্ত্বেও কাব্যাদর্শ যে বিশিষ্ট গ্রন্থ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ভাবের স্বচ্ছ প্রবাহ, ভাষার অপূর্ব সাবলীলতা, কঠিন বিষয়ের সুষ্ঠু সহজঅবতারণা—এ গুণত্রয়ের সমন্বয়ে উক্ত গ্রন্থ সমৃদ্ধ।

দণ্ডীর গভীর সত্যানুসন্ধিৎসাও আমাদের মনকে স্বতঃই আকৃষ্ট করে। যেমন, প্রতিভাই কবিত্বশক্তির একমাত্র কারণ কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন—অদ্ভুত প্রতিভা কবিত্বশক্তির শ্রেষ্ঠ উপাদান বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর বিদ্যানুশীলন এবং কঠোর রচনাভ্যাস ব্যতীত কাব্যসম্পদ্ অর্জিত হয় না। তাঁর মতে প্রতিভা না থাকলেও, কঠোর মনোযোগের সঙ্গে বিদ্যানুশীলন ও অভ্যাসের জোরে—সরস্বতীর কিছু না কিছু অনুগ্রহ নিশ্চয় লাভ করা যায়, তাই অন্ততঃ যশঃপ্রার্থী সকলেরই সরস্বতীর উপাসনায় ব্রতী হওয়া উচিত।

"নৈসর্গিকী চ প্রতিভা শ্রুতং চ বহু নির্মলম্।
অমন্দশ্চাভিযোগোঽস্যাঃ কারণং কাব্যসম্পদঃ॥
ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ববাসনা—
গুণানুবন্ধি প্রতিভানমদ্ভুতম্।
শ্রুতেন যত্নেন চ বাগুপাসিতা
ধ্রুবং করোত্যেব কমপ্যনুগ্রহম্॥
তদস্ততন্দ্রৈরনিশং সরস্বতী
শ্রমাদুপাস্যা খলু কীর্তিমীপ্সুভিঃ।
কৃশে কবিত্বেঽপি জনাঃ কৃতশ্রমা
বিদগ্ধগোষ্ঠীষু বিহর্তুমীশতে॥" ১, ১০৩-১০৫

দণ্ডীর স্বরচিত অলঙ্কারের উদাহরণগুলিও অত্যন্ত হৃদয়-গ্রাহী। এখানে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করছি।

উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে তুল্যতার সূচনা করে যখন পুনরায় ভেদমুখে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করা হয়, তখন ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়। এর উদাহরণক্রমে কবি বলছেন:

"কমলং বদনং চেতি দ্বয়োরপ্যনয়োর্ভিদা।
কমলং জলসংরোহি ত্বন্মুখং ত্বদুপাশ্রয়ম্॥"

অর্থাৎ, প্রেমিক প্রিয়াকে সম্বোধন করে বলছেন—"প্রিয়ে! পদ্ম এবং (তোমার) মুখ, এই দুয়ের মধ্যে (পার্থক্য কিছুই নাই), কেবল এইটুকু ভেদ আছে যে, পদ্ম জলে থাকে, আর তোমার মুখ তোমাতেই আছে।"

আক্ষেপ অলঙ্কারের সংজ্ঞা করেছেন কবি "প্রতিষেধোক্তি-

রাক্ষেপঃ"—প্রতিষেধ বা নিষেধোক্তিই আক্ষেপ। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন :

"গচ্ছ গচ্ছসি চেৎ কান্ত পন্থানঃ সন্তু তে শিবাঃ।
মমাপি জন্ম তত্রৈব ভূয়াত্তত্র গতো ভবান্ ॥"

অর্থাৎ, প্রিয়া বলছেন—"হে কান্ত! যেতে যদি হয়, যাও; তোমার পথ মঙ্গলময় হোক, (তবে যাওয়ার আগে আশীর্বাদ করে যাও যেন), তুমি যেখানে যাচ্ছ, আমার জন্মও সেখানে হয়।" প্রিয়া এখানে প্রিয়তমকে মুখে যেতে বলছেন বটে, কিন্তু তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা বাধা দেওয়ার। প্রিয় প্রণয়িনীর প্রার্থিত বর অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুকামনা সমর্থন করতে পারেন না; তাই তাঁর যাওয়াও হয় না।

ভামহ এবং অন্যান্য বহু আলঙ্কারিক "প্রেয়ঃ"কে অলঙ্কার বলে স্বীকার করেন না, কিন্তু দণ্ডী তা করেছেন এবং তার সংজ্ঞা দিয়েছেন, "প্রেয়ঃ প্রিয়তরাখ্যানম্", অর্থাৎ—প্রিয়তর আখ্যানে প্রেয়ঃ অলঙ্কার হয় এবং মহাভারতের আদর্শে তার এমন একটি উদাহরণ দিয়েছেন, যা সমগ্র অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলে চিরকাল স্বীকৃত ও সমাদৃত হচ্ছে—

"অদ্য যা মম গোবিন্দ জাতা ত্বয়ি গৃহাগতে।
কালেনৈষা ভবেৎ প্রীতিস্তবৈবাগমনাৎ পুনঃ ॥" ২. ২৭৬

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বিদুর বলছেন—"হে গোবিন্দ! আজ তুমি আমার গৃহে পদার্পণ করাতে আমার যে আনন্দ (তার তুলনা কি দিব? শুধু এটুকুই বলি যে), ভবিষ্যতে তুমি যখন পুনরায় (আমার গৃহে) আসবে তখনই কেবল এরূপ আনন্দ পুনরায় হতে পারে।"

দণ্ডী বলছেন, কবি যখন কোনও জিনিষের এমন বর্ণনা করেন, যার অস্তিত্ব পৃথিবীতে সম্ভবপর নয়—যা লোকসীমা অতিক্রম করে যায়, তখন অতিশয়োক্তি অলঙ্কার আত্মপ্রকাশ করে; এই অতিশয়োক্তি অলঙ্কারশ্রেষ্ঠা। উদাহরণক্রমে কবি বলছেন :

"মল্লিকামালভারিণ্যঃ সর্বাঙ্গীণার্দ্রচন্দনাঃ।
ক্ষৌমবত্যো ন লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নায়ামভিসারিকাঃ ॥"
(২.২১৫)

অর্থাৎ, অভিসারিকারা জ্যোৎস্নায়াতে (যখন প্রিয়দের কাছে যাচ্ছেন তখন তাঁদের) দেখাই যাচ্ছে না, জ্যোৎস্নার সঙ্গে তাঁরা সম্পূর্ণ মিলে গেছেন)। (তাঁরা) শ্বেতমল্লিকামালায় বিভূষিতা; সর্বাঙ্গে তাঁদের (শ্বেত) আর্দ্রচন্দন; এবং তাঁরা (শ্বেত) রেশমবস্ত্র-পরিহিতা, (ফলে, সর্বশুক্লা অভিসারিকারা জ্যোৎস্নাবরূপিণী হয়ে গেছেন; জ্যোৎস্না থেকে তাঁদের পৃথক করা যাচ্ছে না)।

দণ্ডীর মতে বিরোধ অলঙ্কারের সৃষ্টি তখনই হয়, যখন কোনও একটি বিষয়ের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের জন্য কবি বিরুদ্ধ পদার্থের একত্র সমাবেশ চিত্রিত করেন, যথা—

"প্রাবৃষেণ্যৈর্জলধরৈরম্বরং দুর্দিনায়তে।
রাগেণ পুনরাক্রান্তং জায়তে জগতাং মনঃ ॥" (২.৩৩৫)

জলভরা মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন—সব কৃষ্ণবর্ণ; অথচ জগদ্বাসীর মন প্রেমের (আলোয়) উজ্জ্বল হয়ে উঠ্ছে।

কাব্যাদর্শের মতে যখন অপ্রক্রান্ত, অপ্রস্তুত অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত, বস্তুবিশেষের স্তুতি (বা নিন্দা) দ্বারা প্রস্তুত বা আলোচ্য বিষয়ের স্তুতি (বা নিন্দা) করা হয়, তখনই কবিরা অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। তিনি উদাহরণ দিচ্ছেন :

"সুখং জীবন্তি হরিণা বনেষ্বপরসেবিনঃ।
অর্থৈরযত্নসুলভৈর্জলদর্ভাঙ্কুরাদিভিঃ ॥" (২.২৩১)

"অহো! বনেতে হরিণেরা অন্য কারো সেবাপরায়ণ না হয়ে (বড়ই) সুখে থাকে, জল, কুশ, অঙ্কুর প্রভৃতি তাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিষ তারা অনায়াসেই পায়।" এখানে এ উদাহরণের উদ্দেশ্য মৃগবৃত্তির প্রশংসা নয়, বস্তুতঃ কোনও উদারচেতা মহীয়ান রাজ-সেবাপরায়ণ ব্যক্তির এই খেদোক্তি—এই মনস্বী নিজেকে নিজে ধিক্কার দিচ্ছেন।

এ প্রকারে দণ্ডীর নিজস্ব উদাহরণগুলি অমূল্য; অনবদ্য সৌন্দর্য-মাধুর্যের আধার। তাই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম আলঙ্কারিক আমাদের চিত্তবিমোহন রূপে চির বিরাজমান।

দণ্ডীর দুটি বৈশিষ্ট্য পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ, তিনি একদিকে যেমন সমগ্র কাব্যাদর্শ গ্রন্থ সরল পদ্যে রচনা করেছেন, তেমনি অন্য কবির প্রভাব থেকেও নিজেকে অনেকটা নির্মুক্ত রেখেছেন। পরবর্তী যুগের অলঙ্কারগ্রন্থ গদ্য-পদ্য মিশ্রিত এবং প্রায়ই প্রসিদ্ধ কবিদের রচিত কবিতায় পরিপূর্ণ। দণ্ডীর গ্রন্থ তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

দ্বিতীয়তঃ, এই অলঙ্কারগ্রন্থ রচনাব্যপদেশে কবি একটি অনবদ্য কাব্যগ্রন্থও সৃষ্টি করেছেন। এ গ্রন্থ পাঠে কাব্যরসে হৃদয় সর্বদা আপ্লুত থাকে, অথচ সুষ্ঠুভাবে অলঙ্কারশাস্ত্র শিক্ষা হয়।

অলঙ্কারশাস্ত্রে ভামহ ও দণ্ডীর নাম যুগপৎ উল্লেখযোগ্য। তাই উভয়ের তুলনামূলক সমালোচনা করা কর্তব্য। দশটি স্থলে দণ্ডী ও ভামহ একই ভাষা ব্যবহার বা কবিতাংশ গ্রহণ করেছেন এবং উভয়েই পূর্বাচার্যদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছেন। ভামহের কাব্যালঙ্কারে দণ্ডীর অপূর্ব কবিত্বশক্তি ও ভাষার অনুপম সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয় না। দণ্ডীর সৃজনী-শক্তিও অদ্ভুত। কিন্তু ভামহে যৌক্তিকতা, মননশীলতা ও প্রখর বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

দশকুমার-চরিত

এবার দণ্ডীর অপূর্ব গদ্যকাব্য দশকুমার-চরিত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্। দশকুমার-চরিত ও কাব্যাদর্শ যে একই ব্যক্তির লিখিত নয়, তার সপক্ষে কোনও প্রবল যুক্তি

নাই এবং দণ্ডীকেই এর রচয়িতা বলে স্বীকার করা হয়। কারো কারো মতে এই গ্রন্থদ্বয় পৃথক পৃথক কবির রচিত— এ বিষয়ে এই বিশেষ যুক্তি প্রদর্শিত হয় যে, কাব্যাদর্শকার কাব্যের স্বল্প দোষও উপেক্ষা করতে স্বীকৃত নন এবং সামান্য গ্রাম্যতাদোষও গুরুতর বলে মনে করেন। এই হিসাবে দশকুমার-চরিতে বিস্তর দোষ পরিলক্ষিত হয়। তাই কেউ কেউ মনে করেন—উভয় লেখক এক হতে পারেন না। আর ভাষার পার্থক্য তো আছেই। কিন্তু গদ্য ও পদ্যের প্রভেদ ও যুগধর্মের প্রভাব মেনে নিলে এ বিষয়ে বিশেষ আপত্তির কারণ থাকে না। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম শতাব্দীর গদ্যমাত্রই অত্যন্ত দীর্ঘ সমাসবহুল, ওজোগুণসম্পন্ন ও অলঙ্কারপ্রধান। দ্বিতীয়তঃ, কাব্যাদর্শ কবির পরিণত বয়সের এবং দশকুমার-চরিত অল্পবয়সের লেখা বলে ধরে নিলে এ বিষয়ে আর কোনও বিচার-বিভ্রাট উপস্থিত হয় না। ফলতঃ উভয় গ্রন্থই একই কবির রচনা, এটা মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। দশকুমার-চরিতের স্থানে স্থানে অপূর্ব সরল গদ্যাংশ আছে এবং ভাবের প্রাচুর্য ও উন্মাদনা কাব্যাদর্শকারেরই সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

দশকুমার-চরিতে মগধরাজ রাজহংসের সহিত মালব-রাজের যুদ্ধবৃত্তান্ত ও মগধরাজের পরাজয়, বিন্ধ্যাটবী বাস বিষয়ে বর্ণনা এবং সেখানে তাঁর পুত্র রাজবাহনের জন্মবৃত্তান্ত প্রভৃতি বর্ণিত আছে। স্বীয় বন্ধু মিথিলরাজ প্রহারবর্মার অপহারবর্মা ও উপহারবর্মা নামক পুত্রদ্বয়কে মগধরাজ এই বনে খুঁজে পান এবং অপর সাত জন রাজপুত্র প্রকৃতপক্ষে রাজার প্রাচীন তিন জন অমাত্যের পুত্র। এই দশ জনের মধুর চরিত্র এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। কোনও ব্রাহ্মণকে পাতালপ্রবেশ বিষয়ে সহায়তা করতে গিয়ে রাজবাহন স্বীয় বন্ধুদের সঙ্গচ্যুত হন। বন্ধুরা তাঁর সন্ধানে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। পাতাল থেকে প্রত্যাগমনের পরে সোমদত্ত ও পুষ্পোদ্ভব নামক বন্ধুদ্বয়ের সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন ঘটে। অতঃপর কোনও যাদুকরের সাহায্যে রাজবাহন মালবরাজ অবন্তিসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁর কাছে প্রসঙ্গক্রমে চতুর্দশ ভুবনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। ক্রমে ক্রমে অপহারবর্মা ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে রাজপুত্র রাজবাহনের পুনর্মিলন ঘটে এবং গঙ্গা-তীরে উপবেশন করে তিনি সব রাজপুত্রের আশ্চর্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। এই গল্পসমুচ্চয়ই দশকুমার-চরিত। প্রকৃত দশকুমার-চরিতের পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা নিয়ে সম্পূর্ণ দশকুমার-চরিত তিন ভাগে বিভক্ত, বলা চলে।২

দশকুমার-চরিত নানা রস, অলঙ্কার, ভাষার উচ্ছ্বাস ও গাম্ভীর্য প্রভৃতি যাবতীয় কাব্য-গুণে বিমণ্ডিত। এ গ্রন্থের চরিত্রচিত্রণ অতি সুনিপুণ; প্রতিটি চরিত্র আপন আপন মহিমায় অত্যুজ্জ্বল। সূক্ষ্ম হাস্যরসের অবতারণা হেতু গ্রন্থটি অত্যন্ত মনোরম। বাণভট্ট ও সুবন্ধুর ভাষার কৃত্রিমতা এতে নাই; অথচ চিত্রণপটুত্ব আছে; স্বল্পাবসরে চিত্রের পর চিত্র চোখের উপরে ভেসে যেতে থাকে। ঘটনার দৈন্য এ গ্রন্থে নাই। কামশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের অবতারণায় এ গ্রন্থ সুসমৃদ্ধ। অষ্টম উচ্ছ্বাসে অর্থশাস্ত্রের বিশ্লেষণ কবির অপূর্ব মনীষার পরিচায়ক।

দণ্ডী ন্যূনকল্পে তের শত বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গদ্যগ্রন্থ দশকুমার-চরিত এবং অলঙ্কারগ্রন্থ কাব্যাদর্শ স্ব স্ব পর্যায়ে অতুলনীয়, সর্বপ্রথম না হলেও স্বকীয় গৌরবে পূর্বাচার্যদের কৃতিকে পরিম্লান করে শ্রেষ্ঠতার প্রতীকরূপে স্বীকৃত ও বিরাজিত।*

২ দশ রাজকুমারের নাম—(১) রাজবাহন, (২-৩) উপহারবর্মা ও অপহারবর্মা (মিথিলরাজের পুত্রদ্বয়), (৪-৬) মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত ও অর্থপাল, (৭-৮) বিশ্রুত ও পুষ্পোদ্ভব, (৯-১০) প্রমতি ও সোমদত্ত।

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর সাহিত্য-বাসরে পঠিত এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

সাধু-সন্ন্যাসীদের কত বৎসরে "এক পুরুষ" হয়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

গত ১৩৪৯ সালের পৌষ মাসের 'প্রবাসী'তে "কত বৎসরে এক পুরুষ ধরা উচিত" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। আলোচনার মূল ভিত্তি কয়েকটি সামাজিক তথ্য (যাহা কেবলমাত্র গৃহীদের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া খাটে) এবং কয়েকটি রাজবংশের বা বিশিষ্ট বংশের ইতিহাস। কিন্তু গৃহীদের সম্বন্ধে যে যুক্তি, সিদ্ধ সাধু-সন্ন্যাসী-দের বেলায় তাহা খাটে না। এ জন্য সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে কত বৎসরে "এক পুরুষ" ধরা উচিত সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রথমেই আপত্তি হইতেছে যে, সাধু-সন্ন্যাসীরা বিবাহ করেন না, যদিও কেহ কেহ পূর্বাশ্রমে বিবাহ করিয়া থাকেন, সন্ন্যাস গ্রহণের পর উহার সহিত সম্পর্ক রাখেন না, সুতরাং তাঁহাদের আবার বংশই বা কি আর 'পুরুষ'ই বা কি? সাধু-সন্ন্যাসীরা নিজ নিজ গুরুকে গুরু-পিতা ও তাঁহার গুরুকে দাদা-গুরু বলেন ও তদ্রূপ জ্ঞান করেন। ব্রজবিদেহী মোহন্ত শ্রীমৎ স্বামী ধনঞ্জয় দাস মহারাজ তৎপ্রণীত নিজ গুরু ব্রজবিদেহী মোহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবনীতে তাঁহাকে সর্বত্র "শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সন্তদাস বাবাজী

মহারাজের গুরু ব্রজবিদেহী মোহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজকে "শ্রীশ্রীদাদাগুরুজী মহারাজ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজ তদীয় গুরুর জীবনী শ্রীশ্রীভোলানন্দ চরিতামৃত গ্রন্থে আপনার গুরুকে "বাবা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং গুরুর গুরুকে "দাদা-গুরু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। একই গুরুর শিষ্যেরা পরস্পরকে গুরুভাই বলিয়া জ্ঞান করেন ও সেই ভাবে পরস্পরকে সম্বোধন করেন। শিষ্য-প্রশিষ্যেরা বা চেলা পর-চেলারাই গুরুর "বংশধর"।

উপরে যে সাধু-সন্ন্যাসীদের উল্লেখ করিয়াছি তাহা সাধারণ ভাবে করিয়াছি। বর্ত্তমান কালে হিন্দু সাধুরা—সন্ন্যাসী, যোগী, বৈরাগী ও পন্থী প্রধানতঃ এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সন্ন্যাসীরা শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদী। যোগীরা যদিও অদ্বৈতবাদী, তথাপি তাঁহারা বিভিন্ন প্রকার যোগসাধন করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে গণ্য করা হয়। বৈরাগীরা রামানুজ ও অন্যান্য দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের অনুবর্ত্তী। মুসলমান রাজত্বের সময় যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে পন্থী বলে, যেমন নানক-পন্থী, দাদু-পন্থী। ইঁহাদের মধ্যে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয় প্রকার মতাবলম্বীই দেখিতে পাওয়া যায়।

পরমগুরুর দেহরক্ষার পর হইতে কত বৎসর পরে দাদা-গুরু দেহরক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার পর গুরুদেব কবে দেহরক্ষা করিয়াছেন জানিতে পারিলে সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে কত বৎসরে "এক পুরুষ" হয় তাহা জানিতে পারা যাইবে। এই সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন। আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা এই প্রবন্ধে দিলাম এবং তাহা হইতে গুরু-পরম্পরায় সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে কত বৎসরে "এক পুরুষ" হয় তাহার একটা আন্দাজ বা প্রাথমিক হিসাব পাওয়া যাইবে।

(১) সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত গুরু প্রদীপের তৃতীয় পৃষ্ঠায় আছে যে, শঙ্করাচার্য্য বঙ্গদেশে বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দদেবের সঙ্গে দেখা করেন। বর্ত্তমানে (অর্থাৎ, ইং ১৯২৬ সালে যখন এই পুস্তক প্রকাশিত হয়) বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ দেবের ১৩৯তম প্রশিষ্য বশিষ্ঠানন্দ সরস্বতী বিদ্যমান। শঙ্করাচার্য্য ইংরেজী ১৩০ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গ্রন্থকার ধরিয়া লইয়াছেন। এমতে (১৯২৬-১৩০) /১৩৮ = ১৩.০ বৎসরে এক পুরুষ হয় এইরূপ একটা হিসাব পাইতেছি।

(২) ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য তাঁহার শঙ্কর-চরিতে লিখিয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য্য ৬০৮ শকাব্দের ১২ই বৈশাখ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং ৩২ বৎসর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন। এমতে তাঁহার দেহত্যাগের বৎসর ইংরেজী ৭১৮ খ্রীষ্টাব্দ। অনেক ঐতিহাসিকের মতে শঙ্করাচার্য্য গুপ্ত যুগের পরবর্ত্তী। এই মত প্রামাণ্য ধরিয়া হিসাব করিলে বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দের শিষ্য-প্রশিষ্যদের বংশপরম্পরায় গড়ে এক পুরুষে (১৯২৬-৭১৮) /১৩৮ = ৮.৮ বৎসর হয়।

(৩) স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত "আমার দেশ" নামক পুস্তকের ২২৫ পৃষ্ঠায় আছে—"সারদা মঠে এই পর্য্যন্ত পঁচাত্তর জন শঙ্করাচার্য্য হইয়াছেন। বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্যের নাম চন্দ্রশেখর আশ্রম।" ইহা তিনি ১৩৪৯ সালের ফাল্গুন মাসে লিখিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য দেহরক্ষার পূর্ব্বে ভারতের চারি প্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করেন। সারদা মঠ স্থাপন-পূর্ব্বক শিষ্য বিশ্বরূপ বা হস্তামলকের উপর ইহার ভার দিয়া যান। সারদা মঠ স্থাপনের ৪ বৎসর পরে পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ স্থাপিত হয়। ইহার অন্ততঃ দুই বৎসর পরে তিনি দেহরক্ষা করেন। এমতে সারদা মঠের প্রতিষ্ঠা ইংরেজী ৭১২ সালে। এইরূপ হিসাব ধরিয়া গণনা করিলে আমরা সারদা মঠের জগদ্‌গুরুগণের কত বৎসরে 'এক পুরুষ' হয় তাহা পাই। যথা:—

(১৯৪৩-৭১২) /৭৫ = ১৬.৪ বৎসর।

(৪) নিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ২৯শ আচার্য্য কেশব কাশ্মীর ভট্ট (নিম্বার্ক-দর্শন—রমা চৌধুরী প্রণীত ৬৭ পৃ:)। এই কেশব কাশ্মীরী চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজী এই সম্প্রদায়ের ৫৫তম পুরুষ (ধনঞ্জয় দাস বাবাজী প্রণীত সন্তদাস বাবাজীর জীবনী—৩৮৮ পৃ:)। তিনি ১৩৪১ সালের কার্ত্তিক মাসে (ইংরেজী ১৯৩৪ সালে) দেহ-রক্ষা করিয়াছেন। কেশব কাশ্মীরী চৈতন্যদেব অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন; এজন্য তাঁহার কাল ইংরেজী ১৫১০ ধরিলে অন্যায় হইবে না। এই হিসাবে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য্যদের বংশে এক পুরুষ হয় (১৯৩৪-১৫১০) /২৬ = ১৬.৩ বৎসর।

(৫) কাশীর বিখ্যাত সন্ন্যাসী ত্রৈলঙ্গ স্বামীর জীবনীতে (তদীয় প্র-শিষ্য স্বামী পরমানন্দ প্রণীত জীবনী, মলাটের ২য় পৃষ্ঠায়) তাঁহার গুরুপরম্পরা ও জন্ম-মৃত্যুর তারিখ এইরূপ দেওয়া আছে:

১। স্বামী ভগীরথানন্দ সরস্বতী
(ইং ১৪৮৭—ইং১৬৯৭) = ২১০ বৎসর।

২। স্বামী গজানন্দ সরস্বতী (ত্রৈলঙ্গ স্বামী)
ইং ১৬০৭—ইং১৮৮৭) = ২৮০ বৎসর।

৩। শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী (ইং ১৮২৭—ইং ১৯৫০) ১২৩ বৎসর

ইঁহাদের এক এক পুরুষের গড় ধরিলে অন্ততঃ পক্ষে ১৫৫ বৎসর পাওয়া যায়। এই হিসাব যে কাল্পনিক বা লোক-পরম্পরা-শ্রুত কিম্বদন্তী নহে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে।

(৬) শিখদের দশ জন গুরু। তাঁহাদের গুরুপরম্পরা নিম্নে দেখানো হইল:

১। নানক দেব (ইং ১৪৬৯—১৫৩৮)
২। অঙ্গদ (ইং ১৫০৪—১৫৫২) শিষ্য
৩। অমরদাস (ইং ১৫০৯—১৫৭৪) শিষ্য
৪। রামদাস (?—১৫৮১) অমরদাসের জামাতা
৫। অর্জুন দাস (১৫৬৩—?) ৪র্থের পুত্র
৬। হরগোবিন্দ (?—১৬৪৫) ৫মের পুত্র
৭। হররায় (?—১৬৬১) ৬ষ্ঠের পৌত্র
৮। হরকিষণ — — ৭মের পুত্র
৯। তেগবাহাদুর — — ৬ষ্ঠের পুত্র
১০। গোবিন্দ সিংহ (১৬৬৬—১৭০৮) ৯মের পুত্র

গুরু নানকের মৃত্যু হইতে গুরু গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর ব্যবধান ১৭০ বৎসর। এই ১৭০ বৎসরে নয় জন গুরুপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। গড়ে প্রত্যেক গুরুর সময় ১৮·৯ বৎসরে দাঁড়ায়।

(৭) তারকেশ্বরের মোহন্ত মহারাজদের ক্রম এইরূপ :

(১) মুকুন্দরাম ঘোষ ; (২) জগন্নাথ গিরি ; (৩) কমললোচন গিরি ;(৪) শম্ভুচন্দ্র গিরি ;(৫) গোপালচন্দ্র গিরি ;(৬) রাধাকান্ত গিরি ;(৭) গঙ্গাধর গিরি ; (৮) প্রসাদচন্দ্র গিরি ; (৯) পরশুরাম গিরি ;(১০) শ্রীমন্ত গিরি ;(১১) রঘুচন্দ্র গিরি ;(১২) মাধব গিরি ; (১৩) সতীশচন্দ্র গিরি ; (১৪) শ্রীযুক্ত দণ্ডিস্বামী মহারাজ।

মুকুন্দ ঘোষের মৃত্যুর তারিখ সঠিক জানা যায় নাই। তিনি রাজা ভারামল্ল রায়ের সমসাময়িক। রাজা ভারামল্ল তারকেশ্বরকে যে জমি দান করেন তাহার তারিখ নাকি ১০ই চৈত্র ১০৮৫ সাল। এমতে আন্দাজ ২০ বৎসরে এক পুরুষ হয়।

(৮) পুরীতে অনেকগুলি বৈষ্ণব মঠ আছে। সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত "শ্রীক্ষেত্র" নামক পুস্তকে অনেকগুলি মঠের গুরুপরম্পরার বিবরণ দেওয়া আছে। এই সব মঠ শ্রীচৈতন্য বা তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের প্রতিষ্ঠিত। তিনি পুরীতে ইংরেজী ১৫১৬ সাল হইতে বসবাস করেন ; এবং তাঁহার তিরোধান হয় ইং ১৫৩৩ সালে। এইজন্য এই সকল মঠ প্রতিষ্ঠার তারিখ আন্দাজ ইং ১৫২৫ সাল ধরিয়া লইলে অযৌক্তিক হইবে না। আমরা নিম্নে এই ধরিয়া হিসাব করিলাম।

৮ (১) ঐ পুস্তকের ১৭৩ পৃষ্ঠায় তোটা গোপীনাথ মঠের সেবকগণের গুরু-পরম্পরার তালিকা এইরূপ দেওয়া আছে। যথা :

(১) শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ; (২) শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী —'মামু গোস্বামী' ; (৩) রঘুনাথ ; (৪) রামচন্দ্র ; (৫) রাধা-বল্লভ ; (৬) কৃষ্ণজীবন ; (৭) শ্যামসুন্দর ; (৮) সান্ত্বামণি ; (৯) হরিনাথ ; (১০) নবীনচন্দ্র ; (১১) মতিলাল ; (১২) দয়াময়ী ; (১৩) কুঞ্জবিহারী।

কুঞ্জবিহারী দয়াময়ীর দৌহিত্রের সন্তান। এই মঠে গড়ে (১৯৫০—১৫২৫) /১৩=৩২·৭ বৎসরে এক পুরুষ হয়।

৮ (২) ঐ পুস্তকের ১৯৬ পৃষ্ঠায় রাধাদামোদর মঠের গুরু পরম্পরা এইরূপ দেওয়া আছে। যথা :

(১) শ্রীরূপ ; (২) শ্রীজীব ; (৩) শ্রীপ্রেমদাস ; (৪) কৃষ্ণদাস; (৫) রাধাচরণ দাস ; (৬) ভগবানদাস ; (৭) জগন্নাথ দাস ; (৮) দামোদর দাস ; (৯) মাধবানন্দ দাস ; (১০) গোবিন্দচন্দ্র দাস।

এই মঠে গড়ে (১৯৫০—১৫২৫) /১০=৪২·৫ বৎসরে এক পুরুষ হয়।

৮ (৩) ঐ পুস্তকের ২১৪ পৃষ্ঠায় রাধাকান্ত মঠের মোহন্ত পরম্পরার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে :

(১) শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ; (২) শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত ; (৩) শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী ; (৪) শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী ; (৫) শ্রীবলভদ্র গোস্বামী ; (৬) শ্রীদয়ানিধিদাস গোস্বামী ; (৭) শ্রীদামোদরদাস গোস্বামী ; (৮) শ্রীগোবিন্দশরণ দাস গোস্বামী প্রভৃতি ১৭ জন গোস্বামীর নাম লিখিত আছে। এই মঠে গড়ে ৪২৫/১৭=২৫·০ বৎসরে এক পুরুষ।

৮ (৪) ঐ পুস্তকের ২২২ পৃষ্ঠায় শ্রীসিদ্ধবকুল মঠের গুরু-পরম্পরার বিবরণ এইরূপ দেওয়া আছে :

(১) শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু ; (২) শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ঠাকুর ; (৩) সিদ্ধ জগন্নাথ দাস ; (৪) নরহরিদাস মহান্ত গোস্বামী ; (৫) গৌরহরি দাস ; (৬) রাধামোহন দাস ; (৭) গোপীমোহন দাস ; (৮) ভগবানদাস ;(৯) গোপীচরণ দাস ; (১০) শ্যামাচরণ দাস (১১) সাধুচরণ দাস ; (১২) নরহরিদাস ; (১৩) বলরাম দাস ; (১৪) পরমানন্দ দাস ; (১৫) শ্রীবলভদ্র দাস মোহন্ত গোস্বামী। এই মঠে গড়ে ৪২৫/১৫=২৮·৩ বৎসরে এক পুরুষ।

৮ (৫) ঐ পুস্তকের ২৩৬-২৩৭ পৃষ্ঠায় শ্রীগঙ্গামাতা মঠের গুরুপরম্পরা এইরূপ লিখিত আছে। যথা :

(১) শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ; (২) শ্রীগঙ্গামাতা ; (৩) শ্রীবনমালী দাস ; (৪) শ্রীগোপাল দাস ; (৫) শ্রীভগবান দাস ; (৬) শ্রীমধুসূদন দাস ; (৭) শ্রীনীলাম্বর দাস ; (৮) শ্রীনরোত্তম দাস (৯) শ্রীপীতাম্বর দাস ; (১০) শ্রীমাধব দাস ; (১১) শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস ; (১২) শ্রীবনমালী দাস।

ইহার মধ্যে শ্রীগঙ্গামাতা ঠাকুরাণী ১২০ বৎসর বয়সে ইং ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। সেজন্য এই মঠের গড় ধরিবার সময় আমরা নিম্নরূপ হিসাব করিলাম।

গড়ে (১৯৫০—১৭২১) /১০=২২·৯ বৎসরে ১ পুরুষ (১)
গড়ে ৪২৫/১১= ৩৮·৭ " — (২)

শ্রীগঙ্গামাতার দীর্ঘ জীবন এই মঠের পক্ষে ব্যতিক্রম বলিয়া

১ম হিসাবটিই আমাদের মতে প্রকৃত গড় হিসাবে ধরা উচিত।

৮ (৬) ঐ পুস্তকের ২৫৫ পৃষ্ঠায় বড় উড়িয়া মঠের গুরু-পরম্পরা এইরূপ দেওয়া আছে :

(১) শ্রীমন্মহাপ্রভু ; (২) শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ; (৩) শ্রীহৃদয়ানন্দ পণ্ডিত ; (৪) শ্রীবলরাম দাস ; (৫) অভিবড়ী শ্রীজগন্নাথ দাস (কথিত আছে ইনিই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন) ; (৬) অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণ দাস ; (৭) শ্রীমুরারী দাস গোস্বামী ; (৮) পুরুষোত্তম দাস গোস্বামী ; (৯) মুকুন্দদাস গোস্বামী ; (১০) মাধবানন্দ দাস গোস্বামী ; (১১) শ্রীনাথ দাস গোস্বামী ; (১২) বংশীধর দাস গোস্বামী ; (১৩) শ্যামাচরণ দাস গোস্বামী ; (১৪) নীলাদ্রিদাস গোস্বামী ; (১৫) রাসবিহারী দাস গোস্বামী। (১৬) রামকৃষ্ণ দাস গোস্বামী ; (১৭) শ্রীবৃন্দাবন দাস গোস্বামী। এই মঠে গড়ে ৪২৫/১৭=২৫'০ বৎসরে এক পুরুষ হয়।

৮ (৭) কলিভিলক মঠ শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক শ্রীরূপ কবিরাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ষোড়শ মোহন্ত ইংরেজী ১৯৪৬ সালে মারা যান। এই মঠে আমাদের উপরি-উক্ত হিসাব মত গড়ে ২৬.৪ বৎসরে এক পুরুষ হয়।

পুরীর বৈষ্ণব মঠসমূহের গুরুপরম্পরায় গড় এক পুরুষে কত বৎসর হয় তাহা নিম্নরূপ দাঁড়ায় :

(১)	তোটা গোপীনাথ মঠ	—৩২'৭ বৎসর
(২)	রাধা দামোদর মঠ	—৪২'৫ ,,
(৩)	রাধকান্ত মঠ	—২৫'০ ,,
(৪)	সিদ্ধবকুল মঠ	—২৮'৩ ,,
(৫)	গঙ্গামাতা মঠ	—২২'৯ ,,
(৬)	বড় উড়িয়া মঠ	—২৫'০
(৭)	কলিভিলক মঠ	—২৬'৪

মোট গড়—২৯'০ বৎসর

বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গড় ৪২'৫ বৎসর ; আর সর্ব্বাপেক্ষা কম গড় ২২'৯ বৎসর—এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ১৯'৬ বৎসর প্রায় সর্ব্বনিম্ন গড়ের কাছাকাছি। আর গঙ্গামাতা মঠের দুই হিসাবের পার্থক্য একমাত্র গঙ্গামাতার সুদীর্ঘ জীবনের জন্য ১৫'৮ বৎসর। সুতরাং এই পার্থক্য ব্যতিক্রম না ধরিয়া মঠের গুরুপরম্পরায় সম্ভব বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

আরও একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, যে মঠের প্রথম মোহন্ত বা গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং—যেমন রাধাকান্ত মঠ, সিদ্ধবকুল মঠ, বড় উড়িয়া মঠ, ইহাদের গড়ের পার্থক্য খুব বেশী নয়।

রাধাকান্ত মঠের গড় ২৫'০ বৎসর
সিদ্ধবকুল মঠের গড় ২৮'৩ ,,
বড় উড়িয়া মঠের গড় ২৫'০ ,,
মোট গড় ২৬'১

(৯) শ্রীনবদ্বীপ দাস প্রণীত "শ্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস" নামক পুস্তিকার ৩৬ পৃষ্ঠায় শ্রীরাধাকুণ্ডের মোহন্ত পরম্পরায় নামমালা প্রদত্ত আছে। লেখকের মতে "১৫৩৩ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত" ঊনত্রিংশ জন মোহন্তের নামমালা এইরূপ :

"১। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ২। শ্রীজীব গোস্বামী। ৩। শ্রীকৃষ্ণদাস। ৪। শ্রীনন্দকিশোর। ৫। শ্রীব্রজকুমার। ৬। শ্রীগোপীরমণ ৭। শ্রীঅনন্তদাস ৮। শ্রীরাধামোহন ৯। শ্রীনিত্যানন্দ ১০। শ্রীপরমানন্দ ১১। শ্রীচরণ ১২। শ্রীগোবিন্দ ১৩। শ্রীপুরুষোত্তম ১৪। শ্রীবৈষ্ণবচরণ ১৫। শ্রীগৌরাঙ্গ ১৬। শ্রীযমুনা ১৭। শ্রীগোপীদাস ১৮। শ্রীনরসিংহ ১৯। শ্রীগুরুচরণ ২০। শ্রীব্রজানন্দ ২১। শ্রীগোবিন্দ ২২। শ্রীজগদানন্দ ২৩। শ্রীরাধারমণ ২৪। শ্রীগৌরদাস ২৫। শ্রীঅদ্বৈত ২৬। শ্রীসনাতন ২৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ২৮। শ্রীনরহরি ২৯। শ্রীনবদ্বীপ।"

এমতে দেখা যায় ৪১২ বৎসরে ২৯ জন মোহন্ত হইয়াছেন। এই হিসাবে গড়ে এক এক জন মোহন্তের সময় ১৪'২ বৎসর। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ১৬শ মোহন্ত একজন স্ত্রীলোক।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্য-প্রশিষ্যদের গড় প্রথম হিসাবে হয় ১৩'০ বৎসর। আর ২য় হিসাবে হয় ৮'৮ বৎসর। উভয় হিসাবের তফাত ৪'২ বৎসর এবং ইহাদের দুই হিসাবের গড় ১০'৯ বৎসর। আমরা শেষোক্ত হিসাবটিকে প্রামাণ্য বলিয়া ধরিলাম ; কারণ সময় সম্বন্ধে বেশীর ভাগ পণ্ডিতের মত ইন্দ্রদয়াল বাবুর পক্ষে। আর সময় সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ভুল হওয়া সম্ভব হইলেও গুরুপরম্পরায় সাধারণতঃ ভুল হইবার সম্ভাবনা অল্প।

রাধাকুণ্ডের মঠের মোহন্তপরম্পরায় গড়	১৪'২	বৎসর
সারদা মঠের গুরুপরম্পরায় গড়	১৬'৪	,,
নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য্যদের গড়	১৬'৩	,,
ত্রৈলঙ্গ স্বামীর গুরুশিষ্যর গড়	১৫৫	,,
শিখগুরুদের গড়	১৮'৯	,,
তারকেশ্বরের মোহন্তদের গড়	২০	,,

সারদা মঠের গড় ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গড় খুব কাছাকাছি হইলেও এই নৈকট্য দৈবাৎ ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। বর্ত্তমানে আমাদের মতে সম্প্রদায়ভেদে গড়ের ভেদ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং সাধু-সন্ন্যাসীদের কত বৎসরে এক পুরুষ হয় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে।

সামোয়া দ্বীপের একটি ছায়াময় গ্রাম

পলিনেশীয়দের উপকথা

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ

ফিজি দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের এক অতি বিস্তৃত অঞ্চলের নাম পলিনেশিয়া। হাওয়াই, তাহিতি, তুয়ামোতু, এলিস্, রোরোতোঙ্গা, ম্যাঙ্গাইয়া, আতিইউ, ইষ্টার, সোসাইটি, ফিনিক্স ইত্যাদি দ্বীপসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্ব-সাগরের বিরাট নীল বক্ষে অবস্থিত এই সমস্ত দ্বীপ যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। তাদের শ্যামল ক্রোড়ে অশান্ত বায়ুতে আন্দোলিত তাল, নারকেল এবং সুপারির অরণ্য যুগযুগান্তর ধরে যেন কি এক অপূর্ব্ব মায়াজাল বিস্তার করে আসছে। ঝড়, ঝঞ্ঝাবর্ত্ত, সামুদ্রিক প্লাবন, ভূমিকম্প এবং আগ্নেয় গিরির অগ্নিস্রাব পলিনেশিয়ার প্রাত্যহিক ঘটনা। এখানকার অধিবাসীদের দৃষ্টির সমক্ষে সদা-প্রসারিত সীমাহীন মহাসমুদ্র। সেইজন্য বোধ হয় পলিনেশীয়েরা অসীমের সুরকে কতকটা উপলব্ধি করতে পারে। এহেতু পলিনেশীয়দের উপকথাতেও এমন এক রসলোকের সন্ধান পাওয়া যায় যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বাস্তব জগতের ঊর্দ্ধে।

পলিনেশীয় উপকথায় নর-নারীর প্রেমের যে প্রকাশ দেখতে পাই তা মনকে যেন কোন্ এক সুদূর কল্পলোকে টেনে নিয়ে যায়। হাওয়াই ও রোরোতোঙ্গা দ্বীপের একটি প্রাচীন উপকথায় কোনও এক বিরহিণী নারীর অন্তর্গূঢ় বেদনাকে যে ভাবে কবিতায় রূপায়িত করা হয়েছে তা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। এই সব কবিতা পলিনেশীয়ার বিভিন্ন দ্বীপসমূহে সুর-সংযোজিত হয়ে গীত হয়ে থাকে।

পলিনেশীয়ায় এমন অনেক উপকথা আছে যা ঐতিহাসিক গাথা ('মেলে') রূপে সুদূর অতীতকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত লোকমুখে প্রচারিত হয়ে আসছে। এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত বেশী। উপযুক্ত গবেষণা দ্বারা এই গাথাসমূহ থেকে শুধু যে প্রাচীন প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার হতে পারে তা নয়, এর ফলে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে পূর্ব্ব-প্রশান্ত মহাসাগরের অগণিত দ্বীপসমূহের মধ্যে এক গভীর সাংস্কৃতিক যোগসূত্রও আবিষ্কৃত হতে পারে। এখানে দুটি পলিনেশীয় উপকথার অনুবাদ দেওয়া হ'ল।

হাওয়াই দ্বীপের উপকথা

প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে লালিত মায়াঘেরা দ্বীপপুঞ্জ 'হাওয়াই'। এরই মধ্যে একটি অতি সুন্দর দ্বীপ 'মাওই'। তার রাজার আদরিণী মেয়ে কেলেয়া। রাজকন্যা কেলেয়া যে কেবল অপরিসীম রূপলাবণ্যবতী ছিল তা নয়, তার সাহসও ছিল অদম্য। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে ছিল তার মিতালি। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে তাকে প্রায়ই দেখা যেত অতি নিশ্চিন্তভাবে সাঁতার দিতে। তাকে সত্যিই তখন জলকন্যার মত দেখাত। কেলেয়ার সাগর-প্রীতি দেখে স্বতঃই অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, নিশ্চয়ই কোন জলদেবতা তাকে অভয় দান করেছেন। তা না হলে কেউ এমন ভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করে সাগরের বুকে নিশ্চিন্তমনে জলকেলি করতে পারে না।

সুন্দরী কেলেয়া যখন প্রথম যৌবনে পা দিয়েছে, এমন সময় তার বাবা একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এখন 'মাওই' দ্বীপের রাজপদে অভিষিক্ত হ'ল কেলেয়ার বড় ভাই

চন্দ্রদেবীর নিকট তার মানব-স্বামীর বিদায় গ্রহণ
(আতিইউ-দ্বীপের উপকথা)

যুবরাজ কাওয়াও। সে তার বোনের দুঃসাহসিক কার্য্যকলাপ দেখে দুর্ভাবনায় পড়ল। তাকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করবার জন্য সে চাইল তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দিতে। কিন্তু কাওয়াও যখনই বিয়ের কথা তুলত, কেলেয়া উচ্ছল হাসি হেসে বলত সাগরের ভেলাই তার একমাত্র স্বামী, আর কেউ নয়। সত্যিই কেলেয়া যেন সমুদ্র-কন্যা। এদিকে দৈববাণী হয়েছিল যে, রাজকুমারী তার স্বামীকে লাভ করবে নৌকোর মধ্যে। সুতরাং কাওয়াও আর পীড়াপীড়ি করত না। বোনের উত্তর শুনে চুপ করে যেত।

এই সময় ওয়াহু দ্বীপের তরুণ রাজপুত্র লোলালের জন্য উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধানে নৌকো করে বেরুল তার দূরসম্পর্কীয় ভাই কালামাকুয়া। লোলালে বিষাদ-ভারাক্রান্ত চিত্তে দিন-যাপন করছিল। সে কোনও সময় ভালবাসত তারই স্বজাতি একটি পরমা সুন্দরী মেয়েকে। কিন্তু সে জলে ডুবে মরে যাওয়ায় লোলালের মনে এত আঘাত লেগেছিল যে, সে অনেক দিন পর্য্যন্ত বিয়ে করতে রাজী হয় নি। তা ছাড়া প্রিয়তমার অকাল-অপমৃত্যুতে সমুদ্রের প্রতি তার একটা বিরাগও জন্মেছিল। সেইজন্য সে লিহুয়ের এমন এক জায়গায় বাস করত যেখানে সাগরের কল্লোল-ধ্বনি পৌঁছাতে পারত না।

নানা দ্বীপ ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে কালামাকুয়ার নৌকো এসে পৌঁছল 'মাওই' দ্বীপের উপকূলে। এই সময় কেলেয়া সাঁতার দিচ্ছিল সেই জায়গায় সমুদ্রবক্ষে। কালামাকুয়া তাকে মিষ্ট কথায় মুগ্ধ করে তার নিজের নৌকোয় তুলে নিলে। এই সময় উঠল তুমুল ঝড়, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে নৌকো-খানি ভীষণ ভাবে দুলতে লাগল। সঙ্গের নাবিকেরা হতাশ হলেও কালামাকুমার অপূর্ব্ব দক্ষতায় নৌকোখানি ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা পায়। ঝটিকা শান্ত হবার পর কালামাকুয়া নৌকোখানিকে নিয়ে চলল ওয়াহু দ্বীপে অবস্থিত লিহুয়ের দিকে। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে কেলেয়ার প্রকৃত পরিচয় তার অজানা রইল না। নৌকোয় রাজকুমারীর নিরন্তর সাহচর্য্য তার মনে যেন মোহজাল বিস্তার করলে, সে হ'ল তার প্রতি গভীর-ভাবে প্রণয়াসক্ত। একদিন কালামাকুয়া রাজকন্যা কেলেয়ার রূপের প্রশংসা করে আবেগকম্পিতকণ্ঠে বললে যে, সে

হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জের চিকিৎসাদেবী 'কুইলামোকু'

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে সুন্দর ফুল, আর দেবতাদের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তার কথায় কেলেয়ার অন্তরে দোলা লাগল, তার মন হয়ে উঠল অপূর্ব্ব প্রণয়রাগে রঞ্জিত।

যথাসময়ে কালামাকুয়ার নৌকো 'ওয়াহু' দ্বীপে এসে পৌঁছল। প্রিয়াহারা লোলালে কেলেয়ার অনুপম তনুশ্রী দেখে মুগ্ধ হ'ল। সে যেন তার পূর্ব্বপ্রণয়িনীর প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলে মাওই দ্বীপের রাজকুমারীর ঘন কালো চোখে।

মাওরি যোদ্ধা

তারপর এক শুভ দিনে লোলালের সঙ্গে কেলেয়ার পরিণয় সম্পন্ন হ'ল। কালামাকুয়ার প্রতি গোপন প্রেম তার হৃদয়ের কোন্ গহনতলে চাপা পড়ে গেল তা কেউ জানতেও পারলে না। লোলালের সুন্দর চেহারা দেখে যেমন সে মুগ্ধ হয়েছিল তেমনি তার নির্মল চরিত্রের কথা শুনে তার প্রতি তার শ্রদ্ধার উদ্রেকও হয়েছিল। দিন যায়। ক্রমে কেলেয়ার কয়েকটি সন্তান জন্মাল। লোলালে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে তাকে ভালবাসতে লাগল। সে কেবল ভাবত কেলেয়াকে কি করে আরও সুখী করবে। কেলায়ার কিন্তু ক্রমে ক্রমে মনটা শূন্যতায় ভরে উঠতে লাগল, তার কিছুই ভাল লাগত না। মন তার কেবলই কাঁদত সাগরের জন্য। সুযোগ পেলেই সে যেত সাগরোপকূলে কালামাকুয়ার কাছে। সেখানে সে তার সঙ্গে সাঁতার কাটত সামুদ্রিক হ্রদে, আর মন তার ছুটে চলে যেত সুদূর সমুদ্রের অনন্তপ্রসারিত নীলাম্বুরাশির অভিমুখে। কালামাকুয়াকে তার সত্যিই খুব ভাল লাগত। তাকে দেখলে তার হৃদয় আগেকার মতই আনন্দে নেচে উঠত। তার প্রতি তার ভালবাসা তো লোপ পেয়ে যায় নি। আর দু'জনেরই যে সমুদ্রপ্রীতি ছিল গভীর।

ক্রমে এই কথা লোলালের কানে এসে পৌঁছল। এতে তার মন দুঃখে ভরে উঠল। কিন্তু সে মুখে কিছু বললে না। কারণ সে বুঝত আশৈশব সমুদ্রবক্ষে লালিতা রমণীকে বেঁধে রাখবার মত ক্ষমতা তার নেই। তা ছাড়া, ভালবাসা তো জোর করে আদায় করা যায় না। লোলালে যা আশঙ্কা করেছিল একদিন সত্যিই তাই ঘটল। কেলেয়া স্বামীর কাছ থেকে চিরতরে বিদায় নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে। লোলালে জানতে চাইল—"কেন?" এক উত্তর—"ভাল লাগে না।"

লোলালের মুখ থেকে ক্রোধ, বিরক্তি অথবা আক্ষেপসূচক কোন কথা বেরুল না। সে শুধু অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললে, "তবে আমাদের বিচ্ছেদ শান্তি এবং প্রীতির ভেতর দিয়েই হোক।" কেলেয়া লোলালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল কালামাকুয়ার কাছে, এবং নূতন করে তার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'ল। লোলালেকে ত্যাগ করতে সে বাধ্য হয়েছিল, কারণ সাগরের ডাক তার কানে এসে পৌঁছে তাকে আকুল করে তুলেছিল।

নিউজীল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসী "মাওরি"দের উপকথা—
পারে ও হুতুর কাহিনী

'মাওরি' তরুণী

খুব বড় ঘরের মেয়ে 'পারে'। অভিজাত-সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তাই তাকে পবিত্র কুমারী (পুহি) হিসাবে এক অতি সুরক্ষিত গৃহের অভ্যন্তরে খুব কড়া নজরে রাখা হয় যাতে তার সঙ্গে কোনও সাধারণ লোক মিশতে না পারে। পর পর তিনটি কাঠের প্রাচীর-বেষ্টিত পারের বাস-গৃহ সাধারণ লোকদের পক্ষে দুরধিগম্য ছিল—সেটির
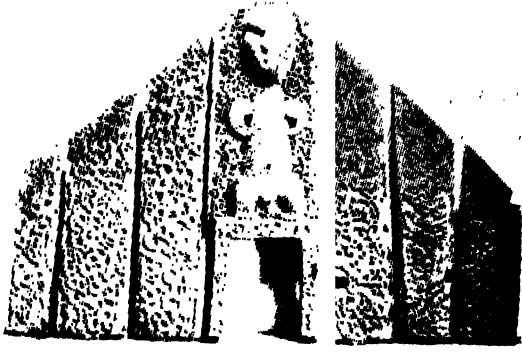
গোলাঘরের সম্মুখভাগের কারুকার্য্য (নিউজীল্যাণ্ড)

সৌন্দর্য্যও কম ছিল না। নানারকম সুগন্ধি ফুল এবং বিবিধ উপকরণ দিয়ে সাজানো বাড়িটি দেখাত যেন স্বপ্নপুরীর মত।

এমন সুরক্ষিতভাবে থাকলেও সুন্দরী "পুহি" ভালবেসে ফেলল 'হুতু' নামে এক সুন্দর তরুণ যোদ্ধাকে। যখন সে তার বাড়ীর সামনে এক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় মত্ত ছিল তখন পারে তাকে দেখতে পেয়েছিল। বাতায়ন থেকে হুতুর বীরত্ব এবং তার নিপুণ অস্ত্রচালনা দেখে পারে বিস্মিত হ'ল। প্রতিযোগিতার সময় হুতুর নিক্ষিপ্ত একটি বল্লম এসে পড়ল পারের গৃহদ্বারের সন্নিকটে। হুতু এল সেটা কুড়িয়ে নিতে। পারে তখন বল্লমটি তুলে নিয়ে তাকে বললে, "আপনি আমার বাড়ীর মধ্যে আসুন; আপনার বীরত্ব দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।" হুতু কিন্তু রাজী হয় না: পুহি তার প্রতি অনুরক্ত হয়েছে একথা বুঝতে পেরে সে নম্রতার সঙ্গে জানালে পুহির গৃহে প্রবেশ করতে তার মত সাধারণ ব্যক্তির সাহস হয় না, তা ছাড়া সে বিবাহিত, এবং তার পুত্র-কন্যা আছে। অভিজাত হুতুর মুখে এই রকম কথা শুনে তার প্রতি পারের অনুরাগ আরও বর্দ্ধিত হয় এবং সে তাকে প্রেম নিবেদন করে। তবু হুতু তার গৃহে যেতে রাজী হয় না। সে তার অনুমতি নিয়ে বিদায় গ্রহণ করলে।

হুতু চলে যাবার পর পুহি আর তার বিরহ-বেদনা সহ্য করতে না পেরে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করে। তার মৃত্যুর কথা চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়লে সকলেই হুতুকে এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করলে। সবাই বলে হুতুকে এর মূল্য দিতে হবে নিজের জীবন দিয়ে। পারের অকালমৃত্যুতে হুতুরও মন বেদনায় মুষড়ে পড়েছিল। তাই সে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া সাব্যস্ত করলে। সে বললে, "মরবার আগে আমি শেষবার চেষ্টা করব পুহির আত্মাকে তার দেহে ফিরিয়ে আনতে। আমার অনুরোধ, ইতিমধ্যে তার দেহ যেন কবর দেওয়া না হয়।" এরপর হুতু চলল পাতালে ("তে রেইঙ্গা") যেখানে আত্মারা থাকে। পথে তার গতিরোধ করলেন পাতালের দেবী হিনে-নুই-তে-পো। হুতু তাকে খুশী করলে সবুজ পাথরের এক রকম সুন্দর অস্ত্র ('মেরে') উপহার দিয়ে। হিনে-নুই-তে-পো তখন পারের আত্মা কোথায় আছে, সে কথা তাকে জানিয়ে দিলে। এর পর হুতু এসে পৌঁছল আত্মাদের দেশে পারের সন্ধানে। হুতুর আগমন-সংবাদ পেয়েও অভিমানিনী পারে তাকে দেখা দেয় না। হুতু তখন উপায়ান্তর না দেখে পুহির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আত্মাদের কাছে নানা ভোজবাজী দেখাতে লাগল। হুতুর অস্ত্র-চালনা দেখে সকলেই খুব তারিফ করতে লাগল। কিন্তু, পারেকে না দেখে সে নিরাশ হ'ল। তখন সে এক নতুন কৌশল অবলম্বন করলে। এক মস্ত বড় ডালহীন গাছ নিয়ে
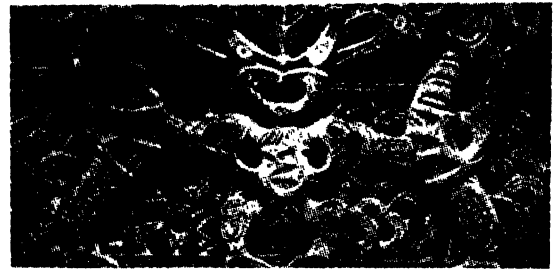
উপকথা-অবলম্বনে কাঠের কারুকার্য্যের (নিউজীল্যাণ্ড)

এল। তার পর মাটিতে পুঁতে সেটির ডগা শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে নোয়ানো হ'ল। তখন হুতু সেই গাছের ডগার ওপর চড়ে দড়িটা ছেড়ে দিতে বললে। হঠাৎ গাছটা এত জোরে সোজা হয়ে গেল যে, হুতু অনেক উঁচু থেকে ছিটকে একেবারে মাটিতে পড়ল। অবশ্য তার গায়ে লেশমাত্র আঘাত লাগল না। তার এই খেলা দেখে সবাই ত অবাক। আড়াল থেকে এই খেলা দেখে পারে ছুটে এল হুতুর কাছে, হঠাৎ হুতু পারেকে কাঁধে নিয়ে নোয়ানো গাছের মাথায় চড়ে বসল। যখন দড়ি ছেড়ে দেওয়া হ'ল, তখন এত প্রচণ্ড বেগে গাছটা সোজা হ'ল যে, পারে ও হুতু দু'জনেই ছিটকে পড়ল মর্ত্ত্য-লোকে।

মাটি আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আমরা মাটিকে ভালবাসি, কিংবা ঘৃণা করি। মাটির দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করি এবং এমন কি মাটির জন্য আমরা মৃত্যু বরণ করি। মৃত্তিকা-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, মাটি যে ভাবে আমাদের তৈরি করে আমরা অনেকটা সেই ভাবেই তৈরি হই।

মানুষ মাটির উন্নতি সাধনের জন্য কি করিয়াছে, কি ভাবে তাহার অপব্যবহার করিয়াছে, কি ভাবে তাহাকে লুণ্ঠন করিয়াছে ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছুই জানি; কিন্তু মাটি মানুষের জন্য কি করিয়াছে এবং কি করিতেছে, সে বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না বলিলেই হয়। আমাদের পায়ের নীচের মাটি অতি সূক্ষ্ম ভাবে নানা বিষয়ে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে; আমাদের চরিত্র, দেহের গঠন, এমন কি মানসিক ক্রিয়া মাটির দ্বারা অনেক পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয়। সময়ে সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আমাদের 'ভোট' দানে প্রণোদিত করে। এমন কি মানুষের সঙ্গীত সম্বন্ধেও মাটি তাহার প্রভাব বিস্তার করে। পাহাড়ে অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গীতের সহিত সমতল প্রদেশবাসীদের সঙ্গীতের তারতম্য যথেষ্টই আছে।

মাটি মানুষের উপর কত দিকে কত ভাবে প্রভাব বিস্তার করে সে সম্বন্ধে মৃত্তিকা-তত্ত্ববিদ্ ডা: চার্লস ই. কেলোগ বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি এমন বহু উদাহরণ দেখাইয়াছেন যাহাতে বুঝা যায় আমাদের জাতীয় ইতিহাসের উপর মাটির প্রভাব কত বেশী। যখনই এক বিপুল জনসংখ্যা এক রকম মাটি হইতে ভিন্ন রকম মাটিতে চলিয়া যায় তখনই তাহাদের মধ্যে ভাবের এক প্রবল উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয় এবং বিদেশীয় মাটি সম্বন্ধে তাহাদের অসন্তোষ বহু প্রকারে প্রকাশিত হয়।

যে সকল স্থানের মাটিতে ক্যালসিয়ম এবং ফস্‌ফরাসের পরিমাণ কম, সেই সকল স্থানের অধিবাসিগণ এই সকল খনিজ পদার্থ দেহের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখে; সেইজন্য সুইডেনের অধিবাসীদের তুলনায় ভারতবর্ষের অধিবাসীরা আকৃতিতে খর্ব্ব। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের আকৃতিও সমান নহে, ইহার পশ্চাতেও মাটির কারসাজি আছে। যে স্থানের মাটিতে আইওডিনের পরিমাণ অল্প সে স্থানের মানুষের গলার গ্রন্থিসমূহ এইরূপ ভাবে স্ফীত হয় যে, তাহার সাহায্যে রাসায়নিক পদার্থের সমস্ত অংশটুকু সে কার্য্যে পরিণত করে।

আমরা মাটিকে মৃত ও জড় পদার্থ মনে করি; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মাটি আশ্চর্য্যরূপে সজীব। মৃত পাহাড় পর্ব্বত এবং প্রাণবন্ত গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার, মানুষ প্রভৃতির মধ্যে ইহাকে সোপান বলা যাইতে পারে। মাটি 'জীবনে' পরিপূর্ণ। এক কণিকা মাটিতে ২০০০,০০০,০০০র বেশী জীবাণু বর্ত্তমান থাকে। ইহা সমগ্র পৃথিবীর মোট জনসংখ্যারও অধিক। মাটিতে যে কত রকমের প্রাণি (কীট, পিপীলিকা, বিছা জাতীয় প্রাণী ইত্যাদি) থাকে তাহা বলা যায় না এবং উহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াও মনে হয় না। আমাদের গবেষণা-গৃহসমূহে যে সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধিত হয় মাটিতে তাহা অপেক্ষা জটিলতর প্রক্রিয়া অনবরত ঘটিতেছে। প্রত্যেক মাসে, প্রত্যেক দিনে এবং এমন কি প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ইহার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে।

মাটির উপরি ভাগের পাতলা স্তর (যে স্তরের জন্য সমগ্র মনুষ্য জাতি জীবিত আছে) পৃথিবীর একটি অতি আশ্চর্য্য বস্তু। নদীর বন্যা এক ঘণ্টায় এক ফুট উচ্চ মাটির একটি স্তর নির্ম্মাণ করিতে পারে; কিন্তু পাহাড়ের ঢালুতে ঐরূপ স্তর নির্ম্মাণ করিতে ১০,০০০,০০০ ঘণ্টা সময় লাগিতে পারে। পাহাড়কে মাটিতে পরিণত করিবার জন্য কত রকমের শক্তি যে অনবরত কাজ করিতেছে তাহা বলা যায় না। সূর্য্য পাহাড়কে তপ্ত করে, রাত্রের শীতল বায়ু উহাকে স্নিগ্ধ ও ঠাণ্ডা করে এবং তখন উহাতে ফাটল ধরে। বৃষ্টির জল ফাটলের মধ্যে প্রবেশ করে, উহাকে জমাট বাঁধিয়া দেয় এবং উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডকে বিক্ষিপ্ত করে। বাতাসের কারবন ডায়োক্সাইড বৃষ্টির জলে গলিয়া কারবনিক এসিডে পরিণত হয় এবং উহার দ্বারা শিলাখণ্ডগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

বৃক্ষাদি এবং অন্যান্য গাছপালা মাটির উপরে অবস্থান করিয়া 'দমকলের' (pump) কাজ করে। উহাদের শিকড় মাটির তলদেশ হইতে খনিজ পদার্থ শুষিয়া লয় এবং কাণ্ডে ও পাতায় উহা সঞ্চিত করে। গাছপালার মৃত্যু ঘটিলে মাটির উপরি ভাগেই আবার ঐ সকল খনিজ পদার্থ স্থান পায় এবং ইহারাই মাটির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। অয়নান্ত বৃত্তে (tropics) প্রতি বৎসরে গাছপালা মাটিতে ৯০ টন 'হিউমস' সঞ্চিত করিতে পারে; শুষ্ক আবহাওয়া-বিশিষ্ট অঞ্চলে ইহার পরিমাণ কয়েক পাউণ্ডের বেশী হয় না।

আবার ঠিক একই ভাবে অসংখ্য রকমের জীবাণু মাটির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে; ইহাদের মধ্যে কোন কোন শ্রেণী বাতাস হইতে যবক্ষারজান সংগ্রহ করিয়া উহাদের অণুকোষে সঞ্চিত করে এবং উহারা যখন মরিয়া যায় মাটিতে তখন উহা সঞ্চিত হয়।

মাটির গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে যখন প্রচুর জ্ঞান অর্জ্জিত

হইতেছিল তখনও মাটি এক "প্রহেলিকাবৎই" ছিল। বহুদিন যাবৎ এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, শস্য মাটি "খায়"। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক জিন ভন হেলমণ্ট একটি টবের মাটি ওজন করিয়া তাহার উপর একটি চারা রোপণ করিয়াছিলেন; ৫ বৎসর পর যখন চারাটি বেশ বড় হইয়াছিল তখন উহা ওজনে বহু পাউণ্ড হইয়াছিল, কিন্তু টবেরমাটির ওজন দুই আউন্সের বেশী কমে নাই; শস্য যে মাটি 'খায়' না হেলমণ্ট তাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মাটি সম্বন্ধে ইহা ব্যতীত তিনি বিশেষ কিছু তথ্য আবিষ্কার করেন নাই। তিনি বলিলেন জলই উদ্ভিদের "জীবন"; তাঁহার এই কথায় ইংরেজ বৈজ্ঞানিক উডওয়ার্ড বলিলেন তাহাই যদি হয় গাছপালা তাহা হইলে কেবলমাত্র জলে জন্মিতে পারে; তিনি এই বিষয়ে বহু পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল পান নাই। ইহার ২০০ বৎসর পর বৈজ্ঞানিক জসটাস ভন লিবিগ আবিষ্কার করিলেন যে, মাটিতে অসংখ্য রকমের খনিজ এবং রাসায়নিক পদার্থ বর্ত্তমান আছে। তিনি বলিলেন মাটি একটি ভাণ্ডারগৃহ-বিশেষ। মাটি হইতেই গাছপালা তাহাদের পুষ্টির জন্য খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করে এবং মাটিতে যখন খনিজ পদার্থের অভাব ঘটে তখন মাটি শস্য উৎপাদনে অক্ষম হয়। অর্থাৎ, মাটি একটি 'ব্যাঙ্ক'। গাছপালা এই 'ব্যাঙ্ক' হইতে খনিজ পদার্থসমূহ 'উঠাইয়া' লয় এবং মানুষ সার হিসাবে আবার উহাদিগকে মাটিতে জমা দেয়। যদিও লিবিগের আবিষ্কার এই ছিল, তথাপি তিনি দেখিলেন যে, অনেক স্থানে শতাব্দীর পর শতাব্দী শস্য উৎপন্ন হইতেছে অথচ তাঁহার হিসাব মত সেই সকল স্থানের জমির উর্ব্বরতা-শক্তি নষ্ট হইতেছে না।

ইহার পর বহু বৎসর অতিবাহিত হইলে রুশ দেশীয় বৈজ্ঞানিক ভি. ভি. ডকুচেভ লিবিগের ন্যায় মাটিকে এক মৃত পদার্থ বলিয়া গণ্য না করিয়া এবং গবেষণা-গৃহে পরীক্ষা না করিয়া মাটি খুঁড়িয়া মাটির নিম্নতম স্তর (প্রস্তর) বাহির করিলেন। এবং মাটির বিভিন্ন স্তর পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে, মাটির গঠন অনবরতই চলিতেছে। গাছের শিকড় মাটির নীচ হইতে খনিজ পদার্থ টানিয়া লইতেছে, বৃষ্টির জলের সহিত উহা পুনরায় মাটিতে প্রবেশ করিতেছে। তিনি ইহাও দেখিলেন যে, একই রকমের প্রস্তর হইতে জলবায়ু, উদ্ভিদ এবং আরও বহু বিষয়ের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের মাটি গঠিত হয়। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে, মাটিতে যে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় মাটি সেই উদ্ভিদেরই প্রকাশ। অর্থাৎ, ডাকোটাসের গমের জমি ভারতবর্ষের গমের জমিরই অনুরূপ। পৃথিবীর সকল স্থানের পাইন গাছের বনের জমিও একরূপ।

বর্ত্তমানে মাটি সম্বন্ধে এক নূতন ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন ১০,০০০ রকমেরও অধিক মাটির শ্রেণী (type) আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহারা ৫০টি 'গ্রুপের' অন্তর্গত।

বর্ত্তমানে পৃথিবীর সকল স্থানের মাটির মানচিত্র আছে এবং সেই মানচিত্রগুলি এত বিজ্ঞানসম্মত যে, তাহা দেখিয়াই বলিতে পারা যায় পৃথিবীর কোন্ কোন্ স্থানে কি কি ফসল উৎপন্ন করা যাইবে। চীন, ভারতবর্ষ, ইটালী না দেখিয়াও কৃষি-বৈজ্ঞানিক মাটির মানচিত্র দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারেন যে, সে সকল দেশের কোন্ কোন্ স্থানের মাটি শস্য (corn), কোন্ কোন্ স্থানের মাটি ইক্ষু, বা কোন্ কোন্ স্থানের মাটি ফলের বাগানের উপযুক্ত। এমন কি কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ ফসলের কি ফলন হইবে তাহাও এইরূপ মানচিত্র দেখিয়া বলা যাইতে পারে।*

* *Farmer's Digest*-এ প্রকাশিত "Soil Will Tell Your Fortune" নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

বিদ্যাসাগর

শ্রীনীলরতন দাশ

পরাধীনতার সঞ্চিত পাপে লাঞ্ছিত যবে দেশ—
মরণোন্মুখ জাতির জীবনে দৈন্যের নাহি শেষ—
ভারত-গগনে হেন কালে তব উদয় জ্যোতির্ম্ময়
শুনালো সবারে চেতনার বাণী, নাশিল মৃত্যুভয়।
নিঃস্বের বেশে আসিয়া বিশ্বে নিলে পরহিতব্রত,
আত্মভোলা এ জাতিরে জাগাতে হলে সাধনায় রত।
ভগবান তব ছিল না বদ্ধ মন্দিরে প্রতিমায়,
মানুষের মাঝে ঈশ্বর তব বিশ্বের বেদনায়।
বালবিধবার অন্তর-ব্যথা, সমাজের অবিচার
মর্ম্মে তোমার জাগায়েছিল যে দুঃসহ হাহাকার।

মানো নাই তুমি সমাজের বাধা অথবা নির্য্যাতন,
রাজপুরুষের ভ্রূকুটি তোমার টলাতে পারে নি পণ।
কুসুমকোমল-চিত্তে কেমনে বজ্র লুকায়ে রয়,—
সে কথা স্মরিয়া বিশ্ববাসীর আজো লাগে বিস্ময়!
জ্ঞানে ব্রাহ্মণ, সেবায় শূদ্র, ক্ষত্রিয় তেজোবলে—
আগ্নেয়গিরি গুপ্ত যেন রে মহাসাগরের জলে!
তোমারে না চিনে করেছে যাহারা লাঞ্ছনা অপমান—
কাপুরুষ তারা, ক্ষমিও তাদের নির্ব্বোধ অভিমান।
এই বাংলার জ্ঞান-গুরু তুমি উদার উচ্চশির,—
নমো নমো নম ভাষার শিল্পী, মহান্ কর্ম্মবীর!

উদয়-দিগন্তে

শ্রীসুনীলকুমার বসু

অবিনাশ চৌধুরীর চকোলেট রঙের বিরাট মোটরখানাকে আজকাল প্রায়ই বিকালবেলায় রায়েদের বুগেনভিলিয়ায় ঢাকা ভাঙা ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। এই ব্যাপারে যে ছোট শহরটিতে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে যাবে তা আর অস্বাভাবিক কি! অবিনাশ চৌধুরী হচ্ছেন এ অঞ্চলের প্রখ্যাতনামা ধনী, একটি মিলের মালিক, অনেকগুলির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং মাইনিং সিণ্ডিকেটের অন্যতম প্রধান পাণ্ডা। তার উপর তিনি বিপত্নীক, আর রায়েরা হলেন হৃত-ঐশ্বর্য্য কুল-গৌরব-সর্ব্বস্ব বনেদী পরিবার। একদা যেখানে পারিবারিক গৌরবের প্রতীক্ নীল পতাকা সগর্ব্বে বিরাজ করত সে ফটক আজ ভাঙা, কয়েকটা পুষ্পহীন বগেনভিলিয়ার লতা ছাড়া আর সেখানে কিছু নেই। রায়-গিন্নী অনেক কষ্টে মানুষ করেছেন রায়-পরিবারের শেষ দুটি তরুণীকে—মণিকা আর কণিকা, তাঁর দুই মেয়ে। তারা আজ শিক্ষিতা তরুণী। তার মধ্যে কণিকা আবার শহরের সবচেয়ে স্মার্ট মেয়ে। নাচ, গান, টেনিস খেলায় সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রায়েদের ভাঙাবাড়ীর রিক্ত ফটকে তাই আজ বহু তরুণের অক্লান্ত অধ্যবসায় ব্যর্থতায় গুমরে মরে। সেখানে এই বিপত্নীক প্রৌঢ়ের বেমানান আকুলতা সবারই চোখে অশোভন লাগল।

জটলা চলতে লাগল শহরের মোড়ে মোড়ে, রেস্তোরাঁয় আর ক্লাবে। বিলিয়ার্ডের লাঠিখানা হাতে করে দাশশর্ম্মা বললে, শুনেছ হে বর্ম্মণ কাণ্ডখানা? চৌধুরী কি ক্ষেপে গেল?

বর্ম্মণ বললে, ক্ষ্যাপার আর কি আছে। ধর যদি চৌধুরীর খেয়াল হয়ে থাকে ওদের একটিকে বউ করবে, তবে অন্যায়টা আর কি? হাজার হোক্ বড়লোক ত?

—'হ্যাঃ বউ করবে', লাহিড়ী বলল, 'তোমার যেমন কথা! হ'লই বা বড়লোক, ঐ বুড়োটাকে রায়গিন্নী কিছুতেই মেয়ে দেবে না।'

বর্ম্মণ বললে, থাম হে, দেবে আবার না! টাকায় অনেক কিছু হয়। আর তা ছাড়া মেয়েদের বিয়ে দিতে খরচ লাগবে ত, শুধু নাচলে আর নাচালেই ত বর জোটে না হে।

রয়্যাল রেস্তোরাঁতে চায়ের ধূমায়মান পেয়ালাটাকে পিপাসু অধরের সন্নিকটে এনে মিহির বললে, কে? মণি? না কণি, ও যারই উপর নজর থাক না কেন অবিনাশ চৌধুরীকে আমি জব্দ করে দেব। আমাদের পাড়ায় এসে ওসব বড়লোকী প্রেম চলবে না। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে মিহির ক্ষাত্রধর্ম্মের তীব্র উদ্দীপনায় জ্বলতে লাগল।

বাবরী চুলগুলোকে কপালের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে তিমির বললে, চৌধুরী ঠকবে, ভীষণ ঠকবে যদি কণিকে বিশ্বাস করে। কণির নাগরিকতার শায়কবেঁধা একটা ভূলুণ্ঠিত বিহঙ্গ সে।

রণেন বললে মণি মেয়েটি কিন্তু বড় ভাল, খুব শান্ত। সেবার এগ্জিবিশানের সময় আমাকে একটা কমলালেবু অফার করেছিল।

দীনেশ ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকল। কি হে, ব্যাপার কি? কুলের খোঁজ পেয়েছ নাকি কলম্বাস—মিহির বললে।

—'ঠাট্টা নয়', দীনেশ উত্তেজিত ভাবে বললে, 'সত্যিই খোঁজ পেয়েছি। মণি নয়, কণি ওর টারগেট।'

ব্যথায় বিমূঢ় হয়ে গিয়ে তিমির বললে, কণি? আমাদের সেই কণি? শহরের সেরা মেয়ে সে। নাচে, গানে লেখায় পড়ায় অভিনয়ে সবচেয়ে স্মার্ট আর ফরওয়ার্ড মেয়ে কণি শেষে কি ঐ বুড়োটার বউ হবে? এ কিছুতেই হতে দেব না।

রণেন বলল, যাক্ তা হলে মণি নয়?

মিহির বললে, কণি কি মত দিয়েছে? এ কথার উত্তর কেউ দিতে পারলে না।

উপহাস বিদ্রূপ ও ভয়প্রদর্শনে পিছু হটবার লোক অবিনাশ চৌধুরী নন। তরুণদের বুঝি তিনি হার মানিয়ে দিলেন এবার। কাজের লোক তিনি, তবু রোজ বিকালবেলায় তাঁর চকোলেট রঙের মোটরখানা রায়েদের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াতে ভুলত না। দুটি সুসজ্জিতা তরুণী বেরিয়ে আসত। পোশাকে তাদের ঝলকে উঠত যৌবনের উৎসারিত আবেগ। তার পর সেই মেয়ে দুটিকে নিয়ে চৌধুরী ছোটাতেন তাঁর বেগবান যন্ত্রযান। পিচঢালা সোজা সড়ক ছেড়ে গাড়ী চলত হাওয়ার বেগে লাল মাটির উঁচু নীচু সরু সরু পাহাড়িয়া পথ ধরে। পৌঁছে যেত লেকের ধারে। তার পর দীর্ঘ লেকটাকে পরিভ্রমণ করে ভুট্টাক্ষেতের বুক চিরে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে মোটর পৌঁছত ফুলহারী পাহাড়ের ধারে। তিন জনে পাহাড়ে উঠত। চৌধুরী কখনও কখনও হাত ধরে কণিকে উপরে তুলে নিতেন ঢালু পথ বেয়ে। মণি সলজ্জভাবে তার হাত প্রত্যাখ্যান করে বলত, থাক আমি নিজেই পারব, আপনি দিদিকে হেলপ করুন।

কিন্তু অশোক কোথায়? এ প্রশ্ন সবারই মনে জাগতে লাগল। চৌধুরী যেদিন থেকে রায়-বাড়ীতে যাতায়াত সুরু করেছেন সেদিন থেকে অশোকের আর কোন খবর পাওয়া যায় না। এ নিয়েও জল্পনাকল্পনা চলছিল খুব।

শেষে খবর নিয়ে জানা গেল সে তিন মাসের ছুটি নিয়ে মুঙ্গেরে মাসিমার বাড়ী চলে গেছে। রায়-গিন্নী অনেক সময় বলতেন, অশোক আর আসে না কেন রে কণি? তার কি অসুখ-বিসুখ করল?

অশোকের নামে কণির মুখে সন্ধ্যার রক্তরাগের মত রঙীন লজ্জার উচ্ছ্বাস জেগে উঠত। ঔদাসীন্যের ভান করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কণি জবাব দিত, আমি কি করে জানব? যার খুশী না হয় সে আসবে না।

মণি মুচকি হেসে বলত, তোর এ নতুন ঢঙ আমি বুঝি না।

'বুঝতে হবে না', কণি নাচের তালে পা ফেলে এগিয়ে যেতে যেতে বলত, 'তুই শুধু দেখে যা।'···

হাঁা, অশোক, সেই দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ছেলেটি। মাইনিং সিণ্ডিকেটের লেবরেটরী এসিষ্টাণ্ট। বছর চারেক আগে চাকুরী নিয়ে যখন এই শহরে এল তখন ওর সাড়ে ছ'ফুট লম্বা দীর্ঘ দেহ, বিরাট বুকের ছাতি, বলিষ্ঠ কব্জী তাক লাগিয়ে দিয়েছিল শহরবাসীদের। অপূর্ব্ব চেহারা অশোকের। ঝাঁকড় ঝাঁকড়া অজস্র চুল মাথায়, ঠোঁট দুটো পুরু, বড় বড় তীক্ষ্ণ চোখ, রোমশ দুটি ভুরু। তার উপর স্বল্পভাষী ও গম্ভীর। রুক্ষ প্রকৃতির কঠিন শুষ্করসে পরিপুষ্ট সে। অশোককে ভাল লেগেছিল মণিকার সেইবার যেবারে সে শহরের প্রায় সবগুলো খেলায় চ্যাম্পিয়ান হয়ে দাঁড়াল। পোলভল্ট দেবার সময় তার দীর্ঘ মসৃণ সুডৌল পরিপুষ্ট দেহখানা বাঁশের লাঠি ভর দিয়ে নাচের ভঙ্গীতে বিলম্বিত হয়ে সাপের মত অবহেলায় বাধার পর বাধা অতিক্রম করে চলছিল। কণি তখন মুগ্ধ হয়ে দেখছিল তার অঙ্গসৌষ্ঠব।

বেঙ্গলী ক্লাবের বাৎসরিক উৎসবে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ল হর্ষধ্বনিতে। পূজারিণী নৃত্যে কণিকা মুগ্ধ করে দিয়েছে সমবেত জনতাকে। অনুরাগী তরুণ-সম্প্রদায় বলাবলি করতে লাগল এমন অপূর্ব্ব নাচ কণি আর কখনও নাচে নি, আশ্চর্য্য কৌশল দেখিয়েছে বটে! কেউ কেউ সরস মন্তব্য করে বললে, বিয়ে আসন্ন কিনা···মনে আনন্দ আছে, তাই। প্রভাত প্রতিবাদ করে বললে, বুড়োর সঙ্গে বিয়েতে আবার আনন্দ কি?

মিহির বললে, তুমি থাম হে দার্শনিক। বাড়ী, গাড়ী, আর শাড়ী, এই তিনটি পেলেই বুড়োকে ভালবেসেও যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়। দেখেছ ত চৌধুরীর বাড়ীখানা? যেন একটা নেটিভ প্রিন্সের প্যালেস্ (রাজা মহারাজার প্রাসাদ)।—কিন্তু বুড়ো যে, অবোধ প্রভাত তবু বুঝতে চায় না।

মিহির বললে, আরে বুড়ো কোথায়, মাত্তর দু' চারটে চুলে পাক ধরেছে, তাও কলপ লাগালেই চলবে।

ভিতরেও ঠিক একই কথা চলছিল। সখী-পরিবেষ্টিতা কণি কৌচে সুকুমার দেহখানা এলিয়ে দিয়ে ধূমায়মান চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল। তার প্রোগ্রাম শেষ হয়েছে। চৌধুরী এই উৎসবে উপস্থিত হতে পারেন নি। একটু পরে তিনি আসবেন গাড়ী নিয়ে মণি আর কণিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

—চৌধুরীকে বলিস্ ভাই চুলে একটু কলপ দিতে, মালতী বললে। সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল অন্য মেয়েরা। কণির শ্রান্ত অর্দ্ধনিমীলিত চোখের কোণে একটু নিস্পৃহ হাসির রেখা দেখা দিলে। মঞ্জু বললে, তুই খুব লাকি (ভাগ্যবতী) যা হোক্। মিষ্টার চৌধুরী ত একজন কুবের বললেই চলে। কি বিরাট বাড়ী!

রমা ফোঁড়ন দিলে—আমি কিন্তু ভাই না বলে পারছি না, মিষ্টার চৌধুরীর বয়েসটা একটু বেখাপ্পা রকমের বেশী।

অপর্ণা একটু বিদ্রূপের সুরে বললে, তাতে কণিকার কোন অসুবিধা হবে না, ও ত চৌধুরীকে বিয়ে করছে না, করছে চৌধুরীর টাকা আর ঐশ্বর্য্যকে।

এতক্ষণে কণিকা সোজা হয়ে উঠে বসল, চায়ের কাপটা টিপয়ের উপর নামিয়ে রেখে বললে, টাকা আর ঐশ্বর্য্য চায় না এমন একটা মেয়ে আমাকে দেখাতে পার? ওরা চমকে গিয়ে হঠাৎ কোন উত্তর দিল না। কণিকা বলে চলল, সত্যিই ত আমি টাকা ভালবাসি, ঐশ্বর্য্য ভালবাসি, আর কে না বাসে বল? গরীবের ঘরে গিয়ে না খেয়ে, না পরে শুকিয়ে মরতে আমি চাই না।

—তাই বুঝি বেচারা গরীব অশোকের কপাল পুড়েছে, একটু মুচকি হেসে বিদ্রূপ করলে অপর্ণা।

সহসা কণিকার মুখখানা আগুনের মত লাল হয়ে উঠল, হর্ষে নয়, জ্বালার তাপে। কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল ও, তার পর আবার নিজেকে এলিয়ে দিল কৌচের উপর অচপল ঔদাসীন্যে। আর কিছু বলার কারো সাহস হ'ল না। বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। বিদ্যুদ্বেগে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কণিকা ডাকলে, মণি, চল্ গাড়ী এসেছে!

অশোক ফিরে এল না। চৌধুরীর আবির্ভাব বজ্রপাতের মত আকস্মিক আঘাতে অশোকের অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত করে দিলে। কণিকার চিরচঞ্চল লাস্য যে অন্তত: এক দিনের জন্যও নিষ্প্রভ হয়েছিল, সে খবর বাইরের জগৎ জানত না, জানত মণি, ওর বোন এবং সখী দুই-ই।···একদিন বর্ষণমুখর মধ্যাহ্নে কণি চুপটি করে বসেছিল জানলার ধারে। বহু দূরে আকাশের গায়ে কুলহারী পাহাড়ের ধূসর চূড়া—অস্পষ্ট আভাস জাগিয়ে তুলছিল বিস্মৃত ব্যথার। পিছন থেকে ওর গায়ে হাত রেখে মণি বলেছিল, তুই কি ভুল করেছিস্? সহসা উত্তর দিলে না কণি, শুধু চেয়ে রইল ধারাশ্রান্ত আকাশের দিকে, পাহাড়ের রুক্ষ চূড়ার পানে। তার মনে পড়ল অতীত দিনের কথা, মনে পড়ল কতবার কতদিন ঐ রুক্ষ নির্ম্মম পাহাড়ের বুকে

আশ্রয় পেয়েছে সে আর অশোক। মণি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলে, তুই ভুল করিস নি ত? ম্লান হেসে কণি বলেছিল, কি জানি, বুঝতে পারি না।···

অশোক ফিরে এল না। বিবাহের আনন্দোজ্জ্বল দিনটি অশোকের প্রতীক্ষায় থমকে দাঁড়িয়েছিল বটে, কিন্তু চৌধুরীর প্রৌঢ় প্রেম ত তাপহীন নয়। সেই শুভ দিনটাকে এগিয়ে আনবার মত অনুরাগের গাঢ়তা ছিল তার। তাই এক দিন সকালবেলায় রায়েদের ভাঙা ফটকের উপর নহবৎ বেজে উঠল। সন্ধ্যায় কণিকার সুডৌল সুকুমার হাতখানা আশ্রয় পেল চৌধুরীর পরিপুষ্ট শ্রমশীল হাতের মধ্যে।

প্রথমটা কণিকা দিশা হারিয়ে ফেলল সেই বিরাট বাড়ীর মধ্যে। মণিকা সব সময় ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকত; তাই ও কোনমতে বজায় রাখতে পারত ওর ক্ষয়িষ্ণু আত্ম-চেতনা। এত প্রাচুর্য্য, এত ঐশ্বর্য্য! ছোট একটা পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে উপলসঙ্কুল পথে। তার পাশে একটা মস্ত বড় টিলা, তারই উপর চৌধুরীর বিরাট বাড়ী—ইউক্যালিপটাস আর শিশু গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায়। চারিদিকে বিরাট কম্পাউণ্ড পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এক দিকে বয়ে চলেছে সেই নদী এবং তার তীর ঘেঁসে অসংখ্য ছোট বড় শালগাছের ঘন অরণ্য। অন্য দিকে রুক্ষ বন্ধুর মাটি ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে আরোহণ করতে করতে দূরে পরিপ্রেক্ষিতের গায়ে মিশে গেছে ফুলহারী পাহাড়ে।

একের পর এক বড় বড় ঘরগুলি দেখে বেড়াতে লাগল কণিকা—চৌধুরীর সঙ্গে সঙ্গে; প্রত্যেকটি ঘরে নূতন নূতন চোখঝলসানো আসবাব ও সাজসজ্জা, দেয়ালে কত ছবি পূর্ব্বপুরুষদের—যারা প্রথম এই অঞ্চলে এসে এর অরণ্য ও খনিজ সম্পদ আবিষ্কার করে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন, আর খনি-অঞ্চলের দুঃসাহসী সাহেবদের। বিচিত্র বৈদ্যুতিক আলোয় ঘরগুলি উদ্ভাসিত, ফুলদানীতে অজস্র ফুলের শোভা—দেখার যেন আর শেষ হয় না।

উৎসবের দিন চৌধুরীর বাড়ীখানা সেজে উঠল নটীর মত। শত শত বিদ্যুতের বাতি জ্বলে উঠল চারদিকে। দামী গালিচায় মোড়া ড্রইং-রুমে একের পর এক অতিথিরা এলেন বহুমূল্য উপহার নিয়ে—মণিকা আর কণিকার সঙ্গে আলাপ করলেন তাঁরা। মাইনিং সিণ্ডিকেটের মিষ্টার জনসন, মিষ্টার রবার্টস, মিষ্টার সিমসন ও আরও অনেক সাহেব এল। রায় বাহাদুর রক্ষিত, চিমনলাল সরাভাই, গোপীলাল আমালাল, শিউচাঁদ রামশরণ জৈন এলেন, আরও এলেন কিষণগড়ের মহারাজা বাহাদুর, মাইকা মাইনিং কোম্পানীর বরজলাল দাগা, প্রতাপগড়ের রাজকুমার—অতিথিদের উপহারে ও শিষ্টাচারে পুলকিত হ'ল কণিকা।···

রাত্রে শোবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে পা কেঁপে গেল কণিকার। ফুল দিয়ে ঘরখানাকে যেন মুড়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু স্তিমিত দীপালোক একটা মদির বিহ্বলতার সৃষ্টি করেছে, পালঙ্কের উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে অবিনাশ চৌধুরী ডাকলেন, এস কণি। চমকে উঠল কণিকা। মধুর স্বপ্ন ভেঙে গেল, সভয় দৃষ্টি মেলে সে চাইল চৌধুরীর দিকে, দেখল অবিনাশ চৌধুরীর চোখ দুটি আত্ম অধিকারের লোভে জ্বলছে। দেখল তার পুরুষত্বব্যঞ্জক ঘন গোঁফের নীচে মৃদু হাসির বিদ্যুৎ, আর দেখল দুখানা সবল পুষ্ট বাহু দস্যুর মত তাকে সজোরে টেনে নিল গভীরে, চেতনার অতল তলে। নীরবে আত্মসমর্পণ করলে কণিকা।

বিবাহের উৎসবমুখর ফেনিল দিনগুলো শেষ হয়ে গেল, তারপর আবার সব স্তব্ধ। বিরাট বাড়ীখানা কয়েক দিন সরগরম থেকে আবার যেন ঝিমিয়ে পড়ল। আত্মীয়ের মধ্যে শুধু এক বৃদ্ধা পিসীমা, তিনি নিজের ঘরে পূজা অর্চ্চনা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, শুধু মাঝে মাঝে কণিকার কুশল সংবাদ নেন এবং খাওয়া-দাওয়ার তদারক করেন। আর আছে অসংখ্য দাসদাসী, তারা কলের পুতুলের মত হুকুম খাটে, রেডিওটা খুলে দিয়ে খানিকটা সময় কাটানো যায়, দামী পিয়ানোটা দশটা আঙুলের চাপে কেঁদে আর্ত্তনাদ করে ওঠে, কিন্তু যন্ত্র নিয়ে মানুষের দিন কাটে না। কণিকা চায় মানুষের সঙ্গে উষ্ণ প্রাণের গাঢ় ভাব-বিনিময়, এই অভাব কে তার মেটাবে? অবিনাশবাবুর মনে পূর্ব্বরাগের ফেনিল তুফান সংযত, শান্ত হয়ে উঠেছে। তিনি কাজের মানুষ, অসংখ্য এনগেজমেণ্ট তাঁর, কণিকার টানে কাজ ফেলে বাড়ীতে বসে থাকা তাঁর কি সাজে! আপিস থেকে ফিরে আবার তিনি বেড়িয়ে পড়েন কাজে, কোনদিন বা ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং, কোনদিন সাহেবদের গার্ডেন পার্টি, কোন দিন শ্রমিক ধর্ম্মঘট প্রতিরোধ। এ ছাড়া সন্ধ্যায় ক্লাবে গিয়ে বিলিয়ার্ড খেলা। ফিরতে তাঁর প্রায় রাত দশটা হয়, অবশ্য কণিকার প্রতি তাঁর ভালবাসা যে কিছু কমেছে তা নয়। আচরণে তাঁর ঠিক আগের মত আন্তরিকতা ও উচ্ছ্বাস রয়েছে। আগের মতই তিনি কণিকে নিয়ে উল্লাস ও উদ্দীপনায় মেতে ওঠেন, কণির সমস্ত খুঁটিনাটি প্রয়োজনের তদারক করেন। কিন্তু সঙ্গ দিয়ে কণিকার নির্জ্জনতা ঢেকে দেওয়ার অবসর তাঁর নেই। রাত্রে ফিরে এসে কণিকাকে নিয়ে তিনি গভীর আনন্দে মেতে ওঠেন, ওর প্রাত্যহিকের অবশিষ্ট অংশটুকু নিবিড় সাহচর্য্যের আস্বাদে ভরে ওঠে। কত গল্প করেন খনির সাহেবদের, ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানের, কুলীদের মূর্খতার, দেহাতীর ধূর্ত্ততার। কিন্তু কণি বুঝতে পারে অবিনাশবাবু সাহেবদের পার্টিতে গিয়ে একটু আধটু নেশা করেন। অবশ্য খনি অঞ্চলে ওট একটা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার—কণিকা তা জানে। কিন্তু

অবিনাশবাবুর এই গোপন অভ্যাসের খবর সে জানত না আর একটা জিনিষ সে আবিষ্কার করেছে অবিনাশবাবুর ড্রয়ারে এক শিশি কলপ, এটাও অজ্ঞাতপূর্ব্ব।

সারাদিন একা একা কাটে, মাঝে মাঝে মণি আসে। নানা কথার মধ্যেও জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে অশোকের খবর কিছু বলতে পারিস্? মণি বলে, তার ছুটি ফুরিয়েছে, সে এসে কাজে জয়েন করেছে। হঠাৎ কেমন উদাস হয়ে যায় কণিকা।

দিনের মধ্যে অন্ততঃ দশবার দশখানা নূতন ফ্যাশনের শাড়ী পরা, ড্রেসিং টেবিলের বিরাট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দশবার চুল আঁচড়ানো, চুল খুলে আবার নূতন ঢঙে চুল বাঁধা। এই ত ওর কাজ; কিছুমাত্র অসুবিধা ঘটবার অবকাশ নেই, ঝি চাকর সর্ব্বদা মোতায়েন, একটু যেন একলা বসে ভাববারও নেই সুযোগ। এ জীবন ভাল লাগে না কণিকার, ঐশ্বর্য্যের স্বাধীনতাটুকু সে চেয়েছিল, বন্ধনটা চায় নি। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই যেন সে জড়িয়ে পড়ছে সংসারের অজস্র প্রাচুর্য্যের মধ্যে।

সেদিন বিকালে একটা অভাবিত ঘটনা ঘটে গেল। অবিনাশবাবু বাড়ীতে ফিরে একটু ব্যস্ত হয়েই বেরিয়ে গেলেন, কোন এক সাহেবের ফেয়ারওয়েল পার্টিতে (বিদায়-সম্বর্দ্ধনায়)। বৈকালিক প্রসাধন শেষ করে কণিকা বারান্দায় চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল, ভাবছিল, মণিকা এলে ভাল হ'ত, ওকে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরোন যেত। হঠাৎ দেখা গেল দূরে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। সাদা পাঞ্জাবী গায়ে, লম্বা পায়জামা পরা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কণিকার বুকের মধ্যে হঠাৎ অদ্ভুত আলোড়ন জেগে উঠল, কাঁপতে লাগল সে থর থর করে। তারপর ঝিকে পাঠিয়ে দিলে ঐ লোকটিকে ডেকে আনতে।

অশোক এল, নাও আসতে পারত, হয়ত আসত না। কি যেন কি ভেবে এল। নীচের তলায় অবিনাশবাবুর বসবার ঘরে কণিকা এসে দাঁড়িয়েছিল। নাটকীয় ঢঙে নমস্কার করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অশোক বললে, কন্‌গ্রাচুলেশন।

অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না কণিকা, শুধু চেয়ে রইল অশোকের মুখের পানে। তারপর বললে, আমার সঙ্গে দেখা করতে আস নি নিশ্চয়। নিস্পৃহভাবে জবাব দিলে অশোক, না, তোমার স্বামী মিঃ চৌধুরীর কাছে এসেছিলাম মাইনিং সিণ্ডিকেটের কাজে।

কণিকা কাতর মিনতির সুরে বললে, সেন্টিমেন্টালিজম্ (ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ) আমি কোনদিন করি নি, কিন্তু একটা অনুরোধ আমি তোমায় করব। কাল বিকালে একবার ফুল হারী পাহাড়ে তোমাকে যেতে হবে। উত্তর দিকে যেখানে আমরা বসতাম, সেইখানে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। এখানে তোমাকে আমি কিছু বলতে পারব না। কিন্তু আমার কথাগুলো আমি তোমাকে বলবই।

—তোমার কোন কথা শোনবার আমার আগ্রহ নেই। সুতরাং পাহাড়ে যাবার প্রশ্ন আর ওঠে না।···

কণিকা চেয়ে দেখল অশোকের মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তবু সে বললে, আমার এ অনুরোধ তোমায় রাখতেই হবে অশোক।

কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল অশোক। পিছন থেকে ডেকে কণিকা বললে, আমার অনুরোধ রেখ কিন্তু।

ফুলহারী পাহাড়ের নির্জন অরণ্যচ্ছায়ায় একা বসেছিল কণিকা, ভাবছিল, অশোক হয়ত আসবে না। দূরে তার চকোলেট রঙের গাড়ীখানা দাঁড়িয়েছিল ছবির মতন। তারও ওধারে সরু পথ চলে গেছে রুক্ষ মাটির অনুর্ব্বর বুক চিরে, পথের দু'ধারে লাল মাটির ছোট বড় খাদ, বর্ষার জল নদীর মত বয়ে চলেছে তার ভিতর দিয়ে। এই অনুর্ব্বর অকূল পার হয়ে পথ চলে গেছে আরও দূরে ভুটাক্ষেতের মধ্যে। পাহাড়ের এ দিকটা নির্জ্জন, অসংখ্য নাম-না-জানা অরণ্য-গুল্ম লতা আর গাছে এ ধারটাতে নিভৃত নির্জ্জনতার সৃষ্টি করেছে। দেহাতী কাঠুরিয়া কদাচিৎ এ পথে আসে। কণিকা বসে বসে ভাবছিল পুরনো দিনের কথা।

পথের পানে নজর পড়তেই দেখল অশোক আসছে সাইকেল চেপে। আনন্দে অধীর হয়ে উঠে দাঁড়াল কণিকা। তার শেষ অনুরোধ রেখেছে অশোক।···

একটা বিরাট শালগাছের আড়ালে বসল ওরা দুখানা সাদা পাথরের উপর। অশোক বললে, প্রথমটা ভেবেছিলাম আসব না। তারপর হঠাৎ চলেই এলাম, কি যেন কি ভেবে, তবে তোমার কথা শুনবার জন্যে নয় এটা নিশ্চিত। কারণ আমি জানি তুমি কি বলবে, আর তা শোনার কিছুমাত্র আগ্রহ আমার নেই। কণিকা বললে, স্বভাবতই তুমি একটু কর্কশ, কিন্তু এখন রীতিমত রুক্ষ হয়ে পড়েছ দেখছি।

'তুমি ত জান', অশোক বললে, 'সভ্যতায় ধার করা পালিশ আমার নেই। আমি যা অনুভব করি তা বলি এবং করি তাতে ভদ্রতা ক্ষুণ্ণ হলেও। আর এও জান সভ্য ছেলেদের মত অত নির্জীব স্নায়ু বা নরম স্বভাবও আমার নয়। প্রতিশোধ নেওয়াটা আমার ধর্ম্ম।'

—সে কি! কণিকা অবাক হয়ে গেল। তুমি আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে নাকি? বললে সে।

'নিতে পারি বৈ কি!' অশোক বললে।

'তোমার রুক্ষতা আমার ভাল লাগে।' কণিকা বললে, যেমন ভাল লাগে এই রুক্ষ পাহাড়কে। কিন্তু আমার একটা কথা বিশ্বাস করতেই হবে তোমাকে। আমি তোমাকে

ভালবাসি। আর আমার স্বামীর সম্পদ আমাকে দেবে স্বাধীনতার অধিকার।'

—'তুমি যখন মার্জ্জিত ভাষায় জটিল ধরণের কথা বল আমি তখন তা বুঝতে পারি না', অশোক বললে, 'আমি বুঝি, যাকে চাই তাকে আমার পেতে হবে।'

কণিকা ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল অশোকের পুরু ঠোঁট দুটি কুঞ্চিত কঠোর আকার ধারণ করেছে। চোখে তার জ্বলছে ভীষণ প্রতিশোধের ভয়াবহ দ্যুতি। মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা উঁচু করে সে বললে, তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালবেসে থাক তবে আমার হতে হবে তোমাকে একান্ত ভাবে।··

কথাগুলো কি যেন এক অজানা আতঙ্কের শিহরণ জাগাল কণিকার মনে। ভবিষ্যৎটা একটা কালো মুখোস-পরা মূর্ত্তি ধরে ধূসর আকাশের ম্লান পটভূমিকায় তাকে হাতছানি দিয়ে যেন ডাকতে লাগল। বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন খালি হয়ে গেল। অস্থির অশোক উঠে দাঁড়াল এবং সোজা গিয়ে সাইকেলটা তুলে ধরল। কণিকা জানত একবার সে যেতে চাইলে তাকে ঠেকান দায়।···

অলস মন্থর নিষ্ক্রিয় জীবনের কয়েকটা মাস কেটে গেল। অনেক বাহ্যিক পরিবর্ত্তন হয়েছে কণিকার। ওর পাতলা ছিপ-ছিপে দেহটায় একটা মাংসল পরিপূর্ণতা দেখা দিয়েছে। অবিনাশবাবু প্রায়ই ঠাট্টা করে বলেন, একেবারে গিন্নী হয়ে পড়লে যে। দেহের তীক্ষ্ণ রেখাগুলি এক নূতন লাবণ্যে ভরে উঠেছে। সমস্ত দেহে চঞ্চল রূপ যেন টলমল করছে। এখনি যেন উপচে পড়বে। শুধু চোখের কোণে একটু কালি, মুখে একটু ম্লানিমা। বাইরে ওর অচপল শুব্ধতা, কিন্তু ভিতরে চলছে আলোড়ন। বড় একটা বাইরে যায় না সে। মাঝে মাঝে অবিনাশবাবুর সঙ্গে লেকের ধারে বেড়াতে যায়, অথবা জঙ্গলে যায় পিকনিক করতে। অবিনাশবাবুর অনুরোধ সত্ত্বেও এবার সে প্রদর্শনীতে নাচের উৎসবে যোগ দিলে না।

অশোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু কেমন যেন হয়ে গেছে অশোক। পাগলের মত কি সব বলে। কখনও উদাস হয়ে ঘুরে বেড়ায়, কখনও প্রতিহিংসায় জ্বলে ওঠে। রুক্ষতার মধ্যে সেই মাধুর্য্য কৈ? এমনটি কণিকা ত চায় নি। অশোককে পেতে চেয়েছিল, আর পাবার সে স্বাধীনতাও ওর হয়েছে। কিন্তু অশোক ত ধরা দেয় না। এক দিন যে এমন করে ওর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিল আজ সে নিজেকে এত দুর্লভ করে তুলল কেন—কি চায় সে? কণিকা বুঝতে পারে না কি বিক্ষোভের আগুনে সে জ্বলে পুড়ে মরছে।

ফুলহারী পাহাড়ের পিছনে সূর্য্য নেমে গেছে। পূবদিকে পাহাড়ের বিরাট ছায়াটা ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে রাঙা মাটির বুকে। দূরে চকোলেট রঙের মোটরখানার সীটে বসে ঝিমুচ্ছে ড্রাইভার। পূবের আকাশে কালো অন্ধকারের আগমন সূচিত হয়েছে গাঢ় বেদনায়। নির্জ্জন পাহাড়ের সানুদেশে শালের জঙ্গলে সাদা পাথরের আসনে বসেছিল কণিকা আর অশোক। কণিকার চোখে মুখে একটা করুণ মিনতি। অশোক উদাস হয়ে চেয়েছিল দূরে দেহাতী পথটার দিকে যেখান দিয়ে সার বেঁধে স্ত্রী-পুরুষ চলছিল গ্রামের দিকে ঝাঁকা মাথায় করে। সামনে কঠিন কঙ্করাকীর্ণ মাটির মাঝে মাঝে গভীর খদ, গ্রামাঞ্চলের গায়ে যেন গভীর ক্ষতচিহ্ন।

—অধিকারের প্রশ্ন কি ওঠে না?—অশোক মুখ না ফিরিয়েই বললে।

কিন্তু অধিকার ত তুমি পেয়েছ, অশোক!—কণিকা বললে মিনতির সুরে।

—আমাকে অংশীদার করতে চাও না? অধিকারের ভাগ দিতে চাও? আমি তা চাই না। আমার বলে যাকে আমি ভাবব তাকে একান্তই আমার মনে করব। তাকে আংশিক ভাবে পেয়ে আমার তৃপ্তি নেই। এই আমার স্বভাব।

পূবের আকাশে কে যেন কালি লেপে দিয়ে গেল। প্রকৃতির গায়ের ক্ষতগুলো ভয়াবহ হয়ে উঠল সন্ধ্যার বিবর্ণ অন্ধকারে। অজানা, অনিশ্চিতের আশঙ্কা কণিকার মুখের উদ্দীপনা আর ঔজ্জ্বল্য যেন মুছে দিয়েছে। অন্তরের আকুলতা তার থামে নি। সে বললে, তুমি কি চাও স্পষ্ট করে বল, অশোক, আমাকে কি করতে বল? এ ভাবে দ্বিধা-সংশয়ের মধ্যে আমি আর বেঁচে থাকতে পারি না। অশোক ওর দিকে চেয়ে একটু হেসে উঠল। কণিকার মনে হ'ল ও হাসির পেছনে লুকান রয়েছে ভয়াবহ শাণিত হিংস্রতা। অনেকক্ষণ অশোক আর কথা বললে না, আপন মনে চেয়ে রইল দূরে ভুট্টাক্ষেতের দিকে।

'তুমি আজও কোন জবাব দিলে না তা হলে', বললে কণিকা, 'এবার আমি চলি, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাড়ী ফিরতে হবে এবার। তবে জবাব আমি তোমার কাছে আদায় করে নেবই।'

অশোক হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, আর একটু বসো না।

কণিকা বললে, আর নয়, আজ সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

অশোক হো হো করে হেসে উঠে বললে, এইটুকু স্বাধীনতা নিয়ে তুমি আমাকে পেতে চাও?

কণিকার মুখখানা কালো হয়ে উঠল, গম্ভীর হয়ে ও বললে, যদি ঠাট্টাই করতে চাও কর, আমি কিছু বলব না।—বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলতে সুরু করলে।

দাঁড়াও দাঁড়াও, শোন একটু, বলে অশোক এগিয়ে গেল তার দিকে, তার পর পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটা ছোট শিশি বার করলে; তার মধ্যে লাল রঙের কি একটা

তরল পদার্থ। কণিকার দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, এই নাও একটা উপহার এনেছি তোমার জন্যে। ল্যাবরেটরীতে বসে বসে ভাবছিলাম তোমাকে একটা উপহার দেওয়ার দরকার, আমাদের ভালবাসার স্মৃতিচিহ্ন।

কম্পিত করে শিশিটা নিয়ে কণিকা বললে, এটা কি? এর ভিতর ও কি? লাল কেন?

হাসতে হাসতে অশোক বললে, কিছু না, অতি তুচ্ছ জিনিষ, একটু বিষ।

বিষ! শিউরে উঠল কণিকা, সে কি! কি সর্ব্বনাশ! এ আমি নিতে পারব না অশোক?

নিস্পৃহ-ভাবে অশোক বললে, তোমাকে আমার পাবার এবং আমাকে তোমার পাবার এ ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় নেই।

'অসম্ভব', চেঁচিয়ে উঠল কণিকা, রুদ্ধ আক্রোশে যেন তার হৃৎপিণ্ড ফেটে বেরিয়ে পড়বে—'এ আমি পারব না অশোক। তুমি এত নিষ্ঠুর, এত ভয়ঙ্কর!'

—এতদিনেও কি তুমি বুঝতে পার নি যে আমি তোমাদের মত দুর্ব্বল স্নায়ু আর নরম মন বিশিষ্ট লোক নই? আমি যাকে পেতে চাই তাকে একান্তভাবেই পেতে চাই।

আমায় ক্ষমা কর, এ তুমি ফিরিয়ে নাও, অশোক।

অশোক পাহাড়ের মত কঠিন, কণিকার মিনতি তার গায়ে রূঢ় ধাক্কা খেয়ে ফিরে গেল। সে বললে, যদি না পার তবে নিজে খেও, সমস্যা মিটে যাবে।

আমার দ্বারা এ সম্ভব নয়, অশোক, আমার সন্তানকে নষ্ট করবার কোন অধিকার আমার নেই।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল অশোক, তুমি তা হলে মা, হতে চলেছো—বলে সে চাইল কণিকার দিকে। বড় বড় চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল দুর্ব্বার আবেগে, পুরু ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপতে লাগল। পরমুহূর্ত্তেই পিছন ফিরে সে চলে গেল সাইকেলটা তুলে ধরে। কণিকা শিশিটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চীৎকার করে উঠল, দাঁড়াও।—ততক্ষণে অশোকের সাইকেল প্রচণ্ড বেগে নেমে চলেছে পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে লালমাটির পথ ধরে, দু'ধারের অসংখ্য খদের গহ্বর এড়িয়ে।

* * *

অবিনাশবাবুর ফিরতে একটু রাত হয়ে গেল। কণিকা কাছে এসে দাঁড়াতেই সপ্রেম আগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ডাকলেন, এস, কাছে এস কণিকা, আমার ফিরতে একটু রাত হয়ে গেছে মা! কি করব বল? মাইনিং সিণ্ডিকেটের কাজে আটকে গেলাম। ভয়ানক একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। কণিকা কোন উত্তর দিলে না, তার চোখে মুখে কেমন যেন একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠল। অবিনাশবাবুর নিকট একান্তভাবে আত্মসমর্পণের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল তার মন। অবিনাশবাবু বললেন, একি! তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন? রুক্ষ চুল, চোখের কোণে কালি. মুখে হাসি নেই। তোমার কি অসুখ করেছে?

কণিকা সংক্ষেপে বললে, না। অবিনাশবাবুর দিকে তাকাতে তার সাহস হচ্ছিল না।

অবিনাশবাবু বললে, শোন তা হলে দুর্ঘটনার কথাটা বলি। বাহারগাঁও মাইনে তিন নম্বর পিটে দশ জন কুলী মারা গেছে, তাই নিয়ে অন্য কুলিরা ক্ষেপে গেছে। জনসন, রবার্টস আর আমি তৎক্ষণাৎ ছুটলাম সেখানে। ভাগ্যে গিয়ে পড়েছিলাম!

কণিকা হঠাৎ বলে উঠল, তুমি ত বাইরে থেকে খেয়ে এসেছ। রাত্রের দুধ খাবে ত? অবিনাশবাবু বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, রাত্রে দুধটা আমার চাই।

কণিকা দুধ আনতে গেল। ডাইনিং রুমে টেবিলের উপর একটা বড় কাপে দুধ ঢাকা দেওয়া ছিল। ডিসে করে দুধ নিয়ে সে চলে এল অবিনাশবাবুর ঘরে। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে অবিনাশবাবু বললেন, বুঝলে, বেটাদের বুদ্ধির দৌড় কতদূর বলি···এই যে দুধ এনেছ, দাও।···ওকি তুমি অমন করছ কেন? কি হ'ল কি তোমার? কাঁপছ কেন থর থর করে?—বলে হাত বাড়িয়ে কাপটা ধরতে গেলেন অবিনাশবাবু। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঝন্ ঝন্ শব্দে কাপটা মেঝেয় পড়ে চুরমার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কণিকার অচেতন দেহটাও মাটিতে পড়ে গেল।

কি হ'ল! কি হ'ল! বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন অবিনাশবাবু; তারপর কোলে করে ওর সংজ্ঞাহীন দেহটা তুলে নিলেন বিছানার উপর। কণিকা শুধু কাতর যন্ত্রণার শব্দ করতে লাগল। তার দেহটা নির্ম্মম ব্যথায় মুচড়ে উঠতে লাগল। কপালের নীল শিরাগুলি তার ফুলে উঠেছে, চোখের কোণ বেয়ে নেমে এল কয়েক ফোঁটা জল। কি এক অন্তর্গূঢ় মূক বেদনার আলোড়নে ওর সুকুমার দেহখানা যেন ভেঙে চুরে একাকার হয়ে যেতে লাগল। অবিনাশবাবু চীৎকার করে হাঁকডাক সুরু করে দিলেন, রামদীন, লখিয়া, পাঁচকৌড়ি, ডাকটরকো বোলাও জলদী।···

ডাক্তার আসতে একটু দেরি হবে। কণিকার চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তার শিয়রে বসে অবিনাশবাবু নিজের হাতে তাকে হাওয়া করছেন। অদ্ভুত দেখাচ্ছিল কণিকাকে। ওর সুডৌল হাত দুখানি অসহ আবেগে টনটন করছে। দেহটা বেঁকিয়ে উঠছে থেকে থেকে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে থর থর করে। বিস্রস্ত চুলগুলি নেমে এসেছে কপালের উপর, কুমকুমের টিপটাকে ঘিরে জেগে উঠেছে কয়েকটা স্বেদবিন্দু। ব্যথা নয়, এ যেন ঝড়, দেহটাকে বিশৃঙ্খল করে দিচ্ছে এক একটা ঝাপটায়। সেই ঝড়ে উড়ে গেল চেতনার ক্ষীণ আত্মসম্বরণ, দেহের শিরা-উপশিরায় অণুতে পরমাণুতে জাগল প্রচণ্ড সৃজন-বিক্ষোভ। তারই আলোড়নে অবিনাশবাবুর নবজাতক আততায়ীর চক্রান্ত ব্যর্থ করে সরস, শ্যামল ধরিত্রীর বুকে হাত বাড়াল।

রাজধানীর এক প্রান্তে

শ্রীসন্ধ্যা ভাদুড়ী

দিল্লীতে তেরাপন্থী জৈনসম্প্রদায়ের সম্মিলন বসেছে। সেখানে প্রতিনিধি হয়ে যাবার জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের আশুতোষ অধ্যাপক জৈন দর্শনে সুপণ্ডিত ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের কাছে বার বার আমন্ত্রণ আসছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এর আগে জয়পুরের সম্মিলনে গিয়ে জৈন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মধ্যে প্রাচীন ভারতের জৈন ভিক্ষুদের জীবনধারার পুনঃপ্রচলন দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে ফিরে এসেছেন। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা আমরা গিয়ে নিজেদের চোখে একবার দেখে আসি এখনও সেই মহাবীরের দিন আর বুদ্ধদেবের দিন কি করে বাঁচিয়ে রেখেছে তেরাপন্থী জৈন-সম্প্রদায়।

সেদিন ডঃ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী গিয়ে দেখলাম কলিকাতা-প্রবাসী তেরাপন্থী সম্প্রদায়ের এক বিশিষ্ট শিষ্য চাঁদমল ভাটিয়া এসেছেন। দিল্লী যাবার প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা চলছে। চাঁদমল বাবু অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী লোক। আমাদের মত অদার্শনিক লোককে সেই দর্শন-সম্মিলনীতে টেনে নিয়ে যাবার আগ্রহ দেখে অবাক হলাম। চাঁদমল বাবু বার বার অনুরোধ জানালেন যেন আমরা নিশ্চয়ই যাই। সামনে ঈষ্টারের ছুটি। সেই সময় আমাদের যাওয়া ঠিক হ'ল।

ঈষ্টারের ছুটি। দিল্লী এক্সপ্রেসে বেরিয়ে পড়লাম আমরা পাঁচ জন—ডঃ মুখোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রী ও তাঁর বোন উমা দেবী আর আমি। সঙ্গে চাঁদমল বাবু ছিলেন। ট্রেনে এক রাত এবং পুরো এক দিন। অবশেষে ভোরবেলায় আমরা এসে পৌঁছলাম দিল্লী ষ্টেশনে। সেখান থেকে গ্রীণ হোটেলে যাওয়া গেল। কোনমতে জিনিষপত্র গুছিয়ে স্নান সেরে আমরা সম্মেলনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

পুরানো দিল্লীর মাঝামাঝি জায়গা। বাজার, দোকান, মারোয়াড়ীর গদি, টাঙা, সাইকেল-রিক্সায় সমাকীর্ণ পথ। কর্ম্মব্যস্ত নগরীর চলমান জনস্রোতের মধ্যে হঠাৎ চোখ থমকে যায়। গেরুয়া বস্ত্রে মণ্ডিত উন্নত তোরণ-দ্বার অভ্যন্তরে কোনও বিশেষ অধিবেশনের নির্দ্দেশ দিচ্ছে। টাঙা থেকে নেমে আমরা এগিয়ে গেলাম উৎসুক দৃষ্টি একবার চারদিকে বুলিয়ে নিয়ে। খানিকটা যাবার পর চোখে পড়ল সামনে চাঁদোয়া-ঘেরা বিস্তৃত স্থান। দর্শক অথবা শ্রোতার বসবার জন্যে চেয়ার নেই, বক্তার জন্যে মণ্ডপ তৈরি হয় নি। বালুবিছানো মাটির ওপর মেয়েদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বসলাম। আমাদের সামনে উঁচু কাঠের টেবিলের ওপর কাঠের চৌকিতে বসে তুলসীরামজী হিন্দি ভাষায় সংস্কৃত মিশিয়ে কথা বলছেন। তাঁর ডান দিকে রাজস্থানের সহস্র ফুল ফুটে রয়েছে লাল, হলদে, গোলাপী, কমলা, নীল, সবুজ নানা রঙের ওড়না আর ঘাগরার মধ্যে; তাঁর বাঁ দিকে বৈরাগ্যের বিমল শুভ্রতা শ্বেতাম্বর ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের মধ্যে। সামনে ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী, শিক্ষাজীবী, শিক্ষানবিশ, ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র সর্ব্বশ্রেণীর সমন্বয়। মাথার উপর হলদে রঙের চাঁদোয়া, পায়ের তলে গঙ্গাজলী বালুরাশি, আশেপাশে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের একত্র অবস্থান আর সামনে হিমালয়ের মত ঐ বিরাট ব্যক্তিত্ব, কণ্ঠে যাঁর মেঘমন্দ্র স্বর, চোখে যাঁর অপরিসীম করুণা, আর ভাষায় যাঁর সর্ব্বধর্ম্মের মূল কথা মানবিকতা—মনে হ'ল সনাতন ভারতবর্ষে ফিরে এসেছি। রাজধানীতে বসে প্রাচীন ভারতবর্ষকে মনে প্রাণে অনুভব করলাম।

মনোহারী ও উমা দেবী

তুলসীরামজী বলে চলেছেন ধর্ম্ম কাকে বলে সেকথা। আচার-অনুষ্ঠান পালন ধর্ম্ম নয়। ধর্ম্ম রয়েছে সর্ব্বজীবের প্রতি অহিংসায়, সর্ব্বজীবের কল্যাণসাধনে। আরও অনেক কথা ইনি বললেন। দেখলাম সংসারত্যাগী হলেও এঁরা জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নন। বর্ত্তমান চীনের কথা, রাশিয়ার কথা, পাকিস্থান এবং ভারতবর্ষের সমস্যা—এ সব তথ্য এঁদের জ্ঞানের ভাণ্ডারে অপাংক্তেয় নয়। তুলসীরামজী বললেন—এ সমস্ত সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় অহিংসামন্ত্র প্রচারে আর পরস্পরের প্রতি মৈত্রীজ্ঞানে। বাস্তবিক পক্ষে বর্ত্তমান পরি-

বিড়লা মন্দির

স্থিতিতে এ রকম সম্মিলনীর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। তুলসী রামজীর ভাষণ শেষ হ'ল। ইতিমধ্যে বহু ভক্ত এসে তাঁর পদধুলি গ্রহণ করলেন। আবাল বৃদ্ধ-বনিতা-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রণামের ধরণ এক। সামনে এগিয়ে এসে করজোড়ে জানু-পেতে বসে এরা তিন বার মাথা নীচু করে অভিবাদন করেন, তারপর উঠে গিয়ে পায়ের ধুলা মাথায় নেন।

তুলসীরামজী গাত্রোত্থান করলেন। সমবেত জনমণ্ডলী উঠে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে বলে উঠল, "ক্ষমা, ক্ষমা"। ইনি এগিয়ে চললেন। আশেপাশে, সামনে পিছনে চারি দিক থেকে এক-সঙ্গে ভেসে আসতে লাগল এক সুর "ক্ষমা ক্ষমা"। অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে আর একবার অনুভব করলাম প্রাচীন ভারতকে মনের মধ্যে।

এখানে তুলসীরামজী এবং এই ধর্ম্ম-সম্মিলনীর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে নিই। মহারাজ শ্রীতুলসীরামজী রাজস্থানের শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী জৈনসম্প্রদায়ের বর্ত্তমান প্রধান পরিচালক। এঁদের নিজস্ব কোন আশ্রয় বা আশ্রম নেই। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা তুলসীরামজীর সঙ্গে পরিব্রাজকের মত ঘুরে বেড়ান। যখন যেখানে যান সেখানকার গৃহস্থ শিষ্যেরা এঁর আশ্রয় ঠিক করে দেন। প্রতি বৎসর একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে এঁর সমস্ত শিষ্য-শিষ্যারা এবং ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা মিলিত হন। এবার এঁরা মিলেছেন দিল্লীতে। এখানে কিছু দিন থেকে ফিরে যাবেন আবার রাজস্থানে।

সভা থেকে বেরিয়ে আমরা তুলসীরামজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তাঁর নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে। দেখা হ'ল। জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আমরা এসেছি। নিছক কৌতূহলের বশে যে সেই বাংলাদেশ থেকে ছুটে এসেছি দিল্লীতে, সে কথা বলতে পারলাম না।

এবার আমাদের দেখা হ'ল ভিক্ষুণীদের সঙ্গে। শ্রীতুলসীর মা ও বোনের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তাঁর বড় ভাইকেও দেখলাম। এঁদের সকলের দীক্ষা হয়েছে তুলসীরামজীর কাছে। মা তাঁর ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়ে থাকেন। বোনের উপর সমস্ত ভিক্ষুণীদের তত্ত্বাবধানের ভার রয়েছে। ভিক্ষুণীরা এঁকে খুব মান্য করেন। দেখলাম এঁরা শুধু শাস্ত্র আলোচনা করেই দিন কাটান না; শুধু কঠোর নিয়ম পালন করে পাষাণে পরিণত করেন নি। এঁদের হাতের কাজ দেখে বিস্মিত হলাম, চমৎকৃত হলাম এঁদের আন্তরিকতায়। নারকেলের মালা পরিষ্কার করে তার ওপর রং ফলিয়ে এমন সূক্ষ্ম সুন্দর কাজ তাঁরা করেছেন যে সেগুলি যে-কোন শিল্প-প্রদর্শনীতে যে পুরস্কারলাভ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দুপুরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

মাঝারি আকারের একটি ঘর। মাঝখানে সামনে কাঠের জলচৌকি রেখে তুলসীরামজীর বোন বসে দর্শনপ্রার্থিনীদের সঙ্গে আলাপ করছেন। তাঁর চার পাশে এখানে ওখানে ছড়িয়ে বসে রয়েছেন বহু ভিক্ষুণী। কেউ সংস্কৃত ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করছেন, কেউ পত্র লিখছেন, কেউ পড়া করছেন। কোনো সদ্যোদীক্ষিতা দেবনাগরী অক্ষর লেখা অভ্যাস করছেন। আমরা যেতেই এঁরা সকলে আমাদের স্বাগত করে বসালেন। পরম আগ্রহে আমাদের নাম-ধাম, শিক্ষা, বৃত্তি সব জিজ্ঞাসা করলেন। এমন সরল এঁদের আচরণ, এমন মধুর এঁদের ব্যবহার যে, আমাদের একবারও মনে হ'ল না যে আমরা আগন্তুক মাত্র। এঁদের রাজস্থানী হিন্দি আমরা ভাল বুঝলাম না। এঁরা আমাদের সংস্কৃত গান গেয়ে শোনালেন, নিজেদের কবিতা পড়ে শোনালেন। তারপর একে একে দেখাতে লাগলেন হাতের কাজ। নিজেরা কাপড় বোনেন, খাবার বাসন তৈরি করেন নারকেলের মালা দিয়ে। চলবার সময় জীবহত্যার ভয়ে চামরের মত যে 'রজোহরণী' দিয়ে তাঁরা সামনের ধুলো সরিয়ে সরিয়ে চলেন তাও তাঁদের নিজেদের হাতে তৈরি করা। এঁদের হাতের অক্ষর যেমন সূক্ষ্ম তেমনই সুন্দর। এঁদের পোশাক সাদা। মাথা 'কেশনির্ম্মূল'। অঙ্গে কোন আভরণ নেই। দেহকে সুন্দর করে তোলবার এতটুকু উপকরণ কোনখানে নেই। মুখে এঁদের শিশুর সারল্য। ছবি তোলবার জন্যে ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ছবি তুলতে ওঁরা দিলেন না ছবি তোলা এঁদের ধর্ম্ম ও আদর্শের বিরোধী।

সারা দিনে সমস্ত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা একবার ভিক্ষা করেন। এক বাড়ীতে একাধিক ব্যক্তির ভিক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ। সমস্ত ভিক্ষা একত্র করে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয়। অপূর্ব্ব এঁদের তপশ্চরণ।

এঁদের মধ্যে আর একদল মেয়ে দেখলাম, তাঁরা ভিক্ষুণীও নন, গৃহচারিণীও নন। শুনলাম তাঁদের পরীক্ষা চলছে। দীক্ষা-গ্রহণের পূর্ব্বে কিছুদিন এঁদের থাকতে হয় তুলসীরামজীর অধীনে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের সঙ্গে। এ সময়টা এঁদের পরীক্ষা-কাল। যদি এঁরা উত্তীর্ণ হন তবেই এঁদের দীক্ষা হয়। আর যদি দেখা যায় ভিক্ষুজীবন যাপনে এঁরা সমর্থ বা উপযুক্ত নন তা হলে এঁদের ফিরে যেতে হয় গার্হস্থ্যাশ্রমে। এঁদের মধ্যে অধিকাংশ মেয়েই অভিজাত ও ধনী পরিবারের। এর মধ্যে সমস্ত ঘর ছেয়ে গিয়েছে রঙে রঙে। বহু রাজপুতরমণী এসেছেন। পঞ্জাববাসিনীও কয়েকজন দেখলাম। এঁরা গৃহস্থ শিষ্যা।

নিয়মপালন এঁদেরও করতে হয়, তবে তাতে এতখানি কৃচ্ছ্রতা নেই। ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে এঁরা এখানে মিলিত হয়েছেন। যত দিন এঁদের গুরু মহারাজ থাকবেন তত দিন এঁরাও থাকবেন। তারপর ফিরে যাবেন স্বস্থানে। দেখলাম এঁরা ভিক্ষুণীদের খুব শ্রদ্ধা করেন। গঙ্গা নামে একটি তরুণী ভিক্ষুণীকে অশীতিবর্ষীয়া এক বৃদ্ধা এসে প্রণাম করলেন। গঙ্গা আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে, "ইনি আমার পূর্ব্বাশ্রমের পিতামহী।" পিতামহী পৌত্রীকে এখন আর স্নেহের চোখে দেখেন না, ভক্তির চক্ষে দেখেন।

বেলা যখন তিনটে বাজল তখন ভিক্ষুণীরা উঠে পড়লেন। এখন এঁদের পড়বার সময়। এই সময় তাঁরা তুলসীরামজীর কাছে পড়াশুনা করেন। এঁদের সঙ্গে আমরাও গেলাম। তুলসীরামজী এঁদের কয়েকজনের প্রবন্ধ শুনলেন। তারপর নিজের লেখা মুকুল নামক পুস্তক পড়ে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। শুধু বৈরাগ্য নয়, শুধু নীতিকথা নয়, শুধু জ্ঞান নয়, এগুলির সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত আছে বলেই কঠোর জীবনকে এঁরা এত সহজ সুন্দর ভাবে নিতে পেরেছেন। হৃদয়কে উপবাসী রেখে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেন নি।

ওখানে একটি কিশোর-সন্ন্যাসী দেখলাম। বার বছরের চপলমতি বালক। নিজের মনে গুনগুন করে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুনলাম আট বছর বয়সে তার দীক্ষা হয়েছে। পড়াশুনাতেও সে ইতিমধ্যে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। তুলসীরামজী তাকে ডেকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ডা: মুখোপাধ্যায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি কি পড়েছে। শুনলাম ব্যাকরণ আর জৈনদর্শনের অনেকখানি সে আয়ত্ত করে ফেলেছে। জৈনদর্শনের কয়েকটা সূত্রও সে বললে। এরই মধ্যে কারুর উত্তরীয় ধরে টানলে, কারুর ভিক্ষার ঝুলিতে হাত ঢুকিয়ে দিলে। নিতান্ত বালকোচিত। তুলসীজী সস্নেহে তাকে দেখছিলেন। এবার একটি শ্লোক তিনি রচনা করলেন যার অর্থ—প্রকৃতির বৈচিত্র্যই এই যে, বালক বাচালতা অবলম্বন করবে, কিন্তু তার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে ভবিষ্যৎকালের বিরাট সম্ভাবনার বীজ। তরুণ সন্ন্যাসীটি কয়েকবার আবৃত্তি করে সেটা মুখস্থ করে ফেললে। মাঝখানের দুটি ছত্র ভুলে গিয়ে ডা: মুখোপধ্যায়ের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "বাকি ছত্র দুটো কি বলুন তো?"

ভোরের এক ঝলক আলোর মত এই কিশোরটি সমস্ত ভিক্ষু ভিক্ষুণীর জগৎ স্নিগ্ধ করে রেখেছে। আর এক জন ভিক্ষুর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তিনি মদ্রদেশীয়। কমার্স পড়তে পড়তে চলে এসেছেন। ফ্রান্স-ফেরত আর এক ভদ্রলোকের জ্ঞানপিপাসা আজও নিবৃত্ত হয় নি।

ভিক্ষুণীদের কাছে সেদিনকার মত বিদায় নিয়ে ফিরে আসছি এমন সময়ে আঁচলে টান পড়ল। তাকিয়ে দেখি নীল ওড়নার মধ্যে দিয়ে ঝক্ ঝক্ করছে এক জোড়া কালো চোখ। ভাঙা বাংলায় শুনলাম, "চলুন আমার বাড়ীতে।"

বিস্মিত হয়ে বললাম, "আপনি দেখছি বাংলা জানেন?"

"হ্যাঁ আমি অনেক দিন সাহেবগঞ্জে ছিলাম। সেখানে বাংলা শিখেছি।" বলে সে ঘোমটা সরালে। ভাল করে তাকে লক্ষ্য করলাম। রাজপুত-নারীর যে বর্ণনা পেয়েছি তার সঙ্গে কিছু মেলে বৈ কি। স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যে আর মনের খুশীতে সে যেন ঝলমল করছে। কোনমতে তাকে এড়াতে না পেরে আমি আর উমাদি তার সঙ্গে গাড়ীতে এসে বসলাম। গাড়ী এসে থামল একটা গলির মুখে। সম্মুখবর্ত্তিনীকে অনুসরণ করে আমরা এসে ঢুকলাম বাড়ীর মধ্যে। পরম আদরে সে আমাদের নিয়ে গেল আলো-অন্ধকার জড়ানো কক্ষে। গালচে পাতাই ছিল। তার উপর সে আমাদের বসালে। একটু পরে সে আর একটি মেয়েকে নিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে। বললে, "এ আমার ভাইয়ের বউ। সংসারে ওর মন নেই, বলছে ভিক্ষুণী হবে।"

আমার সঙ্গিনী মেয়েটিকে পাশে বসিয়ে ঘোমটা খুলে দিলে। দেখলাম সুন্দর কচি মুখ একখানা। বাসন্তী রঙের ঘাগরার ওপর ঘন নীলের কাঁচলী, তার ওপর নেমে এসেছে গোলাপী রঙের উড়না। মাথার সিঁথিতে একটা বড় ধুকধুকি গলায় মুক্তার এক নরী হার। কটিতে সোনার মালা। লাজুক মেয়েটি চোখ নামিয়েই ছিল। আমার সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করলে "তোমার কিসের দুঃখ যে তুমি ভিক্ষুণী হবে?"

প্রত্যুত্তরে মেয়েটি হাসলে।

আবার প্রশ্ন, "জানো, ভিক্ষুণীর জীবন কি অসম্ভব কষ্টের? সমস্ত গয়না খুলে ফেলতে হবে। মাথার চুল কেটে ফেলতে হবে। রঙীন পোশাক পরতে পাবে না। মা-

যাবার কাছে ফিরে যেতে পারবে না, স্বামীকে ভালবাসতে পারবে না।"

এবার মেয়েটি চোখ তুলে তাকালে। বললে, "কেউ কি আমায় জোর করে বলতে পারবে যে স্বামীর ভালবাসা আমার চিরদিন থাকবে? আমার মা বাবাও কি চিরকাল বাঁচবেন? যে ভালবাসা আমি চিরদিন পাব না তাতে আমার কি দরকার? তার চেয়ে আমার প্রভুর ভালবাসাই ভাল যা কোন দিন ফুরোবে না।"

বিস্মিত হলাম মীরাবাইয়ের এই আধুনিক সংস্করণে। মনে হ'ল এ মেয়ে নিজেই তার জীবনের পথ ঠিক করে ফেলেছে, কিছুতেই আর তাকে ঠেকাতে পারবে না। আমি মেয়েটির ননদকে (মনোহারী তার নাম) জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার মা বাবা ভাই সকলে খুশীমনে অনুমতি দেবেন? কেউ রাগ করবেন না এতে?"

মনোহারী বললে, "রাগ করবেন কেন? ও তো ভাল কাজেই যাচ্ছে? তবে আমার ভাই এখনও অনুমতি দেয় নি। তার অনুমতি না পেলে ওর দীক্ষা হবে না।"

মনোহারীর ভ্রাতৃবধূ ইতিমধ্যে কখন নিঃশব্দচরণে উঠে গেছে টের পাই নি। একটু পরেই সে ফিরে এল প্রদীপ হাতে নিয়ে। তার পর দুই ননদ ভাজে মিলে পরিপাটি করে আমাদের খাবার জায়গা করলে। এক এক করে খাবার আনতে লাগল। প্রথমে এল বিরাট থালায় মোটা মোটা পুরী, শাকভাজা, ঢেঁড়সভাজা, চাটনি আর দুধ দিয়ে মেশানো আমের রস। তার পর এল ডালমুঠ, পাঁপরভাজা, ঘিয়ের আর ময়দার তৈরি মিষ্টি, সাদা কুমড়োর মোরব্বা আর নিমকি। খাবার দেখে ঘাবড়ে গেলাম। করুণ চোখে একবার উমাদির দিকে তাকালাম। উমাদি রাজপুতরমণীর আতিথ্যে বিগলিত হয়ে গিয়েছিল, আমার পানে দৃষ্টিপাত করলে না। মনোহারী ইতিমধ্যে পেঁপে, লকেটফল আর কমলা নিয়ে এসেছে। তাকে বললাম, "আমাদের কি আজ ফাঁসির হুকুম হয়েছে?" প্রত্যুত্তরে মনোহারী দু'টুকরো পেঁপে নিয়ে আমার মুখে জোর করে গুঁজে দিলে।

কাটল একটা দিন। আবার প্রভাত, আবার সম্মিলনে গমন, ভিক্ষুণীদের সাহচর্য্য; তুলসীরামজীর ভাষণ। সেদিন মনোহারী গাড়ী করে এসে উপস্থিত। আমাদের নিয়ে সে সমস্ত দিল্লী শহর ঘুরে দেখালে। প্রায় আড়াই শ'র উপর সিঁড়ি ভেঙে কুতুবের চূড়ায় উঠলাম। সেখান থেকে গেলাম বিড়লা-মন্দিরে। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে আমাদের দলের মেয়েরা ঠিক করলেন তাঁরা পরদিন ভোরে বাসে হরিদ্বার যাবেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় ভিড়ের ভয়ে যেতে চাইলেন না। আমারও বিশেষ কারণে যাওয়া হ'ল না।

পর দিন যখন হরিদ্বারের বাস ছেড়ে দিল তখন বার বার মনে হতে লাগল গেলেই ভাল হ'ত। ডাঃ মুখোপাধ্যায় বোধ হয় আমার বিমনা ভাব লক্ষ্য করেছিলেন। বললেন, "যাক্ ওরা। আজ সারা দিনটাকেই কাজে লাগাব, দেখি কে হারে কে জেতে।"

নিজেদের জয় সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলাম। তার প্রমাণ পেলাম হোটেলে ফিরেই। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের হোটেলের রান্না সহ্য হয় না। তাঁর জন্যে কিছু রান্না করা দরকার। রোজ সকালে উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে রান্না করা অভ্যাস, সেই রান্না যে বিদেশে এমন শত্রুতাসাধন করবে কে জানত! ভিজে কাঠকয়লার পিছনে একটা গোটা দেশলাই আর এক দিস্তে পুরানো খবরের কাগজ নিঃশেষ করে যখন হিমসিম খাচ্ছি ঠিক সেই সময়ে সামনে এসে দাঁড়াল প্রতিবেশিনী জালন্ধর-বাসিনী। তার ভাষা আমি বুঝলাম না বটে, কিন্তু সে দেশলাই আর পাখা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে উনুনে মন দিলে। জালন্ধরবাসিনী উনুন ধরিয়ে আমার দিকে ফিরে স্মিতমুখে কি যেন বললে। তার কথার তাৎপর্য্য আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

সেদিন বিকেলে বিড়লামন্দিরে আবার আমাদের যোগ্যতার পরীক্ষা হয়ে গেল। বিড়লা-মন্দিরটির বিরাট পরিকল্পনায় মুগ্ধ হতে হয়।

পরদিন সকালে হরিদ্বারের যাত্রীরা ফিরে এলেন। আর আমাদের একটা দিন মাত্র হাতে। সকালে তুলসীরামজীর ভাষণ শুনতে গেলাম। সেদিন তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল—জৈনরা হিন্দু কিনা। বক্তৃতা-শেষে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "হরিদ্বারের জলে কি আত্মশুদ্ধি হয় বলে বিশ্বাস কর?" আচার অনুষ্ঠানের প্রতি এঁদের ততখানি আস্থা নেই যতখানি আছে নীতি ও চরিত্রের উপর। ভিক্ষুণীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম। একটু পরেই ডাঃ মুখোপাধ্যায় ফিরে এসে বললেন কাল ট্রেনে তাঁর যাওয়া হবে না। কারণ পার্লামেন্টের কনষ্টিটিউশন ক্লাবে তুলসীরামজীর প্রার্থনা-সভায় তাঁর বক্তৃতা আছে। কিন্তু আমাদের টিকিট হয়ে গেছে, যেতেই হবে। অতএব ওঠো, বিছানা বাঁধো, কাপড় তোলো, ঘড়িটা কোথায়, কটা মাল, গাড়ী কখন···আবার সেই হৈ হৈ।

বেথুন বিদ্যালয়ের প্রথম কি নাম ছিল

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বেথুন বিদ্যালয়ের (বর্ত্তমানে স্কুল ও কলেজ) শতবর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে। শতবর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে গত বৎসর বঙ্গের নারীসমাজ নানারূপ উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। ঐ সময় বেথুন বিদ্যালয় সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনাও চলে। একটি বিষয়ে হয়ত এখনও কাহারও কাহারও কৌতূহল রহিয়া গিয়াছে। বেথুন বিদ্যালয়ের প্রথমে কি নাম ছিল? এই বিষয়ে এখানে কিঞ্চিৎ বলিতে চাই।

বলা বাহুল্য, বেথুন বিদ্যালয় প্রথমে একটি স্কুল মাত্র ছিল। ইহা আবার আধুনিককালের স্কুলের মত নয়। নয়-দশ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালিকারা বিদ্যালয়ে আসিত না। তখন অধিকাংশেরই এই বয়সে বিবাহ হইয়া যাইত। বেথুন সাহেব ভদ্র হিন্দুকন্যাদের শিক্ষার নিমিত্ত ১৮৪৯ সনের ৭ই মে এই বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে বড়লাটের শাসন-পরিষদের আইন-সদস্য রূপে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবসে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহা হইতে জানা যায়, বিলাতে অবস্থান কালেই ভারতীয় নারীজাতির মধ্যে শিক্ষা প্রসারের প্রতি তাঁহার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলিকাতায় আগমনান্তর নব্যবঙ্গের নেতৃস্থানীয় রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে পরিচিত হন। বিদ্যালয় স্থাপনকল্পে প্রারম্ভিক যে সব আয়োজন ও সভাদির অনুষ্ঠান হয়, 'সম্বাদ ভাস্কর'* ১৮৪৯, ১০ই মে সংখ্যায় তাহার একটি আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রকাশ করেন। ইহাতে আছে:

বুদ্ধিনিপুণ বেথুন সাহেব ১২ বৈশাখ [২৩শে এপ্রিল] সোমবারে তথায় সাধারণ বন্ধু শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন ঘোষ বাবু স্বদেশস্থ বান্ধবদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এই বিষয়ের সহায়তা করেন, তাহাতে বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয় আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ-পূর্ব্বক স্বীকৃত হইলেন তাঁহারদিগের বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন এবং তৎপর সোমবারে [৩০শে এপ্রিল] ঐ সকল আত্মীয়গণকে লইয়া যাইয়া বেথুন সাহেবের সাক্ষাতেও বান্ধবগণকে এই বিষয় স্বীকার করাইলেন, তৎ সময়ে শ্রীযুত বেথুন সাহেব ঐ সকল ব্যক্তিকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কালে পরামর্শ ধার্য্য করিয়া গত সোমবারেই [৭ই মে] বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে দিয়াছেন,...।

* বারত্রয়িক সংবাদপত্র, ১৮৪৯ সনের ১২ই এপ্রিল হইতে সপ্তাহে তিন বার বাহির হইতে আরম্ভ হয়।

ইহার পরবর্ত্তী ১২ই মে সংখ্যায়—বিদ্যালয়-গৃহের অন্বেষণে রামগোপালের সঙ্গে বেথুন সাহেবের দক্ষিণা-রঞ্জনের বাহির সিমলাস্থ (পরে, সুকিয়া ষ্ট্রীট) বৈঠকখানা গৃহে গমন, তৎকালে দক্ষিণারঞ্জনের অনুপস্থিতি, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখাৎ উক্ত আগমন-সংবাদ প্রাপ্তি, পরে বেথুন সাহেবের গৃহে দক্ষিণারঞ্জনের গমন, তাঁহার নিকট স্কুলের জন্য স্বীয় ভবন বিনা ভাড়ায় দিবার এবং পাঁচ সহস্র টাকা মূল্যের নিজ গ্রন্থাগার দানের অভিপ্রায় প্রকাশ, বিদ্যালয়ের স্থায়ী আবাসের জন্য মির্জ্জাপুরে সাড়ে পাঁচ বিঘা পরিমিত ভূমি দানের প্রতিশ্রুতি, নিজ ভবনে ফিরিয়া আসিয়া পত্রে লিখিত ভাবে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন, বেথুনের উহা সানন্দে গ্রহণ, প্রভৃতি যাবতীয় তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও 'ভাস্করে' সমুদয় বিবরণের মধ্যে বেথুন-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের কোন নামের উল্লেখ নাই।

সে যুগের অন্যতম বিখ্যাত সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকরে' কিন্তু প্রথম দিনে ইহার নাম পাওয়া যাইতেছে 'বিক্টরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়'। ৭ই মে প্রাতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে ইহার উদ্যোগ-আয়োজন সম্পর্কে 'সংবাদ প্রভাকরে' যে সংবাদ বাহির হয় তাহাতে দুই বার উদ্ধৃতি-চিহ্নের ("...") মধ্যে উক্ত নামের উল্লেখ আছে। দুই দিন পরে ৯ই মে সংখ্যার সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কীয় সংবাদে ইহার নাম "বিক্টরিয়া বালিকা বিদ্যালয়" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তিন দিনের মধ্যে "বিক্টরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়" এবং "বিক্টরিয়া বালিকা বিদ্যালয়" দুই রকম নাম লিখিত হওয়ায় এরূপ ধারণা হওয়া অসঙ্গত নয় যে, 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথমে প্রস্তাব মাত্র শুনিয়াই ঐরূপ নামের উল্লেখ করিয়াছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকরে' পরবর্ত্তী ৪ঠা জুন (১৮৪৯) পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের শেষোক্ত নামটিই পাওয়া যায়। এই সময়ে "সমাচার চন্দ্রিকা'তেও বিদ্যালয়টির কথা যে উক্ত নামে প্রকাশিত হয় তাহার প্রমাণ আছে। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, "সমাচার চন্দ্রিকা" রক্ষণশীল সমাজের মুখপত্র। প্রগতিপন্থী রামগোপাল ঘোষ কিংবা নারী-কল্যাণকামী বেথুন সাহেবের সঙ্গে উহার ঘনিষ্ঠতা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। 'সংবাদ প্রভাকরে'র উপর নির্ভর করিয়াই এইরূপ নাম লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, 'সংবাদ প্রভাকর' উক্ত নাম কোথা হইতে পাইলেন? আর 'সম্বাদ ভাস্কর' যখন বিদ্যালয় সম্পৃক্ত অতি খুঁটিনাটি বিষয়ও ব্যক্ত

করিয়াছেন* তখন ঐরূপ নাম স্থিরীকৃত হইয়া থাকিলে উল্লেখ করিলেন না কেন, সে সম্বন্ধে আমাদের মনে ধোঁকা থাকিয়া যায়।

মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদিত হইতে পারে যে, বেথুন সাহেব প্রতিষ্ঠাকালে ইহার কোনও নামের উল্লেখ করিয়াছিলেন কি-না। ১৮৪৯, ৭ই মে বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বেথুন একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাটি সম্পূর্ণই পরদিন ৮ই মে *The Bengal Hurkaru and India Gazette* নামক দৈনিকপত্রে প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে একস্থলে আছে:

"The time may come, and that at no distant period, when all reserve of this kind may be laid aside when the Calcutta Female School, by whatever other and more illustrious name it may then be known, shall take its proud place among the most honoured, as it will assuredly be one of the most useful institutions— of the land."

এখানে বেথুন প্রমুখাৎ সর্ব্বপ্রথম তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির নাম "Calcutta Female School" বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। ১০ই ও ১২ই মে তারিখে "সম্বাদ ভাস্করে" এই বক্তৃতাটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়। উক্ত অংশের অনুবাদ "সম্বাদ ভাস্কর" এইরূপ করিয়াছেন:

অল্পকাল গতে এমত দিন উপস্থিত হইবেক তাহাতে এ-সকল প্রতিবন্ধক থাকিবেক না, এই "কলিকাতা ফিমেল স্কুল" যাহার তৎকালে যে কোন শ্রেষ্ঠ নামকরণ হউক ইহা এতদ্রাজ্যের মান্যতম ও প্রধান হিতকারী বিদ্যামন্দির হইবেক।

এই অনুবাদে "কলিকাতা ফিমেল স্কুল" উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে থাকায় বেথুন স্থাপিত বিদ্যালয়ের উক্ত নামই সমর্থিত হইতেছে। সুতরাং স্বয়ং বেথুন বিদ্যালয়টির নাম "Calcutta Female School" এবং নব্যবঙ্গের অন্যতম প্রধান বান্ধব ও বিদ্যালয়ের সমর্থক সম্বাদ ভাস্কর "কলিকাতা ফিমেল স্কুল" বলিয়া উল্লেখ করায় বিদ্যালয়টির নাম সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তবে 'সংবাদ প্রভাকরে'র অন্যরূপ নামোল্লেখের তাৎপর্য্য কি? গত ১৩৫৬ সনের আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে (পৃ. ২৪৭) "বেথুন বালিকা বিদ্যালয়" শীর্ষক প্রবন্ধে 'সংবাদ প্রভাকর'-প্রদত্ত নামের উল্লেখ করিয়া আমি এ বিষয়ে লিখি:

"সংবাদ প্রভাকর" হইতে জানা যাইতেছে, বেথুন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে 'ভিক্টোরিয়া'র নামের সংযোগ সাধনের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু কেন ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই পরে আমরা তাহা জানিতে পারিব।

ইহার পরে উক্ত সংখ্যায় ২৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলাম:

বেথুন কোর্ট অফ ডিরেক্টর্সের নিকট ভিক্টোরিয়ার নাম যুক্ত করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি গ্রহণের অনুরোধ জানাইলেন। কোর্ট এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই।

তখন সংক্ষিপ্ত ভাবে যাহা লেখা হইয়াছে বর্ত্তমানে একটু বিশদ ভাবে সে সম্বন্ধে বলিতেছি। এ বিষয়ে এখন আমরা নিঃসন্দেহ যে, বেথুন প্রতিষ্ঠাকালে স্কুলটির "Calcutta Female School" বা বাংলায় "কলিকাতা ফিমেল স্কুল" নাম দিয়াছিলেন। তবে বিদ্যালয়টির নাম যে, 'ভিক্টোরিয়া'র নামের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছিল তাহা বেথুনের 'By whatever other and more illustrious name'—এই উক্তি হইতে অনুমিত হইতেছে। 'সংবাদ প্রভাকর' বিদ্যালয়টির সঙ্গে 'ভিক্টোরিয়া' নাম সরকারী ভাবে যুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় ও সাধারণের মধ্যে এই নামই তখন প্রচারিত হইবার অবকাশ পায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ৪ঠা জুন (১৮৪৯) পর্য্যন্ত 'সংবাদ প্রভাকর' 'বিক্টরিয়া বালিকা বিদ্যালয়' বলিয়া বিদ্যালয়টি উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ৬ই জুন হইতে এই নাম পরিত্যক্ত হয়। ঐ দিবসে ও ১৩ই জুন তারিখে বিদ্যালয়টির নাম 'বালিকা বিদ্যালয়' মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। 'ভিক্টোরিয়া' নামটি ইহার সঙ্গে আর কখনও যুক্ত হইতে দেখি না। বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার এক মাসের মধ্যেই 'সংবাদ প্রভাকর'-কর্ত্তৃক এই নামের পরিবর্জন হইতে বুঝা যায়, তৎপ্রচারিত নামটি বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা সরকারী ভাবে কখনও গ্রাহ্য হয় নাই। পরন্তু 'সংবাদ ভাস্করে' ২৩শে জুন (১৮৪৯) তারিখে "স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ক" একখানি প্রেরিত পত্রেও স্পষ্টই পাইতেছি:

"...শ্রীযুত ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব কতিপয় সভ্য এবং দেশহিতৈষী মহোদয়ের সাহায্যানুকূল্যে যে "ফিমেল স্কুল" অর্থাৎ স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন..." ইত্যাদি।

ইংলণ্ডে দীর্ঘকাল প্রচলিত একটি বিশেষ বিধিরও প্রচলন আছে। তথায় "Royalty"-র (অর্থাৎ, রাজা বা রাণীর) নাম কোন-কিছুর সঙ্গে যুক্ত করিতে হইলে একটি পদ্ধতির মধ্য দিয়া যাইতে হয়। রাজা বা রাণীর সার্টিফিকেট বা অনুমতি-পত্র প্রাপ্ত হইলেই তবে তাঁহার নাম কোন

* 'সম্বাদ ভাস্কর'-সম্পাদক বিদ্যালয় বিষয়ক বিভিন্ন ব্যাপারে যে বিশেষ যুক্ত ছিলেন তাহার একাধিক প্রমাণ আছে। ১৮৪৯, ২৩শে মে বেথুনের সভাপতিত্বে বিদ্যালয় স্থানে একটি সভা হয়। সভায় বেথুন ব্যতীত রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। এই সভায় ভাস্কর'-সম্পাদকও উপস্থিত ছিলেন। ইহার বিবরণ প্রদান প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, 'উক্ত সভাতে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার বান্ধবেরা কেহ২ আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন...' ইত্যাদি।

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করা যাইতে পারে। বেথুন আইন-সদস্য ছিলেন। কাজেই এরূপ বিধি-বহির্ভূত কাজ করা তাঁহার পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। কথা উঠিতে পারে, তখন উক্ত নামের প্রতিবাদ হয় নাই কেন? এই মাত্র বলিয়াছি, এবং পরবর্ত্তী উদ্ধৃতি হইতেও আমরা বুঝিতে পারিব, ভিক্টোরিয়ার নাম বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযোগের অভিপ্রায় বেথুন ও তাঁহার বাঙালী বান্ধবদের মনেও জাগরূক ছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উহা কার্য্যে রূপায়িত হইতে পারে নাই। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সরকারী ভাবে এই নাম গ্রহণ না করিলেও সাধারণের মনোভাবের কথা বিবেচনা করিয়াও ইহার প্রতিবাদ করা হয়ত যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। তখন 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার'-এর মত বাঙালী-পরিচালিত কোন কোন প্রতিপত্তিশালী পত্রিকা এই বালিকা বিদ্যালয়ের ঘোর বিপক্ষতা করিতেছিলেন। একথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে ১৮৫০, ২৯শে মার্চ্চ তারিখে বেথুন সাহেব বড়লাট লর্ড ডালহৌসীকে তাঁহার স্কুল, অন্যান্য বালিকা বিদ্যালয়, স্ত্রীশিক্ষার প্রসারোপায় প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণসহ একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। যদি বিদ্যালয়টির সঙ্গে 'ভিক্টোরিয়া' নাম যুক্ত থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি পত্রে ইহার উল্লেখ করিতেন। তাহা না করিয়া বরং তিনি পত্রের শেষে 'ভিক্টোরিয়া' নামটি যাহাতে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহার অনুমতি লইবার প্রার্থনা করিতে কোর্ট অফ ডিরেক্টরসকে অনুরোধ জানাইবার জন্য তাঁহাকে লিখিলেন :

". . . it would give me great satisfaction, and would I think show the interest taken by the government in this movement in a marked and appropriate manner, if I could obtain your Lordship's influence with the Honourable Court of Directors in inducing them to address Her Majesty for leave to call the School by Her name and to consider it as placed especially under Her patronage."*

বড়লাট লর্ড ডালহৌসী বেথুনের স্ত্রীশিক্ষা-প্রসার প্রচেষ্টার প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি পত্রোক্ত এই বিষয়গুলি অবিলম্বে কোর্ট অফ ডিরেক্টরসকে জ্ঞাপন করিলেন। ১৮৫০, ৪ঠা সেপ্টেম্বর কোর্ট একটি ডেস্‌প্যাচে জানাইলেন :

"We do not think that the present state of female education is such as to warrant the unusual proceedings of applying for the sanction of Her Majesty's name to the Female School at Calcutta."†

এখানে কোর্ট বলিতেছেন যে, তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া রাণী ভিক্টোরিয়ার নাম ইহার সঙ্গে যুক্ত করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি যাজ্ঞা করিতে অক্ষম। এইখানেই বেথুনের বিদ্যালয়ের সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার নাম-সংযোগ প্রচেষ্টার অবসান ঘটিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রতিষ্ঠাকালে বিদ্যালয়টির "Calcutta Female School" এই নামকরণ করা হইয়াছিল। ভিক্টোরিয়ার নামের সঙ্গে ইহা যুক্ত করা হইবে তখন হইতেই এরূপ প্রস্তাব চলিতেছিল, কিন্তু কোর্ট অফ্‌ ডিরেক্টরসের প্রতিবন্ধকতা হেতু ইহা শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকর হয় নাই। 'ভিক্টোরিয়া' এই নামের সঙ্গে প্রথমে 'সংবাদ প্রভাকর' যে বিদ্যালয়টিকে যুক্ত করিয়াছিলেন, এখন বুঝা যাইতেছে, নিতান্ত ব্যক্তিগত দায়িত্বেই তিনি উহা করিয়াছিলেন, সাধারণেও প্রভাকর মারফত এই নামটি জানিয়া লয়। ইহার প্রতিবাদ করা তাৎকালিক সামাজিক অবস্থায় (এবং নিজেদের মনোগত ইচ্ছাও কতকটা অনুরূপ থাকায়) কর্ত্তৃপক্ষ সমীচীন বোধ করেন নাই।

* *Selections from Educational Records*, Part II, by J. A. Richie, p. 56.

† *Ibid*, p. 61.

ব্যর্থ সাধন

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

মহা-আকাশের অঞ্চলখানি আমার থাকিত যদি,
সোনালি, রূপালি আলো-বিজড়িত উজ্জ্বল নিরবধি
দিবস, রাত্রির, প্রদোষ-আলোর সকল বরণে মাখা,
স্নিগ্ধ সুনীল, ধূসর ধূম্র, কাজল-কুহেলি-আঁকা।

তা হলে বিছায়ে দিতাম আজিকে পুলকিত অন্তরে,
তোমার চরণ পড়িছে যেথায়—সেথা সেই ভূমি 'পরে;
সে আশা আজিকে নাহি মোর নাহি, অতি অভাগ্য আমি,
শুধু আনমনে স্বপনের মালা গাঁথিয়াছি দিবা যামি।

তাই ত আজিকে ব্যর্থ-সাধন আমার স্বপনখানি
তোমার চলার পথের 'পরেতে বিছায়ে দিলাম আনি,
তুমি যাবে যবে ওগো মোর প্রিয়, যেও চলি মৃদু পায়ে,
বিছানো আমার স্বপন দলিয়া সাঁঝের গোধূলি-ছায়ে।*

* W. B. Yeats-এর Had I the heavens' embroidered cloths কবিতা অবলম্বনে।

সত্যমপ্রিয়ম্

শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগী হিন্দুজনস্রোত গত (১৯৫০) ফেব্রুয়ারী হইতে এখন (জুলাই) পর্য্যন্ত অব্যাহত গতিতে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। প্রায় বিশ লক্ষ বাস্তুত্যাগী ইতিমধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বঙ্গীয় নেতারা বলিতেছেন অন্ততঃ পক্ষে চল্লিশ লক্ষের বাসস্থান এখনই আবশ্যক হইবে এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসী অবশিষ্ট আশি নব্বই লক্ষ হিন্দুকেও বাসস্থান দেওয়ার জন্য এখন হইতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। নেতাদের আলোচনা ও কার্য্যক্রম দেখিয়া মনে হয় এই এক কোটি সওয়াকোটি আগন্তুকের স্থায়ী বাসের বন্দোবস্ত ক্ষুদ্রকায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই করিতে হইবে; বঙ্গের বাহিরে আগন্তুকেরা যাইতে অনিচ্ছুক; অন্ততঃপক্ষে "নেতারা" তাই বলিতে চান।

এক কোটি সওয়াকোটি নবাগত লোককে ভারতের ক্ষুদ্রতম প্রদেশ মাত্র আটাশ হাজার বর্গমাইল পরিমিত পশ্চিমবঙ্গে বসাইলে এই প্রদেশের ভবিষ্যৎ কি হইবে এবং সে সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের আদি অধিবাসীদের কিছু বলিবার আছে কিনা, তাহা নেতাদের মনে স্থান পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এই ক্ষুদ্র প্রদেশের মধ্যে সওয়া তিন কোটি সাড়ে তিন কোটি প্রাণীকে ঠাসাঠাসি করিয়া একত্রীভূত করিলে তাহাদের জীবনযুদ্ধ কিরূপ ঘোরতর ও কালক্রমে কিরূপ বিষময় হইয়া উঠিবে এবং সেই যুদ্ধে স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি আদি পশ্চিমবঙ্গবাসীর অস্তিত্ব থাকিবে, না লুপ্ত হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। "আদর্শবাদী" নেতাদের নিকট এ আলোচনা হয় ত ভাল লাগিবে না; কিন্তু আমরা সাধারণ মনুষ্য, ছেলেপুলে লইয়া ঘর করি; রাত্রি প্রভাত হইলেই আমাদিগকে উদরান্নের সন্ধানে বাহির হইতে হয়; আমাদিগকে এ আলোচনা করিতেই হইবে।

এই আলোচনার জন্য একটু পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত আবশ্যক। সকলেই জানেন ই. আই. রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে বর্দ্ধমান বিভাগের স্বাস্থ্য এবং ভাগীরথী ও তৎসংলগ্ন নদীগুলি কার্য্যতঃ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধগতি হইবার পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্বাস্থ্য বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা বহুগুণ উন্নত ছিল; বর্দ্ধমান বিভাগের স্বাস্থ্য পূর্ব্ব বিহারের স্বাস্থ্যের ন্যায় উৎকৃষ্ট ছিল, সংক্ষেপে ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু বিগত পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের মধ্যে বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ, অর্থাৎ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ, প্রধানতঃ জলপথের অবনতির দরুন, প্রায় সর্ব্ববিষয়ে অবনতির পথে চলিয়াছে। লোকের স্বাস্থ্য গিয়াছে; ভূমির উর্ব্বরাশক্তি গিয়াছে, সমৃদ্ধ নগরনগরী ও গ্রামসমূহ ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়া হয় সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে কিংবা ধ্বংসোন্মুখ হইয়া কোন রকমে টিকিয়া আছে। অপর পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের নদনদীসমূহ বরাবর পূর্ণশক্তিতে বর্ত্তমান থাকায় ঐ অঞ্চলের ভূমির উর্ব্বরাশক্তি ও অধিবাসীদের স্বাস্থ্য প্রায় অটুট রহিয়াছে। স্বাস্থ্য ও উর্ব্বরতায় পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এইরূপ পার্থক্যের ফল হইয়াছে সুদূরপ্রসারী। পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীরা অর্থসম্পদ ও শিক্ষায় ক্রমশঃ উন্নতির পথে চলিয়াছে, কিন্তু বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাংলা ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য ও দারিদ্র্যজাত অশিক্ষায় মগ্ন হইয়া প্রায় অর্দ্ধমৃত ও হতচৈতন্য অবস্থায় কাল কাটাইতেছে।

আমরা, পশ্চিমবঙ্গবাসীরা, আশা করিয়াছিলাম দেশ স্বাধীন হইলে আবার পশ্চিমবঙ্গেরও সুদিন আসিবে, আবার এই অঞ্চলের নদনদীতে জলের গতি ফিরিয়া আসিবে, লোকের দেহে শক্তি ফিরিয়া আসিবে, এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শিক্ষা ও প্রাচুর্য্যের পূর্ণ আলো ও আনন্দ দেখা দিবে। হয় ত সে সুদিন সত্যই আসিবে, কিন্তু সে সুদিন পশ্চিমবঙ্গের আদি অধিবাসীর কাজে লাগিবে কি না জানি না। আমাদের নেতারা জানাইতেছেন পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগী "বলিষ্ঠ" জনগণ আসিয়া পশ্চিমবঙ্গের উষর মরুতে "সোনা ফলাইবে", দেশের চেহারা ফিরিয়া যাইবে। বেশ ভাল কথা। আশার কথা। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হয় আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের এক শ্রেণীর হিন্দু ভাইরা, শুধু অতীতে নয়, এখনও, আমাদের অতিথি হইবার পরেও, আমাদের সঙ্গে কথায় ও ব্যবহারে আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা ও প্রীতির বিশেষ কোনই অপচয় করেন না। পথে ঘাটে, ট্রামে বাসে, দিনরাত্রি ইহার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে; এখানে সে সব দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া তিক্ততা বাড়ানো অনাবশ্যক। কিন্তু এটুকু বলা একান্ত প্রয়োজন যে, যাঁহারা দেশবিভাগের পর হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ স্থানীয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেন তাহা অনেক সময়ই রক্তমাংসের শরীরে সহ্য করা কঠিন হয়; সম্প্রতি যাঁহারা পিতৃপিতামহের ভিটা ছাড়িয়া আসিতে-

ছেন, পশ্চিম বঙ্গের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও অনেকের বীরত্ব জাগিয়া উঠিতেছে; পশ্চিমবঙ্গের ভূম্যধিকারীকে মারপিট করিয়া, তাহার মুখের গ্রাস জমিজমা, বাগ-বাগিচা জোরপূর্ব্বক দখল করিয়া তাঁহারা নিজেদের ভীরুত্ব-কালিমা দূর করিতেছেন। কাজেই নেতাদের কথামত এই বাস্তুত্যাগীরা যখন পশ্চিমবঙ্গে "সোনার ফসল" ফলাইবে, তখন পশ্চিমবঙ্গবাসী সেই ফসলের দ্বারা কতটা উপকৃত হইবে তাহা বুঝা কঠিন নয়। হয় ত ফসল লেনদেনের পরিবর্ত্তে "রামদাও" ও "ট্যাটা" এবং লাঠিঠেঙার ঘাত-প্রতিঘাতে গ্রামাঞ্চল মুখরিত হইবে, গ্রাম্যজীবনের শান্তিভঙ্গ হইবে।

বলিতে পারেন দেশ কি মগের মুলুক হইয়াছে যে ফসল লেনদেনের পরিবর্ত্তে গ্রামে গ্রামে লাঠালাঠি, ঠেঙাঠেঙি হইবে? দেশে কি আইন নাই, পুলিস নাই, বিচার নাই, অপরাধীর শাস্তি নাই? আছে বটে, কিন্তু সেখানেও গোড়ায় গলদ। শান্তিভঙ্গের তদন্ত করিতে দারোগাবাবু আসিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে তিনি পদ্মা-মেঘনা-লক্ষ্যার তীর হইতে আগত। আজকাল কোন কাজে থানায় গেলে প্রায়ই দারোগাবাবুরা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, "আপনার দেশ কোথায়?" আবার তদন্তে আসিলে নাগরিকদের মধ্যে অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, "দারোগাবাবু আপনার দেশ কোথায়?" এইরূপ প্রশ্নের উত্তরের উপর তদন্তের ভবিষ্যৎ যে খানিকটা নির্ভর করে না, তাহা বলা যায় না। আমাদের এক শ্রেণীর পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাইদের একটি মস্ত বড় গুণ এই যে, তাঁহারা "দেশের লোকের" খাতিরে অনেক কিছু করিতে পারেন; শুধু 'দেশের' নামটির জন্যও দাঙ্গাহাঙ্গামা করিতে ইতস্ততঃ করেন না; প্রায় প্রতি বৎসরেই কলিকাতার ফুটবল গ্রাউণ্ডে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, যদিও যে নামটির জন্য তাঁহারা দাঙ্গা করিতে উদ্যত হন, বর্ত্তমানে তাহা প্রায় মধ্যযুগীয় Holy Roman Empire এর নামের মতই সার্থক হইয়া দাঁড়াইতেছে তাঁহাদেরই উদ্যমের অভাবে।

কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে গলদ শুধু নিম্নস্তরেই আবদ্ধ নহে। যখন পাকিস্তানের জন্ম হয় তখন যুক্তবঙ্গের সরকারী কর্ম্মচারীদের শতকরা প্রায় সত্তর আশি জন ছিল পূর্ব্ববঙ্গীয়; তার পর "opting"-এর অনুগ্রহে এবং ডাঃ ঘোষের ব্যবস্থায়, অধিকাংশ মুসলমান কর্ম্মচারী পাকিস্তানে চলিয়া গেলে এবং সমস্ত হিন্দু কর্ম্মচারী পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিলে সেই অনুপাত ঠিক কিরূপ দাঁড়াইয়াছে বলিতে পারি না, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিতে পাই এখানে উচ্চতম পদাধিকারী হইতে আরম্ভ করিয়া আদালতের পিওন ও কনষ্টেবল পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই পদ্মার অপর পার হইতে আগত। সরকারী চাকুরীর জন্য প্রার্থী নির্ব্বাচন ও নিয়োগ যাঁহাদের হাতে, তাঁহারা নিজেরাই এমন ভাবে মনোনীত যে তাঁহাদের নিকট পশ্চিমবঙ্গীয় প্রার্থী অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গীয় প্রার্থীর পক্ষে, জ্ঞানতঃ হউক বা অজ্ঞানতঃ হউক, অধিকতর সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কর্পোরেশনেও দু-একটি পদ বদ দিলে সেই একই কাহিনী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টিতে যা-কিছু পশ্চিমবঙ্গীয় প্রভাব ছিল বা আছে, তাহা দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য প্রকাশ সম্বন্ধে পত্রিকাবিশেষের অত আগ্রহের কারণ কি? আমাদের মনে হয় ইহার কারণ সত্যানুসন্ধান ততটা নহে যতটা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পূর্ব্ববঙ্গীয় রাজনৈতিক দলের আধিপত্য স্থাপনের লালসা। যাহা হউক, মোটের উপর অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এইরূপ যে, পশ্চিমবঙ্গের শাসনকার্য্যে পশ্চিমবঙ্গবাসীর স্থান নাই বলিলেই চলে। কেবল সরকারী কার্য্যে নহে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রবেশ দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের জনৈক পূর্ব্ববঙ্গীয় মন্ত্রী হুকুম জারি করিয়াছেন যে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে, সর্ব্বত্র পূর্ব্ববঙ্গীয় বাস্তুত্যাগীদেরই নিযুক্ত করিতে হইবে; পশ্চিমবঙ্গবাসীর সেখানেও কি স্থান নাই? প্রাইভেট কলেজে প্রোফেসারি, এমন কি স্কুলের সামান্য মাষ্টারিও, নূতন করিয়া পশ্চিমবঙ্গবাসীর পাইবার উপায় নাই। সরকারী, আধাসরকারী, বেসরকারী নানাবিধ—আদেশ অনুরোধ স্কুল ও কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের উপর জারি করা আছে নূতন লোক লইলে বাস্তুত্যাগীকেই লইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গবাসীরও যে অন্নসংস্থানের প্রয়োজন আছে, ইহা যেন সকলে ভুলিয়াই গিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গবাসীর হইয়া একটি কথা বলিবে এমন একখানিও দৈনিক পত্রিকা আজকাল দেখিতে পাই না; দেশ বিভাগের পূর্ব্বে যে দু'একখানি ছিল তাহারা এখন পাকিস্তানের আওতায় পড়িয়া কিংবা অন্য কোন কারণে স্বরূপ বদলাইয়া ফেলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গবাসীর এখন দেশ থাকিয়াও নাই। নিজ বাস-ভূমে পরবাসী ইহাকে না বলিলে কাহাকে বলিব? আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গীয় মন্ত্রী যাঁহারা আছেন তাঁহারা দারুব্রহ্মের মত বসিয়া বসিয়া দেখিতেছেন, তাঁহাদের দেশবাসীরা কেমন তাঁহাদের চোখের সামনে জাহান্নামে যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই এখন মন্ত্রিত্ব ও নেতৃত্বের মূলমন্ত্র!

এইরূপ দুর্বিষহ অবস্থা গত ফেব্রুয়ারীর হাঙ্গামার পূর্ব্বেই ছিল। ফেব্রুয়ারী হইতে নূতন উদ্বাস্তু-সমাগম

আরম্ভ হইলে অবস্থা আরো কয়েক ডিগ্রী সরেস হইয়াছে, সোনায় সোহাগা যোগ হইয়াছে। এখন আর পশ্চিমবঙ্গবাসীর অস্তিত্বই নাই; গবর্ণমেণ্টের সমস্ত সময়, অর্থ, শক্তি, চিন্তা, কল্পনা, উদ্বাস্তু-সমস্যা সমাধানেই নিয়োজিত হইতেছে। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর প্রত্যেককে বাসস্থান দিতে হইবে, জীবিকা অর্জ্জনের উপায় করিয়া দিতে হইবে; যত দিন তাহা সম্ভব না হয় তত দিন তাহাদের জন্য অর্থ যোগাইতে হইবে।

আর পশ্চিমবঙ্গবাসী? পশ্চিমবঙ্গবাসীর দারিদ্র্য নাই, রোগ নাই, কোন কষ্ট নাই, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রের অর্থাভাব নাই, গ্রামবাসীর ম্যালেরিয়া নাই, জলকষ্ট নাই, মধ্যবিত্তের চাকুরীর অভাব নাই। তাহারা ইংলোকেই অনাবিল স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছে। তাহাদের আবার সরকারের নিকট হইতে কোন সাহায্যের দরকার থাকিতে পারে নাকি?

এখন প্রশ্ন এই, পশ্চিমবঙ্গবাসী দাঁড়াইবে কোথায়? আমরা কি ঘরদুয়ার ছাড়িয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইব? কিন্তু জঙ্গলই বা কোথায়? জঙ্গলে ত নেতারা উদ্বাস্তুদের জন্য নগর বসাইবেন, সোনা ফলাইবেন। তবে আমাদের ভবিষ্যৎ কি? ভবিষ্যৎ যাহাই হউক, পশ্চিমবঙ্গবাসীকে শতাব্দের নিদ্রা ছাড়িয়া চোখ মেলিতে হইবে; নিজের জন্য, ভাবী সন্তান-সন্ততির জন্য বাক্যহীন মুখে কথা ফুটাইতে হইবে, নিজের অন্নের গ্রাস বুঝিয়া লইতে হইবে; বদ্ধদৃষ্টি স্বার্থদুষ্ট নেতাদের হাত হইতে নিজেদেরকে বাচাইতে হইবে; বুঝিতে হইবে "নেতা"-রূপ অপদেবতার কবলে পড়িয়া দেশ কোথায় চলিয়াছে!

এই সম্পর্কে ভারত-সরকারের নিকট এবং সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নিকট আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। বঙ্গীয় নেতারা পূর্ব্ব-পাকিস্তানাগত উদ্বাস্তুদের যদি ভিন্ন প্রদেশে যাইতে না দিয়া পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই বসবাস করাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সর্ব্বভারতীয় অ-বাঙালী নেতারা বোধ হয় বিশেষ দুঃখিত হইবেন না; কারণ ন্যায়তঃই হউক বা অন্যায়তঃই হউক বাঙালীকে তাঁহারা অনেকে 'প্রভিন্সিয়াল', 'প্যারোকিয়াল' ইত্যাদি আখ্যা দিয়া থাকেন। নানা গোলযোগের মূলীভূত এই বাঙালী যদি স্বেচ্ছায় অন্য কোন প্রদেশে না যায় ত সে ভালই, সে সব প্রদেশ শান্তিতে থাকিবে; পশ্চিমবঙ্গের খোঁয়াড়ের মধ্যে সাড়ে তিন কোটি বাঙালী ঘোঁট পাকাইয়া মরুক, তাহাতে তাঁহাদের আপত্তি নাই। আমাদের মাননীয় প্রদেশপাল কিছু দিন পূর্ব্বেও বলিয়াছিলেন, উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়া অন্যান্য প্রদেশে যাইতে হইবে; কিন্তু সম্প্রতি তিনিও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র হইলেও এখানে হাজার হাজার বিঘা জমি পতিত রহিয়াছে। সেখানেই উদ্বাস্তুদের বসাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। মাস দুই পূর্ব্বে বিহার ও উড়িষ্যায় "পিত্তিরক্ষা" হিসাবে যে দু' এক হাজার উদ্বাস্তুকে পাঠানো হইতেছিল তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের কারণ আমাদের নেতৃপ্রধানদের প্রপ্যাগাণ্ডা প্রভাবে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নীতির পরিবর্ত্তন কিনা জানি না; কিন্তু কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে আমরা বলিতে চাই তাঁহারা যেন ভারতের এই ক্ষুদ্রতম প্রদেশের স্কন্ধে সওয়া কোটি উদ্বাস্তুকে চাপাইয়া পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা না করেন, তাহাতে ভারতরাষ্ট্রের মঙ্গল হইবে না। স্মরণ রাখিতে হইবে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের পূর্ব্বদিকের সীমান্ত প্রদেশ; পূর্ব্বদিক্ হইতে নানাবিধ বিপদের আশঙ্কা বর্ত্তমান। তদুপরি পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুরা প্রায় প্রত্যেকে কংগ্রেসের উপর ও কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের উপর শুধু বীতশ্রদ্ধ নহে, শত্রুভাবাপন্ন; কংগ্রেসই তাহাদের সমস্ত কষ্ট ও লাঞ্ছনার মূল, ইহা তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস; কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের যথাসাধ্য সাহায্য গ্রহণ করিয়াও তাহারা সুযোগ পাইলে ঐ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয়ত বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না। তা ছাড়া এই ক্ষুদ্র প্রদেশে অসম্ভব রকম ঘন বসতির দরুন এখানে জীবিকার সমস্যা সর্ব্বদাই অতি কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে; ফলে লক্ষ লক্ষ তরুণ জীবিকাপ্রার্থীর দল বেকার-সমস্যার আবর্ত্তে পড়িয়া নানারূপ ধ্বংসাত্মক আন্দোলন জাগাইয়া রাখিবে। রাষ্ট্রের মঙ্গলার্থে এই অসন্তোষের বিষ রাষ্ট্রের একটি অঙ্গে জমিতে না দিয়া চতুদ্দিকে ছড়াইয়া দিয়া ক্রমে ক্রমে নষ্ট করাই দূরদৃষ্টির পরিচায়ক।

পরিশেষে ভারত-সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক সরকার উভয়কেই আমরা সময় থাকিতে সাবধান হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। বাস্তুত্যাগী সমস্যার সমাধান জন্য তাঁহারা যদি পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংসের পথে লইয়া যান, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গবাসীরাও মরণের পূর্ব্বে প্রতিশোধের চেষ্টা করিবে। সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে সরকারী মহলে একটি ধারণা জন্মিয়াছে বলিয়া মনে হয় যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বাংলাদেশ যাহা করিয়াছে তাহার অধিকাংশই, এমন কি প্রায় সমস্তটাই, পূর্ব্ববঙ্গের দান। এরূপ ধারণা জন্মিবার প্রধান কারণ, দেশবিভাগের বহুপূর্ব্ব হইতেই কংগ্রেস "হাইকমাণ্ড" বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধীয় খবরাখবর তাঁহাদের মনোনীত পূর্ব্ববঙ্গীয় সদস্যের মুখ হইতে শুনিয়া

আসিতেছেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে বহুদিন হইতে কিভাবে একটি পূর্ব্ববঙ্গীয় রাজনৈতিক দল করতলগত করিয়া রাখিয়াছে তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তাহার উপর দিনের পর দিন সংবাদপত্রে, পাবলিক পার্কে, মাঠে ঘাটে সর্ব্বত্র পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব-কাহিনী ঢক্কানিনাদে ঘোষিত হইতেছে; দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয়, পশ্চিমবঙ্গীয় কোন কোন নেতাও এই প্রপ্যাগাণ্ডা-কোরাসে যোগ দিয়া সভায় সভায় পূর্ব্ববঙ্গের ত্যাগ ও বীরত্ব ঘোষণা এবং পরোক্ষে পশ্চিমবঙ্গের পিণ্ডদান করিয়া আত্মতৃপ্তিলাভ করিতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে নিজের জনপ্রিয়তা এবং নেতৃত্ব কায়েমী করিয়া লইতেছেন।

এই সব নেতার মুখে একটিবারও শুনিতে পাই না যে, দেশের মুক্তি-সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গবাসীরও দান আছে। তাঁহারা কি জানেন না যে কিংবা জানিয়াও বলিতে সাহস করেন না যে, মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে লবণ-সত্যাগ্রহ ভারতবর্ষের আর সর্ব্বত্র থামিয়া গেলেও মেদিনীপুর ও হুগলি জেলার আরামবাগে থামে নাই, মহাত্মাজীকে বিশেষ আদেশ পাঠাইয়া তাহা থামাইতে হইয়াছিল? ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে মেদিনীপুরের কৃতিত্ব ও 'প্যারালাল গবর্ণমেণ্ট' স্থাপন এবং সেইজন্য পুলিসের অকথ্য অত্যাচার ও নিপীড়নের মধ্যে মেদিনীপুরবাসীর বীরত্ব—পূর্ব্ববঙ্গ ত দূরের কথা, সারা ভারতেও তাহার তুলনা নাই। জাতীয় পতাকা হাতে ধরিয়া বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরার পুলিসের গুলিতে প্রাণদান, ইহার তুলনা অনুসন্ধানের জন্য হয়ত পঞ্চদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে যাইতে হইবে; দেশের জন্য ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দেওয়ার পথ পশ্চিমবঙ্গই দেখাইয়াছে; দীর্ঘদিবস অনশনে থাকিয়া দেশমাতৃকার পূজাবেদীতে তিলে তিলে আত্মাহুতি দিয়াছে পশ্চিমবঙ্গেরই যুবক এবং এই পশ্চিমবঙ্গের যুবকই প্রধানতঃ ১৯৪৬-এর হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় কলিকাতাকে আসন্ন ধ্বংসের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছিল। কৈ এসব কথার উল্লেখ ত আমাদের এই নেতৃপ্রবরদের বক্তৃতার মধ্যে শুনিতে পাই না। কেন? পশ্চিমবঙ্গের কর্ম্মীরা নিজ কার্য্যের মহিমা-ঘোষণায় সর্ব্বদা ঢাক বাজাইতে অক্ষম বলিয়া? কি ঘৃণার কথা!

কংগ্রেস হাইকমাণ্ড ও সরকার এবং পূর্ব্ববঙ্গের দেশত্যাগী নেতৃবৃন্দ ও হিন্দু জনসাধারণকে সরলভাবে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি, পূর্ব্বপাকিস্তানে যে মুসলিম সর্ব্বভৌমত্ব স্থাপিত হইয়াছে, তাহার প্রতীকারের কোন উপায় আছে কি-না। যে পূর্ব্ববঙ্গে এক দিন হিন্দুর প্রাধান্য ছিল, এখন সেখানে মুসলমানের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে, ইহার মূলে কি কি কারণ রহিয়াছে তাহাও আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। স-বর্ণ ও অ-বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার মূলে রাজনৈতিক কারণ রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সামাজিক কারণগুলিও তো আমাদের ভুলিলে চলিবে না।

আজ স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, আসামের বর্ত্তমান অসমীয়া-বাঙালী সমস্যার মূলে দায়ী কি শুধু অসমীয়ারাই? এক শ্রেণীর পূর্ব্ববঙ্গীয়েরা যখন যেখানে থাকেন বা যান, তখন স্থানীয় অপর সকলের স্বার্থ পদদলিত করিয়া নিজেদের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখার অভ্যাস তাঁহাদের প্রকৃতিগত নয় কি? নিজগৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ার মূলে প্রতিবেশী মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গে ব্যবহারে এইরূপ অন্ধ স্বার্থপরতা কতটা দায়ী তাহা তাঁহারা ভালভাবে বিবেচনা করিয়া দেখুন, শুধু কংগ্রেস হাইকমাণ্ড ও প্যাটেল-নেহরুকে দেশভাগের জন্য দায়ী করিলে চলিবে না। তাঁহারা কেহ কেহ নিজেদেরকে নির্দ্দোষ ধরিয়া লইয়া শুধু কংগ্রেসের স্কন্ধে দোষ চাপাইতেছেন ও কথায় কথায় বলিতেছেন যে, "পূর্ব্ববঙ্গ মরিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গও মরিবে", তাহা তাঁহাদের বন্ধ করিতে হইবে। কংগ্রেস সরকার ও দেশের নেতৃপ্রধানেরা পূর্ব্ববঙ্গীয় আন্দোলনকারীদিগকে শান্ত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে বলি দিতে বসিলে, সে অপচেষ্টা তাঁহারা যত শীঘ্র ত্যাগ করেন ততই মঙ্গল। আবার বলিতেছি, পশ্চিমবঙ্গবাসীও মরণের পূর্ব্বে দংশন করিবে। আত্মরক্ষা নীতির স্বাভাবিক পরিণতি যাহা তাহা ঘটিবেই। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের আবির্ভাব-ভূমি এবং ক্ষুদিরাম-কানাইলাল-মাতঙ্গিনী ও সুভাষচন্দ্রের মাতৃভূমি পশ্চিমবঙ্গ ধ্বংস হইলে ভারতরাষ্ট্রে যে ভাঙ্গন ধরিবে তাহা ঠেকাইবার ক্ষমতা কাহারও আছে কিনা ভগবানই জানেন। পশ্চিমবঙ্গ ধ্বংস হইবে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেককে ধ্বংস হইতে হইবে; মন্ত্রীপ্রবরেরা স্বার্থপূরণ করিয়া দেশের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রাসাদ তুলিবেন, তাহা হইবে না; দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইবে, যদি না তৎপূর্ব্বে চিতাভস্মে হতে হয় আমাদের সবার সমান।

দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের সহিত আমার বেশী দিনের পরিচয় ছিল না। ঝাড়গ্রামের রাজার বদান্যতার সাহায্যে বর্ত্তমানে ঝাড়গ্রামে যে কৃষি-মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে উহার প্রাথমিক আলোচনার জন্য গত ১৯৪৯ সালের ২২শে মে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাবিদ্যালয়-পরিদর্শক ডা: বিনোদবিহারী দত্ত, খয়রা কৃষি-অধ্যাপক ডা: পবিত্রকুমার সেন এবং আসামের কৃষিবিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযতীন্দ্র-নাথ চক্রবর্ত্তীর সহিত আমিও ঝাড়গ্রামে গমন করিয়াছিলাম। সেই দিন ঝাড়গ্রামের রাজার প্রাসাদে দেবেন্দ্র বাবুর সহিত আমি প্রথম পরিচিত হই। পরদিন অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় আমরা ঝাড়গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসি। এই অল্প সময়ের মধ্যেই কি জানি কি কারণে দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের সহিত আমার এইরূপ ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, তাঁহার মুখ হইতে আমি তাঁহার জীবনের, কর্ত্তব্যনিষ্ঠার এমন কতকগুলি কথা শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আমার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ঝাড়গ্রাম পরিত্যাগ করিবার সময় আমি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাঁহার মুখে আমি শুনিয়াছিলাম যে, মেদিনীপুর জেলার মধ্যে তাঁহার নিজস্ব এক টুকরাও জমি নাই, ঘরবাড়ী ত দূরের কথা। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি এমন নি:স্ব যে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সৎকারের খরচের জন্য তাঁহার পুত্রকে রাজার নিকট হইতে হয় ত সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি যখন এই কথা বলিয়াছিলেন তখন তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ দেখিয়াছিলাম; আমিও আমার চোখের জল রোধ করিতে পারি নাই। তখন একটুও বুঝি নাই যে তাঁহার মৃত্যু এত সন্নিকট ছিল। ঝাড়গ্রামে অবস্থানের সময় তাঁহার মুখে ইহাও শুনিয়াছিলাম যে, তিনি যত দিন জেলাবোর্ডের সভাপতি ছিলেন, তাঁহার ভ্রমণের জন্য জেলাবোর্ডের তহবিল হইতে কখনও অর্থ গ্রহণ করেন নাই। মেদিনীপুর শহরের মিউনি-সিপ্যালিটির চেয়ারম্যান থাকাকালীনও তিনি এই পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

শুনিয়াছি তিনি মেদিনীপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার তদানীন্তন জেলাম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধে তিনি বর্ত্তমান রাজার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন; রাজার তখন বয়স ছিল ১১।১২ বৎসর। পরে তিনি কর্তৃপক্ষ-গণের অনুরোধে রাজষ্টেটের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। রাজাকে তিনি নিজের পুত্রের ন্যায় শিক্ষা দিয়াছিলেন। রাজার ষ্টেটকে তিনি নিজের ষ্টেট বলিয়াই গণ্য করিতেন। যাঁহারা রাজার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে দেবেন্দ্রবাবুর শিক্ষার ফলেই আজ রাজা তাঁহার চরিত্র, আচরণ, অমায়িকতা, বদান্যতা ও সরলতার জন্য সমাজের সকল শ্রেণীর নিকট এত প্রিয়। তিনি রাজ ষ্টেটের কি পরিমাণ উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাহাও অনেকের নিকট অবিদিত নাই।

দেবেন্দ্রবাবুর শিক্ষার গুণে ও তাঁহারই উৎসাহ ও প্রেরণায় রাজা নরসিংহ মল্ল উগলদেব বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াছেন এবং বহু প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করিয়াছেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রধান হইতেছে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ, নারীশিক্ষা সমিতি, ঝাড়গ্রাম বিদ্যাসাগর বাণীভবন, ঝাড়গ্রাম কৃষি-মহাবিদ্যালয়। বাণী বিদ্যাবীথি, হিন্দুমিশন, মেদিনীপুরের শিশু হাসপাতাল, হোমিওপ্যাথিক কলেজ প্রভৃতিতেও রাজার প্রচুর সাহায্য আছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই সকল সাহায্যের পশ্চাতে ছিলেন দেবেন্দ্র-মোহন ভট্টাচার্য্য।

এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, ঝাড়গ্রাম ষ্টেটের মস্তিষ্ক ছিলেন দেবেন্দ্রবাবু, এবং তাঁহার কর্ম্মকুশলতার, ফলেই আজ ঝাড়গ্রাম বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে; রাজার প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য অট্টালিকা, ময়দান, উদ্যান প্রভৃতির পরিকল্পনা তাঁহারই মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু ঝাড়গ্রাম দেখিলে মনে হইবে তাঁহার প্রতিভা ছিল বহুমুখী।

ঝাড়গ্রামে পরিচয় হইবার পর দেবেন্দ্রবাবু আমার কলিকাতার বাড়ীতে তিন বার আসিয়াছিলেন; ঝাড়গ্রাম কৃষি-মহাবিদ্যালয় স্থাপন ও তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার আলোচনা হইয়াছিল। যুবকগণকে কৃষির প্রতি অনুরক্ত ও কৃষি কার্য্যে লিপ্ত করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তিনি আমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, কর্তৃপক্ষগণ যদি এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত না করেন আমি কিছুমাত্র দু:খিত হইব না। আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়া এবং ঈশ্বরের নাম করিয়াই রাজা বাহাদুরকে কৃষি-মহাবিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহার সকল কাজেই তিনি ঈশ্বরের প্রেরণা লাভ করিয়া থাকেন, এবং সেই প্রেরণাই তাঁহাকে শক্তি দান করে; ফলাফল সম্বন্ধে তিনি কখনও কোন চিন্তা করেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনেরও বহু

উদাহরণ দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার কন্যাদিগের বিবাহের কথাও উল্লেখ করিয়াছিলেন। মোটকথা তিনি ঈশ্বরের উপর সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন।

অল্প সময় ঝাড়গ্রামে অবস্থান-কালে তাঁহার পরিশ্রম, কর্ম্ম-কুশলতা ও শৃঙ্খলাবোধ সম্বন্ধে বহু পরিচয় পাইয়াছিলাম। অতিথিশালায় আমাদের অবস্থান ও আহারের ব্যবস্থা দেখিয়া অমরা আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম; প্রত্যেকের অভ্যাস ও রুচি অনুসারে আহারের ব্যবস্থা ছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাকে রাজকার্য্যের নানাবিধ জটিল ব্যাপারেরও মীমাংসা করিতে দেখিয়াছিলাম।

রাজা নরসিংহ মল্ল উগলদেব তাঁহাকে কি পরিমাণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন তাহাও স্বচক্ষে দেখিয়াছি। শিশুর মতই তিনি সর্ববিষয়ে দেবেন্দ্রবাবুর উপর নির্ভর করিতেন। মনে হয় এখন তিনি যেন অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন।

আমার বাড়ীতে যখন তিনি আসিয়াছিলেন তখন আমার কন্যা শ্রীমতী মল্লিকা বসু, এম-এ, তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "সংগ্রহের ভার পুরুষের উপর, রক্ষা ও বণ্টনের ভার স্ত্রীলোকের উপর; মা, তোমার স্বামীর সংগ্রহ তুমি সুষ্ঠুভাবে রক্ষা কর ও বণ্টন কর ইহাই আমি কামনা করি। ঝাড়গ্রামের রাণীমাকেও আমি এই কথাই বলি। মনে রেখো তোমরাই ঘরের লক্ষ্মী ও শ্রী।"

দেশের কল্যাণই দেবেন্দ্রবাবুর ধ্যান ও ধারণা ছিল; ঈশ্বর-নির্ভরতা তাঁহার এক মাত্র পাথেয় ছিল। তিনি একেবারে স্বার্থশূন্য ছিলেন; নিজের বিবেক অনুসারে নীরবে জনহিতকর কর্ম্ম করাই তাঁহার রীতি ও নীতি ছিল। তিনি কখনও কোন প্রশংসা বা সম্মানের আকাঙ্ক্ষা করেন নাই; কিন্তু তিনি তাঁহার কর্ম্ম ও চরিত্রের জন্য প্রচুর প্রশংসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সরল, নিরহঙ্কার, কর্ত্তব্যপরায়ণ, ঈশ্বরবিশ্বাসী, পরিশ্রমী দেবেন্দ্রবাবু আর ইহজগতে নাই এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারিবেন না; তাঁহার মৃত্যুতে ঝাড়গ্রামের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অপূরণীয়।

ঈশ্বর তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন—ইহাই প্রার্থনা করি। *

*গত ১৬ই জুলাই ঝাড়গ্রামে বিদ্যাসাগর বাণীভবনে অনুষ্ঠিত স্মৃতি-সভায় শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রবন্ধ পঠিত।

শাওন-প্রকৃতি

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

সিক্ত সজল শ্যামরূপ হেরি তিয়াষা না মেটে আজ,
ছন্দিত নব যৌবনলেখা প্রকৃতির তনিমায়;
কনক চাঁদিনী সোহাগে সাজায় অপরূপ নব সাজ
ধরণীর নব রূপায়ণ হেরি নবতম মহিমায়।

বকুলের ছায়ে কালো আঁখি দুটি স্বপনের মধুমায়া,
মালতীকুসুমে বিকশিছে হাসি স্বরগ-অমিয়া যেন,
নিশিগন্ধায় অরূপমুরতি অরূপে জাগিল কায়া
অপরূপ এ যে অদেখা মাধুরী পৃথিবীর বুকে হেন।

নীল বসনের আঁচল লুটায় সবুজ তৃণের বুকে,
পল্লী-তটিনী তাহারি কোলেতে রূপালি জরির রেখা;
অভিসারে যেন চ'লেছে প্রকৃতি অজানা দয়িত সুখে,
দূর নীলিমায় তারি অনুরাগে হাসিছে চাঁদিনী-লেখা।

কদম-কেতকী বাসর সাজায় পুলকে হইল হারা,
সুরভিত হ'ল শ্যামল যামিনী তন্দ্রায় ঢুলু ঢুলু,
জোনাকি আঁকিছে আলো-আল্পনা—এখনো হয়নি সারা,
তটিনীর নীরে মঞ্জীর বাজে ছন্দিত কুলু কুলু।

নীলমায়া মোর নয়নে বুলোলো আজিকার পরিবেশ,
দ্যুলোক-বাসিনী উর্ব্বশী নামে ধরণীর ধূলি-পথে,
মৌন প্রকৃতি সাজিল আজিকে অভিসারী বধূবেশ,
অজানার বুকে আজি অভিযান অলোক-আলোক রথে।

আগুনের ফুল্‌কি—শ্রীবিমলপ্রতিভা দেবী। প্রকাশক শ্রীহারাধন চট্টোপাধ্যায়, ১১, বঙ্কু ভট্টাচার্য্য লেন, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৩৩৪+১০, মূল্য চার টাকা আট আনা।

লেখিকা স্বনামধন্যা বিপ্লবী ও বাংলার নারীজাগরণের পূর্ব্বজাগ্রতা যোদ্ধা। এখানি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা, কল্পনা ও মতামতের ছাঁচে ঢালাই করে গড়া উপন্যাস। বাংলাদেশের পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যেই লালিত্যের প্রাচুর্য্য আর বিক্রমের অভাব। এ অবস্থায় জাঁনদার্ক, লক্ষ্মীবাঈ, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, ভেরা সাজানোভা কি রোজা লাকসামবার্গ যেখানে সেখানে পাওয়া সম্ভব নয়। কোথাও পেলে তারিফ না করে পারা যায় না। বস্তুতান্ত্রিক আদর্শবাদের ক্ষেত্রে বস্তুর অভাব ঘটলে আদর্শ দিয়ে সে অভাব পূর্ণ করা যায় না, কেননা উক্ত তত্ত্বের আসল জিনিস হ'ল বস্তু—আদর্শটা ব্লু-প্রিন্ট নক্সার কাজ করে মাত্র। সেই কারণে বস্তুতন্ত্রে বস্তু আশ্রয় করে থাকা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। কথাটা সমালোচনা নয়, শুধু অরণ্যে রোদন। উপন্যাসখানি সুলিখিত ও পাঠযোগ্য। মতামতগুলি প্রি-ফ্যাব গৃহের মত; অনেক স্থলে বাসিন্দাকেই গৃহের আকারের ও আয়তনের অনুকরণে অদলবদল করে নিতে হয়। তা হলেও মতামতগুলি বেশ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

"গিরিন···বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে শিক্ষা ছাত্রছাত্রীরা আহরণ করে, মনুষ্য-সমাজের মূল মন্ত্র তাতে থাকে না। সে বিদ্যা সমগ্র জগৎকে ধারণা করবার আকাঙ্ক্ষা জাগানো নয়, তাই তারা শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির গর্ব্বটুকুই ধারণ করে মাত্র, অন্তরের প্রকৃত বিকাশসাধনের শিক্ষা তারা পায় না। ধনতন্ত্র-নীতিতে সব শিক্ষাই উল্টে ধরা আছে, সেজন্য যাদের বিপ্লবী অন্তঃপ্রেরণা অত্যন্ত প্রখর তারাই পারে ঐ জালের আবরণ উন্মুক্ত করতে। তখন ও শিক্ষা সত্যই তাদের সাহায্য করে, শিক্ষার সুফল ফলে, নতুবা শুধু ছাপ নিয়ে অর্থকরী বিদ্যার পরিচয় দেয়, আর সত্যকার মানুষ-সমাজের আগাছা হয়ে বুর্জ্জোয়া সমাজের তিলকস্বরূপ বাহবা পায়···।"

যে সব আদর্শবাদ দেউলিয়া সেগুলির শেষ আশ্রয়স্থল বিশ্ববিদ্যালয়ে যা সর্ব্বজনবিদিত। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আদর্শবাদ দাঁড়াতে পারে না। শুকিয়ে যাওয়া, পচে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া, বিস্ফোরিত হওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে সৃষ্ট বস্তুনিচয় ধ্বংসলাভ করে। তফাৎ পরিণতিতে নয়, শুধু গতিবেগের। অ থেকে ক্ষ অবধি যত রকম তন্ত্র ও নীতি আছে তার সব কয়টার মধ্যেই ধ্বংস ও পতনশীলতার বীজ নিহিত আছে। সুতরাং সব পথই পতন ও ধ্বংসের পথ; আবার বাঁচবারও পথ। উচ্চশিক্ষা বর্জ্জন করে বড়বাজারে আশ্রয় নিলেই যে লাভ আছে তা নয়। অশিক্ষিত লোকেরা যে সকলেই পরার্থপর একথাও সত্য নয়। চোর শিক্ষিত ও নিরক্ষর দুই রকমেরই হয়। উচ্চ আদর্শ অবলম্বন করে চলবার জন্য অক্সফোর্ডের পথ প্রশস্ত না হতে পারে; তবে বেথন্যাল গ্রীন বা কলিকাতার বস্তির পথেও উচ্চ আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে থাকে না। মানুষ মানুষ হয় নিজ গুণে। উচ্চশিক্ষা বা ঐশ্বর্য্য দিয়েও হয় না এবং অজ্ঞানতা কিম্বা অভাবেও হয় না।

লেখিকা খুবই উপভোগ্যভাবে বিষয়টির অবতারণা করেছেন, কিন্তু মূল কারণ ও সমস্যার সমাধান-পন্থা মতবাদে চাপা দিয়ে গিয়েছেন, এতে দোষ নেই।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

বীরবলের হালখাতা—প্রমথ চৌধুরী। বিশ্বভারতী, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

"বীরবলের হালখাতা" প্রথম প্রকাশিত হয়—সে আজ তেত্রিশ বৎসরের কথা। তেত্রিশ বৎসর পরেও প্রবন্ধগুলির নবীনতা, উজ্জ্বলতা এবং সরসতা কিছুমাত্র কমে নাই। ইহারও পূর্ব্বে এক একটি প্রবন্ধ যখন "সবুজপত্রে" বা অন্য কোথাও প্রকাশিত হইত সাহিত্যিক-মহলে তখন সাড়া পড়িয়া যাইত। মলাট-সমালোচনা, বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ, সবুজপত্র, কৈফিয়ৎ, চুটকি, প্রত্নতত্ত্বের পারস্য-উপন্যাস, সুরের কথা এবং রূপের কথা এমনি সব প্রবন্ধ।—"শব্দগৌরবে সংস্কৃতভাষা অতুলনীয়। কিন্তু তাই বলে তার ধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে আমরা যে শুধু তার সাহায্যে বাংলা-সাহিত্যে ফাঁকা আওয়াজ করব তাও ঠিক নয়। বাণী কেবলমাত্র ধ্বনি নয়।"—"আমরা হয় বৈষ্ণব, নয় শাক্ত। এ উভয়ের মধ্যে বাঁশি ও অসির যা প্রভেদ সেই পার্থক্য বিদ্যমান; তবুও বর্ণসামাঞ্জস্যের গুণে শ্যাম ও শ্যামা আমাদের মনের ঘরে নির্ব্বিবাদে পাশাপাশি অবস্থিতি করে।"—"বাঙালির মন এখন অর্দ্ধেক অকালপক্ব এবং অর্দ্ধেক অযথা কচি।"—"আর্টিষ্টরা বলেন প্রকৃতি শুধু অন্ধ নন, উপরন্তু বধির। যাঁর কান নেই তাঁর কাছে

গানও নেই।"—"এক কথায় সাহিত্যসৃষ্টি জীবাত্মার লীলামাত্র।… সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্যে খেলনা তৈরি করতে বসেন।"—এমনি সব বাক্য সেদিনও যেমন ছিল আজও তেমনি অপূর্ব্ব। 'হালখাতা' ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে, রস-রসিকতায়, পাণ্ডিত্যে এবং প্রকাশ সৌষ্ঠবে অতুলনীয়। বীরবলের স্নেহহীন বুদ্ধিদীপ্ত আঘাতে উজ্জ্বল চিন্তার কণা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের-মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রমথ চৌধুরীর রচনারীতি সাহিত্যে নব যুগ আনিয়াছে। এই সংস্করণখানি সুমুদ্রিত। 'বীরবলের হালখাতা" সাহিত্যরসগ্রাহীর অবশ্যপাঠ্য।

অনিচ্ছাকৃত—শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র। সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭ পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ, কলিকাতা—২৯। দাম আড়াই টাকা।

ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র মনোবিদ্যা অনুশীলন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার "মনঃসমীক্ষণ" শুধু পণ্ডিত-সমাজে নয় সাধারণের কাছেও সমাদৃত হইয়াছে। "অনিচ্ছাকৃত" একখানি মনোবিদ্যার গ্রন্থ। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিতেছেন, "মনোবিদ্যার তত্ত্বগুলি শুধু আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধিই করে না, উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হলে আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের অনেক সমস্যার সমাধানে তারা যথেষ্ট সহায়তা করে।" অনিচ্ছাকৃত, সমাজসেবক, সমাজ ও শান্তি, সমাজ ও মনোবিদ্যা, কারাবন্ধন, অপরাধ কোথা, শেয়ারব বসায়ী, বিজ্ঞাপন ও মনোবিদ্যা, ব্যক্তিত্ব, দ্বন্দ্ব, জান্তব চুম্বক, স্বপ্ন, ভয়, পাগল কে, দাম, উন্নতি না পরিবর্ত্তন—এইরূপ ষোলটি অধ্যায়ে, মনোবিদ্যার তত্ত্বপ্রয়োগে এই ষোলটি অসম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে কত অদ্ভুত তথ্য জানিতে পারি গ্রন্থকার তাহার আলোচনা করিয়াছেন।—মানুষের মন সমুদ্রের মত। আমরা তার উপরের দিকটাই দেখি। সেইটুকু সংজ্ঞান। তার গভীর তলদেশে কত অসামাজিক চিন্তা, প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া আছে তাহা কচিৎ জানিতে পারি। স্বপ্নে, অসম্বৃত চিন্তাধারায় অথবা আকস্মিক আচরণে তাহাদের সহসা সাক্ষাৎ মেলে। এই সব অসামাজিক ইচ্ছা ও ভাব অবদমিত হইয়া মনের গোপনে নির্জ্ঞানের স্তরে চলিয়া যায়। লুপ্ত হয় না। তাহারা ক্রমাগত সংজ্ঞানে আসিতে চায়। মনের প্রহরী বাধা দেয় বলিয়া তাহারা ছদ্মবেশে আসে। যেগুলিকে আমরা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বলি মনঃসমীক্ষণে সেগুলির মধ্যেও অনেক সময় আমরা নিরুদ্ধ ইচ্ছার প্রেরণা দেখিতে পাই। মানসিক-বিকার সংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান মনের দ্বন্দ্ব। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বইখানিকে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিতে লেখক চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে।

আলোচনাগুলি পাঠকের আগ্রহ উদ্দীপ্ত এবং নানা বিষয়ে কৌতূহল চরিতার্থ করিবে।

উষসী—শ্রীকানাই সামন্ত। জিজ্ঞাসা, ১৩৩-এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

কবিতার বই। সাঁইত্রিশটি গীতিকবিতার সমষ্টি। বইখানি যেমন সুমুদ্রিত কবিতাগুলি তেমনি সুমিষ্ট। শুধু শব্দের পারিপাট্য ও ছন্দের ঝঙ্কার রচনার মধ্যে মাধুর্য্য আনিয়াছে এমন কথা বলিতেছি না, কবিতাগুলির মধ্যে সত্যকার কবিত্ব আছে। লেখক বলিতেছেন,

> হায় নীলাকাশ! হায় ক্ষীণপ্রাণ তীর পাঞ্জরের ধন!
> আমি কবি নই, কথাকার গাঁথি, কথা শুধু সম্বল—
> হায়, হাসি-ভরা বাঁশি-ভরা মোর এ শুধু অশ্রুজল।

অনেক সময় অশ্রুজলই কাব্যের রূপ ধরে। 'প্রদীপে' তিনি বলিতেছেন,

> কূল কৈ ওগো কূল কৈ, ওগো কে আমারে ব'লে দেবে,
> উষসী মূর্ত্তিমতী
> কোন্ অলক্ষ্য ঘাটের সোপানে চিরপ্রতীক্ষাবতী?
> কবে পৌঁছিবে নন্দিত এ আরতি?

'হেমন্তে' আছে,

> কেবল শুনতে পাই
> কুহেলিম্লান দিগ্‌বধূদের করুণ নেত্রপাতে,
> করুণ আলোয় করুণ ছায়ার মায়ায় আবছায়াতে—
> সময় নাই রে নাই!

'শিল্পীর সন্ধ্যায়' আছে,

> রসের আবেগ-ভরে চিরন্তন রূপের আকৃতি,
> মর্ম্মে মর্ম্মরিত চির বোবা অনুভূতি,
> প্রাণ ভ'রে নিয়ে যাব এই।

'স্বপ্নশেষে' রবীন্দ্রনাথের, 'শিল্পীর সন্ধ্যা'য় অবনীন্দ্রনাথের, 'শিল্পী'তে নন্দলালের কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে। 'হে মহা পথিক' এবং 'মধুবাতা ঋতায়তে' মহাত্মার উদ্দেশে রচিত কবিতা। "উষসী"র অনেকগুলি কবিতাই পাঠকের প্রাণকে স্পর্শ করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বাঘের জঙ্গলে—শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত। এ মুখার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ, ২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা

লেখক শিকারের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন পালামৌ—রামগড়ের অরণ্যে। তাঁর সেই শিকারের সঙ্গী ছিলেন ওস্তাদ শিকারী মিঃ.সেন আর তিন জন মহিলা—লেখকের স্ত্রী সাবিত্রী দেবী, মিসেস চৌধুরী আর মিস ব্যানার্জ্জি। এই প্রথম অভিজ্ঞতার পর লেখক বহু বার প্রধানতঃ বাঘের সন্ধানে গয়া জেলার পূর্ব্বপ্রান্তস্থ কালী পাহাড়ী এবং মাধোপুর, মহাদেও স্থান, বিষণপুর একতারা প্রভৃতি তৎসন্নিহিত অরণ্য-অঞ্চলে আর এই জেলারই দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে রজৌলী পাহাড়-সংলগ্ন বনেজঙ্গলে, এমন কি সুদূর নেপালসীমান্তের চম্পকারণ্যে অবধি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। ওদিকে প্যান্থার শিকারের উদ্দেশ্যে পূর্ব্ববঙ্গের ভোলার জঙ্গল পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়াছেন। জঙ্গলে বাঘ ভাল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু শিকারের যে সমস্ত কাহিনী এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেগুলি পড়িলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। দুঃসাহসিক কর্ম্ম সম্পাদনের যে উদগ্র নেশায় লেখক বাংলা বিহার ও নেপালের অরণ্য-পর্ব্বতে ছুটাছুটি করিয়াছেন, রচনার গুণে তাহা যেন পাঠকের মনেও সঞ্চারিত হয়।

বর্ত্তমান পুস্তকখানি প্রচলিত শিকার-কাহিনীসমূহের ঠিক সগোত্র নহে। ইহা আগাগোড়া সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর। লেখকের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি এবং নিসর্গচিত্রণ-নৈপুণ্য দুইই প্রশংসনীয়। পড়িতে পড়িতে মনে হয় শিকারটা অনেক ক্ষেত্রেই গৌণ ব্যাপার, আসলে অরণ্যের রহস্যময় বিরাট রূপে আকৃষ্ট হইয়াই তিনি গৃহকোণের নিশ্চিন্ত আরাম ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়াছিলেন। পথের নেশা যে কেমন করিয়া তাহার মন ভুলাইয়াছিল তাহার পরিচয় পাই "একতারা পথের মায়া" নামক অধ্যায়ে। তাই তো অনেক সময় শিকারে ব্যর্থকাম হইলেও তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহার অন্তরকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে অরণ্যের নিরুপম সৌন্দর্য্য আর অজানার আকর্ষণে অবিশ্রান্ত পথ চলার আনন্দ। এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন, "আমার চোখে পাহাড় এক বিস্ময়, অরণ্যও এক বিস্ময়।" লেখকের মনোরম ভাষায় অরণ্যের স্নিগ্ধ প্রশান্তি, ইহার নিভৃত নির্জ্জনতার বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, Kant Harnsun এর প্যান এর Ghlan-এর মত "My place is in the woods in solitude", 'আমার স্থান অরণ্যের নিভৃতিতে' ইহা তাহারও নিগূঢ় মনের কথা। বর্ত্তমান পুস্তকে অরণ্য-প্রকৃতি এবং তাহার রূপমুগ্ধ লেখকের মনের ছবি বড় চমৎকার ফুটিয়াছে, স্থানে স্থানে বর্ণনা এত জীবন্ত যে, মনে হয় অরণ্য যেন তার সকল রহস্য লেখকের বিস্মিত দৃষ্টির সমক্ষে পরিপূর্ণ মহিমায় উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। লেখকের চোখে অরণ্য ও অরণ্যচারী বাঘ যেন এক অভিন্ন সত্তা। এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন—"বাঘ বিশ্বস্রষ্টার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।" বাঘ শিকারের চেয়ে বাঘের গতিবিধি এবং জীবন-লীলা পর্য্যবেক্ষণে তাঁর বেশী আনন্দ। কাহিনীর উপসংহারে তাই তিনি বলিতেছেন: "হিংস্র জানোয়ার নজরে এল কি দুম করে একটি গুলীতে মারা গেল, এইটুকুই এর সব কথা নহে। রহস্যময়ী প্রকৃতি, রহস্যভরা এর বিচিত্র অরণ্য...। এখানে বাঘ ঘুমিয়ে থাকে দুপুরে, রাত্রে প্রকাশিত হয় এর স্বরূপ। ঝড়বাদল অন্ধকার রাত্রে এর বিচরণ অব্যাহত ও সাবলীল। আমার পথযাত্রায় এ দুরন্তের সন্ধান চলে মানসনেত্রে, অরণ্যে সেই প্রয়াস হয়ে উঠে বাস্তব।"

এই পুস্তকের মূল সুরটি কি, উপরের কয়েকটি ছত্রের মধ্যেই তাহা পরিস্ফুট। বইখানির রূপসজ্জাও অনবদ্য। চমৎকার মসৃণ কাগজে পাইকা অক্ষরে ঝকঝকে ছাপা। মূল্যবান আর্ট পেপারে মুদ্রিত অনেকগুলি ছবি ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

ছোটদের মহাভারত-কথা—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু। দেশবন্ধু বুক ডিপো। ৮৪-এ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য এক টাকা।

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু ইতিপূর্ব্বে ছোটদের জন্য নানা বই লিখিয়া শিশু-সাহিত্যিক রূপে পরিচিত হইয়াছেন। এবার তিনি বালকবালিকা-দিগকে সহজ সরল ভাষায় 'অমৃত-সমান' মহাভারত-কথা শুনাইয়াছেন। বাজারে ছোটদের উপযোগী মহাভারতের অভাব নাই, কিন্তু রবীন্দ্রবাবু অত্যন্ত অল্প পরিসরের মধ্যে আগাগোড়া ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য এবং সঙ্গতি বজায় রাখিয়া যে রকম চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে গল্প বলিয়া গিয়াছেন তাহা শিশুদের মনে বিশেষ কৌতূহল ও আগ্রহের সৃষ্টি করিবে এবং এই বহুশ্রুত কাহিনীতেও তাহারা নূতনত্বের আস্বাদ পাইবে।

বিরাট মহাভারত গ্রন্থের যে-সকল গল্প শিশুদের কল্পনাকে সবচেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ করিবে বিশেষভাবে সেগুলিই লেখক সযত্নে নির্ব্বাচন করিয়াছেন এবং এমন ভাবে সেগুলিকে সাজাইয়াছেন যে কাহিনীর রস-প্রবাহ আগাগোড়া নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বহিয়া গিয়াছে। কুরুক্ষেত্রের আঠারো দিনের যুদ্ধের বর্ণনাও চমৎকার। তাহা শিশুমনে উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে। এই মহাভারতকথা যে ছোটদের মন জিতিয়া লইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কতকগুলি রেখাচিত্র এই পুস্তকের সৌষ্ঠব বাড়াইয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

শোষণমুক্ত রাষ্ট্রবাদ—শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ গুহ রায়। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ঘোষপাড়া রোড, বারাকপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৪। মূল্য ।৵০ আনা।

ভারতবর্ষে যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার সংঘাত এবং সমন্বয় ঘটিয়াছে। ইহা বর্ত্তমানেও চলিতেছে। এজন্য ভারতের সমস্যা খুবই জটিল। স্বাধীনতালাভের পর এই জটিলতা হ্রাস না পাইয়া বাড়িতেছে। লেখক এই সমস্যার সমাধানে নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার মূল কথা হইতেছে এই যে, এই রাষ্ট্রবাদ মতে ধনী নির্ধনকে, বুদ্ধিজীবী শ্রমিককে, কোন জাতি বা সম্প্রদায় অন্য কোন জাতি বা সম্প্রদায়কে, এক ধর্ম্মাবলম্বী অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে, কোন প্রদেশ অপর কোন প্রদেশকে, কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে শোষণ করিতে পারিবে না। এই 'বাদ'কে কার্য্যকরী করার জন্য লেখক ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন নীতির সমর্থন করেন, তাঁহার মতে সমগ্র ভারতের উপর হিন্দীভাষা চাপানো ভাষার সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা। ইহাতে ব্যক্তিগত ও প্রদেশগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে এবং নূতন শোষণের পথ খোলা হইবে। ভাষা প্রাকৃতিক পরিবেশ, জলবায়ু এবং আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লেখক ভারতকে (পাকিস্থান সহ) পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতে চান। ইহাতেই আঞ্চলিক বিরোধ দূর হইবে বলিয়া তাঁহার ধারণা। দরকার হইলে এক-নায়কত্ব বাঞ্ছনীয়; কারণ ইহা জনসাধারণকে সুখ ও শান্তি দিতে পারিবে। ভারতবর্ষকে—ভারত ও পাকিস্থানে বিভক্ত করিয়া কোন কিছুরই সমাধান হয় নাই, দুঃখদুর্দ্দশা বাড়িয়াছে মাত্র। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে দুইটি প্রধান শক্তিগোষ্ঠী রহিয়াছে। লেখক বলেন, ভারত পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলিকে শোষণমুক্ত রাষ্ট্রবাদের ভিত্তিতে গড়িয়া "তৃতীয় শক্তিগোষ্ঠী গঠনপূর্ব্বক" বিশ্বশান্তিরক্ষা করিবে। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধেও লেখকের নিজস্ব মত এবং সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনাও আছে। কথা হইতেছে এই মতবাদ কে শুনিবে, মানিবে এবং কার্য্যকরী করিবে। তবে একথা স্বীকার্য্য যে, লেখকের আদর্শ অতি উচ্চ—তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা চিন্তার খোরাক জোগাইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

১। তড়িতের অভ্যুত্থান—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য পৃষ্ঠা ৮০।

২। আমাদের খাদ্য—শ্রীনীলরতন ধর, পৃষ্ঠা ৬৪

৩। ধরিত্রী—শ্রীসুকুমার বসু, পৃষ্ঠা ৭৬।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ৯৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯ প্রত্যেকটির মূল্য ।০ আনা।

শিক্ষা ও দীক্ষা জীবনরসে সিক্তিত হইয়া দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবে পরিণত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তুলিবার প্রধান উপায় বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের বহুল প্রচার; কিন্তু শুধু তথাকথিত জ্ঞানের আহরণেই যে সেই দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠে না তা আমরা নিত্যই আমাদের জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছি। বিখ্যাত খাদ্যবিজ্ঞানীর পাতে হয়ত দেখিবেন তাঁর বহুনিন্দিত খাদ্যসামগ্রীর সমাবেশ। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সারগর্ভ পুস্তক-রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকের বাড়ীতে হয়ত দেখিবেন স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রাথমিক নিয়মের প্রতি অবহেলা। ইহা ঘটিতে পারিয়াছে শুধু আমাদের শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগ নাই বলিয়াই—তার ভিতর প্রাণের স্পর্শ নাই বলিয়াই। আমাদের গৃহে যুগোপযোগী শিক্ষার প্রচার মোটেই হয় নাই।

এই অভাব দূর করিবার চেষ্টা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ করিতেছেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের প্রথম প্রকাশিত কয়েকটি পুস্তকেই এই বিষয়ে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করিয়াছেন। আলোচ্য তিনখানি পুস্তকই সরল ভাষায় সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিয়া লিখিত। বয়স্ক ব্যক্তিগণও এই সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া নিজেদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াইতে পারিবেন। আমরা এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

উপনিষদ্ – দ্বিতীয় খণ্ড (প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য)। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, ৩০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বর্তমান গ্রন্থকার-সম্পাদিত উপনিষদের প্রথম খণ্ড ইতঃপূর্বে এই পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৫০) সমালোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম খণ্ডের পদ্ধতি অনুসারে প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই তিনখানি উপনিষদের বাংলা ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে—এই প্রসঙ্গে শঙ্কর ও রামানুজের ব্যাখ্যার পার্থক্য স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভূমিকায় সংক্ষেপে শঙ্কর ও রামানুজের মতের বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হওয়ায় সাধারণের পক্ষে ব্যাখ্যাগত পার্থক্যের রহস্য অনুধাবন করা সহজ হইবে। বাংলা ভাষায় উপনিষদের শাঙ্কর ব্যাখ্যা সুপরিচিত। বসন্তবাবু শঙ্করব্যাখ্যার সহিত রামানুজ-ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া সাধারণ বাঙালী পাঠকের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

১। চন্দ্রগুপ্ত-গুরু চাণক্য—(৩য় সং), ২। শিবাজী-গুরু রামদাস স্বামী—(৪র্থ সং) শ্রীকিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—এ. মুখার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড। ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। প্রত্যেকখানির মূল্য ১।০।

গুরুর কৃপালাভ না করিলে যেমন ধর্ম্মসাধন-পথে সিদ্ধিলাভ করা যায় না তেমনি আগেকার দিনে রাজনীতি-ক্ষেত্রেও গুরুর উপদেশ ব্যতীত রাজগণের রাজ্য পরিচালনা একরূপ অসম্ভব ছিল। বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞ কূটনীতি-বিশারদ প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রিগণই পূর্ব্বকালে নৃপতিগণের উপদেষ্টা এবং গুরুস্বরূপ ছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ভগবদ্‌ভক্তিপরায়ণ সাধুগণও রাজনীতি বিষয়ে রাজগণকে উপদেশ প্রদান করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিবাজী-গুরু রামদাস স্বামীর কথা উল্লেখ করা যায়। বিশাল মৌর্য্যসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের গুরু চাণক্যের বুদ্ধিকৌশল এবং কূটনীতি ব্যতীতও এরূপ সুবিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, রক্ষা ও পরিচালনা আদৌ সম্ভবপর হইত কিনা তা বলা কঠিন। চাণক্য বা কৌটিল্য প্রণীত অর্থনীতি ও রাজনীতিবিষয়ক গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে অতি প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষের পণ্ডিতগণ ঐহিক ও ব্যবহারিক জীবনের উন্নতিসাধনে কিরূপ অবহিত ছিলেন তাহা জানা যায়। চাণক্যের জীবনী গ্রন্থকার প্রধানতঃ 'মুদ্রারাক্ষস' নামক নাটক ও গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ অবলম্বনে গল্পের আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ চন্দ্রগুপ্ত ও মৌর্য্যসাম্রাজ্য এবং তদানীন্তন রাজ্যশাসন-প্রণালী সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ইহাতে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

'শিবাজী-গুরু রামদাস স্বামী'ও এক জন সাধুপুরুষের একটি উৎকৃষ্ট সুলিখিত জীবনী। সমগ্র মারাঠাজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া অত্যাচারী মোগলসম্রাটের বিরুদ্ধাচরণপূর্ব্বক কেমন করিয়া ভারতে এক সুদৃঢ় ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারতের রামদাস স্বামী-প্রমুখ 'সমর্থ' সাধুগণের ছিল নিরলস সাধনা। উত্তর ভারতেও এই সময়ে রাজসিংহের অধীনে রাজপুতগণ এবং গুরুগোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে শিখদের অভ্যুত্থান হইতেছিল। দৈবযোগে উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্যলাভ ভারতের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর অধ্যায়ের সূচনা করে। মারাঠাকেশরী শিবাজী এই সময় উপযুক্ত গুরুর অভাববোধ করিতেছিলেন। গুরু রামদাস স্বামীও তখন আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতে এক বিশাল ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনার্থ উপযুক্ত শিষ্যের সন্ধান করিতেছিলেন। রামদাস স্বামী প্রণীত 'দাসবোধ' গ্রন্থ পড়িলে তাঁহার উপদেশগুলির তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, একের উন্নতি ব্যতীত অপরের উন্নতি অসম্ভব—ধর্ম্মরাজ্য ছাড়া ধর্ম্মাচরণ সম্ভব নহে, ইহাই তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম। এই সুলিখিত বই দুখানি উপন্যাসের মতই কৌতূহলোদ্দীপক। দুখানি বই-ই সচিত্র।

১। স্বাস্থ্য ও শক্তি, ২। ব্যায়ামের চার্ট, ৩। আসনের চার্ট—'আয়রণম্যান' শ্রীনীরদকুমার সরকার। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য যথাক্রমে ১৷০, ।০, ।০।

'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্', শরীর ও স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে জীবন বিড়ম্বনামাত্র। দেহ অসুস্থ থাকিলে জীবনের বহু সাধ-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ', বলিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষই ঐহিক ও আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ছাত্রগণ, দেশের কিশোর ও যুবকগণ এই কথা স্মরণ না রাখিলে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া তাহাদের কৃতিত্ব-অর্জ্জনের আশা সুদূরপরাহত। লেখক বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ব্যায়ামশিক্ষাকে জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছেন। [illegible] কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কি করিয়া শক্তিমান ও সুগঠিত দেহের অধিকারী হওয়া যায়, শুধুহাতে ব্যায়াম, আসন অভ্যাস ও বারবেলসহ ব্যায়ামের প্রণালী চিত্র-সংযোগে পুস্তকের প্রথম অংশে বিবৃত হইয়াছে, শেষভাগে স্বাস্থ্যরক্ষার অবশ্যপালনীয় নিয়মগুলি সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। আহার সম্বন্ধে গ্রন্থকার-বর্ণিত নিয়মগুলি প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষার্থিগণ মনোযোগের সহিত এই অধ্যায়টি পড়িবেন, কারণ উপযুক্ত আহারই শরীরের গঠন, পুষ্টিবিধান ও শক্তি অর্জ্জনের প্রধান উপায়, ব্যায়াম শরীরকে অধিকতর শক্তিশালী ও কর্ম্মক্ষম করে। খালিহাতে নানারূপ ব্যায়াম ও আসনের ভঙ্গীসকল দুইটি চার্টের সাহায্যে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চার্ট দুইটি শিক্ষার্থিগণের বিশেষ কাজে লাগিবে।

১। ছোটদের আগাদিন, ২। ছোটদের অ লিংবা—শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। আশুতোষ লাইব্রেরী। ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। প্রত্যেকখানির মূল্য ।০।

প্রথম ভাগ শেষ করিয়াই শিশুগণ যাহাতে আনন্দের সহিত নূতন নূতন ছবি দেখিয়া ও গল্পের বই পড়িয়া একসঙ্গে ভাষাশিক্ষা ও নানাবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এই সিরিজের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। যুক্তাক্ষরবর্জ্জিত সহজ সরল ভাষায় লিখিত, বহু চিত্রশোভিত বইগুলি ছোটরা আগ্রহের সহিত পড়িয়া ফেলিবে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

তস্মৈ—আচার্য্য শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এলাহাবাদ—৬৯-এ, এলেনগঞ্জ, শ্রীসত্যগোপাল গীতাশ্রম হইতে শ্রীখগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৬+৩১৬+৪ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া জনৈক গুরুভ্রাতাকে লেখা আচার্য্য চট্টোপাধ্যায়ের আটানব্বইখানি চিঠি এবং পরিশিষ্টে পাঁচটি হেঁয়ালী স্থান পাইয়াছে। লেখক বরাহনগরস্থ সাধনসমর আশ্রমের মহর্ষি সত্যদেব ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য। তাঁহার লেখায় গুরুভক্তি এবং ভগবন্নির্ভরতা সম্যক্‌ভাবে প্রকাশিত। ইহা ছাড়া ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, জনহিতকর কর্ম্মনীতি ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ও ইহাতে আছে।

যাদুকর—শ্রীঅতুলানন্দ রায়। কলিকাতা ১১-এ, গোকুল মিত্র লেন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

ইহা পাঁচটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ একটি রূপক নাটিকা। ভীলসর্দ্দার মংরু অহিংসা ও প্রেমের বলে ক্ষমতার অপব্যবহারকারী দেবতার আস্ফালনকে ব্যর্থ করিয়াছিল। দেবতা নিজেকে দানবতুল্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং মনুষ্যত্বের মহিমার কাছে নতিস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মনুষ্যত্বের এই মহিমাই ভীল সর্দ্দারের যাদু, তাই পরাভূত দেবতা তাহাকে যাদুকর আখ্যা দিয়াছেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মুক্তিসাধনায় চন্দননগর—শ্রীহরিহর শেঠ। প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনে চন্দননগর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইংরেজাধিকৃত বিরাট সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া ফরাসী চন্দননগরে উহার মূলোচ্ছেদের আয়োজন চলিয়াছিল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হইতে ফরাসী সরকারের উপর এজন্য কম চাপ পড়ে নাই। মধ্যে মধ্যে ইহাকে ইংরেজের হস্তে অর্পণের প্রস্তাবও ইংরেজ পক্ষ হইতে আসে। কিন্তু চন্দননগরের অধিবাসীরা বরাবর ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। যে রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, ইহাকে তাদ্ [illegible] বিশেষ আপত্তি ছিল।

ক্রমে সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও ফরাসীর আচরণে তারতম্য কচিৎ দৃষ্ট হইতে থাকে। তবে দ্বিতীয় মহাসমরের পরে ভারতবর্ষ যখন ভারতবাসীর হস্তে দিবার প্রস্তাব হয়, সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সরকারও যাহাতে স্থানীয় অধিবাসীদের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ-স্থাপন হয় তাহার প্রয়াসী হইলেন। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট ফরাসী চন্দননগরের শাসনকর্তৃত্ব তথাকার পৌরসভার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই পৌরসভার সভাপতি ছিলেন আলোচ্য পুস্তকের গ্রন্থকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়। ১৯৪৭ সনের ১৫ আগষ্ট হইতে গত ২রা মে (১৯৫০) ফরাসী সরকার কর্তৃক ভারতরাষ্ট্রের হস্তে চন্দননগরের কর্তৃত্বভার অর্পণ পর্য্যন্ত দুই বৎসর সাড়ে আট মাসের ঘটনাবলীই বর্তমান পুস্তকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

গ্রন্থকার 'পূর্ব্বাভাষে' ফরাসী অধিকার-কাল—বিগত আড়াই শত বৎসরের পরিচয় অতি সংক্ষেপে দিয়াছেন। ফরাসী সরকারের উপর চন্দননগরের অধিবাসীরা কিরূপ আস্থাবান ছিলেন এই অধ্যায়ে "প্রজাবন্ধু" ও অন্যান্য পত্রিকার উদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা জানা যায়। পরবর্তী অধ্যায়গুলি সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর বিবরণ সম্বলিত। এসকল অধ্যায়ের নামকরণেও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বাভাষ বার্তা'—আরম্ভ, প্রবেশ পথে, গন্তব্যাভিমুখে, মন্দির সমীপে, দেবী সকাশে, মাতৃ অঙ্কে নামক অধ্যায়গুলিতে ভক্তিমান্ সাধকের তীর্থ-ক্ষেত্রে অভীষ্ট দেবতাদর্শনের মত চন্দননগরের স্বাধীনতা-অভিযানের সাফল্য প্রত্যক্ষ করিয়া গ্রন্থকার নিষ্ঠার সহিত তৎসমুদয় এই পুস্তকখানিতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি গত আড়াই বৎসরের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে চন্দননগরের শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন, এইজন্য তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতা-প্রসূত বলিয়া বিবরণগুলি পাঠকের কাছে অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইবে। ইতিহাসের ক্রম ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য গ্রন্থকারকে নিজের কথাও বলিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা স্বল্প বিধায় আরও বেশী করিয়া জানিতে আমাদের কৌতূহল থাকিয়া যায়।

পুস্তকখানিতে সতরটি প্লেটে বহু একবর্ণ চিত্র সংযোজিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ব্যঙ্গচিত্রও একাধিক আছে। ইহাতে গ্রন্থের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইয়াছে। চন্দননগরের ইদানীন্তন ঘটনাসমূহের সহিত পরিচয়লাভ করিতে হইলে এই গ্রন্থখানি অবশ্যই পাঠ করিতে হইবে। এদিক দিয়া ইহা আমাদের একটি অভাবও পূর্ণ করিয়াছে। পুস্তকখানির ভাষা প্রাঞ্জল।

হিন্দুধর্ম্ম পরিচয় শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী ৫, শম্ভু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি হিন্দু বালক-বালিকাদের হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত। গ্রন্থকারের মতে "আজকাল আমাদের যে সরকারী শিক্ষানীতি প্রচলিত, তাহাতে ধর্ম্মের স্থান নাই; অথচ ধর্ম্ম শিক্ষাই সমাজবন্ধন এবং ধর্ম্মাবলম্বীদের ঐক্য ও সজ্ঞশক্তির মূল। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন অন্য সকলে এই সত্য উপলব্ধি করিয়া, তাহাদের বালকগণকে নিজ নিজ ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছে। একমাত্র হিন্দুই এবিষয়ে উদাসীন।" লেখকের এই উক্তির মধ্যে যে যথেষ্ট সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বধর্ম্মের মূল ও সার কথার সঙ্গে পরিচিত না হওয়ায় সন্তানসন্ততিগণ ক্রমে বিভ্রান্ত ও আদর্শভ্রষ্ট হইয়া উঠে। ইহার ফল ইদানীং আমরা বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এসময় এরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট।

পুস্তকখানি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে গ্রন্থকার ঈশ্বর, অবতার, হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ, যুগ বিভাগ, সৃষ্টি, দেবাসুর যুদ্ধ, তপস্যা, সত্য, অহিংসা, ষড়রিপু, শরীর ও আত্মা প্রভৃতি বিষয় ছোট ছোট অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির জীবনীও এই খণ্ডে প্রসঙ্গতঃ দেওয়া হইয়াছে। 'হিন্দু বালক-বালিকাগণের দৈনিক কর্ত্তব্য' অধ্যায়টি বিশেষ প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয় ভাগে আছে—হিন্দুধর্ম্ম, ভগবানের রূপ, মন্ত্র, পূজা, দশবিধ সংস্কার, পাপ-পুণ্য, প্রায়শ্চিত্ত, মৃত্যু, জন্মান্তরবাদ, জাতিভেদ প্রথা, বেদ-উপনিষদ দর্শন প্রভৃতি। হিন্দু শাস্ত্রের ভিত্তিতে এই সব বিষয় লেখক যেভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে বালক-বালিকাদের মনে বিভিন্ন বিষয়ে কৌতূহল অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা প্রত্যেকটি যাচাই করিয়া লইতেও শিখিবে। পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার জনপ্রিয়তাই সূচিত হইতেছে।

ব্যায়ামে বাঙালী শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ব্যায়ামচর্চ্চার বহুল প্রচলন ছিল। গত শতাব্দীর নবশিক্ষার আবর্ত্তে ইহাতে ভাটা পড়িয়া যায়। নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেলা দ্বারা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে—এমন কি শহর অঞ্চলেও ইহার পুনঃপ্রবর্ত্তন হইয়াছিল। ইদানীং বাংলাদেশে আমরা যে এত শরীরচর্চ্চার কেন্দ্র দেখিতেছি, তাহার মূলে হিন্দু মেলা তথা নবগোপাল মিত্রের প্রেরণা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। সরকারী শিক্ষা-বিভাগও ব্যায়ামচর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া স্কুলে বিদ্যালয়ে ইহার প্রচলন করিতে আরম্ভ করেন। বর্তমান পুস্তকখানিতে বাংলা দেশের বহু ব্যায়ামবীর, কুস্তীগির, মুষ্টিযোদ্ধা ও অন্যান্য ক্রীড়াকুশলীর সচিত্র জীবনী সংযোজিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত ব্যায়ামবীর শ্যামাকান্ত (সোহহং স্বামী) হইতে আধুনিক বহু ব্যায়ামবীরের বিবরণ ইহাতে পাওয়া যাইবে। পুস্তকের শেষে সন্নিবিষ্ট 'সরল ব্যায়াম প্রণালী' নামক অধ্যায়টি অনেকের উপকারে আসিবে। বিখ্যাত পুলিন দাস কর্তৃক লাঠি ও অসি খেলার প্রবর্ত্তনের আলোচনাও ইহাতে আছে।

হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠাতা এদেশে বাঙালীদের মধ্যে সার্কাসেরও প্রবর্তক। ১৮৮২ সন নাগাদ তিনি সার্কাস খুলিয়াছিলেন। পুস্তকখানির সার্কাস অধ্যায়ে একথাটি সংযোগ করিয়া দিলে ভাল হইত। গ্রন্থখানি বঙ্গ-সন্তানদের দেহের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে সাহায্য করুক ইহাই কামনা।

বাংলা বর্ষলিপি—শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত। সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালীগঞ্জ, কলিকাতা -২৯। মূল্য দুই টাকা।

সংপ্রতি বাংলা ভাষায় প্রতি বৎসর কয়েকখানি করিয়া "ইয়ার বুক" বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষলিপিখানির সপ্তম বর্ষ চলিতেছে। ইহা প্রথম দিকেও আমরা দেখিয়াছি। বর্তমান সংখ্যাটি পূর্ব্ব পূর্ব্ব 'বর্ষলিপি' হইতে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। নানাবিধ রচনায় ইহাকে ভারাক্রান্ত না করিয়া যে-সব জ্ঞাতব্য বিষয় পরিবেশন করা বর্ষলিপির উদ্দেশ্য তাহা এখানিতে বিশেষ ভাবে সাধিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস পরিসংখ্যান পরিবেশন ইহার একটি বৈশিষ্ট্য। বাংলার জন-সংখ্যা, শস্যসম্পদ, কৃষিশিল্প বাণিজ্যের বিবরণ—যে সকল বিষয়ের সংখ্যামূলক তথ্য অহরহ প্রয়োজন তৎসমুদয় ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন অধ্যায়ে রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের নানা অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্যও ইহাতে পাওয়া যাইবে। বাংলা বর্ষলিপিগুলি দেখিয়া একটি কথা আমাদের মনে হইয়াছে। একটি ভাষায় একই ধরণের বহু বর্ষলিপি প্রকাশ না করিয়া এক একটি বিভাগের কয়েকটি বিষয় লইয়া বর্ষলিপি প্রকাশ করিলে তাহা সাধারণের অধিকতর উপকারে আসিবে। বর্ষলিপি প্রকাশকদের একথা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ঝিল্লী

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

আজি রাতে ঝিল্লী, তোর করুণ ক্রন্দন
এ নিভৃত পল্লীবাট করিছে মন্থন—
প্লাবিত উদ্বেল। হেথা সান্দ্র অন্ধকারে
অকস্মাৎ আমারো এ মনোবীণা-তারে
বেদনার কোন্ রাগ উঠে ঝঙ্কারিয়া
মুহুর্ম্মুহু! বল্ ওরে কিসের লাগিয়া
সুপ্তিলীন ধরাতলে নিদ্রাহীন জাগি'
কিবা ফল তোর! হায়, আমিও একাকী
শূন্য গৃহে ক্ষুণ্নমনে কাঁদি নিরজনে
নিশীথ শয়ন 'পরে! আজি মোর মনে
মহান্ অতৃপ্তি এক জাগে নিরন্তর—
আমারে করিয়া ক্ষুব্ধ, উতল, জর্জ্জর!
হৃদয়ের কোণে মোর কোন্ অপূর্ণতা
পূর্ণতার লাগি' শুধু করে চঞ্চলতা
অবরিত কশাহত ক্ষিপ্ত অশ্বসম।
মানুষের এ বেদনা কোথা তুই পেলি?
কি ক্রন্দন আজি আহা, উঠিছে উদ্বেলি'
কণ্ঠে তোর! মা—না বুঝি জান্তব জগতে
সবে মোরা চলিয়াছি সেই এক পথে
যান্ত্রিক প্রথায়। সেই জন্ম, বিবর্ত্তন—
জন্ম হ'তে জন্মান্তরে সেই সংক্রমণ—
তার পর এক দিন নিঃশেষে নির্ব্বাণ
অনন্ত সত্তার মাঝে—তরঙ্গসমান
বারিধির বক্ষোলীন!

আয় ঝিল্লী, আয়—

আজি রাতে দোঁহে মোরা কাঁদি নিরালায়;—
নীরন্ধ্র তিমিরে হোথা তুই কাঁদ্ বনে,—
আমি কাঁদি সাথীহারা নির্জ্জন শয়নে।

ভ্রম-সংশোধন

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পাটী	পংক্তি	হইবে না	হইবে
শ্রাবণ ১৩৫৭	৩৪৪	১ম	১৬শ	সুন্দরবন	উহা

বর্ষায় (কাঠখোদাই চিত্র)

শ্রীনীরদকুমার সরকার

'ব্যায়াম' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক 'আয়রণ ম্যান' শ্রীনীরদকুমার সরকার একজন বিশিষ্ট ব্যায়াম-শিক্ষক ও অভিনব ক্রীড়াকৌশল-প্রদর্শক হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি যে সমস্ত ক্রীড়া প্রদর্শন করেন সেগুলি বিশেষ শক্তিমত্তা ও কুশলতার পরিচায়ক। নীরদকুমার লাঠি ও ছোরাখেলা, যুযুৎসু, অসিক্রীড়া, কুস্তী, বর্শাক্রীড়া ভার-উত্তোলন, কুচকাওয়াজ, খালিহাতে ব্যায়াম, নানাপ্রকার যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্যায়াম যোগব্যায়াম প্রভৃতিতে বিশেষ পারদর্শী
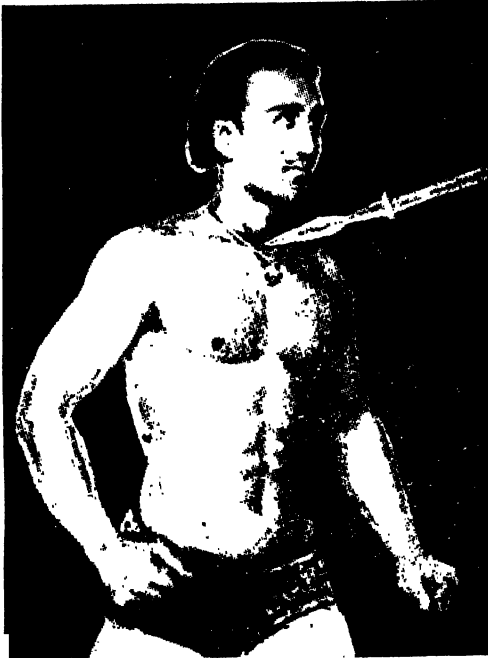
শ্রীনীরদকুমার সরকার

এবং এ সমস্ত শিক্ষাদানেও সুপটু। তিনি শরীর উল্টাইয়া ভার উত্তোলন, চুলের সাহায্যে ভারী ওজনের জিনিষ তোলা, শিশুর বুকে দাঁড়ানো, গলার উপর দিয়া বোঝাই গাড়ী চালানো, গলায় রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় ঝোলা, চক্ষুদ্বারা লৌহদণ্ড বক্রীকরণ, বর্শা গলায় চাপিয়া লোহা বাঁকানো প্রভৃতি বিবিধ ক্রীড়া অবলীলাক্রমে দেখাইয়া থাকেন। ১৯৩৬ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার নীরদবাবুর ব্যায়ামকৌশল দর্শনে মুগ্ধ হইয়া একটি স্বর্ণপদক প্রদান করেন ও তাঁহাকে "আয়রণ ম্যান" উপাধিতে ভূষিত করেন। নীরদবাবু "শরীর ও শক্তি" "সরল যোগব্যায়াম" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন এবং আসনের ও ব্যায়ামের চার্ট তৈরি করিয়াছেন।

এতদিন নীরদকুমার পূর্ব্ববঙ্গে থাকিয়া শিক্ষার্থীদের শরীর-চর্চ্চা শিক্ষা দিতেন। বিগত দুই বৎসর যাবৎ ইনি হাওড়া কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে ব্যায়ামাগার স্থাপন-পূর্ব্বক বহু ছাত্রকে ব্যায়াম-কৌশল শিক্ষা দিতেছেন।

যাদুকর পি সি সরকার

সুপ্রসিদ্ধ যাদুকর পি. সি. সরকার আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও জার্ম্মানীতে সাফল্যের সহিত যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আমেরিকার শিকাগো শহরে এবার (২৭শে—৩০শে মে) যে বিশ্ব-যাদুকর মহাসম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য তিনি চিকাগো যাত্রা করেন। সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত দেড় হাজার যাদুকরের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠতম সম্মানের অধিকারী হন। ফলে টেলিভিশন-কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া তিনি শিকাগো ও নিউইয়র্কের সর্ব্বত্র যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন। বড় বড় থিয়েটার হলে হাজার হাজার দর্শকের সম্মুখে তিনি তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। লণ্ডনে তিনি বি-বি-সি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া "যাদুবিদ্যায় ইংলণ্ড" সম্পর্কে বেতার-বক্তৃতা দেন। তৎপর ১১শে জুলাই আলেকজান্দ্রা প্যালেস হইতে টেলিভিশনে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন। এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সরকারের পরিচয় দিতে গিয়া লণ্ডন বি-বি-সি হইতে

বলা হয়—"বয়সে নবীন হইলেও শ্রীযুক্ত সরকার বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর।" লণ্ডন ইউনিভার্সিটি হলে শ্রীযুক্ত সরকারের যাদুকৌশল দেখিয়া লর্ড মাউণ্টব্যাটেন স্বীকার করেন যে, তিনি জীবনে যত খেলা দেখিয়াছেন তন্মধ্যে মিঃ সরকার প্রদর্শিত একটি খেলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্যারিসে

পি. সি. সরকার

শ্রীযুক্ত সরকার সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল রাজপথে চক্ষুর উপর ময়দার ব্যাণ্ডেজ ও সারা মুখের উপর কালো কাপড়ের থলে বাঁধিয়া দীর্ঘপথ সাইকেলে যাতায়াত করেন। ব্রিটিশ ইউনাইটেড প্রেস এই খেলার ফটো তোলেন এবং এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার করেন। ফরাসী যাদুবিদ্যাবিশারদগণ শ্রীযুক্ত সরকারের যাদুক্রীড়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহাদের "বিশেষ সম্মানিত সদস্য" নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। জার্ম্মান যাদুকর সম্মিলনী তাঁহাকে তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ রাজকীয় পদক ও স্বর্ণ 'লরেল' উপহার দেন। জার্ম্মানীর সংবাদপত্রসমূহ তাঁহাকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

অন্নদাসুন্দরী ঘোষ

বরিশালের পরলোকগত অধ্যাপক ক্ষেত্রনাথ ঘোষের সহধর্ম্মিণী অন্নদাসুন্দরী ঘোষ গত ২০শে জুলাই, ৭৭ বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষের কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

বাখরগঞ্জ জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের বিখ্যাত গুহবংশে ১২৮০ সালের ১৭ই পৌষ অন্নদাসুন্দরীর জন্ম হয়। তখনকার দিনে মফস্বলে মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু ছোটবেলা হইতে লেখাপড়ার দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল বলিয়া অন্নদাসুন্দরী প্রধানতঃ নিজের চেষ্টায় বাড়ীতে বসিয়া বিদ্যাভ্যাসে রত হন। সেই সময়ে বাখরগঞ্জে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা নামে একটি সভা ছিল। এই সভা হইতে মেয়েদের পরীক্ষা

অন্নদাসুন্দরী ঘোষ

লওয়া হইত এবং পরিক্ষার্থিনীদের উত্তরপত্র বঙ্গ-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের দ্বারা পরীক্ষিত হইত। অন্নদাসুন্দরী এই সভার বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিবিধ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সভার তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর মাত্র বার বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়।

াহের ...ও তিনি হিতৈষিণী সভায় কয়েকটি পরীক্ষায় সম্মানে উত্তীর্ণ হন। যেবার তিনি ইতিহাসে অনার্স ক্ষা দেন সেবার তাঁহার পরীক্ষক ছিলেন, বিখ্যাত ইতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত। তিনি অন্নদাসুন্দরীর রচনা-...তে মুগ্ধ হন।

অন্নদাসুন্দরীর অধ্যয়নস্পৃহা বলবতী ছিল। তিনি অল্প ...সেই সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনাবলী অধিগত রিয়াছিলেন। বিবাহের কিছুকাল পর হইতেই তাঁহার বিত্বশক্তির স্ফুরণ হয়। গৃহকর্মের অবকাশে কবিতা-রচনা ...হার জীবনের অন্যতম প্রধান আনন্দ হইয়া দাঁড়ায় এবং একান্ত নিষ্ঠার সহিত তিনি কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। প্রথম বয়সে লেখা তাঁহার বহু কবিতা "বামাবোধিনী পত্রিকা", "নব্যভারত", "দাসী", "অন্তঃপুর" প্রভৃতি তখনকার বিখ্যাত মাসিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার পরিণত বয়সের কবিতাসমূহ "ব্রহ্মবাদী", "ছাত্রবন্ধু" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল। প্রায় ... বৎসর পূর্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার শতাধিক কবিতা সংগ্রহ করিয়া "কবিতাবলী" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। এই কাব্যগ্রন্থে লেখিকার ...াত কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া অনেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

অন্নদাসুন্দরী একজন বিশেষ ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। ...নি এবং তাঁহার স্বামী উভয়েই প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ...কট দীক্ষাগ্রহণ করেন। অন্নদাসুন্দরী উত্তর ভারতের প্রায় ...দয় তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন তীর্থে ...াহার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ বরিশালের "ব্রহ্মবাদী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

অন্নদাসুন্দরী যে কেবল একজন কবিত্বশক্তিসম্পন্ন বিদুষী ...লা ছিলেন তাহা নয়, গৃহকর্ম্মেও তিনি বিশেষ নিপুণা ...ন। তিনি ছিলেন স্বামীর যোগ্যা সহধর্ম্মিণী সন্তানদের ...দর্শ জননী এবং একজন ধর্ম্মপরায়ণা নিষ্ঠাবতী হিন্দু ...।

...হার পুত্রকন্যারা সকলেই নানাক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জ্জন ...েন। জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবপ্রসাদ সুলেখক ও সুপণ্ডিতরূপে ...লাদেশে সুপরিচিত, তাঁহার চারি কন্যার মধ্যে বরিশাল ...এম. কলেজের অধ্যাপিকা শান্তিসুধা ঘোষ একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্ম্মী।

বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে বরিশালের একজন নাগরিক-প্রধান ৭৪ ...র বয়সে কলিকাতা নগরীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন ...শাল শহরের উন্নতি যা আজ দেখা যায় তাহা প্রধানতঃ বরদাকান্তেরই কীর্ত্তি। শহরের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে, ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নে তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। স্থানীয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ের জন্য তিনি পাঁচ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিতে সক্ষম হন, হাসপাতালের পরিসর বৃদ্ধি করেন এবং বিজলী বাতির ব্যবস্থা করেন। এই সমস্ত কার্য্য তিনি যখন পৌরসভায় কর্ণধার ছিলেন তখন সম্পূর্ণ করেন।

অশ্বিনীকুমার-জগদীশচন্দ্র যুগের এক জন শেষ সাক্ষী ছিলেন তিনি। সেই যুগে জাতীয় জীবনে যে বান ডাকিয়াছিল তাহার মধ্যে অবগাহন করিবার শক্তি বরদাকান্তের ছিল। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় আসিয়াও তিনি গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত স্বাধীনতা-আন্দোলনে বরিশাল জেলায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া কারাবরণ করেন। আইনজ্ঞ ও সাহিত্যিক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল।

মথুরানাথ মৈত্র

পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরের উকিল মথুরানাথ মৈত্র ৯৩ বৎসর বয়সে নদীয়া শান্তিপুরে পরলোকগমন করিয়াছেন। মথুরানাথ যে যুগে কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেন, তাহা রাজনীতিক জগতে সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহনের যুগ, হিন্দুত্বের নব উদ্বোধনের যুগ। এই উদ্বোধনের ফলে সেই যুগের যুবকবৃন্দ এক নবজাতীয়তা-মন্ত্রে দীক্ষিত হন, ইহার প্রভাব তাঁহাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে।

তাহার পর আসিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। ফরিদপুরের অম্বিকা মজুমদারকে পুরোভাগে রাখিয়া মথুরানাথ প্রভৃতি আইনজীবীগণ দেশসেবায় ব্রতী হন। পরিণত বয়সে নিজের প্রার্থিত স্থানে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

গোপীনাথ বড়দলৈ

আসামের প্রধান মন্ত্রী গোপীনাথ বড়দলৈয়ের আকস্মিক ও অকাল মৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি এবং তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

মাত্র ৫৯ বৎসর বয়সে গোপীনাথ দেহত্যাগ করিলেন; তাঁহার দেশের ও জাতির সেবার জন্য তাঁহার প্রয়োজন যখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তখন বিধাতা আপন ক্রোড়ে তাঁহাকে টানিয়া লইলেন। ইহা অহরহ ঘটিতেছে, এই বিধান মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

কংগ্রেসের নেতৃত্বপদে যখন গান্ধীজীর আবির্ভাব হইল, তখন আসামে এক নবজাগরণ দেখা দেয়। সেই জাগরণের অগ্রণী ছিলেন নবীনচন্দ্র বড়দলৈ ও তরুণরাম ফুকন। গোপীনাথ প্রথম যৌবনের উৎসাহ লইয়া এই নূতন কর্ম্মপ্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং সম্পদে-বিপদে এই দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর

দেশের ও জাতির সেবা করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতি ছিল মধুর, তিনি অজাতশত্রু ছিলেন। সেইজন্যই তিনি কংগ্রেস রাজনীতির দলাদলির ঊর্দ্ধে থাকিয়া কর্ত্তব্যপালন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের সময় নেতা-নির্ব্বাচনে গোপীনাথের দাবি অগ্রগণ্য হইল। তদপেক্ষা বুদ্ধিমান ও বিদ্বান রাজনীতিক আসামে অনেক ছিলেন, কিন্তু গোপীনাথের মনোনয়ন এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ ছিল।

আশা করি তাঁহার তিরোধানে আসামের রাজনীতিক জীবনে ক্ষমতা লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইবে না। তাহা হইলে দুঃখের সীমা থাকিবে না এবং গোপীনাথের স্মৃতির অবমাননা করা হইবে।

মেকেঞ্জি কিং

কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, উদারনৈতিক দলের নেতা মেকেঞ্জি কিং পরিণত বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি প্রায় ২১ বৎসর এই দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজগোষ্ঠীর নেতৃত্বপদের উপযোগী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। কানাডার নাগরিকবর্গ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের দুই শাখায় বিভক্ত, তাঁহাদের মধ্যে ভেদ-বিসম্বাদ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এই বিবাদের ফলে একটা "দ্বিজাতি"তত্ত্বের সৃষ্টি হয়, এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে তথায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া ভারতবর্ষের মত কানাডাকে বিভক্ত করিবার সূচনা হয়। ইংরেজ রাজনৈতিক লর্ড ডারহামের বুদ্ধিকৌশল ও কর্ম্মপ্রচেষ্টায় তাহা নিবারিত হয়। বিলাতের অতি নিকটবর্ত্তী আয়ারল্যাণ্ডে ইংরেজের ভেদনীতি সফল হইয়াছে।

এই পার্থক্যের কারণ কি তাহার সন্ধান ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়ে। কানাডায় [illegible] প্রভৃতি দলাদলি এবং মতভেদ সত্ত্বেও উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দ "দ্বিজাতি"তত্ত্বের প্রশ্রয় দেয় নাই। ইহা ঐ দেশের গৌরব মেকেঞ্জি কিং এই গৌরবের অংশীদার।

অখিলচন্দ্র দত্ত

পরিণত বয়সে ত্রিপুরার এই জননেতা দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্র-পরিজনের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

বাঙালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবক অখিলচন্দ্র আইন-ব্যবসায়ী রূপে জীবন আরম্ভ করেন। তখন আসিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বন্যা। কুমিল্লার তখনকার নেতৃবর্গ ছিলেন মথুরানাথ দেব, ভূধরচন্দ্র দাশ, অনঙ্গমোহন ঘোষ, রজনীনাথ নন্দী প্রভৃতি উকীল-প্রধানগণ। তাঁহাদের সহকারীরূপে অখিলচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয়। প্রায় ১০ বৎসর পরে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। সেই সময়ে "সিন্ধুবালার" গ্রেফতারে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সিন্ধুবালা সম্পর্কীয় মোকদ্দমাদি পরিচালনা করিয়া তিনি বঙ্গব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাহার পর দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভায় স্থান লাভ করেন এবং উক্ত সভার সহকারী সভাপতির পদে মনোনীত হন।

কুমিল্লা শহর বাঙালী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠারক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। অখিলচন্দ্র "পায়োনিয়ার" ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজনীতি হইতে ব্যবসায়-জগতে আসিয়া পড়েন। এই ব্যাঙ্কের পতনে তাঁহার শেষজীবন সুখের হয় নাই। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

গ্রাহক, সেলিং এজেণ্টস্, বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপনের এজেণ্টদের প্রতি

আগামী পূজার ছুটির জন্য প্রবাসী আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা—প্রকাশের সাধারণ নির্দ্দিষ্ট তারিখের কিছু আগে, যথাক্রমে ২৩শে ভাদ্র আশ্বিনের প্রবাসী এবং ২০শে আশ্বিন কার্ত্তিকের প্রবাসী প্রকাশিত হইবে। তদনুসারে ঐ সব সংখ্যার বুকপোষ্ট গ্রহণ অথবা ভিঃ পিঃ সংরক্ষণাদি গ্রাহকগণ যথাকালে করিবেন। সেলিং এজেণ্টগণ প্রয়োজনীয় সংখ্যার টাকা পূর্ব্বোক্ত প্রকাশ তারিখের পূর্ব্বে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিবেন। বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপনের এজেণ্টগণ আশ্বিন সংখ্যার জন্য ১—১৫ই ভাদ্রের ভিতর এবং কার্ত্তিক সংখ্যার জন্য ১—১৫ই আশ্বিনের ভিতর সব বিজ্ঞাপনাদি পৌঁছাইবার ব্যবস্থা অতি অবশ্য করিবেন। ইতি—প্রবাসীর কর্ম্মাধ্যক্ষ